মহাবিস্ময়

প্রশান্ত প্রামাণিক

চিত্র : 27

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে দেখা যায় এই গ্যালাক্সী। এটির নাম M81 বা NGC3031। এটি একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের ছায়াপথের মতই এটি Sb ধরনের সর্পিল গ্যালাক্সী। এর দূরত্ব প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ

প্রশান্ত প্রামাণিক

মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়

জ্ঞান বিচিত্রা
11 জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা-799001

Maha biswer Maha bismay

by

Prasanta Pramanik

প্রথম প্রকাশ ঃ 15ই ফেব্রুয়ারী, 2010

প্রকাশক ঃ দেবানন্দ দাম

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-799001

প্রচ্ছদ ঃ প্রশান্ত প্রামাণিক

মুদ্রণ ঃ এস ডি প্রিন্টার্স

32A পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-700 009

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

16 ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা-700 009

ফোন ঃ (033) - 2360 4981

সার্বিক যোগাযোগ

জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-799001, ত্রিপুরা

ফোন ঃ (0381) 232-3781 / 232-6342

e-mail : jnanbichitra@yahoo.com

ISBN : 978-81-8266-206-3

US $ 16

কনিষ্ঠা কন্যা

পৌলোমী-কে

কিছু কথা

মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ কাল থেকেই জাগতিক ঘটনা যেমন তাদের বিস্মিত করেছে, তেমনি বিপুল বিস্ময়ে তারা দেখেছে আকাশের নানা নৈসর্গিক ব্যাপার-স্যাপার। চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, গ্রহণ, উল্কাপাত, সমুদ্র নদীর জোয়ার-ভাঁটা, প্লাবন, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস — এই সব দেখে তারা ভয় পেয়েছে, পরে আস্তে আস্তে এক সময় তারা মানিয়ে নিয়েছে। এরপর তারা চেষ্টা করেছে কারণ অন্বেষণের। সৃষ্টি হয়েছে শাস্ত্র, পুরাণ, কিংবদন্তী। একালের মনীষীরা বলছেন, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে অ্যারিস্টটল [384-322 খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ], গ্যালিলিওর (1564-1642 খ্রিস্টাব্দ) সময় থেকে। অ্যারিস্টটলের কালের সঙ্গে গ্যালিলিওর কালের ব্যবধান প্রায় 2000 বছর। এর মধ্যে কোপারনিকাস (1473-1543 খ্রিস্টাব্দ) ছাড়া তেমন আর কাউকে দেখতে পাই না। অথচ এঁরা বলেন না, নিরীশ্বরবাদী মহর্ষি কপিলের কথা, বিবেকানন্দ যাঁকে বলেছেন 'শ্রেষ্ঠ দার্শনিক', যিনি প্রায় তিন হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা আজও যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক। বলেন না, জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির (505-587 খ্রিস্টাব্দ), আর্যভট (জন্ম 476 খ্রিস্টাব্দ), ব্রহ্মগুপ্ত (প্রথম) (জন্ম 598 খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (1114-1200 খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখের কথা। কোপারনিকাস বলার প্রায় এক হাজার বছর আগে আর্যভট প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে নিউটনের (1643-1727 খ্রিস্টাব্দ) প্রায় 500 বছর আগে লিখেছেন মহাকর্ষের কথা, কষেছেন 'অন্তর কলন' [Differential Calculus] এবং 'সমাকলন' [Integral Calculus]-এর অঙ্ক।

সুদূর অতীতে মানুষের কাছে মহাকাশ যতটা বিস্ময়ের ছিল একবিংশ শতাব্দীতে এসে আজ আর ততটা নেই। কিন্তু আজও আমরা সঠিকভাবে জানি না, মহাবিশ্ব চির- প্রসারণশীল কিংবা স্পন্দনশীল। বিজ্ঞানে এমন তত্ত্বও এসে গেছে যা দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে, এই মহাবিশ্ব মানবমুখী; অর্থাৎ এই বিশ্বের যেন সৃষ্টি হয়েছে শুধু মানুষের জন্য। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাবিশ্বের কতকগুলি ভৌত স্থিরাংক, যেমন মহাকর্ষীয় স্থিরাংক, প্রোটনের ভর, বিশ্বের বয়স, হাবল ব্যাসার্ধ, নিউট্রিনো ও ফোটনের অনুপাত ইত্যাদির মধ্যে বিস্ময়কর সংখ্যাগত সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এই সামঞ্জস্যের জন্যই পৃথিবীতে মানুষ এসেছে। কিন্তু কেন এই সামঞ্জস্য তা অজানা। বিজ্ঞান আজও এর ব্যাখ্যা খুঁজে পায় নি। গবেষণা চলছে। মহাবিশ্ব তাই আজও বিস্ময়ের। মহাবিশ্বে আমরা আজও সত্যি সত্যিই 'ভ্রমি বিস্ময়ে'।

'মহাকাশ' জড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের সঙ্গে। আইনস্টাইন বলেছেন, বস্তুহীন মহাকাশের কোনও অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে তাই মহাকাশ আছে। এই 'মহাকাশ' ইংরেজী 'Space'-এর সমার্থক। তবে পরিভাষাবিদরা Space -এর বাংলা করেছেন 'দেশ'। কেউ কেউ অবশ্য 'মহাকাশ'-ও বলেছেন। কিন্তু 'Space'-এর যে বিশাল ব্যাপ্তি তা 'দেশ'-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই 'দেশ-কাল সন্ততি'-কে আমি বহু ক্ষেত্রেই 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি' [Space-time-continuum] বলেছি। তাছাড়া, 'Spaceship' ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা Space-কে মহাকাশই বলছি। আপেক্ষিকতাবাদে 'মহাকাশের বক্রতা', 'মহাকাশের

ক্ষেত্র' ইত্যাদি অর্থবহভাবে বহুল ব্যবহৃত। খুব সাধারণ মানুষ অবশ্য মহাকাশ বলতে মাথার উপরের আকাশের কথাই বোঝেন। মহাকাশ তাঁদের কাছে অনেক দূরের আরও বিস্তৃত আকাশের নামান্তর মাত্র। কিন্তু মাথার উপরের 'নীল আকাশ'-টা কী বস্তু তা তাঁদের অনেকেরই অজানা। 'মহাকাশ' বা দেশের স্বরূপ যথাযথভাবে তাঁদের ধারণায় নেই।

'মহাকাল' হল মহাসময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে 'মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে'-র মহাকাল বলতে মহাসময়কেই বুঝিয়েছেন। আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বলেছেন, সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। ঘটনা না থাকলে সময় বলে কিছু নেই। সময় অপরিবর্তনীয় নয়। সময় আপেক্ষিক। আবার সময় ও মহাকাশকে আলাদাভাবে কখনও কল্পনা করা যায় না, বলতে হয় 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি' বা 'দেশ-কাল-সন্ততি'। জাগতিক বিন্দুসমূহ 'চার মাত্রিক' [Four Dimensional] — অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা এবং সময়। এখন আবার সময় নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা এসেছে। বলা হচ্ছে, কাল্পনিক সময় ও বাস্তব সময়ের কথা। হকিং সাহেব আবার বাস্তব সময়ের দিক নির্দেশ তিনটি 'সময়-তীর' [Arrow of Time] দিয়ে সূচিত হয় বলেছেন। এই তিনটি সময়-তীর হল ঃ 'তাপ-গতিতত্ত্বীয় সময়-তীর [Thermodynamic Arrow of Time], 'মনোবৈজ্ঞানিক সময়-তীর' [Psychological Arrow of Time] এবং 'বিশ্ব-তত্ত্বীয় সময়-তীর' [Cosmological Arrow of Time]। প্রথমটি বলে, 'এনট্রপি' [Entropy] বা অব্যবহারযোগ্য শক্তি বাড়ছে সারা বিশ্বে। দ্বিতীয়টি বলে, আমরা অতীতকে মনে করতে পারি ভবিষ্যতকে নয়। আর তৃতীয় সময়-তীরটি বলে যে, মহাবিশ্ব ক্রম-প্রসারিত হচ্ছে—সংকুচিত হচ্ছে না।

বর্তমান গ্রন্থে মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যেমন মহাবিশ্ব আছে, তেমনি আছে মহাবিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মহাকাশ এবং অবশ্যই মহাসময়ের নানা কথা। মহাবিশ্বের কথাই এখানে মুখ্য। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই এখনও নেই। চেষ্টা করা হয়েছে মহাবিশ্ব, মহাকাশ ও মহাসময় সম্পর্কিত যতদূর সম্ভব আধুনিক তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশন করার। 2008 খ্রিস্টাব্দ অবধি পাওয়া প্রায় সব তথ্যই সংযোজিত হয়েছে। প্রাচীন তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে একেবারে আধুনিক তত্ত্ব এবং তথ্যের একটা তুলনামূলক আলোচনাও করা হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। দেখানো হয়েছে, চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতির রূপরেখা। কিছু ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব, মহাকাশ কিংবা মহাসময় সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার সঙ্গে আধুনিক ধারণার অদ্ভুত মিল আমাদের বিস্মিত করেছে। পাঠক-পাঠিকারাও বিস্মিত হবেন সন্দেহ নেই।

এখনও বিজ্ঞানে স্রষ্টা ঈশ্বরের কোনও স্থান নেই। আইনস্টাইনের মতই আমরা মনে করি, 'বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের রূপ ও গুণধারী এবং আমাদের প্রার্থনা শুনতে পান কিংবা আমাদের ক্ষতি করতে পারেন এ রকমের ঈশ্বরের অস্তিত্ব' কোথাও নেই। কিন্তু বেদান্তের 'ঈশ্বর' নিয়ে বিজ্ঞানের বিরোধিতা থাকার কথা নয়। এই 'ঈশ্বর' আমাদের রামানুজাচার্যের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', যার অনেকটাই কাছাকাছি এসেছেন 'স্পিনোজার ঈশ্বর'। 'ঈশ্বর' শব্দটার সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কদের একটা ছুৎমার্গীয় ভাব রয়েছে। তাঁদের জন্য বলি, প্রায় তিন হাজার বছর আগে নিরীশ্বরবাদী মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্যদর্শনে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে বলেছেন 'আকাশ' এবং সমস্ত শক্তিকে অভিহিত করেছিলেন 'প্রাণ' বলে। অর্থাৎ 'Matter' হ'ল 'আকাশ' এবং 'Energy' হল 'প্রাণ। এই 'আকাশ' ও 'প্রাণ'-এর সম্মিলনে উৎপন্ন সমগ্র বিশ্বচরাচর তার চেতনাসহ বেদান্ত দর্শনে 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হয়েছেন। আরও

বিস্ময়কর কথা হল, ওই অতোদিন আগে 'আকাশ' এবং 'প্রাণ' যে একই সত্তার বা মহত্তত্ত্বের দুই রূপ তা ঘোষণা করেছে সাংখ্যদর্শন। 1905 সালে আইনস্টাইন যেন তারই গাণিতিক রূপ দিয়ে বললেন, $E = mc^2$।

হকিং বলেছেন, বিশ্বের সম্প্রসারণকালেই বুদ্ধিমান জীবদের দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সংকোচনের সময়ে বিশ্ব বুদ্ধিমান জীবের উপযোগী থাকবে না। সুতরাং বিশ্বের অস্তিত্বের সঙ্গে জ্ঞান বা চেতনার অস্তিত্বের কথা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মেনে নিচ্ছে। বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে শুধু আকাশ-প্রাণ বা পদার্থ-শক্তি নয়, চেতনা বা চৈতন্যও রয়েছে। এই সব কিছু নিয়েই বেদান্তের 'ঈশ্বর', যিনি পাপ-পুণ্য বিচার করে শাস্তি কিংবা পুরস্কার দেন না। হকিংয়ের সহকর্মী রোজার পেনরোজ তাঁর 'The Emperor's New Mind' বইটিতে মস্তিষ্ক চেতনা ও মন নিয়ে বিশদ আলোচনার পর উপসংহারে লিখেছেন, "সম্ভবত কম্প্যুটেশনের সাহায্যে মন ও মস্তিষ্ককে জানতে গিয়ে বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়, গণনার বাইরে তখন মনের কাব্যিক অথবা অন্তর্মুখী কিছু ধর্মের আভাস পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে আমার যুক্তি হল কম্প্যুটারে পাওয়া মনের কাঠামো থেকে নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু যোগসূত্র হারিয়ে গেছে। তবু আমি মনে করি, বিজ্ঞান ও গণিতের সাহায্যে মনের সঠিক চিত্র একদিন ধরা পড়বে। আপাতদৃষ্টিতে যে বিপত্তি দেখা যায়, তার সমাধানও সম্ভব হতে পারে। কম্প্যুটেশনের চেয়ে সূক্ষ্ম গণিত অনেক নিখুঁত। তবু গণিতের বাইরে মন নিয়ে রহস্য ও সৌন্দর্যের কিছু লেশ থেকে যায়। যে বিশ্বে নিয়মকানুনের সাহায্যে চেতনার অস্তিত্ব থাকে না, সে বিশ্ব স্বীকার করা যায় না। এখনও পর্যন্ত আমরা গণিতাশ্রয়ী যে বিশ্ব অনুভব করি তা এই অর্থে অসফল। চেতনার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে কোনো তত্ত্বাশ্রয়ী বিশ্বের অস্তিত্ব থাকলে তা স্বীকৃত বিশ্ব হিসাবে পরিচিত হবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, মন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম্প্যুটারের মত কাজ করে, তবে চেতন মন কখনই কম্প্যুটারের মত কাজ করে না, তার চেয়ে কিছু বেশি। ....তাই চেতনার কোনও নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

চারশো বছর আগে 1609 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনে পর্যবেক্ষণ করা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি প্রথম নথিভুক্ত করতে শুরু করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের চলমানতার সেই শুরু। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিয়নের [IAU] প্রস্তাব মত 'ইউনেস্কো' [UNESCO] 2009 সালকে 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ' [International Year of Astronomy] হিসাবে ঘোষণা করেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান বইটির অবতারণা। গ্যালিলিও জন্মেছিলেন 1564 সালের 15ই ফেব্রুয়ারী। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই এই বইটির প্রকাশ দিন রাখা হয়েছে 15ই ফেব্রুয়ারী।

এই বইটি লিখতে গিয়ে বহু বই এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা বইয়ের শেষে সংযোজিত হয়েছে। এইসব বই-পত্র-পত্রিকার লেখক-লেখিকাদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। বইটি আয়তনে বড় হয়ে যাওয়ায় কয়েকজন প্রকাশক এটিকে ছাপাতে রাজী হন নি। কিন্তু 'জ্ঞান বিচিত্রা'-র প্রকাশক দেবানন্দ বাবু আবারো আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন এই বইটি ছাপাবার দুঃসাহস দেখিয়ে। তাঁর সব কলাকুশলীদের কৃতজ্ঞতা এবং অজস্র ধন্যবাদ জানাই। আমার অন্যান্য বিজ্ঞান বইয়ের চেয়ে কিছুটা অন্য ধরনের এই বইটি সব শ্রেণির পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করুক এই প্রার্থনা জানালাম।

কলকাতা

25শে ডিসেম্বর, 2009

প্রশান্ত প্রামাণিক

সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দর্শনে মহাবিশ্ব

[মানুষের জ্ঞান উন্মেষের কাল থেকেই জগৎ ও প্রকৃতিকে নিয়ে তাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। তাদের চিন্তাভাবনায় এসেছে আকাশ, মহাকাশ, জগৎ ও মহাবিশ্ব। হরপ্পা সভ্যতার আমল থেকে মহাবিশ্বকে নিয়ে জ্ঞানের যে বিবর্তন তথা বিকাশ আধুনিককাল অবধি ঘটেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। মহাবিশ্বকে সাংখ্যদর্শন, বৈদিক দর্শন, বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং একালের পাশ্চাত্য দর্শন কেমনভাবে দেখেছে তার আলোচনা করা হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহর্ষি কপিল থেকে শুরু করে গৌতম বুদ্ধকে পেরিয়ে স্পিনোজা, লাইবনিজরা এসেছেন এই আলোচনায়। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যেমন আছে, তেমনি রয়েছে লাইবনিজের কল্পিত 'চিদণু'-তে প্রতিবিম্বিত মহাবিশ্ব।]

'দর্শন' শব্দটি সবার কাছে কমবেশি পরিচিত। এটির আভিধানিক অর্থ হল, অবলোকন, দেখা, জ্ঞান, স্বপ্ন, বুদ্ধি, ধর্ম, উপলব্ধি। এর বুৎপত্তি হল দৃশ [দেখা] + অনট্ ভা। তেমনি এর অপর বুৎপত্তি হল দৃশ + অনট্ ণ। এর অন্য অর্থগুলি হল, নয়ন, চক্ষু, মুকুর; আবার দর্শন হল, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত এই ছয়টি এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রধান শাস্ত্রসমূহ তথা জ্ঞানশাস্ত্র। সাধারণভাবে দর্শন বলতে আমরা যেমন 'দেখা' বুঝি, তেমনি বুঝি দর্শন শাস্ত্রসমূহকে; বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের ষড়্-দর্শন শাস্ত্রগুলিকে। এই ষড়্-দর্শনই হল—পূর্ব-মীমাংসা, বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখবো, এই ষড়্-দর্শনেই শুধু নয়, ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে, বৌদ্ধ দর্শনে, এমনকি পাশ্চাত্য দর্শনেও মহাবিশ্ব কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, ব্যাখ্যাত হয়েছে। চেষ্টা করবো, দর্শনের দৃষ্টিতে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের একটা রূপরেখা দিতে।

মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ মানুষই দর্শনের সীমারেখা সংকুচিত করে দৈনন্দিন জীবনের ধর্মীয় আচার-আচারণগুলিকেই দর্শনের শেষ কথা বলে মনে করে বা বিশ্বাস করে। কিন্তু দর্শনের সীমারেখা অতো সংকীর্ণ পরিধির নয়। তার বিশাল ব্যাপ্তির কথা সাধারণ মানুষের অজানা বলেই দর্শন বলতে তারা বোঝে ধর্মাচরণের রীতি-নীতি, আচার-বিচার ও প্রথা-পদ্ধতি। আসল দর্শনের সঙ্গে এগুলির যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। কতকগুলির সঙ্গে দর্শনের যোগাযোগ নেই বললেও চলে। এইসব আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি দর্শন নয়। দর্শন আরও অনেক উন্নত চিন্তা-ভাবনার ফসল। তার পরিব্যাপ্তি অনেক বিশাল। আর বিশাল বলেই বলা হয়, বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানেই শুরু। আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিই হয়েছে দর্শন থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক করে নিয়ে। দেকার্ত [Rene Descartes] [1596-1650 খ্রিঃ], স্পিনোজা [Benedict de Spinoza] [1632-1677 খ্রিঃ], লাইব্নিজ [Gottfried Wilhelm Leibniz] [1646-1716 খ্রিঃ] প্রমুখ প্রথিতযশা দার্শনিকদের হাত ধরেই এসেছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞান। এঁদেরই অবদানে দর্শন থেকে পৃথক হয়ে গেছে আধুনিক বিজ্ঞান।

ভারতীয় বেদান্ত দর্শন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় অনেক প্রাচীন হলেও, ওই দর্শন মহাবিশ্বের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং তার স্বরূপ নিয়ে অত্যাশ্চর্য এমন সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সেগুলি আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে। মহাবিশ্ব নিয়ে এইসব বিস্ময়কর ব্যাখ্যায় আমরা আসবো এই পরিচ্ছেদের স্বল্প পরিসরে। দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামান্য কিছু আপাত বিরোধ থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান দর্শনেরই অনুগামী। একথা আপ্তবাক্যের মতই স্মরণীয় যে, বিজ্ঞানী মাত্রেই দার্শনিক। মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞানের বহু বিখ্যাত তত্ত্ব ও তথ্য এবং অধুনা আবিষ্কৃত বহু প্রযুক্তির কথা ভারতীয় দর্শনে যেমন আছে, তেমনি আবার অনেক কিছুই আছে, যা আজকের বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আবিষ্কার করতে পারবে, কিন্তু দর্শনের সব ধারণার শেষ সীমা সুদূর ভবিষ্যতেও আধুনিক জড়-বিজ্ঞান ছুঁতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই বিশাল ব্যাপ্তি-সম্পন্ন দর্শনের বিপুল যৌক্তিক পটভূমিতে মহাবিশ্বের স্বরূপ, তার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ক্রমসংকোচন ইত্যাদির ব্যাখ্যায় আসা যাক।

উপনিষদীয় দর্শন মহাবিশ্বকে 'জগৎ' বলে অভিহিত করেছে। 'জগৎ' শব্দের অর্থ হল, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, লোক, ভুবন। 'গম্‌' ধাতুর কিপ্‌ 'ক' যোগ করে নিপাতনে আসে 'জগৎ' শব্দটি। 'গম্‌' ধাতুর অর্থ হল 'গমন করা'। আবার 'গম্‌' ধাতুর সঙ্গে অতি 'ক' যোগ করেও আসে 'জগৎ'। সে জগতের অর্থ হলো জঙ্গম, অস্থায়ী। ইংরেজির 'Universe' শব্দটির অর্থ বা বাংলা প্রতিশব্দ হল 'জগৎ'। দর্শনের তথা দার্শনিকদের 'জগৎ' হল বিজ্ঞানের 'মহাবিশ্ব'। এই 'জগৎ' তথা 'মহাবিশ্ব' সম্পর্কে উপনিষদীয় ধারণা দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করি।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি দিয়ে শুরু করা যাক। এই উপনিষদের প্রথম পংক্তিটি হল, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। এর অর্থ হল, "এই গতিশীল বিশ্বে যাহা কিছু চলমান বস্তু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত।" অন্য অর্থে এই বিশ্ব ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের পরিচ্ছদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম এই বিশ্বের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। অপর অর্থে এই মহাবিশ্বরূপ গৃহে তিনি বাস করছেন। এর ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, এই বিশ্ব গতিশীল। এখানে যা কিছু চলমান বা গতিশীল সবই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছাদিত বা সবকিছুতেই ঈশ্বর আছেন। জগৎ বা মহাবিশ্ব সর্বদাই চলছে, সর্বক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যও এর স্থিরতা নেই। সে কারণেই মহাবিশ্ব 'জগৎ' নামে অভিহিত। এই জগতের মধ্যে যা কিছুই আছে, অর্থাৎ জাগতিক বস্তু মাত্রেই গতিশীল, চলমান। উপনিষদীয় মতে এই চলমান জগৎ একটি অচল সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। কারণ, একটি অচঞ্চল, গতিহীন নিত্য সত্তাকে আশ্রয় না করলে জগতের এই চঞ্চল প্রবাহ সম্ভবই হত না। এই অচঞ্চল নিত্য সত্তাকে আশ্রয় করেই জগৎ চলমান। আর এই অচঞ্চল নিত্য সত্তাই সমগ্র বিশ্বকে এবং এই মহাবিশ্বের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তুকেই ধারণ করে রেখেছে। দর্শন এই অচঞ্চল স্থির সত্তারই নাম দিয়েছে 'ঈশ্বর', উপনিষদীয় ভাষায় যাঁর অন্য নাম 'পরব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্ম'। এই ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করে আছেন। অথবা বলা চলে তিনি সকল বস্তুর অন্তরে বাস করছেন এবং সব কিছুর মধ্যে অবস্থান করে মহাবিশ্বকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং পরিচালিত করছেন। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। মানুষকে অনুভব করতে হবে সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে। বুঝতে হবে, ঈশ্বরের সত্তা নিরপেক্ষ কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। মহাবিশ্বের সবকিছুতেই ঈশ্বরকে দেখতে হবে। ছান্দোগ্য

উপনিষদ তার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে একেবারে এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সমুদয়ই ব্রহ্ম [3/14/1]। মহাবিশ্বের সবকিছুই ব্রাহ্মীসত্তা। এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মেরই অন্তর্গত।

সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিংবা উৎপত্তি নিয়ে। উপনিষদীয় দর্শনে 'সৃষ্টি' বলতে বোঝায় পরিবর্তিত রূপ বা রূপান্তর। দর্শন মতে বিশ্বের উৎপত্তি পরব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র। জগতে এক কণা বস্তু কিংবা এক বিন্দু শক্তি নতুন করে সৃষ্টি করা অসম্ভব। ইংরেজীর 'Creation' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, উপনিষদীয় দর্শনে 'সৃষ্টি' কথাটা সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এই দর্শন মতে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না, ধ্বংসও হয় না। চির-পরিবর্তনশীল এই জগতে কেবল পরিবর্তন হয় মাত্র। এই পরিবর্তনই ঘটায় পদার্থ কিংবা শক্তির রূপান্তর। মহাবিশ্বের মোট পদার্থ কিংবা শক্তির পরিমাণ চিরকালই এক। এর এককণা পদার্থ কিংবা এক বিন্দু শক্তি বাড়ানো বা কমানো অসম্ভব। এই দর্শন বলছে, শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে কিংবা পদার্থ শক্তিতে, কিন্তু মোট শক্তি তথা পদার্থের পরিমাণ এই মহাবিশ্বে চিরকালই এক রয়েছে এবং থাকবেও। প্রায় হাজার তিনেক বছর আগে মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন পদার্থ ও শক্তির তুল্যতার কথা বলেছে। যে কথা আইনস্টাইন বলেছেন 1905 খ্রিস্টাব্দে তাঁর অতি বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্রে। সাংখ্যদর্শনের কথায় খানিকটা পরেই আসব। আবারও বলি, বেদান্ত তথা উপনিষদীয় দর্শন বলছে, জগতের একটা বস্তুকণাও ধ্বংস কিংবা সৃষ্টি করা যায় না। দর্শনে ধ্বংস হল কারণে লয় এবং সৃষ্টি হল নতুনে রূপান্তর। দর্শনে সৃষ্টি মানে রূপান্তর, Creation নয়। আর বিশ্বসৃষ্টির অর্থ হল বিশ্বের প্রকাশ, ক্রমবিকাশ। ব্রহ্মের থেকে জগতের প্রকাশই হল 'বিশ্বসৃষ্টি'। বিশ্ব নতুন করে সৃষ্ট হয় না, অচঞ্চল নিত্য সত্তা ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করেন, তাই-ই বিশ্বসৃষ্টি। ভারতীয় দর্শনে এই বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে বহু মূল্যবান তত্ত্ব রয়েছে, যেগুলির দু-চারটি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বের তথা জগতের স্বরূপ কেমন। বেদান্ত দর্শনের ভাষায় বিশ্বসৃষ্টি 'Creation of the Universe' নয়, 'Transformation of the Universe'. ব্রহ্মই রূপান্তরিত হয়েছেন মহাবিশ্বে। মহাবিশ্ব ব্রহ্মেরই রূপান্তরিত প্রকাশ। ব্রহ্মই অচল, অপরিণামী সত্তা। সেই সত্তাই বিকশিত হয়ে জগৎ হয়েছে। এই চলমান পরিণামী জগৎ ব্রহ্মসত্তারই রূপান্তরণ মাত্র। জগৎ এই ব্রাহ্মীসত্তারই পরিবর্তিত রূপ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। এটি হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এর রচনাকাল নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। একদল বলছেন, এর রচনাকাল প্রায় 3500 বছর আগের কোনও সময়। আবার ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক এবং বিদগ্ধ একদল পণ্ডিতজন বলছেন, ঋগ্বেদের রচনা শুরু হয়েছে এখন থেকে প্রায় 6000 বছর আগে। এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই ফিরতো। প্রায় 4500 বছর আগে এইসব সূক্ত সঙ্কলিত হয়ে সৃষ্টি হয় ঋগ্বেদ। এই গ্রন্থের দশম মণ্ডলের 129-তম সূক্তটি 'নাসদীয় সূক্ত' নামে বিশ্বখ্যাত। এই সূক্তে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বিগত 6000 বছরে জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দর ও কবিত্বময় বক্তব্য আর কেউ রাখে নি। বিশ্বের বিকাশের আদিকথা অদ্ভুত কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে এই সূক্তটিতে। সৃষ্টির আদিকারণ এই সূক্তে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকেও হার মানায়। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যায় এই প্রাচীন সূক্তটি বিস্ময়করভাবে একালের

আধুনিক বিজ্ঞানকেও টেক্কা দেয়। 'নাসদীয় সূক্ত'টির বাংলা অনুবাদ এইরকম ঃ

"সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না; রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সে একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্বপ্রথম অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হলেন। ওদের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নীচের দিকে এবং ঊর্ধ্ব দিকে বিস্তারিত হল, নিম্নদিকে রইল স্বধা প্রয়তি ঊর্ধ্ব দিকে রইলেন। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মিল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন। কোথা হতে যে হল, তা কেই বা জানে? এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল? কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও না জানতে পারেন।" [ঋগ্বেদ ❑ 10ম মণ্ডল ❑ 129 সূক্ত]

এটিই নাসদীয় সূক্তের বঙ্গানুবাদ। এতে বলা হল সৃষ্টির আদি কারণ এবং তার প্রক্রিয়া। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বেদান্ত দর্শনের ধারণার আদি রূপ এই প্রাচীন সূক্তটিতে অত্যন্ত সুচারুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দশম মণ্ডলের এই সূক্তটিকে কিছুটা আধুনিক বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল অন্যান্য মণ্ডলগুলি অপেক্ষা কিছুটা আধুনিককালে রচিত। ভাষা এবং দার্শনিক মননের দিক থেকে এই সূক্তটি, এই মণ্ডলের অন্যান্য সূক্তগুলির মতই কিছুটা অর্বাচীন বলে মনে করা হয়। সাড়ে চার হাজার বছর আগে ঋগ্বেদ সঙ্কলিত হলেও, এই সূক্তটির বয়সকাল সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে বলেই বিবেচনা করা হয়, যখন ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে সুদূরপ্রসারী পরমাত্মার ধারণা ছায়াপাত করেছে। আত্মা, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ধারণার সেই শুরু। এই মনন অত্যন্ত পরিণত হয়ে চলে এসেছে উপনিষদীয় ধারণায়। উপনিষদগুলি তথা বেদান্তের রচনাকাল মোটামুটিভাবে এখন থেকে আড়াই হাজার কিংবা তিন হাজার বছর। নাসদীয় সূক্তই ব্রহ্মবাদের আদি জননী। বিশ্বসৃষ্টির দার্শনিক ব্যঞ্জনার আদিতম সূক্ত।

নাসদীয় সূক্তটিয় দ্বিতীয় ঋক বলছে, 'তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।' অর্থাৎ এক অচঞ্চল, অপরিণামী সত্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে, যা মহাবিশ্ব প্রকাশিত হওয়ার আগেই ছিল। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মা তথা ব্রহ্ম তথা পরব্রহ্মের অস্তিত্বের কথা বলছে নাসদীয় সূক্ত। এই ব্রহ্মই জগৎ হয়েছেন। বিশ্ব চরাচরের সবকিছুই সেই অপরিণামী অচঞ্চল সত্তার পরিবর্তিত প্রকাশ। ঈশোপনিষদের পূর্বালোচিত 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং' এই মন্ত্রেই নাসদীয় সূক্তের পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ধারণার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। ঈশোপনিষদ এবং নাসদীয় সূক্তের মধ্যে সময়ের তফাৎ প্রায় এক হাজার বছর। এই হাজার বছর ধরে ব্রহ্মবাদ লাভ করেছে বিস্তৃতি এবং পরিপূর্ণতা।

"সর্বপ্রথম অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল।" বিশ্বসৃষ্টির পূর্বাবস্থার বর্ণনা এর চেয়ে আরও সুন্দর হতে পারে কি? সম্ভবতঃ নয়। শুধু তাই নয়, নাসদীয় সূক্ত বলছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে 'মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না।' বাস্তবিকই যখন বিশ্ব ছিল না, কেবল মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো, তখন মৃত্যু, অমরত্ব, রাত্রি, দিন কিছুই ছিল না। কেবল অন্ধকার অন্ধকারকে আবৃত করে রেখেছিল। সবকিছুই চিহ্নবর্জিত ও জলময় ছিল। এই 'জল' কিন্তু জল নয় 'সলিল'। এই 'সলিল' সেই জ্যোতির্ময় 'প্রবাহী' [Fluid], যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগের 'মহাজাগতিক অণ্ড' [Cosmic Egg]-এর উপাদান। এই সলিলকে দর্শন পরবর্তীকালে 'কারণ সলিল' হিসাবেও বর্ণনা করেছে। নাসদীয় সূক্তের তৃতীয়ে ঋকে 'সলিল' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে—'সলিলং সর্বমা ইদম্'। বাংলায় অনুবাদের সময় 'সলিল' জল হয়ে গেছে।

সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের বিখ্যাত টীকাকার। সেই সায়ণ নাসদীয় সূক্তের ওই 'মহিমা'কে বলেছেন 'পঞ্চভূত', 'স্বধা'-র অর্থ করেছেন 'অন্ন'। এই অন্ন নিকৃষ্ট এবং 'প্রয়তি'র অর্থ করেছেন, 'ভোক্তা পুরুষ', যে ভোক্তা সর্বজীবের উপরে অর্থাৎ প্রধান। পণ্ডিতবর মিউর [Muir] বলেছেন, 'a self-supporting principle beneath and energy aloft.......' নাসদীয় সূক্ত বলছে, প্রকৃতির যে কার্যসমূহ ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ 'দেব' বলে পূজা করতেন, তাঁরা আদি দেব নন, তাঁরাও সৃষ্ট হয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ তাঁরা কারণ নন, তাঁরা কার্য মাত্র। সূক্ত রচয়িতা ঋষির মনে তাই প্রশ্ন এল, কারণ কে? আদি কে? তারই উত্তর হল 'তিনি'—সেই অচঞ্চল, অপরিণামী সত্তা, যার কথা পরবর্তীকালে উপনিষদগুলি নানাভাবে বলেছে। নাসদীয় সূক্ত এও বলেছে, 'এ নানা সৃষ্টি যে কোথা থেকে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন।' ওই সূক্তের ঋষি এও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, সেই 'তিনি'-ও তা না জানতে পারেন।

নাসদীয় সূক্তের ঋষি যে ধরনের কথা বলছেন, তার কিছু কিছু বলছেন একালের জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞানীরা এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের [Quantum Physics] লোকজনেরা। বিশ্ব বিকাশের তথা সৃষ্টির আগে ছিল এক অবর্ণনীয় মহাশূন্য অবস্থা। মহাশূন্য ও শূন্যের মধ্যে তফাৎটা বৈদিক ঋষিরা জানতেন এবং বুঝতেন। তাই তাঁরা বলছেন, বিশ্বসৃষ্টির আগে বস্তু বা অবস্তু কিছুই ছিল না। তবে অচঞ্চল, অপরিণামী ব্রহ্ম অবশ্যই ছিলেন। সে ব্রহ্মে ছিল না আকাশ অর্থাৎ স্পন্দনশীল শূন্য [Pulsating Void]। তখন ছিল না দেশ [Space], কাল [Time] ও নিমিত্ত [কার্য ও কারণ সম্পর্ক]। তখন সেই অবিদ্যমান বস্তু বা পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই ছিলেন, যিনি জীবিত থাকেন বিনা বায়ুতেই, যিনি অজর, অমর, নিত্য, অপরিণামী।

নাসদীয় সূক্তের ওই অন্ধকার একালের জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞানের কৃষ্ণগহ্বর [Black Hole]। 'অবিদ্যমান বস্তু' হল 'অক্রিয়াশীল শক্তি' [Entropy] বা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। তিনিই ওই মহাশূন্যতার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। এই শক্তি পরিবর্তিত হয়ে ঘনীভূত হয়, বিবর্তিত হয় ইচ্ছায়। ইচ্ছা বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদিশক্তি। এই আদি শক্তি থেকেই তৈরি হয় দেশ-কাল-নিমিত্ত। এই দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম জগৎ হন। নাসদীয় সূক্তের আলো হল জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের 'Whitehole'। সৃষ্টির আদি-ক্রিয়ার সময় দর্শক কেউ ছিল না। তাই আদি-ক্রিয়া সম্পর্কে কেউ কিছুই বলতে পারে না। ঋষিরা এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে, সেই পরমধামের প্রভু তথা পরব্রহ্মও হয়ত জানেন না সৃষ্টির আদি-ক্রিয়া

কেমনভাবে হয়েছিল। এই মহান সত্য একমাত্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। দর্শন এই স্তরে এসে অনুভূতির কথা বলে, বলে হৃদয় দিয়ে অনুভবের কথা। বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না, যুক্তি তথ্য সবই এই স্তরে এসে নিষ্ফল হয়ে যায়। অবিদ্যমান ওই বস্তুই পরবর্তীকালে উপনিষদের পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্মকে উপনিষদ এবং গীতা 'অব্যক্ত' বলেও অভিহিত করেছে। এই অব্যক্তেই অবস্থান করে সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি, গীতার পরা-প্রকৃতি এবং অপরা-প্রকৃতি, সৃষ্টি-পূর্ব পুরুষ-প্রকৃতি, যার বিকশিত রূপই হল মহাবিশ্ব।

নাসদীয় সূক্ত বিশ্ব সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশের কথা এতো সুন্দর ও গভীর ব্যঞ্জনা সহকারে বর্ণনা করেছে যে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বাবস্থা ও সৃষ্টির আদিক্রিয়া সম্পর্কে পৃথিবীর সব সময়ের সব গ্রন্থের সমস্ত বর্ণনার শ্রেষ্ঠতম বর্ণনা দিয়েছে ঋগ্বেদের অতিবিখ্যাত এই 'নাসদীয় সূক্ত'। এই সূক্তের ওই জ্ঞান, ওই গভীর অন্তর্দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের কিছু কিছুর মূল সূত্র এই সূক্তে নিহিত রয়েছে। ব্রহ্মই জগৎ হয়েছেন কিংবা জগৎ হ'য়ে প্রতিভাত হচ্ছেন, মহাবিশ্ব সম্পর্কে এটাই ভারতীয় দর্শন তথা বেদান্ত দর্শনের ধারণা এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্তও বটে।

ঋগ্বেদে সূক্ত হল ঋক বা শ্লোকের সমষ্টি। সূক্ত শব্দটির বুৎপত্তি হল, সু-বচ্ ধাতু + ক্ত অর্থাৎ যাহা শোভনভাবে কথিত হয়। বৈদিক স্তোত্র সূক্ত নামে অভিহিত। প্রত্যেকটি সূক্ত কয়েকটি ঋকের সমষ্টি। ঋক শব্দের অর্থ হল 'স্তুতি' বা পূজা। কয়েকটি ঋক নিয়ে যেমন একটি সূক্ত তৈরি হয়, তেমনি কয়েকটি সূক্ত নিয়ে একটি 'মণ্ডল'। ঋগ্বেদে মোট 10টি মণ্ডল, 1028টি সূক্ত এবং 10552টি ঋক রয়েছে। নাসদীয় সূক্তটি ঋগ্বেদের 1028টি সূক্তের একটি। এটির ঋকসংখ্যা সাতটি। এটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত।

সৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি, যা পূর্বে ছিল না, এখন হল, তাই-ই সৃষ্টি। এই অর্থে সৃষ্টি ক্রমাগত হচ্ছে। বস্তুতঃ আমাদের সৃষ্টিশক্তি আছে বলেই আমরা সৃষ্টি বুঝতে পারি এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা কী সৃষ্টি করি? উপাদান সৃষ্টি করি, না আকৃতি সৃষ্টি করি? বস্তু সৃষ্টি করি, না কার্য সৃষ্টি করি? দর্শন বলছে, মূল বস্তু একটাই—এক অখণ্ড দেশ-কালে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়-বিষয়ী-সমন্বিত, সসীম-অসীম-ভেদাভেদবিশিষ্ট পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। আমাদের সমুদয় জ্ঞানে তিনিই প্রকাশিত হন নানা রূপে। আমাদের কোনও জ্ঞান সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড বস্তুকে অতিক্রম করতে পারে না। আমাদের কোনও কাজই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। আমরা যা কিছু করি তাতে মূলবস্তুর আকৃতি, তার প্রকাশক্রম পরিবর্তিত হয় মাত্র, বস্তুর মূল স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকে। আকারের পরিবর্তন বা বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটলেও বস্তুর স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকে। এই আকার পরিবর্তনও আপাত তথা বাহ্য—জলের উপর তরঙ্গের অবস্থানের মত। মূল বস্তু স্বরূপতঃ একই বা পরিবর্তনহীনই থাকে। আমরা যা কিছু করি তাতে মূলবস্তুর আকৃতি, প্রকাশক্রম পরিবর্তিত হয়। সমস্ত আকার পরিবর্তনেও বস্তুর স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকে। জড় বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলে 'Conservation of Mass" বা 'Conservation of Energy'. শক্তি কিংবা ভরের এই নিত্যতার কথা দর্শন বহুকাল আগেই বলেছে। মহাবিশ্বে পদার্থ ও শক্তির মোট পরিমাণ চিরকালই এক। জড়-বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন আগে এই বলেছে। দর্শন বহুকাল আগেই বলেছে, পদার্থ এবং শক্তি একই সত্তার দুই রূপ। বাহ্যিক রূপের

এই পরিবর্তন বা আপাত পরিবর্তন চলতেই থাকবে ততদিন, যতদিন মহাবিশ্ব আছে। মহাবিশ্বের মহাসমুদ্রে 'তরঙ্গ' মিলায়ে যায়, তরঙ্গ ওঠে, কিন্তু মূলসত্তা সমুদ্র সলিলের স্বরূপ একই থাকে। মহাবিশ্ব না থাকলে ব্রহ্ম-সমুদ্রে তরঙ্গ নেই। রামকৃষ্ণ বলতেন, 'স্থির জল ব্রহ্মের উপমা, জল হেলছে-দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা।' মহাবিশ্ব আছে বলেই ব্রহ্ম-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠছে নামছে। মহাবিশ্ব না থাকলে কেবল তরঙ্গহীন ব্রহ্মই আছেন অচঞ্চল, অপরিণামী সত্তা হয়ে। ব্রহ্ম-সমুদ্রে কেন তরঙ্গ ওঠে, কেন মহাবিশ্ব প্রকাশিত হয় তা প্রায় অজানাই। ঋষিরা বলেন, 'ব্রহ্মের অহৈতুকী ইচ্ছা'-র কারণে এমনটা হয়, নিষ্ক্রিয় পরম সত্তায় নাম-রূপ তরঙ্গ ওঠে, বিশ্ব বিকশিত হয়। অবশ্য বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীরা এই তরঙ্গগুলিকে বলেছেন, 'মায়া'। মায়া অনির্বচনীয়, আছেও বটে, আবার নেইও বটে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা অবশ্য বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য।' ব্রহ্মই জগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন। এঁদের মতে সমুদ্র সত্য তার তরঙ্গও সত্য, মায়া বা রজ্জুতে সর্পভ্রম নয়। জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ ব্রাহ্মীসত্তা। জগৎ ব্রহ্ম-সমুদ্রে নামরূপ তরঙ্গের সমাহার। মহাবিশ্ব তথা জগৎ ব্রহ্মের এক সত্তা, এক রূপ, কিন্তু মহাবিশ্বটাই ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্ম জগতেরও অতিরিক্ত সত্তা।

ব্রহ্ম সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বহু কথাই বলেছে। বলেছে, "ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময় এবং সর্বময় [বৃহদা উপঃ 4/4/5]।" মহাবিশ্বের বা জগতের রূপসৃষ্টি সম্পর্কে এই উপনিষদ অনেক উদাহরণ দিয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি হল ঃ *"যেমন স্বর্ণকার একখণ্ড স্বর্ণ গ্রহণ করে [তার দ্বারা] অভিনব অধিকতর উত্তম* আকারের অন্য একটি বস্তু [অলংকার] প্রস্তুত করে, তেমনি এই আত্মা [ব্রহ্ম] এই দেহ পরিত্যাগপূর্বক অবিদ্যা দূর করে পিতৃগণের বা গন্ধর্বগণের, কিংবা দৈব, প্রাজাপত্য, ব্রহ্মতুল্যও বা অন্য কোন জীবের উপযোগী অন্য একটি নবতর ও কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করেন [বৃহদা উপঃ 4/4/4]" জগতের রূপ নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। চঞ্চল, পরিণামী মহাবিশ্ব তথা জগৎ নিত্যই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করছে। অপরিণামী, অচঞ্চল ব্রহ্মই মহাবিশ্বের তথা জগতের মূল কারণ। জগৎ তাঁর কার্য।

তবে এটাও ঠিক যে, ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম পূর্বে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, পরে কোনও সময় সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন, এ ধরনের চিন্তাও দর্শনসম্মত নয়। তিনি নিত্যক্রিয়াশীল, তাঁর পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রবাহের শুরু আছে, শেষ আছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি হওয়ার শুরু আছে, আছে শেষও। কিন্তু সেই অপরিণামী সত্তার সাধারণ সৃষ্টিপ্রবাহ তথা তাঁর ক্রিয়াশীলতা অনাদি অনন্ত। সেই ক্রিয়াশীলতায় কখনও জগৎ প্রকাশিত হচ্ছে, কখনও তা প্রকাশ পাচ্ছে না। তিনি জগৎ সৃষ্টি করে ঘুমাতে যান না। তাঁর ক্রিয়াশীলতা জগৎ সৃষ্টির আগেও ছিল, জগৎ সৃষ্টির সময় ছিল, জগৎ লয় পেলেও অর্থাৎ মহাবিশ্ব কারণে ফিরে গেলেও থাকবে। ব্রহ্ম জগৎ হয়েছেন। জগৎ যখন তাতে লয় পাবে তখনও তিনি থাকবেন এবং ক্রিয়াশীলই থাকবেন। তাঁর ক্রিয়াশীলতা জগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। জগৎ না থাকলেও অর্থাৎ নামরূপ তরঙ্গ না থাকলেও ব্রহ্ম-সমুদ্র বিরাজমান থাকবে। তখন জগৎ তাঁর মধ্যে লয় পাবে। তখনও তিনি ক্রিয়াশীল থাকবেন। নতুন করে জগৎ সৃষ্টির জন্যই থাকবে তাঁর ক্রিয়াশীলতা। তিনি তাই নিত্যক্রিয়াশীল।

প্রায় তিন হাজার বছর আগে সাংখ্যদর্শন জগৎ সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাই-ই হিন্দুদর্শনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলকথা। সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বই গৃহীত হয়েছে উপনিষদীয় দর্শনে তথা হিন্দু দর্শনে। সাংখ্যদর্শনই সর্বপ্রথম অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে মহাবিশ্বের সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছে। মহাবিশ্বের স্বরূপ কেমন তার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যাকারই হল এই দর্শন।

সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা হলেন মহর্ষি কপিল। পুরাণ মতে তিনি মহর্ষি কর্দম ও দেবহূতির পুত্র এবং ঈশ্বরের চব্বিশটি অবতারের একজন। মহর্ষি কপিল হিন্দুদের ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত 'সাংখ্য-সূত্র'-এর রচয়িতা। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছেন 'শ্রেষ্ঠ দার্শনিক'। মহর্ষি কপিলের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। তাঁর ব্যাখ্যায় এই মহাবিশ্ব বা জগৎ প্রকৃতি [জড়] হতে উদ্ভূত। ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার কপিলই সমগ্র হিন্দু মনোবিজ্ঞানের জনক। তাঁর দেওয়া সৃষ্টিতত্ত্বই ভারতে প্রচলিত দর্শনগুলির ভিত্তিস্বরূপ। সকল দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন সকলেই সাংখ্যদর্শনের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করেছেন এবং মহর্ষি কপিলের উপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্ব বা মহাবিশ্ব তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। বেদান্ত সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলিকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের পরিপূর্ণতা দান করেছে। উপনিষদীয় দর্শনের মূল ভিত্তিই হল সাংখ্য-সূত্র তথা সাংখ্যদর্শন।

কপিল মূলতঃ দ্বৈতবাদী এবং পুরুষ ও প্রকৃতি দিয়েই তাঁর মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের শুরু। বেদান্ত সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে পারে নি। তাই সাংখ্যের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়েছে বেদান্ত। দ্বৈতবাদ রূপ নিয়েছে অদ্বৈতবাদে। চরম একত্বের অনুসন্ধানকে বেদান্ত আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে কপিলের দ্বৈতবাদকে দিয়েছে অদ্বৈতবাদের পরিপূর্ণতা। সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যের বিশ্বসৃষ্টিতে ক্রমবিকাশবাদ যেমন আছে, তেমনি বিশ্বের লয় পাওয়া সংক্রান্ত ক্রমসংকোচনবাদও আছে। ডারউইন [Charles Darwin] তাঁর ক্রমবিকাশবাদে [Theory of Evolution] কেবল ক্রমবিকাশের কথাই বলেছেন, কিন্তু কোনও ক্রমসংকোচনের কথা বলেন নি। অথচ ক্রমবিকাশ থাকলেই ক্রমসংকোচনও থাকবে। সাংখ্যদর্শন তার সৃষ্টিতত্ত্বে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচন উভয়ের কথাই বলেছে। শুধু তাই নয়, ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ কেবল জীবনের তথা জীবজগতের ক্রমবিকাশের কথা বলেছে এবং সে তত্ত্বও মানুষের উৎপত্তিতে এসে শেষ হয়ে গেছে। সাংখ্যদর্শন কেবল জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচনের কথাই বলে না, বলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তথা মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচনের কথাও।

বৈদান্তিকরা কিন্তু কপিলের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে চরম সত্য বা তত্ত্ব বলে মেনে নেন নি। গীতা তথা বেদান্ত সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিকে মূলতত্ত্ব বলে স্বীকার করে নি। বেদান্তে মূলতত্ত্ব সেই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁরই বিভাব। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের তত্ত্বের সঙ্গে প্রাচীন সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বা সৃষ্টি-তত্ত্বের রয়েছে অপূর্ব মিল। বেদান্ত সাংখ্যের বিশ্লেষণকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে কেবল আদি কারণ হিসাবে গ্রহণ করেছে পরব্রহ্মকে। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিকে বলেছে সেই পরব্রহ্মের বিভাব। পরব্রহ্মই পুরুষ ও প্রকৃতি হয়েছেন। এইভাবে সাংখ্য পুরোপুরি গৃহীত হয়েছে বেদান্ত দর্শনে। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের বিভাব হিসাবে ধরে বেদান্ত ব্রহ্মের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করেছে।

মহর্ষি কপিলের বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে হলে সাংখ্যদর্শনের এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিষয়ে কিছুটা জানতে হবে। এই পঁচিশ তত্ত্বই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে মহাবিশ্ব কেমন তা নিশ্চিতভাবেই বলে দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান এখন মহাবিশ্বের সংকোচনের ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলেও ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদে ক্রমসংকোচনের কথা নেই। 1929 সালে এডউইন হাবল [Edwin Hubble] পেশ করলেন তাঁর 'সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব' [Expanding Universe Theory]। সে তত্ত্বে বিশ্বের সংকোচনের কথা ছিল না। পরে 1965 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যালান স্যান্ডেজ [Allan Sandage] ঘোষণা করলেন, 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory]। একসময় মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হবে এই তত্ত্বে তা নিশ্চিত হল। বিজ্ঞান সাংখ্যদর্শনের মতই স্বীকার করে নিল, মহাবিশ্ব এখন প্রসারিত হলেও, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তা ক্রমসংকুচিত হবে। আধুনিক বিজ্ঞান মহাবিশ্বের সংকোচনের কথা মাত্র চল্লিশ বছর আগে স্বীকার করে নিলেও, সাংখ্য দর্শন তা মেনে নিয়েছিল কিংবা আবিষ্কার করেছিল প্রায় 3000 বছর আগে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এই ক্রমসংকোচন বিজ্ঞান মেনে নিলেও, জীবজগতের ক্ষেত্রে এই ক্রমসংকোচন তত্ত্ব আজও মেনে নেওয়া হয়নি। অথচ, সাংখ্যদর্শন জীবজগতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমসংকোচনের কথা বলেছে প্রায় 3000 বছর আগে এবং তার যথাযথ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছে এই দর্শন।

মহর্ষি কপিল তার সাংখ্যদর্শনে বলেছেন, বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ হল প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হলেন 'প্রধান'। পুরুষ প্রধান নন। আসলে পুরুষ সাক্ষী মাত্র, কর্তা নন। প্রকৃতি অবিশেষ হলেও স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্যের আধার। কার্য, কারণ, কর্তৃত্ব অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সকলই প্রকৃতি-কারণ-সঞ্জাত। আর পুরুষ হলেন সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ। পুরুষ অনাদি এবং প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র। কপিলের মতে সংসার দুঃখময়। জীব বিবিধ তাপে তাপিত। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হল জ্ঞান। মুক্তি আসে আত্মদর্শনে। জীবগণের অন্তর্জ্যোতিই আত্মা, এটি পুরুষ, এটি অনাদি। প্রকৃতিই জগতের কারণ। জগৎ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন। প্রকৃতির মোট 23টি বিকৃতি ও বিকার। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় ওই 23টি বিকৃতি ও বিকার এবং পুরুষ-প্রকৃতি সর্বমোট পঁচিশ তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে সাংখ্য দর্শনে। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির চব্বিশ তত্ত্ব এবং পুরুষকে নিয়ে সাংখ্য দর্শনের মোট 25টি তত্ত্ব। মহর্ষি কপিল সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই পঁচিশটি তত্ত্ব এনেছেন। সাংখ্য দর্শন মতে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান অর্থাৎ এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ কী এবং তার সঙ্গে অচল, অপরিণামী সত্তা পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বা আত্মার সম্পর্ক কী এই জ্ঞান জীবের দুঃখের নিবৃত্তি ঘটায়।

সাংখ্যদর্শনের এই 25টি তত্ত্ব সম্পর্কে 'সাংখ্য সূত্র' বলেছে ঃ "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান, মহাতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ।" [সাংখ্য সূত্র ঃ 1/61]। সুতরাং কপিলের 25টি তত্ত্ব হল ঃ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, পাঁচ 'জ্ঞানেন্দ্রিয়'—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাঁচটি 'কর্মেন্দ্রিয়'—হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ; মন, পাঁচটি 'তন্মাত্র'—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ; পাঁচটি 'ভূত'—ভূমি বা ক্ষিতি, অপ বা জল, তেজ বা অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু, ব্যোম বা আকাশ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি। *সাম্যভঙ্গ হলে এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির 7টি 'বিকৃতি' হয়। এগুলি হল মহত্তত্ত্ব,* অহঙ্কার এবং পঞ্চ-তন্মাত্র। এরপর ঘটে বিকৃতিগুলির 'বিকার'। 5 জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5 কর্মেন্দ্রিয়, 1 মন

ও পাঁচ স্থূলভূত এই 16টি হল বিকার। মোট 25টি তত্ত্বই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ও স্বরূপের ব্যাখ্যা করছে। এটিই সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা সৃষ্টি তত্ত্ব।

সাংখ্যদর্শন ওই পঁচিশ তত্ত্বের বিভাগ এইভাবেই করেছে। (1) মূল প্রকৃতি, (2-8) মোট সাতটি প্রকৃতি বিকৃতি। যেমন, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। (9-24) প্রকৃতির বিকার 16টি 5 জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5 কর্মেন্দ্রিয়, 1 মন এবং 5টি স্থূলভূত। (25) পুরুষ। এই 25টি তত্ত্ব দিয়েই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছে সাংখ্য-দর্শন অত্যন্ত সুচারুভাবেই। মূল প্রকৃতিই এ তত্ত্বে 'প্রধান'। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রকে এখানে 'প্রকৃতি বিকৃতি' এই কারণে বলা হল যে, এদের প্রত্যেকটি থেকে অন্য তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। এরা প্রত্যেকেই অন্য তত্ত্বের কারণ। সুতরাং এরাও প্রকৃতি, কিন্তু এরা নিজে অন্য তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত, তাই এদের বলা হয় প্রকৃতি বিকৃতি। যেমন, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির বিকৃতি, আবার অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। অনুরূপভাবে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারের বিকৃতি এবং অহঙ্কার তার প্রকৃতি। আবার 16টি বিকৃতিকে, যেমন, 5 জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5 কর্মেন্দ্রিয়, 1 মন এবং 5টি স্থূলভূতকে বলা হয় বিকার। কারণ এদের থেকে অন্য কোন তত্ত্ব উদ্ভূত হয় না। তাই এরা প্রকৃতির বিকার। অপ্রকৃতি অবিকৃতি হলেন পুরুষ। এই পুরুষ প্রকৃতি নন, বিকৃতিও নন, এমন কি বিকারও নন। তিনি স্বতন্ত্র উদাসীন। সুতরাং মহাবিশ্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিলেন মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্য দর্শনে 25 তত্ত্বের সাহায্যে। মূল প্রকৃতি ও সাতটি প্রকৃতি বিকৃতি নিয়ে মোট অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং উদাসীন পুরুষ—সব মিলিয়ে মোট পঁচিশ তত্ত্ব।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতে প্রকৃতি অর্থে 'নেচার' (Nature) শব্দটি ব্যবহার করেন। হিন্দু দার্শনিকরা প্রকৃতিকে বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহার করেন। একটি হল 'প্রকৃতি' যা নেচার শব্দটির সমার্থক, অন্যটি হল, 'অব্যক্ত' যা ব্যক্ত বা প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নয়। ওই অব্যক্ত থেকেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। এসেছে জড়বস্তু, শক্তি, মন ও বুদ্ধি। মনও সূক্ষ্ম জড় মাত্র, যা আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। সাংখ্য মতে জগতের মূল উপাদান প্রকৃতি। বলা হয়েছে, 'প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্'। একে বলা হয়েছে অনাদি, অন্তহীন, নিত্য, অসীম, অতি সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। এরই অন্য নাম হল প্রধান, অব্যক্ত, ত্রৈগুণ্য ইত্যাদি। অব্যক্ত হল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতির অপর নাম তাই ত্রৈগুণ্য। তমঃ গুণ হল সর্বাপেক্ষা নিম্নতম শক্তি, আকর্ষণস্বরূপ। রজঃ তার চাইতে একটু উচ্চতর। এটা বিকর্ষণস্বরূপ। আর সত্ত্ব সর্বাপেক্ষা উচ্চতম শক্তি। ওই দুটি শক্তির সংযমস্বরূপ। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি দুটি যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি বা বিকার থাকে না। কিন্তু সাম্যাবস্থা নষ্ট হলে এই শক্তিগুলির সামঞ্জস্য নষ্ট হয় এবং ওদের মধ্যে একটা শক্তি অপর শক্তিগুলি অপেক্ষা প্রবলতর আকার ধারণ করে, তখনই পরিবর্তন ও গতি আরম্ভ হয় এবং সৃষ্টি ক্রমবিকশিত হতে থাকে। এমন একটা সময় আসে যখন সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়। তখন এই বিভিন্ন শক্তি একত্রে মিলিত হতে থাকে এবং তখনই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। আবার একটা সময় আসে যখন সমস্ত বস্তুই আদিম অবস্থায়, সেই পুরাতন সাম্যাবস্থায় ফিরে আসতে চায়। তখন শুরু হয় ক্রমসংকোচন। এইভাবে ক্রমবিকাশে ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গাকারে একবার ক্রমবিকশিত হয় এবং ক্রমসংকোচনে আবার মূলকারণে ফিরে আসে।

সুতরাং প্রকৃতিতে যখন ওই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে তখন প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা। সৃষ্টির আরম্ভে এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। সাম্যভঙ্গে শুরু হয় পরিণামাত্মক পরিবর্তন ও গতি।

কোথাও সত্ত্ব গুণ প্রবল হয়ে প্রকাশ, জ্ঞান, সুখ এই সব উৎপন্ন করে। কোথাও রজঃ গুণ প্রবল হয়ে প্রবৃত্তি, দুঃখ চঞ্চলতা প্রভৃতি আনে, আবার কোথাও তমঃ গুণ প্রবল হয়ে মোহ, অজ্ঞান, জড়তা উৎপাদন করে। জগতের সকল পদার্থই এই তিনগুণের কম-বেশিতে সৃষ্ট, ত্রিগুণ ব্যতীত কোন পদার্থ নেই। জড়-জগতে সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকে, তাই এরা অচেতন ও অচঞ্চল। কিন্তু ওদের ভিতর রজোগুণের ক্রিয়া চলতে থাকে। গাছপালায় তমোগুণের প্রাধান্য, কিন্তু এদের মধ্যেও রজঃ ও সত্ত্বগুণের কিছুটা প্রকাশ থাকে। আর সেই কারণে এদের অনুভূতি ও চেতনা আছে। ইতর জন্তুতে তিনগুণই পরিস্ফুট, কিন্তু তমঃ ও রজঃ গুণে সত্ত্বগুণ অভিভূত থাকে। আবার মানুষে এই তিনটি গুণ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলেও সকলের বুদ্ধি, বিবেক, বিচার-শক্তি সমান থাকে না। এর কারণ সকলের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ সমান নয়। হিন্দুদের সমস্ত সাধনার মূল লক্ষ্যই হল তমঃ ও রজোগুণকে অর্থাৎ অজ্ঞান ও কাম-ক্রোধাদিকে দমন করে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করা এবং শেষে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে ত্রিগুণাতীত হওয়া। সমগ্র হিন্দু দর্শন এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন ক্রমবিকাশে মনুষ্য জন্ম লাভ করলেই আত্মচেষ্টায় মোক্ষাধিকারী হয়, লাভ করে ব্রহ্মত্ব।

সাংখ্য দর্শন মতে প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হলে প্রথম যে বিকার হয় তার নাম 'মহত্তত্ত্ব'। আধুনিক সাংখ্যকারদের মতে এর নাম 'বুদ্ধিতত্ত্ব'। কোন কাজ করার আগে তা করার বুদ্ধি বা সংকল্প প্রথম হওয়া চাই। প্রকৃতিরও তেমনি স্বকীয় বিস্তারের জন্য বুদ্ধি হওয়া চাই। তাই প্রকৃতিতে প্রথমে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ গুণ উৎপন্ন হয়। এমন কি জড়ের মধ্যেও এই বুদ্ধিগুণ বিদ্যমান বলে, একালের বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঃ

"Modern Science itself has been driven to the same conclusion. Even in the mechanical action of the atom there is power which can only be called an inconscient will and in all the works of nature the pervading will does inconsciently the works of intelligence. What we call mental intelligence is precisely the same thing in essence."

প্রকৃতির থেকে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হলেও তার মধ্যে বহুত্ববোধ থাকে না। মহত্তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় 'অহংকার'। যে গুণের প্রভাবে একবস্তুপরতা ভেঙে বহুবস্তুপরতা উৎপন্ন হয় তার নাম অহংকার। অন্য থেকে পৃথক থাকার ভাব-প্রবণতা বা অভিমানকেই বলে অহংকার। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ প্রাবল্যে অহংকার থেকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, যথা ❑ হস্ত, পদ, বাক, পায়ু, উপস্থ। তেমনি তমোগুণ প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় পঞ্চ-তন্মাত্র , যথা ❑ শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। আবার সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা ❑ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং সব ইন্দ্রিয়ের উপর মন। তেমনি পঞ্চ তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূত. যথা ❑ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ (জল) ও পৃথিবী। এই স্থূল-ভূত থেকেই সৃষ্টি হয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ।

'তন্মাত্র' শব্দের অর্থ হল 'কেবল তাহাই'। স্থূলভূতের সার হল তন্মাত্র, এর সূক্ষ্ম অবস্থা হল তন্মাত্র। যেমন, আকাশের সূক্ষ্ম অবস্থা বা তন্মাত্র হল শব্দ, গন্ধ ভূমির তন্মাত্র বা সূক্ষ্মাবস্থা। আবার ইন্দ্রিয় বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের শক্তি, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এরা বাহ্য-যন্ত্র দেহের

অংশ এবং স্থূলভূতের অন্তর্গত। প্রকৃত ইন্দ্রিয় এরা নয়। এগুলির শক্তিই আসল ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি জড়, সুতরাং তার পরিণাম বুদ্ধি, অহংকার, মন ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই জড় পদার্থ—অন্ততঃ সাংখ্যদর্শন তাই বলছে। প্রকৃতপক্ষে, জগৎ কেবল জড়াত্মক নয়। সৃষ্টিতে জড় ও চেতন উভয়ই বিদ্যমান। সাংখ্য মতে পুরুষের সান্নিধ্যের জন্য প্রকৃতিতে চৈতন্যের আভাস হয়। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ চেতন হলেও নির্বিকার, অকর্তা। প্রকৃতির গুণেই কর্ম হয়, পুরুষ কেবল সাক্ষী, ভোক্তা ও অনুমন্তা। সাংখ্যের মতে সৃষ্টির সময় প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত থাকে। ফলে, পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে বর্তায়। প্রকৃতি তাই জড়া হলেও তাকে চেতন বলে মনে হয় এবং পুরুষ অকর্তা হলেও তাকে কর্তা বলে মনে হয়। সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য বেদান্ত মেনে নিতে পারেনি। বেদান্ত তথা গীতা বলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টি রূপে পরিণামের প্রকৃত কারণ। গীতা তাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে স্বীকার করে কিন্তু এঁরাই মূলতত্ত্ব তা মানে না। মূলতত্ত্ব সেই পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম এবং পুরুষ ও প্রকৃতি সেই পরব্রহ্মেরই বিভাব। তাঁরই ইচ্ছায় বা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করে, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নেই। গীতায় জড়া-প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের 'অপরা-প্রকৃতি' বলা হয়েছে এবং সাংখ্যের চেতন পুরুষ গীতায় 'পরা-প্রকৃতি' নামে অভিহিত। শ্রীঅরবিন্দ অচেতন জড়ে চেতনার আভাস সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিয়ারই পরিণাম ফল, কিন্তু জড় অচেতন কেমন করিয়া চেতনের মত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড় প্রকৃতির উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষী-স্বরূপ পুরুষ নিজেকে ভুলিয়া যায়। প্রকৃতির চিন্তা, ক্রিয়া নিজের বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই পুরুষের মুক্তি।"

এইভাবেই সাংখ্য দর্শন প্রকৃতির পরিণাম বা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছে। মহাবিশ্ব বা জগৎ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা সাংখ্যদর্শন প্রকৃতির পরিণাম তত্ত্ব দিয়ে বিশদভাবেই বলেছে। আবারো বলি, প্রকৃতি যেহেতু জড়া, তাই তার পরিণাম বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সবই জড় পদার্থ। এদের কিন্তু চেতনাত্মক মনে হয়। কারণ জগৎ কেবলই জড়াত্মক নয়, সৃষ্টিতে জড় ও চেতন উভয়েই সংসৃষ্ট। সাংখ্য বলছে, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে তথা জড়ত্বে চৈতন্যের আভাস হয়। সাংখ্যের মতে এই পুরুষ চৈতন্যময় হলেও ইনি নির্বিকার, অকর্তা। কর্ম হয় প্রকৃতির গুণে, চেতন পুরুষ কেবল সাক্ষী, ভোক্তা এবং অনুমন্তা। সাংখ্য মতে, সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। তার ফলে পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে আভাসিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় 'আবেশ' [Induction] হওয়ার মত ব্যাপার। সেই কারণে প্রকৃতি অচেতন জড় হলেও তাকে চেতন বলে এবং বস্তুতঃ অকর্তা হলেও পুরুষকে কর্তা বলেই মনে হয়।

সাংখ্যের এই সৃষ্টিতত্ত্ব গীতায় যেভাবে গৃহীত হয়ে দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্বে পরিগণিত তা নীচে দেওয়া হল। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি হল মূলতত্ত্ব। গীতার মতে সেই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম হল মূলতত্ত্ব। পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁরই বিভাব। এইভাবে গীতা সাংখ্যের পুরো সৃষ্টিতত্ত্বটাই গ্রহণ করে পুরুষ ও প্রকৃতির উপরে মূলতত্ত্ব হিসাবে 'পরব্রহ্ম'-কে বসিয়েছে। আবার উপনিষদীয় দর্শন ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব একই। সুতরাং হিন্দু-দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের রূপটা এইরকম ঃ
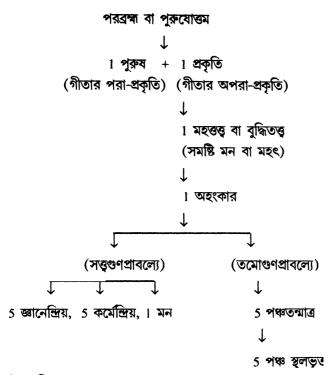
এই তালিকায় ঃ

5 কর্মেন্দ্রিয়— হস্ত, পদ, বাক, পায়ু, উপস্থ।

5 জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

5 তন্মাত্র—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ।

5 পঞ্চভূত—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ।

মহর্ষি কপিলই সর্বপ্রথম এই পৃথিবীতে যুক্তি-বিচার সহযোগে জগৎ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাই কপিল সমস্ত দার্শনিক তথা বিজ্ঞানীর সম্মানীয়। কপিলের এই দর্শনতত্ত্বের উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায়। কপিলের এই দর্শন খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। কতযুগ আগেই এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এই কারণেই এই তত্ত্ব জগতের প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা প্রণালীর অন্যতম। দর্শন তথা পরবর্তীকালের যুক্তিসিদ্ধ সব চিন্তা প্রণালীই কোন না কোনভাবে কপিলের কাছে ঋণী। কপিলের দর্শন থেকে এটা বোঝা যায়, আত্মা অনন্ত। আত্মাই একমাত্র প্রকৃতির পরিণাম নয়। আত্মাই সারা বিশ্বে একমাত্র প্রকৃতির বাইরে। প্রকৃতি পুরুষকে ঘিরে আছে। সেই কারণেই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। পুরুষ ভাবছেন, 'আমি লিঙ্গ শরীর, আমি স্থূলশরীর', আর সেই কারণেই তিনি সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। আসলে সুখ-দুঃখ ভোগ করে ওই শরীর, আত্মা নন। সুখ-দুঃখ আত্মার নয়, দেহের এবং মনের। আত্মার সুখ-দুঃখ কিছুই নেই। আত্মা নিত্য-সাক্ষী স্বরূপ। আত্মা কোন কাজের ফল গ্রহণ করে না। কঠোপনিষদ বলছে, 'সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষুর দৃষ্টির কারণ হলেও স্বয়ং কোন চক্ষুর দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি।' সাংখ্য সূত্রেও আছে, 'যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখলে ওটি লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দ্বারা সুখ-দুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সর্বদাই অপরিণামী।"

বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ধ্যানকালে আমরা যে ভাব অনুভব করি, পুরুষ প্রায় সেই রকম। এই ধ্যান অবস্থাতেই আমরা পুরুষের খুব কাছে এসে যাই। অতএব এখন স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারি যে, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলে থাকেন। কারণ পুরুষের সঙ্গে আমাদের এই একাত্মবোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নয়—এটাই ধ্যানাবস্থা।' আর এটাই হল 'সাংখ্য দর্শন'। সাংখ্য দর্শন মতে এই আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্ত সংখ্যক আত্মা রয়েছেন। সাংখ্য-দর্শনের আরেকটা মতবাদ হল ঈশ্বর বলে কিছুই নেই। জগতের সৃষ্টিকর্তা বলেও কেউই নেই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সমস্ত বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ তখন আর ঈশ্বর স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। সাংখ্য দর্শন তাই পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী। নিরীশ্বর হলেও সাংখ্য দর্শন সর্বমান্য। পুরাণ, ইতিহাস, মনুসংহিতা, স্মৃতি, ভাগবত সর্বত্রই সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনা আছে। সাংখ্য যেমন ক্রমবিকাশবাদের কথা বলেছে, তেমনি বলেছে ক্রমসংকোচনের কথাও। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও ক্রমসংকোচন নিয়ে তেমন কিছু আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু বিশ্বের তথা জীব জগতের ক্রমসংকোচনও মহর্ষি কপিল কর্তৃক স্বীকৃত এবং সিদ্ধান্তকৃত। যার ক্রমবিকাশ আছে তার ক্রমসংকোচন ঘটবে এ বিশ্বাস, এ সিদ্ধান্ত সমগ্র হিন্দু দর্শনের এবং সে চিন্তাধারার মূল হোতা হলেন মহর্ষি কপিল এবং তাঁর সাংখ্যদর্শন। এই দর্শন মহাবিশ্ব ও জীবজগৎ উভয়েরই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচনের কথা বলেছে। বিজ্ঞান এখন মহাবিশ্বের ক্রমসংকোচনের কথা তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করে নিলেও, জীব জগতের ক্রমসংকোচন নিয়ে তার কোনও তত্ত্ব আজও অনাবিষ্কৃত। জীবজগতের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার হল ডারউইনের 'ক্রমবিকাশবাদ'।

সাংখ্য দর্শনের ক্রমসংকোচনবাদের স্বরূপ বোঝাতে 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। মহাবিশ্বের ক্রমসংকোচন কীভাবে হবে তার যথাযথ বর্ণনা রয়েছে এই উদ্ধৃতিটিতে। সাংখ্যদর্শন যে ক্রমসংকোচনের কথা বলেছে, তাই-ই কিছুটা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে বিষ্ণুপুরাণে। সাংখ্যদর্শন মতে ক্রমসংকোচন হল ক্রমবিকাশের বিপরীত প্রক্রিয়া। হিন্দুদর্শন মতে এই ক্রমসংকোচন শুরু হয় ক্রমবিকাশের শেষে এবং শেষ হয় মহাপ্রলয়ে বা প্রাকৃতলয়ে। মহাবিশ্ব তখন আবার প্রকৃতির 'অব্যক্ত' রূপে ফিরে আসে। আবার কিছুকাল পরে 'অব্যক্ত' ব্যক্ত হয়। শুরু হয় ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ মহাবিশ্ব কিছু সময়ের জন্য অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়, আবার তা অব্যক্তে লীন হয়। এইভাবে চলতে থাকে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচন, তরঙ্গেরা উঠে আর নামে—সৃষ্টি বিকশিত হয়, আবার লয় পায়।

বিষ্ণু পুরাণে মহাবিশ্বের ক্রমসংকোচনের বর্ণনা এই রকম ঃ

"ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়কাল সমুপস্থিত হলে প্রথমতঃ জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করে। যখন পৃথিবী থেকে সমস্ত গন্ধ জল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন পৃথিবী বিলয়প্রাপ্ত হয়। গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হলে পৃথিবী সলিলে মিশ্রিত হয়ে যায়। রস থেকে সলিল উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং সলিলকে রসাত্মক জানবে। সেই সময় সলিলসমূহ প্রবৃদ্ধ হয়ে অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করতে করতে সমস্ত ভুবন প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়। তারপর সলিলের গুণ যে রস অগ্নি তাকে শোষণ করতে আরম্ভ করে, কালক্রমে অগ্নিকর্তৃক শোষিত হয়ে রস-তন্মাত্র বিনষ্ট হলে সলিলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই রসহীন সলিলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করে সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়। সেই অগ্নি, সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করতঃ নিরন্তর তাপ প্রদান করে। উর্ধ্ব, অধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়ে যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করে থাকে। তেজসমূহ বিনষ্ট হলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হয়ে উঠে এবং তেজ হৃতরূপ হয়ে

প্রশান্ত হয়, তখন কেবল বায়ুই চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। সেই তেজঃসমূহ বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করলে, সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হয়ে যায়। তারপরে সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তি বীজ আকাশকে অবলম্বন করে দশদিকে প্রবাহিত হয়ে বেড়ায়। ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ আকাশ তাকে গ্রাস করে ও বায়ু শান্ত হয় এবং রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ ও মূর্তিহীন আকাশ দ্বারাই এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে। তখন একমাত্র শব্দই আকাশ মণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। ক্রমে অহংকারতত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং কালে বুদ্ধিতত্ত্বও (মহত্তত্ত্ব) স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়।" (বিষ্ণুপুরাণ 6/12-30)

বিষ্ণু পুরাণের এই বর্ণনায় ক্রমসংকোচনের দিকটা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণু পুরাণের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল 'মহাপ্রলয়' বা 'প্রাকৃতলয়' বোঝাতে গিয়ে, তা এখন আরও বেশি বোধগম্য হবে কিছুটা আগে দেওয়া সৃষ্টিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণের তালিকাটির দিকে চোখ ফেরালে। পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ধীরে ধীরে লয় পেতে থাকে। পৃথিবী থেকে জল, সেই জল থেকে তেজ বা অগ্নি. তার থেকে বায়ু আর বায়ু থেকে আকাশ—এইভাবে লয় হতে থাকে। তেমনি গন্ধ থেকে রস, তারপর রূপ এবং তার থেকে স্পর্শ ও অবশেষে শব্দই থাকে। সেই শব্দও অহংকারে লয় পায়। অহংকার মহত্তত্ত্বে ও সবশেষে মহত্তত্ত্বও প্রকৃতিতে লয় পায়। বিষ্ণুপুরাণের ওই বর্ণনার যৌক্তিকতা আমাদের বিস্মিত করে।

মহাবিশ্ব ও জীবজগতের ক্রমবিকাশ নিয়ে আরও সহজ ও সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের নানান বক্তৃতায়। এগুলিতে তিনি ক্রমবিকাশ এবং ক্রমসংকোচনেরই ব্যাখ্যা করেছেন বেদান্ত বা উপনিষদ এবং সাংখ্যদর্শনকেই ভিত্তি করে। তাঁর সেই সব বক্তৃতার একটিতে এখন আসা যাক। ক্রমবিকাশবাদ নিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর বহু বক্তৃতায় বিশদ আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদের। 1896 সালে 'জগৎ (বহির্জগৎ)' সংক্রান্ত নিউইয়র্কে দেওয়া তাঁর ভাষণের কিছুটা অংশ তুলে ধরা হচ্ছে দর্শনে ক্রমবিকাশবাদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য। বিবেকানন্দ বলছেন, "আমরা এখন জানলাম সূক্ষ্মরূপ ব্যক্ত হয়ে স্থূল থেকে স্থূলতর হয় যতক্ষণ না চরমে পৌঁছয়, চরমে পৌঁছলে আবার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়। এই সূক্ষ্ম থেকে আবির্ভাব, ক্রমে স্থূল থেকে স্থূলতর রূপে পরিণতি, শুধুমাত্র অংশগুলোর অবস্থান পরিবর্তন—একেই বর্তমানকালে 'ক্রমবিকাশবাদ' বলা হচ্ছে। এটা খুবই সত্য, সম্পূর্ণতই সত্য, যা আমরা জীবনে দেখছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোনো মানুষই সম্ভবত এই ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে বিবাদ করবেন না। কিন্তু আমাদের আরো একট বিষয় জানার রয়েছে—সেটি হল প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আগে রয়েছে একটি ক্রমসংকোচ প্রক্রিয়া। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, অপর এক বৃক্ষ কিন্তু সেই বীজটির জনক। বীজই হল সেই সূক্ষ্ম-রূপ, যা থেকে বৃহৎ বৃক্ষটি সম্ভব হয়েছে। আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ক্রমসংকুচিত হয়ে বীজে রূপান্তরিত হয়েছে। গোটা গাছই ওই বীজে বর্তমান। শূন্য থেকে কোনো গাছই জন্মায় না। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, গাছ বীজ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, আর বীজবিশেষ থেকে সেই গাছটিই উৎপন্ন হয়, অন্য গাছ হয় না। এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নির্দিষ্ট গাছের কারণ ওই বীজ, কেবল ঐ বীজটিই—গোটা গাছটাই বীজে বর্তমান। একটা সম্পূর্ণ মানুষ থাকে জীবাণুর ভেতর, ঐ জীবাণুই মানুষের আকারে ব্যক্ত হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই 'সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে' ছিল। সবই কারণে—বস্তুর সূক্ষ্মরূপে। সুতরাং 'ক্রমবিকাশবাদ' সত্যি। তবে এখানে একথা বোঝা দরকার

যে, সমস্ত ক্রমবিকাশের আগে একটি ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া থাকে। যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি একদিন মহাপুরুষ হল, সেই জীবাণুটি প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, পরে মহাপুরুষে ক্রমবিকশিত। এ কথা যদি সত্যি হয় তবে 'ক্রমবিকাশ' (ডারউইন'স ইভোলিউশন)-বাদীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিতর্ক নেই, কারণ ক্রমশঃ স্পষ্টতই জানা যাবে, ওঁরা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটি স্বীকার করলে ধর্মের বিনাশক না হয়ে সহায়ক হবেন।

আমরা দেখলাম শূন্য থেকে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিসই অনন্তকাল রয়েছে এবং থাকবেও অনন্তকাল। কেবল ঢেউয়ের মতো একবার উঠছে আবার পড়ছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ, সমগ্র প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ চলছে। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের আগে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন নানা রূপে ব্যক্ত হয়েছে, আবার ক্রমসঙ্কুচিত হয়ে অব্যক্তভাব ধারণ করবে। একটি উদ্ভিদকে উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। আমরা দেখছি দুটি বিষয় একসঙ্গে মিলে ওই উদ্ভিদকে এক অনন্ত বস্তুতে পরিণত করেছে—সেই দুটি বিষয় হল উৎপত্তি ও বিকাশ এবং ক্ষয় ও বিনাশ। দুটি মিলে উদ্ভিদ জীবন। এভাবে ওই উদ্ভিদ জীবনকে প্রাণশৃঙ্খলের একটি পর্ব ধরে সমস্ত বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলে কল্পনা করতে পারি। জীবাণু থেকে শুরু এবং পূর্ণ মানবে সমাপ্তি। মানুষ ওই শৃঙ্খলের একটি পর্ব, আর যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন—নানারকম বানর, তারপর আরো ছোট ছোট প্রাণী এবং উদ্ভিদগুলো যেন ওই প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্ব। এখন যে ক্ষুদ্রতম কোষ থেকে আমরা আরম্ভ করেছিলাম, সেখান থেকে এই সমস্তকে এক প্রাণপ্রবাহ ধরলে, আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আগেই ক্রমসঙ্কোচ থাকে, আমাদের এই লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করলে, স্বীকার করতেই হবে যে, অতি নিম্নতম জন্তু থেকে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানব অবধি সকল শ্রেণীই অবশ্যই অন্য কিছুর ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা।"

সাংখ্যদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব হল, এই দর্শন একাধারে বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির একটা যুক্তিপূর্ণ সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই সম্পর্কিত ব্যাখ্যাগুলি আজও অসম্পূর্ণ। বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' (Big Bang Theory) কিংবা 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' (Pulsating Universe Theory) আজও সম্পূর্ণতা লাভ করে নি। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান দর্শনের তত্ত্বকেই মেনে নিচ্ছে। আবার পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের 'ক্রমবিকাশ তত্ত্ব' (Theory of Evolution) বেশ কিছুটা পাকাপোক্ত ভিত্তিভূমি পেলেও ডারউইনের এই তত্ত্বটি এখন বহুল সমালোচিত। এর অসম্পূর্ণতা নিয়েও নানা গবেষণা চলছে। সব মিলিয়ে এটিকে এখন 'তত্ত্ব' (Theory) না বলে বরং 'প্রকল্প' বা 'অনুসিদ্ধান্ত' (Hypothesis) বলাই সমীচীন মনে হয়। তবে ডারউইন সাহেবের মূল বক্তব্যের সঙ্গে দর্শনের বিরোধ নেই। বরং দর্শন তার বক্তব্যে অনেক বেশি এগিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদ বা তত্ত্বগুলি দর্শনের বক্তব্যের মধ্যে যেমন আছে, তেমনি আরও অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছে ভারতীয় দর্শন তার স্বভাব-সুলভ নৈপুণ্যে। কি বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বে, কি জীব সৃষ্টির তত্ত্বে, সব ব্যাপারেই হিন্দু-দর্শন আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আবার এটাও ঠিক যে, উন্নত দূরবীন ও নানান আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাবিশ্বের নানা দিক একালের বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আবিষ্কৃত তত্ত্ব কিংবা তথ্য কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিতে দেখা মহাবিশ্ব সংক্রান্ত তত্ত্বকে অতিক্রম করতে পারে নি। মূলতত্ত্ব একই রয়ে গেছে।

ভারতীয় হিন্দু-দর্শন তথা প্রাচ্য দর্শন এবং বিজ্ঞান তথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই দুইয়ের মতে উদ্‌বর্তন (Evolution) বা ক্রমবিকাশ প্রায় একই। প্রথমে জন্মে স্থাবর, তারপর জলপ্রাণী এবং ক্রমবিকাশে পাখি-পশু ইত্যাদি পেরিয়ে আসে বানর জন্ম এবং এই বানরই মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের একটা বিশাল পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানে শুধু দেহের কিংবা দর্শনের ভাষায় আধিভৌতিক ক্রমবিকাশের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের আলোচনা দেহগত। কিন্তু দর্শনের আলোচনা দেহ ও দেহী কিংবা শরীর ও আত্মা উভয়কে নিয়ে। এই শরীর ও আত্মা বেদান্ত ও গীতার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা-প্রকৃতি ও পরা-প্রকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। দর্শন মতে জীব ব্রহ্মেরই অংশ। কিংবা বলা হয় ব্রহ্মই জীবের মধ্যে নিহিত। সারা বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম সবই প্রকৃতি এবং পুরুষের কিংবা অপরা ও পরা-প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীবের মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়াশীল তা ব্রহ্ম-শক্তি। এই শক্তির ক্রমবিকাশও ঘটে জড়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে। এই শক্তির ক্রমবিকাশেই জীবের নতুন নতুন দেহ প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং শক্তির ক্রমবিকাশই মূল কথা। জঙ্গমের পূর্বে স্থাবর তৈরি হয়, জীব প্রথমে স্থাবর হয়েই জন্মায়। এই জন্মে চিৎশক্তি বা চেতনা প্রায় নিরুদ্ধ থাকে। পরে জীব জঙ্গমত্ব পায়। পশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্মে প্রাণশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, কিন্তু মনন শক্তির বিকাশ ঘটে না। ক্রমবিবর্তনে জীব মানুষ-জন্ম লাভ করে এবং ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ মনন-শক্তির অধিকারী হয়। সুতরাং চৈতন্যেরও ক্রমবিকাশ ঘটে একথা দর্শন বারে বারে বলছে। কিন্তু বিজ্ঞান জড়ের বিকাশের কথাই বলছে, চৈতন্য বা জ্ঞানের অভিব্যক্তি (Evolution) স্বীকার করছে না। ভারতীয় দর্শনের মূল কথা হল "যা নেই তা হয় না, যা আছে তারও বিনাশ হয় না, পরিবর্তন হয় মাত্র।" সাংখ্যসূত্র বলছে 'নাসৎ উপপদ্যতে, ন সৎ বিনশ্যতি।" সুতরাং জ্ঞান বা চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটে বা ঘটছে। এটা আধুনিক বিজ্ঞান মানতে নারাজ। দর্শন মতে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না, এমনকি জ্ঞান বা চৈতন্যও নয়, যা আছে তা কেবল পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয় মাত্র। অবশ্য অদ্বৈতবাদ ধরলে, স্থির সমুদ্র যেন ঈশ্বর, জগৎ নামরূপ তরঙ্গমাত্র। সে তরঙ্গের অস্তিত্ব আছেও বটে আবার নেই বটে। এই তরঙ্গই মায়া এবং মায়া অনির্বচনীয়। এই চৈতন্য সাংখ্যের 'পুরুষ', গীতার 'পরা-প্রকৃতি।'

উপনিষদ বলছে মানুষ জন্ম একদিনে হয় নি। বহু প্রজাতিতে বহু যোনি ভ্রমণের পর মানুষ-জন্ম হয়েছে ক্রম-বিবর্তনের ধারায়। জীবাত্মা বহু দেহ ধারণ করে, বহু জন্ম অতিক্রম করে মানবজন্ম লাভ করে, নরদেহ পায়। বিজ্ঞান অবশ্য এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জীবাত্মা প্রথমে জন্মায় জড় রূপে। এই জড়দেহটাকে উপনিষদের মতে বলা হয় আত্মার 'অন্নময় কোষ' এবং এই স্তরে আত্মা অভিহিত হয় 'অন্নময় পুরুষ' (Physical Self) হিসাবে। এরপর অন্ন থেকে প্রাণের উদ্ভব হয় এবং ইতর প্রাণিবর্গের জন্ম হয়। তখন আত্মা যে দেহে অবস্থান করে তা 'প্রাণময় কোষ' এবং আত্মাকে বলা হয় 'প্রাণময় পুরুষ' (Vital Self or Self of Life)। ক্রমে প্রাণীর মধ্যে মনের উদ্ভব হয় এবং মননশীল জীব অর্থাৎ মানুষের জন্ম হয়। আত্মা তখন যে দেহ ধারণ করে তা 'মনোময় কোষ' এবং আত্মাকে বলা হয় 'মনোময় পুরুষ' (Mental Self or Self of Mind)। মানুষ আর পশুর পার্থক্য হল এই মননশীলতায়। মনন শক্তির বিকাশ ঘটিয়েই মানুষ অন্যান্য জীবের চেয়ে সেরা হয়েছে, শিক্ষা-সভ্যতার উচ্চ স্তরে উঠেছে। মননশীলতার জীবনই প্রকৃত জীবন। 'যোগবাশিষ্ঠ' এক জায়গায় বলেছে ঃ

"তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি।।"

প্রাণময়তায় জীবন ধারণ করে, পশু-পক্ষীও জীবন ধারণ করে। কিন্তু মননের দ্বারা যে জীবন ধারণ করে সে-ই প্রকৃত জীবন ধারণ করে।

উপনিষদ বলছে, বিবর্তনের এখানেই শেষ নয়। মনোময় কোষের দেহ পেরিয়ে আত্মা যে জড় শরীর লাভ করে তা 'বিজ্ঞানময় কোষ'। তখন আত্মা অভিহিত হয় 'বিজ্ঞানময় পুরুষ' (Self of Truth-knowledge) নামে। এর পরের স্তরে যে শরীর তা 'আনন্দময় কোষ'। বিজ্ঞানময় পুরুষ আত্মা তখন 'আনন্দময় পুরুষ (Self of Bliss) হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় জীব ঈশ্বরত্ব লাভ করেন এবং ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে স্থিতি পান। আনন্দ-স্বরূপ জানবার পর তিনি সর্বদা আনন্দেই অবস্থান করেন। এখানে আত্মার কিন্তু পরিবর্তন বা ক্রমবিবর্তন ঘটছে না। ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন ঘটছে সেই শরীর বা জড় দেহের যে দেহ আত্মার আবরণ-স্বরূপ কিংবা যে দেহ আত্মাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়। জীবাত্মা আনন্দ-স্বরূপ। সেই স্বরূপে ফিরে আসাই মানুষের লক্ষ্য। তারই জন্য চলে সাধনা। ওই পঞ্চ-কোষ বা পঞ্চ-পুরুষ সবই একই ব্রহ্মের বিভিন্ন বিভাব। এই ক্রমবিকাশ যেমন সমগ্র জীব-জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি কোনও মানুষের জন্ম থেকে জন্মান্তরের বেলায়ও প্রযোজ্য। প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান লাভ করে আনন্দ লাভের চেষ্টায় তার অগ্রগমন। আবার যে মানুষ প্রাণ, মন লাভ করেছে, বিজ্ঞান তার সাধনা এবং আনন্দ তার লক্ষ্য।

পশুর থেকে ক্রম-বিকাশে মানুষ এসেছে। পশুর স্বাভাবিক বৃত্তি মানুষে আছে। পশুর মধ্যে যে ব্রহ্ম তিনি প্রাণময় পুরুষ। কাম, ক্রোধ, লোভ এই নিয়েই পশুর জীবন। মানুষের মধ্যেও এগুলি আছে, কিন্তু আরও কিছু বেশি আছে। সেখানে প্রাণময় পুরুষ হয়েছে মনোময় পুরুষ এবং প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে বিবর্তনে কিংবা ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানময় পুরুষ হয়ে আনন্দময় পুরুষে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপে উপনীত বা উন্নীত হওয়ার। অজ্ঞানতা, জড়তা, ভয়, ভ্রম, প্রমাদ ইত্যাদি তমোগুণ সম্ভূত। আবার কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি রজোগুণ উদ্ভূত। মানুষের সাধনা তাই রজো-তমোগুণ জয় করে সত্ত্বগুণান্বিত হওয়া এবং শেষে ত্রিগুণাতীত হওয়া। ত্রিগুণাতীত হলেই লাভ করা যায় ব্রাহ্মীস্থিতি এবং তখনই বলা যায় ঃ

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ 3/6)

ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। জীব সেই আনন্দস্বরূপ থেকেই এসেছে, আনন্দের দ্বারাই বেঁচে আছে, সেই আনন্দস্বরূপেই আবাব প্রবেশ করবে।

সব কিছুই আবার ঈশ্বরে বা পরব্রহ্মে লীন না হওয়া অবধি এই ক্রবমিকাশ বা ক্রমবিবর্তন চলছে এবং চলবে। ক্রম-সংকোচনে সবকিছু ঈশ্বরে লীন হলে আসে সাম্যাবস্থা এবং সেই সাম্যভঙ্গ হলে আবার ক্রমপ্রসারণ ও ক্রমবিবর্তন এবং ক্রমবিকাশ। শুধু বেদ, উপনিষদ, গীতাতেই নয়, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব তথা সৃষ্টি রহস্য। পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলিও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে সাংখ্যদর্শন এবং উপনিষদীয় তত্ত্বের অনুসরণে। এগুলিতেও বলা হয়েছে ব্রহ্মই কারণ এবং জগৎ তাঁর কার্য। শুধু মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে নয় জীবজগৎ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলি মহাবিশ্ব সংক্রান্ত তত্ত্বের মূলগত কোনও পরিবর্তন ঘটায় নি, কিন্তু তার উৎকর্ষ ঘটিয়েছে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মকল্প, প্রলয়, মহাপ্রলয় ইত্যাদির অবতারণা করে। এর ফলে সৃষ্টির শুরু, ক্রমবিকাশের কাল, মহাবিশ্বের অব্যক্তে অবস্থানের মোট সময় ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা গেছে।

পুরাণগুলি বলেছে, ঠিক কতকাল আগে সৃষ্টির তথা মহাবিশ্বের এবং জীবজগতের ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল, কতদিন এই ক্রমবিকাশ চলবে, কবে শুরু হবে ক্রমসংকোচন, অব্যক্ত অবস্থা কতদিন থাকবে, আবার কবে অব্যক্ত ব্যক্ত হবে, শুরু হবে পুনরায় আর একটি ক্রমবিকাশ। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পুরাণভিত্তিক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছে পুরাণসমূহ।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টির যে বিবরণ দিয়েছেন তা সংক্ষেপে বললে এই রকম দাঁড়ায় ঃ ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠতম। ব্রহ্মাও ঈশ্বর-সৃষ্ট। ঈশ্বর যেমন নিজের তেজে বিশ্বকে প্রকাশ করেছেন, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি প্রকাশ করেছেন, ব্রহ্মা তেমনি প্রকাশ করেছেন সৃষ্টিকে। সাধারণ মানুষ মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রহ্মাকেই জগৎস্রষ্টা মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ঈশ্বরই সবকিছু বিকশিত করেছেন। মায়াবদ্ধ জীব, প্রজ্ঞাশূন্য ব্যক্তি 'আমি', 'আমার' বলে গর্ব বোধ করে, কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া দ্রব্য, ধর্ম, কাল, স্বভাব, জীব—এরা সবই অর্থহীন। সেই দ্রষ্টা, কূটস্থ নিখিলের আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরের চোখের ইঙ্গিতে প্রবৃত্ত হয়ে ব্রহ্মা, জন্ম পাবার পর, তাঁর সৃজ্য সংসারকে পুনর্বার সৃষ্টি করেছেন। নির্গুণ ব্রহ্মের তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজ ও তম। তিনটি গুণই ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় থাকে। সাম্যভঙ্গ হলে সৃষ্টি শুরু হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনের জন্য এই তিন গুণের প্রয়োজন হয়। দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়ী গুণগুলি নিত্যমুক্ত পুরুষকে মায়ামোহিত হওয়ার জন্য কার্য-কারণ কর্তৃত্বে বন্ধন করে। ভগবান তাঁর গতি নিজেই বোঝেন, অন্যের পক্ষে তা অনধিগম্য। এই ত্রিবিধ গুণ সংযোগে তিনি অবাঙ্মনসগোচর। তিনি ব্রহ্মার ঈশ্বর এবং সকলের ঈশ্বর। এই দ্রব্য হল পঞ্চভূত এবং আধুনিক Matter। জ্ঞান হল চেতনা বা চৈতন্য বা Knowledge। আর ক্রিয়া হল ইন্দ্রিয় বা এ কালের Activity। সত্ত্বগুণ জ্ঞানে, রজোগুণ ক্রিয়াতে আর তমোগুণ দ্রব্যে বা পঞ্চ মহাভূতে। কার্য-কারণ কর্তৃত্ব হল শ্রম-দেহ-জীব এবং এগুলির সহযোগে ভোগ। শ্রমে কার্যত্ব, দেহে কারণত্ব আর জীবে কর্তৃত্ব রয়েছে। ভোগ এইভাবেই তিনটি আশ্রয় যুক্ত। নিজের মায়া দিয়েই বহু হতে ইচ্ছুক মায়াধীশ পরমেশ্বর নিজের মধ্যে লীন থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যদৃচ্ছা-ক্রমে কাল-কর্ম-স্বভাব ধারণ করেন। অনন্ত [Eternity] থেকে সীমিত কাল (Periodic Time) ধারণা এলে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ হয়, বিকার বা অসাম্য এসে পড়ে। এর ফলে কর্মের উদ্ভব হয়, সৃষ্টির উপক্রম হয়। স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা এই সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত। স্বভাব থেকে নানা রূপান্তর সিদ্ধ হয়। কর্মের ধারণা থেকে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। তারপর এই মহৎ থেকে অহংকারাদির ক্রম-বিকাশ।

অহংকার-তত্ত্ব থেকে আসে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও দ্রব্যশক্তি। পঞ্চভূতের আদিকারণ তামস-অহংকার। তামস-অহংকার বিকার প্রাপ্ত হয়ে ঘটে আকাশের আবির্ভাব। তার মাত্রা বা সূক্ষ্মরূপ হল শব্দ। শব্দ হল তন্মাত্র এবং আকাশ হল মহাভূত। আকাশের বিকার থেকে স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বায়ুর উৎপত্তি। আকাশের সঙ্গে অন্বয় বলে বায়ুতে শব্দ ও তৎসহ প্রাণ, ওজঃ, সহ্য ও বল বিরাজমান। কাল, কর্ম ও স্বভাবের প্রভাবে বায়ুর বিকার হলে তা থেকে রূপধর্ম বিশিষ্ট তেজের অভ্যুদয়। এই তেজ পূর্বসৃষ্ট শব্দ ও স্পর্শের সঙ্গেও অন্বিত বলে তাদের গুণও এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ তেজ ভূতের রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ রয়েছে। তেজের বিকার থেকে রসাত্মিক জলের সৃষ্টি এবং আগেরগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় জলে রয়েছে রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ। জলের বিকারে গন্ধবান পৃথিবীর উৎপত্তি। আগের ভূতগুলির সঙ্গে অন্বয় যুক্ত বলেই ক্ষিতি বা গন্ধ তন্মাত্রে রয়েছে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি হল তামস-অহংকরের পঞ্চ-তন্মাত্র। আর এই তন্মাত্র থেকে বিবর্তিত স্থূল রূপ হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম।

বিকার বিশিষ্ট সাত্ত্বিক অহংকার থেকে হয় মন এবং বৈকারিক দশ দেবতা—দিক, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং প্রজাপতি। এই দেবতাদের প্রথম পাঁচজন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আর বাকি পাঁচজন কর্মেন্দ্রিয়ের। এইভাবে দশ দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। দিক, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় যথাক্রমে কান, ত্বক, চোখ, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিপতি। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি যথাক্রমে বাক, পাণি, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিপতি। উপেন্দ্র হলেন আদিত্যরূপ বিষ্ণু, আর মিত্রও একজন আদিত্য। সুতরাং তৈজস অহংকার থেকে বিকারের ফলে দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। এই তৈজস অহংকারে জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রাণও রয়েছে। জ্ঞানশক্তি বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মশক্তি প্রাণ দিয়ে কর্মেন্দ্রিয় বোঝানো হয়েছে। এইভাবে তৈজস অহংকার দ্বিবিধ। দশ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও প্রাণ ভেদে যথাক্রমে শোত্র, ত্বক, ঘ্রাণ, জিহ্বা, দৃক, বাক্, বাহু, পদ, পায়ু ও উপস্থ। এই পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন আর গুণভাবগুলি মিলিত না হওয়া অবধি তারা দেহরূপ আয়তন নির্মাণ করতে পারে না। ভগবৎ-শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা সদসৎ-প্রধানের গুণভাব পেল, আর সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে অণ্ডাত্মক শরীরের সৃষ্টি হল। হাজার হাজার বছর ধরে এই অণ্ডটি জলে বা আদি কারণ-সলিলে অবস্থান করল। কাল-কর্ম-স্বভাবস্থিত হিরণ্যগর্ভ পুরুষ এই অচেতন অণ্ডকে সঞ্জীবিত করলেন। হাজার হাজার উরু, পা, হাত, মুখ আর মাথাবিশিষ্ট এক বিশাল পুরুষ অণ্ডটি ভেঙে বেরিয়ে এলেন। এই পুরুষের নীচের দিকের সর্ব অঙ্গ থেকে সাতটি এবং জঘন থেকে সাতটি মোট চৌদ্দটি ভুবন সৃষ্টি হয়েছে। এই পুরুষের আকার-আকৃতি গীতার বিশ্বরূপ পুরুষেরই অন্য বর্ণনা মাত্র।

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাদেবের ধারণা এসেছে পৌরাণিক যুগে। এই ব্রহ্মা জন্ম নেন, জগতের নির্মাণ কার্য করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পরে তিনি মৃত্যুবরণও করেন। জগতের ক্রমবিকাশ শুরু হয় তার জন্মলগ্ন থেকে। ক্রমসঙ্কোচন আরম্ভ হয়ে যায় ব্রহ্মার বয়স 50 ব্রাহ্ম-বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। এই ক্রমসংকোচন শেষ হয় ব্রহ্মার মৃত্যুতে। $31{,}104 \times 10^{10}$ মনুষ্য-বৎসর ধরে সৃষ্টি বহিঃপ্রক্ষিপ্ত থাকে। সুতরাং মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচনের নির্দিষ্ট সময় জানতে হলে ব্রহ্মার দিন-রাত্রি, জন্ম-মৃত্যুর কথা ভালো করে জানা দরকার। পুরাণভিত্তিক দর্শন ব্রহ্মার দিন-রাত্রি, জন্ম-মৃত্যুর কথা বিশদভাবেই আলোচনা করেছে। সেই আলোচনা সামান্য বিশদ করে তুলে ধরা যাক।

প্রথমে, ব্রহ্মার দিন-রাত্রির কথায় আসা যাক। দর্শন মতে, ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচনের সময় নির্ধারণের জন্য কিছুটা বিশদভাবে এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারযুগ মিলে এক চতুর্যুগ। এর পরিমাণ 43,20,000 পার্থিব-বৎসর বা মানুষের বছর। এমনি হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন বা এক রাত্রি। সুতরাং ব্রহ্মার এক দিন-রাত্রি হল 864 কোটি পার্থিব-বৎসর। আবার দেবতাদের এক দিন-রাত্রি হয় পার্থিব এক বৎসরে। মানুষের উত্তরায়ণের ছয় মাস দেবতাদের একদিন আর দক্ষিণায়নের ছয় মাস তাঁদের একরাত্রি। এইভাবে দেবতাদের এক বৎসর বা এক দিব্য-বৎসর হল 360 পার্থিব-বৎসর। বার হাজার দিব্য-বৎসরে এক চতুর্যুগ। এর 4800 দিব্য-বৎসরে সত্যযুগ, 3600 দিব্য-বৎসরে ত্রেতাযুগ, 2400 দিব্য-বৎসরে দ্বাপরযুগ এবং 1200 দিব্য-বৎসরে কলিযুগ। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের বাইরে মহঃ, জন, তপঃ আর সত্য লোকে হাজারটি চতুর্যুগে এক দিন হয়। হাজার চতুর্যুগের ওই দিন হল ব্রহ্মার একদিন। আবার এই পরিমাণ সময় নিয়ে তাঁর এক রাত্রি। ওই ব্রাহ্ম রাত্রিতে ব্রহ্মা ঘুমিয়ে থাকেন, রাত্রি শেষ হলে তাঁর সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়।

ব্রহ্মার একদিনে পরপর চৌদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। প্রত্যেক মনুর রাজত্বকাল হল $71\frac{3}{7}$ চতুর্যুগ বা 30,85,71,428.5 পার্থিব-বৎসর। ব্রহ্মার এক দিনে এক 'কল্প'। অর্থাৎ এক কল্প হল 432 কোটি মনুষ্য-বৎসর বা পার্থিব-বৎসর। ব্রহ্মার দিবসের আগমনে অব্যক্ত প্রকৃতি হতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়। আবার ব্রাহ্ম-রাত্রির সমাগমে সেই অব্যক্ত কারণে সব লয় পায়। ব্রহ্মার একদিন বা 432 কোটি পার্থিব-বৎসরে মোট চৌদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। চতুর্দশতম মনুর রাজত্বকাল শেষ হলে কল্প শেষ হয়, ব্রহ্মার একটি দিন চলে গিয়ে আসে তাঁর রাত্রি 'ব্রাহ্ম-যাম'। এক ব্রাহ্ম-যামও 432 কোটি পার্থিব-বৎসর। ওই সময় সৃষ্টি-কর্ম বন্ধ থাকে, সব অব্যক্ত-কারণে লয় পায়। ব্রহ্মার রাত্রির অবসানে অর্থাৎ কল্প শেষের আরও 432 কোটি পার্থিব বৎসর পরে আবারও নতুন 'ব্রাহ্মদিন' বা কল্প শুরু হয়। এইভাবেই চলতে থাকে। ব্রাহ্মদিন আসে আর যায়। এমনি করে ব্রহ্মার পরমায়ু অর্থাৎ একশত ব্রাহ্ম বৎসর বা $31{,}104 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর শেষ হয়। তখন হয় 'মহাপ্রলয়'। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তখন পরম বস্তুতে লীন হয়। ক্রমসংকোচন শেষ হয়। সবই ঈশ্বরে লীন হয়। ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়। মহান ঈশ্বর তখন একাকী বিরাজ করেন সৃষ্টিহীন অবস্থায়। তখন ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকে না, থাকেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং আর কেউ না, অন্য কিছু না।

আগেই বলেছি, বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছে কপিলের সাংখ্যদর্শন ও অন্যান্য দর্শন-প্রবক্তারা। সৃষ্টি বিষয়ে এগুলি যেমন ক্রমবিকাশবাদের কথা বলেছে, তেমনি বলেছে প্রলয়কালীন ক্রমসংকোচনের কথা। ক্রমবিকাশে ঈশ্বর থেকে বিশ্ব যেমন বিকশিত হয়, তেমনি ক্রমসংকোচনে বিশ্ব আবার ঈশ্বর বা পরব্রহ্মে লীন হয়। এই ক্রমসংকোচনেরই পৌরাণিক নাম 'প্রলয়'। পৌরাণিক মতে প্রলয় চার রকম। অধিকাংশ পুরাণেই প্রলয় নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা আছে। এগুলির মধ্যে 'কূর্মপুরাণ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' বিস্তারিত আলোচনা করেছে ওই ক্রমসংকোচন বা প্রলয় সম্পর্কে। কূর্মপুরাণ বলেছে ঃ

"এই জগতে প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে এই সমস্ত ভূতের যে লয় দেখা যায় তাকে মুনিগণ নিত্য-প্রলয় বলে কীর্তন করে থাকেন। কল্পান্তে ব্রহ্মার নিদ্রাগমন হেতু ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের যে প্রলয় হয়ে থাকে তাকে মনীষীগণ নৈমিত্তিক-প্রলয় বলে থাকেন। মহৎ-অহংকারাদি স্থূলভূত পর্যন্তের যে প্রলয় হয়, কালজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাকে প্রাকৃত-প্রলয় বলেন। আর তত্ত্বজ্ঞান হেতু যোগীদের পরমাত্মাতে যে লয় হয় কাল-চিন্তাপরায়ণ দ্বিজগণ বলেছেন, তার নাম আত্যন্তিক প্রলয়।" (কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, 43/5-9)।

পুরাণ চার রকমের প্রলয়ের কথা বলেছে। উপরে সেই সব প্রলয়ের মূল কথা বিবৃত হয়েছে কূর্ম-পুরাণের উদ্ধৃতিতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জগতে প্রতিদিন সুষুপ্তির জন্য সমস্ত ভূতের যে লয় দেখা যায় তাকে বলে 'নিত্য প্রলয়'। আবার কল্পান্তে অর্থাৎ এক ব্রাহ্মদিন শেষ হলে, ব্রহ্মার নিদ্রাগমনহেতু যে প্রলয় হয়, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের তা নৈমিত্তিক-প্রলয়। এটা হয় 864 কোট মনুষ্যবৎসর পরে পরে, কারণ ব্রহ্মার দিন শেষে অব্যক্ত কারণে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লয় পেলে ওই অবস্থা 432 কোটি মনুষ্য-বৎসর অর্থাৎ ব্রহ্মার একরাত্রি ধরে থাকে। দিন এলে আবার সব ব্যক্ত হতে থাকে, বহিঃপ্রক্ষেপ চলতে থাকে। তারপর আবারও সারাদিন ধরে অর্থাৎ 432 কোটি পার্থিব-বৎসর ধরে বহিঃপ্রক্ষেপ চলতে থাকে। তারপর আবার নৈমিত্তিক-প্রলয়। এই প্রলয়ে সাংখ্য দর্শনের মহৎ বা বুদ্ধি বা সমষ্টি মন থাকছে। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিরাও আস্ত থাকছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন পরম বস্তুতে লীন হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয়। তখন 'প্রাকৃত লয়' বা 'মহাপ্রলয়' হয়। 'মহাপ্রলয়'-এর পর এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই বর্তমান থাকেন আর কিছুই থাকে না। তখন দিনরাত থাকে না। আকাশ কিংবা পৃথিবী থাকে না, জ্যোতিঃ বা অন্ধকার কিছুই থাকে না। তখন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত, বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত একমাত্র ব্রহ্ম-পুরুষই বর্তমান থাকেন। সৃষ্টি যতকাল থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মার 100 বৎসর অর্থাৎ 31, 104×10^{10} মনুষ্য-বৎসর, তত বছর ধরে পরব্রহ্ম সৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকেন। অনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং মহাপ্রলয় $62{,}208 \times 10^{10}$ মনুষ্য-বৎসর পরে পরে হতে থাকে। মহাপ্রলয় একবার হওয়ার পরে ব্রহ্মের সৃষ্টিহীন কাল হল $31{,}104 \times 10^{10}$ মনুষ্য-বৎসর। আবার সৃষ্টির লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় ঠিক অতগুলো বছর ধরে এবং তারপর আবার মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টিমন বা বুদ্ধিতত্ত্ব লয় পায়। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনেরা আস্ত থাকে না।

পরব্রহ্মের সৃষ্টি প্রবৃত্তি কেন হয় দর্শনে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। মূলতঃ বলা হয় লীলা আস্বাদনের জন্যই এক থেকে তিনি বহু হন। তেমনি বিজ্ঞানও ব্যাখ্যা দিতে পারছে না 'বিগ ব্যাঙ' কেন হলো এবং কখন হলো। বিশ্ব সৃষ্টির সম্পর্কে দর্শন মোটামুটি একটা সময় বেঁধে দিতে পেরেছে। বলতে পেরেছে $62{,}208 \times 10^{10}$ মনুষ্য-বৎসর পরে পরে সৃষ্টি শুরু হয়। সৃষ্টি বা বহিঃপ্রক্ষেপ (Projection) চলে $31{,}104 \times 10^{10}$ মনুষ্য-বৎসর ধরে। তারপর ঠিক অতো বছর লয় পেয়ে চুপচাপ থাকে সবকিছু। তখন চলে সৃষ্টি-হীন কাল। আবার শুরু হয় নতুন করে সেই বহিঃপ্রক্ষেপ। বিজ্ঞান এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা তো দিতেই পারেনি উপরন্তু 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বও প্রায় অচল হয়ে পড়েছে আজকের দিনে।। এখন 'সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব' পরিবর্তিত হয়ে 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' হয়েছে। দর্শনের মূলতত্ত্ব মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচন এই তত্ত্বে স্বীকৃত হয়েছে।

আবার নৈমিত্তিক প্রলয় থেকেই শুরু করা যাক। বিষ্ণুপুরাণে এর একটা বর্ণনা আছে, সেটা এই রকম ঃ

"হে মৈত্রেয়, তদনন্তর ব্রাহ্ম-যামে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়ে থাকে। সেই প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র, তোমার নিকট কীর্তন করছি, শ্রবণ কর। চতুর্যুগ সহস্রের পর (432 কোটি মনুষ্য-বৎসর) মহীতল ক্ষীণ হয়ে এলে অত্যন্ত কঠোর ও শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তাহাতে অল্পসার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই অব্যয় আত্মা ভগবান বিষ্ণু, রুদ্ররূপ ধারণ করে প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহকে বিলয় করার চেষ্টা করেন। তৎপরে হে মুনিশ্রেষ্ঠ, রুদ্ররূপী সেই ভগবান বিষ্ণু সূর্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্বক যাবতীয় জলসমূহকে পান করেন। যাবতীয় প্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করে সেই মহাপুরুষ পৃথিবী-তল শোষণ করতে করতে নদী বা সমুদ্রশৈল অথবা শৈল-প্রস্রবণ কিংবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাও শোষণ করবেন। তৎপরে জলপান দ্বারা ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে সূর্যের সেই সপ্তরশ্মি সাতটি সূর্যরূপে প্রকাশ পাবে। প্রদীপ্ত সেই সপ্তভাস্কর উর্ধ্ব এবং অধঃস্থিত যাবতীয় ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করবেন।

তারপরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহ দ্বারা দগ্ধ হয়ে ত্রিভুবন, জলাভাবে শুষ্ক হয়ে যাবে। সেই সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশুষ্ক হয়ে একমাত্র বসুধা কূর্ম-পৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হবে। তৎপরে সমস্ত সংহার করতে উদ্যত ভগবান বিষ্ণু অনন্তদেবের নিঃশ্বাস সম্ভূত কালাগ্নি স্বরূপে পাতালসমূহকে ভস্ম করবেন। তৎপরে সেই কালানল, সমস্ত পাতাল খণ্ড দগ্ধ করে উর্ধ্বগামী হয়ে

পৃথিবীতলকে ভস্মসাৎ করবে। এরপর জাজ্জ্বল্যমান সুদারুণ সেই অনল ভুবর্লোকসমূহকে দগ্ধ করে স্বর্লোক ভস্মসাৎ করবে। প্রবল কালানল তেজোবিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি ভর্জনকটাহের ন্যায় বোধ হবে।"

বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও নৈমিত্তিক প্রলয়ের কথা বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় বক্তৃতায় বহুবারই বলেছেন। এই দুটিকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বিবেকানন্দের বক্তৃতা থেকে কিছুটা তুলে ধরা হচ্ছে। "তাঁদের (দার্শনিকদের) মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করলে উহা একমাত্র 'আকাশ' নামক পদার্থে পর্যবসিত হয়। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যা কিছু দেখতে পাই, স্পর্শ করি বা আস্বাদ করি, এমন কি আমরা যা কিছু অনুভব করি—সবই এই আকাশের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাষ্পীয়—সকল পদার্থ, সর্বপ্রকার আকৃতি ও শরীর, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারা—সবই এই আকাশ হতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য করে তা হতে জগৎ সৃষ্টি করল। আকাশের সঙ্গে একটি সর্বব্যাপী শক্তি আছে। জগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এমনকি চিন্তা-শক্তি পর্যন্ত, 'প্রাণ' নামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য করে জগত-প্রপঞ্চ রচনা করেছে। কল্প প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ সমুদ্রে সুপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিহীন অবস্থায় ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হতে থাকে তেমনি এই আকাশ-সমুদ্র হতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ, কত সূর্য, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, উদ্ভিদ ও নানা শক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার পদার্থ আকাশের বিভিন্ন রূপ মাত্র। কল্পান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হবে। সেই তরল পদার্থ আবার বাষ্পে পরিণত হবে, তা আবার তেজরূপ ধারণ করবে, অবশেষে সব কিছু যা হতে উৎপন্ন হয়েছিল সেই 'আকাশে' লীন হবে। কিছুকালের জন্য (432 কোটি বৎসর বা ব্রহ্মার একরাত্রি) এই 'প্রাণ' যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকবে, কল্প আরম্ভ হলে আবার জাগ্রত হয়ে নানাবিধ রূপ ধারণ করবে, কল্পাবসানে সকলই আবার লয় পাবে। এই রূপে সৃষ্টি-প্রণালী চলছে, আসছে যাচ্ছে—একবার পশ্চাতে, আবার যেন সম্মুখের দিকে চলছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে হয়, কিছুকাল স্থিতিশীল কিছুকাল গতিশীল, একবার সুপ্ত আর একবার ক্রিয়াশীল হচ্ছে। এইরূপ পরিবর্তন অনন্তকাল ধরে চলছে।"

বিশ্বের ক্রমবিকাশ থাকলে তার ক্রমসংকোচও থাকবে এমন কথা বিবেকানন্দ বারে বারে বলেছেন। শুধু ক্রমবিকাশ হয় না, ক্রমবিকাশ হলে ক্রমসংকোচও হবে। সুতরাং বিশ্ব ক্রমবিকশিত হয়ে থাকলে তার ক্রমসংকোচন অনিবার্য। এটা হিন্দু দর্শনের কথা তথা স্বামী বিবেকানন্দের কথা। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

"অতএব এই বিশ্বও এর মূল কারণে ফিরে যাবে। আবার তার উপাদানগুলো একত্র হয়ে একটি আকার ধারণ করবে, ঠিক তরঙ্গ যেমন নীচে নামে আবার ওপরে ওঠে এবং একটি আকার ধারণ করে। কারণে ফিরে যাওয়া, তারপরে বের হয়ে আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকেই সংস্কৃতে বলে 'সঙ্কোচ' ও 'বিকাশ'। অর্থাৎ সংকুচিত হওয়া এবং প্রসারিত হওয়া। সমগ্র বিশ্ব যেন সংকুচিত হয়, তারপর আবার প্রসারিত হয়। তোমরা বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনেছ, শুনেছ কেমন করে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে সবকিছুই নিম্নতর আকার থেকে গড়ে ওঠে। সে কথা খুবই ঠিক, কিন্তু

প্রত্যেক বিবর্তনেরই একটি ক্রমসংকুচিত পূর্বাবস্থা বা অনভিব্যক্ত অবস্থা আছে। আমরা জানি, এই বিশ্বে যে শক্তির লীলা চলছে তার মোট শক্তির পরিমাণ সব সময়েই এক। একটি পরমাণুরও ধ্বংস নেই। কোনো মতেই তুমি এককণা পদার্থ কমাতে পারো না। একবিন্দু শক্তিও তুমি হ্রাস করতে পারো না বা বৃদ্ধি করতে পারো না। মোট পরিমাণ সর্বদা একই থাকবে। প্রকাশেই যা কিছু পার্থক্য—কখনও ক্রমসংকোচ, কখনও ক্রমবিকাশ। পূর্বকল্পে যা অব্যক্ত হয়েছিল তা থেকেই পরবর্তী কালের আবির্ভাব হবে। সমগ্র বিশ্ব এভাবেই চলেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, একেবারে শূন্য থেকে কোনো কিছু গড়ে উঠেছে—এই অর্থে 'সৃষ্টি' বলে কিছুই নেই। বরং বলা চলে সব কিছুরই বিকাশ বা অভিব্যক্তি হচ্ছে, আর ঈশ্বর হচ্ছেন বিকাশকর্তা। এই বিশ্ব যেন তাঁর ভিতর থেকেই নিঃশ্বাসের মতো আসছে, আবার তাঁতেই সংকুচিত হয়ে মিশে যাচ্ছে। আবার তিনি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করছেন। বেদে একটি চমৎকার উপমা আছে—'সেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসে এই বিশ্বকে প্রকট করেছেন এবং প্রশ্বাসে একে গ্রহণ করছেন, ঠিক যেমন একটি ধূলিকণা আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিতে পারি ও প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি'। খুব ভালো কথা, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে প্রথম কল্পের বেলায় কি হয়েছিল? তার উত্তর, 'প্রথম' বলতে আমরা কি বুঝি? প্রথম কল্প বলে কিছু ছিল না, সময়ের যদি আদি বলে কিছু থাকে, তাহলে সময়ের ধারণাই নষ্ট হয়ে যায়। সময় যেখানে শুরু হয়েছিল, সেই রকম একটা সীমার কথা ভাবতে চেষ্টা কর, দেখবে সেই সীমার ওপারে আরও সময়ের কথা তোমাকে ভাবতে হবে। স্থান এবং কাল, দুই-ই অসীম, তাদের আদিও নেই, অন্তও নেই। ঈশ্বর পাঁচ মিনিটে বিশ্ব সৃষ্টি করে ঘুমোতে গেলেন এবং সেই সময় থেকে ঘুমিয়েই আছেন—এর চেয়ে পূর্বোক্ত ধারণা অনেক ভালো। অপরপক্ষে, এই ধারণা দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই শাশ্বত সৃষ্টিকর্তা রূপে। এখানে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে, পড়ছে, আর ঈশ্বর, সেই শাশ্বত প্রবাহকে পরিচালিত করছেন। এই বিশ্ব যেমন অনাদি এবং অনন্ত, ঈশ্বরও তাই। তাই-ই হওয়া উচিত, কারণ আমরা যদি বলি যে এমন সময় ছিল, যখন স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনো আকারেই কোনো সৃষ্টি ছিল না, তাহলে বলতে হয়, তখন কোনো ঈশ্বরও ছিল না, কারণ ঈশ্বর আমাদের কাছে এই বিশ্বের সাক্ষীরূপেই বিদিত। কাজেই বিশ্ব যখন ছিল না, তখন তিনিও ছিলেন না। একটি ধারণা থেকেই অপরটি আসে। কার্যের ধারণা থেকেই আমরা কারণের ধারণা লাভ করি। কার্য যদি না থাকে, তাহলে কারণও থাকতে পারে না। কাজেই এটা স্বভাবতই ধারণা করা যায়, বিশ্ব যেহেতু শাশ্বত, ঈশ্বরও শাশ্বত।"

বিবেকানন্দও আরও বলেছেন ঃ "সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী, তা এক সর্বব্যাপী জড়রাশি, তাতে *এই জগতে যা কিছু আছে* সব কিছুরই কারণ রয়েছে। এখন এই কারণ বলতে আমরা কি বুঝি? কারণ হল, ব্যক্ত অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থা, যা ব্যক্ত হয় তারই অব্যক্ত অবস্থা। ধ্বংস বলতে কি বোঝায়? এর *অর্থ কারণে লয়, কারণে ফিরে আসা—অর্থাৎ যে সমস্ত উপাদান থেকে* কোনো বস্তু তৈরি হয়েছিল, *সেগুলো তাদের আদিম* অবস্থায় চলে যাওয়া। ধ্বংস শব্দের এই অর্থ ছাড়া সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ অর্থ যে অসম্ভব, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কপিল অনেক কাল আগে ধ্বংস অর্থ যে 'কারণে লয়' করেছিলেন, বস্তুত তার দ্বারা যে তা-ই *বোঝায়, তা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান অনুসারে প্রমাণ করা যেতে পারে। 'সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন'* ছাড়া ধ্বংসর আর কোনো অর্থ নেই। জড়বস্তু যে অবিনশ্বর তা গারে প্রমাণ করা যায়। যাঁরা রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, একটা বাতি ও কস্টিক পেন্সিল রেখে সমস্ত বাতিটি পুড়িয়ে ফেলা হয়,

তাহলে ঐ কস্টিক পেন্সিলটা বার করে ওজন করলে দেখা যাবে যে ঐ পেন্সিলটার ওজন, আগের ওজনের সঙ্গে বাতির ওজন যোগ করলে যত হয়, ঠিক তত হয়েছে। ঐ বাতিটাই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে কস্টিকে প্রবেশ করে।

অতএব আমাদের আধুনিক জ্ঞানোন্নতির অবস্থায় যদি কেউ বলে যে, কোনো জিনিস সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়, তবে সে নিজেই উপহাসের যোগ্য হবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তি এই কথা বলতে পারে। শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বলা কখনও সম্ভব নয়। কারণ, প্রাচীন দার্শনিকদের মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিস্বরূপ করে তাঁদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক ভাগটির বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তার দ্বারা কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। আর আধুনিক বিজ্ঞান তার ভৌতিক ভাগ বিশ্লেষণ করে ঠিক সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।"

সুতরাং প্রলয় হল ক্রমসংকোচন। 'মহাপ্রলয়' হল বিশ্বের মূল কারণে ফিরে যাওয়ার জন্য ক্রমসংকোচন এবং এ ক্রিয়া ক্রমবিকাশের ঠিক বিপরীত। স্থূলরূপ ক্রমসংকোচন প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মরূপ লাভ করে মাত্র।

'নৈমিত্তিক প্রলয়' হলে 'মহৎ' বা 'সমষ্টিমন' থাকছেই। 'প্রাকৃত প্রলয়' বা মহাপ্রলয়ের মত সর্বধ্বংসী এ নয়। 864 কোটি মনুষ্য-বৎসর পরে পরে এই নৈমিত্তিক প্রলয় হবে বা হয় বলে আমাদের দর্শনের দাবী। তখন প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন ইত্যাদি আস্ত থাকবে। কিন্তু মহাপ্রলয় হলে সবই লয় পায়। তখন 'মহৎ' বা 'সমষ্টিমন' থাকে না। থাকে প্রকৃতি জড়িত ব্রহ্ম-পুরুষ, যাকে মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে 'কসমিক এগ' বা 'মহাজাগতিক অণ্ড' (Cosmic Egg), যা নাকি সৃষ্টির বা বহিঃ-প্রক্ষেপের প্রারম্ভে ছিল। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে বিজ্ঞানীরা একে বলতেন 'প্রোটাইল' [Protyle]। এখনকার বিজ্ঞান একে বলছে 'অনন্যতা' (Singularity)।

প্রাকৃতলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় সম্পর্কে কালিকা পুরাণে বলেছে যে, মানুষের চারিযুগে এক দৈবযুগ হয়, এক সপ্ততি দৈবযুগে এক মন্বন্তর। দৈব দুই সহস্র যুগে এবং মনুষ্যদিগের দুই সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। এক ব্রাহ্মদিনে চতুর্দশ মনুর অধিকার। মানুষদের ন্যায় ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও এক ব্রাহ্ম-বৎসর হয় 360 ব্রাহ্ম-দিনে। ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসরে এক পরার্ধ—তা-ই পরমেশ্বরের দিন। পরমেশ্বরের রাত্রিও ওই পরিমাণ। ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরার্ধকাল, এই দ্বিপরার্ধ কাল অতীত হলে জগন্মণ্ডলের 'প্রাকৃতলয়' বা 'মহা-প্রলয়' হয়। তন্মাত্রসমূহ, অহংকার এবং মহত্তত্ত্ব, সকলই এমন কি, অন্যান্য প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতি রূপে পর্যবসিত হয় বলে এর নাম 'প্রাকৃত প্রলয়'। প্রাকৃত প্রলয় বা মহাপ্রলয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সকলই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মাই মাত্র বর্তমান থাকেন। পরমাত্মা তখন নিরাধার, নিরাকার, নির্বিকার, নিঃসত্ত্ব, বিশেষণ-বর্জিত, না-স্থূল, না-সূক্ষ্ম, নির্লেপ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, সচ্চিদানন্দ, স্ব-প্রকাশ, সর্বব্যাপী পরব্রহ্মরূপে বর্তমান থাকেন। তখন দিবা-রাত্রি থাকে না, আকাশ-পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার বা আর কিছুই থাকে না। তখন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত, বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত একমাত্র ব্রহ্ম-পুরুষই বর্তমান থাকেন। সৃষ্টি যতকাল থাকে ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ বা 31,104 $\times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর পর্যন্ত পরব্রহ্ম সৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকেন এবং তারপর আবার সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হয়। এই পরব্রহ্ম আধুনিক বিজ্ঞানের 'মহাজাগতিক অণ্ড' (Cosmic Egg)-এর সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু কেবলই মহাজাগতিক অণ্ড নয়।

প্রাকৃতিক প্রলয় সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত বলছেঃ "প্রাকৃতিক প্রলয়কালে একশ বছর অনাবৃষ্টি হয়, ফলে পৃথিবী অন্নহীন হয়। কালের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাগণ তখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে একে অন্যকে খেয়ে ফেলে এবং ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন সংবর্তক নামে রবি সমুদ্রস্থিত, দেহস্থিত ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রস প্রখর কিরণজালে শোষণ করে নেয়, মোটেই বর্ষণ করে না। তারপর সংকর্ষণের মুখ থেকে উৎপন্ন সংবর্তক নামে অগ্নি বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হয়ে পৃথিবীর শূন্য বিবরগুলিকে পোড়াতে থাকে। তখন উপরে, নীচে, চারদিকে সূর্য আর অগ্নি তাপে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হতে থাকে এবং একটি দগ্ধ গোময়পিণ্ডের মত দেখায়। তারপর সংবর্তক নামের অতি প্রচণ্ড বায়ু, একশত বৎসরেরও বেশি সময় ধরে প্রবাহিত হয়। তাতে আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে ধূসর হয়ে যায়। এরপর নানা রকমের আর নানা রঙের মেঘ শত বৎসর ধরে বর্ষণ করতে থাকে ও ঘোর গর্জনে চতুর্দিক পূর্ণ করে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের গহ্বরে প্রবিষ্ট এই বিশ্ব এক হয়ে যাওয়া সাগরের জলে ডুবে যায়। এভাবে জলে প্লাবিত হলে পৃথিবীর গন্ধগুণ জল রাশিতে বিলুপ্ত হয়।

তারপর তেজ জলের গুণ রসকে গ্রাস করে। রসহীন জল নিজ কারণ তেজে বিলুপ্ত হয়। আবার বায়ু তেজের গুণ রূপকে গ্রাস করে এবং রূপহীন তেজ তার কারণ বায়ুতে বিলীন হয়। তারপর বায়ুর স্পর্শগুণ আকাশে মিশে গেলে স্পর্শগুণহীন বায়ু আকাশে বিলুপ্ত হয়। ভূতাদি তামস অহংকার আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে, আর শব্দগুণহীন আকাশ তার কারণ সেই তামস অহংকারে লোপ পায়। এরপর তৈজস অর্থাৎ রাজস অহংকার গুণবৃত্তিগুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে এবং সাত্ত্বিক অহংকার ইন্দ্রিয়দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গ্রাস করে। তখন এই গুণসমূহের সাম্যাবস্থা আসে। *কালের অবয়বসমূহ দ্বারা তার মূল পরমতত্ত্বের পরিণামাদি বিকার হয় না। সেই পরমতত্ত্ব* অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, অব্যয়, সকল কারণেরও কারণ। সেই পরম কারণে বাক্য ও মন প্রবর্তিত হয় না। তাতে সত্ত্ব নেই, রজ নেই, তমঃ নেই, মহত্তত্ত্বাদিও নেই। তখন প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল, কেউ থাকে না। তখন বিভিন্ন লোকের অস্তিত্বও নেই, সে অবস্থায় স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি, আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, সূর্য কিছুই নেই। তখন সেই পরম কারণ যেন ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত, শূন্যের মত যুক্তি-বিচারাদি তর্কের দ্বারা নিরূপণের অতীত। এই অবস্থাই সব কিছুর মূলীভূত লয়স্থান বলে শাস্ত্রে অভিহিত হয়েছে (তুলনীয়ঃ মাণ্ডুক্য উপনিষদ-7)। এরই নাম প্রাকৃতিক প্রলয় বা প্রাকৃত লয় বা মহাপ্রলয়।"

সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন পরম বস্তুতে লীন হয়, দর্শন মতে তখন হয় মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতলয়। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মাও থাকেন না, কারণ তিনিও ঈশ্বর-সম্ভূত এবং জীবিত থাকেন এক শত ব্রাহ্ম-বৎসর। এরপর থাকেন কেবলমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। সবই তাঁতে লীন হয়ে যায়। আলো-অন্ধকার, দিনরাত, সময়-অসময় কিছুই থাকে না। তখন বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি-জড়িত একমাত্র ব্রহ্মপুরুষই বর্তমান থাকেন। এই ব্রহ্ম পুরুষই পরব্রহ্ম। এঁর থেকেই সৃষ্টি হন পিতামহ ব্রহ্মা এবং প্রকাশিত হয় বিশ্ব-জগৎ। সহজেই বোঝা যায়, ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম এক নন। ব্রহ্মার একদিন-*রাত্রি 864 কোটি পার্থিব-বৎসর। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল 100 ব্রাহ্ম-বৎসর বা* $31{,}104 \times 10^{10}$ *পার্থিব-*বৎসর। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল জুড়ে চলে সৃষ্টিকর্ম। তারপর আসে 'মহাপ্রলয়'। মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মের সৃষ্টিহীন কালও হল $31{,}104 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর। তারপর আবার সৃষ্টি প্রবৃত্তি হলে পরব্রহ্ম হতে প্রথম সৃষ্টি হন পিতামহ ব্রহ্মা। এইভাবে $62{,}208 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর অন্তর হয় মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি মন বা বুদ্ধিতত্ত্ব লয় পায়। প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদিরা সবই লীন হয়ে

যায় জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মে। পরব্রহ্মে সৃষ্টি প্রবৃত্তি কেন হয় দর্শনে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। বলা হয়, লীলা আস্বাদনের জন্য এক থেকে তিনি বহু হন। তেমনি বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না 'মহাজাগতিক অণ্ডে' (Cosmic Egg) 'বিগ ব্যাঙ' বা 'মহাবিস্ফোরণ' (Big Bang) কেন হল, কখন হল কিংবা কবে হল।

নৈমিত্তিক প্রলয়ে 'প্রাণ' ও 'আকাশ' থাকছে 'মহৎ' বা 'সমষ্টি মন'-এর মধ্যে। এই স্থিতি এবং গতি নৈমিত্তিক প্রলয়ের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি মহাপ্রলয়ের ক্ষেত্রেও সত্য, যখন মহত্তত্ত্বও লয় পায় পরব্রহ্মে। হিন্দু দর্শন মতে, বিশ্ব জগৎ একবার বিকশিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে, আবার সংকুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। ক্রমবিকাশ মানলে ক্রমসংকোচন মানতে হয় যুক্তির দিক থেকে। দর্শন বিশ্বাস করে বিশ্বের ক্রম-প্রসারণ এবং ক্রম-সংকোচন। বিশ্ব জগৎ তাই দর্শনের দৃষ্টিতে পর্যাবৃত্ত-গতি সম্পন্ন যার পর্যাবৃত্ত কাল (Periodic Time) হল $62,208 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর। এর ক্রমবিকাশ কাল হল মোটামুটিভাবে $31,104 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর অর্থাৎ ক্রম-প্রসারণ কাল $31,104 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর। তেমনি ক্রম-সংকোচন কালও $31,104 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর। এর আবার নানা স্তর ভেদ রয়েছে। হাজার হাজার বছরের লব্ধ জ্ঞান থেকেই হিন্দু দর্শন বিশ্বসৃষ্টিতে 'দোলন তত্ত্বে' (Oscillation Theory) বিশ্বাসী। এটাকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'পালসেটিং ইউনিভার্স থিয়োরী' (Pulsating Universe Theory) বা 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' বলা যায়। আগেই বলা হয়েছে মহাপ্রলয় হলে মহত্তত্ত্বও লয় পায়, থাকে শুধু প্রকৃতি জড়িত পুরুষ বা সেই পরব্রহ্ম, বা চৈতন্য বিজড়িত প্রকৃতি বা 'মহাজাগতিক অণ্ড'। প্রকৃতি বা মহাজাগতিক অণ্ডের সঙ্গে পরব্রহ্মের পার্থক্য কেবলমাত্র চৈতন্যসত্তা নিয়ে, যা আধুনিক বিজ্ঞান আজও মানে না।

এই 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' দর্শনেরই কথা। দর্শনের মতে মহত্তত্ত্বের লয় তথা ব্রহ্মার লয় হলেই, তখন প্রকৃতি জড়িত পরমপুরুষের অবস্থানই বিশ্বের চরম সংকোচন অবস্থা। এই অবস্থায় $31,104 \times 10^{10}$ মানব-বৎসর অতীত হওয়ার পর আবার শুরু হয় প্রসারণ। প্রসারণ চলে আবারো অতোগুলি বছর ধরে। স্যান্‌ডেজ সাহেবের হিসাব মতো মোট সম্প্রসারণকাল 4×10^{10} বছর যা দর্শন নির্দিষ্ট সময়ের ধারে কাছেও ঘেঁসছে না। কারণ স্যান্‌ডেজ সাহেবের হিসাবেও ভুল ধরা পড়লো।

'ডপলার এফেক্ট' থেকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা পরে বের করেছেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 6×10^{11} থেকে 10^{12} বছর এবং প্রসারণ শেষ হওয়া নিয়ে বিরোধ আজও মেটেনি। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান জর্জ এবেল্ গত 1979 সালের নভেম্বরে তেরো বছর ধরে আটটা গ্যালাক্সীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত জানালেন যে, এই বিশ্বের বর্তমান বয়স 2×10^{12} মানব-বৎসর বা পার্থিব-বৎসর। সুতরাং বিশ্বের সঠিক বয়স নিয়ে আজও গোলমাল আছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবং তার মোট প্রসারণ-কাল আজও নির্ণয় করতে পারছে না আধুনিক বিজ্ঞান। কিন্তু দার্শনিকদের সে অসুবিধা নেই। কবে, সেই আদিকালে তাঁরা বলেছেন ব্রহ্মার 100 বছর মানে $31,104 \times 10^{12}$ মনুষ্য বৎসর, তাই-ই এতাবৎ চলে আসছে এবং তাই বিশ্বের বহিঃ-প্রক্ষেপের মোট সময়। ভারতীয় দর্শন অনুসারে ব্রহ্মা যেদিন সৃষ্টি হলেন সেই দিনই বিশ্বসৃষ্টির শুরু। দর্শন অবশ্য সৃষ্টি বলে না, বলে বহিঃপ্রক্ষেপ (Projection), কারণ ভারতীয় দর্শন মতে কোনও কিছুর সৃষ্টি হয় না, ধ্বংসও হয় না, ঘটে নানা রূপান্তর, নানা পরিবর্তন, নানান বহিঃপ্রক্ষেপ। এই মত আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এক।

যাইহোক, ব্রহ্মার আয়ুর 100 ব্রাহ্ম-বৎসর পূর্ণ হলেই বিশ্বের সৃষ্টি বা বহিঃপ্রক্ষেপের কাল শেষ হয়। সেই ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাদেবের আয়ুর অর্ধেক সবে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ এবারের বিশ্ব সৃষ্টির দিন থেকে 50টি ব্রাহ্ম-বৎসর অতিক্রান্ত। তাঁর 51-তম বৎসরের প্রথমদিন কিংবা শ্বেতবরাহ নামক কল্পের এখন শুরু হয়েছে। এই কল্পের চৌদ্দ মন্বন্তরের মধ্যে ছয় মন্বন্তর শেষ হয়ে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের 71টি মহাযুগের মধ্যে 27 মহাযুগ পূর্ণ হয়ে 28তম মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগের প্রথমপাদ অর্থাৎ চতুর্থভাগ এখন চলছে। 1400 বঙ্গাব্দে কলিযুগের 5093 বৎসর পেরিয়েছে। হিসাব করলে বিশ্বের বয়স এখন $15{,}5522\times10^{10}$ মানব-বৎসর বা মোটামুটিভাবে 155×10^{12} মানব-বৎসর।

একটু বিশদভাবে হিসাব করলে 1400 বঙ্গাব্দের 1লা বৈশাখ বা 1993 সালের 14ই এপ্রিল কলিযুগের 5094তম বৎসর শুরু হয়েছে অর্থাৎ তার 5093 বছর অতিক্রান্ত। দর্শন মতে বিশ্বের বয়স এখন হবে 15,552,197,19,61,674 পার্থিব বৎসর বা $15{,}552.2\times10^{10}$ মানব-বৎসর। এই সংখ্যাটি 15.5522×10^{13} বৎসর বা 15.5522 পদ্ম-বৎসর। অর্থাৎ 15.5522 পদ্ম মানব-বৎসর আগে ব্রহ্মা জন্মেছিলেন এবং সৃষ্টি শুরু হয়েছিল আর বিজ্ঞানের ভাষায় বললে 15.5522 পদ্ম বছর আগে 'মহাবিস্ফোরণ' হয়েছিল। পদ্ম সংখ্যাটি হলো, একক দশক শতক ইত্যাদির মতো, একে সংখ্যায় লিখলে দাঁড়ায় 10,00000,00,00,000 বা 10^{13} বা সংখ্যাটি দশ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ 155.522 কিংবা একটু কমিয়ে বললে 155 লক্ষ-কোটি মানব-বৎসর আগে ওই 'মহাবিস্ফোরণ' হয়েছিল। তবে আধুনিক বিজ্ঞান বলছে বিশ্বের বয়স 2×10^{12} বৎসর বা 0.2 পদ্ম-বৎসর। এটা দর্শনের হিসাবের প্রায় 1/78 অংশ। এখন অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্বের প্রকৃত বয়স 2000 কোটি বছর বা 2×10^{10}। দর্শন-নির্দিষ্ট বয়সের তুলনায় এই বয়সটা বেশ কম। অধুনা বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের স্বীকৃত বয়স 2×10^{10} পার্থিব বছর বা দু'-হাজার কোটি বছর ধরছেন।

দর্শনের একাংশের মতে বিশ্বের ক্রম-সংকোচন এখন শুরু হয়ে গেছে যেহেতু ব্রহ্মা তাঁর আয়ুর 50 ব্রাহ্ম-বৎসর অতিক্রম করে গেছেন। বিজ্ঞান অবশ্য বলছে বিশ্বের ক্রম-প্রসারণ এখনও চলছে। ক্রম-সংকোচন এখনও শুরু হয়নি। এই কল্পে ব্রহ্মার দিন শুরু হয়েছে অর্থাৎ শ্বেত বরাহ কল্পের শুরু হয়েছে প্রায় 197 কোটি পার্থিব-বৎসর আগে। এই কল্পের ছয়টি মন্বন্তর শেষ হয়েছে সপ্তম মন্বন্তরের $71\frac{3}{7}$ চতুর্যুগের মধ্যে 27টি চতুর্যুগ পেরিয়ে গেছে। 28তম চতুর্যুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিনটি যুগ পেরিয়ে এখন কলিযুগের 5109 বৎসর চলছে [2008 খ্রিস্টাব্দে]। এই হিসাবে ব্রহ্মার দিন শুরু হয়েছে 197,19,61,689 মানব-বৎসর আগে। অর্থাৎ 197 কোটি মানব-বৎসর আগে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল এই পৃথিবীতে 'নৈমিত্তিক প্রলয়' হওয়ার পর। বিজ্ঞানীরা যে এখন বলছেন প্রায় 200 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে দর্শনের এই সময় সীমার বিস্ময়কর মিল এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, ব্রহ্মা আমাদের মতই মানুষ। কিন্তু তিনি যে লোক বা পরিকাঠামোতে থাকেন সে লোক অর্থাৎ ব্রহ্মালোক আমাদের পৃথিবীর তুলনায় বিশাল গতিবেগ সম্পন্ন। ফলে, পৃথিবীর আপেক্ষিকে ব্রহ্মালোকে কাল-প্রসরণের মান বিশাল এবং প্রায় অবিশ্বাস্য। এই গতি আলোর গতিবেগের খুবই কাছাকাছি। ফলে, আমাদের 864 কোটি বছরে ব্রহ্মার এক দিনরাত্রি। আবারো বলা যায়, ব্রহ্মার জন্মদিন হল আধুনিক বিজ্ঞানের মহাবিস্ফোরণের দিন এবং মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মারও লয় হয়, কিন্তু নৈমিত্তিক-প্রলয়ে হয় না। মহাপ্রলয় হয় 100 ব্রাহ্ম-বৎসর শেষ হলে, কিন্তু নৈমিত্তিক-প্রলয় হয় ব্রাহ্ম-দিন শেষ হলে, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার মৃত্যু হয়, নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার একটা দিন কাটে।

হিন্দুদর্শনে তিনটি মতবাদই প্রধান। এই তিনটি মতবাদই 'ঈশ্বর'কে ব্যাখ্যা করেছে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হিসাবে। তবে এই তিন মতবাদ মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর তথা পরমাত্মা তথা পুরুষোত্তমের সম্পর্ক তিন রকমভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এই ব্যাখ্যাগুলিই মহাবিশ্ব সম্পর্কে ভারতীয় হিন্দু দর্শনের মুখ্য বক্তব্য। ঈশ্বর ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে এই তিন মতবাদের মুখ্য বক্তব্যের সামান্য আলোচনা করে হিন্দু দর্শনে মহাবিশ্বের স্বরূপের ব্যাখ্যা শেষ করবো। এই আলোচনা এতাবৎ যে সব আলোচনা করা হল তারই পরিপূরক হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ খুব সহজ কথায় 'দ্বৈতবাদ', 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' এবং 'অদ্বৈতবাদ' দিয়ে ঈশ্বরের সরল ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য তাঁর কথাতেই বলা যাক। "ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; কার্য সংঘটনের জন্য কারণকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, কারণই কার্যরূপে দেখা দেয়। নির্মাণকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু উপাদান ও কিছু শক্তির সাহায্যেই গ্লাস নির্মিত হয়। গ্লাসে আছে ওই উপাদান ও ওই শক্তি। ব্যবহৃত শক্তিই সংলগ্ন থাকবার সংহতি শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেই শক্তির অভাব ঘটলেই গ্লাসটি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যাবে। উপাদানসমূহও নিঃসন্দেহে গ্লাসের মধ্যেই আছে। কেবলমাত্র তাদের আকারের পরিবর্তন হয়েছে। কারণই কার্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে কার্য দেখতে পাওয়া যায় সেখানেই বিশ্লেষণ করলে কারণ পাওয়া যায়। কারণ নিজেকে কার্যরূপে প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহলে ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে পরিণত হয়েছেন। আত্মাসমূহ যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তাহলে ঈশ্বরই আত্মারূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সুতরাং প্রতি আত্মাই ঈশ্বরের অংশ। একই আগুন থেকে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বের হয়, ঠিক তেমনই সেই শাশ্বত 'এক' থেকেই বিশ্বর সকল আত্মা বের হয়েছে।

আবার দেখলাম, শাশ্বত ঈশ্বর আছেন এবং শাশ্বত প্রকৃতিও আছেন, আর আছে অসংখ্য শাশ্বত আত্মা। এই হল ধর্মের প্রথম সোপান। একেই বলে দ্বৈতবাদ। এই স্তরে মানুষ নিজে স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা। এই হল দ্বৈতবাদ। এ মতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয় সর্বত্র পরস্পর বিরুদ্ধ। মানুষ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে করে, সে জ্ঞাতা এবং প্রকৃতি জ্ঞেয় বিষয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের দ্বৈতভাব সে নিরীক্ষণ করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিকে তাকায়, তখন ঈশ্বরকে দেখে জ্ঞেয়রূপে, নিজকে দেখে জ্ঞাতা রূপে। এই হল মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে দ্বৈতভাব, সাধারণভাবে এই হল ধর্মের প্রথম রূপ।"

এরপর দ্বৈতভাব রূপ নেয় বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে। স্বামীজী বলেছেন, "মানুষ বুঝতে আরম্ভ করে যে ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরই তো এই বিশ্ব এবং আত্মাসমূহ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন এবং মানুষ নিজেও পূর্ণ-সত্তা ঈশ্বরের একটি অংশ মাত্র। আমরা ছোট ছোট জীব সেই অগ্নিকুণ্ডের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, সমগ্র বিশ্ব স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এই হচ্ছে পরবর্তী সোপান। সংস্কৃতে একে বলে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। যেমন আমার এই শরীর আছে, এই শরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে আছে, এই শরীরের ভিতর আত্মা ওতপ্রোতভাবে রয়েছে, সেই রকম অসংখ্য আত্মা ও প্রকৃতি-সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব যেন ঈশ্বরের দেহ-স্বরূপ। ক্রম-সংকোচন বা বিপরীত-অভিব্যক্তির সময় যখন আসে, তখন এই বিশ্ব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয় বটে, তবু ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। মানুষের আত্মা যেমন মানুষের দেহ ও মনের আত্মা—সেই রকম ঈশ্বর আমাদের আত্মার

আত্মা। দ্বৈতবাদীর প্রথম মতে, আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ব্যক্তি। অনাদিকাল ধরে ঈশ্বর ও প্রকৃতি থেকে পৃথক। দ্বিতীয় মতে, আমরা ব্যক্তি কিন্তু ঈশ্বর থেকে পৃথক নই। আমরা যেন একই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চরমান অংশ আর ঈশ্বর হলেন সমষ্টি বস্তু। ব্যক্তি হিসাবে আমরা স্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরে আমরা এক। আমরা সকলে তাঁতেই আছি। আমরা সকলে তাঁরই অংশ—সুতরাং আমরা এক। তবুও মানুষে-মানুষে, মানুষে ও ঈশ্বরে একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বতন্ত্র তবু স্বতন্ত্র নয়। তারপর আসে আরও সূক্ষ্মতর একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি হল অসীমের কি অংশ থাকতে পারে? অসীমের অংশ বলতে কি বোঝায়? যদি বিচার করে দেখ, বুঝতে পারবে—এটি অসম্ভব। অসীমকে কখনও ভাগ করা যায় না, তা সর্বদাই অসীম। অসীমকে যদি ভাগ করা যেত তাহলে প্রতিটি অংশই অসীম হত, অথচ দুটি অসীম কখনও থাকতে পারে না। ধর যদি থাকত, তাহলে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করত এবং উভয়েই সসীম হয়ে যেত। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হল, অসীম এক, বহু নয়, একই অসীম আত্মা হাজার হাজার দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে ভিন্ন ভিন্ন আত্মারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই বিশ্বের অধিষ্ঠান স্বরূপ অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'মানবাত্মা'।"

মহাবিশ্ব ও ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় স্বামীজী এইভাবে দ্বৈতবাদ পেরিয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এবং সেখান থেকে সহজ বিশ্লেষণে অদ্বৈতবাদে এসেছেন। প্রাথমিক স্তরের বহুত্ব কাটিয়ে মানুষের চিন্তা এক সময় অদ্বৈতবাদকেই সমস্ত ঘটনা ব্যাখার উপযুক্ত তত্ত্ব হিসাবে খুঁজে পেয়েছে, গ্রহণ করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। শঙ্করাচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বলছে এক বই দুই নেই। ঈশ্বরই সত্য, তিনিই প্রতিভাত হচ্ছেন কিংবা প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন সর্বত্র। এই প্রতিবিম্বও ভুল বা মিথ্যা মায়া মাত্র। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শন দুই তত্ত্ব স্বীকার করে, নিষ্ক্রিয় পুরুষ আর ক্রিয়াশীল প্রকৃতি। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের পরিভাষায় পুরুষ বা আত্মাই নির্গুণ ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হল মায়া। সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মূলে কোনও পারমার্থিক সত্তা নেই, এ সমস্ত মায়া বা অজ্ঞানের খেলা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর সবই মিথ্যা। বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে আরও বিশদভাবে যা বলেছেন, তা হল ঃ

"এই জগতে তিন রকম সত্তা আছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ, এই অর্থেই বলা চলে যে ঈশ্বর ও সমস্ত জগৎ এক। কিন্তু চিরকাল ধরে প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব পরস্পর আলাদাই থেকে যায়। শুধু কল্প-র শুরুতে অভিব্যক্ত হয় ও কল্প-র শেষে সূক্ষ্ম অবস্থা পেয়ে বীজের আকারে থাকে।

অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা জীব বা আত্মা সম্পর্কে এই মতবাদকে স্বীকার করেন না। উপনিষদের প্রায় সমস্ত অংশ নিজের হাতে পেয়েও তার ওপরই নিজেদের মত পুরোপুরি গড়ে তোলেন। সব উপনিষদেরই কাজ এই বিষয়টিকে প্রমাণের মধ্যে নিয়ে আসা। যেমন, এক টুকরো মাটি সম্পর্কে জ্ঞান পরিষ্কার হলে পৃথিবীর সব মাটি সম্পর্কেই সব কিছু জানা যায়। অদ্বৈতবাদীর ভাব হল সমস্ত বিশ্বকে এমন একটি সাধারণ তত্ত্বে নিয়ে যাওয়া, যে তত্ত্বটি আসলে এই বিশ্বেরই একটি প্রাথমিক সত্তা। তাঁরা দাবি করেন, সমস্ত বিশ্বে একতা রয়েছে আর একটি সত্তাই নিজেকে এ সব নানান রূপে প্রকাশ করছেন। সাংখ্য যাকে প্রকৃতি বলেন, তাঁরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, বলেন যে প্রকৃতি হল ঈশ্বর। এই অস্তিত্ব এবং এই সৎ—এই দুটিই এই বিশ্ব, মানুষ ও জীব এবং যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাতে প্রকাশিত হয়েছেন।

মন ও মহৎ সেই এক সৎ-এর অভিব্যক্তি। তবে এতে অসুবিধা এই যে এটা সর্বেশ্বরবাদ হয়ে দাঁড়ায়। যে বস্তুর পরিবর্তন সম্ভব নয়, এমন বস্তুকে সৎ বলে স্বীকার করা হয়, কেননা যা চরম সত্য

তার পরিবর্তন নেই, তা এই পরিবর্তনীয় ও বিনাশশীল পদার্থে প্রকাশিত হয় কেমন করে?

এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তনবাদ বা আপাত পরিবর্তনবাদ বলে একটা মতবাদ অছে। দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সবকিছুই আসলে প্রকৃতির অভিব্যক্তি। একদল অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর মতে, সমস্ত বিশ্বই ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট হয়েছে। শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদীদের মতে সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট বলে জানা যায় মাত্র। ঈশ্বর হলেন বিশ্বের উপাদান কারণ। কিন্তু সত্যিই তিনি তা নন। আসলে তিনি উপাদান বলে পরিচিত হন শুধু। এ ব্যাপারে একটা উদাহরণ আছে। দড়িকে সাপ বলে মনে হয়েছিল মাত্র, কিন্তু দড়ি কখনো সাপে পরিণত হয় নি। তেমনি এই প্রকাশিত সমগ্র জগৎ-ই সেই সৎ-স্বরূপ। এতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা যে সব পরিবর্তন এতে দেখি, সেগুলো আপাত-প্রতীয়মান। দেশ-কাল ও নিমিত্ত আসলে এই পরিবর্তন ঘটায়। অথবা মনোবিজ্ঞানের উচ্চতর সামান্যীকরণ অনুসারে বলা যায় যে, নাম ও রূপের দ্বারাই এটা ঘটে। নাম ও রূপ দিয়েই আমরা একটা পদার্থকে অন্যটি থেকে আলাদা বলে বুঝি। নাম ও রূপই পার্থক্যের সৃষ্টি করে। আসলে সবই এক ও অভেদ।

বেদান্তবাদীরা আবার বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বলে কিছু নেই। সৃষ্টির মূলে একটি সত্তাই আছে। শুধু বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত জগৎ বলেও কিছু নেই। দড়ি সাপে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয় মাত্র—এই সত্যের পরিবর্তন সম্ভব নয়। যখন ভুল ভেঙে যায়, তখন সাপ শূন্যে মিলিয়ে যায়। মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্টি, জগতকেই দেখে। ঈশ্বরকে নয়। যখন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় তখন তার কাছে জগৎ একবারে বিলুপ্ত হয়। এই ভুলকে অবিদ্যা বা মায়া বলা হয়। এটাই এই সৃষ্টির কারণ। এরই প্রভাবে চরম সত্যই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলে মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্ব নেই, এমন কিছুই নয়। সৎও না, আবার অসৎও নয়—এই হল মায়ার কথা। তার মানে মায়া আছে—একথাও যেমন বলা যায় না, আবার নেই, তাও বলতে পারা যায় না। সৎ বলা যায় একমাত্র চরম সত্যকে। সেদিক দিয়ে দেখলে মায়া অসৎ বা মায়ার অস্তিত্ব নেই। মায়া অসৎ একথাও বলা যায় না। কেননা তা যদি হত তবে তা কখনো জগৎ সৃষ্টি করতে পারতো না। কাজেই এটা এমন একটি কিছু যা সৎ বা অসৎ কোনোটিই নয়। এজন্য বেদান্ত-দর্শনে একে অনির্বচনীয় বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলা হয়েছে। মায়া হল এই বিশ্বের আসল কারণ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেখানে উপাদান হিসেবে আছে মায়া সেখানে আছে নাম ও রূপে। উপাদানই এ সবকিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে হয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীদের কাছে জীবাত্মার কোনো জায়গা নেই। তাদের মতে জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি। আসলে জীবাত্মার আলাদা অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সর্বব্যাপী একটিমাত্র সত্তা, যদি থাকে, তবে আমি একটি সত্তা, তুমি একটি সত্তা, সে আর একটি সত্তা—এ সব কিভাবে সম্ভব?

আমরা সবাই এক। দ্বৈতজ্ঞানই অনিষ্টের আসল কারণ। জগৎ থেকে আমি আলাদা—এই উপলব্ধি যখন আসতে শুরু করে, তখনই প্রথমে আসে ভয়, পরে দুঃখ। যেখানে একজন অন্যজনের কথা শোনে, একজন অন্যজনকে দেখে তা খুবই কম বা সামান্য। যেখানে একজন অন্যজনকে দেখে না, অন্যের কথা শোনে না—তাই হল ভূমা। সেই ভূমাতেই চরম সুখ, অল্পে যা নেই।

সুতরাং অদ্বৈত-দর্শনের মতে, বস্তুর এই আলাদা ভাব—এই ভাব যেন মানুষের আসল স্বরূপকে

সাময়িকভাবে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু আসল স্বরূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটেনি। ছোট্ট পোকা ও মানুষের মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্তা রয়েছে। পোকার দেহই তার নিম্নতম রূপ। এখানে দেবত্ব মায়া দ্বারা অনেক বেশি পরিমাণে ঢাকা রয়েছে। যেখানে দেবত্বের ওপর তার খোলসটা খুবই সামান্য তাই হল উচ্চতম রূপ বা দেহ। সবকিছুর পিছনে সেই দেবত্বই রয়েছে। এই সত্যকে আঁকড়ে ধরেই নীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। অন্যের ক্ষতি করো না। সবাইকে নিজের মতো ভালোবাসো। কেননা সমস্ত বিশ্বই এক। অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি করা হয়। অন্যকে ভালবাসলে নিজেকেই ভালোবাসা হয়। এই সত্য থেকে অদ্বৈত নীতির মূল তত্ত্বের জন্ম। একেই বলা হয়েছে আত্মত্যাগ।

অদ্বৈতবাদীদের মতে, এই ছোট্ট ব্যক্তিত্ব বোধই আমার সব অনর্থের আসল কারণ। এই অহংবোধই আমাকে অন্যটি থেকে আলাদা করে রেখেছে। এটাই ঘেন্না, হিংসা, দুঃখ, সংগ্রাম ও আরও নানা রকম সব অনর্থের সৃষ্টি করে। এই উপলব্ধি থেকে রেহাই পেলে সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সব দুঃখ চলে যায়। কাজেই এই আলাদা আমিত্ব-বোধ ছাড়তে হবে। নিচু জীবনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে সব সময় তৈরি থাকতে হবে আমাদের। যদি কেউ একটা ছোট্ট পোকার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, তবে বুঝতে হবে সে অদ্বৈতবাদীর কাম্য যে পূর্ণত্ব, তাতে পৌঁছেছে।”

সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। বিশ্বজগৎ অলীক, মায়া ভ্রম মাত্র। সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বর নানা রূপে তথা নামরূপে প্রতিবিম্বিত বা প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। ‘ঈশ্বর’ না বলে বলা ভাল ‘ব্রহ্ম’। কারণ সগুণ ব্রহ্মই অদ্বৈতবাদীদের ঈশ্বর। ব্রহ্মের গুণও মায়ামাত্র বা মিথ্যা। কারণ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ। এ ব্যাপারে ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ অনেক বেশি বোধগম্য। ‘মায়া’ রূপ অনির্বচনীয় ব্যাপার-স্যাপার তাতে নেই। ব্রহ্ম সেখানে সগুণ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর-এ কোনও পার্থক্য নেই। সমগ্র বিশ্ব তথা জীব ও জগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ। ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ এই মত বা তত্ত্ব হল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তত্ত্ব। ঈশ্বর এখানে সমগ্র বিশ্বসত্তা, বিশ্বের থেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা কিছু নয়। ঈশ্বরই বহুরূপে প্রকাশিত সমগ্র বিশ্বজুড়ে। সর্বময় এই ঈশ্বরের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিরও বিরোধ প্রায় নেই বললেই চলে।

বিশ্বের বাইরে অবস্থিত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে গিয়ে বহু ধর্মই যুক্তির খেই হারিয়ে ফেলেছে। এই সব ধ্যান-ধারণা এখন কার্যতঃ অচল। ঈশ্বরের এই ধরনের ব্যাখ্যায় তাঁকে খুব বড় একজন মহাশক্তিশালী মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করা হচ্ছে এবং সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন একজন বড় মাপের মানুষ। এগুলি ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধী। বিবেকানন্দ প্রায় একশো বছর আগে তাঁর বক্তৃতায় যে সব কথা বলেছিলেন সেগুলি আজও সমানভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন ঃ “বস্তুর ব্যাখ্যা তার প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে। তাই বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাইরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টেনে আনার প্রয়োজন হয় না। রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করার জন্য রসায়নবিদদের কোনো দানব বা ভূতপ্রেত বা ওই ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

বিজ্ঞানের এই ধারাটি ধর্মের উপর প্রয়োগ করলে দেখা যাবে ধর্মগুলোর মধ্যে এর অভাব রয়েছে। আর সেই কারণেই ধর্মগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান অভ্যন্তর থেকেই অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃতি থেকেই ব্যাখ্যা চায়। অথচ ধর্মগুলো কিন্তু ওই ধরনের ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।

ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষ এবং তিনি বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এক সত্তা—এই ধারণা অতি প্রাচীনকাল থেকে আজও বিদ্যমান। এর স্বপক্ষে বার বার যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক

অতিপ্রাকৃত একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই ঈশ্বরই ইচ্ছামাত্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা। এ কথা আজও বহু ধর্ম বিশ্বাস করে থাকে।

এ সব যুক্তি ছাড়াও দেখা যায়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণাময় বলেও বর্ণিত হয়েছেন। আবার সেই সঙ্গে দেখা যায় যে, জগতে অনেক বৈষম্যও রয়েছে। দার্শনিকদের মতে এই ব্যাখ্যা বাইরে থেকে এসেছে, ভেতর থেকে আসতে পারে না। বিশ্বের বাইরে থেকে কোনো কিছু শক্তি অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি এই বিশ্বকে পরিচালনা করছেন, শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরের নীচে পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন এই ধরনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত বলে মনে করা হয় নি, ঠিক তেমনি ধর্মের ব্যাখ্যাকেও পর্যাপ্ত বলে মনে করা যায় না। তাই ধর্মগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কারণ এর চেয়ে আরও ভালো ব্যাখ্যা তারা আর দিতে পারছে না।

প্রত্যেক বস্তুর ব্যাখ্যা তার ভেতর থেকেই আসে, এই ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটা ধারণা হল আধুনিক বিবর্তনবাদ। দুটো ধারণাই একই মূল তত্ত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সহজ অর্থ হল বস্তুর স্বভাব পুনরায় প্রকাশিত হওয়া। কারণের অবস্থান্তর ছাড়া কার্য আর কিছুই নয়। কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে।

তাই সমগ্র বিশ্বই তার মূল সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র। শূন্য থেকে সৃষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজ তার পূর্ববর্তী কোনো কারণের পুনরাভিব্যক্তি। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেবল তার অবস্থান্তর ঘটে মাত্র। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এটাই ঘটছে। কাজেই এই সব পরিবর্তনের কারণ খোঁজার জন্য আমাদের বিশ্বের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশ্বের ভেতরেই সেই কারণ বর্তমান। ওই ধারণাটাই ধর্মকে ভূমিসাৎ করছে। যেসব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আঁকড়িয়ে ধরেছিল, তিনি খুব বড় একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন, এই ধারণা এখন আর টিকে থাকতে পারছে না।

এখন প্রশ্ন হল, এই দুটো মূল তত্ত্বকে তৃপ্ত করার মতো কোনো ধর্ম কি আছে? উত্তরে বলা যায়, আছে। এর প্রমাণের জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের সামান্যীকরণের মূল তত্ত্বগুলোকে তৃপ্ত করতে হবে। সামান্যীকরণের তত্ত্বগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলোকেও তৃপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের এমন একটা চরম সামান্যীকরণের মধ্যে আসতে হবে, যা কেবলমাত্র সামান্যীকরণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশ্বব্যাপকই হবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তা থেকে হওয়া প্রয়োজন। তাই তাকে নীচুস্তরের কাজের সঙ্গেও সমপ্রকৃতির হতে হবে। যা কারণ, যা সর্বোচ্চ, যা চরম অর্থাৎ যা আদি কারণ তাকে অবশ্যই পরম্পরাগত কতকগুলো অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম এবং নিম্নতম কাজের সঙ্গে অভিন্ন হতে হবে।

বেদান্তের ব্রহ্মই এই শর্ত পূরণ করতে পারেন। কারণ সামান্যীকরণ করতে করতে সব শেষে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারি বেদান্তের এই ব্রহ্ম ঠিক তাই-ই। এই ব্রহ্ম নির্গুণ, অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ)। মানুষের মন যে চরম সামান্যীকরণে পৌঁছতে পারে, তাকেই 'অস্তিত্ব' (সৎ) বলে। জ্ঞান (চিৎ) বলতে আমাদের যে জড় সম্পর্কিত জ্ঞান আছে তাকে বোঝায় না। এ জ্ঞান হল সেই ব্রহ্মজ্ঞানের নির্যাস বা সূক্ষ্মতম অবস্থা। আর এটাই ক্রম-অভিব্যক্ত হয়ে মানুষ বা অন্য প্রাণির মধ্যে জ্ঞান রূপে ফুটে ওঠে। বিশ্বের পিছনে এবং চেতনারও পিছনে যে চরম সত্তা রয়েছে তাকেই আবার জ্ঞানের সূক্ষ্মতম সত্তা বলে 'চিৎ' বলতে এবং বিশ্বের বস্তুগুলোর সত্তাগত একত্ব বলতে যা বোঝায়, জ্ঞান তাই-ই।

মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক সব দিক থেকেই আমরা এক। এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করছে। তাই শরীরের দিক থেকে আমরা পৃথক, এ কথা বলাও ভুল। ধরা যাক, আমরা জড়বাদী। সেক্ষেত্রেও আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, সমগ্র বিশ্ব একটা জড়-সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই জড়-সমুদ্রে আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণি। খানিকটা জড় পদার্থ প্রত্যেক ঘূর্ণির কাছে এসে ঘূর্ণির আকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আবার জড় পদার্থ-রূপে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরে যে জড় আছে, তা হয়তো কয়েক বছর আগে আপনার শরীরেও ছিল অথবা সূর্যের মধ্যে ছিল অথবা অন্য কোনো গ্রহের মধ্যে ছিল অথবা অন্য কোথাও ছিল। অর্থাৎ ঐ জড় অবিরাম গতিশীল অবস্থায় ছিল।

এখন প্রশ্ন হল আপনার দেহ, আমার দেহ—এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য বা অর্থ কি হতে পারে? দেহ সবই এক। আবার চিন্তার বেলাতেও ঠিক তাই। চিন্তার একটা অসীম-প্রহরী সমুদ্র রয়েছে। আমার মন ও আপনার মন সেই সমুদ্রের ভেতর দুটি ঘূর্ণি বিশেষ। তাই তার ফলও প্রত্যক্ষযোগ্য। তা না হলে আমার চিন্তা আপনার চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করছে কি করে? তাই বলা যায় যে, আমাদের সমস্ত জীবনই এক। আমরা এক। এমন কি চিন্তার দিক থেকেও আমরা সকলে এক এবং অভিন্ন।

সামান্যীকরণের দিকে আরও এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে জড়বস্তু ও চিন্তার সূক্ষ্মসত্তা আত্মাকে। আর সেই আত্মা থেকেই সমস্ত অভিব্যক্ত হচ্ছে। যেহেতু এই একত্ব থেকেই সব কিছু এসেছে সেইহেতু সত্তার দিক থেকেও সেগুলোকে এক হতেই হবে। আমরা সর্বতোভাবে এক। শরীর ও মনের দিক থেকেও এক। আর আত্মায় যদি সত্যিই বিশ্বাস থাকে, তবে আত্মার দিক থেকেও আমরা এক—একথা বলাই বাহুল্য। আর আধুনিক বিজ্ঞানেও প্রতিদিনই এই একত্বের কথা প্রমাণিত হয়ে চলেছে।"

একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সব তত্ত্ব প্রাচীন বেদান্ত-দর্শনের মূল বক্তব্যগুলিকে অনুসরণ করছে। সমগ্র বিশ্ব একই উপাদানে তৈরি এ কথা আজকের বিজ্ঞান বলেছে। বেদান্ত দর্শন মতে একমাত্র সত্তা হলেন ব্রহ্ম। জীবজগতের উপাদান কারণ হলেন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদও ঠিক একই কথা বলে। সমগ্র বিশ্বের মূল সত্তা হলেন ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সব জীবাত্মার স্বরূপ। তিনিই এই ব্রহ্মাই, জীবনের পরম ধন। আপনিই তিনি। অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি'। বিশ্বের সঙ্গে আপনি এক। আর যে বলে তার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে, সে দুঃখ ভোগ করে। আর ওই একত্বের বোধ সম্বন্ধে যে সচেতন সে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক বলে জানে এবং সে-ই সুখের অধিকারী হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চতর সামান্যীকরণ ও বিবর্তনবাদের কথা বেদান্তেই আছে। এটা আছে বলেই বৈদান্তিক ধর্ম বৈজ্ঞানিক দাবীসমূহ মেটাতে পারে। এই দর্শনের মতবাদগুলি তাই আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসরণীয় হয়ে ওঠে। তাই ব্রহ্মের বা বেদান্তে বর্ণিত ভগবানের বাইরে তাঁর অতিরিক্ত কোনো সত্তা বলে কিছুই নেই। ব্রহ্মই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আছেন। তিনিই বিশ্ব।

বেদান্তের সারসংকলন হল 'গীতা' কিংবা 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'। গীতায় অর্জুন বিশ্বদর্শন করেছেন 'বিশ্বরূপদর্শন-যোগ' অধ্যায়ে। শুধু বিশ্বই নয় ঈশ্বরের স্বরূপের আভাস কিংবা তাঁর সামান্য কিছু দর্শন ঘটেছে অর্জুনের। 'বিভূতিযোগ' অধ্যায় 'বিশ্বরূপদর্শন-যোগ' অধ্যায়ের পূর্ববর্তী। বিভূতিযোগে ভগবান বলেছেন, 'আমি একাংশে এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি, আমি বিশ্বরূপ (10/42)।' সুতরাং ঈশ্বরের অপরাংশ কী বা কেমন তা অজানা। অর্জুনও বিশ্বরূপ দেখেছিলেন মানে ঈশ্বরের স্বরূপের কিছুটাই দেখেছিলেন মাত্র। রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যায় মানবের কাছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলেন পিঁপড়ের কাছে চিনির

পাহাড়। অর্জুন কিংবা সাধারণ মানুষের কাছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরদর্শন অন্ধের হস্তী-দর্শনের সামিল, যে অন্ধ হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাতি দেখছিল এবং হাতিকে কখনও থামের মত, কখনও কুলার মত, কখনও বা গদার মত ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছিল। মানুষের বুদ্ধি বিশ্বরূপের ধারণাতেই বিহ্বল হয়ে যায়, বিশ্বের অতীত নামরূপের অতীত যে বস্তু, তার ধারণা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তা অনন্ত, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়। ঈশ্বর তাই মায়া স্বীকার করে উপাধি বিশিষ্ট হলেও সসীম হন না। তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) হয়েও বিশ্বাতিগ (Transcendent) প্রপঞ্চাভিমানী। সুতরাং ঈশ্বরের বিশ্বাতিগ নির্গুণস্বরূপ ধারণার অতীত।। মানুষের ধারণায় তা পুরোপুরি আসবে না কোনও দিন। এই অব্যক্ত ভাব সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছে ঃ 'অবিজ্ঞাতং, বিজানতাং, বিজ্ঞানম্ অবিজানতাম্', অর্থাৎ যাঁরা বলেন পরব্রহ্মকে জানি, তাঁরা তাকে জানেন না, কিন্তু যাঁরা বলেন, পরব্রহ্মকে জানি না তাঁরাই তাঁকে জানেন। কারণ হল, যাঁরা বলছেন পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা বোঝেন নি পরব্রহ্ম অজ্ঞেয়, আবার যাঁরা বলেছেন পরব্রহ্মকে জানিনা, তাঁরা বুঝেছেন পরব্রহ্মের পূর্ণ-স্বরূপই অজ্ঞেয়, সুতরাং তাঁরাই পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জেনেছেন।

কেন ও ছান্দোগ্য উপনিষদে, এমন কি ঋগ্বেদেও এই বিশ্বরূপের কথা আছে। "পাদোস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদ স্যামৃতং দিবি" (ঋগ্বেদ-10/90/3)। অর্থাৎ সেই বিরাট পুরুষের এক পদে জগৎ আর অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ জগতের উর্ধ্বে। ওই সূক্তে এও বলা হয়েছে ঃ

" সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।" (ঋগ্বেদ-10/90/1)

অর্থাৎ 'সেই বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ। তিনি সমস্ত জগৎব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত আছেন।' 'দশ অঙ্গুলি' কথাটি এখানে উপলক্ষণ মাত্র। বোঝানো হয়েছে তিনি পরিমাণের অতীত এবং জগতে আছেন, জগত ছাড়িয়েও আছেন। বিশ্বই তাঁর মধ্যে আছে, আর বিশ্বকে ছাড়িয়েও তিনি আছেন।

অর্জুনের মত বীরও ঈশ্বরের বিশ্বরূপের কিছুটা দেখে ভয়ভীত হয়েছিলেন। একালে বিবেকানন্দও নরেন দত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে এমনি ভয়ভীত হয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে।

অর্জুন বলেছিলেন, "তুমি পরমেশ্বর, ব্যক্ত স্বরূপে বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ। আমার বড় ইচ্ছা তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি। যদি আমি তা দেখার যোগ্য হই, তবে আমাকে তোমার সেই বিশ্বরূপ দেখাও।" ভগবান তখন অর্জুনকে দিব্য-চক্ষু প্রদান করে স্বীয় বিশ্বরূপ দেখালেন। অনির্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যদ্ভুত সেই রূপ, তাতে একত্র সমবস্থিত, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান। সেই বিশ্বমূর্তির অসংখ্য উদর, বদন ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু তাতে বিদ্যমান। সে রূপ সর্বতঃ পূর্ণ, সর্বব্যাপী—তার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। সহস্র সূর্যের প্রভায় উদ্ভাসিত। সেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল।

এরপর অর্জুন দেখতে লাগলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপারে যা ঘটবে সেই ভবিষ্যৎ দৃশ্যটিও। সে কি ভীষণ দৃশ্য। অর্জুন দেখছেন ভীষ্মদ্রোণাদি সেনানায়কগণ যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গসহ অগ্নিতে পতঙ্গকুলের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হয়ে সেই বিরাট বিশ্বমূর্তির করাল কবলে প্রবেশ করছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে অর্জুন ভীতকম্পিতস্বরে বললেন, "হে দেববর, উগ্রমূর্তি আপনি কে আমাকে বলুন, আমি ভয়ে বিহ্বল হয়েছি, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আপনার এই সংহারমূর্তি দেখে আমি বুঝছি না আপনি কে, কোন্ কাজে প্রবৃত্ত।" তখন শ্রীভগবান বললেন—"আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, আমি

এখন সংহার কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে কেউ জীবিত থাকবে না। বস্তুতঃ আমি সকলকেই নিহত করে রেখেছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও।"

শ্রীভগবানের এই কথা শুনে অর্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে বার বার প্রণাম করে গদ্ গদ্স্বরে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন এবং পরিশেষে বললেন—"তোমার এই উগ্রমূর্তি আমি আর দেখতে পারছি না, আমি ভয়ে বিহ্বল, আমাকে তোমার পূর্ব সৌম্য মূর্তি দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নরেন্দ্রনাথ অবস্থায় এমনি ভয় পেয়েছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরের স্বরূপের সামান্যতম অংশ দর্শনের সহ্য ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে। অর্জুন বিবেকানন্দরাই ভয়-বিহ্বল, আমি-তুমি কোন ছার!

আগেও বলা হয়েছে এবং আবারও বলি, দর্শনের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ এবং আরও কিছু বেশি। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—'এ সমস্তই ব্রহ্ম' এই দুটি শ্রুতিবাক্যকে হিন্দু দর্শনের ভিত্তি বলা হয়। কিন্তু এই বাক্য দুটির ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকগণের মধ্যে মর্মান্তিক মতভেদ আছে, একটু আগেই সে কথা বলা হয়েছে। এক পক্ষ বলেন—ব্রহ্ম কেবল এক নন, তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তিনি অখণ্ড অদ্বৈত-তত্ত্ব, সমস্ত রকম দ্বৈত বর্জিত, তাঁর মধ্যে নানাত্ব নাই (নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—কঠ), তিনি ভূমা। এই যে দৃশ্য-প্রপঞ্চ, বহু-বিভক্ত জগৎ যা আমরা দেখি, এর বাস্তব সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। ভ্রমবশতঃ সেই ব্রহ্ম বস্তুতেই জগতের অধ্যাস হয়—যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, মরীচিকায় জলভ্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ মায়া বা অজ্ঞান। অজ্ঞান বিদূরিত হলেই ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন অলীক, স্বপ্নশেষ হলে তা থাকে না, এই জগৎও সে রকম স্বপ্নবৎ অলীক, অজ্ঞান দূর হলে জগতের জ্ঞান থাকে না ('অদ্বিতীয়-ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়ং অখিলং জগৎ')।

অপরপক্ষ বলেন—ব্রহ্ম অদ্বিতীয় তা ঠিক, ব্রহ্মই সমস্ত হয়েছেন (তৎ সর্ব্বমভবৎ — বৃহদা)। তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। তিনি আপনাকে জগৎরূপে পরিণত করেছেন। এ সম্বন্ধে বহু শ্রুতিবাক্য আছে। যথা—আমি এক আছি, বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব (একোঽহং বহু স্যাম প্রজায়েয়')। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তাতে অনুপ্রবেশ করলেন। ('স ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত, তৎসৃষ্টা তদেব অনুপ্রাবিশৎ'—তৈত্তিঃ 2/6)। কিরূপে কি উপাদানে সৃষ্টি করলেন?—আপনি আপনাকে এইরূপ করলেন ('তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—তৈত্তিঃ 2/7)। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ ব্রহ্মের শরীর (জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে)। বিশ্ব তাঁর রূপ বা দেহ, এই জন্য তিনি বিশ্বরূপ।

বিশ্ব বলতে শুধু আমাদের এই সৌরমণ্ডল কিংবা আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডটুকু (Milkyway Galaxy) নয়। দর্শনে একেও ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে। আমাদের পৃথিবী এরই অন্তর্গত একটি অতিক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র। এ রকম ব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, অন্তহীন সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড আছে। ধূলিকণারও সংখ্যা করা যায় কিন্তু বিশ্বের সংখ্যা করা যায় না ('সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন')। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছে গ্যালাক্সীর সংখ্যা অসংখ্য। যত বেশি শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কৃত হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডেরাও তত বেশি সংখ্যায় আবিষ্কৃত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অশেষ। দর্শনের ভাষায়, এই অনন্ত কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁর রূপ তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই ভূমা। ব্রহ্মসংহিতা বলছে, 'একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি'। এক হলেও যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন—যাঁর দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

ঈশ্বর-তত্ত্ব নিয়ে হিন্দু দর্শনে আলোচনার যেন শেষ নাই। কয়েক হাজার বই লেখা হয়েছে এর উপর। এখনও লেখা হচ্ছে। বর্তমান আলোচনায় ঈশ্বর প্রসঙ্গ শেষ করা যাক গীতার 'পুরুষোত্তম যোগ' দিয়ে। গীতার 15শ অধ্যায়ের 18শ তম শ্লোকটি এই রকমঃ

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।। (15/18)

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, সেহেতু আমি লোক ব্যবহারে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলে খ্যাত।

মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন, অনন্ত ব্রহ্ম কেমন করে সসীম হলেন, কেমন করে জগৎ হলেন?
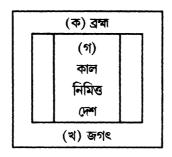
বিবেকানন্দ উপরের চিত্রের সাহায্যে ব্রহ্ম কী করে জগৎ হন তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। উপরের চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হয়েছেন। এই জগৎ শুধু জড়জগৎ নয়, সূক্ষ্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ এবং তার সঙ্গে স্বর্গ-নরক ইত্যাদি যা কিছু আছে, জগৎ অর্থে সে-সবই বুঝতে হবে। এক রকম পরিণামের নাম 'মন', আর এক রকম পরিণামে 'শরীর' ইত্যাদি সব নিয়েই জগৎ। দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম জগৎ হয়ে প্রতিভাত হন। দেশ-কাল-নিমিত্ত এক কাঁচ। সেই কাঁচের মধ্য দিয়ে নীচের দিক থেকে দেখলে ব্রহ্ম জগৎ রূপে দৃষ্ট হন। যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে দেশ-কাল-নিমিত্ত নেই। কাল সেখানে থাকে না, কারণ সেখানে মন নেই, চিন্তাও নেই, ঘটনাও নেই। দেশ সেখানে থাকতে পারে না, কারণ সেখানে কোনও পরিবর্তন নেই—পরিবর্তন, গতি এবং নিমিত্ত বা কার্য-কারণ-ভাবও থাকতে পারে না। সেখানে একমাত্র সত্তা বিরাজমান। যাকে আমরা নিমিত্ত বা কার্য-কারণভাব বলি, তা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হবার পর আসে, তার আগে নয়। একটি জিনিষ তার পরবর্তীটির কারণ, ওটি আবার তার পূর্ববর্তীটির কার্য। এটাই কার্যকারণের নিয়ম।

যা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজেই প্রকাশিত, তিনিই ব্রহ্ম—একমাত্র—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তাঁর কোনও কারণ থাকতে পারে না। যা মুক্ত স্বভাব—স্বতন্ত্র, তার কোন কারণ হতে পারে না, কারণ তা হলে তিনি মুক্ত হলেন না, বদ্ধ হয়ে গেলেন। যার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তা কখনও মুক্ত স্বভাব হতে পারে না। তাই অনন্ত কেন সান্ত হল এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক। অনন্ত সান্ত হন না, সান্ত হিসাবে প্রতিভাত হন মাত্র দেশ-কাল-নিমিত্তের আতস কাঁচের মধ্য দিয়ে।

আবার ফিরে আসি মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচের দার্শনিক 'দোলনতত্ত্বে' [Oscillation Theory], যা আধুনিক বিজ্ঞানের স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বেরই অনুরূপ।

আবারো বলি, এই স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব ভারতীয় দর্শনেরই কথা। দর্শনের মতে মহত্তত্ত্ব লয় পেলে বা ব্রহ্মার পরব্রহ্মে লয় হলেই তখন প্রকৃতি জড়িত পরমপুরুষ বা ব্রহ্মের অবস্থান বিশ্বের চরম সংকোচন অবস্থা। এই অবস্থায় $31,104\times10^{10}$ মানব-বৎসর অতীত হওয়ার পর আবার শুরু হয় প্রসারণ, চলে আবারো অতোগুলি বছর ধরে। স্যান্ডেজ সাহেবের হিসাব মতো মোট সম্প্রসারণকাল 4×10^{10} মানব-বৎসর। ওই মান দর্শনের সময় মানের ধারে কাছেও ঘেঁসে না কিংবা ঘেঁসছিলো না। 1979 সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান জর্জ এবেল বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানালেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 2×10^{12} পার্থিব-বৎসর বা মানব-বৎসর। বিশ্বের বয়স নিয়ে মতভেদ আজও দূর হয়নি বিজ্ঞানীদের। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন মতে, এই সময়টা হিসাব করা মোটেই কঠিন নয়। ব্রহ্মার মোট পরমায়ু হলো 100 ব্রাহ্ম বৎসর, যা $31,104\times10^{10}$ পার্থিব বা মানব বৎসরের সমান। এই 100 ব্রাহ্ম বৎসর হলো বিশ্বের বহিঃপ্রক্ষেপের মোট সময়। ব্রহ্মা যেদিন সৃষ্টি হলেন সে দিনই বিশ্ব সৃষ্টির শুরু। দর্শন অবশ্য সৃষ্টি বলে না, বলে বহিঃপ্রক্ষেপ (Projection)। কারণ ভারতীয় দর্শন মতে কোনও কিছুর সৃষ্টিও হয় না, ধ্বংসও হয় না, ঘটে নানা রূপান্তর, নানান বহিঃপ্রক্ষেপ। এই মত আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এক। যাইহোক, ব্রহ্মার আয়ুর 100 ব্রাহ্মবৎসর পূর্ণ হলেই বিশ্বের সৃষ্টি বা বহিঃপ্রক্ষেপের কাল শেষ। এখন ব্রহ্মার বা ব্রহ্মদেবের আয়ুর মাত্র অর্ধেক শেষ হয়েছে অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে এখন 50টি ব্রাহ্ম বৎসর অতিক্রান্ত। এখন তাঁর 51তম বৎসরের প্রথম দিন কিংবা শ্বেতবরাহ কল্পের এখন মাঝামাঝি সময় চলেছে। আগেই বলেছি, বৈবস্বত মন্বন্তরের 28তম চতুর্যুগের কলিযুগ চলছে এখন। 1400 বঙ্গাব্দের 1লা বৈশাখ বা 1993 সালের 14ই এপ্রিল কলিযুগের 5,094তম বছর শুরু হয়েছে অর্থাৎ 5093 বছর অতিক্রান্ত। খুব বিশদভাবে হিসাব করলে দর্শন মতে বিশ্বের বয়স এখন হবে 15,55,2197,19,61,674 পার্থিব বৎসর বা $15,552.2\times10^{10}$ মানব-বৎসর বা পার্থিব-বৎসর। এই সংখ্যাটি 155.522×10^{12} মানব-বৎসর বা পার্থিব-বৎসর। এটি 155.522 শঙ্খ মানব-বৎসর। অর্থাৎ 155.522 শঙ্খ মানব-বৎসর আগে ব্রহ্মা জন্মেছিলেন এবং সৃষ্টি শুরু হয়েছিল। শঙ্খ সংখ্যাটি হলো একক-দশক-শতক ইত্যাদির মতো। একে সংখ্যায় লিখলে দাঁড়ায় 100000,00,00,000 বা 10^{12} বা সংখ্যাটি একলক্ষ কোটি। অর্থাৎ 155.522 কিংবা একটু কমিয়ে বললে 155 লক্ষ কোটি মানব-বৎসর আগে ওই 'মহাবিস্ফোরণ' হয়েছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান কিছুদিন আগে পর্যন্ত বলেছে, 2 শঙ্খ বৎসর হলো বিশ্বের বয়স। এটা ভারতীয় দর্শনের হিসাবের প্রায় 1/78 অংশ। এখন অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন বিশ্বের প্রকৃত বয়স 2000 কোটি বছর। বিশ্বের বয়স নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

যাইহোক, ভারতীয় দর্শন বলছে, ব্রহ্মার মৃত্যু বা লয় হলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বা পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। তখন কেবল ঈশ্বরই থাকেন। আর কেউ থাকে না। চৈতন্যময় পুরুষ প্রকৃতি বিজড়িত হয়ে *একাই অবস্থান করেন, মহাবিশ্ব তখন তাঁতেই লীন থাকে। এই পুরুষ যেন জল* আর প্রকৃতি হলো সে জলের তরঙ্গ। অবস্থাটা 'বিগ ব্যাং' শুরু হওয়ার আগের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়, যখন কেবল 'মহাজাগতিক অণ্ড'-ই (Cosmic Egg) বর্তমান ছিল। দর্শন বলছে, ঈশ্বরের দেশ-কাল-নিমিত্ত নেই। 'দেশ' হলো ত্রিমাত্রিক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, 'কাল' হলো সময়। নিমিত্ত হলো কার্য-কারণ সম্পর্ক। ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ও সময় এই চারটি মাত্রা নেই। তিনি মাত্রাহীন। বিজ্ঞান মতে

মহাজাগতিক অণ্ডেরও দেশ-কালের মাত্রা নেই। বিশ্ব যখন নেই, তখন ঘটনাও নেই। আর ঘটনা না থাকলে সময় থাকবে কি করে! তাই ব্রহ্মের কোনও সময় নেই। মহাজাগতিক অণ্ডেরও কোন সময় থাকে না। সময় নেই বলেই সেখানে তখন কাল-প্রসরণও থাকে না। সুতরাং প্রাচীন দর্শনের মত হলো ব্রহ্মের কাল-প্রসরণ নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও মহাজাগতিক অণ্ডে কাল-প্রসরণ নেই।

তবে মহাজাগতিক অণ্ডটাই ঈশ্বর নয়, কারণ দর্শন ওর সঙ্গে চৈতন্যের অবস্থানের কথা বলছে, যা বিজ্ঞান বলছে না। বিজ্ঞান মতে মহাজাগতিক অণ্ড জড়-বস্তু বা শক্তি এবং তাতে জ্ঞান বা চৈতন্য অনুপস্থিত। বিজ্ঞান সৃষ্টির শুরুতে কোনও জ্ঞানের বা চৈতন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। দর্শনের মতো বিজ্ঞান কোনও চৈতন্যের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ স্বীকার করে না। বিজ্ঞান মনে করে জ্ঞান অর্জিত হয়, আহরিত হয়। দর্শন বলে, আদিতে চৈতন্যই ছিল এবং চৈতন্যেই বিশ্ব-সংসার বিধৃত। সেই চৈতন্যই সর্বত্র অভিব্যক্ত এবং ক্রম-বিকশিত। এই চৈতন্য বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানের সমষ্টি। দর্শন মতে, চৈতন্য বিজড়িত প্রকৃতি বা মহাজাগতিক অণ্ডই ঈশ্বর। 'বিগ ব্যাং' কেন হয়েছিল তা বিজ্ঞানের অজানা। ঈশ্বর কেন বহু হন তাও অজানা। বলা হয় লীলা-আস্বাদনের জন্য তাঁর বহু হওয়া। এটা খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নয়। উভয়েরই কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। উভয়েই নিমিত্তের অতীত। বিশ্বের সমস্ত ঘটনাই কার্য-কারণ সম্পর্ক যুক্ত। আইনস্টাইন সারা জীবন কার্য-কারণ সম্পর্কের বাইরে এক পাও বাড়াতে রাজী হন নি। কিন্তু যখন বিশ্ব নেই, যেখানে সময় নেই, সেখানে কার্য-কারণ সম্পর্কও থাকতে পারে না। দর্শনের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমন দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, তেমনি ওই Cosmic Egg-ও দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে। ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়েই বিশ্বজগৎ হন, মহাজাগতিক অণ্ডও বিশ্ব-জগতে রূপান্তরিত হয়, Big Bang বা মহাবিস্ফোরণের পরে। এই মহাজাগতিক অণ্ড তাই অনেকটা যেন সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি। চৈতন্যের অবস্থানের ব্যাপারটা বিজ্ঞান যদি স্বীকার করে নেয় তবে মহাজাগতিক অণ্ডকে ঈশ্বর বলতে বাধা থাকে না। যতক্ষণ বিজ্ঞান ওই মহাজাগতিক অণ্ডে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান বা চেতনার অবস্থান স্বীকার না করছে ততক্ষণ দর্শনের ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানের 'কসমিক এগ' একই হতে পারছে না। ততক্ষণ Cosmic Egg চেতনাহীন, কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্যময়, সমস্ত চৈতন্যের আধার। একালে এই 'কসমিক এগ' অবশ্য 'অনন্যতা' [Singularity] নামেও অভিহিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ছিলেন একজন মহা-বৈদান্তিক। বলা যেতে পারে, বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের একটি শাখা মাত্র। আবার অদ্বৈতবাদী মহা-বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যকেও বলা হয় 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'। বুদ্ধ কখনও কারও কাছে মাথা নোয়ান নি—বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা—কারও কাছে নয়। যতদূর যুক্তিবিচার করা যায় ততদূর তিনি যুক্তিবিচার ক'রে গেছেন। নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, সকাল প্রাণীর প্রতি এমন নিবিড় ভালোবাসা একমাত্র তাঁর মধ্যেই ছিল। তিনি নিজের জন্য কখনও কোনও কিছুর আকাঙক্ষা করেন নি। একটা ছাগশিশুর জন্যও তিনি জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

বৌদ্ধ দর্শন দৃশ্য জগৎ ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করে না। এই দর্শন আত্মা, পরমাত্মা মানে না। একটি নিত্য সত্তা জগৎ হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে এটাও স্বীকার করে না, এই দর্শন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই বুদ্ধদেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, আত্মার অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধদর্শন বলছে, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। সাংখ্যদর্শনও বুদ্ধদেবের অনেকটা আগেই বলেছিল, প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। জগতের উৎপত্তি পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনে। বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধ দর্শন বলছেন, শাশ্বত

আত্মা স্বীকার করলে নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে হয়। তিনি তাঁর 'অনাত্মবাদ' তথা 'অনাত্মাবাদ' প্রচার শুরু করেছিলেন সারনাথে প্রথম 'ধর্মচক্র' প্রবর্তনের সময় থেকে। বুদ্ধত্ব লাভের তিনমাস পরেই সারনাথে এসে তিনি বলেছিলেন, "শাশ্বত পরমাত্মা বলে কিছুই নাই। পঞ্চস্কন্ধ নিয়েই জীবন তৈরি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধ চির অনিত্য। এগুলি কার্য-কারণ নীতিজাত। এগুলি আগেও অনিত্য ছিল, ভবিষ্যতেও অনিত্য থাকবে। এগুলি অনিত্য বলেই দুঃখের কারণ।"

বেদান্ত মতে মহাবিশ্বের কারণ হল পরমাত্মা বা ঈশ্বর। বৌদ্ধ দর্শন প্রমাণাভাবে এই পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে মানে না। বেদান্ত জগতের এই কারণকে 'নিত্য বা শাশ্বত' বলেন। বৌদ্ধদর্শন বলে এই রকম শাশ্বত আত্মা বা পরমাত্মা বলতে কিছুই নেই। বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধধর্ম তাই সাংখ্যদর্শনের মতই নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধ দর্শন বেদান্তেরই মত বলেছে, যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার বিনাশ অনিবার্য। আপাতদৃষ্টিতে কোনকিছুকে স্থায়ী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাও উদয়-বিলয়শীল। বৌদ্ধ দর্শন এও মনে করে যে, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু কোনও কারণই নিত্য নয়, শাশ্বত নয়। এটি বীজবৃক্ষাদির মত অনন্ত ভবসন্ততির নিয়মে আবদ্ধ। বেদান্ত যেমন ঈশ্বরকে কারণ এবং জগৎকে কার্য বলেছে, বুদ্ধদেব তা বলেন নি। তিনি জগতের কারণ এবং সে কারণের কার্য জগৎ, উভয়কে অনিত্য বলেছেন। তাঁর মতে, বীজ আগে না গাছ আগে এটা যেমন নির্ণয় করা দুষ্কর, তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও আদি খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এটা জানা যায় যে, অনিত্যতার সূত্র স্বীকার করে নিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্ত আছে, ভবচক্রেরও অন্ত আছে। বেদান্ত মহাবিশ্বের লয় স্বীকার করে, কিন্তু তার ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচনের পর্যাবৃত্ততার নিত্যতা অস্বীকার করেনা কখনই।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা হ'ল—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত সমস্ত মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। বুদ্ধদেব তাই এই জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তির জন্য কোনও শাশ্বত ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেন নি। অস্বীকার করেছেন পরমাত্মাকে, যাঁর প্রক্ষেপণ এই মহাবিশ্ব। তিনি বলেছেন, সমস্ত বস্তুই অনিত্য, সতত পরিবর্তনশীল। মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-গুল্ম, লতাপাতা, তৃণ, স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন সবকিছুই প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহাবিশ্বেরও নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। নিত্য বা শাশ্বত বলে কিছু নেই। বুদ্ধদেব আত্মা বা পরমাত্মা স্বীকার করেন নি, কিন্তু তিনি 'পুনর্জন্মবাদ' মানতেন। বৌদ্ধদর্শনে মহাবিশ্ব তথা জগতের পরিবর্তনশীলতার কথা আছে, কিন্তু বিশ্বের উৎপত্তি এবং লয় সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা নেই।

বিবেকানন্দ বলেছেন, "বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বেদান্তের কোন বিবাদ নাই। বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল মতের সমন্বয় করা। মহাযানী বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্তু বর্মী, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনযানীরা বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি আছে এবং জিজ্ঞাসা করে ঃ এই দৃশ্য জগতের পশ্চাতে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্টি করার কি অধিকার আমাদের আছে? বেদান্তের উত্তর ঃ এই উক্তি মিথ্যা। বেদান্ত কখনও স্বীকার করে না যে, একটি দৃশ্য জগৎ ও একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে। একটি মাত্র জগৎ আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখলে ওটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সব সময়েই ইন্দ্রিয়াতীত। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রজ্জু, না হয় সর্প, কিন্তু একসঙ্গে কখনও দুটি নয়। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে বলে, আমরা হিন্দুরা দুটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তা সর্বৈব ভুল।

বৌদ্ধধর্ম দৃশ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করতে চায় না। একমাত্র দৃশ্য জগতেই তৃষ্ণা আছে। তৃষ্ণাই এইসব কিছু সৃষ্টি করছে। আধুনিক বৈদান্তিকেরা কিন্তু এই মত আদৌ গ্রহণ করে না। আমরা বলি, একটা কিছু আছে, যা ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বস্তু—যৌগিক পদার্থ, 'মৌলিক' নয়। একটি বাহ্যবস্তু না থাকলে কোন ইচ্ছা হতে পারে না। ইচ্ছা হতে জগতের সৃষ্টি এই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা আমরা সহজে দেখতে পাই। এটি কি করে হতে পারে? বাইরের প্রেরণা ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি হতে কখনও দেখেছ কি? উত্তেজনা ব্যতীত, অথবা আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত বাসনা উঠতে পারে না। ইচ্ছা মস্তিষ্কের একরকম প্রতিক্রিয়া বিশেষ। সাংখ্যবাদীরা একে বলে বুদ্ধি। এই প্রতিক্রিয়ার পূর্বে ক্রিয়া থাকবেই এবং ক্রিয়া থাকলেই একটি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।" ['বৌদ্ধ ধর্ম ও বেদান্ত'—স্বামী বিবেকানন্দ।]

বুদ্ধের দর্শনে অনিত্যতা এক চিরন্তন সত্য, যার কোনও ব্যতিক্রম এই দর্শনে স্বীকৃত নয়। তিনি বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই 'ক্ষণিকবাদ' দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত করে এদের অনিত্য বলে ঘোষণা করেছেন। ক্ষণিকবাদের তিনটি ভাগ হল ঃ (1) পঞ্চ স্কন্ধ, (2) দ্বাদশ আয়তন; ও (3) অষ্টাদশ ধাতু। পঞ্চ স্কন্ধ হল ঃ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। বারোটি আয়তন হল ছয়টি ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়। ইন্দ্রিয় ছয়টি হল ঃ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় বা ত্বক এবং মন। এর ছয়টি বিষয় হল ঃ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার)। আঠারোটি ধাতু হল ওই ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাদের ছয়টি বিষয় এবং তাদের সঙ্গে ছয়টি বিজ্ঞান যেমন, চক্ষু বিজ্ঞান, শোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান এবং মন-বিজ্ঞান। এই ভাগের মধ্যে যে কোনও একটি ভাগে মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে অবশ্যই রাখা যায়। এই সব স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু অনিত্য। তাই মহাবিশ্বও অনিত্য।

বুদ্ধদেব কার্য-কারণকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসাবে স্বীকার করেন নি, তবে তিনি এটা স্বীকার করেন যে, 'এটি ঘটলে ওইটি ঘটে। তাঁর মতে, একের বিনাশের পর আরেকটির উৎপত্তি। ['অস্মিন্ সতি ইদং ভবতি'—মজ্ঝি মনিকায়, 1/4/8] এই নিয়মকেই তিনি বলেছেন 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ'। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদেই তিনি বলেছেন, কার্য-কারণ নিয়ম অবিচ্ছিন্ন নয়, বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র [Discontinuous Continuity]। এই বিচ্ছিন্ন প্রবাহকে নিয়েই নাগার্জুন তাঁর শূন্যবাদ তত্ত্বকে বিকশিত করেন। কিন্তু শূন্য থেকে সব কিছুর উৎপত্তি এবং শূন্যেই সব বিলীন হয়ে যাবে, এই মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায় না। বিশ্বের এক কণাও নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না, কিংবা ধ্বংস করা যায় না। বিজ্ঞানের শক্তি ও ভরের নিত্যতার এই সূত্রটি বুদ্ধদেবের বহু আগেই আবিষ্কার করেছিল সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শন। জগতের অনিত্যতার কথা উপনিষদীয় দর্শন বহুবার বলেছে। বুদ্ধ বিরোধ করেছেন উপনিষদের পরমাত্মাকে নিয়ে। এর অস্তিত্ব, নিত্যতা তিনি অস্বীকার করেছেন। বেদান্ত মতে, জগৎ অনিত্য ঠিকই, কিন্তু ওই নিত্যসত্তাই দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়ে জগৎ হিসাবেই প্রতিভাত বা প্রক্ষেপিত হন। বুদ্ধ কিন্তু বলেছেন, এই আত্মাবাদ হল 'মহা-অবিদ্যা'। বুদ্ধ ছিলেন অনাত্মবাদী বা অনাত্মাবাদী এবং অবস্তুবাদী। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন 'অনীশ্বরবাদী'।

তাঁর দশটি অকথনীয় হল ঃ (1) লোক বা বিশ্বলোক কি নিত্য? (2) লোক কি অনিত্য? (3) বিশ্বের কি অন্ত আছে? (4) বিশ্ব কি অনন্ত? (5) জীব ও তার শরীর কি একই বস্তু? (6) জীব ও তার শরীর কি পৃথক বস্তু? (7) মৃত্যুর পর সকলেই কি তথাগত বা মুক্ত হয়? (8) মৃত্যুর পর সকলেই কি তথাগত হয় না? (9) মৃত্যুর পর তথাগত হয় এবং হয় না? (10) মৃত্যুর পর তথাগত হয় না, না

হয়ই না? এই প্রশ্নগুলি বুদ্ধকে করেছিলেন তাঁর এক শিষ্য মালুংক্যপুত্র। এদের উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন, "আমি একে অব্যাকৃত এ জন্যই বলেছি যে, এগুলি সম্বন্ধে বলা নিরর্থক, ভিক্ষুচর্যার [আদি ব্রহ্মচর্য] জন্য (এগুলি) অনুপযোগী। এগুলি নির্বেদ (বৈরাগ্য), নিরোধ (শান্তি), পরমজ্ঞান, নির্বাণের জন্যও অপ্রয়োজনীয়, সেজন্যই আমি এগুলিকে অব্যাকৃত রেখেছি।"

বুদ্ধদেবের দর্শনে মৌলিক রূপে প্রতীত্যসমুৎপাদ তথা ক্ষণিকবাদ অত্যন্ত যুগান্তকারী ছিল। বিশ্বজগৎ ও তার সবকিছুকেই সে পরিবর্তনশীল বলে ঘোষণা করেছে। এই দর্শন, বিগত দিন, যা কোনদিনই আর ফিরে আসবে না, তার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে মানুষকে সময়ানুসারে পরিবর্তিত হওয়ার এবং সর্বদা যে কোন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকার শিক্ষা দেয়। সব মিলিয়ে, জগতের অনিত্যতা নিয়ে বেদান্ত দর্শন এবং বৌদ্ধদর্শনের বক্তব্যের মধ্যে খুব বেশি কিছু বিরোধ নেই। বিরোধ হল, বেদান্ত নিত্য, অপরিণামী পরমাত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বৌদ্ধ দর্শন নিরীশ্বরবাদী—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক হলেন রেনে দেকার্ত্ [Rene Descartes]। তাঁর জন্ম 1596 সালে। তিনি মারা যান 1650 খ্রিস্টাব্দে। দার্শনিক চিন্তাসমূহের বিকাশের জন্য তিনি 1628 খ্রিস্টাব্দ থেকে হল্যান্ডে কাটান; যদিও তিনি ফরাসী দেশে জন্মেছিলেন। হল্যান্ডেই তিনি কুড়ি বছর অতিবাহিত করেন। 1637 থেকে 1644 খ্রিস্টাদের মধ্যে তিনি লিখে ফেলেন তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা। 1649 সালে সুইডেনের রাণীর বিশেষ অনুরোধে তাঁর দর্শন শিক্ষকরূপে তিনি স্টকহোল্‌মে যান। কিন্তু সেখানকার প্রবল শীতে কিছুদিনের মধ্যে দেকার্ত্ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দুর্বল শরীর ভেঙে পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই 1650 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দার্শনিক গ্রন্থ হল ঃ (1) ডিস্‌কোর্স অন মেথড ঃ অর্থাৎ বিচার পদ্ধতি বিষয়ক নিবন্ধ [1637 খ্রিঃ] (2) মেডিটেশন্‌স্ অন্ ফার্স্ট ফিলসফি ঃ অর্থাৎ মূল দর্শন সম্বন্ধীয় বিচার [1641 খ্রিঃ] , (3) প্রিন্‌সিপল্‌স্ অফ ফিলসফি ঃ অর্থাৎ দর্শনের মূলতত্ত্বসমূহ [1644 খ্রিঃ]।

দেকার্তের মতে একেবারে শূন্য বলে জগতে কোথাও কিছু নেই। আমরা যখন বলি যে, এই পাত্রটি শূন্য, তখন পাত্রে যে কিছুই থাকে না, এমন নয়, কিন্তু ভেতরের দ্রব্যগুলি সূক্ষ্ম বলে আমরা তা দেখতে পাই না। পাত্রটি যদি সত্যিই খালি হত তবে তার বিপরীত পিঠগুলি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন হয়ে যেত। তাঁর মতে, জড়বস্তুর এমন কোনও অংশ নেই, যাকে অবিভাজ্য বলা যেতে পারে। নিউটন তাঁর গতিসূত্রের প্রথম নিয়মটি নিয়েছিলেন দেকার্তের মতবাদ থেকে। দেকার্ত্ বলেছেন "প্রত্যেক জড়পিণ্ডের এমন একটি প্রবণতা আছে যে, যদি তা একবার কোনও একদিকে গতিযুক্ত হয়, তাহলে তা অনবরত সেই দিকেই চলতে থাকবে। অর্থাৎ গতির স্বাভাবিক রাস্তা হচ্ছে সরলরেখা। গতির দিক বদলালে, বুঝতে হবে যে, তা অন্য কিছুর প্রভাবেই ঘটেছে।" এই মতবাদ থেকে নিউটন আবিষ্কার করলেন তাঁর তিনটি গতিসূত্রের প্রথমটি।

দেকার্ত্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বর্ণনা দিতে গিয়ে, একটি মূলসূত্রের অবতারণা করেছেন। সূত্রটি এইরকম—যেমন একদিকে, ঈশ্বরের শক্তি ও কল্যাণময়ত্বের কোনও ইয়ত্তা নেই, তেমনি অপরদিকে, মানুষের শক্তি ও কল্যাণময়ত্বও একেবারে নগণ্য নয়। জগৎ সৃষ্টি করায় ভগবানের উদ্দেশ্য কি, তা খুঁজতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তেমনি তাঁর এই উদ্দেশ্যসাধনে মানুষও তাঁকে সাহায্য করতে পারে, এই রকম কিছু ভাবা কিংবা বিশ্বের সব বস্তুই মানুষের উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, এইরূপ মনে করা ধৃষ্টতা

মাত্র। বিশ্বে এমন বহু পদার্থ আছে, যা কখনই মানুষের দৃষ্টিপথে আসে না এবং যা কারও কোনও কাজে লাগে না। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে, তার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে যাওয়া একেবারে নিরর্থক। বস্তুর ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিতে হলে, সেগুলিতে স্পষ্টভাবে-জ্ঞাত গুণ বা ধর্মের সাহায্যেই দিতে হবে। অর্থাৎ জড়বস্তুর গতি প্রভৃতি ধর্মের ব্যাখ্যা যান্ত্রিক [Mechanical Explanation] হবে। পদার্থের যান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা যন্ত্রের বা যন্ত্রীর কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হল কিনা, তা জানা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক, উদ্দেশ্য-সাধকতা নয়।

দেকার্তের ঈশ্বর বেদান্তের ঈশ্বর নন। ইনি বাইবেলের 'ঈশ্বর', যে ঈশ্বর ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর, যিনি মহাশক্তিশালী, মহাকল্যাণময় ইত্যাদি গুণান্বিত। পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর মতগুলি ছিল সমকালীন খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের মতের অনুগামী। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবী তৎসংলগ্ন পারিপার্শ্বিক পদার্থগুলির তুলনায় অচল বলে মানতে হবে, আর সমগ্র ব্যোমমণ্ডল একপ্রকার তরল দ্রব্যে ভরা, এই তরল পদার্থ অনবরত ঘূর্ণিজলের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে, আর সূর্যের চারিদিকে এর যে অংশগুলি ঘুরছে, সেগুলি তৎ-সংবদ্ধ পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহসমূহকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়, তাতে গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হলেও নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক পদার্থগুলির তুলনায় তা স্থির থাকে বলে মানতে হবে। এই মতবাদ তৎকালীন খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের মতানুসারী হওয়ায় দেকার্তের ভাল লেগেছিল। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ছিল তৎকালীন ধর্মযাজকদের মতের বিরোধী। সেইজন্য তিনি এই মতবাদ 'প্রকল্প' [Hypothesis] হিসাবেই উপস্থাপিত করেন। বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "জগৎ ও তন্মধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তু এক মূল বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে গতির নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ সুশৃঙ্খল হয়ে কোটি কোটি বছরে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।"

স্পিনোজার [Bendict de Spinoza] জন্ম হল্যান্ডের আমস্টার্ডামে 1632 খ্রিস্টাব্দে। জাতিতে তিনি ইহুদী। তিনি মারা যান ওই শহরেই 1677 সালে। এই বিখ্যাত দার্শনিকটি তাঁর মতবাদের জন্য তৎকালীন খ্রিস্টান এবং ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই নাস্তিক ও ধর্মের অবমাননাকারী হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দর্শনের মূলতত্ত্ব' 1663 সালে, দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ' 1673 সালে এবং তাঁর তৃতীয় ও সর্বশেষ গ্রন্থ 'নীতিবিজ্ঞান' 1677 সালে প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের সেরা প্রবক্তাদের অন্যতম হলেন স্পিনোজা। আইনস্টাইন প্রায়শই বলতেন, 'স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।' এই মহাবিজ্ঞানী স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্পিনোজা বলেছেন, বিশ্বে এমন কোনও পদার্থ নেই, যা বুদ্ধির আলোকে প্রকাশিত হবে না এবং বুদ্ধি তার বিশুদ্ধ ধারণা ও সাক্ষাৎ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিচিত্র জগতের সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বের প্রত্যেকটি বিষয়ই যখন গণিতশাস্ত্রের বিচারে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়, তখন বলতে হবে যে, যা কিছু ঘটে তা অনিবার্যভাবেই ঘটে। স্পিনোজা সব রকমের পরিবর্তন এবং ঘটনা, এমনকি আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলবিদ্যার [Mechanics] নিয়ম প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে কোনও অলৌকিক অপ্রাকৃত শক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

তাঁর মতে সারবস্তু বা দ্রব্য [Substance] শুধু একটিই এবং তা অনন্ত। তিনি স্বাতন্ত্র্য বা অন্য নিরপেক্ষতাকেই দ্রব্যের স্বরূপ-লক্ষণ বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি দ্রব্য বলতে তাই বুঝি, যা নিজ সত্তাতেই সত্তাবান, যা নিজের ধারণার দ্বারাই বোধগম্য, অর্থাৎ যার ধারণা অন্য কিছু ধারণার সাহায্য-ব্যতিরেকে করা যেতে পারে।" আর যা সম্পূর্ণভাবে স্ব-সাপেক্ষ, তার কোনও সীমা বা অন্ত থাকতে পারে না। কারণ সে সসীম হলে, যে অন্য বস্তুর সত্তার দ্বারা সে সীমাবদ্ধ হয়, নিজের

সীমার ব্যাপারে, সে সেই অন্য বস্তুর সাপেক্ষ হতে বাধ্য। সুতরাং দ্রব্যের ওই স্ব-সাপেক্ষতা থেকে তার অসীমতা অথবা অনন্ততা নির্ধারিত হয়। সেই বস্তুই চরম পদার্থ বা দ্রব্য, যা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না, বরং অন্য সব কিছু যার ওপর নির্ভর করে; যা কারোর দ্বারা সৃষ্ট বা কৃতি না হয়ে, অন্য সব কিছুর কারণ। যার সিদ্ধির জন্য তৎপূর্বসিদ্ধ অন্য কিছু স্বীকার করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু যা সৎ বলে প্রতীয়মান সকল বস্তুরই পূর্ব-সিদ্ধিরূপে অবশ্য স্বীকার্য—তাই হচ্ছে শুদ্ধ, মৌলিক, সৎ এবং তাই হচ্ছে স্ব-পর সব কিছুর কারণ। এই 'কারণ'-ই বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ঈশ্বর। স্পিনোজার দর্শনের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের প্রবল মিল বিস্ময়কর।

স্পিনোজা বেদান্তের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, সর্ব বস্তুর মূল কারণ, তথা সর্ববস্তুর অভ্যন্তরস্থ সত্তা, যা এগুলির স্রষ্টা ও ধারণকারী তাই হচ্ছে 'দ্রব্য'। আর এই দ্রব্যই স্পিনোজার 'ঈশ্বর'। তাঁর কাছে ঈশ্বর মানে বিশ্বাতীত কোনও এক চেতন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি নন, কিন্তু ঈশ্বর মানে অসীম ও চরম সত্তা, যা হচ্ছে সর্ববস্তুর হৃদপিণ্ড বা প্রাণকেন্দ্র।

ঈশ্বর থেকে জগৎ কেমন করে আসে? ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন বাইবেলের এই ধারণা যেমন সত্য নয়, তেমনি জগৎ ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত হয় [Emanates] এও তেমনি সত্য নয়। স্পিনোজা বলছেন, ত্রিভুজের স্বভাব থেকে যেমন অনিবার্যভাবে নির্গমিত [Follows] হয় যে, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টিগত পরিমাণ দুই সমকোণের সমান, তেমনি এই বিচিত্র জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে নির্গত হয় অনিবার্যভাবেই। তবে জগৎ ঈশ্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তার থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে, এরকম ভাবা একেবারে ভুল। জগৎ সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে তাঁতেই বিদ্যমান। যেহেতু জগৎ অন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকে, তা নিরপেক্ষ নয়। ঈশ্বর জাগতিক সর্ববস্তুর হেতু বা কারণ [Reason], তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বস্রষ্টা নন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন প্রকৃতির মূল প্রকৃতি বা স্বভাব [Natura naturans and not natura naturata]। ঈশ্বর নিজেই নিজের কারণ [Causasüi]। ঈশ্বর কখনও ছিলেন না, এরূপ কল্পনা স্ব-বিরোধী। কারণ ঈশ্বর আছেন এই কথা না ভেবে, তাঁর কথা ভাবাই যায় না।

স্পিনোজার দর্শনে দ্রব্য=ঈশ্বর=প্রকৃতি বা মহাবিশ্ব বা জগৎ। তাঁর মতে ঈশ্বর থেকে পদার্থ সকল নির্গত হয়, এব অর্থ এই যে, ঈশ্বরে তারা থাকে। এটা বোঝাবার জন্য স্পিনোজা ত্রিভুজের উদাহরণ দিয়েছেন। ত্রিভুজের যে বিবিধ ধর্ম তার স্বরূপ থেকে নিঃসৃত হয়, সেগুলি ওই ত্রিভুজ বা ত্রিকোণেই নিহিত থাকে, তেমনি জগতের পদার্থ সকল ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত হলে তারা ঈশ্বরেই নিহিত থাকে। সব কিছুরই আদি কারণ হলেন ঈশ্বর। এগুলি প্রমাণের জন্য স্পিনোজা গাণিতিক সমানুগমন [Consequence] বিধানের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে কার্যকারণ ধারা অনন্ত। দৃশ্যমান জগতে কোথাও প্রথম বা শেষ কারণ বলে কিছু নেই। প্রথম বা আদি কারণ হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর।

লাইবনিজ [Gottfried Wilhelm Leibniz] জন্মেছিলেন 1646 খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর লিপজিগ [Lipzig] শহরে। এই সময় ইউরোপে দুটি দার্শনিক মতবাদ খুবই প্রবল হয়। এদের একটি স্পিনোজার যৌক্তিক সর্বেশ্বরবাদ এবং অন্যটি লকের [John Locke] ইন্দ্রিয়ানুভবীয় ব্যক্তিবাদ [Empirical Individualism]। এই দুই মতবাদ পরস্পরের একেবারে বিপরীতমুখী। লাইবনিজ দু'দিক থেকে এই ধারা দু'টির মিলন ঘটাতে প্রয়াসী হন। যুক্তিবাদী হিসাবে তিনি লকের বিপক্ষ স্পিনোজার সমর্থক এবং ব্যক্তিবাদী হিসাবে তিনি স্পিনোজার বিরুদ্ধে লকের মতানুসারী। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই জার্মান দার্শনিকটি একাধারে ছিলেন, আইনবিদ, ইতিহাসবিদ কূটনীতিবিশারদ, গণিতবিদ, জড়-বিজ্ঞানী, দর্শনশাস্ত্র

পটু, ধর্মশাস্ত্রবিদ এবং ভাষাবিদ। কোনও বইয়ে যা লেখা থাকে তার থেকে অনেক বেশি তিনি ওই বইয়ের ভেতর আবিষ্কার করতে পারতেন। সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী লাইবনিজের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না কোনও কালেই। লাইবনিজই প্রথম বলেছিলেন, "Space is the order or relation of things among themselves. Without things occupying it, it is nothing." অর্থাৎ মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতর বিন্যাস। মহাকাশে বস্তুগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছু নয়। আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ব্যাখ্যায় লাইবনিজের এই মতবাদ সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

লাইবনিজ 'চিদণু' [Monad] নাম দিয়ে দেকার্তীয় এবং স্পিনোজার দ্রব্যের ধারণার থেকে একটি উন্নততর ধারণা দার্শনিকদের সামনে রাখেন। এই ধারণার ভিতর প্রাচীন পরমাণুবাদ ও দেকার্তীয় ধারণা, এই দুটি চিন্তাধারার মিলন যেমন ঘটেছে, তেমনি তাঁর ধারণার অভিনবত্ব বজায় রয়েছে। লাইবনিজ বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব একটি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত উপাদানরাজির দ্বারা সুসংঘিত-সংঘাত [Organic Whole] এবং এই নিবিড় সংঘাতে প্রত্যেক দ্রব্যের বিশিষ্ট স্থানটি হচ্ছে তার স্বরূপ — এর প্রত্যেকটি অবিভাজ্য অংশ অপর প্রত্যেকটি অবিভাজ্য অংশের সঙ্গে 'প্রভাবক ও প্রভাবিত' [Actively and passively] এই উভয় সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত এবং বিশ্বের ইতিহাস হচ্ছে অসংখ্য প্রতিবিম্বের সামঞ্জস্যযুক্ত একটি বিরাট ও অম্বয় প্রবাহ। প্রত্যেক চিদণু একই বিশ্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করে, কিন্তু প্রত্যেকেই একটু ভিন্নভাবে এই বিশ্বপ্রতিবিম্ব ধারণ করে। প্রতিবিম্বের ধারণা দিয়ে শুরু হয়েছে লাইবনিজের অধিবিজ্ঞান। আর বিশ্বের ঐক্য বা একতানে তা সমাপ্ত হয়েছে।

যত রকমের জগৎ কল্পনা করা যায়, তাদের মধ্যে আমাদের বাস্তব জগৎটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ভালো এবং সেইজন্য ঈশ্বর এই জগৎটিকে বেছে নিয়ে, তা সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের জোরে, জগৎ সংঘটক চিদণুগুলি অস্তিত্বে আগমন করে। এর আগে এরা বীজরূপে বা ধারণার আকারে ঈশ্বরের মনে বিদ্যমান ছিল। চিদণু স্বকীয় পূর্ণতার দ্বারা অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করে না, কিন্তু তা যে সমূহের একটি অংশ, তার পূর্ণতার দ্বারাই অস্তিত্বলাভ করে। তাঁর মতে, ঈশ্বরের কল্যাণময় ইচ্ছায় সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ জগৎ নির্বাচিত হলে, তাঁরই শক্তিতে তা বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং ঈশ্বর ঠিক করছেন সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ জগৎ কেমন হতে পারে এবং সেই কল্পনা কিংবা ধারণামতো তিনিই তাঁর আপন শক্তিতে বাস্তবায়িত করছেন এই মহাবিশ্ব বা জগৎ।

লাইবনিজ বলেছেন, স্থিতি ও গতি পরস্পরের বিরুদ্ধ নয়, কারণ, স্থিতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মন্থর গতি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। উপবৃত্ত [Ellipse] ও অধিবৃত্তের [Parabola] মধ্যে কোনও বিজাতীয় ভেদ নেই, কারণ যে সকল নিয়ম প্রথমটিতে প্রযোজ্য সেগুলি দ্বিতীয়টিতেও লাগানো যায়। লাইবনিজের মতে একটি জীব অসংখ্য চিদণুর মিশ্রণ। এদের ভিতর একটি চিদণু মুখ্যস্থানীয়, ওটিই জীবের আত্মা। অন্য চিদণুগুলি ওই আত্মার সেবক এবং সম্মিলিতভাবে তারা ওই আত্মার দেহ। জগতের প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি 'অঙ্গাঙ্গিভাবে নিবদ্ধ' অংশের সমুদায় -- আত্মা ছাড়া দেহ অর্থাৎ প্রাণহীন জড় পিণ্ড এই ভূমণ্ডলে নেই। ক্ষুদ্রতম ধূলিকণাও অসংখ্য জীবন্ত প্রাণীর আবাসস্থল। মৃত্যু মানে হ্রাস এবং অব্যক্ত অবস্থা, আর জন্ম মানে বৃদ্ধি এবং ব্যক্ত অবস্থা। মানুষ ও ইতর প্রাণীর জন্ম-পূর্ব ও মৃত্যু-উত্তর অস্তিত্ব মানতে হবে। মানুষের অনাদি এবং অবিনাশী অস্তিত্বকে অমরত্ব বা অমৃতত্ব নাম দেওয়া চলে — মৃত্যুর পরেও তার নৈতিক ব্যক্তিত্বের সচেতনতা ও স্মৃতি লোপ পায় না।

লাইবনিজ বলেছেন, ঈশ্বর জগতের কারণ, অধিষ্ঠান ও লক্ষ্য। সকল জীবই তাঁর থেকে এসেছে,

আবার তাঁর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। জীব জগতের এই সাধারণ ঈশ্বর-প্রবণতা মানুষের চেতনায় ভগবৎ প্রেমের সঞ্চার করে। জগৎ এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে ক্রমশঃ এগোচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, জগতের এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি অগাধ বুদ্ধি, কল্যাণকর গুণ এবং শক্তির দ্বারা পরম মঙ্গলের সঙ্কল্প করে, তা নানাভাবে চরিতার্থ করছেন। লাইবনিজের এই মতবাদ অনেকটা, বেদান্তের 'দ্বৈতবাদ' যেন। তিনি মানেন, এই মহাবিশ্ব অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিশালী কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। একটি কার্যপদার্থের কারণ অপর কোনও কার্যপদার্থ। এই কারণ পরম্পরা যতদূর ইচ্ছা অতীতের দিকে বিস্তৃত করলেও, কোথাও তার অন্ত পাওয়া ও কারণজনিত কারণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। কাজেই, এই পরম্পরার পূর্ণহেতু বাইরে অবস্থিত এবং বিশ্বরচনার অপূর্ব সামঞ্জস্য এটাই স্পষ্ট করে যে, এই অন্ত্য-জগৎ-কারণ হচ্ছে অন্তর-জ্ঞান-সম্পন্ন এবং পরম কল্যাণময়।

লাইবনিজের মতে নিখিল বিশ্বের সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুষমাই ভগবানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সামগ্রিক সুষমার জন্য সত্তার সর্ব সম্ভাবনীয় উচ্চ-নীচ স্তর বা মাত্রা প্রয়োজনীয়। অবিবিক্ত ধারণা, ইন্দ্রিয়ানুভব প্রভৃতি, এই সবই বিশ্বে থাকা দরকার, শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা থাকলে চলবে না। এদের সঙ্গে চলে আসে অপূর্ণতা, দুঃখ,জ্ঞান ও কৃতির ভ্রান্তির কারণগুলি। বিশ্বের সুসংবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার জন্য চিদণুর একটি জড়ীয় উপাদানও অত্যাবশ্যক। আর এই কারণেই অবিমিশ্র সুখ এই জড় উপাদানযুক্ত দেহী আত্মার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মহাবিশ্ব লাইবনিজ কল্পিত চিদণুতে প্রতিবিম্বিত। আবারও বলি, প্রত্যেক চিদণু একই বিশ্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করে, কিন্তু প্রত্যেকেই একটু ভিন্নভাবে এই বিশ্ব প্রতিবিম্ব ধারণ করে। মহাবিশ্বে চরম বৈচিত্র্যের সঙ্গে চরম ঐক্য মিলিত হয়েছে এবং এখানে কোনও কিছুর অভাব নেই এবং এমন কিছু নেই যার প্রয়োজনীয়তা নেই।

বেদান্তের পরব্রহ্মবাদ, সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদ, আচার্য রামানুজের সর্বেশ্বরবাদ মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং স্বরূপ সম্পর্কে যা কিছু বলেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা যেমন দেওয়া হল, তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক দেকার্ত, সর্বেশ্বরবাদী স্পিনোজা এবং 'চিদণু'-র ধারণার স্রষ্টা লাইবনিজ এই মহাবিশ্বকে যেমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। দর্শনে মহাবিশ্ব আরও নানাভাবে বর্ণিত এবং ব্যাখ্যাত। সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেটাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এবার আসি, জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা আধুনিক বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেই সব কথায়। ●

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানে মহাবিশ্ব

[প্রায় চারশ' বছর আগে গ্যালিলিও, দেকার্ত প্রমুখেরা বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে পৃথক করে, তাকে বইয়ে দিলেন তার নিজস্ব খাতে। দ্রুত অগ্রসরমান বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে এখন দু'রকমভাবে বর্ণনা করছে। বিজ্ঞানীদের একদল বলেন, 'স্পন্দনশীল মহাবিশ্ব', অন্যদল বলছেন, 'চির প্রসারণশীল মহাবিশ্ব'। সত্যিটা এখনও অজানা। বিজ্ঞানে বিশ্বতত্ত্বের চর্চা গভীরভাবে শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটায় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে পরেই। এই পরিচ্ছেদে এসেছেন, আইনস্টাইন, ফ্রীডমান, লেমেতার, হাবল, জর্জ গ্যামো, ফ্রেড হোয়েল, নাবলিকার, অ্যালান স্যান্ডেজ, দ্য-সিটার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। দেখানো হয়েছে, বর্তমান বিজ্ঞানের চোখে মহাবিশ্ব কেমন।]

মানুষের জ্ঞানের উন্মেষের কাল থেকে মহাবিশ্ব ও তার উৎপত্তি নিয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। এই সব জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য উত্তর প্রথম দিকে পাওয়া যাচ্ছিল দর্শনে, পুরাণে, নানা ধর্মশাস্ত্রে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই মানুষ ভেবেছে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহদের নিয়ে। সভ্যতার আদিম কাল থেকে মানুষ বিশ্বসৃষ্টি কীভাবে হল সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই সব প্রাথমিক জ্ঞান থেকে এক সময় মানুষ সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। প্রথমে এসেছে দর্শন, তারপর দর্শন থেকে পৃথক করা হয়েছে বিজ্ঞানকে। তারপর বিবর্তনের ধারা পার হয়ে মানুষ এসেছে যুক্তিবাদে। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। যুক্তিবাদ তথা গণিতের সাহায্যে এখন মানুষ আবিষ্কারের চেষ্টা করছে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের সত্যিকারের স্বরূপ।

মহাবিশ্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমভাবে পাওয়া যায়। মহাবিশ্বকে যিনি যেমনভাবে দেখেন তিনি সেভাবেই এর ব্যাখ্যা দেন। দার্শনিকরা যুক্তিতর্ক দিয়ে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করেন। তাতে যুক্তিতর্ক এবং কিছুটা বিজ্ঞান—দুই-ই আছে। দর্শনের চোখে মহাবিশ্ব কেমন তার আলোচনা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সামান্য বিস্তৃতভাবেই করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় দর্শন থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক করে নিয়ে। এই বিজ্ঞান এখন বিশ্বকে দেখে পর্যবেক্ষণ এবং গণিতের সাহায্যে। দূরবীন, বর্ণালি-লেখী [Spectrograph], দীপ্তিমাপী [Photometer] ব্যতিচারমাপী [Interferometer] ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে যেমন দেখে সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে এই মহাবিশ্বকে। মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ স্বরূপ আজও অজানা। এতাবৎ তার আংশিক স্বরূপই জানা গেছে। কবি, শিল্পী, সুরশিল্পীরা মহাবিশ্বকে দেখেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক অপূর্ব নান্দনিক দৃষ্টিতে। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই কাছাকাছি। আধুনিক বিজ্ঞান অনেকটা এগোলেও মহাবিশ্ব রহস্য আজও বহুলাংশে রহস্যই থেকে গেছে। এই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ-মহাকাশ, প্রাণ-অপ্রাণ যাবতীয় পদার্থ ইত্যাদি সব মিলিয়েই মহাবিশ্ব। বিশ্বের সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত শক্তির একত্রিত রূপই হল বিশ্বরূপ—মহাবিশ্বের স্বরূপ। সুতরাং যাবতীয় পদার্থ

ও শক্তির সম্মিলিত রূপই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের পরিপূর্ণ রূপ বিজ্ঞানের কাছে আজও অধরা। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের [Quantum Mechanics] অন্যতম রূপকার, তরঙ্গ বলবিজ্ঞানের [Wave Mechanics] জনক আরউইন শ্রোয়েডিংগার এক সময় বলেছিলেন, "আমি জানি না আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাবো বা আমি কে।" শ্রোয়েডিংগার [1887-1961খ্রিস্টাব্দ] সারা জীবন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। আধুনিককালের বিশ্বতত্ত্ব বা মহাজগৎ তত্ত্ব [Cosmology] হয়তো একদিন বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিংগারের এই প্রশ্নের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব দিতে পারবে। এই প্রশ্নের দার্শনিক জবাব বহুকাল আগেই আবিষ্কৃত। ভবিষ্যতে কেবল এই প্রশ্নের উত্তরই শুধু নয়, বিজ্ঞান হয়তো নির্দিষ্ট করেই বলতে পারবে মহাবিশ্ব কি এবং কী তার সত্যিকারের স্বরূপ।

বিশাল এই মহাবিশ্বে মানুষ একেবারেই নগণ্য। এই মহাবিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তিতে তার স্থান কোথায়? এই মহাবিশ্ব সসীম না অসীম, এটি কি সৃষ্ট হয়েছে, না চিরকাল একই অবস্থায় আছে, বিশ্ব কি চির অস্থির, না কি এটি স্থির? এই মহাবিশ্বে জীবন ও চেতনার উপস্থিতি কি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে? মহাবিশ্বে তেমন কি কোনও প্রয়োজন ছিল এই জীবন এবং প্রাণ-চেতনার? এগুলি কি সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত, না কেবল পৃথিবী নামের এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ গ্রহটির বৈশিষ্ট্য? মহাবিশ্বকে ঘিরে আজও নানা প্রশ্নের খোঁজ চলেছে, যার উত্তর এখনও মেলে নি। এইসব প্রশ্ন একালের জ্যোতির্বিজ্ঞান [Astronomy], জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান [Astrophysics] এবং বিশ্বতত্ত্বের [Cosmology] গভীরতম অনুসন্ধানের বিষয়। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি দিয়ে আমরা মহাবিশ্বের ছোট-বড় রাজ্য খুঁজে দেখি। অণু-পরমাণু, জীবকোষ থেকে গ্রহনক্ষত্র, ছায়াপথ খুঁজে খুঁজে বিজ্ঞান অংশ অংশ করে মহাবিশ্বের ছবি তৈরি করছে। মহাবিশ্বের বহু রহস্য আজও অজানা। 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে' আমরা মানব সত্যি সত্যিই একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছি কি না, তাও সঠিক জানা নেই আধুনিক বিজ্ঞানের। তবে পর্যবেক্ষণ, গবেষণা সবই চলছে।

এখন পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলছেন, অঙ্কশাস্ত্রে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'হরপ্পা সভ্যতা'-র লোকজনেরা প্রায় 5000 বছর আগে প্রবল বুৎপত্তি লাভ করেছিল। এটা ঠিক, এই বিপুল ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে তাদের বহু সময় লেগেছিল। এই প্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস আজও আমাদের অনাবিষ্কৃত। তবে, 4700 বছর আগে তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে যথেষ্ট পারদর্শী হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করেছিল। কোন্ দিনে কোন্ তিথি নির্ণয়ে যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান জড়িত, তেমনি তাদের নগরগুলির অবস্থান, রাস্তাঘাটের সঠিক দিকে অবস্থান ইত্যাদিতেও হরপ্পীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছিল। সারা পৃথিবীতে অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে হরপ্পীয়রা যে বিশাল বুৎপত্তি অর্জন করেছিল তার তুলনা কেবল তারা নিজেরাই। সুমের, মিশর এবং মায়া সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের অনেকটাই হরপ্পীয়দের অবদান। সুতরাং মহাবিশ্বের স্বরূপ জানার প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায়। অন্ততঃ 5000 বছর আগে হরপ্পীয়রা শুরু করেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা।

জ্যামিতি-অঙ্কন প্রণালীর সারগ্রন্থ হল 'শুল্বসূত্র' [Sulvasutra]। এই সূত্রগুলি রচিত হয় তিন হাজার বছরেরও বেশ কিছুটা আগে বৈদিক আমলে। শুল্বসূত্রগুলিতে এত উন্নত ধরনের জ্যামিতিক আলোচনা রয়েছে যে, পূর্বের কোনও জ্ঞান না থাকলে হঠাৎ এ ধরনের সূত্রগ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব। হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পূর্বে পণ্ডিতেরা বলতেন, বৈদিক আমলে শুল্বসূত্রগুলি রচিত হয়েছিল ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে জ্যামিতির জ্ঞান ধার করে। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ায় পর পণ্ডিতেরা বলছেন, ঠিক উল্টো কথাটাই। এখন বলা হয়, হরপ্পা সভ্যতার প্রবল জ্যামিতিক জ্ঞানই পরবর্তীকালের শুল্বসূত্রগুলি

রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে। হরপ্পীয়দের এই জ্ঞান ধার করেছিল সুমের তথা ব্যাবিলন এবং মিশর সভ্যতা। হরপ্পীয়রা এই সব গাণিতিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্ভবতঃ সংরক্ষণ করতো না, কারণ সে অভ্যাস তাদের ছিল না। মিশর ও ব্যাবিলনের এগুলি সংরক্ষণের অভ্যাস ছিল। বৈদিককালে যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজনে এই সবের সংরক্ষণ শুরু হয়। হরপ্পীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য কিংবা তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান সংরক্ষণ একেবারেই করতো না, এমন কথা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, হরপ্পার লেখাগুলি আজও অপঠিত। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতার প্রাথমিক কালে প্রায় 5000 বছর আগে, হরপ্পা সভ্যতার লোকজনেরাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করে। তাদের অর্জিত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই ধার করে মিশর, ব্যাবিলন, এমন কি মায়া সভ্যতাও। হরপ্পীয়দের এইসব তথ্য এবং তত্ত্বই পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

প্রায় 4000 বছরেরও কিছুটা আগে ব্যাবিলনীয় পুরোহিতদের পাটীগণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের দক্ষতায় হরপ্পীয়দের প্রভাব এখন স্পষ্ট বলে স্বীকার করা হয়েছে। আকাশের রাশিচক্রের বারোটি ভাগ তারা করেছিল হরপ্পীয়দের অনুসরণে। নক্ষত্রপঞ্জীও তৈরি করা হয়। গ্রহগুলির গতিবিধি থেকে, ঋতু পরিবর্তন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যেমন নির্দিষ্টকরণ করা হয়, তেমনি বলে দেওয়া হয় 'স্যারোস চক্র'[Saros Cycle]-এর কথা। এই 'স্যারোস' ভারতীয় গ্রহণ-গণনার 'চান্দ্রকল্প'। এক চান্দ্রকল্প বা 'স্যারোস' হল 6,585.322124 সৌরদিন, যা 18 বছর 10.322124 সৌরদিন, যদি এই সময়ের মধ্যে পাঁচটি অধিবর্ষ [Leap Year] পড়ে এবং চারটি অধিবর্ষ পড়লে এই সময়টা হয় 18 বছর 11.322124 সৌরদিন। একটা চান্দ্রকল্পে সাধারণতঃ 42 টি সূর্যগ্রহণ এবং 27 টি চন্দ্রগ্রহণ হয়। একটা চান্দ্রকল্প কিংবা একটা স্যারোসে সবচেয়ে বেশি ৪৪ এবং সব চেয়ে কম 68 টি গ্রহণ হতে পারে — সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ মোট মিলিয়ে। এই সব তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্পর্কে হরপ্পীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের প্রথম দিকের আবিষ্কার।

ঋগ্বেদ বলেছে, আকাশের বহু নক্ষত্রের কথা, গ্রহরা যে সূর্য পরিক্রমণ করছে সে কথা, এমন কি সূর্য যে তার গ্রহদের নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করছে — সে সব কথাও। ঋগ্বেদের অন্ততঃ শতাধিক সূক্ত আছে, যেগুলি স্পষ্টতঃই জ্যোতির্বিজ্ঞানেরই কথা বলে। কোনও কোনও ঋগ্বেদীয় ঋক 6200 বছর আগের মহাবিষুব [Vernal Equinox]-এর অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছে। সুতরাং ঋগ্বেদ মহাবিশ্বের স্বরূপের কিছুটা বলতে গিয়ে, অধুনা আবিষ্কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব এবং তথ্যের অবতারণা করেছে এখন থেকে 3700 বছরেরও বেশি আগে। সপ্তম পরিচ্ছেদে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্ত' [10ম মণ্ডল • 129 সূক্ত] -টির বক্তব্য, একাধারে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়দিক ব্যঞ্জনায় গভীরভাবে সমৃদ্ধ। সুতরাং মহাবিশ্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত প্রায় 3500 বছর আগে ওই নাসদীয় সূক্তটিতে হয়েছিলো বলা যেতে পারে।

হরপ্পা, ব্যাবিলন ও মিশরের অনেকটা পরেই বিকশিত হয়েছিল গ্রীক সভ্যতা। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 540 বছর আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস [Pythagoras] গণিতের নিয়মশাসিত মহাবিশ্বের পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই মডেলে [Model] মহাবিশ্বের সব জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর মত গোলাকার বলা হল এবং তাদের গতি বৃত্তীয় ছিল বলে ধারণা করা হল। জ্যোতিষ্কদের এই গতির সঙ্গে অশ্রুত স্বর্গীয় সুর ছিল বলে কল্পনা করলেন পীথাগোরাস। এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মহাজাগতিক অগ্নি। তবে পীথাগোরাসের এই মডেলের চেয়ে ঋগ্বেদীয় মডেল ছিল অনেকটা

বেশি উন্নতমানের এবং অনেকটাই আধুনিক। ঋগ্বেদীয় মডেলে, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের [Milkyway Galaxy] কেন্দ্রকে আমাদের সৌরমণ্ডল পরিক্রমারত, সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলিও সূর্যকে পরিক্রমা করে, আকাশের নক্ষত্রেরাও স্থির নয়, তারাও প্রবল গতিবেগ সম্পন্ন ইত্যাদি। ঋগ্বেবেদের এই মডেলের বয়স 3600/3700 বছর, আর পীথাগোরাসের মডেলের বয়স 2550 বছর মাত্র।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদের গতিশীলতার কথা বলেন ইউডোক্সাস [Eudoxus of Cnidus]। এই গতিশীলতার মতবাদকে আরও সমৃদ্ধ করেন কালিপ্পাস [Callippus of Cyzicus]। এরপর আসরে আসেন অ্যারিস্টটল [Aristotle] [384-322 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] এবং শেষে গ্রীক-মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমিউস [Claudius Ptolemaeus] [100 - 170 খ্রিস্টাব্দ] ঘোষণা করলেন তাঁর 'ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ' [Geo-centric Theory]। টলেমি বহুকাল ধরে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের পরে তাঁর বিখ্যাত বই 'আলমাজেস্ট' [Almagest] লিখেছিলেন। এই বইটি তেরোটি বইয়ের সংকলন। বইটি প্রকাশিত হয় 150 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই বইটি লিখতে টলেমি, পের্গার [Perga] অ্যাপোলোনিয়াস [Appollonius] [220 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] এবং রোডসের [Rhodes] হিপ্পারকাসের [Hipparchus] [150 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাপত্রগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। ওই 'আলমাজেস্ট' গ্রন্থের প্রথম দুটি বইয়ে আছে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং তাঁর গাণিতিক পদ্ধতিসমূহ। এখানেই তিনি বললেন, বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী স্থির। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহসমূহ এবং নক্ষত্রগুলি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণরত। এই মতবাদই 'ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ' নামে খ্যাত। টলেমিই এর প্রবক্তা।
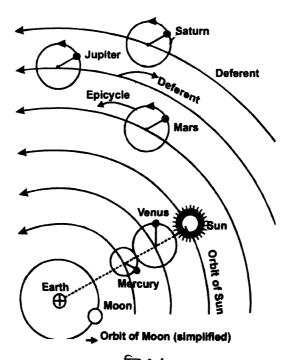
চিত্র ঃ 1

ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ অনুসারে পৃথিবী ও গ্রহদের অবস্থান ●

তাঁর মতে মহাকাশ হল এককেন্দ্রিক [Concentric] একটি শূন্যগর্ভ গোলক যার অক্ষ গিয়েছে পৃথিবীর মধ্য দিয়ে এবং সে গোলকে নক্ষত্রদের অবস্থান। এই গোলক পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। ফলে, নক্ষত্রদের উদয় ও অস্ত দেখা যাচ্ছে। এই গোলক তার সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটি উজ্জ্বল গ্রহকেও নিয়ে ঘুরছে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গোলক আছে পৃথিবী ও নাক্ষত্রীয় গোলকটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে। তাঁর মতে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের পৃথিবী থেকে ক্রমান্বয়ে অবস্থান হল ঃ চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। উপরের 1 নম্বর চিত্রে দেখানো হল, 'ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ' অনুসারে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটি গ্রহের অবস্থান। প্রায় 1300 বছর চালু থাকার পর এই মতবাদ পুরোপুরি ভুল বলে প্রমাণিত হয় কোপারনিকাস [Nicolaus Copernicus] এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি [Galileo Galilei]-এর 'সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ' [Helio-centric Theory]-এর আবিষ্কারের ফলে। অবশ্য টলেমির প্রায় 300 বছর পরে এবং কোপারনিকাসের [1473-1543 খ্রিস্টাব্দ] প্রায় এক হাজার বছর আগেই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট [476 খ্রিস্টাব্দ] প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমারত, নক্ষত্রেরা স্থির, পৃথিবীর নিজস্ব অক্ষে পরিক্রমণের জন্য গ্রহ নক্ষত্রদের প্রাত্যহিক উদয়-অস্ত হয়।

সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের প্রবক্তা কোপারনিকাস [1473-1543 খ্রিস্টাব্দ] হলেন পাশ্চাত্যের প্রথম বিজ্ঞানী যিনি মহাবিশ্বের জন্য সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব-মডেলের আবিষ্কর্তা বা প্রবক্তা। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর সময় থেকেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার শুরু। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাবিশ্ব কেমন তার প্রথম প্রবক্তা হলেন কোপারনিকাস। বিশ্বতত্ত্বের সেই প্রথম শুরু। কোপারনিকাসের মহাবিশ্ব অসীম, সূর্যকেন্দ্রিক এবং তার গোলকের প্রান্তদেশের নক্ষত্রেরা স্থির। কোপারনিকাসের পরে আসেন টাইকো ব্রাহে [Tycho Brahe] [1546-1601 খ্রিস্টাব্দ],জোহান্নেস কেপলার [Johannes Kepler] [1571-1629 খ্রিস্টাব্দ] এবং গ্যালিলিও [Galileo Galilei] [1564-1642 খ্রিস্টাব্দ]। এঁরা তিনজনেই বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এঁরা তিনজনই মূলতঃ কোপারনিকাসের বক্তব্যকেই নানাভাবে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য টাইকো ব্রাহে কোপারনিকাসের মতবাদকে ঠিকমত মেনে নেন নি। আবার সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের বিরোধিতাও তিনি করেন নি।

টাইকো ব্রাহের পর বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এলেন জোহান্নেস কেপলার। তিনি কোপারনিকাসের মতবাদকেই পরিপুষ্ট করেছেন। তাঁর গ্রহের গতি সংক্রান্ত সূত্র তিনটি অতি বিখ্যাত। এগুলি 'কেপলারের সূত্র' [Kepler's Law] নামেই খ্যাত। কেপলার কোপারনিকাসের মহাবিশ্বকে মেনে নিয়েছিলেন। আবার কেপলারের তিনটি সূত্রকে ভিত্তি করেই নিউটনীয় মহাবিশ্বের ভিত্তি তৈরি হয়। মহাবিশ্বের স্বরূপ এইভাবে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করে। মহাবিশ্বের আধুনিক রূপ গাণিতিক সূত্র দিয়ে প্রথম প্রকাশ করলেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন [1642-1727খ্রিস্টাব্দ] । নিউটনের মডেল অনুসারে মহাবিশ্ব অসীম, নক্ষত্রগুলি তাতে সুষমভাবে ছড়িয়ে আছে। মহাবিশ্বের কেন্দ্র কোথাও নেই। পরে দেখা গেল নক্ষত্রগুলি মহাবিশ্বে সুষমভাবে নেই। মহাবিশ্বের কোথাও নক্ষত্র ঘনত্ব বেশি, কোথাও তা কম। আর নক্ষত্রগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেও সেগুলি এলোমেলোভাবে মহাবিশ্বে ছড়ানো।

নিউটন মহাবিশ্বের স্বরূপ সম্পর্কে কোনও একটি সুস্পষ্ট ধারণায় আসতে পারেন নি। 1692 এবং 1693 খ্রিস্টাব্দে তিনি রিচার্ড বেন্টলিকে [Richard Bentley] দুটি চিঠি লেখেন। এই দুটি চিঠিতে নিউটন বিশ্ব সম্পর্কে দুটি ধারণার কথা বলেন। তাঁর এই দুটি ধারণাই মহাবিশ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যায়

অপারগ ছিল। সুতরাং নিউটনের মহাবিশ্ব মডেল মহাবিশ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে নি। প্রথম চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, কোনও সীমিত পরিসরের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত বস্তু যদি অবস্থান করে তা হলে সেই তন্ত্র [System] স্থায়ী হতে পারে না। কারণ নিজস্ব অভিকর্ষের প্রভাবে এই পরিসরের প্রান্তদেশের বস্তুগুলি ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখী হবে এবং ক্রমশঃ কেন্দ্রে এসে জমা হয়ে এক বিশাল বস্তুপুঞ্জ সৃষ্টি করবে ওই পরিসরের কেন্দ্রে। সুতরাং মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ কোনও সসীম পরিসরে থাকতে পারে না। তাই তিনি মনে করতেন মহাবিশ্বের বস্তুগুলি যদি কোনো অসীম পরিসরে পরিব্যাপ্ত থাকে তা হলে সেই তন্ত্রই স্থায়ী হতে পারে। তাঁর মতে, বিশ্বের বিস্তৃতি অসীম হলে তার 'ভারকেন্দ্র' [Centre of Gravity] কেবলমাত্র একটি হবে না। অসীম বিশ্বের ভারকেন্দ্রের সংখ্যা অসীম হবে। ফলে, তেমন মহাবিশ্বের বস্তুগুলি সবদিক থেকে সমানভাবে আকৃষ্ট হবে এবং সে কারণে মহাবিশ্ব একই জায়গায় থাকবে।

নিউটন কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতেই তাঁর এই মহাবিশ্ব মডেল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর ওই অসীম সংখ্যক ভারকেন্দ্র বা অভিকেন্দ্র যুক্ত অসীম মহাবিশ্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 1693 খ্রিস্টাব্দে বেন্টলিকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে। তিনি বলেছিলেন, অসীম পরিসরেও বস্তুগুলি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না। আর ভারসাম্যের সামান্য পরিবর্তনেই বস্তুগুলি পারস্পরিক আকর্ষণে পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং শেষ অবধি তাদের অভিকেন্দ্রিক পতন ঘটবে। সুতরাং নিউটনের ওই অসীম পরিসরের মহাবিশ্ব হবে অস্থায়ী। এইভাবে মহাবিশ্বের স্বরূপের প্রকৃত ব্যাখ্যা অধরাই থেকে যায় নিউটনের আমলে। মহাবিশ্বকে সঠিক ব্যাখ্যা করার সমস্যাটা রয়েই যায়।

নিউটনের কাল থেকে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ [General Theory of Relativity] অবধি প্রায় 200 বছর ধরে মহাবিশ্বের স্বরূপ নিয়ে নানা বিতর্ক ও নানা মডেল চালু হয়। নিউটনের ধারণায় মহাবিশ্ব অসীম। এই সময়ের বিকল্প ধারণা হল, দেশ বা মহাকাশই [Space] অসীম, তার কিছু অংশে রয়েছে সীমিত সংখ্যক নক্ষত্র এবং ছায়াপথ। আবার বস্তুছাড়া মহাকাশ অর্থহীন। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ বা দেশ রয়েছে। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন অবশ্য বলেছেন, মহাবিশ্ব সসীম কিন্তু প্রান্তহীন বা সীমানাবিহীন। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে দুটি নতুন নতুন আবিষ্কারের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এর একটি হল মাখের [Ernst Mach] [1838-1916 খ্রিস্টাব্দ] বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যাকে আইনস্টাইন বলতেন 'মাখের নীতি', [Mach's Principle] এবং অন্যটি হল রীমানীয় জ্যামিতি [Riemannian Geometry]।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বার্কলে [George Berkeley] [1685-1753 খ্রিস্টাব্দ] বলেছিলেন যে, আমরা অনুভব করি বলেই বস্তুর অস্তিত্ব আছে। অতএব নিরপেক্ষ দেশ বা মহাকাশ বলে কিছু নাই। মনে করা যাক, একটি গোলক ঘুরছে। কিন্তু এই ঘোরাটা বোঝা যাবে যদি ওই গোলকের বাইরে কোনও নির্দেশ বিন্দু থাকে। তাই নিউটনের ধারণার নিরপেক্ষ মহাকাশ কল্পনা করা যায় না। তবে স্থির কিছু নক্ষত্র নিয়ে যদি হঠাৎ কোনও মহাকাশের সৃষ্টি হয়, সেই আকাশের বিভিন্ন অংশে গোলকের গতিবিধির ধারণা করা সম্ভব, কারণ ওই নক্ষত্রগুলি স্থির হওয়ায় ওইগুলিই তখন নির্দেশ বিন্দু হিসাবে কাজ করে। বার্কলের এই বক্তব্য কিংবা বলা যায় 'তত্ত্ব' সে সময় নিউটনের প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তাঁর ওই তত্ত্ব সে সময় তেমন আমল পায়নি। তার প্রায় 150 বছর পরে মাখ বললেন, দুটি

পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ কোনও বলের জন্য নয়, প্রকৃতির নিয়মে তারা পরস্পরের সহযোগী। পদার্থের জড়ত্ব তার নিজস্ব ধর্ম নয়, মহাবিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রতিফলন। মাখ তাঁর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেন নি। বুঝিয়ে বলেন নি, মহাবিশ্বে এই তত্ত্ব কেমনভাবে কাজ করে। গাণিতিক কোনও সূত্রও আবিষ্কৃত হয় নি এই তত্ত্বের প্রেক্ষিতে। মাখ কিন্তু বিখ্যাত হন তাঁর 'মাখ সংখ্যা' [Mach Number]-র জন্য। বেগের আপেক্ষিক মান সাধারণতঃ মাখ সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

যাইহোক, আইনস্টাইন মাখের এই তত্ত্ব থেকে গভীর প্রেরণা লাভ করেন। একে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'মাখের নীতি' [Mach's Principle] বলে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন গ্রহণ করেছেন মাখের এই তত্ত্বকে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন বহু প্রচলিত 'ইউক্লিডীয় জ্যামিতি' [Euclidean Geometry]-র সাহায্যে না নিয়ে, সাহায্য নিয়েছিলেন 'রীমানীয় জ্যামিতি'-র [Riemannian Geometry]। এই রীমানীয় জ্যামিতির স্রষ্টা হলেন তিনজন—কার্ল গউস [Karl Friedrich Gauss] [1777-1855 খ্রিস্টাব্দ], জানস বলিয়াই [Janos Bolyai] [1802-1860 খ্রিস্টাব্দ] এবং নিকোলাই ইভানোভিচ লোবাচেভ্স্কি [Nikolai Ivanovich Lobachevsky] [1792-1856 খ্রিস্টাব্দ]। গোটিংগেনের বার্নহার্ড রীম্যানের [Gorge Friedrich Bernhard Riemann] [1826-1866 খ্রিস্টাব্দ] নামে এই নতুন জ্যামিতির নাম 'রীমানীয় জ্যামিতি' হলেও, ওই তিনজন গণিতজ্ঞই এই নবীন জ্যামিতির পথিকৃৎ।

সমান্তরাল দুটি রেখা একই বিন্দুতে কখনও ছেদ করে না ইউক্লিডীয় জ্যামিতির এই স্বতঃসিদ্ধ কেন জ্যামিতি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না এই প্রশ্নের সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন ওই তিনজন গণিতজ্ঞ। গউস ওই স্বতঃসিদ্ধের বিকল্প কী হবে তা অনুমান করেছিলেন। কিন্তু এই অনুমান তাঁর মত বিশ্বখ্যাত গণিতজ্ঞের কাছে এতই অদ্ভুত মনে হয়েছিল যে, তিনি গণিত জগতে উপহাসের পাত্র হয়ে পড়বেন একথা ভেবেই তা প্রকাশ করলেন না সে সময়। হাঙ্গেরীর বলিয়াই 1823 খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করলেন, ওই স্বতঃসিদ্ধ অস্বীকার করে ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এমন এক নতুন ও পৃথক জ্যামিতি তৈরি করা যায়। প্রায় একই সময়ে রাশিয়ার লোবাচেভ্স্কিও একই সিদ্ধান্তে আসেন। একালে এঁদের জ্যামিতিকে বলা হয় 'পরাবৃত্তীয় জ্যামিতি' [Hyperbolic Geometry]। রীমানই প্রথম এই নবীন জ্যামিতির প্রয়োগ করলেন গোলকের ক্ষেত্রে। তাঁর নাম থেকেই এই জ্যামিতির নাম হল রীমানীয় জ্যামিতি। এরপর ফেলিক্স ক্লেইন [Felix Klein] [1849-1925 খ্রিস্টাব্দ] প্রমাণ করেন, রীমানীয় জ্যামিতি ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিসঙ্গতভাবেই, এই দুই জ্যামিতিকেই বাস্তব জগতে ব্যবহার করা যায়। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে প্রয়োগ করেছেন এই রীমানীয় জ্যামিতি। এই নব জ্যামিতি ত্রিমাত্রিক দেশ বা মহাকাশের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করল চতুর্মাত্রিক দেশ বা মহাকাশকে। রীমানীয় জ্যামিতির মতে মহাকাশ বা দেশ তথা মহাবিশ্ব চারমাত্রার। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ বা উচ্চতা ছাড়াও আরেকটি মাত্রার কথা বলল এই জ্যামিতি। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে এই চতুর্থ মাত্রা যে সময় বা কাল [Time] সে কথা বললেন। আমরা ত্রিমাত্রিক গোলক পৃষ্ঠের জীব, অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর জীব এবং আমাদের মনে হয় এই গোলকটি সসীম কিন্তু প্রান্তহীন বা সীমানাবিহীন। আমরা ভাবতে পারি না বলে বিশ্বের আরেকটি মাত্রা থাকতে পারে না এই সিদ্ধান্ত টানা যায় না। সুতরাং মহাবিশ্ব তিনটি নয় চারটি মাত্রা দিয়ে গঠিত হতে পারে — তার এমন ধর্ম থাকতেও পারে যা চারমাত্রা দিয়ে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে চতুর্থ মাত্রা হল 'সময়' বা 'কাল'।

নিউটনের ধারণায় দেশ ও কাল কিংবা মহাকাশ ও সময় অন্য নিরপেক্ষ বলে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, কিন্তু আইনস্টাইনীয় তত্ত্বে সময় নিরপেক্ষ নয় বলে প্রমাণ করা হল। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্বের অনুভূতি সংযুক্ত মহাকাশ ও সময়ের পরিবর্তনশীল সন্ততিতে [Continuum] ছড়িয়ে আছে। এই সন্ততির স্পন্দনের সঙ্গে পদার্থগুলি সহজতম অবস্থান বেছে নেয়। মহাকাশ-সময়-সন্ততির নীতি অনুসরণ করেই পদার্থরা গড়িয়ে যায়। এটা মহাকর্ষের তুল্য, কিন্তু একে 'বল' [Force] বলে ধরে নেওয়ার দরকার নেই। আলোক রশ্মিও ওই মহাকাশ-সময়-সন্ততিতে বক্র পথ অনুসরণ করে। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বিশ্ব সম্পর্কে যা যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে এই রকম ঃ

1916 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশ করলেন। নিউটন তাঁর 'Principia' গ্রন্থে যা বলেছিলেন, তা সহজ কথায় বললে দাঁড়ায়, 'একটি মাধ্যমে বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি অকাট্য প্রমাণিত হলে, সেগুলি ওই মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে বা সমবেগে চলন্ত অন্য সব মাধ্যমে সমানভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।' আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, এই মাধ্যমগুলিতে শুধু বলবিদ্যারই নয়, প্রাকৃতিক সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলিও একই রকম হবে, যদি ওই মাধ্যমগুলি সম্পূর্ণরূপে জাড্যগুণ সম্পন্ন মাধ্যম [Perfectly Inertial System] হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি দেখালেন, যে মাধ্যমগুলি পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে চলমান অবস্থায় আছে সেগুলিতে তো বটেই, তা ছাড়াও কোন নিময় না মেনে চলে খামখেয়ালিভাবে বা যদৃচ্ছভাবে [Arbitrarily] চলন্ত অবস্থায় আছে অথবা নিয়মিত ত্বরান্বিত বেগে [Accelerated Velocity] আছে, এইরূপ সব মাধ্যমগুলিতেও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একইভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।

'মহাকর্ষীয় আকর্ষণ' [Gravitational Attraction] —নিউটনের এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি বললেন, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র [Gravitational Field]। দেশকালসন্ততির বা মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠনের ব্যাখ্যায় তিনি সনাতন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির [Euclidean Geometry] সাহায্য না নিয়ে রীমানীয় জ্যামিতির [Riemannian Geometry] সাহায্য গ্রহণ করলেন। তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর গতিকে বোঝালেন মহাকাশের ক্ষেত্রের ধারণা দিয়ে এবং জানালেন মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠনের জন্য এমনটা হয়। আইনস্টাইন 'বল' বলে কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। সমস্ত রকম বলকে শক্তির [Energy] সংজ্ঞায় প্রকাশ করা এবং প্রতিটি শক্তিকে একটি 'ক্ষেত্র' [Field] হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তাই নিউটনের মহাকর্ষীয় বলকে বাদ দিয়ে আইনস্টাইন তাঁর 'মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র' ধারণা প্রতিষ্ঠিত করলেন 1916 সালের ওই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে [General Theory of Relativity]।

আইনস্টাইন বললেন, "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী কোন বস্তুবিহীন অবস্থায় মহাকাশের [Space] অস্তিত্ব নেই। মহাকাশের ভৌত অস্তিত্ব হল একটি ক্ষেত্র যার সংগঠনে চারটি অংশ—তিনটি হলো মহাকাশের সাধারণ তিনটি মাত্রা ও চতুর্থটি সময়। এদের ভিতরের যে বিশেষ প্রকার নির্ভরতার সম্বন্ধ, সেটিই মহাকাশের যথার্থ বাস্তব রূপকে প্রকাশ করে। আর যেহেতু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করে, সেহেতু কোনরূপ কণিকা বা ভর-বিন্দু কোন অপরিহার্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে পারে না অথবা গতির ধারণাও করতে পারে না। কোন কণিকা হল শুধুমাত্র মহাকাশে একটি সীমাবদ্ধ স্থান, যেখানে ক্ষেত্রশক্তির বা শক্তির ঘনত্ব বেশি।"

বস্তুহীন মহাকাশের [Space] অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব ও বেগ অনুযায়ী। তাঁর এই মতে তিনি বললেন, মহাকাশ সমস্ত বস্তু ধারণকারী কোন অনমনীয় [Rigid] এবং পরিবর্তনাতীত [Immutable] কাঠামো নয়, পরন্তু মহাকাশ বা দেশ ও সময় বা কাল যে দুটিকে অনন্যগত [Independent] বলে মনে করা হত, সে দুটি অবিচ্ছিন্ন এবং এই সন্ততি কোন নির্দিষ্ট আকার শূন্য, নমনীয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্তনশীল। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বই এই সন্ততিকে নুইয়ে দেয় [Bends], বিকৃত করে [Distorts] এবং বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি হবে, সন্ততির নুইয়ে পড়া এবং বিকৃতি দুই-ই তত বেশি হয়।

প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব ও বেগ অনুযায়ী, যার গঠন হলো এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু আলদেয়া জমির মত। মহাকাশের যে কোন স্থানে ও যে কোন সময়ে ওই ক্ষেত্রের শক্তি [Field Strength] জানা যায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের দ্বারা। সাবানের ফেনা যেমন সাবানের বুদ্বুদ তৈরি করে, এই বিশ্বের বুদ্বুদ তেমনি তৈরি হয়েছে শূন্য মহাকাশের সঙ্গে শূন্য সময়কে ঝালাই করে [Welded]।

বিশ্বের এই বক্রতার জন্য কোন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আলো সরল রেখায় যেতে পারে না, কারণ এই বক্র মহাকাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এরূপ যে, তার ভিতরে সরল রেখা বলে কিছুই থাকতে পারে না। আলো যে ক্ষুদ্রতম পথে যায় তাও একটি নির্ভেজাল বক্রপথ, যার আকৃতি নির্ভর করে ওই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপর। সৌরজগতের ভিতরে বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ বেশি বলেই আলোর বক্রপথ যতটা বেশি বাঁকা হবে, তুলনামূলকভাবে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তঃ-গ্যালাক্সী পথে আলো অতটা বাঁকা পথে চলবে না, বরং বেশ সোজা বা সরল পথেই চলবে। সূর্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় আলোকরশ্মির বাঁক নেওয়ার পরিমাণ হবে 1-74 সেকেন্ড [Seconds of an arc]। এডিংটন এটা 1919 সালে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসে।

আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন, সূর্যের পাশ দিয়ে কোনও আলোক-রশ্মি আসার সময় সেটি সূর্যের দিকে যতটা বেঁকে যায় তার পরিমাণ হবে,

$\Delta = 4\ GM/ac^2$,

যেখানে, Δ = বিচ্যুতির কৌণিক মাপ

G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক [Gravitational Constant],

M = সূর্যের ভর,

a = সূর্যের ব্যাসার্ধ,

c = আলোর গতিবেগ,

সূর্যের বেলায় Δ -এর মান হয় 1.74 সেকেন্ড (কৌণিক মান)। এটা আইনস্টাইন অঙ্ক কষেই দেখিয়েছিলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে 1916 খ্রিস্টাব্দে। বৃটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন তার নিখুঁত সত্যতা প্রমাণ করলেন সর্ব প্রথম 1919 সালে। তারপর 1922 এবং অন্যান্য বছর নানা সময় নানাভাবে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এখন সর্বজনীন সত্য। এই আলোক পথের বিচ্যুতির ঘটনা বিজ্ঞানে 'আইনস্টাইন অভিক্রিয়া' [Einstein Effect] নামে বিশ্বখ্যাত। তিনি তাঁর এই তত্ত্বে তিনটি সিদ্ধান্ত অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট করেন। তাদের দ্বিতীয়টি ছিল এই আলোর বেঁকে যাওয়া যেটি সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় বাস্তবে এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইনের প্রথম অনুসিদ্ধান্তটি ছিল বুধগ্রহের কক্ষপথের বিচলন সম্পর্কে সমস্যার সমাধান। এটিকে বলা হয় 'বুধের অনুসূরের চলন' [Advance of the perihelion of Mercury]। আইনস্টাইন বললেন, গুরুভার বস্তুর আশেপাশের মহাকাশ বা মহাকাশ-সময়-সন্ততি বেশি বক্রতা লাভ করে। সেই মহাকাশে গতিশীল কোনও বস্তু বাঁকা পথে [Curved Path] পথ পরিক্রমা করে। সূর্যের থেকে যে গ্রহ যত বেশি দূরে তার কক্ষপথ ততই বৃত্তাকার। কাছাকাছি থাকা গ্রহদের সূর্য পরিক্রমণ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। বুধগ্রহ যেহেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থিত, তাই তার কক্ষপথ অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক [Eccentric]। এর ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্রে ছিল না। পাওয়া গেল আইনস্টাইনের তত্ত্বে এবং সূত্রে। নিউটনের সূত্র অনুসারে কোন গ্রহের সূর্যের চারিদিকে ঘোরার অবকল সমীকরণ [Differential Equation] হল,

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{\alpha}{h^2u^2}$$

আইনস্টাইনের দেওয়া এই সমীকরণ হল,

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{\alpha}{h^2u^2}+3\alpha$$

দুটি সমীকরণেই,

$u=\frac{1}{r}=\text{Radius Vector}$

$\alpha = Mu^2$, যেখানে,

M = গুরু বস্তুটির ভর। বুধের বেলায় যা সূর্যের ভর।

h = ক্ষেত্রীয় গতি [বুধের]।

বুধের অনুসূরের চলন তথা কক্ষপথের অয়নচলন [Precession] নিউটনের সূত্র দিয়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না বহুদিন। এই অয়নচলন গতি বাস্তবে প্রতি 100 বছরে 574 সেকেন্ড (কৌণিক)। কিন্তু নিউটনের সূত্র দিয়ে এই অয়নচলন গতির মান পাওয়া গেল 532 সেকেন্ড। পার্থক্য হল 42 সেকেন্ডের। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সনাতন পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের কথা বলল। নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃতও হল। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হল না। আইনস্টাইনের ওই সমীকরণ এই সমস্যার সমাধান করল। নিউটনের সমীকরণের সঙ্গে আইনস্টাইনের সমীকরণের পার্থক্য হল 3α এবং এর থেকে আইনস্টাইন দেখালেন বুধের কক্ষপথের অয়নচলন গতির ওই পার্থক্য $\varepsilon=\frac{6\pi M^2}{h^2}$ যেখানে M = সূর্যের ভর, h = বুধের ক্ষেত্রীয় গতি। এখান থেকে ε-এর মান বের হল 43 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। সুতরাং বহুকাল ধরে চলে আসা বুধগ্রহের কক্ষপথের অয়নচলন সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। নিউটনের সমীকরণ থেকে পাওয়া বুধের কক্ষপথের অয়নচলন গতির মানের সঙ্গে বাস্তব মানের পার্থক্য ছিল 42 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে এই মান 43 সেকেন্ড পাওয়া গেল। এই সমীকরণ তৈরি হয়েছে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মহাকর্ষ তত্ত্ব থেকে। সুতরাং তাঁর তত্ত্ব যে সঠিক এবং একেবারে বাস্তব তা প্রমাণিত হল। বুধের অনুসূরের অয়নচলন [Precession of Perihelion] প্রতি 100 বছরে 574 সেকেন্ডের (কৌণিক) কিছুটা বেশি। নিউটনের সমীকরণ থেকে তা পাওয়া গেছিল 532 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। আর আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে তাঁর সমীকরণ দিয়ে এই মান অঙ্ক কষে বের হল প্রায় 575 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। এই মান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া বাস্তব মানের

সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রায় এক। মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দেওয়া সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সত্য বলে আবারো প্রমাণিত হল এবং তাঁর মহাকর্ষ-ক্ষেত্র-তত্ত্ব [Gravitational Field Theory] প্রতিষ্ঠিত হল।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি দেখিয়েছিলেন আলো যদি কোন শক্তিশালী মহাকর্ষক্ষেত্র থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তবে তার কম্পাঙ্ক [Frequency] কিছুটা কমবে এবং তরঙ্গ -দৈর্ঘ্য [Wavelength] কিছুটা বাড়বে। ফলে ওই আলোর বর্ণালিতে লালের দিকে কিছুটা সরণ [Shift] দেখা যাবে। আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন এই সরণ হবে,

$\frac{d\lambda}{\lambda}=\frac{Gm}{ac^2}$ যেখানে, $\lambda =$ আলোকরশ্মিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য,

$d\lambda =$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন,

$G =$ মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, $m =$ যে বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র থেকে আলোক রশ্মিটি দূরে চলে যাচ্ছে তার ভর, $a =$ ওই বস্তুর ব্যাসার্ধ, $c =$ আলোর গতিবেগ।

এই সূত্র থেকে অঙ্ক কষে পাওয়া গেল সূর্যের আলোর বর্ণালির ক্ষেত্রে এই সরণ কিংবা $d\lambda$ -এর মান হবে 0.01 অ্যাংস্ট্রম যদি আলোক রশ্মিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 5000 অ্যাংস্ট্রম হয়। এক অ্যাংস্ট্রম [Angstrom] একক হল 10^{-8} সেন্টিমিটার। একে লেখা হয় Å চিহ্ন দিয়ে। সুতরাং সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে 5000 অ্যাংস্ট্রমের তরঙ্গবিশিষ্ট আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে 10^{-10} সেন্টিমিটার। মাপের পক্ষে এই দৈর্ঘ্যটি সে সময় খুবই অসুবিধাজনক ছিল। 1925 খ্রিস্টাব্দে ডবল্যু, এস, অ্যাডামস [W.S.Adams] মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে 'লুব্ধক' [Sirius] নক্ষত্রের সঙ্গী-নক্ষত্রটির বর্ণালি পরীক্ষা করে তার 'লাল-সরণ' [Red Shift] মাপলেন। এই নক্ষত্রটি যথেষ্ট ভারী নক্ষত্র এবং এর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তিও সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি। ডপলার এফেক্ট [Doppler Effect]-জনিত সংশোধন করে নেওয়ার পর বর্ণালির লাল-সরণের মান পাওয়া গেল 0.32 অ্যাংস্ট্রম। ওই নক্ষত্রটির ব্যাসার্ধ প্রায় 18,000 কিলোমিটার। আইনস্টাইনের ওই সূত্র থেকে অঙ্ক কষে পাওয়া গেল লাল-সরণ 0.32 অ্যাংস্ট্রম। সুতরাং আবারো পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হল আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব তথা সাধারণ আপেক্ষিকাবাদ। মহাকর্ষ ক্ষেত্রজনিত কারণে আলোর বর্ণালির এই সরণ 'আইনস্টাইন-সরণ' [Einsteinian Shift] নামে অভিহিত।

আইনস্টাইনের ধারণা মতো বিশ্ব হল সীমাহীন কিন্তু অন্তহীন নয়। তাঁর মতে, মহাকাশ-সময়-সন্ততি অন্তহীন নয় [Finite] কিন্তু সীমাহীন [Unbounded]। বৈদ্যুতিক-চৌম্বক ক্ষেত্রের বাস্তব গঠন যেমন ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্র সমীকরণের [Field Equation] দ্বারা জানা যায় এবং মহাকাশের যে কোনও স্থানে ও যে কোন সময় ওই ক্ষেত্রের শক্তিও [Field strength] জানা যায়; তেমনি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বাস্তব অস্তিত্ব এখন স্বীকৃত এবং এই ক্ষেত্রের গঠন, ক্ষেত্রশক্তি ও শক্তি-ঘনত্ব ইত্যাদি জানা যায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলির দ্বারা।

আইনস্টাইন আরও বললেন ইথারকে কোনরূপ মাধ্যম না ভেবে মনে করা যেতে পারে, এটি মহাকাশের একটি গুণ যার জন্য শক্তি তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বেলাতেও এইরূপ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের [Gravitational Waves] অস্তিত্ব আছে। আলোর মতই এই মহাকর্ষের প্রভাব একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায় তরঙ্গের আকারে। এই তরঙ্গের বেগ

আলোর বেগের সমান। আলোকশক্তি যেমন ফোটন দ্বারা বাহিত হয় তেমনি মহাকর্ষ শক্তিও যে কণা দ্বারা বাহিত হয় তার নাম 'গ্র্যাভিটন' [Graviton]। তবে মহাকর্ষ তরঙ্গের শক্তি খুবই দুর্বল। কিন্তু এই তরঙ্গ বস্তুর ভরের উপর কাজ করে। আইনস্টাইন এই তরঙ্গের সমীকরণও বের করেন।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য জানানো হল। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে এর ব্যাপ্তি এবং ব্যাপক প্রয়োগ নিয়ে নানা চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এখন চেষ্টা চলছে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদকে মিলিয়ে দিয়ে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বিরোধের মীমাংসা করার, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ মাধ্যাকর্ষণ ও অতি দ্রুতগতির জগৎ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এনেছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মাধ্যাকর্ষণকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অতি দ্রুতগতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা বলে; সব কিছু বদলালেও পদার্থবিজ্ঞানের তথা প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অপরিবর্তনীয়। আরও জানলাম ঃ সব বস্তুর প্রচুর স্থির শক্তি আছে; সূর্য স্থির শক্তির সামান্য ছেড়ে দেয়; পরমাণু বোমাগুলি কিংবা পারমাণবিক চুল্লি অনুরূপ শক্তি ছেড়ে দেয়; হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নিষ্ক্রমণ সূর্যের শক্তি নিষ্ক্রমণের সঙ্গে একেবারে এক; কণা-ত্বরায়কে নিয়মমত নতুন পদার্থ তৈরি হয়; স্থিরশক্তি বস্তু তৈরি করে। আরও জানা গেল ঃ যে বস্তু নীচের দিকে পড়ছে তা সামান্য স্থিরশক্তি হারায়; মাধ্যাকর্ষণ আলোকে থামিয়ে দিতে পারে ও কৃষ্ণ-গহ্বরের [Black Hole] সৃষ্টি করতে পারে; কোন জিনিষ কৃষ্ণগহ্বরে পড়লে তা অনেকখানি স্থিরশক্তি মুক্ত করে, মরণোন্মুখ নক্ষত্রেরা তীব্র মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি করে, মাধ্যাকর্ষণের ফলে মুক্ত স্থিরশক্তি বিরাট মহাজাগতিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করতে পারে; কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে একবার কোন কিছু পড়লে তা আর বেরিয়ে আসতে পারে না; একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভর পৃথিবীর ভরের সমান হলে তার ফাঁদ থাকে কেন্দ্রের থেকে মাত্র $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি দূরে; সূর্যের সমান ভরের কৃষ্ণগহ্বরের মরণ ফাঁদ থাকে তার কেন্দ্র থেকে দুই মাইল দূরে। আরো জানলাম, আলো ভারী বস্তু এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে এর গতিপথ বেঁকে যায়; শক্তিবিহীন বস্তু বক্রস্থানে সরলপথে যায়, মহাকাশ বস্তুর অবস্থানের জন্য বক্রতাসম্পন্ন; মাধ্যাকর্ষণ আলোর ওপরে ক্রিয়া করে সময়ের দিক নির্দেশ করে, একটি ভারী ঘূর্ণায়মান বস্তু সঙ্গে র স্থানকে টেনে নেয়। আমরা জানলাম ঃ আলো মহাকর্ষের প্রভাবে মন্থর হয়ে যায় বলে মনে হয়; আলোর এই আপাত মন্থর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সময়ের মন্থর হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কিত; আলোর বেঁকে যাওয়ার অর্থ মহাকর্ষ স্থানকে বিকৃত করে; সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে আলোর বেঁকে যাওয়া এবং মন্থর হয়ে যাওয়া পরিমাপ যোগ্য; মহাকর্ষ-তরঙ্গ বস্তুকে ক্রমাগত লম্বা বা প্রসারিত করে; ত্বরিত মহাকাশ যান তার পিছনে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করতে পারে; এমন মহাকাশ যানে আলো বেঁকে যায়; জৈবিক সময় পারমাণবিক সময় এক; কৃষ্ণগহ্বরে যেতে পারলে যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে; উচ্চগতিতে সময় ধীরে চলে, পদার্থের ভর বাড়ে, ভ্রমণের দূরত্ব কমে যায় বলে মনে হয়; ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও ভৌত নিয়মগুলি সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে; আলো যতদূর যায় তা সময় পরিমাপ করে; গ্যালাক্সীরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছে যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে; এক ধরনের বেতার শক্তি সমস্ত বিশ্বকে ঘিরে আছে; আইনস্টাইন বিগব্যাঙ [Big Bang] ঘোষণা করতে পারতেন, যা হাবল 1929 সালে করলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

1917 সালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্র সমীকরণগুলিকে কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইন দেখালেন মহাবিশ্বের আকৃতি ও গঠনে রয়েছে সঙ্কোচন-প্রবণতা। তাঁর এই তত্ত্বানুসারে অস্থির বিশ্বের

ধারণাকে কিছুতেই পরিহার করা যায় না। মহাবিশ্ব নিরন্তর প্রসারিত হবে কিংবা সংকুচিত হবে। মহাবিশ্বের সব অংশ যদি স্থির থাকতো তাহলে মাধ্যাকর্ষণ তাদেরকে পরস্পরের কাছে টেনে আনতো এবং সসীম স্থির বিশ্বের স্থায়ী গোলাকৃতি রূপটিই যেতো হারিয়ে। তাঁর মতে, বস্তুপুঞ্জগুলির পারস্পরিক অভিকর্ষ এবং পারস্পরিক দূরত্ব এই দুটি কারণের আন্তঃক্রিয়ায় মহাবিশ্বের গঠন স্থায়ীভাবে গোলাকার হবে। এই রকম বিশ্ব-মডেলে অভিকর্ষের আপেক্ষিক প্রাবল্যের ফলে ওই সসীম গোলাকৃতি মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে থাকবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তখনও পর্যন্ত মহাবিশ্বের এই ধরনের কোনও সঙ্কোচনের কথা বলেন নি। আবার আইনস্টাইনের সরল সমীকরণগুলি যে সরলবিশ্বের কথা বলে সে বিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হবে এবং তার সর্বোচ্চ ব্যাস বিশ্বের মোট শক্তির উপর নির্ভর করবে আর কোনও কিছুর উপর নয়। প্রসারণের এই বেগ কিন্তু ক্রমশঃ কমতে থাকবে এবং মহাবিশ্বের বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ব্যাসে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা ক্রমশঃ কমতে থাকবে। তারপর মহাবিশ্ব আর প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হতে থাকবে। সংকুচিত হতে হতে শেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরও অনেক নতুন তত্ত্ব ছিল; ছিল নানা তথ্যও, যেগুলি পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়। যেমন, কেবলমাত্র বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যাস নয় সমস্ত ঘটনার সামগ্রিক সময়ও মহাবিশ্বের মোট শক্তির উপর নির্ভরশীল। কোনও সরল বিশ্বের মোট শক্তি, সূর্যের স্থিতি ভরের যে পরিমাণ শক্তি হয় $E = mc^2$ সূত্র মেনে যদি তার সমান হয়, তবে সেই বিশ্ব এক মাইলের মত প্রসারিত হয়ে আবার সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। আর এই প্রসারণকাল এবং সঙ্কোচন-সময় দুটোই কিন্তু পরস্পরের সমান হবে।

1917 সালে আইনস্টাইনের কাছে এতোসব তথ্য ছিল না। তিনি দেখলেন তাঁর প্রস্তাবিত, কিংবা বলা যায় তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রসূত যে মহাবিশ্ব-মডেল পাওয়া গেল সে মডেল সংকোচন-প্রবণতা সম্পন্ন, যার ফলে মহাবিশ্ব তার সাময়িক স্থায়ী অবস্থা থেকে ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকবে। মোটামুটিভাবে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে পাওয়া গেল, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল হলেও তার ক্রমঃসঙ্কোচনও ঘটবে। আইনস্টাইন এই সময় যে বিশ্বতত্ত্ব খাড়া করেন তাতে মহাবিশ্বের সংকোচনশীলতা এবং প্রসারণশীলতা দুটি-ই ছিল। এই অস্থির বিশ্ব-মডেল নিয়ে আইনস্টাইন বেশ বিব্রত বোধ করলেন। কারণ তাঁর আগের প্রায় সব বিজ্ঞানী—নিউটন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানী সবাই বলেছেন মহাবিশ্ব নিশ্চল বা স্থিতিশীল। এই প্রথম আইনস্টাইন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি তাঁর ওই অস্থির বা অস্থায়ী বিশ্ব-মডেলের পরিবর্তে এক স্থায়ী, অচঞ্চল [Stable] বিশ্ব-মডেলের কথা বললেন। মহাবিশ্বের সংকোচন প্রবণতার কারণ হল অভিকর্ষের প্রাবল্য। মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে অভিকর্ষজনিত এই সংকোচনশীলতা। আইনস্টাইন ধারণা দিলেন এক মহাজাগতিক বিকর্ষণ শক্তির [Cosmic Repulsion Force]। নিউটনের মহাকর্ষ শক্তির ধ্রুবক হচ্ছে 'G'। আইনস্টাইন তাঁর এই নবকল্পিত বিশ্ব-বিকর্ষণ শক্তির স্থিরাংকের সূচক হিসাবে বেছে নিলেন গ্রীক বর্ণমালার λ [Lambda]-কে। এই বিশ্ব-বিকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া মহাকর্ষ শক্তির একেবারে উল্টো। নিউটনের মতে, দুটো বস্তু যত বেশি কাছাকাছি থাকবে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল তত বেশি হবে। আর, আইনস্টাইনের মতে, দুটি বস্তু যত বেশি দূরে থাকবে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ শক্তিও তত বেশি হবে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্রসূত্রগুলির সঙ্গে Lambda factor [λ-factor] যোগ করে আইনস্টাইন মহাবিশ্বের দ্বিতীয় একটা মডেল দিলেন। এই মহাবিশ্বে G-ধ্রুবক সমন্বিত আকর্ষণ শক্তির সঙ্গে ল্যাম্‌ডা ফ্যাক্টার বা λ-factor যোগ করা বিকর্ষণ শক্তির বিপরীত ক্রিয়ার ফলে মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠন

হবে অচঞ্চল [Stable]। কিন্তু এই বিশ্ব অসীম হবে না, হবে সসীম; কিন্তু এর কোনও সীমানা থাকবে না, এ হবে অবাধ। আইনস্টাইনের ভাষায়, বিশ্ব হল সসীম ও সীমানাহীন [Finite but Unbounded]। পৃথিবীপৃষ্ঠ যেমন সসীম এবং অবাধ, তেমনি বিশ্বও সসীম এবং অবাধ বা সীমানাহীন। পৃথিবীর উপর দিয়ে সোজা হাঁটতে থাকলে যেমন হাঁটা শুরুর স্থানে ফিরে আসা যায়, তেমনি আইনস্টাইনের এই দ্বিতীয় বিশ্ব-মডেলের মহাবিশ্বে আলোকরশ্মি কোনও বিন্দু থেকে নির্গত হয়ে সমগ্র গোলাকার বিশ্ব পরিভ্রমণ করে আবার সেই নির্গমন বিন্দুতেই ফিরে আসবে। এই মহাবিশ্ব চতুর্মাত্রিক, যার চতুর্থ মাত্রাটি হল কাল বা সময়। 1931 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন ওই λ -ধারণা বাতিল করে দেন। মেনে নেন তাঁর প্রসারণশীল কিংবা সংকোচনশীল মহাবিশ্বকে। অর্থাৎ অস্থির বিশ্ব-মডেলই হল আইনস্টাইনের স্বীকৃত বিশ্ব-মডেল। 1929 সালে হাবল [Edwin Powell Hubble] [1889-1966খ্রিঃ] তাঁর 'সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Expanding Universe Theory] উপস্থাপিত করার পর আইনস্টাইন তাঁর ওই λ -ধারণা বাতিল করে বলেছিলেন, "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির সময় হাবলের এই বিশ্বের সম্প্রসারণের কথা আবিষ্কৃত হয়ে থাকলে, λ আরোপ করার প্রয়োজন হত না।" সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বিশ্বের যে প্রসারণশীলতার রূপ বেরিয়ে এসেছিল হাবলের তত্ত্বে তা স্বীকৃত হল 1929 খ্রিস্টাব্দে। আবার 1965 সালে প্রকাশিত অ্যালান স্যান্ডেজের 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory] প্রমাণ করে বিশ্ব সংকোচনশীল। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিশ্ব সংকুচিত এবং প্রসারিত দুই-ই হয়। এখন তার প্রসারণ চলছে পরে সংকোচন হবে। এই 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' এখন বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন।

আইনস্টাইন λ -ধারণা যোগ করে তাঁর দ্বিতীয় বিশ্ব-মডেল প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে 1930 খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভিলেম দ্য সিটার [Willem de Sitter] [1872-1934 খ্রিস্টাব্দ] একটি বিশ্ব-মডেল উপস্থাপিত করলেন। এই মডেল আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল মডেল বলে মনে হলেও পরে দেখা গেল এই মডেল অস্থির এবং প্রসারণশীল [Expanding] বিশ্বের কথাই বলছে। আইনস্টাইন ভেবেছিলেন বিশ্বে বস্তু-ঘনত্ব এমনই বেশি যে তাদের অভিকর্ষজনিত শক্তি [G-factor], তাদের পারস্পরিক দূরত্বজনিত মহাবিকর্ষণ শক্তিকে [λ - factor] নাকচ করে দেওয়ার বা সাম্যে রাখার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট। এর ফলে, ওই λ - factor সমন্বিত মডেলে বিশ্বের সংকোচন বা প্রসারণের কোনও গতিই থাকে না। কিন্তু দ্য সিটারের ধারণায় বিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব, আইনস্টাইন যা ধরেছেন, তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং সিটারের এই মতানুসারে বস্তুবিরল মহাবিশ্বে আকর্ষণ শক্তির চেয়ে বিকর্ষণ শক্তি অনেকটাই বেশি। ফলে, বিশ্বের বস্তুগুলি পরস্পর ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে দুটি মডেল বেরিয়ে এলো। একটি আইনস্টাইনের স্থির বিশ্ব, যেখানে 'Matter without Motion' বিদ্যমান। অন্যটি দ্য সিটারের প্রসারণশীল মহাবিশ্ব, যেখানে 'Motion without Matter' ধর্ম বিদ্যমান।

আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন [Arthur Stanley Eddington] সিটার-কল্পিত ফাঁকা মহাবিশ্বে বস্তু ঘনত্ব বাড়িয়েও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে প্রসারণশীল বিশ্বের খোঁজ পেলেন। 1922 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রীডমান [Alexandre Alekasndrovich Friedmann] নতুন করে আপেক্ষিক তত্ত্বের গবেষণায় আইনস্টাইনের ল্যাম্ডা-মডেলে একটি সামান্য বীজগণিতীয় ভুল বের করেন। সে ভুল সংশোধন করে নিয়ে দেখা গেল আইনস্টাইনের ল্যাম্ডা-মডেলের মহাবিশ্বও নিশ্চল

নয়। এই মডেলের মহাবিশ্ব নিশ্চল তো নয়ই, উপরন্তু এটি পর্যায়ক্রমে প্রসারণ এবং সংকোচনশীল। পাওয়া গেল স্পন্দনশীল মহাবিশ্বের ধারণা। আবার ল্যামডা বাদ দিয়েও ফ্রীডমান পেলেন প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মডেল। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই বেরিয়ে আসতে পারতো 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory]। কিন্তু আইনস্টাইন কিংবা ফ্রীডমান কেউই এ নিয়ে বেশি চেষ্টা করেন নি। ওই সময় লোভেল মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'লাল সরণ' [Red Shift] থেকে ছায়াপথগুলির সরে যাওয়ার আভাস ভালোভাবেই পাচ্ছিলেন। আইনস্টাইন 1917 সালেই প্রসারণশীল বিশ্বের কথা ঘোষণা করতে পারতেন। এমন কি স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বও তিনি প্রস্তাব করতে পারতেন 1927 সালের পরে পরেই। ফ্রীডমানও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসরণ করে এগুলি যথাযথভাবে প্রমাণ করতে পারতেন। কিন্তু এদের দুজনের কেউই আর এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। 1922 সালে ফ্রীডমান বলেছিলেন ঃ "গ্যালাক্সীগুলি যে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার কারণ বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল এক প্রচণ্ড কেন্দ্রীয় বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। জন্মমুহূর্তের সেই বিস্ফোরণজনিত গতি আজও লক্ষিত হয় গ্যালাক্সীগুলির উৎকেন্দ্রিক গতিবেগের মধ্যে।" সুতরাং ফ্রীডমান অনেকটা আগেই 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' [Big Bang Theory]-র কথা বলেছিলেন। কিন্তু তখন তা গৃহীত হয় নি। ফ্রীডমান মারা যান 16 সেপ্টেম্বর, 1925 খ্রিস্টাব্দে। তিনি জন্মেছিলেন 1888 সালের 29শে জুন।

1927 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ ল্যামাৎর বা জর্জেস্ লেমেতার কিংবা জর্জেস লেমাইটার [Georges Lemaitre] [1894-1966 খ্রিঃ] ফ্রীডমানের তত্ত্ব কিংবা বিশ্ব মডেলের কথা একদম না জেনে প্রায় একই রকমের একটি বিশ্ব-মডেল বানিয়ে ফেলেন এবং এই সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাপত্রটি তিনি প্রকাশ করেন ব্রাসেলসের 'Annales de a Socie'tc' Scientifique' পত্রিকায়। এই বিজ্ঞানীর নামের উচ্চারণ নিয়ে বিবাদ থাকায়, উপরে ওঁর নামের তিন রকম উচ্চারণই দেওয়া হল। আমরা ওঁকে 'লেমেতার'-ই বলবো। লেমেতারের এই গবেষণা যখন প্রকাশিত হয় তখন ফ্রীডমান মারা গেছেন। এডিংটন লেমেতারের এহ মত সমর্থন করেন। ফলে, লেমেতারের তত্ত্ব 'এডিংটন-লেমেতার তত্ত্ব' [Eddington Lemaitre Theory] নামে পরিচিত হয়। তবে, এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্বই লেমেতারের প্রাপ্য। কারণ, এডিংটন এই তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর সমর্থন করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। লেমেতার তাঁর তত্ত্বে বললেন কিংবা বলা যায় প্রমাণ করলেন ঃ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে মহাবিশ্বের প্রসারণ, সংকোচন বা স্পন্দনশীলতার বীজ উপ্ত আছে। বর্ণালির লালসরণ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তিনিই প্রথম মহাবিশ্বের আদিম উচ্চ ঘনীভূত রূপ কল্পনা করেছিলেন। তাঁকে তাই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের [Big Bang] জনক বলা হয়। সসীম বিশ্বে ল্যামডা-ফ্যাক্টর [λ - factor]-কে ধনাত্মক [Positive] ধরে আইনস্টাইনের মত লেমেতারও দেখান যে, মহাবিশ্ব নিশ্চল বা স্থির নয়, প্রসারণশীল। লেমেতারের মহাবিশ্ব-মডেলের প্রথম ধাপে মহাকর্ষ শক্তি ল্যামডা বলের চেয়ে প্রবল তাই মহাবিশ্বের প্রসারণের হার কিছুটা মন্দীভতূ। এভাবেই মহাবিশ্ব আইনস্টাইনের মডেলের ব্যাসার্ধে পৌঁছে যায়। পরে দ্বিতীয় ধাপে ল্যামডা বল মহাকর্ষ বলের চেয়ে ক্রমশঃ কমতে থাকে। ফলে, প্রসারণের মন্দন বাড়ে। লেমেতারই বললেন, একটি বিপুলকায় আদিম পরমাণুর [Primeval Atom] বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্ব। এই বিস্ফোরণে সৃষ্ট আদিম অগ্নিগোলক [Primeval Fireball] প্রচণ্ড বেগে স্ফীত হতে থাকে। ফ্রীডমান তত্ত্বের সঙ্গে লেমেতারের এই তত্ত্বের বহু মিল। ফ্রীডমান 1922 সালে জার্মানীর স্বল্পখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা Zeitschrift fur

Physik-এ তাঁর গবেষণা পত্রটি প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তখন তত বিখ্যাত ছিল না বলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং বিশ্বতত্ত্ববিদদের নজর এড়িয়ে যায় ফ্রীডমানের ওই নিবন্ধটি। তাই পাঁচ বছর পরে লেমেতার তাঁর গবেষণা পত্রে যেসব তত্ত্ব হাজির করেন বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে, সেগুলির আধিকাংশই ছিল ফ্রীডমানের আবিষ্কারগুলির পুনরাবৃত্তি। লেমেতার ফ্রীডমানের আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না তাঁর নিজের ওই গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হওয়া অবধি।

লেমেতারের গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি অনতিখ্যাত পত্রিকায়। এই প্রবন্ধটি কারও চোখে না পড়লেও আইনস্টাইনের চোখে ঠিক পড়েছিল। পরে একদিন আইনস্টাইন লেমেতারকে বলেছিলেন, "আপনার গণিত অভ্রান্ত, কিন্তু এই প্রবন্ধে আপনার পদার্থবিজ্ঞান বড়ই কাঁচা।" অবশ্য কিছুটা পরে আইনস্টাইন লেমেতার সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা পাল্টেছিলেন। 1933 সালে ব্রাসেলসে এক বক্তৃতায় আইনস্টাইন লেমেতারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "আপনার কাজ খুবই সুন্দর।" লেমেতার ছিলেন একজন বেলজিয়ান পাদ্রী এবং গণিতজ্ঞ, তিনি বিশিষ্ট তাত্ত্বিক বা দক্ষ পর্যবেক্ষক কোনটাই ছিলেন না। তবুও বিশ্বতত্ত্বে তাঁর অতুলনীয় সংযোজন আমাদের বিস্মিত করে।

লেমেতারের প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুদিন পরে 1929 খ্রিস্টাব্দে মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যাসহ আসরে এলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল [Edwin Powell Hubble]। হাবল ইউরোপের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের থেকে বিচ্ছিন্নই ছিলেন। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ নিয়েই তাঁর সময় কেটে যেত। তিনি ছিলেন দক্ষ পর্যবেক্ষক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। হাবলের উপরওয়ালা জর্জ এলারি হেল স্বীকার করেছেন যে, জটিল আপেক্ষিকতাবাদ ছিল হাবলের জ্ঞানের পরিধির বাইরে, কোনওদিন তা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। হাবল যখন তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করেন তখন ওই আবিষ্কারের সমর্থনে তিনি কোনও তত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষ অবধি তিনি তাঁর আবিষ্কারের খুবই একটা সাদামাঠা নাম দেন—'লাল-সরণ বনাম দূরত্বের সম্পর্ক'। তাঁর ওই গবেষণাপত্রে তিনি বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা নিয়ে একটা কথাও বলেন নি। যদিও বিশ্বের প্রসারণের কথা তাঁর গবেষণার মধ্যে বীজ হিসাবে সুপ্ত ছিল।

হাবল জন্মেছিলেন 1889 খ্রিস্টাব্দের 20 শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরীর নার্নফিল্ডে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। এখানেই তিনি শিক্ষক হিসাবে পান দুই দিকপাল বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে। এঁদের একজন হলেন রবার্ট মিলিকান [1868-1953 খ্রিস্টাব্দ] নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী;আর দ্বিতীয় জন হলেন, জর্জ এলারি হেল [1968-1938 খ্রিস্টাব্দ], যিনি ছিলেন এক বিশাল মাপের জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় ইয়ার্কসের মাউন্ট উইলসন মানমন্দির। হাবল অক্সফোর্ড থেকে আইনে স্নাতক হয়েও তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। 1919 খ্রিস্টাব্দে তিনি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে যোগ দেন। শিক্ষক হেলের [Hale] অধীনে কাজ করতে থাকেন। প্রায় 10 বছর ধরে নানা পর্যবেক্ষণের পর হাবল তাঁর ওই গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। সেটা ছিল 1929 খ্রিস্টাব্দ।

বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানীরা নানা তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এঁদের মধ্যে মোটামুটিভাবে এক সর্বজন গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল 1929 খ্রিস্টাব্দে এডিংটন-লেমেতার মডেল চালু হওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই। হাবলের সূত্র অনুযায়ী কোটি কোটি গ্যালাক্সী তাদের অভ্যন্তরের অগণিত নক্ষত্রজগৎ নিয়ে আলোর গতির প্রায় অর্ধেক বেগে অর্থাৎ সেকেন্ডে 1,50,000 কিলোমিটার বেগে মহাশূন্যের চারিদিকে ছুটে চলেছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের নাম দিলেন, 'সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব' (Expanding Universe Theory)। এই তত্ত্বেরই আরেক নাম 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' (Big Bang Theory)। 1930 সালে জর্জ

লেমেতার (Georges Lemaitre) এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, 1,000 কোটি অর্থাৎ 10^{10} বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু একটি আদিম পরমাণুতে (Primeval Atom) পর্যবসিত ছিল। তিনি এর নাম দিলেন 'Super Dense Cosmic Egg'। তারপর সেই মহাজাগতিক অণ্ডটি প্রচণ্ড শব্দে, আকস্মিকভাবে হঠাৎই বিস্ফোরিত হল। তারই ছিন্নভিন্ন দেহ থেকে সৃষ্টি হল লক্ষকোটি গ্যালাক্সী এবং তারা ছুটতে আরম্ভ করলো অকল্পনীয় বেগে মহকাশের দিকে দিকে। সৃষ্টি হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে অভিহিত এই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে খুব বড় রকমের একটা ভুল বেশ কিছুদিন পরে বৈজ্ঞানিকদের নজরে এলো। এই তত্ত্বে গ্যালাক্সীগুলো পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে এবং তারা কোনদিনই আর ফিরবে না সেই বিস্ফোরণ কেন্দ্রে। চিরদিনই তারা ছুটে চলবে বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে দূরে আরো দূরে — দূর হতে দূরতর অবস্থানে। কেন্দ্র থেকে যতই দূরে সরে যাবে ততই তাদের গতি বাড়বে এবং ত্বরান্বিত হবে সে গতি। এমন একটা সময় আসবে যখন গতি বাড়তে বাড়তে আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যাবে। যা অসম্ভব, অন্ততঃ আইনস্টাইনীয় ধারণায়। তাছাড়া ওই গতিবেগে বস্তুগুলির কী অবস্থা হবে বা হচ্ছে, যদি সত্যিই অমন হয়ে থাকে, তা কোনদিন জানা যাবে না। বাস্তবে তো নয়ই, তত্ত্বেও না। কারণ ওগুলো যদি আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ছুটতে থাকে বিপরীতমুখী বেগে তবে কোন যন্ত্রপাতিই ওদের হদিশ করতে পারবে না কোনও কালে। অন্ততঃ আমাদের এই পার্থিব যন্ত্রপাতি তা মোটেই পারবে না। আবার আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী আলোর গতিবেগ ধ্রুবকও বটে আবার সর্বোচ্চও বটে। সুতরাং তত্ত্বে কিংবা বাস্তবে ওদের অবস্থা বিচার করা অসম্ভব হবে। এই চিন্তা-ভাবনাগুলো নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করলো মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে ধরে নিয়ে। 1965 সালে অধ্যাপক অ্যালান স্যান্ডেজ (Allan Samdage) নতুন তত্ত্ব দিলেন যার নাম 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' (Pulsating Universe Theory) । স্যান্ডেজ সাহেবের মতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে, লয় হচ্ছে, আবার নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বললেন, এই বিশ্বের বয়স এখন 10^{10} বছর এবং এখন চলছে এর সম্প্রসারণ কাল। এইভাবে এর সম্প্রসারণ চলবে আরও 3×10^{10} বছর ধরে। তারপর গ্যালাক্সীগুলো ছুটে চলার শক্তি হারাবে। তখন বিশ্ব শুরু করবে সংকুচিত হতে। এইভাবে আবার সৃষ্টি হবে 'মহাজাগতিক অণ্ড' বা Cosmic Egg, একদিন যা বিস্ফোরিত হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো। আবার একদিন হবে মহাবিস্ফোরণ এবং আবারো সৃষ্টি করবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এইভাবে আবর্তিত হবে সংকোচন ও প্রসারণের চক্র।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের তথাকথিত অত্যাধুনিক ধারণার শুরু 1922 খ্রিস্টাব্দে। এর আগে নিউটনের প্রায় একশ বছর পরে উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) দেখালেন নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি নিউটনের মহকার্ষসূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হার্শেল কিছু কিছু গ্যালাক্সী এবং কিছু নক্ষত্রমণ্ডলীর গঠনের একটা মোটামুটি খসড়া দিয়ে ফেলেন। সৌরমণ্ডল এবং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের (Milkyway Galaxy) নক্ষত্রমণ্ডলী যে মহাকর্ষ সূত্র মেনেই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করছে তাও আবিষ্কার করেন। এর ফলে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বিশ্বজনীনতা লাভ করে। এই তত্ত্বের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। হার্শেল এবং তাঁর পরবর্তীকালের আবিষ্কারে ধীরে ধীরে বিশ্বসম্পর্কে ধারণা বদলাতে থাকে। বিশ্বকে নিউটন-পূর্ববর্তী কালে যতটা ছোট বা যেমন বলে মনে করা হত, নতুন ধারণায় দেখা গেল বিশ্ব তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিশাল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক অবধি এই ধারণা নানা নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হতে থাকে।

1924 খ্রিস্টাব্দে এডউইন হাবল (Edwin Hubble) প্রথম দেখালেন যে, আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে সর্পিল (Sprial) নীহারিকা আছে এবং তার অবস্থান অ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda) ব্রহ্মাণ্ডে। এই সর্পিল নীহারিকাটি আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই মত। যত শক্তিশালী দূরবীন তৈরী

হতে থাকলো ততই নানা গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হতে থাকলো। শেষ অবধি এই সিদ্ধান্ত অবধারিত হল যে, এই বিশ্ব অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি। শত শত ব্রহ্মাণ্ডের এই বিশ্ব 'Finite but Unbounded', আইনস্টাইন যেমন বলেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বিশ্ব হল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমাহার।

হাবল 1929 সালে বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব পেশ করেছিলেন। বিভিন্ন গ্যালাক্সীর নক্ষত্রগুলি যে আলো পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে তাদের বর্ণালির 'লাল-সরণ' (Red Shift) বিভিন্ন রকম। হাবল এই লাল-সরণের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন এগুলি হচ্ছে 'ডপলার এফেক্ট' (Doppler Effect)-এর ফল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাবল এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সমগ্র বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এই সম্প্রসারণ বেগ বিভিন্ন গ্যালাক্সীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। কোন গ্যালাক্সীর দূরে সরে যাওয়ার বেগ বা সম্প্রসারণ বেগ ওই গ্যালাক্সী আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে কতদূরে আছে তার উপর নির্ভরশীল। এই সম্প্রসারণ বেগ ওই গ্যালাক্সী এবং আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্বের সমানুপাতিক। অর্থাৎ যে গ্যালাক্সী আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে বেশি দূরে তার সম্প্রসারণ বেগও বেশি এবং তার আলোর বর্ণালিতে লাল-সরণও অনেক বেশি। "The recessional velocity of a galaxy is Proportional to its distance from our own galaxy. This proportionality is known as the 'Hubble Law' and it has been of profound improtance in Cosmology."

বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে ব্রহ্মাণ্ড, সেটি আমাদের নিজেদের ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী। এর নাম ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড বা Milkyway Galaxy। রাতের পরিষ্কার আকাশে একে দেখা যায়। একটি নক্ষত্র খচিত পথ এক বিশাল ফিতার মত আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা চলে গেছে, কিছু কিছু অংশ তার যেন ধোঁয়াশায় ঢাকা। এই নক্ষত্র পথই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ। এতেই আছে আমাদের সৌরমণ্ডল, আমাদের প্রিয় পৃথিবী এবং আমরা। এ কালে গ্যালিলিওই প্রথম বলেছিলেন এই আলোক-বন্ধনী অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি কিংবা সমাহার। পরে জানা গেল, অসংখ্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছে এই ছায়াপথ। এই নক্ষত্রেরা মেনে চলেছে মহাকর্ষ-সূত্র। অবস্থান করছে মহাকর্ষ নিয়ম মেনেই। আরও পরে জানা গেল এই ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রই শুধু আছে তা নয়, আছে মহাজাগতিক ধূলিকণা, মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays) এবং আছে চৌম্বক ক্ষেত্রও (Magnetic Field)। 1924-27 সালে সুইডেনের জ্যোতির্বিদ বের্টিল লিন্ডব্ল্যাড (Bertil Lindblad) এবং ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ জ্যান আউট (Jan Oot) আবিষ্কার করলেন আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড প্রবল বেগে ঘূর্ণায়মান। 1952 সালে আবিষ্কৃত হল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডও সর্পিল (Spiral)। এর প্রান্তদেশগুলিতে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন তরুণ নক্ষত্র। সব মিলিয়ে জানা গেল, এই সর্পিল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস একলক্ষ আলোকবর্ষ (Light Year), অর্থাৎ এর ব্যাসার্ধ হল 50,000 আলোক-বর্ষ। এটা সবাই এখন জানেন, 'আলোক-বর্ষ' হল দূরত্বের পরিমাপ। আলোক-রশ্মি তার প্রতি সেকেন্ড তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে এক সৌর-বৎসরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেই পরিমাণ দূরত্ব হল এক আলোক-বর্ষ (Light Year)। একটি আলোক রশ্মি শূন্যে এক বছরে যতটা পথ পাড়ি দেয় তা এক আলোক বর্ষ। সংখ্যায় প্রকাশ করলে এক আলোকবর্ষ হল 9,46000,00.00,000 কিলোমিটার বা 9.46×10^{12} কিমি। তারাদের দূরত্ব-মাপার আরেকটি বড় ধরনের একক আছে। তার নাম 'পার্সেক' (Parsec)। এক *পার্সেক হল 3.26 (সঠিকভাবে 3.262) আলোকবর্ষ বা 3080000,00,00,000 কিমি বা 30.8×10^{12} কিলোমিটার। সাধারণভাবে শূন্যে আলোর গতিবেগ 3×10^5 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। হিসাবপত্রে এই মাপই*

ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আলো মহাশূন্যে যায় প্রতি সেকেন্ড 2,99,792.457 কিলোমিটার। এক আলোকবর্ষ ওই হিসাবে 945,425,492,3952 কিলোমিটার। ব্যবহারিকভাবে এক পার্সেক 30.8×10^{12} কিমি হলেও প্রকৃতপক্ষে 30.861×10^{12} কিলোমিটার। সুতরাং আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস কিংবা ব্যাসার্ধ দুই-ই অকল্পনীয়। বিশ্ব জুড়ে এমনি হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ড আছে। বিশ্ব কি অকল্পনীয় বিশাল তা সহজেই অনুমান করা মুশকিল। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস হবে 100,000×946000,00,00,000 কিমি বা 9.46×10^{17} কিমি বা 946,000,000,000,000,000 কিলোমিটার বা নয় হাজার চারশো ষাট কোটি কোটি কিলোমিটার বা 9.46 পরার্ধ কিলোমিটার। আবার আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার ধরলে এক আলোকবর্ষ 9.4608×10^{12} কিমি এবং ছায়াপথ গ্যালাক্সীর ব্যাস হবে 9.4608×10^{17} বা 9.4608 পরার্ধ কিলোমিটার ।

সৌরমণ্ডল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে প্রায় 30,000 আলোকবর্ষ দূরে এবং গ্যালাক্সীর প্রান্ত থেকে 20,000 আলোকবর্ষ অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিজ্ঞানীরা এটা জেনেছেন যে, সাধারণতঃ গ্যালাক্সীর প্রান্তের দিকেই নতুন নতুন নক্ষত্র জন্ম নেয় বা নিচ্ছে। বেশির ভাগ তরুণ বা কম -বয়েসী নক্ষত্রের অবস্থান ছায়াপথের প্রান্তের দিকে। ছায়াপথের কেন্দ্রের কাছাকাছি সব নক্ষত্রই বয়সে প্রবীণতর, প্রান্তদেশের নক্ষত্রদের তুলনায় বয়োবৃদ্ধ। এর কারণ আজও অজানা এবং এই তত্ত্ব, এ যাবৎ আবিষ্কৃত সব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন ধরেই নিয়েছেন যে, গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে সাধারণতঃ কোনও নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয় না, বরং বেশির ভাগ মৃত নক্ষত্র বা কৃষ্ণ গহ্বর (Black Hole) গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করে। ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব মাপতে এখন শুধু আর 'পার্সেক' দিয়ে কাজ চলে না। একই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন নক্ষত্রের দূরত্ব বিশাল, দুই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও নক্ষত্র বিশালতম দূরত্বে অবস্থিত। শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কারের ফলে বহুদূরের নতুন নতুন ব্রহ্মাণ্ডেরা আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যকার দূরত্ব এখন কেবল পার্সেক একক দিয়ে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীরা এ'সব নাক্ষত্রিক এবং মহাজাগতিক দূরত্বগুলি মাপতে যে সব একক এখন ব্যবহার করছেন সেগুলি হল ঃ

(1) 1 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 14,96,00,000 কিমি (প্রায়)

(2) 2,06,264 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = $30,85,72,440 \times 10^5$ কিমি = 1পার্সেক

(3) 63,240 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 94608×10^8 কিমি = 1 আলোক বর্ষ

(4) 2,06,265,000 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 1 কিলোপার্সেক

= $30,85,72,440 \times 10^8$ কিমি

(5) 2,06,265,000,000 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক

= 1 মেগাপার্সেক

= $30,85,72,440 \times 10^{11}$ কিমি

= 308×10^{17} কিলোমিটার (প্রায়)

= 308 পরার্ধ কিলোমিটার।

সুতরাং এক মেগাপার্সেক একককটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসের প্রায় 32.46 গুণ। দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সমন্বয়ে গড়া আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের সৌরমণ্ডল এই *ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় 25 কোটি (মতান্তরে 20 কোটি) পার্থিব-বৎসর। এর গতিবেগ প্রায় 144* মাইল প্রতি সেকেন্ডে বা 240 কিলোমিটার/সেকেন্ড ।

বিভিন্ন গ্যালাক্সীর নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোর বর্ণালির লাল-সরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাবল 1929 সালে দেখালেন ঃ

" ....out to a distance of 30 million (তিন কোটি) light-years at least the radial Velocity of a Galaxy is proportional to its distance from the Milky Way. This does not imply that the Milky Way is a unique centre of expansion; on the contrary any galaxy may be regarded as a centre of expansion and an observer in the galaxy would observer the same Hubble-law of recession in effect in other galaxies."

হাবল বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর সূত্রের আনুপাতিকত্বের ধ্রুবক হল, 100 মাইল বা 160 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে প্রতি দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বে। অর্থাৎ আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে প্রতি দশ লক্ষ আলোবর্ষ দূরত্বে, বিশ্বের সম্প্রসারণ বেগ প্রতি সেকেন্ডে 160 কিলোমিটার করে বাড়তে থাকবে। তাঁর মতে, এই হিসাব থেকে পাওয়া যায় যে, বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ডসমূহ প্রায় 200 কোটি বছর আগে এক জায়গায় একত্রে ঘনীভূত হয়ে অবস্থান করছিল। পরে দেখা গেল হাবলের সূত্রে কিছু ভুল আছে। ওই ধ্রুবক হবে, 20 মাইল বা 32 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে এবং প্রতি দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বে। অর্থাৎ আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে প্রতি দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব বৃদ্ধিতে বিশ্বের সম্প্রসারণের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় প্রতি সেকেন্ডে 20 মাইল বা 32 কিলোমিটার। এই ধ্রুবক ধরে হিসাব করলে বিশ্বের সম্প্রসারণের শুরু তথা বিশ্ব-সৃষ্টির যে সময় পাওয়া যায়, তা হল এক হাজার কোটি পার্থিব-বৎসর। অর্থাৎ 10^{10} বছর আগে জমাট বাঁধা ওই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছে। পরবর্তীকালে অ্যালান স্যান্ডেজ (Allan Sandage) 1965 সালে নানা গ্যালাক্সীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বললেন, জমাট বাঁধা বিশ্বের ক্রম-প্রসারণ শুরু হয়েছে 10^{10} বছর আগে। প্রসারণ চলবে আরও 3×10^{10} বছর ধরে। এখন অবশ্য এই বিশ্বের বয়স 2×10^{10} বছর বলে বলা হচ্ছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করছেন বিশ্বের প্রকৃত বয়স আরও অনেকটা বেশি হতে পারে। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, প্রায় 2×10^{10} বছর আগে বিশ্ব জমাট বেঁধে একত্র অবস্থান করছিল। এই জমাট বাঁধা বিশ্বের নাম হল 'Super Dense Cosmic Egg' বা 'অতি ঘনীভূত মহাজাগতিক অণ্ড'। সংক্ষেপে একে মহাজাগতিক অণ্ড বা Cosmic Egg-ও বলা হয়।

এই মহাজাগতিক অণ্ড বিস্ফোরিত হয় বা Big Bang হয় প্রায় 2×10^{10} পার্থিব বছর আগে। এই বিস্ফোরণের কারণ অজানা। হঠাৎ এই বিস্ফোরণ। মহাজাতিক অণ্ডটি বিস্ফোরণে ছিন্ন-ভিন্ন হল। তার এই ছিন্ন-ভিন্ন দেহ থেকে তৈরি হল লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সী। তারা ছুটতে শুরু করল অকল্পনীয় গতিবেগে বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে দূরে। হাবলের এই তত্ত্ব 'সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব' বা 'Expanding Universe Theory' নামে খ্যাত। এর আরেক নাম 'Big Bang Theory' বা 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব'। এ দুই তত্ত্বের কথা মূলতঃ এক। জমাট বাঁধা বিশ্ব সম্প্রসারিত হতে পারে একটা মহাবিস্ফোরণ ঘটলে তবেই। সম্প্রসারণশীল বিশ্ব এক মহাবিস্ফোরণের ফলশ্রুতি। এই তত্ত্বে বলা হয়েছিল এই সম্প্রসারণ চলবে অনন্তকাল ধরে। গ্যালাক্সীগুলো আর কখন ফিরবে না তাদের বিস্ফোরণ কেন্দ্রে। পরস্পরের থেকে চলে যাবে ক্রমশ দুর হতে দূরতর এবং দূরতম অবস্থানে।

কিছুক্ষণ আগেই বলা হয়েছে হাবল-এর সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্বে ভুল ধরা, পড়ল এবং 1965 সালে অ্যালান স্যান্ডেজ দিলেন নতুন তত্ত্ব যার নাম 'স্পন্দশীল বিশ্ব তত্ত্ব' (Pulsating Universer Theory)। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্ব এখন প্রসারিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আরও 3×10^{10} পার্থিব-বৎসর পরে ব্রহ্মাণ্ডগুলির ছুটে চলা শেষ হবে। তখন শুরু হবে সংকোচন। এখন বিশ্বের বয়স 10^{10} বৎসর অর্থাৎ ওই Big Bang হয়েছিল 10^{10} বছর আগে। আরও 3×10^{10} বছর পরে বিশ্বের প্রসারণ শেষ

হবে। সংকোচন শুরু হবে এবং 4×10^{10} বছর ধরে ক্রম সংকোচন শেষে সব কিছুই আবার জমাট বেঁধে একত্রিত হয়ে পরিণত হবে সেই মহাজাগতিক অণ্ডে বা Cosmic Egg-এ, যা একদিন বিস্ফোরিত হয়ে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। এই তত্ত্বে বিশ্বের প্রসারণকাল 4×10^{10} বৎসর এবং সংকোচন কালও 4×10^{10} বৎসর। সুতরাং স্পন্দনশীল বিশ্বের মোট পর্যাবৃত্ত কাল (Periodic Time) হল 8×10^{10} পার্থিব বৎসর। মহাবিস্ফোরণের পর মহাজাগতিক অণ্ড ছিন্ন-ভিন্ন হয়। তার টুকরোগুলি সৃষ্টি করে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি হয় বিশ্বজগৎ। এই বিশ্ব প্রসারিত হয় 4×10^{10} বছর। তারপর বিশ্ব-সংকুচিত হয় 4×10^{10} বৎসর ধরে। আবার বিশ্ব প্রসারিত হয় এবং সংকুচিত হয় একই নিয়মে। এইভাবে আবর্তিত হয় প্রসারণ ও সংকোচনের চক্র (Expansion and Contraction Cycle)। বিশ্বের বয়স নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতভেদ আজও শেষ হয় নি। স্যান্ডেজ সাহেব বলেছিলেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 10^{10} বৎসর। 1979 সাল জর্জ এবেল বলেছেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 2×10^{12} বৎসর। মহাজাগতিক অণ্ডটি এবার বিস্ফোরিত হয়েছিল 2×10^{12} বৎসর আগে। এখন বিজ্ঞানীরা মনে করছেন বিশ্বের বয়স আরও কিছুটা বেশি হতে পারে। সুতরাং মহাজাগতিক অণ্ডের ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ক্রমপ্রসারণ এবং একটা সময় পরে ক্রমসংকোচন প্রক্রিয়ায় আবার তার বিস্ফোরণ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা এখন বৈজ্ঞানিক সত্য। বিশ্ব পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন। স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব এখন সেই কথাই বলছে। একবার মহাজাগতিক অণ্ড বিশ্বজগতে রূপান্তরিত হচ্ছে, আবার কিছুকাল পরে বিশ্বজগৎ মহাজাগতিক অণ্ডে পরিণত হচ্ছে। এই ধারা যুগ যুগান্ত ধরে চলছে বিরামহীনভাবে। তবে এখন বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বয়েস 2×10^{10} বৎসরই বলছেন। 10^{10} কিংবা 2×10^{12} বৎসর নয়। যাইহোক, আধুনিক বিজ্ঞান যেন দর্শনের কথারই প্রতিধ্বনি করেছে। কিংবা বলা যায়, বিজ্ঞান যেন ক্রমশঃ দর্শন হয়ে উঠছে। তবে এই দর্শন একেবারে খাঁটি ভারতীয় হিন্দু-দর্শন। প্রথম পরিচ্ছেদে এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য তাদের অত্যাধুনিক তত্ত্বের উপর কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন তুলেছে। সেগুলির মধ্যে চারটি প্রশ্ন খুবই মৌলিক ঃ

(1) মহাজাগতিক অণ্ড ভীষণ উত্তপ্ত ছিল। উত্তাপের ফলে সেখানে প্রোটন-নিউট্রনেরা আস্ত ছিল না। প্রশ্ন হল, আদি বিশ্ব এমন উত্তপ্ত কেন ছিল?

(2) বিশ্বকে যেদিক থেকে দেখা যাক না কেন, বিশ্ব অতি মাত্রায় সমত্বসম্পন্ন। এই সমতার কারণ কি?

(3) বিশ্বের সম্প্রসারণ বেগ সন্ধিক্ষণকালীন (Critical) বেগের সমানই আছে। সম্প্রসারণের হার বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যা ছিল এখনও তাই। অথচ সৃষ্টির আদিতে এই প্রসারণ হার যদি কোনওভাবে 10^{-17} ভাগ কম হত অর্থাৎ 10^{17} ভাগের একভাগ মাত্র কমে যেত তা হলে হাজার কোটি বছর পার হওয়ার অনেক আগেই বিশ্ব আবার সংকুচিত হয়ে যেত এবং বিশ্ব কোনও দিনই তার বর্তমান আকারে পৌছতে পারত না। বিশ্বের প্রসারণ বেগ এখনও সন্ধিক্ষণকালীন বেগের সঙ্গে প্রায় এক। বিশ্ব কেন ঠিক এই রকম একটা প্রসারণ বেগ নিয়ে প্রসারিত হচ্ছে এবং তার সন্ধিক্ষণকালীন প্রসারণ বেগ এমন নির্দিষ্টই বা হল কেন?

(4) বিশ্ব সমত্বসম্পন্ন হলেও স্থানীয়ভাবে কোথাও তার ঘনত্ব বেশি, কোথাও বা কম। এই স্থানীয় অনিয়ম তৈরি হয়েছে নক্ষত্র ও গ্যালাক্সীগুলির অবস্থানের ফলে। মহাকাশের বস্তু-ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। যদি আদি বিশ্ব সমত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে তবে এখন তার বস্তু ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয় কেন? মহাবিশ্বে কোথাও গ্যালাক্সী আছে কোথাও নেই কেন?

এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বিজ্ঞান আজও জানে না। হকিং [Stephen W. Hawking] সাহেবের মতে আদি বিশ্ব ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। তার সীমানাও ছিল অনিশ্চিত এবং বিশৃঙ্খল। ঘনত্ব সমতাও তখন ছিল না। সৃষ্টির শুরুতেই বিশ্ব ছিল অসংখ্য কৃষ্ণ-গহ্বর (Black Hole)। ঘনত্বের অসাম্যই বিশ্বকে

এমনভাবে সৃষ্টি করেছে। অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা থেকেই এ বিশ্বের জন্ম।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানার দরজা খুলে দিলেও, কোনও একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্ব-মডেল এখনও নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার মহাবিশ্বকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে। এই তো কিছুদিন আগে 1971 সালে ডেনিস সাইমা বলেছেন, "মহাবিশ্বকে জানতে বিশ্ব-তত্ত্বে একটি বলিষ্ঠ তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলি দেশ, কাল ও মহাকর্ষের তত্ত্ব নিয়ে যে আপেক্ষিকতাবাদ, তাও মহাবিশ্বের ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা, ভিন্ন ভিন্ন মডেল ব্যাখ্যা করে, অনন্যভাবে একটি নয়। তাই প্রকৃতির বাইরেও তত্ত্বটির উপযোগিতা থাকতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কোন তত্ত্ব না থাকলে যা ইচ্ছে ঘটতে পারে—যে কোন মডেল ভেবে নেওয়া যায়। কোন দুর্বল তত্ত্বের অবতারণা করলে দেখা যাবে তা দিয়ে এই অসংখ্য মডেলগুলিকে একটি সীমিত সংখ্যায় নামিয়ে আনা যাচ্ছে। আর শুধু একটি সরল তত্ত্ব দিয়ে অনন্য একটি মডেলের আবিষ্কারের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' ঠিক এই ধরনের কথা বলেছিলেন রবার্টসন [Howard Percy Robertson] নামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী 1933 খ্রিস্টাব্দে, আইনস্টাইন যখন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলি থেকে মহাবিকর্ষণজনিত λ - factor বাদ দিয়ে দিলেন এই factorটি অপ্রয়োজনীয় বলে, তার কিছুটা পরেই। রবার্টসন বলেছিলেন, আপেক্ষিকতাবাদের উপর এখন মহাবিশ্বের যেসব প্রতিরূপ দাঁড়িয়ে আছে—তা বিশ্বের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু মহাবিশ্বের অনন্য প্রতিরূপ পাওয়ার জন্য আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। রবার্টসনের প্রায় 40 বছর পরে সাইমা ওই একই কথা বলেছেন। আরও প্রায় 40 বছর অতিক্রান্ত হতে চলল, এখনও মহাবিশ্বের অনন্য কোন মডেল আবিষ্কৃত হয় নি। তবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী মহাবিশ্বের যে মডেলটি মেনে নিয়েছেন তা হল ঃ মহাবিশ্ব সসীম এবং অবাধ বা সীমানাহীন। এই মহাবিশ্ব স্পন্দনশীল—একবার প্রসারিত আবার নির্দিষ্ট সময় পরে সংকুচিত হয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদই প্রথম বলল মহাবিশ্ব চতুর্মাত্রিক। এটি সসীম এবং সীমানাহীন যেমন গোলকের ক্ষেত্রে হয়। এই সসীম মহাবিশ্বে কতকগুলি সীমিত সংখ্যক নক্ষত্র এবং ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী থাকবে। কোনও মহাকাশযাত্রী মহাকাশে পাড়ি জমিয়ে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড দেখে সে আবার তার নিজের যাত্রাশুরুর জায়গায় ফিরে এসে বলবে যে সে মহাবিশ্বের সর্বত্র ঘুরেছে, কিন্তু আর প্রান্তসীমা বা প্রান্তদেশ কোথাও দেখতে পায় নি। অবশ্য এ ধরনের ভ্রমণ তখন সম্ভব যদি মহাকাশ যাত্রীটি অমর হয় এবং তার মহাকাশ যানটির গতিও আলোর গতির কাছাকাছি গতিবেগ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রান্তহীন মহাবিশ্ব অনেকটাই আমাদের পৃথিবীর মতই। পৃথিবী যেহেতু গোলক তাই তার প্রান্ত নেই, কিন্তু সে সসীম। পৃথিবীর মতই মহাবিশ্ব সসীম এবং প্রান্তহীন বা সীমানাহীন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই বেরিয়ে এসেছে বিশ্বের এই রূপ। সে সময় নোবেলজয়ী বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন [Max Born] [1882-1970 খ্রিস্টাব্দ] বলেছিলেন, 'বিশ্বতত্ত্বে এই ধারণা মানুষের ইতিহাসে মহত্তম আবিষ্কার।'

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদই জন্ম দিয়েছে নানা বিশ্ব-মডেলের। দু-তিনটি মডেলের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই সব বিভিন্ন বিশ্ব-মডেলগুলিকে মোটমুটিভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ (1) প্রথম শ্রেণিটি হল বদ্ধ মহাবিশ্ব, যা আয়তনে সসীম এবং প্রান্তহীন বা সীমানাহীন। এই মহাবিশ্বের জ্যামিতিতে, এর পৃষ্ঠদেশের উপর কোনও ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি অবশ্যই 180^0-র বেশি হবে। এই মহাবিশ্ব রীমানীয় জ্যামিতি মেনে চলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নয় [চিত্র ঃ 2 (a)]। দুটি সমান্তরাল লেসার রশ্মি এই বিশ্বে ছুঁড়লে ওই রশ্মি দুটি ভেতরের দিকে বেঁকে যাবে এবং তারা একসময় একটি বিন্দুতে ছেদ করবে। অর্থাৎ আলো এখানে ভেতরের দিকে বেঁকে যাবে। 'ভিতরের দিক' মানে হল মহাবিশ্ব গোলকটির কেন্দ্রের দিক। সুতরাং এই মডেলের মহাবিশ্বে কোনও সরলরেখা টানা যায় না এবং এখানে সমান্তরাল সরলরেখা বলে কিছু নেই।

(2) দ্বিতীয় শ্রেণির মডেল হল অসীম আয়তনের মুক্ত মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্ব আকারে পরাবৃত্তীয় [Hyperbolic], অনেকটা ঘোড়ার পিঠের জিনের মত। এখানে দুটি সমান্তরাল লেজার রশ্মি পরস্পরের থেকে দূরে চলে যাবে। তাদের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং তারা কখনই পরস্পরকে ছেদ করবে না। এই মহাবিশ্বের জ্যামিতি অনুসারে মহাবিশ্বের পৃষ্ঠদেশে আঁকা কোনও ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি 180^0-র চেয়ে কম হবে। আলোক রশ্মি এখানে বহির্মুখী হবে যেহেতু মহাবিশ্বটি পরাবৃত্তীয় আকৃতির [চিত্র ঃ 2(b)] । এই মহাবিশ্বও প্রান্তহীন।

(3) তৃতীয় শ্রেণির মহাবিশ্ব হল সমতল মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্বের প্রান্ত থাকবে না। এটি অসীম তথা মুক্ত মহাবিশ্ব। এটির জ্যামিতি হবে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। এখানে দুটি চলমান সমান্তরাল লেসার রশ্মি চিরকাল সমান্তরালভাবেই চলমান থাকবে। এই মহাবিশ্বের কোথাও একটি ত্রিভুজ আঁকলে সেই ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180^0 হবে। [চিত্র ঃ 2 (c)]

সুতরাং মহাবিশ্বের মডেলসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তিনটি প্রধান পদ্ধতির আশ্রয় নেন। এর একটি হল 'জ্যামিতিক'। এইগুণ থেকে জানা যায় মহাবিশ্ব সসীম কিংবা অসীম এবং তার থেকে জানা যায় মহাবিশ্ব বদ্ধ অথবা মুক্ত। দ্বিতীয় ধর্ম হল, 'জাতীয়' ধর্ম যার সাহায্যে সার্বিক গতিশীলতা উপেক্ষা করে এবং তার অভ্যন্তরীণ গতিবিধি থেকে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল, প্রসারণশীল কিংবা সংকোচনশীল এই ধর্মগুলি নির্ণয় করা যায়। তৃতীয় পদ্ধতি হল, ফ্রীডমান-লেমেতার সূত্রের গতিশীল মহাবিশ্ব। এই তিনটি পদ্ধতি থেকে মহাবিশ্বের নানা মডেল উপস্থাপিত হয়। এই সব মডেলকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, সে কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

(a) **ধনাত্মক বক্র(তার দ্বি-মাত্রিক দেশ বা মহাকাশ**
[Two dimensional space of positive curvature]

(b) **ঋণাত্মক বক্র(তার দ্বি-মাত্রিক দেশ বা মহাকাশ**
[Two dimensional space of negative curvature]

(c) **শূন্য-বক্র(তার দ্বি-মাত্রিক দেশ বা মহাকাশ**
[Two dimensional space of zero curvature]
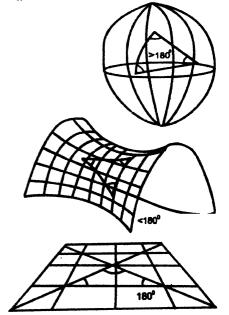
চিত্র ঃ 2

মহাবিশ্বের তিনরকমের দেশ বা মহাকাশের [Space] দ্বিমাত্রিক চিত্র।

2. (a) গোলকের এই বদ্ধতলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অচল। তাই এই তলে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180^0-র বেশি হবে। সমান্তরাল লেসার রশ্মি একসময় পরস্পরকে ছেদ করবে এই তলে।

2. (b) এটি একটি মুক্ত পরাবৃত্তীয় তল। এখানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অচল। এই তলে আঁকা ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180^0-র কম। সমান্তরাল লেসার রশ্মিরা এখানে পরস্পরের থেকে দূরে চলে যায়।

2. (c) মুক্ত সমতল। এই তল ইউক্লিডীয় জ্যামিতি মানে। এখানে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180^0 এবং সমান্তরাল দুটি লেসার রশ্মি চিরকাল সমান্তরাল থাকবে।

নিউটনের কাল থেকে মহাবিশ্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এটি অসীম, স্থির বা নিশ্চল। নিউটনের প্রায় 200 বছর পরে আইনস্টাইনের আমলে এসে তার নানান পরিবর্তন ঘটল। বিজ্ঞানীদের চোখে মহাবিশ্ব নানাভাবে প্রতিভাত হল। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্র সমীকরণগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের নানা রূপ আবিষ্কার করলেন। ফলে, মহাবিশ্বের নানা মডেলের উদ্ভব হল। সাধারণ অপেক্ষিকতাবাদের ওই সমীকরণ থেকে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মডেল বেরিয়ে এলেও আইনস্টাইন λ - factor প্রয়োগ করে মহাবিশ্বের নিশ্চল মডেল ঘোষণা করলেন। এরপর 1922 সালে আলেকজান্ডার ফ্রীডমান ওই ল্যামডা-মডেলের সামান্য কিছু বীজগণিতীয় ভুল ধরলেন এবং দেখা গেল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মহাবিশ্বের পর্যায়ক্রমিক প্রসারণ ও সংকোচনের কথাই বলছে। মহাবিশ্ব চির-অস্থির। হাবলের আবিষ্কারের পর 1931 সালে আইনস্টাইন এই λ - ধারণা প্রত্যাহার করে নেন এ কথা আগেই বলেছি। সুতরাং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে পাওয়া গেল মহাবিশ্ব সসীম কিন্তু তার প্রান্ত নেই এবং এটি নিয়তই অস্থির—প্রসারণ এবং সংকোচনধর্মী।

ফ্রীডমান আইনস্টাইনের মূল সমীকরণগুলি যেভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেন তার ভিত্তিতে অন্যান্য বিশ্বতত্ত্ববিদরা বিশ্বের কয়েক রকমের আকৃতি, গঠন ও বিবর্তন ধারার মডেল বানিয়ে ফেললেন। আগেই বলেছি, এই মডেলগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় এবং মোটামুটি তিনটি পদ্ধতিতে এই শ্রেণি বিভাজন করা হয়। এই পদ্ধতির কথাও একটু আগেই বলা হয়েছে। আবারো বলি, বিশ্ব সসীম কিংবা অসীম দুই-ই হতে পারে। আবার বিশ্ব চির সম্প্রসারণশীল হতে পারে অথবা একবার প্রসারিত একবার সংকুচিত বা Oscillating হতে পারে। মহাবিশ্বের গঠনটি ঠিক কী হবে তা নির্ভর করে মহাবিশ্বের বস্তু-ঘনত্বের উপর। কারণ মহাবিশ্বের মহাকর্ষ শক্তির সামগ্রিক পরিমাণ নির্ভর করে এই বস্তু-ঘনত্বের উপর। এই বস্তুঘনত্বজনিত মহাকর্ষণশক্তি যত বেশি হবে মহাবিশ্বের প্রসারণের হারও তত কম হবে। মহাবিশ্ব সংক্রান্ত যত মডেল এখনও তৈরি হয়েছে সেগুলি দুটি স্বতঃসিদ্ধ মেনে চলে। এর একটি হল 'ভাইলের স্বতঃসিদ্ধ' [Weyl's Postulate]। জার্মান গণিতবিদ হেরমান ভাইল [Hermann Weyl] এই স্বতঃসিদ্ধটির আবিষ্কর্তা। তাঁর নামেই এর নাম। এতে বলা হয়েছে, গ্যালাক্সীগুলির গতি আঁকাবাঁকা বা এলোমেলো নয়, তাদের গতিপথগুলি অনেকটা কোন বৃত্তের কেন্দ্র থেকে নির্গত ব্যাসার্ধগুলির মত। মহাকর্ষশক্তির জন্য অবশ্য এই পথগুলি বক্রতাসম্পন্ন। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটি হল হাবলের আবিষ্কারের ভিত্তিতে গঠিত 'বিশ্বতত্ত্বীয় সূত্র' [Cosmological Principle]। এই সূত্রে বলা হয়েছে, কোনও একটি বিশেষ সময়ে, সে সময় এখন বা দুশো কোটি কিংবা চারশো কোটি বছর আগে হতেও পারে, বিশ্বের যে কোনো দিক থেকে অন্য যে কোনো দিকে তাকালে সবদিককেই একই রকম মনে হবে। এই দুটি স্বতঃসিদ্ধ জটিল বিশ্বের ধারণাকে অনেকটাই সরল করে দেয়।

এই মহাবিশ্ব সসীম হলেও মানুষের কাছে বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে তা যেন অসীম। এই মহাবিশ্বে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্রের লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী, হাজারো কোটি নীহারিকা, অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ, সীমাহীন আয়তনের কোটি কোটি ঘন কিলোমিটার হাইড্রোজেন-হিলিয়াম গ্যাস, অজস্র নানান বিকিরণ, পরিমাপহীন ধূলিকণা, অপরিমেয় নানা শক্তি, বিশাল বিশাল বহু ধরনের ক্ষেত্র এবং আরো কত কী ! নক্ষত্রেরা আবার কত রকম— তরুণ নক্ষত্র, যুবা নক্ষত্র, বৃদ্ধ নক্ষত্র, সাদা বামন, নিউট্রন তারা, পালসার, মৃত নক্ষত্র বা কৃষ্ণগহ্বর [Black Hole]। যত বেশি শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই মহাবিশ্বের আয়তন আরও বেশি বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে এমন দূরত্বের নক্ষত্রপুঞ্জও আবিষ্কৃত হয়েছে যার আলোকরশ্মি এই প্রথম পৃথিবীতে এলো। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ওই নক্ষত্রপুঞ্জটির দূরত্ব প্রায় 450 কোটি আলোকবর্ষ [Light Year]। কারণ, পৃথিবীর বয়স প্রায় 450টি বৎসর। মনে করিয়ে দিই, এক আলোকবর্ষ দূরত্ব হল মোটামুটিভাবে 9.46×10^{12} কিলোমিটার। সুতরাং ওই নক্ষত্রপুঞ্জের, যার আলো এই প্রথম পৃথিবীতে এলো, তার দূরত্ব হবে $450\times10^{7}\times9.46\times10^{12}$ কিলোমিটার বা 4257×10^{19} কিলোমিটার। কী বিশাল অপরিসীম দূরত্ব! জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ আরও অনেক বেশি হবে;এই 450 কোটি আলোকবর্ষ মহাবিশ্বের বিশাল আয়তনের তুলনায় কিছুই নয়।

হাবলের সূত্র অনুসারে এই বিশাল বিশ্ব বিপুল গতি নিয়ে প্রসারণশীল। গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এইভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই সরে যাওয়ার গতিবেগ বা পশ্চাদপসরণ গতি [Rcessional Velocity] 75 থেকে 150 কিলোমিটার হারে বৃদ্ধি পায় প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপার্সেক [Megaparsec] দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য। এক মেগাপার্সেক হল 3.262×10^{6} আলোকবর্ষ। অর্থাৎ এক পার্সেক হল 3.262 আলোকবর্ষ। দেখা গেছে, অশ্লেষা নক্ষত্রপুঞ্জের [Hydra] গ্যালাক্সীগুলি দূরে সরে যাচ্ছে সেকেন্ডে 60,900 কিলোমিটার বেগে। পৃথিবী থেকে অশ্লেষার দূরত্ব প্রায় 110 কোটি আলোকবর্ষ। সমগ্র মহাবিশ্বের প্রসারণের গড় গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 1,50,000 কিলোমিটার। এই বেগ ক্রমশঃ বাড়ে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে এবং সময়ের সঙ্গে। এই পরিবর্ধনের হারের কথা আগেই বলেছি।

আবারো বলি, আইনস্টাইন-ফ্রীডমান তত্ত্ব থেকে মোটামুটিভাবে তিনরকম বিশ্ব-মডেল পাওয়া যায়। সেগুলির চরিত্র বিশ্বের গড় বস্তু-ঘনত্ব এবং তার ফলে উৎপন্ন মহাকাশ-সময়-সন্ততির [Space-Time-Continuum] জ্যামিতিক গঠনের উপর নির্ভর করে। গড় বস্তু-ঘনত্বের একটা বিশেষ পরিমাণকে বলা হয় 'ক্রান্তিক ঘনত্ব' [Critical Density]। এই ক্রান্তিক ঘনত্বের চেয়ে বিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব যদি বেশি হয়, তবে অভিকর্ষের সামগ্রিক প্রবলতার ফলে সমগ্র মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ [Closed] এবং গোলাকার [Spherical] এবং মহাবিশ্বের আকার হবে সসীম। এর ফলে, মহাবিশ্বের প্রসারণবেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং এক সময় এই প্রসারণ বেগ শেষ হয়। ঠিক এই সময় থেকেই প্রসারণের বিপরীত ক্রিয়া সংকোচন শুরু হয় মহাবিশ্বের। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্বের বর্তমান বয়স প্রায় 2×10^{10} বৎসর বা 2000 কোটি বছর। বিশ্বের এই প্রসারণ চলবে আরও প্রায় 2000 কোটি বছর ধরে। এইভাবে মহাবিস্ফোরণের সময় থেকে প্রায় 4000 কোটি বছর ধরে চলবে প্রসারণ, এরপর শুরু হবে মহাবিশ্বের ক্রমসংকোচন। আবারও 4000 কোটি বছর ধরে চলবে সংকোচন, এবং সংকোচনের শেষে মহাবিশ্ব ফিরে যাবে মহাবিস্ফোরণ পূর্ব আদিম ঘনত্বে বা মহাজাগতিক অণ্ডে, যে অণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে, শুরু হয়েছিল মহাবিশ্বের প্রসারণ। ক্রমসংকোচনের শেষে মহাবিশ্ব আবার ফিরে যায় ওই মহাজাগতিক অণ্ডে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হবে আবার এক মহাবিস্ফোরণ। আবারও চলে মহাবিশ্বের প্রসারণ। এইভাবে Bing Bang-এর পরে হয় প্রসারণ এবং প্রসারণের শেষে হয় 'মহাসংকোচন' বা 'মহাকুঞ্চন'

[Big Crunch]। এই প্রসারণ সংকোচন পর্যাবৃত্তভাবে চলতে থাকে অনন্তকাল। এই তত্ত্ব হল 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' এবং এর কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

এই মডেলের সুবিধা হচ্ছে দুটি। প্রথমটি হল, এই মডেলে বিশ্বের কিংবা বিশ্বের উপাদানগুলির সৃষ্টির ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া যায়। কারণ, ধরেই নেওয়া হয় বিশ্ব চিরদিনই প্রসারিত কিংবা সংকুচিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় সুবিধা হল, মহাবিস্ফোরণের ঠিক আগের মুহূর্তে যে শূন্য আয়তন ও অসীম ঘনত্বের অবস্থা [Zero Volume and Infinite Density] অন্য মডেলে ধরে নিতে হয়, সেই রহস্যময় নিয়ম-বহির্ভূত অনন্যতা [Singularity] থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। কারণ এই Pulsating বা Oscillating মডেলের ক্ষেত্রে শূন্যতা বা অনন্যতার কথা আসে না। এক্ষেত্রে বলা যায়, যে অবস্থা থেকে প্রসারণের শুরু বা যে অবস্থায় সংকোচনের শেষ হয়, সেটা কোনও অসীম ঘনত্বের অবস্থা নয়, তবে সেটা একটা অতিবিশাল এবং সসীম ঘনত্বের অবস্থা। লেমেতারের মডেলের একটি বিপুলকায় আদিম পরমাণুর মতই মহাসংকোচনের শেষে এক্ষেত্রে হয়ত কয়েক কোটি কিলোমিটার ব্যাসের একটি 'মহাজাগতিক অণ্ড' [Cosmic Egg] থাকবে।
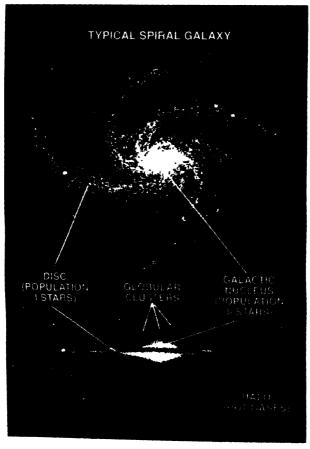
চিত্র ঃ 3

আদর্শ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের [Spiral Galaxy] নমুনা। ●

যদি মহাবিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব 'ক্রান্তিক ঘনত্ব' অপেক্ষা কম হয় কিংবা তার সমান হয় তবে মহাবিশ্বের গঠন হবে খোলা [Open] এবং-অগোলকীয় [Non-spherical] । ওই মহাবিশ্বের মোট আকার সে ক্ষেত্রে হবে অসীম। এ ব্যাপারে দু'রকম মডেলের কথা বলা হয়েছে। মহাবিশ্বের বস্তু ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের সমান হয়, তবে মহাকর্ষশক্তি মহাবিশ্বের প্রসারণবেগের চেয়ে সমান্য কম হবে। এ ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব ধীরগতিতে প্রসারিত হতে থাকবে। স্তিমিত গতির এই প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলবে। প্রথমে এই মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গুণ হবে অ-ইউক্লিডীয় বা রীমানীয়, তারপর এই মহাবিশ্ব ক্রমশঃ সমতল [Euclidean] অবস্থার দিকে যাবে।

মহাবিশ্বের গড় বস্তু-ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের চেয়ে কম হয় তা হলেও বিশ্ব হবে অসীম। এই মহাবিশ্বের গঠনও হবে খোলা এবং এর জ্যামিতিক গুণ হবে রীমানীয়, ইউক্লিডীয় কখনোই নয়। তবে এই অসীম বিশ্বও মহাকাশ-সময়-সন্ততির বক্রতার কারণে ঘোড়ার পিঠের জিনের মত [চিত্র ঃ 2(b)] আকৃতি গ্রহণ করবে। যতই প্রসারিত হোক তা কখনই গোলক হবে না, অসীমই থেকে যাবে পরাবৃত্তীয় বক্রতায়। 2 নম্বর চিত্রের 2 (a) এবং 2 (b) চিত্র দুটিতে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে রীমানীয় অর্থাৎ অ-ইউক্লিডীয় বক্রতা কেমন হয়। এই দুটি ক্ষেত্রেই মহাবিশ্বের কোনও তলে [Surface] একটা ত্রিভুজ আঁকলে তার তিনটি কোণের সমষ্টি কখনই 180^0 হবে না। প্রথম ক্ষেত্রে তা 180^0-র বেশি হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা 180^0-র কম হবে।

আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব মোট ছয় রকমের বিশ্ব মডেলের কথা বলেছে। এগুলির কয়েকটির কথা কিছুটা বিস্তৃতভাবে আগেই বলা হয়েছে। এই ছয়টি মডেলের কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মহাবিশ্ব কেমন তা এক নজরে অনুমান করে নিতে। আগেই বলেছি, এই সব বিশ্ব-মডেল তৈরি হয়েছে কিছু পর্যবেক্ষণ এবং বেশিরভাগটাই গাণিতিক পদ্ধতির অনুসরণে। ফলে, মডেলগুলি মূলতঃ তাত্ত্বিক। উল্লেখিত ছয়টি মডেল হল ঃ

(1) স্থায়ী অবস্থা মডেল [Steady State Model]; (2) উচ্চ ঘনত্বের দোলায়মান মডেল [High Density Oscillating Model]; (3) লেমেতার মডেল [Lamaitre Model]; (4) কম ঘনত্বের চির-প্রসারণশীল মডেল [Low Density Ever-expanding Model]; (4) আইনস্টাইন-দ্য সিটার মডেল [Einstein-de Sitter Model]; (6) বিকিরণ-পরিপূর্ণ মডেল [Radiation Filled Model]।

1. স্থায়ী অবস্থা মডেল [Steady State Model] ঃ

স্থায়ী অবস্থা মডেলকে অনেক বলেছেন 'শাশ্বত বিশ্ব মডেল'। এই মত অনুযায়ী বিশ্ব চিরকাল একই রূপে বিরাজমান। এই মহাবিশ্ব চিরকালই পরিবর্তনহীন। এই তত্ত্ব অনুসারে অতীতের মহাকাশ এবং কাছের বা বর্তমানের মহাকাশ একই রকম দেখাবে। কিন্তু মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মানলে পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের মহাকাশের রূপ একই রকম থাকবে না। দূরের মহাকাশ বিশ্বের অল্প বয়সের রূপ হবে বলে কাছের আকাশের থেকে তাকে অন্যরকম দেখাবে। এই ধারণা নিয়ে কিছুটা পরবর্তীকালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, মহাবিশ্ব চিরসম বা চিরকাল সমান অবস্থায় নেই। মহাবিশ্ব পরিবর্তনশীল ও বিবর্তমান। সুতরাং স্থায়ী অবস্থা তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি খুব জনপ্রিয় একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব হলেও এর স্থায়িত্ব খুব বেশিদিন ছিল না। সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যেই এই তত্ত্ব তথা এই মডেল পরিত্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব স্থির, নিশ্চল, চিরসম এইসব ধারণাও

চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এখন সমস্ত বিশ্ব-মডেলই মহাবিশ্বের পরিবর্তনশীলতার ধারণার উপর তৈরি করা হয়েছে।

1948 সালে তিন ইংরেজ বিজ্ঞানী বন্‌ডি [Hermann Bondi], গোল্‌ড [Thomas Gold] এবং হোয়েল [Fred Hoyle], 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'-তে দুটি প্রবন্ধ লেখেন স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বের [Steady State Theory] উপর। একই সংখ্যার প্রথম দিকে [252-270 পৃষ্ঠায়] একটি প্রবন্ধ লেখেন বন্‌ডি ও গোলড্ এবং ওই সংখ্যাতেই একটু শেষের দিকে [372 পৃষ্ঠায়] আরেকটি নিবন্ধ লেখেন ফ্রেড হোয়েল। হোয়েল তত্ত্বটিকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করেন। বন্‌ডি এবং গোল্‌ড তাঁদের প্রবন্ধে বললেন ঃ "মহাবিস্ফোরণতত্ত্বের সমর্থকরা বলেন মহাবিশ্ব পরিবর্তনশীল। অথচ মহাবিশ্বের সুদূর শৈশবকালের যে নমুনাগুলি কিংবা নিশানাগুলি আমরা বহুদূরের গ্যালাক্সীগুলি থেকে পাই, সেগুলির ব্যাখ্যা আজও করা হয় এখনকার বিশ্বের পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি দিয়ে। 'বিশ্ব' বলতে যদি সমস্ত অস্তিত্বের সমষ্টি বোঝায়, তাহলে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলিও সে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। বিশ্ব যদি পরিবর্তিত হয়, তবে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলিও পরিবর্তিত হওয়ার কথা। পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি অপরিবর্তিত থাকতে পারে একমাত্র সেই বিশ্বেই, যে বিশ্ব নিজেই সবদিক থেকেই পরিবর্তনহীন। সুতরাং বিশ্ব পরিবর্তনহীন, বিশ্ব স্থায়ী, বিশ্ব স্থির অবস্থাসম্পন্ন। তাই এই বিশ্ব শাশ্বত বিশ্ব।" এই দুই বিজ্ঞানী আরও বললেন ঃ 'সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনহীন এমন একটা বিশ্বের চিত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব।' পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে হাবল বানিয়ে ফেললেন 'বিশ্বতত্ত্ব সূত্র' [Cosmological Principla]। বিজ্ঞানীরা সে সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নিলেন। এই সূত্র বলছে, মহাবিশ্বের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে বা যুগে একটি জায়গা বা গ্যালাক্সী থেকে যে কোনো দিকে তাকালে সবদিক থেকে বিশ্বকে একই রকম মনে হবে। কিন্তু 100 কোটি বছর বয়সের মহাবিশ্ব কোন একটা সময়ে চারিদিক থেকে যেমন দেখাবে, 500 কোটি বছরের মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই সেরকম দেখাবে না, অন্যরকম দেখাবে। বন্‌ডি ও গোল্‌ড বললেন, "এটা ঠিক বক্তব্য নয়। বিশ্বের যে কোনও বয়সে, যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো যুগে মহাবিশ্বকে মোটামুটিভাবে একই রকম মনে হবে।" বিশ্বতত্ত্ব সূত্র অনুযায়ী বিশ্বক্ষেত্র ছিল সমসত্ত্ব [Homogeneous] এবং সমদৈশিক [Isotropic]। বন্‌ডি এবং গোলডের এই নতুন পূর্ণাঙ্গ বিশ্বতত্ত্ব সূত্র [Perfect Cosmological Principle বা P C P] অনুসারে শুধু স্থান বা পরিসরের ব্যাপারে নয়, সময় বা কালের ব্যাপারেও এই মহাবিশ্ব সর্বত্র এবং সর্বকালে একইরকম চেহারার ছিল, সেই চেহারা আজও আছে এবং এই একই চেহারা ভবিষ্যতেও থাকবে। মহাবিশ্ব চিরকাল অপরিবর্তনীয়ই থাকবে।

বন্‌ডি এবং গোল্‌ড তাঁদের এই অপরিবর্তিত বিশ্বতত্ত্বে নিশ্চল বিশ্বের কথা বলতে পারছিলেন না, যেমনটি বলেছিলেন আইনস্টাইন অনেকটা জোর করেই, তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্রসমীকরণগুলির সঙ্গে λ-factor যোগ করে। কারণ, দুরবীন ইত্যাদির সাহায্যে গ্যালাক্সীগুলির দূরাপসরণের ব্যাপারটি তখন একেবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং স্থায়ী বা স্থির কিংবা শাশ্বত বিশ্ব কী করে টিকে থাকছে? বন্‌ডি ও গোল্‌ডের মহাবিশ্ব কিন্তু প্রসারণহীন নয় মোটেই। এঁদের মহাবিশ্বটি চির-প্রসারণশীল—Bing Bang তত্ত্ব সমন্বিত মহাবিশ্বেরই মত। কিন্তু প্রসারণ তো হওয়ার কথা নয় এই মডেলে। এই মডেলে মহাবিস্ফোরণের স্বীকৃতি নেই। তাহলে মহাবিশ্ব প্রসারণ বেগ পেলো কেমন করে? এখানেই বন্‌ডিরা ফিরে গেলেন দ্য-সিটারের 1917 খ্রিস্টাব্দের মডেলে।

ওই মডেলে বলা হয়েছিল, মহাবিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব অত্যন্ত অল্প হওয়ায় আইনস্টাইন পরিকল্পিত মহাবিকর্ষণশক্তি [Lambda Force] মহাকর্ষ [G-Force]-কে পরাভূত করে বিশ্বকে চির প্রসারণশীল করে তোলে। স্থায়ী বিশ্ব তত্ত্বেও মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, তার গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে এবং বিশ্বের মোট আয়তন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। তাই যদি হয়, তবে এই মডেলের মহাবিশ্বকে স্থায়ী অবস্থার মহাবিশ্ব বলা হয় কেন? কেন বলা হল এই মডেলের মহাবিশ্ব চিরস্থির এবং সমভাবাপন্ন?

বন্‌ডি ও গোল্‌ড একটা চমকপ্রদ ধারণার কথা বললেন। তাঁরা বললেন ঃ গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেলে তাঁদের মাঝখানে যে বিশাল বিশাল ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে নতুন গ্যালাক্সী, নতুন বস্তুপুঞ্জ দিয়ে। এইসব নতুন বস্তু, নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টি হচ্ছে অত্যন্ত মন্থরগতিতে হাইড্রোজেন পরমাণুর আকারে। এই দুই বিজ্ঞানীর হিসাব অনুসারে, শূন্য মহাকাশ [Empty Space] থেকে প্রতি তিন লক্ষ বছরে প্রতি ঘন-মিটার স্থান থেকে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হচ্ছে। ওঁদের মতে শূন্য থেকেই পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে মহাবিশ্বে। এই সৃষ্টি মন্থর মনে হলেও, মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে এই সৃষ্টিহার অত্যন্ত দ্রুত। তিন লক্ষ বছরে এক ঘনমিটার মহাকাশে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হলে, কয়েকশো কোটি বছরে পাঁচ-দশ কোটি ঘন-আলোকবর্ষ [Cubic Ligh Year] জুড়ে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি হবে তার থেকে গড়ে উঠবে এক ঝাঁক নতুন গ্যালাক্সী। পুরানো গ্যালাক্সীগুলি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়বে, দূরে সরে যাবে, তাদের আলো ক্রমশই লালচে হয়ে উঠবে। আর বড় হয়ে ওঠা ফাঁকগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে শূন্যের গর্ভ থেকে জেগে উঠবে তরুণ নীলাভ তারায় ভরা নতুন নতুন গ্যালাক্সী। সেগুলি আবার কালক্রমে ছড়িয়ে পড়বে, আবারও গ্যালাক্সীর মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে ফাঁকগুলি বিস্তৃত হবে, আধারও ওই সব শূন্যস্থান থেকে জেগে উঠবে নতুন সব গ্যালাক্সী। বিশ্ব অবিশ্রান্তভাবে প্রসারিত হতে থাকবে, কিন্তু নতুন নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টির ফলে সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখাবে।

বন্‌ডি এবং গোল্‌ড বললেন, "অতীতেও বিশ্ব একই রকম ছিল। কয়েকশো কোটি বছর আগে বিশ্বের চেহারাটি যে কোনো জায়গা থেকে এই রকমই দেখাতো, এখন যেমন দেখাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যেকোনও সময়ে এই রকমই দেখাবে। সুতরাং এই তত্ত্বানুসারে মহাবিশ্বের প্রসার এবং বয়স দুই-ই অসীম। এই মহাবিশ্ব কোনওদিন সৃষ্টি হয় নি, এ চিরদিনই ছিল এবং চিরদিনই একই রকম থাকবে। নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্ব থাকছে পরিবর্তনহীন।

এই দুই বিজ্ঞানীর তত্ত্বে নতুন পদার্থ নিরন্তর সৃষ্টি হওয়ায় অনুসিদ্ধান্ত ছিল। শক্তি কিংবা ভরের নিত্যতা সূত্রের বিরোধী ছিল এই অনুসিদ্ধান্ত। শক্তি ও ভরের নিত্যতা এক শাশ্বত সত্য এই মহাবিশ্বে। সেই সত্যের বিরোধী ওই নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্ব। বন্‌ডি এবং গোল্‌ড এই আপত্তির কোনো স্পষ্ট যুক্তি দিতে পারেন নি। তাঁদের যুক্তি ছিল ওই ক্রমসৃষ্টির প্রক্রিয়া না মেনে নিলে স্থায়ী অবস্থার বিশ্ব মডেল খাড়া করা যায় না। ওঁদের এই বক্তব্য শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, যে পত্রিকায় ওঁদের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেই পত্রিকাতেই আরেকটি নিবন্ধ বের হল ফেড হোয়েলের। এতে তিনি স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বটিকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করলেন। এই তত্ত্বের ওই একটানা বস্তু সৃষ্টি ব্যাপারটার আশ্চর্য গাণিতিক ব্যাখ্যা দিলেন ফ্রেড হোয়েল।

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হোয়েল জন্মেছিলেন 1915 সালের 24 শে জুন। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে হোয়েল, বন্‌ডি ও গোল্‌ডের সঙ্গে যোগ দেন স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বের গবেষণার জন্য। 1948 খ্রিস্টাব্দে ওঁদের দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। 1945 থেকে 1958 সাল অবধি

তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকের কাজ করেন। 1956 খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যালোমার মানমন্দিরে [Palomar Observatories], উভয় জায়গাতেই কাজ করেন। তিনি তাঁর কাজের সময় যুক্তরাষ্ট্র এবং কেম্ব্রিজের মধ্যে প্রয়োজনমত ভাগাভাগি করে নেন। তিনি কেম্ব্রিজে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্লুমিয়ান অধ্যাপকের [Plumian Professor] পদও অলংকৃত করেন।

স্থির অবস্থা তত্ত্বের গাণিতিকরূপ দেওয়ার কৃতিত্ব পুরোপুরিই হোয়েলের প্রাপ্য। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে এই তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে যে গাণিতিক সূত্র তিনি বের করেন, তার পুরোটাই তিনি নিজে করেন। অবশ্য ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার [Dr. J.V.Narlikar] এ ব্যাপারে তাঁকে শেষের দিকটায় প্রভূত সাহায্য করেন। সে কথায় পরে আসছি। 1948 সালে স্থায়ী অবস্থা তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পরেই তিনি এই বিষয়টির মুখপাত্র হয়ে পড়েন। 1965 সাল অবধি তিনি এই তত্ত্ব সঠিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। ওই বছরই তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ লব্ধ ফলগুলির নিবিড় বিশ্লেষণের পর স্থায়ী অবস্থা তত্ত্ব পুরোপুরি বাতিল করে দেন। তবে, 1963 সালে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন ওতে মাখের নীতির [Mach's Principle] অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে। তাঁর এই প্রস্তাবিত পরিবর্তন নিয়ে আজও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। মহাকর্ষীয় ক্রিয়াহীনতা [Gravitational Collapse] নিয়েও তিনি মূল্যবান বেশ কিছু বই লিখেছেন। কল্পবিজ্ঞানের বইও তিনি লিখতেন। 1957 সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো [FRS] নির্বাচিত হন। 1972 খ্রিস্টাব্দে তিনি 'নাইট' [Knight] উপাধিতে ভূষিত হন।

হোয়েল 1948 সাল থেকেই নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁদের স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে, কিন্তু তিনি তা পারেন নি। 1965 সালেই তিনি স্বীকার করে নেন যে, তাঁদের তত্ত্বটি ভুল। আর তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের পরিবর্তনের প্রস্তাবনা, যাতে নারলিকারের কিছুটা অবদানও ছিল, সেই প্রস্তাবনা আজও ঝুলে আছে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে। কিন্তু এই নতুন তত্ত্বই তিনি সংযুক্ত করেছিলেন স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বের সঙ্গে। এই নিয়ে সামান্য কিছুটা আলোচনা করে নিই। মহাকর্ষ সম্পর্কিত তাঁর নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হয় 1964 সালে, যদিও 1963 সালেই এই তত্ত্ব পূর্ণ রূপ পায়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্লুমিয়ান অধ্যাপক' [Plumian Professor] ডক্টর ফ্রেড হোয়েল [Dr. F.Hoyle] এবং তরুণ ভারতীয় গণিতবিদ ডক্টর জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার [Dr. J.V.Narlikar] সাত বছর একসঙ্গে কাজ করার পর 1964 সালের জুন মাসে মহাকর্ষ [Gravitation] সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন তুললেন। এই তত্ত্বে বিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণাকে কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইনীয় মহাকর্ষ তত্ত্বকে আরও যুক্তি-গ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা করা হ'লো। এই নতুন মতবাদের মূল বিষয়বস্তু হলো বিরামবিহীনভাবে শক্তির পদার্থে রূপান্তর, যা নাকি মহাজগতে সর্বক্ষণ ঘটে চলেছে। হোয়েল-নারলিকার তাঁদের তত্ত্বে দাবী করলন ঃ "The expanding universe is being maintained in a steady state by a continuous creation of matter."

মহাকর্ষের মূল ধর্ম হলো কোনও মাধ্যমে অবস্থিত সকল বস্তুতেই এ সমানভাবে ক্রিয়াশীল। আইনস্টাইন মহাকর্ষ সম্পর্কে পুরানো নিউটনীয় ধারণা বদলে দিয়ে বললেন যে, মহাকর্ষ এক রকম ক্ষেত্র যা বক্রতাযুক্ত চতুমাত্রিক সময়-সন্ততিরই স্বভাব-ধর্ম [Inherent property of a curved four dimensional space-time continuum] এবং ভারী বস্তুসমূহের নিকটবর্তী হলে এর স্থানীয় বিকৃতি [Local Distortion] ঘটে। ফলে, মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটনীয় ধ্যানধারণার অসুবিধাগুলি আইনস্টাইনীয় এই নতুন তত্ত্বের সাহায্যে দূর করা সম্ভব হয়। আপেক্ষিকতাবাদ [Theory of Relativity] এবং

রীমানীয় চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির সাহায্যে মহাকর্ষীয় সূত্রগুলির ব্যাখ্যা সহজতর ও যুক্তিগ্রাহ্য করে নিউটনীয় তত্ত্বের অসুবিধাগুলি দূর করেন আইনস্টাইন। কিন্তু আইনস্টাইনীয় ব্যাখ্যায়ও অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ দূর হলো না। বৈজ্ঞানিকদের কাছে যে তিনটি অসুবিধা বা প্রশ্ন রইলো সেগুলি হলো ঃ

(1) মহাকর্ষ উৎপাদকারী বস্তু না থাকলেও মহাকর্ষ থাকবে কারণ মহাকর্ষ হল মহাকাশ-সময়-সন্ততির একটা স্বভাব ধর্ম বা গুণ।

(2) 'সময়-নির্দেশ' বা 'সময়-নিশানা' [Time Direction]-এর অস্তিত্ব অব্যাখ্যাত যেখানে মহাকাশ ও সময় উভয়েরই কার্যকারিতা প্রায় একই ধরনের।

(3) আইনস্টাইনও নিউটনের মত বললেন যে, বস্তুর ভর ও ওজন নির্ভর করবে সৌর জগতের মহাকর্ষীয় বস্তুসমূহের [Gravitating Matters] উপর।

পরবর্তীকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেল এই বিধিনিষেধগুলি মহাকর্ষ-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা ব্যাখ্যার পরিপন্থী। বিশেষ করে, বস্তুর ভর ও ওজন কেবল মাত্র এই সৌরজগতের মহাকর্ষীয় বস্তুসমূহের উপরনির্ভরশীল নয়। বরং দেখা গেল, গত শতাব্দীতে জার্মান পদার্থবিদ মাখ [Mach] যেমন বলেছিলেন, 'প্রত্যেক কণিকার ভর বিশ্বর বাকী সমস্ত কণার ভরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' [The mass of each particle is related to that of every particle in the Universe] কোনও বস্তুর ভর ও ওজন যেন তারই অনুগামী। এর সাদামাটা অর্থ হল, জাড্য [Inertia] বস্তুর নিজস্ব গুণ নয় বরং এটা এমন একটা গুণ, যা বিশ্বের অবশিষ্ট পদার্থসমূহের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিকতাবাদে এই তত্ত্ব জুড়তে গিয়েও আইনস্টাইন সফল হন নি শেষ অবধি।

হোয়েল-নারলিকার আইনস্টাইনীয় মহাকর্ষ তত্ত্বের ওই অসুবিধাগুলি দূর করতে গিয়ে মাখের এই ধারণাকে কাজে লাগালেন। তাঁরা মহাবিশ্বের গুণাবলীর উপযুক্ত সমাধান খুঁজলেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে [General Theorv of Relativity] নতুন ছাঁচে ঢেলে। মহাকাশের স্বাভাবিকগুণ মহাকর্ষ — এই ধারণা বাদ দিয়ে তাঁরা বললেন, মহাকর্ষের উৎপত্তি বিশ্বের মোট পদার্থের থেকে। তাঁদের মতে, মহাকর্ষীয় সমস্যার সমাধান আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে নয়, বিশ্বতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব [Cosmology] দিয়েই সম্ভব। দৃশ্য বা অদৃশ্য কোটি-কোটি নক্ষত্রেরা যে মহাকর্ষ বল নিঃসরণ করছে তারও প্রভাব আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তুগুলির উপরে। নারলিকারদের মতে, আজ যদি কোনও উপায়ে বিশ্বের নক্ষত্র মণ্ডলীর অর্ধেক নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হতো, তা হলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ওজন তার আগের ওজনের দ্বিগুণ হতো এবং সূর্য একশ গুণ বেশি উজ্জ্বল হতো। হোয়েল-নারলিকার সেই সব সমীকরণ [Equation] অঙ্ক কষে বের করেছেন, যেগুলিতে বস্তুর ভরের সঙ্গে বিশ্বের অবশিষ্ট পদার্থের ভরের সম্পর্কে নির্ণয় করা যায়। এই সমীকরণ তৈরিতে তাঁদের সাহায্য নিতে হয়েছে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের [Expanding Universe] প্রকৃতিধর্মগুলির যেমন, এই বিশ্বের সম্প্রসারণের হার, বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব ইত্যাদি। এই সব সমীকরণের সঙ্গে আইনস্টাইনীয় সমীকরণগুলির পার্থক্য খুবই সামান্য। পার্থক্য শুধু এই যে, কোনও অঙ্ক এতে ইচ্ছামত আনা হয় নি।

নতুন এই মহাকর্ষীয় তত্ত্ব এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ধারাবাহিকভাবে নতুন পদার্থের সৃষ্টির ফলে স্থির অবস্থায় বিদ্যমান [The expanding universe is being maintained at a steady state by a continuous creation of matter] । এই তত্ত্ব তাই 'Steady State Theory' নামে বিখ্যাত।

দূরের গ্যালাক্সীগুলির অতি বৃহদাকার নক্ষত্রগুলির বিকীর্ণ আলোতে 'লাল-সরণ' [Red-shift]

থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওই গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে অতি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং এই 'লাল-সরণ' বলছে যে, এই বিশ্ব সমভাবে সম্প্রসারণশীল [Uniformly Expanding] । আইনস্টাইন, এডিংটনরা বিশ্বাস করতেন, কোনও নির্দিষ্ট একটি উৎপত্তি-স্থল থেকে শুরু করে বিশ্বের এই সম্প্রসারণশীলতা। এর থেকেই উৎপত্তি হলো সেই 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের' [Big Bang Theory] । বৈজ্ঞানিকরা বললেন, 'বিশ্বের সমস্ত পদার্থ কিংবা শক্তি এক সময় একটা মহাপিণ্ডে একত্রীভূত ছিল'। এই মহাপিণ্ডের নাম দেওয়া হল ঃ 'মহাজাগতিক অণ্ড' [Cosmic Egg] । এই 'অণ্ড' একদিন অজানা কারণে হঠাৎ বিস্ফোরিত হল। এর ছিন্নভিন্ন হওয়া দেহ থেকেই উৎপন্ন হল হাজার হাজার গ্যালাক্সী এবং তারা বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ছুটে চললো অকল্পনীয় গতিতে বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরতর স্থানে। এটাই মোটামুটিভাবে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব বলেছিল, গ্যালাকসীগুলি একদিকে যেমন বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে, তেমনি তারা আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না সেই আদিম বিস্ফোরণ কেন্দ্রে। এইভাবে বিশ্বের আয়তন ক্রমশ বাড়ছে এবং বাড়ছে গ্যালক্সীগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বও। তাই এই তত্ত্বের আরেকটা নাম 'সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব' [Expanding Universe Theory]। 1967 সাল অবধি বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে এই তত্ত্বটি মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। এরপর অবশ্য 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory] এর স্থান দখল করেছে এবং তা এখনকার বৈজ্ঞানিক সত্য।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকরা দেখালেন বিশ্বের বয়স অর্থাৎ সেই মহাবিস্ফোরণের বয়স পাঁচ থেকে দশ হাজার মিলিয়ন বৎসর বা 5×10^9 থেকে 10×10^9 বৎসর। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানীর হিসাবে আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সীর বয়সই 10×10^9 থেকে 15×10^9 বৎসর এবং আমাদের গ্যালাক্সীর চেয়ে অনেকবেশি বয়স্ক বেশ কিছু গ্যালাক্সীরও সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার বিশ্বের এক এক জায়গায় বয়স এক এক রকম হতে পারে না, যেহেতু ধরা হয়ছে একবারই সেই মহাবিস্ফোরণ হয়ে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। তা হলে হয় বিভিন্ন গ্যালাক্সীর বয়স মাপায় ভুল হচ্ছে, নয় এই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বটাই ভুল। দ্বিতীয়তঃ 'Singular Origin' বা 'আদিম উৎস' তত্ত্বে যে আদিম উৎসকে 'Cosmic Egg' বা 'মহাজাগতিক অণ্ড' বলা হয়েছে, পদার্থবিদ্যার সমস্ত ধ্যানধারণা সেখানে ভেঙে পড়ে এবং মহাকাশ-সময়-সন্ততির অস্তিত্বও থাকে না। সুতরাং এই রকম আদিম-উৎস তত্ত্ব কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা নিয়েও বিজ্ঞানী-মহলে ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না।

এই সব অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে হোয়েল-নারলিকার তাঁদের স্থির-অবস্থা [Steady State] তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন, বিশ্ব সব গ্যালাক্সী থেকে একই রকম দেখাবে। শুধু তাই নয়, সবসময়ই একই রকম দেখাবে [At all times]। বিশ্ব সামগ্রিকভাবে [As a whole] অপরিবর্তনীয় [Invariant] এবং তা কালহীন [Timeless]। বিশ্বের কোনও আরম্ভ বা শেষ নেই [No beginning and No end] ।

এখানে আবার সেই সংশয় - যার শেষ নেই, যার সীমা নেই, তার আবার সম্প্রসারণ কী করে হবে? এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'ধারাবাহিক সৃষ্টি' [Continuous Creation]-র ধারণাকে 'স্বীকার্য' [Postulate] হিসাবে উপস্থাপনা করা হলো। গ্যালাক্সীগুলি একটার থেকে আরেকটা যখন দূরে সরে সরে যাচ্ছে তখন বিশ্বের পদার্থ ঘনত্ব [Matter Density] কমছে। এইভাবে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন একটা শূন্য অঞ্চল থাকবে মহাকাশে। কিন্তু 'স্থির-অবস্থা-তত্ত্ব' [Steady State Theory]

অনুসারে আমাদের চারিদিকের গ্যালাক্সীরা ঠিক একই রকম থাকবে চিরকাল। এটা সম্ভব যদি মনে করা হয় নতুন নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টি হয়ে ওই শূন্যস্থান পূরণ করছে। অর্থাৎ নতুন পদার্থ অনবরত সৃষ্টি হচ্ছে মহাকাশে। ফলে, সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব কমছে না, তেমনি কোন অঞ্চল শূন্য হয়ে যাচ্ছে না। নতুন নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টি হয়ে সেই জায়গা আবার ভরে দিচ্ছে।

ধারাবাহিক পদার্থ সৃষ্টির এই ধারণা ভর বা শক্তির নিত্যতা সূত্রের বিরোধী নয়। এখানে পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে শক্তি থেকে কিংবা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে। সৃষ্টি না বলে বহিঃপ্রক্ষেপ [Projection] বা রূপান্তর শব্দগুলিও ব্যবহার করা যায়। ওই সম্প্রসারণের সঙ্গে তাল মেলাতে যে সৃষ্টির বা রূপান্তর প্রয়োজন তা অঙ্ক কষে বের করা হয়েছে। প্রতি দশলক্ষ বছরে এক লিটার হাইড্রোজেন থেকে এক পরমাণু [One Atom] হাইড্রোচেন তৈরি হলেই স্থির অবস্থা বজায় থাকা সম্ভব, যদিও এই বিশ্ব অবিশ্বাস্য গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে তত্ত্বীয় সমীকরণসমূহ ওঁরা বের করেছেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে। যে ক্ষেত্র থেকে ওই হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রের শক্তি ও বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ভরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, এই সৃষ্টি বা রূপান্তর শক্তি ও ভরের নিত্যতা সূত্রের বিরোধী মোটেই নয়।

পৃথিবীতে পরীক্ষার সাহায্যে এই তত্ত্ব প্রমাণ সম্ভব নয় এই কারণে যে, পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বলের মাত্রা অত্যন্ত ক্ষীণ। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু নজরে এলো। দেখা গেল, কিছু গ্যালাক্সী রেডিও তরঙ্গ [Radio Waves] নিঃসরণ করে এবং তা বেশ শক্তিশালী। কিন্তু সব গ্যালাক্সী এমন করে না। দশলক্ষে একটা গ্যালক্সী থেকে এ ধরনের শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। ধরা যাক, কোন গ্যালাক্সী একশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে। তা হলে বেতার তরঙ্গের সেখান থেকে আসতে একশ' কোটি বছর লাগবে। সুতরাং আজকে যদি কোনও গ্যালাক্সীর রেডিও তরঙ্গ পরীক্ষা করি সেটা একশ' কোটি বছর আগের একটা রেডিও তরঙ্গ পরীক্ষা করা হবে এবং একশ' কোটি বছর আগে ওই গ্যালাকসীর অবস্থা কী ছিল তা জানা যাবে। দেখা গেল একশ' কোটি বৎসর আগের বিশ্ব বা অতীত বিশ্বের সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের ফারাক নেই। এটাই বিশ্বের স্থির অবস্থা বা অপরিবর্তনীয় অবস্থার [Steady State] কিছুটা প্রমাণ করে।

কেমব্রিজের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকে অবশ্য বিপরীত ফলাফলই পাচ্ছিলেন। দেখা গেল, পুরানো দিনের বেতার তরঙ্গের সংখ্যা-ঘনত্ব [Number Density] আধুনিকদের চেয়ে বেশি। কিন্তু পরবর্তীকালে আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই সংখ্যা ঘনত্বের পার্থক্য অনেক কমে এসেছে। তাছাড়া এমন কোনও পদ্ধতি আজও অনাবিষ্কৃত যার সাহায্যে বেতার তরঙ্গের লাল-সরণ [Red-Shift of Radio-waves] মাপা সম্ভব। ফলে, হোয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব আজও অপ্রমাণিত। হয়তো আরও কিছুদিন সময় লাগতে পারে। এ পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে এ কথা স্বীকার্য যে হোয়েল-নারলিকারের নতুন সমীকরণ আইনস্টাইনীয় সমীকরণের চেয়ে অনেক ভাল ও উপযোগী। এতে সময় নির্দেশ সংক্রান্ত অসুবিধাও যথেষ্ট কম। কিন্তু 'একীভূত-ক্ষেত্র-তত্ত্ব' [Unified Field Thoery] এই নতুন সমীকরণ দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি আজও। উপরন্তু আইনস্টাইনীয় ধারণা নিয়ে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব প্রমাণের দিকে বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া এখন সম্ভব হয়েছে। 1984 সালে সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসোর 'ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব' [Electro-weak Theory]

পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হওয়ার পর তা আরও শক্ত ভিত্তিভূমি পাচ্ছে ও মৌল বল রয়েছে আর মাত্র তিনটি।

বিশ্বের বয়স অসীম এই ধারণাও ঠিক নয়, যেহেতু 'স্থির-অবস্থা-তত্ত্ব' নিজেই দাবী করে যে, পদার্থ ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার অর্থই হলো কোনও এক সময় পদার্থ ছিল না। সুতরাং ঘুরিয়ে দেখলে বলা যায়, কোনও এক সময় পদার্থ সৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং তা কোনও একটা উৎস থেকে। এটা সত্যি বলে মানা যেতে পারে যে, সময় ও মহাকাশ সীমাহীন এবং অঙ্কের ভাষায় দুটিকেই অসীম বলতে পারি। তখন মহাকাশ ও সময়ের যৌথ অংশ গ্রহণ সমান হয়ে ওঠে। সময়ের বৈশিষ্ট্য হলো এর নির্দিষ্ট দিক আছে যা মহাকাশের নেই। সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান। কিন্তু পদার্থবিদ্যার সমস্ত সূত্রই অতীত-ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ। সময়ের এই বৈশিষ্ট্য আইনস্টাইনীয় তত্ত্বে অব্যাখ্যাত এবং যা নাকি সম্প্রসারণশীল বিশ্বের কারণেই উদ্ভুত। আর এটা একটা একমুখী অপরিবর্তনীয় ঘটনা [Irreversible Phenomenon]।

বস্তুর জাড্য, মহাকাশ ও সময় সংক্রান্ত ধারণা, বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর। বস্তু না থাকলে কিছুই থাকে না। মহাকাশ-সময়-সন্ততি [Space-Time-Continuum] মোটামুটিভাবে মহাকাশের জাড্য হিসাবে ধরা যেতে পারে গাণিতিক সূত্রগুলি নির্ণয়ের জন্য। কিন্তু বস্তু না থাকলে ওইগুলিও থাকবে না। মহাকাশও নয়, সময়ও নয়। সুতরাং এটা বলা ভুল যে, বস্তু না থাকলেও মহাকর্ষ থাকবে, আইনস্টাইন্ কখনই এমন কথা বলেন নি। তিনি শুধু মহাকর্ষকারী বস্তুকে একটা বক্রতাযুক্ত [Curved], স্থানীয়ভাবে বিকৃত [Locally Distorted] মহাকাশ-সময়-সন্ততি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছিলেন মাত্র। সুতরাং বস্তু না থাকলে মহাকর্ষ থাকবে না।

পদার্থের ওজন একটা আপেক্ষিক শব্দ, যা বিশ্বের অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। একটা বস্তু ওজনহীন হতে পারে বা তার ওজন বেড়ে যেতে পারে, তার পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে। সুতরাং আইনস্টাইন যে বলেছিলেন, বস্তুর ওজন নির্ভর করবে সৌরজগতের মহাকর্ষীয় বস্তুসমূহের উপর, তা আংশিক সত্য। প্রকৃত পক্ষে, কোনও বস্তুর মহাকর্ষ বিশ্বের অন্য সমস্ত বস্তুর মহাকর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত, শুধু সৌরজগতের কটি বস্তুর মহাকর্ষের সঙ্গে নয়। এ ব্যাপারে হোয়েল-নারলিকার আইনস্টাইন তত্ত্বের উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটানোর প্রস্তাবই দিয়েছেন।

1965 সালের অক্টোবর মাসে হোয়েল সাহেব অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, পরবর্তী আবিষ্কারগুলির নিরীখে এই স্থির-অবস্থা-তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তিনি এও মন্তব্য করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সম্প্রসারণশীল বিশ্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বের একটা অংশ হয়ত প্রসারিত হচ্ছে ঠিকই, অন্য অংশ হয়ত সঙ্কুচিত হচ্ছে, যা আমাদের নিরীক্ষার বাইরে। হোয়েল এখনও মনে করেন, স্পন্দনশীল-বিশ্ব-তত্ত্ব বিশ্বের একটা স্থানীয় অবস্থার কথা বলে, সারাবিশ্বের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে বিশ্বের এই প্রসারণ-সংকোচন, আবার প্রসারণ ও আবার সংকোচন অর্থাৎ স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বই আপাততঃ বেশির ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন। বিশ্বের এই স্পন্দনশীল রূপ ভারতীয় দর্শনের বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় আশ্চর্যজনকভাবে। এই আলোচনা প্রথম পরিচ্ছেদে বিশদভাবে করা হয়েছে।

2. উচ্চ ঘনত্বের দোলায়মান মডেল [High Density Oscillating Model] ঃ

মহাবিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব ক্রান্তিক ঘনত্বের [Critical Density] চেয়ে বেশি হলে বিশ্বপরিসর হবে বদ্ধ [Closed], আর বিশ্বলোকের আকার হবে সসীম। বস্তু ঘনত্ব বেশি হওয়ায় মহাকর্ষের কারণে মহাবিশ্বের প্রসারণবেগ ক্রমশ মন্থর হতে হতে এক সময় সেই বেগ থেমে যাবে এবং তারপরই শুরু হবে মহাসংকোচন [Big Crunch] । মহাবিশ্ব এই ক্রমসংকোচনে আবার ফিরে যাবে মহাবিস্ফোরণের প্রারম্ভের চরম ঘনত্বের অবস্থায়। আবার ঘটবে মহাবিস্ফোরণ। আবার শুরু হবে মহাবিশ্বের মহাপ্রসারণ। এইভাবে মহাবিশ্ব হবে চির অস্থির, প্রসারণ-সংকোচনে চির দোলায়মান।

মহাবিশ্বের প্রসারণ কিংবা সংকোচন নির্ভর করে একটি মাত্র অপেক্ষকের [Function] উপর। এটি হল R(t), অর্থাৎ এটি সময়ের অপেক্ষক। এছাড়া মহাবিশ্ব একটি ধ্রুবকের উপরও নির্ভরশীল। এই ধ্রুবক হল K। R(t) কে বলা হয় স্কেল-ফ্যাক্টর [Scale Factor]। এটি মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। আর K হল মহাবিশ্বের মোট শক্তি। বিশ্বের সমস্ত গতি শক্তি এবং স্থিতি শক্তির মোট পরিমাণ হল K। এই K-ই বলে দেয় মহাবিশ্বের বস্তুগুলি মহাকর্ষীয় বদ্ধতন্ত্র [Closed System] গঠন করবে, কিংবা মহাবিশ্ব অনির্দিষ্ট কাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে।

বর্তমান মডেলে R(t) অপেক্ষক হবে 'চক্রজ' [Cycloid]। আর বিশ্বের বর্তমান বয়স কম হবে এবং তার বস্তু ঘনত্ব বেশি হবে, আইনস্টাইন-দ্য সিটার মডেলের বিশ্বের বয়স এবং বস্তু ঘনত্বের তুলনায়। এই মডেলে মহাবিশ্বের স্থিতিমাপ [Parameter] অনেকটাই আইনস্টাইন-দ্য সিটার মডেলের মতই হবে এবং বর্তমান পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে এই মডেলের অনুসিদ্ধান্তগুলি বেশ খাপ খেয়ে যায়। বেশির ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী তথা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী দোলায়মান মহাবিশ্ব মডেলই বিশ্বতত্ত্বের পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে সমধর্মী কিংবা সমভাবাপন্ন বলে মনে করেন। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের ফলে পাওয়া তথ্যগুলির সঙ্গে দোলায়মান মডেলই সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সঙ্গতিপূর্ণ মডেল।

3. লেমেতার মডেল [Lemaitre Model] ঃ

এই মডেলে K শূন্যের চেয়ে কিছুটা বেশি, অর্থাৎ K>O এবং এর মহাজাগতীয় ধ্রুবক [Cosmological Constant] λ-ও শূন্যের চেয়ে বেশি এবং অবশ্যই ক্রান্তিক মানের চেয়ে বেশি। এই মডেলের অপেক্ষক R(t)-র ধর্ম খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। লেমেতারের মতে মহাবিশ্বের প্রাথমিক প্রসারণ বেগ ছিল অত্যন্ত বিশাল, যেমনটা নাকি বলা হয়েছে আইনস্টাইন-দ্য সিটার মডেলে। প্রাথমিক এই প্রবল গতি কিছুটা মন্দীভূত হয় বস্তুগুলির নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে। এই মন্দীভূত গতিসম্পন্ন অবস্থায় গ্যালাক্সীগুলি তৈরি হতে থাকে। এই মন্দনকাল অতিক্রান্ত হলে আবার প্রসারণ বেগ বাড়ে। বলা হয়, বর্তমান মহাবিশ্ব এই রকম একটা অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব তার প্রাথমিক প্রবল গতি এবং তারপরের খানিকটা মন্দীভূত গতির স্তর পেরিয়ে এখন আবার প্রবল গতির অবস্থায় এসেছে।

এই মডেলটি ক্রমশঃ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে এই কারণে যে, কোয়াসারগুলির [Quasars] লাল-সরণের [Red Shift] ব্যাখ্যা যথোপযুক্তভাবে করতে পারছে এই মডেল। এটিতে প্রসারণ ত্বরান্বিত হবে। অন্যান্য মডেলের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, অন্যান্য মডেলে প্রসারণ মন্দীভূত হয় নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে। এখানে একটা সময় পরে নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাব কমে যায় এবং প্রসারণ ত্বরান্বিত হয়। এই মডেলে, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জানতে পারা যায়, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বেগ ত্বরান্বিত হচ্ছে অথবা মন্দীভূত হচ্ছে। এটা জানা যায়, হাবল রেখাচিত্র [Hubble Diagram] পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

খুব বিশাল পরিমাণ লাল-সরণের ক্ষেত্রে হাবল-সূত্র একেবারেই অচল। এই সূত্রের কোনও পরিবর্তিত রূপ হয়ত বলে দিতে পারবে প্রসারণের ত্বরণ কিংবা মন্দন। যাইহোক, লেমেতারের এই মডেল মহাবিশ্বের অনেকটাই বাস্তব সম্মত রূপকেই প্রকাশ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই মডেল মহাবিশ্বের বর্তমান রূপটিই বর্ণনা করছে।

4. কম ঘনত্বের চির-প্রসারণশীল মডেল [Low Density Ever-expanding Model] ঃ

এই মডেলে ধ্রুবক K শূন্যের চেয়ে কম অর্থাৎ K<O, কারণ মহাবিশ্বের বস্তু ঘনত্ব এখানে কম। আর, R(t) অত্যন্ত ক্ষুদ্র t-এর জন্য হয়ে যায় $t^{2/3}$ এবং অত্যন্ত বিশাল পরিমাপের t-এর ক্ষেত্রে R(t) হয়ে কেবলই t। এই অপেক্ষক থেকেই এটা পাওয়া যায় যে, এই মডেলের মহাবিশ্ব চির-প্রসারণশীল, কারণ এর কোন মহাকর্ষজনিত পিছুটান নেই। এই মডেল বলছে, আইনস্টাইন-দ্য-সিটার মডেল অনুসারে মহাবিশ্বের যা বয়স, প্রকৃতপক্ষে এই বয়স তার চেয়ে অনেকটাই বেশি। বর্তমান পর্যবেক্ষণগুলির অনেক কটির সঙ্গে এই মডেলের বক্তব্যের সামঞ্জস্য রয়েছে। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এই মডেলটি গ্রহণীয় মডেল। মহাবিশ্বের স্বরূপ বর্ণনায় এই মডেলটি যথেষ্ট বাস্তবমুখী।

5. আইনস্টাইন-দ্য সিটার মডেল [Einstein-de Sitter Model] ঃ

এই মডেলটি একটি বিশেষ মধ্যপন্থী মডেল। তবে λ-factor বাতিল করার পর থেকেই আইনস্টাইন এই মডেলটিকেই মহাবিশ্বের সঠিক মডেল হিসাবে গ্রহণ করেন। এতে K= 0 এবং R(t) অপেক্ষকটি $t^{2/3}$ -এর সমানুপাতিক । এই মডেলে মহাবিশ্বের বস্তু-ঘনত্ব, উচ্চ ঘনত্বের এবং নিম্ন ঘনত্বের মডেলের বস্তু-ঘনত্বের মাঝামাঝি। এই মডেলে প্রসারণ-বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হতে হতে এক সময় তা শূন্য হয়ে যায়। মডেলটি মহাবিশ্বের বয়স সম্বন্ধে বলছে যে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স প্রায় 700 কোটি বছর । এই বয়সকাল আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের [Milky way] বয়সের সঙ্গে মেলে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বয়স প্রায় 700 কোটি বছর বলে পর্যবেক্ষণের উপাত্তগুলি [Data] থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। মহাবিশ্বের বয়স কিন্তু প্রায় 2000 কোটি বছর নির্ণীত হয়েছে অন্যান্য মডেল থেকে। এই মডেলে বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ হল 2×10^{-29} গ্রাম/ঘন সেমি। এই বস্তু-ঘনত্ব উচ্চ ঘনত্বের মডেলের বস্তু-ঘনত্বের চেয়ে কম। কিন্তু পরিচিত গ্যালাক্সীদের বস্তু-ঘনত্বের প্রায় 30 গুণ হল এই মডেল থেকে পাওয়া বস্তু-ঘনত্ব। এই মডেল মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণজনিত ফলাফলের সঙ্গে অনেকটাই সুসঙ্গত। তবে এই মডেলের পুরোপুরি গ্রহণযোগ্যতা এখনও ঠিকঠাক প্রমাণিত হয় নি। এই সম্পর্কে পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে মহাজাগতিক কোমল এক্স-রশ্মির [Soft X-ray] উপর আরও গভীর গবেষণার পর।

6. বিকিরণ-পরিপূর্ণ মডেল [Radiation Filled Model] ঃ

এই মডেল মূলতঃ মহাবিশ্বের প্রসারণের প্রথম দিকের অবস্থা বর্ণনা করে, যখন মহাবিশ্ব জুড়ে বিকিরণেরই প্রাধান্য ছিল। সে সময়টা হল বিকিরণ থেকে পদার্থ সৃষ্টির কাল। এখনকার মত তখন পদার্থের প্রাধান্য ছিল না, ছিল বিকিরণ প্রাধান্য। তখন বিকিরণ চাপের প্রাধান্য ছিল মহাকর্ষের নয়। R(t) এখন $t^{1/2}$-এর মত হয়েছে এবং বিকিরণের উষ্ণতা হয়েছে $t^{-1/2}$, কিন্তু অতিরিক্ত অণু-তরঙ্গ [Microwave] বিকিরণের আবিষ্কার এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

1946 খ্রিস্টাব্দে রুশ-আমেরিকীয় পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো [George Gamow] এবং তাঁর সহকর্মীরা বললেন, মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের প্রসারণ যখন শুরু হয় তখন মহাবিশ্বের উষ্ণতা ছিল অত্যন্ত বিশাল। এর ফলে 'তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া' [Thermo-nuclear Reaction] শুরু হয় এবং এর থেকে হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী মৌল, বিশেষ করে হিলিয়াম প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মহাবিশ্বে যে এখন সর্বত্র প্রচুর পরিমাণ হিলিয়ামের ছড়াছড়ি তার প্রধান কারণ ওই তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া। জর্জ গ্যামোরা আরও বললেন, অধিকাংশ তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল 100 সেকেন্ডের মধ্যেই, যখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 100 কোটি [10^9] ডিগ্রি কেলভিন [^{0}K]। বিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে উষ্ণতা কমতে থাকলো। তাপের এই বিকিরণ ঘটেছিল 'কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ' -এর [Black Body Radiation] নিয়ম মেনে। আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণের যে বর্ণালি পাওয়া যায় বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে অনেকটা সেই রকমের বর্ণালি পাওয়ার কথা যেহেতু মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে এই বিকিরণের উষ্ণতা পরম শূন্যের কয়েক ডিগ্রি মাত্র বেশি হওয়ার কথা। এই রকম একটি বিকিরণ ক্ষেত্রের বিকিরণ স্বভাবতই গ্যালাক্সী কিংবা অন্যান্য রেডিও উৎসের [Radio Source] বিকিরণের তুলনায় অত্যন্ত সামান্যই হবে এবং সেন্টিমিটার ও মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অণু-তরঙ্গগুলি ওই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ ওই ধরনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অণুতরঙ্গগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান মহাবিশ্বে বিদ্যমান থাকবে।

মহাবিশ্বে নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি সীমার [Range] তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন অতিরিক্ত বা অনেকটাই বেশি মাপের অণুতরঙ্গ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল হঠাৎই 1965 সালে। ওই বছরই পেনজিয়াস [A.A. Penzias] এবং উইলসন [R.W.Wilson] হঠাৎই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের বিকিরণের আতিশয্য আবিষ্কার করেন। আমেরিকার এই দুই পদার্থবিজ্ঞানী দেখলেন যে, 7(সাত) সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণের একটি অভিমুখী অভিবাহ [Incoming Flux] পাওয়া যাচ্ছে, যা পরিচিত উৎসগুলি থেকে আসা বিকিরণের চেয়ে প্রায় 100 গুণ বেশি। এটিকে যদি কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণ ক্ষেত্রের অংশ হিসাবে ধরা হয়, তবে মহাবিশ্বের উষ্ণতা হবে পরম শূন্যের চেয়ে 3(তিন) ডিগ্রি কেলভিন বেশি। এই উষ্ণতার সঙ্গে জর্জ গ্যামোর আবিষ্কৃত উষ্ণতা ভালোভাবেই মিলে যায়। অন্যান্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলিতে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, এই বিকিরণের বর্ণালি 2.7 কেলভিন উষ্ণতা-বিশিষ্ট কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বর্ণালির সমগোত্রীয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে, এক মিলিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা তারও চেয়ে কম তরঙ্গ-দৈঘ্যের বিকিরণগুলির পরিমাপ করে। পরম শূন্যের 2.7 ডিগ্রি উপরে অবস্থিত কৃষ্ণ বস্তুর বর্ণালি, যেগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার কিংবা তার কম, দ্রুত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে নেমে আসে বা হ্রাস পায়। এর পরিমাপ করতে হবে বায়ুমণ্ডলের উপরে গিয়ে। এটা সম্ভব মহাকাশযানে পরিমাপ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষের দিকে বায়ুমণ্ডলের উপরে মহাকাশ যান পাঠিয়ে এক মিলিমিটার কিংবা তার কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের পরিমাপ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অণুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের অতিরিক্ত বিকিরণের 'কৌণিক বন্টন' [Angular Distribution] পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই 3^0 কেলভিন উষ্ণতার অণুতরঙ্গ দিনে, রাতে, সকালে, সন্ধ্যায় সর্বক্ষণ মহাকাশের বিভিন্ন দিক থেকে সমানভাবে পৃথিবীতে আসছে। এই বিকিরণ সমদৈশিক [Isotropic]। বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর সমদৈশিকতার পরিশুদ্ধি [Precision] প্রায় 0.1% মাত্র। যদি এই বিকিরণ বিশ্বতত্ত্বীয় উৎসের বিকিরণ হয়, তা হলে এই মাপজোক হবে সবচেয়ে সঠিক পরিমাপ, যা এই প্রথম করা হল। এই পরিমাপ থেকে পাওয়া যাবে এই মহাবিশ্ব বৃহত্তর অর্থে

প্রায় সমদৈশিক। এর থেকে পাওয়া যেতে পারে বিকিরণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গতিশীল পৃথিবীর গতিবেগের সর্বোচ্চ সীমা। একটু সূক্ষ্মতর ওই পরিমাপ সঠিকভাবে বলে দেবে, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডকে সূর্য কোন্ গতিতে, কীভাবে পরিক্রমণ করছে। সূর্যের সঠিক ঘূর্ণন গতিও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। আরও জানা যাবে, এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত গতির কথা এবং তার সার্বিক গতিশীলতার অবস্থা। এর ফলে স্থানীয় গ্যালাক্সীগুলির সঙ্গে তা আমাদের গ্যালাক্সী তথা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক অনেকটাই সঠিকভাবে জানা যাবে। জানা যাবে, স্থানীয় গ্যালাক্সীগুলির প্রেক্ষিতে আমাদের গ্যালাক্সীর অবস্থান এবং তাদের সম্পর্কে আরো বহু নতুন তথ্য।

এখনও এটা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় নি যে, অণুতরঙ্গের এই মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের পৃথিবীতে আসাটা মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণের কারণেই। এই অণুতরঙ্গের থেকে বিকিরণ যে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের সমধর্মী তাও একেবারে শতকরা একশোভাগ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হয় নি। ঊর্ধ্বাকাশে উপগ্রহ পাঠিয়ে নানা মাপজোক করে এতাবৎ যা পাওয়া গেছে, বিজ্ঞানীর তার থেকে বলছেন, এই বিকিরণ উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। এটি নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হলে, সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব আবিষ্কারের মতই এটি হবে একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার।

মোটের উপর রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সকলেই প্রায় এক মত যে, প্রায় 3^0 কেলভিন তাপমাত্রার অনুবর্তী একটা অতিরিক্ত অণুতরঙ্গ প্রায় সব দিকে থেকে পৃথিবীতে আসছে। ওই উষ্ণতার কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের বর্ণালি ওই অণুতরঙ্গের বিকিরণের বর্ণালি প্রায় একই। পরবর্তীকালে সূক্ষ্মতর পরিমাপের পর প্রমাণিত হয়েছে যে, ওই বিকিরণ তরঙ্গের তাপমাত্রা সঠিকভাবে 2.7^0 কেলভিন, 3^0 কেলভিন নয়। সুতরাং পেন্‌জিয়াস-উইলিয়ামের এই আবিষ্কার মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণকেই সমর্থন করে। ফ্রীড্‌মান ও লেমেতারের ধারণাকে অণুসরণ করে জর্জ গ্যামো ও তাঁর সহকর্মীরা মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তারই সমর্থন পাওয়া যায় পেন্‌জিয়াস-উইল্‌সনের আবিষ্কারে। এই সব আবিষ্কার এবং তত্ত্ব মহাবিস্ফোরণের তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

মার্কিন বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই 'অনন্যতা'র [Singularity] তত্ত্বের কথা বলছিলেন। তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে কাজে লাগিয়েই বলতে চাইছিলেন যে, মহাবিশ্ব একটি বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে মহাবিস্ফোরণের ফলে বেরিয়ে এসেছে। কেউ জানে না, সেই বিন্দুতে মহাসংকুচিত অবস্থায় মহাবিশ্ব কেমন করে অবস্থান করেছিল। পদার্থবিজ্ঞানের কোনও নিয়ম এর ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই আদি অবস্থায় আয়তন ছিল শূন্য [প্রায়], বস্তু বা শক্তির ঘনত্ব ছিল অসীম। এই অবস্থায় সময় ছিল না অর্থাৎ $t = 0$ ছিল। সময়ের চলার শুরু মহাবিস্ফোরণের পরে পরেই। মহাবিশ্বের এই অবস্থাকে বলা হয় 'অনন্যতা'। অনন্যতা হলো এক অবর্ণনীয়, অজানা, অব্যাখ্যাত অবস্থা। মহাবিস্ফোরণের ঠিক 1/100 সেকেন্ড পরে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10,000 কোটি কেলভিন। এরপর তাপমাত্রা কমতে থাকে প্রসারণের ফলে বিশ্বের আয়তন বাড়ার সঙ্গে। আদি বিশ্বের এই পর্যায়ে অকল্পনীয় তাপমাত্রা এবং ঘনত্বের মধ্যে বিকিরণ থেকে বস্তুকণার রূপান্তর ঘটছিল নানা সংঘর্ষে। এই সময়ের মহাবিশ্বে কিন্তু 'তাপীয় সাম্য' [Thermal Equilibrium] বজায় ছিল। এরপর ক্রমবিকিরণে উষ্ণতা কমতে থাকলো।

কোনও পদার্থের সমস্ত অংশে উষ্ণতা সমান হলে এবং তার সব দিক থেকে একই হারে শক্তির বিকিরণ ঘটতে থাকলে মোটামুটিভাবে আমরা তাকে 'কৃষ্ণ বস্তু' [Black Body] বলে থাকি। এই বস্তু থেকে যে বিকিরণ ঘটে তাকে 'কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ' [Black Body Radiation] বলা হয়। এই বিকিরণের শক্তি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভর করে ওই কৃষ্ণবস্তুর তাপমাত্রার উপরে। (1) কোনো বিকিরণ রশ্মির

শক্তি যত বেশি, তার কম্পাঙ্ক [Frequency] তত বেশি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম হবে। (2) আর কোনও কৃষ্ণবস্তুর তাপমাত্রা যত বেশি তার রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যও হবে তত হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র মানের। উষ্ণতা যত কমতে থাকবে বিকীর্ণ রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তত বাড়তে থাকবে। এই মহাবিশ্ব আদিম পর্যায়ে রশ্মি বিকিরণের যে নিয়ম মেনেছিল তা কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের নিয়মগুলির সামিল। ফলে, বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, বিশ্বের 'কসমিক সূপ' [Cosmic Soup] অবস্থায় বিশ্ব থেকে যে বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ রশ্মি বেরিয়ে এসেছিল তার অবশেষ আজও মহাবিশ্বে থাকার কথা। মহাবিশ্বের বিপুল প্রসারণে সেই বিকিরণ রশ্মি আজকে হয়ত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেকটাই বেড়ে গেছে, তার তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে এবং এই বিকিরণের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভবই মনে হয়েছিল ওই সময়ের বিজ্ঞানীদের কাছে।

তবু বিজ্ঞানীরা বললেন ঃ সেই আদিম কসমিক সূপের নিদারুণ তীব্র রশ্মির যে অতিক্ষীণ ছায়া আজকের মহাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত থাকার কথা তার এখনকার তাপমাত্রা হবে 5^0 কেলভিনের কাছাকাছি। অর্থাৎ এই তাপমাত্র -273^0 সেলসিয়াসের মাত্র 5^0 বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এই ছায়া-রশ্মির আবিষ্কার নিয়ে মেতে উঠলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক [R.H. Dicke], রোল [P.G. Roll], উইল্‌কিন্‌সন [D.T. Wilkinson], পীব্‌ল্‌স্ [P.J.E. Peebles] প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। 1965 সালের প্রথম দিকে শুরু হল তাঁদের গবেষণা। এমন সময় হঠাৎই একদিন পেন্‌জিয়াস এবং উইলসন আবিষ্কার করে ফেললেন মহাকাশের সর্বত্রব্যাপী এমন একটি রশ্মিস্রোত, এমন একটি অণুতরঙ্গের বিকিরণ, যার গড় উষ্ণতা 3^0 কেলভিনের মত। 1965 সালের Astrophysical Journal-এর 142 সংখ্যায় পেন্‌জিয়াস ও উইলসন তাঁদের আবিষ্কারের উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'A Measurement of Excess Antenna Tempersturc at 4080 M Hz' নাম দিয়ে। 4080MHz হল আবিষ্কৃত রশ্মির কম্পাঙ্ক। এই কম্পাঙ্কের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হবে 7.35 সেন্টিমিটার এবং এর তাপমাত্রা হল 3^0K বা -270^0K সেলসিয়াস। ওই পত্রিকার ওই সংখ্যাতেই ডিক, পীব্‌ল্‌স্, রোল এবং উইলকিন্সন্ এই আবিষ্কার সম্বন্ধে বললেন, খুব সম্ভবতঃ এটি বিশ্বের আদিম বিকিরণের ক্ষীণ অবশেষ। এই অবশেষের কথাই বলেছিলেন জর্জ গ্যামো এবং তঁর সহকর্মীরা। আগেই বলা হয়েছে, পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ওই বিকিরণের তাপমাত্রা 2.7^0 কেলভিন।

সুতরাং মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে মহাকাশের চারিদিক থেকে আসা 2.7^0 কেলভিন উষ্ণতার ওই অতিক্ষীণ অণুতরঙ্গ বা রশ্মি স্রোত, যা সেই আদিম বিশ্ব থেকে উৎপন্ন হয়ে মহাবিশ্বের বিপুল বিস্তারের কারণে আজ অতি দুর্বল, অতি ক্ষীণ, অতি শীতল বিকিরণ স্রোত হয়ে সারা বিশ্বে বিরাজমান। এই বিকিরণ হয়েছিল সেই সময় যখন আদিম বিশ্বে বিকিরণ থেকে ইলেকট্রন তৈরি হয়ে প্রোটন ও নিউট্রনদের সঙ্গে জোড় বাঁধছিল এবং বিকিরণের কাছে মহাবিশ্ব স্বচ্ছ [Transparent] হয়ে উঠছিল। আদিম মহাবিশ্বেও বস্তু-ঘনত্বের পরিমাণ সর্বত্র কাঁটায় কাঁটায় এক ছিল না। ফলে, যে অঞ্চলে বস্তু-ঘনত্ব বেশি ছিল তার তাপমাত্রা, যে অঞ্চলে বস্তু ঘনত্ব কম বা একেবারেই ছিল না তার তুলনায়, সামান্য একটু বেশি হওয়ারই কথা। সুতরাং আদিম বিশ্বের যে অণুতরঙ্গ বিকিরণ আমরা পাচ্ছি, সব সময় তার উষ্ণতা কাঁটায় কাঁটায় 2.7^0 কেলভিন হবে না। এই তাপমাত্রায় আদিম বিশ্বের অসম-ঘনত্বের একটা প্রতিফলন থাকা উচিত। অর্থাৎ নানা দিকে থেকে আসা ওই বিকিরণের তাপমাত্রা ওই 2.7^0 কেলভিনের থেকে অতি সামান্য কম-বেশি হওয়ার কথা। এই সামান্য হেরফের প্রমাণিত হলেই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সত্যতা আরও অনেক বেশি

নিশ্চিত হতে পারবে। তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ওই অণুতরঙ্গ বিকিরণ-অবশেষ নিয়ে শুরু হল গভীর গবেষণা।

1992 সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এই গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই উদ্দেশ্যে পাঠানো Cosmic Background Explorer Satellite (COBE) যে সব তথ্য সংগ্রহ করে আনে, সেগুলিকে প্রায় একবছর ধরে বিশ্লেষণ করার পর ঘোষণা করা হল, ওই আদিম বিশ্বের অণুতরঙ্গের বর্তমান অবশেষের তাপমাত্রায় সামান্য হেরফের হয়েছে। অর্থাৎ ওই বিকিরণে 2.7^0 কেলভিন তাপমাত্রার মধ্যে একটু কম-বেশি আছে। এই হেরফেরটি অবিশ্বাস্য রকমের অল্প। বলা হয়েছে, এর পরিমাণ হল এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের তিনকোটি ভাগের এক ভাগ [3.33×10^{8} ডিগ্রি সেলসিয়াস] মাত্র। পরিমাণ যাই হোক না তাপমাত্রার এই অতি সামান্য হেরফের আদিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বস্তু-ঘনত্বের তারতম্যই নির্দেশ করে। সুতরাং COBE-এর তথ্য থেকে এটা এখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, আদি বিশ্ব তার অনন্যতা থেকে মহাবিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছে মহাবিস্ফোরণের পর। অনন্যতাই মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বে প্রসারিত এবং রূপান্তরিত হয়েছে এবং নিত্য রূপান্তরিত হচ্ছে। মহাবিশ্ব অস্থির, তাঁর ক্রমপ্রসারণ চলছে; শুরু হবে ক্রমসংকোচন এবং তা আবার উপস্থিত হবে অনন্যতায় মহাসংকোচনের শেষে। প্রায় 2×10^{10} বছর বা 2000 কোটি বছর হল বর্তমান বিশ্বের বয়স। আরও 2000 কোটি বছর ধরে চলবে তার মহাপ্রসারণ, তারপর শুরু হবে মহাবিশ্বের মহাসংকোচন। আবারও 4000 কোটি বছর পরে মহাবিশ্ব চলে আসবে অনন্যতায়। মহাবিশ্বের বয়স নিয়ে কিন্তু বিতর্কের অন্ত নেই। বড় বড় টেলিস্কোপের সাহায্যে এখন 1000 কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সী, নীহারিকা এবং কোয়াসার পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে। এমন কি আমরা 1300-1400 কোটি বছর আগেকার অবস্থার গ্যালাক্সী এবং নক্ষত্রদেরও পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। নানা পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে মহাবিশ্বে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের বয়স 1300 বা 1400 কিংবা 1500 কোটি বছর। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা হয়, বিশ্বের বয়স 1500 কোটি থেকে 2000 কোটি বছর। এখন এটা প্রায় সব বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 2000 কোটি [2×10^{10}] বছর। কিন্তু অতি সম্প্রতি একদল মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়েন্ডি ফ্রীডম্যানের [Wendy Freedman] নেতৃত্বে গবেষণা চালিয়ে বলেছেন, মহাবিশ্বের বয়স 800 থেকে 1200 কোটি বছরের মধ্যে। কিন্তু মহাবিশ্বের বয়স এতো কম হতে পারে না বলে আপত্তি তুলেছেন অ্যালান স্যান্ডেজ [Allan Sandage] প্রমুখ বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্ষেত্রের মধ্যে তারাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের যে ধারণাটি গড়ে উঠেছে তাই-ই সবচেয়ে সন্তোষজনক এবং নির্ভরযোগ্য। এই ধারণা অনুযায়ী বিশ্বে অসংখ্য তারা আছে যাদের বয়সই 1300 বা 1400 কোটি বছর। এমন কি 1500 কোটি বছর বয়সেরও বহু নক্ষত্র মহাবিশ্বে বিদ্যমান। সুতরাং মহাবিশ্বের বয়স তাদের চেয়ে কম হতেই পারে না। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়স 1500 কোটি বছরের অনেকটা বেশিই হবে। তাই মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স 2000 কোটি বছর হওয়াই যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।

অতি সম্প্রতি, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' [NASA]-র পাঠানো 'উইল্‌কিন্‌সন মাইক্রোওয়েভ অ্যানাইসোট্রপি প্রোব' [WMAP] নামের মহাকাশযানের পর্যবেক্ষণগুলি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। এই মহাকাশযান এখন সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকে দশ লক্ষ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ওই সব পর্যবেক্ষণের জন্য। এই মহাকাশযানে আছে আদি মহাবিশ্বের ফোটো তোলার কৌশল।

এই ছবি তোলার কৌশলকে কাজে লাগিয়ে নাসার বিজ্ঞানীরা বানিয়ে ফেলেছেন আদি মহাবিশ্বের একটা চিত্র [চিত্র ঃ 4]। এই চিত্রটি নাসার মতে আদিম মহাবিশ্বের জন্ম মুহূর্তের চিত্র। এটি একেবারে মহাবিস্ফোরণ মুহূর্তের ছবি নয়। এটি মহাবিস্ফোরণ হওয়ার সামান্য পরের ছবি। কতটা পরের ছবি তারও হিসাব দিয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এক সেকেন্ডকে এক লক্ষ কোটি [10^{12}] ভাগে ভাগ করলে যে অতি সামান্য সময় বের হয়, 4 নম্বর চিত্রের ছবিটি মহাবিস্ফোরণের অতোটা সময় পরের ছবি। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়স তখন এক সেকেন্ডের এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ বা 10^{-12} সেকেন্ড মাত্র। ছবিটি মহাবিশ্বের 10^{-12} সেকেন্ড বয়সের ছবি।

WMAP-র পাঠানো তথ্য এবং ছবি থেকে মহাবিশ্বের বয়স হিসাব করে বের করা হয়েছে এবং সেই বয়স মাত্র 1370 কোটি বছর। অথচ মহাবিশ্বে অনেক নক্ষত্র আছে যাদের বয়স 1500 কোটি বছরেরও বেশি। তা হলে কি এতাবৎ যত নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং যে সব তথ্য থেকে বিশ্বের বয়স প্রায় 2000 কোটি বছর বলে নির্ণয় করা হয়েছে সে সমস্তই ভুল? একথা বহু বিজ্ঞানী মানতে নারাজ যে, বিশ্বের বয়স মাত্র 1370 কোটি বছর। নাসার ওই সিদ্ধান্ত, প্রাথমিক মহাবিশ্বের ওই চিত্রটি তাবড়-তাবড় বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী এখনও মেনে নিতে পারেন নি। নাসার এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত এক বিজ্ঞানী হলেন জন্‌স্ হপকিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ চার্লস বেনে। তিনি বলেছেন, "এর আগে শিশু মহাবিশ্বকে এতো ভালো করে বুঝতে পারেন নি বিজ্ঞানীরা। একরত্তি বিশ্ব এমন লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হচ্ছিল যে, তা দেখে যে কোনও শিশুর মা-বাবাই ভিরমি খাবেন।" কে জানে, নাসাই হয়ত সঠিক কথা বলছে। কিন্তু 1370 কোটি বছর বয়সের মহাবিশ্ব তার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। WMAP-র ওই ছবি, ওই মডেল কতটা সঠিক তা নিয়েও বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী তথা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা নাসার এই মডেলকে মেনে নেন নি। তাই মহাবিশ্বের স্বীকৃত বয়স এখনও 1500 থেকে 2000 কোটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ●

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাবিশ্ব মহাবিস্ময়

[মহাবিশ্ব এক অনন্ত বিস্ময়। বিজ্ঞানের এতো আবিষ্কার সত্ত্বেও মহাবিশ্বের বহু রহস্য আজও অজানা-অব্যাখ্যাত। আদিম যুগের মানুষ মহাকাশ নিয়ে যেমন বিস্মিত, ভয়ভীত হত, একালের সভ্য মানুষও তেমনি ভীত মহাবিশ্ব নিয়ে — তার শেষ পরিণতি নিয়ে। এই পরিচ্ছেদে আছে গ্যালাক্সীর কথা, নক্ষত্রদের বিবর্তনের কথা, কৃষ্ণগহ্বরের কথা, রয়েছে পালসার, কোয়াসার, কীট বিবর, শ্বেতগহ্বর প্রভৃতির কথা। মহাবিশ্বের দিকে দিকে যে অজস্র বিস্ময় ছড়িয়ে আছে তার সামান্য কিছু বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এই পরিচ্ছেদের আলোচনায়। 'হাবল টেলিস্কোপ' সেইসব রহস্য সন্ধানে গত কুড়ি বছর নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র দশ লক্ষটি আবিষ্কৃত হয়েছে, বাকীগুলি আজও রয়েছে অঙ্কের ফরমূলায়।]

বিশ্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের শেষ নেই, জিজ্ঞাসাও অন্তহীন। এতাবৎ যতটা জানা গেছে, তাতে দেখা যায়, মহাবিশ্ব অসংখ্য নক্ষত্র, গ্যাস ও সীমাহীন ধূলিকণার সমাহার। মহাবিশ্ব সসীম [Finite], কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় [Unbounded]। সদ্য সদ্য পাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলছে, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি [10^{10}] ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী [Galaxy] দিয়ে। এগুলির মধ্যে এতাবৎ প্রায় দশ লক্ষ গ্যালাক্সী আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্যালাক্সীতে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্যাস এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা। মহাবিশ্বের কাঠামোর অংশগুলি হল ব্রহ্মাণ্ডসমূহ। আমাদের পৃথিবী এবং সৌরমণ্ডল যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত তার নাম 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড' [Milkyway Galaxy]। এ রকম কয়েকশো কোটি গ্যালাক্সী রয়েছে মহাবিশ্বে। আমাদের সবচেয়ে কাছের ব্রহ্মাণ্ড হল 'অ্যান্ড্রোমিডা' [Andromeda]। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে ওর দূরত্ব প্রায় পাঁচ লক্ষ 'পার্সেক' [5×10^5 Parsec]। কিলোমিটারে পাঁচ লক্ষ পার্সেক হল 16.31 আলোকবর্ষ বা 15.43×10^{18} কিলোমিটার। আবার সাম্প্রতিক হিসাব বলছে এই দূরত্ব 20,00,000 আলোকবর্ষ বা 18.92×10^{18} কিমি। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সীতে নক্ষত্রের গড় সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি [10^{11}] এবং প্রতিটির গড় ব্যাস প্রায় একলক্ষ 'আলোক-বর্ষ' [10^5 Light Year]। কোনও গ্যালাক্সীর দুটি নক্ষত্রের মধ্যে গড় দূরত্ব মোটামুটি দশ আলোক-বর্ষ। কেউ কেউ আবার বলেছেন যে, দুটি নক্ষত্রের মধ্যে গড় দূরত্ব হল প্লুটো [Pluto] গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসের প্রায় 25000 গুণ, যা মোটামুটিভাবে 15×10^{13} কিলোমিটার বা 15.85 আলোক-বর্ষ।

মহাবিশ্বের বিস্ময়কর বিশালতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে হলে জানতে হবে 'আলোক-বর্ষ' [Light Year] এবং 'পার্সেক' [Parsec] ব্যাপারগুলি কী। একটি আলোকরশ্মি শূন্যে এক সেকেন্ডে যায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। (প্রকৃতপক্ষে 2,99,776 কিমি)। আলোকবর্ষ হল একটি আলোকরশ্মি এক বছরে শূন্যে যতটা পথ পাড়ি দেয় সেই দূরত্ব। এই পরিমাণ মোটমুটিভাবে 9.46×10^{12} কিলোমিটার।

অর্থাৎ প্রায় সাড়ে নয় 'মহাপদ্ম' কিমি। তারার দূরত্ব মাপার দ্বিতীয় একক হল 'পার্সেক' [Parsec]। একটি তারা থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধব্যাস যে কোণে দেখা যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাকে বলা হয় তারাটির 'বার্ষিক লম্বন' [Annual Parallax]। পার্সেক কথাটা এসেছে Parallax (লম্বন) ও 'Second' কথা দুটি মিশিয়ে। পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধব্যাস যে দূরত্ব থেকে এক কৌণিক সেকেন্ড [One Second of an Arc] কোণ উৎপন্ন করে, সেই দূরত্ব হল এক 'পার্সেক'। এক পার্সেক হল, 3.262 আলোকবর্ষ, অর্থাৎ $30,816\times10^{9}$ কিলোমিটার। এক মেগা-পার্সেক হল দশ লক্ষ পার্সেক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাক্ষত্রিক দূরত্ব মাপতে এই 'মেগা-পার্সেক'-কেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। আর এই মেগা-পার্সক হল $30,816\times10^{15}$ কিলোমিটার।

আমাদের সৌরমণ্ডল রয়েছে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে। এটি তার সামান্য একটা অংশমাত্র। বিজ্ঞানীরা যতটা জেনেছেন তাতে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডটা এই রকম ঃ

চিত্র ঃ 5
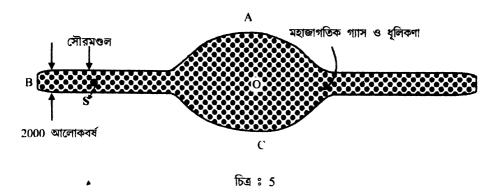
● ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড ●

S = সৌরমণ্ডল

O = ছায়াপথ গ্যালাক্সীর কেন্দ্রবিন্দু

BD = এক লক্ষ অলোকবর্ষ

AC = দশ হাজার আলোকবর্ষ

OS = ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ

BS = কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ

অর্থাৎ আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি মুখ্য অংশ ঃ

(1) নক্ষত্র খচিত গোলাকার সমতল একটি চাকতি, যার ব্যাসার্ধ 50,000 আলোকবর্ষ এবং বেধ [Thickness] 2,000 আলোকবর্ষ।

(2) স্ফীত কেন্দ্রীয় অঞ্চল, যার বেধ 10,000 আলোকবর্ষ।

(3) কেন্দ্রীয় অঞ্চল জুড়ে সম-বিন্যস্ত অসংখ্য প্রাচীন নক্ষত্র, যেগুলি তৈরি করেছে এক সুন্দর বর্ণবলয়।

আমাদের সৌরমণ্ডলের অবস্থান হল ওই সমতল চাকতির উপর। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে এর অবস্থান প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ [3×10^{4}]। এই ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নক্ষত্র ঘনত্ব [Density of Stars] অন্য অংশের প্রায় তিনগুণ। জ্যোতির্বজ্ঞানীরা এক সময় গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়াও বহু নীহারিকা

[Nebulae] পর্যবেক্ষণ করতেন। 1929 খ্রিস্টাব্দে এডুইন পাওয়েল হাবল [Edwin Powell Hubble] প্রথম প্রমাণ করলেন ওই সব নীহারিকা বা নক্ষত্রপুঞ্জ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী, যা আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মতই। বিজ্ঞানী হাবলের সূত্র অনুসরণ কর বেরিয়ে এল 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' [Big Bang Theory]। এই তত্ত্বেরই অন্য নাম 'সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Expanding Universe Theory]। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় হাবলের সূত্র মোটামুটি সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠল। এই সূত্র অনুযায়ী কোটি কোটি গ্যালাক্সী তাদের অভ্যন্তরের অতিকায় অগণিত নক্ষত্রজগৎ, গ্যাস, ধূলিকণা নিয়ে আলোর প্রায় অর্ধেক গতিবেগে অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় 1,50,000 কিলোমিটার বেগে মহাশূন্যের চারিদিকে ছুটে চলেছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। এই তত্ত্ব 'সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব' নামে খ্যাত হল। 1930 সালে জর্জ ল্যামাৎর বা লেমেতার [Georges Lemaitre] এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন প্রায় 1000 কোটি [10^{10}] বছর আগে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি আদিম পরমাণুতে [Primeval Atom] পর্যবসিত ছিল। তিনি এর নাম দিলেন 'Super Dense Cosmic Egg'। তারপর সেই মহাজাগতিক অণ্ডটি প্রচণ্ড শব্দে, আকস্মিকভাবে বিস্ফোরিত হল। তারই ছিন্নভিন্ন দেহ থেকে সৃষ্টি হল কোটি কোটি গ্যালাক্সী এবং ছুটতে আরম্ভ করল অকল্পনীয় বেগে মহাকাশের দিকে দিকে। সৃষ্টি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

1929 খ্রিস্টাব্দের আগে অবধি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গ্যালাক্সীর আলোর বর্ণালি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কোন ক্ষেত্রে বর্ণালির 'নীল সরণ' [Blue-shift] ঘটছে, আবার বহু ক্ষেত্রে হচ্ছে 'লাল-সরণ' [Red-shift]। ডপলার প্রভাব [Doppler Effect] অনুসারে এই সব সরণের ব্যাখ্যা হল, গ্যালাক্সীগুলি হয় পৃথিবী থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে অথবা ওগুলি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। হাবল কিন্তু বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানালেন ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সীগুলি আমাদের থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এবং বর্ণালির লাল-সরণ গ্যালাক্সীর দূরত্বের সমানুপাতিক [There is a direct proportionality between the distance of a galaxy and its redshift]। হাবল তাঁর সূত্রে বললেন, "কোন গ্যালাক্সীর অপসারণ বেগ আমাদের থেকে তার দূরত্বের সমানুপাতিক" [The velocity of recession of a galaxy is directly proportional to its distance from us]। অর্থাৎ,

$$V = H_0 R$$

যেখানে, V = গ্যালাক্সীর গতিবেগ,
R = পৃথিবী থেকে ওই গ্যালাক্সীর দূরত্ব,
H_0 = হাবল ধ্রুবক [Hubble's Constant]

যদি R = 0 হয় তবে V = 0 হবে, যেহেতু $V \propto R$। সুতরাং মহাবিশ্বের আদিতে এমন একটা অবস্থা ছিল যখন ব্রহ্মাণ্ডগুলি একত্র ছিল এবং গতিহীন ছিল। তাপর ঘটেছিল নিশ্চয়ই এক মহাবিস্ফোরণ [Big Bang]। ব্রহ্মাণ্ডগুলি আলাদা হল, ছুটে চলতে শুরু করল পরস্পরের থেকে দূরে, দূরতর ও দূরতম অবস্থানের দিকে।

এখন, গ্যালাক্সীর দূরত্ব R_1, R_2, R_3,—হলে এবং তাদের গতিবেগ V_1, V_2, V_3— ধরলে ও মহাবিস্ফোরণের সময়কাল t হলে, $R_t = tV_1$, $R_2 = tV_2$, $R_3 = tV_3$ — সাধারণভাবে, t = R/V, যা মহাবিশ্বের বয়স জানিয়ে দেয়। বলে দেয় মহাবিস্ফোরণের সময়কাল আবার V/R হল H_0 বা Hubble Constant। অতএব $t = 1/H_0$, অর্থাৎ হাবল ধ্রুবক মহাবিশ্বের বয়সের ব্যতিহারী [Reciprocal]।

মহাবিশ্ব সবদিক থেকেই সমরূপ, সমপ্রকৃতি সম্পন্ন। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুসারে গ্যালাক্সীগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। একটা আরেকটার থেকে দূরে পালাচ্ছে। প্রতি গ্যালাক্সীতেই হাইড্রোজেন

ব্যবহৃত হয়ে নিঃশেষ হয়ে আসছে। প্রত্যেকেই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ক্ষীয়মান এই বিশ্ব থেকে একদিন মুছে যাবে পদার্থ, গতি এবং জীবন। এই তত্ত্বই বর্তমান শতকের মাঝামাঝি বহুল গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়। কারণ এই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করেছে ঃ

(1) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা,

(2) মহাজাগতিক বিকিরণের বেতার-তরঙ্গ সমন্বিত পশ্চাদ্‌পট,

(3) মহাবিশ্বে প্রভূত পরিমাণে হিলিয়ামের অস্তিত্ব।

এই হিলিয়াম উৎপন্ন হয়েছে মহাবিস্ফোরণের ঠিক একশ' সেকেন্ডের মধ্যে ডিউটেরিয়াম [Deuterium] থেকে প্রায় একশো কোটি ডিগ্রী কেলভিন [10^9K] উষ্ণতায়।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে চিহ্নিত এই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে খুব বড় রকমের একটা ভুল বিজ্ঞানীদের নজরে এল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই তত্ত্বে গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে এবং তারা আর কোনদিনই ফিরবে না সেই বিস্ফোরণ কেন্দ্রে। চিরদিনই ছুটে চলবে বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে দূরে আরও দূরে—দূর হতে দূরতর অবস্থানে। কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাবে ততই বাড়বে তাদের গতি এবং ক্রমশঃ ত্বরান্বিত হবে সে গতিবেগ। এমন এক সময় আসবে যখন গতি বাড়তে বাড়তে আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যাবে। যা অসম্ভব, অন্ততঃ আইনস্টাইনীয় ধারণায়। তাছাড়া ওই গতিবেগে বস্তুগুলির কী অবস্থা হবে বা হচ্ছে, যদি সত্যিই অমন বেগ হয়ে থাকে, তা কোনদিনই জানা যাবে না। বাস্তবে তো নয়ই, তত্ত্বেও না। কারণ ওগুলো যদি আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ছুটতে থাকে পৃথিবীর উল্টোদিকে, তবে কোন যন্ত্রপাতিই ওদের হদিশ করতে পারবে না কোনও কালে। অন্ততঃ আমদের পার্থিব সব যন্ত্রপাতি তা মোটেই পারবে না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে আলোর গতিবেগ ধ্রুবকও বটে, আবার সর্বোচ্চও বটে। সুতরাং গ্যালাক্সীগুলির গতিবেগ অলোর গতিবেগের বেশি হতে পারে না। এই চিন্তা-ভাবনা নতুন তত্ত্বের জন্ম দিল। 1965 সালে অধ্যাপক অ্যালান স্যান্ডেজ [Allan Sandage] এই নতুন তত্ত্বের নাম দিলেন 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory]। তিনি বললেন, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণ হচ্ছে, সংকোচন হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, লয় পাচ্ছে, আবার নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে।" তাঁর মতে এই বিশ্বের বয়স এখন 10^{10} বৎসর বা হাজার কোটি বৎসর এবং এখন চলছে এর সম্প্রসারণ কাল। এইভাবে আরও তিন হাজার কোটি বছর ধরে চলবে সম্প্রসারণ। তারপর গ্যালাক্সীগুলোর ছুটে চলার শক্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন আবার শুরু হবে মহাসংকোচন। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিশ্বের বর্তমান বয়স 2000 কোটি বছর। বিশ্ব আরও 2000 কোটি বছর ধরে প্রসারিত হতে থাকবে। তারপর শেষ হবে মহাবিশ্বের প্রসারণ। নিজের মহাকর্ষ শক্তিতে কেন্দ্রাভিমুখী গতি সৃষ্টি হবে মহাবিশ্বের যাবতীয় পদার্থের। আরও 2000 কোটি বছর পরে প্রসারণ শেষ হয়ে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে শুরু করবে। এইভাবে আবার সৃষ্টি হবে 'মহাজাগতিক অণ্ড' [Cosmic Egg], একদিন যা বিস্ফোরিত হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বয়স নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বিশ্বের বয়স 2×10^{10} বছর বা 2000 কোটি বছর বলেছেন। তবে কিছুকাল আগে 1979 সালে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান জর্জ এবেল্ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 2×10^{12} বৎসর। মহাবিশ্বের বয়স নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতভেদ আজও দূর হয় নি। তবে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বয়স এখন 2000 কোটি বছরই স্থির করেছেন।

সম্প্রতি বিজ্ঞানী ডাইক [R. H. Dicke] এবং অন্যান্যরা পৃথিবীতে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছেন, পৃথিবীর চারিদিক থেকে প্রায় সমান তীব্রতার বিকিরণ

পৃথিবীতে আসছে। এগুলি এক ধরনের অণু-তরঙ্গ [Microwave] বা বেতার তরঙ্গ। এই বিকিরণের তাপমাত্রা মাত্র 3^0K। এই বিকিরণ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বহু কিছু জানান দেয়। শুরুতে বিশ্ব ছিল পদার্থ ও জ্যোতিঃপুঞ্জ বা বিকীর্ণ শক্তির একটা সাম্যাবস্থায়। ছিল প্রচণ্ড উত্তাপ। অতি ঘন সন্নিবদ্ধ অকল্পনীয় ক্ষুদ্রতম তার আয়তন। ওই প্রচণ্ড উত্তপ্ত পদার্থ ছিল আয়নিত অবস্থায় [Ionized State]। আয়নিত পদার্থের সঙ্গে শক্তি বা বিকিরণের 'মিথষ্ক্রিয়া' [Interaction] অত্যন্ত প্রবল। বিকিরণ এবং আয়নিত পদার্থের মিথষ্ক্রিয়ার ভারসাম্য কৃষ্ণ-বস্তুর [Black Body] বিকিরণ-বর্ণালির সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং λ ও $\lambda + d\lambda$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যবর্তী V আয়তনে ও T-তাপমাত্রায় ফোটন [Photon] সংখ্যা হবে ঃ $dN = \frac{8\pi V}{\lambda^4} \bullet \frac{1}{\exp[hc/kT\lambda)] - 1} \; d\lambda$ ....[1]

এবার মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে বেতার-তরঙ্গের পরিবর্তনের সম্পর্কের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ধরা যাক, মহাবিশ্ব f বাড়লো দৈর্ঘ্যে এর সম্প্রসারণের জন্য। সুতরাং এর নতুন অয়তন হবে, $V' = f^3 V$ এবং নতুন তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে $\lambda' = f\lambda$ । তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য বর্ণালিতে ঘটবে লাল-সরণ। সুতরাং মহাবিশ্বের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বর্ণালির সরণ বাড়ছে লালের দিকে। এক্ষেত্রে নতুন ফোটন সংখ্যা হবে ঃ

$$dN' = \frac{8\pi V'}{(\lambda')^4} \cdot \frac{d\lambda'}{\exp[hc/(kT'\lambda'] - 1} \quad ....[2]$$

সম্প্রসারণের সময় ফোটন শোষিত হয় না কিংবা নতুন সৃষ্টিও হয় না। তাই dN = dN' এবং [1] ও [2] নম্বর সূত্র তুলনা করলে $T'\lambda' = T\lambda$ বা $T' = T/f$

অর্থাৎ ফোটন-বর্ণালি তার কৃষ্ণ-বস্তু-বিকিরণ গুণ বজায় রাখছে কিন্তু তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের সঙ্গে উষ্ণতা কমছে। এর অর্থ হল বিশ্ব সৃষ্টির প্রথমে তাপমাত্রা প্রবল ছিল। আস্তে আস্তে তা কমছে মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে।

শক্তি ঘনত্ব [Energy density]

$U = aT^4$ ....[3]

যেখানে, $a = \frac{8\pi^5 k^4}{15h^3 c^3} = 7.56 \times 10^{16}$ জুল/মিটার^3

বস্তু ঘনত্ব [Mass Density]

$\rho rad = U/C^2 = 8.4 \times 10^{-33} \times T^4$ .... [4]

এখন, T = 3k বসালে পাই,

বস্তু ঘনত্ব = 6.8×10^{-31} কিলোগ্রাম/মিটার^3

এই বস্তু-ঘনত্বকে এখনকার বিকিরণ-ঘনত্ব [Radiation Density] বলা যায়। এখন মহাবিশ্বে বিকিরণ-ঘনত্ব বস্তু-ঘনত্বের চেয়ে কিছুটা ছোট, তা হল 1.36×10^{-3}। মহাবিশ্বে এখন বিকিরণ শক্তির নয়, পদার্থ বা 'বস্তু-আধিপত্য-কাল' [Matter Dominated Era]। আবার t_o এখনকার সময় হলে, [3] ও [4] সমীকরণ থেকে পাই ঃ

$\rho rad(t_o) \propto T^4 \propto 1/f^4$ ....[5]

কিন্তু, $\rho m(t_o) \propto 1/V \propto 1/f^3$ ....[6]

এইভাবে, $x(t_o)$ অনুপাত = $\rho rad(t_o)/\rho m(t_o) \propto 1/f$

অর্থাৎ, $\frac{mx(t_o)}{x(t)} = \frac{1}{f}$ ....[7]

এবং $x(t)=1 \cdot 36 \times 10^{-3}$। আবারো বলি, t হল এখন থেকে মহাবিস্ফোরণ ঘটার সময় এবং 't_0' হল এখনকার সময়। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে t_0<<t এবং f<<1। তখন $x(t_0) = x(t)/f$>1, অর্থাৎ তখন ছিল বিকিরণ শক্তির আধিপত্য। বিজ্ঞানীরা তাই বিশ্বসৃষ্টির আদিপর্বের এই সময়ের নাম দিয়েছেন 'বিকিরণ-আধিপত্য-কাল' [Radiation Dominated Era]। মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি মুহূর্তের সেই ভীষণ উত্তাপে তৈরি হয়েছিল ইলেকট্রন-পজিট্রন কণা জোড়ে জোড়ে।

$$\gamma + \gamma \rightarrow e^+ + e^- \text{ ....[8]}$$

মহাবিশ্বসৃষ্টির মহাবিস্ফোরণের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয় ফোটন-ফোটন সংঘর্ষ [Photon-Photon Collisions]। সৃষ্টি হয় ইলেকট্রন, মেসন এবং নিউক্লিয়ন [Nucleons]। এদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ফোটনদের। তৈরি হয় পদার্থের প্রাথমিক কণাসমূহ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কণা এবং প্রতিকণা [Anti-particle] জোড়ায় জোড়ায় উপন্ন হয়। এরপর বিকিরণ-শক্তি এবং এই সব বস্তু-কণার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা আসে। তবে তখনকার সেই প্রচণ্ড তাপে এবং বিশ্বের প্রসারণের সেই বিশাল বেগে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামই তৈরি হয়েছে। দশ কোটি ডিগ্রি কেলভিনে তাপমাত্রা না নামা অবধি অবিরাম চলেছে 'ফিউশন ক্রিয়া' [Fusion Reactions]। ফলে, মহাবিশ্বে এখন প্রতি বারোটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটু কম-বেশি একটি হিলিয়াম পরমাণুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এর অনেকটা বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে হাবলের সূত্র তথা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব।

মহাবিশ্বের বিস্ময় নিয়ে আরও বিস্ময়কর নানা তথ্য দিয়েছেন স্টিফেন হকিং [Stephen W. Hawking] প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। এখন বিশ্বসৃষ্টির ঘটনা তথা বিশ্বের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গেছে সময়। কিন্তু আজও বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের পুরোপুরি সমাধান সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীরা পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মহাবিশ্ব আজও তাই মহাবিস্ময় শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই নয়, বিজ্ঞানীদের কাছেও।

মহাবিশ্বের পটভূমিতে ছড়িয়ে আছে লাখো বিস্ময়। এই বিশাল প্রেক্ষাপটে পৃথিবী গ্রহটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ। ধরণীর একটি ধূলিকণা এই পৃথিবীর কাছে যেমন অতি তুচ্ছ, তেমনি আমাদের সূর্য কিংবা পৃথিবী মহাবিশ্বের তুলনায় অতি নগণ্য এক কণামাত্র। এই মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি নক্ষত্র জন্মাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। এর যেন সীমা নেই, শেষ নেই। এ যেন অসীম, অনন্ত। আইনস্টাইন অবশ্য মহাবিশ্বকে বলেছেন, 'Finite but unbounded'। অপরিমেয় বিশাল এই বিশ্বের বৈচিত্র্যের যেমন শেষ নেই তেমনি অশেষ এর নানা বিস্ময়।

শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই নয় বিজ্ঞানীদের কাছেও মহাবিশ্ব এখনো এক মহাবিস্ময়। সাদা বামন [White Dwarf], লাল দানব [Red Giant], সুপারনোভা [Supernova], কোয়াসার [Quasar], পালসার [Pulsar], কৃষ্ণগহ্বর [Black Hole] ইত্যাদি বিভিন্ন নাক্ষত্রিক অবস্থার সম্বন্ধে অধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান

বেশ কিছুটা জানলেও তাদের বহু তথ্যই আজও মানুষের কাছে অজানা। এই অজ্ঞতাই সৃষ্টি করেছে মহাবিস্ময়। সেই মহাবিশ্বের কিছু বিস্ময়কর ঘটনার কথায় আসি মহাবিশ্ব যে কতটা মহাবিস্ময়ের তার আভাস মাত্র দিতে। মহাবিশ্বকে নিয়ে মানুষের বিস্ময় সভ্যতার আদিকাল থেকে। সে বিস্ময়ের ঘোর আজও কাটে নি। নিত্য নতুন আবিষ্কারে সে বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা করে কাটলেও, নতুন নতুন বিস্ময়ের জন্ম হয়েছে এই সব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই মহাবিশ্বের যেমন অন্ত নেই, তেমনি এর মহাবিস্ময়েরও যেন শেষ নাই। তাই শেষকথা কে বলবে তাও বিস্ময়ের।

সভ্যতার আদিকাল থেকে মহাকাশ নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের শুরু। এখনও সে বিস্ময়ের শেষ হয়নি। বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন অগ্রগতি এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সে বিস্ময়ের ঘোর আজও কাটে নি। প্রাচীন কিছু সমস্যার সমাধান হয়তো হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নতুন কিছু বিস্ময়কর তথ্য, যার ব্যাখ্যা এখনও অধরা। আমাদের সৌরমণ্ডলে বারোটি গ্রহ রয়েছে কিনা, সেই বিতর্কের মীমাংসা যেমন এখনো হয় নি, তেমনি প্লুটো গ্রহ কিনা তা নিয়েও রয়েছে বহু বিতর্ক। আবার 2005 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবিশ্বে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ মিললেও, কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে নানা বিস্ময়ের সঠিক সমাধান আজও সম্ভব হয় নি। এমন অজস্র বিস্ময় ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের বিপুল বিস্তারে।

হরপ্পা, মেসোপটোমিয়া, মিশর ও গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলির আমলে মহাকাশ নিয়ে বেশ কিছু চর্চা হলেও তার ব্যাপকতা একালের মত ছিল না। তবু খ-গোলককে নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে বারোটি রাশিচক্রে বিভাজন, গ্রহণ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার, রাশিচক্রভিত্তিক বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন, গ্রহ নক্ষত্রের গতির প্রেক্ষিতে পার্থিব সময় ধারণার প্রচলন ইত্যাদি প্রমাণ করে সেকালে মহাকাশ চর্চার মান খুব একটা অনুন্নত ছিল না। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃত ছায়াপথকে ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের সময়ে বলতেন, আকাশগঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা ইত্যাদি। মিশর একে বলতো স্বর্গের নীলনদী, যা মৃতের দেশে ব'য়ে চলেছে। আবার অনেকটা পরে গ্রীকরা এর নাম দেয় 'দুধ নদী' [River of Milk]। এর থেকেই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নাম দেওয়া হয় 'Milkyway Galaxy', যে ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে আমাদের পরিচিত সৌরমণ্ডল এবং রয়েছি আমরা।

আমরা আকাশে যে সব নক্ষত্র খালি চোখে দেখি সেগুলি আমাদের ওই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থিত। এদের অনেকগুলি আমাদের সূর্যের আকারের। কতকগুলি সূর্যের চেয়ে কিছুটা ছোট আয়তনের। আবার বেশ কিছু নক্ষত্র আছে যেগুলি সূর্যের কয়েকগুণ থেকে কয়েকশো গুণ বড়। আমাদের সৌরমণ্ডলের মত এই সব নক্ষত্রদের অনেকেরই গ্রহমণ্ডলী রয়েছে। ওইসব নক্ষত্রদের পরিক্রমা করছে বেশ কিছু গ্রহ। এখন বিজ্ঞানীরা এই সব গ্রহদের কিছু কিছু আবিষ্কার করেছেন। পর্যবেক্ষণ চলছে। বিশাল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বহুলাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত।

আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে বেশ কিছু নক্ষত্র আছে যেগুলি সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু তাদেরও পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের মত উজ্জ্বল দেখি না। তার কারণ নক্ষত্রগুলির বিশাল দূরত্ব। সূর্য আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 3,00,000 কিলোমিটার। এই গতিবেগ নিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় 500 সেকেন্ড। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 500 আলোক-সেকেন্ড মাত্র। এরপরের নিকটতম নক্ষত্র হল 'প্রক্সিমা সেন্টাউরি' [Proxima Centairi]। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 4.3 আলোকবর্ষ বা 4.1×10^{13} কিলোমিটার। কারণ, আগেই বলেছি, এক আলোকবর্ষ হল আলোকরশ্মি মহাশূন্যে এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, তাই-

ই এক আলোকবর্ষ, যার পরিমাণ হল 9.46×10^{12} কিলোমিটার। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অতিক্রম করতে আলো সময় নেয়, 1,00,000 বছর। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস হল তাই এক লক্ষ আলোকবর্ষ। বড় আকারের শঙ্খবৃত্তাকার [Spiral] ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস মোটামুটিভাবে একলক্ষ আলোকবর্ষ হয়ে থাকে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকগুলি এ ধরনের ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণের পর।

মহাকাশের নক্ষত্রের বিশাল রাজ্যে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে কাছের অন্য ব্রহ্মাণ্ডটি হল 'ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' [Magellanic Clouds]। এটিকে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। এটি একটি ছোটখাট ব্রহ্মাণ্ড, আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মত বড় নয়। এর নক্ষত্রসংখ্যা মোটামুটিভাবে একশো কোটি [10^9]। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় 10,000 কোটি [10^{11}]। এর চেয়েও বড়সড় ব্রহ্মাণ্ড হল 'অ্যান্ড্রোমিডা' [Andromeda], যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম হল M31। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব প্রায় 20,00,000 আলোকবর্ষ বা 18.92×10^{18} কিলোমিটার। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে এর কাছাকাছি থাকা চব্বিশটি ব্রহ্মাণ্ডের সমাহারকে বলা হয় 'স্থানীয় গোষ্ঠী' [Local Group]। এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় সদস্য হল আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং M31 গ্যালাক্সী। মহাকাশে এতাবৎ ছোটবড় প্রায় দশ লক্ষ গ্যালাক্সী আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং M31 ব্রহ্মাণ্ড দুটিই শঙ্খবৃত্তাকার এবং এ ধরনের গ্যালাক্সীগুলির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং ভারী। তবে বেশিরভাগ গ্যালাক্সীই উপবৃত্তাকার। এদের আকৃতি বর্তুলের মত। এদের নক্ষত্র-সংখ্যাও খুব বেশি। পৃথিবী থেকে এগুলির দূরত্ব কয়েশো কোটি আলোকবর্ষ। আগেই বলেছি, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স প্রায় 2000 কোটি [2×10^{10}] বছর। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একদিন থেমে যাবে শুরু হবে একদিন মহাসংকোচন। মহাবিশ্ব ফিরে যাবে তার আদি অনন্যতায় [Singularity]। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একাংশের এই মতবাদ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বেগের মন্দন আজও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। তাই এটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল যে, এই মহাসম্প্রসারণ একদিন বন্ধ হয়ে শুরু হবে মহাসংকোচন। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাবিশ্বে রয়েছে বেশ কিছুটা 'লুকানো ভর' [Hidden Mass], যা আমাদের প্রচলিত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মাপজোখের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। এই লুকানো ভর মহাবিশ্বের মহাকর্ষকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে, মহাবিশ্বের মহাসংকোচন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে এ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হার কমছে। তাঁরা জোর দিচ্ছেন মহাবিশ্বের ওই লুকানো ভরের উপর। মহাবিশ্বের মহাকর্ষ অনেকটাই বেশি ওই অনাবিষ্কৃত লুকানো ভরের জন্য। ফলে, সম্প্রসারণ শেষ হয়ে একদিন মহাসংকোচন শুরু হবে। সাধারণভাবে বলা হচ্ছে, মহাবিশ্ব আরও 2000 কোটি বছর ধরে সম্প্রসারিত হবে এবং তারপর শুরু হবে মহাসংকোচন। বেশিরভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব'। এসব কথা একটু আগেই বলা হয়েছে হাবলের আবিষ্কারের আলোচনার সময়।

শঙ্খবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে মোটামুটি দু'রকম চেহারা ও বয়সের তারা দেখ যায়। এদের সর্পিল বাহুগুলিতে থাকে সাদা বা নীলাভ রঙের নক্ষত্র। এই তারাগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন বা কম বয়েসী। এদের বয়স 200 থেকে 300 কোটি বছরের বেশি নয়। এরা প্রথম বর্গের তারা হিসাবে চিহ্নিত। এইসব তারাদের বেশ কিছুকে ঘিরে আছে আদিম গ্যাসপুঞ্জ এবং সুপার নোভার বিস্ফোরণজাত বিশাল ধূলোর মেঘ। এই মেঘ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন তারা। আবার এইসব ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সীর

কেন্দ্রাঞ্চলে নক্ষত্র-ঘনত্ব অনেক বেশি। এই অঞ্চলের নক্ষত্রদের বেশির ভাগই পুরানো। কেন্দ্রাঞ্চলে তাই লালচে তারার ভিড়। এইসব লালচে তারারা দ্বিতীয় বর্গের নক্ষত্র। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ধনুরাশি [Sagittarius] অঞ্চলে রয়েছে এক মহাজাগতিক ধূলিপুঞ্জ যার বিস্তৃতি কয়েকশো আলোকবর্ষ। শঙ্খবৃত্তাকার এবং উপবৃত্তাকার উভয় শ্রেণীর গ্যালাক্সীতেই থাকে কতকগুলি গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জ [Globular Clusters], যেগুলির এক-একটিতে 2500 থেকে 10,00,000 পর্যন্ত নক্ষত্র অত্যন্ত ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মূল চক্রাকার তলের দু'দিকে বিন্যস্ত রয়েছে এই ধরনের গোলাকাকার নক্ষত্রপুঞ্জ। এদের সংখ্যা প্রায় 200টি। এইসব নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলে অবস্থিত তারাগুলির মতো লালাচে। অর্থাৎ গোলকাকার এইসব নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলের নক্ষত্রগুলির মতই পুরাতন। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের শৈশবকালেই এদের উৎপত্তি।

উপবৃত্তকার গ্যালাক্সীদের গঠন বেশ কিছুটা আলাদা। EO নামে অভিহিত একটি গ্যালাক্সী পুরোপুরি বৃত্তাকার বা গোলকাকৃতি। প্রথমত, এদের মধ্যে কোনও সাদা বা নীল তারা নেই বললেই চলে। এগুলির প্রায় সব নক্ষত্রই পীতাভ বা লালচে রঙের। দ্বিতীয়ত, ধূলি-মেঘ [Dust Clouds] এগুলিতে প্রায় অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, এদের কোনও সর্পিল বাহু নেই, নেই কোনো চক্রাকার মূলতলও। কোনো কোনো উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড প্রায় বৃত্তাকার এবং আয়তনে অতি বিশাল। কন্যারাশির [Virgo] নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে দেখা যায় এমনই একটি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড। সেটির নাম দেওয়া হয়েছে M87। এর আয়তন আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের পাঁচ থেকে ছয় গুণ। M87 ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে প্রায় হাজারখানেক গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জের সুষম সন্নিবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

মহাবিশ্ব আজও মহাবিস্ময়। আধুনিককালের নানা আবিষ্কার সত্ত্বেও সেই মহাবিস্ময়ের ঘোর আজও কাটে নি। আগে মনে করা হত আমাদের সৌরজগৎ মহাবিশ্বে অনন্য। এখন কিন্তু সৌরজগতের মত কয়েকটি গ্রহমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এখনও অবধি পৃথিবীর মত কোনও গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় নি। বহু নক্ষত্রেরই গ্রহ আছে, কিন্তু তাদের দেখতে পাওয়া দুরূহ। গ্রহরা আসলে খুবই অনুজ্জ্বল, তাদের নিজেদের কোনও আলো নেই। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, গ্যাসের বা ধূলোমিশ্রিত গ্যাসের নীহারিকা থেকে যেভাবে সূর্য ও গ্রহদের সৃষ্টি হয়েছে, সেভাবে মহাবিশ্বের অসংখ্য তারার অধিকাংশেরই গ্রহমণ্ডল না থাকার কোন কারণ নেই। সাম্প্রতিককালে উত্তরাকাশের 27 আলোকবর্ষ দূরের অভিজিৎ নক্ষত্রের [Vega] সান্নিধ্যে এবং দক্ষিণ আকাশে প্রায় 50 আলোকবর্ষ দূরের 'বিটা পিক্টোরিস' [Beta Pictoris] নক্ষত্রের চারিদিকে জ্যোতির্বিদরা এমন কিছু কিছু বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন যেগুলি গ্রহমণ্ডল সৃষ্টির আদি পর্যায়ে রয়েছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান। আবার, মাত্র ছয় আলোকবর্ষ দূরের লাল বামন তারা 'বার্নার্ড নক্ষত্র' [Barnard's Star]-এর কিছুটা তরঙ্গায়িত গতি পর্যবেক্ষণ করে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই নক্ষত্রটির এক বা একাধিক গ্রহ রয়েছে। তাঁরা এও অনুমান করছেন এই গ্রহ বা গ্রহগুলির মোট ভর আমাদের বৃহস্পতি গ্রহের প্রায় সমান। আরও বহু সংখ্যক গ্রহমণ্ডল রয়েছে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই। মহাবিশ্বে কত গ্রহমণ্ডল রয়েছে তার হদিশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

এখন পৃথিবী থেকে 50 আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে থাকা নক্ষত্রদের মধ্যে কোন্‌টির গ্রহ বা গ্রহমণ্ডলী আছে তার অনুসন্ধান করছেন জ্যোতির্বিদরা। প্রত্যক্ষভাবে কোন গ্রহকে দূরবীনে দেখা না গেলেও অনেকগুলি নক্ষত্রের বিভিন্ন ধরনের মহাকর্ষজনিত সর্পিলতার বিশ্লেষণ করে পরোক্ষভাবে

বেশ কিছু গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এইসব গ্রহ আমাদের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির মতো বিশাল কিংবা তার চেয়ে অনেক বড়ো। সম্প্রতি শনি গ্রহের মতো এবং তার চেয়ে কিছুটা ছোট আকারের কয়েকটি গ্রহের পরোক্ষভাবে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এদের কক্ষপথ রীতিমত উপবৃত্তকার। এই সব দানব গ্রহ তাদের কেন্দ্রীয় নক্ষত্রটির খুবই কাছে অবস্থিত।

সম্প্রতি কন্যারাশির অঞ্চলে দেখা গেছে একটি পালসার [Pulsar] বা নিউট্রন তারা। তার চারিদিকে পরিক্রমণরত দুটি গ্রহের সন্ধান পরোক্ষভাবে পাওয়া গেছে। অতি ঘন ওই মৃত নক্ষত্রটি গতিবিধি নিরীক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, ওই পালসারটির অন্ততঃ দুটি গ্রহ আছে যেগুলির ভর আমাদের পৃথিবীর 2.8 এবং 3.4 গুণ। তবে এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, সুপার নোভা বিস্ফোরণে জাত ওই পালসারের কাছে গ্রহ তৈরি হল কি করে? এমনটা বর্তমানে প্রচলিত বিশ্বতত্ত্বের বিরোধী।

যতই উন্নততর দুরবীন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই যেন বেড়ে চলেছে মহাবিশ্বের সীমা, গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা। এতাবৎ প্রায় 10 লক্ষ নানা আকারের ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বহুকাল আগে এই সব নীহারিকাদের অভিহিত করেছিলেন 'দ্বীপ-বিশ্ব' [Island Universe] নামে। এই সব দ্বীপ-বিশ্বের সমাহারই হল এই মহাবিশ্ব। উন্নততর যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে বেড়ে চলেছে এই দ্বীপ-বিশ্বের সংখ্যা, মহাকাশের আয়তন এবং পরিসীমা। কান্ট কোনওদিন দূরবীন দিয়ে মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করেন নি। দ্বীপ-বিশ্বের ধারণা তাঁর দার্শনিক চিন্তার ফসল। 1920 সালের আগে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে অন্য গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা বিজ্ঞানীদেরও ছিল না বললেই চলে।

অধ্যাপক জর্জ হেল [George Hale] 1920 সাল নাগাদ ক্যালিফোর্ণিয়ায় মাউন্ট উইলসন মান মন্দিরে 100 ইঞ্চি ব্যাসের বিশাল দূরবীনটি চালু করলেন। এই দূরবীন দিয়ে দূর আকাশের পর্যবেক্ষণ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের হদিশ দিতে থাকল। সর্বপ্রথম অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয় অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বহুদূরে এই স্বতন্ত্র নক্ষত্রজগতটির অবস্থান তাও জানা গেল। ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হতে থাকলো ওই রকম হাজার হাজার স্বতন্ত্র নক্ষত্র-জগৎ যেগুলি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে মহাকাশে ছড়িয়ে আছে, অবস্থান করছে দ্বীপের মত। নক্ষত্র-দ্বীপ বা দ্বীপ-বিশ্বগুলির নাম দেওয়া হল গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড। যত শক্তিশালী দূরবীন তৈরি করা হচ্ছে, মহাকাশে ততই নতুন নতুন ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, মহাকাশ যেন অশেষ। আধুনিক বিশ্বচিন্তার শুরু হল ওই 1920 খ্রিস্টাব্দ থেকে। 1929 সালে হাবল পেশ করেন তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব যার কথা এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই বলা হয়েছে।

নাসা (NASA) এখন প্রবলভাবে চেষ্টা করছে আন্তঃসংযুক্ত মহাকাশচারী বেশ কিছু দূরবীন মহাকাশে স্থাপন করতে, যেগুলি পৃথিবীর মত গ্রহদের আবিষ্কারে সমর্থ হবে। এই সব দূরবীনের নাম দেওয়া হয়েছে 'TPF' বা 'Terrestrial Planet Finder' বা 'পৃথ্বীবৎ গ্রহ আবিষ্কারক'। এই দূরবীনগুলি নক্ষত্রদের প্রবল আলো থেকে তাদের গ্রহদের ক্ষীণ আলোকে পৃথক করে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারবে এবং বলতে পারবে এই সব গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব কিংবা অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে কিনা। নাসা মনে করছে, 2011 সাল নাগাদ এধরনের একগুচ্ছ দূরবীন মহাকাশে স্থাপন করা সম্ভব হবে।

1920 সাল থেকেই বড় বড় দূরবীন বানানোর চেষ্টা চলছে। ওই বছর কাজ শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের 100 ইঞ্চি ব্যাসের বিশাল দূরবীন। তারপর থেকেই চেষ্টা চলেছে আরও

বড় বড় দুরবীন বানানোর। 1948 সালে মাউন্ট প্যালোমার-এ বসানো হয়েছে 200 ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন। এই দুরবীন যখন কাজ শুরু করল তখন ভাবা হয়েছিল মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এটি এক অনন্য পদক্ষেপ। মানুষের এ সংক্রান্ত অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারবে এই দুরবীনটি। কিন্তু কিছু দিন না যেতে যেতেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখলেন একে দিয়েও চলছে না। পৃথিবীর আবহমণ্ডল উপযুক্ত এবং আরও দূর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এই বাধা দূর করতে বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে একটি দুরবীন বসাতে হবে। 1990 সালে একটি বহুমুখী অনুসন্ধানে সমর্থ দূরবীন একটি কৃত্রিম উপগ্রহের উপর বসিয়ে সেটিকে বায়ুমণ্ডলের অনেকটা উপরে একটি কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। এই দুরবীনটির নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবলের নামে 'হাবল্ মহাকাশ দূরবীন' [Hubble Space Telescope]। এই দুরবীনটি কাছের এবং দূরের জ্যোতিষ্কদের পর্যবেক্ষণ করছে। আবার অনুজ্জ্বল উৎস থেকে আসা অবলোহিত রশ্মি [Infrared Rays] বিশ্লেষণের ক্ষমতাও আছে এই দুরবীনটির। হাবল্ দূরবীন দূর মহাকাশে অবস্থিত বহু গ্যালাক্সীর এবং বহু কোয়াসারের অনেক স্পষ্টতর আলোকচিত্র দিতে পেরেছে। এই দূরবীনের সাহায্যে পাঁচ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কন্যারাশির মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান ভার্গো গ্যালাক্সীপুঞ্জের [Virgo Cluster] সিফেড [Ciphed] নামক দূরত্ব নির্দেশক নক্ষত্রগুলিকে এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সিফেডগুলির দীপ্তি-পরিবর্তন ছন্দ এখন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। এর সাহায্যে ওই গ্যালাক্সীপুঞ্জের সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা গেছে। হাবল্ দূরবীনের অবতল অধিবৃত্তাকার দর্পণটির [Concave Paraboloid Mirror] ব্যাস 95 ইঞ্চি। হাবল দূরবীন চালু হওয়ার পর মনে হল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন সম্ভবতঃ মিটল। পরে দেখা গেল, বিজ্ঞানীদের দূরবীন-পিপাসা এতেও মিটছে না। ফলে, পৃথিবীর বুকেই অনেক বড় বড় দূরবীন বসানো হতে থাকলো।

কিছু দিন আগে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় 14,000 ফুট উঁচুতে 'মাউনা কিয়া' [Mauna Kca] মানমন্দিরে বসানো হয়েছে এক বিপুলকায় দূরবীন। এটি একটি যুগ্ম টেলিস্কোপ। নাম দেওয়া হয়েছে 'কেক 1' এবং 'কেক 2' [Keck 1 & Keck 2]। এদের প্রতিটির দর্পণ ব্যাস 10 মিটার বা প্রায় 400 ইঞ্চি। অর্থাৎ মাউন্ট প্যালোমার মানমন্দিরের দূরবীনের প্রায় দ্বিগুণ। এর দর্পণগুলি অধিবৃত্তাকার এবং অবতল। এর প্রত্যেকটি ছত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষড়ভুজাকার [Hexagonal] দর্পণের সমাহার। এটির কর্মক্ষমতা আকাশে স্থাপিত হাবল্ দূরবীনের চেয়ে অনেকটাই বেশি। বিশ্বের আরও অনেক দূর অঞ্চলের ছবি এনে দিয়েছে মাউন্ট মাউনা কিয়ার এই অতিকায় দূরবীন। বিজ্ঞানীরা চিলির অ্যান্ডিজ [Andes] পর্বতের অধিত্যকায় একটি দূরবীন বানাচ্ছেন। এই দূরবীনে থাকবে চারটি দর্পণ। প্রতিটি দর্পণের ব্যাস হবে 8.2 মিটার বা প্রায় 325 ইঞ্চি। সুতরাং চারটি দর্পণ মিলে এই দূরবীনের মোট ব্যাস হবে প্রায় 1,280 ইঞ্চির মতো। অর্থাৎ প্যালোমারের দূরবীনের প্রায় ছ'গুণের বেশি ব্যাস হবে অ্যান্ডিজের এই নির্মীয়মান দূরবীনটির। সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আরেকটি অতিকায় দূরবীন বানাচ্ছেন যার ব্যাস হবে প্রায় 50 মিটার বা প্রায় 2000 ইঞ্চি। এটিতে থাকবে 585টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিবৃত্তাকার দর্পণ। ইউরোপিয়ান সাদার্ন অবজারভেটরির বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন 25 বছর ধরে তাঁরা এক মহা-দূরবীন বানাবেন যার দর্পণটির ব্যাস হবে 1000 মিটার বা প্রায় 40,000 ইঞ্চি। এই দর্পণটি হবে দু-মিটার ব্যাসার্ধের সর্বমোট 250 টি ষড়ভুজাকার দর্পণের সমাহার। এই দর্পণের মোট ওজন হবে 150 টন। এই দূরবীনটির নাম রাখা হয়েছে 'Overwhelmingly Large Telescope' বা

OWL। যার অর্থ করা হয়েছে, বিহ্বলকারী মহাকায় দূরবীন। 2030 সালের মধ্যে এটি কাজ শুরু করবে। এর সাহায্যে মহাকাশকে আরও ভাল করে জানা সম্ভব হবে।

আগেই বলেছি, কন্যারাশি অঞ্চলে এখন দেখা যাচ্ছে একটি 'পালসার' বা নিউট্রন তারা। অর্থাৎ এটি একটি মৃত নক্ষত্র। অথচ তার চারিদিকে পরিক্রমণরত দুটি গ্রহেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে সুপার নোভা বিস্ফোরণে উৎপন্ন ওই মৃত নক্ষত্রটির বা পালসারের কাছে গ্রহ সৃষ্টি হল কেমন করে? এ প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা। আবার অতিসম্প্রতি [15ই জুলাই। 2005] আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের সৌরজগতের বাইরে এমন একটি গ্রহ, যার রয়েছে তিনটি সূর্য। কেপ ক্যানাভেরাল [Cape Canaveral] থেকে 2005 সালের 15 জুলাই এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবী থেকে 149 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই সৌর জগতের কেন্দ্রে আছে তিনটি নক্ষত্র। একটি গ্যাসীয় গ্রহ এই তিনটি নক্ষত্রের সূর্যকে পরিক্রমা করছে, যেমন পৃথিবী পরিক্রমা করে আমাদের সূর্যকে। ওই গ্রহটি আকারে আমাদের বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে সামান্য বড়। আমাদের সূর্য থেকে শনিগ্রহের অবস্থান যতটা দূরে, ওই গ্রহটির অবস্থান ওই ত্রয়ী-সূর্য থেকে প্রায় ততটা দূরেই। এই ত্রয়ী-সূর্যের সৌরমণ্ডলের নাম দেওয়া হয়েছে HD 188753। এটি অবস্থান করছে ছায়াগ্নি নক্ষত্রমণ্ডলীর [Cygnus Constellation] মধ্যে। নব-আবিষ্কৃত অন্য সৌরজগতের এই গ্রহটিতে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে তার আকাশে তিনটি সূর্য। এই সূর্যের বৃহত্তমটির রঙ হবে হলুদ, মধ্যম আকারের সূর্যটির রঙ হবে কমলা এবং ছোটটির রঙ লাল। ত্রয়ী-নক্ষত্রের এই সৌরমণ্ডল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই বিস্ময়ের। এতাবৎ অনেক যুগ্মতারা আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু ত্রয়ী-নক্ষত্রের এই সৌরমণ্ডলের আবিষ্কার এই প্রথম। আমাদের সৌরজগতের বাইরে একটি নক্ষত্র সমন্বিত যেসব সৌরমণ্ডল আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে পাওয়া গ্রহের সংখ্যা 130টি [2005 সাল অবধি]। পূর্বোক্ত নিউট্রন তারার গ্রহটি আবিষ্কৃত হয় 1993 সালে। তারপর 12 বছর ধরে মোট 130টি অন্য সৌরমণ্ডলের গ্রহ আবিষ্কৃত হলেও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আরও বহু গ্রহ রয়েছে সারা মহাকাশ জুড়ে। এদের অনুসন্ধান চলছে। কোনওদিন সবগুলি আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কারণ মহাকাশের শেষ কোথায় তা অজানা। যত শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কৃত হচ্ছে, মহাকাশের পরিধিও ততই বেড়ে চলেছে। মহাকাশ তাই আজও মহাবিস্ময়।

আবার 2006 সালের 29শে জানুয়ারী 'হিন্দুস্তান টাইমস্' পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে। এতে লন্ডনের 28শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত একটি খবর উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে এক নব-আবিষ্কৃত গ্রহের কথা। এই গ্রহটি পৃথিবীর মতই একটি 'নীল' গ্রহ। এর নাম দেওয়া হয়েছে OGLE-2005-BLG-390 Lb। এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন। এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থিত। আমাদের পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 20,000 আলোকবর্ষ বা প্রায় 12×10^{16} মাইল বা 19.3×10^{16} কিলোমিটার [1 মাইল = 1.609 কিমি]।

বারোটি দেশের 72 জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সম্মিলিত পর্যবেক্ষণে এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে 'Gravitational Microlensing' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই গ্রহটির অবস্থান আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের দিকে। এই গ্রহের আয়তন এবং আবহাওয়া আমাদের পৃথিবীর মত বলে মনে করা হচ্ছে। এ ধরনের আরো কিছু গ্রহ এই পদ্ধতিতে আবিষ্কার করা খুব শীঘ্রই সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি একটি 'লাল দানব' '(Red Giant) নক্ষত্রের গ্রহ। এই লাল দানবটির আয়তন আমাদের

সূর্যের এক পঞ্চমাংশ। বিজ্ঞানীরা এও বলছেন গ্রহটি খুবই ঠাণ্ডা। এর সমুদ্রগুলি জমে বরফ হয়ে আছে। পাহাড়গুলি সব ঘন বরফে ঢেকে আছে। এর পৃষ্ঠতলের উষ্ণতা -220^0 সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতাবৎ আবিষ্কৃত অন্য সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র এই গ্রহটি অনেকটাই পৃথিবীর অনুরূপ। এর কক্ষাবর্তন কাল অবশ্য আমাদের 10 (দশ) বছর।

তবু মানুষ আজও নিঃসঙ্গ জীব। কিন্তু 1961 সালে তৈরি 'গ্রীনব্যাংক ফরমূলা' অনুসারে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে বলে অনুমান করা হয়। মানুষ তাই নিঃসঙ্গ নয়। আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই আমাদের মত বা আমাদের চেয়েও উন্নত সভ্যতার মানুষ আছে, যাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা এখন আমরা শুরু করেছি। মানুষের এই প্রতিবেশীরা এতা দূরে দূরে আছে যে, তাদের নাগাল পেতে মানুষকে আরও বেশ কিছু বছর কাটাতে হবে এবং উন্নততর মহাকাশযান তৈরি করতে হবে। এখনকার বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতেই একমাত্র মানুষ বা জীবন আছে তা নয়, এই রকম আরও বহু গ্রহে জীবন আছে এবং আমাদের চেয়েও উন্নততর সভ্যতার পত্তন হয়েছে তার কোন কোনটাতে। এই রকম গ্রহগুলির কিছু আছে আমাদের গ্যালাক্সীতেই। আবার বেশ কিছু অন্যান্য গ্যালাক্সীর অন্তর্গত। 'গ্রীনব্যাংক ফরমূলা' বলছে ঃ

$$N = R_+ f_p n_e f_i f_l f_e L$$

যেখানে,

$N =$ পৃথিবীর মত উন্নত কিংবা আরও উন্নততর সভ্যতাযুক্ত গ্রহের সংখ্যা

$R_+ =$ আমাদের সূর্যের আকারে সমস্ত নতুন তারার গড় সংখ্যা,

$f_p =$ প্রাণী থাকা সম্ভব, এমন তারার সমষ্টি,

$n_e =$ ইকোস্ফীয়ারে আবর্তনরত গ্রহের গড় সংখ্যা যেখানে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান,

$f_i =$ যেখানে জীবের সত্যিই উন্নতি হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা,

$f_l =$ যে সব গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরা তাদের সূর্যের আয়ুষ্কালের মধ্যে আপন ক্ষমতাবলে বাস করেছে তাদের সংখ্যা,

$f_e =$ যে সব গ্রহে বুদ্ধিমান জীবরা ইতিমধ্যেই একটা প্রযুক্তি-সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তার সংখ্যা,

$L =$ একটা সভ্যতার আয়ুষ্কাল, কারণ যে সব সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী, কেবল তারাই মহাবিশ্বের দুস্তর দূরত্ব অতিক্রম করে অন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ।

এই সূত্রে প্রত্যেকটি 'function'-এর জন্য নূন্যতম সংখ্যাটি ধরলে $N = 40$ হয়। আর স্বীকার্য গরিষ্ঠ সংখ্যা ধরলে $N = 50,000,000$। সুতরাং কমপক্ষে 40টি এবং খুব বেশি হলে পাঁচ কোটি অজানা সভ্যতা এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে যেখানে মানুষ আছে, অনেকটা আমাদের মত মানুষ।

অর্থাৎ জীবন এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। মানুষ তার নিজের গ্রহের বাইরে জীবনের অস্তিত্ব আজও খুঁজে পায় নি। না পাওয়ার কারণ সে তার নিজের সৌরমণ্ডলের বাইরে আজও যেতে পারে নি। চেষ্টা চলছে। আরও বেশ কিছু বছর লাগবে নিজের নিকটতম প্রতিবেশীকে খুঁজে বের করতে।

আবারো বলি, মহাকাশে রয়েছে অনন্ত বিস্ময়। নব-আবিষ্কৃত গ্রহদের প্রসঙ্গ শেষ করবো আর একটি অধুনা আবিষ্কৃত গ্রহের কথা বলে। এটি আমাদের সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল গত বছর [2005 খ্রিস্টাব্দ]। অতি সম্প্রতি [আগস্ট, 2006] প্লুটো তার গ্রহত্ব হারানোয় এটি

আমাদের সৌরজগতের নবম গ্রহ হতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি। এই গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে 2003 UB 313। এই নামকরণ করা হয়েছে সাময়িকভাবেই। এই গ্রহটি আমাদের সৌরমণ্ডলেই অবস্থিত। সূর্যের থেকে এর দূরত্ব 900 কোটি মাইল। সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় 97 গুণ দূরত্বে রয়েছে এই নব-আবিষ্কৃত গ্রহটি। এটি 560 বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে। এটি কখনো সূর্যের 330 কোটি মাইল দূরত্বেও চলে আসে। প্লুটোর কক্ষপথের দূরত্ব সূর্যের থেকে 270 কোটি মাইল থেকে 460 কোটি মাইলের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। নতুন গ্রহটির কক্ষপথের দূরত্ব 900 কোটি থেকে 330 কোটি মাইলের মধ্যে পরিবর্তনশীল। এর আয়তন প্লুটোর থেকে বড়। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে 2006 সালের ৪ই জানুয়ারী, ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালোমার মানমন্দিরে [Palomar Observatory]। আমাদের সৌরমণ্ডলের দূরতম এই গ্রহটির নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল 'Xena', পরে অবশ্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নামকরণে এর নাম হয় 2003 UB 313। এর কক্ষপথ আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে প্রায় 44^0 কোণ করে আছে।

তবে প্লুটো ও জেনার গ্রহত্ব নিয়ে প্রবল বিতর্ক চলার পর এই কিছুদিন মাত্র আগে [25শে আগস্ট, 2006] 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় সঙ্ঘ' [International Astronomical Union] বা আই এ ইউ [IAU] ঘোষণা করেছে যে, প্লুটো, তার এতাবৎ স্বীকৃত একমাত্র উপগ্রহ 'শ্যারন' [Charon] এবং জেনা—এই তিনটিই বামনগ্রহ। প্লুটো কুলীন গ্রহ মোটেই নয়। নব আবিষ্কৃত জেনাও পুরোপুরি গ্রহ নয়। আর শ্যারন মোটেই প্লুটোর উপগ্রহ নয়। ওরা যেন যুগ্ম গ্রহ। ওই দুটির মাঝখানে অবস্থিত একটা বিন্দুর চারদিকে ওরা ঘোরে এবং সেই সঙ্গে সূর্য পরিক্রমাও সারে। প্লুটো, জেনা এবং শ্যারনকে আই এ ইউ বামন গ্রহ হিসাবে ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে। বেশির ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই এখনও আই এ ইউর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তাঁরা বলছেন আই এ ইউ-র ওই সম্মেলনে, যেখানে প্লুটো. জেনা ও শ্যারনদের বামনগ্রহ বলে ঘোষণা করা হয় এবং প্লুটো তার গ্রহ-কৌলীন্য হারায়, সেই সম্মেলনে 2500 জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জায়গায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র 424 জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এই 424 জনের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ বিজ্ঞানী ভোট দিয়েছেন এদের বামন গ্রহ করার পক্ষে। সুতরাং মুষ্টিমেয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তেই প্লুটো তার গ্রহত্ব হারিয়েছে। আই এ ইউ গ্রহদের একটা নতুন সংজ্ঞা [Definition] স্থির করেছে ওই সভায়। এই সংজ্ঞা অনুসারেই প্লুটো তার গ্রহত্ব হারিয়ে লাভ করেছে বামন গ্রহত্ব এবং অন্যদুটিও তাই বামন গ্রহ। কিন্তু বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটা বিশাল অংশ আই এ ইউ-র ওই সংজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হন নি। ফলে, এখন প্রবল বাদানুবাদ চলছে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মহলে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের একাদশ পরিচ্ছেদে। আই এ ইউ-র নতুন সংজ্ঞা মেনে নিলে আমাদের সৌরমণ্ডলে এখন গ্রহের সংখ্যা ৪ [আট] এবং বামন গ্রহের সংখ্যা 3 [তিন]-টি। কুলীন এবং বামনগ্রহ মিলিয়ে মোট গ্রহ 11টি।

1930 সালের 18ই ফেব্রুয়ারী প্লুটোকে আবিষ্কার করেন ক্লাইড টমবাও [Clyde Tombaugh] নামের এক শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নেপচুন গ্রহের উপস্থিতি ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতির কারণ অনেকটাই ব্যাখ্যা করলেও পুরোটা করতে পারে নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করলেন নেপচুনের পরে নিশ্চয় আরেকটি গ্রহ আছে, যার প্রভাবে ইউরেনাসের কক্ষপথের ওই অব্যাখ্যাত বিচ্যুতি ঘটছে। এই গ্রহের খোঁজে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন আমেরিকার দু'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এদের একজন হলেন পার্সিভ্যাল লোয়েল [Percival Lowell] এবং অন্য জন উইলিয়াম পিকেরিং [William Pickering]। দু'জনেই আলাদাভাবে গবেষণা চালান। লোয়েল 1894 সালে আরিজোনায় মরুভূমির বুকে প্রতিষ্ঠা

করেন নিজস্ব মানমন্দির। সেখানেই তিনি গভীর আগ্রহে খুঁজতে থাকেন ওই অজানা গ্রহটিকে যার আগাম নাম তিনি দেন 'প্ল্যানেট এক্স' [Planet-X]। একে খুঁজে পাওয়া সেকালে খুবই মুশকিল ছিল, কারণ বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় এর থেকে সূর্যের আলোর প্রতিফলন ছিল খুবই কম মাত্রার। অই লোয়েল তাঁর মৃত্যু অবধি অনুসন্ধান করেও খুঁজে পেলেন না ওই অজানা গ্রহটিকে। 1916 সালে মারা যান লোয়েল।

ওই নতুন গ্রহটি, যার পরবর্তীকালে নাম হয় 'প্লুটো', খুঁজে বের করার দায়িত্ব নেন ক্লাইড টমবাও, যিনি শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে লোয়েলের মানমন্দিরে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পড়াশুনা ছিল মাত্র স্কুল অবধি। কিন্তু তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল আকাশ পর্যবেক্ষণে। এই আগ্রহই তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। 1930 সালে তিনি আবিষ্কার করেন প্লুটো গ্রহটিকে। 1978 সালে আবিষ্কৃত হয় শ্যারণ। 2006 সালে এসে আই এ ইউ-র নতুন সংজ্ঞানুসারে প্লুটো সদ্য হারিয়েছে তার গ্রহত্ব। শ্যারণও উপগ্রহ থেকে বামনগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। প্লুটো আবিষ্কারের খবর ঘোষণা করা হয় 1930 সালের 13ই মার্চ লোয়েলের 75-তম জন্ম দিনে। প্লুটো আই এ ইউর সিদ্ধান্ত অনুসারে বামন গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত হল 2006 খ্রিস্টাব্দের 25 শে আগস্ট।

নাসার [NASA] প্লুটো অভিযানের চেয়ারম্যান অ্যালান স্টার্ন প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন প্লুটোকে গ্রহত্ব থেকে বঞ্চিত করার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন, "কাল যখন ভোট হয়েছে, তখন প্রাগে আই এ ইউ-র হলে আড়াই হাজারের জায়গায় হাজির ছিলেন 424 জন বিজ্ঞানী।" প্লুটোকে বামন গ্রহ বলাকে বিরক্তিকর বলে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন, "যে সংজ্ঞাটি আই এ ইউ-তে মঞ্জুর করা হয়েছে, সেটি ভয়ঙ্কর। বলা হচ্ছে, বড় গ্রহেরা তাদের কক্ষপথের আশেপাশের সব বস্তুকে সরিয়ে দিতে পারে। বামন গ্রহেরা পারে না।" স্টার্নের মতে, এটি বাজে কথা। তিনি এ প্রসঙ্গে মঙ্গল, পৃথিবী, বৃহস্পতি ও নেপচুনের কথা বলেছেন। এদের মতো বড়ো গ্রহগুলোই তাদের কক্ষপথের আশপাশের বস্তুদের হটাতে পারে না তো প্লুটো। সে ক্ষেত্রে বৃহস্পতি, নেপচুনদেরও তো বামন গ্রহ বলতে হবে। তিনি দাবী করেছেন প্লুটো বামন গ্রহ নয় মোটেই। এটিকে গ্রহ-ই বলতে হবে। আই এ ইউর সভাতেও প্রবল তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আই এ ইউ-র গ্রহদের সংজ্ঞা নির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান ওয়েন গিংরিচও বলেছেন, "কুলীন হলে কি বামন হয় না? যত সব ধাপ্পাবাজি।" তিনি সম্মেলন ছেড়ে হঠাৎই ফিরে যান আমেরিকায়। ভোটও দেন নি। তাঁর বক্তব্য প্লুটোর গ্রহত্ব 'হাইজ্যাক' করেছে কিছু বিজ্ঞানী। তিনি আরও বলেছেন, 'এই প্রহসন বেশি দিন চলবে না। শীঘ্রই প্লুটো আবার কুলীন হবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, 2006 সালের 26 শে আগস্ট)।

আই এ ইউর সম্মেলনে গ্রহের সংজ্ঞা এবং সংখ্যা বদল নিয়ে যে প্রস্তাব রাখা হয় তার বিরোধিতায় সরব হন জেনার আবিষ্কর্তা ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র মাইকেল ব্রাউন। তিনি প্রবল আপত্তি তোলেন প্লুটোর গ্রহত্ব নিয়ে। তাঁকে সমর্থন করেন আরো বেশ কিছু বিজ্ঞানী । আই এ ইউ-র দেওয়া গ্রহের সংজ্ঞায় পরিবর্তন করতে হয়। উপস্থিত বিজ্ঞানীদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গ্রহের যে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তার মুখ্য বক্তব্য হল— কুলীন গ্রহ তাদেরই বলা হবে, যারা সূর্য বা অন্য নক্ষত্রের চার পাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে এবং ওই বস্তুর ভর এতটাই বেশি হতে হবে যে, তার অভিকর্ষজ বল বস্তুটিকে একটি গোলকের আকৃতি দিতে পারবে এবং তারা কক্ষপথের আশপাশের বস্তুদের হটিয়ে দিতে পারবে। আর বামন গ্রহ কক্ষপথের চার দিকের বস্তুদের হঠাতে পারবে না। এই নতুন নির্ধারিত সংজ্ঞায় প্লুটো তার গ্রহত্বের কৌলীন্য হারিয়ে হয়ে গেছে বামন গ্রহ।

কিন্তু গ্রহদের এই নতুন সংজ্ঞা বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানতে অপারগ। কলোরাডোর বোল্ডার [Boulder]-এর সাউথ ওয়েস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গ্রহ-বিজ্ঞানী অ্যালান স্টার্ন বলেছেন, "আই এ ইউ যদি সারাদিন ধরে বলে আকাশের রঙ সবুজ, তাহলে আকাশের রঙ সবুজ হয়ে যায় না।" তিনি আরও বলেছেন,"The IAU created a definition which is techically flawed, linguistically flawed and scientifically embarrassing." তিনশো জ্যোতির্বিজ্ঞানীর একটা দল ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা আই এ ইউ-র এই সিদ্ধান্ত মানবে না। প্লুটো বামন গ্রহ — আই এ ইউ-র এই সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু তাই নয় গ্রহের নতুন সংজ্ঞাও তাঁরা মানবেন না। তাঁরা আগামী বছর একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকে সেখানে তাঁরা গ্রহের সঠিক সংজ্ঞা দেবেন। 1930 সাল থেকেই গ্রহ হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আছে প্লুটো। আমাদের সৌরমণ্ডলের এটি নবম গ্রহ। স্টার্ন বলেছেন, প্লুটো তার গ্রহত্বের কৌলীন্য হারাবে না। আই এ ইউ-র এই সম্পর্কিত ভুল সংজ্ঞা বাতিল করে ওই সম্মেলনে গ্রহের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হবে নতুন করে। সুতরাং আমাদের এই ছোট্ট সৌরজগতের মধ্যেই রয়েছে নানা জটিলতা, নানা সন্দেহ। বিশাল মহাকাশের দিকে দিকে এ ধরনের বহু জটিলতা, বহু অনিশ্চয়তা, বহু অজানা বিস্ময় ছড়িয়ে আছে। প্লুটো সমস্যা তারই এক অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবলের আবিষ্কারের কাল থেকেই মহাবিশ্ব নিয়ে, বিশেষ করে অন্যান্য গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চর্চা আরম্ভ হয়। হাবলই প্রথম অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীকে [M31] আলাদা ব্রহ্মাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করেন। এরপরই ব্রহ্মাণ্ড চর্চার জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাল শুরু হল। সময়টা 1923-24 খ্রিস্টাব্দ। 1929 সালে আবিষ্কৃত হাবলের সূত্রের কথা আগেই বলেছি। এই সূত্র থেকেই ক্রমশঃ মহাবিশ্ব সম্পর্কে আধুনিক ধারণা জন্ম নেয়। মহাবিশ্বের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল, তার বিকাশ ও বর্তমান অবস্থা — সবকিছু নিয়েই গভীর গবেষণা শুরু হয়। অবশ্য মহাবিশ্বের প্রকৃত অবস্থার কথা সবার আগে বলেছিলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। 1905 সালে আবিষ্কৃত তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ দেশ [Space] ও কাল [Time] বা মহাকাশ ও সময়কে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহাকাশ-সময়-সন্ততি বা দেশ-কাল-সন্ততির কথা বলে। 1916 সালে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনীয় 'মহাকর্ষ'-কে প্রতিস্থাপিত করে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' দিয়ে, যা মহাকাশ-সময়-সন্ততিরই গতিবিদ্যা। বিশ্ব সম্পর্কে আইনস্টাইনীয় ধারণার সঙ্গে হাবলের ধারণার মিশ্রণ ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক মহাবিশ্ব ধারণা। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মত হল মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে অনন্যতা [Singularity] থেকে। অর্থাৎ একটি বিন্দু থেকে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি। এই বিশাল বিশ্ব এক সময় একটা বিন্দুতে অবস্থান করছিল। আর সেই বিন্দুর বিস্ফোরণকাল থেকেই থেকেই সময়ের শুরু। তার আগে সময় বলে কিছু ছিল না।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে বর্তমানে আমরা জানি, (1) মহাবিশ্বে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্রের দশ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, যেগুলি এক আদিম বিস্ফোরণের ধাক্কায় ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, (2) উজ্জ্বল ছায়াপথগুলির বাইরে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে তার সৃষ্টি-উৎস 'মহাবিস্ফোরণ' [Big Bang] -এর অবশেষ বিকিরণ, (3) ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড ও এই পটভূমি বিকিরণ সুষম ও সমদৈশিক। এই সব জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সব মহাজগৎ তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার পিছনে অবশ্যই রয়েছে আইনস্টাইনের অপেক্ষিকতাবাদের প্রভাব বা প্রধান ভূমিকা। পদার্থ ও শক্তির তুল্যতা $E = mc^2$ মহাজগৎ তত্ত্বের যুগান্তর এনেছে। এই সূত্রটিকে বিজ্ঞানীরা একটু নতুন ভাবে বলেছেন। তা হল

$$E = 3/8\ (\pi D)$$

যেখানে, E = মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ।
D = মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যাস।

এই সর্বোচ্চ ব্যাস আবার মহাবিশ্বের ইতিহাসে কাল বা সময়ের একটি অংশ।

আইনস্টাইনের তত্ত্বে মহাবিশ্ব সর্বদা অস্থির। তাই তার প্রসারণ বা সংকোচন দুটোই অবশ্যম্ভাবী। মহাবিশ্বের জন্ম সময় থেকে তার ক্ষুদ্র আকার ক্রমপ্রসারণে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্ফীত হয়ে বিশাল আকার লাভ করে চলেছে। এই প্রসারণ সর্বোচ্চ ব্যাসে পৌঁছে শেষ হয়। আরম্ভ হয় মহাসংকোচন। দ্রুত এবং দ্রুততর হারে এই মহাসংকোচনের ফলে মহাবিশ্ব আবার ছোট আকারে ফিরে আসবে এবং তার সব উপাদানই বিলীন হয়ে যাবে। এই মহাসংকোচনের ফলে মহাবিশ্ব একটি বিন্দুর অনন্যতায় বা সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছে যাবে। এই অনন্যতা থেকে আবার সৃষ্টি শুরু হবে এক বিশাল বিস্ফোরণ দিয়ে। অতীতে অসংখ্যবার এই সৃষ্টি এবং লয় ঘটেছে, পরে আরও ঘটবে। বার বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্টি ও লয়ের এই মহাবিশ্বের আয়ুষ্কাল অনন্ত। এই অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটির ধারণা এসেছে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান থেকে। এর আগে মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে বলা হত 'মহাজাগতিক অণ্ড' [Super Dense Cosmic Egg]।

মহাবিশ্বের এই প্রসারণ ও সংকোচনশীল রূপ বা স্পন্দনশীল [Pulsating] রূপ সত্যি হবে একটি মাত্র শর্ত পূরণ হলে, সে শর্ত হল 'সন্ধি ঘনত্ব' মহাবিশ্বের পদার্থ ঘনত্বের সমান বা বেশি হতে হবে। আইনস্টাইন-দ্য সীটার মডেল থেকে পাওয়া যায় মহাবিশ্বের সন্ধি ঘনত্ব হল 10^{-29} গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 10টি হাইড্রোজেন পরমাণু। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সূত্রের সাহায্যে সন্ধি-ঘনত্বের এই মান নির্ণয় করেন, সেই সূত্রটি হল,

$$\text{সন্ধি ঘনত্ব} = \frac{3}{8\pi G}$$

যেখানে, G = মহাকর্ষীয় স্থিরাংক
H = হাবল স্থিরাংক

হাবল স্থিরাংকের মান 50 কিমি/সেকেন্ড/দশ লক্ষ পারসেক [Parsec] ধরলে সন্ধি ঘনত্বের মান দাঁড়ায় 4.7×10^{-30} গ্রাম। মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব এই মানের কম হলে মহাবিশ্বের মহাপ্রসারণ চলতেই থাকবে, বেশি হলে সম্প্রসারণ শেষ হয়ে একদিন মহাসংকোচন দেখা যাবে। এখন মহাবিশ্বের ঘনত্ব যা নির্ণয় করা হয়েছে তা সন্ধি-ঘনত্বের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। তা হলে কি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চিরকালই চলবে? একেবারে আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্বের পদার্থ-ঘনত্ব, যা নির্ণয় করা হয়েছে ভারী হাইড্রোজেনের ঘনত্ব থেকে, তা সঠিক নয়। অদৃশ্য নিউট্রিনোরা এক বিশাল সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বে, যাদের ভর অবশ্যই শূন্যের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এই সব নিউট্রিনোরা বিশ্বের পদার্থ ঘনত্বের মান অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে একদল বিজ্ঞানী মনে করেন। সুতরাং নিউট্রিনোদের ঘনত্ব ধরলে মহাবিশ্বের পদার্থ-ঘনত্ব অনেকটাই বেড়ে যাবে। আবার বিকিরণহীন বেশ কিছু পদার্থ মহাবিশ্বে কোথাও লুকিয়ে আছে। এই লুকানো ভরও মহাবিশ্বের পদার্থ-ঘনত্ব এতোটাই বাড়িয়ে দেবে যে তা সন্ধি ঘনত্বকে ছাড়িয়ে যাবে কিংবা তার সমান হবে বলে বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং নিউট্রিনো ও লুকানো পদার্থ উভয়ে মিলেই মহাবিশ্বের পদার্থ-ঘনত্ব বাড়িয়ে তাকে সন্ধি ঘনত্বের সমান বা বেশি করে তুলবে। যদি তা না হয়, তবে মহাবিশ্ব চিরকাল

প্রসারিত হতে থাকবে। এই প্রসারণে এক সময় প্রসারণ বেগ আলোর বেগকেও ছাড়িয়ে যাবে। নক্ষত্রগুলি একে একে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। অনেকেই এক সময় কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। গ্রাস করবে গ্যাস ধূলিকণা ইত্যাদি। স্ফীত হয়ে ওঠা এই কৃষ্ণগহ্বরগুলিও এক সময় উবে গিয়ে রেখে যাবে অবশেষ বিকিরণ। মহাবিশ্বের পদার্থজগতে তখন কেবল থাকবে ফোটন, নিউট্রিনো, গ্র্যাভিটন এবং সম্ভবতঃ কিছু ইলেকট্রন, পজিট্রন।

তবে মহাবিশ্বের এই অবস্থা হতে হলে, এর পদার্থ-ঘনত্বকে অবশ্যই সন্ধি-ঘনত্বের কম হতে হবে। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী অবশ্য চির-সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্বে এখন বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, বিশ্বের পদার্থ-ঘনত্ব উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সন্ধি-ঘনত্বের সমান বা তার বেশি হবে। একদিন মহাবিশ্বের মহাপ্রসারণ শেষ হয়ে মহাসংকোচন ঘটবে এবং স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বই হবে মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ।

তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, বর্তমান মহাবিশ্বের মোট শক্তির মান সূর্যের স্থির ভর-শক্তির 3×10^{23} গুণ। আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়, এই শক্তির জন্য সর্বোচ্চ ব্যাস হবে 4×10^{10} আলোকবর্ষ বা চার হাজার কোটি আলোকবর্ষ। তখন মহাবিশ্বের বয়স দাঁড়াবে প্রায় 6.3×10^9 বছর। সুতরাং বলা যায়, প্রসারণশীল বর্তমান মহাবিশ্বের মোট আয়ুষ্কালের এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি। আইনস্টাইনের মহাবিশ্বের বাইরে দেশ বা মহাকাশ এবং কাল বা সময়ের অস্তিত্ব নেই। মহাবিস্ফোরণের পরেই কালের আবির্ভাব। মহাবিশ্বের উপাদান থেকেই মহাকাশ বা দেশের অস্তিত্ব ও সৃষ্টি। দুটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যকার মহাকাশ বা দেশ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডগুলির অন্তবর্তী অংশ বা তার পরমাণু বাড়ছে না।

মহাবিশ্বের সংকোচন আরম্ভ হলে তখন ছায়াপথের বর্ণালিতে লাল সরণের জায়গায় নীল সরণ শুরু হবে। 3^0K উষ্ণতার পটভূমি বিকিরণ উষ্ণতর হতে থাকবে। ভেঙে পড়ার উষ্ণতায় নক্ষত্র, ছায়াপথ, ব্রহ্মাণ্ড সবই ক্রমশ উবে যাবে। তার আগেই মহাবিশ্বের জীবন যাবে লুপ্ত হয়ে। অবশেষে মহাবিশ্বের বিকিরণ সংকুচিত হয়ে কৃষ্ণগহ্বরগুলি টিকে থাকবে। আরও পরে ওই কৃষ্ণগহ্বরগুলি সংযোজিত হয়ে মহাবিশ্ব রূপ নেবে অসাধারণ এবং বিন্দুসমান পিণ্ডে। শক্তির পরিমাণ থেকে মহাবিশ্বের ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে গণিতের ভাষায় মহাবিশ্ব হবে একটি বিন্দুর মত। বিজ্ঞান একে বলছে অনন্যতা [Singularity]। এই অনন্যতায় দেশকালের বক্রতা হবে অসীম। আলোর গতিবেগে চলা কোনও দর্শকের কাছে মহাবিশ্ব তখন বিন্দু হিসাবেই প্রতীয়মান হবে। ওই বিন্দুকে অতিক্রম করতে শূন্য সময় লাগবে ওই দর্শকের। শূন্য এইজন্য যে এই গতিবেগে সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে মনে হবে। মহাবিশ্বের সংকোচনের স্বরূপ প্রসারণের ঠিক যথার্থ অনুকরণ হবে বলে মনে হয় না। মহাসংকোচন প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ অসম এবং জটিলতর। স্পন্দনশীল মহাবিশ্বে যদি একটি লেসার রশ্মি ছুঁড়ে দেওয়া যায় তবে তা আমাদের পেছন দিক দিয়ে ফিরে আসবে। আমাদের দেশকালের বা মহাকাশ-সময়ের বক্রতার এই হল স্বরূপ। সসীম অথচ প্রান্তহীন স্পন্দনশীল মহাবিশ্বে দেশের বক্রতা বা মহাকাশের বক্রতা ধনাত্মক [Positive]। তাই এখানে আলো বেঁকে যায় ভেতরের দিকে। সূর্যের মহাকর্ষের জন্য তার দিকে আলো বেঁকে যায়। মহাবিশ্বের মহাসংকোচন তাই সম্ভব এবং তার বিন্দুবৎ পিণ্ডে রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু মহাবিশ্বের এই বক্রতা নেগেটিভ [Negative] হলে, আলো ভারী বস্তুর বাইরের দিকে বেঁকে যাবে। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডগুলি ক্রমশই দূরে সরে যাবে। এরকম মহাবিশ্বই মুক্ত এবং অসীম। তার

ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যাও অসীম হবে। আইনস্টাইনের ল্যামডা বলের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই বল ছিল মহাকর্ষের বিপরীত ধর্মী। কিন্তু যদি এই বলকে মহাকর্ষের মত আকর্ষণধর্মী, আবার কখনও বিপরীতধর্মী ধরা যায় তবে তা প্রয়োজনমত বাইরের দিকে কিংবা ভেতরের দিকে প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে। নেগেটিভ বক্রতার অসীম মুক্ত মহাবিশ্বে এই বল মহাবিশ্বকে মহাসংকোচনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথবা কিছুটা আয়তন অবধি মহাবিশ্বকে সংকুচিত করে আবার তার প্রসারণে সাহায্য করতে পারে। তখন বিশ্ব আর বিন্দুবৎ হতে পারবে না। আবার বদ্ধ মহাবিশ্বকে এই বল চিরস্থায়ী প্রসারণে বাধ্য করতেও পারে। তাই মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহা-বিতর্ক এখনও চলছে। 'শেষ নাহি' তাই 'শেষ কথা কে বলবে'! আইনস্টাইনের তত্ত্ব দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যাত হলেও সব সমস্যার সমাধান এতে পাওয়া যায় না। প্রধান একটি সমস্যা হল 'কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি' [Quantum Gravity]'—যার প্রভাবে বিগ ব্যাঙের 10^{-43} সেকেন্ডের আগে দেশকালের বা মহাকাশ-সময়ের ধর্ম কী ছিল তা জানা যায় না। আইনস্টাইন যে ল্যামডা বলকে তাঁর তত্ত্ব থেকে বাদ দিয়েছিলেন, বিজ্ঞানী অ্যালান গুথ কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সৃষ্টির 10^{-35} সেকেন্ডের আগে আদিম বিশ্বের 10^{28} °K উষ্ণতায় ওই ল্যামডা বলের প্রয়োজন আছে—প্রাকৃতিক বলগুলির অতিমহান একীকরণে ওই 'প্ল্যাঙ্কযুগ'-এ এরকম বিকর্ষণী বল থাকা অপরিহার্য। তাঁর মতে সৃষ্টির আদিতে এই বিকর্ষণী বলই মহাকর্ষের আকর্ষণকে অতিক্রম করে মহাবিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে স্ফীত করে। প্রতি 10^{-35} সেকেন্ডে তার আয়তন দ্বিগুণিত হয়। এই প্রবল স্ফীতিশীল দশা থেকে এক নতুন দশায় মহাবিশ্ব চলে আসে, যখন বলগুলি আলাদা হয়, তখনি স্ফীতিও থেমে যায়। ফলে, উত্তপ্ত ওই মহাবিশ্বের বিকর্ষণও আর থাকে না। আরম্ভ হয় মন্দনশীল প্রসারণের ক্রিয়া, যার জের এখনও চলছে।

মহাবিস্ফোরণের ফলে বিশ্বের বিকাশ। সেই মহাবিস্ফোরণের অবশেষ রয়েছে বর্তমানের এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের পটভূমি বিকিরণে। সুতরাং মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে মহাজাগতিক অণ্ডে [Cosmic Egg] বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা কি কৃষ্ণগহ্বর ছিল? তা হলে মহাবিশ্বের প্রসারণ সীমা কি নির্দিষ্ট? কীট বিবরের [Worm Hole] মধ্য দিয়ে সংকুচিত অতীতের কোন বিবরে পদার্থ কি আবার নতুনভাবে সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? এই কীটবিবর [Worm Hole] হল কৃষ্ণ গহ্বরের মতই একধরনের গহ্বর। এদের কথায় আসছি একটু পরেই। কীটবিবরের অন্যপ্রান্তে আছে শ্বেতবিবর [White Hole] বা শ্বেতগহ্বর। কোয়াসার [Quasar] কি শ্বেতগহ্বর, নাকি ছোট ছোট বিস্ফোরণ যেগুলি একত্রিত হয়ে বিগ্ ব্যাঙ সৃষ্টি করেছিল? কোয়াসারের সৃষ্টি কি তবে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সমসাময়িক? তাহলে কোয়াসারের ধর্মে এতো বৈচিত্র্য কেন? কোয়াসার ও শ্বেতবিবর বা শ্বেতগহ্বর নিয়ে আলোচনা করা হবে একটু পরেই। এখানে শুধু এইটুকু বলার যে, মহাবিশ্ব নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন। তাঁদের কাছে মহাবিশ্ব আজও মহাবিস্ময়।

তাঁরা আরও বলছেন, মহাবিশ্ব যদি বদ্ধ এবং বার বার তার সৃষ্টি ও লয় ঘটে, তবে তার শক্তির উৎস কোথায়? পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে মহাকাশের বা দেশের প্রসারণের ফলে মহাবিশ্বে এনট্রপি [Entropy] বেড়ে চলে। সৃষ্টি পরবর্তী পর্যায়ে এনট্রপি ক্রমশঃই বাড়তেই থাকে। অর্থাৎ সারা বিশ্বে অকার্যকর শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন হল, কীটবিবর বা কীটগহ্বরের ভেতর দিয়ে পদার্থের যে উত্তরণ ঘটে তাতে কি এনট্রপি হ্রাস পায় এবং এনট্রপি রূপান্তরিত হয় কার্যকর শক্তিতে? এইভাবেই কি অকার্যকর শক্তির বিবর্তন ঘটে, কার্যকর শক্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়? হকিং বিকিরণ

[Hawking Radiation] কি এ বিষয়ে নতুন কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে? এই রকম বহু প্রশ্ন একালের বিজ্ঞানীদের মনে সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলির উত্তর আজও অজানা।

বহুকালে আগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন তুলেছিলেন ঋগ্বেদের মহান ঋষিরা। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ রচিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে। এই গ্রন্থের দশম মণ্ডলের 129 তম সূক্তটি 'নাসদীয় সূক্ত' নামে বিশ্ববিখ্যাত। এই সূক্তে সৃষ্টির ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানও তার কাছে হার মেনে যায়। গত ছয় হাজার বছরে সৃষ্টি সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দরতম বক্তব্য আর কেউ কোনদিন রাখে নি। নাসদীয় সূক্তটির উদ্ধৃতি প্রথম পরিচ্ছেদে এক বার দিয়েছি। কিন্তু এর গুরুত্ব বিবেচনা করে আবারো দিলাম।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না। অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কী ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছু ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্ধ্বদিকে বিস্তারিত হইল, নিম্ন দিকে স্বধা রহিল, প্রযতি উর্ধ্ব দিকে রহিলেন। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে এই সকল নানা,সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সব নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, তাহা কেই বা জানে? এই নানা সৃষ্টি যে কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।" [ঋগ্বেদ ঃ 10 মণ্ডল ঃ 129 সূক্ত]

নাসদীয় সূক্তের ঋষিরা যে ধরনের কথা বলেছেন, তার কিছু কিছু বলছেন এ কালের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সের [Quantum Physics] লোকেরা। সৃষ্টির আগে ছিল এক অদ্ভুত মহাশূন্য অবস্থা। মহাশূন্য ও শূন্যের মধ্যে তফাৎটা ঋষিরা জানতেন এবং বুঝতেন। তাই বলছেন বস্তু বা অবস্তু কিছুই সে সময় অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল না ; ছিল না আকাশ অর্থাৎ স্পন্দনশীল শূন্য [Pulsating Void]। ছিল না দেশ [Space], কাল [Time] ও নিমিত্ত (কার্য-কারণ-সম্পর্ক)। তখন এক অবিদ্যমান বস্তুই ছিল। সে জীবিত ছিল বিনা বায়ুতে, আত্মশক্তির দ্বারা।

নাসদীয় সূক্তের ওই অন্ধকার আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানের Blackhole বা কৃষ্ণগহ্বর। অবিদ্যমান বস্তু হল অক্রিয়াশীল শক্তি। এই অক্রিয়াশীল শক্তি, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় Entropy, ওই মহাশূন্যতার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বরূপ। শক্তি ঘনীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয় ইচ্ছায়। ইচ্ছা বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তি থেকে তৈরি হয় দেশ-কাল-নিমিত্ত। নাসদীয় সূক্তের আলো হল জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের 'Whitehole'। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার। স্বধা বা স্বয়ংক্রিয় শক্তি নীচে ছিল মানে গোলাকার বিশ্বের অভ্যন্তরে ছিল। প্রয়তি বা ইচ্ছা ছিল উর্ধ্বে। ইচ্ছার পরিণতিই প্রয়তির উর্ধ্বে থাকা। সৃষ্টির আদি ক্রিয়ার সময় দর্শক কেউ ছিল না। সুতরাং সৃষ্টির আদি ক্রিয়া সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে যে অবিদ্যমান বস্তু বা একমাত্র বস্তু কিংবা মহামানস থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি তিনি

হয়ত বলতে পারেন সৃষ্টির আদি ক্রিয়ার রূপ কেমন ছিল। ঋষিরা অবশ্য এমন সন্দেহ প্রকাশও করেছেন যে, সেই মহামানসও সৃষ্টির আদি-ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারেন। এই মহান সত্য একমাত্র হৃদয়ে অনুভব করা যায় ব্যাখ্যা করা যায় না। দর্শন এই স্তরে এসে অনুভূতির কথা বলে, বলে হৃদয় দিয়ে অনুভবের কথা। বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না, যুক্তি তথ্য সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। অবিদ্যমান ওই বস্তুকে কিছুটা পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে, বলা হয়েছে 'অব্যক্ত'। এই অব্যক্তেই অবস্থান করে সৃষ্টি-পূর্বের প্রকৃতি-পুরুষ, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ। প্রথম পরিচ্ছেদে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বিংশ শতাব্দীর শেষে প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন তুলে ধরেছেন হকিং [S.W. Hawking]। তাঁর তত্ত্বানুসারে বিগ ব্যাঙের আদি মুহূর্ত থেকে কালের বা সময়ের অস্তিত্বের সূত্রপাত। তার আগে কাল নিতান্তই কাল্পনিক। অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটিতে মহাকর্ষের প্রভাব এমন তীব্র থাকবে যে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের প্রভাব এড়ান যাবে না!

"বিজ্ঞানের চলতি নিয়ম সেখানে খাটবে না। আপেক্ষিকতাবাদের মতে সিঙ্গুলারিটি বিন্দুতে দেশ কালের বক্রতা হবে অসীম। সাবেকী এই তত্ত্বে হয় মহাবিশ্বের অতীত হবে অসীম অর্থাৎ অনাদি কালের অথবা পরিমেয় সিঙ্গুলারিটির এক আদিবিন্দুতে তার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। মহাকর্ষের কেয়াণ্টাম তত্ত্বে চারমাত্রার ইউক্লিডীয় অর্থাৎ সমতল দেশকালের বিশ্বে কাল যদি কাল্পনিক সংখ্যা $\sqrt{-1}$ দিয়ে প্রকাশ করা যায়, তবে দেশ কাল হবে সসীম, অথচ তার সীমানা বা কিনারা বলতে কিছু থাকবে না—কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বে সিঙ্গুলারিটির সম্ভাবনা থাকে না। তখন দেশ কাল হবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের মত, শুধু দুটি বাড়তি মাত্রা তাতে যুক্ত হবে। কাল্পনিক সংখ্যার কাল যদি তার উত্তর মেরু হয় তবে তার নির্দিষ্ট অক্ষাংশে ক্রমশ বৃত্তের আয়তন বাড়ার মত মহাবিশ্বের প্রসারণশীলতাও বেড়ে বিষুব বৃত্তে সর্বোচ্চ হবে। ক্রমে কাল সংকুচিত হয়ে যেন দক্ষিণ মেরুতে মহাবিশ্বকে বিশাল সংকোচনে [Big Crunch] সংহত করবে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যেমন একক বিন্দু নয়, বিশাল বিস্ফোরণ বা বিশাল সংকোচন বিন্দুগুলি সিঙ্গুলারিটি হবে না। তখন মহাবিশ্বের এই অবস্থা বিজ্ঞানের চলতি নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে।

অনিশ্চয়তাবাদের প্রেক্ষিতে আদিম বিশ্বের কণার অবস্থান ও গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি ছিল তাই তার সুষমতা ছিল না। এই হ্রাসবৃদ্ধির জন্য দ্রুত স্ফীতিশীল [Inflationary] বিশ্বে অসম অঞ্চলগুলির প্রসারণ মহাকর্ষ বলে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে ছায়াপথ, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করেছে। তাই আদিম বিশ্বের স্ফীতিতত্ত্বের সঙ্গেও হকিং-এর এই তত্ত্বের বিরোধ নেই। যে বিশ্বের আদি নেই, অন্তও নেই, তার সৃষ্টিতে স্রষ্টারও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এ থেকে ধারণা আসে যে দেশ ও কাল্পনিক কালের মহাবিশ্ব সসীম হলেও, তার সীমানা থাকবে না—থাকবে না কোন সিঙ্গুলারিটি। আমাদের সমকালীন বাস্তব সময়ে ফিরে এলে সিঙ্গুলারিটির প্রশ্নও ফিরে আসবে। তখন দেশকালের সীমানা থাকবে। সৃষ্টি ও লয়ের অবকাশ থাকবে। বিজ্ঞানের চলতি নিয়মকানুন সেখানে খাটবে না। তাহলে বাস্তব সময়ের মহাবিশ্বকে কাল্পনিক সময়ের ভাবি না কেন? তাহলে সমস্যা লাঘব হয়। হকিং-এর মতে এরকম মহাবিশ্বের সৃষ্টি নেই, লয়ও নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব। মহাবিশ্ব, আপনাতেই আপনি আবদ্ধ। হকিং প্রশ্ন তুলেছেন কেন এই অস্তিত্ব? তার স্রষ্টা কে? স্রষ্টা থাকলে কোন প্রয়োজনে তিনি এই সৃষ্টি করেছেন?" (মহাবিশ্বের কথা ঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র)

হকিংয়ের এই মতবাদ নিয়েও প্রবল বিতর্ক রয়েছে। আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব সসীম কিন্তু তার সীমানা নেই। তা হলে এই বিশ্ব কি কাল্পনিক কালের? বাস্তব সময়ের মহাবিশ্বে সিঙ্গুলারিটি থাকবে, থাকবে সৃষ্টি ও লয়। সত্যি সত্যিই কি বাস্তব সময়ের এই মহাবিশ্ব প্রকৃত পক্ষে কাল্পনিক সময়ের? এর উত্তর আজও অজানা। হকিং বিশ্ব সৃষ্টির সমস্যার কিছুটা সমাধানে এই প্রকল্প দিয়েছেন মাত্র। সুতরাং মহাবিশ্ব আজও নিশ্চিতভাবে মহাবিস্ময়।

মহাবিশ্ব যেসব বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাদের কিছু বিস্ময়কর কথায় আসা যাক। মহাবিশ্বকে জানতে হলে এগুলির সাহায্যেই জানতে হবে। পালসার বা নিউট্রন নক্ষত্র, কোয়াসার, কৃষ্ণগহ্বর প্রভৃতির সাহায্যে মহাবিশ্বকে জানার চেষ্টা চলেছে। আবার সাধারণ নক্ষত্রের জীবনচক্র যাচাই করেও মহাবিশ্বের স্বরূপ কিছুটা জানা যাচ্ছে। বহু প্রশ্নের সমাধান এখনও না পাওয়া গেলেও, এগুলির সমাধানের চেষ্টায় মহাবিশ্ব ক্রমশঃ আরও বেশি রহস্যময় এবং মহিমাময় হয়ে উঠেছে। মহাবিশ্বের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে আলোচনায় আনা যাক শ্বেতবামন [White Dwarf], নিউট্রন নক্ষত্র [Neutron Star], সুপারনোভা [Super Nova], কৃষ্ণগহ্বর [Black Hole], কীটবিবর [Worm Hole], শ্বেতবিবর [White Hole], পালসার [Pulsar] এবং কোয়াসাদের [Quasar] কথা। নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। সেখানেও কোয়াসার-পালসার ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় কেবল তাদের বিস্ময়কর দিকগুলির কথাই বলা হবে।

মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তে ক্ষুদ্রতম মহাবিশ্বের উপাদান কি ছিল তা বলা সম্ভব নয়। কারণ ওই মুহূর্তে বিশ্বের তাপমাত্রা কত ছিল তা আমাদের অজানা। ওই মুহূর্তের এক সেকেন্ডের একশোভাগের এক ভাগ [1/100 সেকেন্ড] পরে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10,000 কোটি [10^{11}] ডিগ্রি কেলভিন। তখন বিশ্ব ছিল বস্তুকণা এবং রশ্মিকণার এক অবিমিশ্র 'মহাজাগতিক অণ্ড' [Cosmic Egg], যাকে কোন কোনও বিজ্ঞানী বলেছেন, 'Undifferentiated Soup', যাকে বাংলায় বলা হয়েছে, 'গরম খিচুড়ি'। একে উত্তপ্ত 'মহাজাগতিক অণ্ড' বলাই সমীচীন। এই নিদারুণ উষ্ণ ও ঘন অবস্থায় বস্তুকণা রশ্মিকণায় এবং রশ্মিকণা বস্তুকণায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। এরপর $10^{1\cdot}$ ডিগ্রি কেলভিনের উষ্ণতার সামান্য নীচে তৈরি হল ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনো [Neutrino]। নিউট্রিনোর বিপরীত কণা অ্যান্টিনিউট্রিনোরও উৎপত্তি হয় এই সময়। এই পর্যায়ে বিশ্বের ঘনত্ব ছিল প্রায় 400 কোটি [4×10^9] গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। ফোটনকণাদের উৎপত্তিও হয়েছিল এইরকম সময়ে।

নিউট্রিনোগুলি অনায়াসেই পৃথিবী ভেদ করে চলে যেতে পারে, যা গামারশ্মিরাও পারে না। অথচ বিশ্বের ওই প্রবল ঘনত্বে নিউট্রিনোরা আটকা পড়ে গেল মহাবিশ্বের ওই আদি অবস্থায়। বর্তমানে প্রতি 100 কোটি ফোটন বা ইলেকট্রন-পজিট্রন বা নিউট্রিনো-অ্যান্টিনিউট্রিনো পিছু একটি করে প্রোটন বা নিউট্রন পাওয়া যায়। ওই সময় অবশ্য প্রোটন বা নিউট্রনরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তবে ওই হাল্কা কণাগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রোটনগুলি অনবরত নিউট্রনে এবং নিউট্রনগুলি প্রোটনে রূপান্তরিত হতে লাগলো ওই সময়। এই অবস্থায় কোন পরমাণু কেন্দ্রক, যেমন ডিউটেরিয়াম [Deuterium] আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হলেও তা ওই প্রচণ্ড তাপে ও চাপে ভেঙে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গেই। মহাবিস্ফোরণের 13.82 সেকেন্ড পরে তাপমাত্রা হল 300 কোটি ডিগ্রি কেলভিন। এই সময় হিলিয়াম তৈরি হতে পারতো, কিন্তু তা হয় নি, কারণ হিলিয়াম তৈরি হয় পর্যায়ে পর্যায়ে। তার প্রথম ধাপে একটি প্রোটন আর একটি

নিউট্রন মিলে তৈরি হয় ভারী হাইড্রোজেন [Heavy Hydrogen] বা ডিউটেরিয়াম। কিন্তু এই ডিউটেরিয়াম ওই 300 কোটি ডিগ্রি কেলভিনে ভেঙে যাচ্ছিল। ফলে, এর পরবর্তী ধাপে আর একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন ওই ডিউটেরিয়ামের সঙ্গে মিলিত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করার সুযোগই পাচ্ছিল না। তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমার পর নিউট্রন রূপান্তরণের হার গেল বেড়ে। নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত দাঁড়ালো 17 : 83।

মহাবিস্ফোরণের তিন মিনিট দু'সেকেন্ড পরে তাপমাত্রা নেমে এলো 100 কোটি [10^9] ডিগ্রি কেলভিনে। তখনও ডিউটেরিয়াম থেকে হিলিয়াম হচ্ছে না। কারণ তখনও ডিউটেরিয়াম উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে। মহাবিস্ফোরণের 15 মিনিট পরে নিউট্রনগুলি প্রোটনে রূপান্তরিত হতে থাকলো। এরই কিছুটা পরে ডিউটেরিয়াম গড়ে উঠতে থাকলো। আর তার সঙ্গে একটা নিউট্রন সংযোগে ট্রিটিয়াম [H^3] থেকে তৈরি হল সুস্থির হিলিয়াম কেন্দ্রক [He^4] বা আলফা কণা [Alpha Particles]। আবার ডিউটেরিয়ামের সঙ্গে প্রোটন যুক্ত হয়েও হল ট্রিটিয়াম এবং আরও একটি প্রোটন জুড়ে তৈরি হল হিলিয়াম। এই সময় তাপমাত্র ছিল প্রায় 90 কোটি ডিগ্রি কেলভিন। এমতাবস্থায় নিউট্রন ছিল প্রায় 13% এবং প্রোটন প্রায় 87%। এক একটি হিলিয়াম কেন্দ্রকে থাকে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন। তাই ওই 13 শতাংশ নিউট্রনের সবগুলিই হিলিয়াম তৈরিতে কাজে লেগে থাকলে চার-কণাবিশিষ্ট হিলিয়ামের পরিমাণ হল 26 শতাংশ এবং একটি প্রোটনবিশিষ্ট হাইড্রোজেন [${}^1H_1$] পরমাণু হল 74 শতাংশ। তাই মূলতঃ হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামেই রূপান্তরিত হল আদিবিশ্ব। হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামই তাই মহাবিশ্বের মূল উপাদান। মহাবিশ্বের নক্ষত্রগুলির মূল এবং আদি উপাদান তাই হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। মহাবিশ্বে উপরোক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন ছিল প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এবং এক-চতুর্থাংশ ছিল হিলিয়াম। নক্ষত্রদের দেহ তৈরি হয়েছে এবং এখনও তরুণ নক্ষত্র তৈরি হয় হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে। তারপর তাদের নানা বিবর্তন ঘটে।

সুতরাং আদি নক্ষত্রদের শরীর গ'ড়ে উঠে মূলতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে। তারপর এক সময় ওই নক্ষত্রে শুরু হয় কেন্দ্রকীয় সংযোজন [Nuclear Fusion]। নক্ষত্রদের শক্তি উৎপন্ন হয় এই ফিউসন পদ্ধতিতে। এদের অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন কেন্দ্রক অর্থাৎ প্রোটনগুলির সংযোজনে তৈরি হয় শক্তি। চারটি আয়নিত হাইড্রোজেন কেন্দ্রক বা প্রোটনের কেন্দ্রকীয় সংযোজনে উৎপন্ন হয় একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক। চারটি প্রোটনের মোট ভরের চেয়ে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রকে ভর কিছুটা কম হয়। যেটুকু ভর কম হয় তা রূপান্তরিত হয় শক্তিতে আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র মেনে। এইভাবে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে অনবরত শক্তির যোগান পায় তরুণ নক্ষত্রগুলি।

সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র। মহাবিশ্বে এই ধরনের কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। সূর্য এক 500 কোটি বছরের যুবা নক্ষত্র। এটি এর এই ধরনের নক্ষত্র অবস্থা আরও 500 কোটি বছর ধরে বজায় রাখতে পারবে। এর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা 6000 ডিগ্রি কেলভিন। এর কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা প্রায় দু'কোটি [2×10^7] ডিগ্রি কেলভিন। এর শক্তির উৎস হল ওই কেন্দ্রকীয় সংযোজন। অন্য সব এই শ্রেণীর নক্ষত্রের মত সূর্যের মধ্যেও চলছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরণ। ফলে, সূর্য নামক সাধারণ নক্ষত্র লাভ করছে তার নক্ষত্র হয়ে থাকার শক্তি। তরুণ নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে তার নক্ষত্র শক্তির মূল উৎস হয় হাইড্রোজেন কেন্দ্রকগুলির কেন্দ্রকীয় সংযোজন, যার ফলে উৎপন্ন হচ্ছে হিলিয়াম। সুতরাং সূর্য বা ওই ধরনের নক্ষত্রগুলির জ্বালানী হল হাইড্রোজেন এবং তার ছাই বা ভস্ম হল হিলিয়াম। একই

পদ্ধতিতে একদিন মহাবিশ্বে তৈরি হয়েছিল হিলিয়াম। সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রের শক্তির উৎস হল হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের ওই কেন্দ্রকীয় সংযোজন।

অনুমান করা হয়, যে সব নক্ষত্রের উষ্ণতা বেশি সেখানে প্রোটন থেকে হিলিয়াম উৎপন্ন হওয়ার ক্রিয়ায় কার্বন অনুঘটকের কাজ করে। পদ্ধতিটি 'কারবন সাইকেল' [Carbon Cycle] নামে পরিচিতি। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। এ সব প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসাবে নিউট্রিনো কণা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ভরহীন এবং আধানহীন কণা নিউট্রিনো অনায়াসেই আবহমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে চলে আসে। সূর্য থেকে কতটা নিউট্রিনো পৃথিবীতে আসছে তারও পরিমাপ করা হয়েছে। তবে এখনও সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় নি, কারবন সাইকেল কিংবা সাধারণ প্রোটন সংযোজন— কোন্ পদ্ধতিতে সূর্য এখন তার শক্তির যোগান পাচ্ছে। নবীন সাধারণ নক্ষত্রের শক্তির মূল উৎসই হল হাইড্রোজেন কেন্দ্রক বা প্রোটনদের কেন্দ্রকীয় সংযোজন।

সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রদের এর পরের অবস্থা হল 'লাল দানব' [Red Giant]। এই অবস্থায় নক্ষত্রটির কেন্দ্রের উষ্ণতা হয় প্রায় 10 কোটি [10^8] ডিগ্রি কেলভিন। এই উষ্ণতায় হিলিয়ামের কেন্দ্রকগুলি সংযোজন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে ভারী ভারী কেন্দ্রক তৈরি করে। লোহার কেন্দ্রক [Iron Nucleus] তৈরি হওয়া অবধি লাল দানবের শক্তির উৎস অটুট থাকে। এর ফলে, কেন্দ্রমুখী মহাকর্ষ শক্তিকে ওই কেন্দ্রকীয় শক্তি ঠেকিয়ে রাখে এবং মহাকর্ষীয় সংকোচন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে ওই লাল দানব হওয়া নক্ষত্রটি।

'চন্দ্রশেখর সীমা' অনুযায়ী যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণ বা তার কম, তাদের ক্ষেত্রে লোহার কেন্দ্রক তৈরি হওয়ার পর তারা শক্তির উৎস হারিয়ে ফেলে এবং তারা শ্বেত বামনে পরিণত হয়। এই অবস্থায় নক্ষত্রটি ঠাণ্ডা হতে থাকে ও ক্ষীণ আলো বিকিরণ করতে থাকে। আমাদের সূর্যও তাই 500 কোটি বছর পর শ্বেতবামনে পরিণত হবে। সব নক্ষত্র শ্বেত বামনে পরিণত হয় না। চন্দ্রশেখর সীমার শর্ত অনুযায়ী সে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণ বা তার কম তারাই কেবল শ্বেতবামন তারায় পরিণত হয়। এই সীমার বাইরের ভরের নক্ষত্রদের বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরণ ঘটে। কেউ পালসার বা নিউট্রন তারা হয়, কেউ সুপারনোভা হয়ে বিস্ফোরিত হয়, কেউ শেষ পর্যায়ে কৃষ্ণগহ্বর হয়। মহাবিশ্বের উপাদান যে কেবল নক্ষত্রেরাই তা নয়, এখানে রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা, নানা গ্যাস, নানা বিকিরণ, অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, অসংখ্য নানান কণা ইত্যাদি। এই মহাবিশ্বের বহু কিছুই অজানা। কেবল মানুষ যেটুকু জেনেছে তাতেই বিস্ময়ের শেষ নেই। না জানি আরো কত বিস্ময় লুকিয়ে আছে মহাবিশ্বের প্রায় অসীম বিস্তারে। মহাবিশ্বের এক বিশ্ব হল শ্বেত বামন তারারা। এগুলির উৎপত্তি সাধারণ তারাদের থেকে, তাদের বিবর্তনের ফলে। যে সব তারাদের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণ বা তার কম একমাত্র সেগুলিই তাদের নক্ষত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে রূপান্তরিত হবে শ্বেতবামনে।

1838 সালে ফ্রিডরিক উইলহেলম বেসেল সূর্য থেকে 61-সিগনী [Cygni] নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন প্রায় এগারো আলোকবর্ষ। 61-সিগনী থেকে 'লুব্ধক' [Sirius] নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে গিয়ে বেসেল দেখলেন তার একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ আছে। 50 বছরে সে ওই কক্ষপথ ঘুরে আসে। বিজ্ঞানী বেসেল অনুমান করলেন কোন বড় নক্ষত্র আছে সাইরাসের কাছাকাছি। তিনি বললেন, লুব্ধকের কক্ষপথের ওপর 'আর একটা কিছু'-র প্রভাব পড়ছে। বেসেল সেই 'আরেকটা কিছু'র নাম দিলেন সাইরাস-বি বা 'লুব্ধকখ'। বেসেলের সময় লুব্ধক-খকে ভালো করে দেখবার মত দূরবীন তৈরিই হয় নি। বেসেলের কাছে যে সব দূরবীন ছিল তার সবচেয়ে ভালোটি দিয়েও তিনি লুব্ধক-খকে দেখতে পান নি। কিন্তু তার অবস্থান তিনি বের করলেন অঙ্ক কষে। 1862 সালে অ্যালভান ক্লার্ক [1804-1887

খ্রিস্টাব্দ] 47 সেন্টিমিটার ব্যাসের দূরবীন দিয়ে লুব্ধক-খ কে দেখতে পেলেন ঠিক বেসেল-নির্দিষ্ট অবস্থানে। এর দীপ্তি লুব্ধক নক্ষত্রের দীপ্তির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। তবে আলভান ক্লার্কের দূরবীনটিও তারাটির ঔজ্জ্বল্য স্থির করতে পারলো না, অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক কাছে থাকায়। কিন্তু তিনি বললেন, লুব্ধক একটি স্বাভাবিক নক্ষত্র, কিন্তু তার সঙ্গী লুব্ধক-খ একটি 'শ্বেতবামন' [White Dwarf]। তার ঘনত্ব অস্বাভাবিক। লুব্ধক নক্ষত্র এখন 'সাইরাস-এ' এবং তার সঙ্গীটি এখন 'লুব্ধক-খ' বা 'সাইরাস-বি' নামেই পরিচিত। তবে লুব্ধক-খ-এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'ডিজিটেরিয়া' [Digiteria]। এই ডিজিটেরিয়া বা সাইরাস-বি কিংবা 'লুব্ধক-খ' একটি শ্বেতবামন তারা।

বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা জানি, লুব্ধক বা লুব্ধক-ক এবং লুব্ধক-খ-এর ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত 10,000 ঃ 1, ভরের অনুপাত 4 ঃ 1, ব্যাসার্ধের অনুপাত 1.8 ঃ 0.034 এবং ঘনত্বের অনুপাত 0.42 ঃ 27,000। ডিজিটেরিয়া বা লুব্ধক-খয়ের কক্ষপথ পরিক্রমণের সময় হল 50.04 $\pm$ 0.09 বছর। লুব্ধক-ক এবং সূর্যের পৃষ্ঠের উষ্ণতা যথাক্রমে $10{,}000^0$K এবং 6000^0 K । 1915 খ্রিস্টাব্দে ওয়ালটার সিডনী অ্যাডাম্‌স্ লুব্ধক-খ-এর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা বের করেন 8000^0 K । এর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা এতোটা বেশি হওয়া সত্ত্বেও এর নিষ্প্রভতার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, এর আয়তন খুবই ছোট। এর ব্যাস প্রায় 4700 কিলোমিটার, যা পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই সব আবিষ্কার থেকে জানা গেল শ্বেতবামনের ধর্ম। এদের আয়তন গ্রহের মত ছোট, বিকিরণ ক্ষমতা নেই বললেই চলে। অথচ এদের উষ্ণতা যথেষ্ট বেশি। এরা নক্ষত্র জীবনের অভিব্যক্তির শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বেসেল 'প্রোকাইঅন' নামক একটি নক্ষত্রেরও অনুরূপ সঙ্গী খুঁজে পেয়েছিলেন। 1895 সালে 'প্রোকাইঅন -বি' আবিষ্কার করেন জন মার্টিন সাবর্লে। এটিও একটি শ্বেতবামন। প্রোকাইঅন-বি এবং লুব্ধক-খ উভয়েই সমগোত্রীয় নক্ষত্র।

লুব্ধক-ক এবং লুব্ধক-খ যে ভরকেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে, তার অবস্থান থেকে জানা যায় লুব্ধক-ক-এর ভর ডিজিটেরিয়ার প্রায় চারগুণ। তবু এই শ্বেত বামনটি এই জন্যই অসাধারণ যে এর ভর প্রায় সূর্যের ভরের সমান। এর ঘনত্ব প্রায় প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে 35 কিলোগ্রাম।। পৃথিবীর কেন্দ্র এবং সৌরকেন্দ্রের ঘনত্বের যথাক্রমে প্রায় 3000 গুণ এবং 300 গুণ। সূর্য থেকে 35 আলোকবর্ষ পরিধিতে রয়েছে প্রায় 300 টি নক্ষত্র। তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে মাত্র আটটি শ্বেতবামন। এর থেকে অনুমান করা হয়, মহাবিশ্বে শতকরা দু-তিনটি নক্ষত্র শ্বেতবামন অবস্থায় বর্তমান। সুতরাং শুধু আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই 200 কোটি বা 300 কোটি শ্বেতবামন তারা থাকা সম্ভব। আগেই বলেছি, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় 10,000 কোটি [10^{11}]। সুতরাং বলা যায়, কোটি কোটি শ্বেত বামন রয়েছে আমাদের মহাবিশ্বে, যেখানে আবিষ্কৃত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ [10^6] ।

শ্বেতবামন তারাগুলি যেন মহাকাশের অঙ্গার। নক্ষত্রগুলি তার জ্বলনের শেষ দশায় উপস্থিত। ফুরিয়ে গেছে তাদের সব জ্বালানী। সব নক্ষত্র তাদের শেষ পর্যায়ে শ্বেতবামন হয় না। কেবল সেই সব নক্ষত্র শ্বেতবামন হয় যাদের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণের মধ্যে। বাকীদের অন্যান্য অবস্থা হয়, যাদের কথা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। অনেক সময়ে শ্বেতবামনেরও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, প্রতিবেশী স্ফীত তারা থেকে মহাকর্ষস্রোতে ভেসে-আসা হাইড্রোজেনের ক্রমান্বয়ে সমাবেশের ফলে। কালক্রমে শ্বেতবামনের গায়ে জমে-ওঠা এই হাইড্রোজেন তাপ বৃদ্ধির ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে হিলিয়ামে পরিণত হয়ে শূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়। শ্বেত বামনটির উপরে আবার একইভাবে হাইড্রোজেন জমে উঠলে আবার ওই রকম বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। এই জাতীয় বিস্ফোরণকে নোভা বা নবতারকা [Nova] বলে। এর দীপ্তি সাময়িকভাবে সূর্যের দীপ্তির কয়েক লক্ষ গুণ হতে পারে। আবার খুব কম ক্ষেত্রে হলেও, শ্বেতবামন বা নিউট্রন তারায় এইভাবে বাইরে থেকে আসা হাইড্রোজেন

জমার ফলে যে বিস্ফোরণ হয় তাতে তারাটি পুরোপুরি চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে। সাধারণ নক্ষত্র যেমন সুপারনোভা [Super Nova] হতে পারে, তেমনি এসব ক্ষেত্রে শ্বেত বামন বা নিউট্রন তারাও আরেক ধরনের সুপারনোভায় [Super Nova Type- I] পরিণত হয়।

পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে যেতে হলে কোনও বস্তুকে সেকেণ্ডে 11.25 কিলোমিটার বেগে গতিশীল হতে হবে। এটি হল পৃথিবীর 'মুক্তিবেগ' [Escape Velocity]। এইভাবে সূর্যের মুক্তিবেগ হল 617 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। আর লুব্ধক-খ এর মুক্তিবেগ প্রায় 3,400 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। এই বেগ আলোর বেগের প্রায় এক শতাংশ। সুতরাং কী বিশাল এই মুক্তিবেগ। এই বেগ চিরকালই অধরা থাকবে মানুষের।

কেন্দ্রকীয় শক্তির উৎস শেষ হওয়ার পর লাল দানব নক্ষত্রের সংকোচন বেড়ে চলে মহাকর্ষের প্রভাবে। তার আয়তন সংকুচিত হয়ে পড়ে। তখন তার আয়তন কোন গ্রহের আয়তনের মত হয়ে উঠে। শ্বেতবামন অবস্থা চলে আসে। বিপুল মহাকর্ষে তার অণু পরমাণু ভেঙে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন সব আলাদা হয়ে যায়। ইলেকট্রনগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হওয়ায় তারা গ্যাসের মত বহমান এক পদার্থ তৈরি করে। এই সময় নিউট্রন, প্রোটনরা নক্ষত্রের 2.5×10^{-9} ভাগ মাত্র দখল করে থাকে। শ্বেতবামনের পৃষ্ঠদেশ থেকে কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ ইলেকট্রন গ্যাস বাড়তে থাকে। এই গ্যাসই নক্ষত্রটির সংকোচন কিছুটা ঠেকিয়ে রাখে। সদ্যোজাত কোনও শ্বেতবামনের পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা এক লক্ষ ডিগ্রি কেলভিন ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে বিকিরণে এই তাপমাত্রা কমে যায়। বয়স্ক শ্বেতবামনের উষ্ণতা 5000^0 K হতেও দেখা যায়। এই উষ্ণতা কমার ফলে কিন্তু শ্বেতবামনটির আকারে পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণ নক্ষত্রের কেন্দ্রে কেন্দ্রকীয় শক্তির জন্য তাপ বাড়ে এবং তার আয়তন বৃদ্ধি মহাকর্ষীয়, সংকোচনকে প্রতিহত করে। তাপের তারতম্যে সাধারণ নক্ষত্রের গঠন বদলাতে পারে। শ্বেতবামনের ক্ষেত্রে তার সারা দেহে যে তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট ইলেকট্রন গ্যাসের বহির্মুখী চাপ থাকে তাতে তার মহাকর্ষীয় সংকোচন বাধা পায়। তাই উষ্ণতা হ্রাসেও শ্বেতবামনের গড়নে কোনও পরিবর্তন হয় না। ক্রমশঃ তার পৃষ্ঠের তাপ যতই কমতে থাকে, তার বিকিরণ ফুরিয়ে আসে। বিকিরণহীন শ্বেতবামন তখন কৃষ্ণবামনে [Black Dwarf] পরিণত হয়। তবে শ্বেতবামনের কৃষ্ণবামন হতে বহু সময় লাগে। কৃষ্ণবামন সাধারণ গ্রহের মত অক্ষয় ও শাশ্বত বস্তু। তবে মহাবিশ্বের যা বয়স তাতে কোটি কোটি শ্বেত বামন তৈরি হলেও একটাও কৃষ্ণবামন তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয় না। মহাবিশ্বের বয়স প্রায় 2000 কোটি বছর, এ কথা আগেই বলেছি। এমনও হতে পারে কৃষ্ণবামন মহাবিশ্বে হয়তো তৈরি হয়েছে, কিন্তু তা আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং তত্ত্বগত ভাবে কৃষ্ণবামনের সম্ভাবনা থাকলে বাস্তবে আজও তা অনাবিষ্কৃত।

অতি সম্প্রতি শ্বেতবামন নিয়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনা নাসার [NASA] 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি'র [Chandra X-ray Observatory] এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন। 2005 সালের 8ই জুন 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স' লিখেছে 'White dwarfs in a death dance?'—অর্থাৎ 'মরণ নৃত্যে দুই শ্বেতবামন'। নাসার ওই বিজ্ঞানীটি আবিষ্কার করেছেন যে, দুটি শ্বেতবামন একে অপরের চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরছে এবং এরা প্রবল শক্তিসম্পন্ন 'মহাকর্ষীয় তরঙ্গ' 'Gravitational Waves] নির্গত করছে। এদের নির্গমন করা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এতোই শক্তিশালী যে ওই দুই শ্বেতবামনকে মহাকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উৎস বলে মনে করা হয়েছে। এই যুগ্ম শ্বেতবামন তারা দুটির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম RXJO806। 1994 সালে এই যুগ্ম শ্বেতবামন দুটি আবিষ্কৃত হয়। এদের আবিষ্কার করা হয় রনজেন

রশ্মির সাহায্যে। পরে দেখা যায় এই যুগ্ম-তারা, 5.4 মিনিট অন্তর জ্বলছে-নিভছে। এরা চিহ্নিত হয় শ্বেতবামন হিসাবে এবং এরা পরস্পর পরস্পরের চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরছে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, দুটি শ্বেতবামন পরস্পরের চারিদিকে ঘুরতে থাকলে তারা প্রবল শক্তিসম্পন্ন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গত করবে এবং শক্তি হারিয়ে তাদের আবর্তনের কক্ষপথ ছোট হয়ে আসবে ও দুটি তারাই এক হয়ে যাবে। অর্থাৎ শ্বেতবামন দুটি এক সময় ধাক্কা খাবে, একটির ঘাড়ের উপর অন্যটি গিয়ে পড়বে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটতে চলেছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব আরও একবার সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে।

পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে, নির্গত মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ওই যুগ্মতারার ঘূর্ণন শক্তিকে প্রবলভাবে নিঃশেষিত করছে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বলছে, 'A binary star system should emit gravitational waves, which rush away at the speed of light and cause the stars to move closer together.' এই যুগ্ম-শ্বেতবামন নক্ষত্রের কক্ষ পরিক্রমণকাল প্রতিবছর 1.2 মিলিসেকেন্ড করে কমছে। এই হার তত্ত্বীয় মানের সঙ্গে একেবারে সমান।

এই RXJO806+1527 বা JO806 নামের যুগ্মতারাটির কক্ষপথ এতাবৎ আবিষ্কৃত যুগ্ম তারাদের কক্ষপথগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। এদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র 50,000 মাইল। এই দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতবাদের সূত্র মেনেই এরা বিপুল পরিমাণে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বের করে দিচ্ছে, ক্ষয় করছে নিজেদের ঘূর্ণন শক্তি। ফলে, এদের কক্ষপথ ছোট হয়ে আসছে। এরা যে পরিমাণ ঘূর্ণন শক্তি ক্ষয় করছে তার পরিমাণ সূর্য তার আলোর জন্য যতটা শক্তি ক্ষয় করছে তার প্রায় 100 গুণ। সুতরাং এই দুই শ্বেতবামন এখন যে পরিমাণ মহাকর্ষীয় শক্তি ক্ষয় করছে তার পরিমাণ অতিবিশাল। এই শক্তি বিকিরিত হচ্ছে মহাকাশের চারিদিকে। এটি এখন মহাকর্ষীয় শক্তি বিকিরণের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস। নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের [Goddard Space Flight Centre] বিজ্ঞানী টড স্ট্রোমায়ার [Tod Strohmayer] বলেছেন, "If confirmed, J0806 Could be one of the brightest sources of gravitational waves in our galaxy. ....It is either the most compact binary known or one of the most unusual systems we have ever seen." তিনি এই আবিষ্কারটির প্রশংসা করে বলেছেন, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি বড় ধরনের আবিষ্কার।

এই শ্বেতবামন দুটি এখন ঘণ্টায় দশ লক্ষ মাইলেরও বেশি গতিতে ঘুরছে। এরা পরস্পরের কাছে চলে আসছে কক্ষপথ ছোট হয়ে আসার ফলে। এরা যত কাছে আসবে এদের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিকিরণের পরিমাণও তত বাড়বে। দেশ-কাল-সন্ততিতে উৎপন্ন এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এদের ঘূর্ণন শক্তি এতোই কমিয়ে দেবে যে, এরা পরস্পরের কাছে চলে আসতে থাকবে। ফলে, একে অন্যকে ধাক্কা মারবে একসময়। সেই বিশাল সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে উৎপন্ন হবে অতি বিশাল পরিমাণের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। পাঁচ থেকে দশ লক্ষ বছরের মধ্যে এই দুই শ্বেতবামনের মধ্যে ওই সংঘর্ষ ঘটবে। সেই সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করতে সম্ভবত মানুষ থাকবে না। কিন্তু এই ঘটনা ঘটবেই আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে। কে জানে এই মহাবিশ্বের অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে হয়তো এখনই এমন সংঘর্ষ ঘটছে যা আমাদের জানার বাইরে, পর্যবেক্ষণের অতীত। সুতরাং ওই দুই শ্বেতবামন মরণ-নৃত্যে এগিয়ে চলেছে পরস্পরের দিকে। অবশ্য সে মৃত্যু দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে না।

মহাবিশ্বে বহু নক্ষত্র আছে যেগুলি হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। একটি অনুজ্জ্বল নক্ষত্র যখন হঠাৎ-ই প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বলতায় বিস্ফোরিত হয় তখন তাকে বলা হয় নোভা ও সুপারনোভা। এই নামকরণ করা হয় বেশ কিছুকাল আগে, যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, এই বিস্ফোরণের ফলে একটি নতুন তারার জন্ম হল। পরবর্তীকালে জানা গেল, একটি পুরাতন ক্ষীণ নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে নোভার উৎপত্তি হয়। শ্বেত বামনেরা অনেক সময় বিস্ফোরিত হয়ে সুপারনোভার সৃষ্টি করে। সুতরাং নোভা বা সুপারনোভা নতুন নক্ষত্রের জন্ম দেয় না। একটি নক্ষত্রই বিস্ফোরিত হয়ে নোভা বা সুপার নোভা সৃষ্টি করে। কিন্তু নোভা বা নব তারা নামকারণটি আজও রয়ে গেছে, যদিও নোভা বা সুপার নোভা একটি তারার বিস্ফোরণ, নতুন তারার উৎপন্ন হওয়া নয়। সুপারনোভা আমরা তাদেরই বলি, যেক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্য, যে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হল তার ঔজ্জ্বল্যের প্রায় এক লক্ষ গুণেরও বেশি হয়। নোভার ক্ষেত্রে এই ঔজ্জ্বল্য বিস্ফোরিত নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্যের 10,000 গুণেরও বেশি হয়। এই ধরনের বিস্ফোরণে নক্ষত্রটির মৃত্যু ঘটে।

গত এক হাজার বছরে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে খালি চোখে পাঁচটি সুপারনোভা দেখা গেছে। এগুলির সবই ঘটেছে 1608 সালে দূরবীন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে। সুপারনোভার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হলেও তা নাটকীয়। তার ঔজ্জ্বল্য মাত্র মাস কয়েক থাকলেও, ওই ঔজ্জ্বল্য কয়েকদিন এতো বেড়ে যায় যে, তার প্রতিবেশী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মোট ঔজ্জ্বল্যকে ছাড়িয়ে যায়। 10,000 কোটি নক্ষত্র সমন্বিত আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে গত এক হাজার বছরে মোট পাঁচটি সুপারনোভার আবির্ভাবের ইতিহাস পাওয়া গেছে। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও সুপারনোভার ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাচ্ছে। দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের কোনও ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের ইতিহাস কালে একটি মাত্র সুপারনোভার আবির্ভাব হতে পারে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। সেখানে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে পাঁচটি সুপারনোভার আবির্ভাব বেশ কিছুটা বিস্ময়ের এবং তাও দেখা গেছে গত এক হাজার বছরের মধ্যে, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে বলা যায় মাত্র 600 বছরের মধ্যে। সুতরাং পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে পাঁচটি সুপারনোভার আবির্ভাব খুবই বিস্ময়কর বিরল ঘটনা।

জানাকালের মধ্যে প্রথম সুপারনোভা দেখা যায় 1054 খ্রিস্টাব্দে। এটি খালি চোখেই দেখা গিয়েছিল। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের একটি বিশাল তারকা বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি করেছিল এই সুপারনোভা। সুপারনোভাদের জীবনকাল তুলনামূলকভাবে বেশ কম। তবে এদের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে এগুলির নক্ষত্র জীবনের। বিস্ফোরণকালে এই নক্ষত্র তার লক্ষ লক্ষ বছরের অস্তিত্বের দীর্ঘ সময়ে মোট যে পরিমাণ শক্তি নির্গত করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি নির্গত করে। এই নির্গমন চলে এক-দু'দিন ধরে। 1054 সালের সুপারনোভাটির ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশি হয়েছিল 4ঠা জুলাই। চীনদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সুপারনোভা পর্যবেক্ষণ করে তার বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। 4ঠা জুলাইয়ের পর থেকে ক্রমশঃ ঔজ্জ্বল্য কমতে থাকে এবং পরে অদৃশ্য হয়ে যায় এই সুপারনোভা। এই নক্ষত্রের টুকরোগুলি এখন দেখতে পাওয়া যায় এবং এরাই সৃষ্টি করেছে 'কর্কট নীহারিকা' [Crab Nebula]। এই বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে শ্বেত বামনের পরিবর্তে যা রয়েছে তা হল একটি পালসার। এই পালসার নিয়মিতভাবে প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ বার জ্বলে উঠছে। শুধু তাই নয় এর থেকে বেতারতরঙ্গ-রশ্মি ও দৃশ্যমান আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

1572 সালে আর একটি সুপারনোভা দেখা যায় আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে। এই বছর নভেম্বর মাসে ক্যাসিওপিয়া বা কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে এই সুপারনোভাটি পর্যবেক্ষণ করেন টাইকো ব্রাহে।

তিনি এর অবস্থান এবং গুণাগুণের বিশদ বিশ্লেষণ করেছিলেন। 1604 সালে ওকিউসুস নক্ষত্রমণ্ডলীতে যে সুপারনোভার আর্বিভাব ঘটে তা ওই সময় বৃহস্পতি ও মঙ্গল একত্র আসার ফলে কাছাকাছি অবস্থিত এই নক্ষত্রমণ্ডলীর ওই সুপারনোভা তার সর্বোচ্চ ঔজ্জ্বল্যে আসার আগেই দৃশ্য হয়। ওই বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার 17ই অক্টোবর এই সুপারনোভাটিকে দেখতে পান। তিনি দেখলেন, হীরের মত দ্যুতিসম্পন্ন ওই সুপারনোভা তখন বৃহস্পতির ঔজ্জ্বল্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। নভেম্বরে ওটির অবস্থান সূর্যের কাছাকাছি এসে যাওয়ায় কেপলার ওটিকে সে সময় আর পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। আবার 1605 সালের জানুয়ারী মাসে যখন ওটি সূর্যের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, তখন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল ওর ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং ওই সুপারনোভাটিকে তাঁর উজ্জ্বলতম অবস্থায় দেখা সম্ভব হয় নি, ওটির সূর্যের আড়ালে চলে যাওয়ায়। প্রকৃতপক্ষে, ওটি সূর্যের আড়ালে চলে যায় নি, পৃথিবীর অবস্থানের জন্যই এটিকে সূর্যের পিছনে চলে যেতে দেখা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি বছরই কুড়ি-পঁচিশটি করে সুপারনোভা আবিষ্কার করছেন। এখনো পর্যন্ত মহাবিশ্বে 600টির বেশি সুপারনোভার সন্ধান পাওয়া গেছে। খালি চোখে শেষ যে সুপার নোভাটির সন্ধান পাওয়া গেছে তা 1885 খ্রিস্টাব্দে। তার অবস্থান অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে কিন্তু পাঁচটির বেশি সুপার নোভা দেখা যায় নি। এগুলিকে খালি চোখেই দেখা গেছে 1054 থেকে 1604 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়ান শেলটন বৃহৎ ম্যাগেল্লানিক ক্লাউড [Magellanic Cloud] বা 'ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' ব্রহ্মাণ্ডে একটি অনন্য বিরল সুপারনোভা আবিষ্কার করেন 1987 খ্রিস্টাব্দের 23 শে ফেব্রুয়ারী চিলির মানমন্দির থেকে। এই সুপার নোভাটির নামকরণ করা হয় 1987A বা সংক্ষেপে 87A। A-অক্ষরটি ওই বছরের প্রথম সুপারনোভা সূচিত করে। বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের পৃথিবী থেকে 1,70,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। সুতরাং ওই সুপারনোভাটির সৃষ্টি হয়েছিল 1,70,000 বছর আগে। পৃথিবীতে ওকে দেখা গেল 1987 সালে। বিস্ফোরণ থেকে আলোর আসতে সময় লেগেছে 1,70,000 বছর। তাই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়ে যে সুপারিনোভাটির সৃষ্টি হয়েছিল তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হল বিস্ফোরণের 1,70,000 বছর পরে। বিশ্বের সব সুপারনোভার ক্ষেত্রে এই কথা খাটে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নীল অতিদানবীয় নক্ষত্র 'স্যান্ডুলিক'-এর বিস্ফোরণেই তৈরি হয়েছে এই সুপারনোভা। প্রায় তিন মাস ধরে উজ্জ্বল থাকার পর 20শে মে এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়। এই সময় এর উজ্জ্বলতা দাঁড়ায় সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 20 কোটি গুণ। তারপর এর উজ্জ্বলতা কমে আসে। ওই বছর 31শে অক্টোবরে এটির ঔজ্জ্বল্য দাঁড়ায় সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রায় তিন কোটি গুণ। 87A আবিষ্কৃত হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর আগে জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন সুপারনোভার শক্তি বিকিরণের মাধ্যম হল নিউট্রিনো। গ্যামো এই পদ্ধতির নামকরণ করেছিলেন 'উরকা প্রসেস' [Urca Process]। রিও ডি জেনেরোতে উরকার জুয়ার আড্ডায় টাকা-পয়সা কীভাবে উড়ে যায় তা যেমন দেখা যায় না, তেমনি সুপারনোভার প্রচণ্ড শক্তি নিউট্রিনোর মাধ্যমে কীভাবে বিকিরিত হয় তাও তেমনি টের পাওয়া যায় না। পরে অবশ্য শক্তিশালী নিউট্রিনোর মতো অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণিকা ধরার সন্ধানী যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। 87A সুপারনোভার বিকিরিত নিউট্রিনো জাপানের নিউট্রিনো সন্ধানী যন্ত্রে ধরা পড়েছে ওই 1987 সালের 23শে ফেব্রুয়ারীতেই। সুতরাং জর্জ গ্যামোর তত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। 87A আবিষ্কারের আগে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবার সুযোগ ছিল না। 87A সে সুযোগ এনে দিয়েছে।

ওহিও এবং জাপানের অন্যত্র এই নিউট্রিনো বিকিরণ পরিমাপ করে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেছেন যে, 87A সুপারনোভার মোট বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণ প্রায় 3×10^{53} আর্গ। এই শক্তি আমাদের সূর্যের এক কোটি বছরের মোট উৎপাদিত শক্তির কিংবা দশ বছরে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড মোট যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তার প্রায় এক হাজার গুণ। আলোর বিকিরণ শুরু হওয়ার আগেই কয়েক সেকেন্ডেই নিউট্রিনো বিকিরণ শেষ হয়ে যায়।

87A সুপারনোভাটিকে পরীক্ষা করে নিউট্রিনোর শক্তি, বিস্ফোরণের উষ্ণতা ও মোট শক্তির পরিমাণ প্রভৃতির তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে প্রমাণ করা সম্ভব হল। নিউট্রিনো বিকিরণের ফলাফল দেখে ওই সুপারনোভার কেন্দ্রস্থ নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। 87A-এর বেলায় তার আলোর তীব্রতা হ্রাসের হার থেকে বোঝা গেল তার নিউট্রন নক্ষত্রটি একটু অন্য ধরনের, কর্কট নীহারিকার মত নয়। 87A সুপারনোভাটির মাত্র শতকরা 0.1 ভাগ যে আলো পৃথিবীতে আসে তার স্পন্দন প্রায় 2000 বার প্রতি সেকেন্ডে। এ রকম দ্রুত স্পন্দনশীল নিউট্রন নক্ষত্র এর আগে আবিষ্কৃত হয় নি। 1989 সালে এই আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন ওই সুপারনোভার কেন্দ্রে রয়েছে একটি কৃষ্ণগহ্বর। কিংবা ওখানে রয়েছে একটা কোয়ার্কের [Quark] স্তূপ, যা উৎপন্ন হয়েছে নিউট্রন নক্ষত্রটি গুঁড়িয়ে যাওয়ার ফলে। 87A-এর কেন্দ্রস্থলে কী আছে তা জানতে হলে আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যখন তার উজ্জ্বল অবশেষ স্তিমিত হয়ে আসবে এবং কেন্দ্রাঞ্চলটির বাইরের আবরণ উন্মোচিত হবে। কেন্দ্রাঞ্চলটি তখন পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে উঠবে। 87A নিয়ে এখন প্রতিনিয়তই গবেষণা চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, অতি দানব নক্ষত্র স্যান্ডুলিকের বিস্ফোরণেই ওই সুপারনোভার উৎপত্তি কি না, বিস্ফোরণের আগে স্যান্ডুলিকের রঙ কী ছিল লাল না নীল, কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে সে এই বিস্ফোরণ অবস্থায় এলো? এগুলি এখন গবেষণার বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিভিন্ন মানমন্দিরে একজোট হয়ে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে হয়ে। 87A আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অতি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। 87A সুপারনোভা এখনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়। একে ঘিরে সব প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

চন্দ্রশেখর সীমার বেশি ভরের কোনও নক্ষত্র শ্বেতবামন না হয়ে নবতারা বা নোভা হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে তার ভর হারিয়ে সেটি নতুন ধরনের তারার সৃষ্টি করবে অথবা টুকরো টুকরো হয়ে গ্রহ, নীহারিকায় পরিণত হবে। সাধারণ সৌরভরের তিনগুণ পর্যন্ত ভারী নক্ষত্র তার জুড়ি তারার কিছুটা ভর আত্মসাৎ করে সে নবতারায় পরিণত হতে পারে। সৌরভরের তিনগুণের বেশি ভরসম্পন্ন নক্ষত্র সুপারনোভা হবে। যার বিস্ফোরণের তীব্রতা নোভার বিস্ফোরণের লক্ষ গুণের বেশি। 1885 সালে অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডে যে নক্ষত্র বিস্ফোরণ ঘটেছে তা সুপারনোভার উদাহরণ। আবার সূর্যের চেয়ে 50 থেকে 70 গুণ ভারী নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণে এদের ভর 97% থেকে 98% হারিয়ে যায়। তখন কেন্দ্রকের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি না হলে ওই কেন্দ্রকটি শ্বেতবামনে রূপান্তরিত হয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর যে কেন্দ্রকটি অবশিষ্ট থাকে তার ভর সূর্যের ভরের দুইগুণ বা তার বেশি হলে, তখন তাতে কেবলই নিউট্রন তৈরি হতে থাকবে প্রোটন ও ইলেকট্রনের জুড়ে যাওয়ার ফলে। নিউক্লীয় বা কেন্দ্রকীয় শক্তি তখনও বাধা দেবে তার সংকোচনে। পৃথিবীতে মুক্ত নিউট্রন ক্ষণস্থায়ী হলেও, নক্ষত্রের বেলায় ওই সব নিউট্রন বহুকাল স্থায়ী। তার কারণ হল, ওই সব নক্ষত্রের প্রবল উষ্ণতা। ফলে, সুপারনোভা হওয়া নক্ষত্রটির কেন্দ্রকটি তখন আরেক রকম তারায় রূপান্তরিত

হয়, যাদের দেহের অধিকাংশ উপাদান হল নিউট্রন এবং যেখানে সব প্রোটন-ইলেকট্রন মিলে গিয়ে নিউট্রন হয়ে চলেছে। নিউট্রন দিয়ে গড়া এরকম নক্ষত্রকে বলা হয় 'নিউট্রন তারা' 'Neutron Star] বা নিউট্রন নক্ষত্র।

1934 থেকে 1938 সালের মধ্যে ফ্রিট্‌জ জুইকি [Fritz Zwicky], ওয়াল্টার বাডে এবং ওপেনহাইমার [J.R. Oppenheimer] প্রমুখের নিবিড় গবেষণায় নিউট্রন নক্ষত্র সম্পর্কে বিশদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। চন্দ্রশেখর সীমার চেয়ে বেশি ভরের তারাদের ভিতরের অভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপ অনেক বেশি হওয়ায় তাদের মধ্যে তাপ-পারমাণবিক বিক্রিয়ার প্রবল বৃদ্ধি ঘটে। উষ্ণতা বাড়তে থাকে এবং দ্রুতহারে হিলিয়াম থেকে লোহা, কোবাল্ট প্রভৃতি মৌল উৎপন্ন হতে থাকে। শেষে অন্তর্মুখী টান ও বহির্মুখী চাপের সংঘর্ষে ওই নক্ষত্রটি তার ভর অনুসারে নোভা বা সুপারনোভা হয়ে যায়। এগুলির ঘনত্বসম্পন্ন কেন্দ্রক নিজেদের ভীষণ আভিকর্ষে পিষ্ট হয়ে আরও ভয়ানকভাবে সংকুচিত হয়ে প্রবল ঘনত্বসম্পন্ন হয়ে যায়। এই সুপারনোভাগুলি দ্বিতীয়-বর্গ সুপারনোভা [Type II Supernova]। আর এর কেন্দ্রকটি হয়ে যায় নিউট্রন তারা। কারণ এই তারাগুলির অধিকাংশ উপাদানই নিউট্রন। একটি নিউট্রন তারার ভর হয়ত সূর্যের দ্বিগুণ, কিন্তু তার ব্যাস হয়তো 15 বা 20 কিলোমিটার। তত্ত্ব অনুযায়ী সাধারণ নিউট্রন তারার ব্যাস 8 থেকে 10 কিলোমিটার হবে, যদি তার ভর সূর্যের ভরের দ্বিগুণ হয়। এদের ঘনত্ব তাই প্রবল। শ্বেতবামনদের ঘনত্বের প্রায় 100 কোটি [10^9] গুণ ঘনত্বসম্পন্ন হতে পারে কোনও নিউট্রন নক্ষত্র। আগেই বলেছি, লুব্ধক-খ শ্বেতবামনটির ঘনত্ব 35 কিলোগ্রাম প্রতিঘন সেন্টিমিটারে৭ এই অনুপাতে একটি নিউট্রন নক্ষত্রের ঘনত্ব 3.5 কোটি [3.5×10^7] মেট্রিক টন হবে। কোন কোনও নিউট্রন নক্ষত্রের ঘনত্ব এরও বেশি হতে পারে।

দূরবীনে নিউট্রন তারাদের দেখা পাওয়া খুবই দুরূহ। কম বিকিরণের ক্ষুদ্র আকৃতির এই নক্ষত্রদের ধরতে পারা মুশকিল। দূরবীনে এদের বিন্দুর মতই দেখায়। এদের চিহ্নিত করা হয় অণুতরঙ্গের [Microwave] সাহায্যে বেতার দূরবীনে [Radio-telescope]। টমাস গোল্ড প্রমাণ করেছেন পালসার শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি নিউট্রন নক্ষত্র। এদের তীব্র চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। এরা নিজের অক্ষে প্রবল বেগে ঘোরে। এদের চৌম্বক অক্ষ এবং আবর্তন অক্ষ এক নয়। এখন জানা গেছে 1054 সালের সুপারনোভার ফলে যে নিউট্রন তারাটি জন্ম নিয়েছে সেটি একটি পালসার। জন্মলগ্ন থেকেই এটি পালসার। জন্মের প্রথম দিকে এটি নিজের অক্ষের উপর সেকেন্ডে 700 বার ঘুরতো, এখন তা মাত্র 30 বারে নেমে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পালসারগুলি তাদের থেকে বিভিন্ন শক্তি নির্গত করে বলেই তাদের ঘূর্ণন বেগ ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসে। কর্কট নীহারিকা থেকে যে পরিমাণ রঞ্জন রশ্মি [X-ray] আসে তার শতকরা 10 থেকে 15 ভাগই আসে ওই পালসারটি থেকে। কর্কট নীহারিকায় ওই একটিমাত্র পালসার বা নিউট্রন তারা এ অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পালসারগুলি এক-একটি অতিঘন নিউট্রন নক্ষত্র। সুপারনোভার বিস্ফোরণের মুহূর্তে নক্ষত্রটির কেন্দ্রকটি এক প্রচণ্ড সংকোচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সংকোচনের ফলে তারাটি অসাধারণ দ্রুতগতিতে নিজের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। কর্কট নীহারিকার পালসারটির মতো তরুণ পালসার বা নিউট্রন নক্ষত্র থেকে কিছু দৃশ্য আলোও আসে। এরপর পালসারের ঘূর্ণন বেগ কমে গেলে ওই দৃশ্য আলোক রশ্মির কম্পাঙ্ক এবং শক্তি দুই-ই হ্রাস পায়। তখন ওই দৃশ্য-আলো অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু পালসারগুলি যথানিয়ম অণুতরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গ নির্গত করে যেতে থাকে। প্রায় প্রতিটি সুপারনোভার কেন্দ্রে একটি

করে নিউট্রন নক্ষত্র আছে, যদি ওই সুপারনোভার বিস্ফোরণ পরবর্তী কেন্দ্রকের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি হয়। যে সব নোভা বা সুপারনোভার কেন্দ্রকের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণ বা তার কম, তাদের কেন্দ্রকগুলি শ্বেতবামন হবে।

চিত্র ঃ 6
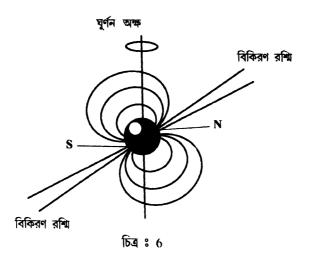
● নিউট্রন তারা বা পালসারের তত্ত্বীয় মডেল। তারাটির ঘূর্ণন-অক্ষ এবং চৌম্বক-অক্ষ এক নয়। তারাটি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দুটি চুম্বক-মেরু থেকে রশ্মি নির্গত হয় লাইট হাউসের [Light House] সার্চলাইট থেকে যেমন আলো বের হতে থাকে অনেকটা সেইভাবে। চৌম্বক মেরু আমাদের দিকে বা পৃথিবীর দিকে থাকলে তবেই আমরা ওই নিউট্রন তারাটির সন্ধান পাই। ●

আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বলেছিলেন ঃ কোনও বিপুল বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রে অভিকর্ষ শক্তি যদি চরম প্রবল হয়ে ওঠে তবে ওই বস্তুপিণ্ড সংকুচিত হতে হতে একটি বিন্দুর মতো অবস্থায় পৌঁছাবে, যে অবস্থায় তার ঘনত্ব হবে অসীম এবং তার আয়তন হবে শূন্য [Infinite Density and Zero Volume]। এই তত্ত্ব অনুসরণ করে 1939 সালে ওপেনহাইমার বললেন যে, সৌরভরের 50-70 গুণ ভারী কোন নক্ষত্রের মহাকর্ষ বা তার নিজ অভিকর্ষ এত তীব্র হবে যে নক্ষত্রের নিউক্লীয় শক্তিও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সৌরভরের 1.4 গুণ ভর বিশিষ্ট কিংবা তাঁর চেয়ে কম ভরের নক্ষত্রগুলি তাদের বিবর্তনে এক সময় যেমন শ্বেতবামন হবে, তেমনি এর উপরে সর্বোচ্চ 3.2 গুণ অবধি সৌরভরবিশিষ্ট নক্ষত্রেরা হতে পারে নিউট্রন নক্ষত্র তাদের জীবন শেষে। অর্থাৎ 1.4 গুণ সৌরভর থেকে 3.2 গুণ সৌরভর পর্যন্ত থাকা নক্ষত্রেরা নিউট্রন নক্ষত্র হয়। 3.2 গুণ সৌরভরের এই সীমাকে বলা হয় 'ল্যান্‌ডাউ সীমা' [Landau Limit]।

এতাবৎ যত নিউট্রন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সর্বোচ্চ ভর সৌরভরের 3.2 গুণের বেশি নয়। তাদের ভর 1.5 গুণ সৌরভর থেকে 3.2 গুণ সৌরভরের মধ্যেই। শ্বেতবামন লুব্ধক-খ-এর ভর সূর্যের সমান হলেও আয়তনে তা সূর্যের আয়তনের তিরিশ ভাগের এক ভাগ। তাই তার পৃষ্ঠ মহাকর্ষ সূর্যের পৃষ্ঠ মহাকর্ষের 900 গুণ। সূর্যের মত ভরের কোনওঁ নিউট্রন নক্ষত্রের আয়তন যদি তার লক্ষ ভাগের একভাগ হয় তবে ওই নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠ মহাকর্ষ হবে 10^{10} গুণ। এরকম নক্ষত্রে পদার্থের মুক্তি বেগ হবে আলোর গতিবেগের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। একটা তুলনামূলক মুক্তিবেগ [Escape Velocity] নীচের তালিকায় দেওয়া হল ঃ

গ্রহ বা নক্ষত্র	মুক্তিবেগ কিমি/সেকেন্ড	আলোর বেগের কত শতাংশ
পৃথিবী	11.2	0.00373%
বৃহস্পতি	60.5	0.020%
সূর্য	617	0.20%
লুব্ধক-খ	3400	1.1%
নিউট্রন নক্ষত্র	200000	67%

এখন অবধি নিউট্রন নক্ষত্র বা পালসারদের ভর সূর্যের ভরের 3.2 গুণের বেশি দেখা যায় নি। এদের সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব পাওয়া গেছে 10^{14} গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে বা 10 কোটি মেট্রিক টন / ঘন সেন্টিমিটার। নিউট্রন নক্ষত্র তার সব শক্তি খরচ করে ফেলে এক সময় কৃষ্ণ নিউট্রন নক্ষত্রে [Black Neutron Star] পরিণত হবে। তখন এই মৃত নক্ষত্র কৃষ্ণবামন বা কোনও বিকিরণ ছাড়াই অনেকটা নিষ্প্রাণ গ্রহদের মত মহাবিশ্বের আঙিনায় অবস্থান করবে। আগেই বলেছি, শ্বেতবামনদের পৃষ্ঠ তাপ যতই কমতে থাকে, তাদের বিকিরণের মাত্রও তত কমতে থাকে। বিকিরণহীন শ্বেতবামন তখন কৃষ্ণবামনে পরিণত হয়। মহাবিশ্বে এগুলি গ্রহদের মতই নিষ্প্রভ হয়ে অবস্থান করে।

যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 3.2 গুণের বেশি, তারা তাদের নক্ষত্র-জীবনের শেষ পর্যায়ে এক অদ্ভুত অবস্থায় আসে। আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন প্রায় সেইভাবেই এগুলি বিন্দুবৎ হয়ে যায়, যাদের বলা হয় অনন্যতা [Singularity]। অনেকে বলেছেন মহাবিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে এক অনন্যতা থেকে এবং একদিন আবার সে তার আদি অনন্যতায় ফিরে যাবে। এ নিয়ে আগেই অনেক কথা বলা হয়েছে।

ল্যানডাউ-সীমার উপরে থাকা নক্ষত্রগুলির শেষের দিকে অবস্থায় তাদের নিউক্লীয় শক্তি আর নিজেদের মহাকর্ষীয় সংকোচন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই তারা নিউট্রন নক্ষত্রের অবস্থায় আসবে না বা শ্বেত বামনও হতে পারবে না কোনদিন। মহাকর্ষীয় সংকোচনে তার আয়তন ক্রমশঃ কমতে থাকবে। সূর্যের 50-60 গুণ ভরের কোনও বিশাল নক্ষত্র সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর যদি এমন একটি অবশেষ রেখে যায়, যার ভর চন্দ্রশেখর সীমার কিংবা ল্যানডাউ সীমার মধ্যে, তবুও ওই অবশেষ থেকে শ্বেতবামন বা নিউট্রন তারা তৈরি হতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তার আবাধ সংকোচন চলবে, আয়তন কমতে থাকবে ঘনত্ব বাড়বে। যে নক্ষত্রে এই প্রক্রিয়া একবার শুরু হয় বিকিরণের ফলে তার ভর কমে এক সময় তা চন্দ্রশেখর সীমায় চলে এলেও তার মহাকর্ষীয় সংকোচন বন্ধ হবে না। ক্রমশঃ তা নিউট্রন নক্ষত্রের চেয়েও ছোট হয়ে যাবে। তার পৃষ্ঠ মহাকর্ষ বেড়ে তার থেকে মুক্তিবেগ [Escape Velocity] বেড়ে যাবে এবং তা হয়ে যাবে আলোর গতিবেগের সমান। তার থেকে আলো আর বের হতে পারবে না। তারও পরে তার থেকে আলোও আর বের হতে পারে না। তখন ওই বিশাল নক্ষত্রটি হয়ে যাবে 'কৃষ্ণগহ্বর' [Black Hole]।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের বছর দুয়েক পরে কার্ল সোয়ার্জচাইল্ড [Karl Schwarzschild] দানব নক্ষত্রগুলির শেষ দশায় মহাকর্ষজনিত সঙ্কোচনের একটা প্রাথমিক গাণিতিক ছক তৈরি করেন। তিনি বললেন, 14 লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসের আমাদের সূর্য যদি কোনও দিন কৃষ্ণগহ্বর হয়, অবশ্য তা কখনও হবে না, কারণ সূর্যের ভর চন্দ্রশেখর সীমার মধ্যেই আছে; তবে এমন একটা সময় আসবে যখন তার ব্যাস হবে তিন কিলোমিটার মাত্র। এরপর এর সংকোচন আর থামবে না এবং সূর্য শেষ পর্যন্ত একটা বিন্দু হয়ে যাবে। সূর্যের ক্ষেত্রে চরম ধসের আগের মুহূর্তের যে ব্যাসার্ধ তাকে বলা হয়

সৃষ্টির প্রথম ছবি

তৈরী হচ্ছে গ্যালাক্সি

1370 কোটি বছর

চিত্র 4
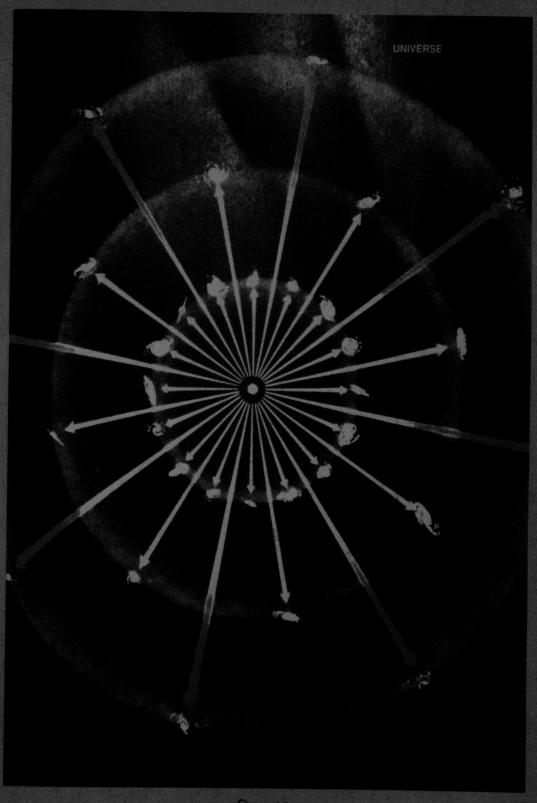
চিত্র ঃ 11

মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ

চিত্র ঃ 12

হঠাৎ দেখলে মনে হবে বিশাল বিশাল পাহাড়, পর্বত শিখর কিংবা স্তম্ভ। আসলে এগুলি অতিশীতল মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণা। ছড়িয়ে আছে 50 আলোকবর্ষ জায়গা জুড়ে ক্যাসিওপিয়া [Cassiopia] নক্ষত্রপুঞ্জে। পৃথিবী থেকে এই পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় 7500 আলোকবর্ষ। ধরা পড়েছে নাসার স্পিৎজার স্পেস দূরবীনে। পাহাড়ের মাঝে উঁকি দিচ্ছে সাদা, হলুদ নক্ষত্র। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরি হয়েছে অভ্যন্তরীণ একটি তারকা থেকে, যেটি আয়তনে আমাদের সূর্যের 10 গুণ। ছবিতে এই তারকাটি দেখা যাচ্ছে না। তবে ধুলো ও গ্যাসের আঙুলাকৃতি থামগুলি নাকি সেই তারকাটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

চিত্র ঃ 13
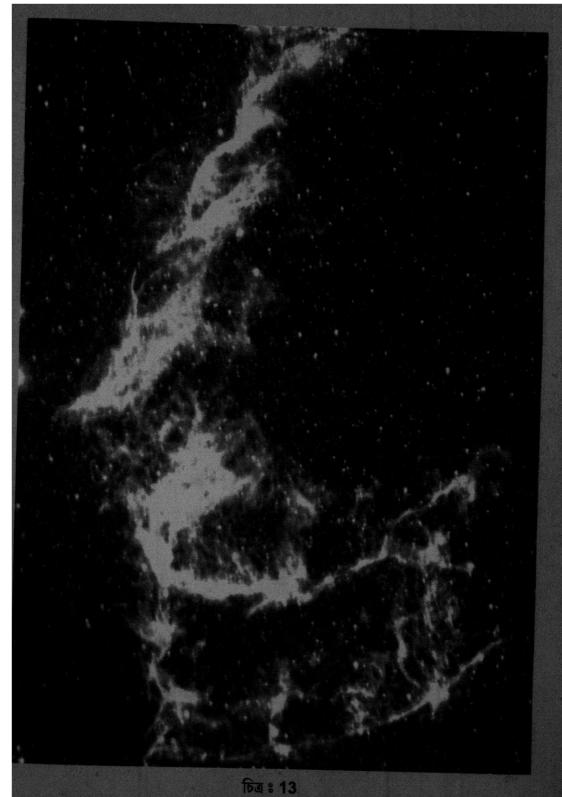
ছায়াগ্নি নক্ষত্রমণ্ডলীতে [Cygnus Loop] 15,000 বছর আগে ঘটে যাওয়া এক বিস্ফোরণ। এটি ঘটেছিল 2500 আলোকবর্ষ দূরে। এটি 'ভেল নীহারিকা' [Veil Nebula] নামে পরিচিত। 60,000° K - তে গ্যাসীয় জ্বলনের দৃশ্য

চিত্র ঃ 14
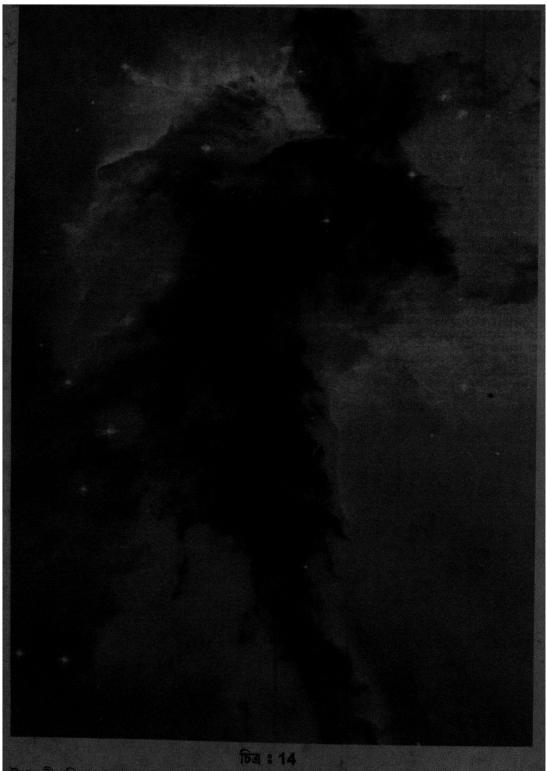
ঈগল নীহারিকার [Eagle Nebula] ছবি। নাসার হাবল মহাকাশ দূরবীন দিয়ে তোলা। মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণার সমাহার এই নীহারিকাটি দেখতে পাখির মত। তাই এর এমন নামকরণ। এর উত্থিত মিনারটি 9.6 আলোকবর্ষ বা 57×10^{12} মাইল দীর্ঘ। এখানে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। ওই মিনারটি যেন নক্ষত্রদের আঁতুড়ঘর কিংবা Incubator

চিত্র ঃ 15
কন্যা রাশির নক্ষত্রপুঞ্জের দানব-ব্রহ্মাণ্ড [Galaxy] - M87

চিত্র ঃ 17

কৃষ্ণ-চক্ষু ব্রহ্মাণ্ড [Black-eye Galaxy]

চিত্র : 18
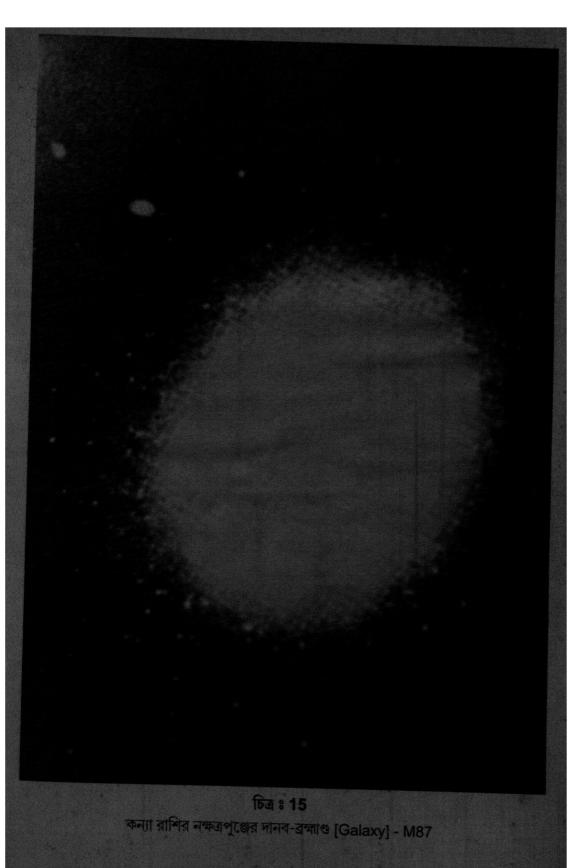
অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী [M31]। প্রায় 22 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত
এই ব্রহ্মাণ্ডটির ব্যাস প্রায় 1,60,000 আলোকবর্ষ

চিত্র ঃ 19
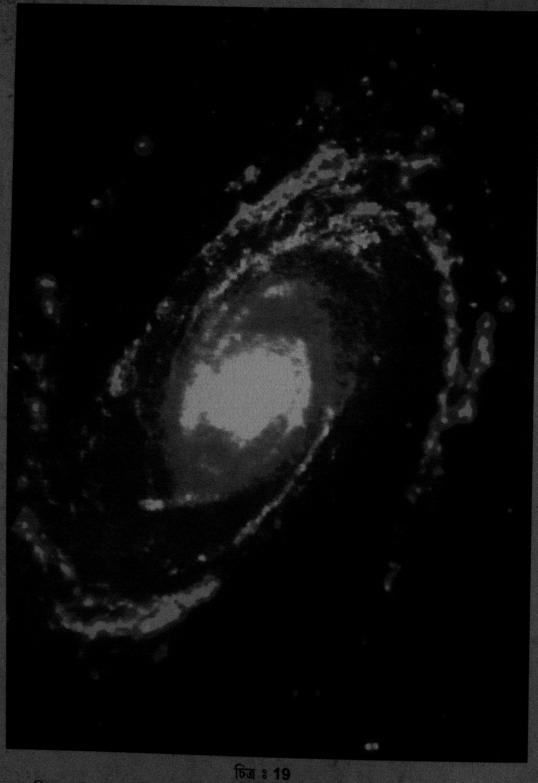
মেসিয়ার 81 [Messier 81] গ্যালাক্সী। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে এটিকে মহাকাশে দেখা যায়। শঙ্খবৃত্তাকার এই ব্রহ্মাণ্ডটি অনেকটা আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মত। এটি পৃথিবী থেকে এক কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত
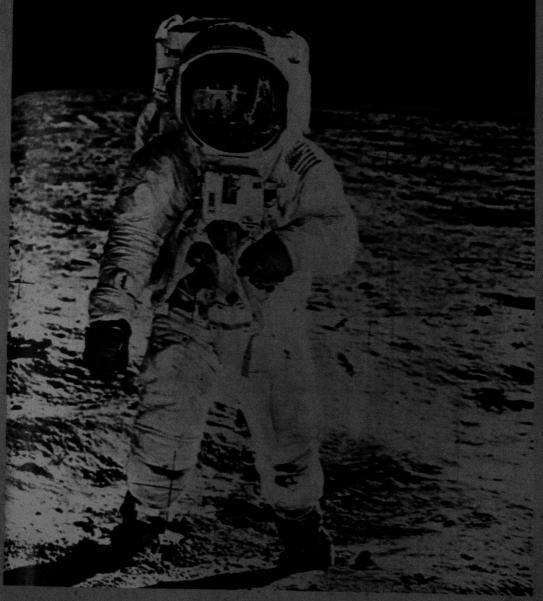
চিত্র ঃ 20

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদচারণা ঃ 20শে জুলাই, 1969 খ্রিস্টাব্দ

চিত্র ঃ 22

দশ দিনের মহাকাশ ভ্রমণ সেরে আনাউশে আনসারী উত্তর কাজাখস্তানের অবতরণ কেন্দ্রে এসে নামেন 2006 সালের 29 শে সেপ্টেম্বর ভোর 5টা 15 মিনিট নাগাদ

চিত্র ঃ 23

'গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' [Large Magellanic Cloud] গ্যালাক্সী। এটি স্থানীয় বর্গ [Local Group]-এর অন্তর্গত। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় 1,70,000 আলোকবর্ষ। এর ব্যাস 25,000 থেকে 30,000 আলোকবর্ষ

চিত্র ঃ 24
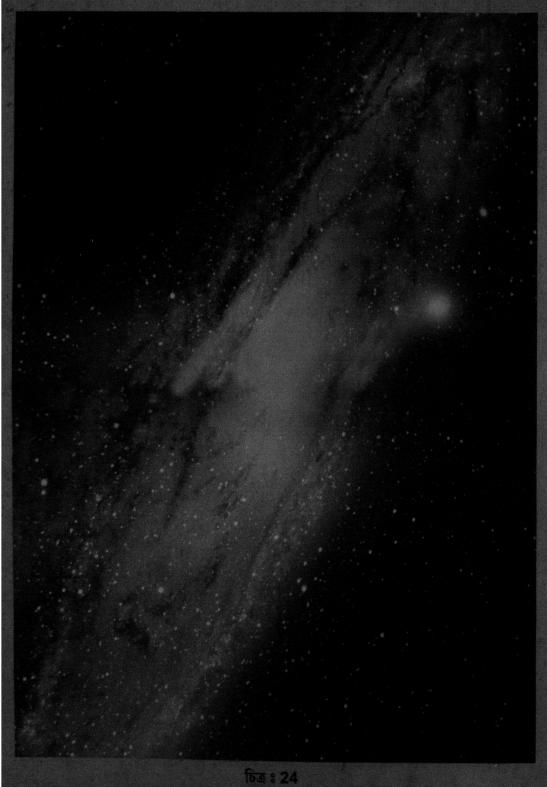
অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী [M31, NGC 224]। হিন্দু পুরাণের 'রূপক' কিংবা 'দেবযানী' ব্রহ্মাণ্ড। দূরত্ব 22 লক্ষ আলোকবর্ষ। ব্যাস 1,60,000 আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম প্রতিবেশী। এর দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষও বলা হয়েছে কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইয়ে

চিত্র ঃ 26

অশ্লেষা [Hydra] নক্ষত্রপুঞ্জের শঙ্খবৃত্তাকার গ্যালাক্সী [M83]। এর নীহারিকা অঞ্চল থেকে নতুন তারা উৎপন্ন হচ্ছে। প্রচুর নীল রঙের নবীন তারার সমারোহ এই গ্যালাক্সীতে। দূরত্ব 1.5 কোটি আলোকবর্ষ।

'সন্ধি ব্যাসার্ধ' [Critical Radius]। এটিকে 'সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ' [Schwarschild Radius] ও বলা হয়। সূর্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাসার্ধ তিন কিলোমিটার। আবারও বলি, সূর্য কখনও কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে না; হবে একটি শ্বেতবামন এবং আরও পরে একটি কৃষ্ণবামন [Black Dwarf]। সন্ধি-ব্যাসার্ধ নিয়ে যে বৃত্ত হয় তার পরিধিই হল কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্ত [Event Horizon]। ঘটনাদিগন্তের ওদিকে ঘটনা নেই, সেই সময়, নেই কোনও জাগতিক নিয়ম।

কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনও পদার্থই এমন কি আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ কৃষ্ণগহ্বরের মুক্তিবেগ আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যায়, যা এক কাল্পনিক গতিবেগ। কৃষ্ণগহ্বর থেকে যেহেতু কোনও কিছুই বেরিয়ে আসতে পারছে না, তাই একে দেখা যায় না। এর নাম তাই 'কৃষ্ণগহ্বর'। আলো বা অন্য কোনও বিকিরণ বেরনোর আগেই তার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। ঘটনা দিগন্তের মধ্যে এই সব অবাস্তব ঘটনা ঘটবে। ঘটনা দিগন্তের বাইরে আবার সবকিছুই স্বাভাবিক।
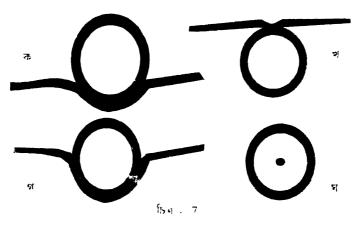
চিত্র : 7

● দানব নক্ষত্র সুপারনোভা হওয়ার পর তার কেন্দ্রকের কৃষ্ণগহ্বরে সংকুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ কালের বক্রতা বৃদ্ধি। (ক) অতিদানব কেন্দ্রকের চারদিকে দেশ বা মহাকাশের বক্রতা। (খ) সংকুচন পিণ্ডটির চারদিকে মহাকাশের বক্রতা বৃদ্ধি। (গ) সংকোচনটি সন্ধি ব্যাসার্ধ বা সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধে পৌঁছে গেছে। দেশ-কাল ক্ষেত্র মুচড়ে গিয়ে এর চারদিকে একটা বাধা-গোলক সৃষ্টি করেছে। এই প্রাচীরকে বা ঘটনা দিগন্ত ভেদ করে আলোকরশ্মি পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। (ঘ) ঘটনা দিগন্তের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত বস্তু ও শক্তি চরম সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রকের আকৃতি বিন্দুবৎ হতে চলেছে ●

পৃথিবী থেকে 6000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত সিগনাস বা ছায়াগ্নি নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি জুড়ি তারার একটি প্রায় কৃষ্ণগহ্বর হয়ে গেছে। তার জুড়ি নীল নক্ষত্রটি কৃষ্ণগহ্বরের অস্বাভাবিক মহাকর্ষের চাপের টানে ডিমের আকারে বিকৃত হয়ে পড়েছে [চিত্র : 9 দেখুন]। এই টানে বাইরের বস্তুপুঞ্জ কৃষ্ণ বিবরটিকে ঘিরে যে বলয় তৈরি করেছে, তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক্সরে বিকিরণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'উহুরু' ধরতে পেরেছে।

আর একটি কৃষ্ণগহ্বরের হদিশ পাওয়া গেছে 1,70,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত 'বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' নামক ব্রহ্মাণ্ডে। কানাডা এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদল মিলে এটিকে চিহ্নিত করে ফেলেছেন। এর জুড়ি তারাটির এর সঙ্গে ব্যবধান 10 লক্ষ মাইল। কৃষ্ণগহ্বরটির ভর সৌরভরের প্রায় 10 গুণ।

আগেই বলেছি, 87A সুপারনোভারও উৎস 'বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ'।
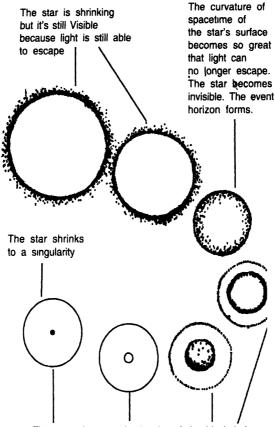
চিত্র ঃ ৪

● কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি ●

1969 সালে পেনরোজ [Roger Penrose] প্রথম ইঙ্গিত দেন যে, আবর্তনরত কৃষ্ণগহ্বর কিছুটা শক্তি বিকিরণ করে। পরবর্তীকালে পেনরোজ ও হকিং [Stephen W. Hawking] কৃষ্ণগহ্বরের আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কৃষ্ণগহ্বর গড়ে উঠার শেষ পর্যায়ে তার অভিকর্ষশক্তি শুধু বস্তুকে নয় সমস্ত রকম শক্তিকেও গ্রাস করে নেয়। ঘটনাদিগন্তের ওপারে পৌঁছে গেলে সে অঞ্চল থেকে আলো কিংবা গামারশ্মিও [γ -rays] আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, তার কাছাকাছি এলাকা থেকে যদি কোনও বস্তুপুঞ্জ ওই কৃষ্ণগহ্বরের দিকে ধাবিত হয়। তখন অভিকর্ষজনিত প্রচণ্ড ত্বরণের ফলে ওই চলমান বস্তুকণাগুলি থেকে তীব্র এক্সরে নির্গত হয়। এই

এক্সরে পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করা যায়। তবে অনেক সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই বিকিরিত এক্সরে দূরবীনে যথাযথভাবে আসতে পারে না। 'হাবল টেলিস্কোপ', যা মহাকাশে স্থাপিত, এই ধরনের বিকিরণের সন্ধান পেতে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা-দিগন্ত আয়তনে বাড়লে তার 'এনট্রপি'-ও [Entropy] বাড়ে। এনট্রপি থাকলে কৃষ্ণগহ্বরের উষ্ণতারও নির্দিষ্টমান থাকবে। কৃষ্ণগহ্বরের তাপ বিকিরণও থাকবে। এর আগে কৃষ্ণগহ্বরের বিকিরণ হয় না বলেই ধারণা ছিল। পেনরোজ-হকিং কৃষ্ণগহ্বরের বিকিরণের কথা বললেন। হকিং বললেন, সৌরভরের 10 বা 15 গুণ ভারী নক্ষত্রই যে শুধু কৃষ্ণগহ্বর হবে তা নয়, দু'-এক কিলোগ্রাম ভরও অতি উচ্চচাপে সংনমিত হয়ে কোটি কোটি স্বাভাবিক ক্ষুদে কৃষ্ণগহ্বর উৎপন্ন হতে পারে। তখন এই সব ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বরের আকার একটা প্রোটনের মত হবে, তবু তা নিজস্ব মহাকর্ষে কৃষ্ণগহ্বরই থাকবে। হকিং আরও জানালেন, পার্থিব জগতে এ ধরনের ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও, সৃষ্টির আদিকালে তেমন কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেছেন, মহাবিস্ফোরণের প্রায় 10^{20} সেকেন্ডের মধ্যে তৈরি হয়েছে এই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর। মহাবিশ্বের এক ঘন আলোকবর্ষ আয়তনে এরকম 10 কোটি [10^8] ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে। হকিংয়ের মতে, কৃষ্ণগহ্বর তার শক্তি বিকিরণ করতে করতে এক সময় মহাকর্ষ যখন তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তখন উচ্চশক্তির গামারশ্মি বিকিরণের ফলে কৃষ্ণগহ্বরের বিস্ফোরণ ঘটবে।
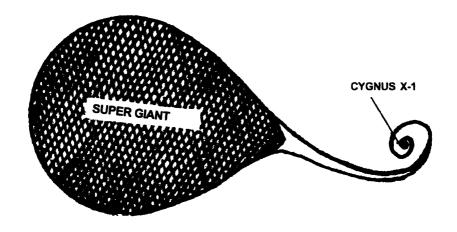
চিত্র : 9

● Cygnus X-1 খুব সম্ভব একটি ব্ল্যাক হোল। এর প্রচণ্ড অভিকর্ষের টানে পাশের মহাদানব নক্ষত্রটির গড়ন খানিকটা তুবড়ে গেছে, আর একটি বস্তুস্রোত তারাটির থেকে প্রচণ্ড ভরসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বরটির দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ●

বড় বড় নক্ষত্রের থেকে তৈরি কৃষ্ণগহ্বরের এতাদৃশ বিস্ফোরণে দীর্ঘ সময় লাগবে। এমন কি আমাদের সূর্য যদি কৃষ্ণগহ্বর হত তবে তার বিস্ফোরণে সময় লাগতো। 10^{66} বছর। প্রোটনের আয়তনের একটি ক্ষুদে কৃষ্ণবিবর বা কৃষ্ণগহ্বর ওজনে 100 কোটি টন হলে সে মাত্র 1000 কোটি [10^{10}] বছরে বিস্ফোরিত হবে। এ রকম বিস্ফোরণে প্রায় 6000 মেগা-ওয়াট শক্তির উদ্ভব হবে। আবার এ রকম একটা ক্ষুদে কৃষ্ণগহ্বর পৃথিবীতে নিয়ে এলে তা বুলেটের মত পৃথিবী এফোঁড়-ওফোঁড়

করে বেরিয়ে যাবে। মনে করা হয়, মহাবিশ্বের প্রতি ঘন আলোকবর্ষে একশো বছরে এ রকম দুটির বেশি বিস্ফোরণ ঘটে না। ক্ষুদে কৃষ্ণগহ্বরের এই তত্ত্ব থেকে সৃষ্টিকালীন মহাবিস্ফোরণের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণগহ্বরগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল ঃ (1) নাক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর [Stellar Black Hole], (2) ক্ষুদ্রাকার কৃষ্ণগহ্বর [Premordial Black Hole] এবং (3) অতিগুরুভার কৃষ্ণগহ্বর [Supermassive Black Hole]। নাক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর উৎপন্ন হয় সেই সব নক্ষত্রের শেষ দশায়, যেসব নক্ষত্রের ভর ল্যানডাউ সীমার উপরে থাকে। অর্থাৎ কোনও নক্ষত্রের ভর সৌরভরের 3.2 গুণের বেশি হলে ওই নক্ষত্রটি তার বিবর্তনের অন্তিম দশায় একটি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। সুতরাং ল্যানডাউ সীমার চেয়ে বেশি ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রেরা একসময় হয়ে যায় কৃষ্ণগহ্বর। এগুলি নাক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর। এগুলি ইলেকট্রন এবং নিউট্রনের অপজাত চাপকে প্রতিহত করে ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকে এবং এক সময় সন্ধিব্যাসার্ধে পৌঁছে যায়। এরপর আরো সংকুচিত হয়ে হয়ে যায় কৃষ্ণগহ্বর। এই জাতীয় কৃষ্ণগহ্বর নাক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর নামে কথিত হয়। এরা নাক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর শ্রেণীভুক্ত।

হকিং এক ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের কথা বলেছেন যেগুলি সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিস্ফোরণের সময়, যাদের কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। এগুলির ভর পৃথিবীর মত কিংবা তার চেয়ে কম হতে পারে। কৃষ্ণগহ্বর অবস্থায় এগুলির ব্যাস এক সেন্টিমিটার বা তারও কম হতে পারে। আগেই বলেছি, এগুলির আয়তন একটি প্রোটনের মত ছোট হতেও পারে। এদের ক্ষেত্রে আপেক্ষকীয় বলবিজ্ঞানের জায়গায় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানই অধিকতর প্রযোজ্য হয়। এই কৃষ্ণগহ্বরগুলি থেকে ধারাবাহিকভাবে শক্তি বিকীর্ণ হতে থাকে। ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে এগুলি থেকে বেরিয়ে আসে বিকিরণ। এই বিকিরণকে বলা হয় 'হকিং বিকিরণ' [Hawking Radiation]। এই ক্ষুদ্রাকার কৃষ্ণগহ্বরগুলি খুবই উত্তপ্ত হতে পারে এবং দূর থেকে এগুলিকে 'শ্বেতগহ্বর' হিসাবেই দেখা যাবে। এই 'শ্বেতগহ্বর' [White Hole] হল বিপ্রতীপ সময়ে [Time Reversal] কৃষ্ণগহ্বরের বিপরীত। এদের কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। এই কৃষ্ণগহ্বরগুলি থেকে যেহেতু শক্তি ধারাবাহিকভাবে নির্গত হয়, তাই এরা শ্বেতগহ্বর হিসাবেই প্রতীয়মান হয়।

অতি গুরুভার কৃষ্ণগহ্বরগুলির ভর সৌরভরের 10 কোটি গুণও হতে পারে। 3.2 সৌরভরের উপরের সৌরভরবিশিষ্ট নক্ষত্রগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয় তাদের নক্ষত্রজীবনের শেষ পর্যায়ে। এই সব কৃষ্ণগহ্বরেরা ব্রহ্মাণ্ডদের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বলে অনুমান করা হয়, বিশেষ করে 'Active Galactic Nucleus'-এর কেন্দ্রস্থলে। কোয়াসার [Quasar] হল এই ধরনের কৃষ্ণগহ্বরগুলির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনে করা হয়, আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলেও একটি অতি গুরুভার কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু একটি সাধারণ গ্যালাক্সী।

একটি কৃষ্ণগহ্বরের জীবনকাল [Lifetime] তার ভরের ঘনফলের সমানুপাতিক। নাক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বরগুলির জীবনকাল মোটামুটি 10^{67} বছর। আবার মহাবিস্ফোরণের পরে যে সব ক্ষুদ্রাকার কৃষ্ণগহ্বর বা শ্বেত গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির বেশ কিছুই শূন্যে মিলিয়ে গেছে, যদিও মহাবিস্ফোরণের বয়স মাত্র 2000 কোটি [2×10^{10}] বছর। কোন কোন কৃষ্ণগহ্বর ঘূর্ণায়মান, কোনটা আবার ঘুরছে না। ঘূর্ণনহীন কৃষ্ণগহ্বরের কোনও তড়িতাধান থাকে না। কিন্তু ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বর তড়িতাধানযুক্ত। আবার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। রেইজনার-নর্ডস্ট্রোউম [Reissner-Nordström] কৃষ্ণগহ্বর ঘূর্ণনহীন হলেও তার তড়িতাধান রয়েছে।

কোনও ঘূর্ণনহীন সোয়ার্জচাইল্ড কৃষ্ণগহ্বরের ভর M হলে, তার ব্যাসার্ধ হবে r এবং

$$r = 2G\frac{M}{C^2}$$

যেখানে, G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক,
M = কৃষ্ণগহ্বরের ভর,
C = আলোর গতিবেগ।

আগেই বলেছি, এই ব্যাসার্ধ হল 'সন্ধি ব্যাসার্ধ'। এই ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকলে তার পরিধিই হল ঘটনাদিগন্ত। এর ভিতরের কোনও ঘটনা ওই ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে বাইরের বিশ্বে আসতে পারে না। এই সন্ধি ব্যাসার্ধ খুবই ছোট এবং আণুবীক্ষণিক যেমন হতে পারে, তেমনি বেশ-বড়সড়ও হতে পারে।

আবার ঘটনাদিগন্তের ওপারে চলে যাওয়া কোন নক্ষত্রের পদার্থের ঘনত্ব যে সব সময় খুবই বেশি হবে তা কিন্তু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনাদিগন্তের অন্তর্গত নক্ষত্র-অবশেষের পদার্থ-ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়েও কম হতে পারে। কোনও বস্তুর ঘনত্ব ওই বস্তুর ভর এবং তার ব্যাসার্ধের ঘনফলের ভাগফলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ,

$$d \propto \frac{m}{r^3}$$

যেখানে, d = বস্তুর ঘনত্ব,
m = বস্তুটির ভর,
r = বস্তুটির ব্যাসার্ধ।

আবার, কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ এর ভরের সমানুপাতিক। এই দুই ঘটনা থেকে পাওয়া যায়, যে ঘনত্বে কৃষ্ণগহ্বরটি তৈরি হচ্ছে তা এর ভরের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ $d \propto \frac{1}{m^2}$, যেখানে d = যে ঘনত্বে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হচ্ছে তা এবং m = ওই কৃষ্ণগহ্বরের ভর। ধরা যাক, কোনও অতিগুরুভার কৃষ্ণগহ্বরের ভর 1000 কোটি [10^{10}] থেকে 10 কোটি [10^8] সৌরভর। এই ভর সম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বর পাওয়া যেতে পারে কোনও ক্রিয়াশীল ব্রহ্মাণ্ডের বা গ্যালাক্সীর কেন্দ্রস্থলে। এই ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় সমান। যদি ওই কৃষ্ণগহ্বরের পুরো গ্যালাক্সীটিই কৃষ্ণগহ্বর হত তবে সে রকম কৃষ্ণগহ্বরের ঘনত্ব হত বাতাসের ঘনত্বেরও কম। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর অতি গুরুভার হলেও তার ঘনত্ব ক্ষেত্রবিশেষে জলের কিংবা বাতাসের ঘনত্বের কম হতে পারে।

2005 সালের 19শে ফেব্রুয়ারী লস এঞ্জেলেসের এক সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে, মহাবিশ্বে কৃষ্ণগহ্বরের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফলে বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। একটি নক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বরের আকর্ষণে সেই গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, বিস্ফোরিত হচ্ছে, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। 18ই ফেব্রুয়ারী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেক্স ফিলিপ্পেনকো জানালেন, "এটি সত্যিই একটি দুর্দান্ত ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট পাওয়া হল 'হোলিগ্রেইল্‌স্'।" একটি শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মি (এক্স-রে) বিস্ফোরণই ঘটনাটির দিকে বিজ্ঞানীদের নজর টেনে নেয়। গ্যালাক্সি আর এক্স জে 1242-11[RX J 1242-11] কেন্দ্রের কাছেই ঘটনাটি ঘটে। ওই নক্ষত্রপুঞ্জকে সহজে দেখা যায় না। বিস্ফোরণের সময় নক্ষত্রপুঞ্জটি পৃথিবী থেকে প্রায় সত্তর কোটি আলোকবর্ষ দূরে ছিল। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ মহল মনে করেন,

ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি নক্ষত্রই কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষেই বিস্ফোরণটি সৃষ্টি হয়। জার্মানিতে মহাজাগতিক পদার্থবিদ্যার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের গুন্থার হেসিনজার বলেন, "কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করার আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া নক্ষত্রটির বিস্ফোরণই রঞ্জন রশ্মি হিসাবে বিকীর্ণ হয়। সেটাই আমরা নিরীক্ষণ করেছি।" বিস্ফোরণের ফলে যে আগুন জ্বলে ওঠে তা নক্ষত্রপুঞ্জের অন্য কয়েক কোটি নক্ষত্রের মিলিত উজ্জ্বলতারও কয়েক হাজর গুণ। ওয়াশিংটন থেকে প্রচারিত নাসার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দেওয়া হয়।

আইনস্টাইন ও রোজেন আরেকটি গহ্বরের কথা বলেছেন যা অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর। তাঁরা বলেছেন, আবর্তনশীল কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থপুঞ্জ সংকুচিত হয়ে অবশেষে অন্যত্র জমে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় অতি অল্প সময়েই পদার্থ কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে চলে যেতে পারে। আমরা জানি, বিশ্বে আলোর গতিবেগ সর্বোচ্চ। কিন্তু আমাদের জাগতিক নিয়ম কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে খাটে না। পদার্থের এ ধরনের চলাচল আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বে সচরাচর ঘটে না। তাই কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থের কোটি কোটি আলোকবর্ষ পথ সামান্য সময়ে অতিক্রম করার ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে। স্বয়ং আইনস্টাইন তেমন সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। এতো দ্রুত চলাচল ঘটতে হলে আমাদের কোন রকম সুড়ঙ্গ বা সেতুর কল্পনা করতে হয়, যা আমাদের পরিচিত সময়ের রীতিনীতি মানে না। তত্ত্ববিজ্ঞানে এই ধরনের দ্রুত চলার পথকে 'আইনস্টাইন-রোজেন সেতু' বা সংক্ষেপে 'ওয়ার্ম হোল' [Worm Hole] বা 'কীটগহ্বর' বলা হয়। কেউ কেউ একে 'কীটবিবর'-ও বলেছেন। কীটগহ্বর মহাবিশ্বের এক বিস্ময়।

কীটগহ্বরের অন্যপ্রান্তে অকল্পনীয় দ্রুততায় চলে যাওয়া এই পদার্থ আত্মপ্রকাশ করে সম্প্রসারিত হবে এবং শক্তি বিকিরণ করবে। কৃষ্ণগহ্বরে যে শক্তি ও ভর আটকে ছিল তা সাধারণ উজ্জ্বল পদার্থের মত হয়ে শক্তি বিকিরণ করবে। এ রকম পদার্থপুঞ্জকে বলা হয় শ্বেত বিবর বা শ্বেতগহ্বর [White Hole]। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, অধুনা আবিষ্কৃত কোয়াসারগুলি [Quasar] ওই শ্বেতগহ্বর। এদের কথায় একটু পরেই আসছি।

মহাবিশ্ব যদি বদ্ধ হয় এবং তার বার বার প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে থাকে তবে তার শক্তির উৎস কোথায়? পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, মহাকাশের বা দেশের প্রসারণে মহাবিশ্বের 'এনট্রপি' ক্রমাগত বেড়ে চলে। সৃষ্টি পরবর্তী পর্যায়ে 'এনট্রপি' বাড়তেই থাকে। তাহলে মহাবিশ্ব কার্যকর শক্তি পায় কোথা থেকে তার নতুন প্রসারণে এবং বারংবার সম্প্রসারণে? এমনও হতে পারে কীট গহ্বরের ভিতর দিয়ে পদার্থের যে উত্তরণ ঘটে তাতেই হয়ত এনট্রপি আবার কার্যকর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্ব তার প্রসারণের শক্তি লাভ করে।

কীটগহ্বর একটা প্রহেলিকা। আমরা জানি প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রের চারপাশের দেশ বা মহাকাশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সেই মহাকাশে [Space] বহুদূরবর্তী দুটি বিন্দুকে একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে যোগ করলে তার দৈর্ঘ্য সমতল অবস্থায় থাকা ওই দুটি বিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তার চেয়ে কম হয়। একটা সমতল কাগজে একফুট দূরে দুটি বিন্দু থাকলে ওই কাগজটিকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে দিলে ওই দুই বিন্দুর মধ্যে প্রকৃত দূরত্ব অনেক কম হয়ে যাবে। এই বাঁকানোটা যত বেশি হবে ওই বিন্দু দুটির প্রকৃত দূরত্ব তত কমে যাবে এবং দেখা যাবে তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়তো এক ইঞ্চিরও কম হয়ে গেছে। পাহাড়ের একদিকের একটি বিন্দু থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে অপর পার্শ্বের বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাতে যে

দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তার থেকে অনেক কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে যদি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে বিপরীত বিন্দুটিতে যাওয়া যায়। এই ধরনের সুড়ঙ্গই কীটবিবর বা কীটগহ্বর। মহাবিশ্বেও রয়েছে এই ধরনের সুড়ঙ্গ। কীটগহ্বর এমনি এক মহাজাগতিক সুড়ঙ্গ বা সেতু, যা মহাশূন্যের বহুদূরের জায়গার দূরত্বকে অনেক কমিয়ে দেয়। এমনও হতে পারে, মহাবিশ্বে দুটি বিন্দুর দূরত্ব স্বাভাবিকভাবে হয়ত কয়েক আলোকবর্ষ, কিন্তু কীটবিবর বা কীটগহ্বর দিয়ে সে দূরত্ব হতে পারে মাত্র কয়েক মিটার। সাধারণভাবে মহাবিশ্বের একটি বিন্দু থেকে অন্য একটি বিন্দুতে যেতে আলোর হয়তো কয়েক বছর লাগে, কিন্তু কীটগহ্বর দিয়ে গেলে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগবে মুহূর্তমাত্র। কীটগহ্বর তথ্যগতভাবে সম্ভব এবং তা বাস্তব। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অন্ততঃ সেই কথাই বলে। তবে এমন কোনও সুড়ঙ্গ এখনও অনাবিষ্কৃত। কিন্তু পরোক্ষ কিছু প্রামাণ যে পাওয়া যায় নি তা নয়।

অনুমান করা হয়, মহাবিশ্বে অনেক কীটগহ্বর আছে যেগুলি সৃষ্টির প্রয়োজনেই তৈরি হয়েছিল। কৃষ্ণগহ্বর তার প্রবল মহাকর্ষে তার চারপাশের নক্ষত্র ইত্যাদিকে অনিবার্যভাবে গ্রাস করে। আলো পর্যন্ত সেখানে আটকা পড়ে যায়। এইসব গ্রাস করা পদার্থ বা শক্তি কি কৃষ্ণগহ্বরেই চিরকাল থেকে যায়? বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'তা হয় না'। দেশকাল বা মহাকাশ-সময়ের বিবর বা সুড়ঙ্গ বেয়ে সেগুলি উদ্গীরিত হয় অন্য কোথাও, আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে কিংবা অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে। মহাবিশ্বের বহু জায়গায় প্রবল শক্তির গামা রশ্মি ও রঞ্জন রশ্মির বিশাল বিকিরণ দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মহাজাগতিক ফোয়ারা [Cosmic Gusher] থেকে অজস্রধারায় বেরিয়ে আসা কোটি কোটি সূর্যের আলোর সমান বিকিরণ ও অন্যান্য রশ্মির প্রচণ্ড নির্গমন সম্ভব হচ্ছে ওই কীটগহ্বরের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থ ও শক্তি স্থানান্তরণের ফলে। এই সব মহাবিকিরণের উৎস হল 'শ্বেতবিবর' বা 'শ্বেতগহ্বর'। কৃষ্ণগহ্বরের গলিত বস্তু এবং শক্তি কীটগহ্বরের মাধ্যমে চালান হয়ে শ্বেতগহ্বর থেকে নির্গত হয়। সুতরাং কীটগহ্বর হল কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বকে অতি সংক্ষিপ্ত করার সংযোগ সেতু বা সুড়ঙ্গ।

কীটগহ্বর বা কীটবিবরকে স্থিতিশীল রাখতে হলে ঋণাত্মক শক্তির একান্ত প্রয়োজন। আবার ঋণাত্মক শক্তির জন্য চাই অপ্রাকৃত বস্তু [Exotic Matter]। সত্যিই কি ঋণাত্মক শক্তি মহাবিশ্বে আছে যা অপ্রাকৃত বস্তু বা পরাপদার্থ [Anti-matter] থেকে উৎপন্ন? বেশ কিছু বিজ্ঞানী ঋণাত্মক শক্তির তত্ত্বীয় প্রমাণ হাজির করেছেন ইতিমধ্যেই। 1940 সালে হেন্‌ড্রিক কাশিমি দুটি পরিবাহী প্লেট খুব কাছাকাছি সমান্তরালে রেখে দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি খুবই সামান্য। ঋণাত্মক শক্তির প্রভাবে এটা হয় বলে মনে করা হয়। এই ঘটনাকে বলা হয়েছে 'কাশিমি-প্রভাব'। 1993 সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ পরীক্ষা করে ওই আকর্ষণী শক্তির পরিমাপও করে। ঋণাত্মক শক্তি তাই অলীক কল্পনা নয়, এটা বাস্তব। তবে সরাসরি আমরা এটিকে দেখতে পাই না। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষীয় নিয়ম থেকেই ঋণাত্মক শক্তির তত্ত্বীয় সমর্থন পাওয়া যায়। কৃষ্ণগহ্বরে আলোও বন্দী হয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও সামান্য পরিমাণ শক্তির বিকিরণ ঘটে। যাকে বলা হয়, 'হকিং বিকিরণ'। এই ঘটনায় শক্তির সংজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে হলেও বাস্তবে এটাই সত্যি যে, কৃষ্ণগহ্বর কিছুটা শক্তি বিকিরণ করে, যা ঋণাত্মক শক্তি হতেও পারে। অর্থাৎ হংকি বিকিরণের শক্তিতে ঋণাত্মক শক্তি আছে। তাই কীটগহ্বরের ঋণাত্মক শক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কীটগহ্বর সৃষ্টির জন্য চাই ঋণাত্মক শক্তি। আর সে ঋণাত্মক শক্তি পাওয়া যায় পরা -বস্তু যা অপ্রাকৃত বস্তু থেকে। এক মিটার লম্বা একটা কীটগহ্বর কৃত্রিমভাবে বানাতে লাগবে বৃহস্পতি গ্রহের সমান ওজনের অপ্রাকৃত বস্তু। নানা তত্ত্বীয় গবেষণার পর এখন তত্ত্বীয়ভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, খুব কম ঋণাত্মক শক্তি দিয়েই একটা কীটগহ্বর বানানো যায় যার মধ্য দিয়ে নাক্ষত্রভ্রমণ সম্ভব। তত্ত্বীয়ভাবে কীটগহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও, বাস্তবে তা আবিষ্কৃত হয় নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কীটগহ্বর আছেই এবং তার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থ ও শক্তি বেরিয়ে এসে শ্বেতগহ্বর সৃষ্টি করছে।

কীটগহ্বরের মধ্য দিয়ে নাক্ষত্র ভ্রমণের কল্পনা এখনও স্বপ্নমাত্র। তত্ত্বগতভাবে তা সম্ভব হলেও, এমন কি কৃত্রিম কীটগহ্বর ঋণাত্মক শক্তি দিয়ে বানানো সম্ভব হলেও নাক্ষত্রভ্রমণ অসম্ভব। বাস্তবে, নক্ষত্র, নিউট্রন তারা, নোভা, সুপারনোভা, কৃষ্ণগহ্বর, শ্বেতবামন, কোয়াসার, পালসার, শ্বেতগহ্বর ইত্যাদি নানা বস্তু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মহাকাশ। এদের থেকে নানা মারাত্মক রশ্মিসমূহ বিকিরিত হচ্ছে যেগুলি মারণরশ্মি। এছাড়া আছে, ধূমকেতু, গ্রহাণু পুঞ্জ, নাক্ষত্র ধুলিঝড়, উল্কাস্রোত—এই সব ভয়ংকর বাধা-বিঘ্ন। সুতরাং কীটগহ্বরের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব ওই সব মারাত্মক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে। তবু বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একদিন ঋণাত্মক শক্তি দিয়ে বানানো যাবে কীটগহ্বর বা কীটবিবর এবং মহাবিশ্ব ভ্রমণ সম্ভব হবে। সীমানাহীন মহাবিশ্বের সবটাই হয়তো ঘোরা হবে না একটা মনুষ্য জীবনে। তবে নাক্ষত্র ভ্রমণে অসুবিধা নেই কীটগহ্বরের দাক্ষিণ্যে। মহাকাশে কীটবিবর বা কীটগহ্বর এখনও আবিষ্কার করা যায় নি।

কৃষ্ণগহ্বরে একটি বিশালকায় নক্ষত্রের অবশেষ, বস্তুপুঞ্জ এবং শক্তিসমূহ একটি প্রায় বিন্দুবৎ অবস্থায় সংহত হয়ে আছে। মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণের আগের অবস্থা প্রায় এই রকম ছিল। একটা বিন্দুবৎ অবস্থা, একটা অনন্যতা। ওই অনন্যতার বিস্ফোরণে যেমন মহাবিশ্বের উৎপত্তি, তেমনি কৃষ্ণগহ্বরগুলির বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার ফলে যে পদার্থ ও শক্তির উদ্‌গীরণ হয়, সেই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা অভিহিত করেছেন 'শ্বেতবিবর' বা 'শ্বেতগহ্বর' [White Hole] নামে। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর বিস্ফোরিত হয়ে শ্বেতগহ্বর সৃষ্টি হয়।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে শ্বেতবিবর বা শ্বেতগহ্বর নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে চিন্তাভাবনার শুরু হয়। সেই গবেষণা গত 50 বছরে অনেকটাই এগিয়েছে। 1997 সালের 14ই ডিসেম্বর মহাকাশে একটি বিশাল বিস্ফোরণ দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন GRB 971214। সুপারনোভার এই ভয়াল বিস্ফোরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা শ্বেতগহ্বরের কথা জানতে পারেন। শ্বেতগহ্বর তাই কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। শ্বেতগহ্বর থেকে ঝরনাধারার মত উদ্‌গীরিত হয়, বস্তু ও শক্তি এবং কৃষ্ণগহ্বরের মরণকূপ থেকে মুক্তি পাওয়া জীবনের ধারা।

কৃষ্ণগহ্বর যেন মহাকাশের ডাস্টবিন [Dustbin]। মৃতনক্ষত্র ও তার আবর্জনা সবই তার গহ্বরে গ্রাস করে নিচ্ছে। সবই বন্দী হয়ে যাচ্ছে তার মহাকর্ষের প্রবল বন্ধনে—নক্ষত্র, তার মৃতদেহ, গ্যাস, ধূলিকণা, নানা বিকিরণ, দৃশ্যমান আলো—সবই, সব কিছুই। এই মহাবন্দীত্ব থেকে মুক্তি মেলে শ্বেতগহ্বরে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসে মহাজাগতিক ফোয়ারা [Cosmic Gushers]। শ্বেতগহ্বরে আছে আলো, আছে মুক্তি, আছে প্রসারণ। এই গহ্বরগুলি কৃষ্ণগহ্বরের বিপরীত। তবে শ্বেতগহ্বরের বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থ ও শক্তি কীটগহ্বরের মধ্য দিয়ে গিয়ে শ্বেতবিবর হয়ে ফোয়ারার মত ঝরে পড়ছে, এই তত্ত্ব এখনও যথেষ্ট বাস্তবভিত্তি লাভ করে নি। বহু বিজ্ঞানী এখন কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও তাঁরা কীটগহ্বর এবং শ্বেতগহ্বরের বাস্তব কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

বিজ্ঞানী নারলিকার [J.V.Narlikar] বেশ কিছু গবেষণা করেছেন শ্বেতবিবর নিয়ে। তিনি মেনে নিয়েছেন, শ্বেতগহ্বর কৃষ্ণগহ্বরের একেবারে উল্টো। কৃষ্ণগহ্বর তার চারপাশের সব কিছুকেই উদরস্থ করে। কিন্তু শ্বেতগহ্বর সেগুলিকে উগরে দেয়। দেশকাল বা মহাকাশ-সময়ের তৈরি করা কীটগহ্বর দিয়ে ওই জমে থাকা পদার্থ ও শক্তি শ্বেতগহ্বরে জমে এবং ফোয়ারার মত সেখান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। শ্বেতগহ্বর থেকে তাই বেরিয়ে আসে বন্যার মত শক্তিশালী গামারশ্মির বিকিরণ এবং কোটি কোটি সূর্যের সমান প্রখর আলো। নারলিকার বলেছেন, শ্বেতগহ্বর দেখতে কেমন, তার থেকে কী ধরনের বিকিরণ নির্গত হয়। শ্বেতগহ্বরেরা প্রবল গামারশ্মির উৎস এবং এক্সরে নিঃসারক। এগুলির সঙ্গে কোয়াসারদের প্রচণ্ড মিল। সম্ভবতঃ কোয়াসারগুলি এক একটি শ্বেতবিবর বা শ্বেতগহ্বর। শ্বেতগহ্বর তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণও নিঃসৃত করে। এর বর্ণালি বিশ্লেষণে দেখা যায় 'নীল সরণ' [Blue Shift]। দূর নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোর "লাল সরণ" [Red Shift] যেমন বলছে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি শ্বেতগহ্বরের আলোর ওই নীল সরণ কি বলছে মহাবিশ্ব সংকুচিত হচ্ছে? তবে শ্বেতগহ্বর আছে এমন কথা এখনই জোর গলায় বলা যায় না, যেমন জোর দিয়ে বলা যায় কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কথা। আগেই বলেছি, একটা কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে অতিসম্প্রতি RXJ 1242-11 নক্ষত্রপুঞ্জে। তত্ত্বীয়ভাবে, শ্বেতগহ্বর আজ স্বীকৃত। বিজ্ঞানীদের হিসাব মত বিশ্বের ভর যতটা হওয়ার কথা তার মাত্র এক দশমাংশ [10%] ভরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাকী 90% ভরের অনেকটাই রয়েছে কৃষ্ণগহ্বরগুলিতে। তবুও সবটা মেলে না। শ্বেতগহ্বরগুলি এই হারানো ভরের কিছুটার হদিশ দিতে পারে কি? বিশাল শক্তির উৎস শ্বেতগহ্বর। কৃষ্ণগহ্বরের বিস্ফোরণে অনন্তধারায় গামারশ্মি বিকিরিত হয় এবং প্রকাশিত হয় কোটি কোটি সূর্যের আলো। শ্বেতগহ্বরেরা মুক্ত করে দিচ্ছে কৃষ্ণগহ্বরে জমে থাকা বস্তু ও শক্তি। শুধু সেই পুরাতন প্রশ্নটাই থেকে যায়, কৃষ্ণগহ্বরের গিলে ফেলা এনট্রপিগুলো আবার কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে কি করে? বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, শ্বেতগহ্বর মহাবিশ্বে অবশ্যই আছে এবং অবশ্যই যতদিন বিশ্ব থাকবে ততদিন শ্বেতগহ্বরও থাকবে।

1997 সালের 14ই ডিসেম্বর যে বিস্ফোরণটি পৃথিবীতে দেখা গিয়েছিল তা ঘটেছিল বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে বহুদূরের নক্ষত্রমণ্ডলীতে। পৃথিবীর থেকে প্রায় 1200 কোটি আলোকবর্ষ দূরে ঘটেছিল এই বিস্ফেরণ। স্বাভাবিকভাবেই, এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল 1200 কোটি বছর আগে। আলো সেই বিস্ফোরণ স্থল থেকে যাত্রা শুরু করে 1200 কোটি বছর পরে 1997 সালে পৃথিবীতে এসে পৌঁছালো। এই বিস্ফোরণের নামকরণ করা হয়েছে GRB971214। 1997 সালের 14ই ডিসেম্বর এই বিস্ফোরণটি পৃথিবীতে প্রথম দেখা যায়। এই বিস্ফোরণটি এতোই বড়মাপের ছিল যে, বিজ্ঞানীরা এর ডাকনাম দিয়েছেন Big Bang-II. কারণ বিশ্বসৃষ্টির মহাবিস্ফোরণের [Big Bang] পরে এটাই হল এতাবৎ আবিষ্কৃত সবচেয়ে বৃহৎ বিস্ফোরণ। তাই এর নাম দেওয়া হল বিগ ব্যাঙ-2। সৃষ্টির পরে এতা বড় বিস্ফোরণ আর হয়নি। এই বিস্ফোরণে আমাদের সূর্যের প্রায় 10^{21} গুণ আলো নিঃসৃত হয়। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের 10,000 কোটি নক্ষত্র কয়েকশো বছরেও যে পরিমাণ বিকিরণ নিঃসৃত করতে পারে না, তার চেয়েও অনেক বেশি বিকিরণ নিঃসৃত হয়েছে এই বিস্ফোরণে।

'ভেল নেবুলা' [Veil Nebula] সুপারনোভা বিস্ফোরণে যে পরিমাণ তেজোময় মারণ-রশ্মি উৎপন্ন হয়েছিল প্রায় 15000 বছর আগে, তার অন্ততঃ 100 গুণেরও বেশি তেজোময় মারণরশ্মি উৎপন্ন করেছে ডিসেম্বর মাসে [1997 খ্রিস্টাব্দ] প্রত্যক্ষ করা 1200 কোটি বছর আগেকার ওই বিগ্ ব্যাঙ-

2 বিস্ফোরণ। এই ভয়াল বিস্ফোরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই বিজ্ঞানীরা শ্বেতগহ্বর তত্ত্বে আসেন। বাস্তবে শ্বেতগহ্বর অনাবিষ্কৃত থাকলেও, তত্ত্বগতভাবে শ্বেতবিবর বা শ্বেতগহ্বর আছে মহাবিশ্ব জুড়ে।

প্রায় অধিকাংশ ব্রহ্মাণ্ডের, বিশেষ করে শঙ্খবৃত্তাকার [Spiral] গ্যালাক্সীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে কৃষ্ণগহ্বর। এই সব কৃষ্ণগহ্বরের গ্রাস করা সব বস্তু ও শক্তি একদিন নির্গত হবে শ্বেতগহ্বর দিয়ে। কীটগহ্বরের এক দিকে যেমন কৃষ্ণগহ্বর অপরদিকে তেমনি আছে শ্বেতগহ্বর। শ্বেতগহ্বর মহাজাগতিক ফোয়ারা, প্রবল শক্তির উৎস। আবারও বলি, কৃষ্ণগহ্বর কীটবিবরের মধ্য দিয়ে তার যে পদার্থ ও শক্তি নির্গত করে তাই-ই শ্বেতগহ্বর। শ্বেতগহ্বরে পদার্থ আছে, আছে শক্তি এবং জীবনও। এই জীবন হল কৃষ্ণগহ্বরের বন্দীত্ব থেকে মহামুক্তি। নক্ষত্রমণ্ডলীর উৎস ও তার ভেতরের শক্তি নিঃসরণের কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দুটি ধারণাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এই দুই ধারণা হল—কৃষ্ণগহ্বর ধারণা এবং শ্বেতগহ্বর ধারণা। কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব এখন প্রমাণিত সত্য। শ্বেতগহ্বর এখনও তত্ত্বীয়ভাবে সত্যি হলেও বাস্তবে তা আজও অমিল। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন তাঁরা খুব শিগ্‌গির আবিষ্কার করে ফেলবেন শ্বেতগহ্বর। বানিয়ে ফেলবেন, সেই আইনস্টাইন-রোজেন সুড়ঙ্গ বা সেতু তথা কীটগহ্বর কিছুকালের মধ্যেই। শ্বেতগহ্বরগুলি কোয়াসার কিনা তা একটু খতিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

কোয়াসারগুলি মহাবিশ্বের আরেক বিস্ময়। 1958 সালেই মার্টিন রাইল্ এমন কতকগুলি বিন্দুবৎ বেতারতরঙ্গ উৎস বা Radio Star-এর কথা বলেন, যেগুলো তাঁর ধারণায় ছায়াপথের বাইরে দূর মহাশূন্যে অবস্থিত। বাডে (W. Baade), মিন্কৌস্কি (R. Minkowski), ম্যাথিউস্ (T. Matthews), স্যান্ডেজ (A. Sandage) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্রমশই ধরা পড়তে লাগল যে, ওই রকম প্রত্যেকটি বেতার-উৎসের অবস্থানবিন্দুতে দৃশ্য-আলোর টেলিস্কোপ (Optical Telescope) ফেলে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে, হয় একটি বহুদূরের গ্যালাক্সিকে, নয়তো একটি গ্যালাক্সির চেয়ে অনেক ছোট, অনেকটা তারার আকৃতির একটি বস্তুকে। 1964 সালে হোংইচিউ 3C 48, 3C 147, 3C 196, 3C 286 প্রভৃতি এই ধরনের আধা-নাক্ষত্রিক বেতার উৎসের নামকরণ করেন 'কোয়াসার' [Quasar]। প্রথম প্রথম এগুলিকে বলা হত QSO [Quasi Steller Radio Sources]। পরে দেখা গেল, সব QSO থেকে শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের বিকিরণ হয় না। তখন ওদের মধ্যে যেগুলি শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গের উৎস তাদের নামকরণ করা হয় কোয়াসার। উপরে বলা নক্ষত্রগুলিকে কোয়াসার বললেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হোংইচিউ। 3C 48 হল কেম্ব্রিজের রেডিও নক্ষত্রের তৃতীয় ক্যাটালগ [3C]-এর 48-তম নক্ষত্র। কোয়াসার আমাদের পরিচিত নক্ষত্রদের মত নয়। 1963 সালে মার্টিন স্মিট [Marten Schmidt] লক্ষ্য করেন যে, এদের অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ অতি প্রবল। এরা রয়েছে বহু দূরে। সাধারণ নক্ষত্রের তুলনায় এদের আকার খুবই ছাট। এদের দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। মহাকর্ষীয় লাল সরণের কারণে এদের কিছু দৃশ্য-বিকিরণও ধরা পড়ে স্মিটের পর্যবেক্ষণে। 3C 446 কোয়াসারটির দীপ্তি 48 ঘণ্টায় দ্বিগুণ হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এর থেকে হিসাব করে পাওয়া যায় এই কোয়াসারের ব্যাস 0.005 আলোকবর্ষ বা 4.73×10^{10} কিলোমিটার। এ রকম একটা কোয়াসারের তীব্র বিকিরণ একটা ছায়াপথের মোট বিকিরণের চেয়ে বেশি। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস প্রায় 1,00,000 আলোকবর্ষ। আমাদের এই ছায়াপথের কেন্দ্রাঞ্চলের ব্যাস প্রায় 15000 আলোকবর্ষ। রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইগর নোভিকভ এবং ইজরাইলের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়ুভ্যাল মীম্যান বলেছেন, কোয়াসার হল আসলে শ্বেতগহ্বর। আগেই বলেছি, কৃষ্ণগহ্বরের প্রান্তের কীটগহ্বর দিয়ে তার পদার্থ ও শক্তি কোয়াসারের মত শ্বেত গহ্বর সৃষ্টি করে। তবে কৃষ্ণগহ্বরের শেষ পরিণতি যদি অনন্যতা [Singularity] হয়, তবে শ্বেতগহ্বর কিংবা কোয়াসারের সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক থাকবে। কীটগহ্বর এবং শ্বেতগহ্বর তত্ত্বীয়ভাবে

প্রমাণিত হলেও, বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব আজও পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোয়াসারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত এবং

চিত্র ঃ 16

● কন্যারাশির [Virgo] M-87 গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড। এর কেন্দ্রে থাকা সম্ভাব্য কৃষ্ণগহ্বরের প্রবল আলোড়নে গ্যাসস্রোত নির্গত হচ্ছে জেটের [Jet] আকারে। এই জেটটি থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে এক্সরে বিকিরণ ঘটছে। ●

কোয়াসার যে অনন্য সাধারণ এবং অস্বাভাবিক এক জ্যোতিষ্ক তার প্রমাণ হল 'সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ড' [Seyfert Galaxy]। 1943 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী সেফার্টই প্রথম এ ধরনের ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কার করেন। এতাবৎ প্রায় এক ডজন এই ধরনের গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব ছায়াপথের কেন্দ্রাঞ্চল বেশ ছোট, উজ্জ্বল, বেশ উত্তপ্ত এবং সক্রিয়, অনেকটা কোয়াসারের মত। এদের বেতার বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধি কোয়াসারের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ডগুলির কিংবা নীহারিকাদের কেন্দ্রস্থলগুলি যেন এক একটি কোয়াসার। কেন্দ্রস্থল পুরো ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় আটভাগের একভাগ এবং তার ঔজ্জ্বল্য পুরো ব্রহ্মাণ্ডটির উজ্জ্বলতার অন্ততঃ তিন গুণ। NGC-4151 সেফার্ট গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে মাত্র 12 আলোকবর্ষের ব্যবধানে আছে প্রায় 100 কোটি নক্ষত্র। স্বাভাবিকভাবে নক্ষত্রগুলি খুবই ঠাসাঠাসি করে রয়েছে। প্রায় 113.52×10^{12} কিলোমিটারে 10^9 বা 100 কোটি নক্ষত্র রয়েছে, যা প্রায় অবিশ্বাস্য।

বিজ্ঞানীরা সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ডগুলি নিয়ে নানা গবেষণার পর অধিকাংশই মনে করেন কোয়াসারগুলি শ্বেতগহ্বর। কোয়াসারের দীপ্তির ওই হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবতঃ হয় এইজন্য যে, কীটগহ্বরে কোনও কারণে পদার্থ চলাচলে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তাই কোয়াসারগুলির দীপ্তির ওই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কোয়াসারগুলি আমাদের

খুব কাছাকাছি নেই। তার যেন মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। এগুলি মহাবেগে ক্রমশঃ দূরে যাচ্ছে। কোন কোনটির গতিবেগ 90 হাজার কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে, আবার কোনওটির 2,00,000 কিমি/সেকেন্ড। OQ172 কোয়াসারটির লাল-সরণ দেখে বলা হয় ওই কোয়াসারটি আলোর বেগের 90% গতিবেগে বা. প্রতি সেকেন্ডে 2,70,000 কিলোমিটার গতিবেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কোয়াসারগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে অবিশ্বাস্য দূরত্বে অবস্থান করছে। আবার, যে বস্তুর গতিবেগ যত বেশি সে যেন আমাদের থেকে তত বেশি দূরে রয়েছে। কোয়াসাররা অতি দূরে অবস্থিত হলেও তাদের থেকে যে প্রবল বিকিরণ পৃথিবীতে আসছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। এদের অমিত উজ্জ্বলতা বিস্ময়কর। গ্যালাক্সীদের গড় ব্যাসের হাজার ভাগের একভাগ ব্যাসবিশিষ্ট কোনও কোয়াসার তার ওই গ্যালাক্সীর উজ্জ্বলতার অন্ততঃ তিনগুণেরও বেশি উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছে। কোয়াসারগুলিই সঠিকভাবে বলতে পারবে মহাবিশ্বের ইতিহাস এবং গঠন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই গভীরভাবে গবেষণা চালাচ্ছেন কোয়াসারগুলিকে নিয়ে। এদের ক্ষেত্রে ওই বিশাল লাল-সরণ কেবলমাত্র অতিমাত্রার দূরত্বের জন্য নাও হতে পারে। কোন কোনও বিজ্ঞানীর মতে, এই লাল-সরণের কারণ কোয়াসারদের বিপুল মহাকর্ষও হতে পারে। অর্থাৎ হয়ত দূরত্বের জন্য নয় কোয়াসারদের ক্ষেত্রে এই লাল-সরণ সম্ভবতঃ 'মহাকর্ষ-ঘটিত লাল-সরণ' [Gravitational Red-shift কিংবা Einstein Shift]। বার্‌বিজ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কোয়াসারগুলি বিপুলকায় এবং অসাধারণ ঘনত্বসম্পন্ন। এর দানবীয় অভিকর্ষই আলোর গতিবেগ কমিয়ে দিচ্ছে তাই এমন লাল-সরণ। যদি দূরত্বের জন্য এই লাল-সরণ হয়ে থাকে তবে এদের দূরত্ব আমাদের পৃথিবী হতে 200 কোটি [2×10^9] থেকে 1000 কোটি [10^{10}] আলোকবর্ষ। আবারো বলি, কোয়াসারদের বর্ণালির লাল-সরণ কেবলমাত্র দূরত্ব নিবন্ধনহেতু হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন না। যেমন, বার্‌বিজ [Geoffrey Burbidge] প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কোয়াসারদের প্রবল মহাকর্ষের কথা বলেছেন এই লাল-সরণের ব্যাখ্যায়।

মনে করা হয়, কোয়াসারদের উৎপত্তিকাল অতি প্রাচীন। মহাবিস্ফোরণের 100 কোটি [10^9] বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে 1700 বা 1800 কোটি বছর আগে প্রথম কোয়াসারটি সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে কারণেই মহাবিশ্বের প্রান্তের দিকেই কোয়াসারগুলির অবস্থান। কোন কোনও কোয়াসারের দূরত্ব 1300 কোটি আলোকবর্ষ। এখন আমরা 1300 কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব অবধি পর্যবেক্ষণ করতে পারি, তাই 1300 কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের কোয়াসারকে পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। আরও শক্তিশালী দূরবীন তৈরি হলে হয়ত আমরা আরও দূরের কোনও কোয়াসারকে দেখতে পাবো। বিশ্বের বয়স যেহেতু প্রায় 2000 কোটি বছর, তাই আশা করা হচ্ছে 1700/1800 কোটি বছরের প্রাচীন কোয়াসার অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে। অতিভারী কৃষ্ণগহ্বর থেকেই শ্বেতগহ্বর বা কোয়াসার উৎপন্ন হয়। বলা হয়, 10,000 কোটি [10^{11}] সৌরভরের কৃষ্ণগহ্বর থেকেই সাধারণতঃ কোয়াসারের উৎপত্তি। বড় বিচিত্র এই কোয়াসাররা। এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই সম্ভবতঃ জানা যাবে, বিশ্বসৃষ্টির অতি পুরাতন ইতিহাস এবং এই মহাবিশ্বের গঠন। বিস্ময়কর মহাবিশ্বের এক মহাবিস্ময় হল এই কোয়াসার।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 2004 সালে চিলির ইউরোপীয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরী [European Southern Observatory]-র জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা নতুন গ্যালাক্সী আবিষ্কার করেছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে Abell 135 IR 1916। পৃথিবী থেকে এই গ্যালাক্সীর দূরত্ব 1320 কোটি [13.2×10^9] আলোকবর্ষ।

এতাবৎ আবিষ্কৃত গ্যালাক্সীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহদায়তন গ্যালাক্সী হল Abell 2029 নামক গ্যালাক্সী। এটি 1990 সালে আবিষ্কৃত হয়। এর দূরত্ব 107 কোটি আলোকবর্ষ। এটির ব্যাস হল 56 লক্ষ আলোকবর্ষ। এর আলোক বিকিরণের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের 2×10^{12} গুণ।

আদি মহাবিস্ফোরণের 10^{43} সেকেন্ড পর অবধি বিশ্বে ছিল একটি মাত্র অবিভক্ত শক্তি। তারপর শক্তি হল দুটি। আরও অনেকটা পরে শক্তি হল তিনটি এবং শেষ অবধি চারটি। 10^{-43} সেকেন্ড আগে মহাবিশ্ব কেমন ছিল তা জানা যায় সম্ভব নয় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েও। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এখানে অচল। আর কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে বিচার করলে সৃষ্টির আদিতে ছিল অনন্যতা। [Singularity], যার আয়তন ছিল প্রায় শূন্য এবং ঘনত্ব ছিল প্রায় অসীম। কিন্তু এই বিন্দু অবস্থার কোনও ব্যাখ্যা আমাদের বর্তমান জ্ঞানে সম্ভব নয়। সুতরাং মহাবিশ্বের আদি অনন্যতা অব্যাখ্যাত। এ যেন দর্শনের সেই ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম যা আজও অব্যাখ্যাত সহস্র ব্যাখ্যার পরেও। চিনির পাহাড়ের ব্যাখ্যা যেমন একটা পিঁপড়ে করতে পারে না, যেমন মানুষ পারে না ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে পুরোপুরি ভাষায় প্রকাশ করতে কিংবা অনুভূতিতে আনতে, তেমনি বিজ্ঞান পারছে না সেই আদি বিশ্বকে বা সেই অনন্যতাকে ব্যাখ্যা করতে।

ওয়াইনবার্গের [Steven Weinberg] বা ভিনবার্গের কথা দিয়ে এই পরিচ্ছেদ শেষ করা যাক। এই ভিনবার্গ, আবদুস সালাম ও গ্লাশোর সঙ্গে একত্রে 1979 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে [Unified Field Theory] এক ধাপ এগিয়ে দেওয়ার জন্য। ভিনবার্গ এই বিস্ময়কর মহাবিশ্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"The present universe is so cold that the symmetries among the different particles and interactions have been obscured by a kind of freezing; they are not manifest in ordinary phenomena, but have to be expressed mathematically, in our gauge field theories. That which we do now by mathematics was done in the very early universe by heat -physical phenomena directly exhibited the essential simplicity of nature. But there was no one there to see it." "বর্তমান বিশ্ব এতই বেশি ঠাণ্ডা যে বিভিন্ন কণা ও শক্তিগুলির মধ্যেকার মৌলিক সামঞ্জস্যটি এই হিমে চাপা পড়ে গেছে। প্রকৃতির জগতে আজকে ওই অবস্থা আর প্রকট নয়; এদের আন্তঃসম্পর্কগুলিকে আমাদের ক্ষেত্রতত্ত্বগুলির গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। যে কাজ আজকে আমাদের গণিত দিয়ে করতে হচ্ছে, সে কাজটি আদিম বিশ্বে তাপের দ্বারাই সংঘটিত হতো। প্রকৃতির মৌলিক সরলতা তখনকার অবস্থার মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। কিন্তু সে অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।" ●

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাকাশের সেকাল-একাল

[মহাকাশ কি? সাংখ্য, বেদান্ত, জৈন দর্শন আকাশের ব্যাখ্যা কীভাবে করেছে তা বলা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চ তন্মাত্রের 'আকাশ' কি কেবলই মহাশূন্য? ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্ত' কি নতুন কোনও আলোকপাত করছে? একালে এসে নিউটন, লাইবনিজ, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন প্রমুখেরা মহাকাশ বা আকাশ নিয়ে কী কথা বলছেন? তাঁদের 'Space' আর 'মহাকাশ' কি এক, না 'Space'-এর পরিবর্তে আমরা 'দেশ' ব্যবহার করবো? এইসব নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে মহাকাশের সেকাল ও একাল বোঝাতে। এখানে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী ইরানী মহিলা আনাউশের মহাকাশ ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। মহাকাশ-সময়-সন্ততির ধারণায় এখন এসেছে 'রীমানীয় জ্যামিতি', শেষ হয়ে গেছে 'ইউক্লিডীয় জ্যামিতি'র কাল।]

'আকাশ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অন্তরীক্ষ, শূন্যদেশ, গগন, নভঃস্থল। সংস্কৃতে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, আ-কাশ [দীপ্তি পাওয়া] + অন্ ক। অর্থাৎ দীপ্তি পায় বলেই আকাশকে আমার আকাশ বলি। লোকমুখে বহু প্রচলিত এই শব্দটি যে বস্তুটিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ আকাশের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ইংরেজিতে আকাশ হল 'Sky' এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আকাশ শব্দটি কিছুটা ব্যবহৃত হলেও 'মহাকাশ' শব্দটির ব্যবহার বিজ্ঞান জগতেই বেশি।

আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে যেটুকু আমরা দেখতে পাই এবং যাকে আমরা 'আকাশ' বলি তারই বৃহত্তর এবং পরিবর্ধিত রূপকেই সাধারণভাবে আমরা 'মহাকাশ' বলি। দৃষ্টিগোচর আকাশের বাইরের আকাশ হল মহাকাশ। মহাকাশ যান, মহাকাশ যাত্রা, মহাকাশ পরিক্রমা ইত্যাদি কথার মহাকাশ হলো সেই আকাশ যা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। প্রকৃত পক্ষে, আকাশ কিংবা মহাকাশের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ইংরেজি 'Space' কথাটার অর্থ হল 'মহাকাশ'। দৃষ্টি সীমার বাইরের আকাশই মহাকাশ। আকাশ যেন মহাকাশেরই অংশ। আকাশের বৃহত্তর রূপই মহাকাশ। বিজ্ঞানের Space-কে বলা হয় 'দেশ' বা 'মহাকাশ'। আমরা দেশ বা মহাকাশ যে অর্থে বিজ্ঞানে ব্যবহার করি সাধারণ অর্থে মহাকাশ কিন্তু তা নয়। সাধারণ অর্থে মহাকাশ অজস্র নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যাসীয়পুঞ্জ, ধূলিকণা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত একটি ধারণা মাত্র। মহাবিশ্ব কিংবা মহাজগৎ যেন মহাকাশের সমার্থক। তাই মহাকাশ সংক্রান্ত বক্তব্য অনেকাংশেই মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় বক্তব্য হয়ে উঠে। মহাবিশ্ব এবং মহাকাশের মধ্যে একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই রয়েছে। সেই পার্থক্যটুকু নিয়েই বর্তমান পরিচ্ছেদের অবতারণা।

আমাদের দৃষ্টিবাহিত দূরত্ববোধ খুবই সীমিত। দূরবর্তী দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর দূরে অবস্থিত কিনা তা আমরা অল্প কিছুদূর পর্যন্ত অনুভব করতে পারি আমাদের খালি চোখ দিয়ে। এই অনুভব আমাদের দৃষ্টি সীমার মধ্যেই। এই সীমার বাইরে আমরা আর দূরবর্তী দুটি বস্তুর

মধ্যে অবস্থানের দূরত্ব অনুভব করতে পারি না। তখন বস্তু দুটিকে সমদূরত্বে অবস্থিত বলে বোধ হয়। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হয় দূরের গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সব দর্শকের কাছ থেকে একই দূরত্বে অবস্থান করছে। সব মিলিয়ে যেন একটি বৃত্ত গঠন করে আছে। কিন্তু বাস্তবে এই পাহাড়, পর্বত, গাছপালা প্রভৃতি পরস্পরের তুলনায় অনেক আগে কিংবা অনেক পিছনে থাকলেও দর্শকের কাছে তা সমদূরত্বে অবস্থান করছে বলেই মনে হয়। আবার মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে উপরের দিকে মহাকাশ পানে তাকালে অনুরূপভাবে দূরত্বের পার্থক্যবোধ লোপ পাওয়ায় মনে হয়, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি একটি গোলকের উপর অবস্থান করছে, আর দর্শক যেন সেই গোলকের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন। ওই গোলকটিকেই বা তাঁর দৃষ্ট অংশ বিশেষকেই বলা হয় 'আকাশ'। আকাশের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এটি ওই দৃষ্টি বিভ্রমেরই [Optical Illusion] ফল।

বাস্তবে আকাশ বা মহাকাশ বলে কিছু না থাকলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান কিন্তু তার অনেক ধ্যান-ধারণায় আকাশকে অর্থাৎ দৃষ্টিবিভ্রমজনিত ওই গোলকটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার ফলে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বহু গণনা সহজবোধ্য হয়েছে। জ্যোতিষ্কদের তুলনামূলক অবস্থান, তাদের মধ্যকার 'কৌণিক দূরত্ব' [Angular Distance], তাদের গতি ইত্যাদির অনেক গণনা সহজসাধ্য হয়েছে। মহাকাশে মহাবিশ্বের তথা ব্রহ্মাণ্ডগুলির সম্প্রসারণ, সূর্যের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমণ, মহাবিশ্ব সম্পর্কিত অন্যান্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য মহাকাশের প্রেক্ষাপটে সহজবোধ্য এবং এগুলির নির্ণয় সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য আকাশকে আকাশ না বলে বলেন 'নভোগোলক' [Celestial Sphere]। মহাকাশকে তাঁরা মহাকাশই বলেন। তবে বিজ্ঞানে মহাকাশ দেশ বা স্পেস [Space]-এর প্রায় সমার্থক।

জৈনধর্ম মতে আকাশ অবগাহহেতু দ্রব্য বা Space। ইদানীংকালে আমরা আইনস্টাইনের বিখ্যাত 'Space- time Continuum'-কে বলি 'দেশকাল সন্ততি' কিংবা 'মহাকাশ-সময় সন্ততি'। 'দেশ' এবং 'মহাকাশ' সমার্থক। 'দেশ'-কে 'মহাকাশ' ধরলে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় না। বরং Space শব্দটির অর্থ এবং তার ব্যাপ্তি 'মহাকাশ' শব্দটির অত্যন্ত কাছাকাছি। 'দেশ' কথাটির মধ্যে যে সংকীর্ণতা আছে, মহাকাশের মধ্যে তা নেই। তাই Space শব্দটির অর্থ দেশ না করে, মহাকাশ করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সুতরাং Space মানে মহাকাশ। একালের প্রায় সবকিছুতেই স্পেসের অর্থে মহাকাশ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। আকাশ বা মহাকাশ নিয়ে সেকালের ধারণায় আসি।

দর্শনের আকাশ অনেকটা যেন বিজ্ঞানের ইথার [Ether], যে ইথার তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন বিজ্ঞানী হুইগেন্স [Huygens] আলোকের তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। দর্শনে আকাশ বলতে ওই ইথারের মত কিছুকে বোঝায়, যার অস্তিত্ব মহাবিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান। জৈন দর্শনে আকাশকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে আকাশ যেন আধুনিককালের স্পেস [Space]। বর্তমানে অবশ্য স্পেসকে মহাকাশ বলা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেছেন, 'আকাশাদি পঞ্চভূত কাল্পনিক সংজ্ঞা [Concept] মাত্র, কোন দৃশ্যমান পদার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চভূত হল - ক্ষিতি, অপ্ [জল], তেজ, মরুৎ ব্যোম [আকাশ]। সুতরাং আকাশ সে অর্থে পঞ্চভূতের [Five Elements] এক ভূত মাত্র।

জৈন দর্শন অনুসারে আকাশ অস্তিকায় দ্রব্য। আকাশের দুটি ভাগ — আলোকাকাশ এবং লোকাকাশ।

লোকাকাশ অসংখ্য প্রদেশ দ্বারা গ্রথিত। প্রদেশ বলতে বোঝায় অণুপরিমিত স্থান। লোকাকাশের এক একটি প্রদেশে কালের এক অণু, পুদ্‌গল বা জড়ের এক অণু, ধর্ম বা গতিতত্ত্ব ও অধর্ম বা স্থিতিতত্ত্ব এবং জীব অবস্থান করে। আকাশ, কাল এবং জড়ের সহযোগে আধুনিক বিজ্ঞানের দেশ-কালের সেই আপেক্ষিকতাবাদের কথা মনে করিয়ে দেয় যার উদ্‌গাতা মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। আকাশের গুণ অবগাহ-হেতুত্ব। এক প্রদেশে এক বস্তুর প্রবেশ সম্ভব হয়, এই অবগাহ গুণের দ্বারা। জৈন দর্শনের আকাশ বিস্ময়করভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের স্পেসের সঙ্গে মিলে যায়।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ মতে পঞ্চভূতের অন্যতম হল আকাশ। বিক্ষেপণ শক্তিবিশিষ্ট সমষ্টি অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর থেকেই আকাশের সৃষ্টি হয়। আকাশের গুণ শব্দ। সাংখ্য দর্শনের পঁচিশ তত্ত্বের এক তত্ত্ব হল আকাশ। সাংখমতে অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে আসে আকাশাদি পঞ্চভূত। শব্দ তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় আকাশ। সুতরাং আকাশের গুণ হল শব্দ। একথা বেদান্ত বলছে। আসলে বেদান্ত দর্শন পুরোপুরিভাবে সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিকে বলেছে ঈশ্বরের দুই বিভাব। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির উপরে বসিয়েছে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে। তাই সাংখ্য যেমন পঞ্চতন্মাত্র থেকে আকাশদি পঞ্চভূতের উদ্ভূত হওয়ার কথা বলেছে, তেমনি ঠিক একই কথাই বলেছে বেদান্ত। অর্থাৎ উভয় দর্শনই বলছে শব্দ তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় আকাশ। আকাশ নিয়ে উভয় দর্শনের বক্তব্য প্রায় এক। একটু পার্থক্য আছে। সে কথা একটু বলে নিই।

সাংখ্যের ব্যাখ্যায় 'তত্ত্ব কৌমুদী' বলছে শব্দতন্মাত্র হতে আকাশের, শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র থেকে বায়ুর, শব্দ-স্পর্শতন্মাত্র এবং রূপ তন্মাত্র হতে তেজের উৎপত্তি হয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপতন্মাত্র এবং রসতন্মাত্র থেকে জলের উৎপত্তি হয়, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। বেদান্ত বলে শব্দতন্মাত্র থেকে আকাশের, স্পর্শতন্মাত্র থেকে বায়ুর, রূপতন্মাত্র হতে তেজের, রসতন্মাত্র হতে জলের, গন্ধতন্মাত্র থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তের তফাৎ খুবই সামান্য। সাংখ্যের তন্মাত্র এবং বেদান্তের সূক্ষ্মভূত একজাতীয় কল্পনা। সাংখ্যের মতে সব ভূতেই রয়েছে শব্দ তন্মাত্র, যার থেকে উদ্ভূত হয় আকাশ।

আবার অদ্বৈতবেদান্ত মতে ঈশ্বরের উপাধি অজ্ঞান হল আকাশের উপাদান কারণ। সাংখ্যের মতে অহংকার বা আমিত্ববোধ [Ego] থেকে উদ্ভূত হয় তন্মাত্র এবং তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় আকাশ। বেদান্ত মতে সূক্ষ্ম আকাশ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূত। স্থূল আকাশ পঞ্চীকৃত স্থূলভূত। সাংখ্যমতে সূক্ষ্মাবস্থা হল শব্দ তন্মাত্র এবং তার স্থূলাবস্থা হল আকাশ। শব্দ তন্মাত্র রয়েছে সব ভূতের মধ্যেই। সাংখ্য মতে দিক্ [Space] ও কাল [Time] আকাশের অন্তর্গত। সাংখ্য, বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্র মতে আকাশ পঞ্চভূতের অন্তর্গত এবং শব্দ আকাশের গুণ। ন্যায়মতে শব্দ একমাত্র আকাশের গুণ। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে আকাশ কার্য, কিন্তু ন্যায়মতে আকাশ নিত্য দ্রব্য। ন্যায়মতে দিক্ ও কাল আকাশের আন্তর্ভূত নয়, বরং তা স্বতন্ত্র নিত্য দ্রব্য।

মীমাংসা মতে আকাশের গুণ শব্দ। 'শব্দ গুণকং দ্রব্যং আকাশপদাবেদমীয়ম্'। শোত্র ইন্দ্রিয়কে এখানে আকাশের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে। এই শোত্র ইন্দ্রিয় দিক্-এর অংশ মাত্র। এই শাস্ত্রানুসারে

শব্দ দু'রকম। যেমন ঃ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও বর্ণাত্মক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ হল ক,খ,গ,ঘ ইত্যাদি। বর্ণ নিত্য এবং সর্বগত শব্দ। বর্ণ এখানে দ্রব্য। ধ্বনি বায়ুর গুণ। ধ্বনির দ্বারা বর্ণ অভিব্যক্ত হয়। ভট্টপন্থী মীমাংসকদের মতে আকাশ ও শব্দ দুই-ই ভিন্ন দ্রব্য। আকাশের সঙ্গে শব্দের কোনও সম্বন্ধই নেই। তবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে আকাশের সম্বন্ধ রয়েছে। এই সব মীমাংসকদের মত তাই সাংখ্য কিংবা বেদান্ত দর্শন শব্দ ও আকাশ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বের অবতারণা করেছে তার অনেকটাই বিপরীত। তবে আকাশ সম্পর্কে সাংখ্য বা বেদান্তের তত্ত্ব অনেকাংশেই আধুনিক বিজ্ঞানের আকাশ ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্নোপনিষদ্ তার চতুর্থ প্রশ্নে বলছে, "পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা [গন্ধতন্মাত্র], জল ও জলমাত্রা [রসতন্মাত্র], তেজ ও তেজোমাত্রা [রূপতন্মাত্র],বায়ু ও বায়ুমাত্রা [স্পর্শতন্মাত্র], আকাশ ও আকাশমাত্রা [শব্দতন্মাত্র] চক্ষু ও দ্রষ্টব্য বিষয়, কর্ণ ও শ্রোতব্য বিষয়, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য বিষয়, রস ও আস্বাদনীয় বিষয়, ত্বক ও স্পর্শের বিষয়, বাক্ ও বক্তব্য বিষয়, হস্ত ও হস্ত দ্বারা গ্রহণীয় বস্তু, জননেন্দ্রিয় ও আনন্দদানের বিষয়, পায়ু ও পায়ুদ্বারা ত্যক্তব্য বস্তু, পাদদ্বয় ও গন্তব্য দেশ, মন ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহংকার ও অহংকারের বিষয়, চিত্ত ও চিত্তের বিষয়, তেজ ও তাহাদ্বারা প্রকাশ্য বিষয়, প্রাণ ও প্রাণের ধারণীয় বিষয় — এ সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত।" [প্রশ্ন উপনিষৎ ঃ 4/৮]

পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা ইত্যাদি — ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই পঞ্চভূত থেকেই স্থূল জগতের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পঞ্চভূতের উপলব্ধি করি তা ওগুলির স্থূলরূপ। এই স্থূলরূপেব অন্তরালে ওদের একটা করে সূক্ষ্ম রূপ আছে প্রত্যেকেরই। পৃথিবীর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ, কাজেই পৃথিবীমাত্রা হল গন্ধতন্মাত্র। জলের বিশিষ্ট গুণ রস, তাই জলমাত্রা রসতন্মাত্র। বায়ুর বিশিষ্ট গুণ স্পর্শ. বায়ুমাত্রা তাই স্পর্শতন্মাত্র। তেজের বিশিষ্ট গুণ রূপ, তেজোমাত্রা হল রূপতন্মাত্র। আকাশের বিশিষ্ট গুণ শব্দ, আকাশমাত্রা তাই শব্দতন্মাত্র।

ন্যায় দর্শনে শব্দকে ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দমূল আকাশ অনুমিত হয়েছে। মীমাংসাতে শব্দমূল হল বায়ু। আধুনিক বিজ্ঞানমতে শব্দ বায়ুতরঙ্গ। আবার 'গর্ভোপনিষদ' পঞ্চভূতের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে। "যৎ কঠিনং সা পৃথিবী। যৎ দ্রবং তৎ আপঃ। যৎ উষ্ণং তৎ তেজঃ। যৎ সংচরিত স বায়ুঃ। যৎ সুধিরং তৎ আকাশন্।" অর্থ হল, কঠিন দ্রব্যমাত্রই পৃথিবীপদবাচ্য। তরল বস্তুকে জল, উষ্ণ বস্তুকে তেজ, গতিময় পদার্থকে বায়ু এবং ফাঁক আছে এমন পদার্থকে আকাশ বলা হয়েছে। যা অবকাশ দান করে তাই-ই আকাশ। এই ব্যাখ্যায় আকাশ স্পেসের তাৎপর্য-ব্যঞ্জক। সুতরাং সাংখ্য এবং উপনিষদীয় দর্শন আকাশ অর্থে স্পেসকেই বুঝিয়েছে। আবার বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে বা বস্তুকেও 'আকাশ' বলা হয়েছে সাংখ্যদর্শনে। আকাশ মহাকাশের অংশ বিশেষ। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ বা বস্তুকে তাই কেবল আকাশ না বলে মহকাশও বলা যায়।

সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে এই বিশ্বের উৎপত্তি। মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বের আলোচনা প্রথম পরিচ্ছেদেই করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথার আবার ফিরে আসি, দর্শনে আকাশ বা মহাকাশ কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা বলার জন্য। সাংখ্যদর্শনের পঁচিশতত্ত্ব বেদান্ত যেভাবে গ্রহণ করেছে তা এই রকম ঃ

5 কর্মেন্দ্রিয় — হস্ত, পদ, বাক, পায়ু, উপস্থ্।
5 জ্ঞানেন্দ্রিয় — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।
5 তন্মাত্র — গন্ধ, রস, রূপ স্পর্শ, শব্দ।
5 পঞ্চভূত — ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ।

প্রকৃতির থেকে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হলেও তার মধ্যে বহুত্ববোধ থাকে না। মহত্তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় অহংকার। যে গুণের প্রভাবে একবস্তুপরতা ভেঙ্গে বহুবস্তুপরতা উৎপন্ন হয় তাঁর নাম অহংকার। অন্য থেকে পৃথক থাকার ভাব-প্রবণতা বা অভিমানকেই বলে অহংকার। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ প্রাবল্যে অহংকার থেকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, যথা - হস্ত, পদ, বাক, পায়ু, উপস্থ, তেমনি তমোগুণ প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় পঞ্চ-তন্মাত্র যথা - শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। আবার সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং সব ইন্দ্রিয়ের উপর মন। তেমনি পঞ্চ তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূত, যথা - আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্(জল) ও পৃথিবী। এই স্থূল-ভূত-থেকেই সৃষ্টি হয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ।

'তন্মাত্র' শব্দের অর্থ হল 'কেবল তাহাই'। স্থূলভূতের সার হল তন্মাত্র, এর সূক্ষ্ম অবস্থা হল তন্মাত্র। যেমন, আকাশের সূক্ষ্ম অবস্থা বা তন্মাত্র হল শব্দ, গন্ধ ভূমির তন্মাত্র বা সূক্ষ্মাবস্থা। আবার ইন্দ্রিয় বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের শক্তি। হস্ত,পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এরা বাহ্য-যন্ত্র দেহের অংশ এবং স্থূলভূতের অন্তর্গত। প্রকৃত ইন্দ্রিয় এরা নয়। এগুলির শক্তিই আসল ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি জড়, সুতরাং তার পরিণাম বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই জড়পদার্থ — অন্ততঃ সাংখ্যদর্শন তাই বলছে। প্রকৃত পক্ষে, জগৎ কেবল জড়াত্মক নয়। সৃষ্টিতে জড় ও চেতন উভয়ই বিদ্যমান। সাংখ্য মতে পুরুষের সান্নিধ্যের জন্য প্রকৃতিতে চৈতন্যের আভাস হয়। সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ চেতন হলেও নির্বিকার, অকর্তা। প্রকৃতির গুণেই কর্ম হয়, পুরুষ কেবল সাক্ষী, ভোক্তা ও অনুমন্তা। সাংখ্যের মতে সৃষ্টির সময়

প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত থাকে। ফলে, পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে বর্তায়। প্রকৃতি তাই জড়া হলেও তাকে চেতন বলে মনে হয় এবং পুরুষ অকর্তা হলেও তাকে কর্তা বলে মনে হয়। সাংখ্য-দর্শনের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য বেদান্ত মেনে নিতে পারেনি। বেদান্ত তথা গীতা বলে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টি রূপে পরিণামের প্রকৃত কারণ। গীতা তাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে স্বীকার করে কিন্তু এঁরাই মূলতত্ত্ব তা মানে না। মূলতত্ত্ব সেই পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম এবং পুরুষ ও প্রকৃতি সেই পরব্রহ্মরই বিভাব। তাঁরই ইচ্ছায় বা অধ্যক্ষকতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করে, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নেই। গীতায় জড়া-প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের 'অপরা-প্রকৃতি' বলা হয়েছে এবং সাংখ্যের চেতন পুরুষ গীতায় 'পরা-প্রকৃতি' নামে অভিহিত।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব এবং মোট তত্ত্ব হল পঁচিশটি। বেদান্ত বলছে পুরুষ-প্রকৃতি মূলতত্ত্ব নয়, পরব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। পুরুষ ও প্রকৃতি পরব্রহ্মের বিভাব বা রূপান্তর মাত্র। পরুষোত্তম বা পরব্রহ্মকে আমরা বিশ্বের যাবতীয় চৈতন্য বা জ্ঞানরাশি ও যাবতীয় শক্তি বা পদার্থের সমষ্টি বলেই ব্যাখ্যা করতে পারি। সাংখ্যদর্শনের পঁচিশ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেই পাওয়া যায় বিশ্বে জড় পদার্থ এবং শক্তি আলাদা নয়। শক্তি [Energy] ও জড়-পদার্থ [Matter] পরস্পর সম্পকযুক্ত। একই সত্তার দুই পরিবর্তিত রূপ। বেদান্ত বলছে বিশ্বের যাবতীয় শক্তির নাম 'প্রাণ' এবং যাবতীয় পদার্থ বা Matter হল 'আকাশ'। এই আকাশ এবং প্রাণ মহত্তত্ত্বের দুই বিভাব বা রূপ।

বেদান্ত তথা সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায়, লেখায় বহুবারই এই আকাশ-প্রাণের তথা পদার্থ ও শক্তির কথা বলেছেন। 1894 থেকে 1896 সালের মধ্যে বিবেকানন্দ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতামালায় ঘোষণা করেছেন পদার্থ ও শক্তি কিংবা আকাশ ও প্রাণ এক, একই বস্তুর দুই পরিবর্তিত রূপ। সুতরাং একটির থেকে অপরটিতে রূপান্তর অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবাস্তবও নয়! আইনস্টাইন মঞ্চে এসেছেন 1905 সালে।

বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা-কিছু জড় পদার্থ আছে, সে-সকলই 'আকাশ' নামক একটি মূলপদার্থ থেকে সৃষ্ট এবং সব শক্তিই মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, জীবনীশক্তি বা যে কোনও শক্তি হোক না কেন, সবই 'প্রাণ' নামক একটি মূল শক্তি থেকে উদ্ভুত। ....প্রাণ ও আকাশের পরেও কিছু আছে, উভয়কেই 'বিরাট মন' বা 'মহৎ' নামক তৃতীয় সত্তায় বিলীন করা যেতে পারে। 'বিরাট মন' আকাশ বা প্রাণ সৃষ্টি করে না, নিজেকে প্রাণ ও আকাশে পরিবর্তিত করে।" বিবেকানন্দ যখন এগুলো বলেন তখন শক্তি এবং পদার্থকে আলাদা আলাদা বলেই সবাই জানতো; বিজ্ঞান তখনও খুঁজে পায়নি পদার্থ শক্তির সম্পর্ক। অথচ বেশ কয়েক হাজার বছর আগে ভারতীয় দর্শন জানিয়েছে সমস্ত জড় পদার্থ [Matter] এবং সব রকমের শক্তি [Energy] 'মহৎ' বা 'সমষ্টিমন' বা 'বিরাট মনের' পরিবর্তিত রূপ। 'মহৎ'-ই জড় এবং শক্তিতে রূপান্তরিত। সুতরাং জড় পদার্থ ও শক্তি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত।

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ব্যাপারটা আরও বোধগম্য হয়ে ওঠে। সাংখ্য দর্শন মতে বিশ্বের প্রথম অভিব্যক্তির সময় প্রকৃতি বা জড়া-প্রকৃতি 'মহৎ'-এ রূপান্তরিত হন। এই 'মহৎ' হল 'সমষ্টিমন' বা 'বিরাট মন'। এই মহৎ-কে বলা হয় মহত্তত্ত্ব, পঁচিশ তত্ত্বের একটি। এর পরে অর্থাৎ মন বা বুদ্ধির পর আসে অহংজ্ঞান। একে বলা হয় অহংকার তত্ত্ব বা অহংতত্ত্ব। আমিত্ব বোধের বিশ্বজনীন রূপ হল এই অহংতত্ত্ব। অর্থাৎ মহৎ বা মহত্তত্ত্ব নামক পদার্থ অহংতত্ত্ব নামের জড় পদার্থের সূক্ষ্মতর অবস্থায় উপনীত হয়। অহংকার পরিবর্তিত হয় দু'রকম পরিণামে। এক রকম পরিণাম হল দশ ইন্দ্রিয় ও মন। অন্য পরিণাম হল 'তন্মাত্র' পাঁচটি — রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এগুলি সূক্ষ্ম জড়-কণা বা

পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণাসমূহের দ্বারা তৈরি। তন্মাত্রগুলি আরও স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে রূপান্তরিত হয় স্থূল জড়ে, পাঁচটি মূল পদার্থ — ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। স্থূল জড়গুলি 'ভূত' নামে অভিহিত। একটি 'ভূত' অপর ভূতগুলির কারণ বলে বলা হয়েছে, কারণ একটি মূল ভূত থেকেই অন্যান্য ভূতগুলি উদ্ভূত। মূল ভূত হল 'আকাশ'। আকাশই আদি ভূত এবং আকাশ থেকেই সব স্থূল পদার্থের উৎপত্তি। সেই জন্য জগতে বা বিশ্বের সমস্ত জড় পদার্থকে একত্রে 'আকাশ' নামে অভিহিত করেছে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন। জগতের সমস্ত জড় পদার্থ তাই 'আকাশ'। জগতে যত রকম শক্তির বিকাশ দেখা যায় বেদান্ত মতে তা একই শক্তির বিভিন্ন রূপান্তরমাত্র। মহাকর্ষ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, তড়িৎ-চুম্বকীয়, জীবনী প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে দার্শনিকরা বলেছেন 'প্রাণ'। 'প্রাণ' নানা পরিবর্তিত রূপে নানা শক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরে। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত শক্তিই দর্শনের 'প্রাণ'-এর বিভিন্ন রূপ। এই প্রাণ একা একা থাকতে পারে না। প্রাণ আকাশের সঙ্গে জড়িত থাকে। প্রাণ আকাশ থেকে আলাদা থাকতে পারে না। আকাশ ও প্রাণ সর্বদাই একত্র অবস্থান করে। এরা 'মহৎ'-এর দুই রূপ, দুই বিভাব। বিজ্ঞানের ভাষায় যা জড় ও শক্তি, দর্শনের ভাষায় তা আকাশ ও প্রাণ। 'প্রাণ' সারা বিশ্বে যতরকম শক্তি আছে সবকেই বোঝায় এবং জীবনী শক্তিও সেগুলির একটি। প্রাণ ও আকাশ মিলেই 'মহত্তত্ত্ব'। আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন বিভাগ দিয়েই সাংখ্যদর্শনের পঁচিশ তত্ত্ব ঃ

(1) যা কারণ নয়, কার্য নয়, সেই চেতন পুরুষ। তিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতি নন, স্বতন্ত্র, উদাসীন কার্যকারণ সম্পর্ক রহিত।

(2) মূল প্রকৃতি যা কারণ বা উপাদান কারণ, কিন্তু কারো কার্য নন। তাই তাঁকে বলা হয় মূল কারণ।

(3-9) সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি যেমন—মহত্তত্ত্ব, অহংকার, পাঁচটি তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)। এদের প্রকৃতি-বিকৃতি বলে এই জন্য যে এরা নিজেরা অন্য তত্ত্বের কারণ তাই এরা প্রকৃতি বা প্রসবধর্মী কিন্তু নিজেরা আবার অন্য তত্ত্ব হতে উদ্ভূত তাই এরা বিকৃতি।

(10-25) পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক, পায়ু ও উপস্থ), পাঁচটি ভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) এবং মন এই ষোলটি হল প্রকৃতির বিকার। এরা নিজেরা অন্য কোনও তত্ত্বের জনক নয়। তাই এরা প্রকৃতি পদবাচ্য বটে কিন্তু প্রকৃতির বিকার।

"মানুষের যথার্থ স্বরূপ" বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর নিউইয়র্ক বক্তৃতায় আকাশ ও প্রাণেণ প্রসঙ্গ এনেছেন। কপিলের সাংখ্য-দর্শন থেকে শুরু করে বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে সেই স্বরূপ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই বক্তৃতায় আকাশ-প্রাণের প্রসঙ্গ এই রকম ঃ

"তাঁদের মতে জগৎ বিশ্লেষণ করলে তা একমাত্র 'আকাশ' নামক পদার্থে পর্যবসিত হয়। আমরা চারিদিকে যা কিছু স্পর্শ করি বা আস্বাদ করি, মনে মনে আমরা যা কিছু অনুভব করি সবই আকাশের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় সকল পদার্থই, সর্বপ্রকার আকৃতি ও শরীর, সূর্য-তারা সবই এই আকাশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তির প্রভাবে এই জগৎ সৃষ্টি হল? আকাশের সঙ্গে একটা সর্বব্যাপী শক্তি আছে। জগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত 'প্রাণ' নামক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে 'জগৎ-প্রপঞ্চ' রচনা করেছে। কল্প প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে সুপ্ত ছিল। আদিতে এই আকাশ গতিহীন অবস্থায় ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়, এই প্রাণের গতিবেগ বর্ধিত

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আকাশ সমুদ্র থেকে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ, কত সূর্য, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, জন্তু-উদ্ভিদ ও নানা শক্তির উৎপন্ন হতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার পদার্থ আকাশের বিভিন্ন রূপ মাত্র। কল্পান্তে সমস্ত কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হবে, সেই তরল পদার্থ আবার বাষ্পে পরিণত হবে, তা আবার তেজরূপ ধারণ করবে, অবশেষে সব কিছু যা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল সেই 'আকাশ'-এই লীন হয়ে যাবে। আর আকর্ষণ, বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে মূলপ্রাণে পর্যবসিত হবে। কিছুকালের জন্য এই 'প্রাণ' যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকবে; কল্প আরম্ভ হলে আবার জাগ্রত হয়ে নানাবিধ রূপ প্রকাশ করবে, কল্পের শেষে সকলই আবার লয় পাবে। এইরূপে সৃষ্টি-প্রণালী চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—কিছুকাল স্থিতিশীল, কিছুকাল গতিশীল হচ্ছে, একবার সুপ্ত আর একবার ক্রিয়াশীল হচ্ছে। এই ধরনের পরিবর্তন অনন্তকাল ধরে চলবে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণও আংশিক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞনও এই পর্যন্ত জেনেছে। এর উপরে এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যেতে পারে না। কিন্তু এই অনুসন্ধানের এখানেই শেষ হয় না। এ পর্যন্ত আমরা এমন জিনিস পাই নি, যা জানলে সব জানা যায়। আমরা সমস্ত জগৎকে পদার্থ ও শক্তিতে, অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলতে গেল 'আকাশ' ও 'প্রাণে' পর্যবসিত করেছি। এখন আকাশ ও প্রাণকে তাদের আদি কারণে পর্যবসিত করতে হবে। তাদের 'মন' নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্যবসিত করা যেতে পারে। 'মহৎ' বা 'সমষ্টি চিন্তাশক্তি' থেকে প্রাণ ও আকাশ উভয়েরই উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই দুটি শক্তিরূপে বিভক্ত হয়ে যায়। আদিতে এই সর্বব্যাপী মন ছিলেন—ইনিই পরিণত হয়ে আকাশ এবং প্রাণ রূপ ধারণ করলেন, আর এই দুটিরই সংযোগে ও মিলনে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে।"

সহজেই বোঝা যায়, আমরা যে অর্থে প্রাণ, মন, চিন্তা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি এখানে এই শব্দগুলি ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আমাদের প্রাণ, মন, চিন্তারা অনেক সংকীর্ণ অর্থবাহী এবং অনেক স্থূলরূপ-সম্পন্ন। বেদান্তের প্রাণ-মন-চিন্তারা অনেক উচ্চতর ও বিস্তৃত ভাব-সম্পন্ন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি এর সূক্ষ্মতর রূপ বোঝাতে ব্যবহৃত। যেমন, প্রাণ বলতে কেবল যে জীবনী-শক্তি বোঝায় তা নয়, প্রাণ বলতে বেদান্ত বুঝিয়েছে বিশ্বের সমস্ত রকম শক্তির সূক্ষ্মরূপ, তেমনি 'আকাশ' হল পদার্থের সূক্ষ্মতম রূপ। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ মতে পরব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা নন। মায়োপহিত বা মায়া-উপাধি-বিশিষ্ট অর্থাৎ 'চিৎ ও অচিৎ' শক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর হ'তেই পঞ্চ-সূক্ষ্ম-মহাভূতের বা তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চ-তন্মাত্র হল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এদের স্থূল অবস্থা হল পঞ্চ-মহাভূত যাদের আমরা বলি আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবী বা ক্ষিতি। তমোগুণ প্রধান পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত পরস্পরের সঙ্গে 'পঞ্চীকরণ' প্রথায় মিলিত হ'য়ে রূপ নেয় ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ বা জল, তেজ বা অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু এবং ব্যোম বা আকাশ—এই পাঁচটি স্থূল মহাভূতের। পঞ্চীকরণের সূত্র হল এই রকম ঃ স্থূল আকাশ $= \frac{1}{2}$ সূক্ষ্ম আকাশ $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম বায়ু $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম অগ্নি বা তেজ $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম জল $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম ক্ষিতি। এইভাবে পঞ্চীকৃত স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি হতে চতুর্দশ ভুবন এবং চতুর্বিধ স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়। চার রকমের স্থূল শরীর হল জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-সূক্ষ্ম-মহাভূত থেকে জন্ম নেয় লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্ম-শরীর। এই সূক্ষ্মশরীর আবার স্থূল-শরীর, দশটি ইন্দ্রিয়, পঞ্চ-প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গে মিলিত হয় এবং আত্মা এই সব উপাধির সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট হয়ে জীবরূপে পরিণত হয়। সুতরাং আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি বেদান্তের 'আকাশ' তা নয়। দর্শনের আকাশ হল পদার্থের সূক্ষ্মতম আদিমতম রূপ।

ভারতবর্ষে অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে থেকেই আকাশ সংক্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় হরপ্পা সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবং সমসাময়িক ব্যাবিলোনীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ অনেকটা নিখুঁতভাবেই গ্রহণ-সংক্রান্ত নানা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। ভারতীয় 'চান্দ্রকল্প' এবং ব্যাবিলোনীয় 'স্যারোস' [Saros] ওই রকম একটা সময় আবিষ্কৃত হয়। প্রায় 5000 বছর আগে থেকেই ভারতবর্ষ তার জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রবল উন্নতি করতে থাকে। আকাশের বা নভোমণ্ডলের 360^0-কে সমান 12টি ভাগে ভাগ করে রাশিমণ্ডলের সৃষ্টি, 27টি বিশেষ নক্ষত্রের নামকরণ, চান্দ্রকল্পের আবিষ্কার, মলিম্লুচ বা অধিমাসের সম্যক জ্ঞান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয়রা যেমন আকাশ তথা মহাকাশের গভীর চর্চা করেছিল, তেমনি তারা সূচনা করেছিল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আদিকাল। সে সমস্ত আবিষ্কারের অধিকাংশই আজও আধুনিক। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি বারোটি রাশি আজও সমানভাবে ব্যবহৃত; যেমনভাবে ব্যবহৃত অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি নক্ষত্রসমূহ। আকাশচর্চা বা মহাকাশ-চর্চায় অগ্রণী ছিল হরপ্পা সভ্যতার লোকজনেরা। সুমেরীয়রা বা ব্যাবিলোনীরা যে তাদের স্যারোসের হিসাব করতো 4000 বছরেরও বহু আগে তার মূলে ছিল হরপ্পীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবদান। সুমেরীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটে হরপ্পীয়দের উন্নততর জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে। ইদানীং বেশ কিছু ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন, সুমেরু সভ্যতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ভারতের দ্রাবিড় জাতি। হরপ্পা সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাও এই দ্রাবিড় জাতি। সুতরাং হরপ্পার লোকজনের দ্বারাই সুমের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এমন সিদ্ধান্তে অসমীচীন কিছু নেই। হরপ্পা সভ্যতার লোকজনেরাই সুমের সভ্যতার স্রষ্টা। [এ প্রসঙ্গে আমার লেখা 'হরপ্পার অনার্য গরিমা' বইটির বিশ্লেষণ দেখা যেতে পারে।]

যাইহোক, আকাশ, মহাকাশ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে ভারতের গবেষণার শুরু এতই প্রাচীনকালে যে, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। 4500 বছরেরও আগে হরপ্পীয়দের আমলে আকাশ ও তার জ্যোতিষ্কদের নিয়ে এই গবেষণার শুরু। এতে সামিল হয়েছিল সুমেরীয় সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও। সেকালের পৃথিবীতে হরপ্পীয়রাই প্রথম শুরু করে আকাশ ও তার জ্যোতিষ্কদের নিয়ে চর্চা। আকাশ সম্পর্কে, গ্রহ ও নক্ষত্রদের গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জানা না থাকলে স্যারোস বা চান্দ্রকল্প কোনওটাই সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আকাশ-চর্চার জনক বলা যেতে পারে হরপ্পীয়দের ও সুমেরীয়দের। আগেই বলেছি, সুমেবীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার অধিকাংশটাই হরপ্পীয়দের আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার এই ধারা ঋগ্বেদের আমলে তথা বৈদিক যুগেও বজায় ছিল। ঋগ্বেদ মোটামুটি 3600/3700 বছর আগে লিখিত হয়েছিল। এটির রচনার মোট সময় দীর্ঘ এবং এর অন্ততঃ সাতটি সময়-স্তর ভাগ রয়েছে। ঋগ্বেদ ও হিন্দু দর্শনের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আকাশে পিতৃলোকের অবস্থান, অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুর পর আকাশ বা অন্তরীক্ষের পিতৃলোকে যায়। আকাশে দেবলোকও আছে, যেখান থেকে দেবতারা পৃথিবীতে আসেন যজ্ঞের হবি ইত্যাদি গ্রহণ করতে। পৌরাণিককালে এসে আকাশে বিভিন্ন লোকের অবস্থানের ধারণা আরও বৃদ্ধি পায়। এই লোক বা ভুবন-সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, যমলোক, অমরাবতী, স্বর্গলোক, নরকলোক—এই রকম হাজারো লোক আকাশে কিংবা মহাকাশে অবস্থিত বলে হিন্দু দর্শন মনে করে। দর্শনের বিশেষ করে পুরাণগুলির সপ্তলোক হল, ভূঃ, ভুব, স্বঃ, জন, মহঃ, তপঃ ও সত্য। এই সপ্তলোকই মহাকাশে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। হিন্দুদর্শন মনে করে, চন্দ্রলোক থেকে আত্মারা

পৃথিবীতে আসে এবং প্রাণী-উদ্ভিদকুলের পুনর্জন্ম হয়। অর্থাৎ আকাশ থেকেই পৃথিবীতে প্রাণের পুনরাগমন। জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাশ এবং মহাকাশ ভারতীয় হিন্দু দর্শনে। আবার আকাশ পঞ্চভূতের এক ভূত হওয়ায় এই বিশ্বসৃষ্টিতে তার অবদান অসীম। সর্বপ্রকার স্থূলভূতের সঙ্গে রয়েছে আকাশ। আবার আমাদের দৃষ্ট আকাশও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে হিন্দু দর্শনে।

গ্রীকদের সভ্য হওয়ার বহুকাল আগেই ঋগ্বেদ লেখা হয়েছিল। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। এটিকে ধর্মগ্রন্থ বলা হলেও এটি যে কেবল ধর্ম বা দর্শনের কথা বলেছে তা নয়। এই গ্রন্থটি নানা বিষয়ের আধার। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা গাগনিক বস্তুদের কথাও বলা হয়েছে। আকাশ-চর্চার সেকাল শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষে হরপ্পা সভ্যতার আমলে। ঋগ্বেদ সেই চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছে। সেই ধারা বজায় রয়েছে উপনিষদীয় এবং পৌরাণিক যুগেও। ওই অতোটা প্রাচীনকালে ভারতীয়রা কেবলমাত্র বিস্মিত হয়ে আকাশ দেখেই ক্ষান্ত হয়নি, সৃষ্টি করেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের। সে সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান এতোটা উন্নতি করেছিল যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সেকালে ছিল পৃথিবী সেরা। বহু সভ্যতাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই জ্ঞান ধার করেছিল। তখন আকাশ, মহাকাশ, মহাবিশ্ব সমার্থক ছিল। মহাকাশ চর্চাই ছিল মহাবিশ্ব চর্চা। সেই চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল ভারতবর্ষ।

ঋগ্বেদ তার চার রকমের ভাগ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্র এবং দশটি মণ্ডল, 1028টি সূক্ত ও 10552টি ঋকের শাখা-প্রশাখা নিয়ে এক বিশাল মহীরূহ। ঋগ্বেদ সভ্যজগতের আদি গ্রন্থ। পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন এই গ্রন্থের সূক্ত-সম্বলিত মূল অংশকে বলা হয় সংহিতা। পরবর্তীকালে অন্য অংশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শুধু ঋগ্বেদ সংহিতাতে 10,552টি ঋক বা স্তুতি 1028 টি সূক্তের রূপ নিয়ে দশ-দশটি মণ্ডল জুড়ে সৃষ্টি করেছে ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋগ্বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন অবশ্য অষ্টম মণ্ডলের ৪০টি ঋক নিয়ে তৈরি 11টি সূক্তকে ঋগ্বেদের অংশ বলে মনে করেন না। এই সূক্তগুলি 'বালখিল্য সূক্ত' নামে খ্যাত। সায়নের মত মেনে নিয়ে বালখিল্য সূক্তগুলিকে বাদ দিলে ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা দাঁড়ায় 1017 এবং ঋক সংখ্যা 10472 টি। এর প্রাচীনত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে মোক্ষমুলর (Max Mueller) সাহেব লিখেছেন ঃ "One thing is certain ঃ there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rigveda."

ঋগ্বেদ সংহিতায় দশটি মণ্ডল। প্রতিটি মণ্ডল আবার কতকগুলি সূক্তের সমষ্টি। প্রত্যেকটি সূক্ত কতকগুলি ঋক নিয়ে তৈরি। ঋক সমষ্টি হলো স্তোত্র বা সূক্ত। প্রত্যেকটি সূক্তেরই কোন-না-কোনও দেবতা আছেন। সূক্তটি যিনি দর্শন বা রচনা করেছেন তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। কোনও কোনও সূক্তের আবার একাধিক ঋষিও আছেন। অর্থাৎ সেই সূক্তের বিভিন্ন ঋক বিভিন্ন ঋষির রচনা। ঋগ্বেদের সবচেয়ে পুরানো অংশ হলো সংহিতা। তারপর সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্মণ অংশ। এই গ্রন্থের মন্ত্রগুলিতে পাওয়া যায় অতি প্রাচীনকালের পূর্বসূরিদের ধর্ম, বিশ্বাস আচার, আচরণ, আশা-আকাঙক্ষা, সমাজজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে এক একটি বাস্তব চিত্র এবং নানান তথ্য। ভারতীয় হিন্দুরা নিজেদের মনে করে বৈদিক ঋষির বংশধর এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা সেই বহু পূর্ববর্তী বৈদিক যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের একটা ধারাবাহিক যোগসূত্র খুঁজে পায়।

ঋগ্বেদে যে শুধু পূর্বসূরিদের ধর্ম, বিশ্বাস, আচার, আচরণ, সমাজজীবন সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা নয়, ঋগ্বেদ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল। ঋগ্বেদে অন্ততঃ শ'খানের ঋক আছে যেগুলি নির্ভেজালভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাই বলেছে। নীহারিকা, সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে

যে বিস্ময়কর তথ্য ও তত্ত্ব ঋগ্বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে তা অনুধাবন করলে সেই প্রাচীন ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ঋগ্বেদে জ্যোতির্বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। ঋষিরা নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও পৃথিবী ইত্যাদির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বই শুধু আবিষ্কার করেন নি, এই সব গাগনিক বস্তুর মধ্যে বস্তুর অতীত প্রাণদেবতাকে দর্শন করেছিলেন। গ্রহ নক্ষত্রেরা তাই হয়ে ওঠে প্রাণদাতা এবং প্রাণের প্রতীক। আগেই বলেছি, ঋগ্বেদের এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তথ্য সবই এসেছে হরপ্পীয়দের কাছ থেকেই।

ঋগ্বেদের দ্যুলোক হল স্বর্গলোক। তাই আকাশ, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, মহাকাশ ইত্যাদি প্রায় সমার্থক। ঋগ্বেদে এমন কিছু দেবতা আছেন যাঁদের বলা হয়েছে অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোকের অধিবাসী। অর্থাৎ তাঁরা আকাশবাসী। শত্রু, রোগ ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি কামনা করেই বেশির ভাগ সূক্ত রচিত এবং সূক্তগুলিতে পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোকের এমন কিছু প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু রয়েছে যাদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। যেখানেই শক্তির প্রকাশ সেখানেই প্রার্থনা জানানো হয়েছে সেই শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত করে। ফলে প্রাকৃতিক সেই শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপহেতু তাঁরা দেবতা বলে কল্পিত। ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নীচের 27টি দেবতাই ঋগ্বেদের প্রকৃত দেবতা ঃ

অগ্নি, মিত্র, বরুণ, মরুৎগণ, বৃহস্পতি, পূষণ, আদিত্যগণ, ব্রহ্মণস্পতি, দ্যৌ, রাত্রি, রুদ্র, বায়ু, সবিতা, অদিতি, যম, অশ্বিদ্বয়, ভগ, ত্বষ্টা, সোম, বিষ্ণু, ঊষা, অর্জমা, সূর্য, পৃথিবী, অপগণ, পর্জন্য ও সরস্বতী (নদী)।

এই তালিকায় বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ তাঁদের উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় পরিপূর্ণ। আবার ইন্দ্র যিনি ঋগ্বেদের আড়াইশোরও বেশি সূক্তে স্তুত হয়েছেন তিনিও এই তালিকায় অনুপস্থিত। ইন্দ্র ঋগ্বেদে দুর্দমনীয় যোদ্ধারূপে পরিকল্পিত এবং তাঁর উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি পড়লে তাঁকে অন্তরীক্ষ স্থানের বাসিন্দা বলেই মনে হয়। অবস্থানানুসারে মূল দেবতাদের আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তবে কতকগুলি দেবতার এইভাবে বিভাগ করা শক্ত।

মোট ঊনিশটি দেবতার এই অবস্থানগত শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। যেমন পৃথিবী স্থান ঃ অগ্নি, পৃথিবী, অপ, সোম। অন্তরীক্ষ স্থান ঃ ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য। দ্যুলোক স্থান ঃ সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, অশ্বিযুগল, ঊষা, রাত্রি, যম, বৃহস্পতি।

ঋগ্বেদে প্রায় শতাধিক সূক্ত আছে যেগুলিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য এবং তত্ত্ব রয়েছে। এইগুলিতে আকাশ তথা মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি, অবস্থান, পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা, সূর্যের ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ কোনও জ্যোতিষীয় গ্রন্থ নয়। তবু এতে আকাশ এবং আকাশে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রদের অনেক কথাই বলা হয়েছে। এই সব তথ্য এবং তত্ত্ব আকাশ-চর্চার সেকালের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। এই রকম কোন কোন ঋকে আকাশকে নীল জলের হ্রদের সঙ্গে তুলনাও করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের সংহিতা অংশে সূর্য, ঊষা এবং সোম ইত্যাদির কথা বহুবার বলা হয়েছে। সোম বলতে মূলতঃ চন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে। এই পৃথিবী যে গোলক (Sphere), তা বেদ বলেছে। এ ব্যাপারে প্রথম মণ্ডলের 33 সূক্তের অষ্টম ঋক ও চতুর্থ মণ্ডলের 53 সূক্তের তৃতীয় ঋক ও অন্যান্য ঋক প্রণিধানযোগ্য। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 62তম সূক্তের সপ্তম ঋক থেকে পাই, নীল আকাশে গ্রহমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সূর্যকে রোদসী অর্থাৎ পৃথিবী পরিক্রমণ করে চলেছে। পৃথিবীর এই পরিক্রমণ পথ উপবৃত্তাকার। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোনও সভ্যতা এই সত্য আবিষ্কার করতে পারে নি।

ঋগ্বেদ চান্দ্রমাস ও সৌরমাস গণনা জানতো, জানতো অধিমাস বা মলমাস বা মলিম্লুচ (Dirty Month) কী এবং কীভাবে তা নির্ণীত হয়। ঋগ্বেদে একটা অদ্ভুত অত্যাধুনিক তত্ত্বও বলেছে। এই প্রাচীনতম গ্রন্থটি বলেছে যে, সূর্যও তার গ্রহমণ্ডল নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করছে। সূর্যের সঞ্চার পথ সংক্রান্ত ঋক হলো ঃ

"যে ঊর্ধ্বপথে মনের ন্যায় সদ্‌গতি বিশিষ্ট সপার্ষদ সূর্যের (অর্থাৎ সৌর পরিবার সহ সূর্যের) এক লক্ষ্য-গতি, স্যন্দন বাষ্পের ভাস্বর বিস্তারের মিত্র হ'তে বরুণ রক্ষমান দিকের সেই প্রিয় ও অমৃত ঐশ্বর্যাধার বিবস্বান (সূর্য) রাজিত" (ঋগ্বেদ 1। 71। 9)।

অর্থাৎ গতিময় বাষ্পের ভাস্বর বিস্তার বা চলন্ত নীহারিকার ভাস্বর বিস্তারের অনুরাধা নক্ষত্র হতে শতভিষা নক্ষত্র অবধি রক্ষমান দিকে সূর্যের সপার্ষদ সঞ্চারপথ। নীহারিকার কেন্দ্র হ'তে সূর্য প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। নীহারিকা আমাদের পরিচিত ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড (Milkyway Galaxy)। এখনকার বিজ্ঞান বলছে সূর্য তার সৌরমণ্ডল নিয়ে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের চারিদিকে সেকেন্ড 200 মাইল বা 320 কিলোমিটার গতিবেগে ঘুরছে কেন্দ্র থেকে প্রায় 30,000 আলোকবর্ষ দূরত্ব বজায় রেখে। ঋগ্বেদ আরও বলেছে, "মিত্র হতে বরুণ নক্ষত্রের ঊর্ধ্বস্থ নক্ষত্রবৃত্তে নক্ষত্রলোকে ধাবিত সৌর-বিশ্বের ক্রান্তির দিশা অবলোকিত হয়, দিকস্পর্শী নক্ষত্রের নাক্ষত্রিক প্রমাণে" (ঋগ্বেদ 1। 2। 8)। সর্পাষদ সূর্যের সঞ্চার বৃত্তের ক্রান্তির দিক হলো, ভূ-কক্ষের অনুসূরের দিক অর্থাৎ পৃথিবীর মেরুতারা যে দিকে প্রতিভাত হয় সেই দিকে। "মরুতের মাধ্যমে বহন্ত শ্রুতিগাথার প্রতিম, ব্রহ্মাণ্ডে সপার্ষদ সূর্যের নিত্য-সদন ও সূর্যের গতিবেগ আবহমান কাল সপ্তসংখ্যক নক্ষত্র কলাপের অন্ধকার মর্দিত আলোক বাহুর দ্বারা প্রদর্শিত" (ঋগ্বেদ 1। 85। 6)। বেদের এই সাতটি নক্ষত্র হল ঃ সপ্তর্ষি নক্ষত্র (Ursa Major), উত্তর আকাশে বর্তমানকালের মেরুনক্ষত্র শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলীর ধ্রুবতারা (Alpha Ursa Minoris), কাশ্যপী নক্ষত্র (Cassiopia), শিবিরাজ নক্ষত্র (Cephcusii), ছায়াগ্নি নক্ষত্র (Alpha Cygni or Deneb), অভিজিৎ নক্ষত্র (Alpha Lyrae or Vega) এবং প্রচেতা নক্ষত্র (Draconis or Thuban)। এদের মধ্যে পাঁচটি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে মেরু তারা হতে থাকে। প্রত্যেকে এক একেবারে মেরুতারা হয় 5,160 বছর। মেরুতারা পরিবর্তিত হওয়ার চক্রের একবার আবর্তনকাল হলো 25,800 বৎসর। এ সত্য এখন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বীকৃত।

ঋগ্বেদের রচনা বহুকাল ধরে হয়েছিল। তাই তার অনেক সূক্ত যেমন প্রাচীনতর সময় নির্দেশ করে তেমনি অনেক সূক্ত আধুনিকতর কাল নির্দেশক। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "একদা যজ্ঞহীন দেবতারা অদিতিকে বল্লেন, 'তুমি যজ্ঞ বলে দাও'। অদিতি বললেন, 'তথাস্তু, যজ্ঞের আবর্তন আমার শীর্ষদ্বয়ে আরম্ভ ও শেষ হোক"। 'যজ্ঞ' শব্দ ঋগ্বেদে বৎসরজ্ঞাপক। অদিতির কথার অর্থ হলো, এক সময় সায়ন বৎসরের আরম্ভ ও শেষ অদিতি বা পুনর্বসু নক্ষত্রে হতো। অর্থাৎ মহাবিষুব বিন্দু (Vernal Equinox) তখন পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থান করতো। পুনর্বসু থেকে আর্দ্রা, মৃগশিরা, রোহিনী, কৃত্তিকা, ভরণী হয়ে বর্তমানের উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের মাঝামাঝি আসতে বিষুব-বিন্দুর সময় লেগেছে প্রায় 8000 বছর বা তার কিছুটা বেশি। বার্ষিক অয়নগতি 50 বিকলা বা সেকেন্ড ধরে বিষুবের সঞ্চরণের এই হিসাব। সুতরাং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কাহিনী প্রায় আট হাজার বছরের পুরাতন। বৎসরের শেষ গণনা করা হতো পুনর্বসু নক্ষত্রে। এখন থেকে আট হাজার বছরের কিছুটা বেশি সময় আগে সায়ন বৎসরের প্রারম্ভ সূচিত হতো অদিতি নক্ষত্রে বা পুনর্বসু নক্ষত্রের প্রথমাংশে।

আবার ঋগ্বেদের কোথাও কোথাও কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত গ্রন্থে যেমন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র, বৈদিক গ্রন্থে কিন্তু তেমন কোথাও নেই। মহাবিষুব বিন্দু (Vernal Equinox)

হতেই নক্ষত্রগুলির প্রারম্ভ হয়ে থাকে। কেননা বৎসর গণনা মহাবিষুব সংক্রান্তি হতেই শুরু হয়। মনে হয়, এই সূক্তগুলি লেখার সময় কৃত্তিকাতেই মহাবিষুব সংক্রান্তি হত। ঋগ্বেদের আধুনিকতর এই সব সূক্ত ধরলে, কৃত্তিকা হতে ভরণী, অশ্বিনী পেরিয়ে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মাঝামাঝি আসতে বিষুববিন্দুর সময় লেগেছে প্রায় 3350 বছর। সুতরাং এই সব সূক্ত রচিত হয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে— এ কথা বলা যেতে পারে। এমন সূক্ত অবশ্য ঋগ্বেদে খুবই কম আছে। বেশির ভাগ সূক্তই 8000 বছর কিংবা 6200 বছরের কথা বলে।

অধ্যাপক এ, হিলব্রান্ট (A. Hillebrandt) বলেছেন, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টারা পঞ্চ-গ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 105 তম সূক্তের 10ম ঋকে বলা হয়েছে যে, আকাশের মধ্য ভাগে পাঁচটি বলদ দণ্ডায়মান রয়েছে। পাঁচটি বলদ হল পাঁচটি বৃষ বা পাঁচটি নক্ষত্রপুঞ্জ (Circumpolar)। এই নক্ষত্রপুঞ্জ হল একটু আগে বলা সাতটি স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীর পাঁচটি। শিশুমার, কাশ্যপী, ছায়াগ্নি ইত্যাদি। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তম ঋকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক হিলব্রান্ট বলেছেন যে, 'সপ্ত-বিপ্রা' হল সপ্তর্ষি মণ্ডল আর পঞ্চ অধ্বর্য্যু হল পাঁচটি গ্রহ। যাগ-যজ্ঞে যে রকম পার্থিব অধ্বর্য্যুরা ব্যস্ত থাকেন, তেমনি আকাশে পাঁচটি গ্রহ সর্বদাই ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে। আবার, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 55তম সূক্তের চতুর্থ ঋকে ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তিনি এই দ্যাবা পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ পূর্ণ করে আছেন নানাভাবে, তিনি পাঁচ দেবতা, সাত-সাতকে সময়ানুযায়ী 34 টি আলোর ন্যায় দেখছেন। এই 34টি আলো একবর্ণের কিন্তু ওরা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পালন করে।" এই 34টি আলোর সম্বন্ধে সায়ণাচার্যের মত হল যে,এঁরা দেবতাদিগের গণ, যথা ঃ অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, প্রজাপতি, বষট্কার ও বিরাজ। অধ্যাপক লড্উইগ কিন্তু বলেছেন, এই 34টি আলো হল সূর্য, চন্দ্র, 27টি নক্ষত্র এবং 5টি গ্রহ। ঋগ্বেদের ঋষিরা পাঁচটি গ্রহ এবং তাদের গতির কথা জানতেন। পৃথিবীর পরিক্রমণ এবং সূর্যের পরিভ্রমণের আধুনিকতম জ্ঞানও তাঁদের ছিল, সে সব কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, বৈদিককালের প্রায় 2000 বছর পরে সময় সংশোধন করে বেদাঙ্গ কালের সূচনা হয়। বেদাঙ্গ কালও প্রায় 500 বছর অনুসৃত হওয়ার পর সংশোধন জরুরী হয়ে পড়ে এবং নতুন যুগের শুরু হয়। এই যুগ 'সিদ্ধান্ত' যুগ নামে খ্যাত। এখন থেকে প্রায় 2700 বছর আগে (700 B.C) এই যুগের শুরু। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয় বিশদভাবে বলা হয়েছে। এখানেও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কখন হত তার উল্লেখ রয়েছে। "শ্রবিষ্ঠার (ধনিষ্ঠা) প্রারম্ভে সূর্য ও চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু অশ্লেষার অর্ধ ভাগেই সূর্য দক্ষিণদিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তন মাঘ এবং শ্রাবণ মাসে হয়।" এই শ্লোক দেখে অধ্যাপক আর্চ ডিকন প্রাট (Prof. Arch Deacon Pratt) গণনা করে বলেছেন যে, এই ধরনের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হত 1200 খ্রিস্টপূর্বাব্দে (1200 B.C)। সুতরাং বেদাঙ্গের কাল এখন থেকে প্রায় 3000 কিংবা 3200 বছর আগে ছিল এই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় জানা যায় ঋগ্বেদ সংহিতা প্রায় 6200 বছর আগে লিপিবদ্ধ হতে আরম্ভ করে এবং প্রায় 2000 বছর আগের কোন কোন ঋক এতে সন্নিবেশিত। এই চার হাজার বছরের মধ্যে কম করে আঠারোজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায়, যদিও এঁদের রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র আজ বিলুপ্ত কিংবা দুষ্প্রাপ্য। এঁরা হলেন ব্রহ্মা, সূর্য, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, মরীচি, অগস্ত্য, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, গর্গ, সোম, পরাশর, ব্যাস, বাল্মীকি, ময় ও যবন। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্রহ্মা, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গি রা প্রভৃতির সিদ্ধান্তকে বলা হয় দৈব সিদ্ধান্ত;পরাশর, যবন, গর্গ ইত্যাদির সিদ্ধান্তকে আর্য সিদ্ধান্ত এবং আর্যভট, ভাস্করাদির সিদ্ধান্ত মানব সিদ্ধান্ত হিসাবে নির্দিষ্ট। মানব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হতে পারে, আর্য

সিদ্ধান্তে নতুন সংযোজন হতে পারে, কিন্তু দৈব সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা হত।

বেদাঙ্গ-যুগের 500 বছর পরে সময়ের সংশোধন প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্ত রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সিদ্ধান্ত কালের শুরু খ্রিস্টপূর্ব 700 বছর। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 2700 বছর আগে সিদ্ধান্ত কালের শুরু। এ পর্যন্ত যে সব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, হিন্দু ষড়-দর্শনের অংশ হিসাবে কুড়িটি গ্রন্থ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ আছে। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে নয়টি সিদ্ধান্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কুড়িটি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হল : (1) ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত (2) সূর্য-সিদ্ধান্ত (3) সোম-সিদ্ধান্ত (4) বৃহস্পতি-সিদ্ধান্ত (5) গর্গ-সিদ্ধান্ত (6) নারদ-সিদ্ধান্ত (7) পরাশর-সিদ্ধান্ত (8) পুলস্ত্য-সিদ্ধান্ত (9) বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত (10) ব্যাস-সিদ্ধান্ত (11) অত্রি-সিদ্ধান্ত (12) কাশ্যপ-সিদ্ধান্ত (13) মরীচী-সিদ্ধান্ত (14) মনু-সিদ্ধান্ত (15) আঙ্গিরস-সিদ্ধান্ত (16) লোমশ-সিদ্ধান্ত (17) পুলিশ-সিদ্ধান্ত (18) যবন-সিদ্ধান্ত (19) ভৃগু-সিদ্ধান্ত এবং (20) চ্যবন-সিদ্ধান্ত। এদের মধ্যে প্রথম চারটি সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের বাণী (Inspired) বলে কথিত। প্রথমটির প্রবক্তা ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টির সূর্য, তৃতীয়টির চন্দ্র এবং চতুর্থটির বৃহস্পতি। অন্যগুলির রচয়িতারা হলেন বিভিন্ন ঋষি অর্থাৎ মানুষ। এ ছাড়াও নবীনতর দুটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ আছে। এ দুটি হল 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' এবং 'আর্য-সিদ্ধান্ত'। সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি পুরোপুরি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হওয়ায় এগুলিতে আকাশ, মহাকাশ, খ-গোলক, নভোগোলক, আকাশ-গোলক প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত। আকাশে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান, গতিবিধি ইত্যাদির গণনাদির প্রয়োজনে সিদ্ধান্তগুলিতে আকাশ বা খ-গোলক নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলিতে আকাশ বা মহাকাশ এবং মহাশূন্য প্রায় সমার্থক।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অন্ততঃ চারটি সূক্ত আছে যেগুলি দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ এবং যেখানে আকাশ বা মহাকাশ ও মহাবিশ্ব কোনও না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে 125 সূক্তটি অন্যতম। অন্যান্য সূক্তগুলি হল 90 তম, 121 তম এবং 129 তম সূক্ত। 125 সূক্তটি 'দেবীসূক্ত' নামেও খ্যাত। এখানে দেবী বলছেন, তিনিই দ্যুলোক প্রসব করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি বিশ্ব-প্রসবিত্রী।

এই সূক্তটির দেবতা পরমাত্মা, ঋষি বাক্ এবং এটি ত্রিষ্টুপ জগতী ছন্দে রচিত। বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে দেবতা নিজের বিষয়ে নিজেই বলেছেন। সাধারণত ঋষিরাই দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র রচনা করেন। এখানে তা হয়নি। তবু বাক্ এ সূক্তের বক্তা বা ঋষি বলে নির্দেশিত। সূক্তের ভিতর কোথাও কোনও নিদর্শন নেই যাতে বলা যায় ঋষি বাক্ এ সূক্তের বক্তা। বক্তা এখানে নিজেকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে বক্তা এখানে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয় অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর। ঋষি ও দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন। ঋষি বাক্ নিজেকেই ঈশ্বর হিসাবে ঘোষণা করেছেন এই সূক্তে। বেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এর ব্যাখ্যায় বলেন, "মহর্ষি অম্ভৃনের কন্যা সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বগত পরমাত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য অর্থাৎ নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে সমস্ত জগৎরূপে ও সকলের আশ্রয়রূপে আমিই সকল হয়েছি — এইভাবেই স্বীয় আত্মাকেই স্তব করেছেন (স্বাত্মানম্ অস্তৌৎ)।" এখানে সর্বেশ্বরবাদের বীজ নিহিত আছে। দেবতা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পরিশুদ্ধ আধার ব্রহ্মবিদুষী বাক্‌কে যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে তাঁর ভিতর দিয়ে স্বয়ং আত্মস্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। বাক্ সূক্তের আটটি ঋকের বাংলা অনুবাদ এই রকম :

"আমি রুদ্রগণ ও বসুগণরূপে বিচরণ করি; আমি আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কেই ধারণ করি; আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি (ঋক্ - 1)। আমি শত্রুনাশকারী সোমদেবকে ধারণ করি। আমি ত্বষ্টা, পুষা এবং ভগদেবকে ধারণ করি।

হবি-সমন্বিত, দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং সোমরস-প্রস্তুতকারী যজমানকে আমি যজ্ঞ ফল প্রদান করে থাকি (ঋক্ - 2)। আমি জগদীশ্বরী, ধনদায়িনী, পরব্রহ্মজ্ঞানবতী এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরূপে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন. আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি (ঋক্ - 3)। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতেই সে-সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য (ঋক্- 4)। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয়েই আমি উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা উত্তম প্রজ্ঞাশালী করতে পারি (ঋক্- 5)। ব্রহ্মদ্বেষী হিংসক অসুরবধের নিমিত্ত আমি রুদ্রের ধনুকে জ্যা সংযোগ করি। সজ্জনের রক্ষণার্থ আমি সংগ্রাম করি। আমি দ্যুলোককে প্রসব করেছি। পরমাত্মাতে ব্যাপনশীল বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহাই আমার কারণ অর্থাৎ প্রকাশস্থান। সেইহেতু আমি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিবিধরূপে বর্তমান আছি। অধিকন্তু নিজদেহদ্বারা আমি ওই দ্যুলোককে স্পর্শ করে আছি (ঋক্- 7)। আমিই সমস্ত ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বিশাল হয়েছে যে, তা দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে (ঋক্- ৪)।

ব্রহ্মবাদিনী ঋষি বাক রচিত এই বিখ্যাত সূক্তটির বক্তব্য একাধারে যেমন তাঁর নিজের, অন্যদিকে ঈশ্বরের তথা তাঁর বিশ্বব্যাপিনী শক্তির। সমগ্র মহাকাশ ও মহাবিশ্বে এই শক্তির খেলা। এই শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, সৃষ্টির উপাদান। বাক্ এবং ঈশ্বর এখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। অর্থাৎ ঋষি ও দেবতা এক হয়ে গেছেন যেহেতু ঋষি ব্রহ্মানুভূতি লাভের পর নিজেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হয়েছেন। ঋষি বাক্ তাই ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রহ্মস্বরূপিণী।

সর্বেশ্বরবাদের মহান দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ এই অতি বিখ্যাত সূক্তটি শক্তিবাদের মূল উৎস। এই সূক্তটি 'দেবীসূক্ত' নামে খ্যাত। সূক্তটি 'বাক্‌সূক্ত' নামেও প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা বিশ্বব্যাপিনী শক্তি যদিও মূলতঃ অভেদ তবুও সেই অভেদে ভেদ কল্পনা করে শক্তিকে একটা স্বতন্ত্র সত্তায় মহিমান্বিত করার বীজ নিহিত ছিল এই সূক্তে। শক্তির মহিমা কীর্তন করে শক্তিমানকে মহিমাময় করাই ছিল এই সূক্তের উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে ঈশ্বরের থেকে তাঁর শক্তিকে পৃথক করে নিয়ে সেই শক্তিতে একটা পৃথক সত্তার আরোপ করা হ'ল। ফলে শক্তিমান ও শক্তিকে পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠা করে পরবর্তীকালে শাক্তধর্ম ও শাক্তদর্শনের উদ্ভব ঘটল। ভারতীয় দর্শনে শক্তিবাদের বীজমন্ত্র হ'ল এই দেবীসূক্ত, যা শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভিত্তিভূমি।

আরেকটি বহুখ্যাত সূক্ত হল 'নাসদীয় সূক্ত'। বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিভংগি এমনভাবে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। এখানে এক 'অবিদ্যমান বস্তু'-র কথা বলা হয়েছে। এই বস্তুটি হতে পারে স্থূল আকাশ বা মহাকাশ। এই অবিদ্যমান বস্তুই সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে অবস্থান করছিল, যার থেকে বিশ্বের সৃষ্টি শুরু। সাংখ্য যেমন অনেকটা পরে 'আকাশ' নামক স্থূলভূতটিকে অন্য চারটি স্থূলভূতের উপাদান স্বরূপ বলেছেন, সেই রকম কথা ঋগ্বেদও বলছে তার নাসদীয় সূক্তে। সুতরাং প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক তথা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে আকাশ তথা মহাকাশ ছিল বিশ্বসৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 129 তম সূক্তটি 'নাসদীয় সূক্ত' নামে বিশ্ববিখ্যাত। এই সূক্তে সৃষ্টির ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানও তার কাছে হার মেনে যায়। গত ছয় হাজার বছরে সৃষ্টি সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দরতম বক্তব্য আর কেউ কোনদিন রাখে নি। নাসদীয় সূক্তটি

নিয়ে এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পুরাবৃত্তি করে এইটুকুই বলবো যে, নাসদীয় সূক্তের ঋষিরা যে ধরনের কথা বলেছেন, তার কিছু কিছু বলছেন একালের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সের (Quantum Physics) লোকেরা। সৃষ্টির আগে ছিল এক অদ্ভুত মহাশূন্য অবস্থা। মহাশূন্য ও শূন্যের মধ্যে তফাৎটা ঋষিরা জানতেন এবং বুঝতেন। তাই বলছেন বস্তু বা অবস্তু কিছুই সে সময় অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল না। ছিল না আকাশ অর্থাৎ স্পন্দনশীল শূন্য (Void)। ছিল না দেশ (Space), কাল (Time) ও নিমিত্ত (কার্য-কারণ সম্পর্ক)। তখন এক অবিদ্যমান বস্তুই ছিল। সে জীবিত ছিল বিনা বায়ুতে, আত্মশক্তির দ্বারা।

নাসদীয় সূক্তের ওই অন্ধকার আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের Blackhole বা কৃষ্ণ গহ্বর। অবিদ্যমান বস্তু হল অক্রিয়াশীল শক্তি। এই অক্রিয়াশীল শক্তি, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় Entropy, ওই মহাশূন্যতার নিঃশ্বাস- প্রশ্বাস স্বরূপ। শক্তি ঘনীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয় ইচ্ছায়। ইচ্ছা বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তি থেকে তৈরি হয় দেশ-কাল-নিমিত্ত। নাসদীয় সূক্তের আলো হল জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের 'Whitehole'। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার। স্বধা বা স্বয়ংক্রিয় শক্তি নীচে ছিল মানে গোলাকার বিশ্বের অভ্যন্তরে ছিল। প্রয়তি বা ইচ্ছা ছিল উর্ধ্বে। ইচ্ছার পরিণতিই প্রয়তির উর্ধ্বে থাকা। সৃষ্টির আদি ক্রিয়ার সময় দর্শক কেউ ছিল না। সুতরাং সৃষ্টির আদি ক্রিয়া সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে যে অবিদ্যমান বস্তুর কথা বলা হল তা শুধু আকাশ নয়, তা মহামানস। যা ওই স্পন্দনশীল শূন্যের আরও পূর্ববর্তী অবস্থা। নাসদীয় সূক্ত বলছে ওই মহামানস হয়ত এই বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলতে পারেন। বলতে পারেন সৃষ্টির আদি ক্রিয়ার রূপ কেমন ছিল। নাসদীয় সূক্তের ঋষি প্রজাপতি নিজেই অবশ্য এমন সন্দেহ প্রকাশও করেছেন যে, সেই মহামানসও সৃষ্টির আদি ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারেন। এই মহান সত্য একমাত্র হৃদয়ে অনুভব করা যায় ব্যাখ্যা করা যায় না। দর্শন এই স্তরে এসে অনুভূতির কথা বলে, বলে হৃদয় দিয়ে অনুভবের কথা। বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না, যুক্তি তথ্য সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। অবিদ্যমান ওই বস্তুকে কিছুটা পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে বলা হয়েছে 'অব্যক্ত'। এই অব্যক্তেই অবস্থান করে সৃষ্টি-পূর্বের প্রকৃতি-পুরুষ, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ। এই অব্যক্তই অবস্থান করে মহাশূন্যে, যা পরবর্তীকালে স্পন্দনশীল মহাশূন্য হয়ে 'আকাশ' নামে কথিত হয়। বাস্তবে এই আকাশ বা মহাকাশ অস্তিত্বহীন।

প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি [Ptolemy] [100-170 খ্রিস্টাব্দ] আকাশ এবং মহাকাশের বহু পর্যবেক্ষণের পর 140 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মহাকাশের প্রেক্ষাপটে পৃথিবী স্থির এবং এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। আর আকাশস্থিত সমস্ত বস্তু, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সবই নভোগোলকে অবস্থিত হয়ে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করছে। টলেমির মতবাদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। এখানে মনে করিয়ে দিই, গ্রীক সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে হাজার তিনেক বছর আগে। এই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে প্রায় 2500 বছর আগে, বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে। কিন্তু হরপ্পীয় সভ্যতা তার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল প্রায় 4500 বছর আগে, অর্থাৎ গ্রীক সভ্যতার চরম বিকাশের প্রায় দু'হাজার বছর আগে। স্বাভাবিক কারণে গ্রীকরা হরপ্পীয় এবং বৈদিক যুগের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেকটাই ধার করেছিল। টলেমি বসবাস করতেন আলেকজান্দ্রিয়া নগরে। তাঁর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদে সম্ভবতঃ মিশরীয় সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল। সিদ্ধান্তকালে, বৈদিক যুগের মত মেনে ভারতবর্ষ যখন বলছে, গ্রহ-উপগ্রহ এমন কি সূর্যও আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে ঘূর্ণায়মান, তখন তার অনেক পরে টলেমি 140 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বললেন যে, পৃথিবী স্থির। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র মায় সূর্যও পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমণরত। তাঁর এই তত্ত্বের সত্যতা না থাকলেও

তাঁর গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণসমূহ ছিল প্রায় নিখুঁত। কিন্তু তাঁর এই ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ছিল একেবারেই ভুল। এই ভুল তত্ত্বই প্রায় 1500 ধরে আঁকড়ে ছিল পাশ্চাত্যের দেশগুলি। কোপারনিকাস [Nicolaus Copernicus] [1473-1543 খ্রিস্টাব্দ] তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রচার করার পর টলেমির এই ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ বাতিল হয়ে যায়। কোপারনিকাসের অন্ততঃ এক হাজার বছর আগেই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট [476 খ্রিস্টাব্দ] নতুন করে বলেছিলেন, পৃথিবী একটি গোলক এবং এটি প্রতিদিন নিজের অক্ষের উপর একবার পাক খেতে খেতে সূর্য পরিক্রমা করে। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘোরার ঘটনাটা বৈদিক ধারণায় ছিল। আবার পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ এবং সূর্যের ঘোরার ব্যাপারটাও বৈদিক যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণায় অবশ্যই ছিল। কিন্তু টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ বাস্তবে ভুল হলেও, এই ভুল মতবাদ 1500 বছর ধরে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে চালু ছিল। তবে টলেমির অনেক আগেই গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস [Pythagoras] [খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী] কিন্তু টলেমির সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলে গেছেন। তাঁর মতবাদ ছিল বৈদিক, বেদাঙ্গ এবং সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুগামী। তাঁর অনুসরণকারী গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতবাদ বা তত্ত্বকে অনুসরণ করেছেন।

গ্রীকদের মধ্যে পীথাগোরাসই প্রথম মহাকাশ চর্চায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রয়োগ ঘটিয়ে বলেন, বিশ্বকে ভালো করে বোঝা যায় ঘূর্ণনের নীতিগুলির সাহায্যে। তিনি অনেকটা সাংখ্যদর্শনের মতই বললেন যে, এই বিশ্বের চারটি মূল উপাদান—মাটি, জল, বাতাস এবং আগুন। পঞ্চভূতের 'আকাশ' নামক স্থূলভূতটি ওঁর এই মতবাদে অনুপস্থিত। তিনি বললেন, পৃথিবী একটি গোলক। চন্দ্রের আলো পুরোপুরি প্রতিফলিত আলোকরশ্মি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পীথাগোরাসপন্থী হেরাক্লিড্‌স [Heracleids] [388-315 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] বললেন, গোলকাকার পৃথিবী মহাকাশে মুক্তভাবে ঘূর্ণায়মান। বুধ এবং শুক্র গ্রহ দুটি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এরাটোস্‌থিন্‌স [Eratosthenes] [276-194 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] নামের আর এক পীথাগোরাসপন্থী দার্শনিক তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানী পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অঙ্ক কষে বের করলেন। এই ব্যাসার্ধের মান ছিল আধুনিককালে মাপা ব্যাসার্ধের অনেকটাই কাছাকাছি। ভুল ছিল প্রায় 20%-এর মত। হেরাক্লিড্‌স এও বলেছিলেন যে, আকাশমণ্ডল নয় পৃথিবীটা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে বলেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাদের আমরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরতে দেখছি। এই ঘূর্ণন প্রতিদিনে একবার। এর ঘূর্ণন অক্ষ হল পৃথিবী থেকে ধ্রুবতারা অবধি টানা কাল্পনিক রেখা। হেরাক্লিড্‌সের মাথায় বুধ ও শুক্র গ্রহ দুটির সূর্য পরিক্রমণের কথা এলেও, পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণের কথা তিনি বলেন নি। এটা মাথায় এসেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানী তথা দার্শনিক অ্যারিস্টার্কাস [Aristarchus]-এর [310-230 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ]।

অ্যারিস্টার্কাস অঙ্ক কষে বের করলেন চন্দ্র ও পৃথিবীর ব্যাসের অনুপাত। তারপর চাঁদের কৌণিক আকৃতির পরিমাপ করে তিনি বের করলেন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব। অনুরূপ পদ্ধতিতে তিনি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব এবং পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের আয়তনও নির্ণয় করেন। তিনি তাঁর হিসাবে সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের 19 গুণ পেয়েছিলেন। সেই মত উনি বলেছিলেন, সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের 6.7 গুণ এবং সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের $(6.7)^3$ বা প্রায় 300 গুণ। এই পরিমাপগুলি সঠিক না হলেও, তাঁর পদ্ধতি কিন্তু ছিল একেবারে সঠিক। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর ব্যাসের 110 গুণ হল সূর্যের ব্যাস। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় 390 গুণ দূরত্বে অবস্থিত হল সূর্য। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। অ্যারিস্টার্কাসের পদ্ধতি অবলম্বন করেই এই মানগুলি এখন পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর পদ্ধতি ছিল সঠিক, কিন্তু ভুল ছিল তাঁর পরিমাপে। সামোস [Samos]

দ্বীপের এই অধিবাসী তাঁর মহাকাশ গবেষণায় কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। তিনিই গ্রীকদের মধ্যে প্রথম বললেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

পীথাগোরাসপন্থীদের এইসব মত সে সময় জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় নি। কারণ অবশ্য অজানা। তবে সাধারণ মানুষ চোখের সামনে যা দেখছে তাকে তারা অস্বীকার করতে পারে নি। প্রতিদিনই তারা দেখছে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। সেখানে যখন অ্যারিস্টার্কাস বললেন, সূর্য নয় পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণরত, তখন তা তাদের অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। সে কারণেই সম্ভবত অ্যারিস্টার্কাসের মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। এরপর টলেমি যখন তাঁর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের কথা বলেছিলিন, জনসাধারণ তা সহজেই গ্রহণ করে। কারণ, সাধারণ মানুষ চোখের সামনে দেখছে সূর্য-তারারা ঘুরছে, পৃথিবী স্থির রয়েছে। তাই প্রত্যক্ষ দর্শনে বিশ্বাসী জনসাধারণ টলেমিকে দ্রুত গ্রহণ করেছে। তাছাড়া পরবর্তীকালে টলেমির মতবাদ খ্রিস্টান ধর্মানুসারী হওয়ায় জনগণ সহজেই ওই মতবাদ গ্রহণ করে। টলেমির ভুল মতবাদ পাশ্চাত্যে চালু থেকেছে প্রায় 1500 বছর। অ্যারিস্টার্কাসরা সেকালের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হন নি।

টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ গড়ে ওঠার পিছনে অ্যারিস্টটলের [Aristotle] [384-322 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] মতবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল টলেমির প্রায় 500 বছর আগে পৃথিবীর স্থির থাকার কথা বলেছিলেন। অ্যারিস্টটলই প্রথম গ্রীক দার্শনিক যিনি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় নিখুঁত কারণের সুসংবদ্ধ প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'বিশ্ব-ব্যবস্থা' পরবর্তীকালে যাবতীয় কার্যকর জ্ঞানের সংশ্লেষণ বলে স্বীকৃত হয়। অ্যারিস্টটল যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, পৃথিবী যদি চলমান এবং ঘূর্ণায়মান হত তবে মানুষ তার সাধারণ জ্ঞানের অনুভূতিতেই তা অনুভব করতে পারতো। তাছাড়া তাঁর চালিকাশক্তির তত্ত্বানুসারে পৃথিবীপৃষ্ঠের সমস্ত গতি এবং পৃথিবীর গতিও একসময় বন্ধ হয়ে যাবে, যদি কোনও বল ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ না করা হয়। তাঁর মত ছিল প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে। পৃথিবীর ঘূর্ণন বা চলন যাই হোক না কেন তা মহাশূন্যে হচ্ছে না। অতএব এই চলন বা ঘূর্ণনে ঘর্ষণজনিত বাধা থাকবেই। এই বাধাই পৃথিবীর নিরন্তর চলন বা ঘূর্ণন প্রতিহত করবে। সুতরাং অ্যারিস্টটল বললেন, পৃথিবী গতিশীল নয়, পৃথিবী স্থির। এইভাবে অ্যারিস্টটল গতির সঙ্গে বলের সম্পর্ক থাকার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী স্থির। এই ভুল সংশোধন করেন নিউটন [Isaac Newton]। অ্যারিস্টটলের প্রায় 2000 বছর পরে। নিউটন দেখান যে, বলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ত্বরণের [P = mf]। বল = ভর × ত্বরণ। অ্যারিস্টটল বললেন, গাগনিক বস্তুগুলির গতির ক্ষয় হয় না, কারণ তারা মহাকাশে তাদের স্বাভাবিক বৃত্তাকার পথে পরিক্রমণরত। বৃত্তাকার পথে গোলকাকার বস্তুগুলির সমবেগে চলন-ঘূর্ণনে তাদের গতির পরিবর্তন হয় না। তাঁর মতে আকাশের বস্তুগুলি সাধারণত গোলাকার। সুতরাং বৃত্তাকার পথে তাদের ঘূর্ণন বা চলন গতির কোনও ক্ষয় বা ঘাটতি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বেলায় তা হয়। কারণ, ওই সমস্ত গাগনিক বস্তুগুলি প্রাথমিক গতি লাভ করেছিল প্রান্তবর্তী গোলক, স্থির নক্ষত্রসমূহ এবং ঐশ্বরিক শক্তি থেকে। কিন্তু পৃথিবী এই সব শক্তি লাভ করেনি। অতএব পৃথিবী স্থিরই আছে—এই ছিল অ্যারিস্টটলের মতবাদ। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় অবশ্য উল্কাদের কথা আনেন নি। অ্যারিস্টটলের এই ভুল তত্ত্ব টলেমির দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রায় 2000 বছর ধরে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিরাজ করে।

অ্যারিস্টটল মহাকাশের ব্যাখ্যায় দেশ [Space] কিংবা কালকে আনেন নি। এনেছেন ভগবান [God]-কে। রামানুজাচার্যের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিকেও নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে

চিরকাল একই সংখ্যক জীবন্ত প্রাণীর প্রজাতি বিদ্যমান। মহাকাশ বা আকাশ মহাশূন্য নয়। প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করতে পারে না। বিশ্ব চিরন্তন এবং এটি অসীমভাবে প্রসারিত হয়ে চলেছে অতীতের দিকে এবং যুগপৎ ভবিষ্যতের পানেও, যদিও মহাকাশে এর অবস্থান সসীম। আকাশ, মহাকাশ, বিশ্ব, পৃথিবী ইত্যাদি সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণায় অনেক ভ্রান্তি থাকলেও, তিনি এগুলির সম্পর্কে একটা সুসংবদ্ধ মতবাদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যার অনেকগুলিই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিককালের তত্ত্বে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আকাশ, মহাকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি নিয়ে অ্যারিস্টটলের ধারণার চেয়ে অনেক উন্নততর ধারণা রয়েছে ভারতীয় বৈদিক সভ্যতায়, উপনিষদীয় দর্শনে এবং পৌরাণিককালের পুরাণসমূহে কথিত ইতিহাসে। মহর্ষি কপিলের নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শন তো একাই একশো!

সহজেই অনুমেয়, টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদে অ্যারিস্টটলের প্রভাব কতটা বিশাল। টলেমির এই ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ সংক্ষেপে বলে নিয়ে মহাকাশের সেকাল প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রায় 1500 বছর ধরে টিকে থাকা তাঁর এই ভ্রান্ত তত্ত্ব যেমন বিস্ময়ের, তার টিকে থাকাও তেমনি বিস্ময়কর। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে টলেমির কথা একবার বলা হয়েছে।

গ্রীক-মিশরীয় বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমিউস [Claudius Ptolemaeus] জন্মেছিলেন 100 খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি মারা যান 170 খ্রিস্টাব্দে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া মানমন্দিরে তিনি গবেষণা করেছিলেন 127 থেকে 151 খ্রিস্টাব্দ অবধি। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল এবং অঙ্ক। তাঁর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ তেরোশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রবলভাবে চালু থাকে। তাঁর এই মতবাদ ভুল বলে প্রমাণিত হয় কোপারনিকাস্-গ্যালিলিওর আবিষ্কারে। অবশ্য তাঁর প্রায় তিনশ' বছর পরে আচার্য আর্যভট প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর ঘোরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারিদিকেও ঘোরে। সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন ভারতবর্ষে। নানা কারণে আর্যভটের সেই তত্ত্ব পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়নি।

টলেমি বহুকাল ধরে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের পরে তাঁর বিখ্যাত বই 'আলমাজেস্ট' (Almagest] লিখেছিলেন। এই বইটি তেরোটি বইয়ের সংকলন। বইটি প্রকাশিত হয় 150 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই বইটি লিখতে তিনি পের্গার [Perga] অ্যাপোলোনিয়াস [Appollonius] [220 খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ] এবং রোডসের [Rhodes] হিপ্পারকাসের [Hipparchus] [150 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাপত্রগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। ওই গ্রন্থের প্রথম দুটি বইয়ে আছে পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং তাঁর গাণিতিক পদ্ধতিসমূহ। এখানেই তিনি বললেন, বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী স্থির। সূর্য, চন্দ্র গ্রহসমূহ এবং নক্ষত্রগুলি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণরত। এই মতবাদ 'ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ' [Geo-centric Theory] হিসাবে খ্যাত। টলেমিই এর প্রবক্তা। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চিত্র ঃ 1 দেখা যেতে পারে।

তাঁর মতে মহাকাশ হল এককেন্দ্রিক [Concentric] একটি শূন্যগর্ভ গোলক, যার অক্ষ গিয়েছে পৃথিবীর মধ্য দিয়ে এবং সে গোলকে নক্ষত্রদের অবস্থান। এই গোলক পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। ফলে, নক্ষত্রদের উদয় ও অস্ত দেখা যাচ্ছে। এই গোলক তার সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটি উজ্জ্বল গ্রহকেও নিয়ে ঘুরছে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গোলক আছে পৃথিবী ও নাক্ষত্রীয় গোলকটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে। তাঁর মতে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের পৃথিবী থেকে ক্রমান্বয়ে অবস্থান হল ঃ চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। ভূ-কেন্দ্রিক

মতবাদ অনুসারে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটি গ্রহদের অবস্থান দেখানো হয়েছে 1নং চিত্রে। বহুদিন ধরে চালু থাকার পর এই মতবাদ পরিত্যক্ত হয় কোপারনিকাস-গ্যালিলিওর আমলে এসে।

তাঁর মতে, নক্ষত্রমণ্ডলী সমন্বিত ওই গোলকের ঘূর্ণনের সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের নিজস্ব ঘূর্ণন গতি আছে। এগুলির প্রত্যেকে সমান বৃত্তাকার গতিসম্পন্ন। বাস্তব পর্যবেক্ষণে কিন্তু তা দেখা যায় না। চন্দ্রের নানা ধরনের গতির ব্যাখায় টলেমি অসুবিধায় পড়েছিলেন। তবে, সূর্যের ক্ষেত্রে তিনি বললেন যে, সূর্য বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিক্রমা করে এবং সে কক্ষপথের কেন্দ্র পৃথিবী থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এই দূরত্বটি সূর্যের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা [Eccentricity]। তাঁর এই মডেল সেকালের সূর্য-পর্যবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

হিপ্পারকাস ৪50টি নক্ষত্রের একটা তালিকা বানিয়েছিলেন। এই তালিকা অনুসরণ করে টলেমি 1,022টি নক্ষত্রের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও ঔজ্জ্বল্য প্রায় সঠিকভাবে নির্ণয় করে নতুন একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। টলেমি ভূগোল এবং আলোকবিজ্ঞান নিয়েও গবেষণা করেন। চর্চা করেন গণিতবিদ্যারও। আগেই বলেছি, 170 খ্রিস্টাব্দে 70 বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

একালের মহাকাশ বর্ণময়। তার মানে এই নয় যে, মহাকাশ ইদানীং বর্ণময় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত মহাকাশ প্রায় একই রকম বর্ণময় রয়েছে। আধুনিক দূরবীনদের কল্যাণে মহাকাশের রূপ এমন বর্ণময় হতে পেরেছে। মহাকাশের একটি বর্ণময় গ্যালাক্সীর ছবি 19 নম্বর চিত্রে দেওয়া হল মহাকাশ একালে কতটা বর্ণময় হয়েছে তার কিছুটা আঁচ দেওয়ার জন্য। মনে করিয়ে দিই, আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সীতে আছে 10,000 কোটি [10^{11}] নক্ষত্র। এতাবৎ আবিষ্কৃত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি। কোনওটা আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে ছোট, কোনওটা আবার তার চেয়ে বড়। ব্রহ্মাণ্ডগুলি নানা ধরনের। এদের নিয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং মহাকাশ পর্যবেক্ষণে আধুনিকতা সংযোজিত হওয়াতে মহাকাশ আজ এমন বর্ণময় হয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মহাকাশের পর্যবেক্ষণে আধুনিকতা যাঁরা এনেছেন তাঁদের কথা বলি মহাকাশের একাল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানান দিতে।

পাশ্চাত্যে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রথম প্রবর্তক বলা হয় কোপারনিকাসকে। তিনিই একালের প্রথম বিজ্ঞানী যিনি অ্যারিস্টটল, টলেমি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতদের বহুদিন ধরে চলে আসা মতবাদগুলি ঠিকমত মেনে নিতে পারেন নি। টলেমির [Ptolemy তথা Claudius Ptolemaeus ঃ 100-170 খ্রিস্টাব্দ] ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ [Geocentric Theory] বাতিল করে দিয়ে কোপারনিকাস [Nicolaus Copernicus] ওদেশে প্রথম বলেন যে, পৃথিবী স্থির নয়। পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর সারা দিনে-রাতে একবার মাত্র আবর্তন করে বলেই আকাশের জ্যোতিষ্কদের আমরা আকাশ পরিক্রমা করতে দেখি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কোপারনিকাস বলার অন্ততঃ হাজারখানেক বছর আগে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট [476 খ্রিস্টাব্দ] প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণরত, নক্ষত্রেরা স্থির, পৃথিবীর অক্ষপরিক্রমণের জন্য গ্রহ-নক্ষত্রদের প্রাত্যহিক উদয়-অস্ত হচ্ছে। আর্যভট তাঁর 'আর্যভটীয়' নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন 499 খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থেই পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও জীবিত ছিলেন।

নিকোলাস কোপারনিকাস জন্মেছিলেন 1473 খ্রিস্টাব্দের 19শে ফেব্রুয়ারী পোল্যান্ডের ভিস্টলা নদীর তীরে অবস্থিত টোরান [Torun] শহরে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল 'নিক্লাস কোপারনিগ্‌ক' [Niklas Koppernigk]। পরিণত বয়সে তিনি পিতৃদত্ত নামের পরিবর্তন করে নিজের নাম রাখেন

'কোপারনিকাস'। এই নামটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন গ্রীক নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। মনে করা হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ গ্রীসদেশের অত্যধিক সমাদর পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ছিল বলেই নিজের পিতৃদত্ত নামের এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন কোপারনিকাস।

কোপারনিকাসের বাল্যকাল কাটে ওই টোরান শহরে। লেখাপড়ায় তিনি বেশ ভালো ছিলেন। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ক্রাকাও [Krakow] বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রথমে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন। এই বিষয়গুলিতে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ইতালির বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রকে তিনি জীবিকার কাজে লাগান নি। প্রথম জীবনে তিনি গণিতের অধ্যাপকরূপেই কাজ শুরু করেন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে তাঁর এক ধর্মযাজক মাতুলের প্রেরণায় তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে ধর্মযাজকদের পদ গ্রহণ করেন। সারা জীবন তিনি ওই ধর্মযাজকের পদেই কাজ করে যান।

কোপারনিকাসের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে টলেমি তাঁর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ প্রচার করে বলেছিলেন, পৃথিবী স্থির এবং আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি এক অদৃশ্য শক্তির বলে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এই অদৃশ্য শক্তিকে বহুকাল ধরে ঈশ্বরের শক্তি বলে বিশ্বাস করা হতে থাকে। ধর্মযাজকরাও ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের জন্য এই মতবাদকে সমর্থন করেন। ফলে, কোপারনিকাসের সময় পাশ্চাত্যের সব মানুষই বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বরের অমোঘ নির্দেশেই স্থির পৃথিবীর চারদিকে সূর্যদেবতা ঘুরে ঘুরে পৃথিবীকে আলো দিয়ে যাচ্ছে। গ্রহ-নক্ষত্রেরাও পৃথিবী পরিক্রমণ করে চলেছে ঈশ্বরের ক্ষমতায়, ঈশ্বরের নির্দেশেই। এর বিরোধিতা করার সাহস তখন খুব কম মানুষেরই ছিল। এ ধরনের বিরোধিতা ছিল ধর্মদ্রোহিতার সামিল। ঈশ্বরের শক্তি খর্ব করা কোন মতবাদ সেকালের সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ধর্মযাজকরা কোনওভাবে মেনে নিতে পারতেন না। সুতরাং ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার দুঃসাহস সে সময় অতি বড় দুঃসাহসীরও ছিল না। কোপারনিকাসই টলেমির বহুকাল পরে পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম এই দুঃসাহস দেখান।

অনেক পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তা-ভাবনার পর তিনি ঈশ্বরের ওই শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। শেষে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, অনন্ত মহাশূন্যে ভাসমান অপরাপর জ্যোতিষ্কের মতই আমাদের পৃথিবীটা পুরোপুরি অবলম্বনহীন অবস্থায় আকাশে ভাসমান। কেবল তাই নয়, এই ভাসমান পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পাক খাচ্ছে। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের জন্য আমরা দেখছি আকাশের জ্যোতিষ্করা পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমদিকে অস্ত যাচ্ছে। কোপারনিকাসের এই মতবাদ ছিল সেকালের পাশ্চাত্য সমাজের কাছে পুরোপুরি এক 'বৈপ্লবিক মতবাদ'। তাঁর এই মতবাদ ছিল যুক্তি-নির্ভর, কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তা প্রমাণিত ছিল না।

কোপারনিকাস কিন্তু তাঁর এই মতবাদ প্রচার করতে সাহসী হলেন না। তিনি জানতেন প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বললেই সমাজে তুমুল ঝড় উঠবে। শুধু ধর্মযাজকরা নয়, গোটা সমাজই তাঁর বিরুদ্ধে যাবে। ধর্মদ্রোহিতার জন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। তাছাড়া নিজে ধর্মযাজক হয়ে কেমন করেই বা তিনি ঈশ্বরের মহিমার বিরুদ্ধে কথা বলবেন? এই সব চিন্তা করে তিনি তাঁর ওই মতবাদ প্রচার করা থেকে বিরত থাকলেন। ধীরে ধীরে তাঁর বয়স বেড়ে চলল। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে তিনি তাঁর ওই বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচারের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। এই সময় তিনি একটি বই

লিখলেন তাঁর ওই মতবাদ নিয়ে। বইটি তাঁর এক বন্ধু ছাপালেন কোপারনিকাসেরই অনুরোধে। বইটির নাম 'On The Revolutions of the Celestial Spheres'।

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল তদানীন্তন পোপ তৃতীয় পলের উদ্দেশে। তবু দ্বিধাগ্রস্ত প্রকাশক ওই বইটির ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এই পুস্তকে বর্ণিত তথ্যটি একটি গাণিতিক কৌশল মাত্র। সত্য বলে মনে করার কোন কারণ নেই।" কোপারনিকাস ছাপার আকারে বইটি হাতে পেলেন তাঁর মৃত্যুশয্যায়। তাই তাঁকে সাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় নি। কিন্তু বইটি প্রবল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শেষকালে বইটির ভূমিকা দেখিয়ে জনসাধারণকে নিবস্ত করা হয়। কিন্তু ধর্মযাজকরা নিরস্ত হলেন না। তাঁরা বাইবেল-বিরোধী মতবাদের জন্য প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলেন। কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আগেই কোপারনিকাস দেহত্যাগ করেন। দিনটা ছিল 1543 খ্রিস্টাব্দের 24শে মে।

প্রতিহিংসাকামী ধর্মযাজকমণ্ডলী পরম আক্রোশে বইটিকে ধর্মদ্রোহিতামূলক গ্রন্থ হিসাবে ঘোষণা করে জনসাধারণ যাতে এই ধরনের বইয়ের সংস্পর্শে না আসে তার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা নিলেন। সে সময় কোপারনিকাসের ওই বৈপ্লবিক মতবাদ একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। তবু এই মতকে সমর্থন করার জন্য ইতালির আরেক দার্শনিক-বিজ্ঞানী ব্রুনো-কে [Giordano Bruno] [1548-1600 খ্রিস্টাব্দ] পুড়িয়ে মারা হয় 1600 সালের 17ই ফেব্রুয়ারী। কোপারনিকাস মূলতঃ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন। কোপারনিকাসই প্রথম মহাকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তিনিই একালে প্রথম ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদকে বাতিল করে দেন। এরপরেই আসরে আসেন টাইকোব্রাহে [Tycho Brahe 1546-1601 খ্রিস্টাব্দ]

টাইকো ব্রাহে ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করেন 1546 সালের 14ই ডিসেম্বর। তাঁর পূর্বপুরুষেরা থাকতেন সুইডেনে। পরে তাঁরা ডেনমার্কে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর টাইকো ব্রাহে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানের পড়াশুনা শেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য তিনি পুনরায় ভর্তি হন লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে [Leipzig University]। কোপেনহেগেনে পড়ার সময় তিনি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি দেখে এতো মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই তিনি মনঃসংযোগ করতে পারছিলেন না। তাই কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে তিনি লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য।

1573 সালে টাইকো ব্রাহে তাঁর প্রথম গবেষণামূলক বইটি প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি সুপারনোভা [Supernova] সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। একটি বিশেষ ধরনের দূরবীনের সাহায্যে তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন নক্ষত্রের শেষ পরিণতি। ট্রাইকো ব্রাহেকে বলা হয় নতুন তারার আবিষ্কারক। তাঁর আবিষ্কার এতোটাই সাড়া ফেলেছিল যে, ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক তাঁর জন্য একটি মানমন্দির বানিয়ে দেন। এই মানমন্দিরটি ছিল কোপেনহেগেন থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত ভেন [Ven] দ্বীপে। তাঁর মহাকাশ সম্বন্ধীয় গবেষণা চলে প্রায় বিশ বছর ধরে এই মানমন্দিরেই। ডেনমার্কের রাজা ভেন দ্বীপের প্রায় 2000 একর জায়গা ব্রাহেকে দিয়ে দেন এই মানমন্দির বানানোর জন্য। এছাড়া তাঁর গবেষণার সব খরচ-পত্র রাজাই বহন করতেন। ভেন দ্বীপে যে শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল তা নয়, এখানে অ্যালকিমির একটা পরীক্ষাগার [Alchemical

Laboratory]-ও বানানো হয় ব্রাহের জন্য। একটি দুর্গের মধ্যে স্থাপন করা হয় এই মানমন্দির ও পরীক্ষাগার। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এখানে গবেষণা করেন।

ট্রাইকো ব্রাহের অনেকগুলি গবেষণা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিশেষত তাঁর মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে গবেষণার ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। তিনি কোপারনিকাসের মতবাদকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারেন নি। আবার এই মতবাদের বিরোধিতাও তিনি করেন নি। তাঁর শেষ জীবনটা ছিল দুঃখময়। রাজার অনুগ্রহভাজন হওয়ায় এক শ্রেণীর অভিজাত লোক তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করতে থাকে এবং নানা হীন ষড়যন্ত্র করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। ফলে, তিনি তাঁর মানমন্দির ছেড়ে বাইরে খুব একটা বের হতেন না। পরে শত্রুদের চক্রান্তে তাঁকে দেশছাড়া হতে হয়। জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি নির্বান্ধব অবস্থায় প্রাগে [Prague] কাটান। গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি প্রাগের প্রবাসেই দেহত্যাগ করেন 1601 খ্রিস্টাব্দের 24 শে অক্টোবর। মৃত্যুর সময় তাঁর সব মূল্যবান গবেষণাপত্র তিনি কেপলারকে দিয়ে যান।

কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক মতবাদে যে সব জ্যোতির্বিজ্ঞানী সে সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা হলেন জোহান্নেস কেপলার [Johannes Kepler]। তিনি জন্মেছিলেন 1571 খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর 'ভেইল' [Weil der Stadt] শহরে। কেপলারের পিতার আর্থিক অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিল যে, একটু বেশি বয়েসেই তাঁকে স্থানীয় এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কেপলার অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলের পাঠ শেষ করে ভর্তি হন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তিনি বি-এ পাশ করেন টুবিংগেন [Tubingen] থেকে এবং গণিতের অধ্যাপক হিসাবে ওখানেই কাজে যোগ দেন। এই সময় তিনি টাইকো ব্রাহের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সহকারী হিসাবে বেশ কিছুদিন কাজও করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা। অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি তাঁর গবেষণাও চালিয়ে যান। কোপারনিকাসের বইটি পড়ার পর কেপলার ওই বৈপ্লবিক মতবাদকেই সমর্থন করেন। এই সমর্থনের কথা সবার কাছে তুলে ধরতেই তিনি একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'Cosmographic Mystery' বা 'ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য'। কেপলার বইটি লেখার পর তার একটি কপি সে সময়ের সেরা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামতের জন্য। গ্যালিলিও কী মতামত দিয়েছিলেন তা অজানা। তবে কেপলারের এই বইটি এবং তাঁর আবিষ্কার পরবর্তীকালের গবেষকদের পথকে অনেকটাই প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইটি হলো 'New Astronomy'। দীর্ঘকাল গবেষণার পর 1609 সালে তিনি এই বইটি প্রকাশ করেন। এই বইয়েই তিনি দেখিয়েছিলেন সূর্যের চারিদিকে গ্রহেরা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের জন্যই গ্রহেরা ঘুরতে ঘুরতে কখনও সূর্যের নিকটবর্তী হচ্ছে, আবার কখনও দূরে চলে যাচ্ছে। কেপলারই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক মতবাদকে প্রমাণ করলেন এবং গ্রহদের পরিক্রমণ পথের সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক তথ্য জানালেন। তিনিই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, কোনও গ্রহের কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়।

কেপলারের আবিষ্কারগুলিতে প্রভাব রয়েছে টাইকো ব্রাহের আবিষ্কারগুলির। ব্রাহে তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকেই প্রাগে ছিলেন রাজকীয় গণিতবিদ হিসাবে। কেপলার শুধু তাঁর সহকারী হিসাবেই গবেষণা করেন নি, ব্রাহে তাঁর সারা জীবনের সব মূল্যবান গবেষণাপত্রও কেপলারের হাতে তুলে দেন তাঁর মৃত্যুর আগে। কেপলার টুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কাজ শুরু করলেও তিনি অস্ট্রিয়ার গ্রাজ [Graz]-এর এক ধর্মীয় স্কুলে প্রায় ছয় বছর কাটান। পরে ব্রাহের জায়গায় তাঁর মৃত্যুর পর কেপলার বারো বছর কাজ করেন রাজকীয় গণিতবিদ হিসাবে।

এরপর 14 বছর তিনি অস্ট্রিয়ার লিঞ্জে [Linz] জেলা-গণিতবিদ [District Mathematician] হিসাবে কাটান। এরপর কিছুদিন করে কাজ করেন উলম্ [Ulm] এবং সাগান [Sagan] শহর দুটিতে। কেপলার জন্মেছিলেন 27শে ডিসেম্বর, 1571 খ্রিস্টাব্দ। তিনি মারা যান 1630 সালের 15ই নভেম্বর। কেপলার ছিলেন চিররুগ্ন। তার উপর গবেষণার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকায় তিনি শরীরের উপর নজর দিতে পারতেন না। ফলে, অল্প বয়সেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। 1630 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 59 বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। আকাশ-চর্চায় কেপলারের অবদান অসমান্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় নানা আবিষ্কার কেপলারকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এবং পদার্থবিজ্ঞানে অমর করে রেখেছে। তাঁর নানা আবিষ্কারের মধ্যে গ্রহের গতি সংক্রান্ত তিনটি সূত্র ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সূত্রগুলি আজও পদার্থবিজ্ঞানে 'কেপলারের সূত্র' [Kepler's Law] নামে বহুল পরিচিত। সূত্র তিনটি হল ঃ

(1) সমস্ত গ্রহ সূর্যকে উপবৃত্তকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। ওই কক্ষপথের দুটি নাভি বা কেন্দ্রবিন্দুর [Focus] একটিতে সূর্য অবস্থান করে।

[All Planets move about the Sun in elliptical orbits, having the Sun as one of the foci.]

(2) কোন গ্রহের সঙ্গে সূর্যের সংযোগকারী ব্যাসার্ধ-ভেক্টর [Radious Vector] সমপরিমাণ সময়ে সমান পরিমাণ জায়গা জুড়ে অবস্থান করে।

[A radious-Vector joining any planet to the Sun sweeps out equal areas in equal lengths of time]

(3) গ্রহদের নাক্ষত্র পরিক্রমকালের (আবর্তনের) বর্গগুলি, সূর্য থেকে তাদের গড় দূরত্বের ঘনফলগুলির সমানুপাতিক।

[The squares of the sidereal periods (of revolution) of the planets are directly proportional to the cubes of their mean distances from the Sun.]

কেপলার আলোকবিজ্ঞান নিয়েও গবেষণা করেন। তাঁর এই সব গবেষণা এবং আবিষ্কার পরবর্তীকালে নিউটনের হাতে নতুন রূপ পায়। টাইকো ব্রাহের মৃত্যুর পর মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ ও সে কক্ষপথে তার গতি নিয়ে ব্রাহের অসমাপ্ত গবেষণা চালিয়ে যান তাঁর উপযুক্ত শিষ্য কেপলার। এই গবেষণার ফলশ্রুতিতেই আবিষ্কৃত হয় কেপলারের উপরোক্ত তিনটি সূত্র। পরে নিউটনের গবেষণায় কেপলারের আবিষ্কারগুলি অবশ্যই মুখ্য ভূমিকা নেয় ও তাঁর গাগনিক বলবিজ্ঞান [Celestial Mechanics] ওই আবিষ্কারগুলিকে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেয়।

কেপলারের সমসাময়িক আরেক বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিপ্লব এনেছিলেন। তিনি গ্যালিলিও গ্যালিলি [Galileo Galilei] এবং গ্যালিলিও নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি জন্মেছিলেন ইতালির পিসা [Pisa] শহরে 1564 খ্রিস্টাব্দের 15ই ফেব্রুয়ারী। বিজ্ঞানকে দার্শনিক চিন্তার মোড়ক থেকে বের করে এনে সরাসরি গবেষণার পথে নিয়ে আসার প্রথম কৃতিত্ব গ্যালিলিওর। তিনি একাধারে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেন এবং গাণিতিকভাবে আবিষ্কৃত তত্ত্বকে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণের বন্দোবস্ত করেন। চন্দ্রের উপরের বিশ্ব এবং চন্দ্রের নিচের বিশ্ব—বহুকাল ধরে চলে আসা এই ধারণার অবসান ঘটিয়ে, তিনি একই তত্ত্ব দিয়ে গাগনিক ঘটনা এবং পার্থিব ঘটনার ব্যাখ্যা

চালু করেন। গবেষণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তক তিনিই। আধুনিক বলবিজ্ঞানের [Mechanics] জনক গ্যালিলিও মহাকর্ষ ও পরবর্তীকালে নিউটনের আবিষ্কৃত তিনটি গতিসূত্রের প্রথম দুটির কথা অনানুষ্ঠানিকভাবেই বলেছিলেন। তিনি মারা যান ৪ই জানুয়ারী, 1642 খ্রিস্টাব্দে।

1574 সালে গ্যালিলিও পরিবার ফ্লোরেন্সে চলে যান পিসা ছেড়ে। ফ্লোরেন্সের ভ্যালোমব্রোসা [Vallombrosa] মঠে পড়াশুনা শেষ করে 1581 সালে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। অর্থাভাবের জন্য কোনও ডিগ্রিলাভের আগেই 1585 সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছেড়ে দেন। পিসার থেকে ফিরে যান ফ্লোরেন্সে। 1586 সালে তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন 'উদস্থিতিক তুলা' [Hydrostatic Balance]-র উপর। এই তুলাযন্ত্র তাঁরই আবিষ্কার। সারা ইতালিতে এই আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ে। 1589 সালে কঠিন বস্তুসমূহের ভারকেন্দ্র [Centre of Gravity] সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাপত্রের জন্য তাঁকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, বিভিন্ন ভরের বস্তু বিভিন্ন গতিতে পৃথিবীতে পতিত হয়। গ্যালিলিও এর উপর তথা বস্তুর গতির উপর গবেষণা শুরু করলেন 1590 খ্রিস্টাব্দে। 1592 সালে তিনি পাডুয়া [Padua] বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। গ্যালিলিও এখানে 18 বছর কাজ করেন। কথিত আছে, পিসা ছাড়ার আগে তিনি সেই অতি বিখ্যাত পরীক্ষা দেখান তাঁর ছাত্রদের। পিসার হেলানো মিনার থেকে তিনি বিভিন্ন ভরের কতকগুলি বস্তুকে নিক্ষেপ করে দেখালেন যে, সমান উচ্চতা থেকে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ভরের বস্তু একই সঙ্গে মাটিতে পড়ছে। অর্থাৎ পতনশীলবস্তুর গতি এবং ভর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নয়। পাডুয়াতে থাকাকালীন 1604 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তত্ত্বীয়ভাবে গ্যালিলিও প্রমাণ করেন, পতনশীল বস্তু সমবেগে ত্বরান্বিত গতির নিয়ম মেনে চলে। সমবেগে ত্বরান্বিত গতি হল এই গতিতে কোনও বস্তুর ত্বরণ বা মন্দন সময়ের সঙ্গে সমহারে হতে থাকে। গ্যালিলিও এই সময় বস্তুর অধিবৃত্তাকার পতনের [Parabolic Fall] সূত্র আবিষ্কার করেন। গতিজাড্য ও স্থিতিজাড্যের আবিষ্কর্তাও গ্যালিলিও।

বলের [Force] সঙ্গে গতির সম্পর্কের সূত্রগুলি গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন নি ঠিকই, কিন্তু এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক আছে একথা তিনি বার বার বলেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য নিউটন গতিসূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। বায়ুপূর্ণ তাপমান যন্ত্রও [Thermometer] তাঁর আবিষ্কার। আলো নিয়েও তিনি বেশ কিছু গবেষণা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর আবিষ্কার তাঁর সময়ের নিরিখে তুলনাহীন। তাঁর একটা বড় কীর্তি হল শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ। গ্যালিলিওর আগেও দূরবীন ছিল, কিন্তু এতো শক্তিশালী ছিল না। দূরবীনের কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গ্যালিলিও। তাঁর আবিষ্কৃত দূরবীন পদার্থবিজ্ঞানে 'গ্যালিলীয় দূরবীন' [Galilean Telescope] নামে খ্যাত। তাঁর এইসব শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তিনি মহাকাশের গবেষণা শুরু করেন 1609 খ্রিস্টাব্দে। 1610 সাল নাগাদ তিনি আবিষ্কার করেন ঃ (1) চন্দ্রপৃষ্ঠ একেবারেই বন্ধুর। পাহাড়, পর্বত আর মৃত আগ্নেয়গিরিতে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের সঠিক ব্যাসও তিনি নির্ণয় করেন। সে সময় বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কাছে এসেছিলেন তাঁর দূরবীনে চন্দ্রপৃষ্ঠ দর্শনের জন্য। সে সময় চন্দ্র-পর্যবেক্ষণের শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। (2) তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কার হল, 'সৌর কলঙ্ক' [Sun Spots] (3) পরের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল, শনিগ্রহের বলয়। অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা শনি গ্রহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই গ্রহের নিরক্ষবৃত্ত বেষ্টন করে অবস্থান করছে একে একে তিনটি বলয়। গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনে এই বলয়দের আবিষ্কার করেন। অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও শনির বলয়কে গ্যালিলিওর দূরবীনে দেখে চোখ ফেরাতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, ওই বলয়গুলি গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট নয়। অতি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে বৃহৎ বস্তুখণ্ড সব সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে

গ্রহটিকে ঘিরে। গ্যালিলি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে দেখিয়েছিলেন সেই সুন্দর দৃশ্য। (4) বৃহস্পতিকে দূরবীনে ভালো করে দেখেছিলেন গ্যালিলিও। এর চারটি উপগ্রহ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। (5) তিনিই প্রথম বলেন, আকাশের ছায়াপথ [Milkyway] অতি দূরবর্তী অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। (6) ভূ-পরিক্রমণ মতবাদ তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন। কোপারনিকাস যা প্রচার করতে ভয় পেয়েছিলেন, গ্যালিলিও তা সাহসের সঙ্গে প্রচার করেন। তবে, তিনি বিশ্বাস করতেন, গ্রহেরা সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণ করে। কেপলারের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সূত্র তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদকে একেবারে বাতিল করে কোপারনিকাসের ভূ-পরিক্রমণ মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করেন, প্রমাণও করেন।

গ্যালিলিওর আমল থেকেই দূরবীনের মাধ্যমে সত্যিকারের মহাকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। শনির বলয় দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে অপার বিস্ময়ে আপ্লুত হতেন বর্ণময় গ্যালাক্সীগুলিকে দেখে, মহাকাশের বিস্ময়কর বিশালত্ব এবং তার বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে। মহাকাশে এখন বর্ণময়তা তার দিকে দিকে।

গ্যালিলিও বললেন, আকাশে সূর্য স্থির আছে, আর পৃথিবীই নিজের অক্ষের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে সূর্য পরিক্রমায়। তিনি আরও বললেন, পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ এবং প্রতিটি গ্রহকে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করতে হচ্ছে। এই পরিক্রমণের কারণ জানতে গিয়েই নিউটন আবিষ্কার করেন মহাকর্ষ [Gravitation]। কিংবা বলা যায়, মহাকর্ষ ধারণা দিয়েই নিউটন গ্রহদের এই পরিক্রমার কারণ ব্যাখ্যা করেন গ্যালিলিওর ঠিক পরে পরেই।

1632 সালে গ্যালিলিও অনেক গবেষণা করে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত বই "Dialogue Concerning the Two Chief World Systems — Ptolemaic and Copernican"। এই বইয়ে তিনি কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক মতবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। ধর্মযাজকরা গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেন। তদানীন্তন পোপের আদেশে তদন্ত করে বিচার শুরু হল গ্যালিলিওর। বিচারক ধর্মাযাজকদের পক্ষ সমর্থন করলেন। আদেশ হল, গ্যালিলিও কোপারনিকাসের মতবাদে বিশ্বাস করে এবং তার প্রচার করে ধর্মদ্রোহিতাই করেছেন। এই মতবাদ প্রত্যাহার না করলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে। গ্যালিলিও শপথ নিয়ে প্রকাশ্যে বর্জন করলেন [Abjured], অভিশাপ দিলেন [Cursed] এবং নিরতিশয় হেয় করলেন [Detested] তাঁর নিজের ওই আবিষ্কারকে। তিনি বাধ্য হয়েই স্বীকার করে নিলেন যে, পৃথিবী স্থির, অন্যরা তার চারিদিকে ঘুরছে। 1633 সালের 21 শে জুন তাঁর ওই স্বীকারোক্তির পরেও বিচারক তাঁকে কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পোপ অবশ্য এই কারাদণ্ডের আদেশ বদল করে তাঁকে গৃহবন্দী রাখার আদেশ করেন। গ্যালিলিও 1633 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে মৃত্যুর দিন অবধি তাঁর ফ্লোরেন্সের বাড়ীতে গৃহবন্দীই ছিলেন। 1642 সালে ৪ই জানুয়ারী তিনি দেহত্যাগ করেন। শেষ জীবনটা তাঁর দুঃখেই কেটেছে। একদিকে রাজরোষ, অন্যদিকে ধর্মযাজকদের ঘৃণা ও গৃহবন্দী থাকা, গ্যালিলিওর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। শেষে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায় সত্য সত্যই তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দোলকের গতি সম্পর্কিত আবিষ্কারগুলি থেকে ওলন্দাজ [Dutch] বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হুইগেনস্ [Christian Huygens] 1656 সালে ঘড়ি বানিয়ে ফেললেন। বায়ুপূর্ণ তাপমান যন্ত্র, যা গ্যালিলিওর আবিষ্কার, তার থেকেই নির্মিত হয় আধুনিককালের থার্মোমিটার।

পদার্থবিজ্ঞানের নানা গবেষণায় গণিতশাস্ত্রকে কাজে লাগিয়ে গ্যালিলিও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানচর্চার শুরু করেন। নিউটনের গতিসূত্রগুলির আবিষ্কারের পথিকৃৎ বলা যায় গ্যালিলিওকে। আবার বহুকাল ধরে চলে আসা টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদকে উৎখাত করে কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন গ্যালিলিও। দর্শনের মধ্যে আবদ্ধ থাকা বিজ্ঞানকে মুক্ত করে তিনি তাকে স্বাভাবিক গতি দিয়েছিলেন। কোপারনিকাস বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্তক হলেও, গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব খাতে প্রবাহিত করেন। গ্যালিলিও তাই আধুনিক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। আধুনিক যুগের মহাকাশ-পর্যবেক্ষণের তিনিই আদি গুরু।

কোপারনিকাসের জন্ম থেকে গ্যালিলিও মৃত্যু তথা নিউটনের জন্ম অবধি অর্থাৎ 1473 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1642 খ্রিস্টাব্দ অবধি মোট 170 বছরের ইউরোপীয় সমাজে বিজ্ঞানচর্চা প্রায় নিষিদ্ধই ছিল বলা চলে। পোপ এবং ধর্মযাজকরা তখন সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা তাঁদের হাতেই সমাজশাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিলাস-ব্যসনে মত্ত। প্রাকৃতিক ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যাঁরাই চেষ্টা করতেন এবং বহুকাল থেকে চলে আসা ধারণা মিথ্যা বলতেন বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতেন, তাঁদের সবাই ধর্মযাজকদের চোখে ছিলেন ধর্মদ্রোহী। তাঁদের শাস্তির বিধান দিতেন পোপ। কোপারনিকাস, ব্রুনো এবং গ্যালিলিওদের যেমন করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, প্রায় সেই রকমভাবেই। সমাজের পরিবেশ ছিল একেবারে বিজ্ঞান বিরোধী। বাইবেল যা বলেছে তার বাইরে আর অন্যকোনও সত্য আছে বলা চলবে না। বাইবেলের কথাই সে সময় চরম সত্য বলে বিশ্বাস করা হত। সমাজ সে সময় ধর্মযাজকদের কথায় সহজে সায় দিত নানা কারণে। তাই বাইবেল-বিরোধী কোনও কথা, তা সে যতই সত্য হোক না কেন, বললে তাকে ধর্মদ্রোহিতার সামিল ধরা হত এবং তার জন্য শাস্তি পেতে হত। এইরকম একটা দমবন্ধ করা সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে নিউটন জন্মগ্রহণ করেছিলেন 4ঠা জানুয়ারী, 1643 সালে, যা জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে 25শে ডিসেম্বর, 1642 খ্রিস্টাব্দ।

নিউটনের পিতার নাম ছিল আইজাক [Isaac] অর্থাৎ তিনিও আইজাক নিউটন। পিতা ও পুত্রের নাম ছিল একই। নিউটনের পিতা মারা যান 1642 সালের অক্টোবর মাসে। অর্থাৎ নিউটনের জন্মের তিনমাস আগেই তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর বাবা ছিলেন সামান্য এক কৃষিজীবী। নিউটনের পিতা পড়াশুনা একেবারেই জানতেন না। নিজের নামটাও তিনি সই করতে পারতেন না। সুতরাং এক নিরক্ষর কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন মহাবিজ্ঞানী আইজাক নিউটন। তাঁর মায়ের নাম হান্নাহ্ আয়াস্কাফ্ [Hannah Ayscough]। নিউটন জন্মেছিলেন শারীরিক অপুষ্টি নিয়ে। তাঁর জন্মকালীন আকার-আকৃতি এতোই ছোট ছিল যে, কেউ ভাবেনি ওই শিশু দীর্ঘ 84 বছর বাঁচবেন।

নিউটন পরবর্তী জীবনে হয়ে ওঠেন মহাবিজ্ঞানী, ইংল্যান্ডের 'জাতীয় হিরো'। গত সহস্রাব্দের 'সেরা মানুষ' বলে চিহ্নিত হয়েছেন তিনি। নিউটন বিশ্ব খ্যাত তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বের জন্য। তাঁর গতিসূত্রগুলিও পদার্থবিজ্ঞানের অমূল্য রত্ন। আলোক বিজ্ঞানেও তার অবদান অসামান্য। তিনি আলোর কণিকাতত্ত্বের আবিষ্কারক এবং সাদা আলো সাতটি রংয়ের সমাহার এরও আবিষ্কর্তা তিনি। তাঁর বহু আবিষ্কারের মধ্যে সেরা হল 'মহাকর্ষ তত্ত্ব'। 1665-66 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর মনে মহাকর্ষ নিয়ে প্রথম প্রশ্ন জাগে। বহুশ্রুত সেই আপেল-কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা। উল্‌স্‌থর্পে [Woolsthorpe] ছুটি কাটানোর সময় একটি পড়ন্ত আপেলকে দেখে তাঁর মনে নাকি এই প্রশ্ন জেগেছিল "আপেল নীচের দিকে পড়ে কেন?" প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, প্লেগের ভয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দু'বছর ধরে বন্ধ

থাকায় নিউটন ওই সময় উল্‌স্‌থর্পে নিজের বাড়ীতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। এই সময় তাঁর চিন্তায় যে সব নতুন তত্ত্ব ধরা দেয় মহাকর্ষ তত্ত্ব তাদের অন্যতম।

নিউটন জন্মেছিলেন লিংকনশায়ারের [Lincolnshire] অন্তর্গত গ্র্যান্থাম [Grantham] শহরতলির উল্‌স্‌থর্পে। আধুনিক বিজ্ঞানের তিনিই প্রথম পুরুষ। আমাদের কাছে তিনি মহাবিজ্ঞানী মহামতি স্যার আইজাক নিউটন। প্রায় কুড়ি বছরের চিন্তায় গবেষণায় তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর অতি বিখ্যাত মহাকর্ষ তত্ত্ব। বন্ধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালীর [Edmund Halley] অনুরোধে 1684 খ্রিস্টাব্দে নিউটন তাঁকে গতির উপর একটি প্রবন্ধ লিখে দেন 'De Motu' [The Motion] নামে। তার প্রায় তিন বছর পরে 1687 সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Philosophiae Neturalis Principia Mathematica"। বইটি 'প্রিন্সিপিয়া' [Principia] নামে খ্যাত। এই গ্রন্থের প্রকাশনার সব খরচ বহন করেন হ্যালী। তিনি প্রুফ (Proof) দেখার কাজও করেছিলেন। এই বিশাল গ্রন্থেই রয়েছে তাঁর গতি বিজ্ঞান এবং মহাকর্ষ তত্ত্ব। আলোকবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর আবিষ্কারগুলি প্রকাশিত হয় আরেক বিখ্যাত গ্রন্থ 'Opticks'-এ। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে 1727 খ্রিস্টাব্দের 31শে মার্চ [জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে 20শে মার্চ]।

প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত এর প্রথম অংশে আছে নিউটনের সেই অতিবিখ্যাত গতি-সূত্র (Laws of Motion)। এগুলি এখন সর্বজন পরিচিত ঃ

(1) Every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line, unless it is compelled to change that state by force impressed on it (Inertia);

(2) The change in motion is proportional to the motive force impressed and is made in the direction of the straight line in which that force is impressed (P = mf);

(3) To every action there is always an opposed and equal reaction.

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আছে বস্তুর বিভিন্ন গতির কথা, বাধা বা ঘর্ষণ-সমন্বিত মাধ্যমে বস্তুর গতির কথা এবং তরলের বিভিন্ন গতি ইত্যাদির কথা। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'System of the World'। এই পরিচ্ছেদেই তিনি পেশ করেন তাঁর বিখ্যাত 'মহাকর্ষ তত্ত্ব'। এই বিশ্বে প্রতিটি বস্তুকণা প্রতিটি বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের অভ্যন্তরীণ দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

বস্তুকণা দুটির ভর যদি M ও m হয় এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব যদি d হয়, তবে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বল F হবে এই রকম ঃ $F = G\frac{Mm}{d^2}$

যেখানে, G হল মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (Gravitational Constant), যার মান সি. জি. এস. পদ্ধতিতে 6.670×10^{-11} নিউটন-মিটার^2 / কিলোগ্রাম^2। বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস 1798 সালে এর মান বের করেচিলেন 6.670×10^{-11} নিউটন-মিটার^2/কিলোগ্রাম^2। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মান হল $(6.670 \pm .005) \times 10^{-11}$ নিউটন-মিটার^2/কিলোগ্রাম^2। দুটি এক কিলোগ্রাম ভরের বস্তু মহাশূন্যে বা শূন্যস্থানে এক মিটার দূরে রাখলে প্রায় বারো ঘন্টা সময় নেবে তারা পরস্পরকে ধাক্কা মারতে। সুতরাং মহাকর্ষীয় বল খুবই দুর্বল।

নিউটনের এই তত্ত্বে মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের বস্তুগুলির আয়তন যাইহোক না কেন, প্রত্যেকটির ভরকে মনে করতে হবে বস্তুটির একটি কেন্দ্রে একটি বিন্দুতে অবস্থিত। এই কেন্দ্রবিন্দুকে বলা হয় বস্তুটির ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity)। বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে, তা সে আয়তনে যাইহোক না কেন,

মনে করতে হবে এক একটি ভরবিন্দু বা Mass-Point। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের সব বস্তুই যেমন একে অপরকে আকর্ষণ করছে, তেমনি পৃথিবীও তার কাছাকাছি সব বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। পৃথিবীর এই আকর্ষণজনিত বলকে বলা হয় 'অভিকর্ষ'(Gravity)। সুতরাং পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বলই অভিকর্ষ নামে অভিহিত। অভিকর্ষের জন্যই আপেল নীচের দিকে পড়ে। পৃথিবীর এই আকর্ষণের জন্য পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থিত প্রতিটি বস্তুই পৃথিবীর দিকে ক্রমবর্ধমান বেগে ধাবিত হয়। এই ক্রমবর্ধমান বেগ বা ত্বরণের নাম 'অভিকর্ষজ ত্বরণ'(Acceleration due to Gravity)। পৃথিবী যে অভিকর্ষ বলে কোন বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে সেই বল হল বস্তুটির ওজন বা ভার (Weight)। সুতরাং 'ভার' হল বল এবং 'ভর' হল বস্তুটিতে পদার্থের পরিমাণ। এই পদার্থের পরিমাণকে আবার বস্তুটির মহাকর্ষীয় ভরও (Gravitational Mass) বলা হয়। কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, যেমন পাহাড়ে, খনি-গর্ভে, বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভর সমানই থাকে। আবার 'জাড্যগুণ জনিত ভর' (Intertial Mass) এবং 'মহাকর্ষীয় ভর' (Gravitational Mass) পরিমাণে একই। অভিকর্ষজ ত্বরণ সমুদ্রপৃষ্ঠে 981সেমি/সেকেন্ড^2। একগ্রাম ভরের কোন বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে তা হল 981 গ্রাম-সেমি/সেকেন্ড^2 বা ডাইন (Dyne)। অর্থাৎ সমুদ্র পৃষ্ঠে একগ্রাম ভরের কোন বস্তুকে পৃথিবী যে বলে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তা হল 981ডাইন। এটি হল এই এক গ্রাম ভর-বিশিষ্ট বস্তুটির ওজন। এর অন্য নাম এক গ্রাম-ভার (Gram-Weight)। আবার একটি পুরোপুরি মসৃণ অনুভূমিক সমতলের উপর একটি বস্তুকে রেখে 981 ডাইন বল প্রয়োগ করে যদি প্রতি বর্গ সেকেন্ডে 981 সেন্টিমিটার ত্বরণ পাওয়া যায়, তবে বস্তুটির ভর হবে এক গ্রাম এবং এই ভর হল জাড্যগুণজনিত ভর। সুতরাং মহাকর্ষীয় ভর ও জাড্যগুণজনিত ভর একই মানের।

নিউটন বলেছেন, স্থির হয়ে আছে এমন কোন বস্তুর উপর কোন বাইরের বল কাজ করলে বস্তুটি সচল হয়, বেগ লাভ করে। বস্তুটি তার জাড্য গুণজনিত ভরের মান অনুযায়ী এই বলের ক্রিয়াতে কম কি বেশী সাড়া দেবে তা নির্ভর করবে। ভর বেশি হলে গতির চেষ্টাকে অধিকতর বাধা দেবে, আবার ভর কম হলে বাধাও হবে কম। অর্থাৎ কোন বস্তু বাইরের প্রযুক্ত বলে কেমন সাড়া দেবে তা নির্ভর করবে ওই বস্তুর জাড্যগুণজনিত ভরের উপর। পৃথিবী যদি সবাইকে সমান বলে আকর্ষণ করত, তবে জাড্যগুণজনিত ভর যার সবচেয়ে বেশি, পতনশীল বস্তুদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে শেষে অনেক ধীরে পৃথিবীতে এসে পড়ত। গ্যালিলিও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন ভরের বস্তু একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে পৃথিবীতে এসে পড়ে। অর্থাৎ পৃথিবী বিভিন্ন ভরের বস্তুকে বিভিন্ন বলে আকর্ষণ করে। পৃথিবী যখন একটি পাথরকে অভিকর্ষজ বলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন সে জানেনা পাথরটির জাড্যগুণজনিত ভরের কথা। পৃথিবীর এই 'আহ্বান' বিজ্ঞানীদের ভাষায় "Calling force of the earth"। এই বল নির্ভর করে পাথরটির মহাকর্ষীয় ভরের উপর। পৃথিবীর এই আহ্বানের 'উত্তর' দেয় পাথরটির বেগ, যাকে বলা যায় 'Answering motion of the stone'। এই বেগ পাথরটির জাড্যগুণজনিত ভরের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর আকর্ষণে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া সব বস্তুই একই সময়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়ে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর 'বেগ জাগানো উত্তর' এক, কোনও তফাৎ নেই। তাই এটা নিশ্চিত যে, বস্তুর মহাকর্ষীয় ভর ও জাড্যগুণজনিত ভর সমান। সুতরাং মহাকাশের সর্বত্র বস্তুর ভর একই থাকে।

নিউটন-তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবী থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ ততই কমে আসবে। ওজন হল বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের ফল। দুটো জিনিষের মধ্যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণও দ্রুত কমে আসবে। নিউটনীয় বিধান অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ দূরত্বের বর্গের বিপরীত হারে চলে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে দূরত্ব হবে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে। পৃথিবী থেকে 6400 কি. মি. উচ্চতায় মাধ্যাকর্ষণ হবে পৃথিবীর উপরে মাধ্যাকর্ষণের এক-চতুর্থাংশ। কারণ, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর উপরিতলের দূরত্ব যা, তার দ্বিগুণ দূরত্ব হবে ওই 6400 কি. মি. উচ্চতায়। মাধ্যাকর্ষণ হবে পৃথিবীর উপরিতলে কোনও বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ-বল যা হবে, তার এক চতুর্থাংশ বল হবে বস্তুটিকে যদি 6400 কি.মি. উচ্চতায় রাখা হয়। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মোটামুটিভাবে বলা যায় 6400 কিলোমিটার।

নিউটনীয় ধারণায় মহাকাশ বা দেশ [Space] অনন্ত, অন্যগত বা পর নির্ভরশীল নয়। মহাকাশের কাঠামো স্থির। তার সাপেক্ষে কোনও বস্তুর পরমবেগ [Absolute Velocity] নির্ণয় করা সম্ভব। নিউটন তাঁর গতি-তত্ত্ব কিংবা মহাকর্ষ তত্ত্ব সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত করেন মহাকাশের ওই স্থির কাঠামোর প্রেক্ষাপটে। গতির প্রভাবে বস্তুর ভর বেড়ে যাওয়া, কমে যাওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলি মোটেই ছিল না। মহাকাশে বস্তুর ভর সর্বত্র একই থাকবে এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু আইনস্টাইন এসে এই সব ধারণা বদলে দিলেন। গতির তারতম্যে গতিশীল বস্তুর ভরের তারতম্য ঘটে, মহাকাশ পর নির্ভরশীল— এইসব তত্ত্ব দিয়ে আইনস্টাইন মহাকাশ ধারণাকে একেবারে বদলে দিলেন নিউটনের প্রায় 200 বছর পরে।

আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব (General Theory of Relativity) দিয়ে 1916 খ্রিস্টাব্দে এই সব নিউটনীয় ধারণা বদলে দিয়েছেন। আইনস্টাইনের মতে প্রকৃত মহাকর্ষ (Graviation) নিউটনের মহাকর্ষের ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। মহাকর্ষ কোনও 'বল' নয়। আইনস্টাইন 'বল' বলে কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন যে, সমস্ত রকম বলকে 'শক্তি'-র (Energy) সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায়। প্রতিটি শক্তিকে একটি 'ক্ষেত্র'(Field) হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ। আইনস্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্বে 'বল' বলে কোন জিনিষ নেই। তিনি মহাকর্ষকে একটি ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করেছেন। 'মহাকর্ষীয় আকর্ষণ' (Gravitational Attraction) নামক নিউটনীয় সিদ্ধান্তকে বাতিক করে কিংবা বলা যায় পরিবর্তিত করে তিনি বললেন, 'মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র' (Gravitational Field)। তিনি তাঁর মতবাদে বললেন, এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে সব বস্তুর আচরণ বা গতিবিধি, যেমন, সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলির আবর্তন, কোনও বলের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার জন্য নয়, এর কারণ হল সূর্যের চারিদিকে মহাকাশে একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। এই মহাকর্ষক্ষেত্রের জন্যই গ্রহগুলি সহজ পথ ধরে গড়িয়ে চলেছে। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই তার চারপাশে মহাকাশে এই ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এইভাবে তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর গতির কারণ বুঝিয়েছেন মহাকাশে ক্ষেত্রের ধারণা দিয়ে। এই 'কারণ' হল মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠন বা জ্যামিতিক গুণ। বিশ্বে এমন কোনও স্থান নেই, যেখানে এই ক্ষেত্র নেই।'

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন, বস্তুহীন মহাকাশের কোনও অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে তাই মহাকাশ [Space] আছে। তাঁর প্রায় 200 বছর আগে জার্মান গণিতবিদ দার্শনিক লাইব্‌নিজ [Gottfried Wilhelm Leibniz] মহাকাশ সম্বন্ধে এমন ধারণা দিয়ে বলেছিলেন, "Space is the order or relation of things among themselves, without things occupying it, it is

nothing.'' মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতর বিন্যাস। মহাকাশে বস্তুগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছু নয়।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের দুটি মূল স্বীকার্য [Fundamental Postulates] হল ঃ

1] The laws of physical phenomena are the same when stated in terms of two systems of reference in uniform translatory motion relative to each other;

2] The velocity of light in vacuum is a constant, independent not only of the direction of propagation but also of the relative velocity of the source and the observer.

প্রথম স্বীকার্যটিকে বলা হয় 'সমতুল্যতা নীতি' [Principle of Equivalence]। দ্বিতীয় স্বীকার্য বলছে বিশ্বের সর্বত্র আলোর গতিবেগ একই এবং এই গতিবেগ সর্বোচ্চও বটে। এই স্বীকার্য দুটিকে একটু অন্যভাবেও বলা হয়েছে মূল বক্তব্য একই রেখে। যেমন ঃ

1] The laws of physics apply equally well for any two observers moving with constant linear velocity relative to each other, or, in other words the observations on one reference-frame are not preferred above those on any other.

2] All observers must find the same value of the free-space velocity of light regardless of any motion they may have.

অর্থাৎ, কোন একটি নিখুঁত জাড্যগুণ সম্পন্ন মাধ্যমে [Perfect Inertial System] পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে, এই মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে [Uniform Velocity] চলমান যে কোন অনুরূপ মাধ্যমেই এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ অপরিবর্তনীয়, উৎস বা পর্যবেক্ষকের বেগের উপর তা নির্ভরশীল নয়। বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগ একই মানের—এই অনুসিদ্ধান্তটি [Hypothesis] আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূলভিত্তি।

দেশকালের বা মহাকাশ-সময়ের প্রতিসাম্যের [Space-time-symmetry] বিশ্বজনীনতার দিক থেকে এই মতবাদের মূল্য অসাধারণ। অআইনস্টাইনের এই মতবাদ প্রযুক্ত হবে পরস্পরের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে চলন্ত মাধ্যমগুলিতে। তাই এই মতবাদকে বলা হয় 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ'। সময় ও মহাকাশকে কখনও আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না, বলতে হবে দেশকাল-সন্ততি বা মহাকাশ-সময়-সন্ততি [Space-time-continuum]। আপেক্ষিকতাবাদে বস্তুর চেয়ে ঘটনার প্রাধান্য বেশি। আর ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় চারটি স্থানাঙ্ক [Co-ordinate] সম্বলিত বিন্দুর দ্বারা—অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা এবং সময়। অর্থাৎ জাগতিক বিন্দুসমূহ হলো চারমাত্রিক [Four Dimensional], যা আইনস্টাইনের আগে তিন-মাত্রিক বলে ধরা হত। চতুর্থ মাত্রাটি হল সময় বা কাল [Time]।

আইনস্টাইন বললেন, সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। চোখ না থাকলে যেমন রঙ থাকে না, তেমনি ঘটনা না থাকলে সময় থাকে না। সময় অপরিবর্তননীয় নয়, বিশ্বের যে জিনিষটি অপরিবর্তনীয় তা হলো আলোর বেগ। বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগ সমান এবং কোনও বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারবে না। আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র সমানই শুধু নয় এই বেগ সর্বোচ্চ বেগ। শুধু তাই নয়, আলোর বেগ পর্যবেক্ষকের গতির উপরও নির্ভরশীল নয়। এই বেগ ধ্রুবক। সারা বিশ্বের সর্বত্রই কাঁটায় কাঁটায় এক।

এরপর আইনস্টাইন প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি পরস্পরের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে চলমান মাধ্যমগুলির জন্য তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন।

এবার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন সবরকম চলমান মাধ্যমের জন্য তত্ত্ব দিলেন। বললেন, সব মাধ্যমেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একইভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে। মহাকাশ ও সময়কে তিনি জুড়ে দিয়ে মহাকাশ-সময়-সন্ততির কথা বললেন। আপেক্ষিকতাবাদের মূলভিত্তি হিসাবে চলে এলো মহাকাশ-সময়-সন্ততি বা দেশ-কাল-সন্ততি। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে পুরোপুরি বদলে দেয়। এতে তিনি বললেন 'আকর্ষণ' বলে কিছু নেই। প্রতিটি বস্তু গতিশীল হয় মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠনের জন্য। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে মহাকাশের [Spacc] বা দেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অবশ্য মহাকাশ, কালের বা সময়ের সঙ্গে মিলেমিশে এমন একটি সন্ততি বা অবিচ্ছেদ্য গঠন বানিয়েছে যে, সেই গঠনের গুণেই বিশ্ব গতিশীল হয়ে আছে। আর 'মহাকর্ষ' বলে কিছু নেই, যার কথা নিউটন বলেছিলেন, সেই মহাকর্ষ এখন বাতিল হয়ে গেছে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে কিছু কথা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একবার বলা হয়েছে। মহাকাশের একালের কথা বলতে গিয়ে সেই কথাগুলির কিছুটা পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। এখন মহাকাশ বা দেশের [Space] ধারণার ঘটেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আমূল নয় বটে, কিন্তু মহাকাশ হারিয়েছে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সময় ও মহাকাশ একীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে মহাকাশ-সময়-সন্ততি। এই সন্ততিই নিয়ন্ত্রণ করছে মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের গতিশীলতা, মহাবিশ্বের ঘটনাবলী।

1916 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশ করলেন। নিউটন তাঁর 'Principia' গ্রন্থে যা বলেছিলেন, তা সহজ কথায় বললে দাঁড়ায়, 'একটি মাধ্যমে বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি অকাট্য প্রমাণিত হলে, সেগুলি ওই মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে বা সমবেগে চলন্ত অন্যসব মাধ্যমে সমানভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।' আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, এই মাধ্যমগুলিতে শুধু বলবিদ্যারই নয় প্রাকৃতিক সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলিও একই রকম হবে যদি ওই মাধ্যমগুলি সম্পূর্ণরূপে জাড্যগুণ সম্পন্ন মাধ্যম [Perfectly Inertial System] হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি দেখালেন, যে মাধ্যমগুলি পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে চলমান অবস্থায় আছে সেগুলিতে তো বটেই, তাছাড়াও কোন নিয়ম না মেনে চলে খামখেয়ালিভাবে বা যদৃচ্ছভাবে [Arbitrarily] চলন্ত অবস্থায় আছে অথবা নিয়মিত ত্বরান্বিত বেগে [Accelerated Velocity] আছে, এইরূপ সব মাধ্যমগুলিতেও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একইভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।

'মহাকর্ষীয় আকর্ষণ' [Gravitational Attraction] — নিউটনের এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি বললেন, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র [Gravitational Field]। দেশকাল-সন্ততির বা মহাকাশ-সময়-সন্ততির [Spece-time-continuum] গঠনের জন্য বা জ্যামিতিক গুণসম্পন্ন হওয়ার জন্য বিশ্বের প্রতিটি বস্তু গতিশীল হয়। তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বে 'বল' বলে কোন জিনিস নেই। মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠনের ব্যাখ্যায় তিনি সনাতন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির [Euclidean Geometry] সাহায্য না নিয়ে রীমানীয় জ্যামিতির [Riemannian Geometry] সাহায্য গ্রহণ করলেন। তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর গতিকে বোঝালেন মহাকাশের ক্ষেত্রের ধারণা দিয়ে এবং জানালেন মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠনের জন্য এমনটা হয়। আইনস্টাইন 'বল' বলে কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। সমস্ত রকম বলকে শক্তির [Energy] সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায় এবং প্রতিটি শক্তিকে একটি 'ক্ষেত্র' [Field] হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তাই নিউটনের মহাকর্ষীয় বলকে বাদ দিয়ে আইনস্টাইন তাঁর 'মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র' ধারণা প্রতিষ্ঠিত করলেন 1916 সালের ওই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে।

আইনস্টাইন বললেন, "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী কোন বস্তুবিহীন অবস্থায় মহাকাশের [Space] অস্তিত্ব নেই। মহাকাশের ভৌত অস্তিত্ব হল একটি ক্ষেত্র যার সংগঠনে চারটি অংশ—তিনটি হলো মহাকাশের সাধারণ তিনটি মাত্রা ও চতুর্থটি সময়। এদের ভিতরের যে বিশেষ প্রকার নির্ভরতার সম্বন্ধ, সেটিই মহাকাশের যথার্থ বাস্তব রূপকে প্রকাশ করে। আর যেহেতু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করে, সেহেতু কোনরূপ কণিকা বা ভর-বিন্দু কোন অপরিহার্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে পারে না অথবা গতির ধারণাও করতে পারে না। কোন কণিকা হল শুধুমাত্র মহাকাশে একটি সীমাবদ্ধ স্থান, যেখানে ক্ষেত্রশক্তির বা শক্তির ঘনত্ব বেশি।"

বস্তুহীন মহকাশের [Space] অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব বা বেগ অনুযায়ী। তাঁর এই মতে তিনি বললেন, মহাকাশ সমস্ত বস্তু ধারণকারী কোন অনমনীয় [Rigid] এবং পরিবর্তনাতীত [Immutable] কাঠামো নয়, পরন্তু মহাকাশ বা দেশ ও সময় বা কাল যে দুটিকে অনন্যগত [Independent] বলে মনে করা হত, সে দুটি অবিচ্ছিন্ন এবং এই সন্ততি কোন নির্দিষ্ট আকার শূন্য, নমনীয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্তনশীল। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বই এই সন্ততিকে নুইয়ে দেয় [Bends], বিকৃত করে [Distorts] এবং বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি হবে, সন্ততির নুইয়ে পড়া এবং বিকৃতি দুই-ই তত বেশি হয়।

প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব ও বেগ অনুযায়ী, যার গঠন হলো এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু আলদেয়া জমির মত। মহাকাশের যে কোন স্থানে ও যে কোন সময়ে ওই ক্ষেত্রের শক্তি [Field Strength] জানা যায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের দ্বারা। সাবানের ফেনা যেমন সাবানের বুদ্বুদ তৈরি করে, এই বিশ্বের বুদ্বুদ তেমনি তৈরি হয়েছে শূন্য মহাকাশের সঙ্গে শূন্য সময়কে ঝালাই করে [Welded]।

বিশ্বের এই বক্রতার জন্য কোনও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আলো সরলরেখায় যেতে পারে না, কারণ এই বক্র মহাকাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এরূপ যে, তার ভিতরে সরলরেখা বলে কিছুই থাকতে পারে না। আলো যে ক্ষুদ্রতম পথে যায় তাও একটি নির্ভেজাল বক্রপথ, যার আকৃতি নির্ভর করে ওই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপর। সৌরজগতের ভিতরে বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ বেশি বলেই আলোর বক্রপথ যতটা বেশি বাঁকা হবে, তুলনামূলকভাবে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তঃ-গ্যালাক্সী পথে আলো অতটা বাঁকা পথে চলবে না, বরং বেশ সোজা বা সরল পথেই চলবে। সূর্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় আলোকরশ্মির বাঁক নেওয়ার পরিমাণ হবে 1.74 সেকেন্ড [Seconds of an arc]। এডিংটন এটা 1919 সালে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্ব বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন, সূর্যের পাশ দিয়ে কোনও আলোক-রশ্মি আসার সময় সেটি সূর্যের দিকে যতটা বেঁকে যায় তার পরিমাণ হবে,

$$\Delta = 4\ GM/ac^2,$$

যেখানে, G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক [Gravitational Constant]

M = সূর্যের ভর,

a = সূর্যের ব্যাসার্ধ,

c = আলোর গতিবেগ,

সূর্যের বেলায় Δ-এর মান হয় 1.74 সেকেন্ড (কৌণিক মান)। এটা আইনস্টাইন অঙ্ক কষেই দেখিয়েছিলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে 1916 খ্রিস্টাব্দে। বৃটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন তার

নিখুঁত সত্যতা প্রমাণ করলেন সর্বপ্রথম 1919 সালে। তারপর 1922 এবং অন্যান্য বছর নানা সময় নানাভাবে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এখন সর্বজনীন সত্য। এই আলোক পথের বিচ্যুতির ঘটনা বিজ্ঞানে 'আইনস্টাইন অভিক্রিয়া' [Einstein Effect] নামে বিশ্বখ্যাত। তিনি তাঁর এই তত্ত্বে তিনটি সিদ্ধান্ত অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট করেন। তাদের দ্বিতীয়টি ছিল এই আলোর বেঁকে যাওয়া যেটি সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় বাস্তবে এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণিত হয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই বেরিয়ে এসেছে আইনস্টাইনের মহাবিশ্বতত্ত্ব। তিনি তাঁর 'সসীম কিন্তু সীমানাহীন' মহাবিশ্বকে নতুনরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই মহাকাশও জড়িয়ে গেছে সে মহাবিশ্বের সঙ্গে। তাঁর মহাবিশ্ব সম্পর্কে আবিষ্কারগুলি এবং এ সংক্রান্ত তাঁর মডেল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের গবেষণার মূল ভিত্তিই হল এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। আবার মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ জানতে এখন শুধু যে আমরা আপেক্ষিকতাবাদই ব্যবহার করছি তা নয়, কোয়ান্টামবাদও ব্যবহৃত হচ্ছে অব্যাখ্যাত মহাবিশ্ব তথা মহাকাশের ব্যাখ্যায়।

আধুনিককালে আকাশ [Sky] সম্পর্কে বলা হয়, আবহাওয়া ভালো থাকলে আকাশের যে রঙ আমরা দেখি তা সৃষ্টি হয় সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণের জন্য। অর্থাৎ দিনের বেলার মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশের যে রঙ দেখা যায়, তা সূর্যালোকের বিচ্ছুরণের কারণে হয়। এই রঙ নীল। এই বিচ্ছুরণ না হলে কিন্তু দিনের আকাশও রাতের আকাশের মত কালো রংয়ের হত। এই বিচ্ছুরণ ঘটে বায়ুমণ্ডলের বাতাসের অণুতে, ভাসমান ধূলিকণায়। পৃথিবী যদি বায়ুমণ্ডলহীন হত, তবে পৃথিবীর আকাশ দিনে রাতে সবসময়ই কালো রংয়ের হত। পৃথিবী থেকে যত উপরে ওঠা যাবে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব তত কমে যাওয়ার জন্য আকাশের রঙ তত কালো হতে থাকবে। বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে আকাশকে দেখলে তাকে কালো দেখাবে। বায়ুর ঘনত্বের সঙ্গে বিচ্ছুরিত আলোর পরিমাণ সমানুপাতিক। বায়ুর ঘনত্ব কমলে বিচ্ছুরিত আলোর পরিমাণ কমবে। ফলে, আকাশের রঙ ক্রমশঃ কালো হতে থাকবে। বায়ু না থাকলে অর্থাৎ বাতাসের ঘনত্ব শূন্য হল বিচ্ছুরিত আলোর পরিমাণও শূন্য হবে। আবহাওয়া মণ্ডলের উপরে গেলে সেখান থেকে আকাশকে কালো দেখাবে। আলোর বিচ্ছুরণের জন্য আকাশের রঙ নীল হওয়াটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি 'রামন প্রভাব' [Raman Effect]।

আবার পৃথিবীর আকাশ রাত্রিতেও পুরোপুরি কালো হয় না। চন্দ্রালোক না থাকলেও নক্ষত্র, গ্যালাক্সীদের আলোর বিচ্ছুরণে আকাশের কালো রঙ কিছুটা ফিকে হয়ে যায়। এছাড়া মেরুজ্যোতি প্রভৃতির কারণে চন্দ্রবিহীন রাতেও আকাশের রঙ পুরোপুরি কালো হয় না। সূর্যালোকিত পৃথিবীর আকাশ সাধারণতঃ নীলই দেখায়। বিচ্ছুরণ হয় দু'রকমের। বাতাসের অণু-পরমাণুতে যে বিচ্ছুরণ ঘটে তাতে আকাশের রঙ নীল হলেও, ধূলিকণা এবং জলকণায় যে বিচ্ছুরণ হয় তাতে দুধ-সাদা বিচ্ছুরিত আলো থাকায় আকাশের ওই নীল রঙের ঘনত্ব কিছুটা কমে যায়। ফলে, আকাশের রঙ হয় ফিকে নীল, যাকে বলা হয় 'আকাশী নীল'। এই রঙ ঘন নীল কিংবা কালচে নীল নয়। ওই দুই ধরনের বিচ্ছুরণের নীট ফল হয় আকাশী নীল। এই নীল 'Blue',কিংবা 'Indigo' নয়।

বাতাসের অণু-পরমাণুতে যে বিচ্ছুরণ ঘটে তাতে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি খুবই কম পরিমাণে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। নীলের তরঙ্গদৈর্ঘ্য লোহিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় ক্ষুদ্রতর হওয়ায় নীল আলোই বিচ্ছুরিত হয় সবচেয়ে বেশি। লাল আলোর বিচ্ছুরণ খুবই কম হয় বা মোটেই হয় না বলা চলে। সেইজন্য বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সূর্যের যে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তা লালচে রঙের হয়। আবার ধূলিকণা কিংবা জলকণা বাতাসের

অণু-পরমাণুদের চেয়ে বেশ কিছুটা বড় হওয়ায় ওই কণাগুলি যে আলো বিচ্ছুরিত করে তাতে হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিচ্ছুরিত আলোর পরিমাণ এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিচ্ছুরিত আলোর পরিমাণ প্রায় সমান সমান থাকে। ফলে, কণাদের দ্বারা বিচ্ছুরিত আলোর রঙ সাদা হয়। এই দুই ধরনের বিচ্ছুরণ থেকে পাওয়া দু'ধরনের বিচ্ছুরিত আলো মিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয় 'আকাশী নীল' রঙ। তাই আকাশের রঙ হয় আকাশী নীল। আকাশের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও বাতাসে বিচ্ছুরণের কারণে আকাশকে নীল রঙের দেখায়। মনে করা হয়, ওই নীল রঙ আকাশেরই রঙ, যদিও আকাশ বলতে বাস্তবে কিচ্ছু নেই।

মহাকাশ হল জ্যামিতির প্রথাগতভাবে পাঠ্য বিষয়গুলির অপার্থিব প্রসারণ। মহাকাশের জ্যামিতিক গুণ রয়েছে। আলোর যেমন লাল, নীল, সবুজ, হলদে নানা ধরন [Mode] আছে, তেমনি মহাকাশেরও বিভিন্ন ধরন রয়েছে। মহাকাশে আরোপিত গুণগুলির মধ্যে রয়েছে, আকার, আকৃতি, অবস্থান, দূরত্ব এবং দিক নির্দেশ। এগুলি মহাকাশের ধরন বা Mode। সুতরাং মহাকাশের কিছু জ্যামিতিক গুণ আছে, কিংবা বলা যায় মহাকাশে ওই সব জ্যামিতিক গুণ আরোপিত হয়।

পাশ্চাত্যের প্রায় অর্ধেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক মহাকাশের বস্তুগত [Objective] অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই দলে রয়েছেন, দেকার্তে, নিউটন, স্যামুয়েল আলেকজান্ডার [Samuel Alexander] প্রমুখ। এঁরা মহাকাশের বস্তুগত বাস্তবতায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কান্ট [Immanuel Krant], বার্গসঁ [Henry Bergson] প্রমুখ দার্শনিক এবং বহু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন মহাকাশ আমাদের মানসিক উপলব্ধি থেকে তৈরি এবং এটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র। এই দু'ধরনের বিশ্বাসের কথা বাদ দিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তা হল আকাশ বা মহাকাশ অন্যগত কিংবা অন্য-নিরপেক্ষ? বহু দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী মনে করেন মহাকাশ একটি অনন্য কাঠামো যেখানে বস্তুরা রয়েছে এবং ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ধারণা বা মতবাদ পোষণ করতেন প্লেটো [Plato], নিউটন, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখেরা। মহাকাশের সঙ্গে বস্তুগুলির দূরত্ব এবং অভিমুখ এবং তার সঙ্গে শুধু বস্তুসমূহেরই নয়, ঘটনাসমূহেরও সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন, অ্যারিস্টটল, লাইব্‌নিজ, আর্নেস্ট মাখ এবং বিংশ শতাব্দীর তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা।

আবার মহাকাশ ও মহাশূন্য [Empty Space] সমার্থক কিনা তা নিয়েও বহু বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও আছে। তবে আইনস্টাইন মহাকাশকে সময়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই বিতর্কের অবসান প্রায় ঘটিয়েই ফেলেছেন। অ্যারিস্টটল, দেকার্তে, লাইব্‌নিজ, আইনস্টাইনদের মতে মহাশূন্য বলে কিছু হয় না। কোনও কিছু প্রসারিত না হলে মহাকাশের কোনও প্রসারণ অসম্ভব। অসীম মহাকাশ কিংবা বিন্দুবৎ মহাকাশ সম্ভব কিনা এমন ধরনের বহু প্রাচীন প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগ করলে মহাকাশ অসীম কিংবা বিন্দুবৎ কোনটাই হবে না। কিন্তু কোয়েন্টাম তত্ত্বানুসারে এই দুই সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং অসীম মহাকাশ কিংবা বিন্দ্যুবৎ মহাকাশ সম্ভব কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতবিদ্যা যতটা এগিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে।

রীমানীয় জ্যামিতি অনুসরণ করলে, মহাকাশে আঁকা কোনও ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180^0 -র কম কিংবা বেশি হবে। কারণ, মহাকাশে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। [Euclidean Geometry] অচল। যেহেতু মহাকাশ বক্র তাই এখানে সরলরেখা টানা যায় না। এই বক্রতার কারণ মহাকাশে বস্তুর উপস্থিতি। বস্তুগুলি মহকাশ-সময়-সন্ততিকে বক্রতাসম্পন্ন করেছে। মহাকাশের বক্রতা অসমান— কোথাও বেশি কোথাও কম। এই বক্রতা মহকাশের স্থান ও সময়ের উপর নির্ভরশীল। স্থান-কাল

ভেদে মহাকাশের বক্রতারও তারতম্য ঘটে। বস্তুগুলি মহাকাশকে মুচড়ে দেয় [Warps]। কিংবা বলা যায়, বস্তুগুলির প্রত্যেকটিই মহাকাশে এক একটি মোচড় বা বক্রতা। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে মহাকাশেরও সম্প্রসারণ ঘটছে। মহাকাশের বাস্তব অস্তিত্ব নেই বলেই এর নিজস্ব সম্প্রসারণ নেই। সে কারণেই মহাশূন্য বলে কিছু নেই। মহাকাশ কোনও বাস্তব পরিকাঠামো নয়। এটি আমাদের অনুভূতি-প্রসূত এক কাল্পনিক পরিকাঠামো। মহাকাশ-সময়-সন্ততির জ্যামিতিক গুণের জন্যই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গতিশীল। বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে এই মহাকাশ-সময় সন্ততি বা দেশকাল সন্ততি।

পৃথিবীতে মহাকাশ যুগের [Space Age] শুরু হয় 1957 খ্রিস্টাব্দের 4ঠা অক্টোবর। ওইদিন সোভিয়েত রাশিয়া [USSR] তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। [Satellite] স্পুটনিক-1 [Sputnik-1] পৃথিবীর কপক্ষথে স্থাপন করে। 184 পাউন্ড ওজনের এই উপগ্রহটি পৃথিবীর আকাশে স্থাপন করা হয় বায়ুর ঘনত্ব, উষ্ণতা, মহাজাগতিক রশ্মি [Cosmic Rays], উল্কাসমূহের উপর গবেষণার জন্য। সেই থেকে গত 50 বছরে 200-রও বেশি এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ তথা মহাকাশযান মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই পৃথিবীর চতুর্দিকে উপগ্রহের মত পরিক্রমণরত। কিছু মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি গ্রহ পর্যবেক্ষণে। কয়েকটি মহাকাশযান চলে গেছে সৌরমণ্ডলের বাইরে। তাদের সংখ্যা খুবই অল্প। গত 50 বছরে মহাকাশ অভিযানের একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে। মানুষের মহাকাশ অভিযানের সে ইতিহাস ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছে। পৃথিবীর আকাশ এখন নানা ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ ছেয়ে ফেলেছে। মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে স্পেস-স্টেশন [Space Station]। মানুষ ছয় দফা চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। আকাশ তথা মহাকাশ নিয়ে নানা গবেষণা চলছে ওই সব কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানের মাধ্যমে। মহাকাশ যাত্রার ইতিহাস কিছুটা বিশদভাবে বলা হয়েছে এই বইয়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে।

মানুষ মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান পাঠালেও কিংবা বৃহস্পতির কক্ষপথে মহাকাশযান স্থাপন করলেও মানুষ নিজে এখন অবধি চাঁদ পর্যন্ত যেতে পেরেছে। প্রথম দফায় 1969 সালের 20 শে জুলাই নীল আর্মস্ট্রং [Neil A. Armstrong] এবং এডুইন অলড্রিন [Edwin E. Aldrin] চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পদচারণা করেছেন। এই দুই ভাগ্যবান মানুষ ছাড়াও এঁদের সঙ্গে আরেকজন মানুষ পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চাঁদের কক্ষপথে মূল মহাকাশযানের চালক হয়ে অবস্থান করছিলেন, তিনি হলেন মাইকেল কলিন্স্ [Michael Collins]। 1969 সালের 19শে নভেম্বর চার্লস কনরাড জুনিয়ার [Charles Conrad Jr.] ও অ্যালান এল বিন [Alan L. Bean] দ্বিতীয়বার চাঁদে পদচারণা করেন। 1971 সালের 5ই ফেব্রুয়ারী অ্যালান শেপার্ড [Alan Shepard] এবং এডগার মিচেল [Edgar Mitchell] আবার চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। এবার মূল মহাকাশযানে থাকেন স্টুয়ার্ট রুজা [Stuart Roosa]। ওই বছর 30শে জুলাই ডেভিড স্কট এবং জেমস আরউইন চাঁদে নেমে তিনবার পদচারণা করেন। 1972 সালের 20শে এপ্রিল পঞ্চম দফায় চাঁদের পদচারণা করেন জন ইয়ং এবং চার্লস ডিউক। 1972 সালের 11ই ডিসেম্বর ষষ্ঠবার চাঁদে পদচারণা করেন ইউজিন কারনান [Eugene Cernan] এবং হ্যারিসন স্মিট [Harrison Schmitt]। রোনাল্ড ইভান্স [Ronald Evans] মূল মহাকাশযানে থেকে চন্দ্র পরিক্রমা করতে থাকেন। এই কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কোনও মানুষই পৃথিবীর মহাকর্ষ তথা অভিকর্ষের আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। মহাকাশে যে সব মানুষ যাচ্ছেন কিংবা গিয়েছেন তাঁদের প্রায় সবাই মহাকাশ বিজ্ঞানী বা মহাকাশ গবেষক কিংবা প্রাযুক্তিক। এঁরা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন মূলতঃ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা ইত্যাদির প্রয়োজনে। ইদানীং অবশ্য সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র মহাকাশ

ভ্রমণের জন্যই পাড়ি দিচ্ছেন মহাকাশে। তবে মাত্র দু'জন এ পর্যন্ত [29শে সেপ্টেম্বর, 2006] কেবলমাত্র ভ্রমণের জন্যই মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন। এঁদের এই মহাকাশ ভ্রমণে মাথাপিছু খরচ পড়েছে প্রায় 2 (দুই) কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় 100 কোটি টাকা।

একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমরা যে মহাকাশ অভিযানের কথা বলছি তার সীমানার বিস্তৃতি খুবই সামান্য। আমরা আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে এখনও যেতেই পারি নি বলা যায়। মহাকাশযান শনি, ইউরেনাস, পাড়ি দিলেও মানুষ পাড়ি দিতে পেরেছে মাত্র 2,35,000 মাইল দূরের চাঁদে। বিশাল মহাবিশ্বের প্রায় সীমাহীন মহাকাশ মানুষের কাছে আজও অধরা। সত্যি কথা বলতে কি, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যতটা উন্নতি হয়েছে তাতে মানুষ কোনওদিন সত্যিকারের মহাকাশ পাড়ি দিতে পারবে না। কারণ, আলো তার প্রতি সেকেন্ডে 300,000 কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড সোজাসুজি পার হতে সময় নেয় এক লক্ষ বছর। কিন্তু আমাদের যন্ত্রপাতি এখনও ঘন্টায় 25,000 বা 30,000 কিলোমিটারের বেশি গতিবেগ উৎপন্ন করতে পারছে না। তাছাড়া আমরা গতিবেগ যতই বাড়াই না কেন তা কোনওদিন আলোর সমান হতে পারবে না। সুতরাং আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড পার হতেই মানুষের লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যাবে, যা অসম্ভব। আমাদের সৌরমণ্ডলের মহাকাশ মহাবিশ্বের প্রায় অসীম মহাকাশের অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। সৌরমণ্ডলের আকাশ অভিযানের একেবারে প্রাথমিক স্তরেই আমরা রয়েছি। গত পঞ্চাশ বছরে আমরা খুব একটা বেশি এগোতে পেরেছি বলে মনে হয় না। নানান সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমাদের মহাকাশ অভিযানে। সুতরাং সত্যিকারের মহাকাশ না হোক, সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে মানুষের অভিযান অদূর ভবিষ্যতে হয়ত সম্ভব হবে। এইসব অভিযানে যে বিশাল অর্থের প্রয়োজন হয় তার যোগান দেওয়াও একটা সমস্যার ব্যাপার। মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে এইসব মহাকাশ অভিযানের ব্যয়নির্বাহ করা পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এই ধরনের মহাকাশ অভিযানের বন্দোবস্ত করার। অন্যান্য পাঁচ-সাতটি দেশ যে সব উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে সেগুলির কোনওটিই মহাকাশ অভিযানের জন্য নয়, সেগুলিকে স্থাপন করা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, আবহাওয়া গবেষণা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনে। মোদ্দা কথা হল, পার্থিব প্রযুক্তি যে স্তরে রয়েছে কিংবা তার যতটা উন্নতি হওয়া সম্ভব তাতে সত্যিকারের মহাকাশ অভিযান অসম্ভব। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সীগুলিতে মহাকাশযান নিয়ে পৌঁছানো অসম্ভব। অলোর গতিবেগ নিয়ে মহাকাশের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে পাড়ি দিলেও কোটি কোটি বছর যেখানে লাগছে দূরের ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে পৌঁছাতে, সেখানে মানুষের পৌঁছানো অসম্ভব। তবে কীট-বিবর বা কীটগহ্বর খুঁজে পেলে কিংবা কৃত্রিমভাবে বানাতে পারলে হয়ত মহাকাশ অভিযান কিছুটা সহজ হলেও হতে পারবে। তবে এ সমস্তই তত্ত্বীয় ব্যাপার। একে বাস্তব করে তুলতে যে সময়, যে আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন, মানব সভ্যতার হাতে সে পরিমাণ অর্থ এবং সময় দুইয়েরই বড়ই অভাব। পৃথিবীর মানব সভ্যতার আয়ু অদূর ভবিষ্যতেই শেষ হয়ে যাবে বলে বহু বিজ্ঞানীর অভিমত। সুতরাং সত্যিকারে মহাকাশ অভিযানে মানুষ কোনও দিনই যেতে পারবে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পৃথিবী থেকে অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব প্রায় 20,00,000 [2×10^6] আলোকবর্ষ। একটা মহাকাশযান যদি আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ছুটে এবং সে বেগ যদি প্রতি সেকেন্ডে 2,00,000 কিলোমিটার হয়, তবে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীতে পৌঁছাতে ওই মহাকাশযানের

সময় লাগবে 30,00,000 বছর। সেকেণ্ডে দু'লক্ষ কিলোমিটার গতি সম্পন্ন মহাকাশযান তৈরি করা মানুষের কাছে এখনও স্বপ্ন মাত্র। আবার এই গতিবেগ সৃষ্টি করা গেলেও কোনও মহাকাশ যাত্রী 30 লক্ষ বছর বেঁচে থাকবে না। এমন কি মহাকাশযানের মধ্যে কোনরকম কৃত্রিম উপায়েই তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। কাল প্রসরণের [Time Dilation] নিয়ম মেনে হয়ত তার আয়ু পার্থিব আয়ুর তুলনায় অনেকটা বেড়েই যাবে মহাকাশযানের মধ্যে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সূত্র মেনে। তবু প্রতি সেকেণ্ডে দু'লক্ষ কিলোমিটার গতির মহাকাশযান নিয়ে কোন মানুষ তার জীবদ্দশায় অ্যান্ড্রোমিডার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারবে না। কেন পারবে না তা দেখা যাক।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সময়-সংক্রান্ত অতি বিখ্যাত আইনস্টাইনীয় সেই সূত্রটিতে আসি, যেটি কাল-প্রসরণের হিসাব দেয়। সূত্রটি হল,

$$T = t \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

যেখানে, T – পৃথিবীর আপেক্ষিকে v গতিতে চলমান মাধ্যমের বা মহাকাশ-যানের ঘড়িতে সময়,

t = পার্থিব ঘড়িতে সময়,

v পৃথিবীর আপেক্ষিকে কোন মাধ্যমের বা মহাকাশযানের গতিবেগ,

c আলোর গতিবেগ।

বর্তমান আলোচনায় t = 30,00,000 বছর। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে দু'লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলা মহাকাশযানের অ্যান্ড্রোমিডা পৌঁছাতে যে সময় লাগবে তা। v = প্রতি সেকেন্ডে মহাকাশযানের গতিবেগ, যা হল 2,00,000 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। c = 3,00,000 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে।

অতএব, $$T = 3 \times 10^6 \times \sqrt{1 - \left(\frac{2,00,000}{3,00,000}\right)^2}$$

$$= 3 \times 10^6 \times \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

$$= 3 \times 10^6 \times \sqrt{1 - \frac{4}{9}}$$

$$= 3 \times 10^6 \times \sqrt{\frac{5}{9}} = 3 \times 10^6 \times \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$= 10^6 \times \sqrt{5} = 10^6 \times 2.24 \text{ [প্রায়]} = 22,40,000 \text{ বছর}$$

সুতরাং 30 লক্ষ বছরের পার্থিব সময় প্রতি সেকেন্ডে দু'লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলমান মহাকাশ যানে কাল প্রসরণের ফলে দাঁড়াবে 22.4 লক্ষ বছর। ওই মহাকাশযানের যাত্রীর 22.4 লক্ষ বছর বেঁচে থাকা অসম্ভব। জীবিত অবস্থায় ওই যাত্রী কখনই অ্যান্ড্রোমিডা পৌঁছাতে পারবে না। মহাকাশ যানের গতিবেগ আলোর বেগের 99.9999995% হলেও মহাকাশযানে যাত্রীকে সময় কাটাতে হবে 20 লক্ষ বছরেরও বেশি। মহাকাশযানের গতিবেগ এতাদৃশ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব তার যাত্রীর

20 লক্ষ বছরেরও বেশি বেঁচে থাকা। সুতরাং তত্ত্বীয়ভাবে অ্যান্ড্রোমিডায় পৌঁছানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। প্রযুক্তিগতভাবে তা আরও অসম্ভব। তাই মানুষের মহাকাশ অভিযান চিরকালই সীমিত থাকবে আমাদের সৌরমণ্ডলের মধ্যে, বড়জোর আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে।

মহাকাশ অভিযান নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে। মহাবিশ্বের বিশাল মহাকাশ চিরকাল আমাদের কাছে মহাবিস্ময় হয়েই থেকে যাবে। দশ লক্ষেরও বেশি ব্রহ্মাণ্ডের কোনওটিরও কাছাকাছি আমরা কখনই যেতে পারবো না। তাদের স্বরূপ সম্পর্কে অনেকটাই আমরা জানতে পারবো মহাকায় দূরবীনগুলির মাধ্যমে এবং তত্ত্বীয় ধারণার মধ্য দিয়ে। যেটুকু আমরা দূরবীন দিয়ে জানছি তা কিন্তু ওই ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান অবস্থা নয়, তার অতীতের অবস্থা। অ্যান্ড্রোমিডার কথাই ধরা যাক। তার থেকে এই মুহূর্তে যে আলো পৃথিবীতে এলো সেই আলো যাত্রা শুরু করেছিল 20 লক্ষ বছর আগে। দূরবীন দিয়ে সেই আলোর মাধ্যমে যে অ্যান্ড্রোমিডাকে এখন দেখছি সেটা অ্যান্ড্রোমিডার 20 লক্ষ বছর আগের অবস্থা। এখন তার অবস্থা কী তা আমরা জানি না, জানতে পারবোও না। যখনই তাকে দূরবীনে দেখবো তখন দেখবো তার 20 লক্ষ বছর আগের অবস্থা। এই 20 লক্ষ বছরের মধ্যে অ্যান্ড্রোমিডা যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তা আমরা জানতে পারবো না কোনওভাবেই। ধ্রুবতারা থেকে আলোর পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে 47 বছর। আজ যদি কোনওভাবে ধ্রুবতারাকে নিভিয়ে দেওয়া হয়, তবে 47 বছর ধরে আমরা ওই ধ্রুবতারাকে একই রকমভাবে আকাশের গায়ে দেখতে পাবো। 47 বছর পরে আমরা আর ধ্রুবতারাকে দেখতে পাবো না। সমস্ত জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে। সুতরাং দূরবীনে আমরা যা দেখছি তা কোন ব্রহ্মাণ্ড বা নক্ষত্রের বহু পুরাতন অবস্থা। ওই ব্রহ্মাণ্ড বা নক্ষত্র পৃথিবী থেকে যত আলোকবর্ষ দূরে দূরবীনে আমরা তাদের তত বছর আগের অবস্থাই দেখতে পাবো। তাদের বর্তমান অবস্থার কথা আমাদের অজানাই থাকবে।

সুতরাং আধুনিক মহাকাশ অভিযান বলতে মূলতঃ বোঝায় আমাদের সৌরমণ্ডলের আকাশে পরিক্রমণ বা অভিযান। পৃথিবীর আকাশ আমরা প্রায় ছেয়ে ফেলেছি নান ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহে। এগুলির সাহায্যে চলছে মহাকাশের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মহাবিশ্বের বিবিধ পর্যবেক্ষণ। এগুলির মধ্যে কতকগুলি নানান যোগাযোগ সংক্রান্ত উপগ্রহ, কতকগুলি আবহাওয়ার আগাম খবর যোগান দেয়, কতকগুলি আবার পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণরত। মহাকাশে স্টেশনও বানানো হয়েছে — পৃথিবীর আকাশে। নাম দেওয়া হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন' [International Space Station]। 'মির' নামক মহাকাশ স্টেশনটিকে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে মহাকাশে তার কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে। এখন ওই নতুন মহাকাশ স্টেশন তার জায়গায় কাজ করছে। পৃথিবীর আকাশে এখন নানা ঘটনা ঘটছে যা আমাদের চমৎকৃত করছে। নানা প্রাযুক্তিক উন্নতি দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। কিন্তু মহাকাশ অভিযানের বিশাল প্রাযুক্তিক প্রয়োজনের তুলনায় এতাবৎ এ সংক্রান্ত যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে তাকে প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। বলা যায়, সত্যিকারের মহাকাশ অভিযানের প্রাথমিক পদক্ষেপ সবে নেওয়া হয়েছে। 'দিল্লী' সত্যিই 'দূর অস্ত্'। আগেই বলেছি, দূর ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে মানুষের যাতায়াত কখনই সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন ছাড়া, কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে যাওয়ার

মাত্র দুটি ঘটনা এতাবৎ [2006 খ্রিস্টাব্দ অবধি] ঘটেছে। আমেরিকার এক ধনকুবের কিছুদিন আগে প্রায় দু'কোটি মার্কিন ডলার খরচ দিয়ে মহাকাশ ঘুরে এসেছেন। রাশিয়া বন্দোবস্ত করেছিল এই মহাকাশ ভ্রমণের, দু'কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় 100 কোটি টাকার বিনিময়ে। এই ভ্রমণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই বইয়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে। রাশিয়া সেই প্রথম কোনও মানুষকে মহাকাশ ভ্রমণে নিয়ে যায়, কেবলমাত্র ভ্রমণের জন্যই। সেবার রাশিয়া ঘোষণা করেছিল মহাকাশ ভ্রমণে মানুষ নিয়ে যাওয়ার সেই প্রথম এবং সেই শেষ। কিন্তু রাশিয়া তার এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ক'দিন আগে এক আমেরিকা প্রবাসী ইরানী মহিলাকে যথারীতি দু'কোটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে মহাকাশ ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে। কেবলমাত্র ভ্রমণের জন্য মহাকাশে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই মহিলা হলেন দ্বিতীয় মহাকাশ যাত্রী। মহাকাশ ভ্রমণের ইতিহাসে ইনিই প্রথম মহিলা যাত্রী। এর নাম আনাউশে আনসারী [Anousheh Ansari]

ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা, কল্পনা চাওলা প্রমুখ মহিলারা মহাকাশ গিয়েছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে। এঁরা কেউ মহাকাশে ভ্রমণের জন্য যান নি। কিন্তু আনাউশে মহাকাশে গিয়েছিলেন কেবলমাত্র মহাকাশ ভ্রমণের জন্য। আনাউশে জন্মসূত্রে ইরানী, কিন্তু তিনি এখন আমেরিকা প্রবাসী। 40 বছর বয়সী এই মহিলা ইরানে জন্মালেও এখন তিনি মার্কিন নাগরিক। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম মহাকাশ যাত্রী। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন ছিল মহাকাশ ভ্রমণের। 2006 সালের 18 ই সেপ্টেম্বর তা সফল হল। ওইদিন রুশ মহাকাশযান 'সয়ুজ টিএমএ-৪ [Soyuz TMA-8]-এ চড়ে আনাউশে কাজাখস্তানের বৈকানুর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উড়লেন দশদিনের মহাকাশ ভ্রমণে। তাঁর সঙ্গে গেলেন অন্য দুই মহাকাশচারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে। এঁরা হলেন আমেরিকার মাইকেল লোপেজ অ্যালেগ্রিয়া এবং রাশিয়ার মিখাইল তুরিন। ফেরার সময় এঁরা দু'জন ফেরেননি। রয়ে গেছেন 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে' জার্মান নভশ্চর টমাস রাইটারের [Thomas Wrighter] সঙ্গে। ছয়মাস ওঁরা থাকবেন ওই মহাকাশ স্টেশনে। কিন্তু আনাউশের সঙ্গে ফিরে এসেছেন অন্য দু'জন নভশ্চর যাঁরা ওই মহাকাশ স্টেশনে বসবাস করছিলেন। এঁরা হলেন আমেরিকার জেফ উইলিয়ামস [Jeff Williams] এবং পাভেল ভিনোগ্রাদোভ [Pavel Vinogradov]. সুতরাং মহাকাশ স্টেশনে রয়ে গেছে তিনজন অন্ততঃ ছয়মাস বসবাসের জন্য। এই তিনজন হলেন ঃ মিখাইল তুরিন, মাইকেল লোপেজ অ্যালেগ্রিয়া এবং টমাস রাইটার।

19শে সেপ্টেম্বরের [2006 খ্রিস্টাব্দ] আনন্দবাজার আনাউশের এই মহাকাশযাত্রার সম্পর্কে লিখেছিল ঃ

"........ইরান তো বটেই, মুসলিম কন্যাদের মধ্যেও আনাউশেই প্রথম মহাকাশযাত্রী। তাই তাঁর স্বপ্নপূরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে সংস্কারের শিকল ভাঙার ইতিহাস। নিজের নাগরিক পরিচয়ের থেকেও তাই জন্মভূমিকেই সাফল্যের মুহূর্তে বার বার মনে করছেন তিনি। ইরানি পতাকা নিয়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। আমেরিকা ও রাশিয়া সরকার সরাসরি এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। আনাউশের যাত্রায় কোনওভাবে যাতে রাজনীতির রং না লাগে তাই এই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু আনাউশে পারেননি। মহাকাশযানে ওঠার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "আমার ব্যাগে ইরানের জাতীয় পতাকা থাকবেই।" কথাগুলো বলার সময় মুখটা একটু বেশিই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

চিত্র ঃ 21

● যাত্রা শুরুর আগে মায়ের সঙ্গে আনাউশে। ●

কম ধকল পোহাতে হয়নি আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নটাকে বাস্তব করতে। আনাউশে প্রোডিয়া সিস্টেমস নামে এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার মালকিন। আমেরিকায় বসে স্বামী ও দেওরের সঙ্গে ব্যবসা সামলান। আর ফাঁকে ফাঁকে গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ- ধুমকেতু, দূর-দুনিয়ার বাসিন্দাদের সান্নিধ্যে আসতে মন কেমন করে। মনের ডাকেই মহাকাশ পর্যটনে মজে যাওয়া। ইংরাজিটাও ভাল মতো জানতেন না।

সাউন্ড অফ মিউজিকের 'মাই ফেভারিট থিংস' গানটাই যা জানা ছিল। "রেইন ড্রপস অন রোজেস অ্যান্ড হুইস্কার অন কিটেনস / ব্রাইট কপার কেটেলস অ্যান্ড ওয়ার্ম উলেন মিটেনস।" তবে সব পছন্দের সেরা চাঁদ-তারার নীল দুনিয়াটা যে এত শিগগিরি ছুঁতে পারবেন, ধারণা ছিল না।

কথা ছিল, রুশ ব্যোমযান সয়ুজের পরবর্তী অভিযানে তিনি সঙ্গী হবেন। কিন্তু সুযোগটা এ বারই এসে গেল। জাপানি ব্যবসায়ী দাইশুকে এনোমতো অসুস্থতার জন্য যেতে না পারায় শূন্য স্থান ভরলেন আনাউশে। সঙ্কট তাতেও কাটেনি। নাসার মহাকাশযান আটলান্টিস আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। স্টেশনে দু'টি যান থাকার স্থান সংকুলান নেই। ফলে, আশঙ্কা ছিলই। কিন্তু শেষমেশ সয়ুজকে জায়গা করে দিতে আটলান্টিস ফিরতি পথ ধরল।

মেয়ের আকাশ ছোঁয়ার আনন্দে সামিল মা-ও। বৈকানুরের অদূরে দাঁড়িয়ে ছল ছল চোখে বললেন, "জানি, মেয়ে আমার দারুণ খুশি। ও সুস্থ শরীরে ফিরে আসুক এই প্রার্থনাই করি।" পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীকে দেখার আনন্দে আনাউশেও আত্মহারা। মহাকাশযাত্রীর পোশাকে আকাশে ওড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বলছিলেন, 'কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ 19শে সেপ্টেম্বর, 2006]

দশদিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কাটিয়ে আনাউশে ফিরে আসেন পৃথিবীতে 2006 সালের 29শে সেপ্টেম্বরের ভোর সোয়া পাঁচটায়। এটা অবশ্য বৈকানুর অঞ্চলের স্থানীয় সময়। আগেই বলেছি, আনাউশের সঙ্গে মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন দুই নভশ্চর পাভেল এবং জেফ। ফিরে আসার পর আনাউশে বলেছেন, 'I had a great cxperience". বলেছেন, "মহাকাশ অভিযান শেষ হল। ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। কান্না পাচ্ছে। কিন্তু নতুন করে স্বপ্ন দেখার আবার শুরু। আমার মনে হয় প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনে আমি অ্যালার্ম ঘড়ির মতো কাজ করব এবার থেকে। নিজে অন্য রকম কিছু করে পৃথিবীটাকেও অন্যরকম করে তোলার চেষ্টা করা দরকার সকলের।" [চিত্র ঃ 22 দেখুন]

আনাউশে এবং তাঁর দুই সঙ্গী নভশ্চরকে মাটিতে নামার পর খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁদের সবাইকে বিমানে নিয়ে যাওয়া হয় মস্কোর কাছে স্টার সিটির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের পরীক্ষা করবেন। মহাকাশযান থেকে আনাউশে মাটিতে পা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামী হামিদ আনসারী তাঁকে লালগোলাপের তোড়া ও উষ্ণ আলিঙ্গন দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। আনাউশের সম্পর্কে মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের এক অধিকর্তা বলেছেন, "আনাউশে দারুণ কাজ করেছেন। মহাকাশ স্টেশনে শামুক ও কেঁচোর প্রজনন এবং বার্লি উৎপাদন করা হয়েছে। আনাউশে কেবল পর্যটক হিসাবেই নয়, নভশ্চর হিসেবেও সফল।"

আরও তিনজন মহাকাশ ভ্রমণের জন্য প্রত্যেকে 100 কোটি টাকা বা দু'কোটি মার্কিন ডলার করে রাশিয়ার মহকাশ সংস্থার কাছে জমা দিয়েছে। এঁরাও অপেক্ষা করছেন মহাকাশ ভ্রমণের জন্য। মনে রাখতে হবে, এই মহাকাশ ভ্রমণ, সত্যিকারের মহাকাশ ভ্রমণের তুলনায় অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। ●

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহাকাশের প্রতিবেশী

[তত্ত্বগতভাবে মহাবিশ্বে রয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড তাদেরই একটি। আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডগুলির রকম-সকম, তাদের প্রকারভেদ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের স্থানীয় প্রতিবেশীর সংখ্যা 33টি। এদের মধ্যে সাতটির সামান্য বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড্রোমিডা, গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ প্রভৃতি প্রতিবেশীদের কথা কিছুটা গুরুত্ব দিয়েই বলা হয়েছে এই স্বল্প পরিসরে। কোয়াসারেরা সত্যিকারে কী, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বের অকেজো শক্তি কি কোয়াসারে কেজো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে? এর উত্তর অজানা। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 1987A সুপারনোভার বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ। গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ ব্রহ্মাণ্ডের দানব নক্ষত্র 'স্যান্ডুলিক'-এর বিস্ফোরণে ওই সুপারনোভার সৃষ্টি হয়েছে প্রায় 1,70,000 বছর আগে।]

বিশাল মহাবিশ্ব অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সীর সমাহার। প্রতিটি গ্যালাক্সীতে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র, যারা আকার-আয়তনে আমাদের সূর্যের মত কিংবা সূর্যের চেয়ে বড় বা ছোট। আমাদের সৌরমণ্ডল রয়েছে যে গ্যালাক্সীতে তার নাম 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড' [Milkyway Galaxy]। এই ব্রহ্মাণ্ড মোটামুটি সাধারণ আকার আয়তনের। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবেশী বলতে মহাবিশ্বের সব ব্রহ্মাণ্ডকেই বোঝায়। তাদের সংখ্যা এক হাজার কোটি [10^{10}] হতে পারে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। সুতরাং এই এক হাজার কোটি প্রতিবেশীর কথা বলা অসম্ভব। দূরের প্রতিবেশীদের বাদ দিয়ে তাই কাছের প্রতিবেশীদের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের খুব কাছের গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যাও 33টি। এদের মধ্যে সাতটি সবচেয়ে কাছের। বর্তমান আলোচনায় আমরা ওই দূর প্রতিবেশীদের কথা যেমন সাধারণভাবে বলবো, তেমনি কিছুটা বিশদভাবে বলা হবে কাছের ওই সাতটি গ্যালাক্সী সম্পর্কে। যে 33টি গ্যালাক্সী আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছে অবস্থিত তাদের বলা হয় 'স্থানীয় বর্গ' [Local Group]।

প্রতিফলক দূরবীনের [Reflecting Telescope] সাহায্যে মোটামুটি 500 কোটি [5×10^{9}] আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে যে সব গ্যালাক্সী পাওয়া গেছে তাদের সংখ্যা প্রায় 50 কোটি। অমাাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র সংখ্যা 10,000 কোটি [10^{11}]। সূর্য একটি গড়পড়তা ভরের এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। এই 10,000 কোটি নক্ষত্রের অনেকগুলি সূর্যের চেয়ে অনেকগুণ বড়। আবার বহু নক্ষত্র আছে সূর্যের চেয়ে ছোট। সূর্যের মতো নক্ষত্রের সংখ্যাই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে বেশি। এই গ্যালাক্সীর বা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস প্রায় 1,00,000 আলোকবর্ষ। আমাদের সৌরমণ্ডল তথা সূর্য রয়েছে এই গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে প্রায় 30,000 আলোকবর্ষ দূরে। মতান্তরে, এই দূরত্ব 33,000 আলোকবর্ষ। এই ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা একটু পরেই করা হচ্ছে।

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ থেকে খালি চোখেই আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রগুলির বাইরে একটা ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী দেখা যায়। এর অবস্থান আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বহুদূরে হলেও একে দেখা যায় আন্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। এই গ্যালাক্সীর নাম তাই 'অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী'। এর পৌরাণিক নাম 'রূপক ব্রহ্মাণ্ড'। এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে 'মেসিয়ার 31' [Messier 31] নামেও অভিহিত করা হয়। তার কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডটি আবিষ্কার করেন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস মেসিয়ার [Charles Messier] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। তিনি ছিলেন মূলতঃ ধূমকেতু-সন্ধানী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনিই

আধুনিককালে আবিষ্কার করেন পৌরাণিককালের আবিষ্কৃত রূপক ব্রহ্মাণ্ডটিকে। এটিকে খালি চোখে অস্পষ্ট দেখা গেলেও বাইনোকুলার এবং ছোট দূরবীনে একে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটি 'মেসিয়ার 31' নামে সুপরিচিত হলেও, সাধারণের কাছে এটি 'অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী' নামেই পরিচিত। এর আকার আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মত হলেও, এর আয়তন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে অন্ততঃ আট গুণ বেশি। অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমিডার ব্যাস আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ। অ্যান্ড্রোমিডার ব্যাস প্রায় দু'লক্ষ [2×10^5] আলোকবর্ষ। এসব নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা একটু পরেই করা হচ্ছে।

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকেও পাশাপাশি থাকা দুটি গ্যালাক্সী খালি চোখে দেখা যায়। আন্ড্রোমিডার মত এই দুটি গ্যালাক্সীও আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবেশী দুই ব্রহ্মাণ্ড। ভূ-পর্যটক ম্যাগেল্লান এদের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পর্তুগীজ এই ভূ-পর্যটকটি সারাজীবনই সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ম্যাগেল্লান [Ferdinand de Magellan] [1480-1521 খ্রিস্টাব্দ] তাঁর প্রথম অভিযানে গিয়েছিলেন 'মেলেকা' [Melcka] বা 'মালাক্কা'[Malacca]। সময়টা ছিল 1505-1511 খ্রিস্টাব্দ। এরপর 1519 সালে তিনি পাঁচটি জাহাজ ও 250 জন লোকলস্কর নিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। পৌঁছে যান ফিলিপিন্স [Philippines]-এ। দক্ষিণ গোলার্ধ পরিক্রমণের সময়ই তিনি আকাশের গায় দুটি ছোট আকারের স্থির মেঘের দেখা পান। এদের কথাও তিনি লিখে রাখেন। অনেক পরে আধুনিককালে এসে জানা যায় এই দুই খণ্ড স্থির মেঘ আসলে দুটি ব্রহ্মাণ্ড, যেগুলি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই দুই গ্যালাক্সীর নামকরণ করা হয়েছে ম্যাগেল্লানের নামেই। বৃহত্তর গ্যালাক্সীটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' [Large Magellanic Cloud] এবং ছোটটির নামকরণ করা হয়ছে 'ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' [Small Magellanic Cloud]। পৃথিবীর থেকে খালি চোখে কিংবা দূরবীনে দেখা কাছাকাছি অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে নীহারিকার [Nebula] মত দেখতে লাগে। এগুলির চিত্র থেকে বিশ্লেষণ করে এগুলিতে থাকা অসংখ্য নক্ষত্রদের হদিশ পাওয়া যায়। তবে অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিগুণ দূরত্বে থাকা ব্রহ্মাণ্ডগুলির বিশ্লেষণ এভাবে করা সম্ভব হয় না। অন্য পদ্ধতি ব্যবহার কবতে হয়।

উভয় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা একটু পরেই করা হয়েছে। দূরবীন আবিষ্কারের পর থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণের সূচনা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হলেও মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বিশেষ করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণের প্রকৃত সূচনা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। আর বিংশ শতাব্দীতে এসে তা লাভ করেছে পূর্ণ আধুনিকতা। গত 100 বছরে বিশ্ব পর্যবেক্ষণের অনেক অগ্রগতি হলেও মহাবিশ্বকে পুরোপুরি জানা কিংবা তার সব রহস্যের সমাধান আজও সম্ভব হয় নি। পুরাতন মত পরিবর্তিত হয়ে নতুন মত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আবার তাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এইভাবে বিশ্বতত্ত্বের প্রকৃত সত্য উদ্ভাবনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ ক্রমশঃ উদঘাটিত হচ্ছে প্রায় প্রতিনিয়তই। আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডদের আমরা নতুন করে জানছি এবং চিনছি।

মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নাক্ষত্রদ্বীপ। প্রতিটি নাক্ষত্রদ্বীপে রয়েছে নানা ধরনের লক্ষ কোটি নক্ষত্র, বিশাল পরিমাণ গ্যাস, বিকিরণ ও ধূলিকণা ইত্যাদি। প্রায় 1500 কোটি [15×10^9] বছর আগে গ্যালাক্সীগুলি তৈরি হতে আরম্ভ করে। এখন মনে করা হয় মহাবিশ্বের বয়স প্রায় 2000 কোটি [20×10^9] বছর। গ্যালাক্সীগুলি যখন একেবারে কমবয়েসী বা তরুণ তখনই সম্ভবতঃ কৃষ্ণগহ্বরগুলি উৎপন্ন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কয়েকশো কোটি বছর আগে এই কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল বলেই এখন আমরা অতি উজ্জ্বল কোয়াসারগুলিকে মহাকাশে দেখতে পাচ্ছি।

অন্য ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা বিংশ শতাব্দীর আগে মানুষের মনে আসে নি। যদিও রূপক ব্রহ্মাণ্ডের কথা প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতেন, তবুও বলা যায় গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার শুরু বিংশ শতাব্দীতেই। এই শতাব্দীতেই শুরু হয় গ্যালাক্সী নিয়ে নিবিড় গবেষণা। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্ত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয় এই সব গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে। জানা গেল, ছায়াপথ ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড, নক্ষত্রগুচ্ছ, বৃহৎ নক্ষত্রমণ্ডলী, কোয়াসার, গ্যালাক্সীদের ক্রমবিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা তথ্য।

শঙ্খবৃত্তাকার নীহারিকাগুলি কী, তা নিয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছিল। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যে অনুরূপ ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী থাকতে পারে সে ধারণা তখন মানুষের ছিল না। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট [Immanuel Kant] একালে প্রথম বলেছিলেন যে, শঙ্খবৃত্তকার নীহারিকাগুলি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু তাঁর মতবাদ প্রমাণ করার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তখন ছিল না। 1920 সাল নাগাদ একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন নীহারিকাগুলি আমাদের গ্যালাক্সীর বাইরে অবস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলী যেগুলির কোন কোনটিতে নতুন নক্ষত্র উৎপন্ন হচ্ছে। 1925 সালে যুক্তরাষ্ট্রের হেবার ডি, কার্টিস [Heber D.Curtis] এবং সুইডেনের নুট লান্ডমার্ক [Knut Lundmark] জানালেন, ওই সব নীহারিকা আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মতই আলাদা ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী। এদের অনেকগুলি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের আকার-আয়তনসম্পন্ন। এমনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সীর সমাহার এই মহাবিশ্ব। কতকগুলি নীহারিকা অবশ্য গ্যাসীয় পুঞ্জ হলেও বেশির ভাগ নীহারিকাই দূরবর্তী পৃথক পৃথক নক্ষত্রমণ্ডলী বা গ্যালাক্সী, যেগুলি আকার-আয়তনে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মত বা তার থেকে ছোট কিংবা বড়। এই সব ব্রহ্মাণ্ড যেন এক একটি নাক্ষত্রদ্বীপ। মহাবিশ্বের মহাকাশে ছড়িয়ে আছে এই সব নাক্ষত্রদ্বীপ।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড হল 'ম্যাগেল্লানীয় মেঘ'। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক অবধি ভাবা হত এই দুটি ব্রহ্মাণ্ড আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত। দুই ম্যাগেল্লানীয় মেঘকে তাদের উত্তপ্ত নীল নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গ্যাসীয় মেঘসমূহ নিয়ে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণাংশের অংশ বিশেষ বলেই মনে হত। এগুলি যে প্রায় 2,00,000 আলোকবর্ষ দূরের আলাদা দুটি ব্রহ্মাণ্ড তা তখন জানা ছিল না। হার্লো শেপ্‌লে [Harlow Shapley] [1885-1972], যিনি 1914 থেকে 1921 অবধি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে নানা গবেষণা করেছিলেন, তিনিই প্রথম বলেন যে, এগুলি শঙ্খবৃত্তাকার নীহারিকা। যুক্তরাষ্ট্রীয় এই বিজ্ঞানীটিই প্রথম এই দুই নীহারিকার দূরত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করেন পর্যায়কাল-জ্যোতি [Period-Luminosity] [P-L] সম্পর্ক দিয়ে। এই সম্পর্ক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব মাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় 1912 খ্রিস্টাব্দে। আবিষ্কার করেন হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের [Harvard College Observatory] হেনরিয়েটা সোয়ান লিভিট [Henrietta Swan Leavitt] [1898-1921 খ্রিস্টাব্দ]। লিভিটের এই আবিষ্কারকে কাজে লাগান শেপ্‌লে। তিনি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুই ম্যাগেল্লানীয় মেঘের দূরত্ব নির্ণয় করেন 75,000 আলোকবর্ষ। যদিও এই দূরত্ব এর দ্বিগুণেরও বেশি, তবুও প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শেপ্‌লের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সে সময় ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড ঠিক কতটা দূর অবধি বিস্তৃত তার সঠিক ধারণা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল না।

অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীর আবিষ্কার নিয়েও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে বেশ কিছু দিন সময় লেগেছে। এটি আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে উজ্জ্বলতম। মেসিয়ার-31 (M31) নামের এই ব্রহ্মাণ্ডটির কেন্দ্রাঞ্চলে 1885 সালে একটি উজ্জ্বল তারা প্রথম দেখা যায়, যেটি আগে অদৃশ্য ছিল। এই তারাটি এতোই উজ্জ্বল ছিল যে, একে খালি চোখেই পৃথিবী থেকে দেখা গেল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে যখন এটি ম্লান হয়ে এল তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন এটি একটি নোভা [Nova], কিংবা নতুন নক্ষত্র। এ ধরনের নতুন তারা সাময়িকভাবে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যেত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধরে নিলেন M31 আমাদের গ্যালাক্সীতেই অবস্থিত এবং ওই নতুন তারাটিকে যেহেতু খালিচোখেই দেখা যাচ্ছিল সুতরাং ওটির দূরত্ব তেমন বেশি নয়। আরো সিদ্ধান্ত করা হল, নীহারিকাগুলি আমাদের ছায়াপথেরই কাছাকাছি অবস্থিত এবং এরই নক্ষত্রধারার অন্তর্গত। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়ও অ্যান্ড্রোমিডা আলাদা ব্রহ্মাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত হয় নি।

1910 খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে 152 সেন্টিমিটার ব্যাসের দূরবীন দিয়ে জে.সি. ডানকান [J.C. Duncan] এবং জর্জ. ডব্লিউ. রিচে [George W. Ritchey] M-31-এর যে সব ছবি তুললেন সেগুলি খুঁতিয়ে বিশ্লেষণ করার পর জানা গেল অ্যান্ড্রোমিডার ওই উজ্জ্বল তারাটির 10,000 ভাগের এক ভাগ ঔজ্জ্বল্যের বহু নীহারিকার মত বস্তু রয়েছে M-31-এর মধ্যে। সুতরাং ওই উজ্জ্বল তারাটি কী বস্তু তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। অনেক দূরের একটি তারার উজ্জ্বলতা অতো বেশি কেন, তারও উত্তর খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। 100 ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন তৈরি হওয়ার পর 1917 সালে মাউন্ট উইলসন মান মন্দিরে M-31-এর ছবি নতুন করে নেওয়া হল। হাবলের [Edwin P. Hubble] সহকারী মিল্টন. এল. হিউম্যাসন [Milton L. Humason] এই সব

নতুন ছবি তুললেন। ছবিগুলি সমীক্ষার পর M-31 সম্পর্কে বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। প্রায় 350টি এই ধরনের ছবি পরীক্ষা করে জানা গেল M-31 ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মতই এক বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলী।

প্রায় এই রকম সময়ে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরও পর্যবেক্ষণ চলতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ছায়াপথ গ্যালাক্সী থালার মত আকৃতিসম্পন্ন এবং সূর্য রয়েছে তার কেন্দ্রের কাছাকাছি। সূর্য থেকে এই গ্যালাক্সীর প্রান্তদেশ মাত্র 15000 আলোকবর্ষ দূরে। এই সিদ্ধান্তে আসার পিছনে ছিল নক্ষত্রের সংখ্যা, সেগুলির বন্টন, নক্ষত্রপুঞ্জের গঠন, যুগ্মতারাসমূহ, পরিবর্তনশীল নক্ষত্র, গ্যাসীয়পুঞ্জ ইত্যাদির পরিসাংখ্যিক তথ্যগুলির গভীর বিশ্লেষণ। সে সময় মনে হয়েছিল কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে এগুলি খুবই পাতলা হয়ে গেছে। 1917 সালে এইসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি জানালেন শেপ্‌লে। তিনি গোলকাকার নক্ষত্রগুচ্ছের নানা পর্যবেক্ষণের পর জানালেন ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র রয়েছে সূর্য থেকে 30,000 আলোকবর্ষ দূরে। ছায়াপথের আয়তন পূর্বানুমিত আয়তনের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এর ব্যাস প্রায় 1,00,000 আলোকবর্ষ। এর কেন্দ্রে রয়েছে গোলাকার মেঘপুঞ্জ। শেপ্‌লের আবিষ্কার দুটি নতুন তথ্য দিল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে। এর একটি হল ছায়াপথের আয়তন সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন। ছায়াপথের আয়তন এতাবৎ যতটা ভাবা হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তার অনেকটাই বেশি। দ্বিতীয় ধারণার পরিবর্তন হল, সূর্যের অবস্থান ছায়াপথের কেন্দ্রে নয়, কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে অনেকটা দূরেই।

শেপ্‌লের তথ্য অনুসারে পাওয়া গেল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র রয়েছে ধনুরাশির [Sagittarius] মধ্যে পৃথিবী থেকে প্রায় 30,000 আলোকবর্ষ দূরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুললেন কথিত ওই অঞ্চলে কিছু দেখা যায় না কেন? 1930 সালে লিক মানমন্দিরের [Lick Observatory] জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট জে. ট্রাম্পলার [Robert J. Trumpler] এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি জানালেন যে, আন্তর্নক্ষত্রীয় ধূলিমণ্ডলের জন্য কয়েক হাজার আলোকবর্ষ পরের বস্তুগুলি দেখা সম্ভব হয় না। এই ধূলিজালের জন্যই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলের বস্তুগুলিকে দেখা যায় না।

শেপ্‌লে স্থানীয় গ্যালাক্সীয় তন্ত্রের বিপুল বিশালতায় বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস তাঁকে অন্যান্য গ্যালাক্সীর বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের পরিপন্থী করে তোলে। তিনি মনে করতেন, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড যেহেতু অতি বিশাল অতএব অন্যান্য শঙ্খবৃত্তকার নীহারিকাগুলি ওই ছায়াপথের মধ্যেই অবস্থিত। ওগুলি যে আলাদা ব্রহ্মাণ্ড হতে পারে তা তিনি মনে করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, অ্যান্ড্রোমিডার নোভা তারাটি মাত্র কয়েকশো আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই ধারণা একেবারেই সত্যি ছিল না। দ্বিতীয় ভুল ধারণাটি তৈরি হয় মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে শেপ্‌লের সহকারী আদ্রিয়ান ভ্যান মানেন [Adrian Van Maanen]-এর কৌতূহলোদ্দীপক ভুলের জন্য।

ভ্যান মানেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা 'জ্যোতিঃমিতি' [Astrometry] নিয়ে গভীর গবেষণা করেন। এই শাখার মূল লক্ষ্য ছিল নক্ষত্রদের সঠিক অবস্থান এবং গতি নিরূপণ। ভ্যান মানেন এই সময় নক্ষত্র পর্যবেক্ষকদের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নিরলস পর্যবেক্ষণের সুবাদে। তাঁর নক্ষত্রসমূহের অবস্থান নির্ণয় ছিল একেবারে নিখুঁত এবং পরবর্তীকালে সঠিক বলেই প্রমাণিত। কিন্তু তিনিও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুল করেছিলেন। এই ভুল ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণে এবং বিশ্লেষণে। M-33, M101 এবং M-51 নামের শঙ্খবৃত্তাকার নীহারিকাগুলির পর্যবেক্ষণের পর 1920 সাল নাগাদ প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্রগুলিতে তিনি দেখান, এইসব নীহারিকাদের সর্পিল বাহুগুলি ঘূর্ণায়মান এবং এই ঘূর্ণনের পর্যাবৃত্তকাল প্রায় 1,00,000 বছর। কৌণিক বেগ প্রায় সব কটিক্ষেত্রেই 0.02 সেকেন্ড [কৌণিক] প্রতি বছরে।

শেপ্‌লে ভ্যান মানেনের এই তথ্য গ্রহণ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, এই নীহারিকাগুলি আমাদের কাছাকাছিই অবস্থিত এবং এগুলি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, M-51-এর আপাত ঘূর্ণনবেগ প্রতি বছরে 0.02 সেকেন্ড [কৌণিক] হলে, M-51 নীহারিকার প্রকৃত গতিবেগ হবে বিশাল, যদি এটি একটি আলাদা গ্যালাক্সী হয় ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে। এটি এক কোটি আলোকবর্ষ

দূরত্বে অবস্থিত হলে এর ঘূর্ণন বেগ হবে প্রায় 12,000 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। শেপ্‌লে জানালেন, যুক্তিসঙ্গত গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 100 কিলোমিটার হলে M-51-এর দূরত্ব একলক্ষ আলোকবর্ষেরও কম হবে এবং এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গতই হবে।

ভ্যান মানেনের ওই গুরুত্বপূর্ণ মাপজোখে কেন ভুল হয়েছিল তা ঠিক পরিষ্কার নয়। তিনি এই পরিমাপ আরও দু-তিনবার করে দেখেছিলেন ফলাফল একই হচ্ছে। এমন কি হাব্‌লের দেওয়া গ্যালাক্সী সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যার পরেও ভ্যান মানেন তাঁর পরিমাপে কোনও ভুল খুঁজে পাননি। পরবর্তীকালে এই ভুলের দুটি ব্যাখ্যা দেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এর প্রথমটি হল এই যে, শঙ্খবৃত্তাকার নীহারিকাগুলি ঘূর্ণায়মান বলে মনে হয় এবং এই ধারণাটি পর্যবেক্ষকের অবচেতন মনে প্রভাব ফেলে। এর ফলে সংবেদনশীল এই সূক্ষ্ম পরিমাপে ভুল হয়ে যায়, যা হয়েছিল ভ্যান মানেনের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় কারণটি হল, প্রথম তোলা একগুচ্ছ আলোকচিত্রের সমস্যা, যেগুলি চিরাচরিত প্রথা-পদ্ধতি মেনে তোলা হয় নি। নতুন পদ্ধতিতে তোলা ছবিগুলি যথেষ্ট সুন্দর হলেও সম্ভবতঃ এগুলিতে নক্ষত্রদের অবস্থানের খুব সামান্য সরণ ঘটেছিল। তাই ভ্যান মানেনের ওই ভুল হয়েছিল। সুতরাং তাঁর ভুল ছিল ওই ছবিগুলিতেই। প্রচলিত প্রথা অনুসরণ না করে নতুন স্বকীয় পদ্ধতিতে ছবি তুলেই ওই বিপত্তি। তবে ওই সময় শেপ্‌লেসহ অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভ্যান মানেনের পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ফলে, নীহারিকাগুলি যে অনেকক্ষেত্রেই অন্য গ্যালাক্সী তা অস্বীকৃত হয়। আর তাই, অন্যান্য গ্যালাক্সীর আবিষ্কার, পর্যবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্বের বিষয়ে গবেষণার প্রকৃত অগ্রগতি অনেকটাই ব্যাহত হয়।

1920 সালেই ওয়াশিংটনে গ্যালাক্সী নিয়ে এক বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মূল বক্তা ছিলেন শেপ্‌লে এবং কার্টিস [Heber Curtis]। শেপ্‌লে বিশ্বাস করতেন একটিমাত্র গ্যালাক্সীর মহাবিশ্বে। কার্টিস মনে করতেন এই মহাবিশ্ব বহু দ্বীপ-গ্যালাক্সীর সমাহার। নীহারিকাগুলি এক একটি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। শেপ্‌লে মনে করতেন নীহারিকাগুলি এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত। কিন্তু বহু দূরবর্তী নীহারিকাগুলি একটি মাত্র ব্রহ্মাণ্ড বা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এমন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতেন না সে সময়ের বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সারা বিশ্ব জুড়ে একটাই গ্যালাক্সী এমন ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ওই বিতর্ক সভায় মহাবিশ্ব একটি গ্যালাক্সী অথবা অনেকগুলি দ্বীপ-গ্যালাক্সীর সমাহার এনিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা গেল না। শেপ্‌লে-গোষ্ঠী এবং কার্টিস-গোষ্ঠী তাঁদের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

1920 সালের গোড়ার দিকে হাবল্‌ [Edwin P. Bubble] মেঘের মত দেখতে NGC 6822 বস্তুটির 15টি তারা আবিষ্কার করেন। এই তারাগুলির ঔজ্জ্বল্য ছিল পরিবর্তনশীল। এই ধরনের পরিবর্তনশীল তারাদের বলা হয় 'Cepheids'। হাবল্‌ প্রথমে এদের Cepheids বলে সন্দেহ করলেও পরে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানলেন এগুলির মধ্যে 11টি তারা Cepheid এবং এগুলি ছায়াপথে ও ম্যাগেল্লানীয় মেঘে দেখা Cepheid-দের মত একই ধরনের গুণসম্পন্ন। তিনি ধরে নিলেন P-L সম্পর্ক [Period-Luminosity Relation] বিশ্বজনীন এবং এর থেকে NGC 6822-এর দূরত্ব নির্ণয় করলেন শেপ্‌লের P-L সম্পর্কের ক্রমাংকন [Calibration] থেকে। এখন অবশ্য এই ক্রমাংকন ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যাইহোক, হাবল্‌ শেপলের ওই ক্রমাংকন অনুসরণ করে NGC6822-এর দূরত্ব পেলেন 7,00,000 অলোকবর্ষ। এখন অবশ্য এই দূরত্ব সঠিকভাবে মাপা হয়েছে এবং তা 20,00,000 আলোকবর্ষ। হাবল্‌ সিদ্ধান্তে এলেন NGC 6822 নিশ্চয়ই অনেক দূরের পৃথক এক গ্যালাক্সী। এটি ছায়াপথের অন্তর্গত নয়।

1924 সালে হাবল্‌ একই ধরনের Cepheid-দের M-31 বা NGC 224-এ খুঁজে পাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আরও পাঁচ বছর ধরে নানা গবেষণার পর হাবল্‌ মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে সূত্র উপস্থাপিত করলেন 1929 খ্রিস্বাব্দে, তা হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুগান্তকারী অতি বিখ্যাত 'হাবল্‌-সূত্র' [Hubble's Law]। এখানে প্রতিষ্ঠিত হল আলাদা আলাদা গ্যালাক্সীর অস্তিত্ব। অর্থাৎ মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীগুলি পৃথক দ্বীপের মত অবস্থিত এও স্বীকৃত হল। হাবল্‌ Cepheid-দের পর্যবেক্ষণ করে NGC 6822-এর দূরত্ব নির্ণয় করে ফেললেন, জেনে ফেললেন তার প্রকৃতি এবং তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, NGC 6822

একটি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। এটি ছায়াপথের অন্তর্গত নয়। Cepheid নক্ষত্রগুলি হল হলদে রঙের দৈত্যাকার বা অতিশয় দৈত্যাকৃতি স্পন্দনশীল পরিবর্তী তারা বা নক্ষত্র। এদের 'স্পন্দনশীল নক্ষত্র'-ও বলা যেতে পারে। NGC 6822-র মধ্য দিয়ে আরও পাঁচটি নীহারিকার মত বস্তু হাবলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। কিন্তু তিনি এগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। পরে দেখা গেছে, এগুলিও বটিকাকৃতি দৈত্যাকার গ্যালাক্সী।

1929 সালে হাবল্ M31 বা অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীর উপর তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে তোলা 350টি আলোকচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাবল্ সিদ্ধান্ত নেন, M-31একটি আলাদা গ্যালাক্সী এবং এটি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে আকার আয়তনে অনেকটাই বড়। M-31 যেহেতু বিশাল এক গ্যালাক্সী তাই হাবল এর চারটি অঞ্চল নিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা শুরু করেন। এই চারটি অঞ্চলের মোট পরিমাণ ছিল এই গ্যালাক্সীটির আয়তনের অর্ধেকেরও কম। তাঁর নিরীক্ষণের আওতার বাইরে থাকা অঞ্চল আমাদের অজানা ছিল প্রায় আরও 50 বছর। 1980 সালে অ্যান্ড্রোমিডার এই অজানা অংশ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। এই বিশাল গ্যালাক্সীটি সম্পর্কে এখন আরও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

হাবল্ বলেছিলেন M-31-এর কেন্দ্রাঞ্চলের তারাগুলি স্পষ্ট নয়। কিন্তু সর্পিল বাহুগুলিতে তারাগুলি বেশ ভালো রকমই স্পষ্ট। একালে জানা গেছে, অন্যান্য শঙ্খবৃত্তাকার গ্যালাক্সীদের মত M-31-এর কেন্দ্রাঞ্চলও স্ফীত এবং সেখানে রয়েছে পুরানো তারার দল, যেগুলির ঔজ্জ্বল্য খুবই কম। 1944 খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওয়াল্টার বাদে [Walter Baade] সর্বপ্রথম M-31-এর কেন্দ্রাঞ্চলের বিশ্লেষণ করলেন। তিনি অনেক কষ্ট করে এই অঞ্চলের বহু প্রাচীন তারাদের মধ্যে কয়েকটি উজ্জ্বলতম লাল দানব [Red Giant] তারা খুঁজে পেলেন। সর্পিল বাহুগুলিতে পাওয়া গেল তরুণ, উজ্জ্বল, উত্তপ্ত, নীল-রঙ বহু নক্ষত্র এবং এগুলির বিশ্লেষণ খুব সহজেই সম্ভব হল। উজ্জ্বল তারাগুলি এতোই উজ্জ্বল যে এগুলিকে সাধারণ দূরবীনে দেখা সম্ভব হল। মনে রাখতে হবে, M-31-এর দূরত্ব প্রায় 22 লক্ষ আলোকবর্ষ কিংবা 24 লক্ষ আলোকবর্ষ।

হাবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল, M-31-এ প্রায় 50 টি Cepheid তারার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া। এদের মধ্যে 40 টি সাধারণ Cepheid নক্ষত্র। এদের স্পন্দনের পর্যাবৃত্তকাল 10 থেকে 48 দিন। এদের পর্যাবৃত্তকাল এবং জ্যোতির মধ্যে সম্পর্কের স্পষ্ট ধারণাও পাওয়া গেল। এই সম্পর্ক ম্যাগেল্লানীয় মেঘ এবং NGC 6822-এ পাওয়া Cepheid-দের অনুরূপ সম্পর্কের সঙ্গে একেবারেই এক। এর থেকে হাবল্ জানালেন, M-31-এর দূরত্ব ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘের দূরত্বের প্রায় 8.5 গুণ। এখন ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘের দূরত্ব যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে M-31-এর দূরত্ব দাঁড়ায় 20,00,000 (2×10^6) আলোকবর্ষ। এখন এই দূরত্ব 22,00,000 আলোকবর্ষ বলা হচ্ছে। মতান্তরে, এই দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষ । সুতরাং হাবলের সিদ্ধান্ত হল M-31অতি অবশ্যই দূরবর্তী, বিশাল আকারের অন্য এক গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড, যা ছায়াপথের বাইরে।

হাবল্ M-31-এর উজ্জ্বল, অনিয়মিত, ধীর পরিবর্তনশীল কিছু পরিবর্তী নক্ষত্রের কথা বললেন। একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল তারার কথাও তিনি বললেন। এই সব অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রদের এখন বলা হয় 'হাবল্-স্যান্ডেজ পরিবর্তী' [Hubble - Sandage Variables]। এই ধরনের তারাদের এখন দেখা যায় দৈত্যাকার গ্যালাক্সীগুলিতে। হাবল্ 85টি নোভার বিশ্লেষণ করেন, যেগুলি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ। হাবল্ বললেন M-31-এ বছরে প্রায় 30.টি নোভা দেখা যায়। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যাল্টন, সি. আর্প [Halton C. Arp]-এর ধারাবাহিক পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণে।

হাবল্ M-31-এ অসংখ্য তারা দেখেছিলেন, এর বিশেষ বটিকাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জগুলিতে। তবে তিনি মাত্র 140 টি নক্ষত্র তালিকাভুক্ত করেন। M-31-এর দূরত্ব যেমন তিনি নির্ণয় করেছিলেন, তেমনি এর ভর এবং ভর-ঘনত্বও এর অভ্যন্তরীণ গতিবেগের সাহায্যে কষে বের করতে সমর্থ হন। তিনি দেখান, *M-31-এর ভর সূর্যের ভরের প্রায় 350কোটি [35×10^8] গুণ। একালে অবশ্য এই ভর নির্ণীত হয়েছে প্রায় 35×10^{10} গুণ, অর্থাৎ সূর্যের ভরের প্রায় 35 হাজার কোটি গুণ।* সুতরাং M-31 ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের

চেয়ে অনেক বড় বিশাল এক গ্যালাক্সী। তিনি দেখালেন, আমাদের সূর্যের চারদিকে নক্ষত্র-ঘনত্ব যেমন, অনেকটা তেমনই M-31-এর বাইরের দিকের বাহুগুলিতে নক্ষত্র-ঘনত্ব।

1950 সাল অবধি গ্যালাক্সীদের সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার ধীর অগ্রগতি ঘটছিল। ওই পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালাক্সীদের নিয়ে গবেষণা করতেন। মাত্র কয়েকটি ভালো দূরবীন তৈরি করা হয়েছিল ওই সময় পর্যন্ত। ফলে, বেশি সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতিও। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্যালাক্সী নিয়ে চর্চা তাই 1950 সালের আগে অনেকটাই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে পরিবর্তন এলো। মহাকাশ অভিযান শুরুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বাড়লো। বানানো হল উন্নতমানের বিশাল বিশাল দূরবীন। এগুলির সাহায্যে অন্যান্য গ্যালাক্সী থেকে আসা বেতার-বিকিরণ, অবলোহিত-বিকিরণ, অতিবেগুনী-বিকিরণ এমন কি এক্সরে-বিকিরণও মাপা সম্ভব হল। এদের সাহায্যে আলোকচিত্রও তোলা গেল বিভিন্ন গ্যালাক্সীর। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণে এলো প্রবল জোয়ার। 1950 সালে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে দূরবীনটি ছিল, তার ব্যাস ছিল মাত্র 254সেন্টিমিটার বা 100 ইঞ্চি। এটি ছিল মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে। সে সময় মাত্র দশজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালাক্সীদের নিয়ে গবেষণা করতেন। 1980 সালে এসে সে চিত্র বদলে গেল। আরও বড় ব্যাসের অন্ততঃ দশটি দূরবীন স্থাপিত হল। একশোরও বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালাক্সীদের গবেষণা করতে থাকলেন। এমনকি হাবল টেলিস্কোপকে বসানো হল মহাকাশে, পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণনরত এক কৃত্রিম উপগ্রহে, যেটি আজও কাজ করে চলেছে। এটি এক্সরে, অতিবেগুনী রশ্মি এবং অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলতে পারছে। দূরবীনগুলিতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে গ্যালাক্সীগুলিকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য।

আজ আমরা গ্যালাক্সীদের সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পেরেছি এই সব উন্নত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। অনুমান করা হয়, প্রায় এক হাজার কোটি [10^{10}] ছোট বড় গ্যালাক্সী রয়েছে আমাদের মহাবিশ্বে। এর মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ [10^{6}] গ্যালাক্সী ধীরে ধীরে কিছুটা পরিচিত হয়ে উঠেছে এই সব যন্ত্রপাতির কল্যাণে। আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সীগুলি আজ মোটামুটি পরিচিত, যদিও এদের অনেকানেক রহস্য আজও অজানা। গবেষণা চলছে। চারশো ইঞ্চি কিংবা তার চেয়েও বড় ব্যাসের দূরবীন তৈরি হয়ে গেছে বা হচ্ছে। সুতরাং দূর-দূরান্তের গ্যালাক্সীরা এখন দূরবীনের নাগালে এসে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত গ্যালাক্সীদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেলেও তাদের বহু রহস্য আজও অজানা। এ নিয়ে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্যালাক্সীদের সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তার ভিত্তিতেই আমরা পরবর্তী আলোচনায় আসি। বিশেষ করে আমরা খানিকটা বিশদভাবেই আলোচনা করবো আমাদের কাছের ছয়টি গ্যালাক্সী নিয়ে যেগুলি 'স্থানীয় বর্গ' বা Local Group -এর অন্তর্গত। এদের মধ্যে রয়েছে, আন্ড্রোমিডা, বড় ও ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ, NGC 1613, স্কাল্‌পটার এবং M-33।

নানা পর্যবেক্ষণের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সীগুলিকে মোট চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এই চার শ্রেণির বা ধরনের গ্যালাক্সী হল ঃ (1) শঙ্খবৃত্তাকার গ্যালাক্সী [Spiral Galaxy], (2) দণ্ডযুক্ত শঙ্খবৃত্তাকার গ্যালাক্সী [Barred Spiral Galaxy], (3) উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী [Elliptical Galaxy] এবং (4) অনিয়মিত গ্যালাক্সী [Irregular Galaxy]। এইগুলি হল গ্যালাক্সীদের মূল বিভাজন। এদের প্রথম তিনটিকে আবার নানাভাগে ভাগ করা হয়। আবার গ্যালাক্সীদের জ্যোতির উপর ভিত্তি করে এক ধরনের শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। এছাড়া, গ্যালাক্সীদের বেতারতরঙ্গ বিকিরণের পরিমাণ থেকে এগুলিকে অন্যভাবেও বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

শঙ্খবৃত্তাকার গ্যালাক্সীগুলিকে আমরা 'সর্পিল গ্যালাক্সী' বা সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডও বলতে পারি। এই ব্রহ্মাণ্ডগুলির যেমন স্ফীত কেন্দ্রাঞ্চল আছে তেমনি আছে বাহু। দেখতে অনেকটা আতস বাজীর চরকি প্রথম ঘুরতে শুরু করলে যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম (চিত্র 25 দেখুন)। আমাদের ছায়াপথ, প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডা প্রভৃতিরা সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এগুলির কেন্দ্রাঞ্চলে থাকে প্রাচীন নক্ষত্র গুচ্ছ, কিন্তু এদের বাহুগুলিতে বাস করে নবীন নক্ষত্রের দলবল। সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের আগে 'S' অক্ষরটি বসানো হয়, ওই ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী যে 'Spiral' বা সর্পিল তা বোঝাতে। হাবল 1926 সালেই সর্পিল গ্যালাক্সীদের

আবার তিনটি ভাগে ভাগ করেন। এদের উপ-বিভাগগুলি হল Sa,Sb এবং Sc। Sa গ্যালাক্সীগুলির বাহুগুলি প্রায় বৃত্তাকার। কিন্তু Sc গ্যালাক্সীদের বাহুগুলি প্রায় খোলা এবং অনেকটাই সরল। Sb ব্রহ্মাণ্ডদের বাহুগুলি অনেকটা মাঝামাঝি আকৃতির — খানিকটা সোজা বা সরল এবং কিছুটা বৃত্তাকার (চিত্র 25 দেখুন)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় M-31গ্যালাক্সী বা অ্যান্ড্রোমিডা Sb প্রকারের সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। আবার আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড অনেকটাই Sb ধরনের হলেও এটি Sc প্রকারের কাছাকাছি। কারণ ছায়াপথের বাহুগুলি অনেকটাই খোলা এবং কম সর্পিল।

সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের বাহুগুলি উদ্ভূত হয় তার কেন্দ্রকের ধার বা প্রান্তদেশ থেকে এবং তাদের বক্রতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে বৃত্তাকার কিংবা অনেকটা উপবৃত্তাকার আকার ধারণ করতে। সর্পিল গ্যালাক্সীর বাহুগুলিই তাদের বৈশিষ্ট্য। এই বাহুদের বক্রতার উপরই নির্ভর করছে সর্পিল গ্যালাক্সীর শ্রেণিবিভাগ। বেশি বক্রতাসম্পন্ন বাহু বিশিষ্ট সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলি Sa গোষ্ঠীভুক্ত। এদের বক্রতা প্রায় বৃত্তাকার। Sb-র বাহুগুলির বক্রতা অনেকটা কম, অনেকটা উপবৃত্তাকার। কিন্তু Sc-দের বাহুগুলির বক্রতা খুবই কম, প্রায় সোজা, সরলরেখার মত। কেবল প্রান্তের দিকে সামান্য বক্রতা থাকে। সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সবটাই নীল রংয়ের। কেবল এদের কেন্দ্রাঞ্চল কিছুটা লাল, উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীদের মতই।
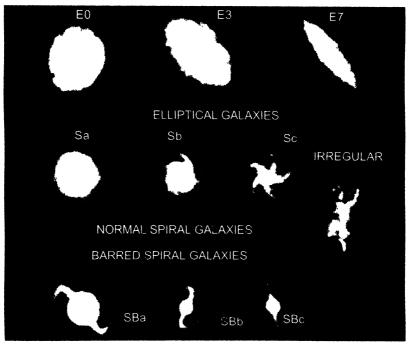
চিত্র ঃ 25

● বিভিন্ন ধরনের গ্যালাক্সী এবং সেগুলির শ্রেণিবিভাগ ●

সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলির বাহুগুলিতে নতুন নতুন তারার উদ্ভব ঘটছে বলেই এদের রঙ নীল। রেকাবি বা থালার আকৃতি বিশিষ্ট মূল কেন্দ্রাঞ্চলের প্রান্তদেশের দিকেও নবীন তারার সমাবেশ থাকায় ওই প্রান্ত অঞ্চলও নীল রঙের হয়। কিন্তু এদের কেন্দ্রকের কাছাকাছি অঞ্চলে প্রাচীন নক্ষত্রদের ভিড় থাকায় ওই অঞ্চল লাল রঙের দেখায়। ওই অঞ্চলে প্রচুর লাল দানব নক্ষত্র থাকায় ওই অঞ্চলকে লাল দেখায়। বাহুগুলিতে নক্ষত্র ঘনত্ব কম হলেও কেন্দ্রাঞ্চলে নক্ষত্র ঘনত্ব অনেকটাই বেশি। সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডদের সাধারণতঃ কয়েকটি বাহু থাকে, যেগুলি পরস্পরের বিপরীত দিকে অত্যন্ত সুসঙ্গতভাবে সজ্জিত। এই সুষমাজনিত সৌন্দর্যমণ্ডিত বাহু সমন্বিত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলি সত্যিই নান্দনিক [চিত্র 26 দেখুন]।

27 নম্বর চিত্রটি একটি সর্পিল গ্যালাক্সীর। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্য দিয়ে একে দেখা যায়। এর বাহুগুলি অনেকটা খোলা বা অবারিত। এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই অনুরূপ। এটিকে Sb ধরনের সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড বলা হলেও এটি Sc শ্রেণির ব্রহ্মাণ্ডের কাছাকাছি। সপ্তর্ষি মণ্ডল অঞ্চলে এটিকে দেখা গেলেও পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এর নানা বিষয়ে মিল রয়েছে। এর কাছাকাছি রয়েছে M 82 (NGC 3034) নামের এক গ্যালাক্সী, যেটি সম্ভবত কয়েকটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে বর্তমান রূপ পেয়েছে। M 82 কে বলা হয় 'Starburst Galaxy'। মনে করা হয়, এটির সঙ্গে M 81-এর একটা সংঘর্ষ হয় প্রায় চার কোটি বছর আগে, যার ফলে M 82 বর্তমান আকার লাভ করেছে। M 82 একটি অনিয়মিতাকার গ্যালাক্সী। সপ্তর্ষি মণ্ডল অঞ্চলে অন্যান্য যেসব নীহারিকা কিংবা গ্যালাক্সী দেখা যায় সেগুলি হল ঃ পেচক নীহারিকা [Owl Nebula] [M 97, NGC 3587] এবং M 101 (NGC 5457) সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড।

অপূর্ব সুন্দর একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড হল M 51। এটি 'ঘূর্ণি গ্যালাক্সী' [Whirlpool Galaxy] নামে অধিকতর পরিচিত [চিত্র 28 দেখুন]। এটিকে প্রথম আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস মেসিয়ার [Charles Messier] 1773 খ্রিস্টাব্দে। পরে 1845 সালে লর্ড রোসে [Lord Rosse] এটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন তাঁর 72 ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন দিয়ে। এর সর্পিল বাহুগুলি স্পষ্টই তিনি দেখতে পান তাঁর ওই দূরবীনে। M 51 কিন্তু পৃথিবী থেকে বহুদূরে অবস্থিত। সেই দূরত্ব প্রায় 3.7 কোটি [3.7×10^7] আলোকবর্ষ। এর কাছেই রয়েছে ছোট একটি অনিয়মিতাকার গ্যালাক্সী NGC 5195। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, M 51-এর সঙ্গে ওই ছোট্ট গ্যালাক্সীটির একটা সংঘর্ষ কিংবা মিথস্ক্রিয়া চলছে। তবে আমাদের এখনকার পর্যবেক্ষণ মানে হল এর 3.7 কোটি বছর আগের অবস্থার পর্যবেক্ষণ। সুতরাং এই মিথস্ক্রিয়ার পরিণাম কী তা আজও অজানা।

দণ্ডযুক্ত শঙ্খবৃত্তাকার কিংবা দণ্ডযুক্ত সর্পিল গ্যালাক্সীগুলি হল এক রকম সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। হাবল এবং অন্য কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই ধরনের সর্পিল গ্যালাক্সীগুলিকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করে এগুলিকে আলাদা ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড হলেও এদের বাহু দুটির একটা নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য এগুলিকে এই বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের গঠন যেন অনেকটাই একটি দণ্ডের মাঝখানে একটা আলোকোজ্জ্বল চাকতি এবং দণ্ডের দুই প্রান্ত থেকে নির্গত হয়েছে দুটি সর্পিল বাহু [চিত্র 25 দেখুন]। দণ্ডটি যেন গ্যালাক্সীটির কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে দু'দিকে সমানভাবে নির্গত হয়েছে। দণ্ডের দুই প্রান্তে সৃষ্টি হয়েছে দুটি প্রায় বৃত্তাকার বাহু। এই শ্রেণির গ্যালাক্সীদের সাধারণতঃ দুটি করে বাহু থাকে। বাহু দুটির একটি নির্গত হয় দণ্ডটির একপ্রান্ত থেকে এবং অন্যটি নির্গত হয় দণ্ডটির অন্যপ্রান্ত থেকে। দণ্ডটি কেন্দ্রাঞ্চলের উজ্জ্বল চাকতির দু'দিকে সমানভাবে নির্গত হয়ে থাকে। তারই দুই প্রান্তে দেখা যায় দুই সর্পিল বাহুকে। এদের বাহু দুটি কখনই সাধারণ সর্পিল গ্যালাক্সীদের মত মূল কেন্দ্রাঞ্চলের প্রান্তদেশ থেকে নির্গত হয় না।

এতাবৎ আবিষ্কৃত গ্যালাক্সীগুলির প্রায় এক চতুর্থাংশই দণ্ডযুক্ত সর্পিল গ্যালাক্সী। এগুলি তত উজ্জ্বল নয়। খুব কম দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বলতর। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, দুই ম্যাগেল্লানীয় মেঘই দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড [চিত্র 23]। হাবল এই শ্রেণির গ্যালাক্সীদের তিন ভাগে ভাগ করেন। এগুলি হল SBa, SBb এবং SBc [চিত্র 25 দেখুন]। এই উপ-শ্রেণি বিভাজন অনেকটাই, সাধারণ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের উপশ্রেণি Sa, Sb ও Sc বিভাগ যে নিয়ম মেনে করা হয়েছিল, সেই নিয়ম মেনে করা হয়েছে। দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের বাহু দুটি যখন প্রায় বৃত্তাকার বা বদ্ধ তখন ওটি SBa উপশ্রেণির। আবার বাহু দুটি যখন কিছুটা মুক্ত কিংবা অনেকটাই উপবৃত্তাকার তখন এমন বাহু সমন্বিত দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড SBb উপশ্রেণির। তেমনি বাহু দুটি একেবারে খোলা বা মুক্ত হলে, ওই বাহু সমন্বিত দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড SBc উপশ্রেণির অন্তর্গত বলে ধরা হয়। দ্বিবাহু সমন্বিত দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলির সৌন্দর্যও সাধারণ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলির মতই অপূর্ব সুন্দর। এগুলির সৌন্দর্য-সুষমা মন্ত্রমুগ্ধকর।

সোমব্রেরো গ্যালাক্সী [M 104 বা NGC 4594] একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। তবে এর সর্পিল বাহুগুলি অনুপস্থিত। এটিকে দণ্ডযুক্ত সর্পিল গ্যালাক্সী বলা যেতে পারে, যদিও এর নির্গত দণ্ডটির দুই প্রান্তে

কোনও সর্পিল বাহু দেখা যায় না। তবে এর উপর দিয়ে কৃষ্ণবস্তুর একটি পথ এমাথা-ওমাথা চলে গেছে। তার ফলে এর কেন্দ্রাঞ্চলের চাকতি কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে, কেন্দ্রাঞ্চল যেন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে [চিত্র 29 দেখুন]। ওই কৃষ্ণবস্তুগুলি কী পদার্থ তা অজানা। এর কেন্দ্রাঞ্চল কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত।

তাই এর ব্যাস ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে প্রায় 35,000 আলোকবর্ষ বেশি। কেন্দ্রাঞ্চলের অস্বাভাবিক এই আয়তনের কারণ অজানা। এটিকে SBc শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এর চতুর্দিকে বেশ কিছু হলদে তারার সমাবেশ রয়েছে। এটিকে আবিষ্কার করেছিলেন পিয়েরে মেকেইন [Pierre Mechain] 1781 খ্রিস্টাব্দে। কন্যারাশির নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এটিকে দেখা গেলেও এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় কোটি [6.5×10^7] আলোকবর্ষ। এটি কিন্তু যথেষ্ট উজ্জ্বল এক সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এর ওই কালো দাগটির রহস্য উদ্ধার হলে এর সম্পর্কে আমরা অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবো।

30 নম্বর চিত্রটি একটি চাকতি ব্রহ্মাণ্ডের [Disk Galaxy]। এটির দূরত্ব 1.3 কোটি আলোকবর্ষ। এর নাম NGC 4945। ডিস্ক গ্যালাক্সীগুলি শঙ্খবৃত্তাকার বা সর্পিল, দণ্ডযুক্ত সর্পিল এবং কিছু অনিয়মিতাকার গ্যালাক্সীও হতে পারে। এই গ্যালাক্সীগুলির বেধ [Thickness] খুবই কম। এগুলি দেখতে চ্যাপ্টা পাতলা থালার মত। কেন্দ্রকের চারপাশে এর নক্ষত্রগুলি প্রায় বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান। চাক্‌তি-ব্রহ্মাণ্ডগুলির উজ্জ্বলতা বেশ কম। এই সব গ্যালাক্সীগুলি সম্ভবতঃ তৈরি হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন আন্তর্নক্ষিত্র পদার্থসমূহ গ্যাসীয় মেঘের আকারে ছিল। তখনও ঘন-নক্ষত্রেরা ঠিকমত গড়ে উঠে নি। সর্পিল এবং অনিয়মিত ব্রহ্মাণ্ডগুলির অনেকটাই চাকতি-ব্রহ্মাণ্ড।

30নং চিত্রের চাকতি ব্রহ্মাণ্ডটিকে উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড মনে হলেও এটি প্রকৃত পক্ষে দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু বাহু অনুপস্থিত বলে একে উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ডের মত দেখাচ্ছে। এগুলিতে নতুন তারার সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ নক্ষত্রই বহু প্রাচীন নক্ষত্র। এই ধরনের ব্রহ্মাণ্ডগুলির তারকা-ঘনত্ব বা নক্ষত্র-ঘনত্ব খুবই কম। তারাদের অবস্থান বেশ পাতলা। কেন্দ্রকের চারিদিকে বৃত্তাকারে এই সব নক্ষত্রদের অবস্থান। একটা চ্যাপ্টা থালার কেন্দ্রস্থলে যেন রয়েছে এই সব গ্যালাক্সীর কেন্দ্রক এবং থালার সমতলে রয়েছে নক্ষত্রগুলি, যেগুলি ওই সমতলে থেকেই কেন্দ্রকের চারিদিকে পরিক্রমণরত। এই গ্যালাক্সীর নক্ষত্রসংখ্যা কিছুটা কম, কিন্তু আকার ও আয়তন আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে সামান্য ছোট কিংবা বড় হতে পারে। বিশাল আয়তনের গ্যাসীয় মেঘ ক্রমশঃ চ্যাপ্টা হয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রগুলি। ডিস্ক-গ্যালাক্সীর আকৃতি তাই এতো পাতলা এবং চ্যাপ্টা। নক্ষত্রগুলির অবস্থানও তাই এতো ছড়ানো এবং নক্ষত্র-ঘনত্ব তাই এতো কম। সে কারণে এদের জ্যোতিও ম্লান এবং ক্ষীণ।

উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীর নামকরণ করা হয়েছে তাদের উপবৃত্তের [Ellipse] মত আকৃতির জন্য। এই সব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চল খুবই উজ্জ্বল। এই ঔজ্জ্বল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় কেন্দ্রকের থেকে প্রান্তদেশের দিকে। এই গ্যালাক্সীগুলির ঔজ্জ্বল্য প্রায় একই রকম। এদের রঙ সূর্যের চেয়ে একটু বেশি লালচে। সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে যেমন অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র, আন্তর্নক্ষত্রীয় গ্যাস এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা অত্যন্ত বেশি রয়েছে, উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীগুলিতে এগুলির পরিমাণ তেমনি একেবারেই উল্টো। উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রগুলির দ্যুতি কম, গ্যাস ও আন্তর্নক্ষত্রীয় ধূলিকণার পরিমাণও অনেক কম। এগুলির শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে এদের উপবৃত্তাকার আকৃতি কতটা চেটালো [Flat] বা চ্যাপ্টা তার উপর। এই শ্রেণিবিভাগ করা হয় EO থেকে E7 অবধি অর্থাৎ মোট আট রকমের। EO উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী হল সবচেয়ে কম চ্যাপ্টা বা চেটালো এবং E7 হলো সবচেয়ে চ্যাপ্টা উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীসমূহ। E-এর পরের সংখ্যা উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীর শ্রেণি নির্দেশ করে। এই সংখ্যা কোনও উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীর ক্ষেত্রে এইভাবে নির্ণয় করা হয় ঃ

$$\frac{10 \times (a-b)}{a}$$

যেখানে, a = উপবৃত্তের বৃহত্তর অক্ষ

b = উপবৃত্তের ক্ষুদ্রতর অক্ষ।

চিত্র ঃ 31

● অ্যান্ড্রোমিডার কাছাকাছি থাকা একটি উপবৃত্তকার গ্যালাক্সী। এটি M-110 বা NGC 205। এই গ্যালাক্সীতে আন্তর্নাক্ষত্রিক পদার্থ প্রায় নেই বললেই চলে। ●

আবার, খুব ছোট উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীদের বলা হয় 'বামন উপবৃত্তাকৃতি' [Dwarf Ellipticals] বা DE। আবার একরকম উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী আছে, যেগুলি অতি চেটলা বা চ্যাপ্টা এবং প্রায় বৃত্তাকার বাহুযুক্ত সর্পিল গ্যালাক্সীদের মাঝামাঝি দেখতে। এদের বলা হয় SO গ্যালাক্সী। বামন উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীগুলিতে 10 কোটি এবং দৈত্যাকার উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ডে প্রায় 10 লক্ষ কোটি [10×10^{12}] সংখ্যক নক্ষত্র বিদ্যমান। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে। আমাদের স্থানীয় বর্গের মধ্যে অন্ততঃ নয়টি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী আছে। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীগুলিতে আন্তর্নাক্ষত্র গ্যাসীয় পদার্থ কিংবা মহাজাগতিক ধূলিকণা খুব কমই থাকে। আমাদের নিকট প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডার বেশ কাছাকাছি রয়েছে দুটি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী। এদের মধ্যে একটি হল M 110 বা NGC 205। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী এদের আশপাশের ছোট ছোট গ্যালাক্সীদের গ্রাস করে ফেলে। এরা বহু প্রাচীন নক্ষত্রের সমাহারে গড়ে ওঠা গ্যালাক্সী।

এদের জীবনে অনেকটাই সময় থাকে আরেকটা গ্যালাক্সীকে গিলে খাওয়ার। চিত্র নম্বর 32-এ দেখানো হয়েছে আর একটি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী। এটি নাম M 87 বা NGc 4486। এটিকে দেখা যায়, কন্যারাশির [Virgo] নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। M 87 তার আশপাশের ছোট ছোট গ্যালাক্সীদের খেয়ে নিজেকে স্ফীত করেছে বলে মনে করা হয়। বেশির ভাগ উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীই খাদক গ্যালাক্সী। এরা সাধারণতঃ নিজেদের আশপাশের ছোট ছোট গ্যালাক্সীদের খেয়ে ফেলে। এমনি একটা গ্রাস করার দৃশ্য রয়েছে চিত্র নম্বর 33-এ। এতে দেখা যাচ্ছে, একটা উপবৃত্তাকার বিশালকায় গ্যালাক্সী গ্রাস করে নিচ্ছে একটা ছোট আকারের সর্পিল গ্যালাক্সীকে।

উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীদের যেগুলি EO সেগুলি প্রায় বৃত্তাকার। এদের চেটালো বা চ্যাপ্টা আকার যত বাড়বে এদের নম্বর তত বাড়বে, অর্থাৎ E 1 অপেক্ষাকৃত কম চেটালো বা চ্যাপ্টা এবং বেশি বৃত্তাকার। এইভাবে E 7 হল সেই সব উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী যেগুলি অত্যন্ত বেশি চ্যাপ্টা। এদের আকৃতি সংক্রান্ত সমীকরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। $n = 10\,(a-b)/a$-সমীকরণ থেকে $n = 1,2,3,4,5,6$ এবং 7 পাওয়া যায়। তাই, E8, E9 কিংবা E10 আকৃতির উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী কখনই হয় না।

চিত্র ঃ 32
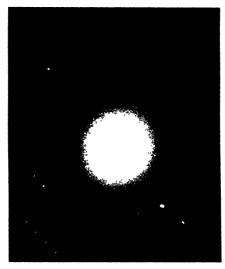
● একটি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী। M-87 কিংবা NGC 4486 এই গ্যালাক্সীটির নাম। এটি একটি দৈত্যাকৃতি গ্যালাক্সী। কন্যারাশির মধ্য দিয়ে এটিকে দেখা যায়। এটি সম্ভবত বেশ কয়েকটি ছোটো গ্যালাক্সীকে গিলে নিজেকে পুষ্ট করেছে। ●

উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীদের ঔজ্জ্বল্য কেন্দ্রাঞ্চল থেকে প্রান্তদেশের দিকে ক্রমশঃ কমতে থাকে। কেন্দ্রাঞ্চলে এদের উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশি এবং এদের প্রান্তদেশে ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে কম। এই সংক্রান্ত সমীকরণ হল ঃ $I = I_0 / \sqrt{\frac{r}{a} + 1}$

যেখানে, I = আলোর প্রাবল্য, I_0 = কেন্দ্রীয় ঔজ্জ্বল্য, r = ব্যাসার্ধ এবং a = স্কেল কারক [Scale Factor]।

সংঘর্ষরত বেশ কিছু গ্যালাক্সীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলিতে দুটি করে গ্যালাক্সী পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ করছে। এই দুটি গ্যালাক্সীর একটি সাধারণতঃ উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী। হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ এমনি এক সংঘর্ষরত গ্যালাক্সীর সন্ধান দিয়েছে অশ্লেষা নক্ষত্রমণ্ডলীতে। অশ্লেষা নক্ষত্রের কাছে দেখা যায় ESO 510 ও G13 গ্যালাক্সীদ্বয় সংঘর্ষরত। এই সংঘর্ষ ঘটেছে অদূর অতীতে। খুব বেশি প্রাচীন নয় সংঘর্ষ শুরুর সময়কাল। 33 নম্বর চিত্রেও দুটি গ্যালাক্সী সংঘর্ষরত। এর একটি এক দৈত্যাকার উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড এবং ছোটটি একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড, যেটির আয়তন অন্যটির চেয়ে অনেকটাই ছোট। এই দুটিকে দেখা যায়, ধনুরাশির মধ্যদিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে। এরা প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে।

দুটি গ্যালাক্সীর সংঘর্ষের ফলে দুটি গ্যালাক্সীর স্বাভাবিক আকার বদলে যায়। তাদের আকৃতি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এ রকম দুটি গ্যালাক্সী সংঘর্ষরত রয়েছে NGC 520-তে। দুটি গ্যালাক্সীই হারিয়েছে তাঁদের আগের আকৃতি। দুটির আকৃতিই এখন অনিয়মিত। তাদের আকার কেমন হয়েছে তা 34 নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই দুই গ্যালাক্সীর নক্ষত্রসমূহের এবং এদের আন্তর্নাক্ষত্রিক পদার্থসমূহের স্বাভাবিক গতিও বিকৃত হয়ে যায়। 33 এবং 34 নম্বর ছবিতে যে মোটা কালো দাগ দেখা যাচ্ছে, ওগুলি হল মহাজাগতিক ধূলিকণা এবং আন্তর্নাক্ষত্রীয় পদার্থসমূহ।

চিত্র : 34
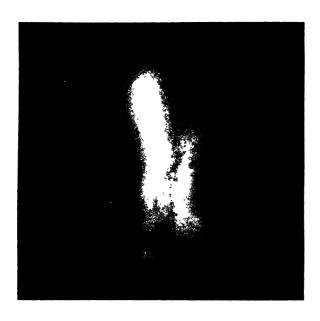
● NGC 520-তে দুটি গ্যালাক্সী সংঘর্ষরত। এই সংঘর্ষের ফলে দুই গ্যালাক্সীর আকৃতি বদলে গেছে। এদের আকৃতি অনিয়ত আকার পেয়েছে ●

35 নম্বর চিত্রে এই রকম আরও দুটি গ্যালাক্সী হল NGC 4039 এবং NGC 4038। এরাও মহাকাশে সংঘর্ষরত। এদের আকারও বদলে গেছে। সংঘর্ষের প্রক্রিয়া আজও চলছে। কিন্তু এখনই ওই দুই গ্যালাক্সী মিলে মালার মত রূপ নিয়েছে। সংঘর্ষ এখনও জারি রয়েছে। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীগুলি দ্বীপের মত অবস্থিত হলেও, এদের বন্টন সারা বিশ্ব জুড়ে এক নয়। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সী-ঘনত্ব কোথাও বেশি, কোথাও কম। অর্থাৎ মহাবিশ্বে বেশ কিছু জায়গায় গ্যালাক্সীদের ভিড় বেশ বেশি। যে সব জায়গায় গ্যালাক্সী ঘনত্ব বেশি সেখানের গ্যালাক্সীপুঞ্জের খুব কম সংখ্যকেরাই সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড হয়। বিশেষ করে গ্যালাক্সীপুঞ্জের ভেতরের দিকের গ্যালাক্সীগুলিতে সর্পিল গ্যালাক্সীর সংখ্যা খুব কম। এর কারণ সম্ভবতঃ ঘন-সন্নিবিষ্ট গ্যালাক্সীদের মধ্যে মহাকর্ষজনিত সংঘর্ষের উপস্থিতি। এই সব সংঘর্ষের ফলে গ্যালাক্সীর গ্যাস ও অন্যান্য মহাজাগতিক পদার্থ নির্গত হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র গ্যালাক্সীর ডিস্ক বা কেন্দ্রাঞ্চলের চাকতিটি থাকে। উৎপন্ন হয় SO ধরনের গ্যালাক্সী। এইসব ঘন-সন্নিবিষ্ট গ্যালাক্সীদের মধ্যে প্রায়শঃই সংঘর্ষ ঘটার ফলে এদের গ্যাসীয় উপাদান তুলনামূলকভাবে খুবই কমে যায়।

তৃতীয় এক ধরনের গ্যালাক্সীপুঞ্জ আছে যেগুলির গ্যালাক্সী সংখ্যা খুবই কম হলেও এগুলি অত্যন্ত ঘন-সন্নিবিষ্ট। এরা একটু অস্বাভাবিক রকমের গ্যালাক্সী। এদের CD গ্যালাক্সী বলা হয়। SO গ্যালাক্সীর মত গঠন হলেও CD গ্যালাক্সী তুলনামূলকভাবে বেশ বড়। এদের ব্যাসার্ধই প্রায় দশ লক্ষ [10^6] আলোকবর্ষ হয়। এই সব গ্যালাক্সীগুলি খুবই ভারী। এদের মহাকর্ষও প্রবল। ফলে, এরা বহু ছোট ছোট গ্যালাক্সীকে নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিজেরা স্ফীত এবং ভারী হয়েছে। এই সব গ্যালাক্সীর একের বেশি কেন্দ্রকও দেখা যায়।

অনিয়মিত গ্যালাক্সীগুলির কোনও নির্দিষ্ট আকার বা গঠন নেই। এগুলি বিভিন্ন আকৃতির, এদের সর্পিল কিংবা উপবৃত্তাকার কোনও দলেই ফেলা যায় না। অনিয়মিত গ্যালাক্সীর সংখ্যা মোট গ্যালাক্সী সংখ্যার 2% থেকে 3%-এর বেশি নয়। যে কোনও নাক্ষত্র তালিকায় এদের সংখ্যা শতকরা দুই থেকে

তিন ভাগ মাত্র। এই সব গ্যালাক্সী দানা দানা এবং কতকগুলি প্রভাবশালী জ্যোতিষ্কের সমন্বয়ে গঠিত। এদের কেন্দ্রক থাকে না। এদের মধ্যে কোনও প্রতিসাম্য নেই। এদের রঙ সাধারণতঃ উজ্জ্বল নীল হয়। সর্পিল গ্যালাক্সীদের বাহুগুলিতে যে ধরনের নীল রঙ দেখা যায় তার চেয়ে অনেকটাই বেশি নীল দেখায় অনিয়মিত গ্যালাক্সীগুলিকে। এর অর্থ হল সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের বাহুগুলিতে যে ধরনের নবীন নক্ষত্র রয়েছে তার চেয়ে অনেকটাই নবীনতর নক্ষত্র রয়েছে অনিয়মিত গ্যালাক্সীগুলিতে এবং এদের সংখ্যাই এই সব গ্যালাক্সীগুলিতে অনেক বেশি। এদের কেন্দ্রাঞ্চলে লাল তারার সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ তারাই নীল। অর্থাৎ এই সব গ্যালাক্সীর বয়স খুবই কম। তাই এদের তারাগুলির অধিকাংশই নবীন তারা।

অনিয়মিত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন : (1) সাধারণ [Ordinary], (2) দণ্ডযুক্ত [Barred] এবং (3) মিশ্র [Mixed]। একরকম অনিয়মিত গ্যালাক্সী আছে যেগুলি 'S' আকৃতির। 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' [চিত্র নম্বর 23 দেখুন] এই ধরনের এক অনিয়মিত ব্রহ্মাণ্ড। হাবল্ মহাকাশের গ্যালাক্সীদের উপরোক্ত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করার পর এগুলিকে আবার কয়েকটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করেন। এই সব উপশ্রেণির কয়েকটির কথা আগেই বলা হয়েছে। হাবলের পরে কয়েক জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালাক্সীদের শ্রেণিবিভাগ একটু ভিন্নভাবে করেছেন। এঁদের মধ্যে 'Gerard de Vaucouleurs'-এর শ্রেণিবিভাগ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। এঁর তৈরি গ্যালাক্সীদের শ্রেণিবিভাগ করা তালিকা নিচে দেওয়া হল [তালিকা নম্বর : 1 দেখুন]। 1960 সালে সিডনি ভ্যানডার বার্গ [Sidney Van dar Bergh] গ্যালাক্সীদের শ্রেণিবিভাগ করেন এদের ঔজ্জ্বল্য বিচার করে। আবার গ্যালাক্সীদের আকৃতি এবং তাদের থেকে আসা আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ একসঙ্গে জুড়ে মর্গান [W. W. Morgan] ওদের এক রকম শ্রেণিবিভাগ করেন।

মর্গান পদ্ধতিতে গ্যালাক্সীদের শ্রেণীবিভাগ লেখা হয় দুটি বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে। কোনও গ্যালাক্সী থেকে পৃথিবীতে আসা আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ করে a, af, f, fg, g, gk, k অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয় কোনও বিশেষ ধরনের গ্যালাক্সীকে নির্দিষ্ট করতে। এর সঙ্গে জোড় দেওয়া হয় হাবল্ পদ্ধতির বিভাজন এবং EO, SO, Sa, Sb, Sc ইত্যাদি নির্দিষ্টকরণ অক্ষরগুলি। যেমন, M 31 হল মেসিয়ার তালিকায় 31 নম্বর ব্রহ্মাণ্ড এবং এটি অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু মর্গান পদ্ধতিতে M 31-কে লেখা হয় KS 5। 'K' এসছে বর্ণালি বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য থেকে। 'S' এসেছে হাবল্ পদ্ধতি থেকে একে Spiral বা সর্পিল আকারবিশিষ্ট বোঝাতে। 5 হল তালিকার ক্রমিক সংখ্যা।

গ্যালাক্সীদের বেতারতরঙ্গ বিকিরণের শক্তি এবং তাদের বেতার-গঠন দিয়ে বিজ্ঞানীরা আরেক ধরনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন মহাবিশ্বের সমস্ত গ্যালাক্সীর, যেগুলি এখন দৃশ্যমান। এই বিভাজনগুলি এই রকম :

[1] g - স্বাভাবিক বেতার অভিবাহের [Flux] গ্যালাক্সী।

[2] R = শক্তিশালী বেতার বিকিরণ যুক্ত গ্যালাক্সী। এদের অনেকগুলিই একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষরত।

[3] cD - অস্বাভাবিক বৃহৎ গ্যালাক্সী, স্ফীত হয়েছে অন্য নিকটবর্তী গ্যালাক্সীকে গ্রাস করে।

[4] S - শেফার্ট গ্যালাক্সীসমূহ [Seyfert Galaxies] 'S' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল কে. শেফার্ট [Carl K. Seyfert] প্রথম এটিকে আবিষ্কার এবং পর্যবেক্ষণ করেন। এগুলির কেন্দ্রকগুলি বেশ উজ্জ্বল। এগুলি বেতারতরঙ্গের উৎস। এগুলির ঘূর্ণনবেগ শত শত কিংবা হাজার হাজার কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে. এদের অধিকাংশই প্রবল বেতারতরঙ্গ বিকিরণ করে।

[5] N - এই গ্যালাক্সীগুলি খুব ছোট। কিন্তু এদের কেন্দ্রগুলি উজ্জ্বল। এগুলি অনেকাংশেই শেফার্ট গ্যালাক্সীদের অনুরূপ।

[6] Q = কোয়াসারদের Q দিয়ে লেখা হয়। ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল এই জ্যোতিষ্কগুলি শক্তিশালী বেতারতরঙ্গের উৎস। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী বেতারতরঙ্গ বিকিরণ করে। কোয়াসারেরা আপাতভাবে N-গ্যালাক্সী এবং S-গ্যালাক্সীর সঙ্গে জড়িত। এগুলির বিশাল উজ্জ্বলতায় সংশ্লিষ্ট গ্যালাক্সীটাই ম্লান হয়ে যায়।

● Vaucouleurs-কৃত গ্যালাক্সীদের শ্রেণিবিভাগ ●

Classes	Families	Varieties	Stages	Type
Eillipticals				E
			elliptical (0-7)	E0
			intermediate	E0 −1
			late elliptical	E^{+}
Lenticulars				S0
	ordinary			SA0
	barred			SB0
	mixed			SAB0
		inner ring		S(r)0
		S-shaped		S(s)0
		mixed		S(rs)0
			early	$S0^{-}$
			intermediate	$S0^{0}$
			late	$S0^{+}$
Spirals	ordinary			SA
	barred			SB
	mixed			SAB
		inner ring		S(r)
		S-shaped		S(s)
		mixed		S(rs)
			0/a	S0/a
			a	Sa
			ab	Sab
			b	Sb
			bc	Sbc
			c	Sc
			bc	Sbc
			d	Sd
			dm	Sdm
			m	Sm
Irregulars	ordinary			IA
	barred			IB
	mixed			IAB
		S-shaped		I(s)
			Magellanic	Im
			non-Magellanic	I0
Peculiars				p
Peculiarities (all types)			peculiarity	p
			uncertain	:
			doubful	?
			spindle	Sp
			outer ring	(R)
			pseudo outer ring	(R1)

তালিকা ঃ 1

● এই তালিকায়, Ellipticals = উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীসমূহ, Lenticulars - মসূরাকার ব্রহ্মাণ্ডগুলি, Spirals = সর্পিল বা শঙ্খবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ডসমূহ, Irregulars − অনিয়মিত গ্যালাক্সীগুলি, Peculiars = বৈশিষ্ট্যসূচক *গ্যালাক্সীসমূহ।* ●

গ্যালাক্সীদের নানা রকম শ্রেণিবিভাগ থাকলেও এগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এদের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশ কম। সাধারণতঃ হাবলের করা শ্রেণিবিভাগই বেশি ব্যবহৃত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৈনন্দিন কাজকর্মে। তবে হাবলের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগকে অনেকটা মার্জিত করে একেবারে আধুনিক করা হয়েছে। হাবলের এই মার্জিত শ্রেণিবিভাগই বহুল ব্যবহৃত।

আগেই বলা হয়েছে, উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীর শ্রেণিবিভাগ হল E0 থেকে E7 অবধি আট রকম। উপবৃত্ত কত বেশি চেটালো বা চ্যাপ্টা তার উপর নির্ভর করে E-র সঙ্গে লেখা ওই পাটিগণিতীয় সংখ্যাটি। চ্যাপ্টা খুব বেশি হলে গ্যালাক্সীটি E7। আর ওটি বৃত্তাকার হলে E0। এইভাবে উপবৃত্তাকার শ্রেণির গ্যালাক্সীদের উপ-বিভাগ করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে হাবল্ নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাজন পদ্ধতি অনুসরণ করে। আরও বলা হয়েছে, সাধারণ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড তিন রকমের — Sa, Sb এবং Sc। a,b ও c অক্ষর সাধারণ সর্পিল শ্রেণির গ্যালাক্সীদের উপ-শ্রেণিবিভাগ সূচিত করছে। কিছু ব্রহ্মাণ্ড আছে যেগুলি উপবৃত্তাকার ও সাধারণ সর্পিল গ্যালাক্সীর মাঝামাঝি, এগুলিকে বলা হয় 'SO' গ্যালাক্সী। আবার দণ্ডযুক্ত সর্পিল গ্যালাক্সীদেরও তিনভাগ করা হয় — SBa. SBb,SBc।

SO গ্যালাক্সী ঃ এই শ্রেণির গ্যালাক্সী উপবৃত্তাকার এবং সর্পিল উভয় ধরনের গ্যালাক্সীরই কিছু কিছু গুণসম্পন্ন। এগুলি কিছুটা উপবৃত্তাকার এবং কিছুটা সর্পিল। হাবল তাঁর মূল শ্রেণি বিভাজনের অনেকটা পরেই SO শ্রেণির বিভাজন করেন। হাবলের মূল শ্রেণি বিভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে গৃহীত হওয়ার অনেক পরে কিছুটা উপবৃত্তাকার, কম চ্যাপ্টা এবং কিছুটা সর্পিল গ্যালাক্সীদের এই নতুন SO শ্রেণি-বিভাজন করেন। অ্যালেন স্যান্ডেজ [Allen Sandage] SO শ্রেণির গ্যালাক্সীদের গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

SO গ্যালাক্সীদের কেন্দ্রক সাধারণতঃ উজ্জ্বল এবং একে ঘিরে থাকে বৈশিষ্ট্যহীন স্ফীতি। এর প্রান্তদেশ অনুজ্জ্বল। এগুলি খুবই পাতলা এবং এদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল এদের উপাক্ষ এবং প্রধান অক্ষের [Major Axis] মধ্যে অনুপাত 0.1থেকে 0.3-এর মধ্যে থাকে। এদের গঠন, উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সীদের উজ্জ্বল্যের নিয়ম মেনে চলে না, তবে সাধারণতঃ এগুলির ঔজ্জ্বল্য সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডদের ঔজ্জ্বল্যের নিয়ম অনুসারী হয়। এগুলির প্রান্তদেশে অনুজ্জ্বল বাহুর মত কিছু একটা দেখা যায়। এগুলি অনেক সময় আন্তর্নাক্ষত্র ধূলিকণার দ্বারা তৈরি 'বিশোষণ পথ'-ও [Absorption Lane] হতে পারে। অনেক সময় SO গ্যালাক্সীদের 'অনিয়মিত' গ্যালাক্সী মনে হতে পারে। SO গ্যালাক্সীদের সংখ্যা, মোট গ্যালাক্সীর 1থেকে 2 শতাংশ। এরা সহজে হাবলের বিভাজন পদ্ধতির মধ্যে আসে। NGC 4753 একটি SO গ্যালাক্সী, যার সঙ্গে রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণার কালো পট্টি। NGC 128-ও একটি SO গ্যালাক্সী, যার কেন্দ্রাঞ্চলীয় স্ফীত অংশের গড়ন আয়তক্ষেত্রাকার। NGC 2685 এই ধরনের আরেকটি গ্যালাক্সী যেটি সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। আপাত দৃষ্টিতে এর কেন্দ্রাঞ্চল একটি সুনির্দিষ্ট প্রান্তযুক্ত চাকতি। এর চারদিকে রয়েছে গ্যাসের গোল গোল চাকা, ধূলিকণার স্তূপ এবং নক্ষত্রসমূহ, যেগুলি প্রায় একই সমতলে অবস্থিত। তার এই তল কেন্দ্রাঞ্চলের তলের প্রায় সমকোণে রয়েছে।

Sa গ্যালাক্সী ঃ Sa ধরনের গ্যালাক্সীগুলি স্বাভাবিক সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এদের বাহুগুলি সরু সরু এবং প্রায় বৃত্তাকার। সরু বাহুগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায় এগুলিতে মহাজাগতিক ধূলিকণা এবং উজ্জ্বল তারাদের উপস্থিতির জন্য। এদের অধিকাংশেরই কেন্দ্রাঞ্চলের স্ফীতি বিশাল। কিছু আছে যাদের কেন্দ্রক বেশ ছোট এবং সেগুলির বাহু অনুজ্জ্বল। NGC 1302 এধরনের সাধারণ এক Sa গ্যালাক্সী। আবার NGC 4866 গ্যালাক্সী বিশেষ ধরনের সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড, যার কেন্দ্রক স্বল্প পরিসরের এবং যার বাহুগুলি বেশ অনুজ্জ্বল ও সেগুলিতে ধূলিকণার পট্টি বা ব্যাণ্ড রয়েছে মসৃণ চাক্‌তির উপর।

***Sb গ্যালাক্সী ঃ** Sb গ্যালাক্সীগুলি আরেক ধরনের সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এদের কেন্দ্রাঞ্চল মাঝারি* আকারের চাক্‌তির আকৃতি সম্পন্ন। এদের বাহুগুলি যথেষ্ট ছড়ানো, অনেকটা উপবৃত্তাকার। বাহুগুলি দেখতে Sa গ্যালাক্সীদের বাহুগুলি মতো অতোটা মসৃণ নয়। বাহুগুলিতে রয়েছে নবীন নক্ষত্র, নতুন

নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে এমন মেঘমণ্ডল এবং আন্তর্নাক্ষত্রিক গ্যাসীয়পুঞ্জ ও ধূলিকণা। Sb গ্যালাক্সীদের আকৃতি অনেকটাই সাধারণ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে আলাদা। এদের কেন্দ্রক থেকেই অনেক ক্ষেত্রে বাহুগুলি নির্গত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাহুগুলি বেশ ছোট আকারের হয়। হাবল এবং স্যান্ডেজ অনেকগুলি Sb গ্যালাক্সীর কথা বলেছেন, যাদের আকৃতি Sb গ্যালাক্সীদের স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞার বা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চেয়ে অনেকটাই অন্য রকম। তাঁরা বলেছেন " A few systems exhibit a chaotic dust pattern superimposed upon the tightly wound spiral arms. Some have smooth, thick arms of low surface brightness, frequently bounded on their inner edges with dust lanes. Finally, there are those with a large, smooth nuclear bulge from which the arms emanate, flowing outward tangent to the bulge and forming short arm segments." তৃতীয় শ্রেণির ব্যতিক্রমী Sb গ্যালাক্সী হল অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড [M31,NGC 224] (চিত্র 24 দেখুন)। Sb গ্যালাক্সীদের আকৃতির এই নানান পার্থক্যের কারণ আজও অব্যাখ্যাত। সাধারণ Sb গ্যালাক্সীর তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এ ধরনের গ্যালাক্সীর একটি হল আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু কিছুটা অন্য ধরনের তথা ব্যতিক্রমী Sb ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা আজও দেওয়া সম্ভব হয় নি। এগুলি আজও রহস্যময়। এদের যথাযথ ব্যাখ্যা পেতে হয়ত আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ব্রহ্মাণ্ডীয় গতিবিদ্যার [Gallactic Dynamics] কোনও নতুন মডেল হয়তো এর ব্যাখ্যা দেবে।

Sc গ্যালাক্সী ঃ এই গ্যালাক্সীগুলির কেন্দ্রক বেশ ছোট, কিন্তু এদের সর্পিল বাহুগুলি অনেকটাই মুক্ত (চিত্র 25দেখুন)। এগুলি ডেলা-পূর্ণ [Lumpy] ও এতে রয়েছে অসংখ্য অনিয়মিতভাবে ছড়ানো নক্ষত্র, আদি তারকা উৎপন্ন করা মেঘ, নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্যাসীয় মেঘ। এই সব গ্যাসীয় মেঘ 'বিকিরণ নীহারিকা' [Emission Nebula] নামে অভিহিত হয়। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই রয়েছে এই ধরনের বিকিরণ নীহারিকা। লেগুন [Lagoon] নীহারিকা এই ধরনের এক নীহারিকা, যেটি আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র 5200 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত [চিত্র 36দেখুন]।

Sc গ্যালাক্সীগুলিকেও কয়েকটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়। স্যান্ডেজ সাহেব Sc-দের ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন ঃ (1) ছোট আকারের কেন্দ্রক থেকে এই শ্রেণির গ্যালাক্সীদের সরু শাখান্বিত বাহুগুলি এতই সর্পিল হয় যে, এগুলি নির্গত হওয়ার স্থান থেকে 180^0-র বেশি ঘুরে যায়। [চিত্র 28দেখুন]। 'ঘূর্ণি গ্যালাক্সী' [Whirlpool Galaxy] ওই Sc ধরনের গ্যালাক্সীদের প্রথম উপশ্রেণির অন্তর্গত। (2) এই উপশ্রেণির গ্যালাক্সীর অনেকগুলি বাহু, যেগুলির শুরু এদের কেন্দ্রকের চারিদিক ঘিরে থাকা একটা উজ্জ্বল বলয়ের স্পর্শক হিসাবে। (3) এই উপশ্রেণির গ্যালাক্সীদের বাহুগুলি এতোই অস্পষ্ট যে এগুলি মূল কেন্দ্রকের অংশ বলেই মনে হয়। এতে আসল কেন্দ্রাঞ্চলের আয়তন অনেকটা বড় দেখায়। (4) এই উপশ্রেণির গ্যালাক্সীদের বাহুগুলিকে অনেক কষ্ট করে খুঁজে পাওয়া যায়। এদের বাহুগুলি ধূলিকণার পট্টি দিয়ে প্রায়শঃই ঢাকা থাকতে দেখা যায়। (5) এই শ্রেণির গ্যালাক্সীদের বাহুগুলি মোটা, শিথিল, বন্ধনহীন এবং খুব পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট নয়। অশ্বিনী নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে দৃষ্ট Pinwheelগ্যালাক্সী এই উপশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। একে 'নাসত্য নীহারিকা' [Triangulum Nebula]-ও বলা হয়। এটির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম M33 বা NGC 598 । চিত্র 37 দেখা যেতে পারে। (6) এই উপশ্রেণিতে সেই সব Sc গ্যালাক্সীরা পড়ে, যেগুলি পরিবর্তন-দশায় রয়েছে। এগুলির গড়ন এমন অনিয়মিত যে, এদের অনিয়মিত গ্যালাক্সী বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে, পরিবর্তনশীল এই গ্যালাক্সীগুলি Sc শ্রেণির যষ্ঠ উপশ্রেণির অন্তর্গত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী de Vaucouleurs এই উপশ্রেণিকে আলাদা করে *নিয়েছেন Sc শ্রেণি থেকে। এই উপশ্রেণিকে একটি পৃথক শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে এর শ্রেণি নাম রেখেছেন* Sd। উজ্জ্বলতার প্রেক্ষিতে এই উপশ্রেণিটিকে একটি পৃথক শ্রেণিভুক্ত করার ব্যাপারটায় যথেষ্ট যৌক্তিকতাও ছিল। এ নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

SB গ্যালাক্সী ঃ এই শ্রেণির গ্যালাক্সীদের সাধারণ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডগুলির থেকে আলাদা করা খুবই কঠিন। SB বা দণ্ডযুক্ত গ্যালাক্সীদের চারটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলি হল SBO, SBa, SBb এবং *SBc। SBO গ্যালাক্সীদের কেন্দ্রাঞ্চল খুবই স্ফীত হয়। কেন্দ্রাঞ্চলকে ঘিরে ডিস্কের মত উজ্জ্বল*

● গ্যালাক্সীদের স্থানীয় বর্গের সদস্যবৃন্দ ●

ক্রমিক সংখ্যা [Serial No.]	নাম [Names of Galaxies]	হাবল্ বিভাজন অনুসারে [Hubble Type]	পরম চাক্ষুষ মান [Absolute Visual Magnitude]
1.	অ্যান্ড্রোমিডা [M 31]	Sb	- 21.1
2.	ছায়াপথ [Milkyway]	Sb/c	20.6
3.	পিনহোল [M 33]	Sc	18.9
4.	বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ [LMC]	Irregular	18.1
5.	M 32	E_2	-- 16.4
6	NGC 6822	Irregular	16.4
7.	NGC 205	E_5	- 16.3
8.	ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ [SMC]	Irregular	16.2
9.	NGC 185	E_3	15.3
10.	NGC 147	E_5	15.1
11.	IC 1613	Irregular	14.9
12	WLM	Irregular	14.1
13.	Leo A	Irregular	- 14.0
14.	Pegasus	Irregular	13.9
15.	Formax	E_3	13.7
16.	UGC A 86	Irregular	12.7
17	Andromeda - I	E	- 11.8
18.	Andromeds - II	E	11.8
19.	Leo I	E_3	- 11.7
20.	DDO 210	Irregular	11.5
21.	GR8	Irregular	- 11.4
22	Sag DIG	Irregular	11.2
23.	Sculptor	E_3	- 10.7
24.	Andromeda -III	E	- 10.3
25.	LGS 3	Irregular	-- 9.9
26.	Sextans I	E	– 10.0
27.	Phoenix	Irregular	9.9
28.	Tucana	E	- 9.5
29.	Leo-II	EO	- 9.4
30	লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডল [Ursa Minor]	E_5	- 8.9
31.	Draco	E_3	- 8.6
32.	Carina	E_4	7.6
33.	EGBO 427	Irregular	?

তালিকা ঃ 2

● এই তালিকায় তিনটি স্থানীয় ব্রহ্মাণ্ড-বর্গের গ্যালাক্সীদের দেখানো হয়েছে। এতে আছে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের স্থানীয়-বর্গ, M-31-এর স্থানীয়-বর্গ এবং Sculptor-এর স্থানীয় বর্গ।

এক মোড়ক থাকে। এদের দণ্ডটি খুবই ছোট আকারের হয়। SB শ্রেণির অন্যান্য গ্যালাক্সীদের মত লম্বা নয়। কখনো কখনো SBO-দের দণ্ডের প্রান্তে বলয়ের মত কিছু একটা আকৃতি দেখা যায়। SBa গ্যালাক্সীগুলিতে উজ্জ্বল, বেশ বড়সড়, স্ফীত মধ্যাঞ্চল বিদ্যমান। এদের বাহুগুলি শক্তভাবে পাক খাওয়ানো। এগুলি প্রায় বৃত্তাকার। দণ্ডের দু-প্রান্তে ওই ধরনের বাহুগুলি থাকে। SBb শ্রেণির গ্যালাক্সীরা মসৃণ, দণ্ডযুক্ত। বাহুগুলি দণ্ডের দু-প্রান্তে প্রায় সমভাবে অবস্থান করে। বাহুগুলিতে স্পষ্টই ধূলিকণার কালো পট্টি থাকে SBb গ্যালাক্সীদের। SBc গ্যালাক্সীদের দণ্ডের প্রান্তে থাকা প্রায় মুক্ত বাহুগুলি অনেক সময় দণ্ডপ্রান্তের উজ্জ্বল বলয়ের স্পর্শকের মত হয়ে নির্গত হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি, হাবল্ অনিয়মিত গ্যালাক্সীদের দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন — Irregular-I ও Irregular-II। এক নম্বর অনিয়মিত গ্যালাক্সীগুলি খুবই সাধারণ। এদের অনেকটাই পরিবর্ধিত সর্পিল গ্যালাক্সীর মত দেখায়। Sc গ্যালাক্সীদের অনেকটা কাছাকাছি হল Irregular-I শ্রেণির অনিয়মিত গ্যালাক্সী। এদের রঙ বেশ নীল, তারাগুলি বেশ স্পষ্ট বিভাজিত। এদের কেন্দ্রক সব সময় থাকে না। থাকলেও তা খুব ছোট্ট হয়। দ্বিতীয় ধরনের অনিয়মিত গ্যালাক্সীতে বস্তু-ঘনত্ব খুবই কম থাকে। এগুলি বিশৃঙ্খল গ্যালাক্সী। NGC 4433, NGC 4753, NGC 5363, NGC 1569, NGC 4691, NGC 5253, NGC 520, NGC 3448 এবং NGC 5195 ইত্যাদি গ্যালাক্সীগুলি Irregular-II ধরনের গ্যালাক্সী। কোনও কোনো অনিয়মিত গ্যালাক্সীকে সর্পিল গ্যালাক্সীদের মত দণ্ডযুক্ত হতে দেখা যায়। এদের দণ্ড কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অক্ষের মত অবস্থান করে। 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' এই ধরনের এক দণ্ডওয়ালা অনিয়মিত ব্রহ্মাণ্ড [চিত্র 23দেখুন] । হাব্ল অবশ্য এই ধরনের অনিয়মিত গ্যালাক্সীদের কোনও উপশ্রেণিতে বিভক্ত করেন নি।

পৃথিবীর তথা আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নিকট প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা প্রায় 40টি। 50 লক্ষ [5×10^6] আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে যে সব গ্যালাক্সীর অবস্থান সেগুলির মধ্যে রয়েছে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড এবং তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবেশী। যেমন, দুটি ম্যাগেল্লানীয় মেঘ, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী এবং পিনহুইল গ্যালাক্সী। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যে 'স্থানীয় বর্গ'[Local Group] তাতে রয়েছে মোট 33টি গ্যালাক্সী। এই 33টি গ্যালাক্সীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল। এই স্থানীয় বর্গের মধ্যে কাছাকাছি আরও দুটি ব্রহ্মাণ্ড-বর্গ রয়েছে। এগুলি হল M-81 গ্রুপ এবং Sculptor গ্রুপ। এরা বহুভাবেই আমাদের স্থানীয় বর্গ বা লোকাল গ্রুপের সদৃশ। এদের দূরত্ব এক কোটি [10^7] থেকে দেড় কোটি [1.5×10^7] আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড আমাদের স্থানীয় বর্গের অন্তর্গত।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের 50 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব অবধি যে সব প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডগুলি রয়েছে তাদের অবস্থনের একটা ছবি দেওয়া হল 38 নম্বর চিত্রে। দেড় কোটি আলোকবর্ষ অবধি দূরত্ব ধরলে ওই M-81 এবং Sculptor-এর স্থানীয় বর্গও আমাদের স্থানীয় বর্গে চলে আসবে।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে 50 লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের একটা গোলক আঁকলে যে সব ব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যে চলে আসে তারাই আমাদের মহাকাশের প্রকৃত প্রতিবেশী। এই প্রতিবেশীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছয়টি ব্রহ্মাণ্ড। ছায়াপথকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মাণ্ড হল সাতটি। এই সাতটি ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃতপক্ষে আমাদের 'স্থানীয় বর্গ' বা লোকাল গ্রুপের অন্তর্গত। এগুলি হল ঃ

(1) ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড [Milkyway Galaxy]

(2) পিনহুইল ব্রহ্মাণ্ড [Pinwheel Galaxy] [M33]

(3) অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড [Andromeda Galaxy] [M 31]

(4) বড় বা গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ [Large Magellanic Cloud] [LMC]

(5) ছোট বা লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ [Small Magellanic Cloud] [SMC]

(6) IC-1613 ব্রহ্মাণ্ড [IC-1613 Galaxy]

(7) NGC - 6822 ব্রহ্মাণ্ড। [NGC-6822 Galaxy]।

এই সাতটি ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক, আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সীর এবং একেবারে পড়শি গ্যালাক্সীদের স্বরূপ জানতে।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড [Milkyway Galaxy] ঃ

মেঘমুক্ত রাতের আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায়, একটা নক্ষত্রখচিত পথ যেন আকাশের এপার-ওপার বিস্তৃত হয়ে আছে। বিশেষ করে, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আকাশের ওই আলোর পথ বেশ উজ্জ্বলভাবে দর্শনীয় হয়ে ওঠে। নক্ষত্রখচিত ওই পথকে আমরা বলি ছায়াপথ (Milkyway)। এটি একটি গ্যালাক্সীর অংশ বিশেষ। এই গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড হল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড। এটি আমাদেরই ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের সূর্য ও সৌরমণ্ডল এই ব্রহ্মাণ্ডেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ। সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডেরই একটা অতি সাধারণ নক্ষত্র। প্রথমে মনে করা হত সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু 1920 খ্রিস্টাব্দে শেপ্‌লে [Harlow Shapley] দূরের বটিকাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জগুলির কয়েকটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন যে, সূর্য ও সৌরমণ্ডল মোটেই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলে অবস্থিত নয়। এই গ্যালাক্সীর কেন্দ্রাঞ্চল পৃথিবীর থেকে প্রায় 30,000 আলোকবর্ষ দূরে ধনুরাশির নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবস্থিত। এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চল একটি চ্যাপ্টা থালার মত। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মোট ব্যাস প্রায় 1,00,000 আলোকবর্ষ।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলের এই চ্যাপ্টাকৃতি দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই ধারণায় এলেন যে, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল এই ব্রহ্মাণ্ডের ঘূর্ণন বেগ প্রতি সেকেন্ডে 160 মাইল বা 260 কিলোমিটার। সূর্য তার গ্রহমণ্ডলী নিয়ে এই বেগেই গ্যালাক্সীর কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে। 30,000 আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের প্রায় বৃত্তাকার এক পথে সূর্য তার গ্রহমণ্ডলীসহ 25 কোটি বছরে একবার ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরে আসে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের এই বিপুল ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রিত হয় এর কেন্দ্রাঞ্চলের ঝাঁক বাঁধা নক্ষত্রমণ্ডলীর দ্বারা, যাদের একত্রিত ভর 5000 কোটি [5×10^{10}] সূর্যের ভরের সমান। ছায়াপথের সম্পর্কে এই সব তথ্য পাওয়া গেল শেপ্‌লের দেওয়া মডেল থেকে। তিনিই প্রথম ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অনেকটা সঠিক মডেল দেন। তখন বলা হয়, এটি একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এর দূরতম নক্ষত্রগুলি এবং গ্যাসীয় মেঘসমূহ এর কেন্দ্র থেকে প্রায় 72,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আমাদের সূর্য ওই কেন্দ্র থেকে প্রায় 27,000 আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। আধুনিককালে এসে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে আমাদের সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব প্রায় 33,000 আলোকবর্ষ এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস প্রায় 1,00,000 আলোকবর্ষ। শুধু তাই নয়, 1980 সালের হিসাব-নিকাশে জানা গেছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রসংখ্যা প্রায় 10,000 কোটি [10^{11}] এবং কৃষ্ণবস্তুগুলিসহ এর মোট ভর একলক্ষ কোটি [10^{12}] সূর্যের ভরের সমান। আমাদের সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায়, 3,33,420 গুণ। আবার পৃথিবীর ভর প্রায় $5{\cdot}974 \times 10^{21}$ মেট্রিক টন। সুতরাং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ভর $5{\cdot}974 \times 10^{21} \times 3{,}33{,}420 \times 10^{12}$ মেট্রিক টন বা $19{,}91{,}851 \times 10^{33}$ মেট্রিক টন, কিংবা বলা যায় 2×10^{39} [প্রায়] মেট্রিক টন, যা 2×10^{45} গ্রাম। সুতরাং দশ হাজার কোটি নক্ষত্র সমন্বিত আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ভর হল প্রায় 2 10^{39} মেট্রিক টন। এই ছায়াপথে নক্ষত্র ছাড়াও রয়েছে বহু কৃষ্ণবস্তু [Dark Matter], মহাজাগতিক গ্যাসীয়পুঞ্জ, মহাজাগতিক ধূলিকণা, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। 1980 সালে বের করা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের এই ভর ভবিষ্যতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আরও বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ওই কৃষ্ণবস্তুগুলির স্বরূপ আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। অন্যান্য গ্যালাক্সীদেরও এই ধরনের কৃষ্ণবস্তু রয়েছে তাদের বহিরাংশে। পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্বে এই সব কৃষ্ণবস্তুর সঠিক ব্যাখ্যা আজও সম্ভব হয় নি। এগুলি গ্রহ কিংবা শিলাখণ্ড হতে পারে না, কারণ গ্যালাক্সীর বহিরাঞ্চলে যেখানে নক্ষত্র নেই, কিংবা নক্ষত্র তৈরির গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ নেই ; যেখানে এমন কি মহাজাগতিক ধূলিকণাও প্রায় নেই, সেখানে ওই সব কৃষ্ণবস্তু কেমন করে তৈরি হল বা কোথা থেকে এলো তা সত্যিই অজানা। ভারী নিউট্রিনো কিংবা অন্য উপ-পারমাণবিক কণাদেরও সে অঞ্চলে দেখা যায় না। সুতরাং ওই সব কৃষ্ণবস্তুর সত্যিকারের স্বরূপ জানতে বিজ্ঞানীদের আরও অনেকটা সময়

লাগবে বলে মনে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান এখনও জানে না মহাবিশ্বের বেশ কিছু অংশের কিংবা উপাদানের সত্যিকারের স্বরূপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বিগত কয়েক দশকে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কেও এমন কথা বলা যায়। বিংশ শতাব্দীর চারের দশক অবধি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতেন নক্ষত্রদের ভর, ঔজ্জ্বল্য এবং তাদের ঘূর্ণন গতির কথা। তখনও পর্যন্ত জানা ছিল না তাদের ক্রমবিকাশের পার্থক্য এবং রাসায়নিক গঠনের প্রভেদ। এখন জানা গেছে, দু'একটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে গ্যালাক্সীদের রাসায়নিক উপাদান প্রায় এক। গ্যালাক্সীদের গতিবিদ্যার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যার অনেক উন্নতি ঘটলেও নক্ষত্রদের সৃতিবিদ্যাজনিত [Kinamatic] গোষ্ঠী বিভাজন আজও সম্ভব হয় নি।

সাধারণভাবে কোনও গ্যালাক্সীর 90% ভর হল তার নবীন এবং প্রাচীন তারাদের মোট ভর। বাকী 10% ভর হল তার আন্তর্নাক্ষত্র গ্যাসীয়পুঞ্জের এবং কিছু ইতস্ততঃ ছড়ানো মহাজাগতিক ধূলিকণার ভর। গ্যালাক্সীদের একটি ঘূর্ণন বেগ আছে। আমাদের সূর্যের চারিদিকের নক্ষত্রেরাও ঘুরছে। সূর্যও আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে। আগেই বলা হয়েছে, এই ঘূর্ণন বেগ সেকেন্ডে 260 কিলোমিটার [160 মাইল]। সূর্যের ঘূর্ণন কক্ষের ব্যাসার্ধ প্রায় 33,000 আলোকবর্ষ। গ্যালাক্সীর ওই গ্যাসীয় পদার্থগুলি মূলতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুর গ্যাস। এই গ্যাসে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়াও আছে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, নিয়ন, লৌহ, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য কিছু গ্যাস। মহাজাগতিক ধূলিকণা হল মূলতঃ কারবন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের জমাট বাঁধা বরফকণা, যার সঙ্গে কিছু মাত্রার লোহাও থাকে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে এই ধরনের ধূলিকণাদের ব্যাস এক মিলিমিটারের কয়েক লক্ষভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ধূলিকণাই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে স্বচ্ছ মেঘপুঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

আমাদের সূর্যের অঞ্চলে আন্তর্নাক্ষত্র গ্যাসীয়পুঞ্জের যে স্তর তা প্রায় 1000 আলোকবর্ষ পুরু। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র এই গ্যাসীয় পুঞ্জের বেধ 2000 আলোকবর্ষের বেশি নয়। এই গ্যালাক্সীর কেন্দ্রীয় স্তরে যে গ্যাসীয় পুঞ্জ আছে তার বেধ 1000 আলোকবর্ষ এবং তাদের সর্বমোট ব্যাস 1,00,000 আলোকবর্ষ। এই পাতলা গ্যাসীয়পুঞ্জের স্তরে রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা, নতুন নক্ষত্রগুলি যেগুলি উৎপন্ন হচ্ছে ওই গ্যাস ও ধূলিকণা থেকে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের এই অঞ্চলের নতুন তারাদের বয়স এক কোটি [10^7] বছরের বেশি নয়। এই নবীন তারা, এই গ্যাস, এই ধূলিকণাদের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছে 'পপুলেশন-1' [Population-1]।

আমাদের সূর্যের বয়স প্রায় 500 কোটি [5×10^9] বছর। সূর্য তাই এক মধ্য বয়সী যুবক নক্ষত্র। এক কোটি বছর বয়সী নক্ষত্রেরা যেমন পপুলেশন-1 অঞ্চলে থাকে, তেমনি বয়স্ক তথা প্রবীন নক্ষত্রের দল থাকে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রাঞ্চলে। সূর্যের চেয়ে বেশি বয়সী নক্ষত্রেরা রয়েছে ছায়াপথের মাঝখানের দিকটা। ছায়াপথের 1,00,000 আলোকবর্ষ ব্যাসের সর্বত্রই নক্ষত্র থাকলেও তার প্রান্তদেশে আছে পপুলেশন-1-এর নবীন নক্ষত্র। আবার প্রবীণ নক্ষত্রদের বেশির ভাগেরই অবস্থান ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যাঞ্চল স্ফীত এবং তা পপুলেশন-1-এর যে দিকটায় অবস্থান তার চেয়ে অনেকটাই বেশি স্ফীত। গ্যালাক্সীর কেন্দ্রীয় তল থেকে এই স্ফীতি উপরের দিকে প্রায় 5000 আলোকবর্ষেরও বেশি। আবার নিচের দিকেও এই স্ফীতি প্রায় 5000 আলোকবর্ষাধিক। সুতরাং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় তল প্রায় গোলকাকৃতি জ্যোতিঃপুঞ্জ দিয়ে মোড়া। এই জ্যোতির্বলয়ে পুরাতন নক্ষত্রদের অবস্থান। এই অঞ্চলের নক্ষত্র-ঘনত্ব পপুলেশন-1 অঞ্চলের নক্ষত্র-ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। এই জ্যোতির্বলয়ের পুরাতন নক্ষত্রসমূহ এবং গ্যালাক্সীর ওই কেন্দ্রীয় তলের নক্ষত্রগুলি সব মিলিয়ে একত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'পপুলেশন-2' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং পপুলেশন-1 অঞ্চলে নবীন তারা এবং পুপুলেশন-2 অঞ্চলে প্রবীণ তারাদের ভিড়। সহজ করে বললে পপুলেশ-1-এ আছে সেইসব নবীন তারা যাদের বয়স এক কোটি বছরের কম। এই সব তারাদের ভিড় সাধারণত সর্পিল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সর্পিল বাহুগুলিতে ছায়াপথের প্রান্তের দিকে। আর পপুলেশন-2-এ রয়েছে সেই সব প্রবীণ বা প্রাচীন নক্ষত্র যাদের বয়স আমাদের সূর্যের বয়সেরও বেশি এবং যারা রয়েছে ছায়াপথের কেন্দ্রাঞ্চলে। পপুলেশন-1 হলো নবীন নক্ষত্রগোষ্ঠী। আর পপুলেশন-2 হল প্রবীণ নক্ষত্রের দল।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড সর্পিল গ্যালাক্সী হওয়ার জন্য এর সর্পিল গঠনের বেশিটা অংশই তৈরি করেছে একটা চ্যাপ্টা সমতল বলয়। এই বলয়ের ভিতরের ব্যাসার্ধ প্রায় 12,000 আলোকবর্ষ। এর বাইরের ব্যাসার্ধ প্রায় 50,000 আলোকবর্ষ এবং এর বেধ প্রায় এক হাজার আলোকবর্ষ। ছায়াপথের এই বাহু অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে নতুন তাবার দল। নবীন তারাদের বেশির ভাগেরই অবস্থান এই সর্পিল বাহুদের অঞ্চলে। ছায়াপথের কেন্দ্রাঞ্চলে যেখানে পূর্বোক্ত জ্যোতির্বলয়ের অবস্থান, সেখানে গ্যাসীয়পুঞ্জ নেই বলে নতুন তারার জন্ম ওই কেন্দ্রীয় অঞ্চলে হয় না। এই অঞ্চলে রয়েছে প্রবীণ পপুলেশন-2 তারকারা। এই অঞ্চলে মহাজাগতিক গ্যাস না থাকার জন্য কখনও নক্ষত্র তৈরি হবে না। সর্পিল বাহু অঞ্চলে, প্রান্তদেশেই নবীন তারার জন্ম হতে থাকবে যতক্ষণ না সব গ্যাস নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়। মহাকর্ষই এইসব তারকা গঠনের মূল শক্তি।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় 20,000 আলোকবর্ষ। নানাদিক থেকে এই অঞ্চলটি আজও এক অজানা প্রহেলিকা। এই অঞ্চলে প্রবীণ পপুলেশন-2 তারার দল। এই অঞ্চল থেকে নতুন তারা আর কখনোই উৎপন্ন হবে না। তবে ছায়াপথের একেবারে কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে বেশ কিছুটা গ্যাস এখনও আছে। এই গ্যাস-সমুদ্র প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে কেন্দ্র থেকে 10,000 আলোকবর্ষ দূরের একটা বিপুলায়তন গ্যাসীয়পুঞ্জ আমাদের সূর্যের দিকে প্রসারিত হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষণে নির্ণীত হয়েছে। এই গ্যাসীয়পুঞ্জের সম্প্রসারণবেগ 50 কিলোমিটার [30 মাইল] প্রতি সেকেন্ডে। আবার কেন্দ্রাঞ্চলের প্রায় বারোটি বেতার বিকিরণ উৎস থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলের ওই গ্যাস থেকে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে, যা একেবারে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। এমন কি ওই অঞ্চলে বেশ কিছু নবীন তারাও তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এগুলি ব্যতিক্রমী অবস্থা। সত্যি সত্যিই ছায়াপথের কেন্দ্রাঞ্চলে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে কিনা কিংবা নবীন তারারা ওই গ্যাসীয় মেঘের মধ্যে রয়েছে কিনা তা আজও বিতর্কিত বিষয়। সেইজন্য ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলকে আজও প্রহেলিকা বলা হচ্ছে। আর যদি সত্যিই ওই অঞ্চলে তরুণ নক্ষত্র কিংবা আদি তারা [Protostar] থেকে থাকে, তবে তার ব্যাখ্যা এতাবৎ আবিষ্কৃত তত্ত্ব দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না।

1944 সালে বাদে [Wilhelm Heinrich Walter Baade] [1893-1960 খ্রিস্টাব্দ] সাফল্যের সংগে অ্যান্ড্রোমিডা [M 31] এবং তার দুই সঙ্গী গ্যালাক্সীর [M 32 ও NGC 205] কেন্দ্রাঞ্চলের বিশ্লেষণ করে তারাদের আবিষ্কার করলেন। অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মতই সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড এবং তার সঙ্গী ওই গ্যালাক্সী দুটি ছিল উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড। তিনি আরও জানালেন, তিনটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রাঞ্চলেই 'লাল দানব' নক্ষত্রগুলি রয়েছে। আর অ্যান্ড্রোমিডার সর্পিল বাহুগুলিতে রয়েছে নবীন নীল তারার সমারোহ। এই সব আবিষ্কারের ঘোষণার সঙ্গে তিনি জানালেন যে, ওই সব ব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরও দু'ধরনের তারা আছে 'পপুলেশন-1' এবং 'পপুলেশন-2' নামের। এদের কেন্দ্রের লালদানবগুলি সবই 'পপুলেশন-2' শ্রেণির অন্তর্গত। সূর্যের কাছাকাছি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলমান তারাগুলির সবই প্রায় 'পপুলেশন-2' প্রকৃতির নক্ষত্র এবং এগুলি ডিস্কের বা গ্যালাক্সীর চাক্তির মাঝখান দিয়ে ছুটছে। একালে এই পপুলেশনের বিভাজন আরও বেড়েছে যেমন— Extreme Population-I, Disk Population, Halo Population II ইত্যাদি।

পপুলেশন-1 এবং পপুলেশন-2 ভাগ করা হয়েছে নক্ষত্রদের বয়স, রাসায়নিক উপাদান এবং সৃতিবিদ্যার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। এই তিনটি প্যারামিটাবের [Parameter] সামান্য কিছু সম্পর্কও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সম্পর্কগুলি বহুলাংশে সঠিক নয়। আবার ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ কিছুটা সঠিক বলে প্রতিপন্ন হলেও, এই সম্পর্ক যে অন্যান্য গ্যালাক্সীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তেমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। গত 50-60 বছরের চেষ্টা সত্ত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডগুলির বহু রহস্য ভেদ করতে আজও সমর্থ হন নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের, নিবিড় পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যগুলির সঠিক বিশ্লেষণ কিংবা বলা যায় সঠিক তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ আজও বহুক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। অমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলে যে প্রহেলিকা রয়েছে, তেমনি কৃষ্ণগহ্বর নিয়েও নানা বিতর্কের পর এখন একটা কৃষ্ণগহ্বর অন্ততঃ নিশ্চিত করা গেছে RXJ 1242-11 নামের প্রায়

70 কোটি আলোকবর্ষ দূরের অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চলেও একটি কৃষ্ণগহ্বর থাকা কোনও বিচিত্র ব্যাপার নয়।

ছায়াগ্নি নক্ষত্রের Cygnus X -1 নাম দেওয়া অদৃশ্য সঙ্গী তারাটি সম্ভবতঃ একটি কৃষ্ণগহ্বর। এ নিয়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। চিত্র ৪ দেখা যেতে পারে। Cygnus X-1 নামের ওই সম্ভাব্য কৃষ্ণগহ্বরটির অবস্থান রাজহংস নীহারিকা মণ্ডলে। চিত্র 40 দেখা যেতে পারে। এই নীহারিকাটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থিত। শুধু ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রেই নয়, এর একলক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসের বিশাল শরীরের কেন্দ্রাঞ্চলে অনেক কৃষ্ণগহ্বর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। সুতরাং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে মৃত নক্ষত্রেরাও যারা কৃষ্ণগহ্বর হয়ে গিলে ফেলছে সব কিছুকেই। আবার ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে নানা সুন্দর, আকর্ষণীয় বেশ কিছু নীহারিকা। এই নীহারিকাদের কথা সামান্য একটু বলে নিয়ে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কথা শেষ করে চলে যাবো তার নিকট প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের কথায়।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে বহু বর্ণময় নীহারিকা। একটি নীহারিকা হল এক মহাজাগতিক বস্তু যেটি নক্ষত্রের চেয়ে বড় এবং অস্পষ্টতর। আগে গ্যালাক্সীদেরও নীহারিকা বলা হত। এখন কিন্তু নীহারিকা বলতে বোঝায় গ্যাসীয় মেঘ ও ধূলিকণার পুঞ্জ, যেগুলিতে এখনও কোনও নক্ষত্র গড়ে ওঠে নি! নীহারিকার গ্যাসের মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন। কাছাকাছি অবস্থিত কোনও উত্তপ্ত তারা বা তারাদের বিকিরিত অতিবেগুনী রশ্মিতে ওই হাইড্রোজেন আয়নিত হয় এবং তার থেকে বর্ণময় আলো নির্গত হয়। অনেক সময় কোন কোনও নীহারিকা এতো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় যে সেটি নক্ষত্রদের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

নীহারিকাদের দুটি মুখ্য ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এদের একটি হল 'বিকিরণ নীহারিকা' [Emission Nebula] এবং অন্যটি হল 'প্রতিফলন নীহারিকা' [Reflection Nebula]। বিকিরণ নীহারিকায় আয়নিত গ্যাসেরা নিজেরাই আলো বিকিরণ করে। আর প্রতিফলন নীহারিকার নক্ষত্রেরা আলো বিচ্ছুরণ করে। এইভাবে তাদের দেখা যায়। বিকিরণ নীহারিকার গ্যাসকে আয়নিত করছে যে নক্ষত্রটি সে নক্ষত্রটি যদি খুব উত্তপ্ত হয়, তবে সেটি অনেক বেশি শক্তির অতিবেগুনী রশ্মি নির্গমন করবে। ফলে, নীহারিকার বেশি পরিমাণ গ্যাস আয়নিত হবে এবং এর বিকিরণের পরিমাণও যাবে বেড়ে। তখন নীহারিকাটিকে ওই নক্ষত্রটির চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায়। বিকিরণ নীহারিকা অতিবেগুনী বিকিরণকে বদলে ফেলছে দৃশ্য আলোয়। বিকিরণ নীহারিকা কিন্তু খুবই হাল্কা এবং পাতলা। এমনও হতে পারে যে, নীহারিকার মাত্র এক কিলোগ্রাম বস্তু, অর্থাৎ আয়নিত হাইড্রোজেনের এক কিলোগ্রাম প্রায় 100 কোটি ঘন কিলোমিটার বা 10^9 ঘন কিলোমিটার জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কর্কট নীহারিকা [Crab Nebula] একটি সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ। এর আয়তন 96 বর্গ আলোকবর্ষ। দূরত্ব 6500 আলোকবর্ষ। এই নীহারিকার সামান্য পদার্থই 96 বর্গ আলোকবর্ষ জুড়ে অবস্থান করছে।

কর্কট নীহারিকার জন্ম একটি সুপার নোভার বিস্ফোরণে। এই বিস্ফোরণ পৃথিবীতে প্রথম দেখা যায় 1054 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। চারজন চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই বিস্ফোরণ প্রথম দেখেন। বলা যায়, তারও 6500 বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 7500 বছর আগে ওই সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটে। কর্কট নীহারিকাকে 42 নম্বর চিত্রে দেখুন।

কালপুরুষ নীহারিকার কেন্দ্রস্থলের চিত্রটি 41 নম্বর চিত্রে দেখান হয়েছে। 43 নম্বর ছবিটি 41 নম্বর চিত্রের কেন্দ্রস্থলের বর্ধিত ছবি। এই চিত্রে দুটি Trapezium Star-কে দেখা যাচ্ছে আরও বৃহত্তর আকারে। মনে রাখতে হবে এই নীহারিকায় নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে। এটি কিছু কালের মধ্যে নক্ষত্রের আঁতুড় ঘরে পরিণত হবে। তাই গবেষণার জন্য এই নীহারিকার চাহিদা অনেকটা বেশি। নক্ষত্রের আঁতুড় ঘরে নক্ষত্রের জন্ম কেমনভাবে হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী পরিচ্ছেদে। কর্কট এবং কালপুরুষ নীহারিকাদ্বয় আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ বিশেষ। আরও বহু নীহারিকা রয়েছে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে।
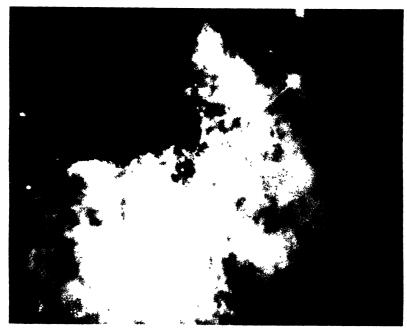
চিত্র ঃ 43

● কালপুরুষ নীহারিকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বাষ্প-সমন্বিত প্রচণ্ড দীপ্তিময় তারা Theta-I Orionis বা Trapezium Star। এই নীহারিকার বৈজ্ঞানিক নাম M 42 বা NGC 1976। দূরত্ব 1500 আলোকবর্ষ। এর ব্যাস 25 থেকে 30 আলোকবর্ষ।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের আর একটি অদ্ভুত দর্শন নীহারিকা হল 'অশ্বমুণ্ড নীহারিকা' [Horse Head Nebula] [B 33]। এর পিছনেই আছে IC 434 বিকিরণ নীহারিকা। সেই নীহারিকার পটভূমিতে দেখা যায় এই কালো নীহারিকাটিকে। এটিকে অশ্বমুণ্ড না বলে 'সর্পমুণ্ড' বললে মনে হয় অনেকটা সঠিক বলা হত। এটি কিন্তু বিকিরণ নীহারিকা কিংবা প্রতিফলন নীহারিকা নয়। তবে, এটিকে 'কালো নীহারিকা' বলা হয় এবং এটি দেখা যায় IC 434 নীহারিকার আলোকে। এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। দূরত্ব মাত্র 1600 আলোকবর্ষ। এর নাম অশ্বমুণ্ড রাখার কারণ হল, দাবা খেলার Knight বা ঘোড়ার মত দেখতে এর মাথাটি। তাই এমন নামকরণ [চিত্র ঃ 44]।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের এমনি আর একটি নীহারিকা হল 'রোসেটি নীহারিকা'। 4900 আলোকবর্ষ দূরের এই নীহারিকাটি কালপুরুষ নীহারিকার মতই নতুন নক্ষত্রের আঁতুড় ঘর। রোসেটি নীহারিকা একটি বিকিরণ নীহারিকা। এতে আছে NGC 2244 নামের নক্ষত্রপুঞ্জ। রোসেটির এই নক্ষত্রগুলি সৃষ্টি হয়েছে মাত্র 500,000 বছর আগে। রোসেটির ব্যাস 90 আলোকবর্ষ। এর মেঘগুলি থেকে এখনও নতুন নক্ষত্র উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে এটি একটি ব্যতিক্রমী নীহারিকা। বলা হচ্ছে, এই নীহারিকায় এখন নতুন নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে।

চিত্র 45 রোসেটি নীহারিকার ছবি। এর বাইরের বলয়গুলিকে আলাদা আলাদা NGC নম্বর দেওয়া হয়েছে। নম্বরগুলি হল NGC 2237, 2238 এবং 2239। রোসেটির মধ্যাঞ্চলের গহ্বর সদৃশ অংশের ব্যাস প্রায় 20 আলোকবর্ষ। এর গোলাপী রঙ হয়েছে আয়নিত হাইড্রোজেনের আলোক বিকিরণের কারণে। এই আয়নিত হওয়াটা সম্ভব হয় নবীন নক্ষত্রেরা এর মধ্যে অবস্থান করার ফলে।

আরেকটি ফুলের মত অপূর্ব দর্শন নীহারিকা হল হেলিক্স নীহারিকা। পৃথিবীর থেকে 300 অলোকবর্ষ দূরের এই নীহারিকাকে খালি চোখে দেখা মুশকিল। কারণ, এর আলো আকাশের এতো বিস্তৃত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে যে, এর ঔজ্জ্বল্য পৃথিবী থেকে বেশ কমই দেখায়। বাস্তবে পৃথিবীর খুব কাছের

এই নীহারিকাটি খুবই সুন্দর দেখতে। এটি একটি কক্ষপথে আবর্তনশীল নীহারিকা। [চিত্র 46 দেখুন]।

পৃথিবী থেকে মাত্র 6700 আলোকবর্ষ দূরে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই রয়েছে এক নীহারিকা যেটি ত্রিধারা নীহারিকা [Trifid Nebula] নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে, এর পরিচয় M 20 এবং NGC 6514। এটি একটি বিকিরণ নীহারিকা। এতে রয়েছে আয়নিত হাইড্রোজেন এবং ধূলিকণার বিশাল মেঘ। এর এই সব মেঘপুঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয় নতুন তারা। সুতরাং প্রচণ্ড উত্তপ্ত অনেক নবীন তারাও রয়েছে এই ত্রিধারা নীহারিকায় [চিত্র ঃ 47]।

ত্রিধারা লাল রঙ বিকিরণ করে। ওর মেঘপুঞ্জে রয়েছে বেশ কিছু নবীন নক্ষত্র যেগুলি প্রবল উত্তপ্ত। এইভাবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত ওই নক্ষত্রগুলি আয়নিত করছে ত্রিধারার গ্যাসীয়পুঞ্জকে। ফলে, বিকিরণ হচ্ছে আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাসের কণা থেকে। ধূলিকণা ও আয়নিত গ্যাস মিলে আদিনক্ষত্র উৎপন্ন হয়। তারপর উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে তা নীল রঙের হতে থাকে। সুতরাং এর নবীন তারারা নীল রঙের; আর এর মেঘপুঞ্জের বিকিরণ হল লাল রংয়ের। এর নক্ষত্রগুলি সবই O-গ্রুপের। এই নীহারিকাটিও একটি ব্যতিক্রমী নীহারিকা, কারণ এটাতেও নক্ষত্র উৎপন্ন হচ্ছে। বিশুদ্ধ নীহারিকায় নক্ষত্র উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। নীহারিকারা মূলতঃ বন্ধ্যা।

48 নম্বর চিত্রটি 'কী-হোল' নীহারিকার। এই সুন্দর নীহারিকাটির নামকরণ করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন হার্শেল [John Herschel] ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই নীহারিকার দূরত্ব মাত্র 8000 (আট হাজার) আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম সদস্য এই নীহারিকাটিতে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে না। সুতরাং একে আদর্শ নীহারিকার দলে ফেলা যায়। NGC 3324 নামের এই নীহারিকা 'কী-হোল' নামে অভিহিত হয় এর এতাদৃশ আকৃতির জন্য। এটি একটি কালো নীহারিকা। কিন্তু বিকিরণ নীহারিকা 'এটা ক্যারিনী'-র [Eta Carinae] আলোর প্রেক্ষাপটে 'কী হোল' নীহারিকা উজ্জ্বল নীহারিকা হিসাবে প্রতিভাত হয় [চিত্র ঃ 48]।

আরেকটি বর্ণময় নীহারিকা হল 'ভেলা নীহারিকা'। এটি একটি বিশাল সুপার নোভার দেহাবশেষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকা এই নীহারিকার দূরত্ব 1600 আলোকবর্ষ। এর বর্তমান ব্যাস প্রায় 200 আলোকবর্ষ। বিশাল এই সুপারনোভা বিস্ফোরিত হয় প্রায় এক হাজার বছর আগে। বিস্ফোরণের পর এর দেহাবশেষ থেকে কর্কট নীহারিকার মত ভেলা নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছে। 49 নম্বর চিত্রে ভেলা সুপারনোভার [Vela Supernova] অবশেষ দেখানো হয়েছে। এর বিস্ফোরণ ঘটেছিল প্রায় এক হাজার বছর আগে। ছবিতে যে সবুজরেখা দেখা যাচ্ছে তা এক কৃত্রিম উপগ্রহের [Satellite] গতিপথের ছবি, যেটি ওই সুপারনোভার ছবি নেওয়ার সময় দূরবীনের দৃষ্টিপথের আওতায় এসে পড়েছিল [চিত্র 49 দেখুন] । এই অবশেষটির ব্যাস 200 আলোকবর্ষ এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 1600 আলোকবর্ষ মাত্র।

তবে ভেলাকে আলাদা নীহারিকা হিসাবে না ধরে একে 'গাম নীহারিকা'-র [Gum Nebula] সঙ্গে এক করে ধরা হয়। ওই বিস্ফোরণে 'ভেলা পালসার' [Vela Pulsar] -ও উৎপন্ন হয়েছে। আবার 'গাম নীহারিকা' নামকরণ করা হয়েছে এর আবিষ্কর্তা ছিলেন স্ট্যানলি গাম [Colin Stanley Gum] [1924-60 খ্রিস্টাব্দ]-এর নামে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গাম ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। গাম নীহারিকাকে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকেই ভালোভাবে দেখা যায়। গাম নীহারিকা পৃথিবী থেকে 1300 আলোকবর্ষ দূরে। এর ব্যাস প্রায় 840 আলোকবর্ষ। ভেলা সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ, যাকে আমরা ভেলা সুপারনোভা বলে অভিহিত করেছি সেটিকে এই গাম নীহারিকার অংশ বলে ধরা হয়। অর্থাৎ ভেলা নীহারিকা গাম নীহারিকারই অংশ বিশেষ। [চিত্র ঃ 49]।

আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অতি পরিচিত সূর্যও একটি সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। সূর্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্র আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে। অবার সূর্যের চেয়ে অনেকটাই বড় কিংবা অনেকটাই ছোট নক্ষত্রও রয়েছে কোটি কয়েক। সূর্য ও তার সৌরমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের 360^0 -র মাত্র 17^0 অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গ্যালাক্সীর এক প্রান্তে, গ্যালাক্সী কেন্দ্র থেকে প্রায় 33,000 আলোকবর্ষ দূরে। ছায়াপথের বিশালতার কাছে আমাদের সূর্য এবং সৌরমণ্ডল অতি নগণ্য। মহাবিশ্বের তুলনায় তা

তুচ্ছাতিতুচ্ছ। অর্থাৎ এই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছে অতি নগণ্য। আর মহাবিশ্বের কাছে এই পৃথিবী ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না কোনওভাবে। এই পৃথিবী, এই সৌরমণ্ডলের থাকা কিংবা না থাকাটা শুধু মহাবিশ্বের কাছেই নয় ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছেও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসের এই ব্রহ্মাণ্ডে কত সৌরমণ্ডল এই মুহূর্তে তৈরি কিংবা ধ্বংস হচ্ছে তা আমরা সত্যিই জানি না। মহাবিশ্বের বেলায় সে সংখ্যা হবে নিশ্চয়ই অতি বিশাল। সমস্ত মহাজাগতিক তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। মহাবিশ্ব দূরে থাক, ছায়াপথের বহু কথা আজও অজানা, তার বহু তত্ত্ব আজও অধরা।

পিনহুইল ব্রহ্মাণ্ড [Pinwheel Galaxy] ঃ

অশ্বিনী নক্ষত্রমণ্ডলীর [Triangulum] মধ্য দিয়ে দেখা যাওয়া আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড হল পিনহুইল গ্যালাক্সী। চিত্র 37এবং চিত্র 50 -এ এই গ্যালাক্সীটিকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষ। আয়তনে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় আট ভাগের একভাগ। এর ব্যাস 50 000 আলোকবর্ষ। এটি একটি সর্পিল বা শঙ্খবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম M33 কিংবা NGC 598। আমাদের স্থানীয় প্রতিবেশী গ্যালাক্সীদের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম। M33-কে কোন বিশেষ অবস্থায় খালি চোখেও দেখা যায়। তবে, সাধারণতঃ এটিকে ভালো দূরবীনের সাহায্যেই দেখা সম্ভব হয়। তা ছাড়া এর উজ্জ্বলতা বেশ কম হওয়ায় একে সব সময় দূরবীনেও সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব হয় না। কোন কোনও সময় একে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।

চিত্র ঃ 50

● অন্যরূপে 'পিন হুইল' [Pinwheel] গ্যালাক্সী। এটি আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড। চিত্র 37-এ একে দেখানো হয়েছে। এর দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষ। ব্যাস 50,000 আলোকবর্ষ। নাম M 33 কিংবা NGC 598। ●

M33-র পিনহুইল নামটি এসেছে এর গড়নের জন্য। এর কেন্দ্র বেশ ছোট। তার চারিদিকে এর বাহুগুলি আলগাভাবে গ্রথিত। সর্পিল বাহুগুলি অনেকটাই মুক্ত। যথানিয়ম, আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাস এবং নবীন তারাগুলি রয়েছে এর সর্পিল বাহুতে। ওই সব অঞ্চলের গ্যাসীয়পুঞ্জের আলাদা NGC নম্বরও দেওয়া হয়েছে। 50 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে থাকা আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সীদের মধ্যে এই গ্যালাক্সীটি অন্যতম। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মতই এটিও সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এর গুণাবলীর সঙ্গে

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নানা মিল দেখা যায়। এর মিল রয়েছে অন্য স্থানীয় প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীর সঙ্গেও।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্য দিয়ে দৃষ্ট M101 বা NGC 5457 নক্ষত্রমণ্ডলীকে অনেক সময় 'পিনহুইল গ্যালাক্সী' বলা হয়ে থাকে। এটি অষ্টমতম ঔজ্জ্বল্যের নক্ষত্রমণ্ডলী। এটি M 33-র মতই সর্পিল গ্যালাক্সী। এর কেন্দ্রাঞ্চল অনেক বেশি ঘনসন্নিবিষ্ট। প্রকৃত পক্ষে, অশ্বিনী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে দেখা যাওয়া M33 গ্যালাক্সীই 'পিনহুইল গ্যালাক্সী', যার দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষ এবং যার ব্যাস 50,000 আলোকবর্ষ। এটি আমাদের স্থানীয় প্রতিবেশীদের অন্যতম।

পিনহুইল গ্যালাক্সীর 37 নম্বর ছবিটি 50 নম্বর চিত্রের কিছুটা বর্ধিত রূপ। 37 নম্বর ছবিতে কেন্দ্রাঞ্চলকে বেশ কিছুটা বড় করে দেখানো হয়েছে। 50 নম্বর চিত্রে সর্পিল বাহুগুলি খুবই স্পষ্ট। বাহুগুলি বেশ ছাড়ানো, কেন্দ্রাঞ্চলের সঙ্গে আঁটোসাঁটো ভাবে গ্রথিত নয়। 50 নম্বর চিত্রেই পিনহুইল গ্যালাক্সীর স্বরূপ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

পিনহুইল গ্যালাক্সীর অনেক তথ্যই আমাদের আজও অজানা, যদিও এটি আমাদের স্থানীয় প্রতিবেশী। তবে এর বহু গুণাবলী আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মেলে, যেহেতু উভয়েই মূলতঃ সর্পিল বা শঙ্খবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আসবে আন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী এবং তারপর দুটি ম্যাগেল্লানীয় মেঘ এবং অন্য দুটি স্থানীয় প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড। এগুলি অবশ্য বামনাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড। তবে, অ্যান্ড্রেমিডা ছায়াপথের চেয়ে অনেক বড় এক ব্রহ্মাণ্ড। এর নক্ষত্র সংখ্যাও অনেক বেশি।

অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড [Andromeda Galaxy] ঃ

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের স্থানীয় বর্গের অন্যতম সদস্য হল অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড। কাছাকাছি প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিবেশী। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস এক লক্ষ আলোকবর্ষ, কিন্তু অ্যান্ড্রোমিডার ব্যাস 1,60,000 আলোকবর্ষ। এই বিশাল গ্যালাক্সীটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের প্রায় চার গুণ। স্থানীয় বর্গের দুটি দৈত্যাকার সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের একটি হল অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যটি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড। অ্যান্ড্রোমিডার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম হল M 31বা NGC 224 । এই বিশাল গ্যালাক্সীটি রয়েছে আমাদের থেকে প্রায় 24 লক্ষ আলেকবর্ষ দূরে। তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি থাকায় এই গ্যালাক্সীটিকে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নানা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্ভব হয়েছে। নক্ষত্রের গঠন, তার ক্রমবিকাশ, নিউক্লীয় সংশ্লেষণ, কৃষ্ণবস্তু ইত্যাদি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা গেছে এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এই সব গবেষণা থেকে মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও বহু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এখন আরও গবেষণা চলছে নতুন তথ্য আবিষ্কারের আশায়।

আকাশের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে সহজভাবে চিহ্নিত করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেই সেই অংশে অবস্থিত তারাদের কাল্পনিক রেখা দ্বারা গ্রথিত বা দলবদ্ধ করে ও কোনও কিছুর সঙ্গে তাদের সেই দলবদ্ধ রূপের সাদৃশ্য কল্পনা করেই, সেই অনুসারে ওই মণ্ডলের [Constellation] নামকরণ করেছেন বহুকাল আগেই। মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি রাশিচক্রের নামকরণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। আকাশের 360^0-কে বারোটি সমান অংশে ভাগ করে প্রত্যেকটি অংশ একটি রাশি হিসাবে চিহ্নিত করার কৃতিত্ব প্রাচীন ভারতীয়দেরই প্রাপ্য। প্রথম 30^0-তে অবস্থিত মুখ্য কয়েকটি তারাদের কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে তা 'মেষ' বা ভেড়ার আকৃতির হয়। তাই আকাশচক্রের ওই অংশের নাম রাখা হল মেষরাশি বা মেষরাশির অঞ্চল। প্রাচীন ভারতই প্রথম বললো, আকাশচক্রের প্রথম 30^0 হল মেষরাশি। কারণ ভারতীয়রা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন অশ্বিনী নক্ষত্র থেকেই রাশিচক্রের শুরু ধরা হবে। আর অশ্বিনী নক্ষত্র মেষরাশিচক্রেই অবস্থিত। তাই মেষরাশি হল প্রথম রাশি। মেষরাশি নামকরণ করা হল এই জন্য যে, ওই 30^0 অংশের মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা কাল্পনিকভাবে যোগ করলে তা মেষের আকৃতি নেয়। এইভাবেই বারোটি রাশিচক্রের নামকরণ এবং তাদের জন্য আকাশের 30^0 করে অংশ নির্দিষ্টকরণ করা হয় বহুকাল আগেই।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই আকাশ বিভাজন ও সেগুলির নামকরণ পদ্ধতি অনেকটা

পরবর্তীকালে গ্রীক সভ্যতার জ্যোতির্বিদরা গ্রহণ করেছিলেন। একালেও ওই ধারা প্রচলিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একালেও সারা আকাশব্যাপী মোট ৪৪টি [অষ্টাশি] এই রকম মণ্ডলের কল্পনা করে নিয়েছেন। এগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নামকরণ যেমন আছে, তেমনি আছে গ্রীক ও রোমক নামকরণও। অ্যান্ড্রোমিডা তেমনি এক রোমক নামকরণ। এটি নেওয়া হয়েছে রোমক পুরাণ থেকে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই ব্রহ্মাণ্ডটির নামকরণ করেছিলেন 'রূপক ব্রহ্মাণ্ড'। কোন কোনও পুরাণে এটি 'দেবযানী ব্রহ্মাণ্ড' নামেও অভিহিত। দেবযানী হলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা এবং রাজা যযাতির পত্নী। পৌরাণিক ভারতের সম্রাজ্ঞী। বড়ো কথা হল, প্রাচীন ভারতীয়রা জানতেন এটা একটা আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। এটা যে আলাদা গ্যালাক্সী তা আধুনিককালে প্রথম জানা গেল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একে কিন্তু আলাদা ব্রহ্মাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছেন অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগে। মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মাণ্ড এবং গ্যালাক্সী প্রায় সমার্থক।

অ্যান্ড্রোমিডা সুপরিচিত জনপ্রিয় মণ্ডলগুলির মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর উত্তরাকাশে এর অবস্থান। এর এবং এর কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণ করা হয়েছে একটি জনপ্রিয় রোমক রূপকথার প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির নামানুসারে। এই মণ্ডলের নামকরণ তাই করা হয়েছে 'অ্যান্ড্রোমিডা'। এর পাশাপাশি মণ্ডলের নাম দেওয়া হয়েছে ক্যাসিওপিয়া, সিফিউস ইত্যাদি। এই ক্যাসিওপিয়া নামটি রোমক পুরাণে এসেছে সম্ভবত হিন্দু পুরাণের 'কাশ্যপী' নাম থেকে। 'W'-আকৃতির এই নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম ভারতীয়রা রেখেছিলেন 'কাশ্যপী' এবং এই কাশ্যপীই রোমক পুরাণে 'ক্যাসিওপিয়া' হয়ে যায়। যাইহোক, অ্যান্ড্রোমিডা নামকরণ যে রোমক পুরাণ কাহিনী থেকে এসেছে বলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন সেই কাহিনী একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। মুশকিল হল, দেবযানীকে নিয়ে আমাদের পুরাণে সুন্দর উপাখ্যান থাকলেও, সে কথা আমাদের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন না, কারণ আধুনিককালে সারা পৃথিবীতে এই ব্রহ্মাণ্ডটি অ্যান্ড্রোমিডা নামেই পরিচিত, দেবযানী কিংবা রূপক ব্রহ্মাণ্ড হিসাবে নয়। তাই দেবযানীর কাহিনী একালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অবাস্তব মাত্র। অথচ রোমক পুরাণের যে গল্প আমার বলতে চলেছি তা গুণমানে উৎকৃষ্ট না হলেও, তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবং বলছেন M 31-র অ্যান্ড্রোমিডা নামকরণ করা হয়েছে ওই কাহিনীর নায়িকার নামে। 'দেবযানী' কিংবা 'রূপক' বহুকাল আগে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দেওয়া এই সব নাম আজ অপাঙ্‌ক্তেয়।

ঈথিওপিয়ার রাজা 'সিফিউস' [Cepheus]-এর কন্যা হলেন অ্যান্ড্রোমিডা। এঁর মায়ের নাম 'ক্যাসিওপিয়া' [Cassiopia]। ফিনিয়াস [Phineus] ছিলেন এঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রাজা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে অ্যান্ড্রোমিডার বিবাহ দেবেন। এমন সময় এক দুর্দৈব দেখা দিল। ক্যাসিওপিয়া গর্ব করে বলতেন, তাঁর কন্যা অ্যান্ড্রোমিডা জুপিটারের পত্নী জুনো এবং জলকন্যা 'নীরিইদ' [Nereid]-এর চেয়েও সুন্দরী। এই ঘোষণা শুনে কুপিত জলদেবতা 'পসিদন' [Poseidon] বা নেপচুন [Neptune] এক ভীষণাকার জলদৈত্যকে ঈথিওপিয়া রাজ্য ধ্বংস করতে পাঠালেন। অ্যামেনের দৈববাণী শুনে রাজা সিফিউস নেপচুনকে সন্তুষ্ট করার করার কন্যা অ্যান্ড্রোমিডাকে এক পাহাড়ের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন, যাতে ওই জলদৈত্য তাকে ভক্ষণ করতে পারে। জলদৈত্য যখন সেই পাহাড়ের কাছে এলো সেই সময় গরগনদের পরাজিত করে মহাবীর পার্‌সিউস্ [Perseus] আকাশপথে ফিরছিলেন। তিনি বন্দিনী অ্যান্ড্রোমিডাকে দেখলেন। অ্যান্ড্রোমিডা জলদৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পেলে পার্‌সিউস্‌কে বিবাহ করবেন এই শর্তে পার্‌সিউস্ মেডিউসার মুণ্ড দেখিয়ে ওই জলদৈত্যকে পাহাড়ে পরিণত করেন। অ্যান্ড্রোমিডা মুক্ত হন। সিফিউস কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ অ্যান্ড্রোমিডাকে পার্‌সিউসের হাতে তুলে দেন। কিন্তু ফিনিয়াস এর বিরোধিতা করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য তিনি সিফিউসের বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হন। পার্‌সিউস্ তখন ফিনিয়াসকেও মেডিউসার মুণ্ড দেখিয়ে তাকে পাথরে পরিণত করেন। এরপর তিনি অ্যান্ড্রোমিডাকে বিবাহ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অ্যান্ড্রোমিডার নামেই নাম রাখা হয় আলোচ্য ব্রহ্মাণ্ডের। এই নামই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

অ্যান্ড্রোমিডা শরৎকালের মণ্ডল হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে, কারণ শরৎকালে একে প্রায় সারারাত ধরে দেখা যায়। সন্ধ্যায় দেখা যায় পূবের আকাশে, ক্রমশঃ আরও আরও পশ্চিমে এবং

শেষরাত্রিতে পশ্চিম দিকচক্ররেখার কাছে। তবে গ্রীষ্ম বা শীতকালেও একে দেখা যায়। গ্রীষ্মে দেখা যায় রাত্রির শেষার্ধে এবং শীতে রাত্রির প্রথমার্ধে পশ্চিমাকাশে।

আকারের বিস্তৃতি, সংশ্লিষ্ট তারাদের সংখ্যা, তারা কিংবা তারাদের অতি উজ্জ্বলতা অথবা তাদের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য আকাশের অনেক তারকামণ্ডল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অ্যান্ড্রোমিডা মণ্ডলের তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তবু প্রাচীনকাল থেকেই এই নক্ষত্রমণ্ডলকে মানুষ চেনে। বিভিন্ন দেশের মানুষ তার বিভিন্ন নাম দিয়েছে নানা সময়ে। তার কারণ অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর চতুঃসীমার মধ্যে একটি জ্যোতিষ্কের উপস্থিতি, যাকে অনুকূল অবস্থায় খালি চোখেই দেখা যায়। খালি চোখে কিংবা সাধারণ দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া ওই জ্যোতিষ্কটিকে এক টুকরো মেঘের মতই দেখায়। অতি শক্তিশালী দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখলে ওই বস্তুটিকে অন্যরূপে দেখা যায়। জানা যায়, কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি ওই ছোট্ট মেঘের টুকরোটি। বহুদূরে থাকার জন্য খালি চোখে ওকে মেঘের মত দেখায়। এই ধরনের তারার দ্বীপকে আমরা বলি গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড। আমরা ওই গ্যালাক্সীটিকে বলছি 'অ্যান্ড্রোমিডা'। এটি একটি আলাদা নাক্ষত্র-দ্বীপ, নক্ষত্রপুঞ্জ। এই রকম হাজার কোটি গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে।

অ্যান্ড্রোমিডা সম্পর্কে একটি কথা পরিস্কার করে বলার দরকার আছে। এই কথাটি প্রায় সব স্থানীয় বর্গের ব্রহ্মাণ্ডের এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি হল অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডল বলে পরিচিত তারাগুলির সবই রয়েছে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে। কিন্তু ওই যে ছোট্ট মেঘের টুকুরোটির কথা বলা হল,তা কিন্তু ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর তারাগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলী এবং অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ পৃথক, পরস্পর কোনও ভৌত [Physical] সম্পর্কহীন। ওদের শুধু পৃথিবী থেকে একই দিকে দেখা যায় মাত্র। নক্ষত্রমণ্ডলীর তারাগুলি যেখানে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে, সেখানে আন্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে প্রায় 24 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। মহাকাশের মধ্যে অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড ও অ্যান্ড্রোমিডা তারকামণ্ডলীকে একই দিকে দেখা যায় মাত্র। এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল ফারাক। অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড হল পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যাওয়া দূরতম মহাজাগতিক বস্তু।

এক সময় অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীকে বলা হত 'অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা'। এই পুরাতন রীতি মেনে এখনও অনেকেএকে নীহারিকা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, নীহারিকা হল মহাকাশে ভাসমান লঘু গ্যাসের, ধূলিকণার সমষ্টি। অ্যান্ড্রোমিডা কিন্তু মোটেই তা নয়। বরং এটি কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি, মহাবিশ্বের এক বিশাল নাক্ষত্র-দ্বীপ। পৃথিবী থেকে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডটি দেখা যায় মাত্র। এরা পারস্পরিক ভৌত সম্পর্কবিহীন।

1920 খ্রিস্টাব্দে সর্পিল নীহারিকাগুলি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড কিনা তা নিয়ে প্রবল বির্তক সৃষ্টি হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, সর্পিল নীহারিকাগুলি গ্যাসীয় মেঘ, যেগুলি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত এবং ওগুলি থেকে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট [Immanual Kant] এই সব নীহারিকাগুলিকে আলাদা আলাদা ব্রহ্মাণ্ড বলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার এই নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। সর্পিল নীহারিকাগুলি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড কিংবা ওগুলি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ, যেগুলি নতুন নক্ষত্র জন্ম দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে—এই নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং প্রবল গবেষণা শুরু হল। অ্যান্ড্রোমিডাকে নিয়ে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটাই সুবিধাজনক হল। 1888 খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আইজাক রবার্টস্ [Isaac Roberts] [1829-1904 খ্রিস্টাব্দ] একটি 20 ইঞ্চি দূরবীনে M 31-এর বেশ কিছু ছবি তুললেন। এই সব ছবি থেকে জানা গেল, ওই নীহারিকাটি সর্পিল। পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান এতে পাওয়া গেল না। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে হাবল্ [Edwin P. Hubble] এই সমস্যার সমাধান করে দেন। 1923-24 খ্রিস্টাব্দে তিনি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের 100 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট 'হুকার দূরবীন' [Hooker Telescope]-এর সাহায্যে সর্পিল অ্যান্ড্রোমিডায় আবিষ্কার করলেন অনেকগুলি পরিবর্তনশীল

ঔজ্জ্বল্যের 'Cepheid' তারা। এগুলিতে 'পর্যায়কাল ঔজ্জ্বল্য নিয়ম' [Period Luminosity Rules] প্রয়োগ করে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, অ্যান্ড্রোমিডা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অনেকটা বাইরে।

1940 থেকে 1955 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অ্যান্ড্রোমিডাকে নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা করা হয়। বাদে [Walter Baade] প্রথমে মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের 100 ইঞ্চি দূরবীনে এবং পরে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালোমার মানমন্দিরের 200 ইঞ্চি ব্যাসের Hale Reflector দূরবীনে নানা পর্যবেক্ষণের পর আবিষ্কার করলেন অ্যান্ড্রোমিডার কেন্দ্রাঞ্চলের প্রাচীন লালদানব তারাদের এবং এর প্রান্তসীমার দিকে থাকা নীল নক্ষত্রসমূহ। বাদের আবিষ্কার প্রমাণ করলো অ্যান্ড্রোমিডা এমন এক সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড যার কেন্দ্রাঞ্চলে আছে Population-II নক্ষত্রসমূহ এবং প্রান্তসীমার দিকে রয়েছে Population-I নক্ষত্রেরা। তাঁর এই সব আবিষ্কার নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু, তার গঠন, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন ইত্যাদির তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে অ্যান্ড্রোমিডা আলাদা সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বীকৃতি লাভ করে। তার মধ্যদেশে স্ফীত অঞ্চলে রয়েছে পুরানো সব নক্ষত্র ও লাল দানব তারার দল এবং বাহু অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে নতুন নক্ষত্র নীল তারা। এই ব্রহ্মাণ্ডটির গুণাবলীর অধিকাংশই আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে অনুরূপ। হাবলের সিদ্ধান্ত ও বাদের ওই আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ করলো।

অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হাইড্রোজেনের [HI] বন্টন খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নিষ্ক্রিয় হাইড্রোজেন এই গ্যালাক্সীর গ্যাসের একটা উপাদান এবং এর বন্টন অন্যান্য 'পপুলেশন-1'-এর অন্যান্য উপাদানের মতই। এই গ্যালাক্সীর কেন্দ্রাঞ্চলে, যেখানে 'পপুলেশন-2' নক্ষত্রেরা আছে, সেখানে গ্যাসের পরিমাণ যথারীতি কম। এই গ্যাস অনেকটা আংটির মত কিংবা বলয়ের মত বণ্টিত। এই ব্রহ্মাণ্ডের উত্তপ্ত গ্যাসের অপকেন্দ্রিক গতিসমূহের চিত্র বা নকশা বানানো হয়েছে। নিষ্ক্রিয় হাইড্রোজেন এবং এই গরম গ্যাসের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া গেছে যে, M 31-এর বহিরাঞ্চলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অদৃশ্য কৃষ্ণবস্তু। এর ফলে M 31-এর প্রকৃত ভর তার আপাত ভরের চেয়ে অনেকটাই বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কৃষ্ণবস্তুর বলয়, গ্যালাক্সীর উৎপন্ন হওয়া, সন্নিবদ্ধ হওয়া, বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

1993 সালে হাবল্ দূরবীন জানিয়েছে M 31-এর কেন্দ্রক দুটি এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় 5 [পাঁচ] আলোকবর্ষ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন অ্যান্ড্রোমিডা তার কোনও সাথী ছোট্ট একটি ব্রহ্মাণ্ডকে গিলে ফেলেছে। এরই ফলে এর কেন্দ্রক হয়েছে দুটি। এই দৈত্যাকার গ্যালাক্সীটির চারিদিকে উপগ্রহবৎ অনেকগুলি ছোট ছোট গ্যালাক্সী অবস্থিত। এদের মধ্যে দুটি গ্যালাক্সী খুবই প্রতীয়মান। এরা সবাই রয়েছে অ্যান্ড্রোমিডার সঙ্গে। এই দুটি ক্ষুদ্র গ্যালাক্সী হল M 32 বা NGC 206 এবং M 110 বা NGC 205।

অ্যান্ড্রোমিডার বেশ কয়েকটি নক্ষত্র-মেঘ রয়েছে। এদের মধ্যে NGC 206 খুবই প্রতীয়মান। এর আয়তন 2400 × 1400 বা 33.6×10^5 বর্গ আলোকবর্ষ। M 31-এ প্রতিবছর অন্ততঃ 30টি করে নোভা (Nova) আবিষ্কৃত হয় বৃহৎ দূরবীনের সাহায্যে। 1885 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে অ্যান্ড্রোমিডা সুপারনোভা [S. Andromeda] দেখা যায়। আধুনিককালে সেই প্রথম ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে সুপারনোভা দর্শন। এর সর্বোচ্চ ঔজ্জ্বল্য ছিল +6। এব পূর্বে যে সব সুপারনোভা দেখা গেছে সেগুলির সবকটিই ছিল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। অ্যান্ড্রোমিডা সুপারনোভাই প্রথম দৃষ্ট অন্য ব্রহ্মাণ্ডীয় সুপারনোভা।

অ্যান্ড্রোমিডার সর্পিল [illegible]ন নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি অছে, যদিও একে Sb শ্রেণির সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না M-31-এর কটি সর্পিল বাহু আছে। অনুমান করা হয়, এর অন্ততঃ দুটি সর্পিল বাহু আছে এবং এর একটিকে প্রভাবিত করছে এর উপগ্রহবৎ সঙ্গী গ্যালাক্সী M 32। সুতরাং অ্যান্ড্রোমিডার সর্পিল বাহু ও তার সংখ্যা নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আজও হয়নি। 'ঘনত্ব তরঙ্গ তত্ত্ব' [Density Wave Theory] সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্পিল বাহুদের গঠন, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনেকাংশে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। অশ্লেষা নক্ষত্রমণ্ডলীতে [Hydra Constellation] অবস্থিত M 83 গ্যালাক্সীর সর্পিল

গঠনের কারণ হিসাবে বলা হয় 'ঘনত্ব তরঙ্গ'-এর প্রভাবের কথা। এই গ্যালাক্সীটির সর্পিল বাহুগুলি সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে 'ঘনত্ব-তরঙ্গ তত্ত্ব' অনুসরণ করে। অ্যান্ড্রোমিডার ক্ষেত্রেও 'ঘনত্ব-তরঙ্গ তত্ত্ব' দিয়ে এর নিজস্ব সর্পিলতা এবং এর বাহুগুলির সংখ্যা ও তাদের সর্পিলতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে। M 83 ব্রহ্মাণ্ডটির অন্য নাম NGC 5236। এই ব্রহ্মাণ্ডটির ছবি দেখা যেতে পারে চিত্র 26 এবং চিত্র 52-তে। 1.5 কোটি আলোকবর্ষ দূরের এই সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডটির সর্পিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার ঘনত্ব-তরঙ্গের কারণে।

অ্যান্ড্রোমিডাকে ঘিরে আছে বটিকাবৎ নক্ষত্রপুঞ্জের এক জ্যোতির্বলয়। এই বলয়টি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে থাকা বলয়ের প্রায় তিনগুণ। এই পুঞ্জগুলির নক্ষত্রসমূহে অনেক বেশি ধাতব পদার্থ বিদ্যমান অন্ততঃ আমাদের গ্যালাক্সীর অনুরূপ নক্ষত্রগুলির তুলনায়। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় M 31-এর বিবর্তন অনেকটাই ধীর এবং অনিয়মিত, কারণ এর বটিকাবৎ নক্ষত্রপুঞ্জের বিস্তৃতি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি। অর্থাৎ ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় M 31-এর ক্রমবিকাশ ঘটছে বেশ কিছুটা ধীরগতিতে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে দেখা বর্ণালিতে লোহিতাপসরণ [Redshift] দেখা যায়। এর অর্থ হল ওই গ্যালাক্সীটি পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু M 31 গ্যালাক্সীর বেলায় ব্যাপারটা উল্টো ঘটছে। এর বর্ণালিতে লোহিতাপসরণের বিপরীত ঘটনা দেখা যায়। এর অর্থ হল M 31 এগিয়ে আসছে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দিকে। এই এগিয়ে আসার বেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 35 কিলোমিটার বা 22 মাইল। এইভাবে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে প্রায় 300 কোটি বছর পরে M 31 বা অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড এবং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক বিশাল সংঘর্ষ ঘটবে। অকল্পনীয় সেই সংঘর্ষে এই দুই ব্রহ্মাণ্ড এক হয়ে যাবে এবং এক অতুলনীয় বিশাল উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সী তৈরি হবে। এমনও হতে পারে যে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে M 31-এর দিকে মহাকর্ষের নিয়মে। এই বিপ্রতীপ ঘটনা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বতত্ত্বের বিজ্ঞানে। এই মহাবিশ্বের প্রসারণের নিয়ম কি তাহলে খাটছে না অ্যান্ড্রোমিডা ও ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড দুটির ক্ষেত্রে? তাই গবেষণার অবকাশ থেকেই যাচ্ছে মহাবিশ্বকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে।

অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই দোসর। এদের গুণাবলী অনেকাংশে সদৃশ। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অনেকটা অংশই মহাজাগতিক ধূলিকণায় সমাচ্ছন্ন। অ্যান্ড্রোমিডা কিন্তু অমন ধূলিমলিন নয়। মহাবিশ্বকে জানার অন্য যে গবেষণার প্রয়োজন তা আমাদের ধূলিমলিন ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভব হয় না। ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে গবেষণার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় M 31 বা অ্যান্ড্রোমিডার উপর। কারণ অ্যান্ড্রোমিডা অতো ধূলি সমাচ্ছন্ন নয়। সুন্দর দর্শন এই ব্রহ্মাণ্ডটির সব কিছুই মোটামুটি ঠিকঠাক থাকলেও এর ভয়ঙ্কর দিকটা হল, প্রায় 300 কোটি বছর পরে ছায়াপথের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষের পর এটি ছায়াপথকে আত্মসাৎ করে নিজের কলেবর বৃদ্ধি করবে। আগেই বলেছি, M 31-এর দুটি কেন্দ্রক, যার অর্থই হল কিছু কাল আগে M 31 একটি ক্ষুদ্রাকার ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করেছে। এইভাবেই এটি গিলে নেবে এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসের আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডকে। সুতরাং আমাদের 24 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এই প্রতিবেশী গ্যালাক্সীটি একটি রাক্ষুসে গ্যালাক্সী।

অ্যান্ড্রোমিডাকে আমরা এখন যে অবস্থায় দেখছি এটি তার 24 লক্ষ বছর আগে আগেকার অবস্থা। কারণ দৃশ্য আলো, এক্সরে, বেতার তরঙ্গ সবাই ওখান থেকে পৃথিবীতে আসতে প্রায় 24 লক্ষ বছর সময় নেয়। এই 24 লক্ষ বছরে অ্যান্ড্রোমিডা নিশ্চয়ই এগিয়ে এসেছে ছায়াপথের দিকে কিংবা ছায়াপথ এগিয়ে গেছে অ্যান্ড্রোমিডার দিকে। যাইহোক না কেন, উভয়ের সংঘর্ষ ঘটতে আরও অন্ততঃ 299.76 কোটি বছর দেরী আছেই। সুতরাং খুব ভাবনার কিংবা আতঙ্কের অবকাশ নেই।

অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান 'The Square of Pegasus' এবং ক্যাসিওপিয়া [W আকৃতি সম্পন্ন] নক্ষত্রপুঞ্জ দুটির মাঝখানে। এরই মধ্য দিয়ে দেখা যায় 24 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ডটিকে। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় অ্যান্ড্রোমিডার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ [Large Magellanic Cloud] ঃ

বৃহত্তর ম্যাগেল্লানীয় মেঘটি একটি প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড। ছায়াপথের প্রতিবেশীদের মধ্যে দুটি ম্যাগেল্লানীয় মেঘ আছে। একটি ছোট এবং অন্যটি তার চেয়ে বড়। বড়টিকে বলা হয় Large Magellanic Cloud

বা গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ কিংবা বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ। আর ছোটটি হল Small Magellanic Cloud বা লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ বা ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ। বড়টিকে সংক্ষেপে বলি LMC এবং ছোটটিকে SMC। দুটিকেই খালি চোখে ছোট মেঘের টুকরোর মত দেখা যায় দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে।

প্রসিদ্ধ ভূ-পর্যটক ম্যাগেল্লান [Ferdinand de Magellan] 1519 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ গোলার্ধ পরিভ্রমণের সময় এই দুই স্থির মেঘখণ্ডকে নিরীক্ষণ করেন এবং এদের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ম্যাগেল্লান [1480-1521 খ্রিস্টাব্দ] নিয়ে কিছু কথা এই পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে বলা হয়েছে। ম্যাগেল্লানের এই পর্যবেক্ষণের প্রায় 400 বছর পরে আধুনিক যুগে এসে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, এই দুটি মেঘের টুকরো দুটি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। এদের নামকরণ করা হয় তাঁর নামেই। এখন বড় বা গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘের কথায় আসা যাক। এর ছবি দেখা যেতে পারে 23 ও 54 নম্বর চিত্রে। এটির দূরত্ব প্রায় 1,70,000 আলোকবর্ষ। এর ব্যাস 25,000 থেকে 30,000 আলোকবর্ষ।

LMC একটি ছোট আকারের গ্যালাক্সী। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ভরের মাত্র 5% থেকে 10% ভর এই ব্রহ্মাণ্ডটির। একে দেখা যায় ডোরাডো [Dorado] এবং মেন্‌সা [Mensa] নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। মহাকাশের প্রায় 8^0 অংশ জুড়ে এর অবস্থান। খালি চোখেও একে দেখা যায়। তখন মনে হয় এটি ছায়াপথেরই একটা অংশ। প্রকৃতপক্ষে এটি আলাদা একটি ব্রহ্মাণ্ড। প্রথম দর্শনে এটিকে একটি অনিয়মিত গ্যালাক্সী মনে হলেও এটি একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এটি দণ্ডযুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড শ্রেণির অন্তর্গত। ট্যারেন্টুলা নীহারিকা [Tarantula Nebula] এই গ্যালাক্সীতেই অবস্থিত [চিত্র 53 দেখুন]। এই নীহারিকাতে সবচেয়ে বেশি আয়নিত হাইড্রোজেন [H II] রয়েছে। এতাবৎ আবিষ্কৃত নীহারিকাগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় আয়নিত হাইড্রোজেন ভাণ্ডার।

এই নীহারিকায় তৈরি হচ্ছে নতুন তারা। LMC এবং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গ্যাস এবং ধূলিকণার এক বিশালাকার সেতু রয়েছে আকাশপথে। এই মহাকাশীয় যোগাযোগ থেকেই সম্ভবতঃ LMC-তে নতুন নতুন নক্ষত্র তৈরির প্রস্তুতি চলেছে। এই সেতুটিকে বলা হয় 'Magellanic Stream'। এই গ্যাসীয় সেতুটি উচ্চগতি সম্পন্ন এধরনের সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম। অদ্ভুত ঘটনা হল, LMC ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে ঘোরে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের তলের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত থেকে LMC তার ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা সম্পন্ন করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড ভবিষ্যতে গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ ব্রহ্মাণ্ডটিকে কোনও একদিন গ্রাস করে নেবে।

53 নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে ট্যারেন্টুলা নীহারিকা [Tarantula Nebula]। এটি রয়েছে 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ'-এর মধ্যে। এর মধ্যে আছে বহু উত্তপ্ত নক্ষত্র, যাদের বিকিরণে এটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। এর গোলাপী রঙ, এর মধ্যস্থিত আয়নিত হাইড্রোজেন [H II] গ্যাসের বিশাল সম্ভার থেকে উৎপন্ন। এটি NGC 2070। অন্য নাম লুপ নীহারিকা [Loop Nebula]। এর ব্যাস 900 আলোকবর্ষ। দূরত্ব প্রায় 1,70,000 আলোকবর্ষ।

LMC-এর পাতলা চাকতিতে রয়েছে উত্তপ্ত নব্য তারার দল এবং Cepheid-রা। প্রাচীন নক্ষত্র এবং অস্থিরগতি নীহারিকারা [Planetary Nebulae] রয়েছে অপেক্ষাকৃত পুরু চাকতির অঞ্চলে। আমাদের গ্যালাক্সীর মত কোনও জ্যোতির্বলয় নেই LMC-র। অথচ বেশির ভাগ সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীন নক্ষত্রদের অবস্থান করা অঞ্চলে এ ধরনের জ্যোতির্বলয় দেখা যায়। LMC-র ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে বটিকাবৎ নক্ষত্রপুঞ্জ এবং এর নক্ষত্রগুলি সবই প্রাচীন তারা। কিন্তু LMC-তে এ ধরনের বটিকাবৎ নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র একটিই রয়েছে, যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম NGC 1866। এই নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রেরা সব নবীন। নীল নক্ষত্র সমন্বিত কিছু বটিকাবৎ পুঞ্জ রয়েছে LMC-র মেঘ ঢাকা অঞ্চলে. বটিকাবৎ নীল নক্ষত্রপুঞ্জ কিন্তু আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে অনুপস্থিত।

গুরু বা বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ পৃথিবী থেকে মাত্র 1,70,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে এই গ্যালাক্সীটির অবস্থান পৃথিবীর অনেকটাই কাছে। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডটির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক সহজসাধ্য। এর নক্ষত্রগুলি ও নীহারিকাসমূহকে অত্যন্ত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এর কিছু বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়েছে, যেগুলির কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। এটি ছায়াপথের নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড। এর অবস্থান দেখা যেতে পারে 38

নম্বর চিত্রে। LMC-কে ম্যাগেল্লানই প্রথম দেখেছিলেন, তা কিন্তু নয়। এঁর দেখার বহুকাল আগে থেকেই এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গোচরে ছিল। তবে ম্যাগেল্লানই প্রথম ব্যক্তি যিনি দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে এটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ এটির দোসর। কিন্তু সেটি একটি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। সেটিও আমাদের প্রতিবেশী। তবে তার কথায় আসার আগে LMC-র কথা শেষ করি, 1987 খ্রিস্টাব্দে দেখা যাওয়া বিখ্যাত সুপারনোভা SN 1987A, যেটি গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ ব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থিত, তার কথা দিয়ে।

আগেই বলেছি একটা অনুজ্জ্বল নক্ষত্র যখন হঠাৎ প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে বিস্ফোরিত হয় তখন তাকে বলা হয় নোভা বা নতুন তারা। আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন এর ফলে একটি নতুন তারার আবির্ভাব হল। এখন জানা গেছে, একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকেই নোভার উৎপত্তি। ওই ক্ষীণ তারাটিকে আগে দেখা যায় নি বলে নামকরণ নিয়ে এই গোলমাল ছিল। তবে সেই নাম আজও চালু আছে। নোভা মানে হল বিস্ফোরিত তারা। 1934 সালে বাদে ও জুইকি নোভা ও সুপার নোভার পার্থক্য দেখিয়ে বলেছিলেন, সুপারনোভা হল উজ্জ্বলতম বিস্ফোরণ যা তার জনক ক্ষীণ নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যকে প্রায় এক লক্ষ গুণের উপর ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই বিস্ফোরণে নক্ষত্রটির মৃত্যু ঘটে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর থেকেই নক্ষত্রটি কৃষ্ণগহ্বর কিংবা ওই জাতীয় নাক্ষত্রিক শবে রূপান্তরিত হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রতি বছর প্রায় 20/25 টি সুপারনোভা দেখতে পান দূরবীন দিয়ে। এগুলি দেখা যায় বাইরের ব্রহ্মাণ্ডে। খালিচোখে শেষ যে সুপার নোভা দেখা গিয়েছিল তা 1886 খ্রিস্টাব্দে সর্পিল অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে। 1987 সালের 23 ফেব্রুয়ারী তেমনি এক বিরল ঘটনা দেখা গেল যার উৎপত্তিকাল প্রায় 1,70,000 বছর আগের কোনও সময়। ওই দিন আমাদের ছায়াপথের ওই প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘের ট্যারেণ্টুলা নীহারিকার প্রান্তদেশে দেখা গেল একটি উজ্জ্বল সুপার নোভা। 1,70,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত LMC-র থেকে আলো আসতে সময় নেয় প্রায় 1,70,000 বছর। অর্থাৎ ওই সুপারনোভাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল প্রায় 1,70,000 আগে। আলো ওখান থেকে যাত্রা শুরু করে 1987 সালে এসে পৌঁছালো পৃথিবীতে।

1987 সালের 23 শে ফেব্রুয়ারী চিলির মানমন্দিরের ইয়ান শেল্টন [Ian Shelton] এই সুপারনোভাটি আবিষ্কার করেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 1987A। 1987 হল বছরএবং A অক্ষর ওই বছরের প্রথম দেখা সুপারনোভা সূচক।

সুদূর অতীতের ওই সুপারনোভা বিস্ফোরণের আলো যে এতোদিনে পৃথিবীতে এসেছে তা বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। ওই ঘটনা যে শুধু শেল্টন দেখেছিলেন তা নয়, প্রায় একই সময়ে ইয়েল মানমন্দিরের অস্কার ডুহালডে, নিউজিল্যান্ডের সৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট জোনসের চোখেও তা ধরা পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ম্যাকনাউট খবরটি পাওয়ার পর প্রত্যক্ষ প্রমাণে ওই আবিষ্কারকে সত্য বলে সমর্থন করেন। ম্যাকনাউট পরবর্তীকালে বলেছেন, অতিদানবীয় নীল নক্ষত্র স্যান্ডুলিক [Sanduleak]-এর জায়গায় বিস্ফোরণটি ঘটেছে এবং সম্ভবতঃ ওই নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হয়ে সুপারনোভাটি সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় তিন মাস উজ্জ্বল অবস্থায় থেকে মে মাসে তা ক্ষীণ হতে থাকে। এটির বিস্ফোরণ আরম্ভ হয় নিউট্রিনোর প্রবল বিকিরণ দিয়ে। এতে অনুমান করা হয় যে নতুন নিউট্রন নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে। দু'ঘন্টা পরে অতি বেগুনী রশ্মির বিকিরণ হয় তীব্রভাবে। তখন তার পৃষ্ঠ উষ্ণতা প্রায় 5 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। 20 শে মে পর্যন্ত উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ বাড়ে। তারপর এটি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে।

আগেই বলেছি, প্রায় 45 বছর আগে বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সুপারনোভার শক্তি বিকিরণের মাধ্যম হিসাবে নিউট্রিনোর কথা বলেছিলেন। গ্যামো এই ধরনের শক্তি বিকিরণের ক্রিয়াকে বেশ সরস করে নাম দেন 'উরকা প্রসেস' [Urca Process]। রিও ডি জেনেরোর জুয়ার আড্ডায় টাকা পয়সা কীভাবে উড়ে যায় তা যেমন দেখা যায় না, তেমনি নিউট্রিনোর মাধ্যমে প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণও তেমন টের পাওয়া যায় না। এখন অবশ্য নিউট্রিনোদের ধরার মত সন্ধানী যন্ত্র তৈরি করা গেছে। 1987 সালের 23 শে ফেব্রুয়ারী ওহিওর এবং জাপানের এমনি নিউট্রন সন্ধানী যন্ত্রে ধরা পড়েছিল 1987A সুপারনোভার প্রবল নিউট্রিনো বিকিরণ।

এই সুপারনোভাটিকে দেখার আগে সুপারনোভা সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সব সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেগুলির প্রায় সব ক'টিই, দুয়েকটি ছোটোখাটো তথ্য বাদ দিয়ে, সত্য বলে প্রমাণিত হল 1987A-র পর্যবেক্ষণে। বিস্ফোরণজনিত বহু উপাদান সমন্বিত মেঘপুঞ্জ, প্রবল অভিকর্ষ পিষ্ট কেন্দ্রীয় পালসার ইত্যাদি সবই পাওয়া গেল। বিপুল পরিমাণ নিউটিনো বিকিরণও পাওয়া গেল। সূর্য থেকে একটা বিশেষ হারে নিউট্রিনো সর্বদাই পৃথিবীতে আসছে। কিন্তু বিস্ফোরণ দেখার বিশেষ মুহূর্তে নিউট্রিনো পাতের হার হঠাৎই প্রবলভাবে বেড়ে যায়। শেল্টন চিলির অ্যান্ডিজ শিখর থেকে ওই হঠাৎ জেগে ওঠা সুপারনোভাটিকে যখন প্রথম দেখলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে চারটি গবেষণাগারে নিউট্রিনো পাতের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড় গেল। এই চারটি গবেষণাগার হল —যুক্তরাষ্ট্রের ইয়ারি হ্রদের তীরের খনিতে থাকা গবেষণাগার, জাপানের একটি দস্তা-সীসার খনিতে থাকা গবেষণাগার, আল্পসের মঁ ব্লাঁ সুড়ঙ্গের গবেষণাগার এবং রাশিয়ার এলবুর্জ পর্বত গহ্বরে অবস্থিত গবেষণাগার। হিসাব করে দেখা হয়েছে যে, সুপারনোভার ইলেকট্রন, অ্যান্টি-নিউট্রিনো বিকিরণ মোট বিকীর্ণ শক্তির এক ষষ্ঠমাংশ বয়ে আনে। এর থেকে 1987A সুপারনোভার মোট বিকীর্ণ শক্তি দাঁড়ায় প্রায় 3×10^{53} আর্গ। এই শক্তি সূর্যের 1000 কোটি বছরের মোট উৎপাদিত শক্তির কিংবা দশ বছরে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদিত মোট শক্তির প্রায় 1000 গুণ। আলোর বিকিরণ হওয়ার আগেই কয়েক সেকেন্ডে নিউট্রিনো বিকিরণ শেষ হয়ে যায়। নিউট্রিনোর শক্তি, বিস্ফোরণের উষ্ণতা ও মোট শক্তির মান প্রভৃতির তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি 1987A সুপারনোভার পরীক্ষায় প্রায় মিলে গেল। নিউট্রিনো বিকিরণের ফলাফল থেকে ওই সুপারনোভার কেন্দ্রে নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। কিন্তু 1987A-র আলোর তীব্রতা হ্রাসের হার থেকে বোঝা গেল যে, তার নিউট্রন নক্ষত্র কর্কটনীহারিকার অনুরূপ নয়। যদিও এর কেন্দ্রে আজও নিউট্রন নক্ষত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি, তবুও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ওই নিউট্রন নক্ষত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে এই সুপারনোভার কেন্দ্র একটি কৃষ্ণগহ্বর হতে পারে অথবা নিউট্রন ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে শুধু কোয়ার্কের স্তূপই জড়ো হয়ে আছে।

1987A সুপারনোভাটি স্যান্ডুলিক নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই নক্ষত্রটি যদি ওই সুপারনোভাটির উৎস হয়, তবে এই অতি দানবীয় নক্ষত্রটি বিস্ফোরণের আগে লাল ছিল না নীল ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কবে তার কোন্ কোন্ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ও তার সুপারনোভায় রূপান্তরণ ঘটেছে তাই-ই এখন গবেষণার বিষয়। এখনও ওই সুপারনোভার উপর গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বের করেছেন, এই সুপারনোভাটির ক্রমশঃ কী কী পরিবর্তন ঘটবে। সেই সব তত্ত্বসমূহের যথার্থতা বোঝা যাবে সরাসরি পর্যবেক্ষণে, ওই সুপারনোভাটির পরীক্ষা- নিরীক্ষায়। পৃথিবী থেকে যে কোন পরীক্ষা এবং তার ফলাফলের যে কোনও ব্যাখ্যা করা হোক না কেন বিজ্ঞানের সাধারণ পরীক্ষার মত তার সত্যতা এখনই যাচাই করা যাবে না। কারণ, পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফল পেতে যে দীর্ঘ সময় লাগবে ততক্ষণে ওই সুপারনোভা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ভস্মাবশেষে পরিণত হবে। এখনকার এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা সেগুলি কাজে লাগাতে পারবেন, যাচাই করে নিতে পারবেন এবং তার সদ্ব্যবহারও করতে পারবেন।

এই সুপারনোভাটির পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে নানা তত্ত্বের যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। আবার নানা নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করাও সম্ভব হয়েছে। 1987A সুপারনোভার দেখা যাওয়া বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। 1,70,000 আলোকবর্ষ দূরের এই সুপারনোভাটিতে এখন যা ঘটছে তা আমাদের পৃথিবী দেখতে পাবে 1,70,000 বছর পরে। আর পৃথিবী থেকে আমরা ওকে যেভাবে দেখছি তা ওই সুপারনোভার 1,70,000 বছর আগেকার অবস্থা। এই 1,70,000 বছরে ওটির কী অবস্থা হয়েছে তা আমরা জানতে পারবো আগামী 1,70,000 বছর ধরে। গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানে এখন বিখ্যাত হয়ে গেছে তার এই 1987A সুপারনোভাটির জন্য।

লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ [Small Magellanic Cloud] ঃ

লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের আরেকটি প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড। একে ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘও বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একে বলেন Small Magellanic Cloud বা সংক্ষেপে

SMC। ভূ-পর্যটক ম্যাগেল্লানের [Ferdinand De Magellan] নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে লঘু বা ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ। আগেই বলেছি, দক্ষিণ গোলার্ধ পরিভ্রমণের সময় 1519 খ্রিস্টাব্দে ম্যাগেল্লান দক্ষিণ আকাশে দুটি মেঘখণ্ড দেখেছিলেন, যেগুলি আকাশের গায় স্থির অবস্থানে ছিল। এদের কথাও তিনি লিখে রেখে গেছেন। প্রায় 500 বছর আগে ম্যাগেল্লান দক্ষিণ আকাশের গায় যে দুটি স্থির মেঘ খণ্ড দেখেছিলেন সেই দুটির বড়টিকে এখন বলা হয় Large Magellanic Cloud এবং ছোটটিকে বলা হয় Small Magellanic Cloud। আধুনিককালে এসে আমরা জেনেছি এই দুটি মেঘখণ্ড দুটি আলাদা গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড। দুটিই ছোট আকারের। এই বামনাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড দুটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই নিকট প্রতিবেশী।

ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ বা SMC ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় নিকটতম প্রতিবেশী। এর দূরত্ব আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র 1,90,000 আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মোট ভরের মাত্র 2% এই SMC ব্রহ্মাণ্ডটির ভর। একে দেখা যায় টিউকানা [Tucana] নক্ষত্রমণ্ডলীর ভিতর দিয়ে। আকাশের প্রায় 3^0 অংশ জুড়ে SMC -র অবস্থান। খালি চোখেই একে দেখা যায়। খালি চোখে দেখলে একে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অংশ বলেই মনে হয়। গুরু বা বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ থেকে এর দূরত্ব মাত্র 20,000 আলোকবর্ষ। এটি একটি অনিয়মিত গ্যালাক্সী। এর প্রস্থ 15,000 আলোকবর্ষ। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 60,000 আলোকবর্ষ। তবে SMC-র লম্বা ঘোরানো আকৃতি দেখে মনে হয়, এটি প্রবল কোনও এক শক্তির প্রভাবে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রায় 20 কোটি বছর আগে সম্ভবতঃ ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে SMC -র কোনও একটা যোগসূত্র ছিল। যে গ্যাসীয় মেঘ এই যোগসূত্র রচনা করেছিল সেই যোগসূত্র এখন SMC -র অংশ বিশেষ। ওই অংশে এখন তৈরি হচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন তারার দল। LMC -র চেয়ে অনেক কম গ্যাসীয়পুঞ্জ রয়েছে SMC তে। কিন্তু এর প্রান্ত অঞ্চলের আয়নিত হাইড্রোজেন [H II]-এর গ্যাসীয় পুঞ্জে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন তারা।

SMC আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে পরিক্রমণরত। ছায়াপথের কেন্দ্রীয় তলের সঙ্গে সমকৌণিক কাল্পনিক অক্ষের পরিক্রমণ পথ ধরে ঘুরে চল্লেছে SMC। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অভিমত হল, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড একদিন লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘকে আত্মসাৎ করে নেবে। কারণ এইভাবে পরিক্রমা করতে করতে SMC ভবিষ্যতে ছায়াপথের আওতায় চলে আসবে। তখন SMC হারিয়ে ফেলবে তার আলাদা অস্তিত্ব। সে মিশে যাবে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে।

IC 1613 ব্রহ্মাণ্ড [IC 1613 Galaxy] ঃ

এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের ছায়াপথের প্রতিবেশী এক ব্রহ্মাণ্ড। এর অন্য কোনও চলতি নাম নেই। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম IC 1613। আর এই ব্রহ্মাণ্ডটি ওই নামেই পরিচিত [38 নম্বর চিত্র]। ছোট আকারের এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের 'স্থানীয় বর্গ'-এর অন্তর্গত। একে দেখা যায় 'সিটাস' [Cetus] নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। খালি চোখে দেখা যায় বিশেষ অবস্থায়। তবে ভাল দূরবীনে একে পরিষ্কার দেখা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডটি একটি অনিয়মিত গ্যালাক্সী [Irregular Galaxy]। এর ঔজ্জ্বল্য 9·2 এবং আকাশে এর আয়তন $12' \times 11'$ [কৌণিক]। ক্ষুদ্র এক জ্যোতিষ্কের মত এটি দৃষ্টিগোচর হয়। Caldwell Catalogue -এর 51 নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় এটি স্থান পেয়েছে। তাই, একে C51-ও বলা হয়।

সিটাস নক্ষত্রমণ্ডলী মেষ ও মীন রাশির দক্ষিণে অবস্থিত। এটি আকাশের চতুর্থ বৃহৎ নক্ষত্রমণ্ডলী। এটি রয়েছে একেবারে বিষুবরেখার উপরে। এর মধ্য দিয়ে আরেকটি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী দেখা যায়। তার নাম M 77 বা NGC 1068। এটি একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এর দূরত্ব 5 কোটি আলোকবর্ষ। এটি শেফার্ট গ্যালাক্সীদের [Seyfert Galaxies] মধ্যে উজ্জ্বলতম। IC 1613 ব্রহ্মাণ্ডটির দূরত্ব মাত্র 50 লক্ষ আলোকবর্ষের মধ্যে। তাই এটি আমাদের প্রতিবেশী। স্থানীয় বর্গের অন্তর্গত এই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তলের সঙ্গে প্রায় একই। অনিয়মিত এই গ্যালাক্সীটির গ্যাসীয় অঞ্চল বেশ কম। তবে, নতুন নক্ষত্র তৈরি হওয়ায় উপযুক্ত কিছু গ্যাসীয়পুঞ্জ রয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ডে।

NGC 6822 ব্রহ্মাণ্ড [NGC 6822 Galaxy] ঃ

ছায়াপথের নিকটতম প্রতিবেশীর নাম NGC 6822 গ্যালাক্সী। খুবই ছোট আকারের ব্রহ্মাণ্ড। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় তলের সঙ্গে প্রায় 30^0 কোণে এর অবস্থান [চিত্র নম্বর 38 দেখা যেতে পারে]। এটিকে দেখা যায় ধনুরাশির নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। বামনাকৃতি এই ব্রহ্মাণ্ডটির দূরত্ব প্রায় ৪0,000 আলোকবর্ষ। এটি স্থানীয় বর্গের অন্তর্গত। এটি আকাশের গায় $20' \times 10'$ [কৌণিক] জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। এটি খুবই অনুজ্জ্বল। এর ঔজ্জ্বল্য ৪.৪ মাত্র। এই ব্রহ্মাণ্ড অনিয়মিতাকার।

আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যাঞ্চলের স্ফীত অংশের সামান্য দূরে এই ব্রহ্মাণ্ডটির অবস্থান। একে 'ধনুরাশির বামন ব্রহ্মাণ্ড'ও [Sagittarius Dwarf Galaxy] বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হওয়ার সময় এটি ছায়াপথ থেকে বাইরে ছিটকে যায়। তা না হলে এটি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হয়েই থাকতো। এটির অবস্থানগত কারণে একে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পিছন দিকে থাকায় পৃথিবী থেকে এটিকে পর্যবেক্ষণ করা বেশ কষ্টকর। সম্ভবতঃ একটি বটিকাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে NGC 6822 ব্রহ্মাণ্ডটিতে। এই বামন ব্রহ্মাণ্ড লম্বাকৃতি এবং অনিয়মিত আকার। আবারো বলি, এটি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪0,000 আলোকবর্ষ।

এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত বটিকাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জটির নাম M 54 বা NGC 6715। এটি যে নিশ্চিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত তা কিন্তু বলা সম্ভব হয় নি। NGC 6822 এখন আলাদা একটি প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড হলেও ভবিষ্যতে এটি ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গুরু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ এবং লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘের মত ভবিষ্যতে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড এই গ্যালাক্সীটি গ্রাস করে ফেলতে পারে।

স্থানীয় বর্গের ব্যাসার্ধ 50 লক্ষ আলোকবর্ষ ধরে আমরা ছয়টি প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের কথা বললাম। ওই ব্যাসার্ধকে 1.5 কোটি আলোকবর্ষ ধরলে মোট 33টি প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আরেকটি উল্লেখ্য গ্যালাক্সী হল স্কালপটার ব্রহ্মাণ্ড [Sculptor Galaxy]। এটি একটি মুক্ত সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড [Open Spiral Galaxy]। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 1.3 কোটি আলোকবর্ষ [55 নম্বর চিত্র দেখুন]। স্কাল্‌পটাব নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এটিকে দেখা যায় বলে এর নাম 'স্কাল্‌পটার গ্যালাক্সী'।

55 নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে স্কাল্‌পটার গ্যালাক্সী [Sculptor Galaxy]। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর নাম NGC 253। এর দূরত্ব 1.3 কোটি আলোকবর্ষ। তুলনামূলকভাবে এই দূরত্ব ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অনেকটা কাছাকাছি। 1.5 কোটি আলোকবর্ষ অবধি ব্যাসার্ধ ধরলে এই গ্যালাক্সীটি আমাদের 'স্থানীয় বর্গ'-এর মধ্যে চলে আসে। সেক্ষেত্রে মোট 33টি গ্যালাক্সী স্থানীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্কাল্‌পটার নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আরেকটি গ্যালাক্সীকে দেখা যায়। এটি 'কার্টহুইল গ্যালাক্সী' [Cartwheel Galaxy]। এর দূরত্ব 50 কোটি আলোকবর্ষ। এর প্রান্তদেশে যে বলয় দেখা যায় তার ব্যাস প্রায় 1,50,000 আলোকবর্ষ। এটি একটি বামন ব্রহ্মাণ্ড। এটি পৃথিবী তথা ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহুদূরে। এর গঠন দেখে মনে হয়, এটি কিছুকাল আগে কোনও গ্যালাক্সীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়েছিল। তবে, এর কোনও ঘটনা আজ ঘটলে, তা পৃথিবীর নজরে আসবে প্রায় 50 কোটি বছর পরে। সুতরাং এর ক্ষেত্রে 'কিছুকাল আগে'-র অর্থ হল 50 কোটি বছরেরও বেশি আগে। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম MCG-06-02-022a।

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবেশীদের কথা শেষ করা যাক গ্যালাক্সীদের গঠন নিয়ে সামান্য কিছু কথা বলে। গ্যালাক্সীদের শরীর গঠিত হয় ছয়টি অংশের সমন্বয়ে। এই ছয়টি অংশ হল ঃ

(1) কেন্দ্রক [Nucleus], (2) কেন্দ্রীয় স্ফীত অঞ্চল [Central Bulge], (3) চাকতি [Disk], (4) সর্পিল বাহু [Spiral Arm], (5) গোলাকৃতি অংশ [Spherical Component], এবং (6) সুবিশাল জ্যোতির্বলয় [Massive Halo]। এই ছয়টি অংশ প্রতিটি গ্যালাক্সীতে যে একেবারে স্পষ্টভাবে থাকে তা নয়। কোনও ক্ষেত্রে একটি অন্যটির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে, সব গ্যালাক্সীরই এই ছয়টি অংশ স্পষ্টভাবে থাকে না।

সর্পিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্পিল বাহুগুলি সাধারণতঃ একটা সূত্র অনুসরণ করে। এই সূত্রটি হল ঃ

$$\log r = a - b\varphi$$

যেখানে, φ = অবস্থান কোণ, যা মাপা হয় গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে বাহুর বহিরতম অংশ অবধি।

a = একটি ধ্রুবক, b = অন্য একটি ধ্রুবক, r = গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব।

গ্যালাক্সীরা নানা আয়তনের, নানা আকৃতির। মহাবিশ্বে যেমন 5000 আলোকবর্ষ ব্যাসের GR8 ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তেমনি রয়েছে 3,00,000 আলোকবর্ষ ব্যাসবিশিষ্ট বিশাল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড। একটি গ্যালাক্সীর মোটামুটি ভর বের করা বেশ কঠিন। কারণ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে বেশ কিছু কৃষ্ণবস্তু যেগুলি অদৃশ্য। সুতরাং কোনও গ্যালাক্সীর দৃশ্য বস্তুগুলি দিয়ে তার যে ভর নির্ণয় করা হয় সে ভর তার প্রকৃত ভরের অনেকটাই কম। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, গ্যালাক্সীর ভর সূর্যের ভরের 1,00,000 গুণের থেকে 10^{12} গুণ বা এক লক্ষ কোটি গুণ হতে পারে। গ্যালাক্সীর ঔজ্জ্বল্যও এইভাবে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের 1,00,000 গুণ থেকে 2,000,000,000,000 বা 2×10^{12} গুণ হতে পারে। মহাবিশ্বে সবচেয়ে পুরাতন যেসব নক্ষত্র দেখা গেছে তাদের বয়স প্রায় 1600 কোটি [16×10^9] বছর। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বয়স 1600 কোটি বছর বলেই গণনা করা হয়েছে। মহাবিশ্বের বয়স ধরা হয় প্রায় 2000 কোটি [2×10^{10}] বছর। সারা বিশ্বের রাসায়নিক গঠন অদ্ভুতভাবে সমতাসম্পন্ন।

প্রায় প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি গোলাকার অংশ রয়েছে, যে অঞ্চলে থাকে পুরাতন নক্ষত্রেরা। এদের প্রান্তদেশে কিংবা বাহু অঞ্চলে থাকে নতুন নক্ষত্রেরা। এই অঞ্চলের গ্যাসীয় মণ্ডল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে নতুন তারার দল। অসংখ্যা ব্রহ্মাণ্ড ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের যেমন একটা 'স্থানীয় বর্গ' আছে, তেমনি খুব পরিচিত কয়েকটি ব্রহ্মাণ্ড গোষ্ঠী মহাকাশে রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিতে ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা বিভিন্ন রকম। কোনওটিতে ছয়টি-সাতটি, কোনওটিতে 30-40টি। এই ধরনের সাতটি স্থানীয়বর্গের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

সাতটি ব্রহ্মাণ্ডবর্গের কিছু তথ্য সম্বলিত তালিকা ●

নাম	দূরত্ব [আলোকবর্ষ]	ব্যাস [আলোকবর্ষ]	বর্ণনা
স্থানীয় বর্গ [Local Group]	—	3×10^6	ছোট্ট শিথিল গোষ্ঠী
M 81গোষ্ঠী [M 81 Group]	7×10^6	1×10^6	শিথিল গোষ্ঠী
ভার্গো গোষ্ঠী [Virgo Cluster]	50×10^6	7×10^6	বৃহৎ জটিল গোষ্ঠী
ফরম্যাক্স গোষ্ঠী [Fornax Cluster]	50×10^6	3×10^6	জটিল গোষ্ঠী
কোমা গোষ্ঠী [Coma Cluster]	150×10^6	23×10^6	বৃহৎ ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠী
হারকিউলিস্ গোষ্ঠী [Hercules Cluster]	240×10^6	7×10^6	বৃহৎ শিথিল গোষ্ঠী
করোনা বোরিয়ালিস গোষ্ঠী [Corona Borealis Cluster]	700×10^6	7×10^6	ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠী

তালিকা ঃ 3

● কিছু অতি পরিচিত ব্রহ্মাণ্ড গোষ্ঠীর সম্পর্কে পাওয়া কিছু তথ্য ●

আমাদেব স্থানীয় বর্গের ব্যাসার্ধ 50 লক্ষ আলোকবর্ষ ধরলে এতে অন্ততঃ ছোট-বড় 22টি গ্যালাক্সী

বর্তমান। এদের মধ্যে আছে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড, দুটি ম্যাগেল্লানীয় মেঘ এবং অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড। এদের সঙ্গে রয়েছে আরও ছোট 18টি গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড।

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কয়েক লক্ষ বিচিত্র দর্শন গ্যালাক্সী রয়েছে মহাবিশ্বে। এরই একটি নমুনা হল 56 নম্বর চিত্রটি। এটি 'কালো চোখ ব্রহ্মাণ্ড' [Black Eye Galaxy]। এটিকে পৃথিবী থেকে কালো চোখের মতই দেখায়। তাই এর এমন নামকরণ। এটি একটি আলাদা ব্রহ্মাণ্ড। এর দূরত্ব 2.4 কোটি আলোকবর্ষ। এর নিজের ব্যাস 65,000 আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে অনেকটাই ছোট। এটি একটি Sb ধরনের সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম M 64 বা NGC 4826। এর ঔজ্জ্বল্য +8.5। একে দেখা যায় Coma Berenices নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল 1779 সালে। এই ব্রহ্মাণ্ডটির আবিষ্কর্তা হলেন J. E Bode। এর অভ্যন্তরের সব তথ্য আজও অজানা। এই ধরনের বিচিত্র আকৃতির বহু গ্যালাক্সী রয়েছে আমাদের চতুর্দিকে।

একটু আগেই 'কার্টহুইল' ব্রহ্মাণ্ডের [Cartwheel Galaxy] কথা বলা হয়েছে। এটি দেখতে অনেকটা গরুর গাড়ীর চাকার মত। তাই এর এমন নামকরণ। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম হল MCG-06-02-022a। এরই অনুরূপ ব্রহ্মাণ্ড হল 'আংটি ব্রহ্মাণ্ড' Ring Galaxy]। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম NGC 4560A। এটি দেখতে অবিকল আংটির মত। তাই একে 'আংটি ব্রহ্মাণ্ড' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটি দেখা যায় 'নরঘোটক নক্ষত্রমণ্ডলী'র [Centaurus Constellation] মধ্য দিয়ে। একে খুব বড় দূরবীনের [VLT] সাহায্যে দেখা যায়। এটি সর্পিল কিংবা উপবৃত্তাকার কোনও ধরনের গ্যালাক্সীই নয়। এই গ্যালাক্সীর কেন্দ্রাঞ্চলের চারিদিক বেষ্টন করে রয়েছে নতুন তারা এবং গ্যাসীয়পুঞ্জের বলয়। এই বলয়টিও উজ্জ্বল। এই বলয় এবং এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল উভয়ে মিলে একে একটা আংটির রূপ দিয়েছে [চিত্র ঃ 57 দেখুন]।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আংটি-ব্রহ্মাণ্ড সাধারণতঃ ঘনত্ব-তরঙ্গের জন্য সৃষ্টি হয়, যখন একটি ক্ষুদ্রতর গ্যালাক্সী একটি বৃহত্তর গ্যালাক্সীর ভিতর দিয়ে যায়। এইভাবে দুই গ্যালাক্সীর সরাসরি সংঘর্ষে ঘনত্ব-তরঙ্গের প্রভাবে উৎপন্ন হয় এই ধরনের বলয়যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড বা আংটি-ব্রহ্মাণ্ড। বর্তমান আংটি-ব্রহ্মাণ্ডটিও সৃষ্টি হয়েছে দুটি গ্যালাক্সীর সংঘর্ষে, যাদের একটি বড় এবং অন্যটি ছোট। ছোট গ্যালাক্সীটি যেন বড়টির কেন্দ্রাঞ্চলের ভিতরে এসে ঢুকে গেছে। এই সংঘর্ষের ফলে তৈরি হয়েছে বলয় এবং ওই দুটি ব্রহ্মাণ্ড মিলে উৎপন্ন হয়েছে NGC 4560A-র উজ্জ্বল কেন্দ্রাঞ্চল।

কোয়াসার [Quasars] ঃ

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবেশীদের কথা শেষকরি কোয়াসারদের কথা বলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সীর মধ্যে খুঁজে পেলেন পদার্থের শক্তিতে রূপান্তরণের মুখ্য ঘটনা। তার তারকামণ্ডলীতে নিয়তই ঘটে চলা এই রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে শক্তির অবিরাম উৎপাদন ঘটছে এই মহাবিশ্বে। নক্ষত্রগুলিতে পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। গ্যালাক্সীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখলেন এই বিশ্বে এক একটি শক্তির উৎস এমন আছে যেগুলির শক্তি বিকিরণ নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই প্রবল শক্তিশালী শক্তির উৎস হল বেতার-ব্রহ্মাণ্ড [Radio Galaxy] এবং কোয়াসার [Quasar]। বিংশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে তাঁদের আবিষ্কারগুলি জন্ম দিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার, যার নাম 'উচ্চশক্তি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান' [High-energy Astrophysics]।

1958 সালেই মার্টিন রাইল [Martin Ryle] এমন কয়েকটি বিন্দুবৎ বেতারতরঙ্গ উৎস বা বেতার নক্ষত্র [Radio Star] আবিষ্কার করলেন যেগুলি তাঁর মতে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বহুদূরের মহাকাশে অবস্থিত। বাদে [Walter Baade], মিনকৌস্কি [Minkowski], ম্যাথিউস [T. Matthews], অ্যালান স্যান্ডেজ [Allan Sandage] প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্রমশই ধরা পড়তে থাকে যে, ওই ধরনের প্রত্যেকটি বেতার উৎসের অবস্থানবিন্দুতে দূরবীনের সাহায্যে পাওয়া যাচ্ছে, হয় একটি গ্যালাক্সী নয়তো একটি গ্যালাক্সীর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র, অনেকটা তারার মত আকৃতির একটি বস্তুকে। এই ক্ষুদ্র আকারের বস্তুটির নাম দেওয়া হল 'কোয়াসার'। এই নামটা এসেছে 'Quasi-stellar Radio Source' বা QSRS থেকে। বাংলায় একে বলা যায় 'আপাত নাক্ষত্র বেতার উৎস'। এগুলি থেকে

প্রচণ্ড শক্তিশালী বেতারতরঙ্গ যেমন নির্গত হয় তেমনি বিকিরিত হয় প্রবল আলো। এর থেকে নির্গত হয় শক্তিশালী এক্সরে বিকিরণও। এগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং এদের রয়েছে একটি নীলাভ সন্ততি [Continuum]। কোয়াসারদের প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও বিতর্ক বিদ্যমান।

বহুদূরের নক্ষত্রবৎ এই বস্তুগুলির প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক চলে প্রায় 1963 সাল থেকে 1973 সাল অবধি। 1963 সালে উজ্জ্বলতর 3C 273-কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, এদের বর্ণালির রেখাগুলি বেতার-ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণালি রেখাগুলির অনুরূপ হলেও এদের বর্ণালিতে এতো বেশি লোহিতাপসরণ [Redshift] যে তার ব্যাখ্যা করা খুবই মুশকিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে কোয়াসারগুলি এক একটি হেঁয়ালী হয়ে উঠলো। সেই হেঁয়ালী আজ অনেকটা কমলেও তা পুরোপুরি কাটে নি। মার্টেন স্মিড [Marten Schmidt] এর অনেকটা সঠিক ব্যাখ্যা দিলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়লেন। এর মূল কারণ হল ওই লোহিতাপসরণ। ওই লোহিতাপসরণ এতোই বেশি যে, হাবলের সূত্রানুযায়ী কোয়াসারদের অপসরণ বেগ পাওয়া গেল প্রতি সেকেন্ডে 90,000 কিলোমিটার বা 1,30,000 কিলোমিটার কিংবা 2,00,000 কিলোমিটার। কোয়াসারদের এই অবিশ্বাস্য অপসরণ বেগ বিতর্কের মূল কারণগুলির একটি হয়ে উঠলো। এমন কয়েকটি কোয়াসার পাওয়া গেল, যেগুলির গতিবেগ তাদের বর্ণালির লোহিতাপসরণ থেকে হিসাব করে দাঁড়ালো প্রতি সেকেন্ডে 2,70,000 কিলোমিটার, যা আলোর গতিবেগের 90%। আবার OQ 172 কোয়াসারটির লোহিতাপসরণ নির্দেশ করছে যে, ওই কোয়াসারটি আলোর বেগের নব্বই শতাংশেরও বেশি বেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কোয়াসারদের অদ্ভুত আশ্চর্যজনক গুণাবলী রয়েছে। এদের আয়তন আমাদের সৌরমণ্ডলের আয়তনের প্রায় সমান। আকারে ছোট হলে কী হয়, এর থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ নির্গত হয় তার পরিমাণ একটা গ্যালাক্সীর মোট বিকিরণের প্রায় 100 গুণ। কোয়াসারগুলি উষ্ণ গ্যাস, শীতলতর গ্যাস এবং ধূলিকণার জটিল মিশ্রণে তৈরি। এর ঔজ্জ্বল্য এবং বিকিরণ মাত্রা দেখে মনে করা হয়, এগুলির অবস্থান কোন না কোনও কৃষ্ণগহ্বরের পাশে। এতাবৎ আমরা যে সব কোয়াসারদের পেয়েছি তাদের দূরত্ব প্রায় 200 কোটি আলোকবর্ষ থেকে 1000 কোটি আলোকবর্ষ। অর্থাৎ কোয়াসারগুলিকে এখন যেভাবে দেখছি তা তাদের 200 কোটি থেকে 1000 কোটি বছর আগের অবস্থা। কোয়াসারগুলি আমাদের থেকে বহুদূরে অবস্থিত। বিশ্বসৃষ্টির প্রায় প্রাথমিককালে কোয়াসারগুলির সৃষ্টি। বিশ্বের প্রকৃত বয়স এখনও নির্দিষ্ট করে সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয় নি বলেই কোয়াসারগুলি ঠিক কত শত কোটি বছর আগে সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল তা বলা যায় না। তবে এগুলির বর্তমান অবস্থান বহু দূরবর্তী প্রাচীন গ্যালাক্সীগুলিতে, যেগুলির বয়স সাধারণতঃ 1000 কোটি বছর বা তারও বেশি।

কোয়াসারদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি যেহেতু বিশ্বসৃষ্টির প্রথমদিকে তৈরি হয়েছিল, এদের অনুসন্ধান থেকেই জানা যেতে পারে মহাবিশ্বের বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস। এদের দূরত্ব বিস্ময়করভাবে বিশাল। আবার এগুলি এতো প্রবলভাবে উজ্জ্বল যে, ওই অত দূর থেকে ওদের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে। এটাও বিস্ময়ের। আবার এদের ব্যাস সাধারণতঃ গ্যালাক্সীদের গড় ব্যাসের হাজার ভাগেরও কম বলে বলা হচ্ছে। তাহলে, তার থেকে এতো আলো, এতো বিকিরণ নির্গত হচ্ছে কেমন করে? এদের এই বিপুল বিকীর্ণ শক্তির উৎস বা কি? ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছাকাছি অঞ্চলে কোয়াসারদের পাওয়া যায় নি। কেন পাওয়া যায় না তা অব্যাখ্যাত। কোয়াসার সম্ভবতঃ মহাবিশ্বের অতীতকালের বস্তু। কোয়াসারের সৃষ্টিকাল যদি 200 কোটি বছরও হয়, তবে এই 200 কোটি বছরে নিকট কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোয়াসার উৎপন্ন হয় নি কেন? এই সব নানা প্রশ্ন ভিড় করে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে। তাহলে কি এখন আর কোয়াসার তৈরি হচ্ছে না, কিংবা আজকের বিশ্ব এমনভাবে বদলে গেছে যে কোয়াসারদের সৃষ্টি আর সম্ভব হচ্ছে না? বিশ্ব কি আর আগের মত নেই? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন একালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মহাবিশ্বের গঠন এবং তার বিবর্তনের প্রকৃত ইতিহাস বলা যেতে পারে, কোয়াসারদের সম্পর্কে ওঠা এই সব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া গেলে।

1963-64 সালেই অধিকাংশ বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বিশ্ব সমভাবাপন্ন নয়, মহাবিশ্ব পরিবর্তমান এবং বিবর্তনশীল। যেকোনও কারণেই হোক কোয়াসাররা এখন আর তৈরি হচ্ছে না।

কোয়াসারদের ক্ষুদ্র আকার, বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য, প্রবল শক্তি বিকিরণ এবং অস্বাভাবিক দূরত্ব আজও বিশাল বিস্ময়ের। এইসব বিস্ময়কর রহস্যের সমাধান হলে হয়ত মহাবিশ্বকে নতুন করে জানা সম্ভব হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোয়াসারদের নিয়ে গবেষণা করছেন। ফলাফল সম্ভবতঃ অতি শীঘ্রই পাওয়া যাবে। এর থেকেই মহাবিশ্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হয়ত সঠিকভাবেই জানা যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওফ্রে বারবিজ [Geoffrey Burbidge] প্রমুখ কিছু বিজ্ঞানী বলছেন যে, কোয়াসারদের আলোর বর্ণালিতে যে অত্যধিক লোহিতাপসরণ দেখা যাচ্ছে তা ওদের গতিবেগের জন্য নয়, এটা ঘটছে ওদের প্রচণ্ড অভিকর্ষের জন্য। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বলছে, কোনও শক্তিশালী মহাকর্ষক্ষেত্র থেকে নির্গত আলোর শক্তি কিছুটা কমে যায়। এই নির্গত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এর ফলে নির্গত আলো সামগ্রিকভাবে কিছুটা লালচে হয়ে যায়। এই ঘটনার নাম 'মহাকর্ষজনিত লোহিতাপসরণ' [Gravitational Red-shift]। এর অন্য নাম 'আইনস্টাইনীয় সরণ' [Einstein Shift]। এই আইনস্টাইনীয় সরণের জন্যই কোয়াসারদের আলোর বর্ণালিতে 'লোহিতাপসরণ' বা 'লাল-সরণ' এতোটাই বেশি দেখা যায়।

বারবিজরা বললেন যে, কোয়াসারগুলি সম্ভবতঃ বিপুলকায় এবং অসাধারণ ঘনত্ব সম্পন্ন। এদের দানবীয় অভিকর্ষ থেকে বের হতে গিয়ে আলোর শক্তি [$E = h\nu$] খানিকটা কমেই যাচ্ছে। ফলে, নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক [ν] কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ওই আলো লালচে হয়ে যাচ্ছে। হয়ত আত্মাভিকর্ষের কারণেই লাল-সরণ অমন বেশি হচ্ছে, ওই আলোর বর্ণালিতে। ওঁদের মতে ওই অবিশ্বাস্য লাল-সরণ ঘটছে অভিকর্ষের কারণে, কোয়াসারটির প্রবল গতিবেগের জন্য নয়। ওই বিস্ময়কর লোহিতাপসরণের কারণ মহাকর্ষ, গতিবেগ বা অপসরণ বেগ নয়।

আবার এমনও হতে পারে, কোয়াসারেরা যেহেতু বহু দূরে দূরে আছে, তাদের অবস্থান মহাবিশ্বের প্রান্তের দিকে অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে দূরতম অবস্থানে তাই তাদের গতিবেগ আলোর কাছাকাছি হয়ে গেছে। আইনস্টাইনীয় পরিকাঠামোয় ওগুলি আলোর বেগের কাছাকাছি আসায় ওগুলির ভর অমন বিশাল হয়েছে এবং শক্তির বিকিরণ অমন প্রবল। কিন্তু কোয়াসারদের গতিবেগ কখনও আলোর সমান কিংবা তার চেয়ে বেশি হতে পারবে না অন্ততঃ আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে। সুতরাং মহাবিশ্বের প্রসারণ একসময় থামবে এবং শুরু হবে মহাসংকোচন—সৃষ্টি কালের সেই আদিম বিন্দুতে বা অনন্যতায় ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন কোয়াসারদের পাশেই আছে কৃষ্ণগহ্বর এবং কোয়াসারগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে চলেছে। এমনও হতে পারে, সব গ্যালাক্সীই একদিন হয়ত কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। মহাবিশ্ব জুড়ে সেদিন থাকবে শুধু কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব। তারও পর ক্রমসংকোচনে একদিন মহাবিশ্ব চলে যাবে একটি বিন্দুবৎ অনন্যতায় অথবা চিরপ্রসারমান মহাশূন্যে ক্ষীণভাবে ছড়ানো কতকগুলি কৃষ্ণগহ্বরই হবে তার শেষ পরিণতি। 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' মানলে মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি হবে মহাজাগতিক অণ্ডে কিংবা কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিন্দুবৎ অনন্যতায়। আর চিরসম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব মানলে চিরপ্রসারমান মহাবিশ্ব একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তা হবে বেশ কিছু সংখ্যক কৃষ্ণগহ্বরের সমষ্টি।

58 নম্বর চিত্রের কোয়াসারগুলি দেখাচ্ছে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রের উজ্জ্বল কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া। প্রতিটি কোয়াসারকে শক্তি যোগাচ্ছে সম্ভবতঃ কেন্দ্রকীয় কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হওয়া মহাজাগতিক বস্তুসমূহ। এই কৃষ্ণগহ্বরগুলি অতীব বিশাল ভরসম্পন্ন এবং এরা মহাজাগতিক বস্তুসমূহকে গ্রাস করে চলেছে।

কোয়াসাররা বহু দূরের প্রতিবেশী এবং মহাবিশ্বের সুদূর অতীতের ঘটনা। এরা সম্ভবতঃ গ্যালাক্সী গঠিত হওয়ার আমলে উৎপন্ন হয়েছিল। এরা তাই গ্যালাক্সী গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের নিদর্শন হতে পারে। হয়তো এই আদি পর্যায়ে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে প্রবল অভিকর্ষজনিত সংকোচন ঘটে—যার ফলে ওই বিক্ষুব্ধ কেন্দ্র থেকে ওই অস্বাভাবিক পরিমাণ এক্সরে, বেতারতরঙ্গ ও আলোকরশ্মি নির্গত হয়। এমনও হতে পারে, ওই প্রবল বিক্ষোভের প্রাবল্য এক সময় প্রশমিত হয় এবং গ্যালাক্সীর কেন্দ্রস্থ কোয়াসারের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য কমে আসে। সম্ভবতঃ এই রকম ঘটনায় গ্যালাক্সীটি আমাদের ছায়াপথ কিংবা M 31-এর মতো একটা আপেক্ষিক ভারসাম্যের অবস্থায় চলে আসে। তবে এই সব সিদ্ধান্ত এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীদের আমরা এখনও তাই ঠিকঠাক জেনে উঠতে পারি নি। ●

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্রের জন্মমৃত্যু

[এই পরিচ্ছেদে আছে নক্ষত্রের জন্মমৃত্যুর কথা—'চন্দ্রশেখর সীমা'—শ্বেত বামন, নিউট্রন তারা বা পালসার, সুপারনোভা, কৃষ্ণগহ্বর প্রভৃতির কথা, তাদের সৃষ্টির অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এখানে আকাশের কুড়িটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের কথা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে আমাদের কাছাকাছি থাকা কুড়িটি নক্ষত্রের কথা। নক্ষত্রদের O,B,A,F,G,K এবং M শ্রেণিবিভাগ যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে H-R পরিলেখর কথা ও তার ব্যবহার। আবার সৌরমণ্ডলের গ্রহদের উজ্জ্বলতা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। নক্ষত্রের সৃষ্টি থেকে শুরু করে কৃষ্ণগহ্বরে তার বিবর্তন অবধি তার নানা পরিবর্তনের কথা বোঝানো হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। নক্ষত্রের জীবনমৃত্যুর বৈজ্ঞানিক খতিয়ান রয়েছে এখানে। শ্বেতগহ্বর, কীটগহ্বরেরা কি বাস্তব সত্য?]

তাপ ও অন্যান্য ধরনের শক্তির নির্গমনকারী দীপ্তিমান গাগনিক গ্যাসীয় বস্তু হল নক্ষত্র। ওই বিকিরিত শক্তির উৎস হল ওই বস্তুর অভ্যন্তরের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া [Thermonuclear Reaction] । মহাকাশে রয়েছে নক্ষত্রেরা, আর বেশ কিছু নক্ষত্র মিলে তৈরি হয়েছে মহাজাগতিক দ্বীপ। এই মহাজাগতিক দ্বীপগুলিকে আমরা বলি 'গ্যালাক্সী' [Galaxy]। এইরকম প্রায় দশ কোটিরও বেশি গ্যালাক্সী নিয়ে বর্তমান রয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। যদিও প্রতিটি নক্ষত্রেরই গুণাগুণ অন্যটির চেয়ে কমবেশি আলাদা, তবু আমাদের সূর্যকে বলা যায় সাধারণ নক্ষত্রগুলির আদর্শ নমুনা। এই পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব নক্ষত্রদের প্রকৃতি, তাদের গুণাবলী নির্ণয়ের পদ্ধতি, তাদের শক্তির উৎস এবং তাদের জন্মমৃত্যুর কাহিনী।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই নক্ষত্রেরা মানুষের কাছে এক বিস্ময়। সে সময় নক্ষত্রের স্বরূপ কী, তা যেমন তারা জানতো না, তেমনি নক্ষত্রের প্রকৃতি ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা এক বিষয়। তাদের কল্পনায় তখন নক্ষত্র ছিল পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকা নানা আকারের স্ফটিক গোলক [Crystal Sphere]। অনেকে আবার মনে করতো, মহাকাশের কালো মোড়কে মাঝে মাঝে ছিদ্র আছে। সেইসব ছিদ্র দিয়ে স্বর্গীয় জ্যোতি পৃথিবীতে আসছে। আর এই আলোই নক্ষত্র হ'য়ে প্রতিভাত হচ্ছে। নক্ষত্রেরা যে সূর্যের অনুরূপ এবং তারা পৃথিবী থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত এই ধারণা পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময়ই কোপারনিকাস বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। আমাদের দেশে এই ধারণা সত্য বলে প্রমাণ করা হয় প্রায় দেড় হাজার বছর আগে—আচার্য আর্যভটের আমলে। এদেশে নক্ষত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্ততঃ হাজার চারেক বছর আগে। নক্ষত্রদের আপেক্ষিকভাবে স্থির ধরে আকাশ-গোলককে বারোটি সমান ভাগে ভাগ করে রাশিচক্রের প্রবর্তন এদেশেই করা হয়েছিল প্রায় 4500 বছর আগে। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ ছিল আমাদের এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে নক্ষত্র ধারণা কীভাবে বিদ্যমান তার কিছুটা বিশদ আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী পরিচ্ছেদে। আবার ফিরে আসি কোপারনিকাসদের কথায়।

টাইকোব্রাহে হলেন পাশ্চাত্যের প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি নানা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করে

দেখালেন যে, নক্ষত্রের লম্বন প্রভাব [Parallax Effect] নেই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি এক একটি নক্ষত্রকে পৃথিবীর গতিপথের একদিক থেকে এবং ছয়মাস পরে তার ঠিক বিপরীত দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, নক্ষত্রেরা লম্বন প্রভাবহীন। দেখা গেল, আকাশে নক্ষত্রেরা প্রায় স্থির। দূরবর্তী কোনও বস্তুকে দর্শক যেমন স্থির দেখে, দর্শকের সামান্য স্থান পরিবর্তনের ফলে বস্তুটির অবস্থানের তারতম্য যেমন পর্যবেক্ষণ করা যায় না, তেমনি নক্ষত্রেরা পৃথিবী থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থান করায় তাদের স্থির বলেই মনে হয়। অনেক দিন পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে, নব আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল, সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি থাকা কিছু নক্ষত্রের সরণ ঘটছে। সে সরণ ওই সব যন্ত্রেব সাহায্যে পরিমাপ করাও সম্ভব হল। এখন আমরা সবাই জানি, এই মহাবিশ্বে কোনও বস্তুই স্থির নয়, সবই চলমান। মহাবিশ্ব তাই দর্শনের ভাষায় 'জগৎ'—চলমান বিশ্ব। দূরবর্তী নক্ষত্রদের এই সরণ আমাদের পৃথিবীর তথা সৌরমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে এতই ধীর যে, আমাদের কাছে নক্ষত্রেরা স্থির বলেই প্রতিভাত হয়।

মেঘহীন এবং চন্দ্রহীন রাতের আকাশে তাকালে মনে হয় আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র দেখছি। প্রকৃতপক্ষে, এই রকম পর্যবেক্ষণে খালি চোখে 6000-টির বেশি নক্ষত্র দেখা যায় না এবং একসঙ্গে কোনও একজন পর্যবেক্ষক প্রায় তিন হাজারের মত নক্ষত্র খালি চোখে দেখতে পায়। প্রতি গোলার্ধে 6000 করে নক্ষত্র খালি চোখে দেখা গেলে দুই গোলার্ধ মিলে খালি চোখে দেখতে পাওয়া নক্ষত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় 12,000 এবং একটা ভাল বাইনোকুলারের সাহায্য নিলে এই সংখ্যাটা প্রায় একলক্ষ ছাড়িয়ে যায়। অবার বেশ শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে আকাশের ছবি তুললে ছবিগুলিতে প্রায় একশো কোটি [10^9] নক্ষত্র ধরা পড়ে। খালি চোখে কিংবা দূরবীনের সাহায্যে যে সব নক্ষত্র দেখার কথা বলা হল সেগুলি সব আমাদের গ্যালাক্সীর, যার নাম Milkyway Galaxy বা 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড'। এরকম আরও অসংখ্য গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে মহাবিশ্বে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডটিতে রয়েছে প্রায় দশ হাজার কোটি [10^{11}] ছোট-বড় নক্ষত্র। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীর সংখ্যা প্রায় দশ কোটি [10^8]। তবে এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। কারণ, 450 কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হলেও, এই প্রথম কোনও নক্ষত্রমণ্ডলীর আলো এসে পৃথিবীতে পৌঁছালো এমন ঘটনা মোটেই বিরল নয়। অর্থাৎ ওই ব্রহ্মাণ্ডটির অবস্থান আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে কমপক্ষে 450 কোটি আলোকবর্ষ দূরে। এক আলোকবর্ষ হল 9.46×10^{12} কিলোমিটার। সুতরাং 450 কোটি আলোকবর্ষ হল 425.7×10^{20} কিলোমিটার। কী বিশাল এই দূরত্ব! এর বাইরেও আরো অনেক ব্রহ্মাণ্ড থাকতে পারে, যাদের আলো আমাদের পৃথিবীতে আজও এসে পৌঁছায় নি। আলো রওনা দিয়েছে, এসে পৌঁছাতে পারে নি। পৌঁছাবে অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে। এই মহাবিশ্ব যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল তার ব্রহ্মাণ্ডগুলির সংখ্যা। সবই যেন বুদ্ধি-বিচার তথা কল্পনারও অতীত!

আকাশে তারার ঝিকিমিকির কারণ মূলতঃ দুটি। পৃথিবীর বয়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনশীলতা এবং পৃথিবী থেকে নক্ষত্রদের বিশাল দূরত্ব। গ্রহগুলির দূরত্ব কম থাকায় আকাশে গ্রহগুলি ঝিকমিক করে না। প্রবল দূরত্বের জন্য নক্ষত্রগুলিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দীপের মত দেখায়। বায়ুমণ্ডলে শোষণ, বিচ্ছুরণ ইত্যাদির কারণে তাদের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ফলে, নক্ষত্রেরা ঝিকিমিকি করে। গ্রহগুলির দূরত্ব তুলনামূলকভাবে খুবই কম হওয়ায় ওদের পৃথিবী থেকে চাকতির মত দেখায়। ওই চাকতির প্রতিটি বিন্দু থেকে যে গড় ঝিকমিকি তৈরি হয় তা পরস্পরকে প্রশমিত করে। গ্রহদের আলোকিত চাকতির আকৃতি বিন্দুবৎ নাক্ষত্রিক আলোক উৎসের চেয়ে অনেকটাই বড় হওয়ায় গ্রহদের ঝিকমিক করতে

দেখা যায় না। তবে দিক চক্রবালের দিকে অবস্থান করা কোন গ্রহকে অনেক সময় ঝিকমিক করতে দেখা যায়। তার কারণ হল, ওই অবস্থানে গ্রহ থেকে আসা আলোকে অনেক বেশি বায়ুস্তর অতিক্রম করতে হয়। ওই রকম অবস্থানে গ্রহেরাও ঝিকমিক করে।

নক্ষত্রেরা রয়েছে পৃথিবী থেকে বহুদূরে। নানা দূরত্বে তাদের অবস্থান। এইসব দূরত্ব মাপতে বিজ্ঞানীরা নানা একক ব্যবহার করেন। যেমন, আলোকবর্ষ, পার্সেক [Parsec], কিলোপার্সেক, মেগাপার্সেক ইত্যাদি। আবার সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বেশি দূরত্বকেও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপবার একক ধরা হয়ে থাকে। আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে 1,86,282 মাইল বা 2,99,776 কিলোমিটার। সাধারণ হিসাবে আলোর গতিবেগ ধরা হয় তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে বা 3×10^5 কিলোমিটার / সেকেন্ড। প্লুটো থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় প্রায় পাঁচ ঘন্টা। নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে পৃথিবী থেকে কিংবা সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বকে একক হিসাবে ধরে ঠিকঠাকভাবে কাজ চলে না। নক্ষত্রদের বিশাল দূরত্বের তুলনায় এই একক খুবই ক্ষুদ্র। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হল 'আলফা সেন্টাউরি' [Alpha Centauri]। এই নিকটতম নক্ষত্রটি থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় চার বছরের কিছুটা বেশি। সুতরাং এটির দূরত্ব চার অলোকবর্ষের সামান্য বেশি। আলো তার প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে সময় নেয় প্রায় এক লক্ষ [10^5] বছর। সুতরাং অন্যান্য গ্যালক্সীর দূরত্ব মাপতে একক নিতে হবে দশ লক্ষ কিংবা এক কোটি আলোকবর্ষ। আগেই বলেছি, এমনও ব্রহ্মাণ্ড আছে যেখান থেকে এই কিছুদিন আগে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে তার নক্ষত্রের আলো। ওই ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব পৃথিবী থেকে কমপক্ষে 450 কোটি আলোকবর্ষ। কারণ, পৃথিবীর বয়স প্রায় 450 কোটি বছর।

এতাবৎ আবিষ্কৃত প্রায় দশ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে ব্রহ্মাণ্ড, সেটি আমাদের নিজেদের ব্রহ্মাণ্ড, যার নাম ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড। এতে রয়েছে প্রায় 10,000 কোটি নক্ষত্র। রাতের পরিষ্কার আকাশে এর অনেকটাই দেখা যায়। একটা নক্ষত্রখচিত পথ এক বিশাল ফিতার মত আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা চলে গেছে, কিছু কিছু অংশ তার যেন ধোঁয়াশা ঢাকা। এই নক্ষত্র-পথই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ। এই ব্রহ্মাণ্ডেই রয়েছে আমাদের সৌরমণ্ডল, আমাদের প্রিয় পৃথিবী এবং আমরা। একালে গ্যালিলিওই প্রথম বলেছিলেন, এই অলোক-বন্ধনী অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি কিংবা সমাহার। পরে জানা গেল, অসংখ্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছে এই ছায়াপথ। এই নক্ষত্রেরা মেনে চলেছে মহাকর্ষ-সূত্র। অবস্থান করছে মহাকর্ষ-নিয়ম মেনেই। আরো পরে জানা গেছে, এই ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রই শুধু আছে তা নয়, আছে মহাজাগতিক ধূলিকণা, মহাজাগতিক রশ্মি [Cosmic Rays] এবং আছে চৌম্বক ক্ষেত্রও [Magnetic Field] । 1924-27 খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বের্টিল লিন্ডব্ল্যাড [Bertil Lindblad] এবং ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ জ্যান আউট [Jan Oot] আবিষ্কার করেন আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান। 1952 সালে আবিষ্কৃত হল ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড সর্পিল [Spiral]। এর প্রান্তদেশগুলিতে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন তরুণ নক্ষত্র। সব মিলিয়ে জানা গেল, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস এক লক্ষ আলোকবর্ষ, অর্থাৎ এর ব্যাসার্ধ হল 50,000 আলোকবর্ষ।

আমাদের সৌরমণ্ডল এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে প্রায় 33,000 আলোকবর্ষ [মতান্তরে, 26,500 আলোকবর্ষ] দূরে এবং গ্যালাক্সীর প্রান্ত থেকে 17,000 আলোকবর্ষ অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিজ্ঞানীরা এটা জেনেছেন যে, সাধারণতঃ গ্যালাক্সীর প্রান্তের দিকেই নতুন নতুন নক্ষত্র জন্ম নেয়। বেশিরভাগ তরুণ বা কম-বয়েসী নক্ষত্রের অবস্থান ছায়াপথের প্রান্তের দিকে। ছায়াপথের কেন্দ্রের

কাছাকাছি সব নক্ষত্রই বয়েসে প্রবীণতর, প্রান্তদেশের নক্ষত্রদের তুলনায় বয়োবৃদ্ধ। এর কারণ আজও অজানা এবং এই তত্ত্ব, এ যাবৎ আবিষ্কৃত সব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন ধরেই নিয়েছেন যে, গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে সাধারণতঃ কোনও নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয় না, বরং বেশির ভাগ মৃত নক্ষত্র বা কৃষ্ণ গহ্বর [Black Hole] গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করে। ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব মাপতে এখন আলোকবর্ষ কিংবা পার্সেক দিয়ে আর কাজ চলে না। শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কারের ফলে বহুদূরের নতুন নতুন ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তাদের বিশাল দূরত্ব এখন কেবল আলোকবর্ষ ও পার্সেক দিয়ে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানীরা এইসব নাক্ষত্রিক এবং মহাজাগতিক দূরত্বগুলি মাপতে যে সব একক এখন ব্যবহার করছেন সেগুলি হল ঃ

[1] 1 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 14.95×10^7 কিমি [প্রায়] [Astronomical Unit]

[2] 2,06,265 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 1 পার্সেক = $30,85,72,440 \times 10^5$ কিলোমিটার।

[3] 63,240 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 1 আলোকবর্ষ = 9.4608×10^{12} কিলোমিটার

[4] 2,06,265,000 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 1 কিলোপার্সেক।
= $30,85,72,440 \times 10^8$ কিলোমিটার।

[5] 2,06,265,000,000 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক = 1 মেগা-পার্সেক [Mega-parsec]
= 308×10^{17} কিলোমিটার [প্রায়]

আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস হল এক লক্ষ আলোকবর্ষ, অর্থাৎ $10^5 \times 9.46 \times 10^{12}$ কিলোমিটার বা 9.46×10^{17} কিলোমিটার। সুতরাং এক মেগা-পার্সেক দূরত্ব হল আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসের প্রায় 32.56 গুণ। আমাদের সৌরমণ্ডল এই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারিদিকে একবার পরিক্রম করতে সময় নেয় প্রায় 20 কোটি [মতান্তরে, 25 কোটি] পার্থিব বৎসর। এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 155 মাইল বা 250 কিলোমিটার।

মহাবিশ্বের মূল উপাদানগুলির একটি হল নক্ষত্র। মহাকাশের বিশাল বিশাল গ্যাসীয়পুঞ্জ থেকে ধূলিকণার সহযোগে তৈরি হয় নক্ষত্র। এই মহাজাগতিক গ্যাস এবং ধূলিকণা উভয়েই মহাবিশ্বের অন্য দুটি মূল উপাদান। নক্ষত্রেরা জন্মায় এবং তাদের মৃত্যুও হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করবো নক্ষত্রের জন্ম-মৃতু নিয়ে। নক্ষত্র জীবনের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করলে আমরা বিশ্ব-রহস্যের অনেকটাই জানতে পারবো। নক্ষত্রের জীবন-চর্যার জ্ঞান আমাদের জানিয়ে দেয় মহাবিশ্বের অনেক অজানা তথ্য। এমন কি বিশ্বসৃষ্টি ও তার বিবর্তন এবং ব্রহ্মাণ্ডগুলি সৃষ্টির স্বরূপও আমরা জানতে পারি নাক্ষত্র জীবনের বিবর্তনের পর্যালোচনা করে। কোটি কোটি নক্ষত্র দিয়ে সমৃদ্ধ মহাবিশ্বের বহু অজানা তথ্য এখন নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুর পর্যালোচনা থেকেই পাওয়া যায়। মহাবিশ্বকে জানতে তার অন্যতম উপাদান নক্ষত্রের বিবর্তনকে জানা প্রয়োজন। পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা এই বিবর্তনকে জানার চেষ্টা করে চলেছে। গত 70 বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানের এই শাখাটি খুবই সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সমৃদ্ধতর হচ্ছে। এই শাখাটি হল 'নাক্ষত্র জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান' [Stellar Astrophysics]। বা সংক্ষেপে 'নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞান'।

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুর আলোচনায় আমরা প্রথমে আসবো চন্দ্রশেখরের [Subramhanyan Chandrasekhar] আবিষ্কারের কথায়। তারপর তাঁর অনন্য আবিষ্কারের সামান্যীকরণ করে নাক্ষত্র বিবর্তনের একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করব। নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো যে, পদার্থবিজ্ঞানের এই শাখাটি এখন বিশাল রূপ নিয়েছে। বর্তমান ক্ষুদ্র পরিসরে তার

পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব। নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞানের যে অংশটুকু চন্দ্রশেখরের আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত তার আলোচনায় এলেই নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

প্রসঙ্গতঃ এও বলা ভালো যে, নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞানের এই বিশালত্বের অন্যতম রূপকার হলেন চন্দ্রশেখর। নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সভায় মহিমান্বিত আসন দেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর বা সুব্রহ্মণ্যন্ চন্দ্রশেখর।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ারদিকে বিশেষতঃ বিশের দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে এক ধরনের তারা বা নক্ষত্র বিশেষ অলোড়ন তুলেছিল এবং চন্দ্রশেখর যখন গবেষণা শুরু করেন তখনও সে আলোড়ন থিতিয়ে যায় নি, কারণ তার বৈশিষ্ট্যগুলির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা তখনও পাওয়া যায় নি। এই তারা বা নক্ষত্রগুলির বহির্মণ্ডলীয় তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের ঔজ্জ্বল্য ছিল অস্বাভাবিক রকম কম। এই জন্য এরা খুব কম পরিমাণ আলো বিকিরণ করে। আকৃতিতে এরা গ্রহদের মতই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রাকৃতির জন্যই এদের নাম দেওয়া হয় 'বামন-তারা' (Dwarf Star) । সাদা বামন [White Dwarf] তারাদের ভর কিন্তু দেখা গেল প্রায় আমাদের সূর্যের সমান। সুতরাং এটা বোঝা গেল এই সব বামন তারাদের ভর বিশাল কিন্তু আয়তন খুবই কম। তাই এর ঘনত্ব যথা নিয়ম হবে জলের ঘনত্বের কয়েক লক্ষগুণ। সাদা বামন-তারাদের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল রহস্যময়। চন্দ্রশেখর এই রকম একটা সময়েই সাদা বামনদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এখন আমরা জানি সাদা বামন তারাগুলি নক্ষত্রের জীবনের শেষ দশা বা শেষ অবস্থা। তারারা কীভাবে ক্রমশঃ এই অবস্থায় আসে তা আমরা এখন জেনেছি উইলিয়াম আলফ্রেড ফাউলারের আবিষ্কৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে। এই ফাউলারই চন্দ্রশেখরের সঙ্গে একযোগে 1983 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে, কোনও নক্ষত্র তার জীবন শুরু করে বিশাল আয়তনের গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ হিসাবে। উপযুক্ত অবস্থায় এই গ্যাসীয় মেঘ ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকে এবং নক্ষত্রের প্রাথমিক অবস্থায় আসে। এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'Protostar' বা 'আদি-নক্ষত্র'। নক্ষত্রের এই প্রারম্ভিক অবস্থায় এর মূল শক্তির উৎস হলো মহাকর্ষীয় শক্তি, যা উৎপন্ন হয় ওই গ্যাসপিণ্ডের ক্রমসংকোচনের ফলে। 'Protostar'-এ যা মহাকর্ষীয় শক্তি উৎপন্ন হয় তার অর্ধেকটা সঞ্চিত থাকে নক্ষত্রের নিজের ব্যবহারের জন্য। এই জমা হওয়া শক্তি Protostar-এর বস্তুগুলিকে উত্তপ্ত করে। ফলে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এবং চাপ দুটোই বাড়তে থাকে। এইভাবে যখন আদি-নক্ষত্র বা Protostar-এর অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা 10 লক্ষ ডিগ্রি কেলভিন $[(10^6)^0K]$-এর বেশি হয় এবং ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় 100 গুণ হয়, তখন নিউক্লীয় বিক্রিয়া [Nuclear Reaction) শুরু হয় এবং এই বিক্রিয়াই নক্ষত্রের শক্তির উৎস। ধীরে ধীরে Protostar-এর অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যখন এর মহাকর্ষীয় সংকোচন (Gravitational Contraction) বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় Protostar-টি একটি পরিপূর্ণ নক্ষত্রে বা তারায় পরিণত হয়।

আরেকটু বিস্তৃতভাবে বললে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়। মহাকাশে বিশালায়তন গ্যাস ও ধূলিকণা নক্ষত্র জন্মের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় এক জায়গায় জড়ো হয় এবং অনুকূল অবস্থায় সেই বিশাল আয়তনের গ্যাস ও ধূলিকণা নিজের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে। এই অবস্থায় এটা নক্ষত্র হয়ে ওঠে না। কিন্তু এটা নক্ষত্রের প্রারম্ভিক অবস্থা বলেই এর নাম 'Protostar' বা আদি-নক্ষত্র দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় এর অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল হয় না। অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, যা নাকি নক্ষত্রের

স্বাভাবিক শক্তির উৎস, সে ব্যবস্থা তখন ওর মধ্যে গড়ে ওঠে না। আবারও বলি, নক্ষত্রের প্রারম্ভিক অবস্থায় শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় না। এটা শুরু হয় প্রারম্ভিক অবস্থা পার হওয়ার পর। এর অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এটিকে বলা হয় Star বা নক্ষত্র। তার আগে অবধি এটি Protostar বা আদি-নক্ষত্র।

Protostar তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মহাজাগতিক গ্যাসীয় পদার্থের প্রয়োজন। এই গ্যাসীয় পদার্থের মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু। ধূলিকণাগুলির ভর মোটামুটি Protostar-এর ভরের শতকরা একভাগ হয়ে থাকে। এই মহাজাগতিক ধূলিকণা গ্রাফাইট কণা [Graphite-particles] ও সাধারণ বরফকণা দিয়ে তৈরি হয়। বরফ তৈরি হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগের ফলে। সম্ভবতঃ কিছু সিলিকেট কণাও এই বরফের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। এই ধরনের বস্তুদের অধুনা আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের [Milkyway Galaxy) কয়েকশো 'পারসেক' (Parsec)-এর মধ্যেই আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। ছায়াপথ সৃষ্টিকালীন এই গ্যাস ও ধূলিকণারা আরও বিপুলায়তন ছিল। ছায়াপথের কিছু কিছু অঞ্চলে এদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিমাণ বেশি, কোন কোনও অঞ্চলে এদের ঘনত্ব বেশ কম। তবে শঙ্খবৃত্তাকার (Spiral) গ্যালাক্সীদের বৃত্তাকার-বাহু-অঞ্চলে এই ধরনের গ্যাস ও ধূলিকণার উপস্থিতি ও ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। ফলে, এই ধরনের গ্যালাক্সীর বৃত্তাকার বাহুই Protostar জন্মানোর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান। দেখা যায়, Spiral Glaxy-র বৃত্তাকার বাহু থেকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক Protostar একবারে তৈরি হতে পারে।

শঙ্খবৃত্তাকার গ্যালাক্সীর বাহুতে অসংখ্য অন্ধকার অঞ্চল আছে। এদের বলা হয় 'কালো নীহারিকা' [Dark Nabula]। এই অন্ধকার বা কালো নেবুলাতেই মহাজাগতিক ধূলিকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এদের এক একটার আয়তন অতি বিশাল। এই নেবুলারাই Protostar-গুলির জন্ম দেয় সবচেয়ে বেশি। এক একটা নেবুলার ব্যাস অস্বাভাবিক রকম বিশাল। মোটামুটি এদের ব্যাস 75×10^{10} কিলোমিটার থেকে 15×10^{12} কিলোমিটার অবধি হতে পারে। এদের গ্যাসীয় পদার্থের ভর ধূলিকণার পরিমাণের পঞ্চাশ থেকে একশ গুণ হয়। এই গ্যাসের অধিকাংশটাই হাইড্রোজেন পরমাণু বা অণু।

মানুষের মহাকাশ যাত্রার ফলে Protostar-এর গঠন সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা পৃথিবী থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, পূর্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব মতই এই Dark Nebula প্রায় 10 লক্ষ বছর থেকে 10 কোটি বছর ধরে নিজের অভ্যন্তরীণ মহাকর্ষ বলের আওতায় থেকে ক্রমশঃ আয়তনে সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং ফলতঃ যা তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তার অর্ধেকটা বিকরিত হচ্ছে আর বাকী অর্ধেকটা নিজের মধ্যে রেখে নিজেই উত্তপ্ত হচ্ছে।

এইভাবে তাপমাত্রা 10 লক্ষ ডিগ্রি কেলভিনের মত হলেই এই Protostar-এর অভ্যন্তরে নিউক্লীয় বিক্রিয়া শুরু হয় এবং এই সময় মহাকর্ষজনিত সংকোচন বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে একটা Protostar একটা নক্ষত্রে পরিণত হয়। এই নতুন নক্ষত্রে সর্বদা হাইড্রোজেন পরমাণুরা হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে থাকে।

নক্ষত্র জীবনের প্রারম্ভে এর হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ত হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হতে থাকে। চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর একটা হিলিয়াম পরমাণুর ভরের চেয়ে কিছুটা বেশি। ফলে প্রতি চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু শক্তি বের হয়। এই শক্তি আসে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে যে পরিমাণ ভর কমে যায় তার থেকে।

চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু একটা হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হলে যদি Δm ভরের পার্থক্য হয়, তবে $\Delta E = \Delta mc^2$ হবে। যেখানে, ΔE হলো উৎপন্ন শক্তি এবং c হলো আলোর গতিবেগ। এইভাবে নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চল (Core)-এর হাইড্রোজেন ক্রমশঃ নিঃশেষিত হতে থাকে এবং যতদিন নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি থাকে ততদিন নক্ষত্রের বাইরের দিকে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। নক্ষত্রের জীবনের এটাই হলো দীর্ঘতম দশা (Longest Phase) বা অবস্থা। একটি নক্ষত্রের মোট জীবনের বেশিটাই হাইড্রোজেন নিঃশেষ করে হিলিয়াম তৈরি হওয়ার অবস্থাতেই কাটে। সূর্যের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও কয়েক শত কোটি বছর ধরে চলবে। আরও প্রায় 500 কোটি বছর ধরে সূর্যের এই হাইড্রোজেন-হিলিয়াম বিক্রিয়া চলবে।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চলের সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন কিছু সময়ের জন্য শক্তির উৎপাদন থেমে যায়। আর নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চলে চাপ যায় কমে এবং নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চল সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে নিজের ওজনের (Weight) প্রভাবে। ফলে, কেন্দ্রাঞ্চলে তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রচণ্ড বিকিরণ চাপে কিন্তু এর বহিস্তরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় নক্ষত্রটির আয়তন বিশাল হয়ে ওঠে। এইরকম নক্ষত্রের নাম দেওয়া হয় 'দানব তারা' (Gaint Star) । অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 10 কোটি ডিগ্রি কেলভিন ($10^{8}\,{}^{0}K$)-এর বেশি হলে কেন্দ্রাঞ্চলের হিলিয়াম পরমাণুগুলির সংযোজনের (Fusion) ফলে কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণুগুলি তৈরি হয় এবং এই ক্রিয়ায় প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রাঞ্চলের সঙ্কোচন বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত হিলিয়াম পুড়ে এইভাবে কার্বন আর অক্সিজেন পরমাণুগুলি তৈরি হওয়ার পরে আবার কিছুদিন শক্তি উৎপন্ন হওয়া বন্ধ থাকে। তখন যথারীতি কেন্দ্রাঞ্চল আবার সংকুচিত হয়। ফলে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় কার্বন ও অক্সিজেন আরও ভারী মৌল তৈরি করে। আবারও প্রচুর পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয় এই ধরনের বিক্রিয়ায়। এইভাবে ক্রমশঃ চলতে থাকে যতক্ষণ না সমস্ত হালকা মৌলিক কণারা লৌহ গোষ্ঠীভুক্ত (Iron Group) মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়। এই লৌহ গোষ্ঠীভুক্ত মৌলের পরমাণুরা সংযোজন ক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। ফলে নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চল মোটামুটি একটা স্থির অবস্থায় আসে। এই সময় এর কেন্দ্রাঞ্চল আর সংকুচিত হতে পারে না। এইভাবে নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চল ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হয়ে আকস্মিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে (Collapse)। এর ফলে নক্ষত্রটির বহিঃস্তরের উষ্ণতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায় ও বহিঃস্তরের হাইড্রোজেনও কেন্দ্রাঞ্চলের মত হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে থাকে। তখন নক্ষত্রটির বহিঃস্তরে প্রভূত পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে থাকে। এই আকস্মিক শক্তি সংযোজনের ফলে বহিঃস্তরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, যাকে সুপারনোভার বিস্ফোরণ (Supernova Explosion) বলা হয়। কেন্দ্রাঞ্চল এই বিস্ফোরণে আলাদা হয়ে যায় এবং তা থেকে সাদা বামন তারা (White Dwarf Star) বা নিউট্রন তারা (Neutron Star) বা একটা কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল (Blackhole) উৎপন্ন হয়। নক্ষত্রটির প্রারম্ভিক ভরের উপর নির্ভর করে এই অবস্থায় কী উৎপন্ন হবে, সাদা বামন তারা, না নিউট্রন তারা, না একটা ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর।

আমাদের সূর্যকে উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। সূর্য একটা সাধারণ আকারের নক্ষত্র। অনুমান করা হচ্ছে, পরবর্তী চার-শ' থেকে পাঁচ-শ' কোটি বছরের মধ্যে এর ব্যাস দ্বিগুণ হয়ে যাবে। প্রথম দুশো কোটি বছরে এর আয়তন বৃদ্ধি ঘটবে শতকরা পাঁচ ভাগ এবং শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে শতকরা 15 ভাগ। পৃথিবী এখন সূর্য থেকে যতদূরে আছে ততদূরে যদি তখনও থাকে তবে পৃথিবীর

গড় উষ্ণতা বেড়ে যাবে প্রায় 18^0F বা 10^0 সেলসিয়াস।

আর পাঁচ-শ' কোটি বছর পরে খুব রেখে ঢেকে হিসাব কষলেও সূর্যের আয়তন শতকরা 30 ভাগ বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গড় উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটবে 50^0K বা 98^0F, কারণ সূর্যে শক্তি উৎপাদন তখন শতকরা 70 ভাগ বৃদ্ধি পাবে। সূর্যের এই আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা কমে কমে 4000^0K বা 6700^0F-এ নেমে যাবে এবং এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়ে এখনকার ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 200 গুণ হবে ও ব্যাস প্রায় 30 গুণ হবে। তখন এর শক্তির উৎস নিঃশেষিত হয়ে যাবে এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা ব্যয়িত হবে এর বিস্ফোরণের জন্য। ফলে, সূর্য তখন একটা সাদা বামন তারায় রূপান্তরিত হবে। সাদা বামন তারাগুলির বেশির ভাগেরই ভর আমাদের সূর্যের মত। তাদের বর্ণালিতে হিলিয়াম রেখাগুলি (Helium Lines) খুবই শক্তিশালী। এর থেকে বোঝা যায় সাদা বামন তারাগুলি পুরানো নক্ষত্র এবং এদের হাইড্রোজেন প্রায় সবটাই হিলিয়ামে রূপান্তরিত। এটা নক্ষত্র জীবনের বিবর্তনের শেষ অবস্থা, বিশেষ করে সূর্যের মত ভর বিশিষ্ট নক্ষত্রদের। যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের 1.4 গুণ বা তার কম তারা সম্ভবতঃ সকলেই তাদের জীবন বিবর্তনের শেষ অবস্থায় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে সাদা বামনে রূপান্তরিত হবে! কেউ কেউ অবশ্য 'নোভা' (Nova) হয়ে যেতেও পারে।

যে সব নক্ষত্র সূর্যের 10 থেকে 70 গুণ ভরবিশিষ্ট তাদের বিবর্তন খুব দ্রুত ঘটে। Protostar বা আদি নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে পরিণত হতে তাদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময় লাগে। এই রকম নক্ষত্রদের পুরো বিবর্তন সময় অর্থাৎ নক্ষত্রের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মোট সময় 10 কোটি বছরের মত হয়। এরা যখন Super Giant দশায় আসে যা নাকি আমাদের সূর্যের 'লাল দানব' (Red Giant) হওয়ার সময়ের মত অবস্থা অর্থাৎ বিস্ফোরণের আগের অবস্থায় আসে, তখন এদের আয়তন বিশাল হয় এবং এরা, সূর্যের কয়েক-শ' গুণ হতে পারে।

সাদা বামন তারা নিয়ে গবেষণাকালীন কোয়াণ্টামবাদ কাজে লাগিয়ে পরমাণুর এক নতুন চিত্র পাওয়া গেল। সাদা বামনদের পদার্থ মূলতঃ বস্তুর ইলেকট্রন উপাদান। নক্ষত্রের অভ্যন্তরের প্রচণ্ড তাপমাত্রায় অভ্যন্তরের সমস্ত পদার্থই আয়নিত হয়ে যায়। সুতরাং নক্ষত্রে যা পদার্থ থাকে তা মূলতঃ আয়ন এবং ইলেকট্রন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইলেকট্রনগুলি একটি নির্দিষ্ট শক্তি সীমার উপরের স্তরে অবস্থান করে। এই নির্দিষ্ট শক্তিসীমা ওই নক্ষত্রের সংকট-শক্তি (Critical Energy)। নক্ষত্রের পদার্থ ঘনত্ব যত বেশি হবে এই সংকট শক্তিও তত বাড়বে। সাদা বামন তারায় তাই ইলেকট্রন এমন চাপ সৃষ্টি করে যে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কোনও শক্তি উৎপাদন না হলেও নক্ষত্রকে এরা সাম্যাবস্থায় রাখতে পারে। এই সব নক্ষত্র যারা আর শক্তি উৎপাদনে অপারগ তাদের বলা হয় 'Degenerate Stars' বা 'অপজাত নক্ষত্র'। চন্দ্রশেখরের আবিষ্কার মূলতঃ এইসব অপজাত নক্ষত্রদের নিয়েই।

চন্দ্রশেখর 1930 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1933 খ্রিস্টাব্দের গবেষণায় আবিষ্কার করলেন যে, কোনও একটি 'Degenerate Star' বা অপজাত নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ তার ভর বৃদ্ধির সঙ্গে কমে যেতে থাকে, যা সাধারণ নক্ষত্রধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ নক্ষত্রের ভর বৃদ্ধি হলে তার ব্যাসার্ধ বাড়ে, কিন্তু উল্টো হয় Degenerate Stars বা অপজাত নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে এবং আরও বললেন, সাদা বামন তারা হওয়া একটি অপজাত নক্ষত্রের ভর কখনই সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি হতে পারে না। এই ভর-সীমা (Mass-limit) জ্যোতির্বিজ্ঞানে "চন্দ্রশেখর সীমা" (Chandrasekhar Limit) নামে খ্যাত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি নয় তাদের অধিকাংশই সাদা

বামনে রূপান্তরিত হবে এদের বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে।

যাদের ভর সূর্যের 1.5 থেকে 3 গুণ তারা শেষ পর্যায়ে নিউট্রন তারা (Neutron Star) বা পালসার [Pulsar] হবে। আবার যাদের ভর সূর্যের ভরের তিনগুণের বেশি তারা সুপারনোভা হ'য়ে বিস্ফোরণের পর পালসার হবে ও পরে তারা 'ব্লাক হোল'-এ রূপান্তরিত হবে। এই 'ব্ল্যাক হোল' বা কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতো শক্তিশালী যে এদের থেকে কোন শক্তিই বাইরে বিকিরিত হতে পারে না। আলোর তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গ এর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র শক্তিকে ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারে না। আমদের সূর্য যদিও কোনদিন এই অবস্থায় আসবে না, কারণ সূর্যের ভর 'চন্দ্রশেখর সীমা'-র মধ্যেই আছে, তবুও যদি ধরে নেওয়া হয় সূর্য 'ব্ল্যাক হোল' হবে, তবে সূর্যের ব্যাস মাত্র 4 মাইল বা 6.4 কিলোমিটার হবে এবং তার ঘনত্ব হবে অকল্পনীয়ভাবে বিশাল।

সাদা বামন সংক্রান্ত চন্দ্রশেখরের এই গবেষণা বিজ্ঞানী মহলে সঙ্গে সঙ্গে সমাদৃত হয়নি। এডিংটন, যিনি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পরীক্ষামূলক প্রমাণ করেছিলেন এবং ওই সময়কার আরো কিছু বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের ঐ তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেন নি। পরবর্তীকালে দেখা গেল সাদা বামন তারাদের ভর চন্দ্রশেখর সীমার নীচেই আছে। 1934 সালের মধ্যেই 'চন্দ্রশেখর সীমা' নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হয়ে যায়। তখনই মেনে না নিলেও বিজ্ঞানীরা আস্তে আস্তে চন্দ্রশেখর সীমার সত্যতা মেনে নিতে থাকেন। আজ অবধি একটিও সাদা বামন তারা আবিষ্কৃত হয় নি যার ভর চন্দ্রশেখর সীমার উপরে রয়েছে। এ তাবৎ আবিষ্কৃত সমস্ত সাদা বামন তারার ভর চন্দ্রশেখর সীমার নীচেই আছে। এই কারণে তাঁর আবিষ্কারের 50 বছর পরে 1983 খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রশেখর উইলিয়াম আলফ্রেড ফাউলারের [William Alfred Fowler] সঙ্গে একযোগে মূলতঃ ওই চন্দ্রশেখর-সীমার জন্যই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এই ফাউলার কিন্তু কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ফাউলার [R. H. Flowler] নন, যিনি চন্দ্রশেখরকে কেম্ব্রিজে ভর্তি হওয়া থেকে গবেষণা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

তারাদের আমরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি। ছোটবেলায় তারাদের নিয়ে সেই বিখ্যাত কবিতা এখন প্রায় সবাই পড়ে—"Twinkle, twinkle, little star, / How I wonder what you are..."। কিন্তু তারাদের নিয়ে বিস্মিত হয় খুব কম লোকই। যাঁরা হন তাঁদের সংখ্যা যথেষ্ট কম। হাতে গোনা যায়। আর তারাদের কথা এতো বিশাল যে তাদের সব কথা বলতে গেলে একটা বিশ্বকোষ তৈরি হয়ে যায়। আমরা তারাদের সেই সব কথা মূলতঃ বলবো যেগুলি চন্দ্রশেখরের কাজের সঙ্গে জড়িত।

সূর্য আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় 1.5×10^8 কিলোমিটার। আলোর গতিবেগ 3×10^5 কিমি প্রতি সেকেন্ডে। সূর্য থেকে তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীতে আসতে আলোর সময় লাগে 500 সেকেন্ড। সূর্য তার গ্রহগুলি নিয়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করছে তার নাম 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড' [Milky Way Galaxy]। এই ব্রহ্মাণ্ড শঙ্খবৃত্তাকার বা সর্পিল [Spiral]। এর একদিক থেকে অপরদিকে যেতে আলোর সময় লাগে এক লক্ষ [10^5] বছর। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস হল একলক্ষ আলোক-বর্ষ [Light Year]। এক 'আলোক বর্ষ' হল আলো শূন্য স্থানে তার প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ-কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই। এক আলোক বর্ষ তাই প্রায় 9.5×10^{12} কিলোমিটার। সুতরাং আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস প্রায় $10^5 \times 9.5 \times 10^{12}$ কিলোমিটার বা 9.5×10^{17} কিলোমিটার। সূর্যকে বাদ দিয়ে আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হল প্রক্সিমা সেন্টাউরি [Proxima Centauri]। তার দূরত্ব 4.3 আলোকবর্ষ বা 4.1×10^{13} কিলোমিটার বা 41 লক্ষ কোটি কিলোমিটার [প্রায়]।

আবারো বলি, এই বিশ্ব বিশাল। এটি সসীম [Finite] কিন্তু সীমানাহীন [Unbounded]। বিশ্বের

বিশালত্বের ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস 1,00,000 আলোকবর্ষ এবং এর নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি [10^{11}]। এতে বহু নক্ষত্রই আছে যেগুলি সূর্যের আয়তন কিংবা তার ভরের কয়েক গুণ থেকে কয়েকশো গুণ। আবার সূর্যের চেয়ে ছোট আকারের নক্ষত্রও আছে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে দুটি ছোটখাট ব্রহ্মাণ্ড। এদের আমরা ছোট ও বড় 'ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' [Magellanic Clounds] নামেই চিনি। এদের মোট নক্ষত্রসংখ্যা মাত্র 100 কোটি। এদের আকার অব্যবস্থিত এবং কিছুটা বিশৃঙ্খল। এদের দেখা যায় আমাদের দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে 1,90,000 এবং 1,70,000 আলোকবর্ষ। আমাদের কাছের একটি বড়সড় ব্রহ্মাণ্ড হল অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড [Andromeda Galaxy]। এটি প্রায় 24,00,000 বা চব্বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর নক্ষত্র সংখ্যাও আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বেশি। যত বেশি শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কৃত হচ্ছে তত নতুন নতুন ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হচ্ছে। মনে হয় যেন, বিশ্বের ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বের বয়স ধরা হয় 2000 কোটি বছর। বিশ্বের প্রান্তদেশে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে 1500 কোটি বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। সুতরাং বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের দূরত্ব অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। এই দূরত্ব মাপতে আলোবর্ষ এককে কুলোয় না। আরও বড় বড় এককের সাহায্য নিতে হয়, যে সব এককের কথা আগেই বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, প্রায় 2000 কোটি বছর আগে মহাজাগতিক অণ্ডের [Cosmic Egg] মহাবিস্ফোরণে [Big Bang] এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়। তারপর থেকে এর ক্রমবিস্তার চলছে। বিশ্বের এই বয়স নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিশ্বের প্রসারণ চলছে 2000 কোটি বছর ধরে। এই প্রসারণ চলবে আরও দুই হাজার কোটি [2×10^{10}] বৎসর। তারপর মহা-সংকোচন শুরু হবে। সেই সংকোচন এই বিকশিত বিশ্বকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সেই মহাজাগতিক অণ্ডে। কিছু বিজ্ঞানী আবার মনে করেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 6×10^{11} বৎসর থেকে 10^{12} বৎসর। বিশ্বের পুনরায় মহাজাগতিক অণ্ডে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও নানা মুনির নানা মত। বলা হয়েছে ঃ

"In the absence of definitive observational conclusions, one can only speculate on the possible fate of the actual universe. If the universe is unbound, the consmological expansion will not halt, and eventually the galaxies and stars will all die, leaving the cosmos a cold dark and virtually empty place. If the universe is bound, the mass-energy content in the distant but finite future will come together again, the cosmic background radiation will be blue-shifted, raising the temperature of matter and radiation to incredible levels, perhaps to reforge everything in the fiery crucible of the big squeeze Because of the development of structure in previous epochs, the big squeeze may not occur simultaneously everywhere at the end of time as its explosive counterpart, the 'big bang', seems to have done at the beginning of time. Discussions of recurring cycles of expansions and contractions thus remain highly speculative," সুতরাং বিশ্বের শেষ হওয়া নিয়ে বিতর্ক এখনও বর্তমান। এ নিয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

আবার নক্ষত্রের কথায় আসি। নক্ষত্র হল জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম দিকে নক্ষত্র ছিল না। কারণ সেই উষালগ্নে হালকা ও শীতল গ্যাস ছড়িয়ে ছিল। এই গ্যাস ছিল মূলতঃ হাইড্রোজেন। তারপর নক্ষত্রদের জন্ম হতে থাকে। সব নক্ষত্র এক সঙ্গে জন্মায় নি। বহু নক্ষত্র বহু আগেই জন্মেছে,

বহু নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে গেছে, আবার বহু নক্ষত্র এখন জন্ম নিচ্ছে। নক্ষত্রদের জন্ম আছে, আছে মৃত্যু। নক্ষত্রদেরও একটা জীবন-চক্র আছে। নক্ষত্রেরা তাদের বিবর্তনের শুরুতে থাকে হালকা ও শীতল গ্যাসের গোলক। সেই গ্যাসীয় গোলকই রূপান্তরিত হয় নক্ষত্রে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে।

সারা বিশ্ব জুড়ে হালকা ও শীতল গ্যাস ছড়িয়ে আছে সৃষ্টির প্রায় আদিকাল থেকেই। কিছুটা পরবর্তীকালে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় তৈরি হয় আলাদা আলাদা গ্যাসীয় গোলক। এই গ্যাসীয় গোলকগুলি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে। ওই গ্যাসীয় গোলকের একটা অংশ অপর অংশকে আকর্ষিত করতে থাকে এবং গোলকটি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ ক্রমসঙ্কুচিত গ্যাসীয় গোলকের 'বহির্মুখীচাপ' [Outward Pressure]-এর ফলে ওটিকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেয়। সুতরাং নক্ষত্র একটা সাম্যাবস্থায় থাকে দুটি বিপরীত বলের সাম্যে [Equilibrium]। এই দুই বলের একটি হল অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণ বল এবং অন্যটি হল বহির্মুখী চাপ। এই দুই বলের সাম্য না হলে নক্ষত্রটি ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা প্রসারিত হতে হতে এক সময় বিস্ফোরিত হবে। এই দুই বলের সাম্য হলেই ওই মহাজাগতিক গ্যাসীয় গোলক নক্ষত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। নক্ষত্র সৃষ্টিতে এই দুই বলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনও নক্ষত্র চিরকালই এই সাম্যাবস্থায় থাকে না। তবে একবার এই সাম্যাবস্থা অর্জিত হলে নক্ষত্রটি সে অবস্থায় বহুকাল থাকে। নক্ষত্রের পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার কথায় একটু পরেই আসছি।

সুতরাং নক্ষত্রের সৃষ্টি এবং সুস্থির থাকার জন্য দুটি বলের সাম্যের প্রয়োজন। একটি বল হল নক্ষত্রের কেন্দ্রাভিমুখী মহাকর্ষীয় বল এবং অন্যটি হল বহির্মুখী বল বা বহির্মুখী চাপ। নক্ষত্রের এই বহির্মুখী চাপের উৎস হল দুটি। একটি হল, গ্যাসের স্বাভাবিক চাপ, যেমনটি নাকি আমাদের বায়ুমণ্ডলের আছে, যাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। এই চাপ কিন্তু নক্ষত্রের কেন্দ্রাভিমুখী বলের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে নক্ষত্রকে সাম্যাবস্থায় রাখতে পারে না। অভিকর্ষীয় বলের বিরুদ্ধে কাজ করে যে বল বা চাপ নক্ষত্রকে সাম্যাবস্থায় রাখে সেই চাপ বা বল হল 'বিকিরণ চাপ' [Radiation Pressure]। এই চাপ উৎপন্ন হয় নক্ষত্রের দহন [Burning] থেকে। মূলতঃ এই বিকিরণ চাপই অভিকর্ষীয় চাপকে সাম্যাবস্থায় আনে। সুতরাং নক্ষত্রের দহনই তাকে সাম্যাবস্থায় রাখে। নক্ষত্র হল জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড।

বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন পোড়ালে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া [Chemical Reaction] হয় তা হল ঃ

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O + \text{Energy}$$

এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জল এবং তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। মহাবিস্ফোরণে বিশ্বসৃষ্টি হয়েছিল প্রায় 2000 কোটি বছর আগে। বিশ্ব এখন প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রসারণ সম্ভবতঃ চলবে আরও 2×10^{10} বা 2000 কোটি বছর। সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে হাইড্রোজেন গ্যাস। এই হাইড্রোজেনের গ্যাসীয় পিণ্ড থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রসমূহ। এখনও হচ্ছে। এই গ্যাসীয় পিণ্ডের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা 10 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে শুরু হয় তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া [Thermonuclear Reaction]। আগেই বলেছি, গ্যাসীয় গোলকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষজনিত বলের জন্য গোলকের সংকোচন ঘটে। এর ফলে গোলকের তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে এই তাপমাত্রা 10 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তখন তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হয়। হাইড্রোজেন ও ডিউটেরিয়ামের [Deuterium] মধ্যে শুরু হয় এই বিক্রিয়া।

রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া প্রায় একই ধরনের। পার্থক্য হল রাসায়নিক বিক্রিয়ায়

অংশ নেয় অণু ও পরমাণু। আর কেন্দ্রীয় বিক্রিয়ায় অংশ নেয় কেন্দ্রক-কণাসমূহ, যথা, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় কেন্দ্রকীয় বল [Nuclear Force] ক্রিয়া করে, কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্রিয়া করে তড়িৎচুম্বকীয় বল। কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাক।
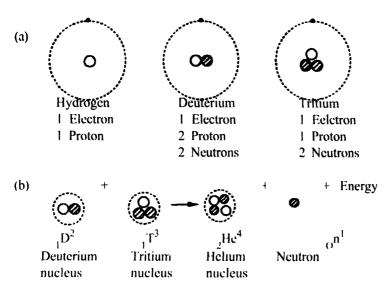
চিত্র : 59

উপরের চিত্রের (a)-তে দেখানো হল হাইড্রোজেন এবং তার দুটি সমস্থানিক [Isotope]—ডিউটেরিয়াম [Deuterium] এবং ট্রিটিয়াম [Tritium]। চিত্রের (b)-তে দেখানো হল অত্যন্ত পরিচিত এক কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া ঃ

$$_1D^2 + {}_1T^3 \longrightarrow {}_2He^4 + {}_0n^1 + \text{শক্তি},$$

অর্থাৎ ডিউটেরিয়াম + ট্রিটিয়াম ⟶ আলফা কণা + নিউট্রন + শক্তি।

ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের রাসায়নিক গুণাবলী অনেকাংশে হাইড্রোজেন সদৃশ হলেও এদের কেন্দ্রেকের গুণাবলী বিভিন্ন। কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির প্রায় 10 লক্ষ গুণ। উপরের কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া হাইড্রোজেন বোমায় [Hydrogen Bomb] ব্যবহৃত হয়।

নক্ষত্রে প্রাথমিক স্তরে হাইড্রোজেন ও তার সমস্থানিকদের বিশেষ করে ডিউটেরিয়ামের যে কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া হয় তা নীচে দেওয়া হল ঃ

$$_1H^1 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_1D^2 + e^+ + \text{শক্তি}$$

$$_1D^2 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_2He^3 + \text{শক্তি}$$

$$_2He^3 + {}_2He^3 \longrightarrow {}_2He^4 + 2\,{}_1H^1$$

এখানে, $_1H^1$ হল প্রোটন [Prot on] বা হাইড্রোজেন পরমাণু। $_1D^2$ হল ডিউটেরিয়াম। e^+ হল পজিট্রন [Positron]। $_2He^3$ এবং $_2He^4$ হল হিলিয়ামের সমস্থানিক। $_2He^4$ -কে বলা হয় 'আলফা কণা' [Alpha Particle]। এই চক্রের [Cycle] নাম p-p চক্র [p-p Cycle]। এই চক্রে যা দাঁড়ায় তা হল, হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণু ক্রমাগত ভারী হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। যখন সব হাইড্রোজেন এইভাবে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন শক্তি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং নক্ষত্রের বিবর্তনের একটা নতুন অবস্থা বা দশা [Phase] আসে। সে কথায় পরে আসছি।

নীচে আরও ছয়টি কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া দেখানো হল। এগুলির ফলে হাল্কা মৌল যেমন গুরুভার মৌলে পরিবর্তিত হয়, তেমনি এই বিক্রিয়াগুলির জন্য যে উষ্ণতার প্রয়োজন হয় তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম।

(1) $_1D^2 + {_1H^1} \longrightarrow {_2He^3}$ + শক্তি

(2) $_3Li^6 + {_1H^1} \longrightarrow {_2He^4} + {_2He^3}$

(3) $_3Li^7 + {_1H^1} \longrightarrow {_2He^4} + {_2He^4}$

(4) $_4Be^9 + {_1H^1} \dashrightarrow {_3Li^6} + {_2He^4}$

(5) $_5B^{10} + {_1H^1} \longrightarrow {_6C^{11}}$ + শক্তি

(6) $_5B^{11} + {_1H^1} \longrightarrow {_2He^4} + {_2He^4} + {_2He}$

প্রথম ধরনের বিক্রিয়ায় অংশ নেয় ডিউটেরন [Deuteron] এবং প্রোটন। 10 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এই বিক্রিয়া হতে পারে। এতে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায় এবং বিক্রিয়াটি খুবই দ্রুত হয়। দ্বিতীয় ধরনের বিক্রিয়ায় অংশ নেয় লিথিয়াম সমস্থানিক, বেরিলিয়াম সমস্থানিক এবং বোরনের ভারী সমস্থানিক। এই বিক্রিয়া কিছুটা ধীর গতিতে হয়। এরজন্য তাপমাত্রা লাগে 30 লক্ষ থেকে 70 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরের দশায় বোরনের হাল্কা সমস্থানিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এই বিক্রিয়া খুবই ধীরগতিসম্পন্ন হয়। এরজন্য প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার দরকার হয়।

পরের পৃষ্ঠার 60 নম্বর চিত্রে দেখনো হল প্রাথমিক নক্ষত্র কীভাবে উৎপন্ন হয়। (a)-তে দেখানো হল সূর্যের ব্যাসার্ধের 10 লক্ষ গুণ বড় একটা গ্যাসীয় পিণ্ড বা গোলক। এই গ্যাস মূলতঃ হাইড্রোজেন। (b) থেকে (f) অবধি দেখানো হল ওই গোলকের সংকোচন এবং কেন্দ্রস্থলের [Core] গঠন। (e) (f) এবং (g)-তে কেবল কেন্দ্রটিকে দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রের উষ্ণতা 10 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া তথা p-p cycle শুরু হয়। নক্ষত্র বিকিরণ ছড়াতে শুরু করে। নক্ষত্রের জন্ম হয়।

p-p চক্রের শেষ হলে নক্ষত্রের মধ্যে বর্হিমুখী চাপ কমে যায়। মাধ্যাকর্ষণ বল ক্রমশঃ বাড়তে থাকে নক্ষত্রটির মধ্যে, বিশেষ করে তার কেন্দ্রাঞ্চলে। ফলে, নক্ষত্রটি আবার সংকুচিত হতে আরম্ভ করে। এই সংকোচনের ফলে নিঃশেষিত কেন্দ্রাঞ্চলের চারিদিকের হাইড্রোজেন বলয় [Shell] তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার আওতায় আসে এবং এই বহির্বলয়ের দহন চলতে থাকে। বহির্বলয়ের এই দহনকাল খুবই কম সময়ের জন্য চলে। এর ফলে নক্ষত্রটির বহিরাঞ্চলের প্রসারণ ঘটে। নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চল এই সময় সংকুচিত হতে থাকলেও বহিরাঞ্চল প্রসারিত হতে থাকায় নক্ষত্রটি একটি দানবাকৃতি লাভ করে। এই

দানব নক্ষত্রটির দীপ্তি তখন লাল রংয়ের হয়। এই কারণে এই দানব নক্ষত্রটিকে বা দানব তারাটিকে আমরা বলি 'লাল দানব' [Red Giant]। এর কেন্দ্রাঞ্চল সংকুচিত হতে থাকে এবং তার উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে 30 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে তখন আবার অন্য একটি তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হয় যাতে অংশ নেয় লিথিয়াম ইত্যাদি। এর ফলে নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চলের সংকোচন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

এইভাবে নক্ষত্রটিতে এক ধরনের বিক্রিয়া থেকে অন্য ধরনের বিক্রিয়া চলতে থাকে। ফলে, নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চলের তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং তার সঙ্গে বিকিরণও বেড়ে যায়। এরপর এমন একটা উষ্ণতার সৃষ্টি হয় যখন 'কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র' (C-N Cycle) কাজ করতে

চিত্র ঃ 60
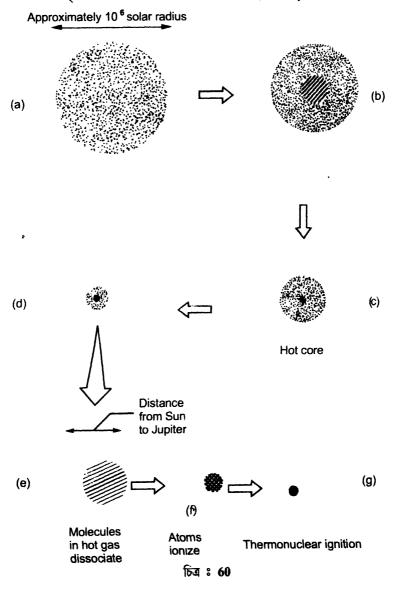
শুরু করে। এই চক্র আরম্ভ হলে নক্ষত্রটির সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হতে থাকে। হাল্কা মৌলের ভারী মৌলে রূপান্তরিত হতে হতে যখন নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চল লৌহে [Iron] রূপান্তরিত হয়, তখন তার তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। নক্ষত্রটির মৃত্যু হতে থাকে। সুতরাং নক্ষত্রের জন্ম হয় তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায়। উৎপন্ন হয় তাপ এবং আলো। এই তাপ এবং আলোর পরিমাণ নির্ভর করে নক্ষত্রটির বয়সের উপর। নক্ষত্রটির বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকমের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া হতে থাকে। ফলে, নক্ষত্রটির তাপ ও অলো বিকিরণের পরিমাণ তার বয়সের উপর নির্ভরশীল।

আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের অনেকগুলি নাক্ষত্র-পর্যায়ক্রম [Stellar Sequences] আছে। এই পর্যায়ক্রম কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় নিবদ্ধ। এই সব পর্যায়ক্রম নির্ণয়ে H-R পরিলেখর [Diagram] একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। H হল নক্ষত্রটির জ্যোতি [Luminosity] এবং R হল তার পৃষ্ঠ-উষ্ণতা [Surface Temperature]। H-কে Y-অক্ষে এবং R-কে X-অক্ষে বসিয়ে যে পরিলেখ পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় নক্ষত্রটি কোন পর্যায়ক্রমে আছে। পৃথিবী থেকে কোনও নক্ষত্রের জ্যোতি হিসাব করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। আর নক্ষত্রটির পৃষ্ঠ-উষ্ণতা নির্ণয় করা হয় তার বিকিরণের রঙ থেকে। পরিলেখর Y-অক্ষে আসে পরম জ্যোতি [Absolute Luminosity] এবং X- অক্ষে আসে পৃষ্ঠ-উষ্ণতা। জ্যোতি হল কোন নক্ষত্র যে পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ করে তার পৃষ্ঠদেশ থেকে তার চারপাশের মহাকাশে। এই জ্যোতি মাপা হয় আর্গস/সেকেন্ড একক দিয়ে। আর পৃষ্ঠ-উষ্ণতা মাপা হয় কেলভিন [^{0}K] একক দিয়ে। এই উষ্ণতা মাপতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। রাসেল [Henry Norris Russel] এই উষ্ণতা মাপতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তা এই রকম ঃ

চিত্র ঃ **61**
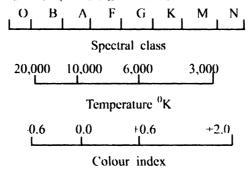
● এখানে O নীলের কাছাকাছি এবং M লালের কাছাকাছি, এই বর্ণালি রেখাগুলির সঙ্গে যে উষ্ণতার সম্পর্ক তা নীচেই দেখানো হয়েছে। মেঘনাদ সাহার তাপীয় আয়নন সূত্র থেকে কোন্ বর্ণালিরেখায় কত উষ্ণতা তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। 61 নম্বর চিত্রের একেবারে নীচের বর্ণ-সূচক [Colour Index] হল, O, B ইত্যাদি বর্ণালি রেখাগুলির মাত্রিক ভাষ্য [Quantitative Version] মাত্র। ●

H-R পরিলেখ থেকে পাওয়া যায় নক্ষত্রদের মুখ্য পর্যায়ক্রম [Main Sequence] এবং তাদের অন্যান্য অবস্থা। 62 নম্বর চিত্রে মোটা ব্যান্ড [Band] হল নক্ষত্রদের মুখ্য পর্যায়ক্রম এবং ব্যান্ডের শাখাগুলি বলে সেই সব নক্ষত্রদের কথা যারা মুখ্য পর্যায়ক্রমে নেই। আর বাঁদিকের কোণের দ্বীপের মত অঞ্চলটিতে আসে 'সাদা বামন' [White Dwarf] নক্ষত্রেরা।

আমাদের পরিচিত বহু নক্ষত্র এবং নিত্যদিনের সূর্য কিন্তু এখন রয়েছে মুখ্য নাক্ষত্র পর্যায়ক্রমে। প্রাথমিক ভর, গঠন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন নক্ষত্র এই মুখ্য পর্যায়ক্রমের বিভিন্ন অবস্থানে

থাকে। এরা সবাই তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পোড়াতে থাকে। এদের কেউ কেউ আমাদের সূর্যের মত তাপ উৎপাদনে কার্বন [C], নাইট্রোজেন [N] এবং অক্সিজেন [O]-কে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করে। সূর্যের কেন্দ্রাঞ্চলের উষ্ণতা প্রায় দু'কোটি (2×10^7) ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই উষ্ণতায় চলতে থাকে কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র [C-N Cycle]। এই চক্রই সূর্যের তাপশক্তির মূল উৎস। চিত্র 63-তে দেখানো হল সূর্যের কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র। এই চক্রে C^{12} অনুঘটকের মত কাজ করে আবার C^{12}-ই থেকে যায়। হাইড্রোজেন নিঃশেষ হতে থাকে। হিলিয়াম উৎপন্ন হয়। নক্ষত্রের তথা সূর্যের কার্বন-নাইট্রোজেন নীচে দেওয়া হল।
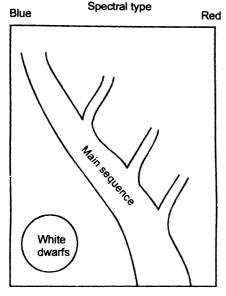
H-R পরিলেখ থেকে কোন্ নক্ষত্র কোন্ পর্যায়ক্রমে আছে তা বলে দেওয়া যায়। বিশাল

চিত্র ঃ 62
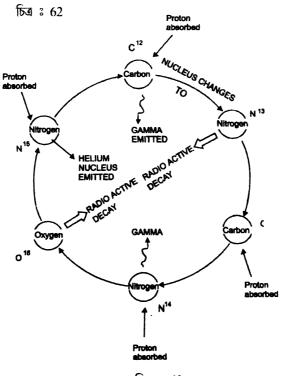
চিত্র ঃ 63

গ্যাসীয় গোলকের ক্রমসংকোচনে তার কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং অবশেষে সেই কেন্দ্রাঞ্চলের জ্বলন [Ignition] শুরু হয়। তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হয়, জন্ম নেয় নক্ষত্র। এই অবস্থা এলে নক্ষত্রটি চলে আসে মুখ্য পর্যায়ক্রমে। এই পর্যায়ক্রম অনেক সময় 'Zero-Age' মুখ্য পর্যায়ক্রম নামেও অভিহিত হয়। এরপর হাইড্রোজেনের তাপ কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়াজনিত দহন শেষ হয়ে গেলে নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থল আবারও সংকুচিত হয়ে উত্তপ্ত হয় এবং তার বহিরাঞ্চল প্রসারিত হয়। ধীরে ধীরে ওই নক্ষত্রটি 'লাল দানব' [Red Gaiant] নক্ষত্র হয়। আমাদের সূর্য লাল দানব হলে তার ব্যাসার্ধ হবে বৃহস্পতি গ্রহের বর্তমান কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সমান। অর্থাৎ সূর্য লাল দানব হলে সে বৃহস্পতি অবধি বিস্তার লাভ করবে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল তখন সূর্যের মধ্যে চলে যাবে, এমন কি বৃহস্পতিও আস্ত থাকবে না। লালদানব সূর্য তখন এদের গিলে ফেলবে। নক্ষত্রেরা চিরকাল ওই লাল-দানব অবস্থায় থাকে না। কিছুকাল পরে তার কেন্দ্রঞ্চলের সংকোচনের জন্য সেখানের উষ্ণতা আরও বাড়তে থাকে এবং শুরু হয় নতুন তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া। লাল দানব আবার ফিরে আসে মুখ্য পর্যায়ক্রমে। আবার এই তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার দহন এক সময় শেষ হয়। নক্ষত্রটি আবার লাল দানব হয় একই নিয়মে। আবারও কেন্দ্রস্থলের সংকোচন হতে থাকে এবং সেখানের উষ্ণতা আরও বাড়তে থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার নতুন তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হয়। ওই নক্ষত্রটি ফিরে আসে মুখ্য পর্যায়ক্রমে।
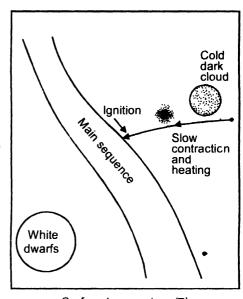
চিত্র ঃ 64

64 নং চিত্রে দেখানো হল গ্যাসীয় গোলক সংকুচিত হয়ে তার কেন্দ্রাঞ্চলের জ্বলন শুরু করে কীভাবে নক্ষত্র হয়ে মুখ্য পর্যায়ক্রমে আসে তার H-R পরিলেখ। এখানে প্রাথমিক নক্ষত্র সৃষ্টি এবং তার মুখ্য পর্যায়ক্রমে আসা দেখানো হয়েছে। নক্ষত্রের এই জ্বলন চলাকালীন পরিলেখতে তার অবস্থান বহু লক্ষ বছর প্রায় একই থাকে। সাধারণভাবে বলা যায়, হাল্কা নক্ষত্রেরা বেশিদিন বাঁচে ভারী নক্ষত্রের তুলনায়। নক্ষত্রের দহন শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হওয়া অবধি পর্যাযগুলি দেখানো হল 65 নম্বর চিত্রে। এটিও একটি H-R পরিলেখ।

এখানে লালদানবের উৎপত্তি এবং অবস্থান যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে নতুন তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় ওই লাল দানবের আবার মুখ্য পর্যাযক্রমে ফিরে আসা। এইভাবে কয়েকবার চলতে থাকে, যতক্ষণ না নক্ষত্রের সব জ্বালানী শেষ হয়ে যায় এবং নতুন কোনও তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া আর সম্ভব হয় না। এরপর নক্ষত্রটির মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় কোনো কোনো নক্ষত্র 'সাদা-বামন' [White Dwarf] তারায় রূপান্তরিত হয়।

আগেই বলেছি, কোন নক্ষত্রের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শেষ হয় যখন তার কেন্দ্রস্থলে লৌহ উৎপন্ন হয় এবং কেন্দ্রস্থল হয়ে যায় লৌহ-গর্ভ [Iron Core]। কিন্তু সব নক্ষত্রের বেলায় তা হয় না। এটা নির্ভর করে নক্ষত্রটির ভরের উপর, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ভর অবধি নক্ষত্র তার নতুন নতুন তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় নিজেকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে না। পুরোপুরি নিঃশেষিত হওয়ার আগে এইসব নক্ষত্র নিজেদের দহন বন্ধ করে দেয়। এরা তখন 'সাদা বামন' তারা হয়ে যায়। নীচের 66 নম্বর H-R পরিলেখর বাঁদিকে সাদা বামন তারার অবস্থান দেখানো হল। যেসব তারা মৃত্যুর আগের পরিপূর্ণ দহন বন্ধ করে দিয়ে সাদা বামন তারায় রূপান্তরিত হয় তাদের প্রক্ষেপ পথ [Trajectory] নীচের পরিলেখ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

Surface temperature (R)

চিত্র ঃ 65
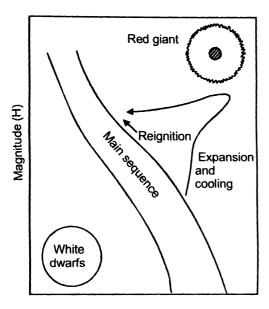
নক্ষত্রের অভ্যন্তরের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া একেবারে শেষ হয়ে গেলে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে নক্ষত্রটি সংকুচিত হতে থাকবে। যেহেতু কোনও বহির্মুখী বলের প্রভাব থাকবে না ওই মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচন প্রতিহত করতে, তাই ওই অবস্থায় নক্ষত্রটি ক্রমসংকুচিত হতে থাকবে এবং এমন একটা সময় আসতে পারে যখন ওটি একটি বিন্দুমাত্র হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। 1927 সালে ফাউলার [Ralph Howard Fowler] দেখালেন যে, কোনও নক্ষত্র তার মৃত্যুদশায় এসে যখন মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচনের ফলে আকারে ছোট হতে থাকে তখন কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান প্রভাবসমূহের [Quantum Mechanical Effects] ফলে আয়তনে ছোট হওয়া ওই সব নক্ষত্রে একটা
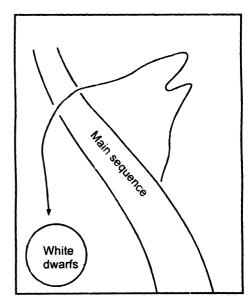
Surface temperature (R)

চিত্র ঃ 66

বহির্মুখী 'আপজাত্য চাপ' [Degeneracy Pressure] সৃষ্টি হয়। এই চাপই অন্তর্মুখী চাপকে প্রতিহত করে। ফলে, মৃত নক্ষত্রটি সীমাহীনভাবে সংকুচিত হয়ে বিন্দুতে পরিণত হয় না। তৈরি হয় 'সাদা বামন' তারা।

সাদা বামন তারাদের ব্যাসার্ধ খুবই কম, কিন্তু এদের ঘনত্ব অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। সূর্য যখন সাদা বামন হবে তখন তার গড় ঘনত্ব হবে 30 টন প্রতি ঘন সেন্টিমিটার। আবারো বলি, যে সব নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি নয় তাদের অধিকাংশই সাদা বামন তারায় রূপান্তরিত হবে। এই ভরসীমাই 'চন্দ্রশেখরের সীমা' বা 'চন্দ্রশেখর সীমা' নামে খ্যাত। সে আলোচনায় পরে আসছি। যে সব নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের 1.5 থেকে 3 (তিন) গুণ, তারা তাদের অন্তিম দশায় নিউট্রন তারা [Neutron Star] বা পালসার হবে। আবার যে সব নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের তিন গুণের বেশি তারা সুপারনোভা [Supernova] হয়ে বিস্ফোরিত হবে এবং পরে ভর-সীমার নিয়ম মেনে সাদা বামন, পালসার এবং তারপর 'কৃষ্ণগহ্বর' [Black Hole] হয়ে যাবে। সাদা বামন, পালসার [Pulsar], 'কৃষ্ণগহ্বর'—এগুলি মৃত কিংবা মরণোন্মুখ নক্ষত্রের বিভিন্ন অবস্থা বা দশা। নক্ষত্রটির প্রারম্ভিক ভরের উপর নির্ভর করে এটি কোন দশাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং নক্ষত্র সৃষ্টির প্রাক্কালে যে গ্যাসীয় গোলক তৈরি হয় তার ভরের উপর নির্ভর করে নক্ষত্রটির মৃত্যুর পর তার দশা কী হবে—সাদা বামন, না নিউট্রন তারা বা পালসার, না কৃষ্ণগহ্বর।

আকাশের নক্ষত্রগুলির মধ্যে কালপুরুষ [Orion] নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের খুবই পরিচিত। ওরই পায়ের কাছে আছে লুব্ধক [Sirius] নক্ষত্র। এটি আমাদের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এরই একটা সঙ্গী নক্ষত্র আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'লুব্ধক-খ', যার অন্য নাম 'ডিজিটারিয়া' [Digiteria]। এই ডিজিটারিয়া বা 'লুব্ধক-খ' একটা সাদা বামন তারা। লুব্ধক একটা স্বাভাবিক নক্ষত্র, কিন্তু এর সঙ্গী 'লুব্ধক-খ', একটি শ্বেত বামন বা সাদা বামন। এদের ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত 10,000 : 1, ভরের অনুপাত 4:1, ব্যাসার্ধের অনুপাত 1.8 : 0·034 এবং ঘনত্বের অনুপাত 0.42 : 27000। সুতরাং সাদা বামন তারার ঘনত্ব কী বিশাল তা বোঝা যায় এই ঘনত্বের অনুপাত থেকে।

সাদা বামন তারাগুলির সৃষ্টি হয় আপজাত্য চাপ [Degeneracy Pressure] তৈরি হয় বলেই। নক্ষত্রের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে অনেক নক্ষত্র তাদের এই বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয় এবং ওই আপজাত্য বল বা চাপের প্রভাবে সীমাহীন সংকোচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। আপজাত্য চাপই মৃতপ্রায় নক্ষত্রটিকে একটা বিন্দু হওয়া থেকে বাঁচায় এবং নক্ষত্রটিকে একটি সাদা বামন তারায় রূপান্তরিত করে। সব নক্ষত্র সাদা বামন তারায় বিবর্তিত হয় না। আগেই বলেছি, নক্ষত্রের প্রাথমিক ভরের উপর নির্ভর করে তার সাদা বামন হওয়া বা না হওয়া। চন্দ্রশেখর সীমাই ঠিক করে দেয় নক্ষত্রটি সাদা বামন তারা হবে কিনা। যেহেতু সাদা বামন তারাদের সব রকম তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শেষ হয়ে যায় নি এবং নক্ষত্রটি একেবারে মৃত হয়নি, তাই সাদা বামন তারার কেন্দ্রস্থলে যে কেবল হাইড্রোজেন থাকে তা নয়, হিলিয়াম, কার্বন ইত্যাদিও থাকে। তবে লৌহের চেয়ে ভারী কোনও মৌলিক কণা থাকে না সাদা বামন তারাদের গর্ভে।

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে এ তাবৎ যে সব আলোচনা করা হল সেগুলিকে সংক্ষেপে তালিকাভুক্ত করার আগে তিনটি নাক্ষত্রিক পরিণতি সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া যাক। এই তিনটি নাক্ষত্রিক অবস্থা হল ঃ কৃষ্ণগহ্বর [Black Hole], সাদা বা শ্বেত বামন তারা [White Dwarf] এবং পালসার [Pulsar]

বা নিউট্রন তারা [Neutron Star]। এদের মধ্যে সাদা বামন তারা সম্পর্কে বেশ কিছুটা বলা হলেও বাকী দুটির কথা কিছুটা জানা দরকার। চন্দ্রশেখরের গবেষণা মূলতঃ সাদা বামন তারাদের নিয়ে হলেও তাঁর আবিষ্কার 'চন্দ্রশেখর সীমা' কিন্তু সাদা বামন, কৃষ্ণগহ্বর, পালসার, সুপারনোভা প্রভৃতির কথা বলে এবং এই সব পরিণতির একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়।

আগেই বলেছি, যে সব নক্ষত্রের প্রাথমিক ভর আমাদের সূর্যের তিন গুণের বেশি, সেই সব নক্ষত্র তার বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে সুপার নোভা [Super Nova] হয়ে বিস্ফোরিত হবে। তারপর ওই নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চল হবে পালসার কিংবা কৃষ্ণগহ্বর। যদি ওই কেন্দ্রাঞ্চলের ভর এতো বেশি হয় যে, তার মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরোধী কোন বহির্মুখী চাপ বা বল তার প্রতিরোধ করতে পারে না, তখন ওই নক্ষত্রটির কেন্দ্রাঞ্চল ক্রমে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে থাকে এবং অবশেষে তা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। নক্ষত্রটির ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি না হলে এটি যেমন সাদা বামন তারায় শেষ হবে, তেমনি কোন নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.5 থেকে 3 গুণ হলে সেটি বিস্ফোরণের পর শেষ হবে পালসার বা নিউট্রন তারায়। আবার কোন নক্ষত্রের ভর বা প্রাথমিক ভর সূর্যের ভরের তিনগুণের বেশি হলে সে তারা বিস্ফোরিত হয়ে পরিণত হবে 'কৃষ্ণগহ্বর' [Black Hole]-এ। নক্ষত্রের এই অন্তিমদশায় এর গুণাবলী হবে অতি বিচিত্র।

কৃষ্ণগহ্বরের ঘনত্ব অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র [Gravitational Field] এতো শক্তিশালী যে এদের থেকে কোনও শক্তিই বাইরে বিকিরিত হতে পারে না। আলোক তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গ এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারে না। আমাদের সূর্য যদিও কোনদিন কৃষ্ণগহ্বর হবে না, কারণ সূর্যের ভর 'চন্দ্রশেখর সীমা'-র মধ্যেই আছে, তবু যদি ধরে দেওয়া হয় সূর্য কোনদিন কৃষ্ণগহ্বর হবে, তবে সে কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাস হবে মাত্র 4 মাইল বা 6.4 কিলোমিটার। এর ঘনত্ব হবে কয়েক কোটি গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে দেখা যায় যে, একটি কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাস হবে মাত্র বাইশ মাইল যদি তার ভর সূর্যের ভরের ছয় গুণ হয়। সূর্যের বর্তমান ব্যাস 8,65,400 মাইল। কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর কোনও বস্তু পড়লে পতনশীল বস্তু তার স্থিতি শক্তির চল্লিশ শতাংশ [40%] নির্গত করতে পারে। এই শক্তি রঞ্জনরশ্মি কিংবা অন্য কোনও বিকিরণের আকারে বেরিয়ে আসে। যখন কৃষ্ণগহ্বরে ক্রমাগত বস্তু পড়তে থাকে তখন এর চারিদিক খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়ার আগে বস্তুগুলি যেন আর্ত চিৎকার করে শক্তি নিঃসরণ করে। তত্ত্বের দিক থেকে একটা কৃষ্ণগহ্বর খুব ভারী হওয়া সম্ভব। এরা মহাবিস্ফোরণ [Big Bang]-এর সময় সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে কিংবা পরবর্তীকালে অনেকগুলি নক্ষত্রের ভর একত্রিত হয়ে এর সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। M87 গ্যালাক্সীর [চিত্র ঃ 32] কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহ্বর আছে তা এখন প্রমাণিত। এটির ভর কয়েকশো কোটি সূর্যের ভরের সমান। সূর্যের বর্তমান ভর 2×10^{33} গ্রাম বা 2×10^{27} মেট্রিক টন, যা পৃথিবীর ভরের 3,33,420 গুণ। সুতরাং একটা কৃষ্ণগহ্বরের ভর এবং তার ঘনত্ব কী অকল্পনীয়ভাবে বিশাল তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং তীব্র মাধ্যাকর্ষণ কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি করে। তার থেকে অলোরও নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। একবার কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে কোনও কিছু পড়লে তা আর কখনও বেরিয়ে আসতে পারে না। তার পদার্থ রূপান্তরিত হয় শক্তিতে আইনস্টাইনের সূত্র মেনে। কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর সঞ্চরণশীল বিশ্বের সমস্ত কিছু বস্তু মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে একটি জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ

থেকে এই তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। এই বিন্দু স্থান-কালের মধ্যে একটি স্বতন্ত্রতা বা অনন্যতা [Singularity], কারণ বিশাল ভর কোন স্থান অধিকার করছে না। অনিশ্চয়তা নীতি [Uncertainty Principle] দিয়ে তত্ত্বীয়ভাবে বলা যায় কৃষ্ণগহ্বরের সঙ্গে অনিশ্চয়তা জড়িত। কৃষ্ণগহ্বর ক্রমশঃ ছোট হতে হতে প্ল্যাঙ্ক-ভর [Planck Mass]-এ উপনীত হতে পারে। তখন তার ব্যাস হবে স্থানের অনিশ্চয়তার সঙ্গে সমান। এই ব্যাস-বিশিষ্ট কৃষ্ণগহ্বরের বস্তু-ঘনত্ব [Matter Density] হবে অত্যন্ত বেশি। মহাবিস্ফোরণের প্রথম পর্যায়ে এই ধরনের বস্তু-ঘনত্বই বিরাজমান ছিল। কিন্তু সমস্যা হল বিশ্ব একটি জ্যামিতিক বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকলে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে কি ঘটেছিল অর্থাৎ বস্তু-ঘনত্ব প্ল্যাঙ্ক-ভরের বস্তু-ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়া পর্যন্ত কী ঘটেছিল তা আজও অজানা। আদি মুহূর্তের এই সময়টার পরিমাণ 10^{-43} সেকেন্ড মাত্র।

কৃষ্ণগহ্বরের কথা ছেড়ে এবার 'সাদা বামন' তারার কথায় আসি। এদের সম্বন্ধে অনেক কথা আগেই বলা হয়েছে। আবারো সংক্ষেপে সাদা বামনের কথা বলি!

সূর্য এবং আকাশে যেসব নক্ষত্র স্থিরভাবে জ্বলছে তারা তাদের জীবনের মধ্য ভাগে রয়েছে। এরা এখনও হাইড্রোজেন জ্বালানী ব্যবহার করে চলেছে। কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার দরুণ কেন্দ্রে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা নক্ষত্রের মধ্যে যে বস্তু আছে তাকে বাইরের দিকে প্রসারিত করে। যে মাধ্যাকর্ষণ সকল বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করে এটি তার বিপরীত। আবার নক্ষত্রের মধ্যে থাকে ওই কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ বল। দুটি বিপরীতমুখী বলের শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতা হয়। এর ফলে নক্ষত্রটি একটা সাম্যাবস্থায় আসে। এদের ঘনত্বও তখন খুব বেশি নয়। সূর্যের গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে খুব একটা বেশি নয়। সূর্যের কেন্দ্রে অবশ্য ঘনত্ব অনেকটাই বেশি এবং তার পরিমাণ এখন জলের ঘনত্বের প্রায় একশো গুণ।

যখন সূর্যে বা অন্যান্য নক্ষত্রে কেন্দ্রকীয় জ্বালানীর পরিমাণ ফুরিয়ে আসবে তখন তার আয়তন অনেকটা বেড়ে যাবে, সে লাল দানব হয়ে জ্বলে উঠবে, আর তারপরেই মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সঙ্কুচিত হতে হতেসাদা বামনে পরিণত হয়ে যাবে। এ ধরনের সাদা বামনের অস্তিত্বের কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা আাছে। আকাশে খুব উজ্জ্বল নক্ষত্রেদের মধ্যে একটি হলো 'সিরিয়াস' [Sirius]। এই 'সিরিয়াস' হল লুব্ধক নক্ষত্র। এর কথা আগেই বলেছি। এও বলেছি, এই নক্ষত্রের একটা স্তিমিত সঙ্গী আছে। এই সঙ্গীটি হলো প্রথম আবিষ্কৃত সাদা বামন। একটি সাদা বামনে মাধ্যাকর্ষণ বস্তুকে এতখানি সংকুচিত করে যে বস্তুর গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের কয়েকশো কোটি গুণ হয়ে যায়। সূর্যের সমান ভর নিয়েও আকৃতিতে একটি সাদা বামন প্রায় পৃথিবীর সমান। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যাকর্ষণ খুব বেশি হয় ও বস্তু ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে সাদা বামন তৈরি করে। মুমূর্ষু নক্ষত্রের এই অন্তিম সংকোচনের দরুণ নির্গত শক্তি বস্তুর স্থির ভরের কেবল দশ হাজার ভাগের এক ভাগের সমতুল। এটা নক্ষত্র জীবনের আদি পর্বে হাইড্রোজেন জ্বালানী উদ্ভুত কেন্দ্রকীয় শক্তির চেয়ে অনেক কম।

কোনও নক্ষত্রের সাদা বামন হওয়ার শর্ত হল তার আদি ভর আমাদের সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি হবে না। এই ভর-সীমাই 'চন্দ্রশেখর সীমা'। সাদা বামনের বৈশিষ্ট্য হল এই নক্ষত্রগুলি তার পুরো জ্বালানী একেবারে নিঃশেষ করে পুড়িয়ে ফেলে নি। এগুলিতে আরও তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু হয় নি। তাই এদের কিছুটা জ্বালানী রয়ে যায়। আবার কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানজনিত প্রভাবে এদের কেন্দ্রাঞ্চলে উৎপন্ন হয় আপজাত্য চাপ [Degeneracy Pressure], যে চাপ বা বহির্মুখী

বলই আরও সংকোচন থেকে রক্ষা করে ওই মৃতপ্রায় নক্ষত্রগুলিকে। এর ফলেই উৎপন্ন হয় সাদা বামন তারারা। সাদা বামন তারা সাদা রংয়ের হয়। তাকে বামন [Dwarf] বলা হয় এই কারণে যে তার আকার খুবই ছোট হয়ে যায়। কোন নক্ষত্রের তাপমাত্রা খুব বেশি হলে এবং তার সামগ্রিক ঔজ্জ্বল্য কম হলে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাধারণ ও স্বাভাবিক নক্ষত্রের তুলনায় এর জ্যামিতিক আকৃতি খুবই ছোট। সাদা বামন তারাদের এই দুটি বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। এদের উষ্ণতা 10,000 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। কিন্তু এদের সামগ্রিক ঔজ্জ্বল্য সূর্যের তুলনায় কম। সুতরাং এদের আকৃতি স্বাভাবিক নক্ষত্রের তুলনায় খুবই ছোট। সেজন্যই এদের বলা হয় 'বামন' [Dwarf]। আর এদের উষ্ণতা বেশি হওয়ায় এরা সাদা রংয়ের আলো বিকিরণ করে। তাই এদের নাম 'সাদা বামন' তারা।

আমাদের সূর্যের ভর যেহেতু চন্দ্রশেখর সীমার মধ্যেই আছে, তাই সূর্য একদিন সাদা বামন তারায় রূপান্তরিত হবে। তখন তার আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট হয়ে যাবে। তখন দর্শকদের কাছে সূর্য হয়ে যাবে অনুজ্জ্বল তারা মাত্র। সূর্যের থেকে সে সময় যতটা বিকিরণ আসবে তা এখনকার বিকিরণের থেকে অনেক কম হবে। তবে আকাশের অন্যান্য তারাদের চেয়ে সেই সূর্যকে কিছুটা বেশি উজ্জ্বলতর দেখা যাবে। চন্দ্র তখন এতো কম সূর্যের আলো পাবে যে, আকাশের চাঁদকে আর দেখা যাবে না। অবশ্য সূর্য সাদা বামন হওয়ার আগে অন্ততঃ একবার লাল দানব তারা হবে এবং সে অবস্থায় সে বৃহস্পতি অবধি সব গ্রহকে গ্রাস করেই নেবে। সুতরাং পৃথিবী কিংবা বৃহস্পতি কেউই সাদা বামন অবস্থা দেখার জন্য আস্ত থাকবে না।

সাদা বামন তারার ঘনত্ব এতো বেশি যে, এক কাপ সাদা বামন তারার পদার্থ 25টি হাতির মোট ওজনের চেয়ে বেশি ওজন সম্পন্ন হবে। সাদা বামন যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। এর দহন বন্ধ হয়ে যায়। কেবল এই সামান্য উজ্জ্বল অবস্থায় সে থাকে, তার মধ্যে উৎপন্ন হওয়া আপজাত্য চাপ তথা বহির্মুখী বলের জন্য এবং কিছু জ্বালানী বেঁচে যাওয়ার জন্য। এই আপজাত্য চাপ চরম শূন্য উষ্ণতায়ও বিদ্যমান থাকে। সাদা বামন তারাটিতে কী কী জ্বালানীর অবশেষ থাকবে তা নির্ভর করে ওই তারাটির জন্ম বৃত্তান্তের উপর। সাদা বামন তারার বিবর্তনের ইতিহাসই বলে দেয় ওর মধ্যে হাইড্রোজেন ছাড়া হিলিয়াম, কার্বন ইত্যাদি আর কোন্ কোন্ মৌল থাকবে।

পালসার [Pulsar] অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত ঘন এক গাগনিক বস্তু, যা হ্রস্ব বেতার তরঙ্গের ঝলক [Pulse] নিঃসৃত করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর। এই অনন্য গুণের জন্য এই গাগনিক বস্তুটিকে পালসার [Pulsar] নাম দেওয়া হয়েছে। ইংরেজীতে এর পুরো নাম Pulsating Radio Star' এবং সংক্ষেপে এই নাম Pulsar, যা বাংলাতেও 'পালসার'। পালসার প্রথম আবিষ্কৃত হয় 1967 সালে। এর দশ বছরের মধ্যে অন্ততঃ 150টি পালসার আবিষ্কৃত হয়েছে।

পালসার যেসব বেতার তরঙ্গ নিঃসৃত করে তাদের কম্পাঙ্ক মোটামুটি 30 মেগাহার্ৎজ [MHz] থেকে 300 মেগাহার্ৎজ [MHz]-এর মধ্যে থাকে। এরা সব থেকে বেশি শক্তি নিঃসরণ করে 100 মেগাহার্ৎজ কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে। বহু পালসার এক্সরে [X-ray] তরঙ্গও নিঃসৃত করে। কতকগুলি একেবারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতার তরঙ্গের ঝলক নিঃসরণ করে। প্রত্যেকটি পালসারে তার ঝলকের সময়কাল এবং এক ঝলক থেকে অন্য ঝলকের মধ্যবর্তী সময়ান্তরের মান বহু লক্ষ বছর ধরে এক থাকে। পালসারেরা যে ঝলক নিঃসৃত করে তার কাল-পরিমাণ 0.003 সেকেন্ড থেকে 0.16 সেকেন্ড।

পালসার একটা ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারা। এর ব্যাস হয় 15 থেকে 30 কিলোমিটার। এতে রয়েছে ঘন সন্নিবিষ্ট নিউট্রন। এদের ঘনত্ব প্রায় 10^8 বা 10 কোটি মেট্রিক টন প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। পালসার ইলেকট্রন ও পজিট্রনের ঘন প্লাজমা [Plasma]। পালসারের চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। পালসার যে বেতার তরঙ্গ নিঃসরণ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সে লাভ করে তার ঘূর্ণন গতি থেকে। তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্র এবং অতি ঘন প্লাজমা তাকে যোগায় বেতার তরঙ্গ বিকিরণের শক্তি। পালসারগুলি যেন আকাশের 'লাইট হাউস' [Light House]। লাইট হাউস যেমন নির্দিষ্ট সময় অন্তর জাহাজদের আলো দেখায় একটা নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণের জন্য, তেমনি পালসারগুলি সারা আকাশ জুড়ে বেতার তরঙ্গ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে পালসার নিয়ে সব কথা এখনও বলা যায় নি। নতুন নতুন আবিষ্কারে পালসারের অজানা দিকগুলি এখন জানা যাচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিগেল ক্যালডার পালসার সম্পর্কে লিখেছেন, "যে সমস্ত নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে বেশি ভারী তারা সূর্যের চেয়ে অনেক তীব্রভাবে প্রজ্বলিত। এদের জীবৎকাল অনেক কম। সুপারনোভার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণীয়ভাবে এদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় নক্ষত্রেরা তাদের লক্ষ লক্ষ বছরের অস্তিত্বে মোট যে পরিমাণ শক্তি নির্গত করেছে, দুই এক দিনে তার চেয়ে বেশি শক্তি নির্গত করে। এ ধরনের চিত্তাকর্ষক বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল 1054 সালে। চৈনিক জ্যোতির্বিদ্‌রা এই বিস্ফোরণ দেখেছিলেন। এই নক্ষত্রের টুকরোগুলি এখন দেখতে পাওয়া যায় এবং এরাই ক্র্যাব নেবুলাটি [Crab Nebula] সৃষ্টি করেছে। এই বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে শ্বেত বামনের পরিবর্তে যা আছে তাকে বলা হয় পালসার। এই পালসার নিয়মিতভাবে প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ বার জ্বলে উঠছে। শুধু তাই নয়, এর থেকে বেতার তরঙ্গরশ্মি ও দৃশ্যমান আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

পালসারকে 'নিউট্রন নক্ষত্র' বলা হয়। এ ধরনের নক্ষত্রে, মাধ্যাকর্ষণ নক্ষত্রের ভরকে এমন একটি গোলকে সংকুচিত করেছে যে, গোলকের ব্যাস দশ মাইল মাত্র। এখানে পদার্থের ঘনত্ব খুব বেশি এবং সামান্য পরিমাণ পদার্থের ওজন অত্যন্ত বেশি। এ ধরনের নক্ষত্রকে 'নিউট্রন নক্ষত্র' বলার একটি কারণ আছে। এটি হলো, তীব্র চাপের দরুণ এখানে বস্তু একটি অদ্ভুত অবস্থায় থাকে। এখানে মাধ্যাকর্ষণ তড়িৎ বলকে (যা পরমাণুর স্বাভাবিক আয়তন বজায় রাখে) অতিক্রম করে যায় এবং সমস্ত পরমাণুর কেন্দ্রকগুলিকে একসঙ্গে সংকুচিত করে। একটি পালসারের স্বরূপ ও প্রকৃতির আলোচনা একটি চমকপ্রদ বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো যে, ধ্বংস হয়ে গেলে একটি পালসার তার ভরের সমতুল স্থির শক্তির দশ শতাংশ ছেড়ে দেয়। এখানে মাধ্যাকর্ষণ যে কোন কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়াকে অতিক্রম করে যায় এবং বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে যে শক্তি পাওয়া যায় তার বেশ কিছু অংশ ছেড়ে দিতে শুরু করে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গী কোন নক্ষত্র থেকে পালসারের দেহত্বকে বস্তু ঝরে পড়ে। পতনের প্রচণ্ডতা এত বেশি যে, এতে বস্তুগুলি প্রজ্বলিত হয়। গরমে শুধু লালাভ হয় তা নয়, সাদাও হয় এবং এত তাপিত হয় যে, রঞ্জন রশ্মিও বের হতে থাকে। লয়প্রাপ্ত নক্ষত্র থেকে যেমন বেতার ও আলোক তরঙ্গ বেরিয়ে আসে, সেইরকম রঞ্জন-রশ্মিও নিয়মিতভাবে বেরিয়ে আসে। এর কারণ হলো পালসারের মধ্যে খুব শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র আছে যা বস্তুর পতনকে নিয়ন্ত্রিত করে ও নিজ দেহে উষ্ণ স্থানের সৃষ্টি করে। যেহেতু পালসার নিজ অক্ষের চারিপাশে ঘুরছে, সেই কারণে উষ্ণ স্থানগুলি বারংবার আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হয়।"

সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রদের মোট চারটি অবস্থার কথা বলছেন ঃ (1) কতকগুলি নক্ষত্র সুপারনোভা হয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে। তারা তাদের দেহের উপাদানগুলি ছড়িয়ে দিচ্ছে মহাকাশে। তারা রাখছে না কোনও নাক্ষত্র অবশেষ [Stellar Remnant] (2) কিছু নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চলে মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ কোয়ান্টাম প্রভাবের ফলে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয় এবং আপজাত্য চাপের ফলে তার থেকে সাদা বামন তারা জন্ম নেয় নাক্ষত্র অবশেষ হিসাবে; (3) কোনও নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি হলে বিস্ফোরণের পর ওই নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চল সাদা বামন না হয়ে আরও সংকুচিত হয়ে হয়ে যায় নিউট্রন তারা বা পালসার; (4) কোন নক্ষত্রের ভর যদি এতে বেশি হয়ে যায় যে, তার কেন্দ্রাঞ্চলের পদার্থের নিউক্লীয় বল তার মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়, তখন সংকোচন চলতে থাকে এবং নক্ষত্রটির বিবর্তন শেষ হয় 'কৃষ্ণ গহ্বর' [Black Hole]-এ।

এ পর্যন্ত যেটুকু আলোচনা করা হল তাতে নক্ষত্রের জন্মমৃত্যুর একটা মোটামুটি রূপরেখা পাওয়া গেল। নক্ষত্রদের বিবর্তনের আরও নানা পর্যায় রয়েছে। সেগুলির নাতিদীর্ঘ আলোচনায় আসার আগে এ পর্যন্ত যা আলোচিত হল তার সারসংক্ষেপ বলে নেওয়া যায়। সেগুলি হল ঃ

- হাইড্রোজেনের বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড থেকেই সাধারণতঃ নক্ষত্রেরা জন্ম নেয়। গ্যাসীয় পিণ্ডটি সংকুচিত হওয়ার ফলে ওটির কেন্দ্রস্থল উত্তপ্ত হয়। তার থেকে শুরু হয় তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া। জন্ম নেয় নক্ষত্রেরা।
- প্রারম্ভিক নক্ষত্রে চলতে থাকে p-p চক্র।
- পরিচিত নক্ষত্রগুলির অধিকাংশই তরুণ তারা। এরা হাইড্রোজেনকে ব্যবহার করছে জ্বালানী হিসাবে এবং এখন এরা মুখ্য পর্যায়ক্রমে রয়েছে।
- হাইড্রোজেন জ্বলন শেষ হয়ে গেলে নক্ষত্রটির বহিরাঞ্চল প্রসারিত হয় এবং ঠাণ্ডা হতে থাকে, কিন্তু*এর কেন্দ্রাঞ্চল সংকুচিত হয়। তবে এদের আয়তন খুব বড় হয়ে যায়। দেখতে লাল রংয়ের হয়। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'লাল দানব'।
- লাল দানবের কেন্দ্রাঞ্চল সংকোচনের ফলে যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে হিলিয়ামের তাপ কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হয়।
- নক্ষত্রে বিভিন্ন রকমের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া সম্ভব। প্রত্যেক রকমের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় হাল্কা মৌলগুলি ভারী মৌলে রূপান্তরিত হয়।
- তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার সংখ্যা যত বেশি হয়, তত বেশি সংখ্যক মৌল উৎপন্ন হয়।
- তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় হাল্কা মৌল থেকে ক্রমাগত ভারী মৌল উৎপন্ন হতে হতে এক সময় নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চলে লৌহ তৈরি হয় এবং তখন এর তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- যখন সব রকম সম্ভাব্য তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শেষ হয়ে যায়, তখন বহির্মুখী গ্যাসীয় চাপ কমে যায় এবং মৃত নক্ষত্র সংকুচিত হতে শুরু করে।
- মৃত নক্ষত্রগুলি থেকে বিভিন্ন অবস্থায় উৎপন্ন হয়—সাদা বামন তারা, নিউট্রন তারা এবং ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর। এটা নির্ভর করে আদি নক্ষত্রের ভরের উপর। চন্দ্রশেখর সীমার প্রবল ভূমিকা রয়েছে সাদা বামন, পালসার বা নিউট্রন তারা এবং কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টিতে।

1927 সালে ফাউলার [R. H. Fowler] সাদা বামন নক্ষত্রের সৃষ্টির ব্যাখ্যায় যে আপজাত্য চাপের অবতারণা করেন তা পরিপূর্ণতা লাভ করে চন্দ্রশেখরের আবিষ্কারে। নাক্ষত্র পদার্থবিজ্ঞানে

চন্দ্রশেখর-সীমা এক অনন্য সাধারণ আবিষ্কার। জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক নতুন দিগন্ত দান করেছে এই আবিষ্কার।

আগেই বলেছি, নক্ষত্রগুলিকে আকাশের গায় বিন্দুবৎ দেখালেও তারা আমাদের সূর্যের মত বড় কিংবা তার চেয়েও অনেকটাই বড়। আবার বেশ কিছু নক্ষত্র আছে যেগুলি সূর্যের চেয়ে কিছুটা ছোট। তারারা সবাই সূর্যের মতই জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। এদের রঙ বিভিন্ন। এদের রঙ নির্ভর করে এগুলির বহির্মণ্ডলের উষ্ণতার উপর। এদের কতকগুলি স্থিরভাবে আলো দেয়, আবার কতকগুলি আলো দেয় পর্যায়ক্রমে। শেষোক্তগুলির ঔজ্জ্বল্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ে কমে। অনেক তারাই একক আমাদের সূর্যের মত। কতকগুলি যুগ্মতারা। দুটি তারা একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে এক একটি যুগ্মতারায়। আবার কতকগুলি তারা তিনটি, চারটি কিংবা তারও বেশি সংখ্যক তারার জটিল সমন্বয়। এই সব তারা মহাকর্ষের বন্ধনীতে পরস্পরের সঙ্গে জটিলভাবে গ্রথিত।

সূর্য একটি সাধারণ ঔজ্জ্বল্যের তারা। বহু তারা আছে যেগুলি সূর্যের দূরত্বে থাকলে সেগুলি সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাতো। আকাশের উজ্জ্বল তারাগুলি সূর্যের 10,000 থেকে 1,000,000 গুণ আলো বিকিরণ করছে। ক্ষীণ তারাগুলি সূর্যের থেকে অনেক কম আলো বিকিরণ করে। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের প্রায় 70 গুণ। সবচেয়ে ক্ষীণ নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1/20 অংশ। এগুলি আমাদের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির চেয়ে অনেকটাই বড়। বৃহস্পতির ভর সূর্যের 1/1000 অংশ মাত্র। নক্ষত্রের বিকিরণ তার ভরের উপর নির্ভরশীল।

আবার মুখ্য ধারায় আসার পর সূর্য ক্রমাগত হাইড্রোজেন খরচ করে চলেছে। তার মূল হাইড্রোজেন ভাণ্ডার ক্রমাগত হাইড্রেজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে শেষ হয়ে আসছে। সূর্যের বর্তমান বয়স মোটামুটি 500 কোটি বছর। তার কেন্দ্রের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিঃশেষিত। এখনও এক-তৃতীয়াংশ হাইড্রোজেন রয়েছে। এতে আরও 500 কোটি বছর চলবে। এই হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরণের হার সূর্যের সেই অবস্থার ভরের আনুপাতিক। সূর্যের মুখ্য ধারায় আসা থেকে তার সব হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার মোট সময় 1000 কোটি [10^{10}] বছর। সূর্যের দ্বিগুণ ভরের কোনও নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এই সময়টা হবে 300 কোটি [3×10^9] বছর। আবার সূর্যের দশগুণ ভরের কোন নক্ষত্রের মোট আয়ুষ্কাল হবে অনেক কম এবং মাত্র কয়েক কোটি বছর।

মহাবিশ্বের কোনও বস্তুই স্থির নয়, সবই গতিশীল। আমাদের আকাশের নক্ষত্রেরাও প্রবল বেগে ছুটে চলেছে মহাকাশের বিভিন্ন দিকে। কিন্তু পৃথিবী থেকে এরা এতোদূরে অবস্থিত যে, আকাশের গায়ে এদের আমরা স্থির বলেই দেখি। গ্রহগুলি পৃথিবীর কাছাকাছি থাকায় এগুলিকে আমরা গতিশীল 'তারা' হিসাবে দেখতে পাই। যেমন, শুকতারা, সন্ধ্যাতারা ইত্যাদি। এগুলি মোটেই 'তারা' নয়। 'স্থির তারা' বলতে কিছু নেই। নক্ষত্রগুলিও প্রবল বেগে গতিশীল। কিন্তু নক্ষত্রদের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় আমরা তাদের স্থির দেখি। তাদের আমরা 'স্থির তারা' বা 'স্থির নক্ষত্র' বলি। যেমন, বারোটি রাশিচক্রে যে সাতাশটি নক্ষত্র বা তারামণ্ডলী রয়েছে তাদের আমরা স্থির নক্ষত্র হিসাবে ধরে নিয়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা হিসাব করে থাকি। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি প্রায় 2000 বছর আগে লুব্ধক [Sirius] নক্ষত্রকে যে অবস্থানে দেখেছিলেন আজ তিনি পৃথিবীতে এলে দেখতেন, লুব্ধক তাঁর সময়কার অবস্থান থেকে অন্ততঃ চাঁদের ব্যাসের প্রায় দেড়গুণ যতটা, ততটা সরে গেছে। লুব্ধকের স্থান পরিবর্তন ঘটেছে এই

2000 বছরে। কিন্তু সাধারণের কাছে আজও লুব্ধক স্থির অবস্থানে আছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানেন এই 2000 বছরে লুব্ধক কতটা সরে গেছে।

খ-গোলকে [Celestial Sphere] নক্ষত্রদের অবস্থান মাপা হয় কৌণিক ডিগ্রি, মিনিট, সেকেন্ড দিয়ে। এই অবস্থানের পরিবর্তন দেখে নক্ষত্রদের গতি নির্ণয় করা হয়। আরেকটা পদ্ধতিতেও এই গতি মাপা যায়। নক্ষত্রটির বর্ণালির রেখাগুলির অবস্থান বিশ্লেষণ করেও এদের গতিবেগ নির্ণয় করা যায় এবং বলা যায় নক্ষত্রটি আমাদের পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছে না কি কাছে চলে আসছে। লুব্ধক প্রতি বছরে সরে যায় 1.3 সেকেন্ড [কৌণিক]। 2000 বছরে তার সরণ 2600 সেকেন্ড যা চাঁদের ব্যাসের প্রায় 1.5 গুণ। পৃথিবী থেকে চাঁদের ব্যাসের কৌণিক মাপের দেড় গুণ হল 2000 বছরে লুব্ধকের ওই সরণ। 'বার্নার্ড নক্ষত্র' [Barnard's Star] নামের ক্ষীণ তারাটির সরণ সবচেয়ে বেশি। বছরে প্রায় 10 সেকেন্ড [কৌণিক] সুতরাং এই তারাটি 200 বছরেরও কম সময় চাঁদের ব্যাসের প্রায় সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। তবে সাধারণ নক্ষত্রদের সরণ বছরে এক সেকেন্ডের [কৌণিক] কয়েক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র হয়ে থাকে। কোন নক্ষত্র তার অবস্থানের এক সেকেন্ড [কৌণিক] সরণ ঘটাতে 10,000 বছর সময় নেয়। আবার বহু নক্ষত্র আছে যারা এক সেকেন্ড [কৌণিক] সরতে সময় নিচ্ছে 1,00,000 বছর। এই সব তারা আপাতভাবে স্থির নক্ষত্র। খুব কাছের ব্রহ্মাণ্ডের তারাগুলিকেও এইভাবে স্থির নক্ষত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু মহাবিশ্বে কোনও নক্ষত্রই স্থির নয়। কোনও কিছুই স্থির নয়।

নক্ষত্রদের সরণ ও দূরত্ব মাপার জন্য যেমন আলোকবর্ষ ব্যবহার করা হয় তেমনি ব্যবহৃত হয় আরও বড় একক 'পারসেক' [Parsec]। লম্বন পদ্ধতি নক্ষত্রের দূরত্ব কিংবা সরণ মাপতে পারসেক একক ব্যবহৃত হয়।

'আলোক বর্ষ' হল একটি আলোক রশ্মি এক বছরে শূন্যে যতটা পথ পাড়ি দেয় তাই। এই এককের পরিমাণটার একটা ধারণা দেবার জন্য বলি সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছয় আট মিনিটে। এক বছর আট মিনিটের চেয়ে যতগুণ বেশি একটি 'আলোক বর্ষ' পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের চেয়ে ততগুণই বেশি। কিলোমিটারে এই একক হবে 946000,0000,000 বা 9.46×10^{12}। তার মানে এক আলোক বর্ষ হল প্রায় 9½ শঙ্খ [Trillion] কিঃ মিঃ-র সমান।

তারার দূরত্ব মাপার দ্বিতীয় যে এককটি জ্যোতির্বিদদের পছন্দ, সেটি পার্সেক, তার উৎপত্তিটা আরো জটিল। এক কৌণিক সেকেন্ড—এই কোণ থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধব্যাস দেখতে হলে যতটা দূরত্ব পার হতে হয় পার্সেক হল সেই দূরত্ব। একটি তারা থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধব্যাস যে কোণে দেখা যায়, জ্যোতির্বিদ্যায় তাকে তারাটির 'বার্ষিক লম্বন' বলা হয়। 'পার্সেক' (Parsec) কথাটা এসেছে 'Parallax' (লম্বন) কথাটির সঙ্গে 'Second' কথাটি যোগ করে। পূর্বোক্ত তারা α সেন্টরির লম্বন হল 0.76 সেকেন্ড। সহজেই বের যায় এই তারার দূরত্ব হল 1.31 পার্সেক। 1 পার্সেক যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের 2,06,265 গুণের সমান তা বের করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। পার্সেকের সঙ্গে অন্য দৈর্ঘ্যমাপক এককের হার হল ঃ

1 পার্সেক = 3.26 আলোক বর্ষ = 3080000,00,00,000 কিঃ মিঃ = 30.8×10^{12} কি.মি.

কিন্তু কিছুদিন পরেই কিলোপার্সেকেও আর কুলালো না। জ্যোতির্বিদরা তখন 'মেগাপার্সেক' প্রচলিত করতে বাধ্য হন। এক মেগাপার্সেক হল 10 লক্ষ পার্সেকের সমান।

দৈর্ঘ্যের নাক্ষত্র এককের একটি তালিকা আবারো দেওয়া গেল ঃ

1 মেগাপার্সেক	= 10 লক্ষ পার্সেক,
1 কিলোপার্সেক	= 1 হাজার পার্সেক,
1 পার্সেক	= 2,06,265 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক,
1 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক	= 14,95,00,000 কিঃ মিঃ।

মেগাপার্সেক জিনিসটা কল্পনার বাইরে। এককিলোমিটারকে যদি মানুষের মাথার চুলের প্রস্থে নিয়ে আসি (0.05 মিঃ মিঃ) তাহলেও মেগাপার্সেক জিনিসটা মানুষের কল্পনার আয়ত্তে আসবে না। তখন সেটা হবে 15,000,00,000 কিলোমিটারের সমান। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের 10 গুণ বেশি।

একটা তুলনা দেওয়া যাক। তবেই পাঠক মেগাপার্সেক কত বিরাট ব্যাপার তা বুঝতে পারবেন। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত বিছানো মাকড়সা জালের সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন হবে প্রায় 10 গ্রাম, পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত টানা হলে তা 6 কিলোগ্রামের বেশি হবে না। এই একই তন্তুকে সূর্য পর্যন্ত টানলে তার ওজন হবে 2.3 টন। কিন্তু তাকে মেগাপার্সেক পর্যন্ত টানলে তার ওজন হবে 50000,00,00,000 টন!

লম্বন পদ্ধতি [Parallax Method] অবলম্বন করে নক্ষত্রের দূরত্ব কিংবা সরণ মাপার ব্যাপারটা বেশ কষ্টসাধ্য। এতে ± 0.005 সেকেন্ডের [কৌণিক] কমবেশি হতে পারে। কোনও নক্ষত্রের প্রকৃত লম্বন 0.010 সেকেন্ড হলে মাপজোকের সময় এই মান 0.005 থেকে 0.015 সেকেন্ডের মধ্যে যে কোন মান হতে পারে। সুতরাং লম্বন পদ্ধতিতে সঠিক মান পাওয়া যায় 65 আলোকবর্ষ দূরত্ব অবধি। 65 আলোকবর্ষ হল 20 পার্সেক। এক পার্সেক হল মোমাটুটি 3.26 আলোকবর্ষ। আরও অনেক পদ্ধতি আছে নক্ষত্রের দূরত্ব এবং সরণ মাপার।

নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যকে নাক্ষত্রমাত্রাও বলা হয়। আকাশের নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য আমরা যা দেখি তা ওদের আপাত ঔজ্জ্বল্য। সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি থাকা নক্ষত্রদের বেশি উজ্জ্বল দেখায়, আবার দূরের নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা বেশি হলেও তাদের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল দেখায়। সুতরাং নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য আমরা যা দেখি তা তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য নয়। এটি আপাত ঔজ্জ্বল্য।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা আছে এমন অনভিজ্ঞ লোকও জানেন যে কোন্ তারা প্রথম মাত্রার, কোন্ তারা প্রথম মাত্রার নয়। এই কথাগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত। কিন্তু প্রথম মাত্রার তারার চেয়েও উজ্জ্বল তারা বা শূন্য, এমন কি ঋণাত্মক মাত্রার তারার কথা তিনি হয়ত শোনেনওনি। তাঁর কাছে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ককে ঋণাত্মক মাত্রার তারা, সূর্যকে 'ঋণাত্মক 27তম মাত্রার তারা' বলে নির্দিষ্ট করা অসংগত মনে হবে। কেউ কেউ এতে ঋণাত্মক সংখ্যা (Negative Number) মতবাদের বিকৃতিও দেখেন। তবু আসলে এ হল ঋণাত্মক সংখ্যা তত্ত্ব অনুসরণের চমৎকার নিদর্শন।

প্রথমে মাত্রা দ্বারা নাক্ষত্র শ্রেণিভুক্তি বিষয়ে কয়েকটি তথ্য দেওয়া যাক। বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে 'মাত্রা' কথাটি তারাদের জ্যামিতিক আয়তন নয়, তাদের দৃষ্টিগত ঔজ্জ্বল্য বোঝায়। প্রাচীনেরা উজ্জ্বলতম তারাদের —মানে সন্ধ্যাকাশে যাদের সর্বপ্রথম দেখা যায়—তাদের প্রথম মাত্রার তারার শ্রেণিভুক্ত করেছেন। তারপর এসেছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আর সবশেষে ষষ্ঠ মাত্রার তারা — সে তারারা খোলা চোখে দেখার সীমানার শেষ প্রান্তে পড়ে। ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা তারাদের এই আত্মপ্রকাশক (Subjective) শ্রেণিভুক্তিতে পরবর্তীকালের জ্যোতির্বিদরা সন্তুষ্ট হলেন না। ঔজ্জ্বল্য শ্রেণিভুক্তির

আরো দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা হল। দেখা গেল, গড়ে উজ্জ্বলতম তারারা (সব তারা সমান উজ্জ্বল নয়) খোলা চোখে দেখার সীমানার শেষ প্রান্তবর্তী ক্ষীণতম তারাদের চেয়ে একশ গুণ উজ্জ্বল।

কাছাকাছি মাত্রার দুটি তারার ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত যাতে স্থির থাকে তার জন্য নাক্ষত্র ঔজ্জ্বল্যের একটা মান তৈরি করা হয়। 'অলোক তীব্রতার অনুপাত'-এর চিহ্ন যদি n হয়, তাহলে পাওয়া যায়ঃ

2য়	মাত্রার	তারারা	1ম	মাত্রার	তারাদের	চেয়ে	n গুণ ক্ষীণতর
3য়	,,	,,	2য়	,,	,,	,,	n গুণ ক্ষীণতর
4র্থ	,,	,,	3য়	,,	,,	,,	n গুণ ক্ষীণতর

1ম মাত্রার তারাদের সঙ্গে অন্য সব মাত্রার তারাদের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় দেখি ঃ

3য়	মাত্রার	তারারা	1ম	মাত্রার	তারাদের	চেয়ে	n^2 গুণ ক্ষীণতর
4র্থ	,,	,,	1ম	,,	,,	,,	n^3 গুণ ক্ষীণতর
5ম	,,	,,	1ম	,,	,,	,,	n^4 গুণ ক্ষীণতর
6ষ্ঠ	,,	,,	1ম	,,	,,	,,	n^5 গুণ ক্ষীণতব

পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে n^5 100। লগারিদ্‌মের সাহায্যে আলোক তীব্রতা অনুপাত n-এর গুণ বের করা খুবই সহজ ঃ

$$n = \sqrt[5]{100} \quad 2.5 \text{ বা } 2.512$$

এর মানে প্রতি মাত্রার তারারা তাদের পূর্ববর্তী মাত্রার তারাদের চেয়ে 2.5 গুণ ক্ষীণতর।

উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদল সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য দেওয়া যায়। আগেই বলেছি, তারাদের ঔজ্জ্বল্য সমান নয়। কোনোটা গড় উজ্জ্বলতার চেয়ে বহুগুণ বেশি উজ্জ্বল, অন্যগুলো ক্ষীণতর। গড় উজ্জ্বলতা হল খোলা চোঁখে দৃষ্ট তারাদের সীমানার প্রান্তবর্তী তারাদের চেয়ে একশ গুণ বেশি উজ্জ্বলতা।

গড় প্রথম মাত্রার তারাদের চেয়ে 2.5 গুণ বেশি উজ্জ্বল তারাদের ঔজ্জ্বল্যকে এখন চিহ্নিত করা যাক। 1-এর আগের সংখ্যা হল শূন্য। তাই এই তারাদের 'শূন্য' মাত্রার তারা বলা হয়। কিন্তু যে তারারা 1ম মাত্রার তারার চেয়ে 2.5 গুণ নয়, মাত্র 1.5 গুণ বা দ্বিগুণ উজ্জ্বল তাদের কোথায় রাখা হবে? তারা 1 আর শূন্যের মাঝখানে বসবে, তাই তাদের নাক্ষত্র মাত্রা জানান হয় ধনাত্মক (Positive) দশমিক ভগ্নাংশের সাহায্যে। যেমন, '0.9 মাত্রা' বা '0.6 মাত্রার' তারা ইত্যাদি। এই তারারা 1ম মাত্রার তারাদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল।

এইবার বোঝা যায় তারাদের ঔজ্জ্বল্য নির্দেশে কেন ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এখন শূন্য মাত্রার আলোক তীব্রতাকেও ছাড়ায় এমন উজ্জ্বল তারা আছে বলে তাদের ঔজ্জ্বল্য স্বভাবতই শূন্যের ওদিকের, তার মানে, ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবে। তাই ঔজ্জ্বল্যের এই সব সংকেত পাওয়া যায় —1, —2, —1.6, —0.9 ইত্যাদি ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কাজে তারার 'মাত্রা' নির্ধারিত হয় ফোটোমিটার যন্ত্র দিয়ে। একটি জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে যার আলোক তীব্রতা পরিচিত এমন একটি তারার ঔজ্জ্বল্য তুলনা করা হয়, কিম্বা ওই যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট একটা 'কৃত্রিম তারার' সঙ্গে।

নাক্ষত্র মাত্রা তারাদের ভৌতিক ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত বলে মনে করাটা ঠিক নয়। আমাদের দৃষ্টি থেকেই তাদের জন্ম। সব ইন্দ্রিয়ের পক্ষে যা প্রযোজ্য সেই 'ভেবার-ফেখনার মনঃ-শারীরবৃত্তিক নিয়ম'

থেকেই তা আসে। দৃষ্টির বেলায় এই নিয়ম দাঁড়ায় ঃ ভাস্বরতা যখন বদলায় জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometrical Progression), আলোক তীব্রতার অনুভূতি তখন বদলায় সমান্তর প্রগতিতে (Arithmetical Progression)।

ঔজ্জ্বল্যের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। এখন দেখা যাক 3য় মাত্রার কটি তারা একসঙ্গে একটি 1ম মাত্রার তারার সমান জ্বলবে। আমরা জানি 3য় মাত্রার তারারা 1ম মাত্রার তারাদের চেয়ে $(2.5)^2$ বা 6.3 গুণ ক্ষীণতর। কাজেই একটি 1ম মাত্রা তারার জায়গায় চাই 6.3টি 3য় মাত্রার তারা। সেই ভাবেই 15.8 টি 4র্থ মাত্রার তারা চাই 1ম মাত্রার একটি উজ্জ্বলতা আনতে। বিভিন্ন মাত্রার তারার কটি করে লাগবে একটি প্রথম মাত্রার তারার উজ্জ্বলতা আনতে তার হিসেবের ফল নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

অর্থাৎ 1ম মাত্রার একটি তারার জায়গায় অন্য মাত্রার কতগুলো তারা চাই তা জানান হল নীচের তালিকায় ঃ

2য়	2.5	7ম	250
3য়	6.3	10ম	4,000
4র্থ	16.0	11শ	10,000
5ম	40.0	16শ	10,00,000
6ষ্ঠ	100.0		

7ম মাত্রায় আমরা সীমানা পেরিয়ে খোলা চোখের বাইরের নক্ষত্র জগতে এসে পড়েছি। 16শ মাত্রার তারাদের কেবল মাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখা যায়। খোলা চোখে দেখতে হলে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি 10,000 গুণ বাড়া দরকার। তাহলে এখন আমরা 6ষ্ঠ মাত্রার তারাদের যেরকম দেখি তাদেরও সেরকমই দেখতে পাব।

অবশ্য এই তালিকায় 'প্রাক-প্রথম' মাত্রার তারাদের কথা নেই। তাদের কোন কোনটির হিসাব দেওয়া গেল; – 0.5 মাত্রার তারা (প্রোসিওন) $(2.5)^{0.5}$ বা 1ম মাত্রা তারার চেয়ে 1.5 গুণ উজ্জ্বলতর, – 0.9 মাত্রার তারা (ক্যানোপাস) হল $(2.5)^{1.9}$ বা 5.8 গুণ উজ্জ্বলতর, অথচ –1.6 মাত্রার তারা (লুব্ধক) হল $(2.5)^{2.6}$ বা 11 গুণ উজ্জ্বলতর।

শেষে আরেকটি কৌতূহলজনক হিসাব দিই ঃ খোলা চোখে দৃষ্ট তারারা যত আলো দেয় কতগুলো 1ম মাত্রার তারা সে আলো দিতে পারে?

ধরে নিচ্ছি, একটি গোলার্ধে 10টি 1ম মাত্রার তারা আছে। দেখা গেল, পরের পর্যায়ের তারাদের সংখ্যা হল পূর্ববর্তী পর্যায়ের প্রায় তিন গুণ বেশি। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে তারা 2.5 গুণ কম। কাজেই আমাদের যে সংখ্যার প্রয়োজন তা এই প্রগতির মোট ফলের সমান।

$$10+\left(10\times3\times\frac{1}{2.5}\right)+\left(10\times3^2\times\frac{1}{2.5^2}\right)+\ldots.+\left(10\times3^5\times\frac{1}{2.5^5}\right)$$

$$=\frac{10\times\left(\frac{3}{2.5}\right)^6-10}{\frac{3}{2.5}-1}=95$$

সুতরাং একটি গোলার্ধের খোলা চোখে দেখা সব তারার মোট ঔজ্জ্বল্য হল প্রায় 100টি 1ম মাত্রা তারা বা একটি – 4র্থ মাত্রা তারার সমান।

এরপর যদি শুধু খোলা চোখে নয়, আধুনিক দূরবীনে দেখা তারাদের নিয়ে হিসাব করি তবে দেখব তাদের ঔজ্জ্বল্য হল 1,100টি 1ম মাত্রা তারা বা একটি -6.6 মাত্রা তারার সমান। দূরবীনে তারা দেখার সঙ্গে খালি চোখে তারা দেখার তুলনা করা যাক।

রাত্রে দেখার সময় মানুষের তারারন্ধ্রের ব্যাস হল গড়ে 7 মিঃ মিঃ। একটি 5 সেঃ মিঃ দূরবীন $\left(\frac{50}{7}\right)^2$ বা মানুষের তারারন্ধ্রের চেয়ে 50 গুণ বেশি আলো ঢুকতে দেয়। একটা 50 সেঃ মিঃ দূরবীন মানুষের তারারন্ধ্রের চেয়ে 5,000 গুণ বেশি আলো ঢুকতে দেয়। তারাদের ঔজ্জ্বল্য দূরবীন অতটা পরিমাণই বাড়ায়। (এ কেবল তারাদের বেলাতেই খাটে। গ্রহদের বেলায় যাদের চক্র দেখা যায়, খাটে না। গ্রহ রূপের ঔজ্জ্বল্য হিসাব করতে হলে দূরবীনের বর্ধন ক্ষমতাটা হিসাবে ধরা প্রয়োজন।)

এটা জানা দরকার যে, কোন এক মাত্রার তারা দেখতে হলে কত ব্যাসের দূরবীন লেন্‌স প্রয়োজন। আমাদের আরো জানতে হবে নির্দিষ্ট লেন্‌সের একটি দূরবীন দিয়ে কোন্ মাত্রার তারা দেখা সম্ভব। ধরা যাক, আমরা জানি যে একটি 64 সেঃ মিঃ দূরবীন 15শ মাত্রার তারা অবধি সব মাত্রার তারাকে ধরতে পারে। পরের পর্যায় 16শ মাত্রার তারা দেখতে হলে কতটা ব্যাসের লেন্‌স দরকার হবে?

$$\frac{x^2}{64^2} = 2.5$$

এই অনুপাতে x হল লেন্‌সের অজ্ঞাত ব্যাস। আমরা পাচ্ছি

$$x = 64\sqrt{2.5} \approx 100 \text{ সেঃমিঃ।}$$

কাজেই, আমাদের দরকার এক মিটার ব্যাসযুক্ত লেন্‌সের একটি দূরবীন। সাধারণতঃ পরবর্তী নাক্ষত্র মাত্রা ধরার জন্য দূরবীনের বিবধনশক্তি বাড়াতে হলে লেন্‌সের ব্যাসকে $\sqrt{2.5}$ বা 1.6 গুণ বাড়াতে হবে।

জ্যোতিষ্কদের বেলাতেও আমাদের বীজগাণিতিক হিসাব চালান যাক। তারার ঔজ্জ্বল্য মাপার মানকে আমরা স্থির তারা ছাড়াও অন্য জ্যোতিষ্কদের ক্ষেত্রে লাগাতে পারি—গ্রহ সূর্য আর চাঁদের বেলাতেও। গ্রহদের ঔজ্জ্বল্যের কথা পরে বিশেষভাবে বলব। এখন বলব সূর্য আর চাঁদের নাক্ষত্র মাত্রার কথা। সূর্যের নাক্ষত্র মাত্রা হল -26.8, পূর্ণচন্দ্রের -12.6। ধরে নিচ্ছি, আগের পাতাগুলো পড়ার পর পাঠকরা নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন দুটো সংখ্যাই কেন ঋণাত্মক সংখ্যা। আসলে অবাক করবে সূর্য আর চাঁদের মাত্রার আপাত কম পার্থক্য। বলা যেতে পারে প্রথমটি 'পরেরটির দ্বিগুণ মাত্র'।

একথা ভুললে চলবে না যে নাক্ষত্র মাত্রা আসলে হল 2.5-এর উপর নির্ভরশীল এক ধরনের লগারিদ্‌ম। সংখ্যার তুলনার বেলায় একটির লগারিদ্‌মকে অন্যটির দ্বারা ভাগ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি নাক্ষত্র মাত্রার তুলনার বেলায়ও একটিকে আরেকটি দিয়ে ভাগ করা যায় না। সঠিক তুলনার ফল পাওয়া যাবে নীচের হিসাবটিতে।

সূর্য, তার নাক্ষত্র মাত্রা হল -26.8, একটি 1ম মাত্রার তারার চেয়ে $(2.5)^{27.8}$ গুণ বেশি উজ্জ্বলতর। চাঁদ সেখানে $(2.5)^{13.6}$ গুণ বেশি উজ্জ্বল।

কাজেই সূর্যের ঔজ্জ্বল্য পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে $\frac{(2.5)^{27.8}}{(2.5)^{13.6}} \approx (2.5)^{14.2}$ গুণ বেশি । লগারিদ্‌ম তালিকার সাহায্যে গণনা করে আমরা 4,47,000 সংখ্যাটি পাই। সুতরাং সূর্য আর চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের নির্ভুল অনুপাত বলা যায় এই রকম ঃ পরিষ্কার দিনে আমাদের আহ্নিক ভাস্কর পৃথিবীতে মেঘমুক্ত রাত্রের 4,47,000টি পূর্ণচন্দ্রের সমান আলো দেয়।

চাঁদ যে পরিমাণ তাপ দেয় তাকে যদি তার আলোর পরিমাণের আনুপাতিক বলে মনে করি— সেটা হয়তো সত্য অবস্থার কাছাকাছিই যাবে — তাহলে সে সূর্যের চেয়ে 4,47,000 গুণ কম তাপ দেয় বলে মনে করা যেতে পারে। জ্যোতির্বিদরা জানেন যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রান্তসীমায় প্রতিটি বর্গ সেন্টিমিটার সূর্য থেকে প্রতি মিনিটে দুই ক্যালোরি তাপ পায়। সুতরাং চাঁদ পৃথিবীর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারকে মিনিটে এক ক্যালোরির 2,23,500 ভাগের বেশি তাপ দেয় না। তার মানে সে তাপ এক মিনিটে এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রির 2,23,500 ভাগ গরম করবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়ায় চাঁদের আলোর তাপমাত্রার প্রভাবের কথা প্রায় ভিত্তিহীন।

পূর্ণিমার আলোয় প্রায়ই মেঘ গলে যায়, এ-রকম একটা ধারণা খুবই প্রচলিত। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তার কারণ হল মেঘের রাত্রে মিলিয়ে যাওয়াটা (যার কারণ অন্য) কেবল চাঁদের আলোতেই লক্ষিত হয়।

এখন চাঁদকে ছেড়ে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের চেয়ে সূর্য আপাতভাবে কত গুণ বড় তাই দেখব। আগের সূত্র অনুসরণ করে আমরা দেখব ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত হবে ঃ

$$\frac{2.5^{27.8}}{2.5^{2.6}} = 2.5^{25.2} = 1000,00,00,000 = 10^{10}$$

তার মানে, সূর্য লুব্ধকের চেয়ে 1,000 কোটি গুণ বেশি উজ্জ্বল।

এখন আরেকটি কৌতূহলজনক হিসাব করা যাক। একটা গোলার্ধের আকাশের সমস্ত তারা মিলিতভাবে যত আলো দেয় পূর্ণিমার চাঁদের আলো তার চেয়ে কতগুণ বেশি উজ্জ্বল? আগেই হিসাব করে দেখেছি 1ম থেকে 6ষ্ঠ মাত্রার সব তারা 1ম মাত্রার 100টি তারার সমান আলো দেয়। সুতরাং আমাদের কাজ হল কেবল 1ম মাত্রার 100টি তারার চেয়ে চাঁদ কতগুণ উজ্জ্বল তা বের করা। সেটা হল $\frac{2.5^{13.6}}{100} = 2{,}700$ -র সমান।

কাজেই একটি পরিষ্কার চন্দ্রহীন রাত্রে তারারা পূর্ণিমার চাঁদের কেবল 1/2,700 ভাগ আলো দেবে। তারাদের এই আলো মেঘমুক্ত দিনে সূর্যের চেয়ে 2,700 × 4,47,000 বা 120,00,00,000 গুণ কম। এখানে বলি, এক মিটার দূরের একটা সাধারণ আন্তর্জাতিক 'মোমবাতি'র নাক্ষত্র মাত্রা হল –14.2, তার মানে অতটা দূরে তা $(2.5)^{14.2 - 12.6}$ বা $(2.5)^{1.6}$ আলো দেয় বা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে চার গুণ উজ্জ্বলতর।

একটি কথা কৌতূহলজনক মনে হবে যে, বিমানের বেকন আলো যার জোর হল 200 কোটি মোমবাতির সমান, তাকে পৃথিবী থেকে চাঁদের সমান দূরে নিয়ে গেলে 4.5 মাত্রার তারার মতোই সে চোখে পড়বে, মানে খালি চোখে দেখা যাবে।

এতক্ষণ যে ঔজ্জ্বল্যের কথা বলা হল তা একান্তই চাক্ষুষ ঔজ্জ্বল্যের কথা। সংখ্যাগুলো জ্যোতিষ্কদের

প্রকৃত দূরত্বে যে ঔজ্জ্বল্য তার কথাই বলেছে। কিন্তু আমরা জানি তারারা সবাই সমান দূরে নয়। কাজেই তাদের চাক্ষুষ ঔজ্জ্বল্য একই সঙ্গে তাদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য আর আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের কথা বলে, বা, আরো ঠিকভাবে বললে বলতে হয়, ও দুটোর একটার কথাও বলে না, যতক্ষণ না দুটোকে আলাদা করছি। এখন এটাও জানা প্রয়োজন যে বিভিন্ন তারা সমান দূরে থাকলে তুলনায় তাদের ঔজ্জ্বল্য বা তথাকথিত 'ভাস্বরতা' কী পরিমাণ হত।

এইভাবে প্রশ্ন তুলে জ্যোতির্বিদরা 'পরম' নাক্ষত্র মাত্রার ধারণার জন্ম দিয়েছেন, তার মানে, এটি আমাদের কাছ থেকে 10 'পার্সেক' দূরত্বের একটি তারার মাত্রা। আগেই বলেছি, পার্সেক হল তারাদের দূরত্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক। আবার বলি, এক পার্সেক হল প্রায় 3080000,00,00,000 কিঃ মিটার। আবার দূরত্ব যদি জানি সেই সঙ্গে একথাও যদি খেয়াল রাখি যে, ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে, তাহলে সহজেই 'পরম নাক্ষত্র মাত্রা' বের করা যায়।

দুটো হিসাবের কথায় আসি। লুব্ধক আর সূর্যের হিসাব। লুব্ধকের পরম মাত্রা হল + 1.3, সূর্যের + 4.8। তার মানে 3080000,00,00,000 কিঃ মিটার দূর থেকে লুব্ধককে 1.3 মাত্রার তারার মতো দেখাবে। 4.8 মাত্রার সূর্য হবে লুব্ধকের $\frac{2.5^{4.8}}{2.5^{1.3}} = 2.5^{3.5} = 25$ গুণ ক্ষীণতর, যদিও সূর্যের দৃষ্টিগত ঔজ্জ্বল্য লুব্ধকের চেয়ে 1000,00,00,000 গুণ বেশি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সূর্য মোটেই আকাশের উজ্জ্বলতম তারা নয়। কিন্তু তার সঙ্গী তারাদের মধ্যে সূর্যকে বামন বলে মনে করাটাও খুবই অন্যায়। কারণ তার ভাস্বরতা সাধারণের ঊর্ধ্বে। নাক্ষত্র পরিসংখ্যান অনুযায়ী সূর্যকে ঘিরে থাকা 10 পার্সেক পর্যন্ত দূরত্বের গড় ভাস্বরতার তারারা হল 9ম পরম মাত্রার তারা। সূর্যের পরম মাত্রা 4.8, তার মানে সূর্য হল

$\frac{2.5^{8}}{2.5^{3.8}} = 2.5^{4.2}$ গুণ বেশি উজ্জ্বল 'প্রতিবেশী' গড় তারার চেয়ে।

সুতরাং সূর্য লুব্ধকের চেয়ে 25 গুণ ক্ষীণতর হলেও চারপাশের গড় তারার চেয়ে 50 গুণ উজ্জ্বলতর।

উপরের 'পরম নাক্ষত্র মাত্রা'র হিসাবের সূত্র হল ঃ $2.5M = 2.5m\left(\frac{\pi}{0.1}\right)^2$ । এখানে M হল তারার পরম মাত্রা, m হল তার দৃষ্টিগত মাত্রা, আর π প্রতি সেকেন্ডে তারার লম্বন। হিসেবের পারম্পর্য হল এই ঃ

$$2.5^{M} = 2.5^{m} \times 100\pi^{2}$$

$$M\ lg\ 2.5 = m\ lg\ 2.5 + 2 + 2\ lg\ \pi$$

$$0.4M = 0.4m + 2 + 2\ lg\ \pi$$

সুতরাং,

$$M = m + 5 + 5\ lg\ \pi$$

যেমন, লুব্ধকের ক্ষেত্রে, m = –1.6 আর $\pi = 0''.38$ । কাজেই তার পরম মাত্রা হবে M = – 1.6 + 5 + 5lg 0.38 = 1.3।

আমাদের আকাশের 20টি সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাক্ষত্র মাত্রা, দূরত্ব, চরম নাক্ষত্রমাত্রা, আপাত নক্ষত্র মাত্রা, বর্ণালির শ্রেণি নীচের তালিকায় দেওয়া হল। নক্ষত্রগুলিকে তাদের ঔজ্জ্বল্যের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। ·

● কুড়িটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ●

[ঔজ্জ্বল্যের ক্রমানুসারে]

ক্রমিক সংখ্যা	তারার নাম	আপাতমাত্রা	বর্ণালি শ্রেণি	প্রকৃত মাত্রা	দূরত্ব (পার্সেক)
1.	লুব্ধক [Sirius]	-1.47	A1V	+1.4	2.7
2.	অগস্ত্যতারা [Canopus]	0.73	FO Ib	–30	5.6
3.	আলফা সেন্টাউরি [Alpha Centauri]	0.33	G 2V	+4.7	1.33
4.	অভিজিৎ নক্ষত্র [Vega]	0 04	AOV	+0.5	8.10
5.	স্বাতি নক্ষত্র [Arcturus]	0.06	K2 111p	–0.2	11.10 •
6.	স্থানুরুদ্র বা বাণলিঙ্গ [Rigel]	0.08	B 8Ia	-7	250.00
7.	ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্র [Capella]	0.09	G 8III4F	- 0.6	13.7
8.	প্রশ্বা নক্ষত্র [Procyon]	0.34	F 5IV	+2.6	3.50
9.	আচের্নার [Achernar]	0.47	B 5 IV	2.7	4.40
10.	বিটা সেন্টাউরি [Beta Centauri]	0.50	B1 II	-3.4	62.00
11.	শ্রবণা নক্ষত্র [Altair]	0.77	A 7V	+2.3	5.10
12.	আর্দ্রা নক্ষত্র [Betelgeuse]	0.80	M 21 ab	–5.0	1.50
13.	রোহিনী নক্ষত্র [Aldebaran]	0.86	K 5 III	–0.7	20.80
14.	চিত্রা নক্ষত্র [Spica]	0.96	B1V	-2.4	48.00
15.	জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র [Antares]	*1.08*	*M II b*	-2.5	53.00

চিত্র : 29
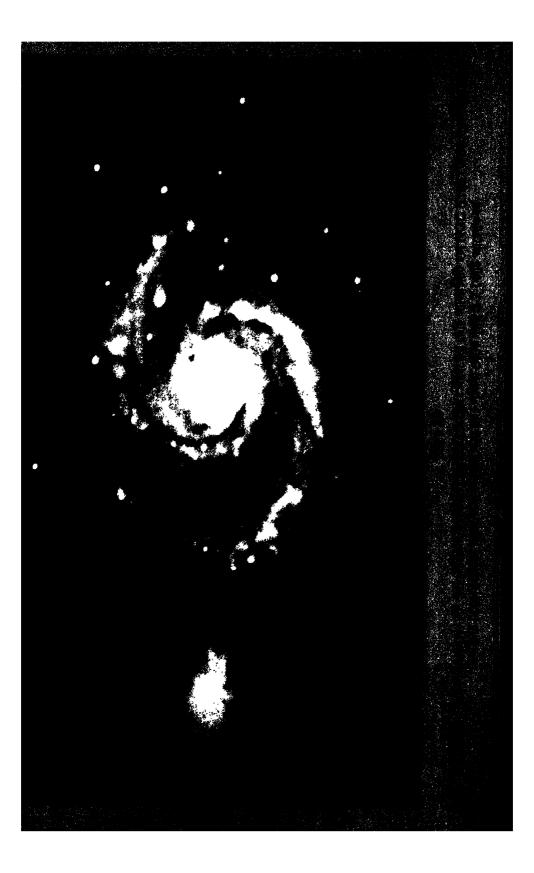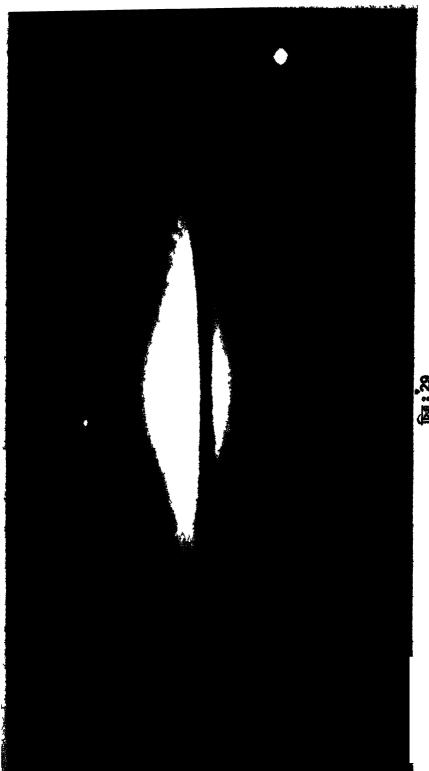
সোম্বেরো গ্যালাক্সী [Sombrero Galaxy]। এটি কন্যারাশি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম M 104 বা NGC 4594। পৃথিবী থেকে দূরত্ব 6·5 কোটি আলোকবর্ষ। এর প্রকৃত ব্যাস 1,35,000 আলোকবর্ষেরও বেশী

চিত্র ঃ 35

সংঘর্ষরত দুটি গ্যালাক্সী NGC 4038 এবং NGC 4039 হাবল দূরবীনের ছবি।

চিত্র : 37

অশ্বিনী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে দেখা যাওয়া একটি সর্পিল গ্যালাক্সী। এর নাম M 33 বা NGC 598। এর পরিচিত নাম 'Pinwheel' গ্যালাক্সী। ব্যাস 50,000 আলোকবর্ষ। দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষ।

চিত্র : 39

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডকে রাতের আকাশে যেমন দেখায়। তরুণ হাইড্রোজেন নতুন নক্ষত্র উৎপন্ন হওয়ার অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলির অবস্থান এর সর্পিল বাহুতে। বাঁদিকে রয়েছে নীহারিকা M8 বা NGC 6523।

চিত্র : 41

কালপুরুষ নীহারিকা। [Orion Nebula]। ছবিটি তোলা হয়েছে অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে [illegible] দূরবীনের [Vary Large Telescope] মাধ্যমে। এখানে চারটি উজ্জ্বল নবীন তারা দেখা যাচ্ছে। এদের নাম 'ট্রাপিজিয়াম তারা' [Trapezium Stars]। এই নীহারিকায় নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম M42 কিংবা NGC 1976। এর দূরত্ব 1500 আলোকবর্ষ, ব্যাস 25 থেকে [illegible] আলোকবর্ষ, ভর সূর্যের ভরের কয়েকশো গুণ।

চিত্র : 45

হেলিক্স নীহারিকা [Helix Nebula]। কুম্ভরাশির নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত। এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। পৃথিবী থেকে দূরত্ব [illegible] আলোকবর্ষ। এটি NGC-7293 নামে [illegible]
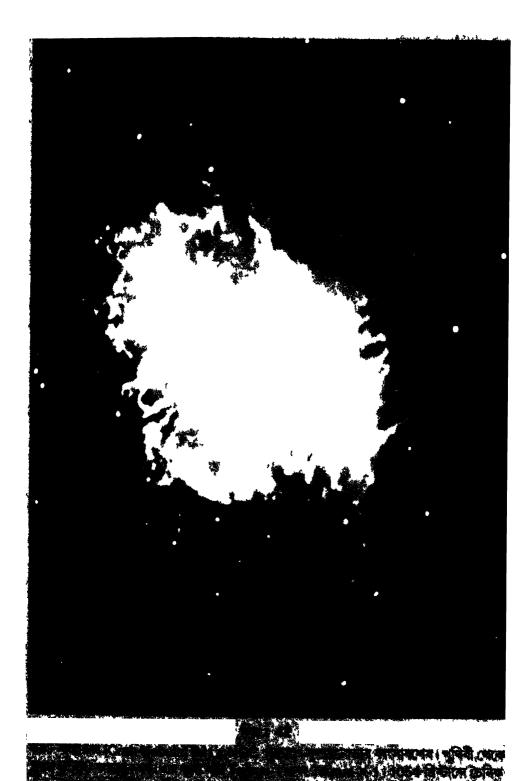
16.	পুনর্বসু নক্ষত্র [Pollux]	1.15	K 0 III	1.0	10.80
17.	ত্রিশঙ্কু নক্ষত্র [Formalhaut]	1.36	A 3V	2.0	6.90
18.	বিটা ক্রুসিস [Beta Crusis]	1.24	B 0 5 IV	5.0	175.00
19.	ছায়াগ্নি নক্ষত্র [Deneb]	1 26	A 2Ia	7 0	450.00
20.	মঘা নক্ষত্র [Regulus]	1.36	B 7V	0.7	25.80

তালিকা : 4

উপরের তালিকার লুব্ধক তারার একটি সাদা বামন সঙ্গী আছে, তার নাম 'লুব্ধক-খ'। এর কথা আগেও বলা হয়েছে। আলফা সেন্টাউরি পরিবারে আছে তিনটি তারা। এদের কথা একটু পরেই বলা হয়েছে। Rigel বা বাণলিঙ্গ তারার পরিবারে রয়েছে চারটি নক্ষত্র। এদের লম্বন মাপা কষ্টসাধ্য। তাই তালিকায় এর বিভিন্ন মানগুলি একেবারে নিশ্চিত মান নয়। ব্রহ্মহৃদয় [Capella] তারাটি একটি যুগ্ম তারা। বিটা সেন্টাউরিও একটি যুগ্ম তারা। আর্দ্রা নক্ষত্রও একটি যুগ্ম তারা এবং একটি অর্ধ-নিয়মিত চর [Semi-regular Variable]। রোহিনী নামের [Aldebaran] তারাটিও একটি যুগ্মতারা। চিত্রানক্ষত্র [Spica] একটি চর যুগ্মতারা। ইন্দ্র বা জ্যেষ্ঠা [Antares]-ও একটি অর্ধ-নিয়মিত চর এবং এর সঙ্গী একটি বামন তারা। ছায়াগ্নি নক্ষত্রটির যে সব তথ্য তালিকায় দেওয়া হয়েছে সেগুলি আনুমানিক। কারণ ছায়াগ্নি নক্ষত্রের দূরত্ব বিশাল, প্রায় 3.26×450 বা 1467 আলোকবর্ষ। Regulus বা মঘা নামক তারাটির পরিবারে তিনটি কিংবা চারটি নক্ষত্র রয়েছে। অর্থাৎ এর সঙ্গী সংখ্যা সম্ভবত দুটি কিংবা তিনটি। আশ্চর্য হল, এই নক্ষত্রগুলির বেশ কয়েকটির নাম সিদ্ধান্ত জ্যোতিষেও পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কৃত তথা বাংলা নামে। ঋগ্বেদে এদের অনেকগুলিকে পাওয়া যায় অন্য নামে। ঋগ্বেদীয় নামগুলি পরিবর্তিত হয়েছে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের কালে [2700 BC]। বাংলা নামগুলি এসেছে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের নামগুলি থেকে। প্রাচীন ভারতবর্ষ এইসব উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদের কথা ভালোভাবেই জানতো।

সবচেয়ে ভাস্বর তারা হল ৪ম মাত্রার একটি তারা। খালি চোখে তাকে দেখা যায় না। তারাটি ডোরাডো নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। লাতিন S অক্ষরটির দ্বারা চিহ্নিত এই তারা ও ডোরাডো নক্ষত্রপুঞ্জটি দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে। উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তাকে দেখা যায় না। এই তারাটি হল পাশের নক্ষত্র পরিবার ছোট ম্যাগেল্লানিক মেঘপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের কাছ থেকে লুব্ধকের চেয়ে 12,000 গুণ দূরে। বিরাট দূরত্বের ফলে ৪ম মাত্রার তারা হওয়া সত্ত্বেও তাকে দৃষ্টিগোচর হতে হলে অসাধারণ রকম ভাস্বর হতে হয়। লুব্ধক যদি অত দূরে থাকত তবে তাকে শূন্যে 17শ মাত্রার তারার মতো দেখাত, সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীনেও তাকে প্রায় দেখাই যেত না।

ওই বিশিষ্ট তারাটি তবে কতটা ভাস্বর? হিসাব করে এই ফল পাওয়া গেছে -9ম মাত্রা। তার মানে পরম সংখ্যায় তা সূর্যের চেয়ে প্রায় 4,00,000 গুণ উজ্জ্বলতর! এই ভাস্বরতম তারাটি যদি আমাদের কাছ থেকে লুব্ধকের সমান দূরে থাকত তবে তা তার চেয়ে 9 মাত্রা বেশি ঔজ্জ্বল্য পেত বা শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদের সমান উজ্জ্বল হত। লুব্ধকের সমান দূরত্ব থেকে এই তারা পৃথিবীকে এতটা আলো দিতে

পারতো যে, তাকে নিশ্চয়ই উজ্জ্বলতম পরিচিত তারা বলা চলতো। হিসাব মতো, এটিই সম্ভবতঃ আকাশের উজ্জ্বলতম দৃশ্যমান তারা।

পৃথিবীর আকাশে অন্যান্য গ্রহদের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল।

পৃথিবীর আকাশে ঃ

শুক্র	- 4.3	শনি	–0.4
মঙ্গল	–2.8	ইউরেনাস	+5.7
বৃহস্পতি	-2.5	নেপচুন	+7.6
বুধ	–1.2		

তালিকায় দেখা যাচ্ছে শুক্র হল বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় দুই নাক্ষত্র মাত্রা, তার মানে $(2.5)^2$ বা 6.25 গুণ উজ্জ্বলতর, আর $(2{\cdot}5)^{-2{\cdot}7}$ বা 13 গুণ উজ্জ্বলতর লুব্ধকের চেয়ে (লুব্ধকের ঔজ্জ্বল্য হল –1.6 মাত্রা)। আরো দেখা যাচ্ছে ক্ষীণদীপ্তি শনিগ্রহটি লুব্ধক আর কানোপাস ছাড়া অন্য স্থির নক্ষত্রদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। এতেই বোঝা যায়, শুক্র আর বৃহস্পতি গ্রহ দুটি কেন একেক সময় দিনের বেলায়ও খালি চোখে দেখা যায়, যদিও তারারা দিনের আলোয় খালি চোখে ধরা পড়ে না।

মঙ্গল, শুক্র ও বৃহস্পতির আকাশে অন্যান্য গ্রহদের ঔজ্জ্বল্য মাত্রা এইরকম ঃ

মঙ্গলের আকাশে		শুক্রের আকাশে	
সূর্য	- 26	সূর্য	27.5
ফোবাস	- 8	পৃথিবী	- 6.6
ডেউমোস	- 3.7	বুধ	– 2.7
শুক্র	- 3.2	বৃহস্পতি	- 2.4
বৃহস্পতি	- 2.8	চাঁদ	- 2.4
পৃথিবী	-- 2.6	শনি	-- 0.3
বুধ	– 0.8		
শনি	-- 0.6		

বৃহস্পতির আকাশে

সূর্য	– 23	4র্থ উপগ্রহ	– 3.3
1ম উপগ্রহ	-- 7.7	5ম ,,	– 2.8
2য় ,,	-- 6.4	শনি	– 2.0
3য় ,,	– 5.6	শুক্র	– 0.3

[illegible]

'পূর্ণ' মঙ্গলের (- 22.5), তারপর 5ম উপগ্রহের আকাশে 'পূর্ণ' বৃহস্পতির (- 21) আর মিমাসের আকাশে 'পূর্ণ' শনির (– 20)। শনি এখানে সূর্যের চেয়ে পাঁচ গুণ ক্ষীণতর!

বিভিন্ন গ্রহ থেকে অন্যান্য গ্রহদের কতটা উজ্জ্বল দেখায় তা নীচের তালিকায় আরও সহজ করে বলা হল ঃ

	নাক্ষত্র মাত্রা		নাক্ষত্র মাত্রা
বুধ থেকে শুক্র	– 7.7	শুক্র থেকে বুধ	– 2.7
শুক্র থেকে পৃথিবী	– 6.6	মঙ্গল থেকে পৃথিবী	– 2.6
বুধ থেকে পৃথিবী	– 5.0	পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি	– 2.5
পৃথিবী থেকে শুক্র	– 4.3	শুক্র থেকে বৃহস্পতি	– 2.4
মঙ্গল থেকে শুক্র	– 3.2	বুধ থেকে বৃহস্পতি	– 2.2
মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি	2.8	বৃহস্পতি থেকে শনি	-2.0
পৃথিবী থেকে মঙ্গল	- 2.8		

দেখা যাচ্ছে, প্রধান গ্রহদের আকাশে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হল বুধের আকাশে শুক্র, শুক্রের আকাশে পৃথিবী আর বুধের আকাশে পৃথিবী।

আমাদের নিকটতম নক্ষত্র পরিবার হল আলফা সেন্টাউরি [Alpha Centauri]। এই নক্ষত্রটি প্রথম মাত্রার যুগ্ম তারা। এর সঙ্গে রয়েছে একটি ছোট একাদশ মাত্রার তারা। তার ফলে আলফা সেন্টাউরি একটি ত্রয়ী তারার পরিবার। তৃতীয় তারাটি দুই ডিগ্রিরও বেশি ব্যবধানে থাকলেও এটি আলফা সেন্টাউরির পরিবারভুক্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে তার গতি নির্ধারণের ফলে। তিনটি তারাই একই বেগে একই দিকে চলছে। তৃতীয় তারাটির বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, সেটি অন্য দুটি তারার চেয়ে আমাদের নিকটতর। সুতরাং এই তারাটিই আমাদের সবচেয়ে কাছের তারা। এটি নিকটতম তারা বলে এর লাটিন নামকরণ করা হয়েছে 'প্রক্সিমা সেন্টাউরি' [Proxima Centauri]। এই তারাটি আলফা সেন্টাউরির অন্য দুটি তারার [আলফা সেন্টাউরি A এবং আলফা সেন্টাউরি B] চেয়ে প্রায় 0.18 আলোকবর্ষ বা 1.703×10^{12} কিলোমিটার নিকটতর। এক আলোকবর্ষ হল প্রায় 94607,00,000,000 কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে আলফা সেন্টাউরির দূরত্ব 4.4 আলোকবর্ষ। আরবের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছিল 'টোলিম্যান' [Toliman]। প্রক্সিমা সেন্টাউরির দূরত্ব 4.22 আলোকবর্ষ। এটিই আমাদের সবচেয়ে নিকটতম তারা। এদের লম্বনের [Parallax] পরিমাপ হল ঃ

আলফা সেন্টাউরি A ও B	0.751
প্রক্সিমা সেন্টাউরি	0.762

A ও B তারা দুটির মধ্যে দূরত্ব মাত্র 34 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক বা $34 \times 1,496 \times 10^5$ কিলোমিটার বা 508.64 কোটি কিলোমিটার মাত্র। প্রক্সিমা থেকে A বা B তারার দূরত্ব প্রায় 65.5 'আলোক দিন' বা $65.5 \times 24 \times 3600 \times 3 \times 10^5$ কিমি বা 1.70×10^{12} কিলোমিটার (প্রায়)।

এই তারাগুলো ধীরে ধীরে জায়গা বদল করে। A আর B তারা দুটি তাদের সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রকে একবার পাক দেয় 79.9 বছরে। প্রক্সিমার এই আবর্তনে 1,00,000 বছরেরও বেশি সময় লাগে। কাজেই সে যে শীগ্গিরি আলফা সেন্টাউরি পরিবারের আরেকজনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে এমন ভয়ের কোন কারণ নেই। আলফা সেন্টাউরি ঔজ্জ্বল্য, ভর এবং ব্যাসের দিক থেকে সূর্যের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে। অর্থাৎ এর ভর, ঔজ্জ্বল্য ও ব্যাস সূর্যের চেয়ে বেশি। আলফা সেন্টাউরি B-র ভর সূর্যের চেয়ে একটু কম, তার ব্যাস সূর্যের 1.2 গুণ। তার ঔজ্জ্বল্য সূর্যের 33% মাত্র। তার বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা 4,400 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কিন্তু সূর্যের 6,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থিত কুড়িটি তারার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। এগুলিকে দূরত্বের ক্রমানুসারে তালিকায় সাজানো হয়েছে।

● কুড়িটি নিকটতম নক্ষত্র ●

[ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে]

ক্রমিক সংখ্যা	নক্ষত্রের নাম	আপাতমাত্রা	বর্ণালি শ্রেণি	প্রকৃত মাত্রা	দূরত্ব (পার্সেক)
1.	আলফা সেন্টাউরি [Alpha Centauri]	0.33	G 2V	+4.7	1.33
2.	বার্নার্ড তারা [Barnard's Star]	9.5	M 5	13.2	1.81
3.	উল্‌ফ 359 [Wolf 359]	1.5	M 8	16.7	2.32
4.	লাল্যান্ডে 21185 [Lalande 21185]	7.5	M 2	10.5	2.49
5.	লুব্ধক [Sirius]	1.5	A1	1.4	2.65
6.	লুইটেন 726-8 [Luyten 726-8]	12.5	M6	15.3	2.74
7.	রস 154 [Ross 154]	10.6	M 5	13.3	2.90
8.	রস 248 [Ross 248]	12.2	M6	14.7	3.15
9.	এপ্‌সিলন ইরিদানি [Epsilon Eridani]	3.7	K 2	6.1	3.28
10.	লুইটেন 789-96 [Luyten 789-96]	12.2	M 6	14.6	3.31
11.	রস 128 [Ross 128]	11.1	M 5	13.5	3.32
12.	61-ছায়াগ্নি নক্ষত্র [61 Cygni]	5.2	K5	7.5	3.42
13.	এপসিলন ইন্ডি [Epsilon Indi]	4.7	K 3	7.0	3.44
14.	প্রশ্বা নক্ষত্র [Procyon]	0.3	F 5	2.6	3.48
15.	এপসিলন 2398 [Epsilon 2398]	8.9	M 4	11.2	3.52
16.	গ্রুমব্রিজ-34 [Groombridge 34]	8.1	M1	10.4	3.55

17.	ল্যাকেইলে 9352 [Lacaille 9352]	7.4	M2	9.6	3.58
18.	তাউ সেটি [Tau Ceti]	3.5	G 8	5.7	3.66
19.	BD + 5^0 - 1668	9.8	M4	11.9	3.76
20.	ল্যাকেইলে 8760 [Lacaille 8760]	6.7	M1	8.8	3.85

তালিকা ঃ 5

এই তালিকার আলফা সেন্টাউরি আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। এটি তিনটি তারা সমন্বিত—আলফা সেন্টাউরি A, আলফা সেন্টাউরি B এবং প্রক্সিমা সেন্টাউরি। এদের মধ্যে প্রক্সিমা সেন্টাউরিই আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। বার্নার্ড তারা রয়েছে পূর্বাষাঢ়া [Ophiuchus] নক্ষত্রমণ্ডলীতে। উলফ-359 তারাটি আছে সিংহরাশিতে [Leo]। লাল্যান্ডে - 21185-তারাটি রয়েছে সপ্তর্ষিমণ্ডলে [Ursa Major]। আগেই বলেছি লুব্ধক একটি যুগ্মতারা। লুব্ধকের সঙ্গী লুব্ধক-খ একটি সাদা বামন [White dwarf]। রস-154 তারাটি আছে ধনুরাশিতে [Sagittarius]। রস-248 তারাটি আছে অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলী অঞ্চলে। লুইটেন-789-96 তারাটি আছে কুম্ভরাশিতে [Aquarius]। কন্যা রাশিতে আছে রস-128 তারাটি। 61-ছায়াগ্নি [61-Cygni] তারাটি একটি যুগ্মতারা। এপ্‌সিলন ইন্ডি তারাটিও একটি যুগ্মতারা। প্রোসিওন তারাটির একটি ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গী তারা আছে। এপ্‌সিলন -2398 তারাটি একটি যুগ্মতারা। এটি রয়েছে প্রশ্বা বা প্রোসিওন [Canis Minor] নক্ষত্রমণ্ডলীতে। গ্রুমব্রিজ-34 [Groombridge-34] তারাটি যুগ্মতারা এর অবস্থান অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীতে। ল্যাকেইলে-9352 [Lacaille-9352] তারাটি রয়েছে মীনরাশিতে [Pisces Australis]। BD + 5^0-1668 তারাটির অবস্থান প্রোসিওন বা প্রশ্বা [Canis Minor] নক্ষত্রমণ্ডলীতে। ল্যাকেইলে 8760 [Lacaille-8760] তারাটি রয়েছে মাইক্রোস্‌কোপিয়াম [Microscopium] নক্ষত্রমণ্ডলীতে।

নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য মাপার মোটামুটি চার রকম পদ্ধতি চালু আছে। আপাত ঔজ্জ্বল্য মাপা হয় আলোকবৈদ্যুত ফটোমিটার [Photoelectric Photometer] দিয়ে। এই যন্ত্রে আপতিত আলো কম মাপের বিদ্যুত উৎপন্ন করে। ফটোমিটার যন্ত্রে ওই তড়িতের পরিমাণ দেখে নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করা যায়। প্রমাণ নক্ষত্রের [Standard Star] অনুপাতে নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য নির্ণয় করা হয়। নক্ষত্রের রঙ দেখেও তার ঔজ্জ্বল্য নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন রঙের জন্য বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের স্কেল তৈরি করা হয়েছে। প্রমাণ নক্ষত্র হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, লুব্ধক এবং শ্রবণা [Altair]-কে। এই দুটি নক্ষত্রের ক্ষেত্রে আপাত ঔজ্জ্বল্য এবং 'নীল' ঔজ্জ্বল্য মাত্রা সমান। আবার লাল নক্ষত্র আর্দ্রা কিংবা জ্যেষ্ঠার [Antares] ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্য B যদি নীল ফিল্টার দিয়ে মাপা হয় তবে তাদের আপাত মাত্রা V অনেকটা ক্ষীণ দেখায়। এই দুই মাত্রার পার্থক্য অর্থাৎ B-V হল একটি নক্ষত্রের বর্ণ-সূচক [Colour Index]। এই পদ্ধতিতে একটা তালিকা বানানো হয় তারাদের এই তথ্যগুলি থেকে তাদের বর্ণ-সূচকগুলি দিয়ে। এই তালিকায় লুব্ধক থাকে শূন্য বিন্দুতে, কারণ এর ক্ষেত্রে B-V শূন্য, যেহেতু B এবং V উভয়ই সমান। লুব্ধকের চেয়ে বেশি নীল কোনও তারার বর্ণ-সূচক হবে ঋণাত্মক কারণ তার V হবে B-এর মানের চেয়ে বেশি। আবার লাল তারা আর্দ্রা বা জ্যেষ্ঠার [Antares] V এদের B-এর চেয়ে কম হওয়ায় এদের বর্ণ-সূচক হবে ধনাত্মক। ইন্দ্র বা জ্যেষ্ঠা তারার ক্ষেত্রে তা + 1.80 এবং আর্দ্রার ক্ষেত্রে তা +1.87 হয়।

নক্ষত্রের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য মাত্রা হল পৃথিবী থেকে এটি একটি নির্দিষ্ট প্রমাণ দূরত্বে অবস্থান করলে পৃথিবীতে এর ঔজ্জ্বল্য কতটা দেখায় সেই মাত্রা। এই প্রমাণ দূরত্ব হল 10 পার্সেক বা 32.6 আলোকবর্ষ। শ্রবণা [Altair] নক্ষত্রটির লম্বন 0.196 সেকেন্ড [কৌণিক]। এর অর্থ হল নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে 16.6 আলোকবর্ষ বা 5.1 পার্সেক দূরে রয়েছে। এই নক্ষত্রটির আপাত ঔজ্জ্বল্য মাত্রা প্রায় +0.8। কিন্তু এটি যদি 10 পার্সেক দূরে অবস্থিত হত তবে এর ঔজ্জ্বল্য মাত্রা অনেকটাই কম হত এবং সে মাত্রা +0.8-এর চেয়ে অনেকটাই ক্ষীণতর হত। এই মাত্রার কম হওয়াটা 1.5 হত। এইভাবে ওই নক্ষত্রটির প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য মাত্রা দাঁড়ায় +2.3। আমাদের সূর্যের প্রকৃত মাত্রা অনুরূপভাবে মাত্র +4.7 হয়। সাধারণ লগারিদম সূত্র দিয়ে আপাত ঔজ্জ্বল্য এবং প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের মাত্রার সম্পর্ক বের করা হয়েছে পৃথিবী থেকে কোনও নক্ষত্রের দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রকৃত মাত্রা = $V + 5 - 5 (\log d)$

যেখানে, V = আপাত ঔজ্জ্বল্য মাত্রা

d = পৃথিবী থেকে নক্ষত্রটির দূরত্ব পার্সেক এককে।

নক্ষত্রের আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণের সাহায্যে জানা যায় নক্ষত্রের গঠন এবং তার উপাদান। আমাদের সূর্যের অনুরূপ নক্ষত্রের বর্ণালি বিশ্লেসণ থেকে পাওয়া যায় নক্ষত্রের পরমাণুর মধ্যে প্রায় 92.5% হল হাইড্রোজেন পরমাণু, 7% হল হিলিয়াম পরমাণু এবং বাকী 0.5% হল অন্যান্য রাসায়নিক পরমাণু। ওজনের দিক দিয়ে বিচার করলে 1000 একক হাইড্রোজেনের সঙ্গে 300 একক হিলিয়াম এবং প্রায় 25 একক অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের, যেমন কারবন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন এবং লৌহের পরমাণু রয়েছে। সাধারণভাবে নাক্ষত্রিক গঠন এই ধরনের হলেও অনেক নক্ষত্র আছে যাদের বর্ণালি অন্য কথা বলে। সেখানে হিলিয়াম কিংবা হাইড্রোজেন ইত্যাদির অনুপাত ওই রকম থাকে না।

উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হল নীল সাদা রঙের লুব্ধক ও বাণলিঙ্গ [Rigel] নক্ষত্রদের বর্ণালি লাল দানব আর্দ্রার বর্ণালির থেকে অনেকটাই আলাদা। এর ফলে আলাদা নাক্ষত্রিক বর্ণালি বোঝাতে তাদের শ্রেণি বিভাগ করা হল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওই নাক্ষত্রিক বর্ণালির শ্রেণিবিভাগ করে নাম দিলেন O, B, A, F, G, K এবং M। কোনও নক্ষত্রের বর্ণালি এই বিভাগগুলির মধ্যে যেটির সঙ্গে মিলে যায়, সেই নক্ষত্রটিকে ওই নামের নক্ষত্র বা তারা বলা হয়। এইভাবে নক্ষত্রদের O-তারা, B-তারা, A-তারা ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। অধিকাংশ নক্ষত্রই O-M শ্রেণির মধ্যেই পড়ে। কিছু নক্ষত্র পুরোপুরি এই শ্রেণিবিভাগের মধ্যে পড়ে না। নক্ষত্রের বর্ণালি-শ্রেণি, বর্ণ-সূচক এবং বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত [চিত্র নম্বর 61 দেখুন]।

O-তারা ● এগুলির বর্ণ সূচক -0.3। এই তারাগুলি নীল তারাদের মধ্যে সবচেয়ে নীল। এদের বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা 25000 ডিগ্রি কেলভিন। এগুলিতে থাকে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন।

B- তারা ● এই সব তারাদের বর্ণসূচক –0.25 থেকে -0.05। এদের বর্হিমণ্ডলের উষ্ণতা $23,000^0$K থেকে $12,000^0$K। B-তারারা সবাই একরকম নয়। এইগুলিকেএদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে B0 থেকে B9 অবধি দশভাগে ভাগ করা হয়, যেখানে B0 হল উষ্ণতম এবং B9 হল শীতলতম B-তারা।

A-তারা ● এই তারাদের রঙ সাদাটে। এদের বর্ণসূচক হল প্রায় –0.05 থেকে +0.2 এবং বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা 11,000°K থেকে ৪000°K। লুব্ধক হল আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এর শ্রেণি AO কিংবা A2। এর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা 11000°K। আবার A8 ও A9 শ্রেণির নক্ষত্রদের উষ্ণতা ৪000°K। এই শ্রেণির তারাদের মধ্যে A0, A1, A2 তারায় প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে। একটু শীতলতর A শ্রেণির তারাদের মধ্যে আয়নিত ধাতুকণা পাওয়া যায়। A8, A9 শ্রেণির নক্ষত্রগুলিতে রয়েছে আয়নিত ক্যালসিয়াম কণার আধিক্য।

F-তারা ● হলুদাভ F-তারাদের বর্ণসূচক +0.2 থেকে +0.4 হয়। +0.2 হয় FO-র বর্ণালির জন্য এবং +0.4 হয় F৪ বা F9-এর বর্ণালির ক্ষেত্রে। সবচেয়ে উষ্ণ F তারার পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা প্রায় 7000°K। সবচেয়ে কম উষ্ণতার F-তারার পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা 6000°K-র কাছাকাছি। এতে হাইড্রোজেনের উপস্থিতি A-তারাদের তুলনায় কম, কিন্তু ধাতব পদার্থের উপস্থিতি বাড়তে থাকে।

G-তারা ● আমাদের সূর্য এবং ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্র এই শ্রেণির অন্তর্গত। হলদেটে লাল এই তারাদের বর্ণসূচক থাকে +0.5 থেকে +0.৪-এর মধ্যে। এদের বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা 6000°K থাকে G0, G1 ও G2 শ্রেণির তারার জন্য। অন্যান্য G তারার ওই উষ্ণতা থাকে 5000°K। এদের বর্ণালিতে খুবই স্পষ্টভাবে থাকে ক্যালসিয়াম রেখা। এতে কম হলেও হাইড্রোজেনের উপস্থিতি রয়েছে।

K-তারা ● কমলা-লাল K-তারাদের বর্ণসূচক থাকে +0.৪ থেকে +1.0-এর মধ্যে। এদের বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা 4000°K থেকে 3200°K হয়। বর্ণালিতে ক্যালসিয়াম রেখার সংখ্যা কমে যায়। হাইড্রোজেনের রেখাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে আসে। আণবিক শোষণ ব্যান্ডগুলি K0 থেকে K9 তারা পর্যন্ত বাড়তে থাকে।

M-তারা ● লালচে M-তারাগুলি অনেকটাই শীতলতর। এদের বর্ণসূচক হয় +2.0 থেকে +3.0 অবধি কিংবা তারও বেশি। এদের পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা 3000°k বা তারও কম হয়। এই তারাদের বর্ণালি বলে এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে টাইটানিয়াম অক্সাইড [Titanium, Oxide] রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আবার H-R পরিলেখর কথায় আসি। তারাদের বর্ণালির চরিত্র, প্রকৃত উজ্জ্বল্য মাত্রা এবং পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা নিয়ে এই পরিলেখ আঁকা হয়। বিংশ শতাব্দীর যে দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম এই পরিলেখ বানান তাঁরা হলেন ডেনমার্কের হার্ৎজস্প্রাং [Hertzsprung] এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি নোরিস রাসেল [Henry Noris Russell]। এঁদেরই পরিলেখ জ্যোতির্বিজ্ঞানে Hertzsprung-Russell পরিলেখ নামে বিখ্যাত। সংক্ষেপে একে H-R পরিলেখ [H-R Diagram] বলা হয়। এই পরিলেখতে তারার প্রকৃত মাত্রার প্রেক্ষিতে তাদের বর্ণালির শ্রেণি বসানো হয়।

ধরা যাক, মুখ্যক্রমে B বর্ণালিবিশিষ্ট একটি তারার পৃষ্ঠ-উষ্ণতা 18,000°K, যা সূর্যের পৃষ্ঠ-উষ্ণতার তিনগুণ। তারাটি সূর্যের 10,000 গুণ ঔজ্জ্বল্য সম্পন্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ স্তেফান [Josef Stefan] তাঁর সূত্রে বলেছিলেন যে, কোন তলে একক ক্ষেত্র থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ নিঃসৃত হয় সেই পরিমাণটা উষ্ণতার চতুর্থ ঘাতের [Fourth Power] সঙ্গে সমানুপাতিক। উষ্ণতা বাড়লেই বিকিরণ বেশ বাড়বে। সুতরাং ওই B তারাটি সূর্যের তুলনায় 3^4 বা 81 গুণ বেশি

শক্তি বিকিরণ করবে তার পৃষ্ঠদেশের একক ক্ষেত্রফলে। কল্পিত এই B-তারাটি যেহেতু ঔজ্জ্বল্যে সূর্যের 10,000 গুণ অতএব এর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল হবে $\frac{10,000}{81}$ × সূর্যের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল বা 125 × সূর্যের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল। এর অর্থ হল কল্পিত B-তারাটির ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের প্রায় 11 গুণ।

অনুরূপভাবে, কোনও লালদানব, যার স্বকীয় ঔজ্জ্বল্য আমাদের সূর্যের 10,000 গুণ এবং যার পৃষ্ঠদেশীয় উষ্ণতা 3000^0K, তার পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল হবে সূর্যের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফলের প্রায় 1,60,000 গুণ। এর অর্থ হল, এই তারাটি বিস্তারে সূর্যের প্রায় 400 গুণ হবে। সূর্যের জায়গায় এই তারাটিকে বসালে এটি আমাদের মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ অবধি বিস্তৃত হত। দানব তারাদের ভর সূর্যের ভরের 0.05 গুণের কম হয় না। দানব তারাদের ঘনত্ব বেশ কম হয়। এদের গড় ঘনত্ব আমাদের সূর্যের ঘনত্বের মাত্র 0.0000002 গুণ। সূর্যের ঘনত্ব হল 1.41 গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। দানব তারার একক ভর থেকে বিস্ময়কর পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। একটি ক্ষীণ বামন তারা তার একক ভর থেকে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তার প্রায় 50,000 গুণ শক্তি উৎপন্ন হয় একটি দানব তারার সমপরিমাণ ভরের পদার্থ থেকে।

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে এই পরিচ্ছেদে আগেই দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। নক্ষত্রদের শেষ পরিণতির পর্যায়ে আসে সাদা বামন, নিউট্রন তারা, পালসার এবং কৃষ্ণগহ্বর। কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে আলাচনার সময় শ্বেত গহ্বর ও কীট গহ্বরের কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কোয়াসারদের কথাও পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে। কোয়াসারদের কথা সামান্য বিস্তারিতভাবে বলে এই পরিচ্ছেদ শেষ করবো। তার আগে সাদা বামন লুব্ধক-খ-এর কথা আবারো একটু বলে নিই।

আগেই বলেছি, লুব্ধক নক্ষত্র আমাদের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এর একটি সঙ্গী নক্ষত্র আছে, যাকে বলা হয় 'লুব্ধক-খ'। এর অন্য নাম 'ডিজিটারিয়া'। এটি একটি সাদা বামন তারা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডরিখ বেসেল [Friedrich Bessel] এর উপস্থিতির কথা প্রথম বলেছিলেন। 1862 সালে আমেরিকার এক দূরবীন নির্মাতা আলভান ক্লার্ক [Alvan Clark] নতুন লেন্স পরীক্ষা করতে গিয়ে একে আবিষ্কার করেন। এর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য +11.5। যদিও এর বিকিরণ সূর্যের বিকিরণের 1/400 ভাগ, তবু এর রঙ লাল না হয়ে দেখা যায় নীল-সাদা। এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের 2.5 গুণ মাত্র। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় 7,900 মাইল। কিন্তু এর মহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রবল। এর ভর প্রায় সূর্যের সমান। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় 3,33,420 গুণ। আর পৃথিবীর ভর 5.974 $\times 10^{21}$ মেট্রিক টন। লুব্ধকের সঙ্গে এর ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত 10,000 : 1, এর ভরের অনুপাত 4 : 1, ঘনত্বের অনুপাত 0.42 : 27000। সুতরাং লুব্ধক-খ এই সাদা বামন তারাটির ঘনত্ব অতি বিশাল। লুব্ধকের ঘনত্বের প্রায় 64,300 গুণ। সাদা বামন তারাদের কথা এই পরিচ্ছেদের প্রথমের দিকে একবার বলা হয়েছে। লুব্ধক-খয়ের কথা আবারও বলা হল এদের ঔজ্জ্বল্য এবং ঘনত্বের কথা বোঝাতে।

আগেই বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মমৃত্যুর বিষয়ে এখন অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীদের নানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই আবিষ্কারগুলির আধিকাংশই সম্ভব হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। এতে মুখ্য অবদান রেখেছেন আইনস্টাইন, হাবল, এডিংটন, চন্দ্রশেখর প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। এখন আমরা সবাই জানি মহাকাশের মহাজাগতিক ধূলিকণা ও আন্তর্নাক্ষত্রিক গ্যাস থেকে নক্ষত্রেরা উৎপন্ন হয়। তারপর তাদের বিবর্তন হতে থাকে এবং সেগুলি নাক্ষত্র জীবনের

মূল ধারায় চলে আসে H-R রেখাচিত্র অনুসরণে। তারপর বহুকাল নক্ষত্র হিসাবে থাকার পর বিবর্তিত হয় মৃত্যুর দিকে। এই বিবর্তনের ফলে নক্ষত্রেরা হয়ে যায় সুপার নোভা, সাদা বামন, নিউট্রন তারা বা পালসার, কৃষ্ণগহ্বর, কীটগহ্বর, শ্বেতগহ্বর কিংবা কোয়াসার ইত্যাদি।

কালো নীহারিকাগুলিতে ধূলিকণা বেশি থাকে। এগুলি থেকেই বেশির ভাগ আদি নক্ষত্র [Protostar] জন্ম নেয়। এই নীহারিকাদের যেগুলি গোলাকার সেগুলিই নক্ষত্র হওয়ার পক্ষে অনেক বেশি উপযোগী। এই নীহারিকাদের ব্যাস 75,000 কোটি থেকে 15,00,000 কোটি কিলোমিটার হয়ে থাকে। এই সব নীহারিকার গ্যাসের পরিমাণ ধূলিকণার 50 থেকে 100 গুণ হতে পারে। মহাকর্ষীয় প্রভাবে এই নীহারিকারা সংকুচিত হতে থাকে এবং একসময় এরা আদিনক্ষত্র হয়ে যায়। আদিনক্ষত্র বিবর্তিত হয়ে নতুন তারা হয়। তখন এদের হাইড্রোজেন কেন্দ্রকীয় সংযোজনের মাধ্যমে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এটাকে বলা হয় 'কেন্দ্রকীয় সংযোজন' [Nuclear Fusion]। তরুণ নক্ষত্র তার হাইড্রোজেন খরচ করে করে আস্তে আস্তে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম, হিলিয়াম থেকে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি ভারী মৌল ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র। এর বর্তমান বয়স প্রায় 500 কোটি বছর। আরও 400 বা 500 কোটি বছর পরে সূর্যের ব্যাস হবে তার বর্তমান ব্যাসের দ্বিগুণ। সামনের 200 কোটি বছরে তার আয়তন বৃদ্ধি খুব অল্প হারে ঘটবে। মাত্র 5% বৃদ্ধি হবে তার ব্যাসের আগামী 100 কোটি বছরে। সূর্যের বিকিরণ বেড়ে যাবে 15%। পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাবে প্রায় 10^{0} কেলভিন। 500 কোটি বছর পরে খুব কম করে হিসাব করলেও সূর্যের আয়তন বৃদ্ধি পাবে এখনকার আয়তনের 30% এবং এর বিকিরণ বাড়বে প্রায় 70%। পৃথিবী যদি তখনও এই অবস্থানে থাকে তবে তার উষ্ণতা হবে 50^{0} কেলভিন। এরপর সূর্য লাল দানব তারা হয়ে যাবে। এর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যাবে প্রায় 200 গুণ। পৃষ্ঠ-উষ্ণতা নেমে আসবে 4000^{0}K-তে। পৃথিবীর আকাশে এখন সূর্যকে যতটা দেখায় তার 30 গুণ বড় দেখাবে। অবশ্য দেখার মত লোক তখন পৃথিবীতে কেউই থাকবে না। সূর্যের সমস্ত স্বকীয় শক্তি তখন নিঃশেষিত হবে। ফুরিয়ে যাবে তার সব হাইড্রোজেন জ্বালানী। সূর্য লালদানব তারা হওয়ার পর হবে একটা বিস্ফোরণ। তারপর ধীরে ধীরে এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল সাদা বামন তারা হয়ে যাবে, চন্দ্রশেখরের নিয়ম মেনে।

সূর্যের ভরের 1.4 গুণ ভরের বেশি নয় এমন নক্ষত্রেরা তাদের শেষ বয়সে সাদা বামন তারা হয়ে যায়। তারপর একসময় তা আর অলো দেয় না। তাদের মৃত্যু হয়। নক্ষত্রের ভর অনুসারে তাদের শেষ দশা কেমন হবে তা বলে দেওয়া যায়। আগেই বলেছি, যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি নয়, তারা তাদের নক্ষত্র জীবনের শেষ দশায় 'সাদা বামন' তারা হবে। এগুলি মহাবিশ্বের জ্বলন্ত অঙ্গার। যে সব তারার ভর সূর্যের ভরের 1.5 থেকে 3 গুণ, তারা তাদের জীবনের শেষ দশায় 'পালসার' বা 'নিউট্রন তারা' হবে। এর চেয়ে বেশি ভরের তারারা বিস্ফোরিত হয়ে 'সুপারনোভা' হবে। সুপারনোভা যারা হয় তাদের নাক্ষত্রিক জীবনের বিবর্তন খুবই দ্রুত হারে ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে তাদের দেহের বিশাল অংশ ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে, তার কেন্দ্রীয় অঞ্চল তৈরি করে 'কৃষ্ণগহ্বর'।
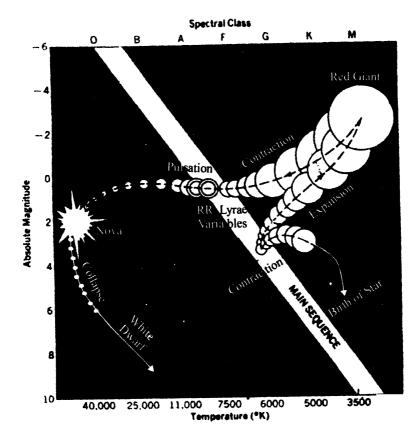
চিত্র ঃ 67

● একটি সাধারণ নক্ষত্রের জীবন-ধারা দেখানো হয়েছে উপরের H-R রেখাচিত্রে। প্রাথমিক গ্যাস ধূলিকণার অবস্থা থেকে আদি তারা চলে আসে নাক্ষত্র জীবনের মূল ধারায়। তার জীবনের বেশিটা সময় সে কাটায় এই মূল ধারায়। তারপর লাল দানব হয়। এরপর তারাটি আয়তনে ছোট হয়। বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এর শরীরের বাইরের অংশ আলাদা হয়ে যায়। সূর্যের চেয়ে 60-70 গুণ বড় নক্ষত্রেরা বিস্ফোরিত হয়ে সুপারনোভা হয়ে যায়। সূর্যের সমান বা তার চেয়ে 1.4 গুণ অবধি ভরের তারারা 'সাদা বামন' হয়ে যায়। সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি ভরের তারারা তাদের শেষ দশায় নিউট্রন তারা বা পালসার হয়ে যায়। ●

1960 খ্রিস্টাব্দ থেকে আধা-নাক্ষত্রিক [Quasistellar] বেতার উৎস আবিষ্কৃত হতে শুরু করে। এক রহস্যময় ও ধোঁয়াটে বস্তু এই সময় আবিষ্কৃত হয় যেগুলি আকারে বেশ ছোট হলেও, অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল। এরা পৃথিবী থেকে বিশাল দূরত্বে অবস্থিত এবং এরা অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি নিয়ত বিকিরণ করে চলেছে। সৌরমণ্ডলের থেকে আকারে খুব একটা বড় না হলেও, এরা একটা ব্রহ্মাণ্ডের 100 থেকে 1000 গুণ শক্তি বিকিরণ করছে, যা প্রায় 10,000 কোটি থেকে 1,00,000 কোটি তারার মোট বিকিরণের সমান। মনে করা হয়, এই আধা-নাক্ষত্রিক জ্যোতিষ্কদের অফুরন্ত প্রবল শক্তির উৎস হল অতি ভারী কৃষ্ণবস্তু [Dark Matter]। এরা চারপাশের নক্ষত্র গ্যাস আর ধূলিকণা গ্রাস করে নিজেরাই হয়ে উঠছে অফুরন্ত শক্তির উৎস।

আধা-নাক্ষত্রিক এইসব বেতার উৎসের প্রথমে নামকরণ করা হয় QSO (Quasi-Stellar Radio Source)। পরে জানা গেল, সব QSO শক্তিশালী বেতার উৎস নয়। 1964 খ্রিস্টাব্দে হোংইচিউ 3C-48, 3C-147, 3C-196, 3C-286 প্রভৃতি কয়েকটি আধা-নাক্ষত্রিক বেতার উৎসের নামকরণ করেন 'কোয়াসার' [Quasar]। সেই থেকে এই সব জ্যোতিষ্কের নাম হয়েছে 'কোয়াসার'। 3C হল কেম্ব্রিজের রেডিও তারার তৃতীয় ক্যাটালগ বা তালিকা। ওই তালিকার ক্রমিক সংখ্যা হল 48,147,196 ইত্যাদি। 1963 সালে মার্টিন স্মিড [Marten Schmidt] দেখলেন এদের তীব্র অতি বেগুনী বিকিরণ আছে। এরা যে অনেক দূরের বস্তু, সাদারণ নক্ষত্রের তুলনায় এরা অনেক ছোট, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এদের দীপ্তির দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গেছে। এদের গঠন ও ধর্ম আমাদের পরিচিত নক্ষত্র-শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। মহাকর্ষীয় লাল সরণের জন্য এদের কিছু দৃশ্য বিকিরণও ধরা পড়ে। এরা অমিত বিকিরণ সম্পন্ন। এতো ছোট আয়তনের জ্যোতিষ্ক থেকে এতো বিশাল বিকিরণ বিস্ময়কর। কোয়াসারদের নিয়ে আজও সব কথা বলা যায় নি। বিজ্ঞানীদের কাছে আজও এরা মহাজাগতিক বিস্ময়।

এতাবৎ প্রায় 1000 কোটি আলোকবর্ষ দূরের ব্রহ্মাণ্ডগুলি দেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোয়াসারগুলি আরও দূরের জ্যোতিষ্ক। 1960 সাল নাগাদ বেতার উৎস সম্পন্ন জ্যোতিষ্কদের যে তালিকা বানানো হয় তাতে 3C-273 নামের একটি জ্যোতিষ্কও ছিল। এই বেতার উৎসের জ্যোতিষ্কটি এমন এক অবস্থানে আছে যে এটি চাঁদের আড়ালে সহজেই চলে যেতে পারে। 1962 সালের 5ই আগস্ট এমনই একটা ঘটনা ঘটল। নিউ সাউথ ওয়েলসের পার্কস রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা চাঁদের আড়ালে চলে যাওয়া 3C-273-এর অবস্থান নির্ণয় করলেন। এর সম্পর্কে পাওয়া অন্য সব তথ্য পাঠানো হল ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার মানমন্দিরে। সেখানে 1963 সালে মার্টেন স্মিড বিশাল হেল রিফ্লেক্টারের [Hale Reflector] সাহায্যে ওই জ্যোতিষ্কটির আলোক বর্ণালি নিলেন। বর্ণালি বিশ্লেষণ করে স্মিড হতবাক হলেন।
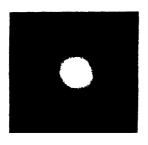
চিত্র ঃ 68

● কোয়াসার [Quasistellar Radio Source]। এটি HE 1013-2136-এর ছবি। এতে দেখা যাচ্ছে এদের ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতা বিস্ময়করভাবে প্রবল। ●

দেখা গেল, 3C-273 কোনও নক্ষত্রই নয়, বরং অতি বিস্ময়কর নাটকীয় কিছু। জানা গেল, এর দূরত্ব প্রায় 300 কোটি আলোকবর্ষ। এর উজ্জ্বলতা একটা ব্রহ্মাণ্ডের মোট উজ্জ্বলতার থেকে অনেক বেশি। এই ধরনের আরও কয়েকটি আরও দূরবর্তী জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হল। এরা 1964 সালে অভিহিত হল 'কোয়াসার' নামে। 3C-48 আরেকটি কোয়াসার। দেখা গেল, সেটি 3C-273-এর থেকেও লোহিত বর্ণের। তার দূরত্ব হিসাব করে পাওয়া গেল 1000 কোটি আলোকবর্ষ। কোয়াসারগুলি প্রচণ্ড

শক্তিশালী। তাই সাধারণ তারামণ্ডলীর তুলনায়, বহুদূরের কোয়াসার দেখতে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। স্মিড 1991 সালে আবিষ্কার করলেন 1300 কোটি আলোকবর্ষ দূরের PC 1247 + 3406 কোয়াসারটি। এটির থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে 1300 কোটি বছর সময় নেয়। এখন আমরা এটির 1300 কোটি বছর আগেকার অবস্থা দেখছি। ইতিমধ্যে তার কী দশা হয়েছে তা আমরা জানি না। কিন্তু এগুলিকে পরীক্ষা করে মহাবিশ্ব 1300 কোটি বছর আগে কেমন ছিল তা আমরা জানতে পারি। মহাবিশ্বের কৈশোরকালের অবস্থা এদের সাহায্যে আজ জানা সম্ভব হচ্ছে।

বেশ কিছু কোয়াসার আছে যারা বহুদূর থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে পারে। এই কোয়াসারগুলির কেন্দ্রস্থ ইলেকট্রনগুলি প্রায় আলোর গতিতে ত্বরান্বিত হতে পারে। যেহেতু কোয়াসারের শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে প্রচণ্ড গতিময় ইলেকট্রনরা কুণ্ডলীর আকারে চলে, ফলে অজস্র বেতার তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। একে Synchrotron Radiation বলা হয়। পৃথিবীর মানুষের তৈরি Synchrotron বা কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রে পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন চুম্বকক্ষেত্রের ভেতর শক্তিশালী ইলেকট্রন পাঠান, তখন ঠিক ওই রকম তরঙ্গ বিকিরণ পাওয়া যায়। এই তরঙ্গ বিকিরণ হল Synchrotron Radiation। এটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বিকিরণ। আর কোয়াসারগুলি প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি করে Synchrotron বিকিরণ।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে বহুদূরের কোয়াসার থেকে আসা আলো কোনও ভারী বস্তুর কাছে এসে বাঁক নেয়। তখন ওই আলো বাঁক নিয়ে ভিন্নপথে পৃথিবীতে পৌঁছায়। এর ফলে কোয়াসারটির কয়েকটি প্রতিবিম্ব [Image] পাওয়া যেতে পারে। 40 কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে G2237 + 0305 ব্রহ্মাণ্ড। এর পিছনে 800 কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে একটি কোয়াসার। কোয়াসারের আলো ওই ব্রহ্মাণ্ডের কাছ দিয়ে আসার সময় বেঁকে যায়। ফলে 'মহাকর্ষীয় লেন্সিং প্রভাব' [Gravitational Lensing Effect] -এর ফলে কোয়াসারটির চারটি প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। এটি 'আইনস্টাইন ক্রস' [Einstein Cross] নামে পরিচিত। কোয়াসারের একটি মাত্র প্রতিবিম্ব আমরা খুব কম দেখতে পাই। অনেকে মনে করেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রায় 100 কোটি বছর পরে প্রথম কোয়াসারটির সৃষ্টি হয়।

3C-446 কোয়াসারটির দীপ্তি 48 ঘন্টায় দ্বিগুণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এটির ব্যাস 0.005 আলোকবর্ষের মত। 0.005 আলোকবর্ষ হল $0.005 \times 9.4607 \times 10^{12}$ কিলোমিটার, বা 47.30×10^{9} কিলোমিটার বা 4730 কোটি কিলোমিটার। একটি সাধারণ ব্রহ্মাণ্ড চওড়ায় 1,00,000 আলোকবর্ষ, তার কেন্দ্রাঞ্চলের ব্যাস প্রায় 15,000 আলোকবর্ষ। এইরকম এক ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি বিকিরণ করে একটা কোয়াসার। রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইগর নোভিকভ এবং ইজরাইলের ইয়ুভ্যাল নীম্যান মনে করেন যে, কোয়াসার হল আসলে শ্বেতবিবর বা শ্বেতগহ্বর [White Hole]। কৃষ্ণগহ্বরের প্রান্তের কীটগহ্বর দিয়ে পদার্থ এসে কোয়াসারের রূপ নেওয়া এই জ্যোতিষ্কগুলি আসলে শ্বেতগহ্বর। এই কীটগহ্বর ও শ্বেতগহ্বরের অস্তিত্ব এখনও তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে কোয়াসারের অস্তিত্ব এবং ধর্ম অনেকটা এখন আমাদের জানা।

কেউ কেউ বলছেন, কোয়াসারেরা দীর্ঘজীবী, আবার কেউ বলছেন এগুলি ক্ষণজীবী। যাইহোক না কেন, এদের বয়স 1000 কোটি বছরের কম নয়। কোয়াসার অমর নয়। মরণের পরে এরা থাকে না, থাকে কেবল অতি ভারী কৃষ্ণগহ্বর। কোয়াসারের কাছাকাছি গ্যাস যখন সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে

যায়, তখন এর কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গ্যালাক্সীতে কিছু কিছু নক্ষত্র তখনও বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। এখনও মনে করা হয়, আমরা আমাদের চারপাশে যেসব নীহারিকা দেখতে পাই, এমন কি আমাদের নিজেদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত, এটি হয়ত কোনওকালে একটা কোয়াসার ছিল।
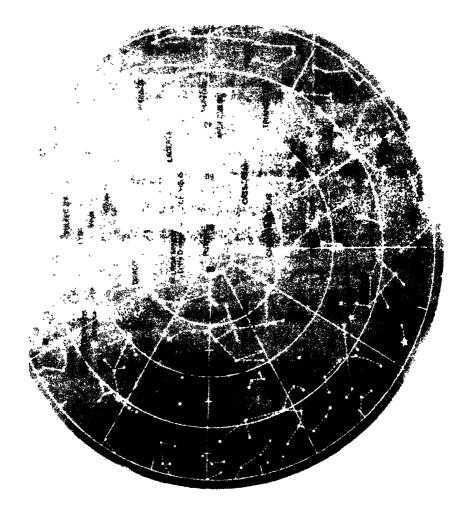
চিত্র ঃ 69

● উত্তর গোলার্ধের আকাশের নাক্ষত্রিক মানচিত্র। চিত্রের রেখাগুলি নক্ষত্র বা অন্য বস্তুর গাগনিক স্থানাঙ্ক নির্দেশ করছে। এককেন্দ্রিক বৃত্তগুলি অক্ষাংশ [Latitude] নির্দেশক। মহাবিষুব 0^0, গাগনিক উত্তরমেরু $+90^0$ এবং গাগনিক দক্ষিণ মেরু -90^0 এখান থেকে গাগনিক বস্তুর বিষুবলম্ব [Declination] নির্ণয় করা যায়। ব্যাসার্ধ রেখাগুলি গাগনিক দ্রাঘিমাংশ [Longitude] নির্দেশক। এখান থেকে স্বাতী নক্ষত্রের [Arcturus] বিষুবলম্ব পাওয়া যায় 20^0 এবং এর বিষুবাংশ [Right Ascension] হয় 14 ঘন্টা 10 মিনিট। এই তারাটির প্রকৃত বিষুবলম্ব $19^042'$ এবং বিষুবাংশ 14 ঘন্টা 11 মিনিট। ●

কোয়াসারের এই সব অস্বাভাবিক ধর্ম যে মহাবিশ্বে অনন্য তার প্রমাণ হল সেফার্ট [Seyfert]

ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী। 1943 সালে কার্ল সেফার্ট এই শ্রেণির গ্যালাক্সী প্রথম আবিষ্কার করেন। এখন
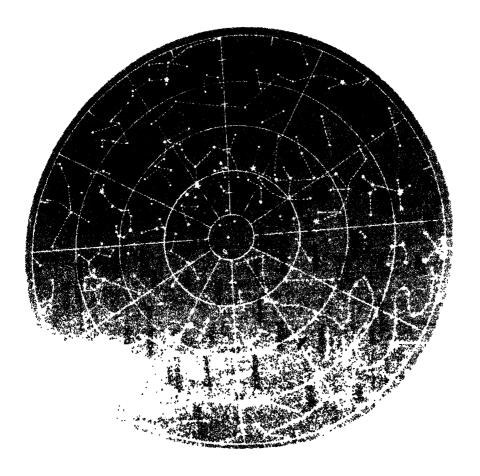
চিত্র ঃ 70

● দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের নাক্ষত্রিক মানচিত্র। দক্ষিণ মেরুতে কোন দর্শকের কাছে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ যেভাবে দেখা যাবে তাই-ই রয়েছে উপরের ম্যাপে। এর এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার রেখাগুলি নির্দেশ করছে গাগনিক অক্ষাংশ এবং ব্যাসার্ধগুলি গাগনিক দ্রাঘিমাংশ। এখান থেকে নক্ষত্রের বা কোনও গাগনিক বস্তুর বিষুবলম্ব এবং বিষুবাংশ নির্ণয় করা যায়। সারা বছর ধরে মাথার উপরের এই নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান পরিবর্তিত হয়। সেপ্টেম্বরের 20 তারিখে আদি-সময়-বৃত্ত [Zero Hour Circle] মাথার উপর থাকলে, ডিসেম্বরের 20 তারিখে ছয়-ঘণ্টা-বৃত্ত [Six Hour Circle] মাথার উপরে আসে। তেমনি বারো-ঘণ্টা-বৃত্ত আসে মার্চের 20 তারিখে এবং আঠারো-ঘণ্টা-বৃত্ত মাথার উপর আসে জুনের 20 তারিখে। ●

পর্যন্ত প্রায় এক ডজন এ ধরনের ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ড খুব একটা বেশি দূরে অবস্থিত নয়, এদের ধর্মও অনেকটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষত্ব হল এর কেন্দ্রাঞ্চল ছোট, অনুপাতে যথেষ্ট উজ্জ্বল, অস্বাভাবিক উত্তপ্ত এবং সক্রিয়। কিছুটা যেন কোয়াসারের মত। এর

বেতার বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধির দ্রুততা কোয়াসারদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। 3C-120 সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ডটির কেন্দ্রাঞ্চল গোটা ব্রহ্মাণ্ডটির আটভাগের একভাগ মাত্র। অথচ এই কেন্দ্রাঞ্চল এর বাকী অংশের থেকে প্রায় তিনগুণ উজ্জ্বল। এমনও হতে পারে যে, কোয়াসারগুলি হয়ত সেফার্ট ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রাঞ্চল। NGC 4151 নামের সেফার্ট ছায়াপথের কেন্দ্রের মাত্র 12 আলোকবর্ষের মধ্যে প্রায় 100 কোটি নক্ষত্র ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করছে। NGC হল New General Catalogue। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই তালিকা বানাতে শুরু করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড্রেয়ার।

কোয়াসারগুলি শ্বেতগহ্বর হতেও পারে। মহাবিশ্বের একদিকে কৃষ্ণগহ্বর এবং অন্যদিকে শ্বেতগহ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব হতে পারে। কোয়াসারের দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি এই কারণে হতে পারে যে, কীটগহ্বরে কোনও কারণে পদার্থ চলাচলে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তার ফলে শ্বেতগহ্বর বা কোয়াসারে তার প্রভাব পড়ে। বিকিরণে দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। সত্যি সত্যিই শ্বেতগহ্বর, কীট গহ্বর আছে কিনা তা আজও অপ্রমাণিত। তবে, তত্ত্বীয়ভাবে এদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। আবার এও মনে করা হয় যে, এদের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। হকিং বিকিরণেই [Hawking's Radiation] কৃষ্ণগহ্বরের পরিসমাপ্তি ঘটে। ●

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঋগ্বেদে নক্ষত্র

[ঋগ্বেদে রয়েছে বহু নক্ষত্রের কথা। তাদেরই অনেকগুলি এখানে আলোচিত। এদের মধ্যে আছে চন্দ্রমার্গের সেই সাতাশটি নক্ষত্রের কথা, যাদের সোয়া দুটি করে নিয়ে এক একটি রাশিমণ্ডলের সৃষ্টি। ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম ওই সাতাশটি নক্ষত্র ব্যবহার করে এবং রাশিচক্রের বিভাজনও করে। সময়টা হবে এখন থেকে হাজার পাঁচেক বছর। ভারতবর্ষের কাছ থেকেই এই 27টি নক্ষত্রচক্রের বিভাজন ব্যবস্থা গ্রহণ করে চীন, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং গ্রীস। 27টি নক্ষত্রপুঞ্জের আকার আকৃতি এবং 12টি রাশিচক্রের নামকরণ ইত্যাদির অনেকটা বিশদ বিবরণ আছে এই পরিচ্ছেদে। নক্ষত্রদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনীও বলা হয়েছে এই পরিচ্ছেদের স্বল্প পরিসরে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত আরো কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলীর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।]

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। এটি হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ হিসাবেও খ্যাত। 'ঋক' শব্দটির অর্থ হল স্তুতি বা পূজা। যার দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা যায়, তাই-ই ঋক। সুতরাং দেবতাদের স্তুতি হল 'ঋক্'। আবার 'বেদ' কথাটা এসেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ 'জানা'। ঋগ্বেদে তাই ঋষিদের জ্ঞান স্তবগান বা স্তুতি হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিস্ময়, রহস্যপুঞ্জ প্রাচীন মানুষদের মনে দেব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ধরা পড়ত। এই সব দেবতাদের জন্য মানুষেরা সেই অতি প্রাচীন দিনে ভয়ে অথবা বিস্ময়ে কিংবা আনন্দে অথবা দুঃখে রচনা করেছে নানা স্তব গান, নানা ঋক। তাঁদের জিজ্ঞাসু মনে এই স্তবগানগুলি এতো সত্য হয়ে অনুভূত হত যে, তাঁরা এই স্তবগান বা ঋকগুলি যেন দেখতে পেতেন। সেই দর্শন থেকেই যেন ঋকগুলির উৎপত্তি কিংবা রচনা। তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত হ'ত এই সব ঋক। 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' যেমন নিঃসৃত হয়েছিল মহর্ষি বাল্মীকির ব্যথাদীর্ণ অন্তর থেকে অনেকটা তেমনিভাবেই যেন রচিত হ'ত এই সব ঋক। 'যাঁর বাক্য তিনিই ঋষি'—এই সূত্র ধরে ঋক রচয়িতারাই হলেন ঋষি। আর ঋষিরা তাই ঋকদ্রষ্টা বা মন্ত্রদ্রষ্টা।

ঋগ্বেদে কয়েকটি ঋক নিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটি 'সূক্ত', আবার কয়েকটি সূক্ত নিয়ে এক একটি মণ্ডল। ঋগ্বেদে আছে 10552টি ঋক্, 1028টি সূক্ত এবং 10টি মণ্ডল। ঋষিরাই ঋক বা সূক্তের রচয়িতা। তবে হিন্দুদের বিশ্বাস তাঁরা সূক্ত রচনা করতেন না, দর্শন করতেন। ঋগ্বেদ কোনও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থ নয়। তবু তাতে নানাভাবে এসেছে নক্ষত্রদের কথা। এতে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা গুরুত্বপূর্ণ কথাও। এই সব কথার অধিকাংশই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রায় একশোভাগ সঙ্গতিসম্পন্ন। ভারতবর্ষই একমাত্র অতো প্রাচীনকালে এমন নিখুঁতভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা এবং আবিষ্কার করতে পেরেছিল। ঋগ্বেদে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা কেমনভাবে আছে তা সামান্য বলে নিয়ে ঋগ্বেদের বলা নক্ষত্রদের কথায় আসবো।

হরপ্পা সভ্যতা তার উন্নতির চরম শিখরে পৌছায় 2500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। তিন-চারশো বছর ধরে এই সভ্যতার রমরমা চলতে থাকে। তারপর এই সভ্যতার অবনতি ঘটতে থাকে। কী কারণে

এই উন্নত নগর সভ্যতার পতন ঘটল তা নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। বেশির ভাগ পণ্ডিতের অভিমত হল, এই সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ হল বর্বর, যাযাবর, নর্ডিক আর্যদের আক্রমণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছুটা প্রতিকূল হওয়ায় হরপ্পা সভ্যতার রমরমা হ্রাস পেতে থাকে। স্তিমিত হয়ে আসা এই সভ্যতার উপর চরম আঘাত হানে যাযাবর, অসভ্য আর্যরা। এই আক্রমণকাল নিয়েও মতভেদ আছে। খ্রিস্টপূর্ব 2000 অব্দ থেকে 1500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ অবধি আর্যদের এই আক্রমণকাল হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন বিদগ্ধজনেরা। এখানেও নানা মুনির নানা মত।

পিগোট, হুইলার প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে খ্রিস্টপূর্ব 2000 অব্দে অর্থাৎ প্রায় 4000 বছর আগে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসে আর্যজাতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেখানের প্রাচীনতর যে উন্নত নগরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে আসে। এই প্রাচীনতর নগরভিত্তিক সভ্যতাই হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা। আর্যজাতি সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের পরাজিত করার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করে। তারপর অতি দ্রুত কাশী অবধি তাদের উপনিবেশ বিস্তার লাভ করে। তাদের এই বিস্তৃত উপনিবেশের নাম হয় 'আর্যাবর্ত'।

স্যার মোর্টিমার হুইলার মনে করেন যে, সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহ আগন্তুক আর্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন যে, ঋগ্বেদে বর্ণিত ইন্দ্র দ্বারা বিনষ্ট নগরগুলি সিন্ধু সভ্যতারই নগরসমূহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে—"Climatic, economic, political deterioration may have weakened it, but its ultimate destruction is more likely to have been completed by deliberate and large scale destruction." [R. Mortimer Wheeler, 'Ancient India' No : 8 1947, pages 73-82]। এর অনেকটা আগেই ডঃ অতুল সুর 1928-31 সালে বলেছিলেন, বৈদিক আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল বটে, কিন্তু তারা হরপ্পা সভ্যতার সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে পারে নি। পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতাই হরপ্পা সভ্যতার পরিবর্তিত রূপ।

প্রায় 4000 বছর আগে আর্যরা এদেশে এলেও হরপ্পার অধিবাসীদের সঙ্গে একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের বহুকাল কেটে যায়। তবে 200/300 বছরের মধ্যেই পশ্চিমে গান্ধার থেকে শুরু করে পূর্বে বারাণসী এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল অবধি আর্যরা তাদের উপনিবেশ বিস্তৃত করে। আর্য অধিকৃত এই বিশাল অঞ্চলের নাম হয় 'আর্যাবর্ত'। শারীরিক ও জীবনচর্যার বৈষম্যযুক্ত দু-দল মানুষ যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন তাদের মধ্যে বাধে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ। এক্ষেত্রে আর্যরা ছিল হা-ঘরে, হা-ভাতে জাতি। তারা যখন এদেশে আসে তখনও তারা অসভ্য যাযাবর। পশুপালনটুকুই কেবল শিখেছে এবং ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছে। প্রায় 4000 বছর আগে আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানায় বলে মনে করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন, প্লাইস্টোসীন যুগের শেষভাগে ঘোড়া বন্য অবস্থায় রুশ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং ইউক্রেনের শুষ্ক ও তৃণাবৃত অঞ্চলে বিচরণ করত। এটা এখন সব পণ্ডিতরাই বলেছেন যে, আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোস মানিয়েছিল এবং ঘোড়ায় টানা হালকা ধরনের জঙ্গী-রথ তৈরি করেছিল। এর থেকে অনুমান করা হয়, আর্যরা যখন ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল তখন তারা কাজাখিস্তান কিংবা মধ্য-এশিয়ায় কোনও অঞ্চলে বাস করতো। কারণ, বন্য ঘোড়া ক্রমশঃ পূর্বদিকে কাজাখিস্তান এবং এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘোড়াকে আর্যরা পোষ মানায় 2000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। 1800 খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক ফলক থেকে আমরা ঘোড়ায় টানা রথের কথা জানতে পারি।

খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ব্যাবিলনের কাশাইট বংশীয় শাসকরা নিজেদের 'আর্য' বলতো। পরবর্তী মিতান্নি শাসকরাও তাই। প্রায় 1380 খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিট্রাইটদের রাজা সুবিলুলিউমার মিতান্নিদের রাজা মত্তিউয়জ বা মতিওয়াজার এক সন্ধি হয়েছিল। এই সন্ধিপত্রে ঋগ্বেদের মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, বোঘাজকোই থেকে যে সব লিপি-ফলক পাওয়া গেছে, তার অন্যতম হচ্ছে মিতানবাসী জনৈক কিককুলী-র লেখা 'অশ্ববিদ্যা' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ।

'আর্য' শব্দটা জাতিবাচক নয়, ভাষাবাচক। যে সব জাতি বা নরগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলত তাদের বলা হত 'আর্য'। নৃতাত্ত্বিকরা বলছেন, প্রাচীনকালে দুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী আর্য-ভাষায় কথা বলত। এই দুটি নরগোষ্ঠী হল ককেশীয় মহাজাতির নর্ডিক গোষ্ঠী এবং অপরটি হল আলপীয় নরগোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ ছিল মাথার খুলির আকারে। নর্ডিকরা ছিল দীর্ঘকপাল জাতি, আর আলপীয়রা হ্রস্বকপাল জাতি। নর্ডিকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হল তারা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। এরাই উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে এএসছিল। এরাই বৈদিক আর্য। এরা ভারতে আসার সময় ছিল যাযাবর বর্বর জাতি। আলপীয়রা ছিল মধ্যমাকার, মাথার খুলি তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রং ফরসা।

পণ্ডিতেরা বলছেন, আলপীয়রা এবং নর্ডিকরা উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিতেই এক সময় বাস করতো। যাযাবর জীবন ছেড়ে নবোপলীয় যুগের উত্তরকালে আলপীয়রা কৃষিকাজ শিখে ফেলে। নর্ডিকরা পশুপালনেই রত থাকে এবং তাদের যাযাবর বৃত্তি বজায় রাখে। মনে করা হয়, আলপীয়রাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূ-খণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা পশ্চিমদিকে এগিয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর অবধি তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদেরই একদল বালুচিস্তান হয়ে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ুতে হাজির হয় এবং পূর্ব উপকূল ধরে চলে আসে ওড়িশা এবং বাঙলায়। আলপীয়রা এসেছিল দ্রাবিড়দের অনুসরণে। তারা মিশে যায় এদেশের জনগণের সঙ্গে। নর্ডিকরা তাদের আদি বাসস্থান ছেড়ে অনেকটা পরেই ভারতবর্ষে আসে। এরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমের প্রবেশদ্বারা দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসেছিল। এরাই 'ভারতীয় আর্য'। এরাই এখানে এসে শিখেছিল কৃষিকাজ। এরাই ধ্বংস করেছিল হরপ্পা সভ্যতার নগরসমূহ। পরবর্তীকালে এরাই রচনা করেছিল ঋগ্বেদ। আর ঋগ্বেদ থেকেই আমরা জানতে পারি, এই নর্ডিক আর্যরা অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল হরপ্পীয়দের সঙ্গে। তাদের পরাজিত করে প্রতিষ্ঠা করেছিল 'আর্যাবর্ত' উপনিবেশ।

ডঃ অতুল সুর লিখেছেন, "সমস্ত ঋগ্বেদখানা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে, আর্যরা ছিল একটা হাঘরে জাত। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বেদের উৎপত্তি হলেও সমগ্র বেদখানাতে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদের কাছে তাদের বৈষয়িক প্রার্থনা—ঋগ্বেদের প্রায় 10,000 মন্ত্রের মধ্যে হাজারখানেকেতে শুধু একই কথা বলা হয়েছে—'দাও আমাদের শত্রুর ধন, দাও আমাদের শত্রুর সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদের শত্রুর নারী' ইত্যাদি। আর্যরা এক সামাজিক দুর্বলতা নিয়ে এদেশে এসেছিল। এই যোদ্ধা জাতের সেই দুর্বলতা হল যে, ওদের সঙ্গে নারীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। সে জন্য তারা হরপ্পীয়দের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করেছে অনার্য মেয়েদের ছিনিয়ে নেবার জন্য। বংশ বৃদ্ধির জন্য এটা

তাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্য একটা বচনের উপর তারা বিশেষ জোর দিয়েছিল, তা হল 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। এরা অনার্য মেয়েদের ছিনিয়ে এনে বিয়ে করত বলেই ভার্যার অন্য নাম 'বধূ'। বধূ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল যাকে বহন করে আনা হয়েছে। অর্থাৎ বধূ হল 'Captured Lady'। আর ছিনিয়ে এনে বিবাহ হল 'Marriage by Capture'। স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করার মধ্যে স্ত্রীর অনার্যত্বই প্রকাশ পায়। অনার্য রমণী আর্যসমাজভুক্ত হওয়ার ফলে গৃহিনীই গৃহ হল। [গৃহিনী গৃহমুচ্যতে]। আর বর্বর আর্যজীবনে প্রভাব পড়ল সভ্য অনার্য সংস্কৃতির। এর ফলে হরপ্পার উন্নত অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘটল বর্বর আর্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ। এই সংশ্লেষণের ফলে গড়ে উঠেছিল হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা। আগন্তুক আর্যরা যে সংস্কৃতি এদেশে বহন করে এনেছিল, যার অনেক নমুনা আমরা ঋগ্বেদে দেখি, সে সংস্কৃতি ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। প্রাগার্য জনসমাজের অনার্য সংস্কৃতিই ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে। জনসমাজে এই সভ্যতা পরবর্তীকালে মণ্ডিত হয়েছিল আর্যদের ভারতীয় উত্তরপুরুষদের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায়। হরপ্পার অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতি এই সংশ্লেষণই সৃষ্টি করে 'ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি' [Indo-Aryan Culture], উদ্ভূত হয় 'ভারতীয় আর্য-সভ্যতা' [Indo-Aryan Civilization]। যার অন্য নাম 'বৈদিক সভ্যতা'।"

নর্ডিক আর্যরা যখন প্রথম এদেশে এল তখন তারা ছিল বর্বর যাযাবর জাতি। অনার্যদের সঙ্গে তাদের বহু বছর ধরে সংঘর্ষ চলার পর সংশ্লেষণ ঘটতে থাকে। আর্যরা কৃষিকাজ শিখে নিয়ে কিছুটা সভ্য হয় এবং গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠীজীবন-যাপন শুরু করে। আর্যদের গোড়ার দিকের বৈরিতা পরবর্তীকালে আর থাকে না। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততই তারা এ দেশের লোকদের সংস্পর্শে আসতে থাকে এবং এদেশের মেয়েদের বিয়ে করতে থাকে। সংস্কৃতির সংশ্লেষণে মুখ্য ভূমিকা নেয় আর্যদের এইসব অনার্য স্ত্রীরা। ভারতীয় আর্য সভ্যতার মূল পরোক্ষ হোতা এইসব নারী যারা আর্যদের 'বধূ' হয়েছিল। অনার্য রমণীরা গৃহিণী হতে থাকায় আর্যদের ধর্মকর্মের উপরও তার প্রভাব পড়ে। ক্রমশঃ তা বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাদের পিছনে ফেলে আর্য ও অনার্য সংশ্লেষণে সৃষ্ট দেবমণ্ডলীর পূজার পত্তন করে। তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণগণ এই সব পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা-পাঠের প্রচলন করে। তবে বৈদিক সভ্যতার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'ঋগ্বেদ' এবং অন্যান্য বেদসমূহ।

এদেশের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বর্বর আর্যরা সুসভ্য হয়েছিল। এই সুসভ্য হওয়ার পিছনে আর্য 'বধূ'দের অবদান অনস্বীকার্য। ওই Captured Lady-রাই আর্যদের সুসভ্য করে তুলেছিল। ঋগ্বেদের বহু জায়গায় মেয়েদের বস্ত্র বয়নের কথা আছে। মনে করা হয়, আদিম সমাজে যেমন মেয়েরা চাষবাস করে, আর্যসমাজেও তেমনি অনার্যরমণীরা শুধু বস্ত্রবয়নই নয়, চাষবাসেরও প্রবর্তন করেছিল। হরপ্পীয় অনার্য বলতে নৃতাত্ত্বিকরা চারটি জাতির কথা বলেছেন—(1) আদি অস্ট্রেলীয়, (2) দ্রাবিড়, (3) ভূমধ্যসাগরীয় এবং (4) আলপীয়। ডঃ অতুল সুর বলেছেন যে, আর্যরা যাদের 'অসুর' বলেছে তারা আলপীয় গোষ্ঠীর লোক, আর্যদের কথিত 'পণি'-রা হল 'ভূমধ্যসাগরীয়' গোষ্ঠীভুক্ত, আর্যরা যাদের 'দস্যু' বলেছে তারা 'দ্রাবিড়' জাতি এবং আর্যরা যাদের 'দাস' নামে অভিহিত করেছে তারা 'নিষাদ' বা আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। এদের সবাইয়েরই কঙ্কাল হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত অসুর, পণি, দস্যু ও দাস—এই চারটি জাতিই হরপ্পা সভ্যতার অনার্য-জাতি।

অত্যুন্নত হরপ্পা সভ্যতার প্রাথমিককাল থেকেই ভারতবর্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেছে। প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার এই সময়টা কমপক্ষে 6000 বছর আগের সময়। সুতরাং প্রায় 6000 বছর আগেই

ভারতীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত। একালের ঐতিহাসিকরা মনে করেন, হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা, যেমন মিশর, সুমের ইত্যাদি সভ্যতাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে এই হরপ্পা সভ্যতা। এই শিক্ষাদান পর্ব শুরু হয়েছিল অন্ততঃ 5000 বছর আগেই। আর্যরা এসেছে এর 1000 কিংবা 1200 বছর পরে। তবে হরপ্পা সভ্যতার কোনও পুঁথি বা বই আমরা পাই নি। হরপ্পার সুগঠিত বর্ণমালার বহু নমুনা পেয়েছি এই সভ্যতার শীলমোহরগুলি থেকে। কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। তবু এই নগর সভ্যতার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, অট্টালিকা প্রভৃতির গঠনশৈলী দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, হরপ্পীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিল। গণিতে তারা বেশ পারদর্শী ছিল। দৈনন্দিন জীবনে তারা যে শুধু দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করত তাই নয়, তারা π (পাই)-এর ব্যবহার জানতো, পীথাগোরাসের উপপাদ্য তাদের অজানা ছিল না।

ঋগ্বেদ লিখিত হয়েছিল অনকেটা পরে। এর বয়স কোনও মতেই 3700/3800 বছরের বেশি নয়। কিন্তু ঋগ্বেদেই রয়েছে হরপ্পীয়দের সুপ্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্ঞানের নানান উদাহরণ। এই অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অনার্য ঋষি ব্যাসদেবের হাত ধরে, যিনি বেদ বিভাজন করে 'বেদব্যাস' নামে আজও বিখ্যাত। মনে রাখতে হবে, আর্যরা ছিল এক বর্বর, হা-ঘরে জাতি। এই যুদ্ধপ্রিয় বর্বর জাতির আক্রমণে হরপ্পার বহু নগর ধ্বংস হয়। অন্ততঃ ৭৭টি পুরী যে ধ্বংস করেছিলেন আর্য-নেতা ইন্দ্র, তা ঋগ্বেদ থেকেই পাওয়া যায়। এই 'পুরবিনাশক' 'পুরন্দর' ইন্দ্রগোষ্ঠীর কোনও লিপি কিংবা মার্জিত ভাষা ছিল না। সুতরাং ঋগ্বেদ কোন্ বর্ণমালায়, কোন ভাষায় প্রথম রচিত হয়েছিল তা অজানা। সম্ভবত, ঋগ্বেদ লেখা হয়েছিল হরপ্পা-লিপিতে এবং প্রাচীন হরপ্পীয় তথা দ্রাবিড়ীয় ভাষায়, যা সংস্কার করেই রূপান্তরিত করা হয় 'সংস্কৃত' ভাষায়। হস্তী-টোটেমবিশিষ্ট [Totem] অনার্য গণেশ বা বিনায়কের শ্রুতলিখন পদ্ধতিতে 'মহাভারত' রচনার প্রচলিত কাহিনী থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদের লিপি ছিল হরপ্পীয় লিপি এবং ভাষাও তাই। কারণ এগুলি যাঁরা লিখতেন, তাঁরা ছিলেন বিনায়ক গোষ্ঠীভুক্ত অনার্য লোক। আরও বড় কথা হল, মহাভারত লেখা কিংবা বেদ বিভাজনের জন্য কোনও আর্য পণ্ডিতকে দায়িত্ব না দিয়ে অনার্য ব্যাসদেবকে দায়িত্ব দেওয়ার কারণই হল আর্যদের কোনও লিপি কিংবা পুস্তক রচনা করার কোনও ভাষা ছিল না। মনে করা হয়, আর্যদের এদেশে আসার বহু আগেই ঋগ্বেদের অনেকাংশই রচিত হয়েছিল এবং সেগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে বেদ-বিভাজনের পরে বেদব্যাস সংকলিত ঋগ্বেদে, বিজয়ী আর্যদের উপযুক্ত করে পরিবর্তিত ও মার্জিত করার পর। সুতরাং ঋগ্বেদে বহু ঋক আছে যেগুলি হরপ্পীয় আমলে সৃষ্ট বা রচিত এবং পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে সংকলিত। মহাভারতের মূল কাহিনী প্রায় 4500 বছর আগের, হরপ্পা সভ্যতার রমরমার কালের হলেও পরবর্তীকালে তা লেখা হয় ব্যাসদেব ও বিনায়কের সাহায্যে। বেদগুলিও অনুরূপভাবে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

ঋগ্বেদ তথা বেদগুলির মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে এগুলিকে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কিংবা জ্যোতিষীয় গ্রন্থ বলা যায়। তবু ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদে এমন বহু ঋক বা সূক্ত আছে যা পুরোপুরি জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য সম্বলিত। ঋগ্বেদে শতাধিক সূক্ত আছে যেগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধীয়। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের বিভিন্ন অবস্থান ও তাদের গতিবিধির কথা এই সব সূক্তে বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর আকার কেমন, নক্ষত্রদের গতিবিধি কি রকম, কাল বা সময়ের গণনা ইত্যাদি এই সব বৈদিক সূক্ত থেকে জানা যায়। চাই কি কাল-প্রসরণের [Time Dilation] আধুনিক তত্ত্বও তাঁদের অজানা ছিল না। পৌরাণিক

যুগে প্রাচীন মুনি-ঋষিরা কাল-প্রসরণের অনেক কাহিনী বলেছেন। অন্ততঃ পৌরাণিক যুগের ঋষিরা কাল-প্রসরণের কথা জানতেন। সূর্যগ্রহণের তত্ত্বও ঋগ্বেদের ঋষিদের অজানা ছিল না। ঋষিরা পরমা-প্রকৃতির উপসনা করতে করতে সুন্দর সুন্দর দেবতাদের দর্শন করতেন আকাশের জ্যোতিষ্কদের মধ্যে। এই সব দেবতাদের পূজার জন্য ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেছেন। সেই সব মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে ওই সব জ্যোতিষ্কের অবস্থান ও গতিবিধি। এইভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে প্রায় হাজার ছয়েক বছর আগে থেকেই। বৈদিক সভ্যতার কালে অর্থাৎ মিশ্র সভ্যতার কালে সংকলিত হয়েছিল ঋগ্বেদ। বলা হয়, এই ঋগ্বেদই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতায় পুঁথি ক্রয়-বিক্রয় করা হত এমন কথা ঐতিহাসিকরা বলছেন বটে, কিন্তু ওই সভ্যতার কোনও পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কারণ, চার-পাঁচ হাজার বছর সময়ের ব্যবধানে পাতা কিংবা তুলোট কাগজের পুঁথি নষ্ট হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আবারো বলি, ঋগ্বেদ মিশ্র সভ্যতা তথা 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা'-র ফসল, যার মধ্যে রয়েছে হরপ্পা সভ্যতার নানা আবিষ্কার, নানা তত্ত্ব এবং নানা তথ্য।

বেদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। হিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় মনে করে। অর্থাৎ বেদ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এটি ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী। বেদের বাণী প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না। শিষ্যেরা গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে শিখে নিত। এইজন্য বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বেদ-এর চারটি ভাগ—ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋগ্বেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে রচিত 1028টি সূক্ত তথা 10552টি ঋক দশটি মণ্ডলে সঙ্কলিত হয়েছে। সামবেদে রয়েছে গীত-সঙ্কলন। এর বেশ কিছু ঋক ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। এর মন্ত্রগুলি গীতধর্মী এবং তাই মনে করা হয় সামবেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞের সময় গান হিসাবে গাওয়া হত। সামবেদে মোট 1549 টি মন্ত্র আছে। সামবেদকে 'সামগান'-ও বলা হয়। যজ্ঞ করার জন্য যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হত। অথর্ববেদে মন্ত্রের সংখ্যা 731টি। অথর্ববেদে সৃষ্টির রহস্য, পৃথিবীর স্তব, চিকিৎসার মন্ত্র, শত্রু বশ ও নাশ করার মন্ত্র এবং বহু উপদেবতা ও অপদেবতার উপাসনার ইঙ্গিত আছে। এইজন্য অনেকে অথর্বকে বেদ বলে স্বীকার করেন না। বস্তুবিজ্ঞান চর্চার বাহুল্য থাকায় এটাকে অনেকেই বেদ বলে মানেন না। কিন্তু এরই থেকে উৎপন্ন হয়েছে 'আয়ুর্বেদ'।

চার বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের রচনকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদ উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নিরিখে বালগঙ্গাধর তিলক স্থির করেন যে, বেদের রচনাকাল আনুমানিক 6000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত জ্যাকোবি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের বিচারে ঋগ্বেদের রচনাকাল ধার্য করেন 2500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। জার্মান পণ্ডিত ভিন্টারনিৎস [Winternitz]-এর মতে সমগ্র ঋগ্বেদ এককালে রচিত হয়নি। 2500 খ্রিস্টপূর্ব থেকে খ্রিস্টপূর্ব 800 অব্দের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দের কাছাকাছি। আধুনিক ঐতিহাসিকরা প্রত্ননিদর্শনের নিরিখে ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ধারণের পক্ষপাতী। তেল-এল-অমরনা এবং বোঘাজকোই লেখ বিচারে অনুমান হয় যে, ঋগ্বেদের প্রথম রচনা খ্রিস্টপূর্ব 1400 অব্দের পরবর্তী হতে পারে না। বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, আর্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রত্ননিদর্শন ইত্যাদি সবদিক বিচার করে অধ্যাপক ব্যাসাম স্থির করেছেন, যে ঋগ্বেদ খ্রিস্টপূর্ব 1500 অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

সুতরাং ঋগ্বেদ রচনার সময় নিয়েও নানা মুনির নানা মত। ম্যাক্সমুলার সাহেবের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল এখন থেকে প্রায় 3,200 বছর আগে কিংবা তার দু-একশ বছর বেশি। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের

মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল হলো 1000 থেকে 900 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আবার পিগোট, হুইলার ইত্যাদি পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের রচনার কাল 3,400 হতে 3,500 বছর আগের কোন সময়। শেষোক্তদের মতে আর্যরা ভারতে এসেছিল প্রায় চার হাজার বছর আগে। ভারতে বসবাস স্থাপনের পর তাদের সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিশ্রণ ঘটতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ঋগ্বেদ রচিত হ'ল। পিগোটের ওই সিদ্ধান্তের পিছনে আরও একটি যুক্তি এই যে, উপরোক্ত যে মিতান্নি-লেখটি পাওয়া গেছে, যার আনুমানিক রচনাকাল 1380 খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে ধার্য করা হয়েছে, তাতে কতকগুলি ঋগ্বেদীয় দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। আবার ভাষাতত্ত্ব দিয়ে ঋগ্বেদের বয়সের এই বিচার কিন্তু ঠিক নয়। কারণ হিসাবে বলা যায়, ঋগ্বেদের সবচেয়ে পুরনো অংশ 'সংহিতা' তৈরি হয়েছে কয়েকশ' বছর ধরে। তারপর বহুদিন ধরে রচিত হয়েছে ব্রাহ্মণ অংশ। সংহিতা আকারে প্রকাশের আগে বহুশত বৎসর ধরে সূত্রগুলি বংশ-পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে রচিত হয়েছে ও অনুশীলিত হয়েছে। মুখে মুখে থাকায় তাদের ভাষারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। আর সেই কারণে ভাষাতত্ত্ব দিয়ে ঋগ্বেদের বয়স বিচার করলে ঋগ্বেদ অনেক আধুনিক বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

তাই ঋগ্বেদের সূক্তের মধ্যেই যাঁরা ঋগ্বেদের বয়সকাল খুঁজে পেয়েছেন তাঁরাই অনেক বেশি প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের ঋষিরা চন্দ্রসূর্যের গতিবিধি, নক্ষত্রের উদয়-অস্ত ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিস্ময়কর বহু তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কারক। সূক্তগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়, কবে কোন নক্ষত্রে সূর্য বিষুবরেখায় আসত, কোন্ দিকের আকাশে কোন্ অবস্থানে কোনো নক্ষত্রকে কোনো ঋতুতে দেখা যেত ইত্যাদি। ঋগ্বেদে এই ধরনের শতাধিক সূক্ত আছে যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য সমৃদ্ধ এবং উন্নত জ্ঞানের পরিচায়ক। এগুলিতে চন্দ্র-সূর্যের বা নক্ষত্রের গতিবিধি যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে, এই সংক্রান্ত সূক্তটি রচনাকালে সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান। অয়নগতির ফলে সূর্যের বর্তমান অবস্থান জেনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়মে এই সব সূক্তের রচনা কাল পাওয়া যায় এবং এই কাল নির্ণয় যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। কারণ মুখে মুখে প্রচলিত সূক্তগুলির ভাষাগত রূপ বহু পরিবর্তিত হলেও নাক্ষত্রিক গতিবিধি নির্দিষ্ট নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। ফলে, এই পদ্ধতিতে হিসাব করা বয়সকালই সঠিক বলা যেতে পারে। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে, এতে বহু সূক্তের বয়স নির্ণীত হয় 6000 বছর কিংবা তারও বেশি। অথচ আর্যদের এদেশে আসার কাল 4000 বছরের বেশি হতে পারে না এবং ঋগ্বেদ রচনার সময় এখন থেকে 3500 বছর আগে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তা হলে যে সব সূক্ত 6000 বছর বা তারও বেশি সময়কাল নির্দেশ করে, সে সূক্তগুলি ঋগ্বেদে এলো কেমন করে? এগুলি প্রাগার্য বা হরপ্পীয় অনার্যদের দ্বারা রচিত সূক্ত নয় তো? এগুলি হয়ত উভয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণের পর অর্থাৎ ভারতীয় আর্য সভ্যতার সৃষ্টির পর ঋগ্বেদে গৃহীত হয়েছিল। এসব অনুমান মাত্র। হরপ্পার লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার না হলে এই সব অনুমান কতটা সত্যি তা বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, হরপ্পীয়রা গণিতে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক সময় প্রবল ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল এবং তা করেছিল ঋগ্বেদ রচনাকালের প্রায় 1000 বছর পূর্বেই। সুতরাং ঋগ্বেদের ওই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত সূক্তগুলির পিছনে যে হরপ্পীয়দের অবদান নেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আর্যরা সভ্য হয়েছিল ভারতবর্ষে এসে হরপ্পীয়দের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে।

প্রকৃতপক্ষে, ঋগ্বেদের বহু ঋক এদেশে আর্য-আধিপত্যের অনেকটা আগেই হরপ্পীয়রা রচনা করেছিল। তাই ঋগ্বেদে আর্য-পূর্ববর্তী বহু তথ্যই সন্নিবেশিত হয়েছে। বিজয়ী অর্ধসভ্য আর্যজাতির বিজয়-কাহিনী

যেমন আছে, তেমনি আছে ছয় বা আট হাজার বছর আগের নাক্ষত্রিক অবস্থান সংক্রান্ত ঋক।

ঋগ্বেদের রচনা বহুকাল ধরে হয়েছিল। তাই তার অনেক সূক্ত যেমন প্রাচীনতর সময় নির্দেশ করে তেমনি অনেক সূক্ত আধুনিকতর কাল নির্দেশক। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "একদা যজ্ঞহীন দেবতারা অদিতিকে বল্লেন, 'তুমি যজ্ঞ বলে দাও'। অদিতি বললেন, 'তথাস্তু, যজ্ঞের আবর্তন আমার শীর্ষদ্বয়ে আরম্ভ ও শেষ হোক"। 'যজ্ঞ' শব্দ ঋগ্বেদে বৎসরজ্ঞাপক। অদিতির কথার অর্থ হলো, এক সময় সায়ন বৎসরের আরম্ভ ও শেষ অদিতি বা পুনর্বসু নক্ষত্রে হতো। অর্থাৎ 'মহাবিষুব বিন্দু' (Vernal Equinox) তখন পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থান করতো। পুনর্বসু থেকে আর্দ্রা, মৃগশিরা, রোহিনী, কৃত্তিকা, ভরণী হয়ে বর্তমানের উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের মাঝামাঝি আসতে বিষু-বিন্দুর সময় লেগেছে প্রায় ৪000 বছর বা তার কিছুটা বেশি। বার্ষিক অয়নগতি 50 বিকলা বা সেকেন্ড (কৌণিক) ধরে বিষুবের সঞ্চরণের এই হিসাব। সুতরাং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কাহিনী প্রায় আট হাজার বছরের পুরাতন যখন বছরের শেষ কিংবা শুরু গণনা করা হত পুনর্বসু নক্ষত্রে। এখন থেকে আট হাজার বছরের কিছুটা বেশি সময় আগে সায়ন বৎসরের প্রারম্ভ সূচিত হতো অদিতি নক্ষত্রের বা পুনর্বসু নক্ষত্রের প্রথমাংশে।

এই কাহিনীর কিছুটা পরবর্তীকালে মহাকাশবিষুব [Celestial Equstor] তার অবস্থান জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নিয়মে পরিবর্তন করে চলে যায় অন্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে। এই সময়ে যে নক্ষত্রের তারায় মহাকাশ-বিষুব [Celestial Equator] অবস্থান করতো সেই নক্ষত্রমণ্ডলী হতে ঋগ্বেদের সময় কাল বিধান করা হতো। ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম তাই 'কালপুরুষ' [Orion]। আজও এর নাম কালপুরুষ। ঋগ্বেদ বলছে, কালপুরুষ নক্ষত্র-মণ্ডলীর শীর্ষস্থ নক্ষত্রের নাম 'মৃগশিরা'। ঋগ্বেদে এর নাম অবশ্য 'সোম' বা 'যজ্ঞসোম'। কারণ মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা হলেন সোম। সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তীকালে মৃগশিরার নাম দিয়েছিল 'অগ্রহায়ণী'। 'হায়ন' মানে বৎসর। বৎসর সূচনাকারী নক্ষত্র, তাই মৃগশিরা হল 'অগ্রহায়ণী'। কালপুরুষের ঊর্ধ্বাকাশের নক্ষত্রের নাম 'যজ্ঞাগ্নি নক্ষত্র' [Auriga]। যজ্ঞাগ্নির পাশেই আছে 'রোহিনী নক্ষত্র' [Capella]। এই সব নাম ঋগ্বেদেরই দেওয়া। ঋগ্বেদ বলেছে, মৃগশিরায় অবস্থান করত মহাবিষুব। এখন মহাবিষুব অবস্থান করছে উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রায় মাঝামাঝি। এক একটা নক্ষত্র পার হতে মহাবিষুব সময় নেয় 955 বৎসর 6 মাস 20 দিন। সুতরাং মহাবিষুবের মৃগশিরা হতে রোহিনী, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্বিনী, রেবতী পার হয়ে উত্তরভাদ্রপদের এখনকার অবস্থানে আসতে সময় লেগেছে 6,250 বৎসর [2005 খ্রিস্টাব্দে] অয়নাংশ গণনাতেও পাওয়া যায় এই সময়টা 6,250 বৎসর। সুতরাং ঋগ্বেদের ওই সূক্তটির রচনাকাল মোটামুটি 6,250 বছর। বলা যায়, ঋগ্বেদের রচনার আদিকাল 6,250 বছর। সুতরাং ঋগ্বেদের ঋষিদের মহাকাশবিষুব সংক্রান্ত ধারণা ছিল এবং তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল অত্যন্ত নিখুঁত এবং একেবারে আধুনিক।

আবার ঋগ্বেদের কোথাও কোথাও কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে সিদ্ধান্তে গ্রন্থে যেমন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র, বৈদিক গ্রন্থে কিন্তু তেমন কোথাও নেই। মহাবিষুব বিন্দু [Vernal Equinox] হতেই নক্ষত্রগুলির প্রারম্ভ হয়ে থাকে। কেননা বৎসর গণনা মহাবিষুব সংক্রান্তি হতেই শুরু হয়। মনে হয়, এই সূক্তগুলি লেখার সময় কৃত্তিকাতেই মহাবিষুব সংক্রান্তি হত। ঋগ্বেদের আধুনিকতর এই সব সূক্ত ধরলে, কৃত্তিকা হতে ভরণী, অশ্বিনী পেরিয়ে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মাঝামাঝি আসতে বিষুববিন্দুর সময় লেগেছে প্রায় 3350 বছর। সুতরাং এই সব সূক্ত রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে—এ কথা বলা যেতে পারে। এমন সূক্ত অবশ্য ঋগ্বেদে খুবই কম আছে। *বেশির ভাগ সূক্তই 8000 বছর কিংবা 6200 বছরের কথা বলে।*

'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থটি বৈদিক কালেই রচিত। এটি ঋগ্বেদের চেয়ে সামান্য অর্বাচীন। অথর্ববেদের প্রায় সম-সাময়িক। অথর্ববেদের বয়স মোটামুটি 3350 বছর। [2005 খ্রিস্টাব্দে]। এই শতপথ ব্রাহ্মণেও

মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং বৎসর আরম্ভ করা নিয়ে একটা গল্প আছে। সেই কাহিনীটি এই রকম ঃ

বৈদিককালে চার বছরে এক যুগ গণনা করা হত। এই যুগ গণনায় প্রতি বছরে 12 মিনিট অধিক গণনা করা হয়ে যেতো। এতে প্রায় 1860 বছরে 15 দিনের পার্থক্য ঘটে। ফলে, ঋতু এবং অয়নান্ত কাল 15 দিন আগেই আরম্ভ হতে থাকলো। ঋষিরা আবার সময় সংশোধনে মন দিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে, ঋষিরা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, "আমাদের রাত্রিকালের স্তোত্রসমূহ দিবসে পাঠ করা হচ্ছে, আর দিবাভাগের স্তোত্রসমূহ রাত্রিতে পঠিত হচ্ছে। হে মহর্ষি, আপনি জ্ঞানী এবং বিদ্বান, অস্তু আমরা আমাদের যজ্ঞ কেমন করে সমাধা করতে হবে উপদেশ দিন।" এখানে রাত্রি হল দেবতাদের রাত্রি, অর্থাৎ মানুষের দক্ষিণায়নের ছয়মাস এবং দিন বলা হয়েছে দেবতাদের দিনকে অর্থাৎ পার্থিব উত্তরায়ণের ছয়মাস। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ হল 'বৎসর'। প্রজাপতি উত্তর দিলেন, "অধিক ক্ষমতাশালী একজন তাড়া করায় একটি বৃহৎ সর্প স্বীয় স্থান, হ্রদ থেকে তাড়িত হয়েছে, এই জন্য তোমাদের যজ্ঞকাল ঠিক ঠিক সমাধা হয় নাই"। এখানে 'বৃহৎ সর্প' হল অশ্লেষা নক্ষত্র, 'হ্রদ' হল নীলাকাশ। অর্থাৎ গণনার ভুলের জন্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের দিন আগে এসে গিয়েছিল এবং এই আগে আসাটা 1860 বছরে প্রায় 15 দিন। সুতরাং বৈদিককালের প্রায় 2000 বছর পরে সময় সংশোধন করে বেদাঙ্গ কালের সূচনা হয়। বেদাঙ্গ কালও প্রায় 500 বছর অনুসৃত হওয়ার পর সংশোধন জরুরী হয়ে পড়ে এবং নতুন যুগের শুরু হয়। এই যুগ 'সিদ্ধান্ত যুগ' নামে খ্যাত। এখন থেকে প্রায় 2700 বছর আগে [700 B.C] এই যুগের শুরু। এই হিসাবে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথাকথিত বৈদিককালের কিংবা বলা যায় হরপ্পীয় কালের শুরু প্রায় 5200 বছর কিংবা তারও বেশ কিছুটা আগে; যখন মহাবিষুব অবস্থান করতো মৃগশিরা নক্ষত্রের কাছাকাছি অঞ্চলে।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয় বিশদভাবে বলা হয়েছে। এখানেও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কখন হত তার উল্লেখ রয়েছে। "শ্রবিষ্ঠার (ধনিষ্ঠা) প্রারম্ভে সূর্য ও চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু অশ্লেষার অর্ধ ভাগেই সূর্য দক্ষিণদিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তন মাঘ এবং শ্রাবণ মাসে হয়।" এই শ্লোক দেখে অধ্যাপক আর্চ ডিকন প্রাট [Prof. Arch Deacon Pratt] গণনা করে বলেছেন যে, এই ধরনের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হত 1200 খ্রিস্টপূর্বাব্দে [1200 B.C]। সুতরাং বেদাঙ্গের কাল এখন থেকে প্রায় 3000 কিংবা 3200 বছর আগে—এই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

ঋগ্বেদের সংহিতা অংশে সূর্য, ঊষা এবং সোম ইত্যাদির কথা বহুবার বলা হয়েছে। সোম বলতে মূলতঃ চন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে। এতে শতাধিক সূক্ত আছে যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বলেছে। এই পৃথিবী যে গোলক [Sphere], তা বেদ বলেছে। এ ব্যাপারে 1ম মণ্ডলের 33 সূক্তের 8ম ঋক ও 4র্থ মণ্ডলের 53 সূক্তের 3য় ঋক ও অন্যান্য ঋক প্রণিধানযোগ্য। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 62তম সূক্তের সপ্তম (7ম) ঋক থেকে পাই, নীল আকাশে গ্রহমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সূর্যকে রোদসী অর্থাৎ পৃথিবী পরিক্রমণ করে চলেছে। পৃথিবীর এই পরিক্রমণ পথ উপবৃত্তাকার। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোনও সভ্যতা এই সত্য আবিষ্কার করতে পারে নি। ঋগ্বেদ চান্দ্রমাস ও সৌরমাস গণনা জানতো, জানতো অধিমাস বা মলমাস বা মলিম্লুচ [Dirty Month] কী এবং কী ভাবে তা নির্ণীত হয়। ঋগ্বেদে একটা অদ্ভুত অত্যাধুনিক তত্ত্বও বলা হয়েছে। এই প্রাচীনতম গ্রন্থটি বলেছে যে, সূর্যও তার গ্রহমণ্ডল নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করছে। সূর্যের সঞ্চার পথ সংক্রান্ত ঋক হলো ঃ

"যে ঊর্ধ্বপথে মনের ন্যায় সদ্‌গতি বিশিষ্ট সপার্ষদ সূর্যের (অর্থাৎ সৌর পরিবার সহ সূর্যের) এক

লক্ষ্য-গতি, স্যন্দন বাষ্পের ভাস্বর বিস্তারের মিত্র হ'তে বরুণ রক্ষমান দিকের সেই প্রিয় ও অমৃত ঐশ্বর্যাধার বিবস্বান (সূর্য) রাজিত" (ঋগ্বেদ 1/71/9)।

অর্থাৎ গতিময় বাষ্পের ভাস্বর বিস্তার বা চলন্ত নীহারিকার ভাস্বর বিস্তারের অনুরাধা নক্ষত্র হতে শতভিষা নক্ষত্র অবধি রক্ষমান দিকে সূর্যের সপার্যদ সঞ্চারপথ। নীহারিকার কেন্দ্র হ'তে সূর্য তেত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। নীহারিকা আমাদের পরিচিত ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড (Milkyway Galaxy)। এখনকার বিজ্ঞান বলছে সূর্য তার সৌরমণ্ডল নিয়ে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের চারিদিকে সেকেন্ডে 160 মাইল বা 260 কিলোমিটার গতিবেগে ঘুরছে কেন্দ্র থেকে 33,000 আলোকবর্ষ দূরত্ব বজায় রেখে। ঋগ্বেদ আরও বলেছে, "মিত্র হতে বরুণ নক্ষত্রের ঊর্ধ্বস্থ নক্ষত্রবৃত্তে নক্ষত্রলোকে ধাবিত সৌর-বিশ্বের ক্রান্তির দিশা অবলোকিত হয়, দিকস্পর্শী নক্ষত্রের নাক্ষত্রিক প্রমাণে।" (ঋগ্বেদ 1/2/8)। সর্পাযদ সূর্যের সঞ্চার বৃত্তের ক্রান্তির দিক হলো, ভূ-কক্ষের অনুসূরের দিক অর্থাৎ পৃথিবীর মেরুতারা যে দিকে প্রতিভাত হয় সেই দিকে। "মরুতের মাধ্যমে বহন্ত শ্রুতিগাথার প্রতিম, ব্রহ্মাণ্ডে সপার্ষদ' সূর্যের নিত্য-সদন ও সূর্যের গতিবেগ আবহমান কাল সপ্তসংখ্যক নক্ষত্র কলাপের অন্ধকারমর্দিত আলোক বাহুর দ্বারা প্রদর্শিত" (ঋগ্বেদ 1/85/6)। বেদের এই সাতটি নক্ষত্র হল ঃ সপ্তর্ষি নক্ষত্র (Ursa Major), উত্তর আকাশে বর্তমানকালের মেরুনক্ষত্র শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলীর ধ্রুবতারা (Alpha Ursa Minoris), কাশ্যপী নক্ষত্র (Cassiopia), শিবিরাজ নক্ষত্র (Cepheusir), ছায়াগ্নি নক্ষত্র (Alpha Cygni or Deneb), অভিজিৎ নক্ষত্র (Alpha Lyrae or Vega) এবং প্রচেতা নক্ষত্র (Draconis or Thuban)। এদের মধ্যে পাঁচটি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে মেরু তারা হতে থাকে। প্রত্যেকে এক একবারে মেরুতারা হয় 5,160 বছর। মেরুতারা পরিবর্তিত হওয়ার চক্রের একবার আবর্তনকাল হলো 25,800 বৎসর। এ সত্য এখন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বীকৃত।

আমরা জানি শিশুমার নক্ষত্রের ধ্রুবতারা [Alpha Ursa Minoris] এখন আমাদের মেরুতারা [Pole star]। কিন্তু খ্রিস্টের জন্মের আগে এই ধ্রুবতারা মেরুতারা ছিল না। সূর্যের গতিশীলতার জন্য মোটামুটি 5,160 বছর অন্তর অন্তর নতুন নতুন নক্ষত্র পৃথিবীর মেরুতারা হয়। আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সূর্যের প্রায় 25 কোটি [মতান্তরে, 20 কোটি] বছর সময় লাগে। এই 25 কোটি বছর হলো এক গ্যালাক্টিক বর্ষ [Galactic Year]। সূর্য আপন সৌরমণ্ডল সঙ্গে নিয়ে সেকেন্ডে প্রায় 160 মাইল বা 260 কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে। আবার সূর্যের সঞ্চারের সঙ্গে পৃথিবীর গতির নাম সায়নগতি। এই সায়নগতির জন্যই পৃথিবীর মেরু তারকার পরিবর্তন ঘটে। মোটামুটি 5,160 বছর পরে একটি নতুন নক্ষত্র আমাদের মেরুতারা হয়, যাকে কেন্দ্র করে আকাশের জ্যোতিষ্কেরা আবর্তিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। খ্রিস্টের জন্মের 5,160 বছর আগে যে নক্ষত্রটি আমাদের মেরুতারা হয়েছিল ঋগ্বেদীয় ঋষিরা তার নাম দিয়েছিলেন 'প্রচেতা নক্ষত্র'। অর্থাৎ, এখন এই 2005 খ্রিস্টাব্দে এসে বলা যায় 7165 বছর আগে প্রচেতা নক্ষত্র আমাদের মেরুতারা হয়েছিল। খ্রিস্টের জন্মের সময় অর্থাৎ 2005 বছর আগে প্রচেতার কাল শেষ হয় এবং ধ্রুবতারা মেরুতারকা হয়ে উঠে। ঋগ্বেদ কিন্তু সব খবর জানতো। আর জানতো বলেই তার ঋষিরা প্রচেতাকে নিয়ে বহু ঋক রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে একটি হলো সপ্তম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের পঞ্চম ঋক। সেখানে বলা হলো, 'বিশ্বের কেন্দ্রস্থ বরণীয় প্রচেতা আজ আমাদের সত্যের আশিস স্বরূপ হও'। প্রচেতা নক্ষত্র তখন বিশ্বের কেন্দ্রস্থ। এই প্রচেতা নক্ষত্রকে ইংরেজীতে বলে 'Draconis' বা 'Thuban'। প্রাচীন মিশরীয়রা প্রচেতার নাম দিয়েছিল 'থুবান' [Thuban]। সেই নাম আজও চলে আসছে। ঋগ্বেদের এই জ্ঞান এক

বিস্ময়কর আবিষ্কার। হরপ্পা এবং বৈদিক সভ্যতায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অত্যুন্নত বিকাশ ঘটেছিল। শুধু ঋগ্বেদেই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির গতিবিধি এবং আনুষঙ্গিকভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা সময়-ধারণার যে সব তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায় তা বিস্মরকর। এ ছাড়া যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও উপনিষদগুলিতে সময় সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তাও কোন অংশে কম যায় না। পৃথিবীর একবার সূর্য পরিক্রমায় যে সময় লাগে তা এক সৌর বৎসর—এ কথা ঋগ্বেদ জানতো। এই সৌর বৎসরকে বারো ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে বলা হতো 'মাস'। দ্বাদশ মাসের নামকরণও করা হয়েছিল সূর্য কোনো মাসে বারোটি নক্ষত্রমণ্ডলীর [Constellation] কোনটিতে অবস্থান করে তা দেখে। এই সব নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণও তখন করা হয়েছিল যা এই আধুনিক যুগেও ব্যবহৃত হচ্ছে। চান্দ্র-বৎসরের গণনাও ঋগ্বেদ জানতো এবং আরও জানতো যে সৌরবৎসর এবং চান্দ্র-বৎসরের মধ্য পার্থক্য মোটামুটি এগারো দিন। উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্যবিধানেও ঋগ্বেদীয় ঋষিরা পারদর্শী ছিলেন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এই দুই বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াতো তেত্রিশ দিন, যা প্রায় একমাস। এমনি একটা মাসকে বলা হতো 'মলিম্লুচ' বা 'মলমাস' বা 'অধিমাস'। এ যুগেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। ঋগ্বেদ জানতো ঃ

সূর্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় এবং চন্দ্রের নিজের কোনও আলো নেই, মোটামুটি 360 দিনে এক বৎসর, বারো মাসে এক বৎসর, চব্বিশ পক্ষে এক বৎসর, ছয় ঋতুতে এক বৎসর, বৎসরে দুই অয়ন—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, বারোটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলী, যাদের প্রত্যেকটিতে সূর্য একমাস করে অবস্থান করে, সূর্যের আলোর সাতটি রঙ, মলমাস বা মলিম্লুচ কীভাবে উৎপন্ন হয়, চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের নিখুঁত গণনা, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কথা এবং তাদের কারণ, সূর্যের দক্ষিণায়নে বর্ষা ঋতুর আগমন, পৃথিবী উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য নিজেও তার সৌরমণ্ডলসহ মহাকাশে প্রচণ্ডবেগে ধাবমান, চন্দ্র-কলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে নদীর বা সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার কথা, নক্ষত্রচক্রের সাতাশটি নক্ষত্রের বিশদ বিবরণ, নীহারিকা থেকে সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি, ঊষাকাল ও গোধূলিবেলা সৃষ্টির কারণ ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্য যেগুলি আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক। এগুলির থেকেই বোঝা যায়, ঋগ্বেদীয় তথা বৈদিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কতটা উন্নতমানের ছিল। আরও বহু উদাহরণ আছে ঋগ্বেদেই।

অধ্যাপক এ হিলব্রান্ট (A. Hillebrandt) বলেছেন, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টারা পঞ্চ-গ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 105তম সূক্তের 10ম ঋকে বলা হয়েছে যে, আকাশে মধ্য ভাগে পাঁচটি বলদ দণ্ডায়মান রয়েছে। পাঁচটি বলদ হল পাঁচটি বৃষ বা পাঁচটি নক্ষত্রপুঞ্জ (Circumpolar)। এই নক্ষত্রপুঞ্জ হল একটু আগে বলা সাতটি স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীর পাঁচটি। শিশুমার, কাশ্যপী, ছায়াগ্নি ইত্যাদি। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের 7ম সূক্তের সপ্তম ঋকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক হিলব্রান্ট বলেছেন যে, 'সপ্ত-বিপ্রা' হল সপ্তর্ষি মণ্ডল আর পঞ্চ অধ্বর্যু হল পাঁচটি গ্রহ। যাগ-যজ্ঞে যে রকম পার্থিব অধ্বর্যু ব্যস্ত থাকেন, তেমনি আকাশে পাঁচটি গ্রহ সর্বদাই ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে। আবার, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 55তম সূক্তের 4র্থ ঋকে ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে "তিনি এই দাব্যা পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ পূর্ণ করে আছেন নানাভাবে, তিনি পাঁচ দেবতা, সাত-সাতকে সময়ানুযায়ী 34টি আলোর ন্যায় দেখেছেন। এই 34টি আলো একবর্ণের কিন্তু ওরা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পালন করে।" এই 34টি আলোর সম্বন্ধে সায়ণাচার্যের মত হল যে, এঁরা দেবতাদিগের গণ, যথা ঃ অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, প্রজাপতি, বষট্‌কার

ও বিরাজ। অধ্যাপক লড্উইগ কিন্তু বলেছেন, এই 34টি আলো হল সূর্য, চন্দ্র, 27টি নক্ষত্র এবং 5টি গ্রহ। ঋগ্বেদের ঋষিরা পাঁচটি গ্রহ এবং তাদের গতির কথা জানতেন। পৃথিবীর পরিক্রমণ এবং সূর্যের পরিভ্রমণের আধুনিকতম জ্ঞানও তাঁদের ছিল, সে সব কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

জৈমিনীয় উপনিষদে প্লক্ষ-প্রস্রবণকেই পৃথিবীর মধ্যভাগ ধরা হয়েছে এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলকে আকাশের মধ্যভাগ। সরস্বতী নদী ঋগ্বেদে বর্ণিত বিখ্যাত নদী। এখন এই নদী অবলুপ্ত। সরস্বতী নদী যেখান হতে উৎপন্ন হয়ে মরুভূমিতে গিয়ে লুপ্ত হয়েছে, সেই সরস্বতীর উৎপত্তিস্থলে আছে এক প্লক্ষ বা ডুমুর গাছ। সরস্বতীর উৎস সেই প্রস্রবণের নাম তাই প্লক্ষ প্রস্রবণ। এই প্লক্ষ-প্রস্রবণের উৎপত্তি স্থলই পৃথিবীর মধ্য ভাগ। এখন সরস্বতী নদীও নেই, নেই প্লক্ষ-প্রস্রবণও। কিন্তু সপ্তর্ষি মণ্ডল আকাশে আছে। ঋগ্বেদে সপ্তর্ষির কথা অনেকবার বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, এই সপ্তর্ষিকেই পূর্বে 'ঋক্ষ' বা 'ভল্লকু' বলা হতো। নক্ষত্রমণ্ডলীকে জন্তুর আকারে কল্পনা করাটা ঋগ্বেদই সবাইকে শিখিয়েছে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের ইংরেজী নাম (Great Bear)। এটার উৎপত্তি ঋগ্বেদের এই 'ঋক্ষ' বা 'ভল্লুক' নাম থেকেই।

সূর্য তার গ্রহগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে প্রায় 25 কোটি [মতান্তরে 20 কোটি] বছরে একবার পরিক্রমা করছে। এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে প্রায় 33,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করা সৌরমণ্ডল প্রায় 25 কোটি বছর সময় নেয় তাদের এই একবার ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায়। আবার, পৃথিবী যে উপবৃত্ত-পথে সূর্য পরিক্রমা করে তাকে বলা হয় ভূ-কক্ষ। ভূ-কক্ষের দুই নাভি [Focus] বা 'অখ্য'। 'অখ্য' শব্দটি ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। বাংলায় এর প্রচলন নেই। সূর্য যে নাভিতে থাকে সেই নাভি বা অখ্য হলো 'অনুসূর' [Perihelion] এবং সূর্যহীন নাভি বা অখ্য হলো 'অপসূর' [Aphelion]। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে ভূ-কক্ষের দক্ষিণ-অখ্য [South Focus] বর্তমানে অনুসূর অর্থাৎ সূর্যের অবস্থান ওই দক্ষিণ নাভিতে। আর উত্তর নাভি অপসূর। অর্থাৎ উত্তর নাভি [North Focus] সূর্যহীন। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উত্তর-দক্ষিণ গতি, ছয় ঋতুচক্রের নৈসর্গিক তথ্য, পৃথিবীর মেরুনক্ষত্রের দিক ইত্যাদির সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব যে, বিজ্ঞানীদের ওই ধারণা ভুল। অর্থাৎ ভূ-কক্ষের উত্তর অখ্যই প্রকৃত পক্ষে অনুসূর এবং দক্ষিণ-অখ্য বা South Focus এখন অপসূর। এই অনুসূর ও অপসূর হওয়া ঘটেছে 2005 বছর [2005 খ্রিস্টাব্দ] আগে এবং উত্তর অখ্যের অনুসূর থাকা এবং দক্ষিণ অখ্যের অপসূর হওয়া আরও 3155 বছর ধরে চলবে। বিজ্ঞানীরা এ মত এখনও না মানলেও ঋগ্বেদ এ কথা জানতো। বিজ্ঞানীদের এই বিপরীত সিদ্ধান্তের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাঁরা সৌরজগতসহ সূর্যের মহাকাশ পরিক্রমার ব্যাপারটা হিসাবের মধ্যে আনেন নি। ঋগ্বেদ শুধু যে ভূ-কক্ষের উত্তর নাভি অনুসূর এবং দক্ষিণ নাভি অপসূর এই দাবী করেছে তা নয়, এ আরও বলেছে যে, অনুসূরে সূর্যের অবস্থানকালীন পৃথিবী যখন তার কাছাকাছি থাকছে তখন পৃথিবীতে গ্রীষ্মকাল আর সূর্যের থেকে দূরে অপসূর বিন্দুকে পরিক্রমণের সময় পৃথিবীর শীতকাল। কারণ, এই অবস্থায় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব প্রায় 30 লক্ষ মাইল বেড়ে যায়। অনুসূরের সবচেয়ে কাছে যখন পৃথিবী আসে তখন উভয়ের দূরত্ব 9 কোটি 15 লক্ষ মাইল। আর অপসূরের দিকে এই দূরত্ব হয় সর্বোচ্চ 9 কোটি 45 লক্ষ মাইল। সূর্যের সঞ্চারের কথা, অনুসূর ও অপসূর সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত, সূর্য ও পৃথিবীর

মধ্যে দূরত্বের বিভিন্নতা ইত্যাদি ঘটনা ঋগ্বেদে কীভাবে বর্ণিত হয়েছে দেখা যাক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 35তম সূক্তের পঞ্চম ঋক বলছে ঃ

"বিশ্বের যে দিকে সবিতার সঞ্চারবৃত্তের দিকচক্রের জ্যোতিষ্কের উপস্থিতি সর্বদা-দৃশদ্‌বান সেই দিকস্থ বিশেষ সূর্যরশ্মিজনিত হিরণ্যসদৃশ উত্তর দিকের অখ্য ও শিশিরাঙ্ক নিম্নাখ্য, ভূ-কক্ষের প্রবহমান অখ্যদ্বয়।"

ঋগ্বেদে শিশির, শিত বা শিতি শীত ঋতুর নাম। উপরোক্ত ঋকে পাওয়া গেল উত্তর অখ্যেই সূর্য আছে এবং উত্তর অখ্যই তাই অনুসূর। তেমনি অপসূর দক্ষিণ অখ্য বা নাভির কাছাকাছি এলে পৃথিবীর শীতকাল হয় এও জানা হলো। সূর্যের সঞ্চারবৃত্ত আছে এবং তা উত্তরাভিমুখী। ভূ-কক্ষের উত্তর নাভি অনুসূর এবং দক্ষিণ নাভি অপসূর হয়েছে প্রায় দু-হাজার বছর আগে [2005 বৎসর] তার আগে ব্যাপারটা উল্টো ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানীরা উল্টোটাই বর্তমান বলছেন—একথা আগেই বলা হয়েছে। এই বিজ্ঞানীদের কথা ঠিক হলে উদ্ধৃত ঋকটি চার-পাঁচ হাজার বছরের পুরানো দিনের কথা বলছে, আর তা না হলে এই ঋকটি হাজার দুই বছরের পুরানো। তবে ঋগ্বেদের দাবী কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণার বিপরীত এবং তার স্বপক্ষে বহু যুক্তিও আছে।

আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে সূর্য তেত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বা নীহারিকার ব্যাসার্ধ 50 হাজার আলোকবর্ষ। সূর্যের গতিবেগ সেকেন্ডে 160 মাইল বা 260 কিমি। সূর্যের সঞ্চার পথের নক্ষত্রগুলি হলো বৃশ্চিক রাশির অনুরাধা নক্ষত্র হতে কুম্ভ রাশির শতভিষা বা বরুণ নক্ষত্র অবধি মোট আটটি নক্ষত্র। এদের নাম যথাক্রমে অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব-আষাঢ়া, উত্তর-আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 115 তম সূক্তের পঞ্চম ঋক বলছে ঃ

"সেই অনুরাধা হ'তে শতভিষা নক্ষত্র অভিচক্ষে এই [সঞ্চার] বৃত্তের অন্যস্থান দুটিতে কর্ষণচলিত অপর পরিধির যোগ বা যুতি সংসৃষ্ট উপস্থানদ্বয় সূর্যের গতিবেগের স্বরূপ প্রকটিত করে চলে" [ঋগ্বেদ ঃ 1/115/5]। অর্থাৎ সূর্যের মহাকাশ পরিক্রমার গতিপথের বা সঞ্চারপথের নাক্ষত্রিক দিকচক্র হলো উপরোক্ত আটটি নক্ষত্র—অনুরাধা হ'তে শতভিষা অবধি। সূর্যের সঞ্চারপথও উপবৃত্তাকার। পৃথিবীর পরিক্রমা পথ বা ভূ-কক্ষও উপবৃত্তাকার। উভয়কক্ষের ছেদবিন্দুও দুটি এবং দুটি বিন্দুই গতিশীল। এদের ঋগ্বেদ বলছে 'উপস্থান'। কাল অদৃশ্য, সুতরাং কালসূচক মহাশূন্যে সূর্যের সঞ্চারবৃত্ত, ভূ-কক্ষ, সূর্য ও পৃথিবীর গতিবেগ সমষ্টির সম্পাতসৃষ্ট উপস্থানদ্বয়ও অদৃশ্য। উপস্থান দুটির পরিচয় কালের গতি দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই ছেদবিন্দু দুটির কাছাকাছি এলে পৃথিবীতে বসন্তকাল বা শরৎকাল হয়। এইজন্য এই উপস্থান দুটির নাম 'বাসন্তী বিষুব' ও 'শারদ বিষুব'।

ভূ-কক্ষার উত্তর নাভি অনুসূর কিংবা দক্ষিণ-নাভি তা নিয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে ঋগ্বেদের বক্তব্যের অমিল থাকলেও এটা বলা যায়, সূর্য তার সৌরমণ্ডল নিয়ে উপবৃত্তাকারে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমণরত এই তথ্য সর্ব প্রথম বিশ্বকে জানিয়েছে ঋগ্বেদ প্রায় চার হাজার বছর আগে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই জ্ঞান এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

একটু আগেই বলেছি, সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব তিন রকমের হয়। একটি সবচেয়ে বেশি দূরত্ব, সবচেয়ে কম দূরত্ব এবং এই উভয় দূরত্বের গড়। ঋগ্বেদে এ সংক্রান্ত ঋকটি হল ঃ

"তিনটি দিব্যস্থান, দুটি সবিতার সমীপবর্তী, একস্থান দূরে দক্ষিণভাগে, উনি দূরগন্তাকে গতিসামর্থ্য দান করেন। আণি যেমন চক্রগতির কারক, গতিরথের অমৃতকারকতা অধিকারীর ক্রান্তিরও তেমনি অবস্থা, যিনি তথ্যে চৈতন্যবান, (তিনি) এ তথ্য বিবৃত করেন।" [ঋগ্বেদ ঃ 1/35/6]

তিন দিব্যস্থান হলো আধুনিক ধারণার 915 লক্ষ মাইল, 930 লক্ষ মাইল এবং 945 লক্ষ মাইল। অর্থাৎ সূর্য হতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দূরত্বে [945 লক্ষ মাইল], সূর্য নিম্ন দূরত্বে [915 লক্ষ মাইল] এবং গড় দূরত্বে [930 লক্ষ মাইল] অবস্থানের তিনটি বিন্দুই তিনটি দিব্যস্থান। আণি [Hub] এখানে সবিতা সূর্য। দুটি ঈশাদণ্ড [Spokes] হলো অনুসূর ও অপসূর। আর ভূ-কক্ষ হলো একটি চক্রবেড় [Rim], যার আকার উপবৃত্তের এবং যার ব্যাস 18,68,64,000 মাইল।

এগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার হলেও ঋগ্বেদের ঋষিরা এগুলি আবিষ্কার করেছিলেন বহুকাল আগে। তবে দূরত্বের হিসাব নিয়ে পার্থক্য আছে। হরপ্পা কিংবা ঋগ্বেদের আমলে যখনই এই দূরত্বগুলি মাপা হয়ে থাকুক না কেন, প্রাচীনকালের মানগুলির সঙ্গে একালের মানগুলির বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছেই। একালের সূক্ষ্ম মাপজোকগুলি হয়তো সে কালে ছিল না, তবুও বলা যায় সূক্ষ্ম মাপজোকে কিংবা বৃহৎ সংখ্যার হিসাবে ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। 10^{17}-এর মত বৃহৎ সংখ্যা যেমন তারা ব্যবহার করতো, তেমনি এক সেকেন্ডের $^1/_{150}$ ভাগ অবধি পরিমাপও তারা করতো। এমন কি প্রাচীন ভারতের সময় পরিমাপক ক্ষুদ্রতম একক 'ত্রুটি'র মান হল 1/33,750 সেকেন্ড।

দৈনন্দিন সময় গণনায়, বিশেষ করে পঞ্জিকায়, মলমাস বা অধিমাসের অবতারণা করে ঋগ্বেদের ঋষিরা এক অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আমরা জানি, চান্দ্র বৎসরের সঙ্গে সৌর বৎসরের পার্থক্য হল প্রায় 11 দিন। যেহেতু আমাদের পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান চান্দ্রতিথি নির্ভর, তাই সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে ঐক্যবিধান না করলে সমস্ত চান্দ্রতিথি নির্ভর উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি প্রতিবছর মোটামুটিভাবে এগারো দিন করে এগিয়ে আসে। ধরা যাক, কোনও বছর 'দোল-উৎসব' পড়লো সৌর চৈত্রমাসের 10ই চৈত্র। অর্থাৎ সেদিন দোল-পূর্ণিমা। সাধারণতঃ এই পূর্ণিমাটা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা এবং 'ফাল্গুনী' বলেই এই পূর্ণিমা ফাল্গুন মাসেই হওয়ার কথা। 10ই চৈত্র কোনও বছর দোল-পূর্ণিমা হলে পরের বছর এগারো দিন এগিয়ে তা পড়বে 30শে ফাল্গুন। তার পরের বছর তা হবে 19শে ফাল্গুন। আর তারও পরের বছর দোল পূর্ণিমা পড়বে 8ই ফাল্গুন। সৌরবৎসরের সঙ্গে চান্দ্রবৎসরের ঐক্যবিধান না করা হলে, ওই দোল পূর্ণিমা প্রতিবছর মোটামুটি এগারো দিন করে এগিয়ে যাবে। দোল পূর্ণিমা এইভাবে পৌষ মাসে এবং আরও পরে শ্রাবণ মাসে চলে আসবে। দোলপূর্ণিমার হোলি-উৎসব যদি শ্রাবণ মাসে হয়, তবে ওই উৎসব তার তাৎপর্য হারাবে। অন্যদিকে শ্রাবণ মাসে চাষ-আবাদ ছেড়ে অধিকাংশ মানুষই এই উৎসব পালন করতে চাইবে না। দোল বা হোলি বসন্তের উৎসব। 'সবার রঙে রঙ' মেশানোর উৎসব। প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটে মনে এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে রঙে, আবীরে, কুমকুমে, গুলালে। অশোক-পলাশ-শিমুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য শ্রাবণ মাসে পাওয়া অসম্ভব। তাই শ্রাবণে দোল-উৎসব অনুষ্ঠিত হলে দোল তার বাসন্তী তাৎপর্য হারাবে। এইসব ভাবনাচিন্তা করেই প্রাচীন ঋষিরা ঠিক করেছিলেন, উৎসবকে একদিকে সর্বজনীন করতে হবে, তেমনি বজায় রাখতে হবে তার মাধুর্য ও তাৎপর্য। দোল-উৎসবকে বসন্ত-উৎসব করে রাখতে হলে তাকে বসন্তকালেই সীমাবদ্ধ

রাখতে হবে। এই কথা সব পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পর্কেই বলা যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিকে সৌরবৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে প্রয়োজন সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে ঐক্যবিধান। এই ঐক্যবিধান করা হল মলমাস অবতারণা করে এবং মলমাসে পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দিয়ে। ঋগ্বেদের ঋষিরা সেই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আজও হিন্দুরা সেই বিধান মেনে চলেছে। ঋষিরা সেই সৌরমাসকে 'মলমাস' বা 'মলিম্লুচ' বললেন, যে সৌরমাসে দুটি অমাবস্যা পড়ে। তিন সৌরবৎসরে 37টি অমাবস্যা ও 37টি পূর্ণিমা হয়। অতএব প্রত্যেক তৃতীয় সৌরবৎসরে 13 টি অমাবস্যা পড়বেই। আর তেরোটি অমাবস্যা কোনও এক সৌরবৎসরে পড়লে ওই বছরের কোনও একটি সৌরমাসে দুটি অমাবস্যা পড়বেই। তেরোটি অমাবস্যা পড়লে সে বছরের দুটি অমাবস্যাযুক্ত মাসটি হল 'মলমাস' বা 'মলিম্লুচ'। ঋগ্বেদ এই সব হিসাব জানতো। সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের হিসাব নিখুঁতভাবেই জানতো। এই দুটি বৎসরের মধ্যে ঐক্যসাধনের এই বিস্ময়কর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ঋগ্বেদের ঋষিরাই। মলমাসে পূজা-পার্বণ নিষিদ্ধ করে প্রতি তিন বছরে উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণকে তার নির্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়ে আনা হল।

সুতরাং চান্দ্র-তিথি নির্ভর হিন্দু-উৎসবগুলিকে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসরের মধ্যে ঐক্যবিধান করেছিলেন মলমাসের অবতারণা করে। এর ফলে একদিকে যেমন উৎসবগুলি তাদের মাধুর্য ও তাৎপর্য হারালো না, অন্যদিকে তমনি বজায় রইলো উৎসবের সর্বজনীনতা। উৎসব সঠিক অর্থে উৎসবই রইল। ভারতীয় হিন্দুদের জীবনযাত্রায় প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোনওভাবে চান্দ্রতিথি ব্যবহৃত হয়। অথচ তারা সুপ্রাচীনকাল থেকে সৌরমাস সহ সৌরবর্ষ গণনায় পটু। ঋতুচক্র ও সৌরমাসের তথা সৌরবৎসরের সঙ্গে চান্দ্রবৎসরের ঐক্য বা সামঞ্জস্য বিধান উপরোক্ত তিনটি কারণে ভারতীয়দের কাছে ছিল অত্যন্ত জরুরী। তাই অধিমাসের প্রবর্তন করে প্রাচীন ভারতীয়রা ওই দু'রকম বৎসরের মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য বিধান করলেন। এই পদ্ধতি আজও ভারতীয় পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারে অনুসৃত হচ্ছে। মলমাস তাই ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলেছে যথেষ্ট পরিমাণে । কয়েক হাজার বছর ধরে সমানভাবে অনুসৃত হচ্ছে এই বিধান।

ঋগ্বেদ তার প্রথম মণ্ডলের 155 তম সূক্তের 6ষ্ঠ ঋকে বলছে ঃ 'বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বৎসরের চতুর্নবতি দিবস চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতি দ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।' সায়ন 'চতুর্নবতি কালাবয়ব' বলতে 'চতুর্নবতি দিবস' অর্থ করেননি। সায়নের মতে 94টি কালাবয়ব হলো ঃ সম্বৎসর (1), অশ্বীদ্বয় (2), পঞ্চঋতু (5), দ্বাদশমাস (12), চতুর্বিংশতি পক্ষ (24), ত্রিশটি দিবারাত্রি (30), অষ্টপ্রহর (8), দ্বাদশ রাশি (12)। এইগুলির সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় 94। পণ্ডিতবর মিউয়র অবশ্য 'চতুভিঃনবতিং' বলতে চারগুণ নব্বই অর্থাৎ বৎসরের 360 দিনের অর্থটা নিয়েছেন। উপরোক্ত অনুবাদে সেই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সায়নভাষ্য ধরলে যে তথ্য আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাতে সৌরমাস ও তার 30 দিনে ভাগ এবং দিনের আবার অষ্টপ্রহরে বিভাজন ইত্যাদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অশ্বীদ্বয় বলতে এখানে দুই অয়ন অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চ ঋতু ধরা হয়েছে হেমন্ত ও শিশির বা শীতকে একটি ঋতু ধরে।

শুধু এই সূক্তেই নয় ঋগ্বেদের আরও বহু সূক্তে সৌরদিন, মাস ও বছরের হিসাব-নিকাশ যেমন নির্ভুলভাবে আছে তেমনটি আর কোথাও নেই। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 164 তম সূক্তটির

কথা বলা যেতে পারে। ওই সূক্তটির কয়েকটি ঋকের বাংলায় অনুবাদ এই রকম ঃ

"সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চারদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করছে। ও কদাচিৎ জরাগ্রস্ত হয় না। হে অগ্নি! এ চক্রে পুত্ররূপ সপ্তশত বিংশতি মিথুন বাস করে। পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্ধে থাকেন, কেউ কেউ তাঁকে 'পুরীষী' বলে। অপর কেউ কেউ ছয় অরবিশিষ্ট সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথে দ্যোতমান আদিত্যকে 'অর্পিত' বলে, যখন তিনি দ্যুলোকের অপর অর্ধে অবস্থিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল পঞ্চঅরবিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রয়েছে, এর অক্ষ প্রভূত ভার বহনেও ক্লান্ত হয় না এবং এর নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখনও শীর্ণ হয় না। সমান নেমি-বিশিষ্ট কালচক্র নিরন্তর ঘুরছে। দশজন একযোগে ঊর্ধ্বদেশে মিলিত হয়ে পৃথিবী ধারণ করছে। সূর্যের চক্ষুরূপ মণ্ডল বৃষ্টিজলে আবৃত হল, সমস্ত প্রাণীজগৎ এতে অর্পিত হল। আদিত্যের সহজন্মা ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হতে উৎপন্ন। এ ঋতুগণ সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত এবং রূপভেদে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট। এরা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য বারবার ঘুরছে। রশ্মিসমূহকে স্ত্রী হলেও পুরুষ বলে, যাদের চক্ষু আছে, তারাই এ দেখতে পায়, যাদের স্থূলদৃষ্টি, তারা এ দেখতে পায় না। যে পুত্র মেধাবী তিনিই এ বুঝতে পারেন। ....দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র, তিন নাভি। এ কথা কে জানে? ওই চক্রে ত্রিশত ষষ্ঠিসংখ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে।" [1ম মণ্ডল 164তম সূক্ত]

বর্ষচক্রের দ্বাদশ অর বলতে ঋষিরা বুঝিয়েছেন বারোটি মাস। অনেকে অবশ্য অর বলতে বারোটি রাশিচক্র মনে করেন, যে রাশিগুলি সূর্য সারা দিন ও রাত্রে পরিক্রমা করে। তবে বর্ষচক্রের কথাই যখন বলা হচ্ছে তখন দ্বাদশ অর বলতে বারোটি মাসকেই বোঝায়। এই চক্রের 720টি মিথুন হলো 360টি দিন ও 360টি রাত্রি। মোট 720টি। পঞ্চপাদ বলতে পাঁচটি ঋতুকে বলা হয়েছে। পরবর্তী ঋকে অবশ্য ছয়টি ঋতুর কথা আছে। তবু এখানে পঞ্চপাদ বলা হলো এই জন্যে যে, হেমন্ত ও শিশির বা শীত ঋতু এক ধরে নিয়ে পাঁচটি ঋতু। 'পুরীষ' মানে জল, 'পুরীষী' মানে বৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ সূর্য উত্তরায়ণে বৃষ্টি সৃষ্টি করেন এবং দক্ষিণায়নে বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয়। এ সম্পর্কে ঋগ্বেদের 6ষ্ঠ মণ্ডলের 32 সূক্তের পঞ্চম ঋকেও একই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ভূ-কক্ষের নাভি দুটি নির্দিষ্ট এবং তার পরিবর্তন নেই এবং যে অক্ষের উপর পৃথিবী ঘুরছে সে অক্ষ নিশ্চয়ই 'প্রভূত ভার বহনেও' অক্লান্ত। কালচক্র সমানভাবে ঘুরছে এবং মহাকাশের দশটি দিক পৃথিবীকে এই অবস্থানে ধরে রেখেছে। বারোমাসে বছর হয়, আবার অধিমাস বা মলমাসকে নিয়ে তেরো মাসেও বছর হয়। বারোমাসের বৎসরে ছয়টি ঋতু এবং তারা প্রত্যেকেই যুগ্ম। কিন্তু অধিমাস বা মলমাসটি একক। এই মলমাস বা অধিমাস নিয়ে আরো ঋক ঋগ্বেদে আছে। ঋতুগুলি বৎসরের স্রষ্টা। এরা ঘুরছে তাই বর্ষচক্র তথা কালচক্র আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে একই ঋতু আসে না তাই তাদের 'স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত' বলা হয়েছে। আবার ঋতুর রূপও পৃথিবীর সর্বত্র একই রকম নয়। তাই রূপ ভেদের কথা বলা হয়েছে। সূর্য-রশ্মি চোখে দেখা যায় না এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ঋষিরাও সে কথা বলছেন। কেবল বুদ্ধিমানেরাই তা জানে। বর্ষচক্রের দ্বাদশ পরিধি হলো দ্বাদশ মাস, এক চক্র হলো এক বৎসর। নাভি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক তিন ঋতু। এই চক্রের অর হলো 360টি দিন-রাত্রি বা 360টি দিবস। ঋগ্বেদে আরো এ ধরনের কয়েকটি সূক্ত রয়েছে।

চন্দ্রকে নিয়ে প্রাচীন ঋষিদের নানা নির্ভুল তথ্য আছে। সেগুলির দু-একটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। অধিমাস নিয়ে আগেই বলা হয়েছে। এখানে কেবল চান্দ্র-তিথি এবং চন্দ্রকে প্রাচীন

ঋষিরা গ্রহ কেন বলতেন তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। পার্থিব পর্যবেক্ষকের চোখে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্রই শীঘ্রগতি। তাঁরা জানতেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, আর চন্দ্র ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। এক চান্দ্রমাস হলো সাড়ে ঊনত্রিশ দিন। দ্বাদশ চান্দ্রমাসে একটি চান্দ্রবৎসর। সুতরাং মোট 354 সৌরদিনে এক চান্দ্রবৎসর। প্রকৃতপক্ষে, এক চান্দ্র মাস হলো 29.530589 সৌরদিন বা 29 দিন 12 ঘণ্টা 44 মিনিট 2.9 সেকেন্ড এবং প্রায় 354 দিন 8 ঘণ্টা 48 মিনিট 35 সেকেন্ডে এক চান্দ্রবৎসর। এক অমাবস্যা হতে অপর অমাবস্যা অবধি ত্রিশটি তিথি বা ত্রিশটি চান্দ্রদিন ধরা হয়। সুতরাং মোটামুটি ত্রিশটি চান্দ্রদিন বা ত্রিশটি তিথিতে সাড়ে ঊনত্রিশটি সৌরদিন হয়। পৃথিবীর সৌর অহোরাত্রি অর্থাৎ নাক্ষত্রদিন সব ঋতুতেই তেইশ ঘণ্টা ছাপান্ন মিনিট। সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে ত্রিশ তিথি হয় বলে এক একটি তিথিতে 23 ঘন্টা 56 মিনিট অথবা তার কিছুটা কম সময় হয়। সকল তিথি সমান মানের নয়, কারণ ভূ-প্রদক্ষিণ কক্ষে চন্দ্রের গতি অনুভূ [Perigee] ও অপভূ [Apogee] অনুযায়ী দ্রুত ও ধীর হয়, যেহেতু চন্দ্রের পরিক্রমণ পথও উপবৃত্তাকার। তাই একটি তিথির ভোগকাল 23 ঘণ্টা 56 মিনিটের বেশি আবার সাড়ে একুশ ঘণ্টার কম হয় না কখনও। এজন্য কোনও চান্দ্রতিথি এক সৌর অহোরাত্র জুড়ে হতে পারে আবার একটি সম্পূর্ণ চান্দ্র তিথি এবং অপর একটি চান্দ্র তিথির কিছুটা অংশ নিয়েও এক সৌর অহোরাত্র হওয়া সম্ভব। কখনো কখনো একটি চান্দ্র তিথির শেষের কিছুটা অংশ, পরের চান্দ্র তিথির মোট ভোগকাল বা সম্পূর্ণ ভোগকাল এবং তার পরের চান্দ্র তিথির প্রথম কিছুটা অংশ নিয়ে এক সৌর অহোরাত্র হয়। এই রকম দিনকে বলা হয় 'ত্র্যহস্পর্শ'। এই ত্র্যহস্পর্শের কথা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে, ফলিত জ্যোতিষে বহুকাল আগেই বলা হয়েছে। চন্দ্রের গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে এটা বলা সম্ভব নয়। তিথি শুরু হওয়ার বা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট কাল নেই। অহোরাত্রের যে কোনও সময় তিথি শুরু বা শেষ হতে পারে। চান্দ্র দিনের নাম তিথি, আর চন্দ্র তাই 'তিথীশ্বর'। ভারতীয় পূজা-পার্বণে চান্দ্রদিন বা তিথির গুরুত্ব অপরিসীম। এ সবই চান্দ্র তিথি ধরে সম্পন্ন হয়। আগেই বলা হয়েছে, চান্দ্র মাস ও সৌরমাসের মধ্যে পার্থক্যের ফলে প্রতি বছর চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরের মধ্যে প্রায় 11 দিনের পার্থক্য হয় মোটামুটিভাবে। তিনটি চান্দ্রবৎসর ও তিনটি সৌর বৎসরের পার্থক্য হয় প্রায় এক মাস। এই রকম একটা মাসকে অধিমাস বা মলমাস বা ঋগ্বেদীয় ভাষায় 'মলিম্লুচ' বলে। এই মলমাসই সৌর ও চান্দ্র দু'রকমের বৎসরের মধ্যে ঐক্যসাধন করে।

চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ না বলে তাকে গ্রহ শ্রেণিভুক্ত করা হলো কেন এ নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। ভাবেন, ঋষি প্রপিতামহেরা বোধহয় জানতেন না চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিক্রমণরত। তাঁদের এই ধারণা একদম ভুল। যে অর্থে ইংরেজীর 'Planet' শব্দ ব্যবহার করা হয় 'গ্রহ' শব্দটি মোটেই সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত 'গ্রহ' শব্দের অর্থ গ্রাস করা, গ্রহ ও গ্রহণ শব্দদ্বয় এক ধাতু হতেই উৎপন্ন এবং গ্রহণ অর্থেও গ্রহ শব্দের প্রয়োগ আছে। সূর্যগ্রহণ অর্থে সূর্যকে গ্রহণ। আর তাকে গ্রহণ করে কে? চন্দ্র, অতএব চন্দ্র গ্রহ। যে গ্রহণ করে সেই গ্রহ। আবার ফলিত জ্যোতিষ মতে মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক ও জীবনের অবসানে প্রাণ গ্রহণ করে যে বা যারা তারাই গ্রহ। এই ব্যাখ্যানুসারে সূর্যও গ্রহ, কারণ ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে সূর্য মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনের অবসানে প্রাণও গ্রহণ করে। এছাড়াও চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দুটি গ্রহণেই

সূর্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। তাই সূর্য নক্ষত্র হলেও প্রাচীন ঋষিরা তাকে গ্রহ বলতেন। ঋষিরা রাহু কেতুকেও গ্রহ বলেছেন। অথচ তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানতেন রাহু ও কেতু কোন দুটি বিন্দুর নাম। এমনকি নাম দুটি তো তাঁদেরই দেওয়া। নাম দুটি দেওয়া হয়েছিলো ওই বিন্দুদুটির গুণ বা ধর্ম দেখেই। পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ পথ ও সূর্যের সঞ্চার বৃত্ত যেমন পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে, যে দুটি বিন্দু হলো বাসন্তী বিষুব ও শারদ বিষুব, তেমনি পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ কক্ষপথ ও চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণ কক্ষপথও পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। এই ছেদ বিন্দু বা সম্পাতদ্বয়ের একটির নাম দেওয়া হয়েছে রাহু এবং অন্যটির নাম কেতু। রাহু বা কেতুতে উপস্থিতির সময় যদি চন্দ্রের পূর্ণিমা হয় তবে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ ঘটায়। রাহু বা কেতুতে না এলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তাই বৎসরের সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এক বৎসরে কোন চন্দ্রগ্রহণ নাও হতে পারে, আবার তিনটি পর্যন্ত গ্রহণ হতেও পারে, তবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বছরে একেবারের বেশি হয় না। পৃথিবীর ছায়া দু'রকমের হয়—প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। উপচ্ছায়াতে চন্দ্র থাকলে কোনও গ্রহণ হয় না। চাঁদকে একটু ম্লান দেখায়। কিন্তু প্রচ্ছায়াতে কোনও আলো না থাকায় চন্দ্রের যতটা অংশ প্রচ্ছায়ার প্রবেশ করে ততটাই অদৃশ্য হয়। চন্দ্র পুরোপুরি প্রচ্ছায়াতে প্রবেশ করলে তখন তাকে আর দেখা যায় না। সে অবস্থায় চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। আর চন্দ্র আংশিকভাবে প্রচ্ছায়া এবং আংশিকভাবে উপচ্ছায়ায় অবস্থান করলে তার আংশিক গ্রহণ হয়। কারণ উপচ্ছায়ায় চন্দ্রের যেটুকু অংশ থাকে তা দৃশ্যমান হয়, যদিও তাকে খানিকটা ম্লান দেখায়।

ঋগ্বেদে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত যে পাঁচটি ঋক রয়েছে সেগুলি হল ঃ

> "যত্ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
> অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ।। 5
> স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
> গুড়্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মাবিন্দদত্রি ঃ।। 6
> মা মামিমং তব সন্তমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধোভিয়সা নি গারীৎ।
> ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা।। 7
> গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্যন্ কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষম্।
> অত্রিঃ সূর্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপ মায়া অঘুক্ষৎ।।8
> যং বৈং সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
> অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবণ্।। 9

[ঋগ্বেদ 5ম মণ্ডল ঃ 40 সূক্ত ঃ 5-9 ঋক]

এর বাংলা অনুবাদ হল ঃ 5) যে সূর্য, যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল, নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেরূপ লক্ষিত হয়েছিল। 6) হে ইন্দ্র। যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সে সকল মায়া-অন্ধকার দূরে অপসারিত করেছিলে তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক, অন্ধকারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করলেন। 7) সূর্য বলছেন, হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশত ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ, তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর। 8) তখন সে ঋত্বিক অত্রি সূর্যকে উপদেশ দিয়ে প্রস্তর ঘর্ষণ করে এবং স্তোত্র দ্বারা দেবগণকে পূজা

করে, মন্ত্র প্রভাবে অন্তরিক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করলেন। তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করলেন। 9) আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে আবৃত করলে, অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হয় নি।

'আসুরঃ স্বর্ভানুঃ' শব্দের অর্থ হল 'বলবান স্বর্গীয় দীপ্তি'। স্বর্ভানু তার মায়া-অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে সূর্যকে। সে অন্ধকার অপসারিত করেছিলেন ইন্দ্র। আর চারিটি ঋকের সাহায্যে ঋষি অত্রি সূর্যকে পুনরায় প্রকাশিত করেছিলেন। এই 'স্বর্ভানু' পৌরাণিককালে এসে রাহু ও কেতু হয়েছেন। পৌরাণিক রাহু-কেতুর গল্প প্রায় সকলেরই কম-বেশি জানা। ঋগ্বেদে কোথাও রাহু-কেতু নেই। স্বর্ভানুই বৈদিককাল থেকে পৌরাণিক কালে এসে রাহু-কেতু হয়ে গেছেন।

পৌরাণিককালে রাহু-কেতু সম্পাতদ্বয় কল্পিত হয়েছে এক দানব হিসাবে। সে বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র। তাকে বলা হত রাহু-দানব। দৈত্য এবং দানবের সংযোগে উৎপন্ন বলে সে প্রবল বলবান। সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল অমৃত। সে অমৃত যে পান করবে সে হবে অমর। অমৃত পান নিয়ে অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে শুরু হল প্রবল বিবাদ। সেই সময় বিষ্ণু এক মোহময়ী নারীর রূপ ধারণ করে, মোহিনী মূর্তিতে দেখা দিলেন বিবাদমান অসুর এবং দেবতাদের সামনে। মোহমুগ্ধ অসুরেরা এবং দেবতারাও সেই মোহিনীকে দিলেন অমৃত বণ্টনের ভার। এক সারিতে বসলেন দেবতারা, অন্য সারিতে অসুরেরা। রাহু ভাবল সে দু'বার অমৃত পান করবে। তাই মোহিনী যখন প্রথমে দেবতাদের সারিতে অমৃত পরিবেশন করতে শুরু করল, তখন রাহু ছদ্মবেশ ধারণ করে বসে গেল দেবতাদের পংক্তিতে। বসল চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতার মাঝখানে। তার ইচ্ছা ছিল দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করার পর সে আবার অসুরদের সঙ্গে অমৃত পান করবে। চন্দ্র ও সূর্য ধরে ফেলল রাহুর সে ছদ্মবেশ। তারা দুজনেই এ ব্যাপারে মোহিনী তথা বিষ্ণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জানাল এক দানব ছদ্মবেশে বসে গেছে দেবতাদের পংক্তিতে। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিলেন রাহুর শিরচ্ছেদ করতে। সুদর্শন রাহুকে দ্বিখণ্ডিত করল। একটা অংশ হল তার ছিন্নমুণ্ড, আর তার অন্য অংশটা হল দেহ বা ধড়। অমৃত পানের ফলে তার ছিন্নমুণ্ড এবং ধড় দুটোই অমরত্ব লাভ করল। ছিন্নমুণ্ডটার নাম হল রাহু, ধড়ের নাম হল কেতু। এক রাহুদানবই দুই হয়ে গেল। হয়ে গেল রাহু এবং কেতু। অমর রাহু এবং কেতু চিরশত্রু হল চন্দ্র-সূর্যের, যেহেতু তারাই ছদ্মবেশী রাহুকে চিহ্নিত করেছিল। রাহু-কেতুর সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যের চিরশত্রুতার ফলেই সুযোগ পেলে তারা চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। চন্দ্র রাহু ও কেতু নামের সম্পাতদ্বয়ের কাছাকাছি এলেই গ্রহণ হয়—এই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই এই পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল উদ্গাতা হ'ল ঋগ্বেদ। এই প্রাচীনতম গ্রন্থটির সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যটাই রূপান্তরিত এবং পল্লবিত হয়েছে পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে। ঋগ্বেদীয় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই মার্জিত হয়ে, পরিবর্তিত হয়ে স্থান পেয়েছে ওই সব কাহিনীতে। পৌরাণিক কাহিনীগুলির গ্রহণ সংক্রান্ত তত্ত্ব একেবারেই নির্ভুল। রাহু কেতুর ধারণা তাই বিস্ময়করভাবে প্রাচীন। এই আবিষ্কার বৈদিককালের কিংবা হরপ্পীয়দের তা বলা মুশকিল। তবে ঋগ্বেদেই আমরা সর্বপ্রথম পেলাম 'স্বর্ভানু' তথা রাহু-কেতুর কথা। প্রাচীন ভারতে রাহু-কেতুর সঙ্গে গ্রহণের সম্পর্কের সম্যক জ্ঞান যে ছিল তার লিখিত প্রমাণ হ'ল আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের 5 মণ্ডলের 40 তম উপরোক্ত সূক্তটি।

পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণের ঋগ্বেদীয় ধারণা বিস্ময়করভাবে আধুনিক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 62-তম সূক্তের সপ্তম ঋক বলছে ঃ

"নীল নভে অনায়াস সংস্থিত স্তবকে আধারভূত অর্কের [গ্রহস্তবকের আধারভূত সূর্যের এক নাম অর্ক] বিবর্তন বেগে দ্বি-নাভিসমন্বিত পথ নিত্য সঞ্জাত হয়ে চলেছে। ভগকে [দ্বাদশ আদিত্যের একটির

নাম ভগ] নির্দিষ্ট মানে পরিবেষ্টন করে রোদসী আমাদের ধারণ ক'রে ব্যোমচারণ সুসম্পন্ন করছেন।" [1মণ্ডল 62 সূক্ত 7 ঋক]

সহজ করে বললে, রোদসী অর্থাৎ পৃথিবী নীল আকাশে গ্রহমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে। পৃথিবীর এই পরিক্রমণ পথ দুই নাভি [Focus] যুক্ত। দুটি নাভি আছে মানে হলো পথটি উপবৃত্তাকার। এই উপবৃত্তাকার পথের মান বা পরিমাণ নির্দিষ্ট। পৃথিবী আমাদের নিয়ে এই উপবৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা করে আকাশে বিচরণ করছে। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এই জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়দের ছিল এবং আর্বতন পথ যে উপবৃত্তাকার তাও তাঁরা জানতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোনও সভ্যতা এই সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের সভ্যতাগুলিতে এই আবিষ্কারেরই সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর তৃতীয় পঞ্চিকার চুয়াল্লিশতম অধ্যায় বলছে ঃ

"রাত্রি অবসান হলে ঊষাকালে যখন লোকে মনে করে সূর্য উদিত হলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য আপনাকে বিপর্যস্ত করেন। দিবা অবসানে যখন লোকে মনে করে সূর্য অস্তগত হলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য বিপর্যস্ত হন।"

সকাল এবং সন্ধ্যায় সূর্যোদয়ের কিছুটা আগে এবং কিছুটা পরে যে আধো-আলোকিত কাল, যাদের আমাদের উষাকাল এবং গোধূলিবেলা বলি, এ দুটির সৃষ্টি হয় সূর্যের আলোর প্রতিসরণের ফলে। সূর্য আপাতভাবে দিকচক্রবাল রেখার উপরে আসার কিছুটা আগেই বায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মির প্রতিসরণের ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে শুরু করে। সূর্য দিকচক্রবাল রেখায় এলে হয় সূর্যোদয়। তার আগে প্রতিসরণের মাধ্যমে যে আলো পৃথিবীতে আসে তাই সৃষ্টি করে ঊষাকাল। এতে যে শুধু প্রতিসরণের ফলেই আলো আসে তা নয়, বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলনের এবং বিচ্ছুরণের ফলেও কিছুটা অতিরিক্ত আলোক রশ্মি প্রতিসৃত রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় ঊষাকাল বা ভোর বা সকাল। সূর্য উঠলে অর্থাৎ সূর্য দিকচক্রবাল রেখায় আপাতভাবে এলে বলা হয় সূর্যোদয় হল এবং দিন শুরু হলো। তেমনি দিন শেষে সূর্য আপাতভাবে দিকচক্রবাল রেখা পেরিয়ে আরো কিছুটা পশ্চিমে যাওয়া অবধি তার আলো একই রকমভাবে প্রতিসরণের ফলে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর যে অংশে এই ধরনের আলো আসে সেখানে তখন গোধূলি। 'গো' অর্থে আলো, 'ধূলি' মানে অন্ধকার। অতএব গোধূলি মানে হলো আলো-অন্ধকারের সন্ধিকাল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যে সূর্যের 'বিপর্যস্ত' হওয়ার কথা বলছে, তা হলো সূর্যরশ্মির এই প্রতিসরণের কথা এবং কিছুটা প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের কথা। সূর্যের বিপর্যস্ত আলোই ঊষাকাল ও গোধূলির সৃষ্টিকর্তা। বায়ুমণ্ডলে আলোর প্রতিসরণ ইত্যাদির কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচয়িতাদের জানা ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল, খুব কম করে ধরলেও, 1,500 খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

এই ঊষাকাল, গোধূলিবেলা, দিন এবং রাত্রি পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময়ে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের তো উদয় অস্ত নাই: পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সূর্য ঘুরছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষ্ণুপুরাণ বলেছে ঃ

"*পৃথিবীর যেখান হতে সূর্য দৃশ্য হল, সেখানের পক্ষে তাঁর উদয় এবং যেখান হতে তিনি দৃশ্য হন* না, সেখানের পক্ষে তাঁর অস্তমন মনে হয়। বাস্তবিক, সূর্যের উদয় বা অস্তমন নাই।" আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথাই রয়েছে প্রাচীন পুরাণে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কথারই প্রতিধ্বনি করছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞান। এরই কিছুটা পরবর্তীকালে আর্যভট বললেন ঃ

"পৃথিবী ও গ্রহের গোলকের যে অর্ধাংশ যখন সূর্যের অভিমুখে থাকে, সেই অর্ধাংশ তখন দীপ্তিশীল হয়। অপরার্ধ নিজের ছায়ায় থাকে বলে নিষ্প্রভ। সূর্যালোকিত অংশে দিন, সূর্য দিননাথ, নিষ্প্রভ অংশ রাত্রি, সোম বা চন্দ্র নিশানাথ।"

সূর্যের অর্ধাংশ উদিত হওয়ার পূর্বে এবং অর্ধাংশ অস্তগত হওয়ার পরে যত সময় নক্ষত্ররাশি অদৃশ্য বা অস্পষ্ট থাকে তাকে যথাক্রমে প্রভাতকাল ও সন্ধ্যাকাল বলেছেন প্রাচীন ঋষিরা। এই সময়ের পরিমাণ প্রায় দুই দণ্ড বা 48 মিনিট। গোধূলির পর আসে রাত্রি। 'রজঃ' অর্থ ধূলি বা অন্ধকার, যে কাল রজঃ নিমগ্ন করে সেই কালের নাম 'রজনী'। রাত্রি তাই রজনী। চন্দ্রালোকে রজনীর অন্ধকার দূর হয়, তাই চাঁদের নাম রজনীনাথ। ঋষিরা আরো বলছেন যে, দর্পণে পতিত সূর্যরশ্মি যেমন দ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে গৃহের অন্ধকার হনন করে, তেমনি চন্দ্রদেহে সূর্যরশ্মি মূর্ছিত হয়ে রজনীর অন্ধকার নাশ করে। চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই একথা ঋষিরা জানতেন এবং সূর্যের আলোই চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়, যেমনটি ঘটে দর্পণে সূর্যালোক প্রতিফলনের ক্ষেত্রে, একথাও তাঁরা ঘোষণা করেছেন সুদূর অতীতে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির কথা সকলের জানা। এই কলা অবশ্য অংশের ষাট ভাগের এক ভাগ। অংশ হলো আধুনিককালের কৌণিক মাপের 'ডিগ্রি' [Degree]। সেদিক থেকে কলা হলো এখনকার 'মিনিট'। প্রাচীনকালে অমাবস্যা হ'তে পূর্ণিমা পর্যন্ত ষোড়শ তিথি ষোড়শ কলা নামে অভিহিত হ'ত। অমরকোষ বিভিন্ন অমাবস্যা ও পূর্ণিমার বর্ণনা দিয়েছে এই রকম ঃ

"পঞ্চদশ কলাযুক্ত পূর্ণিমার নাম 'অনুমতি পূর্ণিমা' এবং ষোড়শ কলাযুক্ত পূর্ণিমার নাম 'রাকা পূর্ণিমা', চন্দ্রের পূর্ণিমা এই দুই রকম হয়। কিঞ্চিৎ দৃষ্ট চন্দ্রযুক্ত অমাবস্যার নাম 'সিনিবালী', নিঃশেষ চন্দ্র অমাবস্যার নাম 'কুহু' অমাবস্যা। কোকিলের একবার কুহুধ্বনিতে যতটুকু সময় লাগে, তাই কুহু অমাবস্যার স্থায়িত্বকাল।"

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪4তম সূক্তের 15তম ঋক বলছে, " এ রূপে আদিত্যরশ্মি এ গমনশীল চন্দ্র মণ্ডলের অন্তর্হিত সূর্যতেজ পেয়েছিল।" নিরুক্ত এক ব্যাখ্যায় বলছে সূর্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে চন্দ্রের আলোক হয়—একথা ঋগ্বেদীয় ঋষিদের জানা ছিল। শুধু তাই নয়, চন্দ্রমণ্ডলও যে গতিশীল তা এখানে বলা হয়েছে। আধুনিক মত বলছে, ঋগ্বেদের ঋষিরা জানুন বা না জানুন নিরক্তকার যাস্কের সময় চন্দ্রালোক সংক্রান্ত ওই তথ্য নিশ্চয়ই জানা ছিল। কিন্তু নিরুক্ত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করেছে মাত্র। তাই ঋগ্বেদীয় ঋষিদের এই তথ্য অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোনও সভ্যতাই এই সত্য আবিষ্কার করতে পারে নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই জ্ঞান সমসাময়িক সভ্যতাগুলি ভারতবর্ষ থেকেই গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের সভ্যতাগুলিতে এই আবিষ্কারের সুস্পষ্ট গভীর প্রভাব দেখা যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 155 তম সূক্তের 6ষ্ঠ ঋক কিংবা ওই মণ্ডলের 164 তম সূক্তটি আশ্চর্যজনকভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম তথ্যের বা তত্ত্বের কথা বলছে। ওই দুটি সূক্ত থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। আমরা যে সব তথ্যকে একেবারে আধুনিককালের বলে মনে করি তা প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের ঋষিদের দ্বারা 6,000 বছর পূর্বেই আবিষ্কৃত। এই দুটি সূক্তের মধ্যে পাই ঃ মেষাদি বারোটি রাশিচক্রের কথা, বরোটি মাসের কথা, ছয়টি ঋতুর কথা, 360 দিন ও 360 রাত্রিতে সম্বৎসর হওয়ার কথা, অধিমাসের কথা, সূর্যের আলোর সাতটি রঙ বা সপ্তরশ্মির বিবরণ ইত্যাদি। এছাড়া আছে উপবৃত্তকার পথে পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার কথা। সেই পথ দ্বি-নাভি [Focus] সমন্বিত। ঋগ্বেদের এইসব আবিষ্কার আমাদের বিস্মিত

করে এবং অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, আজ আমরা আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে যে সব তথ্যকে দাবী করছি, সেই সব তথ্য বেশ কয়েক হাজার বছর আগে ঋগ্বেদের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল!

মাস নিয়ে যজুর্বেদে একটি মন্ত্র আছে, যেখানে বলা হয়েছে বৈদিক যুগের বারোটি মাসের নাম। যজুর্বেদের 7ম অধ্যায়ের 30 তম মন্ত্র হলো ঃ

"উপষাম গৃহীতো হসি মধবে, ত্বোপয়ামগৃতো হসি মাধবায় ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি, শুক্রায় ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি, শুচয়ে ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি, নভসে ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি, নভস্যায় ত্বোপয়ামগৃহীতো হসীষে, ত্বোপয়ামগৃহীতো হস্যূর্জ, ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি সহসে, ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি সহস্যায় ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি, তপসে, ত্বোপয়ামগৃহীতো হসি তপস্যায়, ত্বোপয়াম গৃহী হস্যংহসস্পতয়ে ত্বা।" [যজুর্বেদ ঃ 7ম অধ্যায় ঃ 30তম মন্ত্র]

"হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, চৈত্রমাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, তুমি গৃহীত হয়েছো, আমাদের স্বীকৃত বৈশাখের জন্য তোমায় গ্রহণ করেছি। তুমি গৃহীত হয়েছো, জ্যৈষ্ঠমাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, আষাঢ় মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, শ্রাবণমাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, ভাদ্রমাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, আশ্বিন মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি গৃহীত হয়েছো, কার্তিক মাসের অধিদেবের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি গৃহীত হয়েছো, অগ্রহায়ণ মাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি গৃহীত হয়েছো, পৌষমাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, মাঘমাসের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, ফাল্গুনমাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছো, অধিমাসের (মলমাস) অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি।"

বারোমাসের ঋগ্বেদীয় কিংবা যজুর্বেদীয় নাম হলো

মধু	শুচি	ঈষ	সহস্য
মাঘব	নভস্	ঊর্জ	তপস্
শুক্র	নভস্য	সহস্	তপস্য

অনুবাদে নামগুলি দেওয়া হয়েছে এখনকার প্রচলিত নাম, অর্থাৎ

চৈত্র	আষাঢ়	আশ্বিন	পৌষ
বৈশাখ	শ্রাবণ	কার্তিক	মাঘ
জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র	অগ্রহায়ণ	ফাল্গুন

ভারতীয় বর্ষপঞ্জীতে দ্বাদশ মাসের এই নামকরণেরও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক আছে। একটু পরেই তা আলোচনা করা হবে। যজুর্বেদের ওই মন্ত্র থেকে বৈদিকযুগের মাসগুলির নামও যেমন পাই তেমনি পাই অধিমাসের কথা। যেহেতু চন্দ্র বা সোমের স্তুতি করে এই মাসগুলির উল্লেখ তাই এগুলি চান্দ্রমাসের নাম বলেই মনে করা হয়। অধিমাসের উল্লেখ এই সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করে। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋগ্বেদের ঋষিরা যে সৌরবৎসের গণনা জানতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে। শুধু তাই নয়, চান্দ্রবৎসরের গণনাও তাঁরা জানতেন বেশ ভালো করেই। এই দুই বৎসরের নিখুঁত হিসাব না জানলে অধিমাস বা মলমাসের হিসাব পাওয়া মুশকিল এবং উভয় বর্ষের ঐক্যসাধন বা সামঞ্জস্য

বিধান করাও অসম্ভব। ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষিরা তা নিখুঁতভাবেই জেনেছিলেন এবং উভয় বর্ষের ঐক্যসাধনও করেছিলেন। অধিমাসের সাহায্যে সেই ঐক্যসাধন পদ্ধতি আজও অনুসৃত। তবে এমনও হতে পারে যে, বৈদিক সৌরবর্ষের বারোটি মাসের নামই হলো, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ঈষ উর্জ, সহস,সহস্য তপ এবং তপস্য। কারণ এগুলি চান্দ্রমাসের নামকরণ হলে অধিমাসেরও একটা নাম তাঁরা দিতেন। তা কিন্তু তাঁরা দেননি। সোমের স্তুতি করেছেন বলেই অধিমাসের কথা এসেছে। এই বারোটি মাস সম্ভবতঃ সৌরমাস।

সৌরবৎসরের সঙ্গে চান্দ্রবৎসরের পার্থক্য দ্বাদশ দিন [প্রকৃতপক্ষে 11.25 দিন]—এর উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের 4র্থ মণ্ডলের 33তম সূক্তের 7ম ঋকে। সুতরাং সৌরবৎসর গণনা হতো ওই সব নামের মাসগুলি দিয়ে। সম্ভবত সৌরমাস ও চান্দ্রমাসের নামগুলি একই ছিল এবং অধিমাসের কোনও নামকরণ প্রয়োজন হয়নি এজন্য যে ওই বারোটি মাসের যেটিতে দুটি অমাবস্যা পড়তো কোন বৎসরে, সেই বৎসর সেই মাসটি হতো মলমাস বা অধিমাস বা উপজাতমাস বা মলিম্লুচ। মধু মাধব ইত্যাদি বারোটি নাম তাই প্রাচীন ভারতীয় সৌর বর্ষপঞ্জীর বারোটি সৌরমাসের নাম। বৈদিক যুগে বৎসর শুরু হতো মধুমাসে অর্থাৎ এখনকার ফাল্গুনমাসে। আধুনিক ভারতীয় বর্ষপঞ্জীতে শকাব্দ বর্ষের শুরু হয় 7ই বা ৪ই চৈত্র থেকে। শকাব্দের বারো মাসের প্রথমটি হলো আধুনিক চৈত্রমাস। শকাব্দের 1লা চৈত্র শুরু হয় এবং বর্ষারম্ভ হয় ইংরেজীর 21শে মার্চ বা 22 শে মার্চ এবং বাংলার 7ই বা ৪ই চৈত্র থেকে। এখন জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে মহাবিষুব সংক্রান্তি বা বাসন্তী বিষুব সংক্রান্তি হচ্ছে প্রতি বছর 6ই বা 7ই চৈত্র অর্থাৎ 20শে বা 21শে মার্চ। ওই দিন শকাব্দের 30শে ফাল্গুন অর্থাৎ বর্ষশেষ। অধিবর্ষের জন্য কোনও বছর শকাব্দের বর্ষ আরম্ভ হয় 21শে মার্চ বা বাংলা সনের 7ই চৈত্র, আবার কোনও বছর 22শে মার্চ বা ৪ই চৈত্র নতুন শকাব্দ শুরু হয়। যাইহোক, ঋগ্বেদের বর্ষশুরুর মাস হলো 'মধু' মাস এবং তা হলো আমাদের এখনকার ফাল্গুন মাস। তপস্যমাস হলো এখনকার মাঘমাস। আমরা প্রচলিত মত অনুযায়ী ফাল্গুন মাসকেই 'মধু' মাস বলি।

ঋগ্বেদের আমল থেকে শুরু করে প্রায় 2700 বছর পূর্ব পর্যন্ত বারো মাসের নাম বৈদিক নাম অনুসারে মধু, মাধব ইত্যাদি ছিল। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের কালে বিশাখা, জ্যৈষ্ঠা, আষাঢ়া, শ্রবণা, ভাদ্রপদা, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, ফাল্গুনী ও চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই নামগুলি দেওয়া হয় বারোটি সৌরমাসের। মাসগুলির এই পরিবর্তিত নামকরণ চালু হয়েছিল 'বিক্রম সম্বৎ' বা 'সম্বৎ' সাল গণনার সময় থেকে অর্থাৎ এখন থেকে 2067 বৎসর আগে বা 57 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। মাসগুলির এই নতুন নামকরণ করা হয়েছিলো কোন্ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হচ্ছে তা দেখে। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র কোন মাসে যে নক্ষত্রে অবস্থান করছে সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম অনুসারে রাখা হয়েছে ওই মাসের নাম। কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থান কালে চন্দ্রের পূর্ণিমা হলে যে মাসে তা হলো সেই মাসের নাম হলো কার্তিক। মাসগুলির নাক্ষত্রিক নাম হওয়ার ফলে, সূর্য থেকে দেখলে পৃথিবী ও চন্দ্রের ক্রান্তি বা অবস্থান সহজবোধ্য হয়ে উঠে। যেমন, বৈশাখী পূর্ণিমায় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন সমসূত্রে থাকছে, তখন পৃথিবীর দর্শক যেমন চন্দ্রকে বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিত দেখছে বা বিশাখা নক্ষত্রে চন্দ্রের ক্রান্তি হয়েছে দেখে, তেমনি সূর্য থেকে দেখলে পৃথিবীকেও বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থান করতে দেখা যাবে। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় সূর্য,চন্দ্র ও পৃথিবী একই রেখায় আসে। ফলে, বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্র যেমন বিশাখা নক্ষত্রে

অবস্থান করে, তেমনি পৃথিবীও বিশাখা নক্ষত্রে থাকে, অবশ্য যদি সূর্য থেকে পৃথিবীকে দেখা হয়। আবার পৃথিবী থেকে সূর্যকে দেখলে সূর্য তখন আপাতভাবে 180^0 বিপরীতে অবস্থান করে। অর্থাৎ সূর্যের আপাত অবস্থান তখন মেষরাশিতে, আর মেষরাশি নক্ষত্র হলো অশ্বিনী, ভরণী এবং কৃত্তিকার 1/4 অংশ। 27টি নক্ষত্রের প্রতিটি আকাশে $13^0\ 20'$ অংশ দখল করে আছে। সোয়া দুটি নক্ষত্রে 30^0 বা একটি রাশিচক্রের অবস্থান বা বিস্তার। এই ত্রিশ অংশ বা ডিগ্রি সূর্য মোটামুটিভাবে 30 দিনে অতিক্রম করে। অর্থাৎ সূর্য আপাতভাবে প্রতিদিন আকাশের 1^0 বা এক অংশ সরে যায়। সূর্যের এই সরণ পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের জন্য ঘটে এ কথা আগেই বলা হয়েছে। 20শে বৈশাখ সূর্য মোটামুটিভাবে মেষরাশির 20^0-তে থাকে। নক্ষত্রটা হবে ভরণী। অর্থাৎ সূর্য তখন ভরণী নক্ষত্রে। আর ওইদিন পূর্ণিমা হলে চন্দ্র তখন আকাশে বিশাখা নক্ষত্রে। কারণ মাসটা বৈশাখ।

আবার কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক-চতুর্থাংশ মেষরাশিতে, বাকী তিনভাগ বৃষরাশিতে অবস্থিত। সূর্য হতে দেখলে পৃথিবী কৃত্তিকা নক্ষত্র অতিক্রম করে কার্তিক মাসের প্রায় সাতাশ দিন হতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রায় দশদিন পর্যন্ত। ওই সময় পৃথিবীর ক্রান্তি হয় কৃত্তিকা নক্ষত্র-বিভাগে। আবার সূর্য তখন তুলারাশির ছাব্বিশ অংশ হতে বৃশ্চিকরাশির প্রায় দশ অংশ অবধি গমন করে। এই সময় পূর্ণিমা হয় কৃত্তিকা নক্ষত্রে। মাসের নাম তাই কার্তিক। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রকে কৃত্তিকাবিভাগের প্রধান তারকা Pleiades-এ অবস্থান করতে দেখা যায়। Pleiades তারকা নীহারিকার মত দেখতে এবং অনেকগুলি তারার সমাহার। চন্দ্র যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে, পৃথিবীর ক্রান্তিও যখন কৃত্তিকায়, এমন পূর্ণিমায় সূর্য তুলারাশির 26^0 হতে বৃশ্চিক রাশির 10^0 অবধি অংশে কোথাও অবস্থান করে। অর্থাৎ সূর্য ওইসময় বিশাখা নক্ষত্রের শেষাংশ পরিক্রমা করে বা অনুরাধা নক্ষত্রের প্রথম অর্ধাংশের কোথাও অবস্থান করে। আর একটু সহজ করে বললে, কার্তিকমাসের পূর্ণিমায় চন্দ্র অবস্থান করে কৃত্তিকা নক্ষত্রে, পৃথিবীর ক্রান্তিও ওই কৃত্তিকা নক্ষত্রে, কিন্তু সূর্য তখন থাকে বিশাখা নক্ষত্রে বা তুলারাশিতে।

আবারো বলি, মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম দিকটা হল 'বৈদিককাল'। এই কালের বিস্তার ছিল প্রায় 5200 বছর আগে থেকে 3200 বছর অবধি। এরপর আসে 'বেদাঙ্গকাল'। এর বিস্তার মাত্র 500 বছর—3200 বছর থেকে 2700 বছর পূর্ব অবধি। এখন থেকে প্রায় 2700 বছর আগে [700BC] শুরু হয় 'সিদ্ধান্তকাল'। এই সিদ্ধান্তকাল চলতে চলতে এসে গেছে আধুনিক কাল। এই তিনটি কাল একেবারে পৃথক পৃথক নয়। এদের একটি আর একটির সঙ্গে যেন ধীরে ধীরে মিশে গেছে। ফলে, এই তিনটি কালের বিভাগ সুনির্দিষ্ট ভাবে করা মুশকিল। উপরি উক্ত বিভাজন অনেকটাই প্রায়িক। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন, আবার অনেকে তা করেন না। ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেলি [Bailly] বলেছেন, গ্রীক জ্যোতিঃশাস্ত্র হওয়ার অনেক কাল আগেই ভারতীয় জ্যোতিষ সূত্রাকারে রচিত হয়েছিল। আবার বেন্টলি [J. Bentley] সাহেব বলছেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষ খুব অল্পদিন আগে রচিত, আর ভুলক্রমেই হোক বা অন্য কোনোভাবেই হোক, ওঁর গ্রন্থে এও লেখা আছে যে, হিন্দু জ্যোতিষ বহুকাল হতে চলে আসছে। অন্যান্য পণ্ডিতরা হিন্দু তথা ভারতীয় ও গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাদৃশ্য দেখে মনে করেন যে, গ্রীকদিগের টলেমি [C. Ptolemaeus] [100-170 খ্রিস্টাব্দ] তাঁর 'আলমাজেস্ট' [Almagest] নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশের পরেই ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার শুরু। একদম বাজে কথা। আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে রয়েছে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রিক মতবাদ। টলেমি তো কেবল ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের

কথা বলেছিলেন, যা এখন মিথ্যা বলে প্রমাণিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় মতটাই এখন বাস্তব সত্য। আমাদের জ্যোতিষ চিরকালই নক্ষত্রকে স্থির ধরে 'নিরায়ন পদ্ধতি'-তে গণনা করেছে। গ্রীকদের গণনা চিরকালই 'সায়ন' পদ্ধতির। কেবল মাত্র নীচোচ্চ বৃত্ত এবং প্রতিবৃত্তের [Epicycles and Eccentrics] সাদৃশ্য দেখা যায়। এতে বলা যায় না যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রীকদের চেয়ে প্রাচীনতর নয়। আবারো বলি, প্রায় 5200 বছর আগে ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার শুরু। পৃথিবীতে হরপ্পা-সভ্যতার লোকজনেরাই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করে। এব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয়রাই পথিকৃৎ।

ঋগ্বেদের জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতাতে সূর্য, ঊষা এবং সোম দেবতাদের কথা বারে বারে বলা হয়েছে। সোম বলতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চন্দ্রকেই বোঝানো হয়েছে। মন্ত্রভাগে যে সব মন্ত্র জ্যোতিষ সম্পর্কিত সেগুলি যদি একত্রে লেখা হত তাহলে এই সম্বন্ধে অনেকটা সুমীমাংসা হতে পারতো। তবে মন্ত্রের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্নভাবে করার ফলে এনিয়ে বেশ গোলযোগ হয়। তাই মন্ত্রগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভাগ, কল্প এবং গৃহ্যসূত্রগুলিও ধরতে হবে। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ঋগ্বেদের ঋষিরা জানতেন, পৃথিবী গোলক, আকাশে নিরাধার শূন্যে অবস্থিত, সূর্য তার সৌরমণ্ডল নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করছে, চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সূর্যের আলোয় সে আলোকিত, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কথা এবং আরও বহু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব।

ভারতেই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার শুরু। আর এখান থেকেই তা বিস্তৃত হয় চীন, সুমের, মিশর প্রভৃতি সমকালীন সভ্যতায়। শ্রী বিজ্ঞানানন্দ স্বামী তাঁর অনূদিত 'শ্রী সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখেছেন ঃ

"ঋগ্বেদ সংহিতাতে সপ্তর্ষির কথা অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে; আর শতপথ ব্রাহ্মণে ইহা লেখা আছে যে, এই সপ্তর্ষিকে পূর্বে 'ঋক্ষ' ভল্লুক বলা হইত। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সংহিতাতে নক্ষত্রপুঞ্জকেই জন্তুর আকাররূপে কল্পনা করা হইত। আর এই ভাবটিই সম্ভবতঃ বাবিলোনিয়া, ইজিপ্ট এবং গ্রীকেরা অলম্বন করিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয় অপক্ষপাতিতার সহিত পর্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, আর্য ঋষিদিগের নিকটেই জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রথম প্রাদুর্ভাব ও উৎপত্তি হয়। ইহাদিগের নিকট হইতে চীনেরা, বাবিলনেরা ও আরবেরা জ্যোতির্বিদ্যা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহারা স্বাভাবিক ঔৎসুক্যবশতঃ আকাশের অনেক বেশি নক্ষত্রাদির দর্শন করিয়াছিলেন। সংহিতাতে এই সপ্তর্ষি ব্যতীত, অরুন্ধতী এবং ধ্রুবতারার বিষয়ও উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রজাপতি মৃগরূপে নিজের কন্যার নিকটে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন রুদ্রদেব মৃগরূপী প্রজাপতিকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে প্রজাপতি আকাশে মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। দশম মণ্ডলেও বৃষাকপির বিষয় উল্লিখিত আছে। এই প্রকার নক্ষত্রের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এইরূপ গল্প পরে গ্রীকদের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

এখন আর্যঋষিরা রবিমার্গে 27টি বা 28টি নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইতে খুব সম্ভব ক্রমশঃ দ্বাদশ রাশির প্রাদুর্ভাব হয়। পরে এই দ্বাদশ রাশির ভাব ভারত হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রীকদিগের 12টি রাশিতে যে সব নক্ষত্র আছে, তাহারা বেশির ভাগ পূর্বোক্ত 27টি নক্ষত্রের মধ্যে হইতেছে। হিন্দুরা এই 27টি নক্ষত্র নিম্নলিখিত কারণবশতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 27 দিনে চন্দ্র অচল নক্ষত্রের মধ্যে একটি ভগণ পূর্ণ করেন; অর্থাৎ কোনো একটি নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া

27 দিন পরে পুনরায় চন্দ্র সেই নক্ষত্রে আসিয়া মিলিত হন। চন্দ্রের এই 27টি নক্ষত্র পরিভ্রমণ কক্ষাকে ভচক্র (Lunar Zodiac) কহে। 'ভ' অর্থে 27টি নক্ষত্র বুঝায়। দ্বাদশ রাশিতে সূর্য, দ্বাদশ মাসে ক্রমান্বয়ে যে যাইয়া থাকেন তাহা সূর্যের কিরণাতিশয্য হেতু দেখা যায় না; কিন্তু চন্দ্র যে 27টি নক্ষত্রের একটি নক্ষত্র হইতে পরের নক্ষত্রটিতে এক এক রাত্রিতে যান, তাহা চন্দ্রের কিরণ শীতল হওয়াতে স্পষ্টই নয়নগোচর হইয়া থাকে। এই চন্দ্রের মার্গ যেহেতু রবিমার্গের সহিত ঈষৎ অবনত এবং যেহেতু পাতস্থানের (Nodes) পরিবর্তন হেতু চন্দ্রের মার্গ সদাই পরিবর্তিত হয়, সেই চান্দ্রনক্ষত্ররাশির নক্ষত্রগুলি এমনভাবে গৃহীত হইয়াছে যেন উহারা রবিমার্গের নক্ষত্রও হইতে পারে। এইজন্য চান্দ্র নক্ষত্র রাশি (অর্থাৎ ভচক্র) কেবল যে চন্দ্রের স্থানই দেখাইয়া দেয়, এমত নহে; সূর্যের স্থানও দেখাইয়া দেয়। এমন কি, পঞ্চ গ্রহদিগের, যাহাদিগের ভ্রমণ কক্ষা রবিমার্গের সহিত ঈষৎ অবনত, স্থানও এই ভচক্র দ্বারা নির্ণীত হয়। এখন দেখা গেল যে, প্রায় 27 দিনে ($27^1/_3$ দিনে) চন্দ্রের একটি নাক্ষত্রিক ভগণ যে হয় তাহা আর্যঋষিরা জানিতেন।"

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী যখন বাংলায় 'শ্রীসূর্যদ্ধিান্ত' অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন সে সময়টা হল 1316 বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ সময়টা প্রায় একশো বছর আগের সময়। তখনও হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়নি। প্রমাণিত হয় নি আর্যগরিমার ভ্রান্তি। সে সময়টা ছিল আর্যগরিমা তত্ত্বের রমরমার কাল। তাই উপরের উদ্ধৃতিতে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী বারে বারে আর্যঋষির উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এঁরা বৈদিক ঋষি। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে যে 'বৈদিক সভ্যতা উৎপন্ন হয়, এই সব ঋষি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছিলেন সেই মিশ্রজাতির লোক, সেই মিশ্র সভ্যতার লোক। সুতরাং এঁদের আর্যঋষি না বলে বৈদিক ঋষি বলাই যুক্তিযুক্ত। বৈদিক সভ্যতার ঋষিরা ছিলেন মিশ্রজাতের লোক। এঁরা আর্য ও হরপ্পীয়দের সঙ্কর জাতি। বৈদিক সভ্যতাও তাই। সুতরাং আমরা আর্যঋষি না বলে বৈদিক ঋষিই বলবো।

ঋগ্বেদে 27টি নক্ষত্রের কথা ছাড়া আরও কয়েকটি নক্ষত্রের কথা আছে। একটু পরেই এইসব নক্ষত্র ও রাশিদের কথায় আসবো। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে 27টি নক্ষত্রের উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। অবশ্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 28টি নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। এই 28তম নক্ষত্রটি হল অভিজিৎ নক্ষত্র। ধরা হয়েছিল, চন্দ্রের ভগণকাল যেহেতু $27^1/_3$ দিন, সেই কারণে মনে করা হত চন্দ্র $^1/_3$ দিন অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান করে। প্রত্যেক দিন চন্দ্র মহাবৃত্ত পরিধির $^1/_{27}$ অংশ পরিভ্রমণ করে। এই $^1/_{27}$ অংশের মধ্যে যে নক্ষত্রটি উজ্জ্বল তাকেই সেই অংশের প্রধান নক্ষত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি ওই অংশটির আরম্ভে বা শেষে যেখানেই থাকুক না কেন, ওই নক্ষত্রের নামেই ওই অংশের মধ্যে থাকা নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত কাল [700BC] এই 27টি নক্ষত্রের যে যে নাম রেখেছিল তা হল ঃ

(1) অশ্বিনী, (2) ভরণী, (3) কৃত্তিকা, (4) রোহিণী, (5) মৃগশিরা, (6) আর্দ্রা, (7) পুনর্বসু, (8) পুষ্যা, (9) অশ্লেষা, (10) মঘা, (11) পূর্ব-ফাল্গুনী, (12) উত্তর-ফাল্গুনী, (13) হস্তা, (14) চিত্রা, (15) স্বাতী, (16) বিশাখা. (17) অনুরাধা, (18) জ্যেষ্ঠা, (19) মূলা, (20) পূর্বাষাঢ়া, (21) উত্তরাষাঢ়া (22) শ্রবণা, (23) ধনিষ্ঠা, (24) শতভিষা, (25) পূর্বভাদ্রপদ, (26) উত্তরভাদ্রপদ এবং (27) রেবতী।

এই সাতাশটি নক্ষত্রের প্রত্যেকটি আকাশ গোলকে $13^0 20'$ ক'রে স্থান দখল আছে। তবে এগুলির প্রত্যেকটিই কতকগুলি তারার সমষ্টি বা তারকামণ্ডলী। কারণ কোনও একটি তারা এতবড় হতে পারে

না, যা নাকি পৃথিবীর আকাশে $13^0 20'$ স্থান দখল করে অবস্থান করবে। সুতরাং ওই $13^0 20'$ জুড়ে যতগুলি তারা আছে সবগুলি নিয়েই একটি তারকামণ্ডলী বা নক্ষত্র তৈরি হয়েছে ধরা হয়। এই সাতাশটি নক্ষত্রকেই চন্দ্রের 27 জন পত্নী হিসাবে কল্পনা করেছে ভারতীয় পুরাণ। এই নক্ষত্রগুলিতে চন্দ্রের অবস্থান কালে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের নৈসর্গিক ঘটনা ঘটছে বলে মনে করা হয়। বৃষ্টিপাত, অনাবৃষ্টি, জোয়ার-ভাঁটার তারতম্য ইত্যাদি চন্দ্রের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানের ফল বলে মনে করা হয়। তেমনি বিভিন্ন নক্ষত্রে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থানও মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সংঘটনকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। কোনও মানুষের জীবন-যৌবন-ধনমান ইত্যাদি গ্রহগুলির বিভিন্ন নক্ষত্রে ও রাশিচক্রে অবস্থানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সুদীর্ঘকাল ধরে সুগভীর বিশ্বাস। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় এই সব বিশ্বাসের সত্যতা আজও নিরূপিত হয়নি। তবে এগুলির সবটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্যে সর্বত্র আজও ফলিত জ্যোতিষের যথেষ্ট রমরমা।

সূর্য আকাশগোলকে তার আপাত-পরিক্রমণ পথে মোট বারোটি নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশিচক্র অতিক্রম করে একবারের পরিক্রমায়। প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশিচক্র খ-গোলকের 30^0 স্থান জুড়ে অবস্থিত। এই ত্রিশ ডিগ্রি অতিক্রম করতে সূর্য মোটামুটি 30 দিন সময় নেয়। অর্থাৎ সূর্য এক এক মাসে এক একটি রাশিতে অবস্থান করে। খ-গোলকের 360^0 মোট বারোটি রাশিতে বিভক্ত। ফলিত-জ্যোতিষ এই বিভাগ মানে। তবে শুধু সূর্যের অবস্থান নয়, অন্যান্য গ্রহদের এই সব রাশিতে অবস্থানের ফলে পার্থিব নৈসর্গিক ঘটনা ও মানুষের নিজের জীবনের নানা ঘটনা ঘটে, এটা বিশ্বাস করে। প্রত্যেক রাশির 30^0 অংশ জুড়ে 2.25টি নক্ষত্র আছে। কারণ পূর্বোক্ত 27টি নক্ষত্রের প্রতিটি $13^0 20'$ স্থান জুড়ে থাকে এবং 30^0 স্থান জুড়ে থাকতে সোয়া দুটি নক্ষত্রের বিস্তৃতি লাগে। আকাশে রাশিচক্র ও নক্ষত্র 27টির অবস্থান স্থির। 12টি গ্রহই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাশিচক্রে এবং বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান করে। এদের মধ্যে সূর্যের গতি হলো আপাত গতি। পৃথিবী ঘুরছে বলেই পৃথিবীর আপেক্ষিকে সূর্যকে আমরা গতিশীল দেখি। বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর আপেক্ষিকে সূর্য স্থির, অবশ্য নীহারিকার কেন্দ্রের চতুর্দিকে সপার্ষদ সূর্যের নিজস্ব গতি আছে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যাইহোক, বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন নক্ষত্র ও রাশিতে অবস্থান বিচার করে মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ তথা ভাগ্য গণনা করে ফলিত জ্যোতিষ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বারোটি রাশি হলো ঃ

(1) মেষ [Aries], (2) বৃষ [Taurus], (3) মিথুন [Gemini] (4) কর্কট [Cancer], (5) সিংহ [Leo], (6) কন্যা [Virgo], (7) তুলা [Libra], (8) বৃশ্চিক [Scorpio], (9) ধনু [Sagittarius], (10) মকর [Capricorn], (11) কুম্ভ [Aquarius] ও (12) মীন [Pisces]। ইংরেজী নামগুলো সব গ্রীক বা লাটিন। এগুলি প্রাচীন ভারতীয় নামের অনুবাদ মাত্র। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর যেটির তারাগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে মেষ বা ভেড়ার আকৃতি হয়, সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম দেওয়া হয়েছে 'মেষরাশি'। অনুরূপভাবে, বৃষ; মিথুন, কর্কট ইত্যাদির নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণ করেছেন ভারতীয় প্রাচীন ঋষি তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক হাজার বছর আগে। এই নামগুলিই পরবর্তীকালের গ্রীক সভ্যতা গ্রহণ করে নিজেদের ভাষায় তাদের অনুবাদ ঘটায়। উপরের ইংরেজী বা ল্যাটিন নামকরণ এইভাবেই করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আজও এই নামগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কোনও পরিবর্তন আজও ঘটানো হয়নি।

শুধু রাশিদের নামই নয়, 27টি নক্ষত্র এবং অন্যান্য পরিচিত কিছু নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণ

অনুরূপ নিয়ম মেনে করা হয়েছিল ঋগ্বেদীয় আমলে। আমাদের মাথার উপর যে পরিদৃশ্যমান অনন্ত আকাশ তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তিনভাগে ভাগ করেন। যেমন, উত্তরখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং দক্ষিণখণ্ড। উত্তরায়ণান্ত এবং দক্ষিণায়নান্ত ক্রান্তির মধ্যে যে স্থান রয়েছে তা মধ্যখণ্ড নামে পরিচিত। বৈদিক জ্যোতির্বিদ ঋষিগণ এই মধ্যখণ্ডে 1016টি নক্ষত্রের অবস্থানের কথা বলেছেন। ওই নক্ষত্রদের কতকগুলিকে তাঁরা স্থির তারা [Fixed Stars], কতকগুলিকে সচল তারা [Variable Stars] বলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঋষিরা ওই সব সচল নক্ষত্রগুলির মধ্যে 27টির আকৃতি কল্পনা করে তাদের বৃত্তাকারে আকাশে সন্নিবেশিত করেছেন। নক্ষত্রগুলির নাম একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। এগুলি প্রত্যেকটি একাধিক তারার সমষ্টি। একটি নক্ষত্র পৃথিবীর আকাশে $13^0 20'$ অংশ ঘিরে অবস্থান করছে। স্বাভাবিকভাবেই কোনও একটি তারার পক্ষে আকাশে $13^0 20'$ স্থান দখল করে অবস্থান করা অসম্ভব। অনেকগুলি তারা মিলে একটি নক্ষত্র বা তারামণ্ডলী হওয়ায় এরা একত্রে $13^0 20'$ অংশ দখল করে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে 27টি নক্ষত্রের প্রতিটি আকাশে $13^0 20'$ অংশ জুড়ে অবস্থান করে বলে ধরা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা হিসাবের জন্য এবং কিছুটা হিসাবের সুবিধার জন্যও বটে। তবে, 28তম নক্ষত্রটি তথা অভিজিৎ নক্ষত্রটিকে '0' ধরা হয়। তার কোনও ক্রমিক সংখ্যা নেই অন্য 27টি নক্ষত্রের মত।

বৈদিককালে 27টি নক্ষত্রের আকৃতি যেভাবে কল্পিত হয়েছে তার ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে 71,72, ও 73 নম্বর চিত্র তিনটিতে। এই সাতাশটি নক্ষত্রের কল্পিত আকার কীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওই নক্ষত্রগুলির সৈদ্ধান্তিক ও বৈদিক নামগুলিও দেওয়া হল। বৈদিক নামগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল। নক্ষত্রের কল্পিত আকৃতির সঙ্গে তাদের নামের সার্থক সাদৃশ্য রয়েছে সিদ্ধান্তকালে দেওয়া নক্ষত্রের নামগুলির সঙ্গে। অর্থাৎ নক্ষত্রদের সৈদ্ধান্তিক নামকরণ করা হয়েছিল প্রায় 2700 বছর আগে সিদ্ধান্তকালের শুরুতে, প্রতিটি নক্ষত্রে অবস্থিত তারামণ্ডলীর কাল্পনিক সংযুক্তিকরণের ফলে কল্পিত মূর্তি বা প্রাণীর নাম বা আকার অনুসারে।

নক্ষত্রগুলির আকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

(1) অশ্বিনী নক্ষত্র। তিনটি নক্ষত্রে গঠিত হয়ে অশ্বমুখের ন্যায় আকার ধারণ করায় এটিকে অশ্বিনী নক্ষত্র বলে। [অশ্বিদ্বয়]

(2) ভরণী। তিনটি নক্ষত্রযুক্ত ত্রিকোণাকার। [যম]

(3) কৃত্তিকা। এটি অগ্নিশিখাকৃতি ছয়টি তারকা দ্বারা বিরচিত। [অগ্নিরুদ্র]

(4) রোহিণী। এর আকার কতকটা গরুর গাড়ীর মত চক্রবিশিষ্ট, এটি পাঁচটি নক্ষত্রে বিরচিত। [বিধাতা]

(5) মৃগশিরা। তিনটি নক্ষত্রে বিরচিত এবং এর আকার হরিণের মাথা বা শিরের মত বলে এরকম নাম। [যজ্ঞসোম]

(6) আর্দ্রা। রত্নাকৃতি একটি মাত্র নক্ষত্র। [রুদ্র]

(7) পুনর্বসু। এটি চারিটি নক্ষত্রে রচিত এবং এর আকার ঘরের ন্যায় এবং ওই ঘরের মধ্যে যেন একটি কড়ির ভাঁড় বসানো আছে। [অদিতি]

(8) পুষ্যা। এটি দুইটি নক্ষত্রযুক্ত এবং আকার তীরের ন্যায়। [ব্রহ্মণস্পতি]

(9) অশ্লেষা। পাঁচটি নক্ষত্রে সংগঠিত। এর আকার কুম্ভকারের চক্র সদৃশ। [সর্পরুদ্র]

(10) মঘা। পাঁচটি নক্ষত্রযুক্ত। এর আকার চতুষ্কোণ বাটীর মধ্যে সিংহাসন বা মন্দিরবিশিষ্ট। [মঘবন্]
(11) পূর্বফাল্গুনী। দুইটি নক্ষত্রযুক্ত খট্টাকৃতি। [ভগ]
(12) উত্তরফাল্গুনী। চারটি নক্ষত্রের দ্বারা বিরচিত খট্টোপরি শয্যাকৃতি। [অর্যমা]
(13) হস্তা। পাঁচটি নক্ষত্রে বিরচিত হস্তের ন্যায়। [সবিতা]
(14) চিত্রা। মুক্তা সদৃশ একটি নক্ষত্রবিশিষ্ট। [ত্বষ্টা]
(15) স্বাতী। প্রবালাকার একটি নক্ষত্রমাত্র। [মরুত্বান্]
(16) বিশাখা। চারটি নক্ষত্রবিশিষ্ট এবং আম্র পত্রমালা সদৃশ। [ইন্দ্রাগ্নি]
(17) অনুরাধা। চারটি নক্ষত্রবিশিষ্ট সরল যষ্টির মত। [মিত্র]
(18) জ্যেষ্ঠা। তিনটি নক্ষত্র বিরচিত কর্ণকুণ্ডল সদৃশ। [ইন্দ্র]
(19) মূলা। এগারোটি নক্ষত্র দ্বারা বিরচিত ঝাঁটার সদৃশ। [নির্ঋতিরুদ্র]
(20) পূর্বাষাঢ়া। চারটি নক্ষত্রযুক্ত ও গজদন্ত সদৃশ। [আপঃ]
(21) উত্তরাষাঢ়া। চারটি নক্ষত্রযুক্ত এবং খট্টোপরি শয্যা সদৃশ। [বিশ্বদেবগণ]
(0) অভিজিৎ। তিনটি নক্ষত্রযুক্ত হরতনের টেক্কার ন্যায়। [অভিজিৎ]
(22) শ্রবণা। তিনটি নক্ষত্রযুক্ত ও তিনটি পদতল চিহ্ন বিশিষ্ট। [বিষ্ণু]
(23) ধনিষ্ঠা। পাঁচটি নক্ষত্রবিশিষ্ট ও মৃদঙ্গ সদৃশ। [বসুগণ]
(24) শতভিষা। একশো নক্ষত্রবিশিষ্ট মণ্ডলাকার। [বরুণ]
(25) পূর্বভাদ্রপদ। দুটি নক্ষত্রযুক্ত। খট্টোপরি শয্যা সদৃশ। [অজৈকপাদ রুদ্র]
(26) উত্তরভাদ্রপদ। দুটি নক্ষত্রযুক্ত। দ্বিমস্তকযুক্ত মনুষ্যাকৃতি। [অহির্বুধ্ন্য রুদ্র].
(27) রেবতী। বত্রিশটি নক্ষত্রযুক্ত মাদল সদৃশ। [পূষা বা পূষণ্]

নক্ষত্রদের নিয়ে এই ধরনের কল্পনা সমসাময়িক আর কোনও সভ্যতার ছিল না। সুমেরীয়রা কিছুটা পরেই হরপ্পীয়দের কাছ থেকে তথা ভারতীয়দের কাছ থেকে এটা গ্রহণ করে। চীন এবং মিশরীয়রাও পরবর্তীকালে তাই করেছিল। অনেকটা নবীন গ্রীস-সভ্যতাও এই ঋণগ্রহণ পরম্পরা থেকে বঞ্চিত হয় নি।

27টি নক্ষত্রের ইংরেজী নামসহ সেগুলি যেসব নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবস্থিত তার একটা তালিকা বানালে তা এই রকম হবে ঃ

নক্ষত্র-অভিজ্ঞান পত্র

ক্রমিক সংখ্যা	নক্ষত্রের নাম		নক্ষত্রের প্রধান তারার পাশ্চাত্য নাম	পাশ্চাত্য জ্যোতিষের তুলনীয় নক্ষত্রস্তবকের নাম
	সৈদ্ধান্তিক নাম	ঋগ্বেদীয় নাম		
(1)	অশ্বিনী	নাসত্য ও দস্র (অশ্বিদ্বয়)	α Arietis (Hamal) β Arietis (Sheratan)	Aries and Triangulum.
(2)	ভরণী	বিবস্বান্, যম সংবরণ, সংযম	β Persei (Algol)	Perseus
(3)	কৃত্তিকা	অগ্নি, দহন	η Tauri (Alcyone)	Pleiades

(4)	রোহিণী	বিধাতা, ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভু প্রজাপতি, সূনুর্দ্ধাধার, গণপতি	α Tauri (Aldebaran)	Hyades
(5)	মৃগশিরা। (অগ্রহায়ণী)	সোম, যজ্ঞসোম	λ Orionis	Orion
(6)	আর্দ্রা	রুদ্র	α Orionis (Betelgeuse)	,,
(7)	পুনর্বসু	অদিতি	β Geminorum (Pollux) α Geminorum (Castor)	Gimini
(8)	পুষ্যা (তিষ্যা)	ব্রহ্মণস্পতি বৃহস্পতি	δ Cancri (Procsepe)	Cancer
(9)	অশ্লেষা (আশ্লেষা)	অহি	ε Hydrae	Hydra
(10)	মঘা	পিতৃ	α Leonis (Regulus)	Leo
(11)	পূর্ব-ফাল্গুনী (পূর্ব-ফল্গুনী)	ভগ	δ Leonis (Zosma)	Leo
(12)	উত্তর-ফাল্গুনী (উত্তর-ফল্গুনী)	অর্যমা	β Leonis (Denebola)	,,
(13)	হস্তা Venatici	সবিতা	δ Corvi berenices Canes	Corvus, Coma
(14)	চিত্রা	ত্বষ্টা	α Virginis (Spica)	Virgo
(15)	স্বাতি	বায়ু, মরুত্বান্	α Bootis (Arcturus)	Bootes
(16)	বিশাখা	ইন্দ্রাগ্নি	α Libra (Zuben el Genubi)	Corona Borealis & Serpens
(17)	অনুরাধা	মিত্র	δ Scorpionis	Scorpius
(18)	জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্র	α Scorpii (Antares)	,,
(19)	মূলা (মূল)	নির্ঋতিরুদ্র	λ Scorpii (Shaulah)	Sagittarius
(20)	পূর্বাষাঢ়া	আপঃ, অপাংনপাৎ	α Ophiuchi (Rasalhague)	Ophiuchus
(21)	উত্তরাষাঢ়া	বিশ্বদেবগণ	α Sagittarii (Nunki)	Hercules
(22)	শ্রবণা	বিষ্ণু	α Aquilae (Altair)	Aquila
(23)	ধনিষ্ঠা	বসুগণ, অষ্টবসু	β Delphini (Rotanev) α Delphini (Svalocin)	Delphinus
(24)	শতভিষা	বরুণ	λ Aquarii	Aquarius and Pegasus
(25)	পূর্ব-ভাদ্রপদ (পূর্ব-ভাদ্রপদা)	অজৈকপাদ রুদ্র	α Pegasi (Markab) β Pegasi (Scheat)	The Sqare of Pegasus
(26)	উত্তরভাদ্রপদ (উত্তর-ভাদ্রপদা)	অহির্ব্রধ্ন্যরুদ্র	α Andromeda (Alpheratz) γ Pegasi (Algenib)	Andromeda
(27)	রেবতী	পূষা বা পূষণ্	α Piscium	Pisces

তালিকা ঃ 6

ঋগ্বেদের আমল থেকে কিংবা বলা যায় সুদূর হরপ্পীয় আমল থেকে যে নক্ষত্রমণ্ডলীগুলি খুবই পরিচিত ছিল, সেগুলির মধ্যে দুটি অত্যন্ত বিখ্যাত এবং বেশির ভাগ লোকের কাছে পরিচিত। এই দুটির একটি হল 'কালপুরুষ' নক্ষত্রমণ্ডলী [Orion]। এতে ওই 27টি নক্ষত্রের কয়েকটি অবস্থান করছে। কালপুরুষ বা যজ্ঞপুরুষ (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলীতে আছে, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পিণাকী (γ -Orionis, Bellatrix), স্থানু (Rigel, β Orionis), কপর্দী (x-Orionis, Saiph), মৃগব্যাধ (Sirius, α Canis Major), ঈশানরুদ্র (Procyon, α Canis Minor)।

অতি পরিচিত অপর নক্ষত্রমণ্ডলীটি হল 'সপ্তর্ষি' নক্ষত্রমণ্ডলী [Ursa Major]। এতে অবস্থিত সাতটি তারা এবং বর্তমান ধ্রুবতারার ইংরেজী নামগুলি এই রকম ঃ

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Plough-Ursa Major) ঃ ঋগ্বেদীয় নাম বর্হিরুরু বা চিত্রশিখণ্ডী, ক্রতু (Dubhe), পুলহ (Merak), পুলস্ত্য (Phecda), অত্রি (Megrez), অঙ্গিরা (Alioth), বসিষ্ঠ (Mizar), মরীচি (Alkaid), ধ্রুব (Polaris -α Ursa Minoris)।

ভচক্রকে 27টি নক্ষত্রে এবং 12টি রাশিতে বিভাজন করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এই বিভাজন ভারতবর্ষ থেকে চীন, ব্যাবিলোন, মিশর, সিরিয়া এবং পরবর্তীকালে গ্রীস ও রোম গ্রহণ করে। ভারত যখন এই 27টি নক্ষত্র এবং 12টি রাশি তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনায় ব্যবহার করতো, সমসাময়িককালে চীন ও সুমের সভ্যতা তা গ্রহণ করেছিল। আর কোনও সভ্যতা এই বিভাজন বা এই গণনা পদ্ধতি জানতো না সে সময়। ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার ব্যাবিলোন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাবিলোন থেকে এই জ্ঞান চলে যায় মিশরে। অনেক পরে গ্রীকরা এই বিভাজন গ্রহণ করে। 27টি নক্ষত্র ও 12টি রাশির সেই বিভাজন আজও চলে আসছে। চীন দেশীয়রা 28টি নক্ষত্র ব্যবহার করে এবং তাদের মতে চন্দ্রের 28টি ঘর বা 'সিউ'[Sieu]। ভারতেও একসময় অভিজিৎ নক্ষত্রকে নিয়ে 28টি নক্ষত্র ধরা হত। আরব জাতির লোকজনরা অবশ্য প্রথম থেকেই 27টি নক্ষত্রই ব্যবহার করতো। চীন এবং আরবদের 27টি নক্ষত্র এবং 12টি রাশির গণনা-জ্ঞান ভারত থেকে নেওয়া কিনা এ নিয়ে বহু বিতর্ক ছিল এক সময়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন, আবার এখন তাঁরাই বলছেন 27টি নক্ষত্রে এবং 12টি রাশিতে ভচক্রের বিভাজনের আদিগুরু হল প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবং সম্ভবতঃ তারা হরপ্পা সভ্যতার লোকজন।

আরব জাতিরা বলতো চক্রের 27টি মঞ্জিল বা ঘর। ভারতীয়দের 27টি নক্ষত্র এবং আরবদের 27টি নক্ষত্রের একটা তুলনা করেছেন কোলব্রুক [H. T. Colebrooke] সাহেব। তেমনি এক তুলনা খাড়া করেছেন জ্যোতির্বিদ আইডেলার [L. Ideler] ভারতীয় 28টি নক্ষত্র এবং চৈনিকদের 28টি নক্ষত্রের মধ্যে। তিনটি সভ্যতা, অর্থাৎ ভরতীয় বা হরপ্পীয় ও বৈদিকসভ্যতা, আরব দেশীয় বা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এবং চৈনিক সভ্যতা প্রাচীনকালে 27টি নক্ষত্র বিভাজন ব্যবহার করতো। বিতর্ক হল, নক্ষত্র বিভাজনের আদিগুরু কে? কার কাছ থেকে কে এই বিভাজন শিখেছিল? বিতর্কটা অনেকটা এই রকম ঃ

ভারতীয়রা 27টি নক্ষত্র বিভাজন ব্যবহার করলেও অভিজিৎ নক্ষত্রকে নিয়ে তার নক্ষত্রসংখ্যা 28টি। এই সব নক্ষত্র রবিমার্গের সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ভারতীয়, মেসোপটেমিয়া ও চৈনিক তিন সভ্যতায় ব্যবহৃত 27টি নক্ষত্রের অনেকগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। আবার কতকগুলি দুই দেশের ক্ষেত্রে মেলে, তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মেলে না। আবার কতকগুলি নক্ষত্র আছে যেগুলি তিন দেশের কারোর সঙ্গেই মেলে না, অর্থাৎ এই নক্ষত্রগুলি এই তিন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই তিন

সভ্যতার নক্ষত্রচক্রের তুলনা করে হুইট্‌নি [Prof. Whitney] বলেছেন, ওই তিন দেশের কেউই নাকি এই নক্ষত্রচক্রের আবিষ্কারক নয়, এর আবিষ্কারক হল অন্য এক জাতি। সেই চতুর্থ জাতিটিকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পরে দেখা গেল, এই তিনটি দেশই সর্বপ্রথম 27টি নক্ষত্রচক্র ব্যবহার করত। এই তিনটি দেশের মধ্যে নক্ষত্রচক্রের আদিগুরু কে তা দেখা যাক।

আগেই বলেছি, ভারতীয় নক্ষত্রগুলি রবিমার্গের খুবই কাছাকাছি। মেসোপটেমিয়ারও তাই। এর ফলে শুধু চক্রের নয়, সূর্যের এবং পঞ্চগ্রহেরও স্থান বেশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। চৈনিক নক্ষত্রদের তিনটি বা চারটি 'সিউ' [Sieu] অন্য দুটি দেশের নক্ষত্রচক্র থেকে একেবারে আলাদা হয়ে অনেকটা দক্ষিণে চলে গেছে। ভারতীয় নক্ষত্রদের মধ্যে চারটি—স্বাতী, অভিজিৎ, শ্রবণা এবং ধনিষ্ঠা একেবারে উত্তরে চলে গেছে। এই তিন দেশ বা জাতির মধ্যে একজনই নক্ষত্রচক্রের প্রথম আবিষ্কর্তা। চতুর্থ কোনও জাতির বা দেশের নক্ষত্রচক্রের আবিষ্কারক হওয়ার দাবী অধ্যাপক হুইটনি প্রমুখদের বিরাট এক গালগল্প। এই তিন দেশের মধ্যে প্রাচীন ভারতই নক্ষত্রচক্র আবিষ্কারের আদিগুরু। কেমন করে, তা দেখা যাক।

নক্ষত্রচক্রে যে সব নক্ষত্র মনোনীত করা হয় সেগুলিকে এমন হতে হবে যে, তারা রবিমার্গের কাছে থাকে এবং সেগুলিকে সহজেই চেনা যায়। এই নক্ষত্রগুলি খুব উজ্জ্বল, না হয় এমন আকারবিশিষ্ট যে তাদের সাধারণ মানুষের চোখে পড়বেই। ওই তিন সভ্যতার নক্ষত্র তালিকায় তাই অতি অবশ্যই আসার কথা চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা, দুটি আষাঢ়াদ্বয়, দুটি ভাদ্রপদ নক্ষত্রদের। চৈনিক নক্ষত্র তালিকায় পূর্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র দুটি নেই। অন্য নক্ষত্র আছে। আবার মেসোপটেমিয়া এই দুই ফাল্গুনীর কথা বলেছে। তাদের নাম দিয়েছে জাব্রা এবং সর্ফা [Zubrah & Sarfah]। এই তিন সভ্যতার নক্ষত্র তালিকাতে কালপুরুষের মস্তকে [Orion's Head] যে তিনটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ নক্ষত্র আছে তাদের মনোনীত করা হয়েছে, কিন্তু বৃষের শৃঙ্গের উপর যে বিটা এবং জিটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে তাদের ধরা হয় নি। বিজ্ঞানানন্দ স্বামী লিখেছেন ঃ

"হিন্দুমতে কালপুরুষের মস্তকে যে তারা গৃহীত হইয়াছে তাহা 'মৃগশিরা'র জন্য ঠিক খাটে। ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিলেন। সেজন্য হিন্দুদিগের এই কালপুরুষের মস্তকস্থ নক্ষত্রকে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু চাইনীজ এবং আরবেরা কেন এই মস্তকস্থ ক্ষীণ নক্ষত্র গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝা যায় না। এখানে ইহাও লেখা উচিত যে, কল্পিত চতুর্থ জাতিরা এই স্থলে β Taurus (বিটা বৃষ) নক্ষত্র যাহা উজ্জ্বল এবং রবিমার্গের আরও নিকট তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল এই প্রকার অনুমানের দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তিন জাতির কোনো জাতি এই চতুর্থ জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্র গ্রহণ করে নাই। ইহা একটি বড় আশ্চর্যের বিষয়। খুব সম্ভব যে চতুর্থ জাতি ছিলই না; হিন্দুর নিকট হইতে চীন এবং আরবেরা এই নক্ষত্র গ্রহণ করিয়াছে। তর্কের জন্য ধর কল্পিত জাতির নিকট হইতে তিনটি জাতি ভচক্র গ্রহণ করিয়াছে। ইহা যদি হইত তাহা হইলে খুব সম্ভব তিন জাতিরই 27টি নক্ষত্র ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইত। যেমন গ্রীকেরা এবং ইজিপ্টবাসীরা ব্যাবিলন জাতির নিকট হইতে দ্বাদশ রাশি গ্রহণ করিয়াছে; আর ওই দ্বাদশ রাশি ব্যাবিলনবাসীদিগের যেমন, ইজিপ্টবাসীদিগেরও তেমনি, গ্রীকদিগেরও তেমনি। সেই প্রকার এই ভচক্রও ওইরূপ হইত; কিন্তু যখন তাহা নহে তখন কল্পিত চতুর্থ জাতির অবতারণা করিবার কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না। বরং ইহাই সমীচীন হইতেছে যে, চীন এবং আরবরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ভচক্র গ্রহণ করিয়া কিছু সামান্য পরিবর্তন করিয়া নিজেরা গ্রহণ করিয়াছে। কেন না অনেক প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা হিন্দুদেরই নক্ষত্র (বেদে থাকায়)

অধিক পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস হয়। হিন্দুরা যেখানে শ্রবণা এবং শ্রবিষ্ঠা (ধনিষ্ঠা) গ্রহণ করিয়াছে সেখানে চীনেরা এবং আরবেরা রবিমার্গের নিকট ক্ষীণজ্যোতি তারা রাখিয়াছেন।"

চতুর্থ কোনও সভ্যতার কাছ থেকে প্রাচীন ভারত, চীন ও মেসোপটেমিয়া নক্ষত্রচক্র ধার করেছিল, অধ্যাপক হুইটনিদের এই সিদ্ধান্ত এখন আর গ্রহণ করা হয় না। কোলব্রুক সাহেবের মতে নক্ষত্রচক্র খাঁটি ভারতীয় জিনিষ। এখান থেকে আরব দেশীয়রা তথা মেসোপটেমিয়া এই নক্ষত্রচক্র গ্রহণ করে। বায়ট [J. B. Biot] ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি বলেছেন, নাক্ষত্রিক মাসে চন্দ্রের যে ভগণ হয় তার সঙ্গে চৈনিক সিউয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। বায়ট সাহেবের মতে, চৈনিকদের 27টি নক্ষত্র সমান দূরে অবস্থিত নয়। কোনো নক্ষত্র থেকে কোনো নক্ষত্রের পার্থক্যগুলির মধ্যে ঐক্য নেই। চন্দ্রের গতি নির্ণয়ের জন্য যদি নক্ষত্রগুলি স্থির করা হত তবে ওই অন্তর সব ক্ষেত্রে সমান হত। তা যেহেতু নেই, তখন চৈনিকরা নিশ্চয়ই চন্দ্রের গতি নির্ণয়ের জন্য নক্ষত্রগুলি স্থিরীকৃত করে নি। তাহলে চৈনিকদের 'সিউ'-র উদ্দেশ্য কী? এ প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বায়ট সাহেবের মতামতের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যাটি এই রকম ঃ

"বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বহুদিন হইতে চীনেরা বড় বড় নক্ষত্রের মাধ্যাহ্নিক সংক্রমণ [Meridian transits of certain important stars] দেখিত। তাহাদের সংক্রমণ সময় [their time intervals] তাহাও চীনেরা দেখিত। প্রথম প্রথম সদোদিত নক্ষত্রের [Circumpolar stars] সংক্রমণ দেখিত। বৃহৎ ঋক্ষ, লঘু ঋক্ষ, লায়রা [Lyrae] ইত্যাদি নক্ষত্রের দর্শন করিত। পরে বিষুববৃত্তস্থ নক্ষত্রের মাধ্যাহ্নিক সংক্রমণ দেখিতে লাগিল; কেননা ইহা সহজেই দেখা যাইত, আরও বেশি ঠিক ফল লাভ হইত। বিষুববৃত্তস্থ যে সব নক্ষত্রের বিষুবাংশ প্রায় সমান সমান তাহাদিগেরই মাধ্যাহ্নিক সংক্রমণ 'লওয়া হইত; সুতরাং সংক্রমণ কালও পূর্বের সদোদিত নক্ষত্রের সংক্রমণ কালের ন্যায় সমান হইত। বায়টের মতে ইহাই চাইনীজদিগের 'সিউ'-এর উৎপত্তির কারণ; তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার দর্শন চাইনীজ রাজা ইয়াও [Chinese Emperor Yao]-এর সময়ে হইয়াছিল। এই ইয়াও রাজা প্রথম ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন। ইঁহারই সময়ে বিষুববিন্দুদ্বয় [Two Equinoxes] এবং অয়নান্তবিন্দুদ্বয় [Two Solstices] কতকগুলি 'সিউ' নক্ষত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বায়ট সাহেব বলেন, এই সমান সমান বিষুবাংশে থাকার জন্যই 'সিউ'-এর অবস্থানের মধ্যে এত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়াও রাজার সময় 24টি নক্ষত্র দেখা হইয়াছিল। পরে রাজা চিউকোং [Tchcu Kong]-এর সময়ে আরও চারটি নক্ষত্র যোগ করা হয়। কেন না তদ্দ্বারা বিষুব বিন্দুদ্বয় এবং অয়নান্তবিন্দুদ্বয় আরও ভাল করিয়া নির্ণীত হইতে পারিত। অতএব দেখা গেল যে, চন্দ্রের গমন নির্ণয়ার্থ 'সিউ' এর উৎপত্তি হয় নাই। 'সিউ'গুলি এমন মনোনীত করা হইয়াছিল যে, অয়নান্তবিন্দুদ্বয় এবং বিষুববিন্দুদ্বয় এবং সাধারণতঃ সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদিগের স্থান এই 'সিউ' দ্বারা ভাল রকম নির্ণীত হইতে পারে।"

বায়ট সাহেব চৈনিকদের নক্ষত্রচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করার পর সিদ্ধান্ত নেন, ভারত ও মেসোগটেমিয়া চৈনিকদের কাছ থেকে নক্ষত্রচক্র গ্রহণ করেছিল। প্রায় 3100 বছর আগে [1100 BC] প্রথমে ভারতবর্ষ এই নক্ষত্রচক্র গ্রহণ করে এবং মেসোপটেমিয়া পরে ভারতের কাছ থেকে ওই নক্ষত্রচক্র শিক্ষা করে। পরে দেখা যায় বায়ট সাহেবের এই সিদ্ধান্ত মহাভুল। হুইটনি, ভেবার [A.Weber] প্রমুখেরা নানাভাবে বায়টের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিয়েছেন। তাছাড়া ঋগ্বেদ বলছে, কম করে 4500

বছর আগে থেকেই অয়নান্ত বিন্দুর সাহায্যে সময়ের ঘোষণা করা হত। ধর্মভীরু ভারতীয়রা যাগ-যজ্ঞাদির জন্য ঠিক ঠিক সময় নিরূপণ করতেন এবং ঘোষণা করা হত যে, এই সময় কর্কট বা মকর বা মহাবিষুব সংক্রান্তি হবে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সঙ্গে নক্ষত্রাদির উদয় বা অস্ত কখন হত সে বিষয়েও তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সুতরাং বলা যায়, চীন ও মেসোপটেমিয়া ভারতের কাছ থেকেই নক্ষত্রচক্রের জ্ঞান লাভ করে।

অধ্যাপক ভেবার [A. Weber] বলেছেন যে, চৈনিক সিউ যে 4500 বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। ভেবার অবশ্য রাশিচক্র তথা নক্ষত্র চক্রের আবিষ্কারক হিসাবে এক চতুর্থ জাতির কথা বলেছেন। যে জাতি অনাবিষ্কৃত। তবে তারা মেসোপটেমিয়া কিংবা সুমের সভ্যতার লোকও হতে পারে। এইসব আলোচনা সমালোচনা যেকালে চলছিল, তখনও হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নি। এই মহান সভ্যতার আবিষ্কারের পর [1921-1922 খ্রিস্টাব্দ] এখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, নক্ষত্রচক্রের আবিষ্কারক হলেন হরপ্পীয় জ্যোতির্বিদগণ। ম্যাক্সমূলার [Prof. Max Muller] এবং ই.বারগেস যেমন বলেছিলেন, হিন্দুর ভচক্র হিন্দুদের নিজেদেরই আবিষ্কার। নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্র ভারতই শিখিয়েছে চীন এবং মেসোপটেমিয়াকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে অবধি কখনো বলেছেন নক্ষত্রচক্র ভারত চৈনিকদের কাছ থেকে নিয়েছে, কখনও বলেছেন মেসোপটেমিয়ার কাছে শিখেছে। এখন বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলছেন, মেসোপটেমিয়া সভ্যতাটাই হরপ্পীয়দের সৃষ্টি করা সভ্যতা। সুতরাং নক্ষত্রচক্র বা রাশিচক্র ভারতীয়দের, অন্য কোথাও কিংবা মেসোপটেমিয়া থেকে ধার করার কাহিনী আর ধোপে টেঁকে না। এখন বলা যায়, নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্রের উদ্গাতা হল প্রাচীন ভারতীয়রা তথা হরপ্পীয়রা এবং চীন ও মেসোপটেমিয়া নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্রের জন্য প্রাচীন ভারতের কাছে ঋণী। মিশর, গ্রীক ইত্যাদি পরবর্তীকালীন সভ্যতা অতি অবশ্যই ভারতের কাছে ঋণী। তবে তারা এগুলি গ্রহণ করেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। মেসোপটেমিয়াকে এই নক্ষত্রচক্র শিখিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীন ভারতবর্ষ। চৈনিকরা তাদের সিউগুলির প্রাচীনত্ব 4300 বছরের প্রাচীন বলে দাবী করলেও যেসব পুঁথি এ সম্পর্কে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে, তাদের বয়স 3100 বছরের বেশি নয়।

বেদাঙ্গকালে ভারতবর্ষে পাঁচ বছরে এক যুগ গণনা করা হত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ থেকে পরের পৌষ মাসের অমাবস্যাতে ওই যুগের বৎসর গণনা করা হত। বেদাঙ্গকালের শুরু হয়েছিল মোটামুটি 3200 বছর আগে। এর স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় 500 বছর।

700 খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয় সিদ্ধান্তকাল। বেদাঙ্গকালে 366 সৌর দিনে বা ছয় ঋতুতে বা দুই অয়নে [উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন] বা বার সৌর মাসে এক বছর গণনা করা হত। এই রকম পাঁচ বছরে এক যুগ ধরা হত। এই পাঁচ বছরের তিনটি চান্দ্রবৎসরের প্রত্যেকটিতে 12টি চান্দ্রমাস এবং দুটি চান্দ্রবৎসরের প্রতিটিতে 13টি করে চান্দ্রমাস থাকতো। স্বাভাবিকভাবেই প্রতি তৃতীয় বছরে একটা করে অধিকমাস হয়। প্রতি বছর বলতে এখানে সৌরবর্ষের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 60টি সৌরমাসে 62টি চান্দ্রমাস গণনা করা হত বেদাঙ্গকালে এবং এখনও তাই-ই করা হয়।

সিদ্ধান্তকালের সূচনা হয় প্রায় 2700 বছর আগে। এ সংক্রান্ত যে কাহিনী 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে আছে তা আগেই বলেছি। বৈদিককালে চার বছরে এক যুগ ধরা হত। এর ফলে, প্রতিবছরে 12 মিনিট করে অধিক গণনা করা হত। ফলে 1860 বছরে 15 দিনের পার্থক্য ঘটে। সব ঋতু এবং অয়নান্ত কাল

15 দিন আগেই আরম্ভ হয়ে যেত। এই অসুবিধা দূর করতে আয়নাংশজনিত সংশোধন করা হয় প্রায় 3200 বছর আগে এবং শুরু হয় বেদাঙ্গকাল। আরও 500 বছর পরে আবার অনুরূপ সংশোধন করে আসে 'সিদ্ধান্তকাল'। অনুরূপ সংশোধনের পর ভারতবর্ষের জাতীয় পঞ্জিকায় 21 শে মার্চ মহাবিষুব সংক্রান্তি নির্ণীত হয়েছে। শকাব্দ পঞ্জিকা সেইভাবে সংশোধিত হয়েছে। সেখানে বর্ষ শুরু হচ্ছে বাংলা পঞ্জিকার 7 বা 8 চৈত্র।

সিদ্ধান্তকালেই 27টি নক্ষত্রের বৈদিক নামের পরিবর্তন ঘটানো হয়। মাসের নামগুলিও পরিবর্তিত হয়। মাসের নামকরণগুলি নক্ষত্রদের নাম দিয়ে রাখা হয় খুবই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে। সৌরমাসের নাম রাখা হয় ওই মাসের পূর্ণিমায় চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থান করে তা পৃথিবী থেকে দেখে। যেমন, বৈশাখ মাসে চন্দ্র পূর্ণিমার দিন অবস্থান করে বিশাখা নক্ষত্রে, তাই ওই সৌর মাসটির নাম 'বৈশাখ'। অনুরূপভাবে বাকী এগারোটি মাসের নামকরণও করা হয় সিদ্ধান্তকালে।

ভারতীয় ভাবনায় তারামণ্ডলী নক্ষত্র বলে পরিচিত। নক্ষত্র শব্দটি আসে, 'নক্ত' মানে রাত্রি এবং 'ত্রৈ' ধাতুর অর্থ পালন করা, এই দুটিকে মিলিয়ে। অর্থাৎ রাত্রিকে যে বা যারা পালন করে। আবার মৎস্য পুরাণ বলছে, 'ন ক্ষীয়তে যতস্তানি তস্মান্ন ক্ষত্রতা স্মৃতা'। অর্থাৎ নক্ষত্রসমূহের ক্ষয় নেই বলেই তাদের নক্ষত্র নামকরণ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও দেখা যায়, যা ক্ষত্র হয় না তা নক্ষত্র। শ্রী অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"কিন্তু আমার মনে হয় নক্ষত্র নামকরণের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি, রাত্রির নিমিত্ত আবাস। নক্ বা নক্ত শব্দটির অর্থ রাত্রি এবং সত্র অর্থ আবাস, উভয় যোগে রাত্রির জন্যে আবাস। ভারতীয় তিথি বিভাগের অনুরূপ চৈনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সিউ [Sieu] এবং আরবদের যে মঞ্জিলের প্রচলন তার অর্থ আবাস। নক্ষত্র সকল চন্দ্রের আবাসস্থল। ঋগ্বেদেও নক্ষত্র সোমের গৃহ।"

প্রাচীন ভারতে কাল বা সময় গণনার দুটি পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

"প্রাচীন ভারতবর্ষে কাল গণনার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথমটি চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি রাশি সংক্রান্ত। তিথি সংক্রান্ত পদ্ধতিটি রাশির বহু পূর্বে আবিষ্কৃত। মহাকাশে তারকাচিত্রের মধ্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি বা অবস্থান আমরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্ধারণ করতে পারি। যন্ত্রবিহীন প্রাচীন ভারতবর্ষে কাল নির্ণয়ের পক্ষে এ এক মস্ত বড় অবলম্বন। মহাকাশে সূর্য-চন্দ্রকে আমরা দেখি, প্রত্যক্ষত তারা চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। কিন্তু চন্দ্র-সূর্যের দৈনিক আর একটি গতিও আছে। মহাকাশ লক্ষ্য করে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, মহাকাশে তারকাপুঞ্জের ভেতর দিয়ে চন্দ্র-সূর্য দৈনিক কিয়দংশ পূর্বে পশ্চাদপসরণ করে। এই পশ্চাদপসরণ সমান ব্যবধানযুক্ত এবং নিয়মিত। চন্দ্রের বেলায় চন্দ্রের গতির প্রভাবে একটি তারকাপুঞ্জ থেকে শুরু করে চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরে আসতে $27^1/_3$ দিন সময় অতিক্রান্ত হয়।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধান জানতেন। চন্দ্র যেমন $27^1/_3$ দিনে মহাকাশে তারকাপুঞ্জের ভেতর দিয়ে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে, সে রকম সূর্যও তারকাপুঞ্জকে অবলম্বন করে পূর্বমুখী একটি আবর্তন শেষ করে। এই আবর্তনকালের পরিমাণ 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট 9.5 সেকেন্ড। সূর্যের এই আবর্তনচক্র রবিকক্ষা, ক্রান্তিবৃত্ত বা Ecliptic নামে পরিচিত। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে চন্দ্রকক্ষার অবনতি সামান্য। এত সামান্য যে চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্ধারণ কালে সে ব্যবধান গণনা না করলেও চলে। সুতরাং তাঁরা চন্দ্রের গতি নির্ধারণের জন্যে আবর্তনকাল $27^1/_3$ দিনের সামঞ্জস্যপূর্ণ 28 টি তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। প্রতিটি তারকাপুঞ্জই চন্দ্রের এক একটি আবাসস্থল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে

এই 28টি আবাসস্থলকে 27টি বিভাগে নির্দিষ্ট করেন। চন্দ্রের আবাসস্থল সংক্রান্ত 27টি তারকাপুঞ্জের উজ্জ্বলতম বা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তারকাকে তাঁরা যোগতারা বলতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে নক্ষত্র নামে অভিহিত করতেন। ওই যোগতারা প্রতি বিভাগের আদি প্রান্ত সূচনা করতো। এইভাবে প্রতিটি বিভাগে চন্দ্রের অবস্থান থেকে কাল নির্ণয় এবং তিথি গণনা হত।"

সুতরাং প্রাচীন ভারতীয়রা চান্দ্র তিথি সংক্রান্ত ক্রান্তিবৃত্তের 27টি বিভাগ করেছিলেন 27টি নক্ষত্র দিয়ে। এই সাতাশটি নক্ষত্রের তালিকা আগেই দিয়েছি আবারো একবার দেওয়া যাক পরবর্তী আলোচনার সুবিধার প্রয়োজনে। আগেই দেখিয়েছি 27টি নক্ষত্রের এই নামগুলি সিদ্ধান্তকালে দেওয়া হয়, বৈদিককালে এদের নাম অন্য ছিল। সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বলছে ঃ

"প্রাচীন ভারতবর্ষে চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত ক্রান্তিবৃত্তের যে সাতাশটি বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হল অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা পূর্ব-আষাঢ়া, উত্তর-আষাঢ়, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা এবং রেবতী। এই সাতাশটি নক্ষত্র ছাড়া প্রাথমিক কল্পনায় যে আঠাশটি মণ্ডলে ক্রান্তিবৃত্তকে বিভক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল অভিজিৎ নক্ষত্র। নক্ষত্রটির অবস্থান ছিল উত্তর-আষাঢ়া এবং শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্যে।

এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে চন্দ্র যে দিন যে মণ্ডল অতিক্রম করে, সেই দিন তাকে সেই নক্ষত্রের ভোগস্থিত বলা হয়। ভারতীয় পুরাণে এই সাতাশটি নক্ষত্র চন্দ্রের সাতাশটি পত্নী হিসেবে কল্পিত। সূর্যের বার্ষিকপথ বা ক্রান্তিবৃত্তের এ জাতীয় বিভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রচেষ্টা, পরবর্তীকালে রাশিচক্রের প্রচলন দেখা যায় বিভিন্ন দেশে। রাশিচক্র এবং ভ-চক্র মূলত একই পটভূমির উপরে স্থাপিত।

শ্রীপতিভট্টের 'জ্যোতিষ রত্নমালা' গ্রন্থে অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে শুরু করে সব কটি নক্ষত্রের আকার ও তারকা সংখ্যার উল্লেখ আছে

তুরগমুখসদৃশং যোনিরূপং ক্ষুরাভং
শকটসমমথৈণস্যোত্তমাঙ্গেন তুল্যং।
মণিগৃহশরচক্রাভানিশালোপমাভং
শয়নসদৃশমন্যচ্চাপি পর্যঙ্করূপং।।
হস্তাকারমতশ্চ মৌক্তিকসমং চান্যৎ
প্রবালোপমং ধিষ্ণ্যন্তোরণবৎ স্থিতং
মণিনিভং স্যাৎকুণ্ডলাভং পরং।
ক্রুধ্যৎকেসরিবিক্রমেণ সদৃশং শয্যাসমানং পরং,
চান্যদ্দন্তিবিষাণবৎ স্থিতমতঃ শৃঙ্গটিকব্যক্তি চ॥
ত্রিবিক্রমাভঞ্চ মৃদঙ্গরূপং বৃত্তং ততো হ্ন্যদ্‌যুগলদ্বয়াভং।
পর্যঙ্কতুল্যং মুরজানুকারমিত্যেবমশ্বাদিভচক্ররূপং।।

অর্থাৎ অশ্বিনীর অশ্বমুখ, ভরণীর যোন্যাকার, কৃত্তিকায় ক্ষুরের আকৃতি, রোহিণীতে শকটচিত্র, মৃগশিরায় মৃগশির, আর্দ্রায় মণি, পুনর্বসুতে গৃহ, পুষ্যায় বাণ, অশ্লেষায় চক্র, মঘায় শালা, পূর্বফল্গুনীতে শয্যা, উত্তরফল্গুনীতে শয্যা ও মঞ্চ, হস্তায় হস্ত, চিত্রায় মুক্তা, স্বাতীতে প্রবাল, বিশাখায় তোরণ, অনুরাধাতে বলি, জ্যেষ্ঠায় কুণ্ডল, মূলায় সিংহপুচ্ছ, পূর্ব-আষাঢ়ায় শয্যা, উত্তর-আষাঢ়ায় হস্তিদন্ত,

অভিজিৎ নক্ষত্রে শৃঙ্গাটক, শ্রবণায় ত্রিপদ, ধনিষ্ঠায় মৃদঙ্গ, শতভিষায় চক্র, পূর্বভাদ্রপদায় যমলদ্বয়, উত্তরভাদ্রপদায় শয্যা এবং রেবতী নক্ষত্রে মৃদঙ্গের আকৃতিবৈশিষ্ট্য।"

নক্ষত্রদের আকৃতি, তাদের বৈদিক নাম ও সৈদ্ধান্তিক নামের তালিকা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখন ঋগ্বেদীয় নক্ষত্রগুলির সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করবো। এতে ভারতীয় চান্দ্র তিথি সম্পর্কিত ওই সাতাশটি নক্ষত্র সম্বন্ধে যেমন কিছু কথা বলা হবে, তেমনি বলা হবে অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্রদের কথা, ঋগ্বেদ যাদের বহুকাল আগেই গুরুত্ব দিয়েছিল এবং এই এতোদিন পরেও যেগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আকাশে বিরাজমান। এছাড়া এইসব নক্ষত্রদের নিয়ে যে সব পৌরাণিক কাহিনী এদেশে প্রচলিত সেগুলির কিছু কিছুও আলোচনা করা হবে।

[1] **অশ্বিদ্বয় ঃ**

নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র। এতে রয়েছে দুটি তারা। এই তারা দুটি অশ্বিদ্বয়। এদের নাম নাসত্য ও দস্র। সৈদ্ধান্তিক নাম অশ্বিনী নক্ষত্র। ইংরেজী নাম Hamal [নাসত্য] ও Triangulum[দস্র] । অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিপতি অশ্বি। বেদে অশ্বি অর্থে সূর্য রশ্মি বলা হয়েছে অনেক জায়গায়। অশ্বিনী নক্ষত্রের তিনটি তারাকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করলে এটি অশ্বের মুখাকৃতি নেয়। 71 নম্বর চিত্রে নক্ষত্রদের যে কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হয়েছে, সেটি দেখা যেতে পারে। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়কে নিয়ে বহু সূক্ত রয়েছে। অশ্বিদ্বয় ঋগ্বেদে যমজ ভাই হিসাবে কল্পিত। তাঁরা বিবাহ করেছিলেন ঋগ্বেদের ঋষিকা বা মহিলা ঋষি 'সূর্যা'-কে। সূর্যার 'বিবাহ সূক্ত' [ঋগ্বেদ ঃ 10ম মণ্ডল ৪5 তম সূক্ত] বিখ্যাত।

বৈদিক যুগে অশ্বিদ্বয় সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হয়ে শীতকালের সূচনা করতেন। অশ্বিদ্বয় আবার সূর্যাস্তের পরে উদিত হয়ে বর্ষাঋতুর সূচনা করতেন। ঋতু নির্ণয়ে তাঁরা ভুল করতেন না বলেই তাঁরা নাসত্য। আবার বর্ষা ঋতুও তাঁরা দেখান বলে তাঁদের আরেক নাম দস্র। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চৌত্রিশতম সূক্তের এগারো ঋক বলছে, "আকাশ ব্যাপ্ত এই তেত্রিশ দেব সমভিব্যহারে নাসত্যদ্বয় আগমন করেন, মধুপায়ী অশ্বিনদ্বয়ের সহাবস্থানে আয়ুর অস্ত পর্যন্ত অনিষ্টমুক্ত নিরপরাধ ক্ষতমুক্ত প্রতিষেধযুক্ত দ্বেষহীন হইব।" তেমনি প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের বন্দনায় আছে ঃ 'হে অশ্বিদ্বয়! আপনার সর্বরোগহর স্বর্গবৈদ্য, যা সত্য নয় এমন ভাষণরহিত সুতরাং নাসত্য, দর্শনীয় স্রক-তুল্য অতএব দস্র। আপনার রুদ্রবর্তনী অর্থাৎ আপনারা পরস্পরকে রুদ্রবেগে আবর্তন করেন।' এই সব ঋক্‌গুলি অশ্বিদ্বয়ের নাক্ষত্রিক রূপই পরিস্ফুট করে। তেরো অংশ কুড়ি কলা জুড়ে অশ্বিনী নক্ষত্রের তারাদের দর্শনীয় স্রক বা মালার মত দেখায় বলে এই নক্ষত্রের নাম দস্র। অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রধান তারকাদ্বয় যুগ্মতারকা [Binary Star] । এই যুগ্মতারকা পরস্পরকে পরিক্রমা করে। অর্থাৎ নাসত্য ও দস্র যুগ্মতারকা ও অশ্বিদ্বয় এদের নাম। যেখানে অশ্বিনী নক্ষত্র দুটি মাত্র তারাযুক্ত, সেখানে মেষরাশি মণ্ডলের খ এবং গ তারকায় মণ্ডলটির কল্পনা। তিনটি তারার বেলায় ওই রাশিমণ্ডলের ক তারাও যুক্ত হবে।

ঋগ্বেদের মতে এবং তার জ্যোতির্বিদ্যাজনিত ব্যাখ্যায় রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিদ্বয় এবং শেষ

নক্ষত্র পূষা বা পূষণ, যার বর্তমান নাম রেবতী [Piscium]। এই দুইয়ের মাঝখানে আছে বৃত্রের নমুচি নামক গণ্ড। বৃত্র বলতে বোঝায় নীহারিকা। আমাদের সৌরবিশ্ব যে নীহারিকায় তার ঋগ্বেদীয় রূপক হলো বৃত্র। সেই নীহারিকার অনুন্মোচিত আবরণ বা নমুচি উন্মোচিত হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি। নীহারিকার আবর্তিত তেজপ্রবাহ বৃত্রের গণ্ডত্রয় নামে ঋগ্বেদে নানা জায়গায় অভিহিত। সেই বৃত্রের গণ্ডত্রয়ের নমুচি নামক প্রথম গণ্ড অশনি বিদীর্ণ করায় এই নাসত্য ও দস্র নামের যুগ্মতারার নাম ক্রিয়। ক্রিয় রাশির তারাদের বলা হয় শতক্রিয় বা শতক্রতু। দশম মণ্ডলের একষট্টিতম সূক্তের অষ্টম ঋক্ বলছে ঃ 'শতাক্রিয় বা শতক্রতু সমুদ্রের ফেনা নিক্ষেপ করে নমুচি সংহার করেছিলেন।' সমুদ্রের ফেনা এখানে নীহারিকার পারমাণবিক পদার্থ. কারণ বেদের নিঘণ্টুতে নীহারিকার নাম সমুদ্র, বৈতরণী, বৃত্র, স্বর্গগঙ্গা ইত্যাদি। নীহারিকার পারমাণবিক পদার্থকে সমুদ্র ফেনার সঙ্গে তুলনা করেছেন ঋষিরা। আর নীহারিকার বিস্ফোরণ-তথ্য নমুচি সংহারের গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে নানা গ্রন্থে যাদের পথিকৃৎ হলো স্বয়ং ঋগ্বেদ। অর্থাৎ নাসত্য ও দস্র নামের দুই যুগ্মতারা বৃত্র-নীহারিকার অনুন্মোচিত গণ্ড সমুদ্র ফেনা দিয়ে বিদীর্ণ করে কিংবা নীহারিকার পারমাণবিক পদার্থের আস্তরণ অপসারণ করে মেষরাশির তারাগুলিকে উন্মোচিত করেন। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে অশ্বিদ্বয় দেবতা নন, দেব-বৈদ্যও নন, অশ্বিনী নক্ষত্রের দুটি যুগ্মতারা যারা দস্র ও নাসত্য নামেও খ্যাত।

অশ্বিদ্বয়কে এভাবে নক্ষত্র বানিয়ে ফেললে ঋগ্বেদে তাঁদের নিয়ে যে সব কাহিনী আছে তা নিরর্থক হয়ে পড়ে। অথচ ঋগ্বেদে কল্পকাহিনী নেই বললেই চলে। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়ের উপর প্রায় পঞ্চাশটি সূক্ত আছে। এগুলির অধিকাংশেরই রচয়িতা হলেন দীর্ঘতমা, কক্ষীবান ও ঘোষা। এছাড়া অঙ্গিরা পুত্র কুৎস, সুহস্ত ইত্যাদি ঋষিরাও অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করে কিছু সূক্ত রচনা করেছেন। এই সূক্তগুলিতে অশ্বিদ্বয়ের অনেকানেক অলৌকিক এবং অদ্ভুত কার্যাবলীর বিবরণ আছে যেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানেরও বিস্ময়। তাঁদের কার্যকলাপের একটা তালিকা দেওয়া যাক। অশ্বিদ্বয়ের এই সব কাজকর্মের কোনও নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বরং অশ্বিদ্বয়কে দেব-বৈদ্য বা স্বর্গের ডাক্তার বলে ধরে নিলে ওই সব কাহিনীর কিছুটা সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পাবে, একালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির প্রেক্ষাপটে।

প্রথমতঃ অশ্বিদ্বয় যে রথে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন তা জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করতে পারতো। সেই রথের তিনটি চাকা এবং আকাশে ওড়ার সময় সেই রথের একটি চাকা লুকিয়ে যেতো। এই রথের আকৃতি ছিল ত্রিকোণ। অশ্বিদ্বয়ের ওই রথ ত্রিচক্র, ত্রিস্তর ও তিনজন সারথি পরিচালিত এবং সোনা, রূপা ও লোহা এই তিন ধাতু নির্মিত। রসে অর্থাৎ পারদের জ্বালানীতে এই রথ প্রচণ্ড শব্দে অন্তরীক্ষ মথিত করে চন্দ্রকে অতিক্রম করে সূর্যের দিকে যাত্রা করতো। মনের অপেক্ষা সমধিক দ্রুতগামী সেই রথ। সে রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। ওড়াবার সময় তার একটি চাকা যেমন লুকিয়ে যেত, তেমনি অন্য দুটি চাকা উজ্জ্বল হত। সে রথ আকাশে এলে অন্ধকার দূর হয়ে উষার আবির্ভাব ঘটে। এ ধরনের বিমান আজও আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। অশ্বিদ্বয়ের ওই বিমান আকাশে এলে অন্ধকার দূর হত, আলো আসত।

দ্বিতীয়তঃ ঋগ্বেদের সাতজন নারী-ঋষির অন্যতমা হলেন ঘোষা। ঘোষা ঋগ্বেদের দুটি সূক্তের রচয়িতা। দশম মণ্ডলের 39তম ও 40তম সূক্তের ঋষি হলেন ঘোষা। কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা যৌবনে কুষ্ঠ-রোগগ্রস্তা হন। ফলে তাঁকে কারও সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে বার্ধক্য অবধি পিতৃগৃহে রাখা হয়েছিল। তখনকার দিনে কুষ্ঠরোগীদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ঘোষার বিয়ে হল না। পিতা

কক্ষীবানের কাছেই তাঁর দিন কাটতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তিনি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পিতার সঙ্গে থেকে তিনি প্রভূত জ্ঞানের অধিকারিণী হন। অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে তাঁর কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে যায় এবং তাঁরা ঘোষার যৌবন ফিরিয়ে দেন। ঘোষা যৌবন ফিরে পেয়ে মনোমত পতিকে বরণ করেন। তাঁর রচিত দুটি সূক্তেরই দেবতা হলেন অশ্বিদ্বয়। সুতরাং অশ্বিদ্বয় অনায়াসে নারী-ঋষি ঘোষার কুষ্ঠ সারিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে যুবতী নারী করে দিয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ অশ্বিদ্বয় মহর্ষি চ্যবনকে জরামুক্ত করে তাঁরও যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মহাভারতে ও পুরাণে মহর্ষি চ্যবনের কাহিনী বিশদভাবে বলা হয়েছে। একদিন রাজা শর্যাতি নর্মদার নিকটস্থ বৈদুর্য পর্বতে ভ্রমণ করতে এলেন। সঙ্গে লোক-লস্কর, তাঁর চার হাজার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা সুকন্যা। এই মনোরম স্থানে ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চ্যবন দীর্ঘদিন তপস্যা করছিলেন। তাঁর দেহের চারিদিকে বল্মীক স্তূপ বা উই-ঢিবি হয়ে গিয়েছিল। উই-ঢিবির মধ্যে চ্যবনের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে সুকন্যা কাঁটা দিয়ে তা বিদ্ধ করেন। এতে চ্যবন অত্যন্ত রেগে গিয়ে শর্যাতির সৈন্য ইত্যাদি সকলের মলমূত্র রুদ্ধ করে দেন। শর্যাতি চ্যবনের কাছে সুকন্যার দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা চাইলে সব আবার স্বাভাবিক হয় এবং সুকন্যাকে চ্যবনের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হন।

সুকন্যা সযত্নে বৃদ্ধ ঋষি চ্যবনের সেবা করতে লাগলেন। একদিন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'ভাবিনি, তোমার মতো সুন্দরী দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমাকে তোমার পিতা বৃদ্ধের হাতে দিয়েছেন কেন? তুমি জরাজর্জরিত অক্ষম চ্যবনকে ত্যাগ করে আমাদের একজনকে বরণ করো।' সুকন্যা বললেন, 'আমি আমার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত।' অশ্বিনীকুমার বললেন, 'আমরা দেব চিকিৎসক, তোমার পতিকে যুবা ও রূপবান করে দেবো। তারপর তিনি এবং আমরা এই তিনজনের মধ্যে একজনকে তুমি পতিত্বে বরণ করো।' সুকন্যা এই প্রস্তাব চ্যবনকে জানালে চ্যবন রাজী হলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং মুহূর্তকাল পরে তিনজনই দিব্যরূপ ও সমান বেশ ধারণ করে জল থেকে উঠলেন। সকলের রূপ একই রকম হলেও চ্যবনকে ঠিকমতো চিনে নিলেন সুকন্যা এবং তাঁকেই বরণ করলেন। এইভাবে চ্যবন ঋষি জরামুক্ত হলেন। মহর্ষি চ্যবন তপস্যা বলে অনেক জ্ঞান লাভ করলেও পুনর্যৌবন লাভের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত ছিল না। তাই স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের সাহায্যেই তাঁকে তাঁর জরামুক্তি ঘটাতে হয়েছিল। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রাজা শর্যাতিকে দিয়ে চ্যবন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করালেন। সে যজ্ঞে চ্যবন যখন অশ্বিদ্বয়কে দেবার জন্য সোমরসের পাত্র নিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন, 'এঁরা সোম পানের অধিকারী নন।' চ্যবন নিরস্ত হলেন না, ঈষৎ হাস্য করে অশ্বিদ্বয়ের জন্য সোম-পাত্র তুলে নিলেন। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে উদ্যত হলেন। চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, অগ্নি থেকে 'মদ' নামক এক মহাবীর্য মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্যা (মারক দেবতা) উদ্ভূত হয়ে মুখব্যাদন করে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন, 'ব্রহ্মর্ষি, প্রসন্ন হোন, আজ থেকে দুই অশ্বিনীকুমারও সোম পানের অধিকারী হবেন।' চ্যবন প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহুদ্বয় মুক্ত করলেন এবং মদকে বিভক্ত করে সুরাপান, স্ত্রী, দ্যূত ও মৃগয়ায় স্থাপন করলেন। ডাক্তার অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদের কর্মচারী হয়েও, চিকিৎসক হয়েও, দেবপদবাচ্য হলেন ও অন্যান্য দেবতাদের মত সোম পানের অধিকারী হলেন। সুতরাং চ্যবনের এবং ঘোষার জরা দুর করে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়ার চিকিৎসা-পদ্ধতি অশ্বিনীকুমারদের জানা থাকলেও এ যুগের বিজ্ঞানের এখনও তা অজানা। শুধু ঘোষা বা চ্যবন নয়, ঘোষাই বলছেন যে, অশ্বিদ্বয় কলি নামক এক জরাজীর্ণ স্তোতাকে

পুনরায় যৌবন সম্পন্ন করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শয্যু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ-গাভীকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় দুগ্ধবতী করে দিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসায় বার্ধক্য দূর হয়ে যেত ও গত-যৌবন পুনর্বার ফিরে আসতো।

ষষ্ঠ ঘটনা হল, খেল নামক এক রাজার যাঁর পুরোহিত ছিলেন মহর্ষি অগস্ত্য। খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলা। কোন যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা সেই বিশ্‌পলার একটি পা কাটা যায়। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় এসে বিশ্‌পলাকে লৌহময় পা পরিয়ে দেন। রাত্রের মধ্যে অশ্বিদ্বয় বিশ্‌পলার পা এমনভাবে নতুন করে বানিয়ে দেন যে পরদিন তিনি আবারও যুদ্ধ যাত্রা করতে সমর্থ হন। শল্য চিকিৎসার এ এক অনবদ্য উদাহরণ।

সপ্তম কাহিনী হলো ঋজ্রাশ্বের। বৃষাগিরির পুত্র ঋজ্রাশ্ব ছিলেন রাজর্ষি। অশ্বিদ্বয়ের বাহন স্বরূপ এক বৃকীকে খাওয়ার জন্য ঋজ্রাশ্ব একশো একজন পৌরবাসীর মেষ খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিলেন। পিতা বৃষাগিরি এতে পুত্রের উপরে রেগে যান এবং ঋজ্রাশ্বকে অন্ধ করে দেন। ঋজ্রাশ্ব অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। অশ্বিদ্বয় জানলেন তাঁদের বাহনের খাবার যোগাতে গিয়েই ঋজ্রাশ্বের এই অন্ধত্ব। তখন অশ্বিদ্বয় ঋজ্রাশ্বের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন ও নতুন চক্ষু দান করেন। শল্য চিকিৎসায় অন্ধত্ব দূরীকরণের এটি একটি উদাহরণ।

অষ্টম ঘটনা রোমাঞ্চকর। ইন্দ্র দধীচিকে প্রবগ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি এ বিদ্যা অন্য কাউকে বল তবে তোমার শিরচ্ছেদ করবো।' অশ্বিদ্বয় ওই দুই বিদ্যা অর্জন করতে চাইলেন দধীচির কাছ থেকে। 'মধুবিদ্যা' কী তা জানা নেই। তবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিদ্যা বলতে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যার সমার্থক কোনও বিদ্যাকে 'মধুবিদ্যা' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে কিন্তু মধুবিদ্যা বলতে তা বোঝানো হয়নি। বরং তাতে বলা হয়েছে অশ্বিদ্বয় মধুবিদ্যা বিশারদ হয়েছিলেন বলেই ওইসব অলৌকিক কাজ-কর্ম করতে পারতেন। দধীচির কাছ থেকে মধুবিদ্যা শিখে নেবার জন্য তাঁরা একটা উপায় বের করলেন। তাঁরা দধীচির মস্তক ছেদন করে তা অন্য স্থানে রেখে তাঁকে অশ্বের মাথা পরিয়ে দিলেন।

অশ্বের মাথা নিয়েই দধীচি তাঁদের প্রবগ্য বিষয় অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ উপদেশ দিলেন। অশ্বিদ্বয় প্রবগ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা বিশারদ হলেন। ইন্দ্র তা জানতে পেরে দধীচির ওই অশ্বমুণ্ড বজ্রাঘাতে কেটে ফেললেন। অশ্বিদ্বয় দধীচির সেই লুকানো মনুষ্য-মস্তক এনে আবার দধীচির শরীরে সন্নিবেশিত করলেন। এইভাবে ভিষগশ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয় মধুবিদ্যা বিশারদ হলেন। কিন্তু তাঁদের এই মাথা কেটে নিয়ে আবার জুড়ে দেবার ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রোমাঞ্চকর। অনেকে এই ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করবেন। কিন্তু এটা আবারও মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে,ঋগ্বেদে কল্পকাহিনী নেই। বাস্তব ঘটনার বহুল বিবরণ আছে সেখানে। আধুনিক বিজ্ঞান এতোটা উচ্চ পর্যায়ে না পৌঁছালেও, হৃৎপিণ্ড বদল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন, কিডনি বদলে দেওয়া ইত্যাদি এখন শল্য-চিকিৎসা বিজ্ঞানে জলভাত হয়ে গেছে। কে বলতে পারে, কিছুদিনের মধ্যে শল্য-চিকিৎসকরা দধীচির এই মাথা বদলে দেওয়ার মত মস্তক-সংযোজনের ব্যাপারটাও রপ্ত করে ফেলবেন কিনা।

নবম ঘটনা হল কণ্ব ঋষির অন্ধত্ব দূরীকরণ। কণ্ব-ঋষি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। চলাফেরা করতে পারতেন না। শল্য-চিকিৎসায় অশ্বিদ্বয় তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়ে দেন। আবার শ্যাব নামক একজনের

কুষ্ঠ হয়েছিলো। অশ্বিদ্বয় তার কুষ্ঠ ভালো করে দেন এবং সে বিয়ে করে দীপ্তিমতী সুন্দরী স্ত্রীও লাভ করে। আবার নৃষদপুত্র একজন বধির ঋষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁর বধিরত্ব দূর করেন ও তাঁকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করেন।

দ্বাদশ ঘটনা হল, কোন এক রাজর্ষির বধ্রিমতী-নাম্নী এক কন্যা ছিল। তাঁর স্বামী ছিল নপুংসক। বধ্রিমতী পুত্রলাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেন। অশ্বিদ্বয় সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বধ্রিমতীকে হিরণ্যহস্ত নামক এক পুত্র দান করেন। সম্ভবত নলজাতক [Test Tube Baby] উৎপাদন বা ওই জাতীয় কোনও ব্যবস্থা করেছিলেন সুচিকিৎসক অশ্বিদ্বয়।

আরও ডজনখানেক ঘটনা আছে অশ্বিদ্বয়কে নিয়ে। রাজর্ষি বিমদ স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ করলে অন্যান্য রাজগণ তাঁকে পথে আক্রমণ করে। অশ্বিদ্বয় সে সময় বিমদকে সাহায্য করেন এবং নিজেদের রথ বা বিমানে তুলে নিয়ে বিমদ এবং তাঁর স্ত্রীকে বিমদের বাড়ীতে পৌঁছে দেন। আবার তুগ্র নামে অশ্বিদের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্তী শত্রুদের উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে তাদের পরাস্ত করবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে পাঠালেন। বহু সৈন্য নিয়ে নৌকাযোগে ভুজ্যু সমুদ্র পাড়ি দিতে গেলেন। মাঝ সমুদ্রে ভুজ্যুর নৌকা ভেঙে যায়। ভুজ্যু তখন অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করলেন। অশ্বিদ্বয় এসে ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে উঠিয়ে নিলেন। তিনদিন তিন রাতে তাঁদের পৌঁছে দিলেন তুগ্রের কাছে। পঞ্চদশতম ঘটনা হল মহর্ষি অত্রি-সংক্রান্ত। অসুরেরা অত্রি-ঋষিকে শতদ্বার পীড়া-যন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়ে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। তখন সেই ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করলেন। অশ্বিদ্বয় জল দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে দেন এবং অবিকলেন্দ্রিয় অত্রিকে বের করে আনেন সেই পীড়াযন্ত্রগৃহ থেকে।

আবার গৌতম ঋষি যখন মরুভূমিতে ছিলেন, তখন অশ্বিদ্বয়ের আরেকটি কর্ম খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁরা অন্যদেশের একটি কূপ উঠিয়ে তাঁর নিকট এনে দিয়েছিলেন এবং গৌতমের স্নান-পানাদির সুবিধার জন্য সে কূপের মুখ নিচে ও তলদেশ উপর দিকে করে দিয়েছিলেন। সতেরো নম্বর ঘটনা হলো বন্দন নামে একজন ঋষি ছিলেন এবং তিনি অসুরদের দ্বারা একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হন। সেখান থেকে উঠতে না পেরে তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। অশ্বিদ্বয় তাঁকে কূপ থেকে উঠিয়ে দেন। তেমনি অসুরেরা রেভ নামক এক ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে একদিন সায়ংকালে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। তিনি দশরাত নয় দিন অশ্বিদ্বয়কে স্তব করে কূপের মধ্যেই অবস্থান করেন। দশমদিনের সকালেই অশ্বিদ্বয় তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করেন। আবার শ্যাব নামক ঋষির দেহ তিনভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অশ্বিদ্বয় দেহের ছিন্নাংশগুলি জোড়া লাগিয়ে তাঁকে জীবিত করে দেন। এ ছাড়াও, রাজা পেদুকে অশ্বিদ্বয় এমন এক শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করেন যা তাঁর বহু যুদ্ধ জয় সম্ভব করে।

একবিংশতিতম ঘটনা হলো জাহুষ নামের এক রাজা সব দিক দিয়ে শত্রু বেষ্টিত হলে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন জয়লাভ করার আশায়। অশ্বিদ্বয় তাঁর স্তবে প্রীত হয়ে তাঁদের সর্বত্রগামী রথ বা বিমান দিয়ে রাত্রিতেই জাহুষকে উদ্ধার করেন এবং শত্রুর দুরারোহ পর্বতে তাঁকে নিয়ে যান। আবার ঋচৎকের পুত্র শর নামক স্তোতার পানের জন্য অশ্বিদ্বয় কূপের নিচের জলকে উঁচুতে উপরে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। বন্দন ঋষি, যাঁকে অশ্বিদ্বয় কূপ থেকে উঠিয়েছিলেন, তাঁরও জরা দূর করে যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই মহাভিষগদ্বয়। চতুর্বিংশতিতম ঘটনাও যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। গর্ভস্থ ঋষি বামদের মাতার প্রসব পথের সংকীর্ণতাহেতু স্বাভাবিকভাবে জন্মাতে পারছিলেন না। গর্ভাবস্থায় তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করলেন। অশ্বিদ্বয় এসে বামদেবকে তাঁর মায়ের উদরের বামপার্শ্ব ভেদ করিয়ে জন্ম দেন। সম্ভবত অশ্বিদ্বয়

বামদেবের জন্মের জন্য সীজারিয়ান পদ্ধতি [Caesarean section of birth] অবলম্বন করেছিলেন। ঋগ্বেদের 4র্থ মণ্ডলের 19তম সূক্ত বামদেব ঋষির জন্ম সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে। তাতে দেখা যায় বামদেব মাতৃগর্ভ থেকে মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করে উৎপন্ন হবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। তাঁর জননী তখন ইন্দ্র ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করলে অদিতি ইন্দ্রের সঙ্গে এলেন এবং বামদেবকে স্বাভাবিক নির্গমন পথে জন্ম নিতে বলেন। বামদেব তা অস্বীকার করেন ও নানা যুক্তি দেখান তাঁর ইচ্ছার স্বপক্ষে। সম্ভবত অশ্বিদ্বয় এসে এই সমস্যার সমাধানে করে দেন এবং বামদেবের জন্ম দেন সীজারিয়ান অপারেশন করে। তাতে প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই বিপদ মুক্ত হন। আরও অন্ততঃ ডজনখানেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়েছেন ঋগ্বেদের অশ্বিদ্বয়। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 112 তম সূক্তটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। সুতরাং ঋগ্বেদের এই দুই যমজ ডাক্তার পৌরাণিককালের স্বর্গ-বৈদ্য এই অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সব অলৌকিক কাজকর্ম সম্পাদন করেছিলেন তার অধিকাংশই আজও এ যুগের বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি।

ঋগ্বেদেই আছে (2/15) পরাবৃজ বলে এক ঋষি ছিলেন যাঁর দুটি পা ছিল না এবং ছিল না দৃষ্টিশক্তি। সেই অন্ধ এবং পদহীন পরাবৃজ চাইলেন কতকগুলি কন্যাকে বিয়ে করতে। কন্যারা পরাবৃজকে দেখে পালালেন। পরাবৃজ তখন ইন্দ্রের উপাসনা করে স্তুতি করেন। ইন্দ্র পরাবৃজের দৃষ্টি দান করেন এবং তাঁর পদদ্বয়ও সংযোজিত করেন। এই দৃষ্টিদান ও পাদসংযোজন ইন্দ্র করেছিলেন কিংবা ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে করিয়েছিলেন বলা মুশকিল। তবে ঋগ্বেদ বলছে ইন্দ্রই এগুলি করেছিলেন। ইন্দ্র আরও কিছু আলৌকিক কাজ করেছেন বলে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে। যেমন, নারী-ঋষি অপালার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তাঁর চর্মরোগ ভালো করে দেন এবং অপালার গাত্রবর্ণ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর পিতার কেশশূন্য মস্তক ইন্দ্রের চিকিংসায় আবার কেশযুক্ত হয়। অপালার পিতা মহর্ষি অত্রির মস্তক কেশশূন্য হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্র অত্রির মাথা রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যুগের (জোয়ালের) ছিদ্রে তিনবার নিষ্কর্ষণ দ্বারা শোধন করে তাঁর মস্তক যেমন কেশযুক্ত করেছিলেন, তেমনি তিনি অনুরূপ পদ্ধতিতে অপালার শরীরের চর্মরোগও দূর করে দেন। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয়, অপালার চর্মরোগ ও অত্রির কেশশূন্যতা দূর করতে ইন্দ্র কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এর অর্থ হলো ইন্দ্রও কিছু কিছু ডাক্তারী করতে পারতেন। তবে ইন্দ্র যে এ ব্যাপারে অশ্বিদ্বয়ের সাহায্য নেন নি এমন কথা একেবারে জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ পরাবৃজকে দৃষ্টিশক্তি ও পাদ দান করেছিলেন অশ্বিদ্বয়, এমন কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে ঋগ্বেদেরই প্রথম মণ্ডলের 112তম সূক্তের অষ্টম ঋকে। সুতরাং পরাবৃজ বা অত্রি কিংবা অপালা-সংক্রান্ত কাহিনীর মূল নায়ক হলেন অশ্বিদ্বয় এবং সম্ভবত ইন্দ্র নন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার উদাহরণ কেবলমাত্র আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদেই নয়, অথর্ব বেদ ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থেও বহুল কথিত। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছেন, সুশ্রুত সংহিতায় কম করেও 127 রকম শল্য-চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন অস্ত্রের বা যন্ত্রের উল্লেখ আছে। রামায়ণ-মহাভারতেও এইসব কাহিনী অজস্র। মানব দেহের 'যৌন পরিবর্তন' [Sex-Change] ঘটানোর বহু কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে ছড়িয়ে আছে। এগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং এখনকার শল্য-চিকিৎসার সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দেয়। এই সব কাহিনীর অধিকাংশের সঙ্গে অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনী কুমারদ্বয় কোন না কোনওভাবে জড়িত। রামায়ণের একটি বিখ্যাত কাহিনী দিয়ে এই আলোচনার শুরু করা যাক। বলা বাহুল্য, এই সব কাহিনীর নায়করা ঋগ্বেদের ওই দুই ডাক্তার, কিংবা তাদের উত্তরসূরী।

ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। একদিন তিনি যখন আশ্রমে ছিলেন না তখন শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ করে গৌতম-পত্নী অহল্যার কাছে এসে সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও অহল্যা দুর্মতিবশে সম্মত হলেন। সঙ্গম শেষে অহল্যা ইন্দ্রকে বললেন, 'সুরশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হয়েছি, শীঘ্র এখান থেকে চলে যান, নিজেকে এবং আমাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবেন।' গৌতম সব জেনে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, 'ওরে দুর্মতি, আমার রূপ ধারণ করে অকর্তব্য কর্ম করেছো তার জন্য তুমি নপুংসক হবে।' গৌতম এই অভিশাপ দেওয়া মাত্র ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ল। অহল্যাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'দুষ্টচারিণী! তুমি এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্য হয়ে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে অনাহারে ভস্মশয্যায় বহু সহস্র বৎসর অনুতাপ করবে। যখন এই ঘোর বনে দশরথ পুত্র রাম আসবেন, তখন লোভ মোহ বর্জন করে তাঁর আতিথ্য করবে, তাতে তুমি পবিত্র হয়ে পূর্বরূপ পাবে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হবে।'

গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্র নপুংসক হলেন এবং হারালেন তাঁর পুরুষত্ব। প্রবল অভিশাপ গৌতমের মুখ দিয়ে নির্গত হওয়ায় গৌতমের তপস্যা নষ্ট হল। তাঁর সুরলোক অধিকারের প্রয়াস নষ্ট হল। দেবতারা সবাই মিলে ইন্দ্রের পুরুষত্ব সংযোজিত করার জন্য অগ্নিকে সামনে রেখে পিতৃদেবগণের কাছে গেলেন। তাঁদের সহায়তার মেষের অণ্ড উৎপাটিত করে ইন্দ্রের দেহে সংযোজিত করা হল। মেষাণ্ড সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্র তাঁর পুরুষত্ব ফিরে পেলেন। সুতরাং অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষেত্রে এ এক অদ্ভুত নজির। ইন্দ্রের দেহে কোন মানুষের অণ্ড নয়, সংযোজিত হয়েছিলো মেষের অণ্ড এবং তাই ফিরিয়ে আনলো দেবরাজ ইন্দ্রের লুপ্ত পুরুষত্ব।

দক্ষের যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা সইতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করলেন। পিতা দক্ষের প্রতি ক্রোধবশতঃ তাঁর নিষ্পাপ দেহ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি ভস্মীভূত হলেন। সতীর দেহত্যাগের খবর পেয়ে শিব অসম্ভব ক্রোধে তাঁর জটারাশির একটি টেনে বের করে মাটিতে ছুঁড়ে দিলেন। ওই জটা থেকে সৃষ্টি হল অপরাজেয় মহাকায় বীরভদ্র। তাঁর শরীর এতো উঁচু যে তিনি আকাশ স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর এক হাজার হাত, প্রখর তেজ-সম্পন্ন তিনটি চোখ, করাল দন্তরাজি, জ্বলন্ত অগ্নির মত কেশকলাপ, গলায় নরকঙ্কালের মালা, হাতে উদ্যত বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র। এই বিশাল আকৃতির, মেঘের মত কৃষ্ণ-বর্ণ বীরভদ্রের উপর শিব ভার দিলেন যজ্ঞের সঙ্গে দক্ষকে বিনষ্ট করার। বীরভদ্র সম্ভবত বিশালকায় কোনও তীক্ষ্ণধী রোবট। বীরভদ্র ও শিবের অনুচরেরা মিলে যজ্ঞ পণ্ড তো করলোই, উপরন্তু বীরভদ্র হাড়িকাঠে ফেলে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে সে মুণ্ড আহুতি দিলেন যজ্ঞাগ্নিতে। এছাড়াও বীরভদ্র হোমরত ভৃগু মুনির সেই দাড়ি উপড়ে ফেললেন যে দাড়ি নেড়ে ভৃগুমুনি শিব নিন্দা করেছিলেন খানিক আগে। ঋষি ভগদেবের চোখদুটোও উপড়ে নিলেন, কারণ ওই চোখের ইঙ্গিতে ভগদেব দক্ষকে শিব নিন্দায় উৎসাহিত করেছিলেন এবং এরপর বীরভদ্র সূর্যের সবকটি দাঁত উপড়ে ভেঙ্গে ফেললেন, কারণ দক্ষ যখন শিবনিন্দা করছিলেন সূর্যদেব তখন দাঁত বের করে হাসছিলেন দক্ষের সমর্থনে। এ ছাড়া বহুজনের হাত পা কাটা গেল। দক্ষ-যজ্ঞ হল লণ্ড-ভণ্ড।

পরে শিব সন্তুষ্ট হলেন। অশ্বিনীকুমারদের ডাকা হলো। তাঁরা কাটা যাওয়া হাত পা সব জোড়া লাগালেন। ভগদেবের শরীরে লাগানো হলো মিত্রদেবতার চোখ। তিনি চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি দুই-ই ফেরৎ পেলেন। ভৃগুঋষির দাড়িতে ছাগলদাড়ি লাগানো হল। সূর্যের দাঁতগুলিও নতুন করে তৈরি করা হল।

সবচেয়ে বড় কথা হল যজ্ঞস্থলে গিয়ে দক্ষের হাত, পা, শরীরের অন্যান্য অংশ সংগ্রহ করে জুড়ে নেওয়া এবং দেহটা তৈরি হলে তাতে ছাগলের মুণ্ড যোজনা করে প্রাণদান করা। প্রাণদানের কাজটা অবশ্য রুদ্রদেব বা শিব নিজেই করেছিলেন। কিন্তু জোড়াতালি কিংবা 'Amputation'-এর ব্যাপার-স্যাপারগুলো সব করতে হয়েছিলো বেচারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে। এই বিশাল ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে উঠতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নিশ্চয়ই হিমশিম খেতে হয়েছিলো।

অশ্বিনীকুমারেরা যৌবন ফিরিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু একশরীর থেকে অন্য কোন শরীরে যৌবন স্থানান্তরিত করার কোনও ঘটনা বা কাহিনীর সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদের সম্পর্কের কথা জানা নেই। ঋগ্বেদেও এ ধরনের কোন কাহিনী নেই। শুধু যৌবনের দেহান্তরকরণ নয়, জরার দেহান্তরকরণের কোন ঘটনাও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঘটান নি। এঁরা বহু জরাজীর্ণকে যুবক বা যুবতী করে তুলেছেন আপনাদের চিকিৎসার কল্যাণে। কিন্তু এক দেহ থেকে অন্য দেহে জরা কিংবা যৌবন স্থানান্তরকরণের কোনও অলৌকিক ব্যাপার এঁরা করে দেখান নি। মহাভারতে কিন্তু এ ধরনের বিখ্যাত একটি কাহিনী আছে। সে কাহিনী এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তার সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

মহাকাশে অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনী নক্ষত্রের পশ্চিমে আছে রেবতী নক্ষত্র এবং পূর্বে আছে ভরণী নক্ষত্র এবং তার খানিকটা পরে বৃষরাশি। অশ্বিনী মেষরাশির [Aries] অন্তর্ভূত নক্ষত্র। মেষরাশির প্রথম নক্ষত্র। নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র।

[2] **যম ঃ**

নক্ষত্রচক্রের দ্বিতীয় নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম যম, সংবরণ বা সংযম। সৈদ্ধান্তিক নাম ভরণীনক্ষত্র। ইংরেজী নাম Perseus এবং Algol। অশ্বিনী নক্ষত্রের কিছুটা পূর্বে একটু উত্তরে এর অবস্থান। তিনটি তারা সমন্বিত ভরণী অনেকটা যোনির আকৃতি। এই তারা তিনটি মেষরাশির 35, 39, ও 41 নম্বর তারকা। ভরণীর দেবতা হল যম। ভরণী শব্দটির উৎপত্তি ভরণ বা শোষণার্থ ভৃ-ধাতু থেকে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এর নাম অপভরণী। এটিকে পৌষ মাসে রাত্রির প্রথম প্রহরে মধ্য আকাশে একেবারে প্রায় মাথার উপর দেখা যায়।

ভরণী
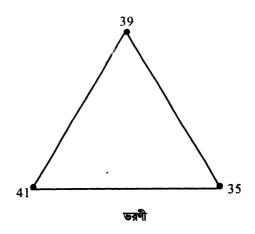
ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 113 সূক্তের 16-শ ঋক বলছে ঃ

"হে জীবাত্মা, উঠে জ্যোতির্লোকে সংক্রান্ত হও দেহাগত অপক্রান্ত অসু তমোহীন প্রগতিশীল, সর্বাত্মক জ্যোতি এসে সূর্যাগ্নির ব্যাপ্তি শেষে উন্মুক্ত পন্থা নিয়ে যাবে যথায় আয়ু প্রবর্ধিত হয়।"

[ঋগ্বেদ ঃ 1/113/16]

এই ঋকটির প্রচলিত অনুবাদ অবশ্য একটু অন্য ধরনের। "হে মনুষ্যগণ! ওঠ আমাদের (শরীর) পরিচালক জীবন এসেছে, অন্ধকার গিয়েছে, আলোক এসেছে। (উষা) সূর্যের গমনের জন্য পথ করে দিয়েছেন; যেখানে অন্নদান করে বর্ধন করছে, সেখানে যাব।" প্রথম অনুবাদটাই যমের নক্ষত্ররূপ প্রকাশক এবং এটিই বর্তমান আলোচনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ভরণী তারকাপুঞ্জের Algol তারাটি একটি উজ্জ্বল তারকা। এই তারার প্রভা ষাট ঘণ্টা ধরে সমান উজ্জ্বল থাকে। পরবর্তী পাঁচ ঘণ্টায় অ্যালগলের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে, তারপর আবার পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। দশ ঘণ্টা ধরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস-বৃদ্ধির পর আবার ষাট ঘণ্টায় এটি পূর্ণমাত্রায় দীপ্তি লাভ করে অবস্থান করে। ভরণীর ওই যুগ্মতারা ঋগ্বেদের যম ও যমী। যুগ্মতারা হওয়ার জন্য অ্যালগোলের প্রভা এইভাবে পরিবর্তিত হয়।

যমের অন্য নাম ধর্ম। ধারণার্থক ধৃ-ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে ধর্ম। ধর্মের অর্থ ন্যায় ও যম। এই শব্দটি সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ কিছুই প্রকাশ করে না। রামায়ণের 'ভরত' চরিত্র ভরণী নক্ষত্রের চরিত্র ও কারকতা অনুসরণে সৃষ্ট। মহাকবি বাল্মীকি যমের ভরণী নামের সঙ্গে মিলিয়ে ভরত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ভরত যম বা ভরণী নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য অনুরূপ নিকষ কৃষ্ণবর্ণ। ভরত ধর্মানুসারে সহজে পাওয়া অযোধ্যারাজ্য ত্যাগ করে রামের প্রতিভূস্বরূপ হয়ে চৌদ্দ বছর রাজ্য পালন করেছেন। ভরত চরিত্রের সৃষ্টিই হয়েছে যেন যম বা ভরণী নক্ষত্রটির কারকতা নিয়ে। নক্ষত্রটির পুরোটাই মেষরাশির অন্তর্ভুক্ত।

[3] **অগ্নিরুদ্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের তৃতীয় নক্ষত্র হল অগ্নিরুদ্র। এই নামটি ঋগ্বেদীয় নাম। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ এর নাম দিয়েছে কৃত্তিকা। ইংরজী নাম 'Pleiades'। এটির মোট 13°20′ মিনিট বিস্তারের একচতুর্থাংশ মেষরাশিতে এবং বাকী তিন-চতুর্থাংশ বৃষরাশিতে অবস্থিত। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের প্রথম ঋক [7/17/1] বলছে ঃ

"হে সমিধ সমন্বিত অগ্নি, সুষমাবিস্তার কর, ময়ূর শিখার ন্যায় পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বিস্তীর্ণ হও।"

ভরণীর সামান্য পূর্বে কিছুটা দক্ষিণ চেপে কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান। মহাকাশে এটিকে সহজেই দেখা যায়। কেউ এর মধ্যে কর্তরিকার [কাটারি] আকৃতি দেখেন। কেউ বা এটির মধ্যে অগ্নিশিখা লক্ষ্য করেন। ঋগ্বেদীয় ঋষিরা এর মধ্যে অগ্নিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই এর নাম দিয়েছিলেন অগ্নিরুদ্র। এটি ঋগ্বেদীয় একাদশ রুদ্রের এক রুদ্র। এর অধিপতি হলেন অগ্নি—ঋগ্বেদের তেত্রিশটি দেবতার এক দেবতা। বাংলায় এর ডাক নাম 'সাতভেয়ে'। ঋগ্বেদেই বলা আছে, কৃত্তিকা একসময় নক্ষত্রচক্রের আদি বা প্রথম নক্ষত্র বলে গণ্য হত।

খালি চোখে কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি তারা দেখা যায়। এর নাম তাই 'ষষ্ঠীমাতা'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার তারার সংখ্যা সাতটি বলা হয়েছে। এই সাতটি তারার নাম হল ঃ অম্বা, নিতত্নী, অভ্রযন্তী, মেঘযন্তী, বর্ষযন্তী, চুপুণীকা ও দুলা। পুরাণে কিন্তু কৃত্তিকার ছয়টি তারার কথা বলা হয়েছে। হয়ত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ রচনা কালে কৃত্তিকায় সাতটি তারাই ছিল। কোনও কারণে সপ্তম তারাটি অস্পষ্ট হয়ে

যাওয়ায় পৌরাণিককালে এসে কৃত্তিকার তারকাসংখ্যা ছয়টি হয়ে যায়। কৃত্তিকা নক্ষত্র মণ্ডল পৃথিবী থেকে প্রায় 500 অলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর যে ছয়টি তারা দেখা যায় তাদের ঔজ্জ্বল্য পঞ্চমমাত্রার চেয়ে কম নয়। কৃত্তিকা মণ্ডলকে মাঘ মাসে মধ্যাকাশে দেখা যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 100তম সূক্তের 35তম ঋকে আছে, শিবের পুত্র কুমার কার্তিক। রুদ্র শিবেরই এক নাম। একাদশ রুদ্রের একটির নাম অগ্নি। কৃত্তিকা নক্ষত্র তাই অগ্নি নামক রুদ্র। কৃত্তিকায় ছয়টি তারা। অগ্নিরুদ্রের কার্তিক তাই ষড়ানন। ষট্ কৃত্তিকা কার্তিককে প্রতিপালন করেছিলেন বলে কৃত্তিকা শিশুপালিনী ষষ্ঠীদেবী। তারকাসুর নামক অসুরাকৃতি তারকাগুচ্ছ। এই তারকাসুর নিধনের জন্য দেব সেনাপতি কার্তিকের উৎপত্তি। কার্তিকের ঋগ্বেদীয় নাম 'শুনাসীর'। 'নাসীর' শব্দের অর্থ 'সেনাগ্রবর্তী, শুনাসীর মানে 'শুভ্রবর্ণসেনানী'। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের 57 সূক্তের পঞ্চম ঋক শুনাসীরের বন্দনা করে বলেছে, ''যিনি দিব্যলোকে চক্রাবর্তিত নীহারিকায় আসীন সেই শুনাসীরকে আমরা বৈদিক ঋকে বন্দনা করছি, তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞহবি সিঞ্চন করছি।'' শুনাসীর শব্দের অন্য অর্থও করা হয়েছে। শৌনকের মতে, শুন দ্যু-দেবতা, অতএব তাঁর মতে 'শুন' হল ইন্দ্র। সুতরাং সীর হল বায়ু। যাস্ক বলেছেন, শুন হল বায়ু, আর 'সীর' আদিত্য। 'সীর' শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল। শুনাসীর অর্থে কৃষিকার্যের উপকরণদ্বয় অর্থাৎ লাঙ্গল ও লাঙ্গলের ফলাও হতে পারে।

অগ্নি বা কৃত্তিকা নক্ষত্র ঋগ্বেদে বহুভাবে স্তুত। ঋগ্বেদে অগ্নিকে নিয়ে অন্ততঃ 200 সূক্ত রয়েছে। ঋগ্বেদের 1028 সূক্তের মধ্যে ইন্দ্র সম্পর্কিত বা ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত সূক্তের সংখ্যা 250-এর বেশি। এরপর আসে অগ্নির উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি। এর সংখ্যা প্রায় 200-র বেশি। সুতরাং ঋগ্বেদের দ্বিতীয় প্রধান দেবতা হলেন অগ্নি। ঋগ্বেদে অগ্নি বিভিন্ন নামে স্তুত। যেমন ঃ জীবদেহের উত্তাপ তনূনপাৎ, প্রত্যক্ষ অগ্নি নরাশংস, সমুদ্রবারিতে জ্বলিত অগ্নি বাড়বানল বা বড়বা, বনের আগুন দাবানল, বনস্পতির দহন শমী, বিদ্যুতাগ্নি শম্পাৎ, যজ্ঞাহুতি ভক্ষণকারী অগ্নির নাম হুতাশন, যজ্ঞহবি বহন করে বলে নাম বহ্নি, ক্রোধাগ্নির নাম জমদগ্নি, জীবনশক্তি বিদিত অগ্নির নাম জাতবেদা, ভানুরশ্মি বা রৌদ্রাগ্নির নাম চিত্রভানু, অগ্নির উত্তাপের নাম ঊর্জস্বন্ত, অগ্নির দীপ্তির নাম ভা, তেজ, তপ্ ইত্যাদি বহু নামে অগ্নি অভিহিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 51 সূক্তের তৃতীয় ঋক বলছে ঃ
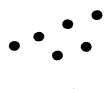
কৃত্তিকা

"হে জাতবেদা, তোমার দশ দিগন্তব্যাপ্ত অতিরোচিত অস্তিত্ব বহুরূপে বিদিত হতে ইচ্ছা করে' চিত্রভানুর মর্মে প্রবেশ করেছি, জলে ওষধিতে অনুপ্রবিষ্ট তোমার আগ্নেয় স্থিতি যম চিনতে পেরেছেন।"

[4] **বিধাতা ঃ**

নক্ষত্রচক্রের চতুর্থ নক্ষত্র হল ঋগ্বেদের বিধাতা নক্ষত্র। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ অনুসারে এর নাম রোহিণী। ইংরেজী নাম Aldebaran বা Hyades। এটি কৃত্তিকার পরবর্তী নক্ষত্র। এর কিছুটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রোহিণীর অবস্থান। আকাশে রোহিণীকে খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। মাঘ মাসের সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের মাঝখানে সামান্য পূর্বদিক ঘেঁষে একে দেখা যায়।

রোহিণী শব্দটি 'রুহ্' ধাতু নিষ্পন্ন। রুহ্ অর্থ আরোহণ। এককালে কৃত্তিকায় মহাবিষুব সংক্রান্তি হত। তারপর কৃত্তিকা নক্ষত্রের পরবর্তী নক্ষত্র রোহিণীকে অবলম্বন করেই সূর্যের আরোহণ। এই জন্য আরোহিণী অর্থে রোহিণী নামকরণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রোহিণী মানে লোহিত বর্ণ। রোহিণী নক্ষত্রের বর্ণও লাল। মৎস্য পুরাণে রোহিত বা লোহিত বর্ণ অর্থে রোহিণী

ব্যবহৃত। রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা প্রজাপতি। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সেইজন্য রোহিণীর দেবতা প্রজাপতি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রোহিণী নক্ষত্রে একটি তারা বলা হলেও পরবর্তীকালে শ্রীপতি, লল্ল, বরাহমিহির প্রমুখেরা রোহিণীতে পাঁচটি তারার কথা বলেছেন। এই পাঁচটি তারা রোহিণীকে একটা ত্রিকোণ শকটের রূপদান করেছে। এইজন্য এর নাম 'রোহিণী শকট'।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 62 সূক্তের নবম ঋক বলছে ঃ

"সনাতন সৌখ্যময় স্বয়ম্ভু পুত্রপৌত্রাদিজীবাধার, যিনি শবদেহত্যাগী বিদেহ অসু নবকলেবরস্থ ও পূরণান্ত জীবন কর্ষিত অসু পুনরায় চৈতন্যাধিসংস্থিত করেন, চরাচর বিধাতা রোহিণী আরোহিত।" [1/62/9]

এই ঋকের অন্য প্রচলিত অর্থও রয়েছে। আমরা এর নক্ষত্র সম্পর্কিত অর্থটি নিলাম।

রোহিণীনক্ষত্র দেহহীন প্রাণের নবদেহ বিধানকারী দেবতা, বিধাতা। বিদেহ অসু বা আত্মা শবরূপদেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মা জড়ধর্মীবর্জিত প্রাণ জড়ে সংযুক্ত করেন, এজন্য তাঁর নাম পিতামহ অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদির বীজাধার। দৈহিক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের অগোচর হল প্রাণ বা বিদেহী প্রাণ। প্রাণের নামান্তর অসু। অসু জড়ের মধ্যে প্রতিভাসিত হয়ে প্রাণী হয়। রোহিণীকেই অসুর নবদেহ বিধান করে। পৌরাণিক নিমির কাহিনীর সঙ্গে রোহিণীর সম্পর্ক আছে।

রোহিণী

বিদেহরাজ নিমি তাঁর যজ্ঞে যাজক করলেন সপ্তর্ষিকে—অর্থাৎ ক্রতু, পুলহ, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ ও মরীচিকে। বসিষ্ঠ নিমিকে জানালেন যে, তিনি ইন্দ্রের যজ্ঞ করছেন। তাঁর আসতে দেরী হবে। ওই যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত নিমিকে অপেক্ষা করতে বললেন ঋষি বসিষ্ঠ। নিমি বসিষ্ঠের জায়গায় ঋষি গৌতমকে দিয়ে তাঁর যজ্ঞ শুরু করে দিলেন। অনেকটা পরে বসিষ্ঠ নিমির যজ্ঞে এসে দেখলেন তাঁর জায়গায় গৌতম যাজক হয়েছেন। রাগান্বিত বসিষ্ঠ নিমিকে অভিশাপ দিলেন, "রাজা, আমি তোমার গুরু, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে অন্যকে বরণ করেছ এজন্য তোমার মৃত্যু হবে।" নিমি বললেন, "ব্রহ্মর্ষি আপনি অন্যায় করেছেন এজন্য আপনারও মৃত্যু হবে।" নিমি ও বসিষ্ঠ মারামারি করে দু'জনে বিদেহ অবস্থা লাভ করলেন। মৃত্যুকালে নিমি দীক্ষিত ছিলেন তাঁর যজ্ঞে। তাই যজ্ঞকর্তার অভাবে যাতে যজ্ঞ বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য যাজক সপ্তঋষি নিমির মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করে ওই যজ্ঞ চালিয়ে গেলেন।

বসিষ্ঠের বিদেহ অসু দেহহীনের মহাদুঃখ অনুভব করে নরদেহ চাইলেন বিধাতার কাছে। বিধাতা তাঁকে মিত্র ও বরুণের পুত্ররূপে নতুন দেহ দিলেন। পুনর্জন্মেও তাঁর বসিষ্ঠ নাম বজায় থাকল। মহর্ষি ভৃগু নিমির যজ্ঞ শেষে বললেন, "আমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে নিমির এই সযত্ন রক্ষিত অবিকৃত শবদেহ চৈতন্যাধিসংস্থিত করতে পারব।" নিমি পুনর্জীবিত হতে চাইলেন না। বলেছিলেন, "আমার ভোগের

অভিলাষ নেই, আমি দেহ চাই না।'' বিধাতার প্রশ্নের উত্তরে নিমি জানিয়েছিলেন, 'পিতামহ, জীবন্ত সবর্ভূতের নেত্রে আমাকে রাখুন।' পিতামহ সেই ব্যবস্থাই করলেন। ব্রহ্মার ইচ্ছায় নিমির বংশ খ্যাত হল বিদেহ বংশ নামে। এই বংশেই জন্মেছিলেন সীতা বা পালিতা কন্যা ছিলেন সীতা। মিথিলার রাজাদের উপাধি ছিল জনক। সীতার পালক পিতার নাম ছিল 'সীরধ্বজ'।

রোহিণী নক্ষত্র, জনস্রষ্টা বিধাতার নামান্তর হল গণপতি, গণেশ। গণেশের মূর্তি রোহিণী নক্ষত্রের তারা বিন্যাসের মত দেখতে। রোহিণীকে দেখলে অনেকটা একদন্ত বিশিষ্ট লম্বিতশুঁড় হাতীর মাথার মত দেখতে লাগে। লম্বত্রিকোণের বাম কোণে মহাকায় লোহিতবর্ণ রোহিণীতারা গণেশের লোহিতবর্ণ স্থূল খর্বতনু। চারহাতে শঙ্খ, চক্র, মোদক ও পরশু। ওই পরশু নিয়ে পরশুরামের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে একটা দাঁত খুইয়েছিলেন গণেশ। এই গণেশই ব্যাসদেবের শ্রুতলেখক হয়েছিলেন মহাভারত লেখার সময়। রোহিণী নক্ষত্রের পুরোটাই বৃষরাশির অন্তর্গত। রোহিণী নক্ষত্র পৃথিবী থেকে 130 আলোবর্ষ দূরে অবস্থিত। খ-গোলের 40° থেকে 53°20′ অবধি রোহিণী নক্ষত্রের বিস্তার।

রোহিণীর একটি অত্যুজ্জ্বল তারা আছে যার নাম ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্র [Capella]। এর ঋগ্বেদীয় নাম 'বভ্র' বা ব্রহ্মার মানসপুত্র। এর দূরত্ব 50 আলোকবর্ষ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 51-তম সূক্তের নবম ঋক বলছে ঃ

''রোদন করো না, অপব্যয় করো না, ইন্দ্রের ন্যায় ভূমাপ্রজ্ঞার অনুব্রতী হও। শিথিলপ্রজ্ঞ হয়ো না, ভুবর্লোকচ্যুত হয়ো না, প্রবৃদ্ধদিব্যলোকের চেতনা বর্ধন করো। বাল্মীকির ন্যায় দ্যুলোকের সূর্য ও নক্ষত্রদের বিশিষ্ট স্তবকীর্তন করে জ্যোতিষ্কের চিৎশক্তিতে সন্দেহ নিপাত করো।''

ভবিষ্যৎ তমসাবৃত। সেই তমসার তীরে বিচরণ করেন বাল্মীকি। সেই তমসার তীরে থাকে ক্রৌঞ্চমিথুন বা ছায়াপথের মিথুনরাশি। মৃগব্যাধ শ্বাতারা বা লুব্ধক ক্রৌঞ্চমিথুনের একটাকে বিনাশ করলে আরেকটা রোদন করতে থাকল। লুব্ধক বা মৃগব্যাধতারা থেকে নিক্ষিপ্ত ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা কালপুরুষ ও মিথুনরাশির মাঝ বরাবর ভেদ করে বৃষরাশির রোহিণীনক্ষত্রে পৌঁছয়। কাজেই মৃগব্যাধ বা লুব্ধক তারার নিক্ষিপ্ত শরেই যে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি মুমূর্ষু হয়ে ছট্‌পট্ করতে লাগল, অন্যটি তাই দেখে করুণস্বরে রোদন করতে থাকল। এই মৃগব্যাধ তারা হল লুব্ধক বা শ্বা বা Sirius। বাল্মীকি অভিশাপ দিলেন, 'নিষাদ, তুমি কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না, যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছ।' লুব্ধক সপার্ষদ সূর্যের আঠাবো ডিগ্রি বিস্তারের সঞ্চারবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এটি শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।

এরপর ব্রহ্মার মানসসত্তা ব্রহ্মহৃদয় তারা আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বাল্মীকি তোমার বাক্য শ্লোক নামেই কীর্তিত হবে। ব্রহ্মহৃদয়ের সংকল্পেই তোমার মুখে এ বাক্ উচ্চারিত হয়েছে। ব্রহ্মহৃদয়ে নিহিত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা তুমি বিদিত হবে। আদিত্যবংশের বা রঘুবংশের যা অবিদিত আছে সে সমস্তই তুমি বিদিত হবে। মিত্র, বরুণ, যম, ভগ, অর্যমা, সবিতা, ত্বষ্টা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, অদিতি ও সূর্য এই দ্বাদশ আদিত্যের ও ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্কদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হবে। যতকাল তোমার রচিত রাঘবের আখ্যান পৃথিবীতে প্রচারিত থাকবে, ততকাল তুমিও ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বলোকে বিহার করবে।''

[5] **যজ্ঞসোম ঃ**

নক্ষত্রচক্রের পঞ্চম নক্ষত্র ঋগ্বেদীয় যজ্ঞসোম। এর সৈদ্ধান্তিক নাম মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী। এটি যে বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অংশ তার নাম কালপুরুষ [Orion]। পরস্পরের কাছে থাকা তিনটি ক্ষীণপ্রভার তারা যজ্ঞপুরুষ বা কালপুরুষের শীর্ষে অবস্থিত। তাই এর নাম যজ্ঞসোম। হায়ণ মানে বৎসর। এই যজ্ঞসোম নক্ষত্র অতীতে প্রায় 6200 বছর থেকে শুরু করে এখন থেকে প্রায় 5245 বছর আগে পর্যন্ত হায়ণ বা বৎসরের অগ্রসূচক থাকায় এই নক্ষত্রের অন্য নাম রাখা হয় অগ্রহায়ণী। মৃগের ন্যায় ধাবমান কালের প্রারম্ভে বা শিরে অবস্থিত বলে এর নাম মৃগশিরা। একসময় সায়ন বৎসর শুরু হত মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী নক্ষত্রে এবং সে ঘটনা ঘটতো 6200 বছর আগে। আর এই ঘটনা চলতে থাকে প্রায় 955 বছর ধরে, এখন থেকে প্রায় 5245 বছর আগে পর্যন্ত। ঋগ্বেদে এই কথা বলা হয়েছে।

মৃগশিরা নক্ষত্রটি আকাশের কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর কয়েকটি তারায় গঠিত। কালপুরুষের পশ্চিমে বৃষরাশি ও রোহিণী নক্ষত্র এবং এর পূর্ব দিকে মিথুনরাশি ও আর্দ্রা নক্ষত্র। মৃগশিরা নক্ষত্রটিকে আকাশে অনায়াসে দেখা যায়। নক্ষত্রটি হরিণের মস্তক বা শিরের আকৃতিযুক্ত বলেই এর নাম মৃগশিবা বা মৃগশীর্ষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে, একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা কামনাযুক্ত হয়ে স্বীয় কন্যা রোহিণীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। রোহিণী পিতার এহেন আচরণে ভয়ে এবং সংকোচে মৃগীরূপ ধারণ করে পলায়নে সচেষ্ট হন। ব্রহ্মাও তখন মৃগরূপ ধারণ করে এই মৃগীর পশ্চাদ্‌ধাবন করেন। তখন সব দেবতা একত্রিত হয়ে সর্বদেবের ঘোরতম অংশ নিয়ে ভূতবানের সৃষ্টি করলেন। সেই ভূতবানের হাতে মৃগ নিহত হল। অবশেষে প্রজাপতি এই মৃগরূপ নিয়ে আকাশে আশ্রয় নিলেন। এই মৃগের সঙ্গে মৃগশিরার সম্পর্কের কারণে মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা নামকরণ। এর অন্য নাম মার্গশীর্ষও। কারণ একসময় এই নক্ষত্র থেকে বর্ষ আরম্ভ হত। তাই একে রবিমার্গের শীর্ষে অবস্থিত ধরা হত। আর সেই কারণেই এই নক্ষত্র মার্গশীর্ষ নামেও অভিহিত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রন্থসমূহে যেটি মৃগশিরা নক্ষত্র তাতে তিনটি তারা। এই তিনটি তারা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর মস্তকস্থিত তিন তারা। বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, প্রাচীন মৃগশিরা বা ঋগ্বেদীয় যজ্ঞসোম সিদ্ধান্তোক্ত মৃগশিরা নয়। কালপুরুষ নক্ষত্রের নিম্নার্ধই হল মৃগশিরা নক্ষত্র। কালপুরুষের দুটি পা ও কোমর বা কটি নিয়ে প্রাচীন মৃগশিরা নক্ষত্র ঠিকঠাক মৃগের শিরের মত দেখতে। শ্রী অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন ঃ

"প্রাচীন মৃগশিরা যে কালপুরুষের নিম্নার্ধকে অবলম্বন করে কল্পিত, অমরকোষেও তার উল্লেখ আছে ঃ

> 'মৃগশীর্ষে মৃগশিরস্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী।
> ইল্বলাস্তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ॥

সিদ্ধান্তের মৃগশিরা

অর্থাৎ মৃগশীর্ষ মৃগশিরা ও অগ্রহায়ণী মৃগশিরার পর্যায়। মৃগশিরার শিরোদেশে যে তারাগুলি আছে তাদের নাম ইল্বলা। এগুলি কালপুরুষের কটিস্থিত তারকা। হেমচন্দ্র বলেছেন, মৃগশিরার শিরস্থ পঞ্চতারকাই 'ইল্বলাঃ'। এই মৃগশিরা কখনো সিদ্ধান্তের মৃগশিরা নয়।

প্রাচীন মৃগশিরা যে সব তারকাযুক্ত সেগুলি হল Orion মণ্ডলের **ঘ, ঙ, চ, ছ, দ, ঞ, খ** তারকা। এদের মধ্যে **খ** তারকাটি সর্বাধিক উজ্জ্বল। আকাশে ঔজ্জ্বল্যে প্রথম কুড়িটি তারকার মধ্যে স্থান সপ্তম। মণ্ডলের অন্যান্য তারকাও বিশেষ উজ্জ্বল।"

মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা সোম। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পর শীর্ষ সমন্বিত মৃগে অর্থাৎ কালপুরুষ নক্ষত্রে চন্দ্রের উদয় থেকে চন্দ্র মৃগশিরার অধিপতি কল্পিত হন। এই নক্ষত্রটিকে ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যায় মাথার উপরের আকাশে দেখা যায় সামান্য দক্ষিণ দিক ঘেঁসে। এই নক্ষত্রটি নক্ষত্রচক্রের 53°20′ থেকে 66°40′ অংশ জুড়ে অবস্থিত'। আগেই বলেছি, এই নক্ষত্রে প্রায় 6200 বছর আগে সায়ন বৎসরের শুরু হত। এই নক্ষত্রটির অর্ধেকটা পড়েছে বৃষরাশিতে এবং বাকী অর্ধেকটা পড়েছে মিথুন রাশিতে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 114 সূক্তের চতুর্থ ঋক বলছে ঃ

প্রাচীন মৃগশিরা

"ত্বিষাম্পতি বঙ্কিমঠামেসংস্থিত রুদ্রনক্ষত্রের ক্রান্তদর্শী এই তারা যজ্ঞসাধনের কাল পালনের নিমিত্ত আহ্বাত হয়েছে। সূর্যসরণীর বিক্ষেপসঞ্জাত বসুমতীপথের সম্পাতদ্বয়ের একতম সুদূর কালের জন্য এই দিব্যতারা কর্তৃক বরণীয় হয়েছে।" 1/114/4]
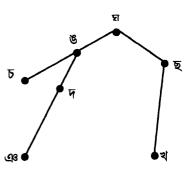
মৃগশিরা নক্ষত্র সপার্ষদ সূর্যের সঞ্চারবৃত্তের আঠারো অংশ [Degree] বিস্তারের মধ্যে আছে বলেই এটি নক্ষত্রচক্রের মধ্যে গণ্য হয়েছে। মৃগশিরার শীর্ষাকাশে রয়েছে যজ্ঞাগ্নি নক্ষত্র [Auriga]। এটি ওই আঠারো অংশের বাইরে থাকায়, এটি মৃগশিরার চেয়ে অনেকটা উজ্জ্বল তারা হওয়া সত্ত্বেও নক্ষত্রচক্রে এর কোনও গুরুত্ব নেই। ক্ষীণতর তারা মৃগশিরাই প্রাধান্য পেয়েছে উজ্জ্বলতর যজ্ঞাগ্নি কোনও গুরুত্বই পায় নি। যজ্ঞাগ্নির কথা কিন্তু ঋগ্বেদ বলেছে। এর সম্পর্কে একটা ঋকও আছে [10 মণ্ডল 51 সূক্ত 9 ঋক]।

[6] **রুদ্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের যষ্ঠ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম 'রুদ্র'। এর সৈদ্ধান্তিক নাম আর্দ্রা। ইংরেজী নাম 'Betelgeuse'। এটি কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর তারা। কালপুরুষের দু'খানি মাত্র তারা সৌরবিশ্বের সঞ্চারবৃত্তের আঠারো অংশ প্রস্থের অন্তর্গত। কালপুরুষের অন্য তারা এই সঞ্চারবৃত্তের বাইরে। যে দুটি নক্ষত্র সঞ্চার বৃত্তের মধ্যে তারা হল মৃগশিরা এবং আর্দ্রা। অতুজ্জ্বল রক্তিমাভ রুদ্র নক্ষত্র কালপুরুষের দক্ষিণবাহু। মৃগশিরার পূর্বে এটি অবস্থিত। কালপুরুষের উত্তর প্রান্তে রয়েছে এটি। আর্দ্রা নক্ষত্র পুরোপুরি মিথুনরাশিতে অবস্থিত। আকাশে একে সহজেই দেখা যায়। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন ঃ

"আর্দ্রার অধিপতি রুদ্র। বেদে রুদ্র ঝড়-বৃষ্টির দেবতা। আর্দ্রার অর্থও জলসিক্ত। তাই আর্দ্রার সঙ্গে জলবৃষ্টির সম্পর্ক ছিল মনে হয়। প্রাচীনকালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যখন বাসন্ত বিষুবন হত তখন জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সপ্তাহে সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করতো। সে সময়ে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার প্রচণ্ড সম্ভবনা অর্থাৎ বৎসরে তখনই ভূমির প্রথম আর্দ্র হওয়া। এই কারণেও আর্দ্রা নামকরণ হতে পরে। আকৃতিগত কারণেও আর্দ্রা নামকরণ হওয়া অসম্ভব নয়। গণক কালিদাস এর সম্বন্ধে বলেছেন, পদ্মাকৃতি উজ্জ্বল এক তারকা। গণক কালিদাস কিন্তু কবি কালিদাস নন। এঁর আবির্ভাব কাল সম্ভবত শকের দ্বাদশ শতাব্দী। যাইহোক পদ্মের আকার এবং বর্ণের সঙ্গে আর্দ্রা নক্ষত্রের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। আবার আর্দ্রা নক্ষত্র সুরগঙ্গার সন্নিকটে অবস্থিত বলেও আর্দ্রার সিক্তভাব, সেই সিক্তভাবের সঙ্গে আর্দ্রা নক্ষত্রের সম্পর্ক থাকতে পারে।"

সিদ্ধান্ত গ্রন্থ অনুসারে আর্দ্রার তারা সংখ্যা মাত্র একটি। বরাহ মিহিরও আর্দ্রা নক্ষত্র যে একটি মাত্র তারা তার উল্লেখ করেছেন। শ্রীপতি এবং লল্ল তারকার যে সংখ্যা বলেছেন, তাও 1। কোলব্রুক এবং অন্যান্য মনীষীরা এই তারকাটিকে Orion অর্থাৎ কালপুরুষ মণ্ডলের তারকা হিসাবে ধারণা করেছেন। এটি কালপুরুষের পূর্ব বাহু, অতিশয় উজ্জ্বল ও তাম্রবর্ণ। আকাশে উজ্জ্বলতম কুড়িটি তারকার মধ্যে এর স্থান দ্বাদশ। সূর্যের চেয়ে এটি 40000 গুণ বেশি উজ্জ্বল—কিন্তু এটির ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এটি 300 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

ক •————————• খ

আর্দ্রা

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আর্দ্রার একটি নাম বাহু। সেখানে এটি দ্বিবচনান্ত। অর্থাৎ কালপুরুষের দুটি বাহু নির্দেশক তারকাদ্বয়ের কল্পনা করা হয়েছে একসঙ্গে। কালপুরুষের পশ্চিম বাহুর নির্দেশক তারাটি Orion মণ্ডলের অন্য তারকা। এটি দ্বিতীয় মাত্রার, পূর্ব বাহুর মত অতটা উজ্জ্বল নয়। ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে আর্দ্রা নক্ষত্রকে একেবারে মাথার উপরে দেখা যায়।

ঋগ্বেদের রুদ্র নামক এই নক্ষত্রটি সূর্যের সঞ্চারবৃত্তের মধ্যে এসে পড়ায় এটি নক্ষত্রচক্রের ষষ্ঠ নক্ষত্র হতে পেরেছে। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীতে মোট ছয়টি রুদ্রের অবস্থানের কথা বলেছে ঋগ্বেদ। আর বাকী পাঁচটি রয়েছে মহাকাশের অন্যত্র। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঋগ্বেদ একাদশ রুদ্রের কথা বলেছে। এই একাদশ রুদ্রের নাম হলঃ মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিণাকী, দহন, ঈশান, কপর্দী, স্থানু, রুদ্র। এই এগারোটি রুদ্রই আকাশের এগারোটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। রুদ্র, পিণাকী, কপর্দী ও স্থানু এই চারটি রুদ্র নামধারী চারটি নক্ষত্রের দুটি কালপুরুষের দুই হাত ও অন্য দুটি ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর দুই চরণ। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী প্রায় আমাদের সকলের চেনা। এতে রুদ্র নামধারী ওই একাদশ নক্ষত্রও আছে। যেমন, রুদ্র হল আর্দ্রা নক্ষত্র [Betelgeuse] । ঋগ্বেদের পিনাকী-রুদ্রের কোনও নামই দেওয়া হয়নি সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষে, কিন্তু ইংরাজী নাম Bellatrix । স্থানুরুদ্র হলো বাণলিঙ্গ নক্ষত্র [Rigel]। কপর্দী রুদ্রের ইংরেজী নাম হল Saiph । মৃগব্যাধ শ্বান্ বা শ্বানক্ষত্র, এটি ঋগ্বেদের সরমা। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের দেওয়া নাম লুব্ধক [Sirius]—আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ঈশান প্রশ্বন্ বা প্রশ্বা নক্ষত্র। দহন কৃত্তিকা নক্ষত্র, সর্প অশ্লেষানক্ষত্র [Hydra], অজৈকপাদ পূর্বভাদ্রপদ, অহির্বুধ্ন্য উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র, নির্ঋতি হলো মূলা-নক্ষত্র [Sagittarius]। এইভাবে ঋগ্বেদের রুদ্রেরা সব নক্ষত্র। তাদের ঘিরে তৈরি সব পৌরাণিক কাহিনীরই নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব। এইভাবে ময়দানব ও তাঁর সঙ্গে জড়িত রুদ্রদের কাহিনীও নক্ষত্রদের প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে রূপান্তরিত হয়।

ঈশানরুদ্র নক্ষত্রটি সূর্যের দীপ্তির প্রায় নয়গুণ দীপ্তি সম্পন্ন।পৃথিবী থেকে এটির দূরত্ব মাত্র এগারো আলোকবর্ষ। প্রথম প্রভার এই তারাটির ঋগ্বেদীয় নাম ঈশানরুদ্র। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম প্রশ্বন্। ইংরেজী নাম Procyon বা Canis Minor । একাদশ রুদ্রের অন্যতম হল ঈশান রুদ্র। এটি কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ রুদ্র সম্পর্কে বলেছেঃ "বিশ্বের অধিপতি মহর্ষি রুদ্রের প্রভব দেবগণের উদ্ভব ও হিবণ্যগর্ভের জন্মের পূর্বে সে তত্ত্ব বুদ্ধিতে সংযুক্ত হয়ে আমাদের শুভ হোক।" নক্ষত্র চক্রের ষষ্ঠ নক্ষত্র রুদ্র বা আর্দ্রা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর দক্ষিণবাহু। কালপুরুষের বায়ুকোণে বা উত্তর-পশ্চিমে বৃষরাশি এবং উত্তর-পূর্বে বা ঈশানকোণে মিথুনরাশির নক্ষত্রসমূহ। আর্দ্রা এবং মৃগশিরা ছাড়া কালপুরুষের অন্যান্য রুদ্রতারার সঙ্গে চন্দ্রের কোনও যোগ নেই। ঋগ্বেদ নক্ষত্রচক্রের সাতাশটি নক্ষত্রের বাইরে

অনেকগুলি নক্ষত্রের কথা বলেছে। এই সব নক্ষত্রের সামান্য বিবরণ একটু পরেই দেওয়া হচ্ছে, 27-টি নক্ষত্র এবং বারোটি রাশি নিয়ে আলোচনার পর। অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে ওই সব নক্ষত্র সম্পর্কে হরপ্পীয় কিংবা বৈদিক মিশ্র সভ্যতার মানুষদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর এবং প্রখর।

[7] **অদিতি ঃ**

নক্ষত্রচক্রের সপ্তম নক্ষত্র হল অদিতি। অদিতি নামটি ঋগ্বেদীয়। এর সৈদ্ধান্তিক নাম পুনর্বসু। ইংরেজী নাম Castor এবং Pollux । পুনর্বসুর অবস্থান আর্দ্রার পূর্বে। এটি মিথুনরাশির নক্ষত্র। এর তিন-চতুর্থাংশ মিথুনরাশিতে এবং বাকী এক-চতুর্থাংশ কর্কটরাশিতে। এই নক্ষত্রের পূর্বে সামান্য দক্ষিণে রয়েছে পুষ্যা নক্ষত্র। আকাশে নির্মেঘ রাত্রিতে পুনর্বসু নক্ষত্রকে খুব সহজেই দেখা যায়। ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যায় আকাশের মাঝখানে সামান্য পূর্ব দিক চেপে এর অবস্থান।

'বসু' শব্দের অর্থ দীপ্তি। পুনর্বসু হলো দ্বিতীয়বার দীপ্তি। অর্থাৎ দুটি দীপ্তি বা জ্যোতি। পুনর্বসু নক্ষত্র দুটি তারা সমন্বিত। তৈত্তিরীয় সংহিতা, শাকল্য সংহিতা, খণ্ডখাদ্যকেও বলা হয়েছে পুনর্বসু দুটি তারার সমাহার। দুটি তারাই বেশ উজ্জ্বল। এর একটি 45 আলোকবর্ষ এবং অন্যটি প্রায় 33 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। পুনর্বসুর পশ্চিমদিকের তারাটি হল Pollux। এটি একটি যুগ্মতারা [Binary Star]। অপর তারাটি হল Castor । পুনর্বসু নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। ঋগ্বেদের 33টি দেবতার এক দেবতা হল অদিতি। আগেই বলেছি, এক সময় সায়ন বৎসরের শুরু হত পুনর্বসু নক্ষত্র থেকে। প্রায় আট হাজার বছর আগে এ ধরনের মহাবিষুব সংক্রান্তি বা বর্ষ শুরু হত পুনর্বসু নক্ষত্রে। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটিতে পুনর্বসু নক্ষত্রের গঠন যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা এই রকম ঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, এক সময়ে দেব-সকল থেকে যজ্ঞ সরে গিয়েছিলেন। দেবতারা যজ্ঞে নিমগ্ন হতে পারলেন না। তখন তাঁরা অদিতিকে বললেন, 'তুমি যজ্ঞের সন্ধান দাও!' অদিতি বললেন, 'তথাস্তু, কিন্তু আমি এই বর চাই যে, আমাতেই যজ্ঞের শুরু ও শেষ হোক।'

পুনর্বসু (কোলব্রুক)
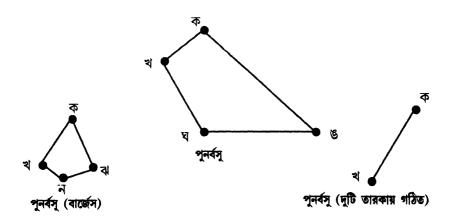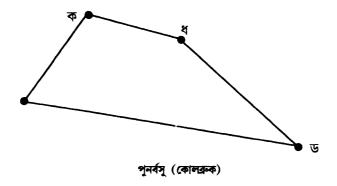
যজ্ঞ অর্থ সম্বৎসর। যজ্ঞেই সম্বৎসরের শুরু ও শেষ বলে অদিতির দুই মস্তক। বাল-গঙ্গাধর তিলক অবস্থাটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, কেনো সময়ে পুনর্বসু নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হত। সেই বাসন্ত বিষুবদ্দিনেই বর্ষারম্ভ ও বর্ষশেষ। ওই বর্ষারম্ভ ও বর্ষশেষের প্রতীক হিসেবেই পুনর্বসুতে 2টি তারা। এই 2টি তারাতে আবার মিথুন রাশির নর ও নারীর কল্পনা।

শ্রীপতি এবং লল্ল পুনর্বসু নক্ষত্রে 4টি তারা বলে মনে করেন। ওই 4টি তারা গৃহাকারে অবস্থিত। মহাকাশে তারকা লক্ষ্য করে আকার এবং অবস্থান মিলিয়ে বলা যায় যে, এই তারাগুলি Gemini মণ্ডলে খ, ক, ঘ এবং ঙ। পুনর্বসু মণ্ডল সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায়েরও এই অভিমত। কিন্তু বার্জেস পরবর্তী 2টি তারা ঝ এবং ন এবং কোলব্রুক ড এবং খ বলে মনে করেছেন। তারাগুলি বিশেষ উজ্জ্বল নয় এবং প্রতিটি তারাই চতুর্থ মাত্রার, কিন্তু ঘ এবং ঙ তারা 2টি তৃতীয় মাত্রার।

বরাহমিহিরের অভিমত, পুনর্বসু নক্ষত্র 5টি তারকায় গঠিত। এই 5টি তারায় ধনুরাকারের কল্পনা। মহাকাশে তারকাবিন্যাস লক্ষ্য করে মনে হয় যে, এই 5টি তারকা Gemini মণ্ডলের খ এবং ক তারকা, Canis Minor মণ্ডলের ক তারকা (এটির নাম Procyon) এবং Canis Major মণ্ডলের ক এবং খ তারকা। Procyon তারকাটি আকাশের প্রথম 20টি সর্বোজ্জ্বল তারকার মধ্যে অষ্টম। 22 আলোকবর্ষ দূরে এটির অবস্থান। Canis Major মণ্ডলের ক তারকাটি মহাকাশের সর্বোজ্জ্বল তারকা।

পুনর্বসু নক্ষত্র। পাঁচটি তারায় গঠিত।
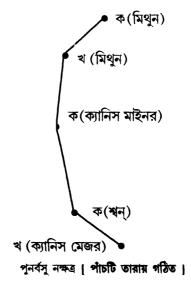
9 (নয়) আলোকবর্ষ দূরে ওই Canis Major নক্ষত্রটির ‘ক’ তারাটির অবস্থান। এরই খ-তারাটি দ্বিতীয় মাত্রার তারা। 5টি তারায় গঠিত পুনর্বসুকে অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় এখানে অপেক্ষাকৃত ছোট করেই দেখানো হয়েছে।

[8] **ব্রহ্মণস্পতি ঃ**

প্রায় 500 আলোকবর্ষ দূরের তারকামণ্ডলী নক্ষত্রচক্রের অষ্টম নক্ষত্র, যার ঋগ্বেদীয় নাম ব্রহ্মণস্পতি, সৈদ্ধান্তিক নাম পুষ্যা। ইংরেজী নাম Praesepe। এর বিস্তার খ-গোলের $93^0 20^/$ থেকে $106^0 40^/$ অবধি। মানবের বাক্ বা কণ্ঠস্বর দান করেন, তাই জীবের বাক্‌নিয়ামক ব্রহ্মণস্পতির নামান্তর বাচস্পতি বা বৃহস্পতি। বাক্ চার প্রকার। মুখের কথায় বলার নাম ‘বৈখরী’, আন্তরিক প্রেরণায় বলার নাম ‘মধ্যমা’, দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বলার নাম ‘পশ্যন্তি’, আত্মা বা ব্রহ্মকে বিদিত হয়ে বলার নাম ‘পরা’। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 164তম সূক্তের 35তম ঋক বলছে ঃ “চার প্রকার বাক্ পরিমিত পদে বিভক্ত, তার তত্ত্ব ব্রহ্মবিদ্‌রা জানেন। তিন প্রকার বাক্ গভীরে নিহিত রয়েছে, মনস্বী ব্যতীত যারা ইঙ্গিত করে না। চতুর্থ প্রকার বাক্যে মনুষ্যেরা কথা বলে।”

পুনর্বসু নক্ষত্রের ঈষৎ দক্ষিণ-পূর্বে এবং অশ্লেষার কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে পুষ্যা নক্ষত্রের অবস্থান। পুষ্যায় উজ্জ্বল তারকা নেই। তাই মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে এটিকে দেখতে হয়। নক্ষত্রটি চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় প্রায় মাথার উপর সরাসরি দেখা যায়। ‘পুষ্’ ধাতু হল পোষণার্থক। এই ধাতু থেকে পুষ্যার উৎপত্তি। পুষ্যাকে ‘তিষ্য’ও বলা হয়। তুষ্ ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন। অমরকোষে নক্ষত্রটির নাম ‘সিধ্য’। পুষ্যার তারামণ্ডলটিকে একটি পুষ্পগুচ্ছের মত দেখায়। তাই অনেকে মনে করেন ‘পুষ্পা’ শব্দটি ‘পুষ্যায়’ রূপান্তরিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, তিষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতি প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ বৃহস্পতি প্রথম এই পুষ্যা নক্ষত্রেই আবিষ্কৃত হয়। পুষ্যার দেবতা তাই ‘বৃহস্পতি’।

শ্রীপতি, লল্ল ও বরাহমিহির মনে করেন পুষ্যা নক্ষত্রে তিনটি তারা আছে। তিনটি তারায় শরের অগ্রভাগের কল্পনা করা হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিষ্য নক্ষত্র একবচনান্ত। তিষ্য হল পুষ্যা। সুতরাং পুষ্যা এক বচনান্ত। পরবর্তীকালে এক বচনান্ত পুষ্যার পরিবর্তন ঘটে। এটিকে তিন তারকা সমন্বিত শরাগ্র আকৃতির নক্ষত্র বলেই ধরা হয়ে থাকে। বাকশক্তি দেন বলে পুষ্যানক্ষত্র ঋগ্বেদের মহাপ্রজ্ঞা ‘সরস্বতী’। “চৈতন্যবতী ধ্যানের পোষয়িত্রী দেবী সরস্বতী আমাদের চেতনার প্রকর্ষ পোষণ করুন”। (ঋগ্বেদ ঃ 6ষ্ঠ মণ্ডল ঃ 61তম সূক্ত ঃ 4র্থ ঋক)। বিশ্বের চেতনাদাত্রী সরস্বতী তথা বৃহস্পতির মহিমা প্রকাশ করছে এই নক্ষত্র। এটির পুরোটাই কর্কট রাশির অন্তর্ভুক্ত।

ক

পুষ্যা

[9] **সর্পরুদ্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের নবম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম ‘সর্পরুদ্র’। একাদশ রুদ্রের এক রুদ্র হল ‘সর্প’। এটি সাপের মত দেখতে। তাই এটি সর্পরুদ্র। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম ‘অশ্লেষা’। ইংরেজীতে নাম ‘Hydra’। এটি পুরোটাই কর্কট রাশির মধ্যে অবস্থিত। খ-গোলের $106^0\ 40^/$ থেকে 120^0 অবধি অশ্লেষার অবস্থান। ঋগ্বেদ বলছে, “সূর্য তুল্য সুজ্যোতিষ্ক অগ্নিজিহ্বা দ্বিজন্মগ্রাহী ঋতসাপ, সত্যপালক এই দক্ষপিতৃক নাগ তার সুমহান তেজোবীথি দেবতাদের সর্বাপেক্ষা অন্তে প্রয়াণ করতে দিয়েছে।” [ঋগ্বেদ ঃ 6ষ্ঠ মণ্ডল ঃ 50তম সূক্ত ঃ 2য় ঋক]

কর্কট রাশির এক নাম 'কুলীর'। অশ্লেষার এক নামও কুলীর। এই কুলীর ভাগবতের 'কালীয় নাগ'। চন্দ্রবংশধর কৃষ্ণ যমুনা নিবাসী কালস্বরূপ কালীয় নাগের মাথায় চড়ে নেচে তাকে দমন করেছিলেন, প্রাণে মারেন নি, সাগরে চলে যেতে বলেছিলেন। অশ্লেষা বা কালীয়নাগ সাগরে চলে এসেছে মহাকাশ সাগরে। মাথাটা তার কর্কট রাশি। চন্দ্র এখনও তার মাথায় চড়ে অর্থাৎ কর্কটরাশিতে চড়ে তাকে অতিক্রম করেন।

পুষ্যা নক্ষত্রের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এবং সিংহরাশির নক্ষত্র মণ্ডলের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে অশ্লেষার অবস্থান। নির্মেঘ আকাশে এটিকে সহজেই দেখা যায় চৈত্রমাসের সন্ধ্যাকালে। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটি অশ্লেষা সম্বন্ধে বলেছে ঃ

"শ্লিষ্ ধাতু থেকেই অশ্লেষা নক্ষত্রের নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। শ্লিষ্ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গ ন। সর্পের স্বরূপ, নিজ দেহকে আলিঙ্গন করে সে অবস্থান করে। সে দিক দিয়ে তারকাযোগে নক্ষত্রটির আকৃতি কল্পনায় সর্পের সঙ্গে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য আছে। নক্ষত্রটির দেবতাও সর্প। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অশ্লেষা Hydra মণ্ডলের তারকা নিয়ে গঠিত এবং Hydra কথাটির অর্থ হল জলসর্প। অশ্লেষার আর একটি অর্থ থাকতে পারে। সেটি অ-শ্লেষা বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। নক্ষত্রটিকে মস্তকহীন সর্পের ন্যায়ও কল্পনা করা চলে।"

বরাহমিহির অশ্লেষায় 6টি তারকার কল্পনা করেন। শ্রীপতি এবং লল্লের অভিমত অনুসারে নক্ষত্রটিতে 5টি তারকা। এই 5টি তারায় চক্রের কিংবা সর্পের ফণার চিত্ররূপ কল্পনা করা হয়।

সর্পরুদ্রকে বা অশ্লেষাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে চাঁদ সওদাগরের কাহিনী। সেখানে চন্দ্র হল চাঁদসওদাগর, অশ্লেষা হল মনসাদেবী। আবার জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ এবং আস্তিকের সেঁখানে আসা ও সর্পকুল রক্ষা করা —এই সব ঘটনার সঙ্গে অশ্লেষা নক্ষত্র কোন না কোনওভাবে জড়িয়ে আছে। পুরাণে সর্পজননী কদ্রুর কাহিনী ও মহাভারতের অর্জুনের স্ত্রী ও ইরাবানের মা উলুপীনাগিনীর আখ্যান—এ সবেরই একটা নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব অশ্লেষাকে জড়িয়ে নিয়ে।

[10] **মঘবন্ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের দশম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম 'মঘবন্'। এর সৈদ্ধান্তিক নাম 'মঘা'। ইংরেজী নাম Regulus কিংবা Alpha Leonis । সবুজাভ মঘবন সূর্যের 100 গুণ দীপ্তি সম্পন্ন। এর দূরত্ব প্রায় 71আলোকবর্ষ। মঘবন্ একটি যুগ্মতারা [Binary Star]। এর সাথী তারাটিকে দূরবীক্ষণে দেখা যায়। ঋগ্বেদের 6ষ্ঠ মণ্ডলের 27-তম সূক্তের তৃতীয় ঋক বলছে ঃ

"তোমার পূর্ণ মহিমা বিদিত নহি, নতুনের ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়সামর্থদান আর কোনও দেবে দৃশ্য হয় না, মঘবন্ তোমার মঘবত্বের সমানশক্তি নেই, ঐশ্বর্যাধিক ঐশ্বর্যও নেই।"

মঘা অশ্লেষার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এর পশ্চিমে কর্কট রাশি এবং পূর্বে কন্যারাশি। মঘার তারকাগুলি উজ্জ্বল তাই এটি সহজে দেখা যায়। বৈশাখ মাসের প্রথমদিকে মঘাকে সন্ধ্যার সময় মধ্যাকাশে দেখা যায়। সিংহরাশিতে এই নক্ষত্রের অবস্থান। এর $13^0 20'$ অংশ সিংহ রাশির শুরু থেকে অর্থাৎ খ-গোলের 120^0 থেকে $133^0 20'$ অবধি বিস্তৃত। মহ্ ধাতুর অর্থ পূজা। এই ধাতু থেকেই মঘবন্ শব্দ এবং সেই শব্দ থেকেই মঘা নামের উৎপত্তি। মঘার দেবতা পিতৃগণ। উত্তরায়ণের প্রাচীন

নাম 'দেবযান' এবং দক্ষিণায়নের নাম 'পিতৃযান'। মঘা নক্ষত্রে পিতৃযানের সূত্রপাত বলেই মঘার অধিপতি পিতৃগণ এবং তার দেবতাও তাই পিতৃগণ। মঘার অন্য নাম অঘা। অঘা শব্দের অর্থ পাপ বা দুঃখ। তাই সম্ভবত মঘাকে অশুভ নক্ষত্র বলে মনে করা হয়।

মঘা নক্ষত্র 5টি তারকার সমষ্টি। 'খণ্ডখাদ্যক' অবশ্য মঘা 6টি তারার সমন্বয়ে গঠিত বলেছে। মঘার আকৃতি লাঙ্গলাকার। মৎস্যপুরাণ বলছে ঃ

মঘা

"অগস্ত্য নক্ষত্রের উত্তরে দেবর্ষি সেবিত যে মঘানক্ষত্র আছেন, জন্মে ও নিধনে যিনি আশিষ বিশদীকৃত করেন সেই প্রারম্ভ ও অন্তকর পিতৃগণ নক্ষত্রের পন্থা মঘার দক্ষিণভাগে, বৈশ্বানরপথের বর্হিভাগের এই পন্থার নাম পিতৃযান।"

মঘাকে ঋগ্বেদ অঘা বললেও প্রকৃতপক্ষে মঘা একেবারে দুঃখদায়ক কিংবা পাপদায়ক নক্ষত্র নয়। আর 26 টি নক্ষত্রের মতই মঘাও একটি নক্ষত্র। সিংহ রাশিস্থ এই নক্ষত্রটি যে মানুষের কেবল খারাপই করে তা নয় কিছু ভালোও করে। সিংহরাশির প্রথম নক্ষত্র হল মঘা বা মঘবন্।
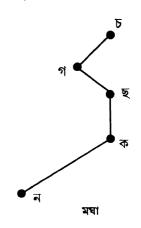
[11] **ভগ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের একাদশ নক্ষত্রটির ঋগ্বেদীয় নাম 'ভগ'। দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য হল ভগ। একে 'অর্জুনী' নামেও ডেকেছে ঋগ্বেদ। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম 'পূর্ব ফাল্গুনী'। পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের সব তারাগুলিকে ধরলে এর ইংরেজী নাম The Sickle। কিন্তু শুধু মেরুদণ্ডের প্রান্তের তারাটির নাম Leonis বা Zosma। মঘা নক্ষত্রের পরবর্তী নক্ষত্র পূর্ব ফল্গুনী বা পূর্ব ফাল্গুনী। পূর্ব ফাল্গুনী তাই একাদশ নক্ষত্র। এটি মঘা নক্ষত্রের কিছুটা পূর্বে এবং উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রের সামান্য পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রটি খুবই উজ্জ্বল। একে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম অংশে সন্ধ্যার আকাশে সরাসরি মাথার উপরে এটি দেখা যায়।

'ফল্গুনী' মানে মনোহর। ঋগ্বেদে ফল্গুনী হল 'অর্জুনী'। অর্জুনীর অর্থ উজ্জ্বল। পূর্ব ফাল্গুনীতে রয়েছে দুটি তারকা। বরাহ-মিহির অবশ্য আটটি তারার কথা বললেও তার আকৃতির কথা বলেন নি। পূর্বফাল্গুনীর দুটি তারকায় অর্জুন বৃক্ষের উন্নত আকৃতির কল্পনা করা চলে। তাই নক্ষত্রের নাম অর্জুনী বলেছে ঋগ্বেদ। পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের দেবতার নাম 'ভগ'। ঋতু বিধান করেন আদিত্য। ভগ হলেন দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য। ভগ শরৎ ঋতুর আদিত্য। পূর্বফাল্গুনী শরৎ ঋতু আনে। পূর্বফাল্গুনীর দেবতা তাই ভগ।

পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের পুরো 13°20′ অংশই পড়ে সিংহরাশিতে। আকাশের 133°20′ থেকে 146°40′ পর্যন্ত পূর্ব-ফাল্গুনী নক্ষত্রের বিস্তার। সিংহরাশিতে রয়েছে মঘা এবং পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র দুটি এবং উত্তর ফাল্গুনীর 3°20′ বা এক চতুর্থাংশ মাত্র। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এক সরলরেখায় এলে পূর্ণিমা হয়। পূর্ণচন্দ্র যে নক্ষত্রে যুক্ত হয় সেই নক্ষত্রের নাম অনুসারে মাসের নাম হয়। পূর্ব ফাল্গুনীতে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র অবস্থান করে বলে এই মাসের নাম ফাল্গুন। চিত্রা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয় বলে শেষ মাসের নাম চৈত্র। ভগ

পূর্ব ফাল্গুনী

বসন্তসখা, মনোভব, স্মর, অর্থাৎ পুষ্পধন্বা মদন। ভগ যৌবনশক্তি। অবিদ্বিষ্ট অক্ষুণ্ণ যৌবশক্তি ধীপ্রকর্ষ ও চিত্তের সংবৃত্তিতে প্রকাশমান হয়। ঋগ্বেদ বলছে, "যা, চিত্ত ও ধীতে পূর্বে নিদ্রিত ছিল তা এই ভগ শক্তির অবিদ্বিষ্ট প্রকাশমানতায় হস্তদ্বয়ে ধৃত হয়।" [1ম/24 সূক্ত/4ঋক]। 'হে ভগ, ভক্তের প্রতি তোমার রক্ষণ এবং অশেষ মোদন মূর্ধা স্থানীয় ঐশ্বর্যলাভের কারণ।' [1ম/24 সূক্ত/5 ঋক]।

[12] **অর্যমা ঃ**

নক্ষত্রচক্রের দ্বাদশ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম অর্যমা। সৈদ্ধান্তিক নাম উত্তর ফল্গুনী বা উত্তর ফাল্গুনী। এর ইংরেজী নাম Denebola। এটি 43 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর বিস্তার খ গোলের 146°40′ থেকে 160° অংশ অবধি। এটির একচতুর্থাংশ অর্থাৎ 3°20′ মাত্র সিংহরাশিতে। বাকী 10° অংশ পড়েছে কন্যারাশিতে। এটি আছে সিংহরাশির পুচ্ছের অগ্রভাগে। কন্যারাশির নক্ষত্রমণ্ডলীর সামান্য পশ্চিম দিকে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রটির অবস্থান। নক্ষত্রটি তেমন উজ্জ্বল নয়। কিন্তু নির্মেঘ আকাশে এটিকে দেখা যায়।

উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে 2টি তারা আছে। এ নিয়ে আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের মতভেদ আছে। এই মত পার্থক্যের কথা অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে যেভাবে দেখিয়েছেন, তা এই রকম ঃ

"বরাহমিহির, শ্রীপতি, লল্ল এবং ব্রহ্মগুপ্ত উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রটিতে 2টি তারকা আছে বলে মনে করেন। এই 2টি তারার যোগতারা সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। কোলব্রুক, বেণ্টলি, বার্জেস সকলেই Leo মণ্ডলের অর্থাৎ সিংহরাশির পুচ্ছপ্রান্তের খ তারকাটিকে যোগতারা বলে মনে করেছেন। এটি দ্বিতীয় মাত্রার তারকা। কিন্তু উত্তরফাল্গুনীর অন্য তারকা কোনটি?

সূর্যসিদ্ধান্তে আছে মণ্ডলের উত্তর প্রান্তস্থিত তারাটি যোগতারা। সুতরাং দ্বিতীয় তারকাটি Leo মণ্ডলের অর্থাৎ সিংহরাশির **খ**-এর দক্ষিণস্থ কোনো তারকা। সেটি Virgo মণ্ডলের অর্থাৎ কন্যারাশির **খ** হতে পারে, **ঢ** বা **ড** হওয়াও অসম্ভব নয়। এই তারাগুলির কোনোটিই বিশেষ উজ্জ্বল নয়। কেউ কেউ উত্তর প্রান্তস্থিত তারাকে যোগতারা হিসেবে সূর্যসিদ্ধান্তের উল্লেখকে ভ্রমপূর্ণ মনে করেন। তাঁরা সিংহরাশির **খ** তারার ঊর্ধ্বস্থ সিংহরাশির 93 সংখ্যক তারাকে অন্য তারা হিসেবে মনে করেন। তারকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফল্গুনীরই ভারসদৃশ আকৃতি এবং ফল্গুনীদ্বয়ে শয্যাকার মনে রাখা হয়।

খ (সিংহ)
খ (কন্যা)
উত্তরফাল্গুনী
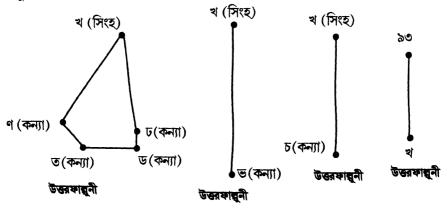
শাকল্য সংহিতায় আছে, উত্তরফাল্গুনীতে 5টি তারকা। যোগতারা Leo মণ্ডলের খ তারকা ছাড়া আর 4টি তারকা Virgo মণ্ডলের মস্তক সংলগ্ন তারকাগুচ্ছ। এতে আছে ণ, ত, ড, ঢ। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে এগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।"

উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের দেবতার নাম অর্যমা। পূর্বফাল্গুনীর দেবতা ভগ যেমন একটি আদিত্য, অর্যমাও তেমনি একটি আদিত্য। ঋতু বিধানের অধিপতি হিসেবেই আদিত্যের পরিচয়।

[13] **সবিতা ঃ**

নক্ষত্রচক্রের ত্রয়োদশ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম সবিতা। দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য হল সবিতা। সমান উজ্জ্বল পাঁচটি তারা একবৃন্তে পল্লবস্তবকের ন্যায় সাজান। এর সৈদ্ধান্তিক নাম হস্তা নক্ষত্র। ইংরেজী নাম Corvi। খ-গোলের 160° থেকে 173°20′ অবধি এর বিস্তার। এই নক্ষত্রটির পুরোটাই রয়েছে কন্যারাশিতে। কন্যারাশির ঋগ্বেদীয় নাম ভার্গবী। সবিতা বা লক্ষ্মীর নামও ভার্গবী। লক্ষ্মীর আরেক নাম কমলা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 35 সূক্তের 2 ঋক বলছে ঃ

"মর্ত্যের জন্য দিব্যলোকের বৈভব আকর্ষণ করে অপিচ মৃত্যু-নিবেশিত না করে চিরবর্তমান, রথাসীনা হিরন্ময়ী সবিতা ভুবনকে অবলোকন করে যান।" [1ম/35 সূক্ত/2 ঋক]

উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের পরের নক্ষত্র এটি। এর উত্তর-পশ্চিমে তাই উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র এবং উত্তরে দীর্ঘস্থান জুড়ে আছে কন্যারাশি বা Virgo মণ্ডল। আকাশে এটিকে সহজেই দেখা যায়। হস্তা নক্ষত্রটি জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যার আকাশে মাথার উপরে ঈষৎ দক্ষিণ দিক চেপে দেখতে পাওয়া যায়। হাতের পাঁচটি আঙুলের আকারে 5টি তারা রয়েছে হস্তা নক্ষত্রে। তাই এই নক্ষত্রের নাম হস্তা। নক্ষত্রটির অধিপতি সবিতা। এটি একটি আদিত্য। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম আদিত্য সবিতা শীত ঋতুর আদিত্য।

হস্তানক্ষত্র যে হস্তাকৃতি বিশিষ্ট এবং এতে 5 তারা আছে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তা বলেছেন। বরাহ মিহির, শ্রীপতি, লল্ল হস্তার হস্তাকৃতি ও তার দুটি তারার কথা বলেছেন। বরাহমিহির, শ্রীপতি, লল্ল হস্তার হস্তাকৃতি ও তার 5টি তারার কথা বলেছেন। শাকল্যসংহিতাও পাঁচটি তারার কথা বলেছে। তবে খণ্ডখাদ্যক হস্তার হস্তাকৃতির কথা বললেও এতে 6টি তারার অবস্থানের কথা বলেছে। হস্তার তারাগুলি Corvus মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। তবে স্বীকৃত হল, হস্তার পাঁচটি তারা হাতের আকৃতি নেওয়ায় এটির নাম হয়েছে হস্তা নক্ষত্র। এই তারাগুলির মধ্যে চতুর্থমাত্রার দুটি তারকা আছে। দুটি তারা পঞ্চম মাত্রার খুবই অনুজ্জ্বল। অপর দুটি তারা তৃতীয় মাত্রায়। 6টি তারা ধরলে পাঁচটি তারা পাঁচটি আঙ্গুল এবং একটি তারা হাতের তালু কল্পনা করতে হয়। সবিতার কাছে এই প্রার্থনা জানাই "দেব অভিলষিতা ঈশানের বরণীয়া হে সবিতা তোমার নিকট সর্বদা পালন ও ভাগ্যের আকাঙক্ষা করি।" [ঋগ্বেদ ঃ 1/24/3]।
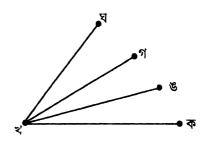
[14] **ত্বষ্টা ঃ**

নক্ষত্রচক্রের চতুর্দশ নক্ষত্র হল ঋগ্বেদীয় 'ত্বষ্টা'। এই ত্বষ্টাও আদিত্য। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম চিত্রা নক্ষত্র। ইংরেজীতে এর নাম Spica বা Alpha Virginis। সূর্যের প্রায় 1500 গুণ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট এই ত্বষ্টা বা চিত্রা নক্ষত্র। এটি রয়েছে প্রায় 262 আলোকবর্ষ দূরে। স্বর্ণাভ এই নক্ষত্রটি একটি

যুগ্মতারা। এরা পরস্পরকে চারদিনে পরিক্রমা করে। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিত্রানক্ষত্রটিকে মৃগসদৃশ কল্পনা করেছেন। চিত্র অর্থে উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। ঔজ্জ্বল্যের প্রাবল্যের জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে চিত্রা। চিত্রার দেবতা ত্বষ্টা। ত্বষ্টাকে নিয়ে ঋগ্বেদে বহু সূক্ত আছে। বিভিন্ন কাহিনীতে ত্বষ্টা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে চিত্রা নক্ষত্রই ত্বষ্টা।

চিত্রা নক্ষত্রের অবস্থান 173°20′ থেকে 186°40′ পর্যন্ত। এর খানিকটা অর্থাৎ 6°40′ অংশ কন্যারাশিতে এবং বাকী অর্ধেকটা অর্থাৎ 6°40′ পড়েছে তুলারাশিতে। এটিকে দেখা যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যাকাশে প্রায় মাথার উপরে সামান্য দক্ষিণ দিক চেপে। সহজেই এটিকে দেখা যায়, কারণ এটি খুবই উজ্জ্বল নক্ষত্র। চিত্রা নক্ষত্রে একটি তারা রয়েছে। চিত্রা তারাটি পড়েছে কন্যারাশিতে। আকাশের 20টি সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাদের মধ্যে চিত্রা ষোড়শতম। বরাহমিহির, শ্রীপতি, লল্ল, শাকল্য সংহিতা এবং খণ্ডখাদ্যক সকলেই চিত্রাতে একটা তারার কথাই বলেছেন। চিত্রাকে বা ত্বষ্টাকে নিয়ে গ্রহসৃষ্টির কাহিনী পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদে ত্বষ্টা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"ত্বষ্টা যে বজ্রাগ্নির হিরণ্যতেজ ধারণ করেন এই স্বর্গ নীহারিকা আবর্তিত সহস্র তীক্ষ্ণমুখ তেজ নিরুদ্ধ নীহারিকা বাষ্প বৃত্রকে কর্তিত করেছে, এই সুকৃতে ইন্দ্র অবধি অর্ণবে নীহারিকা নির্মুক্ত জ্যোতিষ্কপ্রবাহ দ্যুতি বিকীর্ণ করছে।" [ঋগ্বেদ ঃ 1/85/9]।

ঋগ্বেদের 6ষ্ঠ মণ্ডলের 47 সূক্তের 19 ঋক বলছে ঃ

"ভূয়িতেজযোগে হরিদ্বর্ণ রথে ত্বষ্টা এই রাজিত কোন্ বিশ্বহা বিদ্বেষী পক্ষ আসতে পারে এই ঊর্ধ্বাসীন সমীপে সহস্র সৌরতেজ সান্নিধ্যে?"

চিত্রা বিশাল নক্ষত্র বা তারা হলেও এটি কখনই আকাশের 13°20′ অংশ জুড়ে নেই। কোনও তারার পক্ষেই তা সম্ভব নয় দূরত্ব নিবন্ধনের কারণে। তবে নক্ষত্রচক্রের 13°20′ ভাগ রাখা হয়েছে চিত্রার জন্য অন্য 26টি নক্ষত্রের মতই। 360° খ-গোলককে 27টি সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে 13°20′ অংশই আসে।

[15] **মরুত্মান্ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের পঞ্চদশ নক্ষত্রটির ঋগ্বেদীয় নাম মরুত্মান্। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ এর নাম দিয়েছে স্বাতী। ইংরেজী নাম Arcturus বা Alpha Bootis। সূর্যের 23 গুণ বড় স্বাতীর বর্ণ কমলাভ। এর দূরত্ব প্রায় 71আলোকবর্ষ। উনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে মরুত্মান হল প্রাণবায়ু। স্বাতীর দেবতা পবন। 'অত্' ধাতু গতিমূলক। স্বাতী হল স্বা + অতি, অর্থাৎ স্বীয় গতিবেগে প্রস্থিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মাণে স্বাতীর অন্য নাম 'নিষ্ট্যা'। 'ষ্টিব্' ধাতুর অর্থ নিরসন, নিষ্ট্যা অর্থ যা দূরে প্রেরিত। সম্ভবতঃ স্বাতী নক্ষত্র ক্রান্তিবৃত্ত থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত বলেই স্বাতীর এই নামকরণ।

চিত্রার পরবর্তী নক্ষত্র স্বাতী। পঞ্চদশ নক্ষত্র। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে চিত্রা নক্ষত্র এবং এর দক্ষিণ-পূর্বে আছে তুলারাশি এবং বিশাখা নক্ষত্র। আকাশে স্বাতী নক্ষত্র বিশেষ উজ্জ্বল এবং সহজেই দেখা যায়। এটিকে আষাঢ় মাসে রাত্রির প্রথম প্রহরে মধ্য আকাশে সরাসরি মাথার উপর দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্রা নক্ষত্রের মত স্বাতী নক্ষত্রেও একটি মাত্র তারকা আছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সকলেই সে কথা স্বীকার করেন। তারকাটি মুক্তাবৎ বা প্রবালের অনুরূপ। তারকার রঙ এবং ঔজ্জ্বল্যের জন্যেই এ জাতীয় সাদৃশ্যবোধ। স্বাতী নক্ষত্রে যে তারকাটি আছে সেটি Bootes মণ্ডলের ক তারকা। আকাশে

সর্বোজ্জ্বল প্রথম 20টি তারকা মধ্যে এটি ষষ্ঠ, 71 আলোকবর্ষ দূরে এটির অবস্থান। স্বাতী নক্ষত্র একটি মাত্র তারকাযুক্ত হওয়ার জন্যই ওই তারকাটিই মণ্ডলের যোগতারা।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের, 23 সূক্তের প্রথম ঋক বলছে ঃ

"বায়ুগণ! আশীর্বন্ত আপনারা তীব্র বেগে আগত হয়ে এই মহতি সুত সোমসত্র পান করে প্রস্থিত হোন্।" প্রাণবায়ু বস্তু অনুস্যূত হলে পার্থিব জীবদেহ সবিত হয়, তাই প্রাণবায়ুর অন্য নাম সাবিত্রী। সাবিত্রী ও যমকে নিয়ে যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই স্বাতীনক্ষত্র। 'দেবীসূক্ত'-এ বাক্ বলেছেন,

"আমার এই বাতাসের ন্যায় প্রবাহ অগ্রসরমাণ বিশ্বের সকল ভুবনে, দিবি পার হয়ে এই পৃথিবীর তাবতকালের মহনীয়তার পর সম্ভূত হয়েছে।" মরুস্থানকে নিয়ে কয়েকটি সূক্ত রয়েছে ঋগ্বেদে। সেগুলির প্রায় সবগুলিতেই মরুস্থান্ বা স্বাতী নক্ষত্র প্রাণবায়ুর দ্যোতক। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও স্বাতীকে তেমনই গণ্য করা হয়। স্বাতীর বিস্তার 186°40′ থেকে 200° অবধি।

[16] **ইন্দ্রাগ্নি ঃ**

নক্ষত্রচক্রের ষোড়শ নক্ষত্র হল ঋগ্বেদীয় 'ইন্দ্রাগ্নি'। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম বিশাখা নক্ষত্র। **খ**-গোলের 200° থেকে 213°20′ অবধি এই নক্ষত্রের বিস্তার। বিশাখার ইংরেজী নাম Corona Borealis এবং Serpens। বিশাখা ষোড়শ নক্ষত্র। এর দক্ষিণ-পূর্বে বৃশ্চিক রাশি ও অনুরাধা নক্ষত্র এবং উত্তর-পশ্চিমে কিছুটা দূরে স্বাতী নক্ষত্র অবস্থিত। বিশাখা খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়। তবু একে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসে এটিকে মধ্যগগনে মাথার উপরে কিছুটা দক্ষিণ ঘেঁষে লক্ষ্য করা যায়।

'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"বিশাখাকে বিশ্লেষণ করলে শাখাযুক্ত বা শাখাশূন্য দুই রকম অর্থই হতে পারে। অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে শাখাযুক্ত অর্থ সংগত বলে মনে হয়। কারণ যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রারম্ভে বাসন্ত বিষুবদ্দিনের সূত্রপাত, তখন বিশাখা নক্ষত্রের মধ্যস্থলে শারদ বিষুবদ্দিনের শুরু। অর্থাৎ এই মধ্যস্থল থেকেই যেন বিশাখা নক্ষত্রটি কর্তিত হয়ে 2টি শাখায় দুই দিকে বিভক্ত। বিশাখার একটি নাম কার্তিকেয় থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

বৈদিক গ্রন্থসমূহে বিশাখার দ্বিবচনান্ত বিশাখে পদ লক্ষ্য করা যায়। বিশাখা নক্ষত্রের দেবতাও 2টি, ইন্দ্র ও অগ্নি। সুতরাং এক সময়ে বিশাখা নক্ষত্রে 2টি তারা গণ্য হত। শাকল্য সংহিতায় বিশাখা নক্ষত্রে 2টি তারা। খণ্ডখাদ্যকেও 2টি তারকায় বিশাখা নক্ষত্র গঠিত। 2টি তারার ক্ষেত্রে অবস্থান এবং ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে Libra মণ্ডলের অর্থাৎ তুলা রাশির প্রথম 2টি তারকা **ক** এবং **খ** ছাড়া অন্য তারকার কথা মনে হয় না। 2টি তারকাই তৃতীয় মাত্রার কিন্তু **খ** অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল।

বিশাখা

শ্রীপতি এবং লল্ল বিশাখা নক্ষত্রে 4টি তারকা এবং বরাহমিহির বিশাখা নক্ষত্রে 5টি তারকার কথা
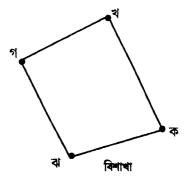
উল্লেখ করেছেন। আকৃতিতে নক্ষত্রটি তোরণসদৃশ। আকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে 4টি তারার ক্ষেত্রে বার্জেস **ক, খ** তারা ছাড়া **গ** এবং **ঝ** তারা 2টিকে গ্রহণ করেছেন। **গ** তারকা ঔজ্জ্বল্যে চতুর্থ মাত্রার, **ঝ** পঞ্চম মাত্রার। Libra মণ্ডলে, **ক, খ, ঝ, গ** সন্নিহিত অনেকগুলি অনুজ্জ্বল তারকা আছে। 5টি তারকায় বিশাখা নক্ষত্রের কল্পনার ক্ষেত্রে সঠিক কোন্ কোন্ তারকায় বিশাখা নক্ষত্র গঠিত তা নির্দেশ করা কঠিন।"

ঋগ্বেদের 5ম মণ্ডলের 46-তম সূক্তের 3-য় ঋক বলছে, "এই ইন্দ্রাগ্নি মিত্র, বরুণ, অদিতির স্বর্গ, দ্যাবাপৃথিবীর মরুৎ, পর্বত, অপের হোমানল, বিষ্ণু, পূষণ, ব্রহ্মণস্পতি, ভগ, সবিতা আদি সর্বদেবতার শক্তির সংহতি।" [5/46/3]। ঋগ্বেদ বলছে ঃ "উগ্রা বিঘ্ননাশিনী করুণাময়ী ইন্দ্রাগ্নি আমাদের আহ্বানে এমনই করুণা তুমি আমাদেরও কর।" [6ম / 60 সূক্ত / 5ম ঋক]। ঋগ্বেদের 6ষ্ঠ মণ্ডলের 59তম সূক্তের 9ম ঋক বলছে ঃ "দিব্যলোকের ও পার্থিবের তারুণ্য এবং দ্যুতি, সমস্ত ঐহিক নিধির প্রদাতা ইন্দ্রাগ্নি বিশ্বায়ু অপোষণ করেন না।" [6ম / 59 সূক্ত / 9 ঋক]।

[17] **মিত্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের সপ্তদশ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম 'মিত্র'। দ্বাদশ আদিত্যের একটি হল আদিত্য নক্ষত্র মিত্র। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম অনুরাধা নক্ষত্র। এর ইংরেজী নাম 'Scorpionis'। এর বিস্তার 213°20′ থেকে 226°40′। অর্থাৎ এই নক্ষত্রের পুরোটাই পড়েছে বৃশ্চিক রাশিতে। এটি বিশাখার পরবর্তী নক্ষত্র। বিশাখার দক্ষিণ পূর্বে এর অবস্থান এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। নক্ষত্রটি উজ্জ্বল। তাই একে সহজে দেখা যায়। শ্রাবণ মাসে রাত্রির প্রথম প্রহরে এই নক্ষত্রটিকে দক্ষিণের আকাশে সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

অনুরাধা হল রাধাকে যে অনুসরণ করে বা অনুগমন করে সে অনুরাধা। বিশাখা নক্ষত্রকে 'রাধা' নামেও ডাকা হয়। সুতরাং বিশাখা নক্ষত্রকে অনুগমন করে বলেই মিত্র নক্ষত্রের নাম সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ অনুরাধা রেখেছিল। অনুরাধা নক্ষত্রের দেবতার নাম মিত্র। মিত্র গ্রীষ্মঋতুর আদিত্য। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থটি' বলছে ঃ

"শাকল্য সংহিতায় অনুরাধা নক্ষত্রে 3টি তারার কথা আছে। 3টি তারকায় নক্ষত্রটি বলির আকারে কল্পিত। বলি অর্থ পূজা, নিবেদন বা ভক্তপুঞ্জ। কিন্তু আকৃতি কল্পনায় বস্তুবাচক শব্দে রূপান্তর প্রয়োজন। বলির অর্থের সঙ্গে নৈবেদ্যের সম্পর্ক আছে। নৈবেদ্যের থালির জ্যা-আকার। অবস্থিতির দিক দিয়ে এবং ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে Scorpius মণ্ডল অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশির **খ, ঘ** এবং **ত** তারকা নিয়ে জ্যা-আকার।

শ্রীপতি, লল্ল, বরাহমিহির অনুরাধা নক্ষত্রে 4টি তারকার উল্লেখ করেন। শ্রীপতি 4টি তারকাতেও বলির আকৃতি নির্দেশ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে 4টি তারকায় এই নক্ষত্রের সর্পাকার কল্পনা করা হয়। কোন্ 4টি তারকায় সর্পাকারের কল্পনা?

অনুরাধা

4টি তারার ক্ষেত্রে **ঘ, খ, ত**-এর সঙ্গে অন্য কোনো প্রত্যক্ষযোগ্য তারকা গ্রহণ করা চলে। কিন্তু সেই তারকা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। অনুরাধা নক্ষত্রের মধ্যতারকা যোগতারা। তিনটি তারার ক্ষেত্রে

মধ্যতারকা Scorpius মণ্ডলের **ঘ** তারকা। সূর্যসিদ্ধান্তে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের যে উল্লেখ আছে, তা থেকেও দেখা যায় যে, অবস্থানের দিক দিয়েও **ঘ** তারকাই যোগতারা। কিন্তু 4টি তারকার ক্ষেত্রে মধ্যতারকা কোনটি? অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের বিচারে সে ক্ষেত্রেও **ঘ** তারকা যোগতারা। কিন্তু তারকামণ্ডলে তার মধ্যস্থানে অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্ভবত মণ্ডলের উত্তর প্রান্তস্থ **খ** তারকা সন্নিহিত **ভ** 1 তারকাটি গ্রহণ করেছিলেন। তখন আকৃতির দিক দিয়ে সর্প কল্পনা অসংগত নয়। **ভ** 1 তারকাটি চতুর্থ মাত্রার। এটি প্রত্যক্ষযোগ্য। **খ, ঘ, ত** সন্নিহিত চতুর্থ মাত্রার এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল তারকা আর নেই। যোগতারা **ঘ** দ্বিতীয় মাত্রার, **খ** এবং **ত** তৃতীয় মাত্রার। গণক কালিদাস অনুরাধা নক্ষত্রকে সর্পাকৃতি এবং সপ্ত তারকাবিশিষ্ট বলে মনে করেন। এ ক্ষেত্রে মহাকাশে পঞ্চম মাত্রার তারকা গ্রহণের প্রয়োজন। **ঘ** তারকার উভয় পার্শ্বে 3টি তারকা আছে—সেই তারকা সমন্বয়ে সপ্ততারকাবিশিষ্ট অনুরাধা মণ্ডলের কল্পনা মনে হয়।"
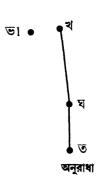
অনুরাধা

[18] **ইন্দ্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের অষ্টাদশ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম ইন্দ্র। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম 'জ্যেষ্ঠা'। ইংরেজীতে এর নাম Antares। বৃশ্চিক আকৃতির যে নক্ষত্রমণ্ডলীর অর্ধবৃত্তাকারে বিন্যস্ত উজ্জ্বল তারকাবলী মিত্র বা অনুরাধা নক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ, তারই হৃদপিণ্ড স্বরূপ রক্তাভ উজ্জ্বলতম তারার নাম ঋগ্বেদের ইন্দ্র এবং সিদ্ধান্তের জ্যেষ্ঠা। ইন্দ্র প্রথম প্রভার তারা। এটি যুগ্মতারা। এর সঙ্গী তারাটিকে খালিচোখে দেখা যায় না, দূরবীনে দেখা যায়। কারণ এই সাথীটি একটি সপ্তম মাত্রার তারা। এটি সবুজাভ তারা। লাল-রঙ তারা ইন্দ্রকে যখন চাঁদ আড়াল করে তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য ওই সবুজাভ সাথীটিকে দেখা যায়। নয়তো ইন্দ্রের দ্যুতিতে এই তারাটির আলো আচ্ছন্ন থাকে। জ্যেষ্ঠার আয়তন আর্দ্রার প্রায় তিনগুণ।

অনুরাধা নক্ষত্রের কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে এবং মূলা নক্ষত্রের কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অবস্থান। এটি অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশিষ্ট। ফলে, এটিকে সহজেই দেখা যায়। ঋগ্বেদের প্রায় 260টি সূক্ত রয়েছে ইন্দ্রের স্তুতি করে। এই সূক্তগুলি এমন একজন ইন্দ্রের কথা বলছে যিনি সম্ভবতঃ আর্যজাতির অধিনায়ক ছিলেন। ইন্দ্রকে নক্ষত্র হিসাবে পাওয়া যায় খুব কম সূক্তেই। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের 46 সূক্তের 5-তম ঋক বলছে ঃ

'ইন্দ্র জ্যেষ্ঠের ন্যায় স্বয়ম্ভর ওজস্বিতায় পরিপূর্ণ শ্রবণ যেমন স্বর্গের চিত্র বজ্রহস্ত পৃথিবীও তেমন সুশিপ্র করেন প্রাবৃটে।" আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 32 সূক্তের দশম ঋক বলছে ঃ

"নিবেশহীন নামরহিত দীর্ঘতম প্রাপ্ত ইন্দ্রশত্রু বৃত্তের শরীর নিমগ্ন করে' অবিশ্রান্ত জলস্রোত চিরকাল বিচরণ করছে।" ইন্দ্রের বৃত্র হননের কথা ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে নানাভাবে বর্ণিত।

ঋগ্বেদের বহু ঋকে ইন্দ্রকে বৃত্রহা বলা হয়েছে। 'বৃত্র' হ'ল নক্ষত্রসৃষ্টিকারী নীহারিকার বৈদিক নামাবালীর একটি নাম। 'বৃতু' ধাতু আবর্তন বোঝায়, বৃত্র এই ধাতুজ শব্দ। দধ্যঞ্চ বা দধীচির অর্থ হ'ল দীপ্তি দধিসিঞ্চিত বা দধির ন্যায় শুভ্র ও কোমল। নীহারিকার জ্যোতিঃপদার্থই দধীচি। নীহারিকা বহু তারার দীপ্তিকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করে রাখে বলেই সে বৃত্র নামে খ্যাত। এই বৃত্রকে বধ করেই নতুন নতুন তারার পরিস্ফুটন ঘটান ইন্দ্র। এই জন্যই ইন্দ্র বৃত্রহা।

যে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তার ব্যাসার্ধ মোটামুটি নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। বিরাট তারা জ্যেষ্ঠা পৃথিবীর এই কক্ষপথ-সমেত সূর্যকে গিলে ফেলতে পারে। জ্যেষ্ঠা তারাটি বৃশ্চিক রাশিচক্রের উজ্জ্বলতম তারা। এই বিপুলত্বের জন্যই এর নাম জ্যেষ্ঠা তা আগেই বলা হয়েছে। রক্তবর্ণ জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রের দেবতা ইন্দ্র। দেবজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের একটি। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র ঋগ্বেদে নানাভাবে স্তুত।

বৃত্র ইন্দ্রকে একবারে ঢেকে রেখেছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রের কুক্ষি বিদীর্ণ করে নির্গত হলেন। দৃঢ় কলেবর দধীচি বা দধ্যঞ্চের দেহের অস্থি ইন্দ্র প্রার্থনা করলেন। দধীচি দেহত্যাগ করলেন। ত্বষ্টা দধীচির আর্দ্র দেহজাত শুষ্ক শুভ্র অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করলেন। সেই না-শুষ্ক, না-আর্দ্র বিস্ফোরক বজ্র দিয়ে দিনও নয়, রাত্রিও নয়, অপার্থিবকালে, ভূমিও নয়, জলও নয়, নিরাধার মহাশূন্যে মহাকাশে একশো ষাটবার প্রহার করে বৃত্রের একটি গণ্ড বিদীর্ণ করে ইন্দ্র বৃত্রহা নামে জগদ্বিখ্যাত হন।

যে আবর্তিত নীহারিকায় জ্যোতিষ্ক উদ্ভূত ও আবর্তিত হয় সেই নীহারিকাই বৃত্র। এই বৃত্রের তিনটি গণ্ডদেশ। প্রথমটির নাম নমুচি ও দ্বিতীয়টির নাম অহি। তৃতীয় গণ্ড বৃত্র। বৃত্রকে ইন্দ্র, নমুচিকে শতক্রিয় এবং অহিকে মঘবন্ হনন করেন। বৃত্র, নমুচি ও অহি যেমন বৃত্রের গণ্ড বা নীহারিকার অংশ, তেমনি ইন্দ্র, শতক্রিয় ও মঘবন্ এই তিনটিই ইন্দ্রের অনেকগুলি নামের অন্তর্ভূক্ত। দধীচির অস্থিজাত বজ্র ইন্দ্র-কর্তৃক বিস্ফোরিত হয়েছিলো, এর অর্থ হ'ল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র নীহারিকার পারমাণবিক পদার্থের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অন্যান্য নক্ষত্রকে পরিস্ফুট করে দিয়েছিলো। সুতরাং, ঋগ্বেদের ইন্দ্র জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে জ্যেষ্ঠা তারা আর ত্বষ্টা হ'ল চিত্রা নক্ষত্র। বৃত্র-নিধনের ঘটনা পুরোপুরি নীহারিকা হতে নক্ষত্রসৃষ্টির নৈসর্গিক ঘটনামাত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ঘটনা পরবর্তীকালে নানা গ্রন্থে নানাভাবে পল্লবিত।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সকলেই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে 3টি তারা নির্দেশ দিয়েছেন। বরাহমিহির, শ্রীপতি, লল্ল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে 3টি তারার কথা উল্লেখ করেছেন। খণ্ডখাদ্যক এবং শাকল্য সংহিতাতেও আছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে 3টি তারকা। এই 3টি তারকায় সকলেই বলয়ের আকৃতি বা কুণ্ডলের আকৃতি কল্পনা করেন। গণক কালিদাস এটিকে শূকরদন্তসদৃশ বলে অনুমান করেন।

যে 3টি তারকায় নক্ষত্রটি গঠিত, সে তারকাগুলির মধ্যে যোগতারা হল মধ্যতারকা। সূর্যসিদ্ধান্তে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের যে উল্লেখ আছে তা থেকে দেখা যায় যে, Scorpius মণ্ডলের **ক** তারকাটি হল যোগতারা। তারকাটি বিশেষ উজ্জ্বল এবং প্রথম মাত্রার। আকাশে সর্বোজ্জ্বল 20টি তারকার মধ্যে এটির স্থান সপ্তদশ। এটি 250 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং এর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় 300 গুণ। প্রতিটি মণ্ডলের যোগতারাও মণ্ডলের নামে অভিহিত। সেই জন্যে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যোগতারাটির নামও জ্যেষ্ঠা। তারকাটি রক্তিমবর্ণের। তৈত্তিরীয় সংহিতায় তাই এটির এক নাম রোহিণী। জ্যেষ্ঠার যোগতারটির পাশ্চাত্য নাম Antares।

জ্যেষ্ঠা

জ্যেষ্ঠা মণ্ডলে আর যে 2টি তারকা আছে, সে 2টি হল Scorpius মণ্ডলের **দ** তারকা এবং **ধ** তারকা। 2টিই তৃতীয় মাত্রার, তবে **ধ** অপেক্ষাকৃত অধিক
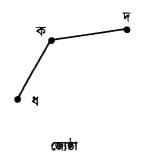
উজ্জ্বল। এই তারকাগুলির নিকটে উজ্জ্বলতর তারকা আর একটি নেই যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে।

নক্ষত্রটিকে শ্রাবণ মাসে রাত্রির প্রথম অর্ধে অনেকটা দক্ষিণের আকাশে প্রত্যক্ষ করা যায়। এর বিস্তার $226^0 40'$ থেকে 240^0 অবধি। এটি বৃশ্চিক রাশির অন্তর্ভুক্ত।

[19] **নির্ঋতিরুদ্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের উনবিংশতম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম নির্ঋতিরুদ্র। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম 'মূলা' নক্ষত্র। ইংরেজী নাম Sagittarius। এর বিস্তার আকাশের 240^0থেকে$253^0 20'$ অবধি। এটি পুরোটাই ধুনরাশির অন্তর্গত। নির্ঋতি একাদশ রুদ্রের এক রুদ্র। জ্যেষ্ঠার পরবর্তী নক্ষত্র এটি। জ্যেষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্বে এবং পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান। এতে কোনও উজ্জ্বল তারকা না থাকলেও একে আকাশে বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রাবণ মাসে নক্ষত্রটিকে সন্ধ্যার আকাশে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেখা যায়।

মূলা

ঋগ্বেদে রুদ্রনক্ষত্র নির্ঋতির নাম শিবা, পশুমতী, চিন্ময়ী। কারণ রুদ্র—শিব, পশুপতি, চিন্ময়। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের 41-তম সূক্তের 17শ ঋক বলছে ঃ "প্রজাত জীবের আমূল চেতনাশম্পাৎ পশুমতীর নিকট দেবতারাও অবনত মর্ত্যজীবের ন্যায়। তনুর আধারে অত্রাবস্থিতা শিবার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের সকল বলী দেবতারাও অবনত মর্ত্যজীবের ন্যায়, জরায় ধসে পড়া অসুযুক্ত দেহেও চিন্ময়ী নির্ঋতি উগ্রতেজে আসীন থাকেন।"

মূলা নক্ষত্রের দেবতা নির্ঋতি। ঋগ্বেদে মূলা নক্ষত্রের নির্ঋতি-ই নাম। নির্ঋতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। সায়ণের অভিমত, ব্যাধির নিদান। অর্থাৎ মূলা নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থানের সময়ে রোগের প্রকোপ দেখা দিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় মূলার এক নাম বিচৃতৌ। বিচৃতৌ কথার অর্থ মোচনকর্তা, রোগপাশমোক্ষক। ঋগ্বেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় নামের অর্থ বিপরীত। মনে করা হয় ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে সূর্যের মূলা নক্ষত্রে অবস্থানের সঙ্গে রোগ আবির্ভাব কালের সম্পর্ক নষ্ট হয়। ফলে মূলা তখন রোগ মোচনকর্তা হয়ে যায়।
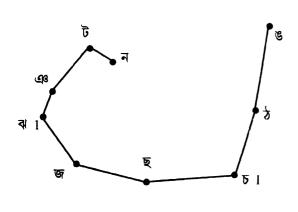
মূলা

মূলা নক্ষত্রের গঠন সম্পর্কে 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বলেছে ঃ

"তৈত্তিরীয় সংহিতায় মূলার প্রতিশব্দ বিচৃতৌ অর্থাৎ মূলা নক্ষত্রে 2টি তারকা। খণ্ডখাদ্যকে মূলা নক্ষত্রে 2টি তারকা। মূলা নক্ষত্র বৃশ্চিক রাশির অর্থাৎ Scorpius মণ্ডলের পুচ্ছে

অবস্থিত। পুচ্ছের সর্বোজ্জ্বল তারকা Scorpius মণ্ডলের **ট** তারকা। সূর্যসিদ্ধান্তে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের উল্লেখে এটিই যোগতারা। সূর্যসিদ্ধান্তে যোগতারা সম্পর্কে আরও আছে যে, মূলার পূর্বস্থিত তারকা যোগতারা। তাহলে 2টি তারকায় মূলা নক্ষত্র গঠনের ক্ষেত্রে Scorpius মণ্ডলের **ট** তারকা সন্নিহিত পশ্চিমদিকে অবস্থিত কোনো উজ্জ্বল তারকা গ্রহণ করতে হবে। এ রকম একটি মাত্র তারকা আছে। সেটি Scorpius মণ্ডলের **ন** তারকা। আলবীরূনীও 2টি তারকার ক্ষেত্রে **ট** এবং **ন**-কে গ্রহণ করেছেন। **ট** তারকা ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে দ্বিতীয় মাত্রার, **ন** তৃতীয় মাত্রার। শাকল্য সংহিতায় মূলা নক্ষত্রে 9টি তারকা। ঔজ্জ্বল্যের কথা স্মরণ রেখে, এই 9টি তারকা বৃশ্চিক রাশির **ছ, চ1, ঠ, ঙ, ট, ন, ঞ, ঝ1, জ** তারকা। এর মধ্যে **ঞ** দ্বিতীয় মাত্রার, **ঝ1**তৃতীয় মাত্রার, **জ** দ্বিতীয় মাত্রার, **ছ** তৃতীয় মাত্রার, **চ1** পঞ্চম মাত্রার, **ঠ** তৃতীয় মাত্রার এবং **ঙ** দ্বিতীয় মাত্রার। বরাহমিহির 12টি তারকায় মূলা নক্ষত্রের কল্পনা করেন। তখন আরও 3টি তারকার প্রয়োজন। মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে, সন্নিহিত আর সব তারকাই অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল এবং কোনোটিই পঞ্চম মাত্রার উর্ধ্বে নয়। সেই তারাদের সংখ্যা তিনের বেশি হওয়ার জন্য তাদের সহজে নির্দিষ্ট করাও চলে না।"

[20] **আপঃ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের বিংশতিতম নক্ষত্রটির ঋগ্বেদীয় নাম 'আপঃ'। কঠিন তরল অথবা বাষ্পীভূত জল হল 'আপঃ'। এর সৈদ্ধান্তিক নাম পূর্ব-আষাঢ়া, আষাঢ় অর্থও জল। এর বিস্তার 253^0 $20'$ হতে 266^0 $40'$ পর্যন্ত। এর ইংরেজী নাম Ophiuchus। জল অমৃত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 23-তম সূক্তের, ষোড়শ ঋক বলছে ঃ 'হে মাতৃস্নেহধারা মধুসঞ্চারিণী জল, তুমি অধ্বর্যুদের যজ্ঞাভিমুখে জয়দাত্রীরূপে প্রবাহিত হয়েছ।" এই নক্ষত্রকে ভেষজবিদ্ বা চিকিৎসকও বলা হয়েছে। এর যোগতারার নাম দেওয়া হয়েছে ধন্বন্তরী। এটির ইংরেজী নাম Ras-alhague। পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও একে ভেষজবিদ্ বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ বলছে ঃ

"আমি সবিশেষ বিদিত হয়েছি নৈশ আকাশের এই বিশ্বব্যাপ্ত রুদ্রবাষ্পে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর উপাদান, ধর্ম ও সম্বন্ধ বিষয়ক রসায়ন এবং বিদ্যুৎ আছে। বিশ্বের আয়ুবৃদ্ধিকর জরা ও রোগনাশক ঔষধ অপে বা জলে আছে।" [ঋগ্বেদ ঃ1ম /23 সূ /20 ঋ]

মূলার পরবর্তী নক্ষত্র হল পূর্বাষাঢ়া। এটি মূলার কিছুটা উত্তর-পূর্বে এবং উত্তরাষাঢা নক্ষত্রটির পশ্চিমে অবস্থিত। এতে উজ্জ্বল নক্ষত্র না থাকলেও এটিকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় আকাশের গায়। ভাদ্র মাসের সন্ধ্যার অন্ধকারে নক্ষত্রটিকে দক্ষিণ আকাশে লক্ষ্য করা চলে। এর নামকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

আষাঢ়া শব্দটি সহ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, তা হলেও শব্দটির অর্থ অসহনীয়। নামকরণেই এই অসহনীয়তা সঠিক কিসের জন্যে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তা বলা দুরূহ। তবে এমন হতে পারে যে, আর্দ্রা নক্ষত্রে যখন বাসন্ত বিষুবন ছিল তখন পূর্বআষাঢ়া নক্ষত্রে শারদ বিষুবন অর্থাৎ বর্ষার অবসান। বর্ষা, সুতরাং ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বাত্যা—নিঃসন্দেহে অসহনীয় অবস্থা। সেই অবস্থার অবসানের কথা মনে করেই কি নক্ষত্রটির নামকরণে অসহনীয়তার উল্লেখ? পূর্বআষাঢ়া নক্ষত্রটির দেবতা আপঃ।

বরাহমিহির পূর্ব-আষাঢ়া নক্ষত্রে 2টি তারকার কথা উল্লেখ করেন। শাকল্য সংহিতাতেও পূর্ব-আষাঢ়া নক্ষত্রে 2টি তারকা। এই 2টি তারকায় গজদন্তের আকৃতি। খণ্ডখাদ্যকে পূর্ব-আষাঢ়ায় 4টি তারকার উল্লেখ আছে। শ্রীপতি এবং লল্লও পূর্ব-আষাঢ়ায় 4টি তারকা বলে মনে করেন। শ্রীপতি 4টি তারকায় যে আকার বর্ণনা করেন, তাতে পূর্ব-আষাঢ়ায় শয্যাকার। গণক কালিদাস বলেছেন শূর্পাকার।
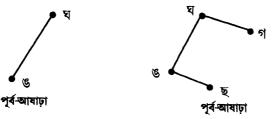
[21] **বিশ্বদেবগণ ঃ**

ব্যোমমণ্ডলের একবিংশতম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম বিশ্বদেবগণ। সৈদ্ধান্তিক নাম উত্তরাষাঢ়া। এর ইংরেজী নাম Hercules । এর বিস্তার $266^0 40'$ থেকে 280^0 অবধি। এর $3^0 20'$ পড়েছে ধনুরাশিতে এবং অবশিষ্ট 10^0 পড়েছে মকররাশিতে । অর্থাৎ মূলা, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের এক-চতুর্থাংশ নিয়ে ওই ধনুরাশি। উত্তরাষাঢ়ার পশ্চিমে বৃশ্চিকরাশি ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র এবং পূর্বে মকর রাশির অবস্থান। নির্মল আকাশে নক্ষত্রটি অনায়াসে দেখা যায়। ভাদ্র মাসের সন্ধ্যার আকাশে দক্ষিণের দিকে ঈষৎ পূর্বদিক ঘেঁসে দেখতে পাওয়া যায় উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রকে।

ঋগ্বেদ বলছে ঃ "আলোকের তড়িৎগতিতে জলপ্রপাতের ন্যায় বিশ্বের দেবগণ স্বর্গ সরণিতে আবির্ভূত হয়েছেন।" [1মণ্ডল / 3সূক্ত / 8ঋক]
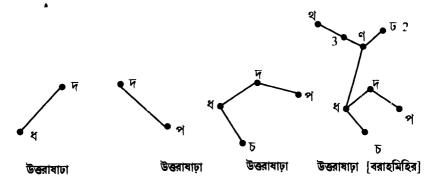
শাকল্য সংহিতাতে উত্তর-আষাঢ়া নক্ষত্রে 2টি তারকা। 2টিতে উত্তর-আষাঢ়া মঞ্চসদৃশ। শ্রীপতি এবং লল্ল উত্তর-আষাঢ়া নক্ষত্রে 4টি তারকা বলে নির্দেশ দেন। খণ্ডখাদ্যকেও আছে উত্তর-আষাঢ়া 4টি তারকাবিশিষ্ট। শ্রীপতির অভিমত এই 4টি তারকায় হস্তিদন্ত। গণক কালিদাস বলেছেন, এই 4টি তারকায় সূর্পাকৃতি। বরাহমিহির উত্তর-আষাঢ়ায় 8টি তারকা কল্পনা করেন।

[0] **অভিজিৎ ঃ**

বহু প্রাচীনকালে অভিজিৎ নক্ষত্রকে নক্ষত্রচক্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অভিজিৎ নক্ষত্রকে এখন আর তা করা হয় না। অভিজিৎকে নিয়ে তখন নক্ষত্রচক্রের মোট নক্ষত্রসংখ্যা ছিল 28টি। এখন অভিজিৎকে বাদ দিয়ে তা 27টি। অভিজিৎকে তাই '0' ক্রমিকসংখ্যা দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তকালেও এর নাম

অভিজিৎ থেকে যায়। ইংরেজীতে এর নাম Vega। অভিজিৎ সম্পর্কে 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তা এই রকমঃ

"চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত অন্যান্য নক্ষত্রের সঙ্গে অভিজিৎ নক্ষত্রের বিশেষ পার্থক্য আছে। নক্ষত্রের আদি কল্পনায় 28টি নক্ষত্র ছিল। তখন অভিজিৎ নক্ষত্র তালিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই নক্ষত্রটি পরিত্যক্ত হয় এবং 27টি নক্ষত্রে চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত নক্ষত্রচক্রটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। অভিজিৎ নক্ষত্রটি চান্দ্রতিথির দ্বাবিংশ নক্ষত্র। এটির সরাসরি অনেকটা দক্ষিণে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র এবং কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে শ্রবণা নক্ষত্র। অভিজিৎ নক্ষত্রে একটি উজ্জ্বল তারকা আছে। ফলে মহাকাশে মণ্ডলটি সহজেই প্রত্যক্ষযোগ্য।

মহাকাশে নক্ষত্রচক্রটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, যখন পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবদ্দিন হত তখন অভিজিৎ নক্ষত্রে শারদ বিষুবদ্দিন ছিল। বাল গঙ্গাধর তিলক বলেন, এইজন্য অভিজিতের প্রাধান্য ছিল। কোনে কোনো প্রাচীন গ্রন্থে অভিজিৎ নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের আদি নক্ষত্র। অভিজিৎ অর্থও জয়শীল। অভিজিতের দেবতা ব্রহ্মা।

পুনর্বসু নক্ষত্র থেকে বাসন্ত বিষুবদ্দিন যখন সরে আসে, তখন অভিজিৎ নক্ষত্রে শারদ বিষুবদ্দিন থাকে না। ক্রমে ক্রমে অভিজিৎ নক্ষত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে। মহাভারতে দেখা গেছে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে কাল গণনার সময়ে অভিজিৎ পরিত্যক্ত হয়েছে। তা ছাড়া অভিজিৎ নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের অনেক উপরে স্থাপিত বলে সংগতি সাধনের জন্য অভিজিৎ নক্ষত্রের পরিত্যক্ত হওয়া অসম্ভব নয়।"

শাকল্য সংহিতায় অভিজিৎ নক্ষত্রে 3টি তারকা। খণ্ডখাদ্যকেও অভিজিৎ নক্ষত্রে তারকা সংখ্যা 3টি। অভিজিৎ-এর আকৃতি শৃঙ্গাটক বা পানিফল-সদৃশ। অভিজিৎ নক্ষত্রের যোগতারা হিসেবে সূর্যসিদ্ধান্তে আছে যে, মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারকা যোগতারা। সূর্যসিদ্ধান্তের অবস্থান নির্দেশের সঙ্গে মিলিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, এটি Lyra মণ্ডলের **ক** তারকা। **ক** তারাটির নাম Vega। মহাকাশে সর্বোজ্জ্বল 20টি তারকার মধ্যে এটি 4 নম্বর তারকা, এটি 26 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আভিজিৎ নক্ষত্রের শৃঙ্গা-টক-সদৃশ আকৃতির জন্য নিকটবর্তী আর যে 2টি তারকার কথা মনে হয়, সে 2টি তারকা Lyra মণ্ডলের **চ** এবং **খ** তারকা। কোনো কোনো গবেষক অভিজিৎ নক্ষত্র **ক, চ** এবং **গ** তারকায় গঠিত বলে মনে করেন।
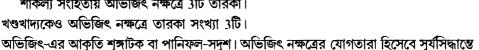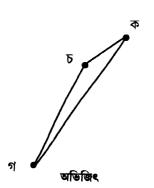
যোগেশচন্দ্র রায় **ক, চ** এবং **ঙ** তারকার কথা বলেন। **ঙ** তারকা একটি নয়, **ঙ** 1 এবং **ঙ** 2 নামে 2টি বিচ্ছিন্ন তারকা। 2টি তারকাই পঞ্চম মাত্রার এবং 2টিই প্রত্যক্ষযোগ্য। এরা **ক** এবং **চ** তারকার অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত বলে 3টি তারকায় গঠিত মণ্ডলটির ক্ষেত্রে এদের নিয়ে যে কোনো আকারের

কল্পনা চলে। Lyra মণ্ডলের **চ** চতুর্থ মাত্রার তারকা। **খ** তারকাটির তৃতীয় মাত্রা থেকে চতুর্থ মাত্রা পর্যন্ত ঔজ্জল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। **গ** তৃতীয় মাত্রার তারকা। **খ** এবং **গ**-এর মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য? **গ**-এর তুলনায় **খ** নিকটে আছে, উভয়ের ঔজ্জ্বল্যও প্রায় সমান। শৃঙ্গাটকসদৃশ আকৃতি কল্পনায় **খ** এবং **গ**-এর কোনোটিই অসুবিধার সৃষ্টি করে না বলে **খ** ছেড়ে **গ**-কে গ্রহণ করার কোনো সার্থকতা দেখা যায় না।

অভিজিৎ

অভিজিৎ নক্ষত্রটিকে ভাদ্র মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় মধ্য আকাশে ঈষৎ উত্তর দিক চেপে দেখতে পাওয়া যায়।

[22] **বিষ্ণু ঃ**

নক্ষত্রচক্রের দ্বাবিংশ বা 22-তম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম বিষ্ণু। এর সৈদ্ধান্তিক নাম শ্রবণা। ইংরেজীতে এর নাম Alpha Aquilae বা Altair। বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য। এর দূরত্ব 17 আলোকবর্ষ। এর বিস্তার 280° থেকে 293°20′। এটি পুরোপুরি মকররাশির অন্তর্গত। অভিজিৎ নক্ষত্রের কিছুটা দক্ষিণে সামান্য পূর্ব দিক চেপে এই নক্ষত্রের অবস্থান। শ্রবণা অতি উজ্জ্বল তারকা সমন্বিত। তাই একে সহজেই দেখা যায়। শ্রবণা ছায়াপথের খুবই কাছে অবস্থিত। আশ্বিন মাসের সন্ধ্যায় একে মাথার উপরে দেখা যায়।

'শ্রবণা' অর্থ কর্ণ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নক্ষত্রটির নাম শ্রোণা। শ্রোণা শব্দটির অর্থ খঞ্জ বা রুগ্ন। কিন্তু শ্রবণের সঙ্গে শ্রুতির সম্পর্ক ধরলে শ্রবণা এবং শ্রোণার মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য নজরে আসে না। মনে হয়, শ্রবণা শব্দটির প্রয়োগ প্রথমে শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ প্রসঙ্গে করা হয়। পরবর্তীকালে শ্রবণা যখন শ্রোণা শব্দে রূপান্তরিত হয়, তখন শ্রবণার কর্ণ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে ত্রিভুজ প্রভৃতির খণ্ড বা ভগ্ন অংশ অতিভুজ নির্দেশ করে। শ্রবণার দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণু অর্থ সূর্য। পুরাণে বিষ্ণু ত্রিপদে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন। শ্রীপতি শ্রবণা নক্ষত্রের ত্রিপদ আকার বর্ণনা করেন। এই ত্রিপদ আকারের জন্য শ্রবণা নক্ষত্রে 3টি তারকা। বরাহমিহির, শ্রীপতি, লল্ল সকলেই শ্রবণা নক্ষত্রে 3টি তারকার কথা বলেছেন। খণ্ডখাদ্যকে এবং শাকল্য সংহিতাতেও শ্রবণায় 3টি তারকার উল্লেখ আছে। শাকল্য সংহিতাতে শ্রবণা নক্ষত্র মৃদঙ্গের আকৃতির। গণক কালিদাস শ্রবণা নক্ষত্রের তারকাত্রয়ের শরাকৃতির কথা বলেছেন।

যে 3টি তারকায় শ্রবণা নক্ষত্রটি গঠিত সূর্যসিদ্ধান্তে আছে যে, সেই 3টি তারকার মধ্যতারকা যোগতারা। সূর্যসিদ্ধান্তে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের যে উল্লেখ আছে, তা থেকে দেখা যায় যে, যোগতারাটি Aquila মণ্ডলের **ক** তারকা। তারকাটি আকাশে সর্বোজ্জ্বল 20টি তারকার মধ্যে একাদশ স্থানে রয়েছে। এটি প্রায় 16 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। অন্য 2টি তারকা **ক** তারকার দুই পার্শ্বে 2টি তারকা, Aquila মণ্ডলের **খ** এবং **গ** তারকা। **গ** তৃতীয় মাত্রার, **খ** চতুর্থ মাত্রার। পার্শ্বস্থ অন্যান্য তারকা বেশ অনুজ্জ্বল এবং তারা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রবণা

[23] **বসুগণ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম 'বসুগণ' বা 'অষ্টবসু'। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এর নাম 'ধনিষ্ঠা'। ধনিষ্ঠার দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে শ্রবণা এবং কিছুটা দক্ষিণে মকররাশি। নক্ষত্রটিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র নেই একটিও। এর বিস্তার 293°20′ থেকে 306°40′ অবধি। এর ইংরেজী নাম Delphinus।

বসুগণ সম্পর্কে ঋগ্বেদ বলছে ঃ "যাঁরা শুক্রের ন্যায় শুভ্র, সূর্যের হিরণ্যদ্যুতির ন্যায় রোচিত সেই দেবশ্রেষ্ঠদের নাম বসু।" ধনিষ্ঠার নামকরণ সম্পর্কে এবং গঠন সম্পর্কে অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন ঃ "এই নক্ষত্রটির নাম ধনিন্ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে এই ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে বর্ষ গণনা শুরু হত। অর্থাৎ ধনিষ্ঠা ছিল আদি নক্ষত্র। আদি নক্ষত্র কি শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র বা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র? এর সঙ্গে কি ধনিষ্ঠা কথাটির অর্থ—ধনিষ্ঠায় ধনীদের অবস্থানের সম্পর্ক আছে? ধনিষ্ঠা নক্ষত্রটির আর এক নাম শ্রবিষ্ঠা। শ্রু ধাতু থেকে শ্রবিষ্ঠার উৎপত্তি। শ্রব্ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। শ্রবিষ্ঠা এবং ধনিষ্ঠার মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে মনে হয়। ধনিষ্ঠার দেবতা বসু। বসু অর্থ ধনী বা উজ্জ্বল। অষ্টবসু প্রসিদ্ধ। অর্থের দিকে দিয়ে ধনিষ্ঠায় ধনীদের অবস্থান পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ধনীরা হলেন অষ্টবসু।

ধনিষ্ঠা ধনিষ্ঠা
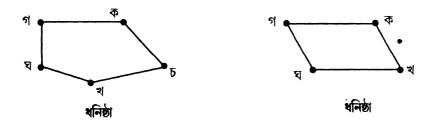
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কটি তারকা এবং কোন্ কোন্ তারকায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রটি গঠিত? শাকল্য সংহিতায় আছে, ধনিষ্ঠায় 5টি তারকা। খণ্ডখাদ্যকেও ধনিষ্ঠায় 5টি তারকার উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের মত অনুসারেও 5টি তারকা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 4টি তারকা, শ্রীপতি এবং লল্লও 4টি তারকার কথা নির্দেশ করেন। শাকল্য সংহিতায় ধনিষ্ঠার মৃদঙ্গের আকার। শ্রীপতিও মৃদঙ্গ আকার সমর্থন করেন।"

এই নক্ষত্রটির অর্ধেকটা অর্থাৎ এর 6°40′ পড়েছে মকর রাশিতে এবং বাকী অর্ধেকটা পড়েছে কুম্ভরাশিতে।

[24] **বরুণ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের চুতর্বিংশতিতম বা 24-তম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম বরুণ। এর সৈদ্ধান্তিক নাম 'শতভিষা'। ইংরেজী নাম Aquari। বরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ঋগ্বেদে বরুণ দেবতাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি সূক্ত আছে। ঋগ্বেদ বলেছে ঃ

"যে অমিতদ্যুতি নক্ষত্রনিবহ রাত্রে উচ্চে নিহিত থাকে, সেই দৃশ্যজ্যোতিষ্কেরা কি করে চৈতন্য দিবালোকে বিলীন রাখে। বিচরণশীল চন্দ্রমাসহ নৈশ আকাশ চালিত হয় অবারিত শক্তি বরুণের ব্রতচারণায়।" [ঋগ্বেদ ঃ 1ম মণ্ডল 24-তম সূক্ত 10-তম ঋক]।

শতভিষার বিস্তার 306°40′ থেকে 320° অবধি। পুরো নক্ষত্রটিই রয়েছে কুম্ভরাশিতে। কুম্ভরাশির

প্রধান নক্ষত্র হল বরুণ বা শতভিষা। 'শতভিষক' হতে এই নক্ষত্রের নাম হয়েছে শতভিষা অর্থাৎ চিকিৎসকের ক্ষমতাশালী। 'শত' মানে বহুসংখ্যক। এই নক্ষত্রের কারকতা নিয়ে মহাভারতের মহাভিষগরাজ শান্তনুর আখ্যান তৈরি হয়েছে। 'মহাভিষ', 'শান্তনু', ভীষ্ম-এঁদের নাম রাখা হয়েছে শতভিষা নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। শান্তনুই মহাভিষগ বা মহাভিষ। মহাভারতের ওই উপাখ্যানে অষ্টবসু বা বসুগণও রয়েছেন।
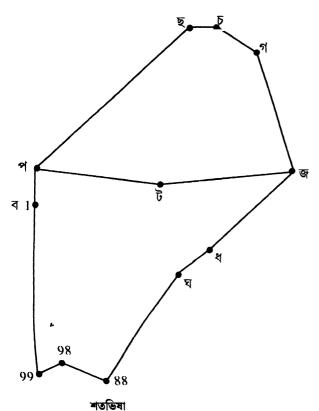
শতভিষা

শতভিষার উত্তরে আছে পূর্বভাদপদা নক্ষত্র। উত্তর-পশ্চিমে আছে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। এটিতে কোনও উজ্জ্বল নক্ষত্র নেই, তবু এটিকে আকাশে সহজেই দেখা যায়, তার কারণ হল এটিতে অনেকগুলি নক্ষত্র রয়েছে। এটিকে কার্তিকমাসের প্রথম ভাগে সন্ধ্যার দক্ষিণ আকাশে ঈষৎ পূর্ব দিক ঘেঁষে দেখা যায়। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটিতে লেখা হয়েছে ঃ

"নক্ষত্রটির শতভিষা নাম শতভিষজ্ থেকে উৎপন্ন। নক্ষত্রটিতে চন্দ্র থাকবার সময়ে রোগ হলে বৈদ্যেও সে রোগের উপশম করতে পারে না—এ জাতীয় একটি শাস্ত্রীয় প্রবাদ আছে। কিন্তু তারকাগুচ্ছের সঙ্গে রোগমুক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হল কিভাবে? মহাকাশে তারকাবিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যখন রোহিণী নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবন হত, শতভিষা নক্ষত্রে তখন দক্ষিণায়নের অবসান অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়ণের শুরু। সুতরাং গ্রীষ্মের প্রারম্ভ। গ্রীষ্মকালে রোগবৃদ্ধির লক্ষণ। সেই রোগবৃদ্ধির লক্ষণ থেকেই শতভিষজ্ এবং ক্রমে ক্রমে শতভিষা নক্ষত্রের উৎপত্তি বলে মনে হয়। এ থেকেই সম্ভবত, শতভিষা নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থানের ফলে শত বৈদ্যেও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হন, ধারণাটির সৃষ্টি। শতভিষা নক্ষত্রের দেবতা বরুণ।"

শতভিষা নক্ষত্রে অনেকগুলি তারকা রয়েছে। শতভিষা কথাটির সঙ্গে শত যুক্ত থাকলেও নক্ষত্রটিতে একশো তারকা নেই। বহু তারকাযুক্ত বলেই নক্ষত্রটির এই নামকরণ। শতভিষা নক্ষত্রের আর এক নাম শততারকা। নক্ষত্রটি আকৃতিতে চক্রের অনুরূপ।

[25] **অজৈকপাদরুদ্র ঃ**

ব্যোমমণ্ডলের পঞ্চবিংশতিতম নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম অজৈকপাদরুদ্র। সৈদ্ধান্তিক নাম পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। এর বিস্তার আকাশের 320° থেকে 333°20′ অবধি। এই নক্ষত্রের প্রধান তারাদের ইংরেজী নাম 'The Square of Pegasus। এর মূল চারটি তারা একটা চতুষ্কোণ তৈরি করেছে আকাশের গায়। এদের রং সাদা, নীলাভ সাদা এবং রক্তাভ। এদের দূরত্ব মোটামুটি 100 আলোকবর্ষ। একাদশ রুদ্রের এক রুদ্র অজৈকপাদরুদ্র। এই অজৈকপাদ শব্দটির অর্থ এক পাদবিশিষ্ট জীব। গাছ বা পাদপও একপদবিশিষ্ট প্রাণী। ঋগ্বেদ বলছে ঃ

"অহির্ব্রিঘ্ন্য তথা অজৈকপাদ পৃথিবী ক্ষীরোদসমুদ্র নক্ষত্রসমৃদ্ধ বিশ্বের দেবতারা ক্রান্তদর্শী শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য আমাদের প্রতিপালকেরা হোমের সহিত স্তুতির মন্ত্রাবলী শ্রবণ করুণ।" [ঋগ্বেদ ঃ 6ম/50 সূক্ত/ 14 ঋক]।

ঋগ্বেদেরই প্রথম মণ্ডলের উননব্বই সূক্তের প্রথম ঋক বলছে ঃ "হে ভজনীয়, আমদের জীবনযজ্ঞে দেবগণের ন্যায় আগমন কর। অহিংস অপ্রতিরুদ্ধ উদ্ভিদ সর্বত্র জাত হও। সদাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে আমাদের অপরিহার্য আহার দানে নিত্যকাল রক্ষা কর।" [ঋগ্বেদ ঃ 1ম ঃ ৪9 সূক্ত ঃ 1 ঋক]

পূর্বভাদ্রপদের সরাসরি দক্ষিণে আছে শতভিষা নক্ষত্র এবং পূর্বে আছে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র। পূর্বভাদ্রপদ মোটামুটি উজ্জ্বল তারকাবিশিষ্ট, তাই একে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। কার্তিক মাসের প্রথম দিকে সন্ধ্যার আকাশে এটিকে সামান্য পূর্ব দিকে চেপে প্রায় মাঝ আকাশে দেখা যায়। এর নাম কেউ কেউ পূর্বভাদ্রপদাও বলেছেন।

ভদ্র মানে সুন্দর। সুন্দর পা যার সে-ই ভদ্রপদা। ভদ্রপদ থেকেই ভাদ্রপদ বা ভাদ্রপদা। এর আরেক নাম প্রোষ্ঠপদা। প্রোষ্ঠ মানে 'গো'। গরুর মত পদ হলে সে প্রোষ্ঠপদ বা প্রোষ্ঠপদা। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে দুটি তারার কথা বলেছেন। বরাহমিহির, লল্ল, শ্রীপতি প্রমুখেরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন পূর্বভাদ্রপদায় বা পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে দুটি তারা। এই নক্ষত্রের দেবতা একপাদ অজ বা অজৈকপাদ রুদ্র। এটি দ্বাদশ রুদ্রের একটি রুদ্র।

পূর্বভাদ্রপদ বা পূর্বভাদ্রপদা

পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের 10° অংশ পড়েছে কুম্ভরাশির মধ্যে এবং তার শেষের 3°20′ অংশ পড়েছে মীনরাশিতে।

[26] **অহির্ব্রিঘ্ন্যরুদ্র ঃ**

নক্ষত্রচক্রের ষড়বিংশ বিভাগের ঋগ্বেদীয় নাম অহির্ব্রিঘ্ন্য। এর সৈদ্ধান্তিক নাম উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র এবং এর ইংরেজী নাম Andromeda। 'ব্রঘ্ন্য ' শব্দের অর্থ মূলশক্তি। একাদশ রুদ্রের একটি হল অহির্ব্রিঘ্ন্য। অহিঃ হল সাপ বা সর্পিল। মীনরাশির মধ্যেই পুরো নক্ষত্রটি অবস্থিত। সর্পিল নীহারিকা [Spiral Galaxy] ধনুরাশির শীর্ষস্থ প্রচেতানক্ষত্র সমষ্টি [Hercules] আবৃত করে বৃশ্চিকরাশির অনুরাধানক্ষত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। ঋগ্বেদের ঋষিরা এটা জেনেছিলেন এবং সম্ভবতঃ সে কারণেই এই নক্ষত্রটি নাম 'অহির্ব্রিঘ্ন্য' রেখেছিলেন। বিখ্যাত গ্যালাক্সী অ্যান্ড্রোমিডাকে এইখানেই দেখা যায়। তবে তার দূরত্ব 24 লক্ষ আলোকবর্ষ।

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের পশ্চিমে আছে পূর্বভাদ্রপদ এবং এর পূর্বে কিছুটা দক্ষিণ চেপে আছে রেবতী নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটি উজ্জ্বল এবং সহজে দেখা যায়। আকাশে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র উত্তর ভাদ্রপদের আগে থাকায় নামকরণ সেইভাবেই করা হয়েছে। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দেবতা অহির্ব্রধ্ন্য রুদ্র। এটি একাদশ রুদ্রের একটি। ঋগ্বেদ বলছে ঃ

"স্বর্গপরিব্যাপ্ত অরুষ্টরুদ্র ব্রধ্নের যোজনায় জ্যোতিষ্কগণ দিব্যলোক রোচিত করে বিচরণ করছেন।" [প্রথম মণ্ডল, ষষ্ঠ সূক্ত, প্রথম ঋক]

উত্তরভাদপদ নক্ষত্রের তারার সংখ্যা নিয়ে 'প্রাচীন ভারতে জোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"শাকল্য সংহিতায় আছে উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্রে 2টি তারকা। খণ্ডখাদ্যক অনুসারেও 2টি। শ্রীপতি এবং লল্লও 2টি তারকায় নক্ষত্রটি গঠিত বলে মনে করেন। উত্তরভাদ্রপদা এবং পূর্বভাদ্রপদার 2টি করে 4টি তারকা মিলে শয্যাকার। যে 2টি তারকায় উত্তরভাদ্রপদা মণ্ডলটি গঠিত, সে 2টি তারকা হল পূর্বভাদ্রপদার পূর্বে সমান্তরালভাবে অবস্থিত 2টি উজ্জ্বল তারকা, Pegasus মণ্ডলের **গ** তারকা এবং Andromeda মণ্ডলের **ক** তারকা। এই তারকাটির নাম Sirrah। Pegasus মণ্ডলের **গ** তৃতীয় মাত্রার, Andromeda-এর **ক** দ্বিতীয় মাত্রার তারকা।

সূর্যসিদ্ধান্তে অনুসারে এই 2টি তারার উত্তরের তারকা যোগতারা। কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্তে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের যে উল্লেখ আছে, তাতে যোগতারার অবস্থানে দ্রাঘিমাংশের সঙ্গে মিল থাকলেও অক্ষাংশে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মনে হয়, পূর্বে দক্ষিণের তারকাই যোগতারা ছিল। পরে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কারণে উত্তরের তারকা যোগতারা হয়। তখন দ্রাঘিমাংশের ততটা পরিবর্তন না ঘটলেও অক্ষাংশের পার্থক্য ঘটে। যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকায় এই ভ্রান্তি। Pegasus মণ্ডলের **গ** তারকার দক্ষিণে আর কোনো উজ্জ্বল তারা না থাকায় **গ**-কে উত্তরের তারা এবং যোগতারা হিসেবে বজায় রাখা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া তখন পূর্বভাদ্রপদা এবং উত্তরভাদ্রপদার 4টি তারকাতে শয্যাকারও সহজে কল্পনা করা যায় না। বরাহমিহির উত্তরভাদ্রপদায় 8টি তারকার কথা বলেন। কিন্তু সঠিকভাবে সেগুলি কোন্ কোন্ তারকা তা নির্দেশ করা কঠিন।"
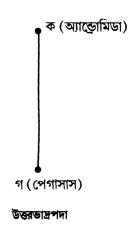
উত্তরভাদ্রপদা

এই নক্ষত্রটির বিস্তার 333°20′ থেকে 346°40′ পর্যন্ত। এটি পুরোটাই মীন রাশির অন্তর্গত।

[27] **পূষণ ঃ**

নক্ষত্রচক্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম পূষণ বা পূষা। সৈদ্ধান্তিক নাম রেবতী। ইংরেজী নাম Piscium। এর বিস্তার **খ**-গোলের 346°40′ থেকে 360° অবধি। রেবতী 27 নক্ষত্রচক্রের শেষ নক্ষত্র এবং প্রথম নক্ষত্র হল অশ্বিনী। রেবতীর উত্তর-পশ্চিমে আছে উত্তরভাদ্রপদ এবং সরাসরি প্রায় উত্তরে ঈষৎ পূর্বদিক চেপে আছে অশ্বিনী নক্ষত্র এবং মেষরাশি। রেবতী নক্ষত্রে কোন উজ্জ্বল তারা নেই। এটি মীনরাশির মধ্যস্থলে অবস্থিত। পূষা বা পূষণ্ তথা রেবতী সম্পর্কে ঋগ্বেদ বলেছে ঃ

"আমাদের সুপথে সুগতির নিমিত্ত আমাদের শত্রুবৃত্ত অপনয়ন করুন। হে পূষণ, এই ক্রতু বিদিত হোন।" [1ম মণ্ডল, 42 সূক্ত, 7 ঋক]।

রেবতী নক্ষত্রের রেব্ শব্দের অর্থ লম্ফন। কিন্তু রেবতীর সঙ্গে লম্ফনের সাদৃশ্য কি? রেবতী নক্ষত্র মীন রাশিতে অবস্থিত। লম্ফনের সঙ্গে মীনের প্রকৃতি অনুধাবন করে নক্ষত্রটির রেবতীর নামকরণ অসম্ভব নয়। শ্রীপতি রেবতীর মৃদঙ্গের আকার কল্পনা করেন। শাকল্য সংহিতাতেও রেবতী নক্ষত্র মৃদঙ্গ সদৃশ। রেবতী নক্ষত্রের দেবতার নাম পূষা। পূষা হেমন্ত ঋতুর আদিত্য।

পৌরাণিককালে রেবতীকে নিয়ে অনেক কাহিনী রচিত হচ্ছে। বিশেষ করে সত্যযুগের রেবতীর সঙ্গে দ্বাপরযুগের বলরামের বিবাহ নিয়ে। এই কাহিনীতে 'কাল প্রসরণ'-এর [Time Dilation] কথা জড়িয়ে আছে একেবারে সরাসরিভাবে। বলরামের ব্যাপার-স্যাপারগুলির কিছুটা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাও সম্ভব। এইসব নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে রেবতী নক্ষত্রে 32টি তারকা। এই 32টি তারকা সঠিকভাবে নির্দেশ করা কঠিন। সূর্যসিদ্ধান্তে আছে, রেবতীর দক্ষিণস্থ তারাই যোগতারা। Pisces মণ্ডলের অর্থাৎ মীন রাশির 2টি মৎস্য সংযোগকারী রেখায় **চ** তারাটিই যোগতারা হিসেবে নির্দিষ্ট। তারাটি অনুজ্জ্বল এবং পঞ্চম মাত্রার। কিন্তু এটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এটি রবিচক্রের উপরে স্থাপিত। রেবতী নক্ষত্রের যোগতারার পার্শ্বস্থিত তারকার সংখ্যা বেশি নয়। সবগুলি তারকাই অনুজ্জ্বল। তা ছাড়া **চ** তারকাকে দক্ষিণস্থ তারকা হিসেবে মনে করলে তারকা সংখ্যা আরও হ্রাস পায়। তবুও পার্শ্বস্থিত তারকাগুলি এখানে সন্নিবেশিত হল। রেবতী নক্ষত্রের **ড, ঠ, ঘ** তারকা পঞ্চম মাত্রার, শুধু **ঙ** চতুর্থ মাত্রার।

অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে নক্ষত্রটিকে মধ্য আকাশে কিছুটা পূর্ব দিক চেপে লক্ষ্য করা যায়।

এই 27টি নক্ষত্র ছাড়া ঋগ্বেদ আরও যে সব নক্ষত্রের কথা বলেছে তাদের মধ্যে রয়েছেঃ [1] উত্তানপাদ বা শিশুমার নক্ষত্র [Ursa Minor], [2] সপ্তর্ষিমণ্ডল [Ursa Major বা Plough] [3] অগস্ত্যতারা [Canopus], [4] কাশ্যপী [Cassiopia], [5] ত্রিশঙ্কু [Formalhaut] [6] কালপুরুষ [Orion] নক্ষত্রমণ্ডলী।

এরপর আসা যাক রাশি বিভাজনের কথায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানই এই রাশি বিভাজনের প্রথম উদ্ভারক। খ-গোলের 360°-কে 27টি নাক্ষত্রিক বিভাজনের এবং বারোটি সমান ভাগের রাশি বিভাজনের আদিগুরু হল প্রাচীন ভারত এবং তার প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঋষিকুল। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আগে করা হয়েছে। বারোটি রাশির নাম আগেও একবার দেওয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আরও একবার তা দেওয়া হল। রাশিদের সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য দিয়েই এই পরিচ্ছেদের কথা শেষ করবো। বারোটি রাশি [Sign] হলঃ [1] মেষ [Aries], [2] বৃষ [Taurus], [3] মিথুন [Gemini], [4] কর্কট [Cancer], [5] সিংহ [Leo], [6] কন্যা [Virgo], [7] তুলা [Libra], [8] বৃশ্চিক [Scorpius], [9] ধনু [Sagittarius], [10] মকর Capricorn], [11] কুম্ভ [Aquarius], [12] মীন [Pisces]।

রেবতী

[1] **মেষ** [Aries]

রাশিচক্রের প্রথম রাশি। এর বিস্তার 0° থেকে 30° অবধি। এতে আছে অশ্বিনী, ভরণী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক চতুর্থাংশ। মেষ রাশির তারাগুলির ঔজ্জ্বল্য কম। পৌষ ও মাঘ মাসে সন্ধ্যার আকাশে রাশিটিকে সরাসরি প্রায় মাথার উপরে দেখা যায়। এতে একটি মেষের মুখমণ্ডলের কল্পনা অনায়াসে করা যায়।

[2] **বৃষ** [Taurus]

রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি। এর বিস্তার 30° থেকে 60° অবধি। এতে আছে কৃত্তিকা নক্ষত্রের তিন-চতুর্থাংশ, রোহিণীর পুরোটাই এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের অর্ধেকটা নিয়ে বৃষরাশি। মেষের ঈষৎ পূর্ব দিকে এটি অবস্থিত। ফলে মেষ রাশিটিকে লক্ষ্য করবার পরে বৃষ রাশির অবস্থান নির্দিষ্ট করা সহজ। এটিকে চেনাও কঠিন নয়। তা ছাড়া বৃষ রাশির মধ্যে একাধিক উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় তারকা আছে। সেদিক দিয়ে বৃষ রাশিকে সহজেই চেনা সম্ভব। মেষের মূর্তি যেমন মেষরাশিতে, তেমনি বৃষরাশির তারকপুঞ্জ নিয়ে একট বৃষের মূর্তি কল্পনা করা হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাশিটিকে সরাসরি প্রায় মাথার উপর দেখা যায়।

[3] **মিথুন** [Gemini]

মিথুন রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। রাশিচক্রের প্রথম দুটি রাশির মধ্যে কল্পিত হয়েছে দুটি পশুমূর্তি একটি মেষ, অন্যটি বৃষ। তৃতীয় রাশিটিতে একটি যুগল মানব মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে। একটি পুরুষ ও একটি নারী মূর্তি মিলে মিথুন। এর পাশ্চাত্য নাম Gemini। এটি আকাশের 60° থেকে 90° অবধি বিস্তৃত। মিথুনরাশির উল্লেখযোগ্য তারাদের মধ্যে পুনর্বসু অন্যতম। পুনর্বসু নক্ষত্র দুটি তারার সমন্বয়ে গড়া। এতে রয়েছে মৃগশিরা নক্ষত্রের অর্ধেকটা, আর্দ্রানক্ষত্রের পুরোটা, পুনর্বসুর তিন-চতুর্থাংশ।

মিথুন রাশির প্রথম পুনর্বসু তারকা মহাকাশে সর্বোজ্জ্বল তারকাদের মধ্যে পঞ্চদশ। অর্থাৎ তারকাদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে রোহিণীর পরেই এর স্থান। মহাকাশে এটির দূরত্ব 32 আলোকবর্ষের মতন। দ্বিতীয় পুনর্বসুতে একাধিক তারকা আছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 2টি তারকা পরস্পরকে আবর্তনরত। এ 2টি তারকার একটি দ্বিতীয় মাত্রার, অন্যটি তৃতীয় মাত্রার।

রাশিচক্রের 12টি রাশির মধ্যে মিথুন রাশি অনেকটা উত্তর ঘেঁষে অবস্থিত। গ্রহকুলের 2টি গ্রহ ইউরেনাস এবং প্লুটো মিথুন রাশিকে অতিক্রম করবার সময়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল। রাশিটি এই কারণে বিশেষ গৌরবের অধিকারী। ইউরেনাস 1781 খ্রিস্টাব্দে এবং প্লুটো 1930 খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে সূর্যাস্তের পরে মাথার উপরের আকাশে রাশিটিকে লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্বন্ বা প্রশ্বা তারা [Procyon] এবং শ্বন্ বা শ্বা বা লুব্ধক [Sirius] তারা এই রাশিরই অন্তর্গত। ফলে, মিথুনরাশিকে আকাশে সহজে দেখা যায়।

[4] **কর্কট** [Cancer]

রাশিচক্রের চতুর্থরাশি কর্কটরাশি। ইংরেজীতে Cancer। আকাশের 90° থেকে 120° অবধি এর বিস্তার। এই রাশির নক্ষত্রগুলি অনুজ্জ্বল। অনুজ্জ্বল এই তারকাদের নিয়ে যে মূর্তি কল্পনা করা হয় তা কর্কট বা কাঁকড়ার। এতে রয়েছে পুনর্বসুর এক চতুর্থাংশ, পুষ্যা নক্ষত্রের পুরোটা এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের সবটাই। বৃহস্পতি প্রায় 6000 বছর পূর্বে পুষ্যা নক্ষত্রে আবিষ্কৃত হয়। পুষ্যা নক্ষত্রের অধিপতি হল

বৃহস্পতি দেবতা। পুষ্যা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয় বলে মাসের নাম পৌষ। কর্কট রাশিকে মাথার উপরে দেখা যায় চৈত্র ও বৈশাখ মাসের সন্ধ্যার অন্ধকারে।

[5] **সিংহ** [Leo]

রাশিচক্রের পঞ্চম রাশি সিংহ। এর বিস্তার 120° থেকে 150° অবধি। এতে আছে মঘা ও পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র দুটি এবং উত্তর ফাল্গুনীর এক চতুর্থাংশ। সিংহ রাশিতে সিংহের মূর্তি অন্যান্য রাশির বিভিন্ন আকৃতির তুলনায় অনেক সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সিংহরাশির পশ্চিমে কর্কটরাশি এবং পূর্বে কন্যারাশি। এই রাশির মঘা নক্ষত্রটি খুবই উজ্জ্বল। প্রথম মাত্রার এই তারাটির দূরত্ব প্রায় 67 আলোকবর্ষ। সিংহরাশিতে আরও দুটি নক্ষত্র রয়েছে এর একটি পূর্বফাল্গুনী এবং অন্যটি উত্তর-ফাল্গুনী। এই দুটি তারা তৃতীয় মাত্রার। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যার অন্ধকারে এই রাশিটিকে সরাসরি মাথার উপরে দেখা যায়।

[6] **কন্যা** [Virgo]

রাশিচক্রের ষষ্ঠরাশি। এর বিস্তার 150° থেকে 180°। এটিতে একটি মানবকন্যার রূপ কল্পনা করে এর নামকরণ করা হয়েছে 'কন্যা'। কন্যার পূর্বে তুলারাশি এবং তার পশ্চিমে সিংহ রাশি। আকাশে মেষরাশি যখন পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে থাকে, মিথুন ও কর্কট সে সময়ে প্রায় মাথার উপরে থাকে। কন্যারাশি তখন পূর্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করে। কন্যারাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকার নাম চিত্রা। এটি আছে 120 আলোকবর্ষ দূরে। এটি একটি তারকাবিশিষ্ট নক্ষত্র। চিত্রা বিশাল আকারের তারা। আকাশের 20টি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মধ্যে এটি উজ্জ্বলতায় ষোড়শ। কন্যারাশিতে আছে উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রের তিন-চতুর্থাংশ পুরো হস্তা নক্ষত্র এবং চিত্রা নক্ষত্রের অর্ধেকটা।

আকাশে কন্যারাশিকে জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে সরাসরি প্রায় মাথার উপরে লক্ষ্য করা যায়।

[7] **তুলা** [Libra]

রাশিচক্রের সপ্তমরাশি তুলা রাশি। প্রথম রাশি মেষ যখন পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে যায় তখন তুলারাশির উদয় ঘটে পূর্বাকাশে। তুলারাশিতে দাঁড়িপাল্লার রূপকল্পনা করা হয়। এর দুটি পাল্লা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই রাশিটি তেমন কিছু উজ্জ্বল নয়। কিন্তু এর পূর্বে বৃশ্চিকরাশি এবং পশ্চিমে কন্যা রাশি থাকায় একে চিনতে খুব অসুবিধা হয় না। কন্যারাশি উজ্জ্বল, বৃশ্চিকরাশিও আকর্ষণীয় দেখতে। এই দুইরাশির মাঝখানে থাকা তুলারাশিকে সহজেই নির্দিষ্ট করা যায়। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার কোনও তারা নেই। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে তুলারাশিকে সন্ধ্যার আকাশে মাথার উপরে লক্ষ্য করা যায়।

তুলা রাশির বিস্তার আকাশের 180° থেকে 210° অবধি। এতে রয়েছে চিত্রা নক্ষত্রের অর্ধেকটা, স্বাতীর পুরোটা এবং বিশাখার তিন-চতুর্থাংশ।

[8] **বৃশ্চিক** [Scorpio]

রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। এর বিস্তার 210° থেকে 240° অবধি। এতে আছে বিশাখার এক চতুর্থাংশ, অনুরাধা নক্ষত্র এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। তুলারাশির পূর্ব দিকে এবং ধনুরাশির পশ্চিম দিকে এর অবস্থান। উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় দর্শন এই নক্ষত্রমণ্ডলটির নামের সঙ্গে তার গঠনের সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৃশ্চিকরাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হল জ্যেষ্ঠা [Antares]। ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকে এটি আকাশের সপ্তদশ তারা। এটি রয়েছে প্রায় 250 আলোকবর্ষ দূরে। সূর্যের আয়তনের প্রায় 300 গুণ এর আয়তন। সূর্যের চেয়ে এর ঔজ্জ্বল্য প্রায় 3000 গুণ। এই রাশিতে আরও দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। এগুলি হল অনুরাধা এবং মূলা। বৃশ্চিকরাশিকে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সূর্যাস্তের পর মাথার উপরের আকাশে প্রত্যক্ষ করা যায়।

[9] **ধনু** [Sagittarius]

রাশিচক্রের নবম রাশি। এতে একটি ধনুর্ধরের মূর্তি কল্পনা করা হয়। এর পশ্চিমাংশে মানবদেহের মূর্তি কল্পিত হয়, যে মানবদেহের হাতে রয়েছে তীর ও ধনুক। এর পূর্বাংশ অশ্বাকৃতি, কিছু অনুজ্জ্বল তারকায় অশ্বের দেহ ও পায়ের কল্পনা। সবমিলিয়ে একটা মানবমূর্তির কল্পনা করা হয় যায় অর্ধেকটা মানুষের আকৃতি, অর্ধেকটা অশ্বের আকৃতি বিশিষ্ট। মানুষের হাতে আছে তীর-ধনুক।

ধনুরাশি আকাশের 240° থেকে 270° অবধি বিস্তৃত। এতে আছে মূলা ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র দুটি এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের এক-চতুর্থাংশ। এই রাশিতে প্রথম মাত্রার ঔজ্জ্বল্যের একটিও তারা নেই। তবে এতে একাধিক উল্লেখ্য তারকাপুঞ্জ রয়েছে। রাশিটিকে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে সন্ধ্যার আকাশে সরাসরি প্রায় মাথার উপরে দেখা যায়।

[10] **মকর** [Capricorn]

রাশিচক্রের দশম রাশি হল মকর। কুম্ভরাশির পশ্চিম দিকে এবং ধনুরাশির পূর্ব দিকে রয়েছে এই রাশিটি। পশ্চিম আকাশে তুলারাশি যখন অস্তে নামতে শুরু করে তখন মকর রাশি প্রায় মাথার উপরে চলে আসে। পূর্ব দিগন্তে তখন উদিত হতে থাকে মেষরাশি।

মকর এক কাল্পনিক বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তু। মকর হিন্দুমতে গঙ্গাদেবীর বাহন। বরাহমিহিরের মতে, মকর হল 'মৃগাস্য'। বামন পুরাণ অনুসারে, মকর মৃগাস্য, বৃষস্কন্ধ, গজনেত্র। গ্রীক জ্যোতিষ মতে এর অর্থ শৃঙ্গবান ছাগ—কিন্তু এই ছাগের দুটি মাত্র পা। পশ্চাতে মৎস্যপুচ্ছ। ভারতীয় কল্পনায় এই রাশির আকৃতি মকর হিসাবেই কল্পিত।

এই রাশির বিস্তার 270° থেকে 300° অবধি। এতে আছে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের তিন-চতুর্থাংশ, শ্রবণার পুরোটা এবং ধনিষ্ঠার অর্ধেকটা। এই রাশিটিকে দেখা যায় আশ্বিন ও কার্তিক মাসের সন্ধ্যার আকাশে সরাসরি মাথার উপরে।

[11] **কুম্ভ** [Aquarius]

রাশিচক্রের একাদশ রাশি হল কুম্ভ। এর বিস্তার 300° থেকে 330° অবধি। এতে আছে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্ধেকটা, শতভিষা পুরোটা এবং পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের তিন-চতুর্থাংশ। এই রাশির পূর্বদিকে মীন রাশি। পশ্চিমে মকর রাশি। কুম্ভরাশি যখন মাথার উপরে তখন পশ্চিমে অস্ত যায় বৃশ্চিক রাশি এবং পূর্বাকাশে উদিত হয় বৃষ রাশি। শতভিষা এই রাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। একে দিয়েই এই রাশিটিকে আকাশের গায় নির্দিষ্ট করা যায়। এটি কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যায় সরাসরি প্রায় মাথার উপরে পরিলক্ষিত হয়। এটির নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক রেখায় যোগ করলে একটা কুম্ভের আকৃতি পাওয়া যায়।

[12] **মীন** [Pisces]

রাশিচক্রের দ্বাদশরাশি। এর বিস্তার 330° থেকে 360° অবধি। এতে আছে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের এক-চতুর্থাংশ এবং উত্তর-ভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্র দুটি। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার কোনও

তারা নেই। এই রাশির প্রধান তারকা হল 'রেবতী'। রাশিটিকে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সন্ধ্যার অন্ধকারে সরাসরি মাথার উপরের আকাশে দেখা যায়।

মীনরাশির নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিকভাবে যুক্ত করে দুটি মৎস্যাকৃতির চিত্র পাওয়া যায়। এর অবস্থান মেষরাশির পশ্চিমে এবং কুম্ভরাশির পূর্বে। যে সময় মীনরাশি আকাশে মাথার উপরে থাকে সে সময় মিথুনরাশি পূর্বাকাশে উদিত হতে থাকে এবং ধনুরাশি অস্ত যেতে থাকে পশ্চিমকাশে।

আগেই বলেছি, পূর্বোক্ত সাতাশটি নক্ষত্রের প্রত্যেকটি আকাশ গোলকে 13°20′ ক'রে স্থান করে আছে। তবে এগুলির প্রত্যেকটিই কতকগুলি তারার সমষ্টি বা তারকামণ্ডলী। কারণ কোনও একটি তারা এতবড় হতে পারে না, যা নাকি পৃথিবীর আকাশে 13°20′ স্থান দখল করে অবস্থান করবে। সুতরাং ওই 13°20′ জুড়ে যতগুলি তারা আছে সবগুলি নিয়েই একটি তারকামণ্ডলী বা নক্ষত্র তৈরি হয়েছে ধরা হয়। এই সাতাশটি নক্ষত্রকেই চন্দ্রের 27 জন পত্নী হিসাবে কল্পনা করেছে ভারতীয় পুরাণ। এই নক্ষত্রগুলিতে চন্দ্রের অবস্থান কালে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের নৈসর্গিক ঘটনা ঘটছে বলে মনে করা হয়। বৃষ্টিপাত, অনাবৃষ্টি, জোয়ার-ভাঁটার তারতম্য ইত্যাদি চন্দ্রের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানের ফল বলে মনে করা হয়। তেমনি বিভিন্ন নক্ষত্রে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থানও মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সংঘটনকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। কোনও মানুষের জীবন-যৌবন-ধন-মান ইত্যাদি গ্রহগুলির বিভিন্ন নক্ষত্রে ও রাশিচক্রে অবস্থানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সুদীর্ঘকাল ধরে সুগভীর বিশ্বাস। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় এই সব বিশ্বাসের সত্যতা আজও নিরূপিত হয়নি। তবে এগুলির সবটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্যে সর্বত্র আজও ফলিত জ্যোতিষের যথেষ্ট রমরমা।

আবরো বলি, সূর্য আকাশ গোলকে তার আপাত-পরিক্রমণ পথে মোট বারোটি নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশি-চক্র অতিক্রম করে একবারের পরিক্রমায়। প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশিচক্র খ-গোলকের 30° স্থান জুড়ে এবস্থিত। এই ত্রিশ ডিগ্রি অতিক্রম করতে সূর্য মোটামুটি 30 দিন সময় নেয়। অর্থাৎ সূর্য এক এক মাসে এক একটি রাশিতে অবস্থান করে। খ-গোলকের 360° মোট বারোটি রাশিতে বিভক্ত। ফলিত-জ্যোতিষ এই বিভাগ মানে। তবে শুধু সূর্যের অবস্থান নয়, অন্যান্য গ্রহদের এই সব রাশিতে অবস্থানের ফলে পার্থিব নৈসর্গিক ঘটনা ও মানুষের নিজের জীবনের নানা ঘটনা ঘটে বলে ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে। প্রত্যেক রাশির 30° অংশ জুড়ে 2.25টি নক্ষত্র আছে। কারণ পূর্বোক্ত 27টি নক্ষত্রের প্রতিটি 13°20′ স্থান জুড়ে থাকে এবং 30° স্থান জুড়ে থাকতে সোয়া দুটি নক্ষত্রের বিস্তৃতি লাগে। আকাশে রাশিচক্র ও নক্ষত্র 27টির অবস্থান স্থির বলে ধরা হয়, যদিও বিশ্ব বহ্মাণ্ডে কেউই স্থির নয়। এই আপাত স্থির কাঠামোয় 12টি গ্রহই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাশিচক্রে এবং বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান করে। এদের মধ্যে সূর্যের গতি হলো আপাত গতি। পৃথিবী ঘুরছে বলেই পৃথিবীর আপেক্ষিকে সূর্যকে আমরা গতিশীল দেখি। বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর আপেক্ষিকে সূর্য স্থির। অবশ্য নীহারিকার কেন্দ্রের চতুর্দিকে সপার্ষদ সূর্যের নিজস্ব গতি আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যাইহোক, বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন নক্ষত্র ও রাশিতে অবস্থান বিচার করে মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ তথা ভাগ্য গণনা করা হয়। এই গণনা কতটা বৈজ্ঞানিক তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক আছে। ফলিত জ্যোতিষের এইসব ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্য, কিংবা কতটা মিথ্যা তা আমাদের অজানা। ●

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুরাণ কাহিনীর জ্যোতির্বিজ্ঞান

[প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার অভিপ্রায়ে গ্রহ-তারক-চন্দ্র-তপনদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীকে নিয়ে নানা সরস কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এইসব কাহিনীরা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে। অজস্র কাহিনীর মাত্র কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান পরিচ্ছেদে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গাণিতিক কাঠিন্যে সরস মোড়ক দেওয়া হয়েছে এইসব কাহিনীর আবরণে। এই পরিচ্ছেদের ষোলটি কাহিনীর সবগুলিই প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না এইসব গল্পের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকটা। এখানে কাহিনীগুলি যেমন সংক্ষেপে বলা হয়েছে, তেমনি তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমূহও সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করা হয়েছে।]

প্রাচীন ভারতের পুরাণ, মহাকাব্য এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এমন কিছু কাহিনী আছে যেগুলি নিছক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত এবং যেগুলি মহাকাশের নক্ষত্রদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সব কাহিনীর সংগে জড়িয়ে আছে নক্ষত্র, গ্রহ, ছায়াপথ এবং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বেশ কয়েকটি ঘটনা। এইরকম বেশ কিছু কাহিনীর মধ্যে কয়েকটির কথা বলা যাক। এই পৌরাণিক কাহিনীগুলিই বলে দেয় প্রাচীন ভারত জ্যোতির্বিজ্ঞানে কী বিশাল উন্নতি করেছিল। সেই উন্নতিরই প্রতিফলন ঘটেছে এই সব কাহিনীতে। এই কাহিনীগুলির কোন কোনওটিতে যখ., কাল প্রসরণের [Time Dilation] আভাস পাওয়া যায় তখন বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। রেবতী নক্ষত্রকে নিয়ে তেমনি এক কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক।

1. রেবতীর বিয়ে ঃ

এই কাহিনীর রেবতী তার নাক্ষত্র-রূপের চেয়ে রাজকন্যা হিসাবেই বেশি প্রতিভাত। এ কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য হল এতে কাল প্রসরণের কাহিনী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বহুকাল আগে রাজা অনর্তের পুত্র রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে এক নগর বানিয়ে আনর্ত নামের একটা দেশ পালন করতেন। তাঁর একশো গুণী পুত্রের মধ্যে ককুদমী সবার বড়। তাঁকে বলা হতো রৈবতক ককুদমী। তাঁর একমাত্র কন্যা রেবতী সর্বগুণান্বিতা। একবার রৈবতক ককুদমী তাঁর মেয়ে রেবতীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাকে মেয়ের উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান দেবার কথা বলতে হাজির হলেন মুক্তদ্বার ব্রহ্মালোকে। নারদ ওঁদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। নারদই পরামর্শ দিয়েছিলেন ককুদমীকে, কারণ পৃথিবীর কোনও বরই রেবতীর পছন্দ হচ্ছিল না। ব্রহ্মালোকে যখন ওঁরা পৌঁছলেন তখন সেখানে গান হচ্ছিল হাহা-হূহূ গন্ধর্বের। রাজা কোনও সুযোগ না পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পরে গান শেষ হলো। গান শেষ হতে তিনি মেয়েকে দেখিয়ে তাঁর মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সে কথা শুনে ব্রহ্মা উচ্চহাস্য করে বললেন, 'হে রাজন, তুমি পৃথিবীতে তোমার মেয়ের জন্য পাত্র হিসাবে মনে মনে যাদের নাম ভেবেছ, তারা সবাই কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। এখন তাদের পুত্র-পৌত্র নাতিদের বংশের কথাও শোনা যায় না। এর মধ্যে [অর্থাৎ এই গান শুনতে শুনতে] সাতাশটি চতুর্যুগ-কাল

[অর্থাৎ 27×43, 20,000 পার্থিব বৎসর বা 11,66,40,000 পার্থিব বৎসর] অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে দেবদেবের অংশে মহাবল বলদেব আছে। সেখানে গিয়ে সেই নররত্নটিকে তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর।" [শ্রীমদ্ভাগবত ঃ 1ম স্কন্ধ ঃ 4র্থ অধ্যায়]।

অর্থাৎ ব্রহ্মার ওখানে গান শুনতে শুনতে সামান্য সময় অতিবাহিত হলেও, এই সময়টুকুর মধ্যেই পৃথিবীতে 11,66,40,000 পার্থিব বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ওখানকার একদিন-রাত্রি বা এক ব্রাহ্ম-দিবস হলো 864 কোটি পার্থিব-বৎসর বা 864 কোটি মানব-বৎসর। যেহেতু 1000 চতুর্যুগে মোটামুটি ব্রহ্মার একদিন বা একরাত্রি, আমাদের ঘণ্টায় প্রকাশ করলে তা বারোটি ব্রাহ্ম-ঘণ্টা। অর্থাৎ 432 কোটি পার্থিব বৎসরে বারোটি ব্রাহ্ম ঘণ্টা। অতএব, এক চতুর্যুগ হলো $^{12}/_{1000}$ ব্রাহ্ম-ঘণ্টা, আর 27টি চতুর্যুগ হলো $27 \times {12}/_{1000}$ ব্রাহ্ম-ঘণ্টা বা 19.44 ব্রাহ্ম-মিনিট। সুতরাং ব্রহ্মার ওখানে গান হয়েছিল 19.44 ব্রাহ্ম-মিনিট এবং তাতেই কেটে গেছে 11,66,40,000 পার্থিব বৎসর।

এই উদাহরণ সুস্পষ্টভাবে কাল-প্রসরণের কথা বলছে। বিষ্ণু পুরাণেও এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মা সেখানে কিঞ্চিৎ অবনত মস্তক হয়ে ইষৎ হেসে বলছেন, "তুমি যাদের নাম বলছ এখন তাদের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে তাদের বংশীয় কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। তুমি যতটুকু সময় এখানে গান শুনেছিলে ততটুকু সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে বহুসংখ্যক চতুর্যুগ অতীত হয়েছে। অধুনা পৃথিবীতে সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টবিংশতিতম দ্বাপর যুগ চলছে। এখন তোমার বন্ধুবান্ধব কেহই জীবিত নাই। তুমি একাকীই কন্যাকে কোনও পাত্রে সমর্পণ কর। বহুকাল হলো তোমার বন্ধু, বান্ধব, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, মন্ত্রী, কলত্র, সৈন্য, কোষ এবং সমুদয় অতীত হয়েছে।"

এই কথা শুনে রাজা আবার ব্রহ্মাকে প্রণাম করে সশঙ্ক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ভগবন্, যখন এই রকম অবস্থা উপস্থিত হয়েছে, তখন কোন্ ব্যক্তিকে কন্যা দান করব?" ব্রহ্মা বললেন, "রাজা, পূর্বকালে কুশস্থলী নামে তোমার যে রাজ্য ছিল এখন সেখানে দ্বারকা নামে পুরী সংস্থাপিত হয়েছে, বলরাম সেই দ্বারকায় অবস্থান করছেন, সেই বলরামকে তুমি কন্যা দান কর, সঙ্কর্ষণই এখন শ্লাঘ্য বর।"

ককুদমী পৃথিবীতে এসে রেবতীকে বলরামের হাতে সম্প্রদান করে আবার ফিরে গিয়েছিলেন ব্রহ্মালোকে। পৃথিবীতে এসে তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর সবই বদলে গেছে, ব্রহ্মা যেমন যেমন বলেছিলেন। লক্ষণীয় হলো, বিষ্ণুপুরাণ যেখানে 'বহুসংখ্যক চতুর্যুগ' বলছে, শ্রীমদ্ভাগবত সেখানে 'সাতাশটি চতুর্যুগের' কথা বলছে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে অতিক্রান্ত সময়ের পার্থিবমান একেবারে সুনির্দিষ্ট। হাহা-হূহূ গন্ধর্বদ্বয়ের গান শেষ হতে সময় লেগেছে 19.44 ব্রাহ্ম-মিনিট, আর সেই সময়টুকুতেই পৃথিবীতে 11,66,40,000 বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্রহ্মালোকের এই সামান্য সময়টুকুই পৃথিবীর 11,66,40,000 বছরের সমান। আর এরই নাম 'কাল-প্রসরণ' বা আধুনিক কালের Time Dilation। আইনস্টাইন পৃথিবীতে না এলে এই কাহিনীগুলিকে আজও কল্প-গল্প বলেই চালিয়ে যেতাম, যেমন 'ট্যাকিয়ন তত্ত্ব'-কে আজও আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারছি না। কিন্তু ট্যাকিয়ন যদি সত্যিই কোনও দিন আবিষ্কৃত হয়, তখন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ট্যাকিয়ন সম্পর্কিত কল্প-গল্পও সত্য হয়ে উঠবে। কাল বা সময় বর্তমান থেকে অতীতে ছুটতে পারবে। সময়ের বিপরীতমুখী গতির পরিমণ্ডলে কাল-প্রসরণের ঘটনা তখন তার চমক হারিয়ে ফেলবে।

2. অগস্ত্যযাত্রা ও বিন্ধ্যপর্বত ঃ

অগস্ত্য এক মহাঋষি। তিনি কেবল বৈদিক ঋষিই নন, তিনি মহাভারতীয় এবং পৌরাণিক ঋষিও ছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যকে নিয়ে বহু প্রচলিত এবং প্রায় সর্বজনবিদিত অনবদ্য কাহিনী হ'ল বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চতা-বৃদ্ধি রোধ।

একবার বিন্ধ্যপর্বত সূর্যের গতিরোধ করবার জন্য মাথা উঁচু করতে থাকে। এই পর্বতের চূড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে দক্ষিণে সূর্যের আলো দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠল। দেবতারা অগস্ত্যের কাছে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানালেন। বিন্ধ্য ছিলেন অগস্ত্যের শিষ্য। অগস্ত্য বিন্ধ্যের কাছে গেলে পর্বত তাঁকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। তিনি বিন্ধ্যকে বললেন, "আমি দক্ষিণে যাচ্ছি। যতদিন না ফিরে আসি এই অবস্থায় থাক।" এই বলে তিনি দক্ষিণে যান, আর ফেরেন নি। যেদিন তিনি দক্ষিণে যান সেটি ছিল সম্ভবত ভাদ্র মাসের প্রথম দিন। এই যাত্রাই 'অগস্ত্য-যাত্রা' নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে ভাদ্রের প্রথম দিনেই শুধু নয় সব মাসের প্রথম দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ বলে ধরা হয়। কারণ, এই বিশ্বাস আজও চালু যে, মাসের প্রথম দিন যাত্রা অগস্ত্য-যাত্রা হতে পারে এবং গমনকারী আর প্রত্যাবর্তন নাও করতে পারেন।

এই অগস্ত্য-যাত্রার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে। আমাদের আকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারকার নাম দেওয়া হয়েছে 'অগস্ত্য'। এই অতি দানব (Supergiant) নক্ষত্রটি ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকে লুব্ধকের (Sirius) ঠিক পরেই। এরই অবস্থান, গতিবিধি ইত্যাদি নিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের আলো দেওয়ার উপরোক্ত রূপক কাহিনীটি বর্ণিত। গোল্ডস্টুকার, কল্ডওয়েল প্রভৃতি প্রাচ্যবিদরা মনে করেন যে, এই কাহিনীতে ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের ইঙ্গিত আছে! অগস্ত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কেউ কেউ আবার এও মনে করেন, তিনি তামিল ভাষা ও সাহিত্যের প্রবর্তক। 'অগস্তিয়ম' বা 'অগস্ত্যম্' নামে পরিচিত বারো হাজার শ্লোক-সম্বলিত বিপুল আয়তন তামিল ব্যাকরণ ঋষি অগস্ত্যেরই রচনা বলে মনে করা হয়।

পৃথিবী যখন সূর্যের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে, সেই দক্ষিণায়নে অর্থাৎ শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালের আকাশের একেবারে দক্ষিণের দিগন্তে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দেখা যায়। ইংরাজীতে অগস্ত্য নক্ষত্রের নাম Canopus। এখন অবশ্য দক্ষিণায়ন শুরু হয় ৪ই আষাঢ় এবং চলে 7ই পৌষ অবধি। ঋগ্বেদে দক্ষিণ দিকের নাম যমস্য ভুবন বা যাম্য, পরাবত, অবাচী ইত্যাদি। উত্তর এবং দক্ষিণ শব্দ দুটির অর্থ এখন কেবল দিক সূচনা করে। কিন্তু প্রায় দু'হাজার বছর আগে বর্তমানের ধ্রুবতারা যখন পৃথিবীর মেরু তারা হয়েছিল তখন পৃথিবীর উপবৃত্তাকার সূর্য পরিক্রমা পথের উত্তর দিক অনুসূর [Perihelion] হওয়ার সময় উত্তর ও দক্ষিণ শব্দ দুটি ঊর্ধ্ব ও অধঃ অর্থেও ব্যবহৃত হত। এই অনুসুর যখন সূর্যের উত্তর দিকে থাকবে না সেই সময় অর্থাৎ প্রায় আরও তিন হাজার বছর পরে উত্তর শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তেমনি দক্ষিণও তখন দক্ষিণ থাকবে না।

মহাকাশে রবিপথ সূর্যের বার্ষিকপথ। তারকাচিত্রের ভেতর দিয়ে সূর্য দৈনিক এক ডিগ্রি করে পূর্ব দিকে সরে যায়। ফলে এক বছরে তার একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। এই পথচিত্র বৃত্তাকার এবং নির্দিষ্ট। এটির নাম রবিকক্ষা। এই রবিকক্ষার উপরে পৃথিবীর অক্ষের একট নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান এবং আবর্তন ঘটে। রবিকক্ষার উপরে পৃথিবীর আবর্তন অনেকটা লাটিমের ঘূর্ণনের মত। লাটিম যখন তার আপন অক্ষের উপরে আবর্তন করে, তখন লাটিমের অক্ষদণ্ডটিও এক বিচিত্র গতিবৈশিষ্ট্যে লাটিমের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। পৃথিবীর অক্ষও সে রকম। সে রবিকক্ষার উপরে

পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। এই আবর্তনগতি অতি ধীর। প্রায় 25800 বছরে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর অক্ষের উপরে যদি কোনো তারা থাকে তবে সেই হবে ধ্রুবতারা। পৃথিবীর অক্ষের দিকনির্দেশনা স্থির নয়, 25800 বছরের বিভিন্ন সময়ে সে বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে। ফলে মেরু সান্নিহিত কোনো তারাই অনন্তকাল ধ্রুবতারা থাকতে পারে না। কয়েক হাজার বছর ধ্রুব থাকার পর পৃথিবীর অক্ষ যেই সরে যায়, অমনি সেই নির্দিষ্ট তারকা ধ্রুবত্ব হারায়। নতুন তারা ধ্রুবত্ব লাভ করে। 25800 বছরে পৃথিবী-অক্ষের আবর্তনের সম্পূর্ণতার সঙ্গে একটি চক্রের সম্পূর্ণতা ঘটে। তখন আবার 25800 বছর পূর্বের ধ্রুবতারার ধ্রুবত্ব লাভ হয়। ফলে, মেরু সন্নিহিত তারারা 12900 বছরে মেরুর দিকে এগোয় এবং বাকি 12900 বছরে মেরু থেকে দূরে সরে আসে। অগস্ত্য তারকা দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত এ রকম একটি তারকা। সুতরাং 12900 বছর সে মেরু তারার সন্নিহিত হয় এবং বাকি 12900 বছর সে মেরু তারা থেকে দূরে সরে যায়। দক্ষিণ আকাশে আরও অনেক তারকা থাকলেও এই অগস্ত্য তারাটিকে বিন্ধ্যপর্বতের সঙ্গে যুক্ত করার কারণ তারকাটি উজ্জ্বল, বিশিষ্ট, দর্শনীয় এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে কাহিনীটির উপযুক্ত।

ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যকে বললেন, 'আমি দক্ষিণ দিক যাবো তুমি পথ ছেড়ে দাও', আর বিন্ধ্য প্রণতঃ হয়ে পথ ছেড়ে দিল। অগস্ত্য বললেন, 'যতদিন না আমি দক্ষিণ দিক হতে প্রত্যাবর্তন করি ততকাল তুমি এমনি প্রণতঃ হয়ে থাক।' সেই যে অগস্ত্য গেলেন আর ফিরলেন না। অদূর ভবিষ্যতে ফিরছেনও না। কবে ফিরবেন তার হিসাবটা জ্যোতির্বিজ্ঞান দিচ্ছে।

Canopus বা অগস্ত্যের দক্ষিণ যাত্রা এখন থেকে [2000 খ্রিস্টাব্দে] প্রায় দশ হাজার নয়শো বছর পরে শেষ হবে। অর্থাৎ আরও প্রায় এগোরো হাজার বছর ধরে বিন্ধ্য এমনি মাথা নুইয়েই থাকবে। কেননা ওই সময় ধরে পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার উপবৃত্তাকার পথটির অপসূর [Aphilion] থাকবে দক্ষিণ দিক, যেমন আজ আছে। ফলে দক্ষিণায়নের সময় প্রথম প্রভার অগস্ত্য তারাকে আকাশের দক্ষিণ দিগন্তে এখন যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি দেখা যাবে। কিন্তু বেশ কিছুটা ভবিষ্যতে তা হবে না। অর্থাৎ আগামী এগারো হাজার বছর ধরে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দক্ষিণ আকাশে দেখা গেলেও প্রায় ষোল হাজার বছর পরে অগস্ত্য মধ্য আকাশে চলে আসবেন কারণ তখন পৃথিবীর উপবৃত্তাকার পরিক্রমণ পথের দক্ষিণ ভাগ অনুসূর এবং উত্তর ভাগ অপসূর হয়ে যাবে। আরও সহজ করে বললে অগস্ত্যের দক্ষিণ পথে চলা শেষ হবে প্রায় এগারো হাজার বছর পরে। তারপর তিনি উত্তরাভিমুখী হবেন। আরো পাঁচ হাজার বছর লাগবে তাঁর মধ্যগগনে ফিরে আসতে। অনুসূর ও অপসূর পরিবর্তনের ফলে শুধু অগস্ত্যই নন দক্ষিণ গোলার্ধের সব নক্ষত্রই তখন মধ্য আকাশে দেখা যাবে এবং এখানকার বহু নক্ষত্র যারা মধ্যাকাশে জ্বলজ্বল করছে তারা ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হয়ে যাবে। অনুসূর ও অপসূরের এই পরিবর্তন ঘটে এইজন্য যে, বার্ষিক গতিবেগে পৃথিবী ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অপসৃত হয়ে উপবৃত্তাকার ভ্রমণ পথের সূর্যহীন অখ্য [Focus] বা অপসূরের দিকে আসতে থাকে। এখন যেমন পরিক্রমা পথের উত্তর দিক অনুসূর আছে ষোল হাজার বছর পরে দক্ষিণ দিকে অনুসূর থাকবে। এইভাবেই একবার উত্তর দিক বা উত্তর ভাগ অনুসূর হবে আবার দক্ষিণ দিক বা দক্ষিণ ভাগ অনুসূর হবে এবং চলতে থাকবে। পরিব্রাজক ঋষি অগস্ত্য একবার দক্ষিণে যাবেন আবার ফিরে আসবেন, মধ্য আকাশে দীপ্তিমান হবেন এবং আবারো দক্ষিণে যাবেন। কালপ্রবাহ চলতে থাকবে তথাকথিত নৈমিত্তিক প্রলয় অবধি।

পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে পরমাল্পদূরত্ব হ'ল অনুসূর অবস্থার নয় কোটি পনেরো লক্ষ মাইল। উপবৃত্তকারে সূর্য পরিক্রমার সময় এই দূরত্ব বাড়তে থাকে। যা পর্বে পর্বে বৃদ্ধি পায় তার নাম পর্বত। 'বিন্ধ্য' অর্থ হ'ল পথ বন্ধনীয়। সুতরাং বিন্ধ্য পর্বতের অর্থ হ'ল পর্বে পর্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পথ বন্ধনীয়। বিন্ধ্য পর্বতের বৃদ্ধি পাওয়া হল পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার গতিবেগ-জনিত পথ-বন্ধনীয়তে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া।

অনুসূর অবস্থা হতে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব প্রতিদিন নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় পর্বে পর্বে বেড়ে যায়। ফলে প্রতিদিন সূর্যোদয় পূর্ব দিনের অপেক্ষা পায় ত্রিশ সেকেন্ড পরে ও সূর্যাস্ত প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড আগে হয়। এইভাবে দিন ছোট হতে থাকে ও রাত্রি বড় হয়। পৃথিবীর উপবৃত্তাকার সূর্য পরিক্রমা পথ বা বিন্ধ্য পর্বত বাড়তে বাড়তে মোটামুটি $182\frac{1}{2}$ দিনে এমন একটা অবস্থায় আসে যখন পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মাইল হয়ে যায়। অর্থাৎ অনুসূরকালীন উভয়ের দূরত্ব নয় কোটি পনেরো লক্ষ মাইল থেকে পর্বে পর্বে বেড়ে অপসূর অবস্থায় নয় কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মাইলে এসে দাঁড়ায়। বিন্ধ্য পর্বতের অর্থাৎ ভূ-পরিক্রমণ পথের এই বাড়াবাড়ি রুখতেই অগস্ত্য বিন্ধ্যকে বলেছিলেন, 'আমি দক্ষিণে যাবে পথ ছেড়ে দাও', নত হয়ে বিন্ধ্য পথ ছেড়ে দিল। অর্থাৎ বিন্ধ্য আর বাড়লো না। ফলে অপসূর অবস্থায় সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব নয় কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মাইল চরমই রইলো এবং এরপর এটা কমতে আরম্ভ করলো। অগস্ত্য বলেছিলেন, 'যতকাল আমি দক্ষিণ দিক হতে প্রত্যাবর্তন না করি ততকাল তুমি প্রণতঃ থাক।' অর্থাৎ যতদিন ভূ-কক্ষের দক্ষিণভাগ অপসূর থাকবে ততকাল অগস্ত্য দক্ষিণ আকাশেই থাকবেন। দূরবীন দিয়ে দেখলে অগস্ত্যের পাশে লোপামুদ্রা নামের ক্ষুদ্র তারাটিকেও দেখা যায়। স্বামীর পাশে ঋষি লোপামুদ্রাও শোভমানা দক্ষিণ আকাশে।

আসল কথা বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাঞ্চল থেকে সব সময়ে অগস্ত্য তারাকে দেখা চলে না। বিন্ধ্যপর্বতের অক্ষাংশ 22 ডিগ্রি। এই 22 ডিগ্রি অক্ষাংশের কিছুটা উত্তরের অক্ষাংশের কথা যদি ধরি, তাহলে দেখতে পাব যে, 25,800 বছরের মধ্যে অগস্ত্য একবার ওই অক্ষাংশবিশিষ্ট মানুষের দৃষ্টির সম্মুখভাগ থেকে অন্তর্হিত হবে এবং পরে আবার অগস্ত্য ওই অক্ষাংশের মানুষের সম্মুখে আসবে। এই আবির্ভাব এবং তিরোভাবকে বিজ্ঞানীরা রূপকের ছলে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যে, 22 ডিগ্রি অক্ষাংশের বিন্ধ্যপবর্ত বর্ধিত হওয়ার জন্যই যেন অগস্ত্য তারা ওই অক্ষাংশের উত্তরের মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে এবং অগস্ত্যের আবির্ভাবে বিন্ধ্যপর্বত নত হচ্ছেন বলেই যেন বিন্ধ্যের উত্তরের অক্ষাংশ থেকে অগস্ত্য আমাদের নজরে আসছে।

3. ত্বষ্টার ভ্রমিযন্ত্র ঃ

'ত্বষ্টা' হল নক্ষত্রচক্রের চতুর্দশ নক্ষত্র। এর নাম ত্বষ্টা রেখেছে ঋগ্বেদ। সিদ্ধান্তজ্যোতিষ এর নাম রেখেছে চিত্রা। চিত্রা নক্ষত্র 262 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 1500 গুণ চিত্রার ঔজ্জ্বল্য। ঋগ্বেদের ত্বষ্টার সঙ্গে পৌরাণিক বিশ্বকর্মাব প্রবল মিল। ত্বষ্টা চিত্রা নক্ষত্র হলেও তাঁর কার্যকলাপ প্রাচীনকালের প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে তাঁকে অগ্রগণ্য করেছে।

ঋগ্বেদে ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি সূক্ত আছে। এদের মধ্যে দশম মণ্ডলের 81 ও 82 সূক্তে বিশ্বনিয়ন্তাকে বিশ্বকর্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই বিশ্বনিয়ন্তা কিংবা সৃষ্টিকর্তা পৌরাণিক প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন, কিন্তু দেব-স্থপতি ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা তিনি নন। বরং তিনি ত্বষ্টারও সৃষ্টিকর্তা। অবশ্য ভারতীয় দর্শন কোনও কিছু সৃষ্টির কথা বলে না, বলে বহিঃপ্রক্ষেপ (Projection) কিংবা রূপান্তরের (Transformation) কথা। সুতরাং এই দুটি সূক্তে যে বিশ্বকর্মার কথা বলা

হয়েছে তিমি বিশ্বদেবতা, বিশ্বের আদি রূপকার। তাঁকে ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা যাই বলা হোক না কেন, তিনি দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মা বা ঋগ্বেদীয় ত্বষ্টা নন, কিংবা চিত্রা নক্ষত্রও নন। ত্বষ্টার উপর রচিত ঋগ্বেদের কিছু ঋক এই রকম ঃ " ত্বষ্টাদেবের নতুন সে চমস (চামচ বা হাতা) নিঃশেষিতরূপে নির্মিত হয়েছিল, ঋভুগণ সে চমস পুনরায় চারখানি করেছিল।" (1ম মণ্ডল / 20 সূক্ত /6ষ্ঠ ঋক)।

"ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহি (বৃত্র)-কে হনন করেছিলেন, ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করেছিলেন, তারপর যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করেছিলেন।" (ঋগ্বেদ 1/32/2)

"অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করেছিলেন। ইন্দ্র পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাবার ইচ্ছা করে সে মস্তক শর্যনাঋৎ সরোবরে(কুরুক্ষেত্রে) প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"(ঋগ্বেদ 1/84/13-14)

"হে ইন্দ্র! যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লাভ করে সমস্ত গর্বকারী মানুষকে অতিক্রম করে এবং আর্যদের দ্বারা দস্যুদের অতিক্রম করে, আমরা তাদের ভজনা করি। তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলে, আমাদের জন্যও সেরূপ কর।" (ঋগ্বেদ 2/11/19)

"আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করলেন। শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপী-তেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করলেন। তিনি গাভীদের আহ্বান করতে করতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করলেন।" (ঋগ্বেদ 10/8/8-9)

"নির্মাণকর্তা প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেবত্বষ্টা আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষবৎ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অন্যথা করতে কারও সাধ্য নেই। আমাদের এ সম্পর্ক আকাশ ও পৃথিবী উভয়েই জানেন।" (ঋগ্বেদ 10/10/5)

"ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যা সরণ্যুর বিবাহ দিচ্ছেন, এ উপলক্ষে বিশ্বসংসার এসে উপস্থিত হল। যমের মাতা যখন বিবাহিত হলেন, তখন মহান বিবস্বানের জায়া অদর্শন হলেন, সে মৃত্যু-রহিত সরণ্যুকে মনুষ্যদের নিকট গোপন করা হল, তার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করে বিবস্বানকে দেওয়া হল, তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং সরণ্যু যমজ দুটি সন্তানকে ত্যাগ করলেন।"(ঋগ্বেদ 10/17/1-2)

এই ঋকগুলি থেকে বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টা সম্পর্কে আমরা তিনটি ঋগ্বেদীয় কাহিনী পাই। প্রথমটি হলো, বৃত্র বধের জন্য দধীচির অস্থি থেকে বজ্র বা বজ্রাস্ত্র নির্মাণ। দধীচির অস্থি-নির্মিত এই বজ্র তিনি দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে বৃত্রহননের জন্য। দ্বিতীয়টি হল, ত্বষ্টা সূর্যের আদিরূপ স্তিমিত করে তাঁর তেজকে আপন কন্যা সরণ্যুর সহ্য ক্ষমতার মধ্যে এনেছিলেন। তৃতীয় কাহিনীটি হল, ইন্দ্র ত্রিতের বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেন। এই বিশ্বরূপ ত্রিশির ছিলেন। এই গল্পই মহাভারতে ও পুরাণে একটু রঙ লাগিয়ে বলা হয়েছে পরবর্তী যুগে। এই সব কাহিনীতে নানা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীগুলি যেমন ঋগ্বেদে আছে তেমনি পৌরাণিক যুগের গ্রন্থগুলিতেও এই সব কাহিনী বেশ রঙচঙ লাগিয়ে গল্পের মত করে পরিবেশন করা হয়েছে। এই তিনটি কাহিনী ছাড়াও আরো কিছু কাহিনী বিশ্বকর্মাকে নিয়ে বলা হয়েছে রামায়ণে ও মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে। সবগুলি কাহিনীই বিশ্বকর্মার অত্যুন্নত প্রযুক্তি কৌশল আবিষ্কারের পরিচায়ক। এই কাহিনীর কোন কোনটিতে ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মাকে প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে।

ঋগ্বেদের ত্রিশিরার কাহিনী ও বৃত্রাসুরের কাহিনী পরবর্তীকালে মহাভারত ইত্যাদির সময়ে একসঙ্গে মিলে গেছে। দুটি আলাদা আলাদা কাহিনী একটি দীর্ঘতর কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ঋগ্বেদে বৃত্রের কাহিনী হল, মহর্ষি দধীচির অস্থি থেকে ত্বষ্টা বানালেন বজ্র, সে বজ্র ত্বষ্টা দিলেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র সে বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুরকে ধ্বংস করলেন। আর ত্রিশিরার কাহিনী হল ঃ ত্বষ্টা ত্রিশিরবিশিষ্ট এক পুত্র তৈরি করলেন ইন্দ্রের অনিষ্টসাধন মানসে, তার নাম বিশ্বরূপ। তিনটি শির বা মাথাওয়ালা বলে তার নাম 'ত্রিশিরা'। ইন্দ্র ত্রিশিরার তিনটি মাথা কেটে তাকে হত্যা করেন আপ্তের পুত্র ত্রিতের বন্ধুত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে। অবশ্য দশম মণ্ডলের ৪ম সূক্তের অষ্টম-নবম ঋক বলছে ইন্দ্রই ত্রিতকে পাঠিয়েছিলেন ত্রিশিরা-বিশ্বরূপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ত্রিতই সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করেন। ত্রিশিরাকে সপ্তরশ্মি বলার অন্য কারণ এবং অন্য ব্যাখ্যা আছে। সে কথায় পরে আসা যাবে। সুতরাং ঋগ্বেদীয় কাহিনীতে বিশ্বরূপ বা ত্রিশিরাকে বধ করেন ত্রিত, আর তার মাথা তিনটি কেটে ফেলেন ইন্দ্র স্বয়ং।

মহাভারত ও অন্যত্র এই দুটি কাহিনী মিলে মিশে যে রূপ নিয়েছে তা হল ঃ ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের জন্য এক ত্রিশিরা পুত্র উৎপাদন করলেন। ত্রিশিরা একমুখে বেদ অধ্যয়ন করত, অন্য মুখে সুরাপান করত এবং তৃতীয় মুখের দিকে তাকালে মনে হতো সে যেন দিগ্বিদিক গ্রাস করতে উদ্যত। ত্রিশিরা ইন্দ্রপদ লাভের তপস্যা শুরু করল। ইন্দ্র তাকে তপস্যা থেকে কোনওভাবে নিবৃত্ত করতে না পেরে ত্রিশিরার উপর ঘোরতর অগ্নি সদৃশ বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা বজ্রের আঘাতে নিহত হল বটে কিন্তু তাকে দেখে জীবিত বলে মনে হতে থাকলো। বজ্র প্রহারে নিহত হলেও তার তেজ কিছু মাত্র কমল না, তিনটি মুখই আগের মতো তেজঃ দীপ্ত রইলো। ত্রিশিরার এই অবস্থা দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে এক সূত্রধরকে ত্রিশিরার মাথা কাটবার জন্য নিয়োগ করলেন। বহু কষ্টে ত্রিশিরার মাথা কাটলো সেই সূত্রধর। এখানে ইন্দ্র নিজে ত্রিশিরার মাথা কাটেন নি, সূত্রধর লাগিয়ে তার মাথা তিনটি কাটিয়েছেন। 'ত্রিত' ঋগ্বেদে আছে এখানে অনুপস্থিত। বিনা অপরাধে ত্রিশিরাকে হত্যা করায় ত্রিশিরার স্রষ্টা ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা ভীষণ রেগে গিয়ে আরেকটা ভীষণাকৃতির অসুর বানিয়ে ফেললেন। তার নাম হলো বৃত্রাসুর। ইন্দ্রের সঙ্গে তার যুদ্ধ হলো। বিষ্ণু বৃত্র হত্যার মোটামুটি দুরকম উপদেশ দিয়েছেন। কতকগুলি কাহিনী ঋগ্বেদের অনুসরণ করে বলছে যে, বিষ্ণু দধীচির অস্থিতে ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বজ্র বানাতে বলেন, সে বজ্রই একমাত্র বৃত্রাসুরকে ধ্বংস করতে পারবে। অন্য কাহিনীগুলি বলছে যে, সমুদ্রের ফেনার সাহায্যে বৃত্রাসুর ধ্বংস হবে এবং সেই ফেনারাশিতে বিষ্ণু তেজরূপে নিহিত থাকবেন। ফলে প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত কাহিনীর ক্ষেত্রে দেখা গেল, ইন্দ্র নিজেই মহর্ষি দধীচির কাছে গেলেন, প্রার্থনা করলেন তাঁর অস্থি। ঋষি দেবগণের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করলেন যোগবলে। ইন্দ্র তাঁর অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মার কাছে গেলেন। বিশ্বকর্মাকে নানা স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করে ইন্দ্র তাঁকে দধীচির অস্থিগুলি দিলেন বৃত্রহননকারী বজ্র নির্মাণের জন্য। বিশ্বকর্মা বজ্র বানিয়ে দিলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র নিক্ষেপ করলেন বৃত্রাসুরের উপর। বৃত্রাসুর সেই বজ্রাঘাতে নিহত হল। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কাহিনী অনুসারে, বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের একটা সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে ঠিক হয় যে, দেবতারা শুষ্ক কিংবা আর্দ্র বস্তু, প্রস্তর বা কাঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা দিবাভাগে কিংবা রাত্রিকালে বৃত্রকে বধ করবেন না। ফলে ইন্দ্র একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন দিবসও নয় রাত্রিও নয়, সমুদ্র জলের বিশাল পরিমাণ ফেনারাশি বৃত্রাসুরের উপর ছড়িয়ে দিলেন। ফেনারাশি আর্দ্রও নয়, শুষ্কও নয়, অস্ত্রও নয়, শস্ত্রও নয়, সুতরাং ওতেই বৃত্রাসুর ধ্বংস হয়ে গেল।

বিশ্বকর্মা দুটি কাহিনীতে তিনটি প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট ত্রিশিরা যতদূর মনে হয় যন্ত্র-মানব (Robot) বা ওই জাতীয় কিছু। ইন্দ্রের বজ্র তাঁর প্রাণ হরণ অর্থাৎ তাকে বিকল করলেও তার মুখগুলি অমলিন থেকেছে এবং তাকে জীবিত বলেই মনে হয়েছে। তার তেজঃ প্রভাব দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে সূত্রধর ডেকে ত্রিশিরার তিনটি মাথাই বহু কষ্টে কাটিয়েছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন মাথাগুলি ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বৃত্রাসুরও অমনি আর এক বিশাল যন্ত্রমানব (Robot)। তার কলেবর আকাশ ভেদ করে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। সৃষ্টি মাত্রই সে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হয় এবং ইন্দ্রকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত হয়। বৃত্রাসুরকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, ইন্দ্রের বজ্র তার কোন ক্ষতি করতে পারতো না। তার ধ্বংসের জন্য বিশেষ ধরনের বজ্র বানাতে হয় এবং সে বজ্রও বানিয়ে দেন বৃত্রাসুর স্রষ্টা ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা নিজেই এবং তা বানানো হয় দধীচির অস্থি থেকে। সেই বজ্রেই বৃত্রাসুর ধ্বংস হয়। ফেনা দিয়ে বৃত্রের ধ্বংস ব্যাপারটার একটা নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা আছে। সে ব্যাখায় ইন্দ্র, ত্বষ্টা ইত্যাদির নক্ষত্র হয়ে যান, বৃত্র হয়ে যায় নীহারিকার পারমাণবিক আবরণ। এই নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা বাদ দিলে মানুষের হাড় থেকে বজ্র বানানোর ব্যাপারটা কোনও বিশেষ ধরনের তেজষ্ক্রিয় পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর সামিল। সুতরাং দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মা ঋগ্বেদীয় কাহিনীর এই পর্বে যে তিনটি অত্যুন্নত প্রযুক্তির নিদর্শন রেখেছেন তাদের দুটি হল ভিন্ন ধরনের দু-দুটি বিশাল যন্ত্র-মানব (Robot) এবং একটি উন্নত ধরনের পারমাণবিক-বোমা জাতীয় অস্ত্র বা বজ্রাস্ত্র।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের পঁচাশিতম সূক্তের নবম ঋক বলেছে ঃ

"ত্বষ্টা যে বজ্রাগ্নির হিরণ্যাভতেজ ধারণ করেন এই স্বর্গ নীহারিকা আবর্তিত সহস্র তীক্ষ্ণ মুঁখতেজে নিরুদ্ধ নীহারিকা বাষ্প বৃত্রকে কর্তিত করেছে, এই সুকৃতে ইন্দ্র অবধি অর্ণবে নীহারিকা নির্মুক্ত জ্যোতিষ্ক প্রবাহ দ্যুতি বিকীর্ণ করছে।"

ত্বষ্টা হলো চিত্রা নক্ষত্র, আর ইন্দ্র হল জ্যেষ্ঠা। তারার বাষ্পীয় আবরণের ঋগ্বেদীয় নাম বৃত্র। অর্থাৎ আবর্তিত নীহারিকার পারমাণবিক আবরণ বিস্ফোরণ করে নীলাভ পরিমণ্ডলে সোনার বরণ চিত্রা নক্ষত্র সহস্র তীক্ষ্ণ-মুখ বজ্রাগ্নির তেজ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং তার দ্যুতি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র অবধি বিস্তৃত হয়েছে। এই হল উপরোক্ত ঋক তথা কাহিনীর নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা। অবশ্য আরো একটু আছে। বৃত্র ইন্দ্রকে একেবারে আবৃত করে রেখেছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রের কুক্ষি বিদীর্ণ করে নির্গত হলেন। দৃঢ় কলেবর দধীচি বা দধ্যঞ্চের দেহের অস্থি ইন্দ্র ভিক্ষা চাইলে দধীচি দেহত্যাগ করেন। ত্বষ্টা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র বানান। সেই না-শুকানো, না-ভেজা বিস্ফোরক বজ্র প্রহরণে, দিনেও নয় রাতেও নয়, সন্ধ্যাকালে, ভূমিও নয়, জলও নয়, নিরাধার মহাশূন্যে অর্থাৎ আকাশে, বৃত্রের একটি গণ্ড বিদীর্ণ করে ইন্দ্র 'বৃত্রহা' নামে জগদ্বিখ্যাত হন। বৃত্রের তিনটি গণ্ডের তৃতীয় গণ্ডটির নাম 'বৃত্র', দ্বিতীয়টির নাম 'অহি' এবং প্রথমটির নাম 'নমুচি'। বৃত্রকে ইন্দ্র, নমুচিকে শতক্রিয় এবং অহিকে মঘবন হনন করেন। বৃত্র, অহি, নমুচি যেমন বৃত্রের তথা নীহারিকার তিনটি গণ্ডের নাম, তেমনি ইন্দ্র, মঘবন ও শতক্রিয় ইন্দ্রের বহু সংখ্যক নামের তিনটি নাম। 'বৃতু' ধাতু আবর্তনার্থক, আবর্তিত হয় তাই বৃত্র। ঋগ্বেদে দধ্যঞ্চ অর্থ দধির ন্যায় শুভ্র, কোমল। দীপ্তিমান ছায়াপথ (Milky Way) দধীচির অস্থিজাত বজ্র ইন্দ্রের দ্বারা বিস্ফোরিত হয়েছিল, অর্থাৎ নীহারিকায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। সব মিলিয়ে বৃত্রাসুর বধের নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা হলো, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বা ইন্দ্র, বৃত্রের শরীরে অর্থাৎ নীহারিকায় বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেন এবং ফলশ্রুতি হিসাবে নীহারিকার পারমাণবিক আবরণ বিদূরিত হয় ও নক্ষত্রেরা প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই

ব্যাখ্যায় বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টা হয়ে যান চিত্রা নক্ষত্র এবং তখন আর স্থপতি বিশ্বকর্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এই ধরনের নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব। ঋগ্বেদে প্রায় শ'খানেক সূক্ত আছে যেখানে এই ধরনের নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব।

ত্বষ্টা সংক্রান্ত ঋগ্বেদীয় দ্বিতীয় কাহিনীটি খুবই রোমাঞ্চকর। দেবশিল্পী ত্বষ্টা-বিশ্বকর্মা সূর্যের সঙ্গে নিজের মেয়ে সরণ্যুর বিয়ে দিলেন খুব ধুমধাম করে। ত্বষ্টা তনয়া কিছুদিন সূর্যের ঘর করলেন। জন্ম দিলেন যম-যমীর। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও আদিকালের সূর্যের সেই প্রচণ্ড তেজ তিনি সইতে পারলেন না। সরণ্যু ঘর ছাড়লেন। আদিম সূর্যের সেই প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়ে বড়বানল রূপে তপস্যা শুরু করলেন। এদিকে সূর্য সরণ্যুর খোঁজে শ্বশুর বাড়ী গেলেন। ত্বষ্টাকে জানালেন সরণ্যুর ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা। শ্বশুরকে তিনি এও জানালেন যে, সরণ্যু সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরেই ঘর ছেড়েছেন। নিজের তেজ বিক্ষেপে পত্নীর বিবাগী হওয়ার ঘটনায় অনুতপ্ত সূর্যের তেজ কামানোর একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা নিলেন দেব-স্থপতি ত্বষ্টা তথা বিশ্বকর্মা। সূর্যের তেজ প্রশমনের জন্য বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা সূর্যকে চড়িয়ে দিলেন এক ঘূর্ণমান ভ্রমিযন্ত্রে। এরপর একটা বাটালী এনে বিশ্বকর্মা তাঁর গোলাকার জামাতার সাতভাগ তেজ চেঁছে বের করে দিলেন। অবশিষ্ট অষ্টমভাগ অক্ষয় বলে সেটাকে আর ছাঁটলেন না। সেই অক্ষয় অষ্টম ভাগের নাম হল 'ত্বিষা'। সেই ত্বিষা রয়ে গেল। ত্বষ্টা অনেক মাপজোক করে দেখলেন ত্বিষার অর্থাৎ সূর্যের ওই অক্ষয় অংশের তেজ সরণ্যুর সহ্য সীমায় এসেছে, কারণ সাত ভাগ তেজ ছেঁটে বের করে নেওয়া হয়েছে এবং ফলতঃ দ্রাবকাগ্নির বাষ্পাচ্ছন্ন তেজ প্রশমিত হয়েছে। সূর্যের থেকে ছেঁটে নেওয়া ওই সাতটি অংশ থেকে তৈরি হল সাতটি গ্রহ। ভ্রমিযন্ত্রে ফেলে সূর্যকে ছেঁটে ফেলার এই অপারেশন চলাকালীন সারা বিশ্ব জুড়ে প্রবল শব্দ, মহা আর্তনাদ, অতুলনীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সরণ্যুর সহ্য সীমায় নিজেকে নিয়ে আসার ইচ্ছাতেই সূর্য নিজের উপর ত্বষ্টার এই মহান শল্যচিকিৎসা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এই কাহিনীটির রূপকভেদ করলে, সূর্য থেকে সাতটি গ্রহ সৃষ্টির যে আধুনিক তত্ত্ব কিছুদিন আগেও চালু ছিল, সেই Tidal Theory-র একেবারে অনুরূপ একটি তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। আগেই বলা হয়েছে, ত্বষ্টা হলো চিত্রা নক্ষত্র। অন্ততঃ ঋগ্বেদ সেই কথাই বলছে। সুতরাং চিত্রা নক্ষত্রের প্রভাবে সূর্য থেকে সাতটি গ্রহের উৎপত্তি হয়েছিল, উপরোক্ত ওই কাহিনীর নাক্ষত্রীয় ব্যাখ্যায় সেই সত্যই ধরা পড়ে। মনে রাখতে হবে, সূর্যের ওই সব ছেঁটে ফেলা একটা অংশ থেকে তেজ নিয়ে বিশ্বকর্মা বানিয়ে ছিলেন চক্রাস্ত্র। বিশ্বকর্মা সেই চক্র দেন মহাদেবকে। মহাদেব ওই চক্র দিয়েছিলেন বিষ্ণুকে। চক্র কী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র সকলেরই জানা। এই চক্রাস্ত্রের নির্মাতা ছিলেন দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মা। দেবতাদের যত অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান, পুরী-প্রাসাদ, আমরাবতী ইত্যাদি সবকিছুর অধিকাংশই বিশ্বকর্মার হাতে বানানো। দেবতাদের বাসস্থল অমরাবতী বা অমরপুরী বানিয়েছিলেন বিশ্বকর্মা। ত্রিভুবনে অমরাবতীর তুল্য সুন্দর নগর আর নেই বলেই সর্বত্র এর প্রশংসা করা হয়েছে। তবে এই পুরী বা নগরের তুলনায় আরও কিছু উৎকৃষ্টতর পুরীর বা নগরের নির্মাণ করেছিলেন ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা, যেগুলির দু-তিনটি ছিল মহাকাশ-নগরী কিংবা অন্তরীক্ষ-নগর।

পাশুপত অস্ত্র লাভের পর অর্জুন অমরাবতীতে ইন্দ্রের কাছে গেলেন। ইন্দ্র তাঁকে বায়ু, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদির কাছে অস্ত্র-বিদ্যা শিখিয়ে পাঠালেন নিবাত-কবচদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অর্জুন ভয়ানক অন্তরীক্ষ-যুদ্ধের পর ধ্বংস করলেন সব নিবাত-কবচদের, দখল করলেন তাদের অপূর্ব সুন্দর নগরী।

অর্জুন দানব-নগরীর উৎকৃষ্টতর রূপ দেখে মোহিত হলেন এবং মাতলির কাছে জানতে চাইলেন ওই দানবপুরী অমরাবতীর চেয়েও সুন্দর কেন! মাতলি অর্জুনকে যা উত্তর দিয়েছিলেন তা এই রকমঃ

"বিশ্বকর্মাই এই দানবপুরীর স্থপতি ও স্রষ্টা। বিশ্বকর্মা এই পুরী বানিয়েছিলেন দেবরাজের জন্য। কিন্তু নিবাত-কবচগণ ভীষণ তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এই বর লাভ করেন যে, এই পুরী হবে নিবাত-কবচদের বাসস্থান। বর লাভ করে তারা দেবতাদের এই নগর থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে অমরাবতীর চেয়ে উৎকৃষ্ট এই নগরী দানবদের হাতে চলে যায়।"

নিবাতকবচরা অর্জুনের হাতে নিহত হলে দেবরাজ আবার ওই নগরের দখল পান। এই নগর অন্তরীক্ষের। আর অর্জুন নিবাত-কবচের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্র-সারথি মাতলি ওই যুদ্ধে অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন। অন্তরীক্ষের দেবলোকে ফিরে আসবার সময় কালকঞ্জাদি দানবদের আকাশচারী নগর দেখেন অর্জুন। পুলোমা ও কালকা নামের দুই অসুরী দিব্য সহস্র বৎসরের তপস্যার পর ব্রহ্মার বর লাভ করেন। ব্রহ্মা তাঁদের এই বর দেন যে, তাঁদের পুত্রগণ অল্প দুঃখভোগী ও দেবতা-রাক্ষস-নাগদের দ্বারা অবধ্য হবে। বর ছাড়াও ব্রহ্মা তাঁদের বসবাসের জন্য ওই আকাশচারী বিশাল নগর দান করেন। এই অদ্ভুত নগর, আকাশে ভ্রাম্যমান বিশাল নগর বা বিমান বানিয়েছিলেন ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা স্বয়ং। এর নাম 'হিরণ্যপুর'। এই সুন্দর, বিশাল, বৈমানিক নগর কখনও আকাশে উঠতো, কখনও মাটিতে নামতো, কখনও বা জলের মধ্যে ডুবে যেতো। এর গতি ছিল কখনও সোজা, কখনও কোণাকুণি, কখনও বৃত্তাকার। মোটামুটি সর্বত্রগামী বিশাল এক অত্যাধুনিক মহাকাশযান (Space-Station) বা মহাকাশনগর ছিল বিশ্বকর্মা নির্মিত ওই হিরণ্যপুর। এ ধরনের মহাকাশ-নগরী আধুনিক প্রযুক্তিবিদরা এখনও বানাতে পারেন নি। দূর ভবিষ্যতে হয়ত এঁরা বানাবেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা ওই হিরণ্যপুর বানিয়েছিলেন বেশ কয়েক হাজার বছর আগে। সুতরাং প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বকর্মা-ময়দানবেরা অনেক এগিয়ে। হিরণ্যপুরে কয়েক হাজার দানব বাস করত। তাদের নিয়েই মহাকাশ-বন্দর হিরণ্যপুর আকাশে বিমানের মত চলে ফিরে বেড়াতো বিশাল গতিবেগে। অর্জুন পাশুপত অস্ত্রে বিশ্বকর্মার কারিগরী বিস্ময় ওই হিরণ্যপুর ধ্বংস করেন ওখানে বসবাসকারী দানবদের ধ্বংস করতে।

[4] ময়দানবের ত্রিপুর ঃ

দানব-স্থপতি ময়ের প্রাযুক্তিক কাণ্ডকারখানার বিবরণে আসবার আগে, ময় বা ময়দানবকে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান কেমনভাবে চিত্রিত করেছে তা দেখা যাক। অতি প্রাচীন কালের জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রবর্তকদের যে সব নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন, ব্রহ্মা, সূর্য, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, মরীচি, অগস্ত্য, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, গর্গ, সোম, পরাশর, ব্যাস, বাল্মীকি, ময় ও যবন। এঁদের অনেকের নাম মাত্র জানা আছে, এঁদের রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ আজও অনাবিষ্কৃত। একটি বা দুটির নতুন সংস্করণ পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যেই এই সব শাস্ত্র প্রবর্তকদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের আলোচ্য ময় বা ময়দানবের কথা বলতে পারি। 'সূর্যসিদ্ধান্ত' বলেছে, গণিতজ্ঞানে তুষ্ট হয়ে সূর্য ময়দানবকে গ্রহচার বলেন। 'সূর্যসিদ্ধান্ত' হল অতি প্রাচীন গ্রহ-গণিত গ্রন্থ। সেখানে বলা হয়েছে, সূর্যের কাছ থেকে ময়দানব যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান পেয়েছিলেন সেই জ্ঞানই সূর্যসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করছেন। অথচ ময়ের লেখা কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ আজও পাওয়া যায় নি। অবশ্য সূর্য-সিদ্ধান্তের দাবী হল এই গ্রন্থের মূল রচয়িতা হলেন স্বয়ং ময় বা ময়দানব। সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের জ্ঞানযুক্ত ময়দানবের দ্বারাই গ্রন্থিত হয়েছিল

এই সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং এই প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা নিয়েই সূর্যসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার, ময়দানবের নাম গ্রন্থকার হিসাবে অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ময় কেবল স্থপতিই ছিলেন না, ছিলেন সেকালের নামকরা জ্যোতির্বিদ। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান এতো উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সে কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান তার অত্যন্ত অদ্ভুত আধুনিকতা নিয়ে এ যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে অনায়াসেই পাল্লা দিতে পারে। মহাকাশ গবেষণায় প্রাচীন ভারত ছিল পৃথিবীর সেরা এবং এ যুগে, এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের রমরমার যুগেও, প্রাচীনকালে লব্ধ তার সেই জ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কারের কৃতিত্বও ম্লান করে দিচ্ছে। সমানে পাল্লা দিচ্ছে এই এতোদিন পরেও।

সুতরাং ময় বা ময়দানব ছিলেন একাধারে স্থপতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। অবশ্য ভালো স্থপতি হতে হলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ভালো দখল থাকা দরকার। এ যুগেও তা সমান সত্য। প্রাচীনকালে, ব্রহ্মা, মরীচি, অঙ্গিরা, প্রভৃতির সিদ্ধান্ত দৈব-সিদ্ধান্ত, পরাশর, যবন, ময়, গর্গকৃত সিদ্ধান্ত আর্য-সিদ্ধান্ত এবং আর্যভট, বরাহমিহির, ভাস্করাদি প্রণীত সিদ্ধান্ত মানব-সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হয়। মানব সিদ্ধান্তের রূপান্তর সম্ভব। আর্য-জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তে বীজ প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু দৈব-জ্যোতিষের সিদ্ধান্তে বা দৈব-সিদ্ধান্তে কোন প্রকার পরিবর্তন করতে পুরাকালের লোকের সাহস হত না, মূল গণনাক্রম ঠিক রেখে কেবল অবান্তর বিষয়ে সংস্কার চলতে পারত। বরাহমিহির থেকে পরবর্তী কালের আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি সমুদয় সিদ্ধান্তকারকে শ্রুতি, স্মৃতি, সংহিতার সঙ্গে সিদ্ধান্তের ঐক্য রাখতে হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণসমূহ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র স্মৃতিবাচ্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র হিসাবে প্রামাণ্য, যে পর্যন্ত সেগুলি শ্রুতিকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে কেবল সে পর্যন্ত।

ঋগ্বেদ কালপুরুষ (Orion) তারকামণ্ডলীর মধ্যভাগে ঘনায়মান তিনটি তারকার নাম দিয়েছে পণিগণ, ইল্বলা ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষে কালপুরুষের কোমরবন্ধনীর (Orion's Belt) তিনটি তারার নাম দেওয়া হয়েছে ময়, বিদ্যুন্মালী ও তারকাসুর। বিদ্যুন্মালী পৌরাণিক কাহিনীতে তারকাসুরের পুত্র হিসাবে কল্পিত। একদল পণ্ডিতের মতে. বাল্মীকি রাম-সীতার সুখ-দুঃখাধীন মানব চরিত্র বর্ণনা করলেও তাঁর রাম-সীতার লোকোত্তর নক্ষত্র-চরিত্র বিদ্যমান। তাঁদের মতে তারকা রাক্ষসী, মারীচ, রাবণ, ময়দানব, কুম্ভকর্ণ, সরমা, রাক্ষসী এবং রাক্ষসদের প্রপিতাম- পুলস্ত্য প্রভৃতি সকলে আকাশের বা দিব্যলোকের দানব তারা। দুর্বাসা, পরশুরাম ইত্যাদি গ্রহ, এব, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা হলেন দ্যুলোকের বিভিন্ন তারা। এইভাবে বহু পৌরাণিক কাহিনীর নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কাহিনীগুলির ব্যাখ্যাও নক্ষত্র দিয়ে করলে যথেষ্ট সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ অনুসারে, জ্যোতির্বিদ ও স্থপতি ময় হয়ে যান একটা নক্ষত্র মাত্র যে নক্ষত্র অবস্থান করছে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর কোমরবন্ধনীতে। ওই কোমর বন্ধনীর তিনটি জ্বলজ্বলে তারা প্রথমটি হল ময়, দ্বিতীয়টি বা মাঝখানেরটি হল বিদ্যুন্মালী ও শেষেরটি তারকাসুর। সুতরাং ময় আকাশের তারা, প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ্। তাঁর জীবনের পৌরাণিক ঘটনাবলী অবশ্য তাঁর নাক্ষত্রিক জীবনের চেয়ে প্রযুক্তিবিদের জীবনটাকেই বেশি পরিস্ফুট করে।

আগেই বলা হয়েছে Orion বা কালপুরুষের ডানহাত হলো রুদ্রনক্ষত্র, যা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আর্দ্রানক্ষত্র বা ইংরেজীতে হলো Betelgeuse। বাঁ-হাতের ঋগ্বেদীয় পিণাকী রুদ্র নামের নক্ষত্রটির ইংরেজী নাম Bellatrix। কালপুরুষের বাঁ হাতের নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম পিণাকী রুদ্র। এর কারণ হলো, এই নক্ষত্রের সামনে আকাশের গায় চমৎকার ভাবে সাজানো কয়েকটি ক্ষুদ্র তারা ধনুকের মত আকৃতির বিশিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে। কালপুরুষের বাঁ হাতে ধরা ধনুকাকারে সজ্জিত মৃদু প্রভার এই তারাসমূহ পিণাকী রুদ্রের 'পিণাকী ধনু'। এরই পৌরাণিক নাম 'আজগবধনু' বা 'হরধনু'।

কালপুরুষের বাঁ পায়ের নক্ষত্র হলো ঋগ্বেদীয় স্থানুরুদ্র, যার পৌরাণিক নাম 'বাণলিঙ্গ' এবং ইংরেজী নাম Rigel। তেমনি কালপুরুষের ডান পায়ের তারার ঋগ্বেদীয় নাম কপর্দীরুদ্র এবং ইংরেজী নাম Saiph । কপর্দীকে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ঋগ্বেদের নামেই ডাকতো, কারণ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এই নক্ষত্রটির নতুন কোন নামকরণ করা হয়নি।

এই চারটি রুদ্র তারার প্রায় চতুষ্কোণ শরীরের মধ্যভাগে সমসূত্রে ঘনায়মান তিনটি তারা কালপুরুষের মেখলা (Orion's Belt)। এই তারকাত্রয়ের একটু পরেই বাষ্পাবৃত তারকাগুচ্ছ বা Great Nebula in Orion। কালপুরুষের মধ্যস্থিত এই Nebula যেন এক গুপ্ত সম্পত্তি। ঋগ্বেদ ওই তিনটি তারকাকে বলছে পণিগণ। আর এই Nebula হল তাদের গুপ্তনিধি। ঋগ্বেদের 10ম মণ্ডলের 108-তম সূক্তে Great Nebula in Orion অথবা পণিগণের অধিকৃত এই নীহারিকার ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অসংখ্য তারকার গুপ্তনিধি নিয়ে সরমা ও পণিগণের সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু পৌরাণিক মতে কালপুরুষের কটিবন্ধের তারা তিনটির নাম হল ঃ ময়দানব, বিদ্যুন্মালীদৈত্য ও তারকাসুর। এই তিন জ্যোতিষ্কের সঙ্গে ত্রিপুরারি শিবের যে ত্রিপুর-ধ্বংস-কাহিনী জড়িয়ে আছে তারও নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব।

"মহামায়াবী মায়ার জনক ময় নামক অসুর এই বিপ্র অন্যান্য দৈত্যদের অনুগ্রহ করার জন্য তপস্যা করতে থাকলেন। তাঁর মত একই উদ্দেশ্যে একই পংক্তিতে বলবান বিদ্যুন্মালী এবং বীর্যবান তারকাসুর পরম তপোনিমগ্ন হলেন। তাঁরা ময়ের তেজঃ সমাক্রান্ত হয়ে এক পংক্তিবদ্ধ ময়ের দু'পার্শ্বগত দীপ্ত মূর্তিত্রয়ের বা অগ্নিত্রয়ের মত দেখা যেতে থাকলেন। তিন দানবের তপস্যায় লোকত্রয় তাপিত হতে থাকলো।"

দেবতারা ভয় পেয়ে ব্রহ্মা বা রোহিণী নক্ষত্রের পরামর্শ চাইল। ব্রহ্মা বললেন, 'ময়দানব, বিদ্যুন্মালী ও তারকাসুরের এই তেজ একটি বাণে বিদ্ধ করা যায়। রুদ্র ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। কিরণ বিক্ষেপ করে বলেই নক্ষত্রেরা তারা নামে অভিহিত হয়'। Betelgeuse বা রুদ্র কিংবা আর্দ্রা তারার দক্ষিণবিক্ষেপে কালপুরুষের মেখলায় তারকাত্রয় অবস্থিত। দেবতারা রুদ্রকে বললেন, দানবদের তেজ দেবতাদের অপেক্ষা বেশি। দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক তেজ আপনার এজন্য আপনি মহাদেব। হে মহাদেব, আপনি এই ত্রিপুর সংহার করুন। রুদ্র বললেন, ত্রিপুর তেজোশরে বিদ্ধ করব, সংহার করব না। রুদ্র সংবৎসরকে শরাসন ও অদিতিকে ধনুকের জ্যা করে সহাস্যে বললেন, 'কে আমাকে বহন করবে?' ব্রহ্মা বহন করতে সম্মত হলেন। মহাদেব বৃষরূপী রোহিণী নক্ষত্রে আরোহণ করলেন। রুদ্রের বাণ নিক্ষিপ্ত হল এবং তা দক্ষিণবিক্ষেপে ত্রিপুর বিদ্ধ করল এবং ওই বাণ বাম বিক্ষেপে বৃষরূপ বাহন ব্রহ্মাকে বিদ্ধ করল। ত্রিপুর বিদ্ধ করে রুদ্রের নাম হল ত্রিপুরারি। দেবতাদের শঙ্কা হরণ করায় শঙ্কর, হর ইত্যাদি। মহাভারতে ও পৌরাণিক কালে এই কাহিনী অনেকটা বদলে যায়। তাতে কাহিনীটি অনেকটা বাস্তবোচিত রূপ পায়। ফলে, কাহিনীটির নাক্ষত্রিক ব্যাখার বদলে তার পার্থিব রূপটিই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছে এবং ঘটনাটি সহজ, সরল ও সাধারণের বোধ্য হয়ে উঠেছে। ত্রিপুর ধ্বংস নিয়ে মহাভারতের তথা পৌরাণিক কাহিনী কিছুক্ষণ পরেই আলোচিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে নাক্ষত্রীয় ব্যাখ্যায় খাণ্ডব বন দহনের কাহিনী কেমন রূপ পায় দেখা যাক। এই খাণ্ডববন দহনের সঙ্গে স্থপতি ময়ও জড়িত আছেন।

ত্বষ্টা বা চিত্রা তারা যেমন দেবস্থপতি বিশ্বকর্মা, তেমনি ময়দানব তারা হলো দানবশিল্পী ও স্থপতি। অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নি নক্ষত্র কৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছে খাণ্ডববন পুরোটাই আহুতি চাইলেন। তখন ওই বনের অধিবাসী ময়দানব তারা প্রাণ নিয়ে বেগে পালাচ্ছেন দেখে অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নি নক্ষত্র তাঁকে

খেতে চাইলো। কৃষ্ণ ময়কে মারার জন্য চক্র উদ্যত করলেন। অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ নিরস্ত হলেন। কৃতজ্ঞ ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য ত্রিলোক বিখ্যাত অননুকরণীয় সভা নির্মাণ করে দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের সভা দ্বাপর যুগের কথা। ময়দানব ত্রেতাযুগের রামের কালেও ছিলন। আবার কলিযুগেও সূর্য ময়দানবকে গ্রহচার বিদ্যা দান করেছেন। সুতরাং ময়দানব ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই তিন যুগেই বিদ্যমান ছিলেন। ময় পার্থিব দানব নন, কালপুরুষের কোমরবন্ধনীর তিনটি তারার একটি। তাই শুধু পার্থিব ত্রেতা, দ্বাপর, কলিই নয়, আকাশে যুগ-যুগান্ত বিদ্যমান থাকা ময়দানব তারার পক্ষে এগুলি অসম্ভব কিছু নয়। সূর্যলব্ধ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের জ্ঞানযুক্ত ময়দানব তারার জীবনসত্তা অশন (ভোজন করে) করেই নিজের পার্থিব জন্মে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রন্থন করেছেন, এই ধরনের প্রাচীন ভাবনাই ময়দানবকে সূর্যসিদ্ধান্তের আদি গ্রন্থকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। দূরবীক্ষণে দেখলে কালপুরুষের কোমরবন্ধনীর তারা তিনটির পরের নীহারিকার আকৃতি অশ্বমুণ্ডের মত দেখায়, তাই এই কালাগ্নির নাম 'হয়শীরা'। প্রাচীন ঋষিরা এই কালাগ্নির কথা বা 'হয়শীরা' নীহারিকার কথা কেমন করে জানলেন তা এক বিস্ময়।

যজ্ঞাগ্নিতে জ্বলন্ত খাণ্ডববন থেকে যে চারটি শার্ঙ্গকপক্ষি বিন্ধ্যাচলে উড়ে গিয়েছিল তারাও দৃষ্টিগ্রাহ্য জ্যোতিষ্ক। আকাশের একেবারে দক্ষিণ দিগন্তের অগস্ত্য তারা এবং শ্বাতারার মাঝখানে অনেকগুলি ক্ষীণালোক তারার হাটে লাঙ্গলের ফালার মত আকাশে বিন্যস্ত যে চারটি উজ্জ্বল তারা আছে সেই চারটি তারাই শার্ঙ্গকপক্ষি। এদের নাম 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' অনুসারে পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ। সুতরাং খাণ্ডব বন দহন সম্ভবতঃ হয়গ্রীব বা হয়শীরা নীহারিকা হতে নক্ষত্রের উৎপত্তির ঘটনা সূচিত করে। ঋগ্বেদ ও সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের এই নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা ছেড়ে ময়দানবের পৌরাণিক পার্থিব কাহিনীর দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক।

মহাভারতে ত্রিপুর ধ্বংস সম্পর্কে যে কাহিনী আছে তা এই রকম। তারকাসুর বধের পর তারকাসুরের তিন পুত্র তারকাক্ষ, ক-- লাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর পেলেন যে, তাঁরা তিনটি আকাশগামী কামনগরীতে বাস করতে পারবেন, যেখানে সব রকম অভীষ্ট বস্তু থাকবে, দেব-দানব-যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি যা বিনষ্ট করতে পারবে না এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্র-শস্ত্র বা ব্রহ্মশাপেও যার হানি ঘটবে না। এই তিন নগরে তাঁরা অবস্থান করে আলাদা আলাদা বিচরণ বা আকাশ পরিক্রমা করবেন। হাজার বছর পরে তাঁরা তাঁদের তিনটি নগর সহ মিলিত হবেন তখন তাঁদের ত্রিপুর এক হয়ে যাবে। সেই সময় যে দেবশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত ত্রিপুরকে এক বাণে বিদ্ধ করতে পারবেন তিনিই তাঁদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহ্মার কাছে এই বর পেয়ে ময়দানবকে ভার দেওয়া হল ত্রিপুর নির্মাণের। তারকাসুরের তিন পুত্র ময়দানবকে নিয়োগ করলেন আকাশগামী কামাচারী তিন পুরী বা ত্রিপুর নির্মাণের জন্য।

দানব স্থপতি ময় বহু পরিশ্রমে তিনটি পুরী বানলেন। তিনি একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের এবং একটি কৃষ্ণ লৌহের পুর বা পুরী নির্মাণ করলেন। প্রথম পুরটি স্বর্গ, দ্বিতীয় পুরটি অতরীক্ষ এবং তৃতীয়টি পৃথিবী পরিক্রমা করত। তাদের গতিবেগ এমন ছিল যে, প্রত্যেক এক হাজার বছরে তিনটি পুর একটি রেখায় বা সমসূত্রে এসে মিলে মিশে একটা পুর বা পুরী হয়ে যেতো। এই ত্রিপুরের প্রতিটি পুর চক্রযুক্ত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভৃতি সমন্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণময়পুরে, কমলাক্ষ রৌপ্যময়পুরে এবং বিদ্যুন্মালী লৌহময়পুরে বাস করতে লাগল। দেবতাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কোটি কোটি দৈত্য এসে সেই ত্রিপুর দুর্গে আশ্রয় নিল।

ময়দানব তাদের সব চাহিদা মায়াবলে পূরণ করলেন। তারকাক্ষের হরি নামের এক পুত্র, ব্রহ্মার বর পেয়ে প্রত্যেক পুরে একটা করে মৃতসঞ্জীবনী পুষ্করিণী নির্মাণ করলো। মৃত দৈত্যদের সেই পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করলে তারা পূর্বের রূপে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত। ত্রিপুর শুধু বিশাল বিশাল তিনটি মহাকাশ স্টেশনই নয়, সেগুলিতে নির্মিত হয়েছিলো বিশাল বিশাল পরীক্ষাগার, যার সাহায্যে মরা মানুষ বা দৈত্য বাঁচানো যেত। ফলে, দৈত্যেরা চতুর্দিকে নানা অনাচার করে বেড়াতে থাকলো এবং তাদের ধ্বংস করা দেবতাদেরও অসাধ্য হয়ে পড়ল। ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষেপেও ত্রিপুর ধ্বংস হলো না। হওয়ার কথাও নয়। ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন কিংবা Plan দিয়েছিলেন এমনভাবে যে, প্রতি হাজার বছরে সমসূত্রে তিনটি পুর না আসা অবধি কেউ তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। তার উপর ত্রিপুর তিনটি এক হয়ে গেলে তাকে এক বাণে বিদ্ধ করতে হবে, না হলে ত্রিপুর ধ্বংস হবে না। সুতরাং এই সব শর্ত পূরণ না হওয়া অবধি ইন্দ্রের বজ্র ত্রিপুরের কোনও ক্ষতি করতে পারল না। ফলে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন দৈত্য বধের উপায় জানতে।

দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশে ঈশানকে রাজী করালেন ত্রিপুর ধ্বংস করার জন্য। ঠিক হল, এই ত্রিপুর ধ্বংস করার জন্য বিশ্বকর্মা এক বিশাল রথ বানাবেন যাতে করে রুদ্রদেব অন্তরীক্ষে যাবেন এবং অপেক্ষা করবেন সহস্র বছর যখন ত্রিপুরের তিনটি বিশাল পুরী সমসূত্রে আসবে। সেই রথের সারথি হবেন স্বয়ং ব্রহ্মা। শুধু তাই নয়, ঈশান বা শঙ্কর সব দেবতার তেজের অর্ধেক নিয়ে তেজস্বী হলেন। এতে তাঁর নাম হল মহাদেব। অন্তরীক্ষে গিয়ে মহাদেব তাঁর ধনুতে জ্যা রোপণ এবং পাশুপত অস্ত্র যোগ করে অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় দানবদের তিন পুরী একত্র মিলিত হল। মহাদেব তাঁর দিব্য ধনু আকর্ষণ করে ত্রিপুর লক্ষ্য করে বাণ মোচন করলেন। মহাদেবের বাণে জ্বলে উঠলো ত্রিপুর, তুমুল আর্তনাদ উঠলো ত্রিপুর হতে। ত্রিপুর আকাশ থেকে পড়তে থাকলো এবং দানবগণের সঙ্গে দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হল। মহেশ্বর তখন হাহা রবে তাঁর ক্রোধজনিত অগ্নিকে নির্বাপিত করে বললেন, ত্রিলোক ভস্ম করো না। পাশুপত অস্ত্রে ত্রিভুবন জুড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। তাই সে আগুন মহাদেবেই নিভিয়ে ফেললেন। আগুন তাঁর ক্রোধের নয় পাশুপত অস্ত্রের। ত্রিপুর ধ্বংস করতে মহাদেব পাশুপত অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। অর্জুনও আকাশচারী হিরণ্যপুর ধ্বংসের জন্য পাশুপাত অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। হিরণ্যপুর বানিয়েছিলেন দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা আর ত্রিপুর বানিয়েছিলেন দানব স্থপতি ময়দানব।

মহাভারতে পাওয়া যায়, ময়দানব বাস করতেন খাণ্ডববনে। শ্বেতকি রাজার বহু বর্ষব্যাপী যজ্ঞে প্রচুর হবি ভোজন করে অগ্নির হল অগ্নিমান্দ্য। তাঁর রূপ হল মলিন। ব্রহ্মা উপদেশ দিলেন অগ্নিকে যে, তাঁর অগ্নিমান্দ্য দূর হবে, যদি তিনি খাণ্ডববনের সব পশু-পাখি ভোজন করেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্নি সাতবার খাণ্ডববন দহনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সাতবারই ব্যর্থ হন। অবশেষে খাণ্ডববন দাহ করার ব্যাপারে অগ্নি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রের সখা তক্ষক যেহেতু খাণ্ডববনে বাস করেন, ইন্দ্র তাই বার বার বাধা দিয়ে অগ্নিকে খাণ্ডববন ভোজনে বিরত রাখেন। কিন্তু অগ্নির অগ্নিমান্দ্যের জন্য খাণ্ডববন দহনই একমাত্র ঔষধ, তাই কৃষ্ণার্জুন অগ্নিকে খাণ্ডববন দহনের কাজে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। নর-নারায়ণ অগ্নিকে সাহায্য করলে অগ্নি খাণ্ডববন দহন করে সেখানকার সমস্ত প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করে তাঁর অগ্নিমান্দ্য দূর করেন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেন, নমুচির ভ্রাতা ময়দানব এবং চারটি শার্ঙ্গক পক্ষী এই ছটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ জীবিত রইল না সেই বিশাল খাণ্ডববনে। ময়দানব যখন পালাচ্ছিলেন খাণ্ডববন থেকে তখন কৃষ্ণ

তাকে মারবার জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ নিরস্ত হলেন। ময়দানব প্রাণে বাঁচলেন। হাত জোড় করে অর্জুনকে বললেন, 'কৌন্তেয়, আপনি কৃষ্ণের ক্রোধ আর অগ্নির দহন থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকার কি করব বলুন?' অর্জুন কিছু নিতে রাজী হলেন না। ময়দানব কিন্তু প্রতিদান হিসাবে কিছু নিতে অর্জুন বারে বারে অনুরোধ জানালেন, অর্জুন তবুও অরাজী। দানবগণের বিশ্বকর্মা ও মহাশিল্পী ময়দানবকে কৃষ্ণ অবশেষে বললেন, 'শিল্পীশ্রেষ্ঠ, যদি তুমি আমাদের প্রিয়কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন এক সভা নির্মাণ কর, যার অনুকরণ মানুষের অসাধ্য।' ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভাগৃহ বানাতে লেগে গেলেন। তিনি চতুর্দিকে দশ হাজার হাত (5000 গজ) পরিমাপ করে সর্ব ঋতুর উপযুক্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন। সুতরাং সভাগৃহ নির্মাণের জন্য ময়দানব মোটামুটি 9 বর্গ মাইল এলাকা নির্দিষ্ট করেন ইন্দ্রপ্রস্থের একেবারে কাছাকাছি।

নানাদেশ থেকে তিনি নিজে ও তাঁর কিঙ্করেরা নানা মাল-মশলা নিয়ে এলেন সভা তৈরি করবার জন্য। চৌদ্দমাস ধরে নিরলস পরিশ্রমের পর যে সভা তৈরি হল তা আকাশে ভাসমান বিশাল বিমান এবং যা পৃথিবীতে অতুলনীয় এবং অননুকরণীয়। মহাভারত বলছে ঃ "তারপর ময় ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হল। এই সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত করে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, বহুবিধ উত্তম দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কিঙ্কর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময়দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিক নির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম, মৎস ও কূর্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন তাঁদের কেউ কেউ সরোবর বলে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলন। সভাস্থলের সকল দিকেই পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকারণ্ডবাদি সমন্বিত পুষ্করিণী ছিল।" (মহাভারত, সভাপর্ব, রাজশেখর বসু অনূদিত)। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো আট হাজার কিঙ্করসহ যুধিষ্ঠিরের এই 'নবসচিবালয়' আকাশে ভাসমান ছিল। আর বুদ্ধিমান রাজাদেরও মতিভ্রম ঘটানোর সামর্থ্য ছিল শিল্পী স্থপতি ময়দানবের তাঁর অপূর্ব স্থাপত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। অমন যে মহামানী বুদ্ধিমান দুর্যোধন তাঁকেও ময়দানব নির্মিত হ্রদ চিনতে না পেরে হাবুডুবু খেতে হয়েছিল ওই কৃত্রিম হ্রদের জলে। সুতরাং স্থপতি ময়দানবের ওই সৃষ্টি ছিল পৃথিবীর সেরা অতুলনীয় এবং অননুকরণীয়।

যাইহোক, ময়দানব ছিলেন অতীত ও বর্তমানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব স্থপতি। তাঁর অপূর্ব স্থাপত্য সৃষ্টি এযুগের প্রযুক্তিবিদদেরও বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিশ্বকর্মা ছাড়া প্রাচীন স্থপতিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি ময়দানবের সমকক্ষ। অনেকে অনুমান করেন, দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার বিশাল বিশাল স্থাপত্যের কারিগর এই ময়দানব। আর ময় বানিয়েছিলেন বলেই ওই সভ্যতার নাম মায়া-সভ্যতা।

5. অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ ঃ

মহর্ষি অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণের কাহিনী মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণগুলিতে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, সমুদ্র শোষণ এখন আর অবাস্তব কোন ঘটনা নয়। পৃথিবীর দুটি বৃহৎ শক্তিই এমন একটি রাসয়নিক পদার্থ তৈরি করেছেন, যা ছড়িয়ে দিলে সমুদ্রের জল জেলির মত থকথকে হয়ে যাবে। তাকে ভেদ করা যাবে না। সাবমেরিন পড়বে আটকা। এই অবস্থায় উচ্চ শক্তির লেজার রশ্মি দিয়ে খানিকটা জায়গা একেবারে শুকিয়ে নিয়ে সমুদ্রতল খুঁড়ে আত্মগোপন করা

বা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ যুগের বিজ্ঞান এই ঘটনা যে সম্ভব তা মেনে নিয়েছে।

বৃত্রাসুর নিধনের পর কালকেয় দানবেরা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় নিল। তারা থাকতো সমুদ্রের জলের ভিতরে। কালকেয় দানবগণ রাত্রিকালে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে তপস্বী ব্রাহ্মণদের বধ করতে লাগল। বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি মহাসমুদ্র পান করে ফেলুন, তা হলে আমরা কালকেয়গণকে বধ করতে পারব। অগস্ত্য সম্মত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময় তরঙ্গায়িত জলজন্তু সমাকুল সমুদ্রের তীরে এলেন এবং মহাসমুদ্রের জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন, হতাবশিষ্ট কিছু দানব বসুধা বিদীর্ণ করে পাতালে আশ্রয় নিল। দেবতারা অগস্ত্যকে বললেন, আপনি যে জল পান করেছেন, তা উদগার করে সমুদ্র আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে। তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর। পরে অবশ্য ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করে সমুদ্র পূর্ণ করেন। মহাভারত বলছে ঃ

"অনন্তর নিতান্ত অভিমানী দানবদল দেবগণ কর্তৃক একান্ত তাড়িত ও আহত হইয়া ব্যাকুল চিত্তে মীন-মকর-কুম্ভীর-সমাকীর্ণ অগাধ সাগরগর্ভে প্রবেশপূর্বক একত্র মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ......দানবগণ তরঙ্গ দুর্গম সাগর দুর্গে বাস করিয়া লোক বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ মন্ত্রণা অবধারণ করিল।"

সাগরের জলের মধ্যে নির্মিত এই দুর্গ কি বিশাল আকৃতির সাবমেরিন? সাবমেরিন জাতীয় কোনও জলযান ছাড়া এগুলি আর কী-ই বা হতে পারে? তারা দিনের বেলায় সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করায় তাদের বধ করা তো দূরের কথা তারা দিনের বেলায় সমুদ্রের ঠিক কোন জায়গায় আছে তা নির্ণয় করাই সম্ভব হতো না। ফলে সমুদ্রগর্ভ নিবাসী কালকেয় দানবদের অত্যাচারে পৃথিবীতে হাহাকার উঠল। দেবতারাও কিছু করতে পারলেন না। কারণ সমুদ্রগর্ভে ইন্দ্রের বজ্র অচল এবং অকেজো, তাই বিষ্ণু পরামর্শ দিলেন সমুদ্রের জল শোষণের। মহর্ষি অগস্ত্যকে দেওয়া হল সেই সমুদ্র-শোষণের ভার এবং তিনি সমুদ্র শোষণ করলে কালকেয়দের নিধন করলেন দেবতারা। কিছু দানব পালিয়ে গিয়ে মাটির তলায় আশ্রয় নিল। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এইসব ঘটনার কোনটাই আজ আর অবাস্তব নয়। সাবমেরিন যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে সমুদ্রের জলকে জেলির মত করে উচ্চশক্তি সম্পন্ন লেজার রশ্মি দিয়ে খানিকটা জায়গা শুকিয়ে নিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকা। সুতরাং কালকেয় দানবদের কাহিনী, মহর্ষি অগস্ত্যের সাগর শোষণ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় এখন আর কোনভাবেই অলীক গল্প মাত্র নয়। এইসব কাহিনীর বাস্তবতা কোনও এক সময় ছিল। পরবর্তীকালে মহাভারতের সময়ে কিংবা তারও কিছুটা পরে এই সব বাস্তব বর্ণনায় জড়িয়ে যায় কিছু অলৌকিকতা কিংবা অসামঞ্জস্য এবং আরও অনেক পরে তাদের মনে হয় কেবল অলীক কাহিনী মাত্র। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে ওই সব কাহিনীর সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণের একটা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটিতে এই ব্যাখ্যা যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা এই রকম ঃ

"কাহিনীর অগস্ত্য মুনি মহাকাশের অগস্ত্য তারকা। অগস্ত্য তারকার অবস্থান দক্ষিণ আকাশে। আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারকার নাম লুব্ধক, বিদেশি নাম Sirius। Canis Major মণ্ডলের তারকা এটি।

অগস্ত্য তারকা ঔজ্জ্বল্যে লুব্ধকের পরেই। সুতরাং ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে আকাশের দ্বিতীয় তারকা অগস্ত্য। এটি Carina মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, অবস্থান লুব্ধক তারকা থেকে কিছুটা দক্ষিণে। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে মহাকাশ পটভূমিতে অগস্ত্য তারকার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য পৌরাণিক দিক দিয়েও তারকাটিতে একটি বিশিষ্ট মুনির রূপবৈচিত্র্য আরোপ করা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব 12000 অব্দের কাছাকাছি সময়ে তারকাটি ছিল দক্ষিণ আকাশের মেরুতারকা। পৃথিবীর আবর্তন বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি ছাড়া মেরুদ্বয় 26000 বছরে (প্রকৃত পক্ষে, 25,800 বছরে) একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। ফলে মেরুর স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেরুতারকাও ধ্রুবত্ব হারায়। যে অগস্ত্য তারকা ছিল এককালে দক্ষিণ আকাশের মেরুতারকা, বর্তমানে সে মেরু সন্নিহিত বিশিষ্ট স্থান থেকে বিচ্যুত।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মহাকাশে বিশেষ উজ্জ্বল তারকা অগস্ত্যের পরিচয় দেবার পরে এবারে শোষিত সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়া যাক। মহাকাশ পটভূমিতে সমুদ্র কোথায়? মহাকাশে মোটামুটিভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে ছায়াপথ দেখা যায়, তাই হল মহাকাশ পটভূমির সমুদ্র। এর অন্য নাম ক্ষীরসাগর বা দুগ্ধসমুদ্র। পৌরাণিকেরা কল্পনা করেন, অগস্ত্য এই সমুদ্র শোষণ করেছিলেন।

মহাকাশে ছায়াপথটি 2টি মেরুর ভেতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে সাধারণভাবে একটি বৃত্তাকার পথে প্রবাহিত। বৃত্তাকার পথের একাংশে বৃষ রাশি এবং মিথুন রাশির মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে এটি রাশিচক্রকে অতিক্রম করেছে। অপরার্ধে এটি বৃশ্চিক রাশি এবং ধনু রাশির মধ্যবর্তী অংশে রাশিচক্রকে পার হয়ে গিয়েছে। ছায়াপথ যেখানে বৃষ রাশি এবং মিথুন রাশির মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত, আকাশের সেই অঞ্চলটি ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে মাথার উপরে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাদ্র মাসে যখন ছায়াপথ প্রত্যক্ষযোগ্য তখন অগস্ত্য তারকা দৃষ্টির অন্তরালে। অন্যদিকে ফাল্গুন মাসে অগস্ত্য তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। ওই সময়ে আকাশ নির্মল, ছায়াপথ দর্শনীয় এবং অগস্ত্য তারকা প্রত্যক্ষযোগ্য। কাহিনীটি ওই সময়ে মহাকাশ পটভূমি লক্ষ্য করে রচিত বলে মনে হয়।

অগস্ত্য তারকার অবস্থান দক্ষিণ আকাশে দক্ষিণ প্রান্তের সন্নিহিত অঞ্চলে। যেখানে অগস্ত্য তারকাটি লক্ষ্য করা যায় সেখান থেকে ছায়াপথ কিছুটা পূর্বে অবস্থিত। অগস্ত্যের দক্ষিণে ছায়াপথের যে অংশের অবস্থান সেই অংশটি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ আকৃতির। অগস্ত্য নক্ষত্র ছায়াপথের কাছাকাছি যে অঞ্চলে অবস্থান করছে, সেখানে ছায়াপথ খুবই ক্ষীণ-তনুসম্পন্ন। মনে হয়ে থাকে, ছায়াপথের ধারাবাহিকতা এখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পৌরাণিকেরা এবং মহাকাশ বিশেষজ্ঞরা ছায়াপথের এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছিলেন। অগস্ত্য ছায়াপথ অর্থাৎ দুগ্ধসমুদ্র সন্নিহিত হওয়ার জন্য তাঁরা মনে করলেন যেন অগস্ত্যই সমুদ্র শোষণ করলেন। অগস্ত্য যে সমুদ্র শোষণ করেছিলেন সেই সমুদ্রের ছিল অসুরদের বাস। অসুর কারা? তারকাতেই অসুরকুলের কল্পনা মনে করা হয়। ছায়াপথ অসংখ্য তারকাবিশিষ্ট। অর্থাৎ ছায়াপথ-সমুদ্রেই বহুসংখ্যক তারকারূপী অসুরের অবস্থান।

দেবতাদের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হবার পরে অসুরদের পাতাল প্রবেশ ঘটেছিল বলে উপাখ্যানে উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, উত্তর আকাশ স্বর্গ, দক্ষিণ আকাশ পাতাল, পুরাণে এ জাতীয় একটি ধারণা অছে। কাহিনীটি দক্ষিণ আকাশের পটভূমিতে রচিত বলে পাতালরূপী দক্ষিণ আকাশেই অসুরদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এ কথা সংগত কারণেই মনে করা চলতে পারে।"

এই সবের ভিত্তিতেই অসুরকুল নিধন এবং অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ উপাখ্যানের উদ্ভব হয়েছিল।

6. ধ্রুবের উপাখ্যান ঃ

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এক একটি মনুর রাজত্বকাল পৌরাণিক হিসাবে মোটামুটি 30 কোটি 85 লক্ষ পার্থিব বৎসর। এরপরে আরও পাঁচজন মনু পেরিয়ে পৃথিবীতে এখন চলছে 7ম মনু বা বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনুর কাল এখন থেকে প্রায় 200 কোটি বছর আগের কথা। আর গল্পটার কাল হবে প্রায় 180 বা 185 কোটি বছর। উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুটি পত্নী। সুরুচির পুত্র উত্তম, যিনি তৃতীয় মনু হয়েছিলেন। আর সুনীতির পুত্র হলেন ধ্রুব। পিতার কোলে বসা নিয়ে বিমাতা সুরুচির রূঢ় ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে পাঁচ বছর বয়সে ঘর ছাড়েন ধ্রুব। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন ওই পাঁচবছর বয়সেই। বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "হে ধ্রুব! সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি, সকল নক্ষত্র, সপ্তর্ষি ও যাঁরা বিমানচারী দেবতা সেই সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুবস্থান দিলাম। কোনও কোন দেবতা চার যুগ পর্যন্ত থাকেন, কেউ মন্বন্তর স্থায়ী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করলাম। তোমার মাতা সুনীতিও বিমানে তারকা হয়ে সেই সময় পর্যন্ত তোমার নিকটে বাস করবেন....।" এইভাবে ধ্রুবলোকে স্থান পেলেন ধ্রুব। কল্পক্ষয়ে যখন নৈমিত্তিক প্রলয় হবে তখনই এই ধ্রুবলোক লয় পাবে। সে সময়টাও কম নয়। 432 কোটি পার্থিব বৎসর বৎর। আরো বড় কথা ধ্রুব নক্ষত্র পৃথিবীর 'মেরু-তারা' [Pole-Star] হয়, 25,800 পার্থিব বছর পরে পরে এবং প্রায় 5,160 পার্থিব বছর মেরুতারা হয়ে বিরাজ করে, যেমন এখন ধ্রুবতারাই মেরুতারা।

বিষ্ণুপুরাণের উপরোক্ত কাহিনীর থেকে এটা জানা গেল, পার্থিব শরীরবিশিষ্ট ধ্রুবকে এমন একটা লোকে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আয়ুষ্কাল বেড়ে পুরো একটা ব্রাহ্মদিন বা কল্প বা 432 কোটি পার্থিব বৎসর হয়ে গেল। সে লোকটিও এমন যার একটি নক্ষত্র, ধ্রবর নামে যার নাম রাখা হলো ধ্রবতারা, 25,800 পার্থিব বছর পরে পরে পৃথিবীর মেরু তারা হয় এবং 5,160 পার্থিব বৎসর ধরে মেরুতারা হিসাবে বিরাজ করে। এই লোকটি শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবস্থিত যেখানে ধ্রুবতারার অবস্থান। আরও জানা গেল, কিছু কিছু দেবতার আয়ুষ্কাল যেমন 36,000 বছর, তেমনি আরও অনেক দেবতা আছেন অন্যান্য লোকে যাঁদের কেউ কেউ চারযুগ অর্থাৎ 43,20,000 পার্থিব বৎসর বাঁচেন, আবার কোন দলের আয়ুষ্কাল একমন্বন্তর অর্থাৎ 30 কোটি 85 লক্ষ 71 হাজার 428.5 পার্থিব বৎসর। বিষ্ণু ধ্রবুকে দিলেন এমন একটা 'লোক' বা মাধ্যম বা পরিকাঠামো, গতিশীলতা যার অনেক বেশি এই পৃথিবীর আপেক্ষিকে। শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলীর সেই লোকে ধ্রুব বেঁচে থাকবেন 432 কোটি মানব-বৎসর বা পার্থিব-বৎসর পার্থিব শরীর নিয়েই। আর এই অসম্ভব সম্ভব হবে সেখানে প্রচণ্ড গতিবেগের জন্য কাল-প্রসরণের ফলে। পৃথিবীর আপেক্ষিকে ধ্রুবলোকের গতি অত্যন্ত বেশি বলেই কাল-প্রসরণের মাত্রাও সেখানে বিশাল। তাই দেবতারা যেখানে 36,000 পার্থিব বৎসর এবং 43,20,000 আয়ুষ্কালসম্পন্ন, আবার কোন কোনও দেবতা এবং মনুদের আয়ু যেখানে 30,85,71,428.5 পার্থিব বৎসর, সেখানে ধ্রুব আয়ু পেলেন 432 কোটি মানব-বৎসর বা পার্থিব বৎসরের।

এই উপাখ্যানটিকে আর একটু বিস্তারিত করে বলা যেতে পারে।

স্বায়ম্ভুর মনুর 2টি পুত্র, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। দুজনেই ধর্মজ্ঞ ও মহাবীর্যবান্। এর মধ্যে উত্তানপাদের অভীষ্ট পত্নী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তমের জন্ম হয়। রাজার সুনীতি নামে আর একটি মহিষী ছিলেন। কিন্তু তিনি সুনীতিকে ততটা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন না। সুনীতির গর্ভে রাজার আর একটি পুত্র জন্মায়, তার নাম ধ্রুব।

একদিনের ঘটনা। রাজ-আসনে উপবিষ্ট উত্তানপাদ। তাঁর অঙ্কে আশ্রিত উত্তমকে লক্ষ্য করে ধ্রুবেরও পিতার ক্রোড়ে আরোহণের ইচ্ছা হল। কিন্তু উত্তানপাদের ক্রোড়ে উত্তম, তা ছাড়া সুরুচি সম্মুখে ছিলেন। রাজা ধ্রুবকে ক্রোড়ে নিলেন না। সুরুচিও ধ্রুবের ইচ্ছা বুঝতে পেরে ধ্রুবকে বকাবকি করলেন। তিনি বললেন, 'সুনীতি তোমার মাতা। তুমি রাজ-আসনের উপযুক্ত নও।' অপমানিত ধ্রুব সুনীতির কাছে এসে মাকে বললেন তাঁকে অপমান করার কাহিনী। সুনীতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধ্রুবকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

একই রাজার দুই পত্নী ও দুই পত্নীর দুই পুত্র। উত্তানপাদ তাঁর দুই পুত্রের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। এক পুত্র ধ্রুব তাতে অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ। সুনীতি তাঁকে বোঝাতে চাইলেন, বললেন, 'পূর্ব-জন্মে যা সঞ্চয় করনি, তা এ জন্মে তোমায় কে দিতে পারে? অন্য জন্মের পুণ্যের জন্য সুরুচির প্রতি রাজা সুরুচিসম্পন্ন। তাঁর পুত্র উত্তমও সেই রকম পুণ্যোপচয়সম্পন্ন। আর তুমি স্বল্পপুণ্য পুত্র, ধ্রুব নামে আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছ।'

ধ্রুব বললেন, 'না, মা, তোমার কথা সত্য নয়। আমি সর্বসাধ্য নিয়ে চেষ্টা করবো যাতে অশেষ জগতেরও পূজিত সর্বোত্তমের উত্তম স্থান অর্জন করতে পারি।'

কাহিনীতে 'সর্বোত্তমের উত্তম স্থান' নিঃসন্দেহে মহাকাশের ধ্রুবস্থান।

ধ্রুব গৃহত্যাগ করলেন, নগর ছেড়ে গহন অরণ্যে এলেন। সেখানে সপ্তর্ষির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সপ্তর্ষি সাত ঋষি, উত্তর আকাশে ধ্রুবতারা সন্নিহিত সপ্তর্ষি মণ্ডল। ধ্রুব প্রণিপাত করে সপ্তর্ষিকে বললেন, আমি উত্তানপাদের পুত্র, সুনীতির গর্ভে আমার জন্ম। আমি নির্বেদ হেতু আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি।

সপ্ত ঋষি এরপর ধ্রুবকে তাঁর সংকল্প জিজ্ঞাসা করলেন। ধ্রুব তখন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাহিনীর ছায়ায় আবৃত করে তুলে ধরলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ, অর্থে বা রাজ্যে আমার অভিলাষ নেই। আমি সেই একমাত্র স্থানে যাবার বাসনা পোষণ করি, যা পূর্বে অন্যে ভোগ করেন নি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। তখন সপ্তর্ষির সাত ঋষি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ তাঁকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পন্থা নির্দেশ করলেন। তারপর ধ্রুব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হল।

রূপকের ছলে ধ্রুবতারার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এই কাহিনীতে। উত্তানপাদ একটি তারকামণ্ডল। এটি ধ্রুবতারার সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত। এটি উত্তর আকাশের শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডল। অর্থাৎ শিশুমার নক্ষত্রই উত্তানপাদ। ব্রহ্মার এককল্প এবং মনুদের মধ্যে তার পৌরাণিককাল বিভাজনটা একটু বলে নিই।

360 পার্থিব বৎসরে দেবতাদের এক দিব্য-বৎসর। আর দেবলোকের গতি আলোর গতিবেগের 99.99961%। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেহেতু দেবতাদের স্রষ্টা, তিনি যে লোকে অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক তা বোধ হয় আরও অনেক বেশি বেগে গতিশীল, মানুষের পার্থিব গতির তুলনায় তো বটেই, দেবলোকের তুলনায়ও তা নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তাই বেগের আতিশয্যহেতু ব্রহ্মলোকে কাল-প্রসরণের পরিমাণ দেবলোকের তুলনায় অনেক অনেক বেশি, আর পার্থিব সময়ের তুলনায় তা অতি বিশাল। ভারতীয় প্রাচীন দর্শন বলছে চার যুগের কথা—কলিযুগ, দ্বাপরযুগ, ত্রেতাযুগ ও সত্যযুগ। কলিযুগ হলো 4,32,000 পার্থিব-বৎসর, দ্বাপর 8,64,000 পার্থিব-বৎসর, ত্রেতাযুগ 12,96,000 পার্থিব-বৎসর আর সত্যযুগ 17,28,000 পার্থিব-বৎসর। এই রকম 1,000 চতুর্যুগে বা 432 কোটি

মানব-বৎসর বা পার্থিব-বৎসর সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার একদিন বা একরাত্রি। সুতরাং মোট 864 কোটি মানব-বৎসর বা পার্থিব-বছরে ব্রহ্মার এক দিন-রাত্রি। ব্রহ্মার দিবসের আগমনে অব্যক্ত প্রকৃতি হতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়। আবার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্ত কারণে সব লয় পায়। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ 432 কোটি পার্থিক বৎসরে মোট চৌদ্দজন মনু রাজত্ব করেন।

এই চৌদ্দজন মনু হলেন ঃ (1) স্বায়ম্ভুব, (2) স্বরোচিষ, (3) ঔত্তম, (4) তামস, 95) রৈবত, (6) চাক্ষুষ, (7) বৈবস্বত, (৪) সাবর্ণি, (9) দক্ষ সাবর্ণি, (10) ব্রহ্ম সাবর্ণি, (11) ধর্ম সাবর্ণি (12) রুদ্র সাবর্ণি, (13) দেব সাবর্ণি বা রৌচ এবং (14) ইন্দ্র সাবর্ণি বা ভৌত্য। প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালের সময় হলো 1000/14 মহাযুগ বা চতুর্যুগ বা $71\frac{3}{7} \times$ 43,20,000 পার্থিব-বৎসর বা 30,85,71,428.5 মানব-বৎসর। প্রতিটি কল্পে এই চৌদ্দজন মনুরাই ঘুরে ফিরে রাজত্ব করেন। এই ধারণা সময়ের চক্রাকারে আবর্তনের কথাই সমর্থন করে।

চতুর্দশ মনুর রাজত্বকাল শেষ হলে কল্প শেষ হয়। ব্রহ্মার একটি দিন চলে গিয়ে আসে তাঁর রাত্রি, 'ব্রাহ্ম-যাম'। এক ব্রাহ্ম-রাত্রিও 432 কোটি পার্থিব বৎসর। ওই সময় সৃষ্টিকর্ম বন্ধ থাকে। সব অব্যক্ত কারণে লয় পায়। ব্রহ্মার রাত্রির অবসানে অর্থাৎ কল্পশেষের আরও 432 কোটি পার্থিব-বৎসর পরে আবারও নতুন 'ব্রাহ্মদিন' বা কল্প শুরু হয়। কিন্তু ঘটনা ঘটতে থাকে পূর্ব-কল্পের মতই। সেই মনুরাই রাজত্ব করেন। আবারো বলি, মনুরা যেখানে 30.85 কোটি বছর রাজত্ব করেন, সেখানে ধ্রুব লাভ করলেন কল্পস্থিতি বা 432 কোটি বছরের আয়ুষ্কাল।

ধ্রুবের উপাখ্যান পুরোপুরি মহাকাশের কথা বলে। ধ্রুব গৃহত্যাগের পর গেলেন অরণ্যে। সেখানে দেখা হল সপ্তর্ষির সঙ্গে। বাস্তবে মহাকাশে শিশুমার নক্ষত্রের দক্ষিণ দিকেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থান। ওই কাহিনীতে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার নামও বলা হয়েছে। ধ্রুবতারা সম্পর্কে আমাদের পুরাণের সর্বত্র একটি বৈজ্ঞানিক সত্য লক্ষ্য করা যায়। তা হর্ল সর্বোত্তমের উত্তম স্থান হচ্ছে মেরু বা মেরু সন্নিহিত অঞ্চল। মেরু তারকাকে যখন আমরা লক্ষ্য করি, তখন তাকে আমরা আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দেখি না। কলকাতার আকাশে সে ভূমি থেকে প্রায় 23 ডিগ্রি উপরে অবস্থিত। কিন্তু একথা ঠিক, যে কল্পিত অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তন, সেই অক্ষরেখাকে উত্তর দিকে বর্ধিত করলেই মেরুর নির্দেশ পাওয়া। সেই দিক দিয়ে মেরু তারকা আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত বলা যায়।

কাহিনীতে আছে, ধ্রুবের মাতারও তারকাপ্রাপ্তি ঘটেছিল। ধ্রুবের মাতা সুনীতি কোন তারকা? সেটি নিশ্চয় ধ্রুবতারা সন্নিহিত শিশুমার মণ্ডলেরই কোনো তারকা। ধ্রুবতারার নিকটে একটি তারকা আছে, সেটি শিশুমার মণ্ডলের Delta তারকা। বাংলায় এটিকে ঘ- তারকা বলতে পারি। মনে হয়, এই তারাতেই সুনীতির কল্পনা। তারকাটি বিশেষ উজ্জ্বল, এমন বলা চলে না। কিন্তু নিকটে অন্য কোনো তারা না থাকায় এটিকে চেনার অসুবিধা হয় না।

7. রাম ও পরশুরাম ঃ

ভৃগু হতে উৎপন্ন বলে শুক্রগ্রহের আরেক নাম 'ভার্গব'। ভৃগু সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি জ্যোতিষ্ক। ভৃগুর প্রপৌত্র, ঋচীকের পৌত্র, জমদগ্নির পুত্র পরশুরামই শুক্রগ্রহের রূপক। নাক্ষত্রীয় ব্যাখ্যায় পুরাণ কাহিনীর রূপ যায় বদলে। এই সব কাহিনী ও বাস্তবের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা আজও সম্ভব। কেমন করে সম্ভব তা দেখা যাক। কবি ও মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র বিশারদ শুক্রগ্রহ ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে পরিভ্রমণ করছে। সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব আকাশের উজ্জ্বল 'শুকতারা' হলো এই শুক্রগ্রহ। আবার সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশের জ্বলজ্বল করা 'সন্ধ্যাতারা'ও সেই শুক্রগ্রহ। কিন্তু মাঝরাতে বা

মাঝ আকাশে কখনও একে দেখা যায় না। সব জ্যোতিষ্কই বৎসরের কোন না কোনও সময় পৃথিবীর মাঝ-আকাশে মাঝরাতে আসে। কিন্তু বুধ আর শুক্র কখনই আসে না। এই দুই জ্যোতিষ্ক হলো ব্যতিক্রম। রাত সাড়ে সাতটার পর পৃথিবীর আকাশে শুক্রকে কখনও দেখা যায় না। ভার্গব বা শুক্রগ্রহ বা পরশুরাম কখনও পৃথিবীতে রাত্রিবাস করেন না। 'শুক্র' নামের কারণ এই গ্রহের রশ্মি সাদা কিংবা শুভ্র, 'শুচ্' ধাতুর অর্থ হলো শুক্লতা। শুক্র বা পরশুরাম দুর্নিরীক্ষ শুভ্রবর্ণ এবং ভীমকায়। নক্ষত্রমণ্ডলীতে তিনটি ধনুরাকৃতি তারকাস্তবক দেখা যায়। একটি কালপুরুষের 'পিনাক-ধনু' বা 'হর ধনু', অন্য দুটির একটি বিষ্ণুর 'শার্ঙ্গধনু' এবং অপরটি মহাভারতের অর্জুনের 'গাণ্ডীবধনু'।

সত্যযুগে পরশুরাম জন্মেছিলেন বলে বলা হয়। তিনি অবতার। সে সময় মেরুতারা [Polestar] ছিলেন শিবিরাজনক্ষত্র এবং কাশ্যপীনক্ষত্রের দীপ্তিতেই শিবিরাজ নক্ষত্রকে চিহ্নিত করা যেত। সেই কশ্যপকে পরশুরাম পৃথিবী দান করলেন বলে পরশুরাম কখনও পৃথিবীতে রাত্রিবাস করেন না। পরশুরাম অর্থাৎ শুক্রগ্রহ দিবালোকে কখনো-সখনো দেখা গেলেও মধ্যরাত্রে কখনই তাকে দেখা যায় না। রামায়ণে এই নাক্ষত্রিক তথ্য যেভাবে বলা হয়েছে তা হলো ঃ

ভার্গব পরশুরাম একটি ধনু দেখিয়ে রামকে বললেন, 'তুমি জনকের গৃহে হরধনু ভঙ্গ করেছ। এই ধনু বিষ্ণু শার্ঙ্গধনু, বিষ্ণুর এই ধনু ঋচীককে, ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। বিদ্যুৎবর্ণ এই ভীষণ ধনুর্বাণের নিকট হরধনু শিথিল হয়ে যায়। যদি পার তবে এই ধনুর্বাণ নিয়ে তুমি তোমার বীর্য প্রদর্শন কর।'

রাম মৃদু কণ্ঠে বললেন, "ভার্গব, আপনার ক্ষত্রকুলনাশন কীর্তি আমি শুনেছি। আপনি আমার শক্তি অবজ্ঞা করছেন তা আমি সইবো না।" রাম ভার্গব পরশুরামের হাত থেকে শার্ঙ্গধনু নিয়ে তাতে জ্যা-রোপণ করে শরসংযোগ করলেন। এরপর পরশুরামকে বললেন "আপনি ব্রাহ্মণ এবং পূজনীয় বিশ্বামিত্রের ভগ্নীর পৌত্র, এই হেতু আমোঘ প্রাণহর এই শর মোচন করতে পারছি না। হয় আপনার গতিবেগ, নয় তপোবল অর্জিত স্বর্লোক. এই দুটির একটি নষ্ট করবো। বলুন, কোন্‌টা সংহার করবো?"

এইভাবে ব্রহ্মা ও দেবগণের সমক্ষে পরাভূত পরশুরাম ধীরে ধীরে বললেন, "আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করেছিলাম তখন কশ্যপ বলেছিলেন, প্রয়োজনে দিনে তুমি পৃথিবীতে আসতে পার কিন্তু রাত্রিবাস করতে পারবে না। সেই অবধি আমি পৃথিবীতে রাত্রিবাস করি না। এখন তুমি আমার গতি নাশ করো না, আমি যেন দ্রুত গতিতে চলে যেতে পারি। তুমি শর নিক্ষেপ করে আমার তপোবল অর্জিত স্বর্গ সংহার কর।"

তখন রাম শরক্ষেপ করে পরশুরামের স্বর্গ সংহার করলেন। সেই থেকে মধ্যরাত্রির জমজমাট দেবসভায় যেতে পারেন না ভার্গব পরশুরাম অর্থাৎ আমাদের শুক্রগ্রহ।

দেব-দানবের বিরোধ চিরন্তন ব্যাপার। ঋগ্বেদও একথা বলেছে। এখনও সেই বিরোধ আছে। দেবতাদের গুরু হলেন বৃহস্পতি এবং দানবদের গুরু হলেন শুক্রাচার্য। এই দুজনের বনিবনা নেই। শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃতদের বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। শুক্রচার্য সম্পর্কে আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে আমাদের পুরাণকাহিনীতে। প্রাচীন ভারতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রাজনৈতিক গ্রন্থের নাম 'শুক্রনীতি' এবং ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থের নাম 'ভৃগুসংহিতা'। রামায়ণের পরশুরাম সংক্রান্ত কাহিনীকে এইভাবে নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যায় প্রতীকী কাহিনী বলা যেতে পারে।

শুক্রগ্রহই সাঁঝ আকাশের 'সন্ধ্যা তারা' এবং ভোর আকাশের 'শুকতারা' একথা আগেই বলা হয়েছে। শুক্র কোনও সময় এতো উজ্জ্বল হয় যে এর আলোতে ছায়া পড়ে। শুক্রকেও বুধের মত

সূর্যের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হতে দেখা যায় মাঝে মাঝে। শুক্রের এই অতিক্রমণ সময় পর্যবেক্ষণ করে সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব বের করা হয়ে থাকে। পরপর 113.5 বছর ও 129.5 বছর পরে আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। সূর্যের নিকটে আছে বলে শুক্রের উত্তাপ বেশি হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কারণ শুক্রের বায়ুমণ্ডল আছে। আর সে বাতাসে আছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস। শুক্রে অক্সিজেন নেই। প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। তবে উন্নতশ্রেণীর জীবন ওখানে অনুপস্থিত। শুক্রেরও কলা আছে চন্দ্রের মত। খালি চোখে তা দেখা যায় না। অবশ্য কিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক আছেন যাঁরা খালি চোখেই শুক্রের কলা দেখতে পান। বিখ্যাত গাণিতিক 'গাউস' বলেছেন যে, তিনি একবার তাঁর মাকে দূরবীনে শুক্রগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। মাকে দূরবীনে শুক্রের কলিল অবস্থা দেখিয়ে চমক লাগনোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। দূরবীনে শুক্রকে বাঁকা ফালির মত দেখায়। দূরবীনে শুক্রকে দেখে গাউসের মা আশ্চর্য তো হলেনই না, বরং উল্টে গাউসকে প্রশ্ন করলেন বাঁকা ফালিটার মুখ অন্যদিকে কেন। অর্থাৎ খালিচোখে তিনি ফালিটাকে যেভাবে দেখেন দূরবীনে তা উল্টে গেছে। গাউস তখন ভাবতেও পারেননি যে, তাঁর মা খালি চোখেই শুক্রের কলাগুলি দেখতে পান। এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুর্লভ। দূরবীন আবিষ্কারের আগে কেউ ভাবতেও পারেনি যে, শুক্রেরও চাঁদের মত কলা আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে শুক্র তার অন্ধকার মুখটি আমাদের দেখায়। ফলে তার সবচেয়ে বড় কলাটি আমরা পার্থিব মানুষেরা কখনই দেখতে পাই না। 'অমাবস্যার শুক্র' অবস্থা থেকে তার কলা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এই ফালিটি যতই পূর্ণ হতে থাকে তার ব্যাস তত কমে যায়, শুক্রকে সবচয়ে উজ্জ্বল দেখায় তার মধ্যবর্তীকলায়। অমাবস্যার শুক্রের 30 দিন পরে গ্রহটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়। তখন সে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকের চেয়ে তেরো গুণ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তার আলোয় পৃথিবীতে কোন বস্তুর ছায়া পড়তেও দেখা যায়।

৪. প্রজাপতির রুচিবিকার ঃ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে নিয়ে একটা অভিনব কাহিনী আছে, যে কাহিনী মহাকাশে নক্ষত্রদের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে। এই কাহিনীর সামান্য ছোঁয়া আমরা ঋগ্বেদেই দেখতে পাই। প্রজাপতি একবার তাঁর কন্যার দিকে কামাতুর নির্লজ্জ দৃষ্টিপাত করেন। প্রজাপতির কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্য প্রজাপতির এই মানসিক স্খলন ঘটায়। প্রজাপতির এই কন্যা ঋগ্বেদের ঊষা, সৈদ্ধান্তিক নাম যাঁর রোহিণী এবং পৌরাণিক নাম যাঁর সরস্বতী। কামার্ত প্রজাপতি রোহিণীর দিকে ধাবিত হলে রোহিণী ভয় পেয়ে মৃগের রূপ ধারণ করে দৌড় লাগালেন বাবার হাত থেকে বাঁচতে। রোহিণী স্ত্রী-মৃগ হয়ে পালাচ্ছে দেখে প্রজাপতিও মৃগের রূপ ধারণ করে তার পিছনে দৌড়াতে লাগলেন। সে এক লজ্জাজনক আশ্চর্য অবস্থা। দেবগণ বললেন, যা কেউ কোনও দিন করেন নি, প্রজাপতি সে রকম কাজ করছেন। দেবতারা এমন কাউকে পেলেন না, যিনি প্রজাপতিকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই আচরণ অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তখন দেবতারা তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে অতি উগ্র ঘোর শরীর ছিল তা দিয়ে ভূতবান্ নামে এক মহাবীরের সৃষ্টি করলেন। দেবতারা তার শক্তি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেন। সেই ভূতবান্ দেবতাদের কাছে একটি বর প্রার্থনা করলেন। ভূতবান্ পশুদের উপরে আধিপত্য করবার আকাঙক্ষা জানালেন। দেবতারা বললেন, তথাস্তু। সেই কারণে ভূতবানের আর এক নাম পশুমান অর্থাৎ পশুপতি। ভূতবান দেবতাদের নির্দেশে প্রজাপতিকে আক্রমণ করে তাঁকে তীরবিদ্ধ করেন। এরপর ভূতবান্ আকাশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেই সঙ্গে রইলেন প্রজাপতি এবং প্রজাপতির হরিণীরূপিণী কন্যা। প্রজাপতির আকৃতি

হল মৃগ। যিনি প্রজাপতিকে হত্যা করেছিলেন অর্থাৎ ভূতবান্ হলেন মৃগব্যাধ। প্রজাপতি কন্যা, যিনি হরিণী আকৃতি ধারণ করেছিলেন, তিনি হলেন মহাকাশের রোহিণী নক্ষত্র। যে শর দ্বারা ভূতবান্ প্রজাপতিকে নিহত করেছিলেন সেটি 3টি অংশযুক্ত বলে তার নাম ত্রিকাণ্ডবান।

শতপথ ব্রাহ্মণে এই গল্পটি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সেখানে আছে যে, প্রজাপতি স্বীয় কন্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই আচরণকে দেবতারা পাপ মনে করে বললেন, এই দেব পশুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, অথচ এঁর এ কি গর্হিত আচরণ! তখন তাঁরা রুদ্রকে বললেন, রুদ্র, তুমি এঁকে শরবিদ্ধ কর।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও কাহিনীটি আছে। কিন্তু সেখানে এটির আরও ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রজাপতির বীর্য থেকে বিরাট উৎপন্ন হলেন। দেবাসুর বিরাটকে গ্রহণ করলেন। প্রজাপতি বললেন, এ আমার। বিরাট পূর্বদিকে গেলেন। প্রজাপতিও তখন সেইদিকে গমন করলেন;এইভাবে প্রজাপতি বহু স্থান ভ্রমণ করে শেষকালে আকাশের রোহিণী নক্ষত্র হলেন।

বৈদিকগ্রন্থে প্রজাপতির এই বিকারের কাহিনী কিছুটা অন্যরকম। সেখানে প্রজাপতির দুহিতা ঊষা। সেখানে মৃগ, মৃগব্যাধ, রোহিণী, প্রজাপতি, রুদ্র ও ভূতবানের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এইসব চরিত্রগুলি যে আকাশের তারাদের কথা বলছে এ ব্যাপারে পণ্ডিতেরা প্রায় একমত। ভূতবান হল মৃগব্যাধ নক্ষত্র। কোলব্রুক, বার্জেস, বেন্টলি প্রমুখেরা মৃগব্যাধ নক্ষত্রকে Alpha Canis Major বলে স্থির করেছেন। এই তারাটিই আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা লুব্ধক বা Sirius। সুতরাং মৃগব্যাধরূপী লুব্ধকই শর দিয়ে প্রজাপতিরূপী মৃগকে বধ করেছিলেন।

ঋগ্বেদীয় আমলে একসময় কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী যজ্ঞপুরুষ নামে খ্যাত ছিল। অর্থাৎ তখন কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীতে বর্ষারম্ভ হত। এখন সায়ন বর্ষারম্ভ হয় উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রায় মাঝামাঝি অঞ্চলে। তখন হত মৃগশিরায়। উপবৃত্তাকার সঞ্চারপথে সূর্যের সঞ্চরণের অনুসরণে মহাবিষুবের যে সরণ হয় তাতে 955 বছর 6 মাস 20 দিন সময় লাগে এক একটি নক্ষত্র পেরিয়ে যেতে। মৃগশিরা থেকে রোহিণী, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্বিনী ও রেবতী পেরিয়ে মহাবিষুবের উত্তরভাদ্রপদের মাঝামাঝি চলে আসতে মোট সময় লেগেছে প্রায় 6200 বছর। সুতরাং ঋগ্বেদীয় কাল প্রায় 6200 বছর পুরানো, যখন মহাবিষুব সংক্রান্তি হত মৃগশিরা নক্ষত্রে।

আবারো বলি, কালপুরুষ নক্ষত্রে যে বৎসরের সূচনা হত ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণু 4টি পদবিশিষ্ট। এই 4টি পদ বর্ষচক্রের 4টি বিশেষ স্থান। প্রথম পদ উত্তরায়ণ বিন্দু, দ্বিতীয় পদ বাসন্তবিষুবস্থান, তৃতীয় পদ দক্ষিণায়ন বিন্দু এবং চতুর্থ পদ শারদবিষুবস্থান। বিষ্ণুর এই 4টি পদ সূর্যের বার্ষিক আবর্তন পথের 4টি স্থান। একালে এই চারটি স্থানের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। উত্তরায়ণ বিন্দু এখন 23 ডিসেম্বর, ওই দিন সূর্যের উত্তরে পরিক্রমণ শুরু। দ্বিতীয় পদ 21 মার্চ বাসন্তবিষুবস্থান, ওই দিন এখন দিন-রাত্রি সমান, তৃতীয় পদ দক্ষিণায়ন বিন্দু 22 জুন একালে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা আরম্ভ এবং চতুর্থ পদ শারদবিষুবস্থান 23 সেপ্টেম্বর, ওই দিন দিন-রাত্রি সমান।

ঋগ্বেদে আছে, বিষ্ণুর এক পদ মৃগনক্ষত্রে। কালপুরুষের সংস্কৃত নাম মৃগনক্ষত্র। বিষ্ণুর যে পদটি মৃগ বা কালপুরুষ নক্ষত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে জানা যায় যে, সেখানে বাসন্তবিষুবপাত হত। অর্থাৎ সেদিনটি হল 21 মার্চ, সূর্যের বার্ষিক আবর্তনপথের 4টি বিশেষ অবস্থানের একটি। স্থূলতঃ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব 4200 অব্দের ঘটনা। তখনই সংবৎসর ও যজ্ঞের সূত্রপাত অর্থাৎ কালপুরুষ নক্ষত্রেই যজ্ঞের

আরম্ভ। যজ্ঞ ও প্রজাপতি একার্থবোধক অর্থাৎ কালপুরুষই প্রজাপতি। বালগঙ্গাধর তিলকও অনেক প্রমাণ সহযোগে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

প্রজাপতি হল কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী। এই নক্ষত্র মণ্ডলীটিকে পৌরাণিককালে মৃগাকার, পুরুষ ব্যাধাকার, কখনও বা ছাগাকার বলে কল্পনা করা হয়েছে। আবার কালপুরুষের মাথার তিনটি তারাই মৃগশিরা নক্ষত্র। ভূতবানের শরবিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি হলেন কালপুরুষ নক্ষত্র। ভূতবানের শর কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিদেশের 3টি তারা। কালপুরুষের কটিদেশে 3টি উজ্জ্বল এবং 2টি অনুজ্জ্বল তারা আছে। এগুলির সমন্বয়ে ইশ্বলা নক্ষত্র। উজ্জ্বল 3টি তারা সরাসরি রোহিণী নক্ষত্রের দিকে দিক নির্দেশ করছে। এই 3টি তারা যেন ত্রিকাণ্ডবান। মহাকাশে তারকামণ্ডলীর অবস্থানের এই পটভূমি লক্ষ্য করেই কাহিনীটির উৎপত্তি। এই কাহিনীর আরও নানা রূপ দেখা যায় পুরাণের কাহিনীগুলিতে। আগেই বলেছি, বেদের এ সংক্রান্ত কাহিনী কিছুটা আলাদা। সেখানে অগ্নিরূপ রুদ্র দীপ্তিমান বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন এবং স্বীয় কন্যাতে দীপ্তিস্থাপন করেছিলেন। এই সব কাহিনী সম্ভবত বলছে, এক সময় মৃগশিরা নক্ষত্রেই বর্ষারম্ভ বা মহাবিষুব সংক্রান্তি হত। পরে তা প্রাকৃতিক নিয়মেই রোহিণী নক্ষত্রে হতে শুরু করে। এই ঘটনাই প্রজাপতির স্বীয় কন্যায় গমনের ঘটনা হিসাবে বর্ণিত। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটি বলছে ঃ

"প্রজাপতি এবং স্বীয় কন্যার এই কাহিনীতে আমরা মৃগরূপী প্রজাপতিকে শরবিদ্ধ হতে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কোথাও শুধু শরবিদ্ধ হওয়া নয়, মৃগের শিরচ্ছেদের কথাও বর্ণিত আছে। শিবপুরাণে ব্রহ্মা মৃগাকারে মৃগরূপিণী সন্ধ্যার প্রতি ধাবিত হলেন। তখন শিব শর দ্বারা মৃগের শিরচ্ছেদ করেন। ষষ্ঠ নক্ষত্রে সেই শর এখনও আকাশে এবং মৃগের শির পঞ্চম নক্ষত্রে আছে। ষষ্ঠ নক্ষত্র চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত আর্দ্রা নক্ষত্র অর্থাৎ কালপুরুষ মণ্ডলের 'আলফা' তারকাটি। পঞ্চম নক্ষত্র মৃগ নক্ষত্র কালপুরুষের অন্তর্গত।

কাহিনী অনুসারে মৃগের শিরচ্ছেদন ঘটে। মৃগশির কোনটি? সিদ্ধান্ত অনুসারে, কালপুরুষ নক্ষত্রের মস্তকের 3টি তারা মৃগশিরা। প্রাচীন মৃগশিরা কিন্তু এটি নয়। কালপুরুষের কটিদেশ ও 2টি পা নিয়ে প্রাচীন মৃগশিরা গঠিত। উপাখ্যানে মৃগব্যাধের শরের সঙ্গে রোহিণী নক্ষত্রের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু আর্দ্রা নক্ষত্র থেকে প্রাচীন মৃগশিরার ভেতর দিয়ে যে সরলরেখা যায়, তা রোহিণী নক্ষত্রে পৌঁছায় না। কিন্তু সিদ্ধান্তের মৃগশিরা নিলে এরা সমসূত্রে স্থাপিত হয়। সম্ভবত এই উপাখ্যানে সিদ্ধান্তের মৃগশিরা গ্রহণ করা হয়েছিল।

আলোচিত উপাখ্যানটির একটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায় ঋগ্বেদে। সেখানে আছে, অগ্নিরূপ রুদ্র দীপ্তিমান বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন এবং দুহিতায় স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। মহাকাশে তারকা পটভূমিতে তো বটেই, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও এসবের উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আছে মনে হয়। এককালে প্রজাপতি মৃগ নক্ষত্রে ছিলেন, তিনি এলেন রোহিণী নক্ষত্রে। প্রজাপতি ও সংবৎসর একার্থবোধক। অর্থাৎ মৃগনক্ষত্রে মহাবিষুবপাত বা যখন দিন-রাত্রি সমান, বর্ষ শুরু হত তখন। পরে বর্ষ শুরু হত রোহিণী নক্ষত্রে অর্থাৎ প্রজাপতি রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি স্থাপন করলেন।"

সুতরাং প্রজাপতি ব্রহ্মার রুচিবিকারের এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে নাক্ষত্রিক। এই কাহিনীর চরিত্রগুলি কতকগুলি তারার রূপক কাহিনী, যে তারাগুলি রয়েছে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীতে।

9. চাঁদ-রোহিণীর সনাতনী প্রেম ঃ

চন্দ্র এবং রোহিণীকে নিয়ে একটি অতি পরিচিত উপাখ্যান আছে, যেটি পুরোপুরি চন্দ্রের কোনও নক্ষত্রে অবস্থানের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের কথা বলে। রোহিণী যেমন 'প্রজাপতির রুচি-বিকার' কাহিনীর নায়িকা, এক্ষেত্রেও রোহিণীই নায়িকা। তবে নায়ক হলেন চন্দ্র। হ্যাঁ, আকাশের চাঁদ। তাঁকে আর নক্ষত্র রোহিণীকে নিয়েই এই গভীর প্রেম বা আসক্তির কাহিনী।

পৌরাণিককালে দক্ষ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি প্রজাপালক তাই তিনি প্রজাপতি। সমস্ত প্রজার অধ্যক্ষ। তাঁর বেশ কয়েকটি পুত্র-কন্যা। এঁদের মধ্যে তাঁর 27টি কন্যা ছিল। এই কন্যাদের নাম হল ঃ

(1) অশ্বিনী, (2) ভরণী, (3) কৃত্তিকা, (4) রোহিণী, (5) মৃগশিরা, (6) আর্দ্রা, (7) পুনর্বসু, (8) পুষ্যা, (9) অশ্লেষা, (10) মঘা, (11) পূর্ব-ফাল্গুনী, (12) উত্তর-ফাল্গুনী, (13) হস্তা, (14) চিত্রা, (15) স্বাতী, (16) বিশাখা, (17) অনুরাধা, (18) জ্যেষ্ঠা, (19) মূলা, (20) পূর্বাষাঢ়া, (21) উত্তরাষাঢ়া (22) শ্রবণা, (23) ধনিষ্ঠা, (24) শতভিষা, (25) পূর্বভাদ্রপদ, (26) উত্তরভাদ্রপদ, এবং (27) রেবতী।

সুতরাং দক্ষের এই সাতাশটি কন্যা হল আকাশের সাতাশটি নক্ষত্র। দক্ষ প্রজাপতি তাঁর এই সাতাশটি কন্যার উপযুক্ত বর বা পাত্র অনুসন্ধান করছিলেন। তিনি উপযুক্ত পাত্রও খুঁজে পেলেন। সে পাত্র হলেন আকাশেরই অপর বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক চন্দ্র বা চাঁদ। প্রজাপতি দক্ষ 27টি কন্যাকে বিয়ে দিলেন চন্দ্রের সঙ্গে। তিনি চন্দ্রকে সব কন্যাদের প্রতি সমান যত্ন করবার নির্দেশ দিলেন। চন্দ্র 27টি নক্ষত্র-নাম্মী দক্ষ কন্যার স্বামী হলেন। সাতাশটি পত্নী নিয়ে চন্দ্রের সংসার শুরু হল।

কিছুদিনের মধ্যেই গোল বাঁধলো। চন্দ্র রোহিণীর সৌন্দর্যে এমনই বিমোহিত হলেন যে, তিনি অন্য ছাব্বিশটি পত্নীর কথা ভুলে সারাক্ষণ রোহিনীর সঙ্গে কাটাতে লাগলেন। স্বামীসঙ্গহারা ওই ছাব্বিশজন পত্নী ক্ষুব্ধ হয়ে চন্দ্রের কাছে প্রতিবাদ জানালেন তাঁর এই পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের জন্য। মোহাবিষ্ট চন্দ্র এতে বিরক্ত হয়ে অন্য স্ত্রীদের ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিলেন এবং আগের মত রোহিণীর সঙ্গেই আমোদপ্রমোদে মেতে রইলেন। অনন্যোপায় ছাব্বিশ জন দক্ষকন্যা পিতার কাছে গিয়ে চন্দ্রের বিরুদ্ধে পালিশ করলেন। দক্ষ প্রজাপতি চন্দ্রকে ডেকে এনে খুব করে ধমকালেন এবং চন্দ্রকে সব পত্নীর প্রতি সমান ভালোবাসার উপদেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি উপদেশ দিয়ে চন্দ্রকে এই বলেও সতর্ক করে দিলেন যে, ওই উপদেশের যেন অন্যথা না হয়। কিন্তু বাড়ী ফিরে চন্দ্র অন্য স্ত্রীদের অনাদর করে আগের মতই সারা সময় রোহিণীতে উপগত হয়ে থাকলেন। খবর পেয়ে প্রজাপতি রাগান্বিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হবেন চন্দ্র। চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হল।

দক্ষের অভিশাপে রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত চন্দ্র দিনে দিনে ক্ষয় পেতে শুরু করলেন। নানা উপায় অবলম্বন করা হল যাতে চন্দ্রের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়। নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু সবই বৃথা গেল। শাপগ্রস্ত চন্দ্র যক্ষ্মার হাত থেকে মুক্তি পেলেন না। চন্দ্রের ক্ষয়ের ফলে ধান্যশস্যের স্বাভাবিক উৎপাদন হল না। সেগুলির আস্বাদ ও রস হ্রাস পেল। ওষধিগুলি বীর্যহীন হয়ে পড়লো। তা ছাড়া প্রাণীদেরও ক্ষয় হতে লাগলো। দেবতারা এসে চন্দ্রকে বললেন, আপনার আকৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কেন? এরপর দেবতারা মিলিতভাবে দক্ষ প্রজাপতির কাছে, চন্দ্রকে শাপমুক্ত করবার জন্য আবেদন জানালেন। প্রজাপতি বললেন, আমার অভিশাপ মিথ্যা হবে না। তবে চন্দ্র যদি তাঁর সমস্ত কন্যার প্রতি সুবিচার করে, তাহলে সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করে সে পুনরায় বৃদ্ধি পাবে। মাসার্ধকাল প্রত্যহ তার ক্ষয় আর মাসার্ধকাল প্রত্যহ তার বৃদ্ধি হবে।

মহাভারতের শল্য পর্ব থেকে গৃহীত পুরাণের এই কাহিনীটি নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। আকাশচিত্র এবং বৈজ্ঞানিক সত্য অবলম্বনে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে।

প্রজাপতি দক্ষ সম্ভবত সূর্যপথ। ঋক্‌সংহিতায় আছে অদিতি থেকে দক্ষ এবং দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছিলেন। অদিতি অর্থ অখণ্ডিত বা সম্পূর্ণ। মনে হয় এখানে বৃত্তাকার সূর্যপথের কথা ভেবেই এই সম্পূর্ণতা। তাছাড়া নক্ষত্র নামাঙ্কিত প্রজাপতির যে 27 কন্যার কথা বলা হয়ছে, সেই 27 কন্যা সূর্যপথের কাছ ঘেঁষেই ধারাবাহিকভাবে অবস্থিত। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী নামেই তাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। উপাখ্যানে যে 27 কন্যা দানের কথা বলা হয়েছে, তারও একটি বিশেষ কারণ আছে। মহাকাশ আবর্তনের ক্ষেত্রে চন্দ্র প্রত্যহ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে আবর্তন চক্রের 1/27 অংশ হিসেবে। এই 1/27অংশই চন্দ্রের এক একটি পত্নীর কক্ষ। 27 দিনে সম্পূর্ণ আবর্তন অর্থাৎ এক একটি কক্ষে চন্দ্রের অবস্থান এক একটি দিনভিত্তিক। দিনগুলি স্থির করবার জন্য প্রত্যেকটি কক্ষ এক একটি তারকাচিত্র দ্বারা নির্দিষ্ট। মহাকাশ অবলম্বনে কাল নির্ণয়ের এই পদ্ধতি প্রাচীনতম পদ্ধতি। অশ্বিনী থেকে শুরু করে মহাকাশে চতুর্থ প্রকোষ্ঠ রোহিণী-প্রকোষ্ঠ। সেখানে চন্দ্রের অন্যতম পত্নী দক্ষের কন্যা রোহিণী তারকামণ্ডলের অবস্থান।

মহাভারতে প্রজাপতির 27টি নক্ষত্র নাম্নী কন্যার কথা থাকলেও তৈত্তিরীয় সংহিতায় এদের সংখ্যা 33টি। কৃত্তিকা নক্ষত্রের 7টি তারা যোগ করেই এই 33টি তারকার উদ্ভব। কৃত্তিকাকে একটি না ধরে 7টি তারা ধরলে সংখ্যাটি 33টিই হয়। তবে সর্বত্রই রোহিনীতে চন্দ্রের বারংবার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। সব কাহিনীতেই বলা হয়েছে চন্দ্রই বেশি সম্ভোগ করেছেন রোহিণী নক্ষত্রকে, অন্যান্য নক্ষত্রদের বঞ্চিত করে। চাঁদ-রোহিণীর এই উপাখ্যানের আর একটু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আসা যাক।

চন্দ্রের পৃথিবী-পরিক্রমণ পথ বা চন্দ্রকক্ষা এবং পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণ পথ বা রবিকক্ষা পরস্পর যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে সে দুটি বিন্দুর একটি রাহু এবং অন্যটি কেতু। এই বিন্দু দুটি স্থির নয়। এই বিন্দু দুটি প্রায় $18\frac{1}{2}$ বছরে একবার রবিকক্ষা আবর্তন সম্পূর্ণ করে। রবিকক্ষার সঙ্গে চন্দ্রকক্ষার অবনতি প্রায় $5^{0}30'$ বা সাড়ে পাঁচ ডিগ্রি। তাই রবিপথের ওই অংশের মধ্যে আসা কোন না কোনও নক্ষত্র চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। ওই অংশের মধ্যে থাকা নক্ষত্রদের বেলায় ওই আচ্ছাদন ঘটবে চন্দ্রের, অন্য নক্ষত্রের বা তারার বেলায় নয়। এই সব আচ্ছাদিত তারাদের মধ্যে রোহিনীর আচ্ছাদনই সবচেয়ে দর্শনীয়। বৈদিককালে রোহিণী নক্ষত্র একটি মাত্র তারার দ্বারা গঠিত ধরা হলেও পরে রোহিণীতে আরও চারটি নক্ষত্র যুক্ত হয়। রোহিণী এখন আকৃতিতে শকটাকার। এর পাশ্চাত্য নাম Hyades। এই শকটাকার নক্ষত্রটির অবস্থান রবিকক্ষা থেকে 3^{0} থেকে 6^{0}-র মধ্যে। রোহিণী নক্ষত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হল রোহিণী নামের তারাটি। এটি বৃষরাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। এর ইংরেজী নাম Aldebaran। আকাশের কুড়িটি উজ্জ্বল তারার মধ্যে এটি চতুর্দশতম।

চন্দ্র 27 দিনে সাতাশটি নক্ষত্রে অবস্থান করে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত আচ্ছাদন করে $18\frac{1}{2}$ বছরে একবার। অর্থাৎ প্রতিদিন চন্দ্র একটি নক্ষত্রের কাছে অবস্থান করলেও চন্দ্র প্রতিটি নক্ষত্রকে সত্যিকারের আচ্ছাদন করে $18\frac{1}{2}$ বছর অন্তর। এরকম আচ্ছাদন চন্দ্র সূর্যকেও করে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়। রোহিণীর বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 3 ডিগ্রি এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় 4 ডিগ্রি। ফলে ওই $18\frac{1}{2}$ বছর সময়ের মধ্যে চন্দ্র যখন রোহিণীকে আচ্ছাদন করে, সেই আচ্ছাদনের পরে শকটাকার রোহিণী পর পর

দু'তিন মাস চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। সুতরাং চন্দ্রের রোহিনী আচ্ছাদনের কাল অন্যান্য নক্ষত্রদের আচ্ছাদনকাল অপেক্ষা অনেক বেশি। রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্র সমাগমের এই বৈশিষ্ট্য অন্য নক্ষত্রে দেখাই যায় না। তাছাড়া অন্য নক্ষত্রের মত চন্দ্রের আচ্ছাদনে নিষ্প্রভ হয়ে যায় না রোহিনী নক্ষত্র। রোহিণীর এই বৈশিষ্ট্যও পুরাণ কাহিনীর খোরাক যুগিয়েছে। চন্দ্রের অবস্থানে যেন রোহিণীর উৎফুল্লতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ওই যে বলা হল, চন্দ্র অনেকটা বেশি সময় রোহিণীতে অবস্থান করে $18\frac{1}{2}$ বছর বা এক স্যারোস [Saros] অন্তর, ওটাই চন্দ্র-রোহিণী উপাখ্যানের মূল ভিত্তি।

এই উপাখ্যানের আরেকটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটিতে।

"চন্দ্র-রোহিণী প্রেম উপাখ্যানে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে আরও একটি কথা বলবার মত আছে। চন্দ্রকে অভিশপ্ত করবার পর দেবতারা যখন প্রজাপতি দক্ষের কাছে গিয়ে শাপের অপনোদন প্রার্থনা করলেন, তখন দক্ষের নির্দেশ বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ। পনেরো দিনে চন্দ্রের ক্ষয় এবং পনেরো দিনে সেই ক্ষয় পূরণের মধ্যে অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং বিভিন্ন কলার হ্রাস-বৃদ্ধির উল্লেখ আছে। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষয় প্রভাসে অবগাহনের ফলে পূর্ণ হবে এ কথা বিস্ময়কর। প্রভাস অর্থ উপাখ্যানের পটভূমিতে সূর্য। প্রভাসের সঙ্গে প্রকৃষ্ট দীপ্তি দানের সম্পর্ক আছে। প্রকৃষ্ট দীপ্তি কে দিতে পারেন? যিনি পারেন তিনি অবশ্যই সূর্য। সূর্যের রশ্মিতেই চন্দ্রের দীপ্তি, প্রাচীনকালের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সে কথ জানতেন। ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে। দক্ষের উক্তিতেও সে কথা সমর্থিত হল। চন্দ্রের প্রেম উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য সমর্থিত হল ও একাধিক বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটলো।"

10. অগস্ত্যের বাতাপিবধ ঃ

বৈদিক ঋষি অগস্ত্যকে নিয়ে যে সব পৌরাণিক কাহিনী, তৈরি হয়েছে তাদের অন্যতম হল তাঁর বাতাপি নামক এক দৈত্য বধের কাহিনী। অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণের উপাখ্যান কিছুটা আগেই বলা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে সে কাহিনীর সঙ্গে কেমন করে অগস্ত্য তারা [Canopus] ও আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড জড়িত রয়েছে। এখন আবার অগস্ত্যের কথায় আসি।

ঋগ্বেদের বেশ কিছু সূক্তের রচয়িতা বা দ্রষ্টা মহর্ষি অগস্ত্য মনোমত পাত্রীর অভাবে বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিব্রাজকের জীবনযাপন করতে থাকেন। এখানে-ওখানে তপস্যায় জীবন কাটালেন বহুদিন। অবশেষে পিতৃপুরুষদের অনুরোধ ও উপদেশে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। বংশরক্ষা ও পিতপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য তিনি বিবাহে আগ্রহী হন। মনোমত পত্নীলাভের ইচ্ছায় জাগতিক সমস্ত প্রাণীর সর্বোৎকৃষ্ট অংশ নিয়ে তিনি নিজেই এক কন্যার সৃষ্টি করলেন। সেই কন্যাকে দেওয়া হল বিদর্ভ রাজের কাছে। বিদর্ভরাজ তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন এবং কালক্রমে সেই কন্যাই লোপামুদ্রা নামে খ্যাত হন। লোপামুদ্রা বিদর্ভরাজের পালিতা কন্যা। মহর্ষি অগস্ত্যই তাঁর স্রষ্টা। সম্ভবত তিনি একেবারে খাঁটি এক নলজাতিকা।

লোপামুদ্রা শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই লোপামুদ্রা নামের সার্থকতা ধরা পড়ে। 'লোপা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হ'ল, নিজন্ত লুপ্ বা লোপি (লোপ করান) + অন্ কে + স্ত্রীলিঙ্গে আপ, অর্থাৎ যিনি নারীগণের রূপাভিমান লোপ করেছিলেন। আর 'লোপামুদ্রা' হ'ল 'লোপা' শব্দ—মৃদু (হর্ষ) বা (গ্রহণ করা) + ড ক + আপ্, অর্থাৎ যিনি নারীগণের রূপাভিমান লোপ করে হর্ষ উৎপাদন করেছিলেন। যথাকালে ঋষি অগস্ত্য বিয়ে করলেন লোপামুদ্রাকে। তাঁদের দৃঢ়াস্য ও দৃঢ়াস্যু বা ইদ্মবাহ নামে দুই পুত্র জন্মে।

রামায়ণের মতে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর উদ্দেশে নিষিক্ত মিত্রবরুণের তেজে কুম্ভ বা কলসীর মধ্যে ঋষি অগস্ত্য জন্মান। ঋগ্বেদের মতে, যজ্ঞস্থলে উর্বশীকে দেখে মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞের কলসীতে পড়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম দেয়। এই জন্য ঋষি অগস্ত্য 'কুম্ভজ', 'কুম্ভযোনি' বা 'মৈত্রাবরুণি' নামেও খ্যাত। এ-যুগের যোল আনা খাঁটি 'টেস্ট-টিউব-শিশু' বলতে যা বোঝায় মহর্ষি অগস্ত্য বা বশিষ্ঠ তাই-ই ছিলেন হাজার চার-পাঁচ বছর বা তারও কিছুটা আগে। প্রসঙ্গতঃ মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে দ্রোণ, কৃপ ও কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত স্মরণীয়। গুরু দ্রোণ জন্মেছেন দ্রোণী বা জলপাত্র থেকে। কৃপ ও কৃপী জন্মেছিলেন একটা তৃণের মধ্যে যমজ শিশু হ'য়ে।

যাইহোক, সংসারধর্ম পালনের জন্য লোপামুদ্রা একবার অর্থ চাইলেন স্বামী অগস্ত্যের কাছে। অগস্ত্য ইল্বল নামক এক অত্যাচারী দৈত্যকে বধ করে প্রচুর ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিলেন লোপামুদ্রাকে। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে। দৈত্যরাজ ইল্বল এক অদ্ভুত কৌশলে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যদের হত্যা করছিল। সে তার ভাইকে মায়া বলে ভেড়া বানিয়ে তার মাংস অতিথিদের খাওয়াতো। এই ভাইয়ের নাম বাতাপি। খাওয়া শেষ হলে সে বাতাপির নাম ধরে ডাকতো। ডাকলেই বাতাপি দৈত্যরূপ ধরে ওই অতিথিদের পেট চিরে বেরিয়ে আসতো। এতে অতিথিদের মৃত্যু ঘটত। তখন ইল্বল ও বাতাপি নর মাংসের ভোজ লাগাতো। ইল্বল অকারণে অগস্ত্যকে ওই একইভাবে ধ্বংস করতে চাইলে ঋষি অগস্ত্য বাতাপিকে জীর্ণ করে ফেলেন আপন ব্রহ্মতেজে। ফলে অগস্ত্যের উদরেই বাতাপির মৃত্যু ঘটে। পরে ইল্বলকেও ধ্বংস করে অগস্ত্য সকলের ভয় দূর করেন ও বহু ধন-সম্পত্তি লোপামুদ্রাকে এনে দেন সংসার খরচ চালানোর জন্য।

ঘটনাটি একটু বিস্তৃত করে বললে এই দাঁড়ায় একদিন অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বললেন যে, সন্তান উৎপাদনের জন্য তিনি লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেছেন। লোপামুদ্রা বিনয়ের সঙ্গে বললেন যে, এই জটাচীরধারী ফলাহারী সন্ন্যাসীর পক্ষে কি সন্তান পালন সম্ভব?

তখন মহর্ষি চিন্তান্বিত হয়ে ধনান্বেষণে চললেন। পর পর তিনি একাধিক রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি নিরাশ হলেন। সকল রাজাই আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখিয়ে বললেন যে, রাজ্যে স্থিতি কিছু নেই। তাঁরা মহর্ষিকে ইল্বলের কথা বললেন। তাঁরা বললেন যে, ইল্বল ধনবান, ইল্বলের নিকট মহর্ষি ধন প্রার্থনা করলে মহর্ষির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

এইভাবে অগস্ত্য এবং ইল্বলের সাক্ষাৎ ঘটে। অগস্ত্য ইল্বলের নিকটে উপস্থিত হলেন। ইল্বল তাঁকে আপ্যায়ন করে। বাতাপিকে মায়াবলে সে ছাগে রূপান্তরিত করে সেই ছাগমাংস ভক্ষণ করালো। আহারান্তে অগস্ত্য যখন বিশ্রামরত, তখন ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করলো। কিন্তু ছাগমাংস জীর্ণ করেছেন অগস্ত্য। বাতাপি আর অগস্ত্যের দেহ ছিন্ন করে নির্গত হতে পারলো না। তখন ইল্বল ভীত হয়ে অগস্ত্যকে অভিলষিত ধন সমর্পণ করলো। অগস্ত্য সেই সম্পদে লোপামুদ্রার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি একটি পুত্র সন্তানের অধিকারী হলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানানুসারে অগস্ত্য দক্ষিণ আকাশের একটি বিশিষ্ট তারা। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাদের মধ্যে এটি দ্বিতীয়। লুব্ধক হল প্রথম। লোপামুদ্রা তারাটিকে দেখা যায় অগস্ত্যের পাশেই। অগস্ত্যের পূর্বদিকে এর অবস্থান। Carina নক্ষত্রমণ্ডলেই এর অবস্থিতি। লোপামুদ্রা তারাটির সৌন্দর্যও পুরাণে বর্ণিত লোপামুদ্রার রূপের মতই অতুলনীয়। ঔজ্জ্বল্যের বিচারে লোপামুদ্রা পঞ্চম মাত্রার তারা। অর্থাৎ এর ঔজ্জ্বল্য অনেকটা ম্লান। 'লুপ্ত যার ঔজ্জ্বল্য' অর্থেও লোপামুদ্রা নামকরণ অনেকটাই সংগত। সুতরাং উজ্জ্বল তারা অগস্ত্যের পাশেই দক্ষিণ আকাশে রয়েছেন তাঁর পত্নী লোপামুদ্রা।

মহাভারত বলেছে, অনুকূলা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে অগস্ত্য ঘোর তপস্যা করেন। আমাদের মাথার উপর যে ছায়াপথ দেখা যায় তা আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ। এই ছায়াপথের নাম আকাশগঙ্গা, সোমধারা ইত্যাদি। এই আকাশগঙ্গা নক্ষত্রদের কাছে কেবল গঙ্গাই হয়ে যায়। তাই আকাশগঙ্গা তখন কেবল গঙ্গা। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার অবস্থান আকাশের দক্ষিণাঞ্চলে মেরু সন্নিহিত প্রদেশে। অর্থাৎ অগস্ত্য আকাশগঙ্গা বা গঙ্গার তীরে পত্নী লোপামুদ্রার সঙ্গে তপস্যা করছেন।

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার নাক্ষত্রিক অবস্থান জানা গেল। এখন ইল্বল ও বাতাপির কথায় আসি। আগেই বলেছি পৌরাণিক কাহিনীতে এরা দুই ভাই দৈত্য হিসাবে চিহ্নিত। ইল্বলরা থাকতো মণিমতীপুরে। ইল্বল একদিন এক তপঃপ্রভাসম্পন্ন মহাতেজা ব্রাহ্মণের নিকট দেবরাজপ্রতিম পুত্র প্রার্থনা করলো। দৈত্য ইল্বলের সে প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ অসম্মত হলেন। তখন ইল্বল জাতক্রোধবশত ব্রাহ্মণ সংহারে প্রবৃত্ত হল। ইল্বলের এক সহোদর ভ্রাতা ছিল। তার নাম বাতাপি। সে ছাগরূপ ধারণ করতে পারতো। ইল্বল সেই ছাগকে ব্যঞ্জন রেঁধে অতিথি ব্রাহ্মণদের ভোজন করাত। তারপর মায়াবলে সেই মৃত ছাগকে জীবিত করে তাকে আহ্বান করতো। বাতাপি ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে সহাস্যে বহির্গত হত। ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করতেন। এইভাবে ইল্বল তার ভাই বাতাপিকে সঙ্গে নিয়ে বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হতে থাকে। তার অত্যাচারে ব্রাহ্মণেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। অগস্ত্য বাতাপিকে বধ করেই ইল্বলকে শায়েস্তা করেন এবং তাকে সুপথে আনেন।

ইল্বলও অগস্ত্য কিংবা লোপামুদ্রার মত আকাশের একটি নক্ষত্র, যে নক্ষত্রে পাঁচটি তারা আছে। মৃগশিরার মস্তকে যে পাঁচটি তারা আছে সেই পাঁচটি তারাই ইল্বল বা ইল্বলা। পণ্ডিতেরা বলছেন, মৃগশিরা শিরস্থ পঞ্চতারকাই 'ইল্বলা'। অমরকোষে প্রাচীন মৃগশিরার যে বর্ণনা আছে তাতেই ইল্বলের নির্দেশ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে,

মৃগশীর্ষে মৃগশিরস্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী।
ইল্বলাস্তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ।।

এখানেও আছে যে, মৃগশিরার শিরোদেশে যে তারাগুলি আছে, তাদের নাম ইল্বলা। এগুলি কালপুরুষের কটিস্থিত তারকা। কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিদেশে 3টি বড় ও 2টি ছোট তারকা আছে। এই 5টি তারার নাম ইন্বকা, ইল্বকা বা ইল্বল। বাতাপি ছাগের আকৃতি ধারণ করতে পারতো। কালপুরুষ নক্ষত্রই বাতাপি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মৃগ হিসেবে কালপুরুষের কল্পনা আছে। ওই মৃগ নক্ষত্র 'ঋশ্য' নামের একটি ছাগ। প্রজাপতি এই ছাগরূপ ধারণ করেছিলেন। কালপুরুষের মধ্যেই ইল্বলের অবস্থান হলে কি হবে কালপুরুষ এবং ইল্বলের পৃথক কল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

প্রায় 6200 বছর আগে মৃগশিরা বা যজ্ঞসোম নক্ষত্রে সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি হত। তখন অগস্ত্য তারার উদয় হত বর্ষার শেষে। অগস্ত্য সে সময় অতোটা দক্ষিণ আকাশে চলে যায় নি। 'বাত' কথার মানে হল ঘূর্ণিঝড়। অগস্ত্য সেই ঘূর্ণিঝড় বা বাতাপিকে বধ করেছিলেন। সে সময় শরতের প্রারম্ভে অগস্ত্যের উদয় দেখে ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন অগস্ত্য এসেই যেন বাতাপি বা ঘূর্ণিঝড় ধ্বংস করলেন বা বাতাপি বধ করলেন। সে সময় একই সঙ্গে আকাশে যজ্ঞপুরুষ বা কালপুরুষকে, তার মৃগশিরা, ইল্বলা ও বাতাপিকে যেমন দেখা যেত, তেমনি দেখা যেত অগস্ত্য তারাটিকে। অগস্ত্যের উদয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাত থেমে গিয়ে নির্মল শরৎকাল আসতো, তাই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কবির দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছে অগস্ত্যের বাতাপি বধের অনবদ্য কল্পনা। ভারতের সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে উন্নতমানের কবি কিংবা কাহিনীকার ছিলেন তার প্রমাণ হল এই সব নাক্ষত্রিক কাহিনীগুলি, যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের

বাস্তব ঘটনাবলী থেকে কল্পিত এবং সুবিন্যস্ত। বাতাপি বধের পর ইল্বলের কাছ থেকে অগস্ত্যের ধন-সম্পত্তি লাভ এবং তা লোপামুদ্রাকে প্রদান ইত্যাদি ঘটনা মূল কাহিনীর গৌণ অংশ মাত্র। আসল বা সার অংশ হল জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে কাহিনীর উপস্থাপনা।

[11] তারা হরণ ও বুধের জন্ম

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের মুখ্যদেবতা হলেন সোম বা চন্দ্র। 'সোম' অর্থে কোনও কোনও জায়গায় 'সোমরস' নামক উদ্ভিজ্জ পানীয়ের কথা বলা হলেও, নবম মণ্ডলের সোম মূলতঃ চন্দ্রদেবতা কিংবা আকাশের চাঁদ হিসাবেই উপস্থাপিত। তাই পুরাণ কাহিনীতে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায়ও সবচেয়ে বড় অবলম্বন হল চন্দ্র। পৌরাণিক কাহিনীসমূহে চন্দ্রের প্রাধান্য তাই অনেক বেশি। তাছাড়া চান্দ্র বৎসরের গণনায় পটু বৈদিক ঋষিদের কাছে চন্দ্র ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষ্ক। পৌরাণিককালে এসে কাহিনীগুলিতে চন্দ্রের সে কারণেই এতো প্রাধান্য, এতো রমরমা। এইসব কাহিনী নির্দিষ্ট করেই দেখিয়ে দেয় প্রাচীন ভারতের অসামান্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গভীরতা। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার যখন সবেমাত্র উন্মেষ ঘটছে, তখন ভারতবর্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানে এগিয়ে গিয়েছিল অকল্পনীয় উৎকর্ষতায়।

চন্দ্রের তারাহরণের কাহিনীটির পুরোপুরি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে। এর মূল ভিত্তি আকাশে চন্দ্র প্রভৃতির অবস্থানে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত এগুলির নানা বাস্তব তথ্যে। এই কাহিনীটিরও নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব। দেবাসুরের সংগ্রামের বহু কাহিনী আছে পুরাণ কাহিনীগুলিতে। চন্দ্রকে নিয়ে এবং তার তারা-হরণ কাহিনীতেও আছে দেবাসুর সংগ্রাম। তারাহরণের কাহিনীটা এই রকম ঃ

দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্যার নাম তারা। রূপবান চন্দ্র একবার বৃহস্পতির ভার্যা তারাকে অপহরণ করেছিলেন। এই হল চন্দ্রের তারাহরণ। তারাহরণের ফলে বৃহস্পতি বিমর্ষ হলেন। তিনি ভগবান ব্রহ্মা এবং দেবর্ষিগণকে অনুরোধ করলেন। তাঁরাও তারাকে পরিত্যাগ করবার জন্য চন্দ্রকে আবেদন জানালেন। কিন্তু চন্দ্র অবিচল। তিনি তারাকে প্রত্যর্পণে কিছুতেই সম্মত হলেন না। অনুরোধ উপরোধ যখন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন সংগ্রাম ছাড়া অন্য পথ থাকে না। অতএব সংগ্রামের সূত্রপাত হল। একদিকে বৃহস্পতি, অন্যদিকে চন্দ্র। রুদ্র ও দেবতাদের নিয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায়। আর চন্দ্রের পক্ষে সমস্ত অসুরকুল। শুক্র অসুরদের আচার্য। তিনি অসুরকুল নিয়ে চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করলেন।

দেব ও অসুর উভয় পক্ষে শুরু হল প্রচণ্ড সংগ্রাম। তারাকে নিয়ে এই সংগ্রাম হয়েছিল বলে এই সংগ্রামের নাম তারকাময় রণ। সংগ্রামের বিভীষিকা দেখে জগৎ ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা যুদ্ধ নিবারণ করে বৃহস্পতিকে তারা অর্পণ করলেন। দেবাসুর রণের পরিসমাপ্তি ঘটল।

যুদ্ধ তো শেষ হল, কিন্তু মুশকিল হল তারাকে নিয়ে। কারণ তারা ইতিমধ্যে গর্ভবতী হয়েছে। বৃহস্পতি তা জেনে তারাকে গর্ভপাত করতে বললেন। ঠিক গর্ভপাত নয়, 'গর্ভনিক্ষেপ' করতে বলা হল। তারা গর্ভনিক্ষেপ করলেন ঈষিকাস্তম্বে [শরগুচ্ছে]; সহজ করে বললে, বলা যায় কাশের বনে তারার গর্ভপাত করানো হল। এই গর্ভ থেকে জন্ম নিল এক দিব্যকান্তি পুত্র। এই পুত্রের প্রকৃত পিতা কে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হল। তারা প্রথমে পুত্রটি প্রকৃতপক্ষে কার তা বলতে রাজী না হলেও, পরে ব্রহ্মার আদেশে তারা জানালেন, এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত। চন্দ্র খুশি হয়ে তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন বুধ। বুধ মানে 'প্রাজ্ঞ'। এই নামকরণও যথেষ্ট অর্থবহ। চন্দ্রকে নিয়ে দেবাসুরের এই সংগ্রাম নিছক কাল্পনিক কাহিনী নয়। এই উপাখ্যান পুরোপুরি জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক। আকাশের গ্রহনক্ষত্রেরা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবকিছুই এখানে রূপক।

'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন ঃ

"দেবাসুরের এই সংগ্রামের নাম তারকাময় রণ অর্থাৎ তারকাদের নিয়ে এই যুদ্ধ। যুদ্ধের রথী মহারথী যাঁরা, তাঁদের নাম কাহিনীতে লক্ষ্য করেছি, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, চন্দ্র। এঁরা সকলেই মহাকাশের গ্রহ বা উপগ্রহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রহদের কিংবা গ্রহ-তারকার পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থানের নাম সংগ্রাম। তাহলে কাহিনী বা সংগ্রামের সূত্রপাতে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র বা চন্দ্র নিকটবর্তী ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন বৃহস্পতির পত্নী তারা। সে কোন্ তারা?

মহাকাশে যুদ্ধের পটভূমি লক্ষ্য করলেই তারার পরিচয় উদঘাটিত হবে। দেবাসুর সংগ্রাম, সংগ্রাম চন্দ্রকে অবলম্বন করে। তাহলে চন্দ্রের একদিকে দেব, অন্যদিকে অসুর। অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি চন্দ্রের এক পাশে, অন্য পাশে শুক্র। শুক্র অসুরদের আচার্য। বৃহস্পতির সহায় ছিলেন রুদ্র, তিনি আর্দ্রা নক্ষত্রের অধিপতি। আর্দ্রা কালপুরুষের দক্ষিণ বাহু, উজ্জ্বল এবং লোহিতবর্ণ। অকাশের সর্বোজ্জ্বল 20টি তারকার মধ্যে এটির স্থান দ্বাদশ। এটি চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত ষষ্ঠ নক্ষত্র। চন্দ্র যে তারাকেই আচ্ছাদন করুক, একথা ঠিক যে, সে তারা আর্দ্রার নিকটবর্তী কোনো তারা। শুধু তাই নয়, এই গ্রহ অবস্থানের মধ্যে বুধ আছে বলে বলা যায় যে, সূর্যও এই গ্রহ সম্মেলনের কাছাকাছি ছিল। সূর্য এবং বুধের ব্যবধান কখনোই 2৪ ডিগ্রির বেশি নয়। শুক্রগ্রহও সব সময় থাকে সূর্যের নিকটে। ফলে যুদ্ধের পটভূমি থেকে সূর্য বেশি দূরে ছিলেন না। সেই কারণে বৃহস্পতির পত্নী হিসেবে আর্দ্রার নিকটবর্তী যে তারাটির কথা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছিলেন তা নিশ্চয় চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত কোনো তারা। চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত নক্ষত্রগুলি সূর্যের বার্ষিক পথ সন্নিহিত এবং সূর্যের নিকটবর্তী। তাছাড়া সূর্যের বার্ষিক পথের ৪ ডিগ্রি উত্তর বা দক্ষিণের মধ্যে প্রায় সমস্ত গ্রহ অবস্থিত। কাহিনীতে একাধিক গ্রহ-উপগ্রহের সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং বৃহস্পতি-পত্নী চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত কোনো তারা হবার সম্ভাবনাই সর্বাধিক।"

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে বৃহস্পতি-পুষ্যা যোগ খুবই প্রসিদ্ধ। পুষ্যা নক্ষত্র হল নক্ষত্রচক্রের অষ্টম নক্ষত্র। চান্দ্রতিথির সঙ্গে জড়িত 27টি নক্ষত্রের ষষ্ঠ নক্ষত্র হল আর্দ্রা ও সপ্তম নক্ষত্র হল পুনর্বসু বা অদিতি নক্ষত্র। আর নবম নক্ষত্র হল অশ্লেষা। আর্দ্রা হল কালপুরুষ মণ্ডলের আলফা [Alpha] তারকা। পুষ্যা নক্ষত্রে একাধিক তারকা। মূল তারকা, যার নামে নক্ষত্রটির নামকরণ, সেটি হল কর্কট রাশির Delta তারকা। আর্দ্রার সামান্য পূর্বে এই Delta তারকা বা পুষ্যা তারকা। এই তারাতেই অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মণস্পতি তারায় প্রায় ছয় হাজার বছর আগেই বৃহস্পতি আবিষ্কৃত হয়। তখন থেকেই গুরু-পুষ্যা যোগ ও তার শুভফলের প্রচলন। এই গুরু-পুষ্যা যোগ থেকেই পুষ্যা তারা হয়ে যায় বৃহস্পতির বা গুরুর পত্নী। সুতরাং চন্দ্র যে তারার হরণ করেছিল বলা হল সে তারা হল পুষ্যা। কর্কটরাশির Delta তারা। ঈষিকাস্তম্ব বা শরবন হল আকাশের ছায়াপথ। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত এই ছায়াপথেই বুধের জন্ম। এই শরবনের পশ্চিমে আর্দ্রা এবং পূর্বে পুষ্যা নক্ষত্রের অবস্থান। পুষ্যা ও চন্দ্রের মিলনে যে বুধের জন্ম সেই বুধকে গ্রহ না ধরে তাকে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান ধরলে এই উপাখ্যানের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিকটা আরও পরিস্ফুট হয়।

এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, পুষ্যা প্রভৃতি গ্রহ ও নক্ষত্র। শুক্র যেহেতু মধ্য রাত্রির আকাশে থাকে না, তাই কাহিনীর সময়কাল প্রথমরাত্রি কিংবা শেষ-রাত্রি। তখন সূর্য দিগন্তের অন্তরালে। তবে মনে করা হয়, সূর্যাস্তের ঠিক পরে, যখন শুক্র পশ্চিম অকাশে সন্ধ্যাতারা হয়ে জ্বলজ্বল করে, সেই সময়কার আকাশ নিরীক্ষণ করেই এই কাহিনীর অবতারণা। ভোরের আকাশে শুকতারা হয়ে শুক্রগ্রহ থাকলেও এই কাহিনী ভোরের আকাশ দেখে কল্পনা করা হয়নি বলেই অনেকে

মনে করেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই সঠিক যে, এই উপাখ্যানের পটভূমি হল সন্ধ্যার আকাশ যে আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধ গ্রহ এবং পূর্ণচন্দ্র।

সূর্য অস্ত গেছে পশ্চিম আকাশে। দিগন্তের কিছুটা উপরে আর্দ্রা নক্ষত্র। রুদ্ররূপী আর্দ্রা লোহিতবর্ণ। সূর্যের অবস্থান তখন পূর্ববর্তী মৃগশিরা নক্ষত্রে। আর্দ্রার কাছেই দেবগুরু বৃহস্পতি। তার পূর্বে শরবনরূপী ছায়াপথ। আরও পূর্বে চন্দ্র পশ্চিম আকাশে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সম্ভবতঃ তৃতীয়ার চাঁদ। তার পাশে পুষ্যা নক্ষত্র—বৃহস্পতির তারা। শুক্রগ্রহ জ্বলজ্বল করছে পশ্চিমাকাশে। চন্দ্রের নিকটে রয়েছে বৃহস্পতিপত্নী পুষ্যা তারা এবং শুক্রগ্রহ। বুধগ্রহের অবস্থান ছায়াপথের মধ্যে। এই অবস্থায় চন্দ্র প্রতিদিন পুষ্যাকে আচ্ছাদন করে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে এগিয়ে চলে অশ্লেষার দিকে। পুষ্যাকে চাঁদের সঙ্গে দেখা যায় শুক্লপক্ষের প্রথম কয়েকটি তিথিতে যখন খণ্ডিত চন্দ্র আকাশে থাকে। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটি দেবাসুর সংগ্রামের অপর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে এই উপাখ্যান প্রসঙ্গে। সেটি হল ঃ

"পুষ্যার পূর্বে অশ্লেষা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে অশ্লেষায় দক্ষিণায়ন হত। কাহিনীটি সম্ভবত ওই সময়ের। সূর্যের দক্ষিণায়ন বিন্দু থেকে দক্ষিণ দিকে অসুর রাজ্য, উত্তরে দেবতাদের অবস্থান। সুতরাং অশ্লেষায় রাক্ষসকুলের শুরু। রাক্ষসকুল চন্দ্রের সহায়। চন্দ্র পুষ্যাকে আচ্ছাদন করে রাক্ষসকুলের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। এইভাবেই চন্দ্রের তারাহরণ কাহিনীকে সংগতভাবে ব্যাখ্যা করা চলে।

কাহিনীর সময় ভোর রাত্রি ধরলে কিছু অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। তখন পুষ্যার অবস্থান সূর্যের অনেক নিকটে। আর্দ্রা দূরবর্তী তারা। তার উপর পুষ্যা অনুজ্জ্বল। সে সময়ে তাকে লক্ষ্য করা নিঃসন্দেহে দুরূহ। তাছাড়া ভোরের রাতে পূর্ব আকাশে চন্দ্রের উদয় কৃষ্ণপক্ষে, একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে। চন্দ্র দিগন্তের কাছে, তখন চন্দ্রের পূর্বগতি প্রত্যক্ষ করা চলে না।"

ভারতীয় পুরাণের এ-জাতীয় বিভিন্ন কাহিনী নিছক কাহিনী নয়। এগুলি মহাকাশভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক চিন্তাযুক্ত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থার নির্দেশক। জ্যোতিষে পঞ্চগ্রহের সমাগম সহসা ঘটে না। এ কাহিনী সেকালের পঞ্চগ্রহ মিলন চিত্রটি ধরেছে। চন্দ্র এবং সূর্য এই পৃথিবীতে গ্রহ হিসাবেই চিত্রিত।

12. মহাপ্লাবন ও মনু ঃ

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই বিখ্যাত গল্প আমাদের অনেকেরই জানা। সে গল্প 'নোয়া'র [Noah] গল্প। বাইবেল বলছে, ঈশ্বর একবার রোষান্বিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে জল প্লাবিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় মানব নোয়াকে একটা নৌকা বানাতে বললেন। সেই নৌকার আশ্রয়ে থাকবে নোয়া ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের তিনপুত্র ও তিন পুত্রবধূও। এছাড়া থাকবে জগতের সব রকমের পশু-পক্ষীর ও কীটপতঙ্গের স্ত্রী ও পুরুষ জাতি। নোয়ার নৌকার এই বিখ্যাত কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা। প্রায় একই রকম একটি কাহিনী আছে আমাদের পুরাণে এবং মহাভারতেও।

ভারতবর্ষে বৈবস্বত মনুকে নিয়ে প্রায় অনুরূপ একটি উপাখ্যান আছে। মনু ছিলেন সূর্যের পুত্র। মহাভারতের বনপর্বে আছে, সেই পুত্র পরিণত বয়সে মহাঋষি, অসাধারণ তেজস্বী, এমন কি ব্রহ্মার মতন অমিত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তিনি প্রচণ্ড প্রতাপ, অসীম বীর্য ও অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিতে পিতা সূর্যকে এবং পিতামহ কাশ্যপকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছিলেন। সে তাঁর তপস্যার ফল। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ও একপদে অবস্থান করে ভয়ংকর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। কখনো বা তিনি অধোমস্তক হয়ে, কখনো বা নির্নিমেষ নয়নে দশ সহস্র বৎসর পর্যন্ত গুরুতর তপস্যা করেছিলেন।

কোনো এক সময়ে ক্ষুদ্র একটি মৎস্য নদীতীরবর্তী হয়ে আর্দ্র কৌপীন পরিহিত ও জটাধারী তপস্বী মনুকে এই কথা বললে, ভগবন্, আমি একটি ক্ষুদ্র মৎস্য, বলবান্ মৎস্যের ভয়ে আমি ভীত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে রক্ষা করলে আমিও আপনার উপকার করবো।

বৈবস্বত মনু মৎস্যের সেই কথা শুনে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হয়ে আপন হস্তে তাকে ধারণ করলেন এবং অপর হস্ত দিয়ে একটি জলাধার নিকটে এনে তার ভেতরে চন্দ্রকিরণের মত শুভ্রবর্ণ ওই মৎস্যটিকে নিক্ষেপ করলেন। ক্রমে সেই মৎস্যটি বৃদ্ধি পেল। দীর্ঘকাল পরে মৎস্যটি আকৃতিতে অতি বৃহৎ হয়ে উঠলো। তখন আর জালার ভেতরে তার স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হল না। মৎস্যের অনুরোধে মনু তখন তাকে একটি দীঘিতে স্থানান্তরিত করলেন। সেখানেও সে বর্ধিত হতে লাগলো। অবশেষে সেই দীঘিও মৎস্যের পক্ষে সংকীর্ণ হয়ে এল। তখন পুনর্বার মৎস্যের অনুরোধে মনু তাকে গঙ্গায় স্থাপন করলেন। অবশেষে আকৃতির বিশালত্বের জন্য মৎস্য নীত হল গঙ্গা থেকে সমুদ্রে।

সমুদ্রে স্থাপিত হওয়ার পরে বৃহৎ মৎস্যটি মনুকে বললে, ভূতলের এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থ অচিরকালের মধ্যে জলমগ্ন হবে, সুতরাং আপনি একখানি দৃঢ় নৌকা নির্মাণ করুন, সেটি যেন একটি শণের রজ্জুযুক্ত হয়। তারপর আপনি সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে সেই নৌকায় আরোহণ করবেন। আর সমস্ত বীজ সংগ্রহ করে নৌকায় রাখবেন।

তারপর সেই মৎস্যটি মনুকে আরও বলল, হে ভগবান, আপনি সেই নৌকায় আরোহণ করে আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন। আমি বিশাল শৃঙ্গ ধারণ করে আপনার কাছে আসবো। তখন আপনি সেই বিশাল শৃঙ্গ দেখে আমাকে চিনতে পারবেন।

তারপর মনু মৎস্যের কথা অনুসারে এক সুদৃঢ় নৌকা নির্মাণ করে, সমস্ত বীজ নিয়ে সেই নৌকায় আরোহণ করে মহাতরঙ্গময় মহাসমুদ্রে ভাসমান হয়ে স্মরণ করলেন মৎস্যকে। বিশাল শৃঙ্গধারী মৎস্য এসে উপস্থিত হল। তারপর মনু মৎস্যের মস্তকস্থিত সেই শৃঙ্গে আপন নৌকাকে শণসূত্রময় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করলেন। তখন মনুর নৌকা মৎসের আকর্ষণে দুরন্ত গতিযুক্ত হল। এদিকে সমস্ত পৃথিবী জলব্যাপ্ত, তবু সেই জলপ্লাবনের মধ্যে সাত ঋষি, মনু ও মৎস্য দৃষ্টিগোচরীভূত ছিল। অবশেষে মৎস্য হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গের নিকটে নৌকাটিকে বহন করে নিয়ে এল। তখন মনু সেই শৃঙ্গের সঙ্গে নৌবন্ধন করলেন। সেই হল মনুর নৌবন্ধন।

জলপ্লাবনের এই কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণ, মৎস পুরাণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে। তবে উপখ্যানটি সর্বত্র একই রকমভাবে বলা না হলেও, বক্তব্যগুলি সব জায়গায় মোটামুটিভাবে একই। অথর্ববেদেও জলপ্লাবনের কথা আছে। এই পৌরাণিক কাহিনীটির সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন, বহুকাল পূর্বে পাঞ্জাবে যে জলপ্লাবন ঘটেছিল, এইজল প্লাবনের কাহিনীতে তার ছোঁয়া আছে। কেউ বলেছেন, সিন্ধুদেশ বারবার জলপ্লাবিত হত প্রাচীনকালে। সেই সব জলপ্লাবনের প্রভাব সম্ভবত রয়েছে এই উপাখ্যানের রচনায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটেছিল এবং তাঁর ফলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যায় মেরু অঞ্চলের বরফ গলে। এতে দ্বারকা নগরী জলপ্লাবনে সমুদ্রগর্ভে লীন হয়ে যায়। এই জলপ্লাবন যে সত্যিই ঘটেছিল তার প্রমাণ হল 'বেট দ্বারকা'-র সমুদ্রের তলদেশ খুঁড়ে বের করা হয়েছে প্রায় 4200 বছরের পুরাতন দ্বারকানগরী। হরপ্পা সভ্যতার মুখ্য নগরগুলি মাঝে মাঝে জলপ্লাবনে ডুবে যেত। এই প্লাবনও ছায়া ফেলে থাকতে পারে এই কাহিনীতে। আবার কেউ কেউ বলছেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে যে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে সেটা সৃষ্টি হয়েছে একটি গ্রহের গুঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে। এই গুঁড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় পৃথিবীর অক্ষ তার সূর্য পরিক্রমার

কক্ষপথের সঙ্গে $23\frac{1}{2}$ ডিগ্রি কোণে স্থাপিত হয়। অক্ষের ওই অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয়। এই মহাপ্লাবনের কথা কেবল বাইবেল নয়, পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিও বলেছে। আমাদের পুরাণগুলিতেও রয়েছে সেই সব মহাপ্লাবনের কোনও একটির কাহিনী। তবে অনেকেই আবার মনে করেন না, জলপ্লাবনের এই কাহিনী বাস্তব কোনও জলপ্লাবনের ঘটনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি রূপক কাহিনী মাত্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নক্ষত্রদের কথা।

তবে সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে মহাকাশ পটভূমিতেই কাহিনীটির উদ্ভব বলে মনে হবে।

উপাখ্যানে যে জলপ্লাবনের কথা আছে, সে প্লাবন পার্থিব নয়, মহাকাশ পটভূমিকেই সেই প্লাবনের ক্ষেত্র বলে মনে হয়। ঋগ্বেদে আছে, দেবতাদেরও সৃষ্টির পূর্বে মহাকাশসলিল দ্বারা বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ছিল। ঋগ্বেদে যম-যমী সংবাদে যমী যমকে বলেছেন, বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্তী দ্বীপে নির্জন প্রদেশে তুমি আমার সহচর। যম ও যমী 2টি তারকা। উত্তর আকাশের উত্তর প্রান্তের শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল সদৃশ একটি ক্ষুদ্রকায় মণ্ডল। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে মণ্ডলটি বিশেষ পরিচিত। সেই মণ্ডলের দুটি তারকা যথাক্রমে যম ও যমী, পাশ্চাত্য Ursa Minor মণ্ডলের Beta এবং Gamma তারকা। শিশুমার মণ্ডলটিই যেন সমুদ্র মধ্যবর্তী দ্বীপ।

তাহলে মহাকাশের একটি রূপ এই সমুদ্র এবং এই সমুদ্ররূপী মহাকাশই বর্তমান কাহিনীর পটভূমি। তাছাড়া মহাভারতে বর্ণিত জলপ্লাবনের এই কাহিনীতে সপ্তর্ষিদের নিয়ে মনুর নৌকায় অবস্থানের কথা আছে। এই সপ্তর্ষি মর্ত্যের নয়, মহাকাশে সাতজন ঋষির নামাঙ্কিত সাতটি তারা, শিশুমারের নিকটবর্তী সপ্তর্ষি মণ্ডল।

উপাখ্যানটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মনু একটি তারকা। শিশুমার নক্ষত্রের কাছাকাছিই এর অবস্থান। এটি সম্ভবতঃ Draco নক্ষত্রমণ্ডলের 'আলফা'[Alpha] তারা। এটি চতুর্থ মাত্রার তারা এবং এটিকে খালিচোখে দেখা যায়। এই তারাটি ঋগ্বেদে 'বৈবস্বত মনু' নামে খ্যাত। এককালে এই তারকাটি ধ্রুবতারা হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কোনও তারাই আকাশে চিরকাল ধ্রুব বা স্থির থাকে না। কোনও এক সময় আপাতভাবে যে তারাকে স্থির বলে মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময় পরে দেখা যাবে সেটি অচল নয় সচল।

পৃথিবীর অক্ষকে কাল্পনিকভাবে মহাকাশে বাড়িয়ে দিলে এই রেখার অগ্রবিন্দু হয় মেরু। এই মেরুর আবর্তন ঘটে একটা ছোট বৃত্তে অনেকটা লাটিমের ঘূর্ণনের বেলায় যেমন হয় সে রকম। এই মেরু প্রায় 25800 বছরে একবার তার আবর্তন শেষ করে, প্রায় ছয় হাজার বছর আগে কেবলমাত্র একটি তারা চলমান সেই আবর্তন পথের উপর এসে পড়েছিল সেই তারাটি হল বৈবস্বত মনু তারা যেটি Draco মণ্ডলীর নক্ষত্র আলফা তারা। তারাটি শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলীর মুখে অবস্থিত। মিশরীয়রা সম্ভবতঃ এটিকে 'থুবান' [Thuban] বলতো। এই তারাটি পরবর্তীকালে চলমান মেরুর অগ্রবিন্দু থেকে দূরে স'রে যায় এবং শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্তমান ধ্রুবতারাটি ধ্রুবত্ব লাভ করে। এখনকা'র এই ধ্রুবতারাটি 23^{0} উপরে অবস্থিত। এটি মোটামুটি উজ্জ্বল। শিশুমারের লেজের ডগায় এটিকে দেখা যায়। এখনকার ধ্রুবতারার সঙ্গে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মরীচি নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখায় যুক্ত করলে তা পুরাতন ধ্রুবতারা বা মনুতারার কাছ দিয়ে যায়। মনু তারার নিকটে আরেকটি ছোট তারা আছে যার নাম প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা রেখেছেন 'ইলা'। এই ইলাকে মনুর কন্যা বলা হয়েছে।

জলপ্লাবনের কাহিনীতে যে মৎস্যের কথা বলা হয়েছে, তা মহাকাশের উত্তরাঞ্চলের মনু তারা সন্নিহিত শিশুমার মণ্ডলটিই। ঋগ্বেদে এই মৎস্যের নাম 'শিংশুমার'। কাহিনীতে যে নৌকার কথা

উল্লেখ করা হয়েছে মহাকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারকা নিয়ে সেই নৌকার আকৃতি কল্পনা। পুরাণে সপ্তর্ষিকে নিয়ে বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কখনো তাকে নিয়ে শকট বা শিবিকার কল্পনা, কখনো বা তার আকৃতিতে তাম্রচূড় ও শিখণ্ডীর রূপারোপ। বৈদিক ঋষিগণ সপ্তর্ষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃশ্যও দেখতেন। এই নৌকাই মনুর নৌকা। যে রজ্জুতে মনু এই নৌবন্ধন করেছিলেন তা শিশুমারের মুখের সম্মুখস্থ অজগর তারকামণ্ডল। রজ্জুতে সর্পভ্রম। অজগরের রজ্জু আকৃতি। অজগর তারকামণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম Draco। মৎস্য পুরাণে আছে, মনু এক ভুজঙ্গকে নৌবন্ধনের রজ্জু করেছিলেন।

শিশুমারের মুখেই রজ্জুর অবস্থান। শিশুমার হল মৎস্য। সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলকে নিয়ে নৌকার কল্পনা। সেই নৌকা বাঁধা হল উত্তরগিরিতে। কারণ মনু তারা ধ্রুবতারা হওয়ায় মেরু বা উত্তরগিরিই তখন আকাশের সর্বোচ্চ স্থান। সুতরাং জল প্লাবনের ওই উপাখ্যান তৈরি হয়েছে নক্ষত্রদের অবলম্বনে এবং আকাশে তাদের অবস্থান বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই কাহিনীর সময়কাল সম্ভবত মনুতারার ধ্রুবতারা হওয়ার কাল।

13. সমুদ্র মন্থন ঃ

সমুদ্রমন্থন নিয়ে এক দীর্ঘ পৌরাণিক উপাখ্যান অধিকাংশ পৌরাণিক গ্রন্থে রয়েছে। এই আখ্যান ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বেশ জনপ্রিয়। সেই উপাখ্যান এই রকম ঃ

স্বর্গরাজ্যের সীমা নিয়ে দেবাসুরের চিরকালের সংগ্রাম চলেছে। অসুরেরা সীমা লঙ্ঘন করে, কাজেই দেবগণ বাধা দেন। একবার দীর্ঘকাল ধরে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ফলে দেবগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অমৃতপানে অভিলাষী হলেন। এও বলা হয়, এই অমৃত পানের ফলে দেবতারা অমর হবেন। মৃত্যু তাঁদের ছুঁতেই পারবে না। তাঁরা অনায়াসেই অসুরজয়ী হতে পারবেন।

বলা হল, ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করলেই অমৃত উঠবে। ক্ষীরোদ সাগর হল দুগ্ধসাগর। এই সাগর মন্থন করে অমৃত তুলে আনা কেবলমাত্র দেবতাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁরা অসুরদেরও সঙ্গে চাইলেন। সন্ধি হল। ঠিক করা হল, দেবাসুর মিলিত হয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করবেন। এই মন্থনে যা যা উত্থিত হবে সবই সমানভাবে ভাগাভাগি হবে। এমন কি অমৃতও দেবাসুর সমানভাগে ভাগ করে নেবেন। অসুরেরা সমুদ্রমন্থনে রাজী হল এই ভেবে যে, অমৃত পান করে তারাও বলবান হতে পারবে, এমন কি অমরও হতে পারবেন।

মন্থনের জন্য প্রয়োজন মন্থনদণ্ড। সাগর মন্থন। সুতরাং মন্থনদণ্ড সাধারণ দণ্ড নয়। মন্দর পর্বত ছিল আকৃতিতে অতি বিশাল। উচ্চতায় সে এগার হাজার যোজন, নিম্নে মৃত্তিকার মধ্যেও পবর্তটি এগার হাজার যোজন প্রবিষ্ট ছিল। দেবতারা মিলিতভাবে মন্দর পবর্তকে সমুদ্রমন্থনের উপযুক্ত বিবেচনা করলেন, কিন্তু তাঁরা মন্দর পবর্তটিকে উৎপাটিত করতে সমর্থ হলেন না। তখন তাঁরা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনেই সম্মত হয়ে সর্পরাজ অনন্তকে মন্দর উৎপাটনে নিয়োজিত করলেন।

সর্পরাজ অনন্ত ছিলেন মহাশক্তিশালী। তিনি বলপূর্বক বন ও বনবাসী প্রাণিগণসমেত সেই পবর্তরাজ মন্দরকে উত্তোলিত করলেন। তারপর দেবগণ সেই মন্দর পবর্তবাহী অনন্তের সঙ্গে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়ে সমুদ্রকে বললেন, অমৃতের জন্যে আপনাকে আমরা মন্থন করবো।

সমুদ্র সম্মত হলেন, কিন্তু বিনাশর্তে নয়। তিনি বললেন, মন্থনের সময় মন্দরের ঘূর্ণনের জন্য তাঁকে তীব্র মর্দন সহ্য করতে হবে। সুতরাং অমৃতের অংশ তাঁকেও দিতে হবে।

তারপর দেবগণ ও অসুরগণ মন্দর পর্বতের অধোদেশে আধার হবার জন্যে সমুদ্রস্থিত কূর্মরাজকে অনুরোধ জানালেন। কূর্মরাজ সম্মত হয়ে মন্দরের নিম্নদেশে নিজের পৃষ্ঠ স্থাপন করলেন। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা কূর্মপৃষ্ঠস্থিত মন্দরের নিম্নদেশের সমীকরণের জন্য পর্বতে আঘাত হানলেন।

প্রাথমিক পর্বের পর অমৃত লাভের জন্যে সমুদ্রমন্থন শুরু হল। মন্দর পবর্ত মন্থনদণ্ড। অনন্ত নাগ মন্থনরজ্জু। সেই মন্থনরজ্জুর একপ্রান্তে অসুরগণ সমবেত হল, অন্যপ্রান্তে দেবগণ। দেবগণ সম্মিলিতভাবে ছিলেন বাসুকির দেহের প্রান্তদেশে। সেইদিক থেকে তাঁরা পুচ্ছ ধারণ করলেন। অসুরেরা ছিল নাগরাজ বাসুকির শরীরের মুখভাগে। নাগরাজ বাসুকি ভগবান নারায়ণ বলে উভয় দলের সেই আকর্ষণ সহ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দেবগণ ও অসুরগণ যখন মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্রমন্থন করেন, সেই সময় সমুদ্র থেকে গম্ভীর মেঘগর্জনের ন্যায় বিশাল শব্দ উত্থিত হচ্ছিল। চতুর্দিকে ভয়ংকর পরিবেশ। মন্দর পর্বতের ঘূর্ণনে পর্বতের বিশাল আকারের সব বৃক্ষ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হয়ে পক্ষিগণের সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এদিকে সংঘর্ষে অগ্নিও প্রজ্বলিত। সেই অগ্নি মন্দর পর্বতকে আবৃত করে হস্তী, সিংহ ও বিবিধ প্রাণীকে দগ্ধ করতে লাগলো। তা ছাড়া সমুদ্রের বিভিন্ন প্রাণী মন্দর পর্বতের ঘর্ষণে লবণ জলের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

সমুদ্রমন্থনে এই প্রলয়ংকর অবস্থায় দেবতা অসুর সকলেই ক্লান্ত। কিন্তু অমৃত উত্থিত হল না। দেবতারা বরদাতা ব্রহ্মাকে শরণ করলেন। ব্রহ্মা তখন নারায়ণকে বললেন, আপনি এই পরিশ্রান্ত দেবদানবগণকে বল প্রদান করুন। এই বিষয়ে আপনিই পরম আশ্রয়।

বিষ্ণু সকলকে শক্তি দান করলেন। তখন আবার নতুন উদ্যমে সমুদ্রমন্থন শুরু এবং সাগরের জলে আলোড়ন আরম্ভ হল। চলল সমুদ্রমন্থন।

অত্যধিক সমুদ্র মন্থনের ফলে কালকূট বিষ উৎপন্ন হ'ল। সেই বিষ ধূমযুক্ত অগ্নির মত প্রজ্বলিত হয়ে জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ব্রহ্মার অনুরোধে শিব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে 'নীলকণ্ঠ' নামে বিখ্যাত হয়ে হলেন।

অবশেষে মথিত সমুদ্র থেকে বিমল সমুজ্জ্বল শীতরশ্মি চন্দ্র উৎপন্ন হলেন। সেই সঙ্গে উত্থিত হল শ্বেতবর্ণ অশ্ব, পারিজাত তরু, সুরভি, লক্ষ্মীদেবী ও চারটি দন্তশোভিত শ্বেতহস্তী ঐরাবত এবং সকলের আকাঙ্খিত অমৃত। মূর্তিমান ধন্বন্তরির শুভ্র কমণ্ডলুতে অমৃত রক্ষিত ছিল। অমৃত উঠলো সবার শেষে। অমৃত উঠে আসার পর মন্থন বন্ধ হল।

সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে চন্দ্রকে মহাদেব শিরোভূষণ করলেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন। ইন্দ্র ঐরাবতকে নিজের বলে গ্রহণ করলেন এবং ধন্বন্তরির হস্তে ধৃত কমণ্ডলুর অমৃত পানে দেবগণ বলবীর্যবান্ হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় অসুরেরা অমৃতে বঞ্চিত হলেন। কেবল রাহু নামে এক দানব দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত পান করে। কিন্তু রাহুর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত গিয়েছে এমন সময়ে চন্দ্র সূর্য দেবগণের হিত কামনায় বিষ্ণুকে সেই সংবাদ দিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ অমৃত পানকারী সেই রাহুর মস্তক নিজ শক্তিতে চক্রের দ্বারা ছেদ করলেন। এমন সময় আকাশস্থিত রাহুমুখ থেকে উচ্চারিত হল, 'চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে আমার চিরকাল শত্রুতা থাকবে।' সেইজন্য রাহু এখনও চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে।

এই উপাখ্যানের সমুদ্র হল দুধ সমুদ্র বা ক্ষীরোদ সমুদ্র, যা আমাদের আকাশের ছায়াপথ। এই সমুদ্র পার্থিব সমুদ্র নয়, স্বর্গের তথা আকাশের সমুদ্র বা আকাশ গঙ্গা যা আকাশের উত্তর-দক্ষিণে

চিত্র ঃ 49

'ভেলা সুপারনোভা' [Vela Supernova] অবশেষ। এর বিস্ফোরণ ঘটেছিল প্রায় এক হাজার বছর আগে। এটির ব্যাস 200 আলোকবর্ষ এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 1600 আলোকবর্ষ মাত্র

চিত্র ঃ 51
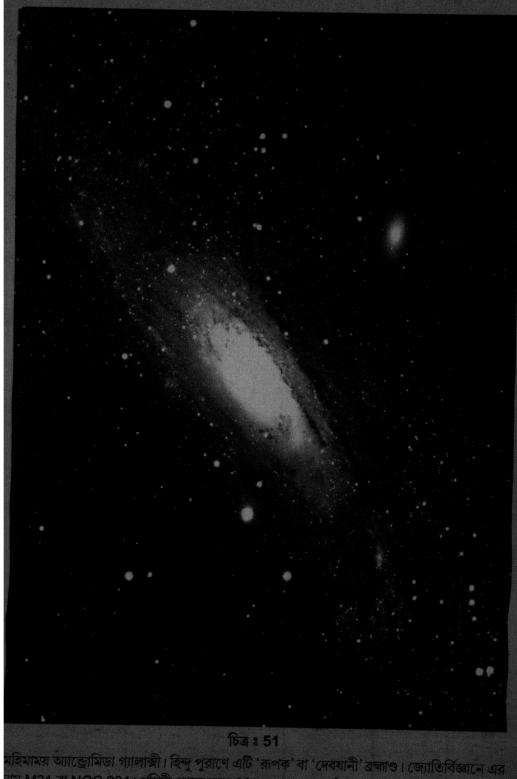
মহিমাময় অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী। হিন্দু পুরাণে এটি 'রূপক' বা 'দেবযানী' ব্রহ্মাণ্ড। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর নাম M31 বা NGC 224। পৃথিবী থেকে দূরত্ব 22 লক্ষ আলোকবর্ষ [মতান্তরে 24 লক্ষ আলোকবর্ষ]। এর ব্যাস প্রায় 1,60,000 আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসের 1.6 গুণ

চিত্র ঃ 52
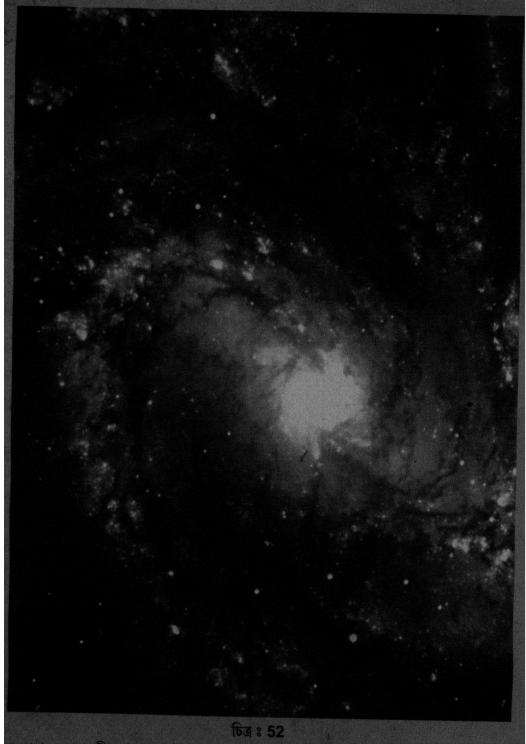
অশ্লেষা নক্ষত্রমণ্ডলীতে [Hydra Constellation] অবস্থিত এই গ্যালাক্সীর [M83] সর্পিল বাহুগুলিতে নীল-রঙ নতুন তারা জন্ম নিচ্ছে। এর নীহারিকা অঞ্চলের আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাস [H II] থেকে বিকিরিত হচ্ছে লাল রঙ। এর শঙ্খবৃত্তাকার গঠনের কারণ সম্ভবত 'ঘনত্ব তরঙ্গ' [Density Wave। পৃথিবী থেকে দূরত্ব 1.5 কোটি আলোকবর্ষ। M83-র অন্য নাম NGC 5236

চিত্র ঃ 53

ট্যারেন্টুলা নীহারিকা [Tarantula Nebula]। এটি রয়েছে 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ'-এর মধ্যে। এর মধ্যে আছে বহু উত্তপ্ত নক্ষত্র, যাদের বিকিরণে এটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। এর গোলাপী রঙ, এর মধ্যস্থিত আয়নিত হাইড্রোজেন [H II] গ্যাসের বিশাল সম্ভার থেকে উৎপন্ন। এটি NGC 2070। অন্য নাম 'লুপ নীহারিকা' [Loop Nebula]। এর ব্যাস 900 আলোকবর্ষ। দূরত্ব প্রায় 1,70,000 আলোকবর্ষ
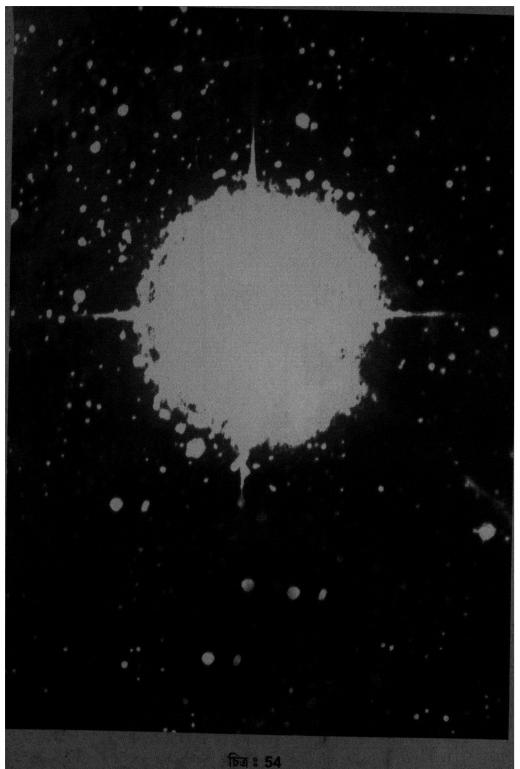
চিত্র ঃ 54
1987 সালে প্রতিবেশী গ্যালাক্সী 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত সূর্যের বহু কোটি গুণ দীপ্তিসম্পন্ন সুপারনোভা। এর নাম 1987A। দূরত্ব 1,70,000 আলোকবর্ষ

চিত্র ঃ 55

স্কাল্প্টার গ্যালাক্সী [Sculptor Galaxy]। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর নাম NGC 253।
এর দূরত্ব 2,80,000 আলোকবর্ষ। এই গ্যালাক্সীটি রয়েছে আমাদের 'স্থানীয় বর্গ' - এর মধ্যে

চিত্র ঃ 56

কৃষ্ণচক্ষু বা কালো চোখ ব্রহ্মাণ্ড [Black Eye Galaxy]। এটি Sb ধরনের শঙ্খবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড। নাম M 64 বা NGC 4826। পৃথিবী থেকে দূরত্ব 2·4 কোটি আলোকবর্ষ। এর ব্যাস 65,000 আলোকবর্ষ

চিত্র ঃ 57

'আংটি ব্রহ্মাণ্ড' [Ring Galaxy]

10। মঘা

11। পূর্বফল্গুনী

12। উত্তরফল্গুনী

13। হস্তা

14। চিত্রা

15। স্বাতী

16। বিশাখা

17। অনুরাধা

19। জ্যেষ্ঠা
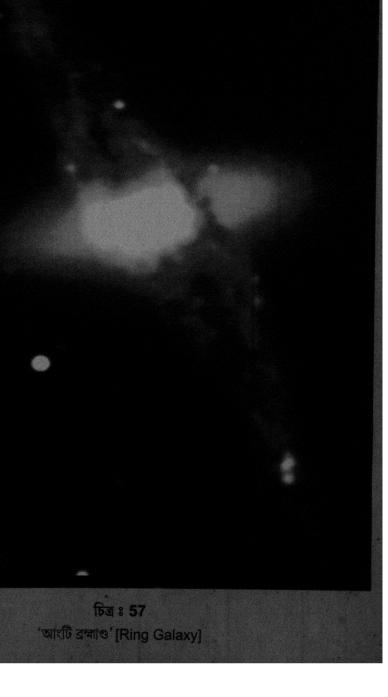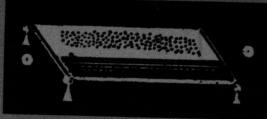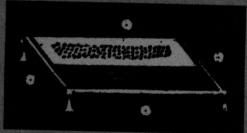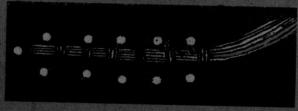
18। মূলা

চিত্র : 72

নক্ষত্রদের আকৃতি

20। পূর্বাষাঢ়া

21। উত্তরাষাঢ়া

22। শ্রবণা
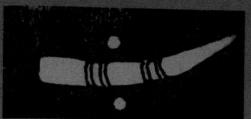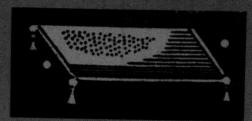
23। ধনিষ্ঠা
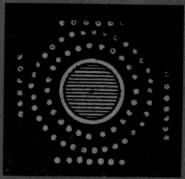
24। শতভিষা
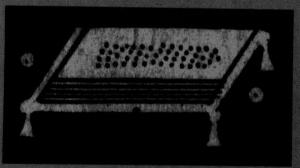
25। পূর্বভাদ্রপদ

26। উত্তরভাদ্রপদ
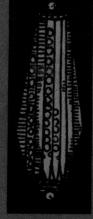
27। রেবতী

0। অভিজিৎ

চিত্র ঃ73
নক্ষত্রদের আকৃতি

চিত্র : 81

সূর্য থেকে গ্রহগুলির দূরত্ব মাইলে দেওয়া হয়েছে। ওগুলি ওদের গড় দূরত্ব। 1 মাইল = 1.61 কিলোমিটার। গ্রহগুলির আকার মোটেই কোনও অনুপাতে নেই। সবাইকে সমান দেখানো হয়েছে। কারণ স্কেলে করলে সূর্য একটা বিন্দুতে হত এবং গ্রহগুলি আঁকা যেত না
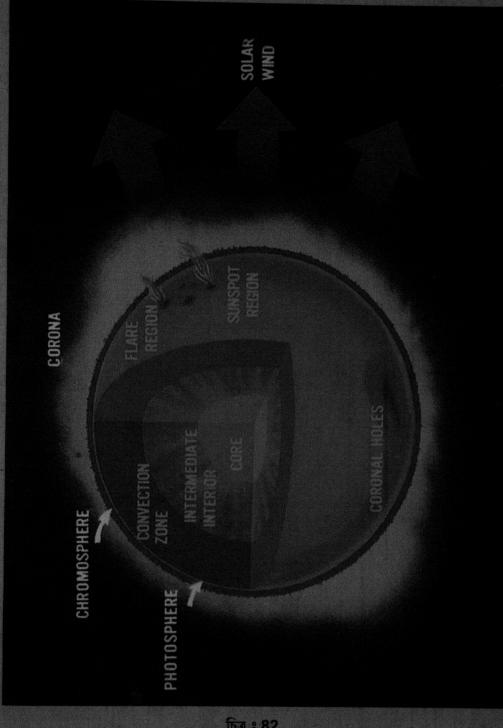
চিত্র ঃ 82

সূর্যের অনেকগুলি স্তর। এর কেন্দ্রে অকল্পনীয় তাপ ও চাপে চলছে তাপ-কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া, যার ফলে হাইড্রোজেন নিয়মিত রূপান্তরিত হয়ে তাপ উৎপাদন করছে। বাইরের দিকে সূর্যের তিনটি স্তর - ফোটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার এবং সৌর কিরীট। ফোটোস্ফিয়ারের বেধ মাত্র 100 কিলোমিটার [62 মাইল]
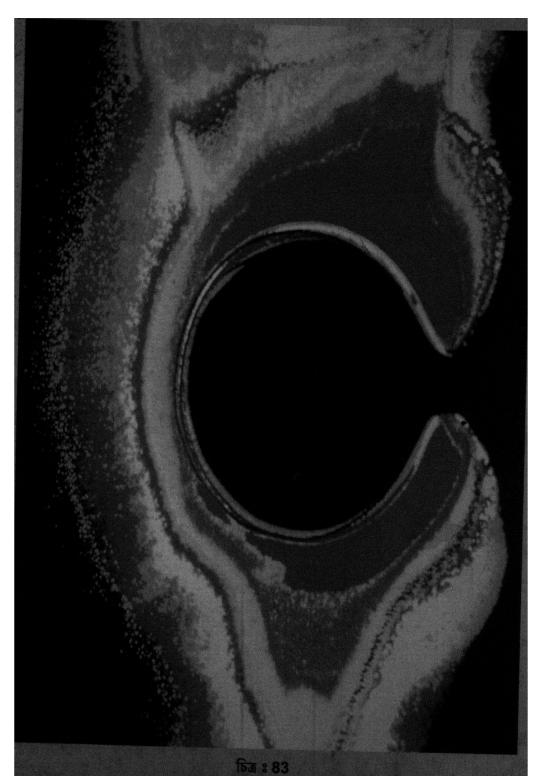
চিত্র ঃ ৪৩
স্কাইল্যাবের সৌর দূরবীনে তোলা সৌরকিরীটের ছবি। এক্সরে এবং অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে তোলা হয়েছে এই ছবিটি

বিস্তৃত। এটি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড। এই আকাশ গঙ্গা দুগ্ধতুল্য শুভ্রবর্ণ বা ক্ষীরোদ সাগর। এর অন্য নাম সোমধারা, দেবপথ ইত্যাদি। সমুদ্র মন্থনের এই উপাখ্যানে রয়েছে বিস্ময়কর কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সত্য।

মহাকাশের ছায়াপথ বলয়াকৃতি। এর একদিকের অবস্থান বৃষরাশি ও মিথুন রাশির মাঝামাঝি অঞ্চলে এবং অন্য অংশটি রয়েছে বৃশ্চিক ও ধনু রাশির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"মহাকাশে যে ছায়াপথ লক্ষ্য করা যায় সে ছায়াপথ একটা বলয়। এই বলয়াকৃতি ছায়াপথের একটা অর্ধের অবস্থান বৃষ রাশি এবং মিথুন রাশির মধ্যবর্তী অংশে, অন্য ভাগটি গেছে বৃশ্চিক রাশি এবং ধনু রাশির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল দিয়ে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ৪টার সময় পশ্চিম দিকচক্রে একটা স্থূল দুগ্ধশুভ্র বলয়ার্ধ দেখা যায়। আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রায় ওই সময় পশ্চিম দিক্‌চক্রে দুগ্ধশুভ্র বলয় থাকে না। তখন একটি বলয় লক্ষ্য করা যায় পূর্ব দিগন্তে। জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে পূর্ব এবং পশ্চিম দিগন্তে যে দুগ্ধশুভ্র পথটি লক্ষ্য করা যায় তা কিন্তু বলয়ের একই অংশ নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বলয়ের যে অংশটি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে সেটি বৃষ ও মিথুন রাশির অন্তর্গত। আষাঢ় মাসে লক্ষিত হয় তার অপরার্ধ, বৃশ্চিক ও ধনু রাশির মধ্যবর্তী অঞ্চলটি। কিন্তু মহাকাশে পরপর এই দুই মাসে দুগ্ধসমুদ্র লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, বলয়ের যে অংশ পশ্চিমে ছিল তা পূর্বে স্থানান্তরিত হয়েছে, কিংবা যা পূর্বে ছিল তা পশ্চিমে অপসৃত হয়েছে। এই হল মন্থন গতি—এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে। চক্রগতির মত এটিতে আবর্তনের সম্পূর্ণতা নেই। দেওয়াল ঘড়ির দোলক যেমন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় এবং সেই প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে ফিরে আসে, মন্থনগতিও সেই রকম। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে মহাকাশে দুগ্ধপথের মন্থনগতি সদৃশ স্থান পরিবর্তন থেকেই সম্ভবত কাহিনীটির উৎপত্তি।"

পণ্ডিতেরা বিষুববৃত্তকে বলেছেন ছায়াপথরূপী সমুদ্রের বাসুকিরূপ রজ্জু। এই বিষুববৃত্তের অক্ষরেখাই হল মন্দর পর্বত। সমুদ্রমন্থনে যে সব বস্তু উত্থিত হল তারা সবাই মহাকাশের বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক কিংবা বিভিন্ন তারকার সমন্বয়ে সৃষ্ট মানুষ, অশ্ব, গজ, কুকুর, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদির চিত্ররূপ। অমৃত হল পূর্ণচন্দ্র যা আমাদের আকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষ্ক। ধন্বন্তরি ছায়াপথ সন্নিহিত একটি তারকা মণ্ডল। সম্ভবত এটি কালপুরুষ তারকামণ্ডলী। চিত্রানক্ষত্রসহ যে কন্যা রাশির কল্পনা সেই কন্যা হলেন লক্ষ্মীদেবী, যিনি দুর্বাসা ঋষির অভিশাপে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আষাঢ় মাসে পূর্বাকাশে দেখা যায় ছায়াপথকে এবং মধ্য আকাশে চিত্রা ও কন্যারাশিকে। ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে সমুদ্র থেকে উত্থিত হলেন। সুতরাং ধন্বন্তরি নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছেই ছিল পূর্ণচন্দ্র। মহাকাশে চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্তের কাছাকাছিই থাকে। আবার কালপুরুষের অবস্থান এই অঞ্চলেই এবং এটি ছায়াপথ বা দুগ্ধ সমুদ্র বা ক্ষীরোদ সাগরের সন্নিহিত।

কালপুরুষের 13টি নক্ষত্র সহজেই দেখা যায়। এই 13টি নক্ষত্রকে মৃগ হিসাবে কল্পনা করে একে মৃগ নক্ষত্র যেমন বলা হয়, তেমনি এই 13টি নক্ষত্রের সাহায্যে কূর্ম-আকৃতিও অনুমান করা যায়। অথর্ববেদ ও শুক্লযজুর্বেদে কূর্মের নাম কশ্যপ। কশ্যপকে প্রজাপতি দক্ষ 13টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, ঠিক যেমন 27টি কন্যাকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রের সঙ্গে। এই সাতাশটি কন্যা নক্ষত্রচক্রের 27টি নক্ষত্র। অনুরূপ ভাবে, কশ্যপকে সম্প্রদান করা 13টি কন্যাও 13টি নক্ষত্র যেগুলি রয়েছে কালপুরুষ মণ্ডলে। এই দক্ষ প্রজাপতি 10টি কন্যা দান করেছিলেন ধর্মকে এবং নিঃসন্দেহে এই 10টি কন্যাও

আকশের দশটি তারা। সুতরাং 13টি নক্ষত্র দিয়ে কূর্মাকৃতিই কল্পনা করা হয়, যার পিঠে রাখা হয়েছিল মন্দর পর্বতকে। কল্পনায় এই কূর্ম-পৃষ্ঠেই স্থাপিত হয় মন্দর পর্বত। আর অমৃত লাভ করতে দক্ষিণায়ণের সব তারা, যেগুলি কাহিনীতে অসুর হিসাবে চিহ্নিত এবং উত্তরায়ণের সব তারা, যাদের আমরা দেবতা বলি, উভয় দলই ছায়াপথ সুমদ্র মন্থনে হাত মিলিয়ে ছিল। মহাকাশে তাই সম্ভব হয়েছিল ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন, যা বাস্তবে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট তারকামণ্ডলীর অবস্থান ও তাদের কারকতা এবং ছায়াপথের সঙ্গে তাদের সন্নিকটস্থতার কাহিনী বলে। সৃষ্টি করে অনবদ্য সব পৌরাণিক কাহিনী, বিস্ময়কর উপাখ্যান।

14. বিনতার মুক্তি ঃ

সমুদ্রমন্থন করলেন দেবাসুর মিলিত হয়ে। সেই মন্থনে উঠে এলো নানা মহার্ঘ বস্তু এবং সবশেষে অমৃত। মহার্ঘ বস্তুগুলির কয়েকটি হল পারিজাত, সুরভি নাম্নী গাভী, বিশালকায় ঐরাবত এবং শ্বেতবর্ণের এক অশ্ব। বিনতার কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই অশ্বটি।

দক্ষের দুই কন্যা বিনতা ও কদ্রু কশ্যপ ঋষির দুই স্ত্রী। এই দু'জন ওই অশ্বটিকে নিয়ে এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। উক্ত অশ্বটির পুচ্ছের রোমসমূহ যে শ্বেতবর্ণের এ নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ ছিল না। তবু বিনতা কদ্রুকে অশ্বটির পুচ্ছের রোমসমূহের বর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন। কদ্রু বললেন, হে সুহাসিনী, আমি মনে করি, অশ্বের পুচ্ছের রোমসমূহ শ্বেতবর্ণের হলে আমি তোমার দাসীবৃত্তি গ্রহণ করবো, অন্যথায় তুমি আমার দাসী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করবে।

এই বিতর্কে কদ্রুর পরাজিত হওয়াই সংগত এবং বিনতার দাসী হিসেবে তাঁরই জীবন নির্বাহ করার কথা। কিন্তু কদ্রু ছলের আশ্রয় নিলেন। তিনি তাঁর সহস্র সংখ্যক সর্পপুত্রকে বললেন, আমাকে বিনতার দাসীত্ব থেকে রক্ষা করবার জন্য তোমরা কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ রোমের আকার ধারণ করে শীঘ্র উচ্চৈঃশ্রবার শরীরে অধিষ্ঠান কর।

পরদিন ওই বিতর্কের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য দুই ভগিনী মিলিত হয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। বিনতা বিস্মিত হয়ে দেখলেন অশ্বের শরীর চন্দ্রকিরণতুল্য শ্বেতবর্ণ, কিন্তু পুচ্ছদেশের সমস্ত লোম কৃষ্ণবর্ণ। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদে মলিন হলেন বিনতা। বিতর্কে বিনতার পরাজয় ঘটলো। ফলে দুঃখসন্তপ্তচিত্তে তিনি কদ্রুর দাসীত্ব গ্রহণ করলেন।

কিছুকাল পরে বিনতার পুত্র গরুড়ের জন্ম হল। বিনতা দুটি অণ্ড প্রসব করেছিলেন। তার একটি থেকে জন্মগ্রহণ করেন সূর্যসারথি অরুণ। অন্যটির থেকে জন্ম হয় গরুড়ের। গরুড় ছিলেন মহাশক্তিশালী।

জন্মগ্রহণের পর গরুড় আকাশে উড্ডীন হলে তাঁকে দেখে দেবতারা বিস্মিত হলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁর প্রকাশ, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু দু'টি বিদ্যুতের মত দীপ্ত। দেবতারা তাঁকে অগ্নিস্বরূপ মনে করে স্তব-স্তুতিতে তাঁর সন্তোষ বিধান করবার চেষ্টা করলেন।

গরুড় তখন আপনাকে সংহত করে ভ্রাতা অরুণকে পৃষ্ঠে স্থাপন করে পিতৃগৃহ থেকে মহাসাগর পরপারে মাতার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সেখানে মাতার দাসীবৃত্তি দেখে গরুড় মর্মাহত। তিনি কদ্রুর পুত্রদের মাতার শাপের অপনোদনের শর্ত ব্যক্ত করবার জন্য অনুরোধ করলেন। দুঃসাধ্য সেই শর্ত পালন করা। সর্পগণ বলল, গরুড়, তুমি বলপূর্বক অমৃত এনে দাও তাহলেই তোমার মাতা আমার মায়ের দাসীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে।

মহাবীর পক্ষী-সম্রাট গরুড় নিরাশ হলেন না। যে কার্য সম্পাদান সাধারণ সকলের পক্ষে অসম্ভব ছিল, গরুড়ের পক্ষে তা সহজ না হলেও অসম্ভব ছিল না। তিনি অমৃত সংগ্রহে অগ্রসর হলেন। গরুড়

আসছেন, এই সংবাদে দেবকুল আলোড়িত। চতুর্দিকে উদ্যোগ এবং প্রস্তুতিপর্ব চললো। দেবগণ অমৃত পাত্রটিকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ধারণ করে গরুড়ের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু গরুড়কে তাঁরা পরাস্ত করতে পারলেন না। প্রচণ্ড সংগ্রাম, একদিকে একাকী গরুড়, অন্যদিকে সমবেতভাবে দেবকুল। তবু দেবকুল পর্যুদস্ত হলেন। গরুড়ের আঘাতে গন্ধর্বগণ সাধ্যগণের সঙ্গে পূর্ব দিকে পলায়ন করলেন, রুদ্রগণ বসুদের নিয়ে গেলেন দক্ষিণাঞ্চলে, আদিত্যগণ পশ্চিম দিকে এবং অশ্বিনীকুমার যুগল আত্মরক্ষার্থে উত্তরে অন্তর্ধান করলেন।

তারপর গরুড় আপন শক্তি, উদ্যম ও উৎসাহ বলে অমৃত সংগ্রহ করে বায়ুর বেগে ধাবিত হলেন। অমৃত হৃত, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ—তিনি বজ্র দ্বারা অমৃত হরণকারী গরুড়কে আঘাত করলেন। তখন দেবগণের কোলাহলের মধ্যে পক্ষিরাজ গরুড় বজ্রাহত হয়েও ইন্দ্রকে বললেন—ইন্দ্র, যাঁর অস্থি দ্বারা এই বজ্র নির্মিত, সেই ঋষির সম্মান, এই বজ্রের সম্মান এবং তোমাদের সম্মান রক্ষা করবো। সেইজন্য একটি পক্ষ ত্যাগ করছি। এই বলে গরুড় একটি পক্ষ পরিত্যাগ করলেন। সেই পক্ষের নাম হল 'সুপর্ণ'।

কাহিনীর অবশিষ্টাংশে ইন্দ্র ও গরুড়ের মিত্রতা স্থাপিত হল। এরপর অমৃত নিয়ে গরুড় এলেন নাগদের কাছে। প্রার্থিত বস্তু আনীত হওয়ায় বিনতা কদ্রুর দাসীত্ব থেকে মুক্ত হলেন। কিন্তু সর্পগণ অমৃত পানের সুযোগ পেলেন না। গরুড়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ইন্দ্র অমৃত হরণ করলেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্রের পরামর্শে অমৃত পানের পূর্বে সর্পেরা গেল স্নান এবং মাঙ্গলিক চন্দনাদি লেপনের জন্য। সেই অবকাশে কুশের উপরে রক্ষিত অমৃত ইন্দ্র হরণ করে নিয়ে গেলেন। সর্পেরা এসে অমৃত না পেয়ে কেবলমাত্র কুশ লেহন করলো। এইভাবে বিনতার মুক্তি হল দাসীত্ব থেকে।

ঋগ্বেদে এই কাহিনী কিছুটা সংক্ষেপে আছে। বলা হয়েছে, শ্যেন পক্ষী সোম আহরণ করে আনছিল দ্যুলোক থেকে। সোমরক্ষাকারী কৃশানু তা দেখতে পেয়ে শর নিক্ষেপ করেন। আহত শ্যেন পক্ষীর একটি পাখা দেহচ্যুত হয়। এই সোম অমৃতও হতে পারে আবার সোমরসও হতে পারে। আবার এই কাহিনী অন্যত্র একটু পরিবর্তিত হয়েই পরিবেশিত হয়েছে। যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও সোম আনয়নের এই উপাখ্যানটি আছে। তবে সেখানে এটি কিঞ্চিৎ ভিন্নাকারে পরিবেশিত। সেখানে আছে, দেবগণ গায়ত্রীকে সোম আনয়নের কথা বললেন। সেই নির্দেশ অনুসারে গায়ত্রী সোমরক্ষকগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে পদদ্বয় এবং মুখের দ্বারা রাজা সোমকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেন। তখন সোমরক্ষক কৃশানু গায়ত্রীর পশ্চাতে বাণ মোচন করে তাঁর বামপদ ছিন্ন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, গায়ত্রী পক্ষীরূপ ধারণ করে দ্যুলোক থেকে সোম আনয়ন করেন। মহাভারতের উপাখ্যানের সঙ্গে ঋগ্বেদের উপাখ্যানের এক দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সে পার্থক্য ইন্দ্রকে নিয়ে। মহাভারতে ইন্দ্র ছিলেন সোমরক্ষক। তিনি সোম হরণকারী গরুড় পক্ষীকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেছিলেন। ঋগ্বেদে শ্যেন পক্ষী ইন্দ্রের জন্যই অমৃত আহরণ করে আনছিল।

সুতরাং এ কথা মনে হওয়া অসংগত নয় যে, মহাকাশ পটভূমিতে ঋগ্বেদের ইন্দ্র কল্পনার সঙ্গে মহাভারতের ইন্দ্র কল্পনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র সূর্য, বহু স্থানে সে কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি প্রতিদিনের সূর্য নন। তিনি বর্ষণের দেবতা। তাঁর জন্মের সময়ে মেঘগর্জনের উল্লেখ ঋগ্বেদে লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সুস্পষ্ট পরিচয়জ্ঞাপক আরও অনেক শ্লোক আছে। সে সব শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করলে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইন্দ্র সূর্য, বর্ষণের বা বর্ষার দেবতা। দক্ষিণায়নের প্রারম্ভে যে সূর্যের উদয় হয়, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে ইন্দ্র সেই সূর্যেরই প্রতীক।

ইন্দ্রের নাক্ষত্রিক ব্যাখ্যা কিন্তু কিছুটা আগেই দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ অনুসারে ইন্দ্র হলেন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের জ্যেষ্ঠা নামের তারা। এটি একটি যুগ্ম তারা (Binary Star)। এর একটি তারা সবুজাভ। অন্যটি রক্তাভ এবং বৃশ্চিক রাশির উজ্জ্বলতম তারা এটি। ইন্দ্র বা জ্যেষ্ঠা তারা প্রথম প্রভার তারা এবং এর সাথীটি প্রায় সপ্তম প্রভার। খালি চোখে সাথীটিকে দেখা যায় না। চাঁদ যখন প্রথম প্রভার লাল রংয়ের যুগ্মতারা জ্যেষ্ঠাকে আড়াল করে তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্যেষ্ঠার এই সবুজাভ সাথীটিকে চোখে দেখা যায়, নয়ত ইন্দ্রের দ্যুতিতে এই তারাটির আলো আচ্ছন্ন থাকে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন ইন্দ্র বা জ্যেষ্ঠাতারা (Antares)-র পরিধি আকাশের মহাকায় তারা রুদ্র বা আর্দ্রা (Betelgeuse)-র প্রায় দেড় গুণ। সুতরাং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তারার নাম জ্যেষ্ঠা দিয়ে অথবা তার নাম দেবজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র দিয়ে ঋগ্বেদ সংহিতার ঋষিরা অসাধারণ সুপ্রাচীন মনীষার পরিচয় রেখেছেন।

'ইন্দ্র জ্যেষ্ঠের ন্যায় স্বয়ম্ভর ওজস্বিতার পরিপূর্ণ শ্রবণ যেমন স্বর্গের চিত্র বজ্রহস্ত পৃথিবীও তেমন সুশিপ্র করেন প্রাবৃটে' '(6ষ্ঠ ম ঃ 46 সূ ঃ 5ম ঋক্)'। ইন্দ্র এখানেও মেঘের দেবতা কিংবা বর্ষার দেবতা হিসাবেই চিহ্নিত, কারণ পৃথিবীকে তিনি সুশিপ্র করছেন প্রাবৃটে বা বর্ষাকালে। মহাভারতের ইন্দ্র হলেন সোমরক্ষক। সোমই অমৃত। চন্দ্রই অমৃত। তাছাড়া একমাত্র চন্দ্রেরই হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কল্পনামিশ্রিত দৃষ্টিতে চন্দ্রের হ্রাসকে দেবতাদের অমৃত পান হিসাবে মনে করলেন। চন্দ্রের হ্রাস চিরস্থায়ী নয়। সেই হ্রাস পূরণ করেন সূর্য। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে একথা সম্পূর্ণ সত্য। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারতে অমৃত বা সোমের রক্ষক ছিলেন ইন্দ্র। সাধারণতঃ শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যার আকাশে লক্ষ্য করলে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ছায়াপথ দেখা যায়। এই ছায়াপথের অন্য নাম সোমধারা। এই সোমধারাই মহাসমুদ্র, যে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উত্থিত হয়। সোমধারার মধ্যাঞ্চলের পূর্বদিকে সোমধারা সংলগ্ন একটি তারকামণ্ডল আছে। এর নাম Aquila, বাংলায় ঈগলমণ্ডল। এই ঈগলমণ্ডলই মহাভারতের গরুড় কিংবা ঋগ্বেদের শ্যেন পক্ষী। ভালো করে দেখলে মনে হবে ঈগল বা গরুড়ের ঠোঁট যেন সমুদ্র স্পর্শ করেছে। ঈগল মণ্ডলের কিছুটা দক্ষিণে আছে ধনুরাশি মণ্ডল। ধনুরাশিতে আছে ধনুর্ধরের রূপ কল্পনা, তার হাতে ধনুক ও তীর। সুতরাং ছায়াপথ, ধনুরাশির ধনুর্ধর এবং ঈগল পক্ষীকে দেখে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মহাভারতের ইন্দ্রের সঙ্গে ধনুর্ধরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ঋগ্বেদের কৃশানু এই ধনুরাশির ধনুর্ধরের রূপক মাত্র। অমৃত হরণের এই কাহিনীটি যে মহাকাশ অবলম্বনেই রচিত, কাহিনীটির মধ্যে তার আরও পরিচয় আছে। অমৃত হরণের সময় গরুড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে মহাভারতে গন্ধর্ব, রুদ্র, আদিত্য এবং অশ্বিনীযুগলের বিভিন্ন দিকে পশ্চাদপসরণের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই মহাকাশসংশ্লিষ্ট। তবে অশ্বিনীকুমারযুগল মহাকাশে 2টি তারকা। 2টি তারকাই রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষের অন্তর্ভুক্ত। চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত 27টি নক্ষত্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনীও এই 2টি তারকা নিয়েই গঠিত। এরা পাশ্চাত্য Aries মণ্ডলের খ এবং গ তারকা। অমৃত তথা সোম হরণের বিচিত্র এই উপাখ্যান পৌরাণিক ঋষিদের উদার কল্পনায় পল্লবিত। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে, কাহিনীর মূল উপাদান মহাকাশ অবলম্বনেই সংগৃহীত হয়েছে। পৌরাণিক এইসব কাহিনীর মূল ভিত্তি কিন্তু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান এবং কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এইসব বিস্ময়কর উপাখ্যান।

15. জয়দ্রথের শেষ দিন ঃ

আগেই বলেছি, ঋগ্বেদে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের বর্ণনা রয়েছে। সম্ভবত এটিই বিশ্বসাহিত্যে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখ। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ঋষিরা হলেন অত্রি এবং তাঁর বংশধরগণ।

এই মণ্ডলের 40তম সূক্তের মোট ঋক সংখ্যা নয়টি। এই নয়টি ঋকের প্রথম চারটি ঋকের দেবতা ইন্দ্র, পঞ্চমটির দেবতা সূর্য এবং অবশিষ্ট 4টি ঋকের দেবতা অত্রি স্বয়ং। সূক্তটির ঋষি অত্রি। এর ছন্দ উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্। 40 তম সূক্তটির পঞ্চম থেকে নবম ঋক বলছে ঃ

"হে সূর্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল, নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেরূপ লক্ষিত হয়েছিল। হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সে সকল মায়া-অন্ধকার দূরে অপসারিত করেছিলে, তখন অত্রি চারটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক, অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করলেন। সূর্য বলছেন, হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশত ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ, তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর। তখন সে ঋত্বিক অত্রি সূর্যকে উপদেশ দিয়ে প্রস্তর খণ্ডের ঘর্ষণ করে এবং স্তোত্র দ্বারা দেবগণকে পূজা করে, মন্ত্র প্রভাবে অন্তরিক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করলেন; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করলেন। আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে আবৃত করলে, অত্রি পুত্রগণ অবশেষে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হয় নি।" [ঋগ্বেদ ঃ 5 মণ্ডল ঃ 40 সূক্ত ঃ 5-9 ঋক]

ঋগ্বেদ বলছে, স্বর্ভানুর 'মায়া-অন্ধকার' সূর্যকে আচ্ছন্ন করে। সে অন্ধকার বিদূরিত হয় অত্রির স্তোত্রে। 'আসুরঃ স্বর্ভানুঃ' শব্দের অর্থ হল 'বলবান স্বর্গীয় দীপ্তি'। ঋগ্বেদ সংহিতায় 'রাহু' শব্দটি নেই। তবে এর এই স্বর্ভানুই পৌরাণিককালে এসে রাহু হয়েছে। রাহুর অন্য নাম তাই স্বর্ভানু। অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সূর্যকে চারটি ঋকের দ্বারা অত্রি প্রকাশিত করেন। এই অন্ধকারও চারটি ধাপে বিদূরিত হয় বলে অত্রি বলেছেন। অন্ধকারের প্রথম অংশ বিদূরিত হলে সূর্যকে লালচে রংয়ের মেষের মত দেখায়। এরপর অন্ধকারের দ্বিতীয় অংশ দূর হলে সূর্যকে লাগে রূপোলি ভেড়া। এবার অন্ধকারের তৃতীয় অংশ বিদূরিত হলে সূর্যকে লাগে লোহিতবর্ণ মেষ। আর সবশেষে অন্ধকারের চতুর্থ স্তর বিদূরিত হলে সূর্য পুরোপুরি স্বর্ভানুর কবল-মুক্ত হয়। তখন সূর্যকে লাগে উজ্জ্বল শুভ্র মেষ। সূর্যগ্রহণের বিভিন্ন ধাপের কথাই যেন এখানে বলা হয়েছে।

অত্রি সূর্যকে ললচে দেখেছেন, যখন সূর্যের উজ্জ্বল আলোকমণ্ডল [Photoshere] সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। সূর্যের চারিদকে ফুটে উঠেছে একটা গোলাপি আভা। এটাই হল সূর্যের আবহমণ্ডলের অন্তর্বর্তী বর্ণমণ্ডল [Chromosphere]। এই দৃশ্য খুবই দুর্লভ এবং এটা দেখা যায় কেবল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়। 'ছটামণ্ডল' যখন ভেসে উঠে আকাশের গায়, তখন সূর্যের বাইরের আবহমণ্ডলে যে পাতলা গ্যাসের আস্তরণ আছে, তার আলোকময় অবয়বটি আমরা দেখতে পাই। এটি রূপোলি উজ্জ্বলতায় মোড়া। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় একটা সময় লাল আগুনের লেলিহান শিখা সূর্যের প্রান্তভাগে উঁকি মারতে থাকে। সৌরদেহের হাইড্রোজেন গ্যাসের ক্রমাগত আলোড়নেই এই জ্বলন্ত রক্তিম শিখা দেখা যায়। এর নাম সৌরশিখা। [Solar Prominences]। এগুলিই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সবচেয়ে দুর্লভ এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য। চতুর্থ অবস্থায় সূর্য পুরোপুরি রাহু মুক্ত হয়ে যায়। ঋষি অত্রি ওই স্বর্ভানুর মায়া-অন্ধকার ধাপে ধাপে দূর করেছেন এবং সূর্যকে করেছেন স্বর্ভানুমুক্ত। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের যে চারটি

ধাপের কথা একালের বিজ্ঞানীরা বলেন গ্রহণকে ব্যাখ্যা করতে, ঋষি প্রায় সেই ধাপগুলিরই কথা বলেছেন ঋগ্বেদের 5ম মণ্ডলের 40 তম সূক্তের পঞ্চম থেকে নবম ঋক অবধি।

মহাভারতে জয়দ্রথ বধ করতে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সাহায্য নিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হলে শোকার্ত অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন জয়দ্রথ বধের। কারণ জয়দ্রথই চক্রব্যূহের দ্বার আটকে রেখে যুধিষ্ঠির-ভীমদের সেখানে প্রবেশ করতে দেয় নি। ফলে, চক্রব্যূহ-ভেদকারী অভিমন্যু চক্রব্যূহের মধ্যে একাই প্রবল যুদ্ধ করেন ছয় রথীর সঙ্গে। এঁরা হলেন—দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্‌বল ও কৃতবর্মা। এই অসম যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হন। পুত্র শোকাতুর অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জয়দ্রথ যদি ভয় পেয়ে দুর্যোধনাদিকে ত্যাগ না ক'রে পালায় তবে কালই তাকে বধ করব। যদি কাল তাকে নিহত করতে না পারি তবে যে নরকে মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা যায়—সেই নরকে আমি যাব।...আরও প্রতিজ্ঞা করছি শুনুন—পাপী জয়দ্রথ জীবিত থাকতে যদি কাল সূর্যাস্ত হয় তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব।....."

পরের দিন অর্থাৎ চতুদর্শ দিনের যুদ্ধে সারা দিন অর্জুন প্রবল যুদ্ধ করেও জয়দ্রথের কাছাকাছি যেতে পারলেন না। দ্রোণ ব্যূহ বানিয়ে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখলেন। অর্জুন না পারলেন ব্যূহ ভেদ করতে, না পারলেন দ্রোণকে হারিয়ে লুকানো জায়গা থেকে জয়দ্রথকে বের করে আনতে। দিন শেষ হতে তখনও কিছুটা বাকী, কৃষ্ণ বললেন, "ভীত জয়দ্রথকে ছ'জন মহারথ রক্ষা করছেন, এঁদের জয় না করে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথ আর আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার ক'রো।"

"যোগীশ্বর হরি যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে, এখন অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করবেন—এই ভেবে কৌরবযোদ্ধারা হৃষ্ট হলেন। জয়দ্রথ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন, জয়দ্রথ ভয়মুক্ত হ'য়ে সূর্য দেখছেন, দুরাত্মাকে বধ করার এই সময়' কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন 'মন্ত্রসিদ্ধ বজ্রতুল্য বাণ' নিক্ষেপ করে জয়দ্রথেরর মাথা কেটে ফেললেন। আরও কতকগুলি বাণ দিয়ে অর্জুন সেই মাথা আকাশপথে নিয়ে গিয়ে ফেললেন জয়দ্রথের পিতা রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে। বৃদ্ধক্ষত্র তখন সন্ধ্যার উপাসনায় বসেছিলেন। তাঁর কোলে জয়দ্রথের কাটা মাথা পড়ায় তিনি ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কাটা মুণ্ডটি মাটিতে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধক্ষত্রের মাথাও শতধা বিদীর্ণ হল। পুত্রবৎসল বৃদ্ধক্ষত্রই একদিন অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'যে আমার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে'। তাঁর নিজের অভিশাপই ফলবতী হয়ে তাঁর নিজের মাথাটা শতধা বিদীর্ণ করল, পুত্রের কাটা মাথা মাটিতে ফেলার অপরাধে। যাইহোক, এরপর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করলেন। সূর্য পুনঃ প্রকাশিত হল। কৌরবেরা বুঝলেন, এ সব হল কৃষ্ণের মায়া। প্রকৃতপক্ষে, ওই সময়টায় ঘটেছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। এমনও হতে পারে, কোনও বিশেষ উপায়ে কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তর থেকে সূর্যকে আড়াল করে দেওয়া হয়েছিল সাময়িকভাবে। তবে, এই ঘটনাটা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের কথাই মনে করায়। জয়দ্রথ বধের প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয়েছিল সূর্যগ্রহণকে। কিন্তু পূর্ণগ্রাসের আগে অনেকক্ষণ আংশিক গ্রাস হওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে কৌরবপক্ষদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথকে ব্যূহমুক্ত করার ব্যাপারটা ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। তাই মনে হয় হঠাৎই অন্ধকার সৃষ্টি করা হয়েছিল কোনওভাবে এবং সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে দেওয়া

হয়েছিল কোনও কৃত্রিম উপায়ে। যেভাবেই হোক না কেন, কুরুক্ষেত্রে সেদিন ঘটেছিল সূর্যের পূর্ণগ্রহণ।

16. রাহুকেতুর উপাখ্যান ঃ

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। তার 5ম মণ্ডলের 40তম সূক্তের 5ম-9ম ঋক পাঁচটি যে সূর্যগ্রহণের কথা বলছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এটিই সম্ভবত সূর্যগ্রহণে প্রাচীনতম বর্ণনা। তার পঞ্চম ঋকটির দেবতা সূর্য এবং শেষ চারটি ঋকের দেবতা অত্রি নিজেই। পুরো সূক্তটির রচয়িতা ঋষি অত্রি। এই পাঁচটি ঋকের বাংলা অনুবাদ হল একটু আগেই বলা হয়েছে।

'আসুরঃ স্বর্ভানুঃ' শব্দের অর্থ হল 'বলবান স্বর্গীয় দীপ্তি'। স্বর্ভানু তার মায়া অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে সূর্যকে। সে অন্ধকার অপসারিত করেছিলেন ইন্দ্র। আর চারিটি ঋকের সাহায্যে ঋষি অত্রি সূর্যকে পুনরায় প্রকাশিত করেছিলেন। এই 'স্বর্ভানু' পৌরাণিককালে এসে রাহু ও কেতু হয়েছেন। ঋগ্বেদের কালেও ঋষিরা জানতেন রাহু বা কেতু কিংবা স্বর্ভানুতে চন্দ্র অবস্থান করলে সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। অত্রি কিংবা তাঁর পুত্রগণ অন্ধাকারাবৃত সূর্যকে মুক্ত করুন বা না করুন, প্রাকৃতিক নিয়মেই সূর্য মুক্ত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, রাহু কিংবা কেতুতে অবস্থিত অথবা এই দুই বিন্দুর কাছাকাছি অবস্থিত চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর কোন কোনও অংশের ওপর দিয়ে যায়। পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের প্রচ্ছায়া পড়ে সে অংশের লোকদের কাছে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, কারণ চাঁদ সেখানে সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় কিছু সময়ের জন্য। সেই অংশের লোকেরা দেখে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কিংবা অবস্থা বিশেষে বলয় গ্রহণ। আর পৃথিবীর যে অংশে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে সেই অংশের লোকেরা দেখে সূর্যের আংশিক গ্রহণ। গ্রহণ হতে হলে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীকে এক সরলরেখায় আসতে হবে। আর এই সময় চন্দ্র রাহু বা কেতু বিন্দুতে কিংবা ওই দুটি বিন্দুর যে কোনওটির কাছাকাছি অবস্থান করবে। সুতরাং সূর্য কিংবা চন্দ্রের গ্রহণে রাহু ও কেতুর তথা ঋগ্বেদীয় স্বর্ভানুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার কক্ষপথ একটি বিশেষ তলে অবস্থিত। এই তল পৃথিবীর কক্ষতল। আবার চাঁদ যে কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে তার তলকে বলা হয় চন্দ্রের কক্ষতল। এই দুই কক্ষতল একই সমতলে নেই। পৃথিবী এবং চন্দ্রের কক্ষপথ যদি একই সমতলে অবস্থান করতো তা হলে প্রতি অমবস্যায় সূর্যগ্রহণ এবং প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হ'ত। কিন্তু এই দুই কক্ষতল পরস্পরের সঙ্গে 5^0 $9'$ কোণ করে রয়েছে। উভয় কক্ষতলের নতি [Inclination] $4^0 58'$ থেকে $5^0 19'$ পর্যন্ত হয়। অর্থাৎ গড় নতি হয় $5^0 9'$। এই কারণে প্রতি অমাবস্যায় কিংবা প্রতি পূর্ণিমায় সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী একই সমতলে তথা একই সরলরেখায় আসতে পারে না। ফলে, প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ এবং প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

পৃথিবীর কক্ষতলকে আকাশ-গোলকে প্রসারিত করলে মহাকাশে যে বৃত্ত রচিত হয়, তার নাম 'ক্রান্তি বৃত্ত' [Ecliptic]। চন্দ্রের কক্ষপথ এই ক্রান্তিবৃত্তকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। এই ছেদ বিন্দু দুটির নাম 'আরোহীপাত' বা 'উচ্চপাত' [Ascending Node] এং 'অবরোহীপাত' বা 'নিম্নপাত' [Descending Node]। ছেদ বিন্দু দুটিকে সাধারণভাবে বলা হয় পাত বা পাতবিন্দু [Nodes]। যে বিন্দুর মধ্য দিয়ে চন্দ্র দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমন করে তা আরোহীপাত। আবার যে বিন্দুর মধ্য দিয়ে চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যায়, তাকে বলা হয় অবরোহীপাত বা নিম্নপাত। পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায়া পড়লেই সূর্যগ্রহণ হয়। আর এর জন্য দরকার সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের একই তলে

সরলরেখায় থাকা। একটি মাসে চন্দ্র দু'বার পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্ত বা কক্ষতল অতিক্রম করে। ওই দুটি দিনে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই তলে বা সমতলে আসে। কিন্তু ওই দু'দিন সব সময় এরা সমসূত্রে বা সরলরেখায় আসে না। এরা একই সমতলে থাকাকালীন অমাবস্যা হলে সূর্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমা হলে চন্দ্রগ্রহণ হয় কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনও অমাবস্যার দিনে উচ্চপাত বা নিম্নপাতের 18.5 ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বের মধ্যে কিংবা খুব সঠিকভাবে বললে $18^0 31'$ কৌণিক দূরত্বের মধ্যে চন্দ্র থাকলে সূর্যগ্রহণ হওয়া সম্ভপর। ওই দুই পাতবিন্দুর $18^0 31'$ কৌণিক দূরত্বের বাইরে চন্দ্র থাকলে সূর্যগ্রহণ হবে না। কিন্তু পাতবিন্দুর যে কোনও একটি থেকে $15^0 29'$ কৌণিক দূরত্বের মধ্যে কোন অমাবস্যায় চন্দ্র অবস্থান করলে সূর্যগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। যে অমাবস্যায় উচ্চপাত কিংবা নিম্নপাতের মোটামুটি 15.5 ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বের মধ্যে চন্দ্র আসবে সেই অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হবেই।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমা, পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা এবং সূর্যের মহাকাশ পরিভ্রমণের কথা জানতেন। গ্রহণ সম্পর্কে প্রায় সব আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্য তাঁদের জানা হয়ে গিয়েছিল। এই সব প্রাচীনভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একালে 'ঋষি' হিসাবে পরিচিত। আমাদের ঋষি প্রপিতামহেরা উচ্চপাতের নাম দিয়েছিলেন 'রাহু' এবং নিম্নপাতের নাম 'কেতু'। তাঁরা জানতেন সম্পাতবিন্দুদ্বয়ে বা রাহু-কেতুতে চন্দ্র এলে তবেই গ্রহণ হয়। এই জন্য তাঁরা রাহু-কেতুকে বলতেন 'ছায়াগ্রহ'। যে গ্রহণ করে বা করায় সেই গ্রহ। রাহু এবং কেতু গ্রহণ সংঘটনকারী। অতএব রাহু এবং কেতু উভয়েই 'গ্রহ'। যে অর্থে ইংরেজি 'Planet' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, 'গ্রহ' শব্দটি মোটেই সে অর্থে ব্যবহার করা হয় না। একালে অবশ্য আমরা Planet-কে 'গ্রহ' বলি। প্রাচীন ঋষিরা গ্রহণ সংঘটনকারীকেই 'গ্রহ' নামে অভিহিত করেছেন। তাই তাঁরা গ্রহণ সংঘটনকারী সম্পাতবিন্দু দুটিকে অর্থাৎ রাহু-কেতুকেও গ্রহ বলেছেন। চন্দ্র এবং সূর্যও যেহেতু গ্রহণ সংঘটনকারী, অতএব তারা ঋষি পিতামহদের কাছে গ্রহ হিসাবেই পরিচিত। এইভাবে ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের সৌরমণ্ডলে নয়টি গ্রহের কথা বলেছে। এদের মধ্যে পাঁচটি অর্থাৎ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি হল Planet, সূর্য একটি ছোটমাপের Star বা নক্ষত্র, চন্দ্র হল Satellite বা উপগ্রহ, আর রাহু-কেতু হলো Nodes বা সম্পাতদ্বয়। কিন্তু ঋষিদের চোখে এরা সবাই গ্রহ। কারণ তাঁদের গ্রহ আর ইংরেজির Planet শব্দটি একই অর্থবহ নয়। পরবর্তীকালে তাঁরা ইউরেনাসের নাম দিয়েছিলেন প্রজাপতি বা ইন্দ্র, নেপচুনের নাম বরুণ এবং প্লুটোর নাম রুদ্র।

সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে রাহু বা কেতুতে অবস্থিত কিংবা এদের কাছাকাছি অবস্থিত চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর কোন কোন অংশের উপর দিয়ে যায়। চন্দ্রের ছায়া দু'রকম—প্রচ্চায়া [Umbra] এবং উপচ্ছায়া [Penumbra]। পৃথিবীর যে অংশে প্রচ্ছায়া পড়ে সে অংশের লোকদের কাছে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, কারণ চাঁদ সেখানে সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় কিছু সময়ের জন্য। পৃথিবীর সেই অংশের লোকেরা দেখে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। বিশেষ অবস্থায় ওই প্রচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন পৃথিবীর লোকেরা সূর্যের বলয় গ্রহণ দেখতে পায়। আর পৃথিববীর যে অংশে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে সেই অংশের লোকেরা দেখে সূর্যের আংশিক গ্রহণ।

আবার রাহু বা কেতুতে উপস্থিতির সময় যদি চন্দ্রের পূর্ণিমা হয় তবে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। রাহু বা কেতুতে না এলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করতে পার না,

তাই বৎসরের সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। পৃথিবীর ছায়াও দু'রকমের হয় —প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। পৃথিবীর উপচ্ছায়াতে চন্দ্র থাকলে কোন গ্রহণ হয় না। চাঁদকে একটু ম্লান দেখায়। তার জ্যোতি কিছুটা কমে যায়। কিন্তু পৃথিবীর প্রচ্ছায়াতে কোনও আলো না থাকায় চন্দ্রের যতটা অংশ প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করে ততটাই অদৃশ্য হয়। চন্দ্র পুরোপুরি প্রচ্ছায়াতে প্রবেশ করলে তখন তাকে আর দেখা যায় না। সে অবস্থায় চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস হয়। আর চন্দ্র আংশিকভাবে প্রচ্ছায়া এবং আংশিকভাবে উপচ্ছায়ায় অবস্থান করলে তার আংশিক গ্রহণ হয়। কারণ উপচ্ছায়ায় চন্দ্রের যেটুকু অংশ থাকে তা দৃশ্যমান হয়, যদিও সে অংশটা বেশ খানিকটা ম্লান দেখায়। তার জ্যোতি কিছুটা কমে যায়। ইতিহাসে রাহু কেতু নামকরণ প্রথম করেছিল প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এই নামকরণ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রাথমিককালে [700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ] কিংবা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের শেষের সময়ে হয়ে থাকতে পারে। পৌরাণিক রাহু-কেতুর গল্প প্রায় সকলেরই কম-বেশি জানা। ঋগ্বেদে কোথাও রাহু-কেতু নেই। স্বর্ভানুই বৈদিককাল থেকে পৌরাণিক কালে এসে রাহু-কেতু হয়ে গেছেন।

পৌরাণিককালে রাহু-কেতু সম্পাতদ্বয় কল্পিত হয়েছে এক দানব হিসাবে। সে বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র। তাকে বলা হত রাহু-দানব। দৈত্য এবং দানবের সংযোগে উৎপন্ন বলে সে প্রবল বলবান। সমুদ্র-মন্থনে উঠেছিল অমৃত। সে অমৃত যে পান করবে সে হবে অমর। অমৃত পান নিয়ে অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে শুরু হল প্রবল বিবাদ। সেই সময় বিষ্ণু এক মোহময়ী নারীর রূপ ধারণ করে, মোহিনী মূর্তিতে দেখা দিলেন বিবাদমান অসুর এবং দেবতাদের সামনে। মোহমুগ্ধ অসুরেরা এবং দেবতারাও সেই মোহিনীকে দিলেন অমৃত বণ্টনের ভার। এক সারিতে বসলেন দেবতারা, অন্য সারিতে অসুরেরা। রাহু ভাবল সে দু'বার অমৃত পান করবে। তাই মোহিনী যখন প্রথমে দেবতাদের সারিতে অমৃত পরিবেশন করতে শুরু করল, তখন রাহু ছদ্মবেশ ধারণ করে বসে গেল দেবতাদের পংক্তিতে। বসল চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতার মাঝখানে। তার ইচ্ছা ছিল দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করার পর সে আবার অসুরদের সঙ্গেও অমৃত পান করবে। চন্দ্র ও সূর্য ধরে ফলল রাহুর সে ছদ্মবেশ। তারা দুজনেই এ ব্যাপারে মোহিনী তথা বিষ্ণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জানাল এক দানব ছদ্মবেশে বসে গেছে দেবতাদের পংক্তিতে। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিলেন রাহুর শিরচ্ছেদ করতে। সুদর্শন রাহুকে দ্বিখণ্ডিত করল। একটা অংশ হল তার ছিন্নমুণ্ড, আর তার অন্য অংশটা হল দেহ বা ধড়। অমৃত পানের ফলে তার ছিন্নমুণ্ড এবং ধড় দুটোই অমরত্ব লাভ করল। ছিন্নমুণ্ডটার নাম হল রাহু, ধড়ের নাম হল কেতু। এক রাহুদানবই দুই হয়ে গেল। হয়ে গেল রাহু এবং কেতু। অমর রাহু এবং কেতু চিরশত্রু হল চন্দ্র-সূর্যের, যেহেতু তারাই ছদ্মবেশী রাহুকে চিহ্নিত করেছিল। রাহু-কেতুর সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যের চিরশত্রুতার ফলেই সুযোগ পেলে তারা চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। চন্দ্র রাহু ও কেতু নামের সম্পাতদ্বয়ের কাছাকাছি এলেই গ্রহণ হয়—এই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই এই পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে।

পৌরাণিক কাহিনী আরও বলে যে, আগে রাহু সর্বদাই চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হত। বেশি সংখ্যায় গ্রাস করার ফলে খুবই অসুবিধা দেখা গেল জীবনযাত্রায়। ব্রহ্মা তাই বিধান দিলেন যে, রাহু অমাবস্যা-বিশেষে সূর্যকে এবং পূর্ণিমা-বিশেষে চন্দ্রকে একবার করে গ্রাস করলেও তার কাটা গলা দিয়ে আবার বেরিয়ে আসতে পারে চন্দ্র কিংবা সূর্য। সুতরাং গ্রাস বা গ্রহণ ব্যাপারটা সাময়িক। বিশেষ অমাবস্যায় ঘটে সূর্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমা বিশেষে ঘটে চন্দ্রগ্রহণ। দুটি সম্পাত বিন্দুমাত্র হলেও রাহু-কেতুকে গ্রহ দেবতার মর্যাদা দিয়ে তার বা তাদের পূজাপার্বণের ব্যবস্থাও করেছে প্রাচীন ভারতীয়

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাদের রূপ কল্পনাও করা হয়েছে। রাহুকে বলা হয়েছে তিনি কর্ণনাসাক্ষিযুক্ত বিকট বদন, মহাউগ্র, শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণমহিষারূঢ়, রবি-শশি দমনকারী। তার দেবতা ছিন্নমস্তা, অধিদেবতা যম এবং প্রত্যধিদেবতা সর্প। তার বাহন হল আটটি কালো ঘোড়ার রথ। ভয়ংকর দর্শন রাহুর নানা নাম, যেমন ঃ সৈংহিকেয়, তম, স্বর্ভানু, কবন্ধ, শীর্ষক, পরাগ ইত্যাদি। রাহুকে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যে নানা কাহিনী রয়েছে। সে কাহিনীগুলি বলছে, তার উৎপত্তি এবং রবি-শশি গ্রাস করার কথা। পৌরাণিক গ্রন্থে রাহুর প্রণাম মন্ত্র হল ঃ

"অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়া সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্।।"

অর্ধকায়, মহাঘোর, চন্দ্র-সূর্য বিমর্দনকারী, সিংহিকার পুত্র, রৌদ্র-রাহু তোমাকে প্রণাম করি। ফলিত জ্যোতিষ বলছে, রাহু কৃষ্ণবর্ণ, ক্রূরগ্রহ, দক্ষিণদিকের অধিপতি। রাহু গুপ্তযুক্তি, কষ্ট তথা ত্রুটিকারক। এ ধরনের বহুকথা আছে রাহু সম্পর্কে আমাদের ফলিত জ্যোতিষে।

কেতুর বর্ণনায় বলা হয়েছে, কেতু হস্তপদ সমন্বিত, কিন্তু ছিন্নশির, দ্বিভুজ, বাণ-কৃপাণ-বিশিখ-বেদ ধারণকারী দীপ্তিময়। তার দেবতা ধূমাবতী, অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত এবং প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা স্বয়ং। সে পুচ্ছমান, আটটি লাল রংয়ের ঘোড়ায় টানা রথ তার বাহন। কেতু কৃষ্ণবর্ণ ক্রূরগ্রহ। হাত, পা, চর্মরোগ তথা ক্ষুধাজনিত কষ্টাদির নিয়ামক। কেতু গুপ্তযুক্তি, কঠিন পরিশ্রম, ভয় ও হানিকারক। গ্রহণ সংঘটনকারী বলেই কেতু এবং রাহুকে গ্রহের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আসলে এর সম্পাতদ্বয়—একথা বহুবারই বলা হয়েছে। এদের নিয়ে পুরাণ এবং ফলিত জ্যোতিষ নানা কাহিনী গড়েছে। ফলিত জ্যোতিষ নানাভাবে পৃথিবীর উপর তথা মানবজীবনে এদের প্রভাবের কথা বলেছে। গ্রহ হিসাবে রাহু ও কেতুকে অন্যান্য সাতটি গ্রহদের সমান মর্যাদা দিয়েছে। তবে এদের বলেছে 'ছায়াগ্রহ'। সত্যিই তো, এদের সান্নিধ্যে এলে চন্দ্র কিংবা সূর্য ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়। নবগ্রহস্তোত্রে কেতু গ্রহের প্রণামমন্ত্র হল ঃ

"পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।"

পাললের ধূম-সদৃশ [পলখড়ের ধোঁয়ার মতো], গ্রহ-তারা বিমর্দনকারী, রৌদ্র, রুদ্রাত্মক, ক্রূর, কেতু তোমাকে প্রণাম করি। শ্রী মদ্ভাগবতে রাহুর উপাখ্যান যেভাবে বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই রকম ঃ

"তখন অসুর রাহু দেবতার চিহ্ন দ্বারা নিজের রূপ গোপন করে দেবতাদের পঙ্ক্তিতে চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে প্রবেশ করে অমৃত পান করলে চাঁদ আর সূর্য তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেন। তখন ভগবান শ্রীহরি অমৃতপানকারী রাহুর মাথাটি চক্র দিয়ে কেটে ফেললে তার মুণ্ডহীন দেহটি সুধাসিক্ত না হয়েই ভূতলে পড়েছিল। সেই ছিন্নমুণ্ডটি সুধা পানের জন্য অমরত্ব লাভ করলে ভগবান ব্রহ্মা তাকে গ্রহ করে দেন। সেই রাহু গ্রহ শত্রুতা হেতু এখনও পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় চন্দ্র-সূর্যকে খাবার জন্য তাদের দিকে ধাবিত হয়।" [শ্রীমদ্ভাগবত □ ৪ম স্কন্ধ □ 9ম অধ্যায়]

আগেই বলা হয়েছে যারাই গ্রহণ সংঘটনকারী তারাই 'গ্রহ' নামে অভিহিত। রাহু এবং কেতু আসলে সম্পাতবিন্দু হলেও তারা গ্রহ পদবাচ্য, কারণ তারা গ্রহণ সংঘটনকারী। যেহেতু চন্দ্র রাহু কিংবা কেতুতে না এল গ্রহণ হয় না, তাই রাহু এবং কেতু গ্রহণ সংঘটনকারী এবং এরা গ্রহ। তবে এরা 'ছায়াগ্রহ' নামে খ্যাত। কারণ এরা ছায়া সৃষ্টিকারী। ঋগ্বেদের মায়া-অন্ধকার সৃষ্টিকারী স্বর্ভানু এইভাবে পৌরাণিককালে এসে হয়েছে রাহু ও কেতু নামের ছায়াগ্রহ। রাহু ও কেতুর চিরশত্রুতা সূর্য এবং চন্দ্রের

সঙ্গে। কাশীরাম দাসের মহাভারতেও বলা হয়েছে ঃ

'ইন্দ্র যম বরুণ হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ।।
সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষে সব পান করেন আপনি।।
হেনকালে ডাকিয়া বলেন রবিশশী।
হের দেখ রাহু দৈত্য সুধা খাইল আসি।।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
দুইখানা করিয়া কাটিল ততক্ষণ।।
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু।
মুখ হৈল রাহু, কলেবর হইল কেতু।।"

আগেই বলেছি, রাহুকে পুরাণকাররা বলেছেন, বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র। রাহু এক দানব। বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্রদের বলা হয় সৈংহিকেয়। এরা দৈত্য ও দানব সংযোগে উৎপন্ন বলে প্রবল বলবান হয়। 'ব্রহ্মপুরাণ' তেরোজন সৈংহিকেয়দের নাম উল্লেখ করেছে। এটা হল ঃ বংশ্য, শল্য, নল, বল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জিক, নরক, কালনাভ, সরমান ও সুরকল্প। এই নামগুলিতে রাহুর নাম নেই। যাইহোক, বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাহু ও কেতু ফলিত জ্যোতিষের নবগ্রহের দুটি গ্রহ হিসাবে পরিগণিত। একালের ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য বারোটি গ্রহের কথা বলা হয়। যেমন ঃ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, প্রজাপতি [Uranus], বরুণ [Neptune] ও রুদ্র [Pluto]। এদের মধ্যে রবি একটা নক্ষত্র, চন্দ্র একটা উপগ্রহ, রাহু ও কেতু দুটি সম্পাতবিন্দু। এদের হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহ বলেছে এই কারণে যে, এরা গ্রহণ সংঘটনকারী, তাই এরা গ্রহ। আবার প্লুটোর গ্রহত্ব নিয়েও গোলমাল রয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে রাহু ও কেতুর মধ্যে অবস্থান সর্বদা 180^0 বিপরীতে হলেও এদের অক্ষ আবর্তিত হয়। কোনও বিন্দু থেকে আবর্তন শুরু করে রাহু বা কেতু 18 বছর 10.3 দিন কিংবা 18 বছর 11.3 দিন পরে আবর্তন শেষ করে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে আসে। এই 18 বছরে পাঁচটি অধিবর্ষ [Leap Year] হলে সময়টা হবে 18 বছর 10.3 দিন, অন্যথায় 18 বছরে চারটি অধিবর্ষ হবেই এবং সেক্ষেত্রে এই আবর্তনকাল হবে 18 বছর 11.3 দিন। এই সময়টা ব্যাবিলনীয়দের এক 'সারোস চক্র' [Saros Cycle] এবং প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে এটি একটি 'চান্দ্রকল্প'। ●

নবম পরিচ্ছেদ

মহাকাশ-সময়-সন্ততি

[বিশ্বতত্ত্বে মহাকাশ-সময়-সন্ততি তথা দেশ-কাল-সন্ততির গুরুত্ব অসীম। সন্ততির এই ব্যাপারটা মাত্র শ'খানেক বছরের পুরাতন। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর স্রষ্টা। সময়কে দেশ বা মহাকাশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এসেছে মহাকাশ-সময়-সন্ততি। বিশ্বের ব্যাখ্যায় এই সন্ততির অবদান অতুলনীয়। আপেক্ষিকতাবাদ দিয়েই বিশ্ব ব্যাখ্যাত হচ্ছে। আর সেই আপেক্ষিকতাবাদ ব্যাখ্যা করছে মহাকাশ-সময়-সন্ততি। বহুযুগ ধরে চলে আসা সময় ধারণা গেছে বদলে। সময় এখন নিরপেক্ষ নয়। সময়কে আলাদা করে ভাবাও যায় না। সময় এখন অন্যের উপর নির্ভরশীল এক চতুর্থ মাত্রা (Dimension)। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। ঘটনা না থাকলে সময় বলে কিছু নেই।]

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের 'Space-time-continuum'-এর বাংলা অনুবাদ কিংবা বাংলা প্রতিরূপ দু'রকম করা হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Space-এর অর্থ করা হয় 'দেশ'। আবার Time মানে 'কাল'। এঁদের মতে Space-time-continuum-এর পরিভাষা হল 'দেশ-কাল-সন্ততি'। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁর 'পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা'য় Space-এর বাংলা 'দেশ' বলেছেন ঠিকই, কিন্তু 'Space'-এর যে বিশাল ব্যাপ্তি তা 'দেশ'-এর মধ্যে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। 'Spaceship'-কে আমরা 'মহাকাশযান'-ই বলছি, 'দেশযান' বা 'দেশর জাহাজ' বলছি না। 'দেশের ক্ষেত্র', 'দেশের বক্রতা' ইত্যাদির চেয়ে 'মহাকাশের ক্ষেত্র, 'মহাকাশের বক্রতা' ইত্যাদি অনেক বেশি অর্থবহ। তাই Space-কে 'মহাকাশ' বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। Time-কে কাল বা সময় যে কোনও একটা বলা যেতে পারে। সুতরাং Space-time-continuum-এর বাংলা 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি' হওয়াটাই অনেক বেশি অর্থবহ এবং যুক্তিযুক্ত। তাই 'দেশ-কাল-সন্ততি' ব্যবহার না করে আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি'-ই ব্যবহার করেছি।

'দেশ' বা 'মহাকাশ' কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিশিষ্ট যেগুলির মধ্যে আছে আকার, আকৃতি, অবস্থান, দূরত্ব এবং দিক নির্দেশ। এগুলি মহাকাশের ধরন বা চলতি রীতি, যেমন নাকি আলোর বিভিন্ন ধরন হল নীল, লাল, সবুজ ইত্যাদি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের প্রায় অর্ধেক, যেমন, দেকার্ত, নিউটন, স্যামুয়েল অলেকজাণ্ডার প্রমুখেরা মনে করতেন মহাকাশ ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাস্তবতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু মহাকাশ নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব কিনা তা নিয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছিল। কান্ট [Kant], বার্গসন [Bergson], কিছু বিজ্ঞানী ও অন্যান্যরা বললেন যে, মহাকাশ বাস্তব নয়। আমাদের অনুভূতি এবং কল্পনায় তার অস্তিত্ব। মহাকাশের বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই এই নিয়ে প্রায় সব সময় মানুষকে দু'ভাগে ভাগ হতে দেখা গেছে। মহাকাশ চরম কিংবা কারো উপর নির্ভরশীল এ নিয়েও বিতর্ক কম হয় নি। প্লেটো [Plato], নিউটন থেকে বার্ট্রেন্ড রাসেল [Bertrand Russell] অবধি মনে করতেন, মহাকাশ একটি অনন্য পরিকাঠামো যাতে ঘটনা ঘটছে, বস্তুরা আশ্রয়

নিয়েছে। আবার অ্যারিস্টটল, লাইব্‌নিজ, আর্নেস্ট মাখ এবং উনবিংশ শতাব্দীর এমন কি বিংশ শতাব্দীরও বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, মহাকাশ বস্তু নিরপেক্ষ নয়—দূরত্ব ও দিকনির্দেশগুলির সংগে মহাকাশ সম্পর্কযুক্ত।

এছাড়াও আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক ছিল। প্রশ্নটা হল, 'শূন্য মহাকাশ' বা 'শূন্য দেশ' [Empty Space] বলে কিছু আছে কিনা। পরামাণুবিদরা, নিউটনপন্থীরা বললেন, শূন্য মহাকাশের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু অ্যারিস্টটল, দেকার্তে এবং আইনস্টাইনের অনুগামীরা বললেন 'শূন্য মহাকাশ' একটি অযৌক্তিক কল্পনা। কোনও কিছুর পরিবর্ধন সত্যি সত্যিই কোনও কিছুর পরিবর্ধন ছাড়া হতে পারে না। মহাকাশ নিয়ে আরেকটা পুরাতন প্রশ্ন হল, মহাকাশ কি অসীম কিংবা সীমাহীন; কিংবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ? মহাকাশ কি কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টি? বিচ্ছিন্ন মহাকাশকে জ্যামিতির সূত্রে প্রয়োগের সমস্যা যেমন আছে, তেমনি অবিচ্ছিন্ন মহাকাশকে পাটীগণিতীয় সূত্রে মিলিয়ে নেওয়ায় সমস্যা রয়েছে। ফলে, মহাকাশের স্বরূপ কী তা নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হতে থাকে। এরপর জানা গেল, মহাকাশ ইউক্লিডীয় [Euclidean] জ্যামিতি অনুসরণ করে না। মহাকাশের জ্যামিতি হল রীমানীয় জ্যামিতি [Riemannian Geometry]। এই নতুন জ্যামিতি এমন ধরনের যে, এর ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণের চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে। মহাকাশে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়ম চলে না, চলে এই নতুন রীমানীয় জ্যামিতি। মহাকাশ, এই জ্যামিতি অনুসারে, উপবৃত্তাকার। মহাকাশের বক্রতা সর্বত্র সমান নয়—কোথাও বেশি কোথাও কম। মহাকাশের বক্রতা সময়ের উপরও নির্ভর করে। বস্তু মহাকাশকে মুচড়িয়ে দেয়। আবার এইসব প্রশ্নের বিপ্রতীপ প্রশ্নও করা হয়। যেমন, বস্তু কি মহাকাশের বিকৃতি?

আইনস্টাইনই প্রথম বললেন যে, বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। বস্তু না থাকলে মহাকাশ বলে কিছু নেই। মহাকাশের ভৌত অস্তিত্ব হল একটি ক্ষেত্র যার সংগঠনে চারটি অংশ—তিনটি হল মহাকাশের তিনটি সাধারণ মাত্রা—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এবং এর চতুর্থ মাত্রাটি হল 'সময়'। এই চারটি উপাদানের ভিতর যে নির্ভরতার সম্বন্ধ, সেটিই মহাকাশের যথার্থ বাস্তব স্বরূপকে প্রকাশিত করছে। আইনস্টাইনের এই মহাকাশ ধারণা অনেকটা নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী লাইব্‌নিজের ধারণার অনুগামী। আইনস্টাইন মহাকাশ ও সময়কে কীভাবে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহাকাশ-সময়-সন্ততিতে এলেন সে কথায় আসতে হলে সময় ধারণার বিবর্তন নিয়েও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। সেই বিবর্তনের কথায় আসি।

গ্রীক দার্শনিকরা সময়ের চক্রাকারে আবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। যার থেকে 'মহাবর্ষ' (Great Year)-এর কল্পনা। প্লেটো (Plato) মনে করতেন, মহাবর্ষ হলো সেই পরিমাণ কাল বা সময়, যে সময়ের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ ইত্যাদি তাদের পূর্বের কোনো সময়ের আপেক্ষিক অবস্থানে ফিরে আসে। অর্থাৎ কোনো একটি সময়ে আকাশে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির পারস্পরিক অবস্থান যেমন ছিল, ঠিক সেই রকম অবস্থানে তাদের ফিরে আসতে যে সময় লাগে প্লেটো তাকে বলতেন মহাবর্ষ। আর হেরাক্লিটাস (Heraclitus) মনে করতেন মহাবর্ষ হল পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ধ্বংস এবং পুনরায় সৃষ্টি হওয়া অবধি মোট সময়। অপর গ্রীক দার্শনিক জেনোর মতাবলম্বীরা, যাদের আমরা 'স্টোইক' (Stoic) বলি, ওই দুই মতবাদকে মিলিয়ে নিয়ে বলতেন যে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে যে অবস্থানে ছিল সেই অবস্থানে আবার ফিরে আসবে, বিশ্ব আবার নতুন করে বিকশিত হবে, সমস্ত সময়-চক্র পুনরাবৃত্ত হবে। এইসব দার্শনিকরা বৈদিক ঋষিদের মতো জানতেন না যে সূর্যও মহাকাশে

গতিশীল। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়েই আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডকে (Milkyway Galaxy) পরিক্রমণরত। ফলে, মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির একই রকম অবস্থান কিংবা একই রকম অবস্থানে ফিরে আসা কখনই সম্ভব নয়। সূর্য মোটামুটি 25 কোটি বছরে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড একবার পরিভ্রমণ করে। একবার পরিক্রমণ শেষ হবার পরও সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি মহাকাশে সূর্যের ওই পরিভ্রমণ শুরুর আগে যে আপেক্ষিক অবস্থানে ছিল, সেই অবস্থানে আর ফিরে আসে না। তবে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের 'দোলন তত্ত্ব' (Oscillation Theory)-এর প্রতিফলন ঘটেছে স্টোইকদের সময়সংক্রান্ত উপরিউক্ত ধারণায়। দোলন-তত্ত্ব মতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এখন ক্রম-বিকশিত হচ্ছে, তারপর শুরু হবে ক্রম-সঙ্কোচন। সঙ্কোচন শেষ হলে আবার শুরু হবে বিকাশ। পুনরাবৃত্তি ঘটবে সৃষ্টিচক্রের এবং সময়চক্রেরও। স্টোইকদের সময়চক্রের ধারণা হিন্দু দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুগামী।

গ্রীক দার্শনিকদের সময়চক্রের ওই ধারণা খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা মানতে পরেননি। সেন্ট অগাস্টাইন (St. Augustine) যুক্তি দিলেন যে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা একবারই মাত্র ঘটেছে, আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সময়ের চক্রাকারে আবর্তন সম্ভব নয়, সময়ের গতি রৈখিক (Linear)। অ্যারিস্টটল (Aristotle) গতি এবং সময়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে মনে করতেন। অগাস্টাইন অ্যারিস্টটলের এই মতবাদে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন যে, আত্মা বা মনের সঙ্গে সময় জড়িত, সময় স্মৃতি (Memory), একাগ্রতা (Attention) এবং উপলব্ধি (Anticipation)-কে সমৃদ্ধ করে। সপ্তদশ শতকে এসে নিউটন (Newton) বললেন যে, সময় মনের উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। সময় অনন্যগত, অপরিবর্তনীয় অপ্রতিরোধ্য এক প্রবাহ যা আপনভাবে বয়ে চলেছে অন্তহীন অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যতের পানে। সময়ের অস্তিত্ব মন বা বস্তু কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। নিউটন মনে করতেন যে, যদি এমন কতকগুলি ঘড়ি বানানো সম্ভব হয় যা নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল সময় নির্দেশ করবে এবং সেই ঘড়ির এক একটি সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকরা বিশ্বের যে কোনো স্থানে পরস্পরের আপেক্ষিকে চলন্ত যে কোনো মাধ্যমেই [Medium] থাকুন না কেন, এই সব ঘড়ি সব সময়েই সমান গতিতে চলবে এবং যে কোনো মুহূর্তে সব ঘড়িতে সমান সময় নির্দেশিত হবে, কোনোরকম পার্থক্য থাকবে না।

নিউটনের সমসাময়িক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ দার্শনিক লাইব্‌নিৎস বা লাইব্‌নিজ [Leibnitz] বলেছিলেন, "Space is the order or relation of things among themselves. Withour things occupying it, it is nothing". অর্থাৎ মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতরে বিন্যাস, মহাকাশে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে, সেগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছুই নয়। সময় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, "Time is simply the order of succession of phenomena" বা ঘটনার পরম্পরানুসারী বিন্যাসই সময়। সহজ করে বললে, ঘটনা ঘটছে বলেই সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট [Inmanuel Kant] সময় সম্পর্কে নিউটন ও লাইব্‌নিৎসের দুই বিরোধী মতবাদকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কান্ট নিউটনের অন্যান্য আবিষ্কারের উৎসাহী সমর্থক হলেও নিউটনের সময় সম্পর্কিত মতবাদ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বললেন, "Time is simply a feature of the way men's minds visualize the external world and is not a characteristic of external relality itself." অর্থাৎ মানুষের মন বহির্জগৎকে যেভাবে দেখে তারই একটি বৈশিষ্ট্য হল সময় এবং বাইরের বাস্তবতার কোনো বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বা গুণ এটা নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে, সময় যদি বিশ্বের একটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য

হয়, তবে বিশ্ব যথাকালের বেশ আগেই সৃষ্টি হয়েছে এটা যেমন প্রমাণ করা যায়, তেমনি যথা সময়ের বেশ আগে সৃষ্টি হয়নি এও প্রমাণ করা সম্ভব। এই বিরোধের মীমাংসায় কান্ট এই সিদ্ধান্তে নিলেন যে, বিশ্বের সঙ্গে সময়ের সম্পর্কে নেই কিন্তু বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের চিন্তার সঙ্গে জড়িত আছে সময়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গতি বাড়তে শুরু করল। ভূ-বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে ঘটলো উন্নততর নানা বিবর্তন। সময়ের চক্রাকারে আবর্তনের কথা মানুষ ভুলে গেল। সবাই ধরে নিল সময়ের প্রগতি কেবলমাত্র রৈখিক। সময় কেবল এগিয়ে চলেছে একটা সরলরেখা ধরে একমুখী জলস্রোতের মতো। 1905 সালে জগৎবাসীকে চমকে দিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন [Albert Einstein] নামের তখনকার স্বল্পখ্যাত এক জার্মান বিজ্ঞানী। জাতিতে যিনি ইহুদি, নাগরিক জার্মানির। তিনি জানালেন, সময় পর্যবেক্ষক-নিরপেক্ষ নয়, বরং তা পর্যবেক্ষকের উপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল। কান্ট এ ধরনের কথা কল্পনায়ও আনতে পারেননি। কান্টের মতবাদে বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী দুই ধরনের লোকেরই ধারণা ছিল সময় সারা বিশ্বে অনন্যগত, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বত্রই একই রকম থাকে বা থাকবে। আইনস্টাইন বললেন যে, সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। বিশ্বের যে কোনো আধারে সময়ের গতি এক—এই ধারণা ভুল। ফলে, পৃথিবীর মানুষ হকচকিয়ে গেল। তাই তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ [Relativity], কাল-প্রসরণ [Time Dilation] বুঝে উঠতে তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদেরও বেশ কিছুটা সময় লেগেছিলো। কাল-প্রসরণ এখনও সাধারণ মানুষের তেমন বোধগম্য নয়। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন বিখ্যাত বৃটিশ জ্যোতির্বিদ এডিংটন [Sir Arthur Eddington]। 1919 সালের এক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এডিংটন এই তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রমাণ করেছিলেন। সে সময় আপেক্ষিকতাবাদ এতই দুর্বোধ্য ছিল যে এই নিয়ে বেশ সরস একটা গল্প চালু আছে। একদিন এডিংটনের এক সহকর্মী তাঁকে বললেন, "প্রফেসর এডিংটন, বর্তমানে পৃথিবীতে যে তিনজন মাত্র বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদ ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেন, আপনি তাঁদের একজন।" এই কথায় এডিংটনের মুখে বেদনার ও চিন্তার ছাপ পড়তে দেখে সহকর্মীটি বললেন "প্রফেসর, আপনি এত বিহ্বল হচ্ছেন কেন? আপনি অতি বিনয়ী।" এডিংটন বললেন, "না আমি বিহ্বল হইনি। আমি শুধু ভাবছি তৃতীয় ব্যক্তিটি কে।"

এই তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন সম্ভবত জার্মান গণিতজ্ঞ অধ্যাপক হেরমান মিনকৌস্কি [Hermann Minkowski]। যিনি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের [Special Theory of Relativity] গাণিতিক রূপ দিয়েছেন। মিনকৌস্কি ছিলেন আইনস্টাইনের ছাত্রজীবনের অধ্যাপক।

মিনকৌস্কি বলেছেন, "Space and time separately have vanished into the merest shadow and only a sort of combination of the two preserves only reality". —অর্থাৎ মহাকাশ ও সময় পৃথকভাবে কিছুই নয় এবং শুধু দুয়ের মিলন ও অবিচ্ছিন্নতাই হল বাস্তব সত্য। 1908 সালে তিনি বিশ্ব সম্পর্কে নতুন ধারণা দিলেন আইনস্টাইনকে অনুসরণ করে। বিশ্বকে তিনি বোঝালেন জ্যামিতির সাহায্যে। আপেক্ষিকতাবাদে 'বস্তু'র চেয়ে 'ঘটনা'র বেশি প্রাধান্য। মিনকৌস্কি ঘটনার [Event] ধারণাকে বুঝিয়েছেন মহাকাশে একটি কণিকার একটি বিশেষ বিন্দুতে [Special Point] এবং একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে [Given instant] অবস্থানের দ্বারা। তাঁর মতে ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় চারটি স্থানাঙ্ক [Coordinate] সম্বলিত একটি বিন্দু দিয়ে, যার তিনটি স্থানাঙ্ক মহাকাশ সংক্রান্ত ও অন্যটি হল সময়। মহাকাশ সংক্রান্ত স্থানাঙ্ক হল অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা, আর সময় হল বিভিন্ন এককে [Unit] সময়ের মান। এই রকম একটি বিন্দুকে তিনি বললেন 'জাগতিক বিন্দু' [World Point]।

কোনো কিছুর গতি হবে এইসব জাগতিক বিন্দুর সঞ্চারপথে [Locus]। তিনি এই সঞ্চারপথের নাম দিলেন 'জাগতিক রেখা' [World Line]। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা হলো চতুর্মাত্রিক [Four Dimensional]। মিনকৌস্কি বললেন, জাগতিক বিন্দুসমূহ চারমাত্রার মহাকাশ-সময়-সন্ততি [Four Dimensional Spce-Time-Continuum] এবং এই হল বিশ্ব।

কোনো ঘটনাকে যদি মনে করি E, তবে মহাকাশ-সময়ের এই মতবাদ E-এর সামনে এবং পিছনে একটা করে আলোক-শঙ্কুর [Light Cone] ধারণার জন্ম দেয়। এই দুই শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু [Vertex] হবে E এবং এদের বক্রতলগুলি হবে শীর্ষবিন্দুর মধ্য দিয়ে যাওয়া সমস্ত কাল্পনিক তড়িৎচুম্বকীয় রশ্মির মহাকাশ-সময়-পথসমূহ [Space-time-paths]। এইরকম কাল্পনিক শঙ্কুর সামনেরটা নির্দেশ করবে ভবিষ্যৎ, আর পিছনের শঙ্কু নির্দেশ করবে অতীতের দিকে। সামনের শঙ্কুর ঘটনাগুলি হবে ঘটনা E-এর ভবিষ্যৎ রূপ, তেমনি পিছনের শঙ্কুতে অবস্থিত ঘটনাসমূহ হবে ঘটনা E-এর অতীত রূপ। কিন্তু অন্য কোনও ঘটনা যা ওই শঙ্কু দুটির মধ্যে অবস্থিত নয়, তার E-এর সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক পুরোপুরি পর্যবেক্ষক-নির্ভর হবে। অর্থাৎ অন্য ঘটনাটি যদি F হয় এবং F যদি ওই দুটি শঙ্কুর বাইরে থাকে তবে, কোনো পর্যবেক্ষক দেখবে, E ও F একসঙ্গে ঘটছে কিংবা F ঘটছে E-এর আগে অথবা পরে। নিউটনীয় সময় ধারণায় সব পর্যবেক্ষকই E ও F -এর মধ্যে একই রকমের সম্পর্ক দেখবে—আলাদা আলাদা নয়। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন, পর্যবেক্ষকদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ত্বরান্বিত [Accelerated] গতির ফলে, E ও F এই ঘটনা দুটির মধ্যে সাময়িক সম্পর্ক বিভিন্ন। ভিন্ন-ভিন্ন পর্যবেক্ষক এটা ভিন্ন-ভিন্নভাবে দেখবে যদি তাদের বেগ বিভিন্ন হয়।

আপেক্ষিকতাবাদ বোঝাতে গিয়ে আইনস্টাইন সাধারণ মানুষদের কৌতুক করে বলতেন, "যখন তোমাদের কেউ একজন খুব সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপে মগ্ন থাক, তখন জানতে পার না কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে, তখন এক ঘণ্টা মনে হয় এক মিনিট। আবার কেউ যদি গরম স্টোভে আঙুল রাখ, তাতে এক মিনিটকেই মনে হবে এক ঘণ্টা। এই হলো আপেক্ষিকতা।" তাঁর তত্ত্বে, ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। রঙের ধরণার মতই সময়ের ধারণাও উপলব্ধির বিষয়। চোখ আছে তাই রং আছে, চোখ না থাকলে রং বলে কিছু নেই। তেমনি ঘটনা আছে বলেই সময় আছে, ঘটনা না থাকলে সময়ও নেই। প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা দিতে কোনও পর্যবেক্ষক চারটি মাত্রার সাহায্য নেন। এই চারটি মাত্রার তিনটি হল মহাকাশজনিত ও চতুর্থমাত্রা হল সময়। কোথায় ঘটনা ঘটল তা নির্দেশ করতে হলে কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্ক-নির্ধারক কাঠামো [Frame of Reference] থেকে ওই ঘটনা কতদূরে ঘটল তা জানতে হবে। এতে মহাকাশে ঘটনার আপেক্ষিক অবস্থান পাওয়া যাবে। এরপর কোন্ সময় তা ঘটেছে তা জানতে পর্যবেক্ষককে তাঁর নিজস্ব কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে বা আবিষ্কৃত পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে।

আমরা সময়ের অভিজ্ঞতা পাই ঘড়ি থেকে। মানুষের তৈরি ঘড়ি-যন্ত্রের ক্রিয়া সৌরজগতের নিয়মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সৌরজগতের বাইরে আমাদের এই সময়ের ধারণা অর্থহীন। সৌরজগৎ ছাড়িয়ে আমাদের তৈরি ঘড়ি-ভিত্তিক সময় নির্ধারণ মোটেই সঠিক মান দেয় না। আপেক্ষিকতাবাদে ঘড়ি বলতে শুধু মানুষের তৈরি ঘড়ির কথা ভাবলে হবে না, ঘড়ি বলতে বুঝতে হবে—যে যন্ত্র অবিরাম নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হচ্ছে এবং যার দোলনকাল বা পর্যাবৃত্তকাল [Periodic Time] সব সময়ই একই মানের। এইভাবে দেখলে পৃথিবীও একরকম ঘড়ি, যে ঘড়ি 23 ঘণ্টা 56 মিনিট পর্যাবৃত্তকাল-সম্পন্ন, কারণ নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে এর 23 ঘণ্টা 56 মিনিট সময়

লাগে। এইভাবে পরমাণুও একটি ঘড়ি, যেখানে ইলেকট্রনের আবর্তনজনিত একটি সুনির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যা (Frequency) বর্তমান। বিশ্বে বহু মৌলিক পদার্থ আছে যাদের পরমাণুগুলির কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট এবং বিশ্বের সব জায়গায় এই কম্পাঙ্ক অসাধারণভাবে সমান থাকে। এই পরমাণুগুলিকে মৌলিকযন্ত্র বা ঘড়ি হিসাবে ধরা যেতে পারে। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদ এদের সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

আইনস্টাইন আরও বললেন যে, সময় সম্পর্কিত ধারণা যেমন 'এখন' (Now), 'যুগপত্তা' (Simultaneity) বলে কিছু নেই। এই সব ধারণা আসে তখন, যখন সময়কে মনে করা হত অপরিবর্তনীয় বা invarient, যার প্রবাহ বিশ্বের সর্বত্র সব মাধ্যমে একই বেগে চলছে বলে মনে করা হত। তখন ধারণা করা হত, বিশ্বের যে কোনো স্থানে যে কেনো মুহূর্তে সময়ের মান এক। আপেক্ষিকতাবাদ সময় ধারণার পরিবর্তন ঘটাল। কোনো ঘটনা কোন্ মুহূর্তে ঘটছে কিংবা দুটি ঘটনা ঘটবার মুহূর্তগুলি নির্ভর করবে পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন বেগে চলমান মাধ্যমে অবস্থানের উপর। কোনো দুটি ঘটনার 'যুগপত্তা' কিংবা কোনটি 'আগে' অথবা কোনটি 'পরে'—এসব বলা ভুল। পৃথিবীতে কিংবা অন্য যে কোনো গতিশীল মাধ্যমে অবস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে বিশ্বের কোনো ঘটনা 'এখন' ঘটছে বলে মনে হলেও অপর কোনো পর্যবেক্ষক, যিনি প্রথম পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিকে দ্রুতবেগে ধাবমান অন্য কোনো মাধ্যমে আছেন, তা 'এখন' ঘটছে বলে দেখবেন না। প্রথম জনের কাছে যে ঘটনা 'এখন' ঘটছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, দ্বিতীয় জনের কাছে তা হবে না। মনে হবে হয়ত ঘটনাটি আগেই ঘটে গেছে। তেমনি প্রথমজনের কাছে যা 'আগে' ও 'পরে', দ্বিতীয় জনের কাছে হয়তো তা ঠিক উল্টো মনে হবে। আবার প্রথমজনের কাছে যে দুটি ঘটনা 'যুগপৎ' (Simultaneous) বলে মনে হবে, দ্বিতীয় জনের কাছে তা মোটেই 'যুগপৎ' মনে হবে না, বরং মনে হবে একটি 'আগে' ও অন্যটি 'পরে' ঘটেছে। এটা নির্ভর করবে প্রথম জনের আপেক্ষিকে দ্বিতীয় জনের বা দ্বিতীয় জন যে মাধ্যমে অবস্থান করছে তার গতিবেগের উপর।

ধরা যাক, 'এখন' বা এই মুহূর্তে কোনো নক্ষত্র থেকে আলো এসে কোনো পর্যবেক্ষকের দূরবীনে পড়লো। ওই নক্ষত্রটির দূরত্ব যদি ওই পর্যবেক্ষকের থেকে এক কোটি 'আলোক-বর্ষ' (Light Year) হয়, তবে 'এখন' যে আলোটি দূরবীনে এলো তা এক কোটি বছর আগে ওই নক্ষত্র থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। সুতরাং 'এখন' দূরবীনে পর্যবেক্ষক যা দেখবেন তা হল ওই নক্ষত্রটির এক কোটি বছর আগের অবস্থা। ইতিমধ্যে নক্ষত্রটির মৃত্যু বা ধ্বংস বা বিস্ফোরণ ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়ে থাকতে পারে, যা জানার উপায় নেই। সুতরাং পর্যবেক্ষকটির কাছে যা 'এখন' নক্ষত্রটির কাছে তা এক কোটি বছর 'আগে'। আবার নক্ষত্রটির কাছে যা 'এখন' পর্যবেক্ষকটির কাছে তা হবে এককোটি বছর 'পরে'।

এইভাবে আইনস্টাইন প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সময় ধারণার পরিবর্তনই শুধু ঘটালেন না, তিনি বললেন, "সময় ও মহাকাশকে আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না, বলতে হবে মহাকাশ-সময়-সন্ততি বা 'দেশকাল-সন্ততি' (Space-time-continuum) । মহাকাশ ও সময় দুটিই অবিভাজ্য। সময়ের সব পরিমাপই হল মহাকাশের ভিতর আবার মহাকাশের যে কোনো পরিমাপ সময়কে বাদ দিয়ে নয়।" সেকেন্ড, মিনিট, দণ্ড, পল, মাস, বছর ইত্যাদি সবই হলো মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র-তারকা এদের আপেক্ষিকে পৃথিবীর অবস্থান। মহাকাশ তিনমাত্রার আর সময় একটি মাত্রা। এই বিশ্বের সবকিছুই চতুর্মাত্রিক। সাধারণ মানুষ চার মাত্রার জিনিষের কথা চিন্তা করতে পারে না। যার দৈর্ঘ্য আছে তা একমাত্রা সম্পন্ন (One Dimensional)। যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা তিনটিই আছে তা ত্রিমাত্রিক (Three Dimensional)

সাধারণভাবে রেললাইন একমাত্রিক, ক্ষেত্রের উপরিতল দ্বি-মাত্রিক, আর একটা ঘর ত্রিমাত্রিক। একটা কাগজের উপর একটা সরলরেখা টানলে তা একমাত্রিক মনে করা হয় সাধারণভাবে। অবশ্য বিশ্বে কোনো তলই সমতল নয় এবং মহাকাশ নিজেই বক্রভাবসম্পন্ন, সুতরাং কোথাও সরলরেখা টানা অসম্ভব। যাইহোক, সেই সরলরেখাটিকে আমরা কোটি কোটি বিন্দুর সমষ্টি বলে ধরে নিতে পারি। আর তত্ত্বগতভাবে Continuum বা সন্ততি বলতে আমরা বুঝব ওই রেখার যে কোন দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা মাত্রায় বিভক্ত বলে মনে করা। একটা গতিশীল ট্রেনের অবস্থান জানাতে আমরা সাধারণভাবে কোনো নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে তার দূরত্ব কত তা বলে থাকি। এটা একমাত্রিক সন্ততি [One Dimensional Continuum] । আবার একটা জাহাজের অবস্থান জানা যায় অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দিয়ে। এটা দ্বিমাত্রিক সন্ততি। উড়ন্ত উঁড়োজাহাজের অবস্থান জানা যায় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা দিয়ে। এইভাবে মহাকাশ ত্রিমাত্রিক সন্ততি [Three dimensional continuum] । কিন্তু গতিশীল কোনো কিছুর সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে কেবল মাত্র মহাকাশে এর অবস্থান বললে হবে না, বস্তুটি সময়ের সঙ্গে কিভাবে স্থান পরিবর্তন করছে তাও জানতে হবে। আগের উদাহরণগুলির সবগুলিই ঘটনার সঠিক বর্ণনা নয়। কারণ ট্রেনটি কোনো সময় কোন্ জায়গায় আছে তা বলা দরকার তার অবস্থানের সঠিক বর্ণনা দিতে। শুধু তাই নয়, কোন্ সময় কোন্ জায়গা দিয়ে যাবে তা জানলে তার চলাচলের সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে। এটা আমরা মোটামুটিভাবে পাই 'সময় সারণী' [Time Table] থেকে। তেমনি দিল্লি-কলকাতাগামী বিমানের ক্ষেত্রে শুধু তিনটি মাত্রা উল্লেখ করলে চলবে না, তার সঙ্গে সময়ের উল্লেখ জরুরি। ওই বিমানে দুর্ঘটনা ঘটলে যেটা সবার আগে আমরা জানতে চাই, কোন্ সময়ে দুর্ঘটনা ঘটল এবং কত অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতায় তা ঘটলো তাও জানতে হয় দুর্ঘটনার সঠিক স্থান নির্ণয়ের জন্য। এইভাবে সময় হল চতুর্থমাত্রা [Fourth Dimension] । যদি কোনো বিমানের কোনো শহর থেকে অন্য একটি শহরে উড়ে যাবার পথ কল্পনা করা হয়, তবে সেই পথটিকে মাঝখানের কতকগুলি জায়গায় নামা-ওঠা দিয়ে বিচ্ছিন্ন পথ ভাবলে চলবে না, বরং ভাবতে হবে একটি অবিচ্ছিন্ন বক্রাকার পথ [Curved Path] চারমাত্রার মহাকাশ-সময়-সন্ততির [Four dimensional Space-time-continumm] ভিতর দিয়ে।

বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই গতিশীল। পৃথিবী এই মুহূর্তে মহাকাশের যেখানে আছে পরের মুহূর্তে অন্যখানে সরে গেছে। পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে সেকেন্ডে প্রায় 19 মাইল বা 30 কিমি বেগে। আবার সূর্য তার সৌরমণ্ডলকে নিয়ে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে এক সেকেণ্ডে প্রায় 160 মাইল বা 260 কিলোমিটার বেগে। ছায়াপথের আজ যেখানে সূর্য আছে, সেখানে ফিরে আসতে সূর্যের মোটামুটি সময় লাগে 25 কোটি বছর, যা হল এক গ্যালাক্টিক বর্ষ [Gallactic Year] । কিন্তু ছায়াপথের সেই জায়গায় ফিরে এলেও মহাকাশের সেই জায়গায় আর আসছে না। কারণ মহাকাশে আমাদের ছায়াপথ তখন অনেক দূরে চলে যাবে, যেহেতু বিশ্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে এবং গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে সেকেন্ডেপ্রায় 1,50,000 কিলোমিটার বেগে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। তবে মহাবিস্ফোরণের তত্ত্বের [Big Bang Theory] 'সম্প্রসারণশীল বিশ্ব' মতবাদটি এখন আর চূড়ান্ত বলে মানা হচ্ছে না নানা কারণে। বহু বিজ্ঞানী এখন বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের 'দোলন তত্ত্বে' [Oscillatiom Theory] বিশ্বাসী। এই তত্ত্বই আধুনিক বিজ্ঞানের 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory]। অর্থাৎ বিশ্বের এখন ক্রম-প্রসারণ ঘটছে এবং এর শেষ পর্যায়ে এসে ঘটবে ক্রম-সঙ্কোচন।

আগেই বলেছি, সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানীরা নানাভাবে দিয়েছেন। মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এড্‌উইন পাওয়েল হাবল [Edwin Powel Hubble] 1929 সালে। তিনি একটি সূত্র আবিষ্কার করলেন। এই সূত্র অনুযায়ী যে গ্যালাক্সী অন্যান্য গ্যালাক্সীর থেকে যত দ্রুতবেগে দূরে চলে যাচ্ছে তার বর্ণালির [Spectrum] লাল অভিসরণ [Red-shift] তত বেশি। লাল অভিসরণের তাৎপর্য হল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য [Wavelength] বেড়ে যাওয়া। সুতরাং গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ যত বেশি তার আলোর বর্ণালিতে লাল অভিসরণের মাত্রাও তত বেশি - এর অর্থ হল অপসরণ বেগ বাড়ার সঙ্গে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়ছে। আবার অধ্যাপক হান্নেস আল্‌ফ্‌ভেন বলেছেন, 'ছায়াপথসমূহের আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতিবেগ তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক'। এর থেকে বিজ্ঞানীরা বের করলেন কোটি কোটি গ্যালাক্সী তাদের অভ্যন্তরীণ অগণিত অতিকায় নক্ষত্রজগৎ নিয়ে আলোর গতির প্রায় অর্ধেক বেগে অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় 1,50,000 কিলোমিটার বেগে মহাশূন্যের চারিদিকে ছুটে চলেছে এবং তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের নাম দিলেন 'সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব'। সরণ যখন হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই সমস্ত বস্তু কোনো এক সময়ে একটি মাত্র বিন্দুতে সংবদ্ধ ছিল হাইড্রোজেনের সুদৃঢ় সুতীব্র এক জমাট ঘনত্বে। তারপর ঘটল বিস্ফোরণ। তখন থেকে অর্থাৎ সেই বিস্ফোরণের সময় থেকেই বস্তুকণাসমূহ ওই বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে এবং পরস্পরের কাছ থেকেও সরে সরে যাচ্ছে। সেইজন্য এই তত্ত্বের নাম যেমন 'সম্প্রাসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Expanding Universe Theory], তেমনি এর অন্য নাম 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' [Big Bang Theory] ।

'বিগ ব্যাঙ্' তত্ত্বকে মূল প্রতিপাদ্য ধরে নিয়ে 1965 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালান স্যান্ডেজ [Allen Sandagc] নতুন তত্ত্ব দিলেন। এই তত্ত্বেরই নামই 'স্পন্দনশীল-বিশ্ব-তত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory] । স্যান্ডেজ সাহেবের মতে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, আবার নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বললেন, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান বয়স [10^{10}] বা এক হাজার কোটি বছর এবং এখন চলছে তার সম্প্রসারণকাল। এইভাবে সম্প্রসারণ চলবে আরও 3000কোটি বছর। তারপর গ্যালাক্সীগুলোর ছুটে চলার শক্তি হবে নিঃশেষিত, তখন বিশ্ব আবার সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। এইভাবে আবার তৈরি হবে একদিন সৃষ্টিপূর্ব সেই 'কসমিক এগ' বা 'মহাজাগতিক অণ্ড', যা আবার বিস্ফোরিত হয়ে আবার সৃষ্টি করবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। এইভাবে চলবে সঙ্কোচন ও প্রাসারণের চক্র [Cycle]। এই তত্ত্ব বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের যে 'দোলন-তত্ত্ব', তারই হুবহু প্রতিধ্বনি।' 'দোলন-তত্ত্ব' বলছে, এই বিশ্ব একবার প্রসারিত হয়ে বিকশিত হচ্ছে, আবার সঙ্কুচিত হয়ে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসছে। এই সব কথা আগেও একবার বলা হয়েছে।

এই বিশ্বের বয়স নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিরোধ আজও মেটেনি। বিশ্বের বয়স ক্রমশই বেশি, আরো বেশি বলে হিসাব করা হচ্ছে। আর এতেই সম্প্রসারণশীল-বিশ্বতত্ত্বের চির-সম্প্রসারণ মতবাদ নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। কারণ বিশ্ব চির-সম্প্রসারিত হলে তার যা বয়স হত বলে হিসাব করা হয়ছে বর্ণালিতে লাল-অভিসরণ [Red-shirt] দেখে, বিশ্বের বয়স কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। 'ডপার এফেক্ট' [Doppler Effect] থেকেই অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরে বের করলেন বিশ্বের বর্তমান বয়স 6×10^{10} বছর। আবার 1979 সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষ বিভাগের প্রধান জর্জ এবেল তেরো বছর ধরে আটটি গ্যালাক্সীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিশ্বের বর্তমান বয়স 2×10^{12} বছর। এই বয়সটা আরও কিছু বাড়ার সম্ভাবনাও

উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স 2000 কোটি বছর। এর সম্প্রসারণ চলবে আরও 2000 কোটি বছর। আর তারপর ঘটবে এর মহাসঙ্কোচন।

ইদানীং বিজ্ঞানীরা অঙ্কের সাহায্যে আইনস্টাইনীয় ভরের একটা প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। তবে বাস্তবে এর দেখা পাওয়া যায়নি। এই কণাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যাকিয়ন' [Tachyon]। আলোর চেয়ে কম গতিবেগে এদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। আর আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগে এদের অস্তিত্ব প্রকটিত হয়। এদের ক্ষেত্রে সময় কি তবে বিপ্রতীপ গতিসম্পন্ন হবে? অর্থাৎ সময় কি পিছু হটতে হটতে ভবিষ্যৎ বাদ দিয়ে বর্তমান থেকেই অতীতের দিকে ছুটবে? গতি এদের যতই বাড়তে থাকবে সময়ও তত দ্রুত অতীতের পানে ছুটতে থাকবে। সে এক অকল্পনীয় অবস্থা হবে যদি সত্যিই ট্যাকিয়ন খুঁজে পাওয়া যায়। তখন ব্যাপারটা অঙ্কের কাল্পনিক সংখ্যা না হয়ে বাস্তবে অদ্ভুত কিছু হবে। কারণ ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে সময় পিছু হটতে হটতে বাস্তবে মিশরীয় বা হরপ্পা সভ্যতায় পৌঁছে যাবে বর্তমান যুগ থেকে। এই রকম পিছিয়ে যেতে যেতে মানুষই হয়তো চলে যেতে পারে সৃষ্টির আদিকালে। ব্যাপারটা এখন কল্পনার হলেও অঙ্কে তা এখন বাস্তব। কিন্তু বাস্তবে ট্যাকিয়ন এখনও অমিল অনাবিষ্কৃত। সুতরাং সময়ের বিপ্রতীপ গতি বা বিপরীতমুখী গতি বাস্তবে এখনও অসম্ভব ব্যাপার। আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে এটা সম্ভব নয়। ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে ভবিষ্যতে কোনওদিন সম্ভব হলেও হতে পারে। সম্ভব যদি কোনদিন হয়, তবে তা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা হবে এবং আইনস্টাইনীয় ধারণার বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করবে। এখন বিজ্ঞান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বলা যায়, সময়ের বিপ্রতীপ গতি বা বিপরীতমুখী গতি সম্ভব নয়। সময় সর্বদাই বর্তমান হয়ে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধেয়ে চলবে, কখনই ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে যাবে না। তবে ভবিষ্যতে এমন দিন আসতেও পারে, যখন বর্তমান থেকে অতীতের জগতে কিংবা বর্তমান থেকে দূর-ভবিষ্যতের জগতে ইচ্ছামত যাওয়া-আসা করা যাবে। সময় হয়ত বর্তমানেই স্থির রাখা যাবে কাল-প্রসরণের দৌলতে। তখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলে মিশে এক হয়ে যাবে। অধরা সময় বন্দী হবে বিজ্ঞানের হাতে। সময়ই হবে মানুষের ক্রীতদাস। সেদিন হয়ত মানুষ সময়কে কাজে লাগাবে ইচ্ছা মত। নানান যন্ত্রের মত সময় হয়ে উঠবে একটা নতুন ধরনের যন্ত্র।

যাইহোক, অধ্যাপক ফাইনবার্গের ট্যাকিয়ন কণা আজও অধরা। আগেই বলা হয়েছে, জন্মের শুরু থেকে এই কণারা আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলে। আলোর বাধা এরা অতিক্রম করতে পারে না। অর্থাৎ গতিবেগ কমে গেলে পরিচিত স্বাভাবিক কণা হিসাবে এরা প্রতীয়মান হতে পারে না। অঙ্ক কষে দেখানো হয়েছে এদের শক্তি ঋণাত্মক এবং স্থির ভর কাল্পনিক। যদি ট্যাকিয়নের তড়িতাধান থাকে তবে তারা শোরেনকভ-রশ্মি নির্গত করবে এবং তখন তাদের সনাক্ত করা যাবে। এই রাস্তায় ট্যাকিয়ন খুঁজে পাওয়ার অনেক চেষ্টাই বিজ্ঞানীরা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। ট্যাকিয়ন আজও অধরা। আবার ট্যাকিয়নের তড়িতাধান না থাকলেও তাদের অস্তিত্ব ধরা যেতে পারে সাধারণ পারমাণবিক কণাদের সঙ্গে বিক্রিয়ার সময় সামগ্রিক শক্তির হেরফের পর্যবেক্ষণ করে। ট্যাকিয়ন যখন পারমাণবিক কণাদের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়ার পর সেখানে শক্তির পরিমাণ বিক্রিয়ার আগে শক্তির মোট পরিমাণের চেয়ে কম হবে। এর কারণ ট্যাকিয়ন ঋণাত্মক শক্তিসম্পন্ন। এভাবেও বিজ্ঞানীরা ট্যাকিয়ন খুঁজে পান নি আজও। সুতরাং ট্যাকিয়ন-যান বা কালযান সত্যি সত্যিই আবিষ্কৃত হবে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের। আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে ট্যাকিয়ন-ধারণা। ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে সময় বিপরীমুখী অর্থাৎ তার চলা ভবিষ্যত থেকে বর্তমান হয়ে অতীতের দিকে।

সুতরাং সময় ধারা নিয়ে দু'রকম তথ্য এসে যাচ্ছে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের জটিল চিন্তাধারায়। কাল্পনিক-সময় ধারণাকে বিজ্ঞানীরা আর অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। সময় এখন দু'রকম—বাস্তব সময় [Real Time] ও কাল্পনিক-সময় [Imaginary Time] । শুধু তাই নয়, বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ বিগব্যাঙ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে যখন সারা বিশ্বটাই কসমিক এগে অবস্থান করছিল তখন তার আকৃতি ছিল সবচেয়ে ছোট। এটা ছিল বাস্তব-সময়ে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম আকৃতি। আবার এটাকে বলা যায় কাল্পনিক-সময়ে বৃহত্তম আকৃতি। কাল্পনিক-সময় ও বাস্তব-সময়ের মাঝখানে রয়েছে বিগ-ব্যাঙের মুহূর্তটি যখন কাল্পনিক সময়ের শেষ এবং বাস্তব সময়ের শুরু। এই মুহূর্তটিতেই মহাজাগতিক অণ্ডের বিস্ফোরণ এবং বিশ্বের বহিঃপ্রক্ষেপ শুরু। বাস্তব সময় এবং কাল্পনিক সময় নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। যেমন আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টামবাদকে মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন একালের বিজ্ঞানীরা। সময় এখন জড়িয়ে গেছে বিশ্বের মোট শক্তির সঙ্গে , বিশ্বের প্রারম্ভিক আকার-আকৃতির সঙ্গে। সময়ের অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্বন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Stephen W. Hawking তাঁর 'A Brief history of time' বইটিতে বলেছেন,

"The history of the universe in real time, however, would look very different. At about ten to twenty thousand mollion years ago(10^{10} or 2×10^{10} years),it would have a minimum size, which was equal to the maximum radius of the history in imaginary time. At later real times, the universe would expand like the chaotic inflationary model prosposed by Linde (but one would not have to assume that the universe was created some how in the right sort of state). The universe would expand to a very large size and eventually it would collapse again into what looks like a singularity in real time."

হকিং সাহেবের মতে বিশ্ব 'Finite' হবে কাল্পনিক -সময়ে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, বিশ্ব 'Finite but unbounded' অর্থাৎ 'সীমাহীন কিন্তু অন্তহীন নয়'। সেই 'অন্তহীন নয়' অবস্থায় বা নির্দিষ্ট অবস্থায় এবং 'সীমাহীন বা 'Unbounded' অবস্থায় বিশ্ব থাকতে পারে একমাত্র কাল্পনিক-সময়ে (Imaginary Time) । হকিং সাহেব বলেছেন, "The universe could be finite in imaginary time but without boundaries or singularities."

তাই আধুনিক মত হল যে, যেটা আমরা বাস্তব সময় বলে মনে করছি তা হয়ত একটা ধারণা বা idea মাত্র এবং তার বাস্তবতা নেই। আর যে সময়কে আমরা কাল্পনিক সময় বলে মনে করছি, তাই হয়ত সব কিছুর বুনিয়াদ, হয়ত তাই-ই সবকিছুর মূলে। সুতরাং আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সূত্রে অর্থাৎ

$$T' = T\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}$$

সূত্রে V যদি C -এর বেশি হয় অর্থাৎ মাধ্যমের গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের বেশি হয়, তবে V গতিবেগ-বিশিষ্ট চলমান মাধ্যমে সময় হবে ঋণাত্মক, কাল্পনিক-সময়। নতুন মত অনুসারে বিশ্ব-সৃষ্টির আগে এই কাল্পনিক-সময়ই ছিল। অর্থাৎ সেই কসমিক-এগে সময় যে ছিল না, তা নয়, বরং কাল্পনিক-সময় নিয়েই অবস্থান করছিল সেই মহাজাগতিক-অণ্ড। হকিং সাহেবের মতে, বাস্তব-সময় ও কাল্পনিক-সময়ের মধ্যে সেটিই আমাদের গ্রহণযোগ্য, যা বিশ্বের অবস্থার সঠিক বর্ণনা দিতে সক্ষম। যে সময়কে দিয়ে বিশ্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেই সময়ই প্রকৃত পক্ষে বাস্তব সময় হওয়া

উচিত। "So it is meaningless to ask: Which is real, 'real' or 'imaginary' time? It is simply a matter of which is the more useful description."

সুতরাং সৃষ্টির আদিতে বিশ্বের বহিঃপ্রকাশের আগে, তথাকথিত কাল্পনিক সময়ই ছিল এবং সেই কাল্পনিক সময়ই তখনকার বাস্তব-সময়। সেই মহাজাগতিক অণ্ডে গতিবেগ নিশ্চয়ই আলোর চেয়ে বেশি ছিল, তাই এই কাল্পনিক-সময়ের অবস্থান, যে সময় অতীতে নিয়ে চলে সমস্ত বর্তমানকে। সত্যি কথা বলতে কি, কাল্পনিক-সময়ে অগ্রগতি বা পশ্চাদগতি বলে কিছু নেই, নেই অতীত কিংবা ভবিষ্যতও। অগ্র-পশ্চাৎ গতি কিংবা অতীত-ভবিষ্যৎ ধারণা আসে বাস্তব-সময়ের প্রেক্ষাপটে। বিশ্বসৃষ্টির আগে তাই কাল্পনিক-সময়ের পরিমণ্ডলে অগ্র-পশ্চাৎ গতি ছিল না, ছিল না অতীত-ভবিষ্যতও।

অনিশ্চয়তা নীতি [Uncertainty Principle] অনুসারে, আদি বিশ্বে নিশ্চয়ই ঘনত্ব-জনিত অসাম্য বা অসামঞ্জস্য [non-Uniformity], তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, বিদ্যমান ছিল। সেই অসাম্যই সৃষ্টি করেছে বর্তমান বিশ্ব। সীমাহীন বা Unbounded বিশ্বের ব্যাখ্যা অনিশ্চয়তা নীতিতেই সম্ভব। আবার এই নীতিই ব্যাখ্যা দিতে পারে আদি-বিশ্বের ওই ক্ষুদ্রতম ঘনত্ব অসাম্যের। এ নিয়ে বিজ্ঞানের আধুনিকতম গবেষণা এখন চলছে। সিদ্ধান্তসমূহ আজও অনিশ্চিত। সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত বিশ্ব নিয়ে এখন বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এসে দাঁড়িয়েছে এক দ্বৈতবাদে ঃ

"The idea that space and time may form a closed surface without boundary also has profound implications for the role of God in the affairs of the universe. With the success of scientific theories in describing events most people have come to believe that God allows the universe to evolve according to a set of laws and does not intervene in the universe to break these laws. However, the laws do not tell us what the universe should have looked like when it started—it would still be upto God to wind up the Clockwork and choose how to start it off. So long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is really compeletely self-contained, having no boundary or edge, it would have neither begining nor end : it would simply be. What place, then, for a creator ?"

[A Brief History of Time ❑ S. W. Hawking]

আধুনিক বিজ্ঞানের এই সব তথ্য কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন তথ্যের অনুসরণ মাত্র। দর্শন তো করে কবেই বলেছে অসাম্য ছাড়া সৃষ্টি বা রূপান্তর কিংবা বহিঃপ্রক্ষেপ ঘটে না। আবার সময়ের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, কিংবা বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়া সবই আপেক্ষিক। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা তো বর্তমান থেকে অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে হামেশাই যাতায়াত করতে পারতেন এমন কথা ভারতীয় দর্শনে বহুবার বহুক্ষেত্রে বলা হয়েছে। দর্শন তো মহাজাগতিক অণ্ডের নিষ্ক্রিয় কালের কথাও বলেছে, যার পরিমাপ হল $31,104 \times 10^{10}$ পার্থিব-বৎসর। দর্শন অনুসারে মহাজাগতিক অণ্ড বা কসমিক-এগ সীমাহীন কিন্তু অন্তহীন নয়। সেখানে ঈশ্বরই একমাত্র অসীম এবং অন্তহীন। বিশ্ব ঈশ্বরেরই রূপ। ঈশ্বর বিশ্ব এবং তারও অতিরিক্ত।

আইনস্টাইনের মহাকাশ-সময়-সন্ততি সময়কে জড়িয়ে দিয়েছে মহাকাশের সঙ্গে, সময় আর মহাকাশ আলাদা কিছু নয়। একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। আলাদাভাবে সময় কিংবা মহাকাশকে ধারণা করা ভুল। তাই বিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সময়। সময় হয়েছে বিশ্ব-নির্ভর। এই ধারণাই জন্ম দিয়েছে আরো এক নতুন মতবাদের। সময় সম্পর্কিত এই মতবাদ আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা সময়ের সম্পর্কে আগামীদিনের ধারণার পথিকৃত। এই মতবাদ কিংবা তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) ও সময়কে

নিয়ে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই জানা গেল, আলোক রশ্মি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ আলোকে প্রভাবিত করছে, সেহেতু সময়কেও মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবিত করবে। কারণ হল, আলোর গতি সময়কে প্রভাবিত করে। সময়ের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ বক্তব্য হল কৃষ্ণগহ্বর ও সময়কে নিয়ে বিজ্ঞানীদের অত্যাধুনিক মতবাদ। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, চলমান সময় বলে কিছু নেই, কৃষ্ণগহ্বরের ধারে সময় নিশ্চল হয়ে যায়। কৃষ্ণগহ্বরের ধারেকাছে যেতে পারলে যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে সময় সম্ভবত কাল্পনিক-সময় হয়ে যায়। সে সময়ের অতীত-ভবিষ্যত বলে কিছু থাকে না। মহাজাগতিক অণ্ডেও এ রকম বাস্তব সময় থাকে না সে কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। বিগব্যাঙ যখন হল তখনই সময়ের শুরু এবং কৃষ্ণগহ্বরে সময়ের শেষ।

এই কৃষ্ণগহ্বর জিনিষটা কি? যেখানে সময় স্থির হয়ে যায় কিংবা যার ভিতরে সময় অতীত-ভবিষ্যত হারিয়ে কাল্পনিক হয়ে যায়, সেটা কেমন বস্তু? সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানে একটি সুপরিচিত নাম। 1983 সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁকে, তাঁর পঞ্চাশ বছর আগেকার আবিষ্কারের জন্য। 1930 থেকে 1933 সাল অবধি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করার জন্য যে গবেষণা তিনি করেন, সেই গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্যই 1983 স্যালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। চন্দ্রশেখর 1930 থেকে 1933 সালের গবেষণায় আবিষ্কার করেন যে, কোনও একটি 'Degenerate Star'-এর ব্যাসার্ধ তার ভর বৃদ্ধির সঙ্গে কমে যেতে থাকে, যা সাধারণ নক্ষত্র-ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। Degenerate Star হল সেই সব নক্ষত্র যারা তাদের নিজেদের সব জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলে শক্তি উৎপাদনে অপারগ। সাধারণ নক্ষত্রের ভর বৃদ্ধি হলে তার ব্যাসার্ধ বাড়ে, কিন্তু Degenerate নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো হয়। তিনি বললেন, একটি Degenerate নক্ষত্রের ভর কখনই সূর্যের ভরের 1.4 গুণের বেশি হতে পারে না। এই 'ভর-সীমা' (Mass Limit) জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'চন্দ্রশেখর সীমা' (Chandrasekhar's Limit) নামে বিখ্যাত। চন্দ্রশেখরের মূল আবিষ্কার, যার জন্য তিনি পঞ্চাশ বছর পরে 1983 সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তা সংক্ষেপে বললে এই রকম দাঁড়ায় ঃ

"The radius of a degenerate star decreases as its mass increases (in contrast to an ordinary star whose radus increases with the increase of mass) and that a degenerate star cannot have a mass larger than limiting mass of above 1.4 times the mass of the Sun." যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের 1 4 গুণের বেশি নয় তাদের অধিকাংশই 'সাদা বামন' (White Dwarf) তারায় রূপান্তরিত হবে। কিছু কিছু তারা অবশ্য 'নোভা' (Nova) হয়ে যেতে পারে।

আবারও বলি, যে সব তারার ভর সূর্যের ভরের 1.5 থেকে 3 গুণ সেগুলি শেষ পর্যায়ে 'নিউট্রন তারা' (Neutron Star) বা পালসার (Pulsar) হবে। আবার যাদের ভর সূর্যের ভরের তিনগুণের বেশি তারা সুপার নোভা (Super Nova) হয়ে বিস্ফোরিত হবে এবং তারপর তারা পালসার হবে এবং আরও পরে তারা রূপান্তরিত হবে কৃষ্ণ-গহ্বরে (Black-Hole)। এই সব কৃষ্ণ-গহ্বরের ঘনত্ব অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (Gravitational Field) এতো শক্তিশালী যে এদের থেকে কোনও শক্তিই বাইরে বিকিরিত হতে পারে না। আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এদের মহাকর্ষীর ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারে না। আমাদের সূর্য, যদিও কোনদিন এই অবস্থায় আসবে না, কারণ সূর্যের ভর 'চন্দ্রশেখর সীমা'-র মধ্যেই আছে, তবুও যদি ধরে দেওয়া হয় সূর্য কৃষ্ণ-গহ্বর

হবে, তবে তখন তার ব্যাস হবে মাত্র 4 মাইল বা 6.4 কিলোমিটার এবং ঘনত্ব হবে অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। সূর্যের বর্তমান ব্যাস 8,65,400 মাইল।

ধরা যাক, কোনও নক্ষত্র বেলা বারোটার সময় কৃষ্ণ-গহ্বরে পরিণত হবে এবং একজন মহকাশচারী তার উপর অবস্থান করছে ও তার বন্ধুরা একটা মহাকাশযানে ওই নক্ষত্রটি থেকে কিছুটা দূরে থেকে বন্ধুটিকে পর্যবেক্ষণ করছে। মহাকাশযানের বন্ধুরা 11টা 59 মিনিট 59 সেকেন্ড থেকে বেলা 12টা অবধি নক্ষত্রে অবস্থানকারী বন্ধুর পাঠানো আলোক সংকেত যথানিয়ম দেখতে পাবে। কিন্তু ঠিক 12টায় তারা তাদের বন্ধুকে দেখতে পাবে না, পাবে না কোন আলোক সংকেতও। প্রথমটায় তারা দেখবে বন্ধুর পাঠানো আলোক সংকেত লোহিত থেকে লোহিততর হচ্ছে এবং তা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। তারপর বেলা ঠিক বারোটায় তাদের পর্যবেক্ষণে নক্ষত্রটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। বন্ধুর পাঠানো আলোক-সংকেত কিংবা বন্ধুটিকেও আর তারা দেখতে পাচ্ছে না। তখন নক্ষত্রটি হয়ে গেছে কৃষ্ণ-গহ্বর। সময় গেছে স্থির হয়ে, নিশ্চল হয়ে কিংবা শেষ হয়ে। ওই কৃষ্ণ-গহ্বর তখন কেবল মহাকর্ষীয় বল (Gravitational Force) ছড়িয়ে যাবে। 1965 সাল থেকে 1970 সালের মধ্যে রজার পেনরোজ (Roser Penrose) এবং স্টিফেন হকিং (Stephen W. Hawking) সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে প্রমাণ করেরেছন যে, কৃষ্ণগহ্বরে রয়েছে অসীম ঘনত্বের অনন্যতা এবং মহাকাশ-সময়-সন্ততির বক্রতা (Space-time Curvature)। তাঁদের মতে মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাঙের মুহূর্তে শুরু হয়েছে সময়ের চলমানতা এবং তা শেষ হয় কৃষ্ণ গহ্বরে এসে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে দেখা যায় যে, একটা কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাস হবে মাত্র বাহশ মাইল যদি তার ভর সূর্যের ভরের ছয় গুণ হয়। কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর কোনও বস্তু পড়লে পতনশীল বস্তু তার স্থির শক্তির চল্লিশ শতাংশ নির্গত করতে পারে। এই শক্তি রঞ্জন রশ্মি কিংবা অন্য বিকিরণের আকারে বেরিয়ে আসে। যখন কৃষ্ণ-গহ্বরে ক্রমাগত বস্তু পড়তে থাকে তখন এর চারিদিক খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়ার আগে বস্তুগুলি যেন আর্তচিৎকার করে শক্তি নিঃসরণ করে। তত্ত্বের দিক দিয়ে খুব ভারী 'কৃষ্ণগহ্বর' হওয়া সম্ভব। এরা বিগব্যাঙের সময় সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে কিংবা পরবর্তীকালে অনেকগুলি নক্ষত্রের ভর একত্রিত হয়ে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করে থাকতে পারে। গ্যালাক্সীগুলির কেন্দ্রে এদের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। তত্ত্বগতভাবে কৃষ্ণ-গহ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। অন্ততঃ একটি কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কৃত হয়েছে। M87 গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহ্বর আছে বলে মনে করা হচ্ছে তার ভর সম্ভবত কয়েকশো কোটি সূর্যের ভরের সমান।

সুতরাং তীব্র মাধ্যাকর্ষণ কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি করে। তার থেকে আলোরও নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। একবার কৃষ্ণ-গহ্বরের মধ্যে কোনও কিছু পড়লে তা আর কখনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তার পদার্থ রূপান্তরিত হবে শক্তিতে আইনস্টাইনের সূত্র মেনে। কৃষ্ণ-গহ্বরের প্রান্ত কিংবা উপরিত্বকই হল 'ঘটনা-দিগন্ত'। তারপর সময় শেষ, ঘটনাও শেষ। এই দিগন্তের পর আর কোন ঘটনাই দেখা যাবে না। সুতরাং আলো যেমন কৃষ্ণ-গহ্বরের ধারে বা প্রান্তে নিশ্চল হয়ে যায় তেমনি সময়ও সেখানে নিশ্চল। কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে সময় শুধু নিশ্চল নয়, অতীত ভবিষ্যত হারিয়ে সে কাল্পনিক সময় (Imaginary Time) হতেও পারে। হিসাবে দেখা গেছে, সময়ের হার এক শতাংশ কমাতে হলে কৃষ্ণগহ্বর থেকে তার ব্যাসের পাঁচশগুণ দূরত্বে ঘড়িটিকে অবস্থান করাতে হবে। 1974 সালে হকিং সাহেব ঘোষণা করেছেন কৃষ্ণগহ্বরগুলি উত্তপ্ত এবং তাদের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এই ধরনের

ঘটনায় কৃষ্ণগহ্বরের স্থিতি-শক্তি হঠাৎ বিনষ্ট হয়ে তা গামা-রশ্মি বা পারমাণবিক কণায় রূপান্তরিত হতে পারে। এখন এ রকম বিস্ফোরণ ঘটবে খুব ছোট কৃষ্ণগহ্বরে। এইসব ছোট কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয়েছিল সৃষ্টির আদিকালে। বিজ্ঞানীরা বলেন, যদি 150 আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত কোন কৃষ্ণগহ্বরে এ ধরনের বিস্ফোরণ ঘটত তবে তা নিশ্চয়ই দে'খা যেত। কিন্তু তা দে'খা যায় নি। আবার কৃষ্ণগহ্বরও মহাকাশে নিশ্চিতভাবে একটির বেশি আবিষ্কৃত হয় নি। বিজ্ঞানীরা অবশ্য আশা করছেন আমাদের গ্যালাক্সীতে খুব শীঘ্রই কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পাওয়া যাবে।

তবু তাত্ত্বিক দিক থেকে ধরা যাক, কোনও মহাকাশচারী অনেক বাধা অতিক্রম করে একটি কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে ঘুরতে সমর্থ হল এবং তা কৃষ্ণগহ্বরের বহিঃপৃষ্ঠের এত কাছে যে সেখানে পৃথিবীর তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগ হারে ঘড়ি চলে। ফলে, মহাকাশচারীর এক ঘণ্টা সময় কাটলে পৃথিবীতে এক হজার ঘণ্টা কেটে যাবে। মহাকাশচারীর দৈনিক সংবাদ তিন বছরে একবার পৃথিবীতে আসবে। তার পাঠানো শুভ কামনা রেকর্ড করতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লেগে যাবে। সে যদি টেলিভিশনে ছবি পাঠায় তাতে দেখা যাবে তার চোখের পলক পড়তেই বহু সময় লাগছে। মহাকাশচারী কিন্তু দেখবে তার সব কিছুই স্বাভাবিক, হৃদযন্ত্রের গতিও ঠিকঠাক চলচে। সে তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই খবর পাবে যে তার বন্ধুরা সব মৃত। তার এক বছর পরে পৃথিবীতে ফিরলে সে দেখবে পৃথিবীতে এক হাজার বছর কেটে গেছে। আবার কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে পরিক্রমারত ওই মহাকাশচারী পৃথিবীতে অবস্থিত কোনও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে পাঠানো আলোক-সংকেতগুলো তার কাছে খুব দ্রুত আসছে মনে করবে। সে দেখবে ওই সব আলোক সংকেত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে প্রভূত পরিমাণে নীলের দিকে সরে গেছে। বেতারের তরঙ্গ অনেক বেশি উচ্চ কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট বলে তার মনে হবে। তাদের বুঝতে হলে তরঙ্গগুলিকে রেকর্ড করে পরে ধীর গতিতে চালাতে হবে। কিন্তু যে তথ্য তারা বহন করবে তা অনেক দ্রুত গতিতে মহাকাশচারীর কাছে আসবে। মহাকাশচারী তার দেড় মিনিট অন্তর পৃথিবী থেকে পাঠানো দৈনিক বার্তাগুলি পেতে থাকবে। এক সপ্তাহে প্রায় পাঁচবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান দেখতে পাবে। ওই মহাকাশচারী যদি ওই মহাকাশযানে সারা জীবন কাটায় এবং 80 বছর বয়সে মৃত্যুলাভ করে তবে তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি 80 বছরের জীবনে পৃথিবীতে 80,000 বছর কেটে যাবে।

সময়ের ব্যাখ্যায় হকিং সাহেব তাঁর আধুনিকতম মতবাদের তিন ধরনের সময়ের উল্লেখ করেছে। কাল্পনিক সময় (Imaginary Time) অতীত-ভবিষ্যত বর্জিত। তাকে বাদ দিলে বাস্তব সময়ের (Real Time) দিক নির্দেশ তিনটি সময়-তীর (Arrow of Time) সূচিত করে। সময়-তীয় হল সেই দিক নির্দেশ যা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে এবং সময়কে সম্মুখাভিমুখী বলে। "Something that distinguishes the past from the future, giving a direction to time."

তিন রকমের সময়-তীরের একটি হল 'তাপগতিতত্ত্বীয় সময় তীর' (Thermodynamic Arrow of Time), দ্বিতীয়টি হল 'মনোবৈজ্ঞানিক সময়-তীর' (Psychological Arrow of Time) এবং তৃতীয়টি হল 'বিশ্বতত্ত্বীয়-সময় তীর' (Cosmological Arrow of Time)। তাপগতিতত্ত্বীয় সময়-তীর সেই দিক নির্দেশ করে যে দিকে বিশৃঙ্খলা (Disorder) কিংবা অব্যবহারযোগ্য শক্তি (Entropy)-র বৃদ্ধি ঘটে। মনোবৈজ্ঞানিক সময়-তীর বলে আমরা অতীতকে স্মরণ করতে পারি ভবিষ্যতকে নয় এবং অনুভব করি সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলেছে। এরপর বিশ্বতত্ত্বীয় সময়-তীর। এই সময়-তীর এই নির্দেশ দেয় যে, বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে সঙ্কুচিত হচ্ছে না।

ধরা যাক, একটা গ্লাস টেবিলের উপর ছিল, মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। টেবিলের অক্ষত গ্লাসটির মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হওয়া অবধি কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল। এই সময়ের দিক-নির্দেশ দিচ্ছে তাপগতিতত্ত্বীয় সময়-তীর এবং মনোবৈজ্ঞানিক সময়-তীর—এরা উভয়েই একই দিক নির্দেশ করছে। একদিকে যেমন শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে, তেমনি সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলে যাচ্ছে। এই দিকের নির্দেশ বিশ্বতত্ত্বীয় সময়-তীরের ক্ষেত্রে বিশ্বের সম্প্রসারণের দিক নির্দেশ করছে। এখন বিশ্ব যদি সঙ্কুচিত হতে শুরু করে তবে কি বিশ্বতত্ত্বীয় সময়-তীর বিপরীতমুখী দিক নির্দেশ করবে? তখন কি মানুষের স্মরণে ভবিষ্যত আগে আসবে এবং সময় অতীতের দিকে চলমান হবে? ভাঙ্গা গ্লাস জোড়া লেগে কি বিপরীত-মুখী গতিতে আবার টেবিলের উপর অবস্থান করবে? হকিং সাহেবও এক সময় এমনটা হবে ভেবেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

"The collapse of star to form a black hole is rather like the later stages of the collapse of the whole universe. So if disorder were to decrease in the contracting phase of universe, one might also expect it to decrease inside a black hole. So perhaps an astronaut who fell into a black-hole would be able to make money at roulette by remembering where the ball went before he placed his bet."

তিনি ভেবেছিলেন, ক্রম-সংকোচন অবস্থায় বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ কমতে থাকবে। পরে অবশ্য তিনি দেখিয়েছেন, তাপগতিত্ত্বীয় সময়-তীর এবং বিশ্বতত্ত্বীয় সময়-তীর বর্তমানে যে দিক নির্দেশ করছে তাতে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবনের অস্তিত্ব তাতেই বজায় থাকছে। এই দুই সময়-তীর একই দিক নির্দেশ করছে বলেই বুদ্ধিমান জীবেরা বিশ্বে বর্তমান আছে। সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে, তা কিন্তু নয়। বিশৃঙ্খলা বাড়ছে বিশ্বের সীমা (Boundary) নেই বলেই এবং ঠিক সেই কারণেই বুদ্ধিমান জীবেরা বিশ্বে রয়েছে এবং তা আছে বিশ্বের এই সম্প্রসারণশীল অবস্থাতেই। হকিং সাহেবের মতে,

I have shown that the psychological arrow is esentially the same as the thermodynamic arrow, so that the two would always point in the same direction. The no-boundary proposal for the universe predicts the existence of a well defined thermodynamic arrow of time because the universe must start off in a smooth and ordered state. And the reason we observe this thermodynamic arrow to agree with the cosmological arrow is that intelligent beings can exist only in the expanding phase. The contracting phase will be unsuitable because it has no strong thermodynamic arrow of time."

বিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সময়। বিশ্বতত্ত্ব আজ সময়-তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে, বিশ্ব-সৃষ্টি-রহস্যের সঠিক সমাধান না হলে সময় সমস্যার সমাধানও অসম্ভব। কাল্পনিক-সময় সত্যি সত্যিই কোথাও আছে কিনা তা আজও গবেষণার বিষয়, আবিষ্কারের বিষয়। অঙ্কের প্রমাণই সব নয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াণ্টামবাদের মিলনই একদিন হয়ত এই বিজ্ঞান-রহস্যের সঠিক সমাধান করতে পারবে এবং তখন কাল্পনিক সময় ও বাস্তব সময় সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে।

মহাকাশ-সময়-সন্ততির আবিষ্কারক হলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। 1905 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর অতিবিখ্যাত বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ উপস্থাপনা করলেন। এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মহাকাশ বা দেশ [Space] অনন্ত, অন্যগত বা পরনির্ভরশীল নয়। মহাকাশের কাঠামো স্থির। তার সাপেক্ষে কোন বস্তুর পরমবেগ [Absolute Velocity] বের করা যায়। আবার লোরেনৎসের তত্ত্বে পাওয়া গেল চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য সংকোচন, কাল প্রসরণ [Time Dilation] এবং আলোর

অপরিবর্তনীয় বেগ। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে এগুলিকে রাখলেন এবং এতাবৎ চলে আসা মহাকাশ সম্পর্কে ধ্যানধারণার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটিয়ে আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন, বস্তুহীন মহাকাশের কোনও অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে তাই মহাকাশ [Space] আছে। তাঁর প্রায় 200 বছর আগে জার্মান গণিতবিদ দার্শনিক লাইব্‌নিজ [Gottfried Wilhelm Leibniz] মহাকাশ সম্বন্ধে এমন ধারণা দিয়ে বলেছিলেন, "Space is the order or relation of things among themselve, without things occupying it it is nothing." মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতর বিন্যাস। মহাকাশে বস্তুগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছু নয়।

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম স্বীকার্যে বলেছিলেন, 'সমতুল্যতার নীতি' [Principle of Equivalence]। তাঁর দ্বিতীয় স্বীকার্য বলেছিল, বিশ্বের সর্বত্র আলোর গতিবেগ একই এবং এই গতিবেগ সর্বোচ্চও বটে। সুতরাং প্রথম স্বীকার্য বলেছে, কোন একটি নিখুঁত জাড্যগুণ সম্পন্ন মাধ্যমে [Perfect Intertial System] পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে, এই মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে [Uniform Velocity] চলমান যে কোন অনুরূপ মাধ্যমেই এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অকাট্য হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ অপরিবর্তনীয়, উৎস বা পর্যবেক্ষকের বেগের উপর তা নির্ভরশীল নয়। বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগ একই মানের—এই অনুসিদ্ধান্তটি [Hypothesis] আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূলভিত্তি।

দেশকালের বা মহাকাশ-সময়ের প্রতিসাম্যের [Space-time-symmetry] বিশ্বজনীনতার দিক থেকে এই মতবাদের মূল্য অসাধারণ। আইনস্টাইনের এই মতবাদ প্রযুক্ত হবে পরস্পরের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে চলন্ত মাধ্যমগুলিতে। তাই এই মতবাদকে বলা হয় 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ।' সময় ও মহাকাশকে কখনও আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না, বলতে হবে দেশকাল-সন্ততি বা মহাকাশ-সময়-সন্ততি [Space-time-continuum]। আপেক্ষিকতাবাদে বস্তুর চেয়ে ঘটনার প্রাধান্য বেশি। আর ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় চারটি স্থানাঙ্ক [Co-ordinate] সম্বলিত বিন্দুর দ্বারা—অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা এবং সময়। অর্থাৎ জাগতিক বিন্দুসমূহ হলো চারমাত্রিক [Four Dimensional], যা আইনস্টাইনের আগে তিন-মাত্রিক বলে ধরা হত। চতুর্থ মাত্রাটি হল সময় বা কাল [Time],

আইনস্টাইন বললেন, সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। চোখ না থকলে যেমন রঙ থাকে না তেমনি ঘটনা না থাকলে সময় থাকে না। সময় অপরিবর্তনীয় নয়, বিশ্বের যে জিনিষটি অপরিবর্তনীয় তা হলো আলোর বেগ। বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগ সমান এবং কোনও বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারবে না। আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র সমানই শুধু নয় এই বেগ সর্বোচ্চ বেগ। শুধু তাই নয়, আলোর বেগ পর্যবেক্ষকের গতির উপরও নির্ভরশীল নয়। এই বেগ ধ্রুবক। সারা বিশ্বের সর্বত্রই কাঁটায় কাঁটায় এক।

সময় বা কাল সম্পর্কে তিনি আরও বললেন, 'এখন' [Now], 'যুগপত্তা' [Simultaneity] বলে কিছু নেই। একটা নক্ষত্রকে দূরবীনে হয়ত 'এখন' দেখা গেল। কিন্তু ওটাই তারাটির এখনকার অবস্থা নয়। যদি মনে করি, ওই তারাটির থেকে আলোর আসতে পঞ্চাশ বছর সময় লাগে তবে এখন যা দেখলাম তা ওই তারাটির পঞ্চাশ বছর আগের অবস্থা। আজকে যদি তারাটি ধ্বংস হয়ে থাকে, তবে

আজ থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পরে জানা যাবে যে তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর ধরে তারাটিকে আমরা একইভাবে দেখবো।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন সময় সম্পর্কে যে ধারণা দিলেন তাতে জানা গেল সময় আপেক্ষিক এবং ঘটনা ঘটছে বলেই সময় আছে, ঘটনা না থাকলে সময় বলে কিছু নেই। সময় অনন্ত বা অনন্যগতও নয়, সময় আপেক্ষিক। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোন বস্তুই আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন হবে না বা হতে পারে না। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার [3×10^5 কিমি/সেকেন্ড]। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনও বস্তুতে তিনটি ঘটনা ঘটবে। বস্তুর দৈর্ঘ্য-সংকোচন ঘটবে গতির অভিমুখে, দ্বিতীয়তঃ তার ভর [Mass] বৃদ্ধি ঘটবে এবং সর্বোপরি ওই বস্তুর সঙ্গে কোনও ঘড়ি যুক্ত থাকলে সেই ঘড়ি [Slow] চলবে। এই তিনটি ঘটনা যে আনুপাতিক হারে ঘটবে তা হল ঃ

$$r=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে, r = আনুপাতিক হার
v = বস্তুটির গতিবেগ
c = আলোর গতিবেগ

মনে করা যাক, v = 1/7c, অর্থাৎ বস্তুটির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সাত ভাগের এক ভাগ বা এক সপ্তমাংশ। তখন,

$$r=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{7}\right)^2 c^2/c^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{49}}}=1.01$$

অর্থাৎ আলোর গতিবেগের এক সপ্তমাংশ গতিতে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ভর 1% বৃদ্ধি পাবে, ওই গতিশীল বস্তুটির দৈর্ঘ্য ছোট হবে 1%। বস্তুটির সঙ্গে সংযুক্ত ঘড়িটি গতিশীল অবস্থায় 1% 'স্লো' চলবে। এ সবই ঘটবে বস্তুটির গতিশীল অবস্থায়। আলোয় গতিবেগের সাত ভাগের এক ভাগ গতিতে চললে কোনও বস্তুর পৃথিবী ঘুরে আসতে সময় লাগে এক সেকেন্ড। এই গতিতে সময় স্লো হবে 1% মাত্র। আর এই গতিবেগ দ্বিগুণ হলে [v = 2/7c], এই অনুপাত দাঁড়াবে 1.04, অর্থাৎ সময় ধীরে চলবে 4% হারে। তেমনি v=6/7c হলে, r হবে 2 অর্থাৎ সময়ের গতি অর্ধেক হয়ে যাবে ওই গতিশীল বস্তুতে। পৃথিবীতে কোন সময়ের পরিমাণ এক ঘণ্টা হলে পৃথিবীর আপেক্ষিকে কোনও গতিশীল বস্তুতে, যার গতিবেগ আলোর গতির 6/7 ভাগ, সময়ের মাপ হবে আধঘণ্টা। আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল বস্তুতে সময় ধীরে চলবে এবং তা হবে মোটামুটি এই রকম অনুপাতে ঃ

v = 0.995c হলে r =10
v = 0.99995c হলে r = 100
v = 0.9999995c হলে r = 1000
v = 0.999999995c হলে r = 10,000

সহজ কথায়, কোন মহাকাশযাত্রীর মহাকাশযানের গতি 0.9999995c হলে অর্থাৎ আলোর গতিবেগের 99.99995% হলে, মহাকাশযাত্রীর ঘড়িতে এক বছর অতিক্রান্ত হলে এই পৃথিবীতে সেই সময়ে 1000 বছর অতিক্রান্ত হবে। ওই মহাকাশযাত্রীর এক বছর হবে পার্থিব এক হাজার বছরের সমান। গতিশীল মহাকাশযানের পর্যবেক্ষক দেখবেন পৃথিবীতে ঘড়ি অত্যন্ত দ্রুত চলছে। আর পৃথিবীর পর্যবেক্ষক দেখবেন মহাকাশযানের ঘড়ি খুব ধীরে চলছে। ওই মহাকাশযাত্রী তাঁর ঘড়ির এক বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবেন তাঁর যাত্রার সময় থেকে পৃথিবীতে এক হাজার বছর কেটে গেছে। সব বদলে গেছে পৃথিবীর, কিন্তু মহাকাশযাত্রীর পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই। কারণ তাঁর সময় কেটেছে মাত্র এক বছর।

যাইহোক, সময়ের বা কালের গতি শ্লথ হতে পারে, এটা এখন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-র মত সত্য। কিন্তু তাকে বিপরীতমুখী করে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে নিয়ে যাওয়া আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে অসম্ভব। এটা আমাদের ধারণারও পরিপন্থী। সময় সাধারণতঃ অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যায় বলে আমরা ধারণা করি। তবু এমন কি কিছু সত্যিই করা সম্ভব যার ফলে সময় ভবিষ্যত থেকে বর্তমান পেরিয়ে অতীতে পাড়ি জমাতে পারবে? আগেই বলা হয়েছে, পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং এখনও করছেন।

আবার অনুপাতের ওই অঙ্কটির দিকে চোখ ফেরানো যাক। ওখানে $v = c$ হলে ওই 'r' হয়ে যাবে অসীম (Infinity)। অর্থাৎ কোনও বস্তুর গতি আলোর গতিবেগের সমান হলে তার ভর হবে অসীম, তার দৈর্ঘ্য সংকুচিত হবে অসীম অনুপাতে এবং সেই বস্তুতে ঘড়িও চলবে অসীম ধীর গতিতে। এটা অসম্ভব। বাস্তবে আলোর সমান গতিবেগ কারুরই হয় না। আবার $v>c$ হলে 'r' হবে একটি কাল্পনিক রাশি' [Imaginary Quantity)। কারণ, $[1-v^2/c^2]$ হবে ঋণাত্মক এবং $\sqrt{1-v^2/c^2}$ হবে কাল্পনিক রাশি। অতএব, আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ কোনও বস্তুরই হতে পারে না, অন্ততঃ আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে তা অসম্ভব।

আপেক্ষিকতাবাদে সময় সংক্রান্ত সমীকরণটি হল ঃ

$$T = t \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

যেখানে, T = পৃথিবীর আপেক্ষিকে v গতিতে চলমান মাধ্যমে ঘড়িতে সময়,
t = পার্থিব ঘড়িতে সময়,
v = পৃথিবীর আপেক্ষিক কোন মাধ্যমের গতিবেগ,
c = আলোর গতিবেগ [3,00,000 কিমি প্রতি সেকেন্ডে]

এখানে, $v = c$ হলে T হবে '0' অর্থাৎ কোনও মাধ্যমের গতি আলোর সমান হলে সেই মাধ্যমের শূন্য সময় পৃথিবীতে অনন্ত সময়ের সমান হবে, কারণ $t = T/0 = \alpha$ [Infinity]। আবার ওই মাধ্যমের গতিবেগ আলোর গতিবেগের বেশি হলে [$v>c$], T- এর মান হবে ঋণাত্মক। তখন $\sqrt{1-v^2/c^2}$ হবে একটা কাল্পনিক রাশি। সুতরাং আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে বা ধারণায় আলোর সমান বা আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ কোনও পদার্থের হওয়া সম্ভব নয়।

আগেই বলেছি, ইদানীং বিজ্ঞানীরা অবশ্য অঙ্কের সাহায্যে আইনস্টাইনীয় ভরের একটা প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। এই কণাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যাকিয়ন' [Tachyon]। ট্যাকিয়ন কণা আলোর

চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন। অঙ্ক কষে এ কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও বাস্তবে এর অস্তিত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কারণ এই কণার গতি আলোর গতির সমান কিংবা তার চেয়ে কম হলে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। শুধু ধারণা নয় অঙ্কের সাহায্যে তা প্রমাণ করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একদল পদার্থবিজ্ঞানী এই তত্ত্বের প্রতিবাদ করে বললেন, আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন কোনও কণা বা কোনকিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু আরেকদল পদার্থবিজ্ঞানী জোর গলায় বললেন, আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগসম্পন্ন কণা থাকতেই হবে। তার প্রমাণও তাঁরা দিয়েছেন অঙ্কের সাহায্যে। আপেক্ষিকতাবাদ বলছে, কোনও পদার্থ আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন হতে পারে না। যদি কোনও কণা আলোর গতির কাছাকাছি এসে পৌঁছায় তার ভর হবে অতি বিশাল, তখন সেই কণা আলোর গতির নাগালও ধরতে পারে না, পারে না সেই সীমানা টপকাতে। জেনিভার কাছে 'সের্ণ'-এ [CERN] যে বিশেষ ধরনের কণা-ত্বরায়ক 'সিংক্রোট্রন' [Syncrotron] আছে তাতে মৌলিক কণাগুলিকে আলোর গতির শতকরা 99.5 ভাগের সমান গতিবেগে ইতিমধ্যে ত্বরান্বিত করে দেখা গেছে তাদের ভর আনুপাতিক হারে বাড়ে নি। আগের সূত্রানুসারে দশগুণও হয়নি। উীটমার কির্থ তাই মৌলিক কণাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন ট্যাকিয়নকে মেনে নিয়েই। কিন্তু 'ট্যাকিয়ন তত্ত্ব' এখনও সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি।

যাইহোক, দেশ ও কাল বা মহাকাশ ও সময়কে আলাদা আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে সময় ও মহাকাশকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বলা হল মহাকাশ-সময়-সন্তুতি বা দেশ-কাল-সন্তুতি। আবারো বলি, আপেক্ষিকতাবাদে বস্তুর চেয়ে ঘটনার প্রাধান্য বেশি। আর ঘটনা প্রকাশিত হয় চারটি স্থানাঙ্ক [Co-ordinate] সম্বলিত বিন্দুর দ্বারা, যেমন ঃ অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা এবং সময়। অর্থাৎ জাগতিক বিন্দুসমূহ চার-মাত্রিক [Four dimensional], যা আইনস্টাইনের আগে তিনমাত্রিক বলে ধরা হত। চতুর্থ মাত্রাটি হল সময় বা কাল। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বেরিয়ে এল সময়ের শ্লথগতি [Time dilation], যা অঙ্কের সূত্রে দাঁড়ায়,

$$T^1 = T\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

যেখানে 'T^1' হলো চলন্ত মাধ্যমে সময়ের মান, 'T' পৃথিবীতে অবস্থিত একটি ঘড়িতে সেই সময়ের মান, 'v' হল মাধ্যমের গতিবেগ এবং 'c' হলো আলোর বেগ। অর্থাৎ পৃথিবীর পর্যবেক্ষক দেখবেন চলন্ত মাধ্যমে ঘড়ি শ্লথ গতিতে বা ধীরে চলছে, আবার চলন্ত মাধ্যমের পর্যবেক্ষক দেখবেন পৃথিবীর ঘড়ি দ্রুত চলছে।

মহাকাশ ও সময় এইভাবে হয়ে গেল আপেক্ষিক, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদই নিয়ে এল মহাকাশ-সময়-সন্তুতির বাস্তব ধারণা।

সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে সময় বা কাল ও মহাকাশকে বা দেশকে জুড়ে দিয়ে বলা হল মহাকাশ-সময়-সন্তুতি বা দেশ-কাল-সন্তুতি, সমস্ত ঘটনা হল চতুর্মাত্রিক, শক্তি ও বস্তুর মধ্যে তুল্যতা ও একটির থেকে অন্যটিতে রূপান্তরিত হওয়া প্রমাণিত হল এবং স্বীকৃত হল কাল-প্রসরণ [Time Dilation]। এই সব তত্ত্ব ও সূত্র পুরানো ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়ে বিজ্ঞানকে বহুকাল এগিয়ে দিল। বিশ্ব-বিজ্ঞানে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব তাই সীমাহীন। আবার মহাকাশ-সময়-সন্তুতির ধারণাও

একক অনন্য বাস্তবতা। মিনকৌস্কির ভাষায়, "মহাকাশ ও সময় পৃথকভাবে কিছুই নয় এবং অবিচ্ছিন্নতাই বাস্তব সত্য।"

'সন্ততি' শব্দটি 'Continuum' শব্দটির বাংলা পরিভাষা। আইনস্টাইনের 'Space time continuum'-এর বাংলা রূপ হলে 'দেশ-কাল-সন্ততি' বা 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি'। বাংলায় 'সন্ততি' যেমন 'সন্তান', 'অপত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি এর অন্যান্য অর্থ হল, 'ব্যাপ্তি', 'বিস্তার', 'অবিচ্ছেদ' ইত্যাদি। মহাকাশ ও সময়ের অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতেই 'সন্ততি' শব্দের প্রয়োগটা যথোপযুক্ত হয়েছে। এই বিশ্বের বাস্তব রূপই হল মহাকাশ-সময়ের অবিচ্ছিন্নতা—মহাকাশ-সময়-সন্ততি।

'Continuum' শব্দের অর্থ করা হয়েছে "(i) A total that is continuous and uninterrupted; (ii) That which has perfect continuity, the continuum of space; (iii) A basic, common character underlying a series or aggregation of indefinite variations; (iv) A set of numbers or points such that between any two of them a third may be interpolated." [Webster Comprehensive Dictionary].

বাংলায় সন্ততি-র মধ্যে যে অবিচ্ছিন্নতার ভাব রয়েছে ইংরেজীর Continuum-এ ততটা নেই। 'Continuous and uninterrupted' শব্দগুলি যতটা অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে পারে Continuum-এ ততটাই বোঝানো হয়েছে। সন্ততি-তে অবিচ্ছিন্নতা যেন অনেক বেশি গভীর। এক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দটি মহাকাশ ও সময়ের প্রকৃত অবিচ্ছিন্নতার যেন অনেকটাই কাছাকাছি। মহাকাশ ও সময়ের অবিচ্ছিন্ন সত্তাই 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি'।

শুধু বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদেই নয়, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদেও আইনস্টাইন ব্যবহার করেছেন 'মহাকাশ-সময়-সন্ততি'-কে প্রাকৃতিক বাস্তবতা মেনে নিয়ে। তাঁর মতে মহাকাশ সমস্ত বস্তু ধারণকারী অনমনীয় [Reigid] এবং পরিবর্তনাতীত [Immutable] কাঠামো নয়, পরন্তু মহাকাশ বা দেশ, সময় বা কাল যে দুটিকে অনন্যগত [Independent] বলে মনে করা হত, সে দুটি অবিচ্ছিন্ন। এই মহাকাশ-সময়-সন্ততির কোন নির্দিষ্ট আকার নেই, এটি নমনীয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্তনশীল। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বই এই সন্ততিকে নুইয়ে দেয় [Bends], বিকৃত করে [Distorts] এবং বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি হবে, ততই ওই সন্ততির নুইয়ে পড়া এবং বিকৃতি দুই-ই বেশি হবে। প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব বা বেগ অনুযায়ী, যার গঠন হল এবড়োখেবড়ো, উঁচুনীচু আলদেওয়া জমির মতো। মহাকাশের যেকোনও স্থানে ও যেকোনও সময়ে ওই ক্ষেত্রের শক্তি [Field Strength] জানা যায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের দ্বারা। সবানের কণা যেমন সাবানের বুদবুদ তৈরি করে, এই বিশ্বের বুদবুদ তেমনি তৈরি হয়েছে শূন্য মহাকাশের সঙ্গে শূন্য সময়কে ঝালাই করে [Weld]

সময় এখন হয়ে গেছে চতুর্থ মাত্রা [Fourth Dimension]। সময় এখন অনন্যগত নয়, অর্থাৎ সময় এখন অন্যগত, অন্যের উপর নির্ভরশীল। সময় এখন আপেক্ষিক। আবারো বলি, বস্তুহীন মহাকাশের বা দেশের কোনো অস্তিত্বই নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। সময় বা কাল অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। চোখ না থাকলে যেমন রঙ থাকে না তেমনি ঘটনা না থাকলে সময় থাকে না। সময় বা কাল অপরিবর্তনীয় নয়, বিশ্বের যে জিনিষটি অপরিবর্তনীয় তা হল আলোর বেগ। বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগ সমান এবং কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারবে না। আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র সমানই শুধু নয় এই বেগ

সর্বোচ্চ বেগ। শুধু তাই নয়। আলোর বেগ পর্যবেক্ষকের গতির উপরও নির্ভরশীল নয়। শূন্যে আলোর বেগ ধ্রুবক এবং তা সর্বোচ্চ।

এইভাবে সময় হয়েছে আপেক্ষিক। বস্তু না থাকলে মহাকাশ নেই। আবার সময় অনন্য কিছু নয়। কিন্তু মহাকাশ-সময়-সন্ততি একটি বাস্তব সত্তা। এই মহাবিশ্বের একটি গুণ হল এই সন্ততি। মহাবিশ্ব তৈরিই হয়েছে মহাকাশ বা দেশের সঙ্গে কাল বা সময়ের মহা সমন্বয়ে। সময়ের আপেক্ষিকতার কথা বলা শেষ করি একটা উদাহরণ দিয়ে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের এটাই মূল বক্তব্য।

ধরা যাক, একটা বিমান প্রচণ্ড বেগে উড়ে চলেছে। বিমানের কেবিনে যথারীতি যাত্রীরা রয়েছে। মনে করা যাক, কেবিনের একেবারে মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা ফ্ল্যাশ করা হল। এই ফ্ল্যাশের আলো কেবিনের সামনের এবং পিছনের যাত্রীরা একই সময়ে দেখবে যেহেতু আলো এই কেবিনের মধ্যে চতুর্দিকে সমান গতিবেগে গতিশীল। কিন্তু পৃথিবীর থেকে কোনও দর্শক যদি বিমানের কেবিনের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে তবে দেখতে পাবে, কেবিনের সামনের যাত্রীরা কেবিনের পিছন দিকের যাত্রীদের তুলনায় কিছুটা পরেই ওই ফ্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছে। কেবিনের পিছন দিকের যাত্রীরা যেহেতু ফ্ল্যাশের দিকে অগ্রসরমান তারা আগে ওই ফ্ল্যাশ দেখবে এবং কেবিনের সামনের যাত্রীরা যেহেতু ওই ফ্ল্যাশের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অতএব তারা ওই ফ্ল্যাশের আলো কিছুটা পরেই দেখবে। অর্থাৎ কেবিনের মধ্যে দর্শকদের কাছে ওই ফ্ল্যাশের আলো দেখাটা 'যুগপৎ' হলেও, পৃথিবীর দর্শকের কাছে যাত্রীদের আলো দেখাটা যুগপৎ হবে না। কেবিনের পিছনের যাত্রীরা ফ্ল্যাশের আলো আগে দেখবে এবং কেবিনের সামনের যাত্রীরা সেই ফ্লাশের আলো দেখবে কিছুটা পরে। সুতরাং দর্শকের গতিবেগের উপর নির্ভর করে ঘটনার 'যুগপত্তা' কিংবা 'আগে' অথবা 'পরে'। এইভাবে সময় হয়েছে আপেক্ষিক। এই সময়ের সঙ্গে মহকাশকে ঝালাই করেই গড়ে উঠেছে মহাকাশ-সময়-সন্ততি। এই সন্ততিই মহাবিশ্বের বাস্তব স্বরূপ—মহাবিশ্বের বাস্তবতা। ●

দশম পরিচ্ছেদ

মহাকালের আদ্যন্ত

[সময় জিনিষটা কি? বিজ্ঞান বলছে সময় আপেক্ষিক একটি বাস্তব সত্তা। আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে সময়ের বিপ্রতীপ গতি অসম্ভব। মহাবিস্ফোরণ থেকে সময়ের চলা শুরু। কিন্তু আমরা জানিনা, জানতে পারবোও না মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে প্ল্যাঙ্ক যুগ (10^{-43} সেকেন্ড) অবধি কী ঘটেছিল! সৃষ্টির আদিতে বিশৃঙ্খলা ছিল, এখন কি তার শৃঙ্খলা আসছে? বিশ্ব কি চির অস্থির? প্রসারণ-সংকোচন নিয়েই কি এই বিশ্ব, না বিশ্ব চিরসম্প্রসারণশীল? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও বিজ্ঞানের অজানা। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি বিশ্বের তৃতীয় এক অবস্থার কথা বলে। চিরসম্প্রসারণশীল বিশ্বে সময়ের আদি পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্ত পাওয়া যাবে না। 10^{100} বছর পরেও এক শীতল অন্ধকার বিশ্ব থাকবে, যেখানে থাকবে রাশি রাশি ফোটন এবং দু'তিনটি মাত্র মৌলিক কণা।]

সময় বা কাল নিয়ে সভ্যতার অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। আগেই এ সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রায় সোয়া তিনশো বছর আগে নিউটন বললেন, মহাকাশ বা দেশের মত কাল বা সময় এক নিরপেক্ষ সত্তা। এরা সবাই গণিতের নিয়ম মেনে চলে। কাল বাইরের কোনও প্রভাব ছাড়াই নিরপেক্ষভাবে সতত চলমান। নিউটনের আগের দার্শনিকদের যুক্তিতে কালকে ধরা হত অবাস্তব, পদার্থের বর্ণের মত একটা সত্তা। নিউটন একে বাস্তব সত্তা বলায় তাঁর সিদ্ধান্ত তাঁর পুর্বসুরিদের বিরুদ্ধে যায়। নিউটনই একালে প্রথম বললেন, সময় একটি নিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা।

দার্শনিক লুক্রেটিয়াস বলতেন, কালের নিজস্ব সত্তা নেই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে পৃথক করেই কালের চেতনা ধরা পড়ে। নিউটনের সমসাময়িক প্রতিভাধর গাণিতিক তথা দার্শনিক লাইব্‌নিজ বলেন, পদার্থ বা বস্তু ছাড়া কালের ধারণা করা নিতান্তই একটা ফাঁকা বা শূন্য ব্যাপার মাত্র। আইনস্টাইন সময়কে একটা মাত্রা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে। এই সময় বা কালের ধর্ম হল যে, সে শুধু একদিকে প্রবাহিত হতে পারে। আমরা কালের স্রোতকে একমুখী বলি। অর্থাৎ সে ভবিষ্যতের দিকেই চলে। এডিংটন এই একমুখীনতার ধর্মকে বলেছেন কালের শর বা সময়ের তীর [Arrow of Time]। একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, দেশ বা মহাকাশ যখন তিন মাত্রাবিশিষ্ট সেখানে কাল একমুখী কেন? কাল কি পেছনে ফিরতে পারে? কাল বা সময় কি অনপনেয় [Irreversible]? এগুলির উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে মহাবিশ্বের আদিলগ্নের আলোচনায়।

সময়ের বিপরীতমুখী গতি হল 'সময় উৎক্রমণ' [Time Reversal]। সময় বা কালের একমুখীনতাকে বিপরীতমুখী বা বিপরীতগামী করার ঘটনা হল 'Time Reversal'। সময় সাধারণতঃ অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যায় বলে আমরা ধারণা করি। এমন কি কিছু করা বা হওয়া সম্ভব যার ফলে কাল ভবিষ্যত থেকে বর্তমান পেরিয়ে অতীতে পাড়ি জমাতে পারবে। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা চলছে। সময়ের এই বিপ্রতীপ গতির কথা কোন কোনও তত্ত্বে মেনে নেওয়াও হচ্ছে। কালের পিছু হাঁটা এখন তেমন অবাস্তব কিছু বলে মনে করেন না বিজ্ঞানীদের একটি দল। একদল পদার্থবিজ্ঞানী অবশ্য দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতি সময়ের অভিমুখ নিরপেক্ষ [Nature is indifferent to the direction of time]। পদার্থবিজ্ঞানের যে কোনও মূল সূত্রে **t**-এর জায়গায় '**–t**' বসালেও ওই সূত্র এমন কোনও ঘটনা নির্দেশ করে না যা প্রকৃতিতে ঘটা অসম্ভব। এই সব বিজ্ঞানীদের মতে, **t** বা কাল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাইহোক না কেন প্রকৃতিতে বা সারা বিশ্বে মূলসূত্রগুলি বা নিয়মগুলি একই থাকবে। এঁদের মতে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে সময় যেতে পারে না। সময়ের গতিশীলতা ভবিষ্যতমুখী। তবে কোনও ক্ষেত্রে তা দ্রুত আবার কোনও ক্ষেত্রে তা ধীর। এই দলে পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানী এখনও আছেন। সুতরাং বর্তমান পৃথিবীর বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর মত হল সময়ের বিপ্রতীপগতি সম্ভব নয় এবং তা অবাস্তব।

আইনস্টাইনীয় পরিকাঠামোয় সময় ধারণার কথা নবম পরিচ্ছেদে কিছুটা বলা হয়েছে। তারই একটু পুনরাবৃত্তিতে আসা যাক। আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে সময় সম্পর্কে যে ধারণা দিলেন তাতে সময় হল আপেক্ষিক এবং ঘটনা ঘটছে বলে সময় আছে, ঘটনা না থাকলে সময় বলে কিছু নেই। আলোর গতিবেগই সর্বোচ্চ বেগ। কোনও বস্তুই আলোর সমান বা আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগসম্পন্ন হতে পারবে না। গতিবৃদ্ধির সঙ্গে কোনও বস্তুতে তিনটি ঘটনা ঘটিবে ওই গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য সংকোচন ঘটবে গতির অভিমুখে, দ্বিতীয়ত তার ভর বৃদ্ধি ঘটবে এবং সর্বোপরি ওই বস্তুর সঙ্গে কোনও ঘড়ি যুক্ত থাকলে সেই ঘড়ি 'স্লো' [Slow] চলবে ওটির আপেক্ষিকে থাকা স্থির ঘড়ির তুলনায়। এই তিনটি ঘটনা যে হারে ঘটবে তা আগেই আলোচিত হয়েছে, তবুও আর একবার বলি ঃ

$$r = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}}$$

যেখানে, r = আনুপাতিক হার
V = বস্তুটির গতিবেগ
C = আলোর গতিবেগ

মনে করা যাক, $V = \frac{1}{7}C$ অর্থাৎ বস্তুটির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সাত ভাগের একভাগ বা এক সপ্তমাংশ।

তখন, $$r = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{(1/7)^2.C^2}{C^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{49}}} = 1.01$$

অর্থাৎ বস্তুটির ভর গতিশীল অবস্থায় 1% বৃদ্ধি পাবে, বস্তুটির দৈর্ঘ্য ছোট হবে 1% এবং বস্তুটির সঙ্গে সংযুক্ত ঘড়িটির সময়ও গতিশীল অবস্থায় 1% 'স্লো' চলবে। আলোর গতিবেগের সাতভাগের

এক ভাগ গতিতে চললে কোনও বস্তুর পৃথিবী ঘুরে আসতে সময় লাগবে প্রায় এক সেকেন্ড। এই গতিতে সময় 'স্লো' হবে মাত্র 1%। আর এই গতিবেগ দ্বিগুণ করা হলে [V = 2/7C] এই অনুপাত দাঁড়াবে 1.04 অর্থাৎ সময় ধীরে চলবে 4% হারে। তেমনি, [V=6/7C] হলে r =2 হবে, অর্থাৎ সময়ের গতি অর্ধেক হয়ে যাবে। পৃথিবীতে কোনও সময়ের পরিমাণ 1 (এক) ঘণ্টা হলে পৃথিবীর আপেক্ষিকে আলোর গতির 6/7 ভাগ গতিবিশিষ্ট কোনও বস্তুতে সময়র মাপ হবে আধঘণ্টা। গতিবৃদ্ধির সঙ্গে গতিশীল বস্তুতে সময় আরও ধীরে চলবে।

এইভাবে, V = 0.995C হলে, r = 10

V = 0.99995C হলে r = 100

V = 0.9999995C হলে r = 1000 হবে।

অর্থাৎ কোনও মহাকাশযাত্রীর মহাকাশযানের গতি 0.9999995C হলে বা আলোর গতিবেগের 99.99995% গতিবেগ হলে মহাকাশযাত্রীর ঘড়িতে এক বছর অতিক্রান্ত হলে, পৃথিবীতে তখন 1000 বছর অতিক্রান্ত হবে। মহাকাশচারীর এক বছর তখন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান হবে। এরই নাম 'কাল প্রসরণ' [Time Dilation]। মহাকাশযাত্রী তার ঘড়ির একবছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে তার যাত্রার সময় থেকে পৃথিবীতে এক হাজার পার্থিব বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সব বদলে গেছে এই পৃথিবীর, কিন্তু মহাকাশযাত্রীর সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, কারণ তার নিজের সময় কেটেছে মাত্র এক বছর। এইভাবে গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সময়ের গতি শ্লথ হতে পারে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এটা প্রমাণ করেছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটি আজ বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত।

এইভাবে সময়ের গতি শ্লথ হতে পারে, কিন্তু তাকে বিপরীতমুখী করে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে নিয়ে যাওয়া আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে অসম্ভব। কারণ V = C হলে ওই r হবে অসীম। অর্থাৎ কোনও বস্তুর গতি আলোর গতিবেগের সমান হলে তার ভর হবে অসীম, তার দৈর্ঘ্য সংকুচিত হবে অসীম অনুপাতে এবং সেই বস্তুতে ঘড়িও চলবে অসীম ধীর গতিতে। এটা অসম্ভব। বাস্তবে আলোর সমান গতিবেগ কারুরই হয় না। তর্কের খাতিরে V > C ধরে নিলে r হবে একটি কাল্পনিক রাশি।

আর, $\sqrt{1-V^2/C^2}$ হবে একটি কাল্পনিক রাশি। [Imaginary Quantity] । সুতরাং আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ কারও হবে না। এমন কি আলোর সমান গতিবেগও নয়।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সময় সংক্রান্ত সমীকরণ হল :

$$T = t \times \sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}$$

যেখানে, T = পৃথিবীর আপেক্ষিকে V গতিতে চলমান মাধ্যমের ঘড়িতে সময়

t = পার্থিব ঘড়িতে সময়

V = পৃথিবীর আপেক্ষিকে চলমান কোনও মাধ্যমের গতিবেগ

C = আলোর গতিবেগ যা মোটামুটিভাবে 3,00,000 কিলোমিটার/সেকেন্ড।

এখন, V = C হলে T = 0 হবে। আর, $t = T \div \sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}} = \alpha$ [অসীম] হবে। অর্থাৎ কোনও মাধ্যমের গতি আলোর গতির সমান হলে ওই মাধ্যমের 'শূন্য' সময়েই পৃথিবীর ঘড়িতে অসীম সময়

অতিবাহিত হবে। এখানে মাধ্যমের গতিবেগ আলোর গতিবেগের বেশি হলে [V > C], সেই মাধ্যমে T-এর মান হবে ঋণাত্মক এবং $\sqrt{1-V^2/C^2}$ হবে একটা কাল্পনিক রাশি। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদ থেকে 'কাল্পনিক' [Imaginary] কালের ধারণা আমরা পাই না, পাই 'বাস্তব কাল' বা 'বাস্তব সময়' [Real Time]-এর ধারণা।

তবে, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের হাত ধরে 'কাল্পনিক সময়' বা 'কাল্পনিক কাল' পদার্থ বিজ্ঞানে চলে আসে। 1926 সালে শ্রোয়েডিঙ্গার [Erwin Schroedinger] প্রকাশ করেন তাঁর 'তরঙ্গ বলবিদ্যা' [Wave Mechanics]। এই বলবিদ্যায় 'দেশ' বা মহাকাশ সম্পর্কিত তাঁর তরঙ্গ সমীকরণ হল ঃ

$$\nabla^2\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}[E-V]\psi = 0$$

তেমনি তাঁর কাল বা সময় সম্পর্কিত তরঙ্গ সমীকরণ হল ঃ

$$\frac{ih}{2\pi}\cdot\frac{\delta\psi}{\delta t} = \frac{h^2}{8\pi^2 m}\cdot\nabla^2\psi - V\psi$$

এই দুই সমীকরণে, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

m = কণার ভর

E = কণার মোট শক্তি

V = কণার স্থিতিশক্তি

ψ = এইগেন ফাংশন [Eigen Function]। এর অন্য নাম 'তরঙ্গ অপেক্ষক' [Wave Function]। এর মানই ঠিক করে x-অবস্থানে অবস্থিত কণিকাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতা। ψ-কে আমরা Wave Function-ই বলি। তবে এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানে।

t = সময় বা কাল।

∇^2 = Laplacian Operator অর্থাৎ

$$\nabla^2\psi = \frac{\delta^2\psi}{dx^2} + \frac{\delta^2\psi}{dy^2} + \frac{\delta^2\psi}{dz^2}$$

দ্বিতীয় সমীকরণটি যেটি সময়-সম্পর্কিত সেটিতে যোগ হয়েছে 'i' কিন্তু বাদ গেছে E। এখানে t হল কাল বা সময় আর 'i' হল $\sqrt{-1}$, যা একটি কাল্পনিক রাশি। গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় যতরকম 'অবকল সমীকরণ' [Differential Equations] আছে তাদের কোনওটিতে এর আগে 'i' ব্যবহৃত হয় নি। এই প্রথম 'i' এলো পদার্থবিজ্ঞানের অবকল সমীকরণে। কাল্পনিক সময় ধারণার শুরু হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীরা অঙ্কের সাহায্যে আইনস্টাইনীয় ভরের একটা প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এর দেখা পাওয়া যায় নি। এই কণাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যাকিয়ন' [Tachyon]। এরা নাকি আলোর চেয়েও বেশি গতিবেগসম্পন্ন। আলোর গতিবেগে কিংবা আরও কম গতিবেগে এদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। আর আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগে এদের অস্তিত্ব প্রকটিত হয়। এই রকম কণা যদি বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এদের ক্ষেত্রে সময় কি বিপরীতমুখী গতিসম্পন্ন হবে? এদের গতি যত বাড়তে থাকবে সময় কি তত অতীতের দিকে ছুটতে থাকবে? সে এক

অকল্পনীয় অবস্থা হবে যদি সত্যিই ট্যাকিয়ন খুঁজে পাওয়া যায়। তখন ব্যাপারটা অঙ্কের কাল্পনিক সংখ্যা না হয়ে বাস্তবে অদ্ভুত একটা কিছু হবে। কারণ ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে সময় পিছু হঠতে হঠতে বর্তমান যুগ থেকে চলে যাবে মিশরীয় কিংবা হরপ্পা সভ্যতার আমলে। এই রকম পিছিয়ে পিছিয়ে হয়তো আমরা চলে যেতে পারবো সৃষ্টির আদিকালে। ব্যাপারটা কল্পনার হলেও অঙ্কে তা এখন বাস্তব। বাস্তবে ট্যাকিয়ন আজও অমিল, অনাবিষ্কৃত। সময়ের বিপরীত গতি বাস্তবে এখনও অসম্ভব ব্যাপার। আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে এটা সম্ভব নয়। ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে ভবিষ্যতে কোনওদিন এটা সত্যি হলেও হতে পারে। যদি কোনও দিন সম্ভব হয়, তবে তা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা হবে এবং আইনস্টাইনীয় ধারণার বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করবে এবং সময় বা কাল তখন হবে 'অপনেয়' [Reversible]। আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে সময়ের অপনেয়তা সম্ভব নয়। সময় 'অনপনেয়' [Irreversible]। এর বিপরীতমুখী গতি অসম্ভব। সময় সর্বদাই বর্তমান হয়ে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধেয়ে চলবে, কখনই ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে যাবে না আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে। কিন্তু কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানকে আপেক্ষকীয় বলবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একেবারে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা বলছেন, সময় আগে বা পিছনে দু'দিকেই যেতে পারে। তবু কাল যে অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য প্রকাশ করতে পারে তা থেকে আমরা তিনটি কাল-শর বা সময়-তীর পাই।

এক বিশাল বিস্ফোরণ [Big Bang] থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের দেশ ও কাল উৎপন্ন হয়েছে সেই বিস্ফোরণের সময় থেকেই। উৎপত্তি হওয়ার পর থেকে মহাবিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই প্রসারণ শুরু হওয়ার আগে পদার্থ ও শক্তি একত্র ঘনীভূত ছিল। কোন নিয়মমাফিক গতি কোথাও ছিল না যাতে কালের স্রোত প্রবাহিত হতে পারে। প্রথম দিকের মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে প্রসারণের আগে কয়েক মুহূর্ত কেটেছে অথবা কয়েক কোটি বছর কেটেছে তার কোনও প্রমাণ ছিল না। প্রসারণের আগে একটি এবং প্রসারণের পরে যদি দুটি ছবি নেওয়া যেত, তবে দেখা যেত প্রসারণের আগে মহাবিশ্ব ছিল ছন্নছাড়া এলোমেলো অবস্থায়। প্রসারণের পরের ছবি দুটি থেকে দেখা যেত, মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জ ক্রমশঃ পাতলা হচ্ছে। মহাবিশ্বের প্রসারণের পূর্ব-ধারণা থেকে আমরা বলি দ্বিতীয় ছবির পরে তৃতীয় ছবিটি নেওয়া হয়েছে। সময়-তীর বা কালের শর বাইরের দিকে ছুটে চলেছে। কিন্তু প্রসারণের কোনও পূর্ব-ধারণা না থাকলে আমরা এটাও বলতে পারি তৃতীয় ছবিটি দ্বিতীয় ছবির আগের অবস্থা। সেক্ষেত্রে সময় তীরের অভিমুখ ভিতরের দিকে গতিশীল মনে হবে। এমন ভাবনায় ভুলও হয় না। কেবল তখন প্রসারণ মনে না হয়ে মহাবিশ্ব সংকুচিত হচ্ছে মনে হবে। সময়-তীরের অভিমুখ বলছে প্রসারণ কিংবা সংকোচনের কথা।

তাই মহাবিশ্বই হল কালের উৎস। সময় বা কালের যাত্রা শুরু মহাবিশ্বের প্রসারণকাল থেকেই। মহাবিশ্ব চির-সম্প্রসারণশীল হলে সময় বা কাল হবে একমুখী। আবার মহাবিশ্ব বদ্ধ হলে অর্থাৎ মহাবিশ্বের সংকোচন ও প্রসারণ দুটোই থাকলে কাল বিপরীতমুখী হতে পারবে। প্রসারণে কাল যেমন ভবিষ্যৎমুখী, সংকোচনে তেমনি কাল হবে অতীতমুখী। টমাস্ গোল্ডের মতে সংকোচন শুরু হলেই মহাবিশ্বে কাল পিছু হাঁটবে। সুতরাং বদ্ধ মহাবিশ্বে অর্থাৎ যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও সংকোচন দুই-ই আছে তাতে সময় সামনে এবং পিছনে দুই দিকেই যেতে পারে। প্রসারণশীল অবস্থায় কাল ভবিষ্যতের দিকে চলে।

হকিং সাহেবের মতে কাল বা সময় যে অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য প্রকাশ করতে পারে, তা থেকে আমরা তিনটি কাল-শর বা সময়-তীর [Arrow of Time] দেখতে পাই। এই তিনটি কাল-

শরের প্রথমটি হল তাপগতীয় সময়-তীর [Thermodynamic Arrow of Time]। এর অভিমুখে বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ক্রম-বর্ধমান। দ্বিতীয় হল, মনস্তাত্ত্বিক সময়-তীর [Psychological Arrow of Time]। এই শরের অভিমুখ বলে আমরা অতীতকে স্মরণ করতে পারি ভবিষ্যৎকে নয়। তৃতীয় সময়-তীর বা কাল-শর হল, মহাজাগতিক কাল-শর বা সময়-তীর [Cosmological Arrow of Time]। এই সময়-তীরের অভিমুখ মহাবিশ্বের প্রসারণের দিকে, সংকোচনের দিকে নয়। তাপগতীয় ও মনস্তাত্ত্বিক কাল-শর যে একই অভিমুখে চলে বলে দেখতে পাই, তার কারণ মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব কেবলমাত্র সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বেই সম্ভব হতে পারে। সুতরাং মহাবিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সময়। বদ্ধ মহাবিশ্বের সংকোচনকালে অবশ্যই থাকবে না মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব। এইভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও আপেক্ষিক হয়ে গেছে। মহাবিশ্বের সংকোচন-প্রসারণের উপর নির্ভর করছে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ বা জ্ঞানের বিকাশ। সুতরাং জ্ঞানেরও ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচন নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও সংকোচনের উপর।

এখন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই মহাবিশ্ব চির-প্রসারণশীল কিংবা বদ্ধ বা ক্রমান্বয়ে প্রসারণ ও সংকোচনধর্মী তা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে বিবাদ রয়েছে। এ নিয়ে বহু আলোচনা মহাবিশ্বসংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলিতে করা হয়েছে। বর্তমানের প্রসারণ আরম্ভ হওয়ার কাল 'হাবলের স্থিরাংক' [$H=2\times10^{-18}$ প্রতি সেকেন্ডে] থেকে নির্ণয় করা যায়। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের একটি সিদ্ধান্ত হল যে, দেশ ও কালের এমন একটা সীমারেখা থাকবে যার বাইরে নক্ষত্র, ছায়াপথ বা জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব নেই। এই কাল্পনিক সীমারেখার দূরত্ব কোনও দূরবীনের পাল্লায় ধরা যায় না।

কোয়াসার [Quasar] আবিষ্কার শুরু হল 1960 সাল থেকে। কোয়াসারের ঔজ্জ্বল্য অস্বাভাবিক। এই জ্যোতিষ্কগুলির উজ্জ্বলতা এতই বেশি যে দূরবীনের সাহায্যে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোয়াসারকে সহজেই দেখা যায়। 1970 সালে এমন কয়েকটি কোয়াসার আবিষ্কৃত হল যাদের লাল-সরণ ছিল অস্বাভাবিকভাবে বেশি। কিন্তু একটি সর্বোচ্চ মানের পর এই লাল-সরণ আর বাড়তে দেখা গেল না। এই সর্বোচ্চ মান থেকে সেই সময়টা পাওয়া যায় যখন ছায়াপথই ছিল না, ছিল না ব্রহ্মাণ্ড। তাই ওই নির্দিষ্ট মান বা সময়ের পূর্বের কোনও কোয়াসার দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং এইসব কোয়াসারের অবস্থানই যেন মহাবিশ্বের কিনারা। এই কিনারা চিহ্নিত হয়েছে সময় দিয়ে মহাকাশ বা দেশ দিয়ে নয়। কালের প্রবাহই এই কিনারা চিহ্নিত করেছে।

মহাবিস্ফোরণের পর থেকে নক্ষত্র ও বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হতে খানিকটা সময় লেগেছে। এই সময়টুকু প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ছিল অন্ধকার। ঠিক কতটা সময় এই মহাবিশ্ব অন্ধকার ছিল তার পরিমাপ করা যায় না। তত্ত্ব মতে মহাবিশ্বের ইতিহাসে প্রথম আলোর রেখা দেখা দেয় প্রায় 1500 কোটি বছর আগে। তাই মহাবিশ্বের কিনারা হবে 1500 কোটি আলোকবর্ষ। 1500 কোটি আলোকবর্ষের চেয়ে দূরতর কিছুই দেখা যাবে না, কারণ মহাবিশ্বের তখন অন্ধকার কাল। 1500 কোটি বছরের পূর্বে মহাবিশ্ব ছিল অন্ধকারময়। মহাবিশ্বের সব পর্যবেক্ষকের কাছেই মহাবিশ্বের কিনারা 1500 কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে। বলা হচ্ছে, মহাবিশ্বের কিনারায় এখন যে কোয়াসারদের আমরা দেখছি এগুলিই মহাবিশ্বের প্রথম আলোকরেখা। 1500 কোটি বছর আগের প্রথম 'আলোক রেখা'। এখন হয়তো ওই আলোক-উৎস কোয়াসারগুলির আলোতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, যা আমাদের অজানা। সে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে আরও 1500 কোটি বছর। সুতরাং মহাবিশ্বের এই মুহূর্তের অবস্থা আমরা জানি না। যেমন, গত 1500 কোটি বছরে ওই কোয়াসারদের বহু পরিবর্তন ঘটলেও আমরা কিন্তু দেখছি তাদের 1500 কোটি বছর আগের অবস্থা।

চারমাত্রার মহাবিশ্বের ধারণা করা বেশ কষ্টকর। এরকম মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছি কিংবা কিনারায় আছি তা বোঝা মুশকিল। গোলাকার মহাবিশ্বের কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। তেমনি এটা বলা যাবে না আমরা কোথায় আছি—কেন্দ্রে না কিনারায়। সতরাং মহাবিশ্বে আমরা কোথায় আছি তা বলা না গেলেও, মহাবিশ্বে আমরা কখন এসেছি তা বলা যায়। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বানুসারে মহাবিস্ফোরণ হয়েছিল প্রায় 1800 কোটি বছর [2000 কোটি বছর] আগে এবং মহাবিশ্ব তার অন্ধকার কাল পেরিয়ে আলোয় এসেছিল প্রায় 1500 কোটি বছর আগে। আমরা এসেছি মহাবিস্ফোরণের প্রায় 2000 কোটি বছর পরে। মহাবিস্ফোরণের বয়স প্রায় দু'হাজার কোটি [2×10^{10}] বছর।

প্রসারণশীল মহাবিশ্বের কোন পর্যবেক্ষক দেখবে যে দূরের একটি ছায়াপথ তাদের দূরত্বের আনুপাতিক গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরত্ব যত বেশি হবে সরণ বেগও সেই অনুপাতে বাড়বে। সেই সরণের পরিমাণ পাওয়া যাবে ডপলার সরণ জনিত আলোর লাল সরণে। বর্ণালিতে লাল-সরণের বর্ণালি রেখা তুলনা করে সরণের গতিবেগও বলা যাবে।

আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে আলোর গতিবেগ হল গতির শেষ সীমা। দূরের ছায়াপথ বা কোয়াসার আলোর কাছাকাছি গতিবেগে প্রসারিত হতে পারে কিন্তু আলোর সমান বা বেশি গতিবেগে কখনই নয়। বিগ ব্যাঙ তত্ত্বের মহাবিশ্বের ইতিহাস সসীম, তাই মহাবিশ্বের কিনারার দূরত্ব এমন হবে যার বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। সেই কিনারা 1500 কোটি আলোক বছর দূরে—যেখানে ছায়াপথ তথা ব্রহ্মাণ্ড আলোর শতকরা 90 ভাগ বা তার বেশি গতিবেগে সরে যাচ্ছে। তাই যত বেশি লাল-সরণ ধরা পড়বে তা থেকেই কিনারার নির্দেশ মিলবে। কিছুদিন পরে দেখা গেল বহু কোয়াসার আছে যাদের বয়স 1600 কোটি বছরেরও বেশি। একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, এই কিনারার দূরত্ব যত বাড়বে ব্রহ্মাণ্ড কিংবা কোয়াসারগুলির গতিও ক্রমশঃ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি আসবে। এক সময় এই গতিবেগ বাড়তে বাড়তে আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যাবে। এটা নিশ্চয় বাস্তব অবস্থার কথা বলবে না, বলবে কাল্পনিক অবস্থার কথা।

চিত্র ঃ 74
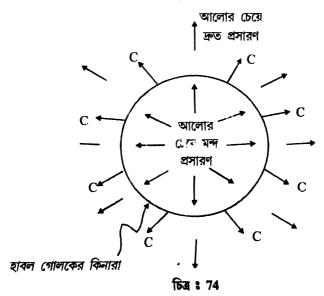
● হাবল ব্যাসার্ধের মধ্যে দেশের প্রসারণ বেগ আলোর বেগ থেকে কম। ওই ব্যাসার্ধের বাইরে প্রসারণ বেগ C-র থেকে বেশি হতে পারে বলে ওপার হবে কাল্পনিক। ওই ব্যাসার্ধের কিনারায় প্রসারণ বেগ C-এর সমান। ●

1975 সালে অ্যালান স্যান্ডেজ ছায়াপথের দূরত্ব ও লাল সরণের সম্পর্ক থেকে প্রসারণের মোট কাল নির্ধারণ করেন 1800 কোটি বছর। সবচেয়ে প্রাচীন নক্ষত্রগুলির বয়সকাল নির্ধারিত হয়েছে 1500 থেকে 1600 কোটি বছর। মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের তীব্রতা থেকে তাত্ত্বিকেরা মহাবিশ্বের বয়স 1500 থেকে 2000 কোটি বছর বলে মনে করেন। কোয়াসারের অস্তিত্বের শেষ সীমা পাওয়া গেল 1800 কোটি আলোকবর্ষ! এই সীমায় কোয়াসারের সরণবেগ আলোর গতিবেগের প্রায় 90 শতাংশ। এই বেগে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। এই সীমাকেই মহাবিশ্বের কিনারা বলা যায় এবং তা হাবল ব্যাসার্ধের বা মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমান। তবে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ ঠিক এই সংখ্যাটি থেকে কিছুটা পৃথক হবে, কারণ দেশকালের বক্রতার জন্য মহাজাগতিক ঘনত্বের উপর এই ব্যাসার্ধের মান নির্ভর করে। অবশ্য যে সীমারেখা টানা হয়েছে তার বাইরে জ্যোতিষ্কের সরণ বেগ আলোর মত বা তার বেশি হবে, তাই ওপার হবে নিতান্তই কাল্পনিক। সুতরাং 1600 কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের পর বস্তুর অবস্থা কী হচ্ছে তা অজানা, কারণ, ওই দূরত্বে বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান কিংবা তার বেশি হয়ে যায়।

তাই দেশ ও কালের মহাবিশ্বে কালের ভূমিকাই প্রধান। কালই মহাবিশ্বের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাপকাঠি। কালের মাত্রা দিয়েই দেশ ও কালের মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সার্থক হয়। তবু মহাবিশ্বের স্বরূপ আমাদের কাছে অস্পষ্টই থেকে যায়। এখনও মহাবিশ্বের সব কথা আমাদের জানা নেই। মহাবিশ্বের মোট শক্তির সঙ্গে যে কাল বা সময়ের সম্পর্ক বিদ্যমান সে কথায় একটু পরেই আসছি।

ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্রের কথায়, "বিজ্ঞান প্রকৃতির নিখুঁত স্বরূপ জানার চেষ্টা করে, তবে মহাজগতের বিজ্ঞান এখনও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় নি। বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব মহাবিশ্বের পেন্সিল স্কেচ তৈরি করতে পারে, তার পূর্ণ ছবি নয়। মহাবিশ্ব কি পরমাণু, কোয়ান্টা প্রভৃতির সমাহার? মহাকর্ষের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? প্রাকৃতিক নানা প্রক্রিয়ার সঙ্গে দেশকালের মহাবিশ্ব কীভাবে জড়িয়ে আছে? মহাবিশ্বের প্রসারণ থেকে কি একদিন সংকোচন আরম্ভ হবে? বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব এসব প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দিতে পারে না। তবু এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন নতুন তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন তত্ত্বের দৃষ্টিকোণে মহাবিশ্বকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার এই নতুন প্রয়াসের সাফল্যের জন্য আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।" [মহাবিশ্বের কথা]

মহাবিশ্বের সবকথা, সব ইতিহাস যেমন আমরা জানি না, তেমনি সময়ের তথা কালের সব কথা সব ইতিহাস আমাদের আজও অজানা। মহাবিশ্বের কথা যত বিশদভাবে, যত সঠিকভাবে জানা যাবে, সময়ের কথা, মহাসময়ের ইতিবৃত্তও ততটা নির্ভুলভাবে জানা যাবে। সময়ের আদি-অন্ত আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। বিজ্ঞানীরা যতটা জেনেছেন, তাতে বলা যায়, সময় বা কালের শুরু মহাবিস্ফোরণের সময় থেকেই। মহাবিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সময়।

আগেই বলেছি, আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোন কণা বা বস্তুর গতিবেগ আলোর সমান বা তার বেশি হতে পারে না। কিন্তু ট্যাকিয়ন কণা আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগসম্পন্ন। আলোর গতিবেগে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই ধরনের কণা বাস্তবে পাওয়া যায় নি, তত্ত্বীয়ভাবে পাওয়া গেছে।

কিন্তু বিপরীত পদার্থ সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। 1928 খ্রিস্টাব্দে ডিরাক তাঁর তত্ত্বে বলেছিলেন যে, প্রত্যেক কণার বিপরীত আধানের বিপরীত কণা থাকা অনিবার্য। ডিরাকের কাছে তাঁর নিজের তত্ত্বই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। কিন্তু 1932 খ্রিস্টাব্দে সত্যি সত্যিই বিপরীত কণা পজিট্রন আবিষ্কৃত হল। বিপরীত কণার অস্তিত্ব এখন পরীক্ষায় প্রমাণিত। কণা বিপরীত কণার বিলয়ে শক্তির সৃষ্টিও পরীক্ষালব্ধ ফল।

অবশ্য আমাদের মহাবিশ্বে বিপরীত পদার্থ বিরল। কিন্তু মহাজগৎ তত্ত্বে একটি বড় প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে মহাবিশ্বের কোথাও বিপরীত পদার্থের ছায়াপথ বা নক্ষত্র আছে কি? থাকলেও পদার্থ ও বিপরীত পদার্থের জগতের বিকিরণ বর্ণালি হুবহু একরকম হবে, তাই বর্ণালি থেকে বিপরীত জগৎ আলাদাভাবে চেনা যাবে না।

আমাদের জগতে বিপরীত পদার্থ বিরল কেন, পদার্থের সমপরিমাণ নয় কেন—সে প্রশ্ন অযৌক্তিক নয়। আমাদের জগতে বিপরীত পদার্থ যে বিরল এই সত্যটিকে আপাতত মেনে নিতে হবে। এই সমস্যার সমাধানে 1973 সালে এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। এই তত্ত্বে বলা হচ্ছে মহাবিস্ফোরণ তিনটি মহাবিশ্ব তৈরি করেছে। এর একটি মহাবিশ্ব হল আমরা যেটিকে দেখছি অর্থাৎ যে মহাবিশ্বে পদার্থের প্রাধান্য ও কালের স্রোত সমানে বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাবিশ্বে কাল চলেছে উল্টোদিকে এবং তার উপাদান হল বিপরীত পদার্থ। এ ধরনের মহাবিশ্ব যেন আমাদের মহাবিশ্বের স্থায়ী অতীত কাল। এই মহাবিশ্বের সঙ্গে প্রথম ধরনের মহাবিশ্বের সাক্ষাৎ কখনও সম্ভব নয়।

এই তত্ত্বের তিন নম্বর মহাবিশ্ব হল ট্যাকিয়নের মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্বের সঙ্গে এক এবং দুই নম্বর মহাবিশ্বের কখনই সাক্ষাৎ হবে না। কারণ এই মহাবিশ্ব যেন আমাদের এক নম্বর মহাবিশ্বের স্থায়ী ভবিষ্যৎ কাল। সুতরাং বর্তমান মহাবিশ্বের স্থায়ী অতীতকাল হল দু'নম্বর মহাবিশ্ব এবং তার স্থায়ী ভবিষ্যৎকাল হল তিন নম্বর মহাবিশ্ব। ফাইনম্যান [Richard Feynman] এই তত্ত্বে নতুন যে ধারণা যুক্ত করেছেন তা হল, বিপরীত পদার্থ বিপরীতগামী কালের কাছে সাধারণ পদার্থের মতই হবে। আমাদের জগতের সাধারণ পদার্থ সেখানে বিপরীত পদার্থ এবং বিরল মনে হবে।

'মহাবিশ্বের কথা' বইটির থেকে এ প্রসঙ্গে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। "প্রসঙ্গত এখানে আলফবেনের জগৎ—বিপরীত জগতের তত্ত্ব উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে এই দুই জগৎ কাছাকাছি এলে বিনষ্ট হয়ে শক্তিতে বিলীন হবে, তাই এই দুই জগতের মাঝখানে থাকবে গামারশ্মির এক পুরু আবরণ। এই আবরণের একদিকে থাকবে সাধারণ পদার্থের প্লাজমা—যা ওই পদার্থের জগতকে সুরক্ষিত করে রাখবে। আর উল্টোদিকে বিপরীত পদার্থের প্লাজমার আবরণ বিপরীত জগতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এভাবে দুই জগতের সহাবস্থান সম্ভব হতে পারে। মহাজগৎ তত্ত্বের এইসব প্রসঙ্গ আমাদের কাছে দার্শনিক তত্ত্বের মত মনে হতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্বের উপাদানের সঙ্গে মহাজগৎ তত্ত্বের যে নিবিড় সম্পর্ক আছে তা অস্বীকার করা যাবে না।"

তেমনি মহাবিশ্বের সঙ্গে সময় সম্পর্কিত বলেই তার উপাদানগুলির সঙ্গেও সময় সম্পর্কযুক্ত। আবার মহাকাশ বা দেশের সম্প্রসারণে মহাবিশ্বের আয়তন যেমন বাড়ছে, তেমনি তার উত্তাপও কমছে। সাধারণ নিয়মে আয়তন দু'গুণ বাড়লে উষ্ণতা অর্ধেক হয়ে যায়। মহাবিশ্বে বিকিরণের ঘনত্বও সম্প্রসারণের জন্য কমবে। স্টিফেনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটারে বিকিরণের পরিমাণ উষ্ণতার চতুর্থ ঘাতে হ্রাস পায়। আয়তন দ্বিগুণ হলে বিকিরণের ঘনত্ব তাই $(2)^4$ অর্থাৎ ষোলগুণ কমে যাবে। মহাবিশ্বে বিকিরণ ছাড়া পদার্থও তো আছে। ত্রিমাত্রিক দেশে আয়তন দুগুণ বাড়লে পদার্থের ঘনত্ব $2^3 = ৮$ গুণ কমে যাবে। পদার্থের ও বিকিরণের ঘনত্বে এই ইতরবিশেষ, বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখন আমরা যদি সময়ের উল্টোদিকে ফিরে যাই, এমন একটা সময় চিহ্নিত করতে পারব যখন পদার্থের ও বিকিরণের ঘনত্ব হবে সমান সমান। এখন মহাবিশ্বে বিকিরণের ও পদার্থের ঘনত্বের অনুপাত $1 : 10^9$ —তা থেকে সৃষ্টির পর 10^5 বছর কাল সময়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে যখন এদের ঘনত্বের অনুপাত ছিল প্রায় 1 : 1, আর তখন মহাবিশ্বের উষ্ণতা ছিল প্রায় 10,000 ডিগ্রি কেলভিন।

মহাবিস্ফোরণের 10^{-12} সেকেন্ড পরে মহাবিশ্বের উষ্ণতা ছিল 10^{16} ডিগ্রি কেলভিন। আধুনিক কণাত্বরণ যন্ত্রে আমরা এই উষ্ণতার সমান শক্তির তুল্যমূল্য কণা পেতে পারি। কিন্তু 10^{-12} সেকেন্ডেরও আগে যখন মহাবিশ্বের উষ্ণতা 10^{16} ডিগ্রি কেলভিন-এর বেশি ছিল তখনকার পদার্থের ভাঙাগড়ার চিত্র পরীক্ষাগারে পাওয়া সম্ভব হয়নি আজও। তাই 10^{-12} সেকেন্ডেরও আগে যা ঘটেছে তার ইতিহাস জানতে আমাদের তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়। মহাবিস্ফোরণের সঙ্গে সময় সৃষ্টি হয়ে তার একমুখী অগ্রগমনে মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ কেমন হয়েছে তা দেখা যাক।
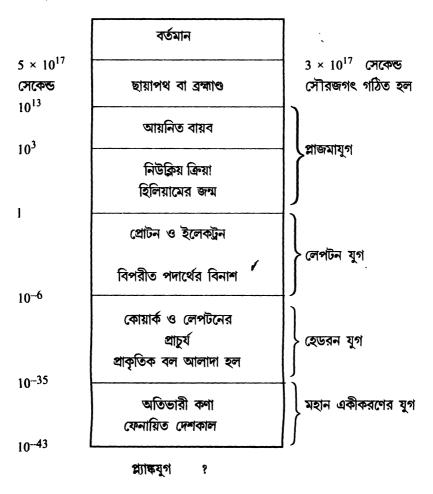
চিত্র ঃ 75

● মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের ইতিবৃত্ত। সময়ের একক এখানে সেকেন্ডে ধরা হয়েছে। বিস্ফোরণের কাল থেকে সময়ের চলা শুরু হলেও প্ল্যাঙ্কযুগ বা প্ল্যাঙ্ক সময় যা প্রকৃতপক্ষে 5.39×10^{-44} সেকেন্ড পর থেকে ঘটনার বিবরণ তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায়। প্ল্যাঙ্ক যুগে কী ঘটেছিল তা অজানা। সেই অনন্যতা কিংবা মহাজাগতিক অণ্ড থেকে ক্রমশঃ বেরিয়ে এসেছে মহাবিশ্ব। সময়ের সঙ্গে মহাবিশ্বের বিকাশ উপরের তালিকায় পরিস্ফুট। ●

মহাবিশ্বে বিপরীত পদার্থের কোনও জগৎ আছে বলে আপাতত জানা নেই। তাই সিদ্ধান্তে আসা যায়, আদিতে পদার্থ এবং বিপরীত পদার্থের অনুপাত নিশ্চয়ই এক ছিল না। কারণ তা যদি থাকতো তাহলে পদার্থ দিয়ে মহাবিশ্ব গ'ড়ে উঠতো না বা উঠতে পারতো না। মহাবিস্ফোরণের পরের 10^{-43} সেকেন্ড বা আরও সঠিকভাবে বললে 5.39×10^{-44} সেকেন্ড অবধি হল মহাবিশ্বের প্রথম যুগ। এই যুগ সম্বন্ধে বাস্তব বা তত্ত্বীয়ভাবে কোনও কিছুই জানা সম্ভব হয় নি। মনে করা হয়, এই ক্ষণকালে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের আধিপত্য ছিল। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে মহাকর্ষ দেশকালের বক্রতা বা বিকৃতি। আর কোয়ান্টাম তত্ত্বে কণা ও শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অথচ এলোমেলো হ্রাসবৃদ্ধি থাকবে।

তত্ত্বীয়ভাবে, প্ল্যাঙ্কদৈর্ঘ্য $l_p = \left(\frac{Gh}{2\pi C^3}\right)^{1/2} = 1.62 \times 10^{-35}$ মিটার, প্ল্যাঙ্কসময় $t_p = \left(\frac{Gh}{2\pi C^5}\right)^{1/2}$

$= 5.39 \times 10^{-44}$ সেকেন্ড এবং প্ল্যাঙ্কভর $= m_p$ এবং $m_p = \left(\frac{hC}{2\pi G}\right)^{1/2} = 0.18 \times 10^{-8}$ কিলোগ্রাম।

এখানে h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, C = আলোর গতিবেগ। প্ল্যাঙ্ক সময়ে ও প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের পরিসরে কোয়াণ্টাম মহাকর্ষের প্রভাবে এই প্রথম যুগে দেশকালের বক্রতায় মনে হয় বিপুল হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছিল। তখন মহাবিশ্ব ছিল স্পঞ্জ বা ফেনায়িত গঠনের মত কিছু যার সঠিক তথ্য কী গণিত, কী অনুমান কোন কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। হুইলারের তত্ত্বে যে সুপার স্পেসের কথা বলা হয়েছে, প্ল্যাঙ্ক যুগ হয়ত ছিল তারই প্রভাবাধীন। তবু কোয়াণ্টাম মহাকর্ষের স্বরূপ এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যা কিছু বলা হয়, সবই অনুমান ও তত্ত্বসাপেক্ষ। তাই কেউ কেউ যখন বলেন, প্ল্যাঙ্কযুগে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ 10^{-35} মিটার ব্যাসের কৃষ্ণবিবর হল মহাবিশ্বের উৎস, তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবিবর ও প্ল্যাঙ্কযুগ নিয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হবে।

এই সব অনুমানের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিমূর্ত ধারণা পাওয়া যায়, তাতে মহাকর্ষের কোয়াণ্টাম তত্ত্বের ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণই থেকে যায়। অবশ্য স্টিফেন হকিংয়ের সাম্প্রতিক তত্ত্বে কোয়াণ্টাম গ্র্যাভিটির রূপরেখা স্পষ্টতর হচ্ছে।

প্ল্যাঙ্কযুগের পর মহাবিশ্বের উষ্ণতা যখন প্রায় 10^{32} ডিগ্রি কেলভিন, তখন পদার্থের মৌল উপাদনের অস্তিত্ব ছিল, তার ঘনত্ব ছিল প্রায় 10^{97} কিলোগ্রাম। উষ্ণতা হ্রাসর সঙ্গে এই সব উপাদান (মনে হয় কোয়ার্ক) থেকে তৈরি হল হেডরন কণা। আরও কম উষ্ণতায় এই সব কণার বিপরীত কণার মিলনে বিনাশ ঘটল। অস্থায়ী যে সব কণার বিনাশ হল না, তারা এমনিতেই ক্ষয় পেল।

10^{-6} সেকেন্ডের পর মহাবিশ্বে ছিল প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, মিউওন, পাইঅন ও তাদের বিপরীত কণা। তাছাড়া ছিল নিউট্রিনো, ফোটন ও গ্র্যাভিটন। ৯ ও ৪ কোয়ার্ক দিয়ে গড়া কণাগুলি আগেই বিনষ্ট হয়েছিল। 10^{-6} সেকেন্ডের পর প্রোটন ও নিউট্রন তাদের বিপরীত কণার মিলনে বিনষ্ট হল। 10^{-3} সেকেন্ডে মিউওনেরও অনুরূপভাবে বিনাশ ঘটল। এক সেকেন্ডের পর আর পজিট্রন অবশিষ্ট ছিল না। পড়ে রইল কিছু নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রিনো, ফোটন ও গ্র্যাভিটন। উষ্ণতা কমে গিয়ে যখন এমন মানে পৌঁছল যা বড় বড় নিউক্লীয়াসের বন্ধনশক্তির থেকে কম, তখন নিউট্রন প্রোটন জুড়ে তৈরি হল নিউক্লীয়াস। এ অবস্থায় তৈরি হল বর্তমান মহাবিশ্বের শতকরা 25 ভাগ হিলিয়াম। বাকী পদার্থটুকু হাইড্রোজেন নিউক্লীয়াস হয়ে পড়ে রইল। কয়েক

মিনিটের মধ্যে উষ্ণতা এতো কমে গেল যে সংযোজন ক্রিয়ায় আর বড় ধরনের নিউক্লীয়াস গড়ে উঠতে পারল না। হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি হতে আমাদের সৃষ্টিকে অন্ততঃ 10^5 বছর বা 3.2×10^{12} সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়েছে। সে সময় মহাবিশ্বের তাপ 10000 ডিগ্রি কেলভিন হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়নন শক্তির নীচে নেমে যায়। ওই সময় পদার্থ ও বিকিরণ আলাদা হয়ে যায়।

চিত্র নম্বর 75 থেকে পাই, মহাবিস্ফোরণের 3×10^{17} সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পর সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তার আগে 10^{13} সেকেন্ড পরে ছিল শুধু আয়নিত গ্যাস। এক সেকেন্ড থেকে 1000 সেকেন্ডের মধ্যে নিউক্লীয় ক্রিয়া বিদ্যমান ছিল, তখন হিলিয়াম নিউক্লীয়াস তৈরি হয়েছে। মহাবিস্ফোরণের 10^{-6} কাল থেকে 1 সেকেন্ড অবধি লেপটন যুগ। প্রথমে মহাবিশ্ব কোয়ার্ক ও লেপটনে পূর্ণ হয়। তারপর প্রোটন ও ইলেকট্রন আলাদা কণা হিসাবে মহাবিশ্বকে পূর্ণ করে। মহাবিস্ফোরণের 10^{-35} সেকেন্ড পরেই প্রাকৃতিক চারটি বল আলাদা আলাদা হয়ে যায়। তারপরেই আসে কোয়ার্ক ও লেপটন কণা। 10^{13} সেকেন্ডের আগে যখন হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি হল তখনই বিকিরণ ও পদার্থ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময়ের বিকিরণের শক্তি ছিল বেশি এবং তরঙ্গ ছিল ছোট। এই শক্তির তবঙ্গ ই বর্তমানে $3^{o}K$ উষ্ণতার বড় আকারের মাইক্রোতরঙ্গে পরিণত হয়েছে।

চিত্র ঃ 76
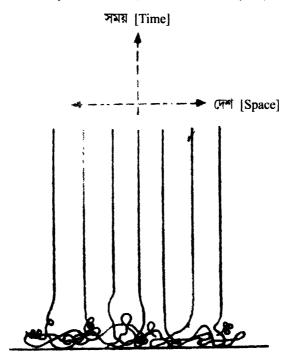
● সৃষ্টির আদিতে ছিল বিশৃঙ্খল এলোমেলো অবস্থা। এই চিত্রের মত কল্পনা করা যাক কয়েক গাছি সুতো উল্লম্ব অবস্থায় ঝুলছে। মেঝেতে সুতোর গাছিগুলি গিঁট পাকিয়ে জড়ান অবস্থায় ঘন আস্তরণ তৈরি করেছে। এই উদাহরণে প্রত্যেক গাছি সুতো যেন একটি সময় বা কালের প্রতীক। দুটি গাছির ব্যবধান হল সময়ের ব্যবধান। মেঝের উপরে সুতোর গাছিগুলি সুশৃঙ্খল যেমন সাধারণ দেশকালের মহাবিশ্বে ঘটনার ক্রম অনুযায়ী দেশকালের সুসম্পর্ক আছে। মেঝের কাছে সময়ের সুতো গাছিগুলি এমন জড়িয়ে গেছে যে কালের ক্রম অনুযায়ী দেশ চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। সব কিছুই অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সৃষ্টির আদি লগ্নের এই হল কাল্পনিক অবস্থা। ●

মহাবিশ্বের উষ্ণতা 10000^0K হয়ে যায় 3.2×10^{12} পরে। তখন পদার্থ ও বিকিরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে তথা প্রাকৃতিক নিয়মেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস মহাকর্ষের জেরে একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানান ব্রহ্মাণ্ড বা ছায়াপথ। এই গ্যাসেরা মহাকর্ষের ফলে আরও পদার্থ টেনে এনে বড় আকার নেয়। মহাবিস্ফোরণের প্রায় 10 কোটি বছর পরে এই মহাকর্ষীয় সংকোচন শুরু হয়। সূর্যের চেয়ে 100 কোটি থেকে 400 কোটি গুণ ভারী এই সব সংকুচিত পদার্থপুঞ্জ থেকেই জন্ম নেয় ব্রহ্মাণ্ড বা ছায়াপথসমূহ। সংকোচনে নক্ষত্রগুলির উষ্ণতা বাড়লো। নিউক্লীয় সংযোজনের সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন করে সংকোচন ঠেকিয়ে টিকে থাকলো। বর্তমান মহাবিশ্ব এইভাবেই ক্রমবিকশিত হয়েছে সময় বা কালের অগ্রগতিতে।

সৃষ্টির আদিতে যখন কালের বা সময়ের শুরু তখন মহাকাশে তথা দেশে ছিল এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। বিশেষ করে প্ল্যাঙ্কযুগে অবস্থা কী রকম ছিল তা তত্ত্ব দিয়েও সঠিক বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা ওই অবস্থার কিছুটা উপযুক্ত এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যায় বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা আসার একটা যৌক্তিক বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্র 76 দেখুন।

মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে সময়ের চলা শুরু। সময় চলছে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন এই মহাবিশ্ব বদ্ধ। তাঁদের মতে ঃ "মহাবিশ্বে দেশের প্রসারণের হার ক্রমশ কমছে। এর কারণ ছায়াপথ ও মহাজাগতিক পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। এই আকর্ষণ যদি আরও বাড়তে থাকে তবে একদিন প্রসারণ থেমে গিয়ে দেশের সংকোচন আরম্ভ হবে। এই সংকোচনের ফলে বিপুল মহাবিশ্ব ছোটো হয়ে কোটি কোটি বছর পরে বেলুনের মত চুপসে যাবে। মহাবিশ্বের ত্রিমাত্রিক সসীম গোলকাকৃতি এই প্রতিরূপে কালের মাত্রায় তার স্থিতির সময়সীমা অসীম। ফলে কেউ কেউ বলেন, মহাবিশ্ব যেন দোলায়মান বা অসিলেটিং। বিশাল বিস্ফোরণ থেকে এখন প্রসারণশীল বিশ্ব কালের সীমায় পৌঁছে সংকুচিত হয়ে পরে শূন্য বিন্দুতে ভেঙ্গে পড়ে। এই সিঙ্গুলারিটি থেকে তখন আবার নতুন সৃষ্টি আরম্ভ হয় এক বিশাল বিস্ফোরণ দিয়ে। অতীতে অসংখ্যবার এই সৃষ্টি ও বিলয় ঘটেছে, পরে আরও ঘটবে। বদ্ধ মহাবিশ্বের ধারণা শুধু বিশ্বের স্থিতিতে সীমিত সময়ে সীমাবদ্ধ। যদিও বার বার পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্টি ও বিলয় দুই মিলে মহাবিশ্বের আয়ু অনন্ত।"

তাঁদের কাছে সময় চলেছে তার একমুখী গতি নিয়ে। তার অভিমুখে চলছে প্রসারণ। মহাবিশ্বের সংকোচনের সময় কাল বিপরীতমুখী তথা কাল্পনিক কাল হবে। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি চির প্রসারণশীল হয়, যা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তবে সেক্ষেত্রে সময়ের কী হবে বলা মুশকিল। সময়ের ভবিষ্যৎ চিরসম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে যেমন অজানা, তেমনি অজানা মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ। সেক্ষেত্রে মৃত বিশ্বই হয়ত অনন্তকাল টিকে থাকবে। মহাবিশ্বে তখন থাকবে ফোটন, নিউট্রিনো, গ্র্যাভিটন এবং সম্ভবতঃ কিছু ইলেকট্রন ও পজিট্রন।

অনেকটা আগেই একবার বলেছি, বদ্ধ মহাবিশ্বের সঙ্গে এর সন্ধি ঘনত্বের একটা সম্পর্ক আছে। মহাবিশ্ব যদি অনন্তকাল প্রসারণের প্রভাবে না বেড়ে বদ্ধ হয় তবেই এরকম দোলায়মান মহাবিশ্ব কল্পনা করা যায়। এরকম বদ্ধ মহাবিশ্বের শর্ত হল সন্ধি ঘনত্ব মহাবিশ্বের পদার্থের ঘনত্বের সমান বা বেশি হতে হবে। আইনস্টাইন-দ্য সীটার মডেলের মহাবিশ্বে সন্ধি ঘনত্ব মহাবিশ্বের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে হবে প্রায় 10^{-29} গ্র্যাম অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 10টি হাইড্রোজেন। তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় স্থিরাংক G ও হাবল স্থিরাংক H-এর পরস্পর অনুপাত থেকে সন্ধি ঘনত্বের যে মান হিসেব করেন তা হল ঃ

$$\text{সন্ধি ঘনত্ব} = \frac{3H^2}{8\pi G}$$

হাবল স্থিরাংকের মান 50 কি মি/ সেকেন্ড / মিলিয়ান পারসেক ধরলে, প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এই মান 4.7×10^{-30} গ্র্যাম দাঁড়ায়। মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব এই মানের কম হলে মহাবিশ্বের প্রসারণ চলতে থাকবে, বেশি হলে সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন দেখা যাবে। মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব এই সন্ধি ঘনত্বের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। তাছাড়া বর্তমান মহাবিশ্বে ভারী হাইড্রোজেনের ঘনত্ব থেকে হিসেব করে জানা গেছে যে তাতে পদার্থের ঘনত্ব সন্ধি ঘনত্ব থেকে অনেক কম। তবে অদৃশ্য নিউট্রিনো এত বিপুল সংখ্যায় থাকতে পারে যাদের ভর শূন্যের চেয়ে বেশি। এই সব নিউট্রিনো মহাবিশ্বে পদার্থের ঘনত্বের মান বাড়িয়ে তুলতে পারে যা হিসাবে ধরা হয়নি। আধুনিক পরীক্ষায় ছায়াপথগুলির মহাকর্ষীয় আবর্তন বেগ থেকে তার ভর পাওয়া যায়। দৃশ্য অদৃশ্য বিকিরণ বর্ণালি থেকে সেই ভর হিসাবও করা যায়। বিজ্ঞানীরা এই দুরকমের পরীক্ষায় মহাবিশ্বের ভরের গরমিল লক্ষ্য করেছেন। বিকিরণহীন বেশ কিছু পদার্থ যেন কোথাও লুকিয়ে আছে।

● মহাবিস্ফোরণের কাল থেকে মহাবিশ্বের প্রধান ঘটনার কালক্রম ●

কাল	প্রধান ঘটনা
মহাবিস্ফোরণ লগ্ন [0]	আমাদের জানা মহাবিশ্বের কাল, দেশ ও শক্তির আবির্ভাব। বিস্ফোরণ ঘটে 'মহাজাগতিক অণ্ডে' কিংবা 'অনন্যতা'-য়।
মহাবিস্ফোরণের পর থেকে 10^{-43} সেকেন্ড অবধি	এটা প্ল্যাঙ্ক যুগ। এই যুগের শেষে মহাকর্ষ, বিকিরণ মহাবিশ্বের তাপগতীয় সাম্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।
10^{-34} সেকেন্ড পরে	মহাবিশ্ব অনন্যতা থেকে বর্তমান প্রসারণ হারের 10^{50} গুণ হারে স্ফীত হল।
10^{-30} সেকেন্ড পরে	স্ফীতি যুগের অবসানে অনন্যতা থেকে কণার আবির্ভাব।
10^{-11} সেকেন্ড পরে	প্রতিসাম্য ভেঙে ইলেকট্রোউইক বল দশান্তরে তড়িৎ-চুম্বকীয় ও দুর্বল মিত্রস্ক্রিয়া বলে রূপান্তরিত বা বিচ্ছিন্ন হল।
$10^{-6} - 10^{-1}$ সেকেন্ড পরে	কোয়ার্ক অ্যান্টিকোয়ার্কের পরস্পর বিনাশ বন্ধ হল। অবশিষ্টগুলির তিনটি দল প্রোটন, নিউট্রন সৃষ্টি করল।
10^{-4} সেকেন্ড পরে	1/10000 সেকেন্ড বয়সের মহাবিশ্বে ইলেকট্রন, পজিট্রন অধিকার করে নিউট্রন, প্রোটনের পরস্পর রূপান্তর ঘটল। প্রোটন থেকে নিউট্রন সৃষ্টিতে সামান্য বেশি শক্তির প্রয়োজন হওয়ায় মহাবিশ্বে নিউট্রনের চেয়ে প্রোটন পাঁচগুণ বেশি বেঁচে গেল।
10^{-2} সেকেন্ড পরে	তাপগতীয় সাম্যে জড় ও শক্তির পরস্পর ক্রিয়া
1 সেকেন্ড পরে	অন্য কণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নিউট্রিনো আলাদা হল।
3 মিনিট 42 সেকেন্ড পরে	নিউট্রন প্রোটন জুড়ে হিলিয়াম নিউক্লীয়াস সৃষ্টি হল। মহাবিশ্বে এখন প্রায় শতকরা 20 ভাগ হিলিয়াম এবং 80 ভাগ হাইড্রোজেন রয়েছে।

কাল	প্রধান ঘটনা
7 ঘন্টা পরে	মহাবিশ্ব এখন এতটা শীতল যে আর কোনও নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটল না।
এক বছর পরে	মহাবিশ্বের উষ্ণতা একটি নবীন নক্ষত্রের কেন্দ্রের উষ্ণতায় নেমে এল।
10 লক্ষ বছর পরে	পটভূমি বিকিরণের উৎপত্তি, ফোটন বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলেকট্রন ও নিউক্লীয়াসের মিলনে পরমাণু গঠন শুরু হল। এবার পদার্থ থেকে ছায়াপথ, ব্রহ্মাণ্ড ও নক্ষত্র তৈরি হল।
মহাবিস্ফোরণের 100 কোটি বছর পরে বা এখন থেকে 1700 কোটি বছর আগে	ব্রহ্মাণ্ডগুলি, নীহারিকাসমূহ এবং কোয়াসারদের আবির্ভাব।
এখন থেকে 500 কোটি বছর আগে	সূর্যের উৎপত্তি।
460 কোটি বছর আগে	পৃথিবীর উৎপত্তি। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কুণ্ডলী বাহুর আবির্ভাব। সৌর জগতের উৎপত্তি।
380 কোটি বছর আগে	পৃথিবীর কঠিন শিলাস্তরের উৎপত্তি।
350 কোটি বছর আগে	আণুবীক্ষণিক জীবকোষের উৎপত্তি।
মতান্তরে, 200 কোটি বছর আগে	জীবনের উন্মেষ।
180-130 কোটি বছর আগে	গাছপালার আবির্ভাব, পৃথিবীর আবহমণ্ডলে অক্সিজেন বেড়ে যাওয়ায় জলজ জীবের আবির্ভাব।
90-70 কোটি বছর আগে	যৌন মিলনের ফলে জীবনের ক্রমবিকাশ শুরু হল। জেলিফিসের মত প্রাণীর আবির্ভাব।
60 কোটি বছর আগে	শামুক জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি।
50 কোটি বছর আগে	প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব।
42.5 কোটি বছর আগে	স্থলে প্রাণীর আগমন।
39.5 কোটি বছর আগে	কীটের উৎপত্তি।
32.5 কোটি বছর আগে	স্থলে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব।
20 কোটি বছর আগে	প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব।

কাল	প্রধান ঘটনা
7 কোটি বছর আগে	প্রাইমেট-পূর্ব জীবের আবির্ভাব।
5.5 কোটি বছর আগে	ঘোড়ার উৎপত্তি।
3.5 কোটি বছর আগে	বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর উৎপত্তি।
2.4 কোটি বছর আগে	তৃণের জন্ম।
2.1 কোটি বছর আগে	বানর জাতির উৎপত্তি।
2 কোটি বছর আগে	পৃথিবীর বর্তমান আবহাওয়া মণ্ডলের উৎপত্তি।
1.1 কোটি বছর আগে	তৃণভোজী ভূ-চর প্রাণীদের বিস্তার।
50 লক্ষ বছর আগে	শিম্পাঞ্জী থেকে এপ্ম্যানেরা বিচ্ছিন্ন হল।
37 লক্ষ বছর আগে	এপম্যানেরা দাঁড়িয়ে হাঁটতে শিখলো।
18-17 লক্ষ বছর আগে	হোমোইরেক্টাস মানব এলো। চীনের আদি মানব।
6 লক্ষ বছর আগে	হোমো-সেপিয়েন মানুষেরা এলো।
3.60 লক্ষ বছর আগে	মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল।
20000 থেকে 15000 বছর আগে	চাষবাসের আবিষ্কার।

তালিকা ঃ 7

উপরের তালিকায় প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহের যে সময় সারণী দেওয়া হয়েছে তাতে সূর্য ও সৌরজগৎ সৃষ্টি অবধি দেওয়া সময়গুলি প্রায় নির্ভুল হলেও, পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি ও তার বিবর্তনের সময়-সারণী নিয়ে পুরাতাত্ত্বিক, ভূ-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ কিছুটা মতভেদ আছে। সময়ের বা কালের একমুখী গতির সঙ্গে মহাবিশ্বের ক্রম-বিবর্তনের একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এই সময়-সারণী ও প্রধান ঘটনার তালিকায়।

আইনস্টাইনের মহাবিশ্বের বাইরে দেশ-কালের বা মহাকাশ-সময়ের অস্তিত্ব নেই। মহাবিস্ফোরণের থেকেই কালের আবির্ভাব। মহাবিশ্ব এখন প্রসারিত হচ্ছে। এর সংকোচন যখন আরম্ভ হবে তখন ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণালিতে লাল নয় নীল সরণ দেখা যাবে। 3^{o}K উষ্ণতার পটভূমি বিকিরণ উষ্ণতর হয়ে উঠবে। ওই উষ্ণতায় নক্ষত্র ব্রহ্মাণ্ড সব ক্রমশঃ উবে যাবে। তার অনেক আগেই মহাবিশ্বে জীবন লুপ্ত হবে। শেষে মহাবিশ্বের বিকিরণ সংকুচিত হয়ে টিকে থাকবে শুধু কৃষ্ণগহ্বরগুলি। সবার শেষে এগুলির সংযোজনে মহাবিশ্ব পরিণত হবে একক নগ্ন এক বিন্দুতে কিংবা অনন্যতায় [Singularity]। অবশ্য মোট শক্তির মানের সঙ্গে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক বল ও মৌলিক কণার সম্পর্ক এখনও খুব যথাযথভাবে আবিষ্কৃত হয় নি। শূন্য থেকে দেশ-কাল সৃষ্টির কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্ব অথবা আপেক্ষিক তত্ত্বের কাল ও শক্তির সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে 'সুপার গ্র্যাভিটি তত্ত্ব' [Super

Gravity Theory] সাহায্য করতে পারে। শক্তির পরিমাণ থেকে মহাবিশ্বের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে মহাবিশ্ব হবে একটি বিন্দুর মত। বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন— Singularity, যেখানে দেশ-কালের বক্রতা হবে অসীম। আলোর গতিবেগে চলমান কোন যাত্রী মহাবিশ্বকে বিন্দুই দেখবে এবং তাকে অতিক্রম করতে তার সময় লাগবে শূন্য। এই মহাবিশ্ব অবশ্যই আদি মহাবিশ্ব।

টমাস গোল্ডের মতে সংকোচনশীল মহাবিশ্বে সময় ঋণাত্মক বা বিপরীতমুখী হবে। তাহলে প্রসারণ ও সংকোচনের মোট সময় হবে শূন্য। তবে বহু বিজ্ঞানী ঋনাত্মক সময় নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। রজার পেনরোজ বলেন, মহাকর্ষ আকর্ষণের সাহায্যে সব পদার্থকে একসঙ্গে জড়ো করতে চায় এবং এর থেকেই কালের দিক নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংকোচনশীল মহাবিশ্বে মহাকর্ষের ধর্ম যখন একই থাকছে তখন কাল বা সময় অপরিবর্তনীয় বা অনিবর্তনীয়ই থাকবে। বদ্ধ মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কালের এই ধারণা যুক্তিযুক্ত হলেও, মহাবিশ্ব যদি মুক্ত হয় তাহলে কালের ধর্ম আরও জটিল হয়ে পড়ে। মুক্ত মহাবিশ্ব চির সম্প্রসারণশীল। এমন মহাবিশ্বে সময় কীরূপ নেয় তা অজানা।
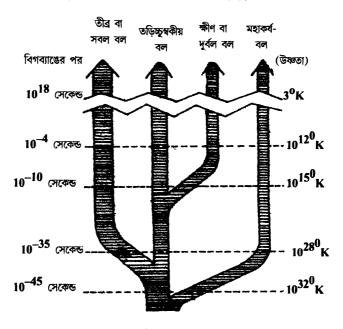
চিত্র ঃ 77

● আদি ঘনীভূত একটি বলের প্রতিসাম্য ভেঙে বিগব্যাঙের পর শীতলতর বিশ্বে সময় ও উষ্ণতা ভেদে চারটি বল যেভাবে বিচ্ছিন্ন হল। ●

মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তে দেশ ও কাল আলাদা হয়ে যায়। অনুমান করা হয় তার আগে দেশ ও কাল ছিল অভিন্ন। এই দুই সত্তার একীকৃত রূপ কী ছিল তা অজানা। অভিন্ন সত্তা যখন ছিল তখন ধরে নিতে হয় তা নিশ্চয়ই প্রতিসম ছিল। সেই প্রতিসাম্য ভেঙে সৃষ্টি লগ্নের 'জিরো আওয়ারে' দেশ ও কাল আলাদা হয়ে অগ্রসরমান। ত্রিমাত্রিক দেশ তিন দিকেই প্রসারিত হচ্ছে। কাল একটি মাত্রা, শরের মত তা একমুখী। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে দেশ ও কালের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'সন্ততি' [Continuum]

তত্ত্ব থেকে মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। ওই আদি লগ্নে চারটি মৌলিক বল একীভূত হয়ে একটি অতিবলের আকারে ছিল। ওই অতিবলের ধর্ম কী ছিল তা অজানা। এই চারটি মৌলিক বল হল ঃ মহাকর্ষ বল [Gravitational Force], তড়িচ্চুম্বকীয় বল [Electromagnetic Force], সবল মিথষ্ক্রিয়া [Strong Interaction] ও দুর্বল নিথষ্ক্রিয়া [Weak Interation] বল। এদের মধ্যে দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া বলকে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সঙ্গে একীভূত করা সম্ভব হয়েছে 1979 সালে। এখন মৌলিক বল রয়েছে তিনটি। আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুসারে এই তিনটি মৌলিক বলকেও একীভূত করা যাবে, যেহেতু সৃষ্টির আদিলগ্নে সব বলই প্রতিসাম্যের আকারে একটি অতিবলের আকারে ছিল।

"কিন্তু সৃষ্টির পর বিশ্বের প্রসারণের ফলে তার উষ্ণতা কমেছে। সেই সঙ্গে প্রতিসাম্য ভেঙে পড়েছে। ফলে মহাকর্ষ 10^{-43} সেকেন্ডে আলাদা হয়ে গেছে। অন্য তিনটি বল থেকে 10^{14} গিগাইলেকট্রন ভোল্ট উষ্ণতায় তীব্র বল (সবল মিথষ্ক্রিয়া) পৃথক হয়েছে। 100 গিগাইলেকট্রন ভোল্ট উষ্ণতা পর্যন্ত অবশেষে এই ইলেকট্রোউইক বল টিকে ছিল।

এই উষ্ণতায় ইলেকট্রোউইক বল থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় ও ক্ষীণ বল (দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া)পৃথক হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে চারটি বলেরই প্রতিসাম্য ছিল অক্ষত। তখন বিশ্বের উষ্ণতা ছিল প্রায় 10^{19} গিইভো। 77 চিত্রে অক্ষত প্রতিসাম্যের বিচ্যুতি যেভাবে ঘটেছে তা দেখানো হয়েছে। এই বিচ্যুতি ঘটেছে বলেই আমরা সৃষ্টির বৈচিত্র্য অনুভব করতে পারি। নতুবা মহাবিশ্বের বৈচিত্র্য সম্ভব হত না।

আবার কোন এক সময় তাপগতীয় অসাম্যে অ্যান্টিপ্রোটনের চেয়ে প্রোটনের সংখ্যা কিছু বাড়তি ছিল বলেই আমাদের পদার্থজগতের বিশ্ব গড়ে উঠেছে। প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটনের জুড়ি যেমন শক্তি উৎপাদন করে, সেই শক্তি থেকে ওই জুড়ি উৎপন্নও হতে পারে। তাই বাড়তি প্রোটন থাকার কথা নয়। তবু, দেখা যায় দুয়ের সংখ্যার প্রতিসাম্য ভেঙে বিশ্বজগৎ গড়ে না উঠলে আমাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকত?

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বিশ্বের আদিম রূপ হল প্রতিসাম্যের জগৎ। প্রতিসাম্য ভেঙে ফুটে উঠেছে সৃষ্টির বৈচিত্র্য। আবার সৃষ্টির বৈচিত্র্য কমাতে প্রতিসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে চলেছে প্রকৃতি। তাপগতীয় অসাম্যের এলোমেলা অবস্থাতেও স্ব-সুবিন্যাসের মাধ্যমে বস্তুজগতে প্রতিসাম্য ফিরে আসছে।

বিজ্ঞানী আলফভেনের মতে আমাদের বিশ্বজগতের প্রতিসম বিপরীত পদার্থের জগৎ থাকতে পারে। কিন্তু তার ছোঁয়ায় আমাদের জগৎ টিকবে না। দুই জগৎই শক্তিতে বিলীন হবে। তাই তাঁর ধারণা এই যে, জগৎ ও বিপরীত জগতের প্রান্তসীমায় থাকবে পুরু গামারশ্মির আবরণ। এই আবরণ ভেদ করে দুই জগৎ কখনই একত্র হতে পারবে না।

প্রতিসাম্যের জগৎ বিশ্বসৃষ্টির আদিম রূপ। প্রতিসাম্য ভেঙে সৃষ্টির বৈচিত্র্যই হল বিশ্বজগতের স্বরূপ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রকৃতি সৃষ্টির আদিম রূপ প্রতিসাম্যকে কখনও কখনও ফিরিয়ে আনে। প্রতিসাম্যের এই খেলায় শুধু মহাজগৎ নয়, পদার্থ জগৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ সবাই জড়িয়ে আছে।" [সৃষ্টির পথ ঃ ডঃ সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র]

1974 খ্রিস্টাব্দে স্টিফেন হকিং বক্রদেশ কালের পটভূমিতে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের পূর্বানুমান কী হবে তা বিবেচনা করেন। ব্ল্যাকহোলের মত দেশকালের সর্বোচ্চ বক্রতায় তিনি দেখিয়েছেন যে তার ঘটনা দিগন্তে কণা উৎপন্ন হবে। এই পদ্ধতিকে 'হকিং বিকিরণ' বলা হয়। বিকিরণ ঘটে বলে ব্ল্যাকহোলের তাপ থাকবে, আর তার উষ্ণতা তার ভরের ব্যস্ত অনুপাতী হবে। ব্ল্যাকহোল যত ছোট

হবে তার বিকিরণ তত দ্রুততর হবে, শেষে তা বিস্ফোরিত হবে। সাবেকী ব্ল্যাকহোলের চরিত্রে এ লক্ষণ অজানা ছিল।

হকিং আ ও বললেন, এই পদ্ধতিতে কিন্তু কোয়ান্টার পূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে না। কোয়ান্টাম তত্ত্বে সাধারণ 5 দুটি কণার বিক্রিয়ায় উভয়ের আচরণ জানা যায়। পরস্পর সম্পর্কিত এই আচরণ তত্ত্বে জানা গেলে পর্যবেক্ষণের ফলের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যায়। কিন্তু হকিং এর পদ্ধতিতে কণা বিপরীত ণা ভ্যাকুয়ামে জন্মালে, তাদের একটি ব্ল্যাকহোল গ্রাস করে নেবে, অন্যটি বিকিরণ হিসেবে রা পড়বে। ব্ল্যাকহোল গ্রস্ত কণা ধরা না পড়ায়, অর্ধেক তথ্যই হারিয়ে যাবে। তাদের পার রক সম্পর্কও জানা যাবে না। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নিয়মের ওপর কোয়ান্টাম তত্ত্বে এই থ্যহানির অনিশ্চয়তা একটি বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। হকিং পদ্ধতিতে তথ্যহানির এই ঘটনা ক বোঝা যায় ব্ল্যাকহোলের বিস্ফোরণে উবে যাওয়া একটি অনিবর্তনীয় পদ্ধতি অর্থাৎ হকিং কিরণের অবশেষ থেকে ব্ল্যাকহোলের পুরো মডেল গড়া যাবে না। যদিও ব্ল্যাকহোলের চরিত্রের ই পূর্বানুমানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও মহাকর্ষের প্রয়োগ ঘটছে, তবু এই তত্ত্বকে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্ব বলা যাবে না। কারণ দেশকাল এখানে সাবেক সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। নীচু মানের শক্তির পাল্লায় হকিং-এর পূর্বানুমান কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও মহাকর্ষের বিক্রিয়ার সন্নিকর্ষ হলেও একে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির মৌলিক তত্ত্ব বলা যায় না। তাছাড়া এই পূর্বানুমান থেকে দেখা যায় যে, পদার্থের ক্ষেত্র কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে ও দেশ সাবেকি আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তার ফলে অস্থিরতা থাকবে। যেমন, এখানে ব্ল্যাকহোল তৈরি হয়ে বিলীন হবে, বিশ্বও সত্বর বিলীন হয়ে যাবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ তিনভাগ জুড়ে আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। সাফল্য আজও অধরা। আংশিক কিছু সাফল্য পাওয়া গেলেও ওই মিলন সম্ভব হয়নি। কারণ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি [Quantum Gravity] তত্ত্বের শুধু হকিং-বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে পারলেই চলবে না, তাকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতে হবে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান দিয়ে। এর প্রথম ধাপ হতে পারে দুর্বল বল, সবল বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল ব্যাখ্যা করতে যে সব গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলির সাহায্য নেওয়া।

অন্যান্য বিক্রিয়ার ব্যাখ্যায় এই কৌশলগুলি প্রয়োগ কিছুটা সম্ভব হলেও আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের বেলায় তা জটিল হয়ে পড়ে। 1960 খ্রিস্টাব্দে গ্র্যাভিটন বিক্রিয়ার জন্য গাণিতিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। পরে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সামান্য পরিবর্তন করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া য় নি। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির স্বরূপ ধরা পড়ে নি।

1970 খ্রিস্টাব্দে সুপার সিমেট্রির জ্যামিতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকেই আশা করেছিলেন কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি প্রশ্নের সমাধান হবে। এই তত্ত্বে ফের্মিয়ন ও বোসনকে স্পিনের তারতম্য ও একই পরিবারভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। সুপার সিমেট্রির জ্যামিতির সঙ্গে আইনস্টাইনের মহাকর্ষের জ্যামিতি একত্র করে তৈরি হয়েছে সুপার গ্র্যাভিটি তত্ত্ব। কিন্তু কোনটাই কার্যকর হয় নি। শুধু এই ধারণা বর্তমান যে, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সফল রূপায়ণ একদিন না একদিন সম্ভব

গতানুগতিক পদ্ধতিতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব অবিকৃত রেখে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির বনিয়াদ গড়ার চেষ্টা করা হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাবেক পদ্ধতিতে যে দুটি

উপায়ে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম অবস্থা নিরূপণের চেষ্টা করা হয় তার একটি হল শ্রোয়েডিংগারের সমীকরণের অনুরূপ সমীকরণ সমাধান করে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের ভবিষ্যতের রূপ নির্ণয় করা। এই পদ্ধতিতে আংশিক সাফল্য পাওয়া গেলেও কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির বহু সমস্যার সমাধান পাওয় যায় না। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান। এই পদ্ধতিতে 1940 খ্রিস্টাব্দে ফাইনম্যান দেখান যে, একটি কণার এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাওয়ার সম্ভাবনা হিসাব করা যায়। এই হিসেবের জন্য দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দেশকালের সব সম্ভাব্য পথ অর্থাৎ ইতিবৃত্ত বিবেচনা করতে হয়। কণার প্রত্যেক পথের জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে তার ওয়েভ ফাংশানের মাধ্যমে তার সম্ভাবনার বিস্তার পাওয়া যায়। তখন প্রত্যেক পথের সম্ভাবনার বিস্তার যোগ করে যোগফলের বর্গফল থেকে কণার ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে যাওয়ার সম্ভাবনা পূর্বানুমান করা যায়। ফাইনম্যানের এই পদ্ধতি 'ইতিবৃত্তের যোগফল' বা Sum-over-histories নামে পরিচিত।

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটিতে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের 'ওয়েভ ফাংশন' চিহ্নিত করা প্রয়োজন। মহাজগৎ তত্ত্বে এরকম ওয়েভ ফাংশান নিয়ে বিশদ গবেষণা হয়েছে। কণা জগতের নিয়ম-কানুন বিপুল বিশ্বে প্রয়োগ করা অবশ্যই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিগব্যাঙ তত্ত্বের যথার্থতা থাকলে আজকের বিশ্ব যে একসময় ছোট আকারের ছিল, তাতে সন্দেহ থাকে না।

তাহলে ঐ আদিম অবস্থার ওপর কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এই প্রভাব থেকে কোয়ান্টাম মহাজগৎ তত্ত্বের সূচনা ঘটেছে। সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার নিয়ম তৈরি করে বিশ্বের বর্তমান অবস্থার স্বরূপ নির্ণয় এই তত্ত্বে সম্ভব হতে পারে। এই নিয়মে বর্তমান বিশ্বের কোয়ান্টাম মহাকর্ষ ওয়েভ ফাংশন জানার প্রয়োজন। এই ওয়েভ ফাংশানে বর্তমান বিশ্বের সব তথ্যই যুক্ত থাকতে হবে। এই ওয়েভ ফাংশান যেমন বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তেমনি আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গেও তার মিল থাকা প্রয়োজন।

জিম হার্টল ও স্টিফেন হকিং এরকম একটি ওয়েভ ফাংশানের বিবরণ দিয়েছেন। এই ওয়েভ ফাংশান ফাইনম্যানের প্রস্তাবিত ইতিবৃত্তের যোগফল বা Sum-over-histories থেকে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি হল একটি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি থেকে বিশ্বের অন্য এক ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে উত্তরণ। এই দুই ত্রিমাত্রিক দেশে উত্তরণের সব সম্ভাব্য পথের ওয়েভ ফাংশান যোগ করে সেই যোগফলের বর্গফল থেকে বিশ্বের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার বিবর্তনের সম্ভাবনা বলে দেওয়া যায়।

হার্টল ও হকিং-এর কোয়ান্টাম থেকে সৃষ্টি বা কোয়ান্টাম জেনেসিস তত্ত্ব কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির এই রূপরেখা থেকে গড়ে উঠেছে। এঁরা দুজন ওই সময় ঘোষণা করলেন যে, এঁরা মহাবিশ্বের একটি কোয়ান্টাম ওয়েভ ফাংশন তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে হকিং তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে এখন আজকের বিশ্বকে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা যায়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পূর্বানুমান হল অতীতে বিশ্বের অনন্যতা। [Singularity] ছিল, আর সেখানে দেশের বক্রতা ছিল বিপুল। তাই সেখানে অপেক্ষিকতাবাদের নিয়ম ভেঙে পড়ে, তখন কোয়ান্টাম ক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। মহাবিশ্বের সৃষ্টির আদিম শর্ত বুঝতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সফল। আর বিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা থেকে বিশ্ব সৃষ্টির আদিম শর্ত পাওয়া যায়। আমি বিশ্বের সেই কোয়ান্টাম অবস্থার প্রস্তাব দিতে চাই।" হকিং তাঁর এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইতালির পডুয়ার [Padua] সেই বিখ্যাত হলঘরে যেখানে বহুকাল আগে গ্যালিলিও বক্তৃতা করেছিলেন পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা নিয়ে।

হকিংয়ের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি ব্যবহার করে শিশু বিশ্বের সব অবস্থা বর্ণনা করা যায়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেমন বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মের জন্য প্রযুক্ত হয়, তেমনি দেশ ও কালের সৃষ্টিতেও তার প্রয়োগ সম্ভব। সিঙ্গুলারিটির জন্য নতুন কোন নিয়ম তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বে সিঙ্গুলারিটির মত কোন অবস্থার স্থান নেই। অনিশ্চয়তাবাদে বিন্দুরও ব্যাপ্তি থাকায় তার বিন্দুত্ব বা সিঙ্গুলারিটির প্রশ্ন ওঠে না। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সুসংহত একটি তত্ত্ব না পাওয়া গেলেও এরকম তত্ত্বের রূপরেখা কী হবে তার আভাস পাওয়া যায় স্টিফেন হকিং-এর তত্ত্বে। এই রূপরেখার অন্যতম হল ফাইনম্যানের ইতিবৃত্তের যোগফল পদ্ধতির প্রয়োগ। এই পদ্ধতিতে কোন কণার একক ইতিহাস নয়, দেশকালে তার প্রত্যেক সম্ভাব্য পথ থাকবে, থাকবে সেই পথের ইতিহাস। এরকম প্রত্যেক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে দুটি সংখ্যা। একটি হল তার তরঙ্গের আকার, অন্যটি হল কণাটি তরঙ্গের পর্যায়ে কোন্ দশায় অবস্থান করছে, সেই দশার মান। কণার বিশেষ বিশেষ অবস্থানে বিন্দু অতিক্রমের প্রত্যেক সম্ভাব্য ইতিবৃত্তের সঙ্গে জড়িত তরঙ্গকে যোগ করতে হবে। কিন্তু এই যোগফল পেতে হলে জটিল গাণিতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। তা এড়াতে তরঙ্গ যোগ করতে হবে কণার ইতিবৃত্তে জড়িত বাস্তব কালের প্রেক্ষিতে নয়, কাল্পনিক কালের ভিত্তিতে। দেশকাল যখন বিচ্ছিন্ন নয় সৃষ্টির সেই প্রাক-মুহূর্তকালের অস্তিত্ব ছিল না, দেশকালের চারমাত্রায় নয়, শুধু দেশের চারমাত্রায় তখন বিশ্বের ইতিবৃত্তের যে যোগফল হিসাব করতে হয়েছে তা বাস্তব নয়। বিশ্ব আকারে কিছু বাড়লে তবেই কালের প্রকাশ ঘটেছে।

চিত্র ঃ 78
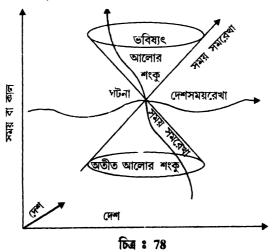
● দেশকালের যে কোন ঘটনা অন্য ঘটনার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত তা বিভিন্ন রেখা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। দুটি ঘটনা আলোর সাহায্যে যুক্ত হলে তা হবে সময়ের সঙ্গে যুক্ত। ভবিষ্যতের আলোর শংকু হল আলোর সাহায্যে প্রেরিত ঘটনার বিবরণ, অতীতের আলোর শংকুর বিভিন্ন বিন্দু থেকে ঘটনাস্থলে আলো পাঠাতে পারে। দুটি শংকুর বাইরে দুটি ঘটনা ঘটলে তা দেশের পরিমাপে পৃথক হবে; দুটি শংকুর ভেতরকার ঘটনা সময়ের মাপে পৃথক বোঝাবে। কোন দ্রষ্টার দেশকালের ইতিবৃত্ত সময়ের মাপে সময়সমরেখায় প্রকাশ করা যাবে।

[সৃষ্টির পথ □ ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র] ●

হকিং-এর ভাষায় কাল্পনিক কাল কল্পবিজ্ঞান মনে হতে পারে, আসলে তা এক সুনিশ্চিত গাণিতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ একটি সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে ধনাত্মক সংখ্যা হয় (যেমন $2\times2 = 4$, $-2 \times -2 = 4$)। বিশেষ সংখ্যাকে যে কাল্পনিক বলা হয় তার কারণ

এই গুণফল নেগেটিভ হয়। ($i=\sqrt{-1}$ অক্ষর দিয়ে অভিহিত এরকম কাল্পনিক সংখ্যা ঐ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে –1 হয়, 2i × 2i = –4)। ফাইনম্যানের ইতিবৃত্তের যোগফল পদ্ধতির গাণিতিক জটিলতা এড়াতে কাল্পনিক সময় ব্যবহার করা দরকার। বাস্তব কালের পরিবর্তে কাল্পনিক সময় দিয়ে পরিমাপ করলে দেশকালের উপর তার প্রভাব হল—দেশ ও কালের পার্থক্য ঘুচে যায়। যে দেশকালে ঘটনা ঘটার সময়ের মান যদি কাল্পনিক স্থানাঙ্কে থাকে তবে সেই দেশকাল হবে ইউক্লিডীয়। আমাদের ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারণা এখন দুয়ের পরিবর্তে চারমাত্রায় নিতে হবে। এই জ্যামিতিতে দেশ ও কালের দিকের পার্থক্য থাকবে না। বাস্তব দেশকালে কালের স্থানাংক বাস্তব মানের ধরলে কালের দিক তার শংকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, দেশের দিক থাকবে তার বাইরে। "বাস্তব দেশকাল জানতে ইউক্লিডীয় দেশকাল ও কাল্পনিক কাল ব্যবহার করা একটি গাণিতিক কৌশল মাত্র।" অতীত ভষ্যিতের কাল্পনিক কালের প্রতিসাম্য ভেঙে যেন এখন বাস্তব কালের অস্তিত্বের ছায়া গড়ে উঠেছে। [চিত্র 78 দেখুন]

হার্টল ও হকিংয়ের সীমানাহীন বিশ্বের প্রস্তাবে ওয়েভ ফাংশানের যোগফল পেতে প্রতিটি ইতিবৃত্তে বিশ্বের দুটি নয় একটি সীমানা থাকবে। সীমানার ধারণা পেতে আমরা একটি গোলকের তলের সীমানার কথা ভাবতে পারি। ওই তলের কোন সীমানা নেই কারণ ওই তলে যে কোন দিকে হেঁটে গেলে চিরকাল একই দিকে হাঁটতে হবে। দেয়ালের কোন বাধার মুখোমুখি হতে হবে না। গোলকে দুটি ছিদ্র থাকলে তার দুটি সীমানা হবে। একটি ছিদ্র হল বিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থা, দ্বিতীয়টি হল বর্তমান বিশ্বের অবস্থা। গোলকটি হল বিশ্বের ইতিবৃত্ত। সীমানাহীন বিশ্বের প্রস্তাবে গোলকে থাকবে একটি ছিদ্র বা সীমানা, তা বর্তমান বিশ্বের অবস্থা নির্দেশ করবে। অন্য ছিদ্র থাকবে অনুপস্থিত অর্থাৎ বিশ্বের সূত্রপাতের সীমানা বলে কিছু থাকবে না (চিত্র 79)।

চিত্র : 79
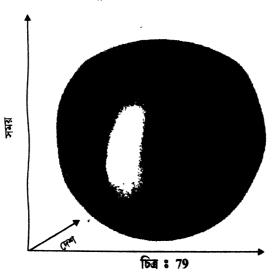
● সীমানাহীন বিশ্বে দেশকালের একটি সম্ভাব্য ইতিবৃত্ত প্রকাশ করতে ফাঁপা গোলকের মাথায় একটি ছিদ্র ব্যবহার করা যায়। ছিদ্রের সীমানা হল বর্তমান বিশ্বের ত্রিমাত্রিক চিত্র। ছিদ্রের উল্টোদিকের মেরু হল বিশ্বসৃষ্টির আদিম অবস্থা। সীমানাহীন বিশ্বের তত্ত্ব বোঝাতে এরকম সব সম্ভাব্য ইতিবৃত্তের যোগফল দিয়ে মহাবিশ্বের অবস্থা প্রকাশ করা যায়। ●

হকিং বলেছেন, 'বিশ্বের সীমানার শর্ত হল যে তার সীমানা নেই। বিশ্ব আপনাতে আপনি বিধৃত, বাইরের কোন প্রভাবের অধীন নয়। তার সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই।' কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি দেশকালের সীমানার কথা বলে না। যেহেতু দেশকালের সীমানা নেই অতএব তার আচরণের প্রশ্নও নেই। বিজ্ঞানের সব নিয়ম যেখানে অচল সেই অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটি নেই, তাই দেশকালের সীমানার শর্ত ব্যাখ্যা করতে নতুন নিয়মের কথা ভাবতে হয়। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বিশ্বের দুটি রূপ সম্ভব। হয় বিশ্ব অনন্তকাল ধরে আছে অথবা অতীতে কোনও সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি একটি তৃতীয় অবস্থার সম্ভাবনার কথা বলছে।

যেহেতু ইউক্লিডীয় দেশকালের জ্যামিতিতে কাল ও দেশ একমুখী, দেশকাল সেখানে সসীম অথচ তার সিঙ্গুলারিটি নেই, তাই তার কোন সীমানা থাকবে না। দেশকাল হবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের মত, তাতে দুটি বাড়তি মাত্রাযুক্ত হবে মাত্র। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সসীম কিন্তু সীমানার বাধায় আটকে যাওয়ার অথবা সিঙ্গুলারিটির মুখে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ইউক্লিডীয় দেশকালকে যদি আমরা অসীম কাল্পনিক কালে টেনে নিয়ে যাই অথবা কাল্পনিক কালে সিঙ্গুলারিটি থেকে তার সূত্রপাত ধরে নিই, তাহলে সাবেক তত্ত্বে বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার জটিল বেড়াজালে আটকে পড়ব। কারণ কোন তত্ত্ব দিয়ে সিঙ্গুলারিটি ব্যাখ্যা করা যাবে না।

হকিংয়ের মতে সমস্ত জগৎরেখা সৃষ্টির সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা বিন্দু থেকে পৃথিবীর দ্রাঘিমা রেখার মত উত্তর মেরু থেকে যাত্রা শুরু করবে। জগৎরেখা (World Linc) হল অপেক্ষিকবাদে কোন কণা বা বস্তুর দেশকালের চারমাত্রায় গতিপথ।

আমরা যখন আমাদের জগৎরেখায় চলি, তখন অন্য জগৎরেখা আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, যেমন কোন সমুদ্রযাত্রী দক্ষিণদিকে একটি দ্রাঘিমারেখা ধরে চলছে, অন্য দ্রাঘিমারেখাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে তা তুলনা করা যায়। কোটি কোটি বছর পরে প্রসারণ থেকে সংকোচন আরম্ভ হলে এক সময় বিশ্ব এক অগ্নিগোলকে ভেঙে পড়বে। কালের আরম্ভ ও শেষ কখন হবে সে প্রশ্ন অবাস্তব। দেশকাল যদি সসীম অথচ সীমাহীন হয়, তবে বিগব্যাঙ পৃথিবীর উত্তর মেরুর মত। বিগব্যাঙের আগে কী ঘটেছিল প্রশ্নটি উত্তর মেরুর এক কিলোমিটার উত্তরে কী আছে প্রশ্নের মত। এই প্রশ্ন অর্থহীন।

চিত্র ঃ 80

● পৃথিবীর উত্তর মেরুর সঙ্গে বিগব্যাঙ বিন্দুর তুলনা।
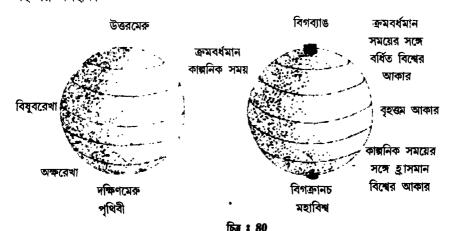
(উৎস ঃ A Brief History of Time : Stephen Hawking)। ●

কোয়ান্টাম গ্রাভিটি যে সীমানাহীন বিশ্বের প্রস্তাব দিয়েছে তাতে কাল্পনিককালের ভূমিকা বিশাল। হকিং বলেছেন, কাল্পনিক কালের নিরিখে বিশ্বকে দেখলে তার সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা থাকবে না। বাস্তব সময়ের প্রেক্ষাপটে অবশ্য অনন্যতা থাকবে। হকিংয়ের ব্যাখ্যায়, সীমানাহীনা বিশ্বের প্রস্তাবে এমন নয় যে সব সম্ভাব্য ইতিবৃত্তই বিশ্ব অনুসরণ করবে, বরং অধিকাংশ ইতিবৃত্তই কাজে লাগবে না। কিন্তু একই শ্রেণীর এমন কিছু ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে যা অধিক সম্ভাবনাময়। এইসব ইতিবৃত্ত যেন পৃথিবীপৃষ্ঠের আদলে তৈরি। উত্তর মেরু থেকে যে কোন দূরত্ব হল কাল্পনিককাল। উত্তর মেরু থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে যে বৃত্ত তৈরি হয় তা যেন বিশ্বের তৎকালীন আয়তন। উত্তর মেরুর বিন্দু থেকে সৃষ্টির সূত্রপাত। এই বিন্দু থেকে যতই দক্ষিণে এগানো যায়, নির্দিষ্ট দূরত্বে অক্ষাংশের বৃত্ত আকারে বাড়তে থাকে—ফলে কাল্পনিক কালের সঙ্গে বিশ্ব যেন প্রসারিত হতে থাকে।

এভাবে বিশ্ব বিষুব রেখায় বৃহত্তম আকার পেয়ে কাল্পনিক কালের অগ্রগতিতে ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে, দক্ষিণ মেরুর একটি বিন্দুতে বিলীন হবে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বিশ্বের আকার প্রায় শূন্য হলেও সিঙ্গুলারিটির সেই অজ্ঞেয় বিন্দু হবে না। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যেমন পদার্থবিজ্ঞানের সব নিয়মই প্রযোজ্য, বিশ্বের এই দুটি বিন্দুতেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

প্রায় দু'হাজার কোটি বছর আগে শিশু বিশ্বের আকার ছিল খুবই ছোট। তখন তা কাল্পনিক সময়ে বা কালে সর্বোচ্চ মানের ব্যাসার্ধ নিয়ে বেড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে বিশ্ব বিশাল আকারে প্রসারিত হয়েছে। আবার সংকোচনে বাস্তবকালের নিরিখে মহাসংকোচন শেষে অনন্যতায় পরিণত হবে। শুধু কাল্পনিক কালের নিরিখে বিশ্বকে দেখলে সিঙ্গুলারিটি কিংবা অনন্যতা থাকবে না।

হকিংয়ের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে বলা যায়, সিঙ্গুলারিটিতে মহাকর্ষক্ষেত্র এত প্রবল বলেই কোয়ান্টাম মহাকর্ষ ক্রিয়া এড়ান যায় না। তা থেকেই এই ধারণার জন্ম যে, কাল্পনিক কালে বিশ্ব সসীম অথচ সীমানাহীন। তার সীমানা নেই বলেই সিঙ্গুলারিটির অস্তিত্ব নেই। যে বাস্তবকালে এখন আমরা বাস করি, তাতে ফিরে গেলে সিঙ্গুলারিটিও ফিরে আসবে। কাল্পনিক কালে বাস করে, এমন কোন মহাকাশযাত্রী ব্ল্যাকহোলে পড়লে সে আর সিঙ্গুলারিটির বাধায় অন্তর্হিত না হয়ে একটা বিন্দুতে এসে পড়বে।

তাহলে বাস্তবে কাল্পনিক কালই কি বাস্তবকাল এবং আমরা যাকে বাস্তবকাল মনে করি তা কি শুধু মনের কল্পনা? বাস্তবকালে বিশ্বের আদি ও অন্তে দেশকালের সীমানায় সিঙ্গুলারিটি থাকবে, সেখানে বিজ্ঞানের সব নিয়মকানুন ভেঙে পড়বে। কিন্তু কাল্পনিক কালে সীমানা বা সিঙ্গুলারিটির বালাই থাকবে না। তাই কাল্পনিক কালের ধারণাই যথার্থ মৌলিক। সেখানে বাস্তবকাল যেন তার ভঙ্গ প্রতিসাম্যের ছায়া অথবা বিশ্বকে আমরা যে রকম দেখতে চাই তা দেখার সাহায্যের জন্য আমরাই বাস্তব এই কালের আবিষ্কার করেছি।

আমাদের দেখা জগতের বর্ণনায় আমরা গণিতের মডেল দিয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব সৃষ্টি করি। সেই সৃষ্টি থাকে আমাদের মনে। তাই বাস্তব ও কাল্পনিক কালের কোন্‌টি বাস্তব এই প্রশ্নে কোন সন্দেহ হয় না। বিশ্বের স্বরূপ নির্ণয়ে যা বেশি সফল তার গুরুত্বই বেশি হবে।

বিশ্বের ইতিবৃত্তের যোগফল থেকে সীমানাহীন বিশ্বের প্রস্তাবের যথার্থতা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বিশ্বের বর্তমান ঘনত্বের মানে তার প্রসারণের হার যে সবদিকে সমান তত্ত্বের এই সর্বোচ্চ সম্ভাবনার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল মিলে যায়। পটভূমি মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তীব্রতা যে কোনদিকে একই থাকে তা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। শিশু বিশ্বে এই বিকিরণের সুষম ঘনত্বের

হ্রাসবৃদ্ধি ছিল। COBE মহাকাশযান বিশ্বের বর্তমান সীমানা থেকে এই সূক্ষ্ম হ্রাসবৃদ্ধির চিত্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এই হ্রাসবৃদ্ধি থেকে গড়ে উঠেছে ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ প্রভৃতি এমনকি আমরাও।

কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তাবাদের মতে শিশুবিশ্বে কণাসমষ্টির গতিবেগ ও অবস্থানে কিছু অনিশ্চয়তা অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি থাকবে। সীমানাহীন বিশ্বের প্রস্তাবে অনিশ্চয়তাবাদ জনিত হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটেছে। পরে দ্রুত স্ফীতিতে বিশ্ব হঠাৎ ফুলেফেঁপে উঠেছে। এই সময়ে হ্রাসবৃদ্ধিও সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সম্প্রসারণ থেকে গড়ে উঠেছে বিশ্বের বর্তমান অবয়ব। প্রসারণশীল বিশ্বে যেখানে যেখানে ঘনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি ছিল, মহাকর্ষ সেখানে ঘনতর অঞ্চলের প্রসারণ কমিয়ে তার সংকোচনে সাহায্য করেছে। তা থেকে বিশ্বে ছায়াপথ নক্ষত্র প্রভৃতির অবয়ব গড়ে উঠেছে। জটিল এই গঠনবিন্যাসের ব্যাখ্যায় সীমানাহীন বিশ্বের তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তাবাদ মিলে এক উল্লেখযোগ্য নতুন তত্ত্বের সূচনা হয়েছে, এই তত্ত্ব কোয়াণ্টাম গ্র্যাভিটির ভিত্তিমূল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কোয়াণ্টাম গ্রাভিটির পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলে তা মানুষের সৃষ্টির অন্যতম উজ্জ্বল নির্দশন হিসাবে পরিগণিত হবে।

প্রায় 2000 কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণ ঘটে। সময় চলতে শুরু করে। চারটি মৌলিক বল, যা এখন তিনটি, পৃথক হয়। প্রায় 10^{90} সংখ্যক তথ্য বা বিষয় সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে 10^{28} ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনে। এই সময় উষ্ণতা ছিল 10^{19} গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট [10^{28} Electron Volt]। ইলেকট্রন ভোল্টকে বোলৎজমান ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করলে উষ্ণতার মান সেলসিয়াস বা কেলভিনে পাওয়া যায়। এই ধ্রুবক বা স্থিরাংক হল 0.00008617 ইলেকট্রন ভোল্ট প্রতি ডিগ্রি কেলভিনে [^{0}K]।

বর্তমান বিশ্বে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তার একটি হল 3^0K উষ্ণতার পটভূমি বিকিরণ। ওই উষ্ণতার মান শিশুবিশ্বে যে প্রচণ্ড ছিল তা বলতে পারি। এই হিসেবে বিগব্যাঙ ক্রিয়ায় বিশ্বের উষ্ণতা ছিল প্রায় 10^{32} ^{0}K অর্থাৎ 10^{19} গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এত উচ্চ উষ্ণতায় কি ঘটতে পারে তা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, কি ঘটেছিল তাও অনুমানসাপেক্ষ। সেই অনুমান থেকে বলা যায়, তখন মহাকর্ষ বল ছিল যথেষ্ট তীব্র, মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রচুর কণা তৈরি হচ্ছিল, তবে কণার ধারণা তখন খুব অর্থবহ ছিল না।

বিশ্বের একটা দিগন্ত রয়েছে। আদিকালে বিশ্ব আকারে ছোট ছিল বলেই এই দিগন্তও সেখানে ছোট ছিল। আলোর চেয়ে কারও গতিবেগ বেশি হয় না। কোনও সময়ের কোনও ঘটনা জানতে হলে ওই সময় থেকে আলোর সংকেত আসতে হবে। মহাবিশ্বের ওই মহাদিগন্তের বাইরের থেকে আলো আসতে পারে না। বিশ্বের বয়স যখন 1000 কোটি বছর, তখন তার দিগন্ত হয় 3000 কোটি আলোকবর্ষ এবং তার বেশি দূরত্বের কোনও খবরই আমরা পাবো না। আবার বিশ্ব যখন কয়েক মিনিটের শিশু ছিল, তখন তার দিগন্তও ছিল কয়েক আলোক-মিনিট। ওই কয়েক আলোক-মিনিটের বাইরের কোনও ঘটনার খবর আমরা কখনো পাবো না। তাপমাত্রা যখন 10^{32} ডিগ্রি কেলভিন তখন এই দিগন্ত একটি কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হবে। ওই বিশ্বের আকার তখন একটা কণার আকারই হবে। মহাবিস্ফোরণের 10^{-43} সেকেন্ড পরে বিশ্বের উষ্ণতা ছিল 10^{32} ডিগ্রি কেলভিন। আগেই বলেছি, 10^{-43} সেকেন্ড অবধি সময়টা হল প্ল্যাঙ্ক সময় $\left(\sqrt{\frac{Gh}{2\pi C^5}}\right)$। এর আন্তর্জাতিক মান

5.39×10^{-44} সেকেন্ড। 0 সময় থেকে 10^{-43} সেকেন্ড সময় অবধি মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণে কী ঘটেছিল তা অজানা। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এখন বলছেন ঃ

"অবশ্য একটা কথা আমরা বলতে পারি যে এই সময়কার বিশ্ব আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও 1995 খ্রিস্টাব্দের মহাজগৎতত্ত্বে তার কোন প্রভাব পড়ে না। কারণ সৃষ্টির প্রথম সেকেন্ডের মধ্যে বিশ্ব যে তাপীয় সাম্যে অবস্থান করছিল তা থেকে কণা ও নিউট্রিনোর সংখ্যা বিন্যাস নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি সৃষ্টির প্রথম সেকেন্ডের তাপীয় সাম্যের অবশেষ থেকে আমরা বিশ্বে হিলিয়ামের প্রাচুর্য, পটভূমি বিকিরণ এমনকি নিউট্রিনোর প্রাচুর্য হিসেব করতে পেরেছি। 10^{-43} সেকেন্ডের আগের বিশ্বের উপর নির্ভর করে এমন কিছু পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। বিশ্ব সৃষ্টিকালে সমদৈশিক ও সমসত্ত্ব ছিল কিনা এই তথ্যও পর্যবেক্ষণের কাজে লাগে না। অবশ্য নিউক্লীয় কণা ও ফোটনের অনুপাত জানতে এই তথ্যের প্রয়োজন আছে।

আদিম সৃষ্টির পর বিশ্বের এই হযবরল অবস্থার মধ্যেও অনুমান করা যায় যে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের মত মহাকর্ষের তরঙ্গ বিকিরণ ঘটছিল। এই তরঙ্গ আলোর গতিবেগে চললেও তা তড়িৎ চুম্বকীয় আলো-তরঙ্গ নয়, মহাকর্ষ ক্ষেত্রের আন্দোলনজনিত মহাকর্ষ তরঙ্গ। মহাকর্ষ বিকিরণের এই ক্রিয়া অবশ্যই খুব ক্ষীণ, তাই তা কখনও ধরা যায়নি। তবু বলা যায় 10^{32} °K উষ্ণতার তাপীয় সাম্যের বিশ্বের অন্য বস্তু থেকে মহাকর্ষ বিকিরণ আলাদা হয়ে পড়েছিল। তখন থেকে মহাকর্ষ বিকিরণের উষ্ণতা ক্রমশঃ বিশ্বের আয়তনের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে কমে এসেছে। বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর উষ্ণতাও একই নিয়ম অনুসরণ করেছে। অবশ্য কোয়ার্ক/অ্যান্টিকোয়ার্কের অথবা লেপটন / অ্যান্টিলেপটনের বিনাশজনিত তাপ অন্যান্য পদার্থের উষ্ণতা বাড়ালেও মহাকর্ষ বিকিরণের উষ্ণতায় তার প্রভাব পড়ে নি। তাই আজকের বিশ্বে ফোটনের উষ্ণতা (3°K) বা নিউট্রিনোর উষ্ণতার (2°K) চেয়ে মহাকর্ষের বিকিরণের উষ্ণতা কম, প্রায় 1°K-এর সমান। মহাকর্ষের এই পটভূমি বিকিরণ আজ ধরা পড়ে না। তা ধরা পড়লে আদিম বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হত।"

নিত্যতার প্রতিসাম্য হল অবিরাম প্রতিসাম্য। এই সব ধর্মের সামান্য পরিবর্তনে ভৌত নিয়ম পরিবর্তিত হয় না। এই পরিবর্তন ক্রমশঃ অবিরামভাবে আনা যায়। কিন্তু CPT নিয়মে যুক্ত প্রতিসাম্য অবিচ্ছিন্ন হবে। CPT প্রতিসাম্য হল তিনটি প্রতিসাম্যের যুক্ত রূপ—কণা বিপরীত কণার পরস্পর রূপান্তরের প্রতিসাম্য। 'C' হল প্রতিসাম্য, P হল দর্পণ প্রতিসাম্য বা Parity এবং T হল সময় বা বৈপরীত্য প্রতিসাম্য। কোনও বস্তু দর্পণে অংশত প্রতিফলিত হতে পারে না। এটা দর্পণ প্রতিসাম্য। হয় প্রতিফলন হবে, নয় হবে না। অংশত প্রতিফলন হবে না। তেমনি একটা প্রোটন পুরোটাই অ্যান্টিপ্রোটন হতে পারবে আংশিকভাবে নয়। তেমনি সময় বিপরীতমুখী হলে পুরোটাই বিপরীতমুখী হবে আংশিকভাবে নয়।

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হল যে সময় একদিকে চলে। সময় বিপরীতমুখী হলেও যে কিছু যায় আসে না এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে একটি চলচ্চিত্র পিছনের দিকে দেখান হলে দেখা যাবে যে লোকগুলো পিছনের দিকে হাঁটছে, চিত্রটি বাস্তব মনে হবে না।

কিন্তু কণা জগতে উভয়মুখী সময়ের সঙ্গে ভৌত ক্রিয়ার চরিত্র পৃথক হবে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন মিলে যেমন দুটি গামারশ্মির কোয়াণ্টা হতে পারে, তেমনি ঐ দুটি কোয়াণ্টা থেকেও ইলেকট্রন পজিট্রনের জুড়ির উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু কোন কোন কণা জগতের বিক্রিয়ায় উল্টোটা ঘটলেও তার ঘটার সম্ভাবনা প্রথমটির চাইতে কম। তাতেই মনে হতে পারে যে ভৌত নিয়ম বুঝি সময় বৈপরীত্যে পরিবর্তিত হয়। আসলে ভৌত নিয়ম অতীত,

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক ফলের তারতম্য হওয়াও নিয়মের মধ্যে পড়ে।

আবার একবার আপেক্ষিকতাবাদের সময় ধারণায় ফিরে আসি। বদ্ধ বিশ্বে মহাসংকোচনের শেষে সময় কি শেষ হয়ে যাবে? সময়ের শুরু হয় মহাবিস্ফোরণ থেকে, তখন থেকে চলতে থাকে সময় তার একমুখী গতি নিয়ে। মহাবিশ্বের প্রসারণও চলে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে। এই সময় আবার বিপরীতমুখী গতি নেবে মহাসংকোচনের শুরুতে। আর মহাসংকোচনের শেষে মহাবিশ্ব ফিরে যাবে 'অনন্যতা'য়। সেই অনন্যতায় সময়ের শেষ হবে, হবে সময়ের অন্ত।

যদি সময়ের অন্তর [Interval]-কে সময় মাত্রার এক রকম দূরত্ব হিসাবে ধরা হয় তবে তা দূরত্বে রূপান্তরিত হতে পারে। আলোর গতিবেগ যদি 'C' হয় এবং দুটি ঘটনার সময়ের অন্তর যদি 'T' হয়, তবে দূরত্ব হবে CT। এখন যদি মহাকাশে এই দূরত্ব 'D' হয়, তবে দেখানো যায় যে, CT এবং D-এর মান পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভরশীল হলেও $[CT^2 - D^2]$ -এর মান সব পর্যবেক্ষকের কাছেই সমান হবে, যারা সমান আপেক্ষিক গতিতে চলমান। এই $[CT^2 - D^2]$-এর বর্গমূল অর্থাৎ $\sqrt{CT^2 - D^2}$ - হলো দুটি ঘটনার মধ্যকার মহাকাশ-সময় অন্তর [Space-time Interval]। মহাকাশ-সময় চতুর্মাত্রিক। কারণ ত্রিমাত্রিক হলো মহাকাশ, আর চতুর্থমাত্রা হলো সময়। আবার কোনও ঘটনাকে যদি মনে করি E, তবে মহাকাশ-সময়ের এই মতবাদ E-এর সামনে এবং পিছনে একটা করে আলোক-শঙ্কুর [Light Cone] ধারণার জন্ম দেয়। এই দুই শঙ্কুর শীর্ষ বিন্দু [Vertex] হবে E এবং এদের বক্রতলগুলি হবে শীর্ষবিন্দুর মধ্য দিয়ে যাওয়া সমস্ত কাল্পনিক তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মির মহাকাশ-সময় পথসমূহ [Space-time-paths]। এই রকম কাল্পনিক শঙ্কুর সামনেরটা নির্দেশ করবে ভবিষ্যৎ, আর পিছনের শঙ্কু নির্দেশ করবে অতীতের দিকে। সামনের শঙ্কুর ঘটনাগুলিই হবে ঘটনা E-এর ভবিষ্যৎ রূপ, তেমনি পিছনের শঙ্কুতে অবস্থিত ঘটনাসমূহ হবে ঘটনা E-এর অতীত রূপ। কিন্তু অন্য কোনও ঘটনা যা ওই শঙ্কুদুটির মধ্যে অবস্থিত নয়, তার E-এর সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক পুরোপুরি পর্যবেক্ষক-নির্ভর হবে। অর্থাৎ অন্য ঘটনাটি যদি F হয় এবং F যদি ওই দুটি শঙ্কুর বাইরে থাকে, তবে কোনও পর্যবেক্ষক দেখবে, E ও F একসঙ্গে ঘটছে কিংবা F ঘটছে E-এর আগে অথবা পরে। নিউটনীয় সময় ধারণায় সব পর্যবেক্ষকই E এবং F-এর মধ্যে একই রকমের সম্পর্ক দেখবে—আলাদা আলাদা নয়। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন, পর্যবেক্ষকদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ত্বরান্বিত [Accelerated] গতির ফলে, E ও F এই ঘটনা দুটির মধ্যে সাময়িক সম্পর্ক বিভিন্ন। ভিন্ন-ভিন্ন পর্যবেক্ষক এটা ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে দেখবে যদি তাদের বেগ বিভিন্ন হয়।

আমরা সময়ের অভিজ্ঞতা পাই ঘড়ি থেকে। মানুষের তৈরি ঘড়ি যন্ত্রের ক্রিয়া সৌরজগতের নিয়মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সৌর জগতের বাইরে আমাদের এই সময়ের ধারণা অর্থহীন। সৌরজগত ছাড়িয়ে আমাদের তৈরি ঘড়ি-ভিত্তিক সময় নির্ধারণ মোটেই সঠিক মান দেয় না। আপেক্ষিকতাবাদে ঘড়ি বলতে শুধু মানুষের তৈরি ঘড়ির কথা ভাবলে হবে না, ঘড়ি বলতে বুঝতে হবে — যে যন্ত্র অবিরাম নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হচ্ছে এবং যার দোলনকাল বা পর্যাবৃত্তকাল [Periodic Time] সব সময়ই একই মানের। এইভাবে দেখলে পৃথিবীও একরকম ঘড়ি, যে ঘড়ি 23 ঘণ্টা 56 মিনিট পর্যাবৃত্তকাল সম্পন্ন, কারণ নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে এর 23 ঘণ্টা 56 মিনিট সময় লাগে। এইভাবে পরমাণুও একটি ঘড়ি, যেখানে ইলেকট্রনের আবর্তনজনিত একটি সুনির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যা [Frequency] বর্তমান। বিশ্বে বহু মৌলিক পদার্থ আছে যাদের পরমাণুগুলির কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট এবং বিশ্বের সব জায়গায় এই কম্পাঙ্ক অসাধারণভাবে সমান থাকে। এই পরমাণুগুলিকে

মৌলিকযন্ত্র বা ঘড়ি হিসাবে ধরা যেতে পারে। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদ যে ঘড়ির কথা বলে তা মানুষের তৈরি ঘড়ি হতে পারে, পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন পৃথিবীরূপ ঘড়ি হতে পারে, আবার পরমাণু-রূপ ঘড়িও হতে পারে। যে কোনও 'ঘড়ি' হোক না কেন, আপেক্ষিকতাবাদ সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

এইভাবে আইনস্টাইন প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সময় ধারণার পরিবর্তনই শুধু ঘটালেন না, তিনি বললেন, "সময় ও মহাকাশকে আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না, বলতে হবে মহাকাশ-সময়-সন্ততি [Space-time-continuum]। মহাকাশ ও সময় দুটিই অবিভাজ্য। সময়ের সব পরিমাপই হলো মহাকাশের ভিতর আবার মহাকাশের যে কোনও পরিমাপ সময়কে বাদ দিয়ে নয়।" আবারও বলি, সেকেন্ড, মিনিট, দণ্ড, পল, মাস, বছর ইত্যাদি সবই হলো মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র-তারকা এদের আপেক্ষিকে পৃথিবীর অবস্থান। মহাকাশ তিনমাত্রার আর সময় একটা মাত্রা। এই বিশ্বের সবকিছুই চতুমাত্রিক। সাধারণ মানুষ চারমাত্রার জিনিষের কথা চিন্তা করতে পারে না। যার দৈর্ঘ্য আছে তা একমাত্রা সম্পন্ন [One-dimensional] যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটিই আছে তা ত্রিমাত্রিক [Three-dimensional]। সাধারণভাবে রেললাইন একমাত্রিক, ক্ষেত্রের উপরিতল দ্বি-মাত্রিক আর একটা ঘর ত্রিমাত্রিক। একটা কাগজের উপর একটা সরলরেখা টানলে তা একমাত্রিক মনে করা হয় সাধারণভাবে। অবশ্য বিশ্বে কোনও তলই সমতল নয় এবং মহাকাশ নিজেই বক্রভাবসম্পন্ন, সুতরাং কোথাও সরলরেখা টানা অসম্ভব। যাই হোক, সেই সরলরেখাটিকে আমরা কোটি কোটি বিন্দুর সমষ্টি বলে ধরে নিতে পারি। আর তত্ত্বগতভাবে Continuum বা সন্ততি বলতে আমরা বুঝবো ওই রেখার যে কোন দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা মাত্রায় বিভক্ত বলে মনে করা। একটা গতিশীল ট্রেনের অবস্থান জানাতে আমরা সাধারণভাবে কোনও নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে তার দূরত্ব কত তা বলে থাকি। এটা একমাত্রিক সন্ততি [One-dimensional Continuum]। আবার একটা জাহাজের অবস্থান জানা যায় অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দিয়ে। এটা দ্বিমাত্রিক সন্ততি। উড়ন্ত উড়োজাহাজের অবস্থান জানা যায় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা দিয়ে। এইভাবে মহাকাশ ত্রিমাত্রিক সন্ততি [Three-dimensional Continuum]। কিন্তু গতিশীল কোন কিছুর সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে কেবলমাত্র মহাকাশে এর অবস্থান বললে হবে না, বস্তুটি সময়ের সঙ্গে কিভাবে স্থান পরিবর্তন করছে তাও জানাতে হবে। আগের উদাহরণগুলির সবগুলিই ঘটনার সঠিক বর্ণনা নয়। কারণ ট্রেনটি কোন্ সময় কোন্ জায়গায় আছে তা বলা দরকার তার অবস্থানের সঠিক বর্ণনা দিতে। শুধু তাই নয় কোন্ সময় কোন জায়গা দিয়ে যাবে তা জানলে তার চলাচলের সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে। এটা আমরা মোটামুটিভাবে পাই 'সময় সারণী' [Time Table] থেকে। তেমনি দিল্লী-কলকাতাগামী বিমানের ক্ষেত্রে শুধু তিনটি মাত্রা উল্লেখ করলে চলবে না, তার সঙ্গে সময়ের উল্লেখ জরুরী। ওই বিমানে দুর্ঘটনা ঘটলে যেটা সবার আগে আমরা জানতে চাই, কোন্ সময়ে দুর্ঘটনা ঘটলো এবং কত অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতায় তা ঘটলো তাও জানতে হয় দুর্ঘটনার সঠিক স্থান নির্ণয়ের জন্য। এইভাবে সময় হলো চতুর্থমাত্রা [Fourth-Dimension]। যদি কোনও বিমানের কোনও শহর থেকে অন্য একটি শহরে উড়ে যাবার পথ কল্পনা করা হয়, তবে সেই পথটিকে মাঝখানের কতকগুলি জায়গায় নামা-ওঠা দিয়ে বিচ্ছিন্ন পথ ভাবলে চলবে না, বরং ভাবতে হবে একটি অবিচ্ছিন্ন বক্রকার পথ [Curved Path] চারমাত্রার মহাকাশ-সময়-সন্ততির [Four-dimensional Spac-time-continuum] ভিতর দিয়ে।

আগেই বলেছি, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই গতিশীল। পৃথিবী এই মুহূর্তে মহাকাশের যেখানে আছে

পরের মুহূর্তে অন্যখানে সরে গেছে। পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সূর্যকে ঘুরছে সেকেন্ডে প্রায় 19 মাইল বা 30 কিমি বেগে। আবার সূর্য তার সৌরমণ্ডলকে নিয়ে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে এক সেকেন্ড প্রায় 160 মাইল বা 260 কিলোমিটার বেগে। ছায়াপথের আজ যেখানে সূর্য আছে, যেখানে ফিরে আসতে সূর্যের মোটামুটি সময় লাগে 25 কোটি বছর, যা হলো এক গ্যালাকটিক বর্ষ [Galactic Year]। কিন্তু ছায়াপথের সেই জায়গায় ফিরে এলেও মহাকাশের সেই জায়গায় আর আসছে না। কারণ মহাকাশে আমাদের ছায়াপথ তখন অনেক দূরে চলে যাবে, যেহেতু বিশ্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে এবং গ্যালাক্সীগুলি পরস্পরের থেকে সেকেন্ডে প্রায় 1,50,000 কিলোমিটার বেগে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। তবে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের [Big Bang Theory] 'সম্প্রসারণশীল বিশ্ব' মতবাদটি এখন আর ততটা জোরদার নয়। বিজ্ঞানীদের অনেকেই এখন বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের 'দোলন-তত্ত্বে' [Oscillation Theory] বিশ্বাসী। এই তত্ত্বই অনেকটা আধুনিক বিজ্ঞানের 'স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory]।

এখন চলেছে বিশ্বের প্রসারণ। এরপর শুরু হবে মহাসংকোচন। তবে বিশ্ব যদি বদ্ধ না হয়ে, চির-সম্প্রসারণশীল হয় তবে চলা থামবে না সময়ের। তার একমুখী গতি নিয়ে সে চলবে অনন্তকাল। এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি। 1500 কোটি কিংবা 2000 কোটি বছরের দীর্ঘ সময়ের পরেও আমরা জানিনা বিশ্ব বদ্ধ কিংবা মুক্ত। আগেই বলা হয়েছে,

$$\text{সন্ধি ঘনত্ব} = \frac{3H^2}{8\pi G}$$

হাবল স্থিরাংকের মান 50 কিমি/সেকেন্ড/প্রতি 10 লক্ষ পারসেক ধরলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এই মান 4.7×10^{-30} গ্রাম দাঁড়ায়। মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব এই মানের কম হলে মহাবিশ্বের প্রসারণ চলতে থাকবে অনন্তকাল, বিশ্ব হবে মুক্ত। আর এই ঘনত্ব এই মানের সমান বা বেশি হলে সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন দেখা যাবে। বিশ্ব হবে তখন বদ্ধ। বদ্ধ বিশ্বে সময় শুরু হয় মহাবিস্ফোরণে এবং শেষ হয় মহাসংকোচনের শেষে অনন্যতায়। আর বিশ্ব মুক্ত হলে তার প্রসারণ চলবে অনন্তকাল। সেক্ষেত্রে সময়ের আদি থাকলেও সময়ের অন্ত থাকবে কিনা তা অজানা। সময়ের বিপ্রতীপ গতি সেখানে সম্ভব হবে কিনা তা বিতর্কিত বিষয়! অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, মুক্ত বিশ্বের অনন্ত প্রসারণের ফলে মৃত মহাবিশ্বে অনন্তকাল টিকে থাকবে ফোটন, নিউট্রিনো, গ্রাভিটন এবং সম্ভবতঃ কিছু ইলেকট্রন, পজিট্রন। আবারো বলি, মুক্ত বিশ্বের অবস্থা কাল বা সময়ের প্রেক্ষাপটে কী দাঁড়াবে তা বিজ্ঞানীরা বলতে পারছেন না।

সময়ের শুরু থেকে মহাবিশ্বে প্রধান যে সব ঘটনা ঘটেছে তার একটা তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে। নীচের তালিকায় চোখ বোলালে অত্যাধুনিক সময় ধারাণার একটা রূপরেখা পাওয়া যাবে। এই তালিকাটি একটি লগারিদম্ স্কেল [Logarithmic Scale], যেখানে সময়ের অন্তর দশের গুণিতকে কমছে।

মহাবিস্ফোরণ থেকে সেকেন্ডে সময়	তুলনামূলক কাল-পরিমাণ এবং ঘটনাসমূহ
10^{20}	প্রায় 3×10^{12} বছর। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন 2×10^{12} বছর আগে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল, অর্থাৎ বিশ্বের বর্তমান বয়স 2×10^{12} বছর।

মহাবিস্ফোরণ থেকে সেকেন্ডে সময়	তুলনামূলক কাল-পরিমাণ এবং ঘটনাসমূহ
10^{19}	মোটামুটি 3×10^{11} বা 30,000 কোটি বছর। কারো কারো মতে মহাবিশ্বের শিশুকাল।
10^{18}	3000 কোটি বছর। মহাবিশ্বের প্রকৃত বয়স অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণের কাল হল 2000 কোটি বছর।
10^{17}	300 কোটি বছর। সৌর মণ্ডল সৃষ্টি হয় 4.6×10^{9} বা 460 কোটি বছর আগে। সূর্যের বয়স অবশ্য প্রায় 500 কোটি বছর।
10^{16}	মোটামুটি 3×10^{8} বা 30 কোটি বছর। সূর্য তার সৌরমণ্ডল নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সী একবার ঘুরে আসে 20 কোটি [মতান্তরে 25 কোটি] বছরে। পৃথিবীতে ডায়নোসরাস এসেছিল 1.35×10^{8} বছর বা 13.5 কোটি বছর আগে।
10^{15}	3 কোটি বছর। ডায়নোসরাসরা লুপ্ত হয়েছে অনেক আগেই। জীবের ক্রমবিকাশ চলছে পৃথিবী জুড়ে।
10^{14}	মোটামুটি 30 লক্ষ বছর। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় 30 লক্ষ বছর আগে।
10^{13}	প্রায় 3 লক্ষ বছর। মানুষ তখনও আগুন জ্বালাতে শেখে নি।
10^{12}	মোটামুটি 30,000 বছর। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় ওই রকম সময় লাগে।
10^{11}	প্রায় 3000 বছর। 10,000 বছর আগে শেষ 'হিমযুগ' [Ice-Age] পৃথিবীতে এসেছিল। বুদ্ধদেব পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রায় 2600 বছর আগে। উপনিষদীয় মহান যুগ চলছে তখন ভারতের মাটিতে।
10^{10}	মোটামুটি 300 বছর। 280 বছর আগে 1727 সালে নিউটনের মহাপ্রয়াণ ঘটে।
10^{9}	প্রায় 30 বছর। এক পুরুষ বলতে আমরা ওই সময়টাকেই ধরি।
10^{8}	প্রায় তিন বছর।

মহাবিস্ফোরণ থেকে সেকেন্ডে সময়	তুলনামূলক কাল-পরিমাণ এবং ঘটনাসমূহ
10^{7}	প্রায় 108 দিন। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা হল 14.75 দিন।
10^{6}	10.8 দিন। এক সপ্তাহ হয় সাত দিনে।
10^{5}	1.08 দিন। একটু কমালে একদিন। মোটামুটিভাবে এক লক্ষ সেকেন্ডে এক দিন। প্রকৃতপক্ষে এক সৌরদিন হল 86,400 সেকেন্ড।
10^{4}	167 মিনিট।
10^{3}	17 মিনিট প্রায়। 16.7 মিনিট।
10^{2}	এক মিনিট 40 সেকেন্ড
10	দশ সেকেন্ড।
10^{0}	এক সেকেন্ড ।
10^{1}	এক সেকেন্ডের দশ ভাগের একভাগ। এই সময়ের মধ্যে একবার কম্পন হলে সে শব্দ মানুষ শুনতে পায়।
10^{-2}	এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ। Turbo-fan-এর একবার ঘূর্ণনের সময়।
10^{-3}	ডাঁশ জাতীয় পতঙ্গের পাখনার একবার কম্পন সময়, যা এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের একভাগ।
10^{4}	এক সেকেন্ডের 10,000 ভাগের এক ভাগ সময়। 10,000 কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ শুনতে মানুষের অসুবিধা হয় না।
10^{-5}	এক সেকেন্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। 25,000 কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ মানুষ শুনতে পায়। তখন তার একবার কম্পনের সময় 4×10^{-5} সেকেন্ড।
10^{-6}	এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।
10^{-7}	এক সেকেন্ডের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। এই সময়ে ইলেকট্রন রশ্মি তার উৎস থেকে টিভির পর্দায় চলে আসে।

মহাবিস্ফোরণ থেকে সেকেন্ডে সময়	তুলনামূলক কাল-পরিমাণ এবং ঘটনাসমূহ
10^{-8}	সেকেন্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ। এই সময়ে FM তরঙ্গ কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে।
10^{-9}	সেকেন্ডের 100 কোটি ভাগরে এক ভাগ। কোন VHF তরঙ্গের কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করতে যে সময় লাগে।
10^{-10}	এক সেকেন্ডের 1000 কোটি ভাগের এক ভাগ। এই সময়ে একটি SH কম্পাঙ্কের তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে।
10^{-11}	এক সেকেন্ডের 10,000 কোটি ভাগের এক ভাগ সময়। এই সময়ে দৃশ্য আলোর তরঙ্গ জানালার কাঁচ অতিক্রম করে।
10^{-12} 10^{-13} 10^{14}	অবলোহিত রশ্মি [Infrared Beam] এবং দৃশ্য আলোকরশ্মি এই সময়গুলিতে বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে।
10^{15}	সেকেন্ডের 10 কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়। হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন এই সময় নেয় প্রোটনকে একবার ঘুরে আসতে।
10^{-16}	অতিবেগুনি রশ্মি [Ultra-violet Ray] এই সময় নেয় কোন নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করতে।
10^{-17} 17^{-18} 10^{19} 10^{-20} 10^{-21} 10^{22}	এই সময়গুলি X-রশ্মি বা গামা-রশ্মি নেয় কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করতে।
10^{-23}	0.00000000000000000000001 সেকেন্ড
10^{-24} 10^{-25}	ক্ষণস্থায়ী কণাদের অস্তিত্বের সময়।
10^{30}	এই সময়ের পর বিশ্বের ব্যাসার্ধ একটি প্রোটনের প্রায় 10^{50} গুণ বড় হয়ে উঠেছিল।

মহাবিস্ফোরণ থেকে সেকেন্ডে সময়	তুলনামূলক কাল-পরিমাণ এবং ঘটনাসমূহ
10^{-43}	এই সময়ের পূর্বের কোনও কিছু জানা সম্ভব নয়। আমরা যা জেনেছি তা এই সময়ের পরের অবস্থা। এই সময় অবধি মোট কাল হল 'প্ল্যাঙ্ক সময়'। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে 10^{-43} সেকেন্ড অবধি সবই আমাদের অজানা। আন্তর্জাতিক এককে প্ল্যাঙ্ক সময়ের মান $\sqrt{\frac{Gh}{2\pi C^5}} = 5.39 \times 10^{-44}$ সেকেন্ড।

তালিকা ঃ 8

মহাবিস্ফোরণের পর সময়ের চলা শুরু। বিশ্ব বদ্ধ হলে, মহাসংকোচন হবে, সময় বিপরীতমুখী হবে এবং এক সময় অনন্যতায় তা শূন্য হবে। বদ্ধ বিশ্বে সময়ের বিপরীতমুখীনতা সম্ভব। কিন্তু বিশ্ব বদ্ধ কিংবা মুক্ত তা আমরা আজও জানি না। মুক্ত বিশ্বে সম্প্রসারণ আছে, মহাসংকোচন নেই। সেক্ষেত্রে সময়ের গতি তার একমুখীনতা নিয়ে অনন্তকাল ধরে চলবে। তার শেষ কোথায় তা নির্ণয় করা যাবে না, কিংবা বলা যায় তা অজানাই থাকবে। সেক্ষেত্রে সময়ের আদি থাকলেও অন্ত পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং বদ্ধ বিশ্বে সময়ের আদি-অন্ত থাকবে, কিন্তু মুক্ত বিশ্বে সময়ের একটা শুরু থাকলেও তার শেষ কোথায় তা আমাদের জানা নেই। ●

একাদশ পরিচ্ছেদ

মহাসময়ের প্রেক্ষাপট

[মহাবিস্ফোরণের পর শুরু হল সময়ের চলা। চলমান সময়ের একটা বিরাট অংশ জুড়ে পৃথিবী অনুপস্থিত। পৃথিবী এসেছে মাত্র 460 কোটি বছর আগে। আর মানুষ এসেছে মাত্র পাঁচ লক্ষ বছর। পৃথিবীতে তথাকথিত সভ্যতা এসেছে পাঁচ-সাত হাজার বছর আগে। এই পাঁচ-সাত হাজার বছর সময়কে মানুষ এতো বৈচিত্র্যময়তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে এবং সেই ব্যবহারে এতোটাই ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছে যে তা রীতিমত বিস্ময়ের। পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মহাসময়কে মানুষ আশ্চর্যজনকভাবে কাজে লাগিয়েছে। প্রবহমান সময়কে কাজে লাগানোর ইতিহাসের সামান্য নমুনা তুলে ধরা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। দেওয়া হয়েছে মহাসময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, যা একাধারে রোমাঞ্চকর এবং স্বস্তিদায়কও বটে।]

অনন্যতার মহাবিস্ফোরণের পর সময়ের চলা শুরু। সেই মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে প্রায় 1800 কোটি কিংবা 2000 কোটি [2×10^{10}] বছর ধরে। আরও 2000 কোটি বছর চলবে সে মহাপ্রসারণ। তারপর শুরু হবে মহাসংকোচন, যদি এই মহাবিশ্ব বদ্ধ হয়। এই মহাসংকোচনের শেষে আবার আসবে অনন্যতা। সেই অনন্যতা 2000 কোটি বছর আগের ওই অনন্যতার সঙ্গে এক নাও হতে পারে। মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে মহাবিশ্বের নানা পরিবর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে। এবার পৃথিবীর কথায় আসা যাক। পৃথিবীর বয়স মাত্র 460 কোটি বছর। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়সের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমাদের পরিচিত সূর্য একটা সাধারণ নক্ষত্র। তার বয়স প্রায় 550 কোটি বছর। মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে এখন আমাদের পৃথিবীর কথায় আসি।

পৃথিবীর বয়স নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সর্বাধুনিক হিসাবটাও সঠিক নয় বলে অনেকে মনে করেন। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে পৃথিবীর বয়স হিসাব করা হয়েছে 460 কোটি বছর। পৃথিবীর ভূত্বক কঠিন হতে শুরু করেছে প্রায় 360 কোটি বৎসর আগে। তবে সূর্য থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্ব এখন প্রায় অচল। Tidal Theory এখন বহু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন না। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব হল 'Dust Cloud Hypothesis'। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী ও সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ প্রায় একই সঙ্গে মোটামুটি 550 কোটি বৎসর আগে সৃষ্টি হয়েছিল মহাজাগতিক ধূলিকণা ও হাইড্রোজেনের পারমাণবিক মেঘ থেকে । এই মতানুসারে এই পৃথিবীর বয়স সূর্যের বয়সের সঙ্গে সমান, অর্থাৎ 550 কোটি বৎসর। প্রাক্ কেম্ব্রিয়ান (Pre-Cambrian) যুগের কোন ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস আজও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ভূ-বিজ্ঞানীরা যেটুকু ইতিহাস বানিয়েছেন তা মাত্র 57 কোটি বছরের। অর্থাৎ 57 কোটি থেকে 360 কোটি অবধি বিশাল সময়ের ইতিহাস আমাদের অজানা। আরও অজানা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে তার ইতিহাস। তবে এইসব ইতিহাস মানুষের নয়, তার মাটির, তার ভূ-ত্বকের,তার জ্বলন্ত অবস্থার। সুতরাং পৃথিবীর বয়সের মাত্র এক-দশমাংশ আমাদের কাছে কিছুটা পরিচিতি রেখেছে, বাকি নয় ভাগই অজানা। সময়ের প্রেক্ষাপটে এতো গেল পৃথিবীর ইতিহাসের কথা।

তার সৃষ্টি মানুষের ইতিহাসও আমরা পুরোপুরি জানি না। বলা হয়, 500,000 বছর আগে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তারা আগুন জ্বালাতে শিখেছে নাকি 40,000 বছর আগে। এই পাঁচ লক্ষ বছর থেকে চল্লিশ হাজার বছর অবধি তারা কী করল তা অজানা। আবার 40,000 বছর থেকে মিশরের পিরামিড কিংবা হরপ্পা সভ্যতার কাল 34/35 হাজার বছর পরে। আগুন জ্বালাতে শেখবার পর 34000 বছর ধরে মানুষ কী করল তাও আমাদের অজানা। আবার মিশর কিংবা হরপ্পার সব কথা আমরা আজও জানি না। সুতরাং পৃথিবীর 550 কোটি বছরের ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশের কথা আমরা মোটামুটিভাবে জানি। যে সময়টুকুর কথা আমরা জানি তা বিশ্বের মহাসময়ের অতি তুচ্ছ একটা ভগ্নাংশ মাত্র। পৃথিবীর মোট বয়স যদি 100 বছর ধরা হয় তবে মানুষ এসেছে সাড়ে তিন দিন আগে, মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে মোটামুটিভাবে মাত্র সাত ঘণ্টা আগে, আর আমাদের জানা সভ্যতার সময় দাঁড়াবে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক।

পৃথিবীর বয়স 550 কোটি বছর কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মোটামুটি সর্বসম্মতভাবে মেনে নেওয়া পৃথিবীর বয়স হল 460 কোটি বছর। পৃথিবীর এই 460 কোটি বছরকে যে সব পর্যায়ে বা যুগে ভাগ করা হয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হল। এটি পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী।

• পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ •

যুগ	যুগের অন্তর্বিভাগ	কত কোটি বছর স্থায়ী হয়েছিল		আজ থেকে কত কোটি বৎসর আগে শুরু হয়েছিল।
কেনোজোয়িক	কোয়াটারনারী		0.1	0.1
	টারসিয়ারি	7.5	7.4	7.5
মেসোজোয়িক	ক্রিটেসিয়াস		6.0	13.5
	জুরাসিক	13	3.0	16.5
	ট্রায়াসিক		4.0	20.5
প্যালিওজোয়িক	পারমিয়ান		2.5	23.0
	কার্বনিফেরাস		5.0	28.0
	ডেভোনিয়ান		4.5	32.5
	সিলিউরিয়ান		3.5	36.0
	অরডোভিসিয়ান	29.5	6.0	42.0
	ক্যামব্রিয়ান		8.0	50.0
প্রিক্যামব্রিয়ান		150	—	200
অ্যাজোয়িক		260	—	460

(পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য ঃ ডঃ তারকমোহন দাস)

তালিকা ঃ 9

কেনোজোয়িক যুগের কোয়াটারনারি ও টারসিয়ারি বিভাগকে আরও কতকগুলি অন্তর্বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। মানুষের বিবর্তনের কথায় এই অন্তর্বিভাগগুলি কাজে লাগে। তাই ওই অন্তর্বিভাগের একটা তালিকাও দেওয়া হল।

কেনোজোয়িক যুগ ও তার অন্তর্বিভাগগুলির নাম		স্থায়িত্বকাল কোটি বছরে	আজ থেকে কত কোটি বছর আগে শুরু হয়েছিল
কোয়াটারনারি	আধুনিক	0.002 (কুড়ি হাজার বছর)	0.002 (কুড়ি হাজার বছর)
	প্লিসটোসিন	0.10 (দশ লক্ষ বছর)	0.10 (দশ লক্ষ বছর)
টারসিয়ারি	প্লিওসিন	1.1	1.2
	মিওসিন	1.6	2.8
	অলিগোসিন	1.1	3.9
	ইয়োসিন	1.9	5.8
	প্যালিওসিন	1.7	7.5

এই 'প্লিসটোসিন'-কে অনেকে বলেছেন 'প্লাইস্টোসিন'। এর সময়কাল কেউ বলেছেন 10 লক্ষ বছর, কেউ বলেছেন 20 লক্ষ বছর। এই প্লাইস্টোসিন যুগেই ঘটেছে মানুষের আবির্ভাব।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, কোটি কোটি বছরের হিসাবের মধ্যে আধুনিক যুগের কুড়ি হাজার বছর প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই আসছে না। এই ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী নিয়েও কিছুটা মতভেদ আছে ভূ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে। আবার নৃবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলি এর সঙ্গে জুড়লে উপরের তালিকার সময়সীমাগুলি কমবেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ একটা যুগ কিংবা তার অন্তর্বিভাগগুলির যে সময়সীমা ধরা হয়েছে সেগুলির মান কমবেশি হয়ে পড়ে। এছাড়াও ইংরেজী শব্দগুলির বাংলা উচ্চারণের বিভিন্নতা পাঠকদের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এগুলি দূর করতে আরেকটি তালিকা নীচে দেওয়া হল পৃথিবীর 460 কোটি বছর বয়সের বিভিন্ন বিভাগ সংক্ষেপে জানতে। এবারের তালিকাটি ভূতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলি মিলিয়ে বানানো। এই তালিকার সময়সীমাগুলি বহুল ব্যবহৃত। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য উপরের তালিকাটিই বেশি ব্যবহার করেন। আর ভূতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা বেশি ব্যবহার করেন নীচের তালিকাটি। নামভেদ ও সময়ভেদ নিয়ে পৃথিবীর 460 কোটি বছর বয়সের ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী যেমন দাঁড়ায় তা হল ঃ

• ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী •
(নীচ থেকে উপরে পাঠ্য)

মহাযুগ	যুগ	কত কোটি বছর আগে	ওই সময়ের প্রাণী ও উদ্ভিদ
সেনোজয়েক বা কেনোজোয়িক	প্লাইস্টোসীন প্লাওসীন মাইয়োসীন অলিগোসীন ইওসীন	0.20 2½ 7	কপি-নর ও মানুষ আধুনিক গাছপালা পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীব
মেসোজয়েক	ক্রিটেশস্ জুরাসিক ট্রায়োসিক	13½ 18 22½	ডাইনোসেরস, সাইকেড জাতীয় উদ্ভিদ, আদিমতম পক্ষী, অ্যামোনাইটস্, দুরন্ত সামুদ্রিক জীব।
প্যালিওজয়েক	পারমিয়ান কারবনিফেরাস ডিভোনিয়ান সিলুরিয়ান অর্ডোভিসিয়ান ক্যামব্রিয়ান	27 35 40 44 50 60	আদি স্তন্যপায়ী জীব, বৃশ্চিক ও আদি সরীসৃপ, উভচর, ফার্ণ জাতীয় বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, মৎস্য, আদি উদ্ভিদ মেরুদণ্ডহীন জীব
আর্কিজয়েক	আর্কিয়ান	200	জীবনের উন্মেষ
অ্যাজোয়িক		460	
পৃথিবীর বয়স		460	

(মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য ঃ ডঃ অতুল সুর)

তালিকা ঃ 10

মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর আবির্ভাব অনেকটাই পরে। আবার পৃথিবীর 460 কোটি বছর বয়সের প্রেক্ষিতে মানুষ এসেছে আরও অনেক পরে। এই সেদিন যেন তার আবির্ভাব। পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয়েছে 200 কোটি বছর আগে। অর্থাৎ পৃথিবীর 57 শতাংশ ভাগ সময় ছিল জীবনহীন, প্রাণশূন্য। মানুষ এসেছে অনেকটাই পরে। বিশ লক্ষ বছর আগে আবির্ভূত হওয়া অস্ট্রালোপিথেকাসকে (Australopithecus) মানুষের পূর্বপুরুষ ধরলে পৃথিবীর বয়সের 99.957 শতাংশ ভাগ সময় জুড়ে পৃথিবী ছিল মানবহীন। মানুষ এসেছে সবার শেষে, সবার পেছনে। কিন্তু জীবনের রঙ্গমঞ্চে সে

আজ নিয়েছে নায়কের ভূমিকা। সে তার প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকেই এই গৌরব পায়নি। মানুষের সভ্যতা বলতে যা বোঝায়, তার বয়স মাত্র 8-10 হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ মানুষ যতদিন এসেছে তার 99.5 শতাংশ ভাগ সময়ই সে কাটিয়েছে বনে, জঙ্গলে, জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে তাদের মতোই জীবনযাপন করে। সবার উপর আধিপত্য করার বুদ্ধি তখন তার ছিল না। সভ্যতার সূচনা হল তার বুদ্ধির উন্মেষ থেকে। অন্যদের উপর তার আধিপত্য করার শুরু হল সে সময় থেকেই। অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন, গৃহ ও জনপদ স্থাপন, চাষ-আবাদ শুরু করে নিরাপত্তা বৃদ্ধি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির সাহায্যে সে এই আধিপত্য আরও বেশি করে কায়েম করতে পেরেছে। বলা হয়, গত তিনশো বছরের মধ্যে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে গিয়ে পৃথিবীর জল, স্থল বায়ুমণ্ডলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক চরিত্রের এত অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে বিপর্যস্ত করেছে যে, বিগত 200 কোটি বছরের মধ্যে কোন প্রাণী তেমন বিপর্যস্ত করতে পারে নি। মানুষ আর 5000 বছর এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। অনেকে মনে করেন একবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। তথাকথিত সভ্যতার সেটাই হবে চরম পরিণতি। পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয়। পৃথিবী লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের জন্য। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত না হলে মানুষ নিজের নিশ্চিহ্ন হওয়াটা নিজেই ডেকে আনবে। সবার উপর আধিপত্য করার অদম্য লোভই তাকে নিয়ে যাচ্ছে মানব জাতির ধ্বংসের দিকে। সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে। শিবালিক পাহাড়ের বিস্তীর্ণ প্রদেশে। এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে রামাপিথেকাস, সুগ্রীব পিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস প্রভৃতি নরাকার জীবের জীবাশ্ম। পণ্ডিতদের মতে, ভারতের এই অঞ্চলেই ঘটেছিল আদি মানুষের সর্বপ্রথম বিবর্তন। রামাপিথেকাসই (Ramapithecus) মানব জাতীয় জীবগণের (Dryopithecus) মধ্যে প্রথম বৃক্ষ ত্যাগ করে মাটিতে আশ্রয় নেয়। এই রামাপিথেকাস থেকেই পরে মানুষের উদ্ভব হয়। প্রায় 1 কোটি 20 লক্ষ বছর আগে রামাপিথেকাস আবির্ভূত হয় হিমালয়ের এই অঞ্চলে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই রামাপিথেকাসরাই পরে এই অঞ্চল থেকে আফ্রিকা ও চীন দেশে গিয়ে সেখানকার ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে নিজ নিজ বিশিষ্টতা লাভ করে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

রামাপিথেকাস থেকেই প্রায় 20 লক্ষ বছর আগে জন্ম নেয় অস্ট্রালোপিথেকাস [Australopithecus]। এরা ভারত থেকেই এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জাভা পর্যন্ত গিয়েছিল। কেনিয়া ও তানজানিয়াতেও *এদের পাওয়া গেছে। এরা প্রকৃত মানুষ নয়। কিন্তু এদের থেকে বিবর্তনে এসেছে মানুষ। প্রায় পাঁচ লক্ষ* বছর আগে ঋজুভাবে চলাফেরা করতে সমর্থ [Homo Erectus] মানুষ এসেছে পৃথিবীতে। এরপর আসে নিয়ানডারথাল জাতির মানুষ [Neanderthal Man] প্রায় দেড় লক্ষ বছর বা 1,50,000 বছর আগে। এরা প্রায় 40,000 বছর আগে নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এদের জায়গায় আসে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ *'ক্রোম্যানিয়ন' [Cromagnon] জাতির মানুষ। অনেকে মনে করেন, নিয়ানডারথাল মানুষেরা নিশ্চিহ্ন হয়* নি। তারা মিশে গিয়েছিল ক্রোম্যানিয়নদের সঙ্গে। ক্রোম্যানিয়ন মানুষেরা কীভাবে আবির্ভূত হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ অজানা। তবে, এটা সবাই মেনে নিয়েছেন যে, এই ক্রোম্যানিয়ন মানুষেরাই আধুনিক মানুষদের পূর্বপুরুষ। বলা হয়, প্রায় 40,000 বছর আগে এই ক্রোম্যানিয়ন মানুষেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়।

পৃথিবীতে মানুষেরা প্রথম এসেছিল প্লাইস্টোসীন যুগে। প্লাইস্টোসীন যুগে পৃথিবী চারবার তুষারাবৃত হয়েছিল। তুষার ঢাকা পড়ায় এই যুগকে 'তুষার যুগ' বলা হয়। এই তুষার যুগে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরের অর্ধাংশ তুষারাবৃত হয়। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী পলভাইস-এর মতে মানুষ হল এই তুষার যুগের সৃষ্টি — Man is the product of Ice Age. । তাঁর মতে, এই ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে, নানা রকম কলাকৌশলের আবিষ্কার করতে হয় মানুষকে এবং এর ফলেই মানুষের মস্তিষ্কের দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে। বরফ এখনও পুরোপুরি গলেনি, প্রচুর বরফ জমে আছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে। অথচ তুষার যুগের আগে মেরু সন্নিহিত অঞ্চলে বরফের কোনও চিহ্নই ছিল না। মেসোজোয়িক যুগে সেখানে অরণ্য ছিল। আজও তাই সেখানে কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া যায়।

যাইহোক, পৃথিবীতে আসা চারটি তুষার যুগ হল ঃ

(1) প্রথম তুষারযুগ বা গুনজ [Gunz] তুষার যুগ।

(2) দ্বিতীয় তুষার যুগ বা মিন্ডেল [Mindel] তুষার যুগ।

(3) তৃতীয় তুষার যুগ বা রিস [Riss] তুষার যুগ।

(4) চতুর্থ তুষার যুগ বা ভুরম [Wurm] তুষার যুগ।

আদি তুষার যুগ এসেছিল 10,00,000 বা দশ লক্ষ বছর পূর্বে। মধ্যতুষার যুগ আসে 4,50,000 বছর আগে এবং অন্তিম তুষার যুগ এসেছিল 1,00,000 বছর পূর্বে। ভাগটা এই রকম ঃ

[1] আদি তুষার যুগ	প্রাক-Gunz তুষার যুগ	
[প্রথম]	Gunz- তুষার যুগ	দশ লক্ষ বছর আগে
[2] মধ্য তুষারযুগ	Gunz-Mindel অন্তর যুগ	
[দ্বিতীয়]	Mindel তুষার যুগ	সাড়ে চার লক্ষ বছর আগে
	Mindel-Riss অন্তর যুগ	
[3] অন্তিম তুষারযুগ	Riss তুষার যুগ	এক লক্ষ বছর আগে
[তৃতীয় ও চতুর্থ]	Riss-Wurm অন্তর যুগ	
	Wurm তুষার যুগ	

সুতরাং প্রথম তুষার যুগ দশ লক্ষ বছর, দ্বিতীয় তুষার যুগ সাড়ে চার লক্ষ বছর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তুষার যুগ এসেছে এক লক্ষ বছর আগে।

তুষার যুগ কেন এল তার কারণ বিজ্ঞানীরা বলতে পারছেন না। পৃথিবীর 460 কোটি বছরের ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে হঠাৎ কোন্ কারণে চারটি তুষার যুগ এসে হাজির হল তা আজও অব্যাখ্যাত। তবে তুষার যুগ আসায় মানুষের বুদ্ধির বিকাশ দ্রুত হয়েছে এটা বলছেন বিজ্ঞানীরা। পণ্ডিতেরা তুষার যুগ কেন এলো এবং হঠাৎই এলো তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে না পেরে বলছেন ঃ

"Several theories have been put forward such as variations in the strength of solar radiation, *sunspot activity causing increased snowfall and rainfall, a change in the position of the poles,* which would alter the seasons and have effect on the present polar ice caps seem to be large but their fate over the next ten or twenty thousand years is unknown. Neither do we know whether the Ice Age is over. It may be that this is sinply another interglacial phase prior to the spread of a new ice-cap over northen Europe and America.

প্লাইস্টোসীন যুগের আরম্ভে পৃথিবীর যে সব অংশ তুষার মুক্ত ও উষ্ম আবহাওয়ায় ছিল সেই সব জায়গায় আবির্ভূত হয় ঋজুভাবে চলাফেরা করতে পারে [Homo Erectus] এমন নরাকার জীব। মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগে এল নরাকার জীবসমূহের মধ্যে মানুষের লক্ষণযুক্ত কপি- নর বা Ape-man। এর হল অস্ট্রালোপিথেকাস। এরা প্রকৃত নর বা Homo-sapiens নয়, এরা কপি-নর মাত্র। আগেই বলেছি, অস্ট্রালোপিথেকাসরা রামাপিথেকাসদেরই বংশধর। প্লাইস্টোসীন যুগের শেষার্ধে কোনও একটা সময় অস্ট্রালোপিথেকাস ও হোমো-ইরেকটাসরা পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কীভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয় তা আমাদের অজানা। এরপর আসে নিয়ানডারথাল মানুষ। সেও প্রায় 1,50,000 বছর আগে। এই সব নরাকার জীবদের বুদ্ধিবৃত্তির কতটা বিকাশ ঘটেছিল তা বোঝা যায় তাদের কঙ্কালাস্থি ও মস্তিষ্কের ঘিলুর পরিমাণ [Brain Capacity] থেকে। বুদ্ধির বিকাশে মাথার ঘিলুর পরিমাণের একটা ভূমিকা আছে। নরাকার জীব এবং প্রকৃত মানুষের মস্তিষ্কের ঘিলুর পরিমাণের একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল, বুদ্ধির বিকাশে ঘিলুর পরিমাণের প্রভাব বুঝতে।

প্রাণীর নাম	মস্তিষ্কের ঘিলুর পরিমাণ ঘন-সেন্টিমিটারে [সি. সি.]
1) গিবন	99
2) শিম্পাজী	397
3) অস্ট্রালোপিথেকাস	670
4) হোমো হ্যাবিলাস	670
5) পিথেকানথ্রপাস	770-900
6) হোমো-ইরেকটাস	700-1200
7) সিনানথ্রপাস	1015-1255
8) রোডেসীয় মানুষ	1283
9) নিয়ানডারথাল মানুষ	1200-1600
10) সোয়ানকুম মানুষ	1000-1325
11) আধুনিক মানুষ	1000-2000 [গড় 1300]

নিয়ানডারথাল মানুষের মস্তিষ্কটা বেশ পরিণতই ছিল। কিন্তু তারা প্রায় 40,000 বছর আগে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তা আমাদের অজানা। অনেকে মনে করেন তারা ক্রোম্যানিয়নদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। 40,000 বছর আগে এসেছে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ। ওরাই আধুনিক মানুষ। পণ্ডিতরা বলছেন, এদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ককাসয়েড [Caucaoli], মংগোলয়েড [Mongoloid], নিগ্রয়েড [Negroid] এবং অস্ট্রালয়েড [Australoid] প্রভৃতি মানবগোষ্ঠী। বলা হয়, নরগোষ্ঠীর মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য যে সব কারণে ঘটেছে সেগুলি হচ্ছে ঃ 1) জীনঘটিত পরিব্যক্তি [Gene Mutation], 2) প্রাকৃতিক নির্বাচন [Natural Selection], 3) জীনের নিষ্ক্রিয়তা [Genetic Drift], 4) পরিবেশের প্রভাব [Environmental Influence] এবং 5) জন-মিশ্রণ [Population Mixture].

আদিম মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা এবং আনুষঙ্গিকভাবেই সমস্যা ছিল উদরপূর্তির। তাদের আবির্ভাবকালে পৃথিবীতে ছিল অতিকায় হাতি [Mammoth], বনমহিষ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু। সে সময় মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস। বন্য ফলমূলও তারা কিছু খেত। উদরপূর্তির

জন্য তাদের পশুশিকারে যেতে হত। সুতরাং আত্মরক্ষা ও পশুশিকার এই দুই প্রয়োজনে আদিম মানুষ বানিয়েছিল পাথরের আয়ুধ। জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের জন্য বানানো পাথরের আয়ুধগুলিই তাদের কৃষ্টির একমাত্র নিদর্শন। মানুষের সভ্যতার উন্মেষকালকে তাই বলা হয়, 'প্রস্তর যুগ' [Stone Age]। আদি মানবদের নির্মিত পাথরের আয়ুধ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পেয়েছি। এই আয়ুধ বানানো হয়েছে হয় চকমকি পাথর বা Flint, আর তা নয় তো নদীর ধারে পাওয়া নুড়ি-পাথর [Pebbles] ও কোয়ার্টজাইট পাথর থেকে।

মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে প্রস্তরযুগকে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে- 1) আদি প্রস্তরযুগ বা 'প্রত্নোপলীয় যুগ' [Palaeolithic Age], 2) 'মধ্য প্রস্তরযুগ' বা 'মধ্যোপলীয় যুগ' [Mesolithic Age], এবং 3) অন্তিম প্রস্তর যুগ বা 'নবোপলীয় যুগ' [Neolithic Age]। আদি প্রস্তর যুগ হল প্রত্নোপলীয় যুগ। এই যুগের স্থিতিকাল বেশ দীর্ঘ। বলা হচ্ছে এই যুগ পাঁচ লক্ষ বছর থেকে পঁচিশ হাজার বছর অবধি বিস্তৃত ছিল। মধ্য প্রস্তর যুগের বিস্তার ছিল 25,000 বছর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪000 বছর অবধি। আর নবোপলীয় যুগ হল খ্রিস্টপূর্ব ৪000 বছর থেকে খ্রিস্টপূর্ব 3000 বছর। পণ্ডিতেরা প্রত্নোপলীয় যুগকে আবার আট ভাগে ভাগ করে তার বিস্তৃত সময় সীমাকে ছোট ছোট ভাগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই আট ভাগ হল ঃ

প্রত্নোপলীয় যুগ বিভাগ		কত বছর পূর্বে
[1] আদি প্রত্নোপলীয় যুগ	অ্যাবেভিলিয়ান	5,00,000-4,70,000
	চেলিয়ান	4,70,000-4,05,000
	অ্যাশুলিয়ান	4,35,000-1,15,000
[2] মধ্য প্রত্নোপলীয় যুগ	লেভালয়সিয়ান	2,30,000-72,000
	মুস্টেরিয়ান	1,50,000-72,000
[3] অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগ	অরিগনেসিয়ান	1,15,000-72,000
	সলুট্রিয়ান	72,000
	ম্যাগডেলেনিয়ান	72,000-25,000

উপরের তালিকায় যুগ ভাগা-ভাগির ওই সময়কাল দেখলে বোঝাই যায় যে, একটা যুগের পুরোপুরি শেষ হতে না হতে শুরু হয়ে গেছে আরেকটা যুগ। অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় একটা যুগের শেষ কিংবা আরম্ভ নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। যেমন, অ্যাশুলিয়ান বিভাগ শেষ হয়েছে 1,17,000 বছর আগে, অথচ তার অনেক আগেই অর্থাৎ 2,30, 000 বছর আগেই শুরু হয়ে গেছে লেভালয়সিয়ান যুগ, যা মধ্য প্রত্নোপলীয় যুগ বিভাগের একটা ভাগ। কিন্তু অ্যাশুলিয়ান ভাগকে রাখা হয়েছে আদি প্রত্নোপলীয় যুগের অংশ হিসাবে যেহেতু এর শুরু 4,35,000 বছর আগে। আবার যে মধ্যোপলীয় বা মধ্য-প্রস্তর যুগের কথা আমরা একটু আগে বলেছি, এই মধ্য প্রত্নোপলীয় বিভাগ তার সঙ্গে এক নয়। মধ্যোপলীয় বা মধ্য-প্রস্তর যুগ বলতে আমরা বুঝি প্রত্নোপলীয় যুগের শেষে 25000 বছর থেকে খ্রিস্টপূর্ব 8000 বছর অবধি বিস্তৃত কালকে অর্থাৎ তার পরমায়ু মাত্র 15,000 বছর। কিন্তু প্রত্নোপলীয় বা পুরা-প্রস্তর যুগের মধ্য ভাগের বিস্তার ছিল 2,30,000 বছর থেকে 72,000 বছর অবধি। আরেকটা বিভাজন অনুসারে, পুরা-প্রস্তর যুগ বলতে প্রায় 20 লক্ষ বছর থেকে শুরু করে 12000 বছর আগেকার সমস্ত সময়টাকেই বোঝায়। এর মধ্যে 50,000 বছর পর্যন্ত সময়কে আদি প্রস্তরযুগ, 50,000 থেকে 20,000 বছর পর্যন্ত সময়টাকে মধ্য পুরা-প্রস্তরযুগ এবং 20,000 বছর

থেকে 12,000 বছর আগে পর্যন্ত সময়কে অন্ত-পুরাপ্রস্তর যুগ হিসাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এই বিভাজন বলছে নব্য-প্রস্তরযুগের শুরু হয়েছে 10,000 বছর আগে অর্থাৎ প্রায় 8,000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

আদি মানুষের আয়ুধগুলিই তাদের কৃষ্টির প্রকাশ। আদি প্রত্নোপলীয় যুগের বিশিষ্ট আয়ুধ ছিল হাত-কুঠার। এছাড়াও ছিল মাংস কাটার অস্ত্র [Choppers], মাংস ছেদন করার আয়ুধ [Cleavers] ইত্যাদি। মধ্য দশার প্রত্নোপলীয় যুগে অর্থাৎ নিয়ানডারথাল মানুষদের সময় মাংস চাঁছবার আয়ুধ [Scrapers] বিশেষভাবে তৈরি হতে থাকে। এই সময় পুরানো বহু আয়ুধ অনেক উন্নততর হয়। নিয়ানডারথালদের এই উন্নততর কৃষ্টিকে মুস্টেরিয়ান কৃষ্টিও বলা হয়ে থাকে। প্রত্নোপলীয় যুগের একেবারে অন্তিমদশায় আরও বহু নতুন নতুন আয়ুধ নির্মিত হয়। জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটাবার জন্য নতুন নতুন শিল্পের পত্তন হয়। এর মধ্যে ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্মিত ছুরির ফলা এবং খোদাই করার যন্ত্র [Burins]। খোদাইয়ের যন্ত্রগুলি বেশ ক্ষুদ্রকায় হত এবং ওগুলি দিয়ে নরম পাথর, কাঠ ও হরিণের শিংয়ের উপর চিত্রাঙ্কন করা হত। এই সময় 'পিন' (Pin) এবং বর্শা ফলকেরও আবির্ভাব ঘটে। এগুলি কিন্তু সবই পাথরে নির্মিত। হারপুন, সূচ, বর্শা ফলক ইত্যাদি সবই এই সময়েই আবিষ্কৃত হয়। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষ পর্যায়ে আসে 'মেসোলিথিক' [Mesolithic] যুগ। এই মেসোলিথিক যুগকে আমরা মধ্য-প্রস্তর যুগও বলি, আবার একে সন্ধিকালের যুগও বলা হয়। কারণ এটাই প্রত্নোপলীয় যুগ [Palaeothic Age] ও পরবর্তী নবোপলীয় যুগের [Neolithic Age] মধ্যে সেতুবন্ধন।

অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষের দিকে মানুষেরা পর্বতের গুহায় ছবি আঁকা শুরু করে। এই গুহা চিত্রাঙ্কনের মধ্যে স্পেনের আলটামিরা, ফ্রান্স, ইতালি ও ভারতের পর্বতগাত্রসমূহে আঁকা চিত্রাবলী উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে 42 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভীমবেটকা পাহাড়ের গুহাপুঞ্জেই জগতের বৃহত্তম প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলাসমূহের অবস্থান। ভারতের অন্যান্য যে সব জায়গায় এই সময়ের চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি হল ঃ মহীশূরের বেলারী, কেরলের ওয়াইনাড়, সিংভূম জেলার মৌভাণ্ডার ও ঘাটশিলা, বিন্ধ্যপর্বতের কাইমুর শৈলমালা ও সাতপুরা পাহাড়ের ঘোড়ানগর এবং মহাদেও পাহাড়। আরও অনেক জায়গায় এই ভারতেই পাওয়া গেছে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষের দিকের মানুষের আঁকা চিত্রাবলী। সারা ভারতবর্ষে যেমন বহু জায়গায় এই আমলের চিত্রকলা পাওয়া গেছে পর্বতগুহায়, পর্বতগাত্রে, তেমনি সারা পৃথিবীর বহুস্থানেই এ রকম চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সব চিত্রকলাগুলির মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত হল ইতিহাস বিখ্যাত আলটামিরার [Altamira] গুহাচিত্র। এটি স্পেন দেশে। এর কথা সারা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই জানে। কিন্তু জানে না যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম, বৃহত্তম গুহাচিত্রাবলীর সমাবেশ রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষেই, ভোপাল থেকে 42 কিলোমিটার দূরে বিন্ধ্যপর্বতের প্রাগৈতিহাসিক গুহাসমূহে—ভীমবেটকায়। আসলে ভীমবেটকার আবিষ্কার খুব অল্পদিন আগেই হয়েছে। মাত্র বছর পঞ্চাশ আগে। তাছাড়া ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ ইচ্ছাকৃতভাবেই ভীমবেটকা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে রাজী নন। সম্ভবতঃ তাঁদের মাথাব্যথা না হওয়ার কারণ হল যে, ভীমবেটকার কোনও পাশ্চাত্য শংসাপত্র নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার সার্টিফিকেট নেই বলেই স্বাধীন ভারতের পণ্ডিতেরাও ভীমবেটকা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। অথচ পৃথিবীর বৃহত্তম, প্রাচীনতম, প্রাগৈতিহাসিক এই গুহাচিত্রগুলিও ভারতের তথা পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন কথা শোনাতে পারে—জানাতে পারে অনেক নতুন তত্ত্ব।

যে আলটামিরার এতো খ্যাতি, যে আলটামিরাকে বিশ্বের সব ইতিহাসের ছাত্রই কমবেশি জানে, প্রথমে সেই আলটামিরার কথায় আসা যাক। উত্তর স্পেনের স্যানটানডার [Santander] থেকে 30 কিলোমিটার (19 মাইল) দূরে আলটামিরা। 1868 সালে এক শিকারী এই গুহা এবং তার চিত্রকলার আবিষ্কর্তা। এখানের চিত্রকলা কোনও জালিয়াতি কিনা তা নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি সর্বজন স্বীকৃত হয় যে, আলটামিরার গুহাচিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের আঁকা। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন স্পেনের এবং বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ।

আলটামিরার গুহা 270 মিটার। [890 ফুট] লম্বা। এই গুহার পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ থেকে বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলি অরিগনেসিয়ান [Aurignacian], সলুট্রিয়ান [Solutrean] এবং অন্তিম বা মধ্য ম্যাগডেলেনিয়ান [Magdalenian] যুগের। সুতরাং এগুলির বয়স 1,15,000 বছর থেকে 25,000 বছর বলা যেতে পারে। তাহলে এই প্রত্নবস্তুগুলি নিশ্চয়ই নিয়ানডারথাল মানুষের। আবার নিয়ানডারথাল মানুষেরা যেহেতু 40,000 বছর আগে লুপ্ত হয়ে যায় কিংবা ক্রোম্যানিয়ন মানুষদের সঙ্গে মিশে যায়, সেহেতু অন্তিম ম্যাগডেলেনিয়ান যুগের প্রত্ননিদর্শনগুলি বা 25,000 থেকে 40,000 বা এই 15,000 বছরের প্রত্নবস্তুগুলিকে ক্রোম্যানিয়ন মানুষদের ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু বলে অনুমান করলে তা অসঙ্গ ত হওয়ার কথা নয়। এই সব প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল, উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এবং পশুর কাঁধের চওড়া হাড়ের উপর খোদাই করা নকশা।

আলটামিরার গুহায় প্রকোষ্ঠের সংখ্যা একশোর মত। এর বিখ্যাত যে প্রকোষ্ঠটিতে বেশির ভাগ চিত্রকলা রয়েছে তার আয়তন 18 মিটার x 9 মিটার বা 60 ফুট লম্বা ও 30 ফুট চওড়া। এর উচ্চতা সর্বত্র সমান নয়। কোথাও 1.15 মিটার [3.77 ফুট], কোথাও বা 2.65 মিটার [8.69 ফুট]। এই গুহার দেওয়াল নয়, ছাদই বহুবর্ণে চিত্রিত। বহুবর্ণ বলতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মোট তিনটি রং—লাল, কালো এবং বেগুনী [Violet]। বেশির ভাগ ছবিই হল বাইসনের [Bison]। বাইসনগুলির শিল্প সুষমা আশ্চর্য বিস্ময়ের। 25000 বছর আগের শিল্পীরা এতো সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন এ যেন ভাবাই যায় না। এই প্রকোষ্ঠে বাইসনের ছবি ছাড়া আরও যে সব ছবি আছে সেগুলি হল—দুটি বন্য বরাহ, কিছু ঘোড়া, একটি হরিণী এবং আরও কয়েকটি অবয়ব। এগুলি সবই ওই তিনটি রংয়ে আঁকা আছে। এদের সঙ্গে রয়েছে আটটি নরমূর্তিধারী দেবতার খোদাই করা ছবি [Anthropomorphic Figure], বেশ কিছু হাতের ছাপ এবং কিছু হাতের বর্ণালি নকশা-চিত্র। অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলিতে রয়েছে কালো রংয়ে আঁকা নানা মূর্তি। বেশ কিছু মূর্তি এবং অবয়ব খোদাই করাও হয়েছে প্রকোষ্ঠগুলির ছাদে এবং দেওয়ালে। এই সব অঙ্কন শিল্পীরা এতোই দক্ষ ছিলেন যে, পাথরের স্বাভাবিক রংকে মিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের কৃত্রিম রংয়ের সঙ্গে বেশ কিছু চিত্রে। আবার বহু চিত্রে পর্বতগাত্রের স্বাভাবিক পরিণাহগুলিকে [Contours] সঠিকভাবে ব্যবহার করে নিয়েছেন চিত্রের উপযোগী করে। সুতরাং আলটামিরার শিল্পীরা যে বেশ দক্ষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আলটামিরার লোকেরা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল কিনা তা এই ছবি থেকে বোঝা যায় না। তবে ভীমবেটকার লোকেরা যে ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, তাদের আঁকা ঘোড়ায় চড়ে শিকার করার দৃশ্য সম্বলিত চিত্রগুলি থেকে। ভীমবেটকার কথায় একটু পরেই আসছি। আলটামিরার ছবিগুলির বয়স খুব নির্দিষ্ট করে বলা না হলেও মোটামুটি এগুলিকে 25,000 বছরের পুরানো ধরা যায়। অন্তিম ম্যাগডেলেনিয়ান আমলের শিল্পীরাই এর স্রষ্টা। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসাই যায় যে, এই সব চিত্র-ভাস্কর্যের সৃষ্টি করেছিলেন ক্রোম্যানিয়ন মানুষেরাই। আবারও বলি, ক্রোম্যানিয়ন

মানুষেরা পৃথিবীর এই অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রায় 40,000 বছর আগে এবং এরা আধুনিক মানুষের আদি পুরুষ। তবে এটা অজানা যে, এদের আগে আসা নিয়ানডারথাল মানুষরা হঠাৎ বিলুপ্ত হল কেন? আবার ক্রোম্যানিয়নরা হঠাৎই এতো সভ্য হয়ে গেল কেমন করে এবং কোথা থেকে? নৃতত্ত্ববিদরা এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি আজও। নিয়ানডারথালরা যে পরিবর্তিত হয়ে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ হয়েছিল—এমন কথাও বলছেন না বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন নিয়ানডারথালরা মিশে গিয়েছিল ক্রোম্যানিয়নদের সঙ্গে। বিলুপ্ত হওয়া আর মিশে যাওয়া এক ব্যাপার নয়। যাইহোক, আলটামিরার গুহাচিত্রকেই সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের তৈরি আদি চিত্রকলা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এগুলির স্রষ্টা ক্রোম্যানিয়ন মানুষ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই কিন্তু জানেনা ভীমবেটকার কথা। জানে না আলটামিরায় নয়, পৃথিবীর আদিমতম, বৃহত্তম, সমৃদ্ধতম চিত্রকলা রয়েছে ভীমবেটকায়। এগুলি কোন্ মানুষের সৃষ্টি তা অজানা। তবে, রামাপিথেকাসের দেশ ভারতবর্ষই যে সমস্ত সভ্যতা এবং কৃষ্টির আদিগুরু তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে ভীমবেটকার অসংখ্য গুহা এবং তাদের চিত্রকলা। ভীমবেটকার আবিষ্কার হয়েছে 1957 সালে। আজও পৃথিবীর নৃ-বিজ্ঞানীদের কাছে তেমন পরিচিতি পায়নি এই প্রাচীনতম চিত্রকলা সমৃদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলি।

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শহর ভোপাল। ভোপাল থেকে 42 কিলোমিটার দূরে ভীমবেটকার অবস্থান। শাল, সেগুন, মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা বিন্ধ্যপর্বতের কিছুটা অংশের নাম 'ভীমবেটকা'। পাহাড়, ঘন জঙ্গল, ক্ষয়ে যাওয়া অদ্ভুত আকারের পাহাড়-চূড়া নিয়ে প্রায় নির্জন ভীমবেটকা এক অনন্য বিস্ময়। 1957 সালে আবিষ্কৃত হয়েছে ভীমবেটকা। জনসাধারণের দেখার জন্য তা খুলে দেওয়া হয়েছে 1990 সালে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক গুহা-মানবদের বিশাল এক বসতি। এখানেই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায় আবিষ্কৃত হয়েছে 760টির বেশি গুহা। এই গুহাগুলিতে নাকি প্রায় এক লক্ষ বছর কিংবা তারও আগে থেকে বাস করেছে মানুষ। এখানে পাওয়া প্রত্নিদর্শনগুলি অন্ততঃ সেই কথাই বলছে। এই 760টি গুহার অন্ততঃ সাতশোটি গুহা রঙীন চিত্র সম্বলিত। এই সব চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সাদা, লাল, সবুজ ও হলদে রঙ। লক্ষাধিক বছর ধরে আদিম মানুষের বিবর্তন ঘটেছে ভীমবেটকায়। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগ, মধ্যোপলীয় যুগ পার হয়ে তারা চলে এসেছে অশোকের আমলের সভ্যতায়। এতো দীর্ঘস্থায়ী আদিম মানব বসতি এবং এতো পুরাতন চিত্রকলা পৃথিবীর আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। আবার এতো সংখ্যায় প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ভীমবেটকায় বহু চিত্র রয়েছে যাদের বয়স 10,000 বছর থেকে 30,000 বছর। বড় কথা হল, একই মানুষ বিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে অশোকের আমলের সভ্যতায় বা মৌর্যসভ্যতায় এবং সে মানুষের পূর্ব-পুরুষ এক লক্ষ বছরের বেশি প্রাচীন। আর তারা বাস করেছে এই ভীমবেটকায় এক লক্ষ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে এক নাগাড়ে। সুতরাং ভীমবেটকায় 40,000 বছরের প্রাচীন ক্রোম্যানিয়ন মানুষের কোন ভূমিকা আছে কি? ভীমবেটকার মানুষেরা নিয়ানডারথাল বা তাদের সমগোত্রীয় কোন মানবগোষ্ঠী নয় তো? ভীমবেটকার রহস্য আজও অনুদ্ঘাটিত। নৃতাত্ত্বিকরা এখনও এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। লক্ষাধিক বছরের প্রাচীন এই মানবগোষ্ঠী কারা? ভীমবেটকার মানুষেরা নিশ্চয়ই 'ক্রোম্যানিয়ন' নয়। তবে এরা কারা এবং ক্রোম্যানিয়ান মানুষদের বহু আগেই এরা কীভবে সৃষ্ট হল বা উদ্ভূত হল? এরা এবং আলটামিরার লোকেরা কি একই মানবগোষ্ঠী? এরা কি নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠীর লোক? এসব প্রশ্নের উত্তর অজানা। নৃতাত্ত্বিকরাও এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থই হয়েছেন। সুতরাং এটা মেনে নিতে দ্বিধাই থাকছে যে, ক্রোম্যানিয়ন

জাতির মানুষ হতেই পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব হয়েছে। কারণ ভীমবেটকার মানুষেরা ক্রোম্যানিয়ন নয়। লক্ষাধিক বছরের প্রাচীন এই মানবগোষ্ঠী অন্তিম তুষার যুগ অতিবাহিত করলো কেমন করে?

ভীমবেটকা নামটা এসেছে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের নাম থেকে। কথিত আছে, বনবাসের সময় পাণ্ডবেরা বেশ কিছুদিন এখানে কাটিয়েছিলেন। তখন গুহা-মানুষেরা নিশ্চয়ই অনেকটা সভ্য হয়ে গিয়েছে। শিখে গিয়েছে চাষবাস। সম্ভবতঃ এই জনপদের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে পাণ্ডবেরা কিছুদিন এই জায়গায় থেকে যান। 'ভীমের বাটিকা' বা 'ভীমের বৈঠক' থেকেই নাকি জায়গাটার নাম 'ভীমবেটকা। তবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা বহুকাল ধরে এখানে বাস করছে, পাণ্ডবদের আসার বহু আগে থেকেই। এই বসতির অন্য কোন নাম ছিল কিনা তা অজানা। এখানে পাওয়া গেছে অশোকের শিলালেখ। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও এখানে এক বড়সড় জনপদ ছিল। আর সে কারণেই সম্রাট অশোক তার শিলালেখর দ্বারা অনুশাসন প্রচার করেছিলেন এই জনপদে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2200 ফুট উঁচুতে ভীমবেটকার অবস্থান। ঘনজঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের গায়ে গুহা। ছোট বড় নানা আকৃতির, নানা মাপের। গুহাগুলির কোনটির আয়তন এতো বিশাল যে তাতে 50/60 জন লোক আনায়াসে বাস করতে পারে। 760টিরও বেশি গুহা রয়েছে 9 নয় কিলোমিটার জুড়ে। এর প্রায় 700টি গুহাতেই রয়েছে চিত্রকলা। সভ্যতার ইতিহাস বলছে, মানুষ পুরোপুরি সভ্য হওয়ার অনেক আগেই ছবি আঁকতে শিখেছে। অর্ধ-সভ্য মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে ছবি এঁকেছে। ছবির মাধ্যমে সে তার বক্তব্য অপরকে বোঝাতে চেয়েছে। এই ছবি থেকেই ক্রমবিবর্তনে এসেছে চিত্রলিপি, ভাবচিত্র লিপি এবং অবশেষে লিপির উদ্ভব হয়েছে। আদিম মানুষের মূল জীবিকা ছিল শিকার। আদিম মানুষদের আঁকা গুহাচিত্রে তাই শিকার দৃশ্যই বেশি করে স্থান পেয়েছে। ভীমবেটকার সর্বত্রই আঁকা হয়েছে শিকার দৃশ্য। সর্বত্রই শিকার দৃশ্যের প্রাধান্য থাকলেও এখানে চিত্রসংখ্যা অনেক হওয়ায় শিকার চিত্রের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের কিছু ঘটনাও চিত্রায়িত হয়েছে। শিকার দৃশ্য ছাড়াও তাই রয়েছে দলবদ্ধ নাচের দৃশ্য, গানের দৃশ্য, হাতি চড়ার দৃশ্য, পশুদেব যুদ্ধ, মধুসংগ্রহের চিত্র, শরীর-সজ্জা, ছদ্মবেশ, মুখোশ পরা নৃত্যের দৃশ্য এবং অন্যান্য নিত্যদিনের গৃহকর্মের চিত্র। পশুচিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে বাইসন [Bison], বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হরিণ, বন্য বরাহ, হাতি, ঘোড়া, কুকুর, সরীসৃপ, কুমীর প্রভৃতি। বাইসন, বন্য বরাহ, ঘোড়া, হরিণদের আমরা আলটামিরাতেও দেখতে পাই। এখানে অতিরিক্ত হিসাবে রয়েছে হাতি, গণ্ডার, সিংহ, বাঘ, কুমীর ইত্যাদি। মধ্যপ্রদেশের এই অঞ্চলে এককালে যে গণ্ডার, সিংহ এবং কুমীর ছিল সে কথা বলে দিচ্ছে ভীমবেটকার এই সব চিত্রকলা। হাতি, বাঘ, কুকুর ইত্যাদি আজও এ অঞ্চলে দেখা যায়, কিন্তু গণ্ডার, সিংহ, কুমীর নয়।

শিকার দৃশ্যে অশ্বারোহী চিত্রিত হয়েছে বহুবার। তার মানে ভীমবেটকার মানুষেরা গোড়াকে পোষ মানিয়েছিল বহুকাল আগে। তারা পোষ মানিয়েছিল হাতিকেও। ধর্মীয় প্রতীক এবং পবিত্র চিহ্ন হিসাবে বার বার আঁকা হয়েছে বেশ কিছু প্রতীকী চিত্র। চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে মূলতঃ লাল এবং সাদা রং দিয়ে। অনেকগুলি ছবিতেই ব্যবহৃত হয়েছে, লাল সাদা ছাড়া আরও দুটি রং—সবুজ এবং হলুদ। সব মিলিয়ে বেশ কিছুটা জমজমাট চিত্রকলার সমারোহ ভীমবেটকার প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলিতে।

ভীমবেটকার ছবিগুলির বয়স 2200 বছর থেকে 30,000 বছর কিংবা তারও বেশি। কিন্তু সব ছবির রংই আজও গভীর এবং উজ্বল। এটা খুবই আশ্চর্যের। আশ্চর্যরকমের উজ্জ্বল এবং অমলিন এই সব রঙের একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন পণ্ডিতেরা। বিশেষ করে, 10,000 বছর কিংবা তারও বেশি

পুরানো চিত্রের রঙ আজও এমন উজ্জ্বল থাকল কি করে তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। ভীমবেটকার গুহা-মানবেরা রঙ বানাতে ব্যবহার করেছিল ম্যাঙ্গানিজ [Manganese], লৌহ আকরিক [Haemalite], নরম লাল-পাথর এবং কাঠ-কয়লা। কোথাও কোথাও রঙে মেশানো হয়েছে পশুর চর্বি, গাছের পাতার রস। আদি মানবেরা রঙ বানানোয় এমনই পটু হয়েছিল যে, দশ-বিশ হাজার বছর পরেও সে সব রঙ সমান ঝলমলে। চিত্রগুলি দেখলে মনে হয় যেন সামান্য কয়েকদিন আগে সেগুলি আঁকা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিন্ধ্যপর্বতের এই অঞ্চলের পাথরে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে, এক ধরনের অক্সাইড। এই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া হওয়ার ফলেই পুরাতন রঙের এমন জেল্লা। চিত্রগুলি দেখে মনে হয় সদ্য আঁকা। আরও বড় কথা হল, বেশির ভাগ গুহাই উন্মুক্ত। রোদ লাগছে, হাওয়া খেলছে, কোনও কোনও গুহাতে বৃষ্টির ছাঁটও ঢুকছে, তবুও রঙ অটুট এবং তাও 10/20 হাজার বছর ধরে। পৃথিবীর প্রাচীনতম চিত্রকলা রয়েছে ভীমবেটকায়। কোন কোন গুহায় প্রাচীন চিত্রের উপর আঁকা হয়েছে নবীনতর বা নবীনতম চিত্র। অর্থাৎ একই ক্যানভাসে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সময়ে ছবি এঁকেছেন। সে ক্ষেত্রেও নবীনতম চিত্রের বয়স কম করে হাজার পাঁচেক বছর। সে রঙও 10/20 হাজার বছরের পুরানো রঙের মতই উজ্জ্বল। ভীমবেটকার আদিম অধিবাসীরা রঙ বানানোর যাদুকর ছিলেন। তাঁরা এমন রঙ বানাতে জানতেন, যে রঙ 10/20 হাজার বছর ধরে নতুনের মতো উজ্জ্বল থাকতো। অবশ্য তাঁদের রঙের এই দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের পিছনে বিন্ধ্যপর্বতের ওই অঞ্চলের পাথরের গুণাবলীর অবদানও অনেকটাই।

ভীমবেটকার চিত্রকলাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। পুরাতাত্ত্বিকদের করা সেই পর্যায়গুলির বিবরণ নীচে দেওয়া হল। ওই পর্যায়গুলিই বলে দেয় সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের অনেকটাই। তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, ভীমবেটকার আদিম মানুষেরা কারা? তাদের সঙ্গে ক্রোম্যানিয়ন মানুষদের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ভীমবেটকার মানুষদের সঙ্গে হরপ্পার মানুষদের সম্পর্কই বা কতটা? রামাপিথেকাসের দেশ ভারতবর্ষে সভ্যতার বিবর্তনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অবশ্যই পাওয়ার কথা। সেই ইতিহাসের উপযুক্ত প্রত্ননিদর্শন যথেষ্ট সংখ্যায় না পাওয়ার কারণ হল আমাদের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের ব্যর্থতা। ভীমবেটকা কিন্তু সেই ইতিহাসের অনেকটাই পূরণ করে দিতে পারে। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করতে পারে ভীমবেটকা। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসকে একটা পূর্ণাঙ্গ এবং যৌক্তিক রূপ দিতে পারে ভীমবেটকার চিত্রকলা। ভারতবর্ষের রামাপিথেকাসের বংশধরদের বিবর্তনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি করা যেতে পারে ভীমবেটকার ওই সব চিত্রকলার সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে।

ভীমবেটকার চিত্রকলাগুলির কালানুক্রমিক বিভাজন নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। কালানুসারে চিত্রগুলির সাতটি পর্যায়।

(1) **প্রথম পর্যায় ঃ** ভীমবেটকার বেশ কিছু চিত্রকলা আছে যেগুলি আঁকা হয়েছে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ ম্যাগডেলেনিয়ান যুগে। এগুলির সময় নির্দেশ করা হয়েছে 30,000 বছর কিংবা তারও বেশি। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের [Upper Palaeolithic Period] এই সব ছবিতে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরা এঁকেছেন বাইসন, বাঘ এবং গণ্ডার। ব্যবহার করেছেন সবুজ ও ঘন লাল রঙ। এই সব ছবি যে সময় আঁকা হয়েছিল তখন মধ্যপ্রদেশের ওই সব অঞ্চলে গণ্ডার বাস করতো। এখন সারা ভারতে গণ্ডার রয়েছে আসামের কাজিরাঙ্গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়ায়।

সুতরাং মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চল থেকে গণ্ডার বিলুপ্ত হওয়ার আগেই আঁকা হয়েছিল ওই সব ছবি। এগুলির বয়স আলটামিরার গুহাচিত্রগুলির থেকেও বেশি। কোন কোনও মতে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষ হয়েছে 40,000 বছর আগে। সে বিচারে ভীমবেটকার এই ছবিগুলির বয়স 40,000 বছরও হতে পারে।

(2) **দ্বিতীয় পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ের ছবিগুলি আঁকা হয়েছে মধ্য-প্রস্তর যুগে [Mesolithic Age]। এই ছবিগুলির বয়স 25,000 থেকে 10,000 বছর অবধি। এই পর্যায়ের বেশির ভাগ ছবিই আঁকা হয়েছে 11/12 হাজার বছর আগে। কিছু কিছু ছবি আছে যাদের বয়স 15/20 বছর। এই পর্যায়ের ছবির পাত্রপাত্রীদের আকার অনেকটাই ছোট। আকার-আকৃতি বোঝানো হয়েছে বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে। বন্য পশু ছাড়াও ছবিতে রয়েছে বহু মানুষ এবং পশু শিকারের দৃশ্য। মানুষের হাতে আছে বর্শা, মাথা সরু করা লাঠি এবং তীর ধনুক। শিকার দৃশ্য ছাড়াও আঁকা হয়েছে সমবেত নৃত্য, পাখির ঝাঁক, বাদ্যযন্ত্র, মা ও শিশু, গর্ভবতী নারী, মৃত পশু বহন, সমবেত পান-দৃশ্য এবং মৃতদেহ সমাহিত করার দৃশ্য। সহজেই বোঝা যায়, এই পর্যায়ে শিল্পীরা আধুনিক হয়ে উঠেছেন। এই সময় চার রকমের রঙই ব্যবহৃত হয়েছে।

(3) **তৃতীয় পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ের ছবিগুলির বয়স নয় থেকে দশ হাজার বছর। এগুলি নব্য-প্রস্তর যুগে আঁকা। এই পর্যায়ের শেষের দিকে আঁকা ছবিগুলি মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা অলঙ্করণের অনুরূপ। এই সময় ভীমবেটকার অধিবাসীরা মালবের প্রাচীন কৃষিজীবীদের সংস্পর্শে আসে এবং তারা কিছু কিছু চাষবাসও শুরু করে। এরই প্রতিফলন দেখা যায় 9/10 হাজার বছরের প্রাচীন এই পর্যায়ের চিত্রকলায়।

(4) **চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় ঃ** এই দুটি পর্যায় 9000 থেকে 5000 বছর পুরানো। ইতিহাসের প্রথম দিকে আঁকা হয়েছে এই ছবিগুলি। এই সময়ের শেষের দিকে হরপ্পা, মিশর, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার রমরমা শুরু হয়েছে। ভীমবেটকার শিল্পীরাও তাঁদের চিত্রকলায় ব্যবহার করেছেন লাল, সাদা ও হলদে রঙ। ছবির মানও অনেক উঁচু হয়েছে এই সময়ে। চিত্রে পাত্র-পাত্রীর আকার-আকৃতিও অনেকটাই আনুপাতিক হয়েছে এই কালে। শিকার দৃশ্য বেশ কম হয়ে গেছে, ধর্মীয় প্রতীকের উপস্থাপনা অনেক বেড়ে গেছে চিত্রগুলিতে। অশ্বারোহীদের যেমন আঁকা হয়েছে, তেমনি আঁকা হয়েছে পোষাকপরা মানুষ। এই সময়ের কিছু ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে ওই কালের কিছু লিপি, যা অবশ্য দুর্বোধ্য এবং অপাঠ্য। তবে পুরাতত্ত্ববিদরা এগুলি খুঁটিয়ে দেখছেন ওগুলি সত্যিসত্যি লিপি কিনা। ধর্মীয় চিত্রগুলিতে আছে যক্ষ, বৃক্ষ-দেবতা এবং যাদুশক্তি সম্পন্ন আকাশ রথ। এই সময়ের ছবিগুলি মূলত তাম্রাশ্ম [Chalcolithic] যুগের।

(5) **ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ের ছবিগুলি অনেক আধুনিক। এদের বয়সকাল 2000 থেকে 2500 বছর। চিত্রগুলিতে জ্যামিতিক আকার-আকৃতি রয়েছে। সরল রেখাগুলিও বেশ বলিষ্ঠ। ছবিগুলি আঁকাও হয়েছে বেশ ভাবনা-চিন্তা করে। কিন্তু এই চিত্রগুলির অঙ্কন-শৈলী অত্যন্ত ম্যাড়ম্যাড়ে এবং শৈল্পিক সুষমা-বিহীন। যে সুষমা, যে স্বতঃস্ফূর্ততা, যে শৈল্পিকতা, যে সৌন্দর্যবোধ ভীমবেটকার প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়গুলিতে দেখা গেছে, ইতিহাসের কালের এই পর্যায়ের চিত্রগুলিতে তা অনুপস্থিত। এই পর্যায়ের ছবিগুলি দেখে মনে হবে যে, এর শিল্পীরা যেন ভীমবেটকার সেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীদের উত্তরসূরিই নয়। হঠাৎই শিল্প-নৈপুণ্যে ঘাটতি ঘটেছে লক্ষ বছরের পুরাতন ভীমবেটকায়। তবে এই সব ছবিতে সবুজ, হলুদ, খয়েরি এবং লাল রঙ বহুল ব্যবহৃত।

ভীমবেটকার প্রথম গুহায় রয়েছে সাদা রঙে আঁকা একটা হাতির ছবি। তিন নম্বর গুহা বেশ

বড়সড়। এটি সভাগৃহ ছিল। চার নম্বর গুহা থেকে ছবির শুরু। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু গুহা আছে যেগুলিতে ছবি নেই। আট নম্বর গুহা থেকেই চিত্রকলার প্রাচুর্য। নয় নম্বর গুহায় প্রায় একশো জন মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারতো। এখানে রয়েছে ঘোড়ায় চড়া এক আদিম মানুষের চিত্র। সাধারণতঃ দেহরেখা দিয়েই মানুষ আঁকা হয়েছে ভীমবেটকায়। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া ওই মানুষটির দেহাবয়বের পুরোটাই রঙ দিয়ে ভরানো। সম্ভবত ইনি দলপতি। এঁর মাথায় পাগড়ি, হাতে পাথরের অস্ত্র। তাঁর সামনের মানুষটির পাগড়ি আবার অন্য রকম। এই মানুষটি সম্ভবত দলপতির দেহরক্ষী।

অধিকাংশ শিকার দৃশ্যেই ঘোড়ায় চড়া মানুষের ছবি রয়েছে ভীমবেটকায়। আবার হাতি চড়ার দৃশ্যও রয়েছে কোন কোন ছবিতে। অর্থাৎ ভীমবেটকার লোকেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই হাতি এবং ঘোড়া দুই-ই পোষ মানিয়েছিল এবং তারা রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো। প্রাগৈতিহাসিক চিত্রগুলির অধিকাংশেই রয়েছে ঘোড়ায় চড়ে শিকারের দৃশ্য। অথচ এদের অনেক পরবর্তীকালে হরপ্পার লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না বলেই যাযাবর আর্যদের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। হরপ্পা তথা সিন্ধু-সভ্যতার পতন ঘটেছিল আর্যদের আক্রমণে। ভীমবেটকার অশ্বারোহণ দৃশ্য তাই পণ্ডিতদের ভাবায়। আবার প্রাগৈতিহাসিক কালে হাতি পোষ মানানোর ব্যাপারটাও অতি আশ্চর্যের। 12/13 হাজার বছর কিংবা তারও আগে শিকারের প্রয়োজনে হাতি পোষমানানোর ব্যাপারটা ঐতিহাসিকদের কাছেও বিস্ময়কর।

ভীমবেটকায় সাতশোর বেশি গুহা এবং তাদের চিত্রকলার কথা এখানে আলোচনা করা অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয়। তবে এই সব গুহা এবং তাদের চিত্রকলাসমূহ মানব সভ্যতা বিকাশের অন্যতম দলিল। শুধু তাই নয়, ভারতের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসেরও অতুলনীয় দলিল এই সব চিত্রকলা। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষেই। এর জোরদার প্রমাণ হল ভীমবেটকার গুহাচিত্রসমূহ। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের ছবিগুলিতে বন্যজন্তুগুলির আকার বেশ বড়। মধ্য প্রস্তর যুগে [Mesolithic Age] মানুষ ও জন্তুর চিত্রগুলি কিন্তু বেশ আনুপাতিক। আবার প্রথম দিকের মানুষেরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে পাথর, মাথা সূচালো করা লাঠি, বর্শা জাতীয় কিছু। মধ্য-প্রস্তর যুগের ছবিতে মানুষের হাতে উঠে এসেছে তীর-ধনুক। নব্য-প্রস্তর যুগের ছবিগুলিতে উঠে এসেছে কৃষিকার্যের দৃশ্য। এই দৃশ্য রয়েছে তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের ছবিতেও। অর্থাৎ ধীরে ধীরে সভ্য হয়ে ওঠার অনন্য প্রামাণিক দলিল হল ভীমবেটকার বিভিন্ন যুগে আঁকা ছবি। ভীমবেটকা মানব সভ্যতার বিবর্তনের অনন্য দলিল। ভীমবেটকার প্রায় সাড়ে সাতশো গুহার পরীক্ষী-নিরীক্ষা আজও অসম্পূর্ণ। এগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজও প্রকাশিত হয়নি। এখন *প্রয়োজন ভীমবেটকার বিশদ গবেষণা, নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এর বিস্তারিত বিবরণীর প্রকাশ। মহাকালের প্রেক্ষাপটে ভীমবেটকা ভারতীয় সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।*

আলটামিরা ও ভীমবেটকা ছেড়ে আবার ফিরে আসি মানুষের বিবর্তনের কথায়। মহকালের প্রেক্ষাপটে এই সময়টুকু খুব সামান্য হলেও পৃথিবীর প্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আগেই বলেছি; অস্ট্রালোপিথেকাস [Australopithecus] *পৃথিবীতে এসেছিল বিশ লক্ষ* বছর আগে। প্রকৃত মানুষ [Homo-sapiens] এবং অস্ট্রালোপিথেকাসদের মধ্যবর্তী সময় মানবজাতীয় জীবের আর্বিভাব ঘটেছিল বিশ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বছর পূর্বে। পাঁচ লক্ষ বছর আগে ঋজুভাবে চলাফেরা করতে পারে [Homo-erectus] এমন মানবদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল তা প্রমাণিত। এর পরবর্তী পর্যায়ে *এসেছে নিয়ানডারথাল মানুষেরা* [Neanderthal Men]। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে নিয়ানডারথাল

মানুষেরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়। তার জায়গায় আসে ক্রোম্যানিয়ন [Cromagnon] জাতির মানুষ। এই ক্রোম্যানিয়ন জাতির মানুষ থেকেই সম্ভবত পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব।

এখানকার নৃতত্ত্ববিদরা একমত যে, পৃথিবীতে বর্তমান যত জাতি বিদ্যমান, তারা সবাই ক্রোম্যানিয়যন থেকেই উদ্ভূত। তাঁদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই একই বর্গ [Genus] ও প্রজাতি [Species] হতে উৎপন্ন। তবে বৈশিষ্ট্যমূলক আবয়বিক পার্থক্য অনুসারে তাদের তিনটি মহাজাতিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ (1) ককাসয়েড [Caucasoid], (2) মঙ্গোলয়েড [Mongoloid] ও (3) নিগ্রয়েড [Negroid]। এদের আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েচে। নিচের তালিকায় সেই বিভাগগুলি দেখানো হল ঃ

ককাসয়েড	মঙ্গোলয়েড	নিগ্রয়েড
(1) নর্ডিক	(1) এশিয়াটিক	(1) আফ্রিকান
(2) মেডিটেরনিয়ান	(2) ওশিয়ানিক	(2) ওশিয়ানিক
(3) আলপাইন	(3) আমেরিকান ইন্ডিয়ান	(3) নিগ্রিটো

উপরের মহাজাতি বিভাজনে 'অণু-অস্ট্রালয়েড'-দের কথা বলা নেই। তাই উপরের বিভাজন নিয়ে অনেক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। নানাভাবে প্রমাণ করা যায়, ভারতের আদিম অধিবাসীরা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' বা 'অণু-অষ্ট্রালয়েড'। এক সময় এরা উত্তর ভারত থেকে ইস্টার দ্বীপ অবধি পৌঁছে যায়। 30,000 বছর আগে এরা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পৌঁছেছিল। সেটা ছিল অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের ব্যাপার। নানাভাবেই প্রমাণ করা যায় যে, 'অস্ট্রালয়েড' একটা মহাজাতি। তাই অস্ট্রালয়েড বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েডকে একটি মহাজাতি ধরলে মোট মহাজাতির সংখ্যা হয় চারটি—(1) নিগ্রয়েড, (2) ককাসয়েড, (3) মঙ্গোলয়েড এবং (4) অস্ট্রালয়েড। হয়তো এমনও হতে পারে যে, প্রথম তিনটি মহাজাতি উদ্ভূত হয়েছে ক্রোম্যানিয়ন মানব জাতি থেকে, আর অস্ট্রালয়েডরা এসেছে ভারতের কোন আদি মানবগোষ্ঠী থেকে, যাদের বিবর্তন হয়েছে ভারতবর্ষেরই মাটিতে—রামাপিথেকাসের দেশ ভারতবর্ষেই যার আদি উদ্ভব। পণ্ডিতেরা অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত মানবেন না। তবে, একালের কিছু নৃতাত্ত্বিক ভারত ও শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দ্রাবিড় ও অনুরূপ নৃজাতির গঠন সাদৃশ্য ইত্যাদি দেখে, সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এরা নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড। ভারতের দেশজ অধিবাসীরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড এবং দ্রাবিড় বা অনুরূপ জাতিগুলি অনেকাংশে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতি। অনেকেই বলছেন, দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে নিগ্রোয়েডদের কোনও সম্পর্ক নেই। আদি ভারতবাসীরা ছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড। এরাই বিবর্তিত হয়ে দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি করে। হরপ্পা সভ্যতার মূল স্থপতি ছিল এই দ্রাবিড় জাতিই। হরপ্পা সভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং উন্নততম সভ্যতা।

অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে শুধু মাত্র আয়ুধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেদের শক্তিশালী করে তুলেছিল তাই নয়, তারা নিজেদের আরো শক্তিমান করতে পেরেছিল আগুনের ব্যবহার শিখে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আগুন তাদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতো, বন্য পশুদের হাত থেকে রক্ষা করতো, মাংস ঝলসানোর কাজে লাগতো। আগুন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতেও শিখিয়েছিল। আগুন জ্বালানো শিখতে মানুষের বেশ কিছুদিন সময় লাগলেও আগুনের ব্যবহার তারা বহুকাল আগে থেকেই করতে শিখেছিল। প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষেরা আগুন সংগ্রহ করতো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে কিংবা গাছের ঘর্ষণের

ফলে উদ্ভুত দাবানল থেকে। সেই আগুনকে তারা সংরক্ষণ করত অগ্নিকুণ্ডে কাঠ যোগান দিয়ে। মানুষ আগুন জ্বালতে শিখেছিল আগুন ব্যবহার করতে জানার অনেকটা পরেই। নিয়ানডারথাল মানুষরা আগুনের ব্যবহার জানতো, তবে তারা আগুন জ্বালাতে জানতো কি না তা অজানা। মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল প্রায় 40,000 বছর আগে। এই সময় ক্রোম্যানিয়ন মানুষেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। নিয়ানডারথাল মানুষেরা আয়ুধ নির্মাণ করতে এবং আগুন ব্যবহার করতে শিখেছিল খুব ভালভাবেই। তাদের মধ্যে ধর্মের উন্মেষও ঘটেছিল। মৃতদেহ তারা সমাধিস্থ করত এবং মৃত দেহটির সঙ্গে তার ব্যবহৃত আয়ুধগুলিও সমাধিস্থ করা হত। আগুন তাদের সমাজ জীবনে কতটা প্রভাব ফেলতো তার বর্ণনা দিয়েছেন নৃতত্ত্ববিদ কারলটন এস. কুন। তিনি বলেছেন ঃ

"But wholly apart from warmth, fire is vital to the social life of human beings. After the sun has set, when shadows have faded and darkness is gathering, the air is still, the earth-smells rise and the cries of night-prowlers burst out of the forest, then there is nothing like a bright crackling fire to dispel anxiety and fear. This is the time when the whole band comes together. Teeth and whites of eye-balls gleam. Old hunts are acted upon and new ones planned. In good weather men and women will dance on firelight some times until, dawn. It is hard to imagine an intimate group of human beings living without the social cohesion that firelight gives."

আগুন আদিম মানুষের জীবনে এনেছিল সঙ্ঘবদ্ধতা, এনেছিল আরও কৃষ্টির বিকাশ, সভ্যতার বিবর্তন। শেষ তুষারযুগ [Wurm] এসেছিল 1,00,000 বছর আগে। তার বরফ গলতে থাকে 40,000 বছর আগে। আগেই বলেছি, তুষার যুগ কেন পৃথিবীতে আসে তার সঠিক কারণ অজানা। তবে অনেকে কারণ হিসাবে পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা, সৌর-কলঙ্কজনিত সৌরতাপের পরিবর্তন, পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে অক্ষরেখার স্থিতির পরিবর্তন ইত্যাদির কথা বলেন। তবে সঠিক কারণ আজও বলা যায় নি। যাইহোক, তুষারযুগের শেষেই আসে ক্রোম্যানিয়ন মানবগোষ্ঠী। এরা সূচ দিয়ে চামড়া সেলাই করে পোষাক বানিয়ে তা দিয়ে নিজেদের দেহ ঢাকতো। শীতলতা থেকে নিজের দেহ রক্ষা করতো। এরা হাড়ের সূচ তৈরি করেছিল প্রায় 35,000 বছর আগে। বলা হয়, নিয়ানডারথালরা এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নবোপলীয় যুগের শুরু অবধি অর্থাৎ 10,000 বছর আগে অবধি মানুষকে খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে শিকারের উপর। নবপোলীয় যুগেই মানুষ চাষবাস শুরু করে এবং ক্রমশঃ শিকারের উপর নির্ভরশীলতার শেষ হয়।

অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে মানুষ আগুনে ঝলসানো মাংস খেতো। সেলাই করা চামড়ার পোষাক পরতো। সিদ্ধ করে খাওয়ার ব্যাপারটা কৃষি উদ্ভবের আগে তারা রপ্ত করতে পারে নি। জন্তুর চর্বি মিশিয়ে গেরি-মাটি দিয়ে তারা প্রসাধন করতেও শিখেছিল। এই সময় মানুষেরা এসে মিলত আয়ুধ সংগ্রহের জন্য অস্ত্র কারখানায়। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের এই রকম আয়ুধ কারখানা অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। আয়ুধ-নির্মাতা নিজে শিকারে বের হতে পারতো না। তাই তার বা তাদের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগান দিত আয়ুধ ক্রেতারা। এইভাবে দ্রব্যের বিনিময়ে কেনাবেচা চালু হয়। আয়ুধ কারখানাগুলিই ছিল প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের মিলন স্থান। এখানেই এক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মানুষের দেখা হত এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হত। পরস্পর

পরস্পরকে নিজেদের ডেরায় আমন্ত্রণ জানাতো। এইভাবে এক ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে অপর ব্যক্তির পরিবারের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হত। এর ফলে সমাজ-বিন্যাসের সূচনা হয় অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে।

আদিম সমাজের পরিবার গঠিত হত পিতামাতা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে। পিতা সন্তানকে উপদেশ দিতেন শিকারের কৌশল সম্বন্ধে। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা শিকারে পিতার সহযোগী হত। মেয়েরা ফলমূল ইত্যাদি খাদ্য সসংগ্রহ করতো এবং রাত্রিতে পুরুষদের সঙ্গে নাচগানে যোগ দিত। খাদ্য-সংরক্ষণ করতে শেখার পর সবদিন তাদের শিকারে বের হওয়ার দরকার হত না। সেই অবসর সময়টা তারা তাদের অনুভূতিকে বাস্তবায়িত করতো, ছবি আঁকতো অন্ধকার গুহায়। স্পেনের আলটামিরা এবং ভারতের ভীমবেটকা তারই ফলশ্রুতি।

সুতরাং অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে মোটামুটি একটা পরিবার ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। জীবন-চর্যার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সে সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা 'টোটেম' নির্দিষ্ট করেছিল। আয়ুধ নির্মাতা, শমন বা বৈগা, চিত্রকর ইত্যাদিরা স্থান পেয়েছিল তাদের সমাজ বিন্যাসে। বলা হচ্ছে, এই সময়েই প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল নিষিদ্ধ যৌনমিলনের সংজ্ঞা। এই সময় মাতার সঙ্গে পুত্রের, পিতার সঙ্গে কন্যার এবং ভাইয়ের সঙ্গে বোনের যৌনমিলন নিষিদ্ধ বলেই ধরা হত। তাদের নান্দনিক অনুভূতির বিকাশও ঘটেছিল এবং তারা ছবি আঁকতো পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় নিজেদের বাসস্থানে কিংবা তার আশপাশে।

নবোপলীয় যুগে মানুষের ইতিহাসে ঘটেছিল এক বিপুল বিপ্লব। এই যুগেই মানুষ শিখলো চাষ-আবাদ, পশু-পালন এবং বয়ন। তারা স্থায়ী বসবাসের মাধ্যমে প্রথমে গ্রামের এবং পরে নগরের সৃষ্টি করে। এর ফলে এই যুগের মানুষেরা আবিষ্কার করলো নতুন নতুন বৃত্তি ও পেশা।

নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি পৃথিবীর অনেক জায়গায় উদ্ভূত হয়েছিল। নবোপলীয় যুগে কৃষ্টির সূচনা হয় মেয়েরা যখন ভূমিকর্ষণ করতে শুরু করে। জগতের বিভিন্ন জায়গায় বন্য অবস্থায় যে শস্য উৎপন্ন হত, মেয়েরা ভূমিকষর্ষণ করে সেই স শস্যই উৎপন্ন করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুর তাঁর 'মানবসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে গম, যব, ধান ইত্যাদি উৎপাদন বিভিন্ন স্থানে হয়েছিল এবং সেগুলি সবই স্বতন্ত্র নবোপলীয় কৃষ্টির উৎপত্তিস্থল হয়ে দাঁড়ায়। মধ্য-প্রাচীর বন্য অবস্থায় উৎপন্ন যে সব শস্য ভূমিকর্ষণ দ্বারা মেয়েরা উৎপাদন শুরু করেছিল, তা হচ্ছে গম ও যব। আর থাইল্যান্ডের মেয়েরা যে শস্য ভূমিকর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন করেছিল, তা হচ্ছে ধান। সুতরাং ভূমিকর্ষণ দ্বারা ধানের উৎপাদনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও একটা নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। থাইল্যান্ডের নবোপলীয় সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনাল্ড শিলার (Ronald Schiller)। এর বয়স নিরূপিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব 8000 বৎসর। সি ও সয়ার (C. O.Sauer) তাঁর 'এগ্রিকালচারেল অরিজিনস্ অ্যান্ড ডিসপারস্যাল' গ্রন্থে বলেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাকেন্দ্র ছিল। কারলো চিপোলো (Carlo Chipollo) তাঁর 'দি ইকমনিক হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ডি পপুলেশন' গ্রন্থে বলেছেন যে, ধানের চাষ বঙ্গোপসাগরের আশপাশের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলেই কোন জায়গায় শুরু হয়েছিল। পরেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'একস্ক্যাভেসেন্স্ অ্যাট পাণ্ডু রাজার ঢিবি' গ্রন্থে বলেছেন যে, ধানের চাষ বাঙলায় শুরু হয় এবং বাঙলা থেকে চীন দেশে যায়।"

পশ্চিমবঙ্গেও প্রত্নোপলীয় যুগ বিকশিত হয়ে এসেছিল নবোপলীয় যুগ। সুবর্ণরেখা, কংসাবতী ও গন্ধেশ্বরী নদীসমূহের তট, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল, ভাগীরথী

বিধৌত অঞ্চল এবং বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অন্যত্র ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া গেছে নবোপলীয় যুগের প্রত্ন নিদর্শন। বর্ধমান জেলার পাণ্ডু-রাজার ঢিবি ও ভরতপুর এবং পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নাটশাল অঞ্চলের তাম্রাশ্ম যুগের অব্যবহিত নিচের স্তরে আমরা তামার তৈরি দ্রব্যাদির সঙ্গে পেয়েছি নবোপলীয় যুগের কুঠার, পাথরের তৈরি কণ্ঠিমালার গুটি, ছোট ছোট পাথরের আয়ুধ ও চিত্রাঙ্কিত সাদা মৃৎপাত্র। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি পেরিয়ে তাম্রাশ্মযুগের কৃষ্টি বিকশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবেই। যে ভূখণ্ড জুড়ে তা হয়েছিল তার মোটামুটি আয়তন হল—উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী, দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ, পশ্চিমে কংসাবতী নদী এবং পূর্বে ভাগীরথী।

নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ কৃষ্টিই রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হয়েছিল তাম্রাশ্মযুগের নগর সভ্যতায়। যেহেতু তামার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার ছিল পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলেই তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ওই বিবর্তন বাঙলা দেশেই হয়েছিল এবং বাঙলার বণিকরাই তামা সরবরাহ করতো সেই সব অঞ্চলে যেখানে তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল। তাম্রাশ্ম যুগের নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার পিছনে বাঙলার অবদান অনেকটাই। এই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে তামা সরবরাহের কাজটা করেছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোকরাই। মেদিনীপুর তথা তমলুক অঞ্চলের লোকরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পান্না গ্রাম থেকে মাটির 45ফুট নিচে থাকা সমুদ্রগামী নৌকার কঙ্কাল বিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নবোপলীয় যুগের নৌকাই প্রমাণ করে মেদিনীপুর জেলার ওই অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের নৌ-পারদর্শিতার কথা।

কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন। সেজন্য তাকে সেচের ব্যবস্থা করতে হল। ফসল কাটার জন্য কাস্তের উদ্ভাবন করতে হল। মাঠ থেকে কাটা ফসল ঘরে আনবার জন্য গাধা পালন করতে হল। ঘরে ফসল তুলে আনবার পর তা ঝাড়াই-মাড়াই করবার জন্য কুলা উদ্ভাবন করতে হল। ঝাড়াই-মাড়াইয়ের পর শস্য রাখবার জন্য ঝুড়ি-চুবড়ি-ধামা ইত্যাদি উদ্ভাবন করতে হল। আবার সংরক্ষিত ফসল পাছে পোকা-মাকড়ে নষ্ট করে, তার জন্য মাটির পাত্র তৈরি করতে হল। শস্য পেষাইয়ের জন্য ঢেঁকি ও যাঁতা উদ্ভাবন করতে হল। মাটির পাত্রগুলো প্রথমে এবড়ো-খেবড়ো রূপে হাতেই তৈরি করা হত, কিন্তু পরে কুম্ভকারের চক্রে নিপুণতার সঙ্গে তৈরি হতে লাগল। প্রথমে গম, যব, ধান ইত্যাদি খাদ্যশস্যই উৎপাদন করা হল, কিন্তু পরে অন্য ফসলের চাষও আরম্ভ হল। তুলার চাষ করে, তা দিয়ে সুতা তৈরি করে কাপড় বয়ন করতেও আরম্ভ করল। নদীর ধারে যারা বাস করত তারা আগে থেকেই মাছ খেত, এখন মাছ ধরবার জন্য বড়শি, মাছ ধরবার জাল ইত্যাদি তৈরি হতে লাগল। নদীতে পরিবহনের জন্য প্রথমে ভেলা ও পরে নৌকার ব্যবহার শুরু করল। বাটনা বাটার জন্য শিল-নোড়া ও স্থলপথে পরিবহণের জন্য গো-শকটও প্রচলিত হল। এইভাবে একের পর এক জিনিস উদ্ভাবন করে নবোপলীয় যুগে মানুষ তার বৈষয়িক জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তুলল। এই বৈষয়িক জীবনের রূপায়ণে ওই যুগের মেয়েরা যেমন সক্রিয় ভূমিকা নিল, পুরুষরাও তেমনই চুপ করে বসে রইল না। মেয়েদের সাহায্য করবার জন্য তারা নানা রকমের উন্নত ধরনের আয়ুধ তৈরি করতে আরম্ভ করল। সে-সব আয়ুধ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া গিয়েছে।

কৃষিজ প্রয়োজনেই মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে হয়েছিল। আর তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রাম ও নগর। নবোপলীয় যুগের মানুষরা ঘরবাড়ি তৈরি করতো মাটি দিয়ে, সেভাবে আজও ভারতের

বহু আদিবাসী তাদের ঘরবাড়ি বানায়। গ্রামের লোকরা এই পদ্ধতিতে আজও বেশ বড় বড় ঘরবাড়ি তৈরি করে, যেগুলি কল্পনাতীতভাবে বহুকাল টিকে থাকে। বিশেষ, করে, পশ্চিমবাংলার দক্ষিণের কিছু জেলাতে আজও এই পদ্ধতিতে দোতলা মাটির বাড়ি তৈরি করা হয়ে থাকে। কাদামাটি দিয়ে প্রথমে এক থাক্ উঁচু দেওয়াল তৈরি করা হয়। তারপর সে থাক্ শুকিয়ে গেলে তার ওপর কাদামাটির দ্বিতীয় থাক্ তৈরি করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে দোতলা, তিনতলা বাড়ি বানানো যায়। তবে নবোপলীয় যুগের মানুষেরা সম্ভবত একতলা বাড়িই বানাতো এবং মাটির দেওয়ালের ওপর পাতার ছাউনি দিত। আমাদের দেশে বহু মাটির বাড়িতে তালপাতার অথবা খড়ের ছাউনি আজও দেখা যায়। ছ্যাঁচাবেড়ার গায়ে কাদা লেপে বাড়ি তৈরির ব্যাপারটা আরও অনেক পরের ঘটনা।

মানুষ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে জেনে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া কৃষি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করলো। প্রত্নোপলীয় যুগের অন্তিম দশায় মানুষ বেশি শিকার পাওয়ার আসায় পাহাড়ের গুহায় ছবি এঁকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সাহায্য নিত। নবোপলীয় যুগে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া অব্যাহত থাকলো, তবে বদলে গেল পদ্ধতি। এবার আর শিকারের জন্য নয় কৃষিকাজের জন্য তা ব্যবহৃত হল অন্যভাবে। কৃষির সাফল্যের জন্য তারা কৃষিভূমিতে মৈথুনক্রিয়া চালু করলো। ফসল তোলার উৎসব হয়ে গেল এক যৌন-মহোৎসব [Sexual Orgy]। আর সেখানে উদ্ভূত হল লিঙ্গ ও ভূমি-মাতার [Earth Mother] পূজা। এর থেকেই সৃষ্টি হল শিব ও শক্তির কল্পনা। শিব হলেন দেবাদিদেব এবং শক্তি হলেন আদি শক্তি—আদি জননী।

ভারতবর্ষে নবোপলীয়র সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং কারবন-14 পরীক্ষায় তাদের যে সব বয়স নির্ধারিত হয়েছে তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যেমন কাশ্মীরের বুরঝহোমে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের বয়স বলা হচ্ছে 4418-3593 বছর। অথচ হরপ্পা সভ্যতার চরম উন্নতির কাল এখন থেকে প্রায় 4500-বছর। আর সে সভ্যতা তাম্রাশ্ম সভ্যতা। সেকালে পৃথিবীর সেরা সভ্যতা। তার বিস্তৃতি ছিল সারা উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের প্রায় 15 লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে। এরকম অবস্থায় কাশ্মীরে তখনও নবোপলীয় সভ্যতাই বিরাজ করছে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার আলো সেখানে পৌঁছায়নি, এমনটা হতে পারে না। উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতেও হরপ্পা সভ্যতা হাজার চারেক বছর আগে ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ কাশ্মীর, এমন কি কালিবঙ্গানেও 4400 বছর আগে নবোপলীয় সভ্যতাই রয়ে গেছে, তখনও তাম্রাশ্ম সভ্যতা আসে নি, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারবন-14 পরীক্ষায় ভুল থাকতে পারে অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্তে। অবশ্য প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতার বয়স 5400 বছর কিংবা তারও বেশি বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেছেন। এটাও মনে করা হয়, নবোপলীয় যুগের অন্তিম পর্বে মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে খুবই দ্রুত।

ভারত তথা আফগানিস্তানের সভ্যতার বিকাশ প্রত্নোপলীয় যুগ [Palaeolithic Age] পেরিয়ে কিছুটা সময় চলে আসে মধ্য-প্রত্নোপলীয় যুগে [Mesolithic Age]। তারপর সভ্যতার বিবর্তন মানুষকে নিয়ে আসে নবোপলীয় বা নব্যপ্রস্তর যুগে [Neolithic Age]। নবোপলীয় যুগের শেষে মানুষ তার বৈষয়িক কাজকর্মে তামার ব্যবহার শুরু করেছিল। এর ফলে পবির্তিত এবং উন্নততর এই নতুন সভ্যতাকে বলা হল 'তাম্রাশ্ম সভ্যতা' [Chalcolithic Civilization]। এই নতুন যুগ হল 'তাম্রাশ্ম যুগ' [Chalcolithic Age]। ভারতবর্ষে এই যুগের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর থেকে খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর। Chalcolithic শব্দটার উচ্চারণ হল 'ক্যাল্‌কোলিথিক'। গ্রীক

ভাষায় 'Khalkos' মানে তামা এবং 'Lithos' মানে পাথর। এই বর্ণমালায় ইংরেজি "C" অক্ষরটা নেই। যাইহোক, যে সভ্যতার ধারকরা তাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তামা ও পাথর দিয়ে তৈরি করত, সেই সভ্যতাকে আমরা বলছি তাম্রাশ্ম সভ্যতা। এরপর আসে ব্রোঞ্জ-যুগ [Bronze Age]। ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। সভ্যতার বিবর্তনও দ্রুত ঘটতে থাকে মিশর, সুমের, সিন্ধু উপত্যকা, চীন সর্বত্রই আমরা তাম্রাশ্ম সভ্যতার প্রথম দিকে তামার ব্যবহার দেখতে পাই। অথচ মিশর ও সুমেরে তামা পাওয়া যেত না এবং চীনে তামা খুব অল্পই পাওয়া যায়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় ঘটেছিল, যেখানে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেত এবং সহজেই পাওয়া যেত। এখানে সেখানে তামা অবশ্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু একটা সভ্যতা বিকাশের পক্ষে তা ছিল নগণ্য। বাংলাদেশে ছিল সে-যুগের তামার বৃহত্তম খনি। বাঙলার বণিকরাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, সেই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দরের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত ভারতের তৎকালীন বৃহত্তম তাম্রখনি হতে। ধলভূমগড় অঞ্চলের মুসাবনীতে এখনও তামার খনি বর্তমান।

প্রসঙ্গত বলা যায়, তাম্রাশ্ম যুগের শেষ ভাগে যখন খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর পর মিশরে ব্রোঞ্জের [Bronze] প্রবর্তন ঘটল, তখন ব্রোঞ্জে নির্মিত দ্রব্যসম্ভার মিশরীয় সভ্যতাকে নতুন রূপ দান করল। এই যুগে সোনার ব্যবহারও অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল, কেননা এই যুগের পিরামিডের মধ্যে শায়িত নৃপতি, যিনি মাত্র 19 বছর বয়সে মারা যান, সেই তুতানখামেনের সমস্ত শবাধারটাই [Sarcophagus] সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এই সময় ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করতে লাগল। তার ফলে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী আরও বেশি পরিমাণে শক্তিধর হয়ে উঠল।

আগে মনে করা হত যে, ব্রোঞ্জ সভ্যতা 'came through the agency of sea-traders from the north or through land-traders from Palestine and Syria'। কিন্তু এই মতবাদ বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সম্বন্ধে Hutchinson's Twentieth Century Encyclopaedia-তে বলা হয়েছে— Recent discoveries in Thailand suggest that the far East, rather than the Near East, was the cradle of Bronze... Finds of bronze artefacts in North Thailand in 1974-76 showed that a stage of metallurgy had been reached there in 4000 B.C. which was not reached in Mesopotamia and the rest of the Middle East until 3000 B.C.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, থাইল্যান্ড অঞ্চলে ব্রোঞ্জ উৎপাদন শুরু হয়েছিল প্রায় 6000 বছর আগে। অর্থাৎ নবোপলীয় যুগের শেষে কিংবা তাম্রাশ্ম যুগের শুরুতেই এই অঞ্চলে ব্রোঞ্জ তৈরি করা শুরু হয়েছিল এবং তা ব্যবহৃত হতে থাকে থাকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের আসবাবপত্রে, অস্ত্রশস্ত্রে। ব্রোঞ্জ সঙ্কর ধাতু— তামা ও টিনের (Tin) মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। থাইল্যান্ডের নিজস্ব টিনের খনি আছে বটে, কিন্তু তামার খনি নেই। সেই জন্যই মনে হয়, খুব সম্ভবত তারা তামার জন্য বাঙলার ওপর নির্ভর করত। যদি তাই হয়, তা হলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, বাঙালী বণিকরা বাণিজ্য অভিযানে বেরিয়ে, থাইল্যান্ডে তামা বিক্রয় করে, সেখান থেকেই সর্বপ্রথম ব্রোঞ্জ পশ্চিমের দেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল। পরে হয়তো ব্রোঞ্জের প্রস্তুত প্রণালীটা জানবার পর তারা নিকটস্থ সূত্র থেকে টিন সংগ্রহ করে বাঙলার তামার সঙ্গে মিশিয়ে ওই সঙ্কর ধাতু নিজেরাই তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল।

ভারতের তাম্রাশ্ম সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা', 'হরপ্পা সভ্যতা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল আধুনিক আফগানিস্তানের পশ্চিম সীমা অবধি। 'হরপ্পা সভ্যতা' কিংবা 'সিন্ধু সভ্যতা' নামটি কিন্তু এই ব্যাপক বিস্তৃত অত্যুন্নত সভ্যতার যথাযথ নামকরণ হওয়া উচিত নয়। এই সভ্যতার ব্যাপ্তি সিন্ধু উপত্যকা কিংবা হরপ্পা অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত। তাই এর যথাযথ নামকরণ হওয়া উচিত 'প্রাগার্য সভ্যতা' [Pre-Aryan Civilization]। ঐতিহাসিকরা এখন একে 'হরপ্পা সভ্যতা' নামেই মেনে নিয়েছেন। এই সভ্যতা ভারতেই দেশজ সভ্যতা। হরপ্পা সভ্যতাই বিস্তৃত হয়েছিল আফগানিস্তানের 'মুণ্ডিগাক' অবধি। সম্ভবত এটাই ছিল ওই সভ্যতার পশ্চিম সীমানা। আর পূর্বদিকে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' পর্যন্ত।

মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর পাঁচ-সাত লাখ বছর অতি নগণ্য সময় মাত্র। ওই নগণ্য সময়টুকুতেই মানুষ নামক এই বুদ্ধিমান জীবটির আবির্ভাব ঘটেছে পরিব্যক্তি [Mutation] ও ক্রমবিকাশের যৌথ উদ্যোগে। মানুষের গোষ্ঠী বিভাজন ও তার সভ্যতার ক্রমবিবর্তন কীভাবে ঘটেছে তা কিছুটা বিস্তৃতভাবেই একটু আগে বলা হয়েছে। এই ক্রমবিবর্তনে ঘটেছে সভ্যতার বিকাশ। একে একে এসেছে হরপ্পা, মিশর, মেসোপটেমিয়া, মায়া, চৈনিক, গ্রীক, রোমক প্রমুখ সভ্যতাসমূহ। এগুলি পেরিয়ে মানুষ আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেপৌঁছেছে। মানুষের কাছে পাঁচলক্ষ বছরের বিবর্তনকাল দীর্ঘ মনে হলেও মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে এই সময় অতি নগণ্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ সময়মাত্র।

সময় গতি-নিরপেক্ষ নয়। আবার গতি সময় নিরপেক্ষ নয়। সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণার বিবর্তন ঘটেছে, তার জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে। প্রাচীন মানুষের সময়-ধারণার বিবর্তন এনেছে আধুনিক সময়-ধারণা। এই বিবর্তন ঘটেছে কয়েক হাজার বছর ধরে। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের প্রকৃতি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাও বদলেছে। সময়ের প্রকৃতি, তার পরিমাপ, তার আপেক্ষিকতা সব কিছুই বিবর্তিত হয়েছে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সময় সংক্রান্ত ধারণার উন্নতির সঙ্গে সভ্যতার উন্নতিও হয়েছে সেই অনুপাতে। এই অনুপাত কোনও আপতন নয়। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আছে সময় সংক্রান্ত ধারণা, আর উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে উন্নততর সভ্যতার প্রতিশ্রুতি। আমাদের জানা সময়ের মধ্যে বহু সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটেছে। আমাদের পৃথিবী সময়ের পটভূমিতে এই সব সভ্যতার কোন্‌টি কেমন কিংবা কোন্‌টি কতটা পুরাতন ও আধুনিকতা সম্পন্ন অথবা সভ্যতাগুলির মধ্যে কোনটি কতখানি উন্নত ছিল তার সঠিক বিচার হতে পারে, কোনও সভ্যতায় সময় সম্পর্কে কী কী ধারণা চালু ছিল তা দেখে। সময় সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাই বলে দিতে পারে কোন সভ্যতার উন্নতির মান। এটা দেখা গেছে, যে সভ্যতার সময় সংক্রান্ত ধারণা যত উন্নত সে সভ্যতাও তুলনামূলকভাবে ততোটাই উন্নত হয়। সুতরাং সময়ের গতি-প্রকৃতির ধারণা ও পরিমাপ ইত্যাদির নিরিখে সভ্যতার উন্নতির মান নির্ণয়ই সঠিক পদ্ধতি। সভ্যতা যেমন সময়-নিরপেক্ষ নয়, তেমনি সময় ধারণাও সভ্যতা নিরপেক্ষ নয়। আবারো বলা যায়, যে সভ্যতা যত উন্নত, তার সময় সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাও তত উন্নত। এ ব্যাপারে এ যাবৎ কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আজ যেভাবে সময়ের ব্যাখ্যা করছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের কাছে সময় সেইভাবে ধরা দেয়নি। সে যুগের মানুষের কাছে সময়ের অনুভূতি এসেছিল নিতান্তই সাদামাটাভাবে। তারা দেখত নিত্যনৈমিত্তিক কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা, যেমন সূর্য ওঠা ও তার অস্ত যাওয়া, অন্ধকার ঘনিয়ে আসা, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি। তারা জানত সূর্য ডুবছে, আবার উঠবে। অন্ধকার নামছে আবার আলো আসবে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

চাঁদ ছোট হচ্ছে আবার বড় হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। দেখতো চাঁদ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল বাড়ছে। আস্তে আস্তে তারা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সঙ্গে সময়ের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেল। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধিও সময়ের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে— তাও তারা জানল। এই ঘটনার সঙ্গে সমুদ্র-নদীর জোয়ার-ভাঁটার সম্পর্কও বুঝতে শিখল। ধীরে ধীরে বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিত্যদিনের নানা নৈসর্গিক ঘটনার সঙ্গে সময়ের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক অনুভব করল এবং ক্রমশঃ সময়ের সঙ্গে এইগুলির যোগসুত্র আবিষ্কার করতে সমর্থ হল। প্রাক-ইতিহাসের যুগের আগের আদিম মানুষেরা জানল, নির্দিষ্ট সময়ের পরে অস্ত যাওয়া সূর্য আবার উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাদ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হবে। খাদ্য সংগ্রহের হাতিয়ার বানাতে হবে এবং তার জন্য দিনরাত্রির কোন একটা সময় নির্দিষ্ট রাখতে হবে। বসবাসের জন্য গুহার ব্যবস্থা হওয়ার পর সেই সব গুহার দেওয়ালে আঁকা শুরু হল তাদের শিকার যোগ্য পশু-পাখির ছবি। এই সব আঁকা-আঁকির সময়ও নির্দিষ্ট হল। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দৈনন্দিন কাজকের্মর সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক গড়ে উঠল। দানা বাঁধতে থাকল সময় সম্পর্কে আদিম মানুষের ধারণা। যদিও পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গ্রহ-নক্ষত্র সবাই সময়ের তালে বাঁধা, তবু মানুষের মধ্যেই সময়ের ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করল যথাযথভাবে এবং ঘটতে থাকল সেই অনুভূতির বিবর্তন। মৌমাছি, পিঁপড়ে থেকে শুরু করে নানা জীবজন্তু মায় গাছপালা পর্যন্ত সময় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না রেখেই এমন অনেক কাজ করে যেগুলি সময়োচিত এবং তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। কীভাবে এইসব কাজ তারা সঠিক সময়ে করে থাকে তা আজও অজানা, তবে বলা হয় তারা এগুলো প্রাকৃতিক নিয়মেই করে। ওইসব কাজ সঠিক সময়ে করে বলেই তারা বেঁচে-বর্তে থাকে। কিন্তু সময় সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। চলমান সময় যে প্রতি মুহূর্তেই বর্তমান থেকে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে, ভবিষ্যতকে বর্তমান নিয়ে আসছে, এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা একমাত্র মানুষেরই আছে। মানুষই জানে বর্তমান নিয়ত অতীত হয় এবং ভবিষ্যত বর্তমান হয়ে ওঠে। সে জানে সময় ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলেছে অতীতকে পেছনে ফেলে। একমাত্র মানুষই পেরেছে সময়ের এই গতি অনুভব করতে, সময়কে পরিমাপ করতে এবং সময়কে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে।

বর্তমান সভ্যতা সময়কে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এমনটি আর কোন সময় দেখা যায়নি। সময়কে এখন মনে করা হয় এমন এক ধরনের রৈখিক অগ্রগতি [Linear Progression], যার পরিমাপ হয় ঘড়ি ও ক্যালেন্ডারের সাহায্যে। সময় নিয়ে এই ধরনের ভাবনা, সময়কে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে ছিল বলে মনে হয় না। বৈদিক সভ্যতার মত দু একটি সভ্যতা দৈনন্দিন জীবনে সময়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও আধুনিক কাল সময়কে যে গুরুত্ব দিয়েছে তার মাত্রা অনেক অনেক বেশি। বর্তমান যুগ যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সময়ের পরিমাপ করতে পেরেছে এমনটি আর কোন কালে হয়নি। শুধু তাই নয়, আমরা এখন অতীতের ঘটনা ও তার গতি প্রকৃতি নির্দেশ করতে সময়কে যেভাবে ব্যবহার করছি এমনতর সময়ের ব্যবহার অতীতের কোনও সভ্যতা করছে কিনা তা যথেষ্ট বিতর্কিত বিষয়।

এখন আমরা মৌলিক কণার স্বল্পস্থায়ী জীবন মাপছি সময় দিয়ে, ভারত-পাকিস্তানের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার উত্তেজনাও মাপছি সময় দিয়ে, আবার একটা নক্ষত্রের হাজার-হাজার বছরের জীবন-কাল ও তার পরিণতিও বর্ণনা করছি সময়কে কাজে লাগিয়ে। সময় মাপার ব্যাপারটাও বেশ ধাঁধার। সময়ের পরিমাপ হয় মহাকাশে গতির নিরিখে। আবার গতির পরিমাপ করি সময় ও স্থান পরিবর্তন দিয়ে, অর্থাৎ সময় ও মহাকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। আধুনিক বিজ্ঞান সময় পরিমাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

কলাকৌশল বের করেছে। এমন সব সূত্র বা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে মহাকাশে গতিশীল পদার্থ ও সময়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ও সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা এমন পৃথিবী কল্পনাও করতে পারি না যেখানে সময়ের পরিমাপ নেই কিংবা সময়ের একক নেই। দিন-রাত্রি, জন্ম-মৃত্যু সবই এখন ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের জালে জড়িয়ে গেছে, বাঁধা পড়েছে সময়ের ডোরে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এখন সময় দিয়ে ঘেরা।

পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি সভ্যতার একটি হলো ভারতের হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো, অন্যটি মিশরীয় সভ্যতা। হরপ্পা সভ্যতায় সময় সম্পর্কে কী ধরনের ধারণা চালু ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা আজও সম্ভব হয়নি। **প্রথমতঃ** হরপ্পার তথাকথিত সীলমোহরগুলির উপর উৎকীর্ণ লিপিগুলি আজও অপঠিত। **দ্বিতীয়তঃ** ওই সভ্যতা প্রত্নতাত্ত্বিক নিয়মে আবিষ্কৃত হওয়ার আগে তার বহু প্রত্নবস্তু নানাভাবে ধ্বংস করেছে উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সুসভ্য মানুষ। পাঁচ-ছ' হাজার বছর আগে সিন্ধু নদীর তীর ধরে প্রায় হাজার মাইল জুড়ে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতার নাম দিয়েছেন 'সিন্ধু সভ্যতা'। তবে এখন এই সভ্যতার সর্বস্বীকৃত নাম 'হরপ্পা সভ্যতা'। সুতরাং হ রপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার আধুনিক নাম হরপ্পা সভ্যতা। এর বিস্তৃতি ছিল প্রায় 15 লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে। আফগানিস্তানের 'মুন্ডিগাক' থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' অবধি। এই 'সিন্ধু' কথাটা থেকেই নাকি সৃষ্টি হয়েছে 'হিন্দু' শব্দ। ফলে, সিন্ধু-সভ্যতা হয়ে গেছে 'হিন্দু সভ্যতা'। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, 'সিন্ধু সভ্যতা' ছিল প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা। এদের সাথে অসভ্য আর্যদের সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালের 'বৈদিক সভ্যতা'। আবার অনেকের মতে, সিন্ধু সভ্যতাই বিবর্তিত হয়ে পরবর্তী বৈদিক সভ্যতায় রূপান্তরিত এবং ক্যাসপিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে লোহার ব্যবহার জানা ও ঘোড়ায় চড়তে পারা অর্ধসভ্য আর্যজাতির এদেশে আগমন আর তাদের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিশ্রণে বৈদিক সভ্যতার অভ্যুদয়, গালগল্প ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব মতবাদীরা মনে করেন, আর্যরা ভারতবর্ষের বাইরের থেকে এসেছিল, একথা ঠিক নয়। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বাইরের থেকে কোন সভ্যতার ঢেউ এসে আমাদের সভ্য করেনি। ভারতবর্ষেই অতি প্রাচীনকালে অত্যন্ত উন্নত ওই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো বিবর্তনের পথ বেয়ে।

একালের ঐতিহাসিকরা অবশ্য 'সিন্ধু সভ্যতা' না বলে ঐ সভ্যতাকে বলছেন 'হরপ্পা সভ্যতা'। আর্যরা ছিল বহিরাগত এবং 'অর্ধসভ্য' প্রায় 'হাঘরে' জাতি, যারা এদেশ আক্রমণ করে ভারতের দেশজ হরপ্পা সভ্যতাকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে এবং ওদের সংস্কৃতির সঙ্গে হরপ্পা সংস্কৃতির মিলনে তৈরি হয়েছে 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা' বা 'বৈদিক সভ্যতা'। এখন অধিকাংশ পণ্ডিতই বলছেন হরপ্পা সভ্যতা ভারতের দেশজ সভ্যতা এবং আর্যরা বহিরাগত 'বর্বর জাতি'। হরপ্পা সভ্যতার শুরু প্রায় 5300 বছর আগে এবং তার শেষ মোটামুটি 3800 বছর পূর্বে আর্যদের আক্রমণের পর। বহু দিন ধরে চলা বহু যুদ্ধে হরপ্পীয়রা হেরে গেছে বর্বর আর্যদের কাছে।

যাইহোক, হরপ্পা সভ্যতার অত্যুন্নত নগরগঠন শৈলী, তার বিশাল স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত, একেবারে সোজা ও সরল প্রশস্ত রাস্তাঘাট, শস্য-সংরক্ষণ, বলদ ও মহিষে টানা নানা ধরনের যানের ব্যবহার ইত্যাদি দেখে মনে হয়, সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষরা উন্নত নগর সভ্যতার পত্তনে দক্ষ ছিলেন। ওজনের জন্য তখন বিভিন্ন মাপের বাটখারার প্রচলন ছিল। দৈর্ঘ্য মাপের জন্য চালু ছিল অন্ততঃ দু রকমের মাপকাঠি, যা আধুনিক যুগের পরিমাপক ফিতা [Measuring Tape] বা দণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়। সময়ের ধারণা ও তার পরিমাপ নিয়ে কোনও তথ্য এই সভ্যতা থেকে আজও

অনাবিষ্কৃত। অথচ চাকার আবিষ্কার হয়েছে এর অনেক আগেই। গতির সঙ্গে আসে সময়ের ধারণা। যে সভ্যতা ভর [Mass] মাপছে, রৈখিক দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা মাপছে, তার সময় ব্যবস্থা থাকবে না এটা হতে পারে না। সময় পরিমাপের একক তাদের নিশ্চয়ই ছিল। সে ব্যবস্থাও ছিল। অনেকে অনুমান করেন, তাঁরা সূর্য-ঘড়ি [Sun-dial] ও জলঘড়ি [Water-clock] কিংবা বালিঘড়ি [Hour-glass] ইত্যাদির ব্যবহার জানতেন। সময়কে দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগাতেন। সীলমোহর ও মুদ্রার প্রচলন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সময়ের কথা জানতেন না, এটা হয় না। বরং বলা যায় সময়কে তাঁরা একটা মাত্রা হিসাবেই নির্দিষ্ট করেছিলেন, সব ঘটনার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নিয়ে। এই উন্নত সভ্যতার জীবনধারা কোন মতেই সময়-নিরপেক্ষ ছিল না। সময় পরিমাপক কোনও প্রত্ন-নিদর্শন হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োতে এখনও পাওয়া যায়নি এটা ঠিক। তাই বলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, তাঁদের সময় সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। কোন সভ্যতার বিকাশ ঘটলে তার সময়-ধারণারও বিকাশ ঘটতে বাধ্য। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর যুগে সময়-ধারণার যথেষ্ট বিকাশ না ঘটে থাকলে, পরবর্তীকালে বৈদিক যুগে সময় সম্পর্কে অত্যুন্নত ধারণার সৃষ্টি হতে পারতো না। সুতরাং বলা যায়, হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সময় ধারণায় সময় একটা মাত্রা [Dimension] হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল।

হরপ্পা সংস্কৃতিতে লেখার রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। শীলমোহরগুলিতে এইসব লিপি উৎকীর্ণ। মৃৎপাত্রের উপরও কিছু কিছু লেখা পাওয়া গেছে। এই বর্ণমালা এতোই প্রাচীন যে অন্যান্য প্রাচীন বর্ণমালার সঙ্গে এই লিপির কোনও সাদৃশ্য নেই। মোটামুটি জানা গেছে, প্রায় 250 রকমের অক্ষর ব্যবহৃত হতো। এগুলি আজও অপঠিত থাকায় সিন্ধু তথা হরপ্পা সভ্যতার অনেক কিছুই আজও অজানা। অনেকে মনে করেন এই লিপিগুলি বর্তমান তামিল লিপির প্রাচীনতম রূপ। তবে এ নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আজও হয়নি। এই সময় যে সব বাটখারা চালু ছিল তাদের ওজন নিখুঁতভাবে সমান রাখা হতো। পণ্য কেনাবেচার জন্য বড়মাপের বাটখারা, আবার অলঙ্কার ও পুঁথি কেনাবেচার জন্য ছোট মাপের বাটখারার প্রচলন ছিল। পুঁথির দোকানে বাটখারা পাওয়ায় পণ্ডিতেরা মনে করেন পুঁথিও ওজন দরে কেনাবেচা হতো। দৈর্ঘ্য মাপতে যে দু ধরনের মাপকাঠি পাওয়া গেছে তার একটি মহেঞ্জোদাড়োতে, অন্যটি হরপ্পায়। মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া মাপকাঠির দৈর্ঘ্য 13.2 ইঞ্চি, আর হরপ্পায় পাওয়া মাপকাঠির দৈর্ঘ্য 20.62 ইঞ্চি। হরপ্পার এই কাঠিটি ব্রোঞ্জ নির্মিত। কিন্তু সময় পরিমাপের কোনও ব্যবস্থার কথা জানা যায়নি। প্রায় এক হাজার বছর টিকে থাকা এই অত্যুন্নত সভ্যতায় সময় মাপার কোনও ব্যবস্থা ছিল না এটা হতে পারে না। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কোনও নিদর্শন না পেলেও এটা অনুমান করতে বাধা নেই সিন্ধু সভ্যতায় সময়ের ধারণাও উন্নতমানের ছিল এবং সময়ের পরিমাপ করারও উন্নত বন্দোবস্ত ওই সভ্যতা করেছিল। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা প্রাচীনতম। এর সমসাময়িক বা কিছুটা নবীনতর সভ্যতা হলো 'মিশরীয় সভ্যতা'।

নীলনদের উপত্যকায় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর বা তারও কিছু আগে এক অত্যুন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতাকে আমরা বলি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। এই সভ্যতারই বিস্ময়কর অবদান হলো বিশাল বিশাল পিরামিড। মৃতদেহ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় এরা ছিল পটু। 'মমি' করার আশ্চর্য পদ্ধতি এদেরই আবিষ্কার। পিরামিড তৈরির আশ্চর্য কলাকৌশল যেমন আধুনিক প্রযুক্তিবিদদের বিস্ময় উৎপাদন করে, তেমনি 'মমি' করে মৃতদেহকে হাজার হাজার বছর অক্ষত অবিকৃত রাখবার ব্যবস্থাপনাও এ যুগের বিজ্ঞানীদের সমীহ আদায় করে। মিশরীয়দের ব্যবহৃত চিত্রলিপি, যার নাম 'হাইয়ারোগ্লিফিক্স্' [Hieroglyphics], পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, মিশরীয় সভ্যতার

অনেক কিছুই আজ আমরা জানতে পেরেছি। এদের জীবনযাত্রা, ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, এমনকি সময়-ধারণা সম্পর্কেও আমরা বহু তথ্য পেয়েছি। ফলে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অত্যন্ত উন্নত ও বিস্ময়কর প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বহু কথাই আজ আমাদের জানা।

কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্যই নাকি মানুষ প্রথম পঞ্জিকা আবিষ্কার করে; পণ্ডিতেরা একথা বলেন। প্রাচীন মিশরেও এই সমস্যা ছিল। ফলে মিশরীয়রা পঞ্জিকা আবিষ্কার করেছিল কৃষিসমস্যা সমাধানের জন্য। সেখানে প্রতি বছর দক্ষিণের আবিসিনিয়ার পাহাড় অঞ্চলে যে বর্ষা নামতো তাই উত্তরে এসে মিশরের নীল নদীর দুপাশে প্লাবন সৃষ্টি করতো। এই প্লাবনই মিশরের কৃষিকাজের সহায়ক হতো। কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুতি দরকার। তাই প্লাবন কখন আসবে জানা থাকলে কৃষিকার্যের প্রস্তুতি ঠিক ঠিক ভাবে নেওয়া সম্ভব হতো। এই প্লাবনের সময় জানতে গিয়েই মিশরীয়রা পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। তারা দেখলো নীল নদীতে যখন বন্যা আসে তখন আকাশে সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বে যে তারা দেখা যায় তা হলো 'লুব্ধক' [Sirius]। কয়েক বছর তারা হিসাব কষলো। দেখা গেলো, এই লুব্ধক নক্ষত্র আকাশের শেষ দৃশ্যমান তারা হিসাবে দেখা দেয় 365 দিন পরে পরে। এইভাবে তারা আবিষ্কার করলো 365 দিনে এক বছর। এই পঞ্জিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় 2776 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আবার কেউ কেউ বলেন এই সময়টা হবে 4236 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। দুটো সময়ের মধ্যে ফারাক বড্ড বেশি। আবার পশ্চিম আফ্রিকার ডোগান উপজাতির প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা গেছে যে, এই অর্ধসভ্য উপজাতির প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা লুব্ধক নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে বিস্ময়কর সব তথ্য জানতেন।

1834 সালে বেসেল [1784-1846] পৃথিবী হতে 8.6 আলোকবর্ষ দূরের লুব্ধক নক্ষত্রের গতি অনিয়মিত এটা অবিষ্কার করেন। ঢেউ-খেলানো তার গতিপথ। তিনি বলেন, লুব্ধকের কক্ষপথের ওপর 'আর একটা কিছু'র প্রভাব পড়ছে। জ্যোতির্বিদ বেসেল সেই 'আরেকটা কিছু'র নাম দিলেন 'লুব্ধক-খ'। ওই শতাব্দীতে লুব্ধক-খকে ভালো করে দেখবার মতো দূরবীন তৈরিই হয়নি। বেসেলের কাছে যে সব দূরবীন ছিল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি দিয়েও তিনি লুব্ধক-খকে দেখতে পাননি। কিন্তু তার অবস্থান বের করলেন অঙ্ক কষে। :862 সালে আলভান ক্লার্ক 1804-1887] 47 সেন্টিমিটার ব্যাসের দূরবীন দিয়ে লুব্ধক-খকে দেখতে পেলেন ঠিক বেসেল নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু তাঁর দূরবীনটিও তারটির ঔজ্জ্বল্য স্থির করতে পারলো না, অতি উজ্জ্বল তারা লুব্ধক কাছে থাকায়। তবে তিনি বললেন লুব্ধক একটা স্বাভাবিক নক্ষত্র, কিন্তু তার সঙ্গী লুব্ধক-খ একটি 'শ্বেত বামন' [White Dwarf] তারা, তার ঘনত্ব অত্যধিক। বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা জানি, লুব্ধক ও লুব্ধক-খ এর ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত 10,000 1, ভরের অনুপাত 4 1, ব্যাসার্ধের অনুপাত 1.8 0.034 এবং ঘনত্বের অনুপাত 0.42 27000। লুব্ধক-খ-র কক্ষপথ পরিক্রমণের সময় হলো 50.04 ± 0.09 বছর। ডোগানদের প্রাচীন পুঁথিতে লুব্ধক-খয়ের নাম 'পো-তোলোই'। তাদের পঞ্চাশ বছর অন্তর একবার করে যে 'সিগুই ভোজ'-এর ব্যবস্থা হয় তা নির্দেশ করে এই নক্ষত্র 'পো-তোলোই'। এই ভোজ-উৎসবের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে নতুন করার ইচ্ছাকে ফলবতী করা। ডোগানদের শস্য 'পো' থেকে এসেছে 'পো-তোলোই' নাম। 'পো'-র বৈজ্ঞানিক নাম 'ডিজিটারিয়া একসিলিস'। ফলে লুব্ধক-খ-এর আধুনিক নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিজিটারিয়া'। ডোগান পুরাণ বলছে, ডিজিটারিয়া উজ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে পঞ্চাশ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু ডিজিটারিয়া নিজে অদৃশ্য। ডোগানরা বলে, ওই ডিজিটারিয়া নাকি সবচেয়ে ভারী তারা। 'নিজের কক্ষপথে ঘোরার সময়' এই ডিজিটারিয়া লুব্ধকের অবস্থান নির্দিষ্ট করে। লুব্ধক ও তার সঙ্গী নক্ষত্র সম্পর্কে প্রাচীন ডোগানদের এই জ্ঞান রীতিমত বিস্ময়জনক।

যাইহোক, নীলনদের বন্যার খবর জানতে গিয়েই মিশরীয়রা জানলো 365 দিন 6 ঘণ্টায় এক সৌর বৎসর হয়। নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তারা রাত্রিকে মোট বারো ভাগে এবং পরে দিনকেও মোট বারো ভাগে ভাগ করে ফেলল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট 24টি সমান ভাগ করা হলো দিনরাত্রির মোট সময়কে। এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টার দিনরাত্রির আবিষ্কার করলো মিশরীয়রা। সময় ধারণার আধুনিক যুগের সেই শুরু বলা যেতে পারে। এটা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেকার কথা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য এই 'ঘণ্টা' [Hour] ব্যবহৃত হত। পুরোহিতরা ঘণ্টা হিসাব করে পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদির নির্ধারণ করতেন। ঘণ্টাকে তাই বলা হতো 'পুরোহিতের কর্তব্য' [Priestly Duty] অর্থাৎ কোন ঘণ্টায় পুরোহিত কী করবেন তাও তারা নির্দিষ্ট করেছিল। পুরোহিতদের তারা 'ঘণ্টা পর্যবেক্ষক' [Hour Watcher] বা 'নক্ষত্র পর্যবেক্ষক' [Star Watcher] নামেও অভিহিত করতো। মিশরীয়রা সময় মাপতে 'ছায়া-ঘড়ি' [Shadow Clock] ব্যবহার করত। এই ছায়া-ঘড়ি আমাদের পরিচিত সূর্যঘড়িরই অনুরূপ। প্রায় তিন হাজার বছরের পুরানো মিশরীয় ছায়া-ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন মিশরসভ্যতা তার অন্যান্য উন্নত-কলা-কৌশলের সঙ্গেই সময় ধারণাও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছিল। সময় ধারণার উন্নতি ঘটে সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মিশর-সভ্যতায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হরপ্পা সভ্যতার পরে পরেই ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার শুরু। পিগোট, হুইলার প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে খ্রিস্টপূর্ব 2000 অব্দ অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 4000 বছর আগে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আর্য জাতি প্রবেশ করে এবং সেখানে অধিষ্ঠিত যে প্রাচীনতর নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সংঘর্ষ আসে। এই প্রাচীনতর নগরভিত্তিক সভ্যতাই হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা। আর্যজাতি সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের পরাস্ত করার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করে। এই আর্যজাতি ঠিক কোথা হতে এসেছিল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলছেন দক্ষিণ রাশিয়া থেকে, কেউ বলছেন উত্তর মেরু থেকে, আবার কেউ বলছেন তারা ভারতবর্ষেরই লোক, ভারতের বাইরের থেকে আসেনি। আর্যরা কৃষিজীবী ছিল, ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহার জানত এবং মানুষের আদর্শে কল্পিত দেবতাদের পূজা করতো। সিন্ধু সভ্যতার অত্যুন্নত মানের তুলনায় তাদের অর্ধসভ্যই বলা চলে। এই অর্ধসভ্য আর্যজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার উন্নত সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভব হলো 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা' [Indo-Aryan Civilization]। এই মিশ্র সভ্যতাকে আমরা বলি বৈদিক সভ্যতা। কারণ এই সভ্যতাই সৃষ্টি করেছিল বেদসমূহ। এই সভ্যতারই সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো ঋগ্বেদ।

ঋগ্বেদের ঋষিরা চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি, নক্ষত্রের উদয়-অস্ত ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিস্ময়কর বহু তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কারক। সূক্তগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়, কবে কোন্ নক্ষত্রে সূর্য বিষুব রেখায় আসত, কোন্ দিকের আকাশে কোন্ অবস্থানে কোনো নক্ষত্রকে কোনো ঋতুতে দেখা যেত ইত্যাদি। ঋগ্বেদে যজ্ঞের নামান্তর বৎসর। বৎসর কাল পরিমাণ বিশেষ। ঋগ্বেদের উদ্ভবকালে যে নক্ষত্রের তারায় বিষুব ছিল সেই নক্ষত্রমণ্ডলী হতে ঋগ্বেদের কাল বিধান করা হ'তো। তাই তার নাম কালপুরুষ। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থ নক্ষত্রের নাম 'মৃগশিরা'। ঋগ্বেদে এর নাম 'সোম'। সিদ্ধান্তগুলি এর নাম দিয়েছিল 'অগ্রহায়ণী'। 'হায়ণ' অর্থ বৎসর। বৎসর সূচনাকারী নক্ষত্র, তাই এর নাম অগ্রহায়ণী। মৃগশিরা খুবই অনুজ্জ্বল নক্ষত্র। এর দেবতা সোম বা চন্দ্র। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর উর্ধ্বাকাশের নক্ষত্রের নাম 'যজ্ঞাগ্নি নক্ষত্র' রেখেছিলেন ঋগ্বেদীয় ঋষিরা।

যজ্ঞাগ্নি নক্ষত্রের পাশেই আছে রোহিণী নক্ষত্র। রোহিণীর ঊর্ধ্বাকাশে আছে প্রথম প্রভার 'ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্র'। এই নামগুলি সবই ঋগ্বেদের দেওয়া। বিষুব মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে রোহিণীতে এসেছিল ন'শ পঞ্চান্ন বৎসর ছ'মাস কুড়ি দিনে। আবার কৃত্তিকায় আসতে তার মোট সময় লেগেছিল এক হাজার নশো এগার বৎসর একমাস দশদিন। এইভাবে ভরণী, অশ্বিনী, রেবতী পার হয়ে বিষুব এখন উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রায় অর্ধাংশ পর্যন্ত দক্ষিণাবর্তে চলে এসেছে। মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম অংশ হতে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত আসতে বিষুবের সময় লেগেছে ছ' হাজার দুশো এগারো বৎসর একমাস দশদিন। 2008 সালে বিষুবের যা অবস্থান তাতে এই সময়টা হবে ছ' হাজার দুশো তিপান্ন বৎসর। অয়নাংশ গণনায় পাওয়া যায় এই সময়টা হলো 6,450 বৎসর। সুতরাং এই সময়টাই হলো ঋগ্বেদ রচনার আদিকাল। অর্থাৎ মোটামুটি 6250 বৎসর আগে ঋগ্বেদ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে ঋগ্বেদের এই আবিষ্কার বিস্ময়কর।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 115তম সূক্তের পঞ্চম ঋক বলছে ঃ

"সেই অনুরাধা হতে শতভিষা নক্ষত্র অভিচক্ষে এই (সঞ্চার) বৃত্তের অন্যস্থান দুটিতে কর্ষণচলিত অপর পরিধির যোগ বা যুতি সংসৃষ্ট উপস্থানদ্বয় সূর্যের গতিবেগের স্বরূপ প্রকটিত করে চলে" (ঋগ্বেদ ঃ 1/115/5)। অর্থাৎ সূর্যের মহাকাশ পরিক্রমার গতিপথের বা সঞ্চারপথের নাক্ষত্রিক দিকচক্র হলো উপরোক্ত আটটি নক্ষত্র—অনুরাধা হতে শতভিষা অবধি। সূর্যের সঞ্চারপথও উপবৃত্তাকার। পৃথিবীর পরিক্রমা পথ বা ভূ-কক্ষও উপবৃত্তাকার। উভয়কক্ষের ছেদবিন্দুও দুটি এবং দুটি বিন্দুই গতিশীল। এদের ঋগ্বেদ বলছে 'উপস্থান'। কাল অদৃশ্য, সুতরাং কালসূচক মহাশূন্যে সূর্যের সঞ্চারবৃত্ত, ভূ-কক্ষ, সূর্য ও পৃথিবীর গতিবেগসমষ্টির সম্পাতসৃষ্ট উপস্থানদ্বয়ও অদৃশ্য। উপস্থান দুটির পরিচয় কালের গতি দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই ছেদবিন্দু দুটির কাছাকাছি এলে পৃথিবীতে বসন্তকাল বা শরৎকাল হয়। এইজন্য এই উপস্থান দুটির নাম 'বাসন্তী বিষুব' ও 'শারদ বিষুব'।

আগেই বলেছি, "মিত্র হতে বরুণ নক্ষত্রের ঊর্ধ্বস্থ নক্ষত্রবৃত্তে নক্ষত্রলোকে ধাবিত সৌরবিশ্বের ক্রান্তির দিশা অবলোকিত হয়, দিক্‌স্পর্শী নক্ষত্রের নাক্ষত্রিক প্রমাণে" (ঋগ্বেদ 1/2/8)। সপার্ষদ সূর্যের সঞ্চার বৃত্তে ক্রান্তির দিক হলো, ভূ-কক্ষের অনুসুরের দিক অর্থাৎ পৃথিবীর মেরুতারা যেদিকে প্রতিভাত হয় সেইদিকে। "মরুতের মাধ্যমে বহন্ত শ্রুতিগাথার প্রতিম, ব্রহ্মাণ্ডে সপার্ষদসূর্যের নিত্য-সদন ও সূর্যের গতিবেগ আবহমান কাল সপ্তসংখ্যক নক্ষত্রকলাপের অন্ধকার মর্দিত আলোক বাহুর দ্বারা প্রদর্শিত।" (ঋগ্বেদ 1/85/6)। এই সাতটি নক্ষত্র হলো সপ্তর্ষি নক্ষত্র (Ursa Major), উত্তর আকাশে বর্তমান কালের মেরু নক্ষত্র শিশুমার নক্ষত্রের ধ্রুবতারা (Alfa Ursa Minoris), কাশ্যপী নক্ষত্র (Cassiopia), শিবিরাজ নক্ষত্র (Cepheus), ছায়াগ্নি নক্ষত্র (Alpha Cygni or Deneb), অভিজিৎ নক্ষত্র (Alpha Lyrae or Vega) এবং প্রচেতা নক্ষত্র (Draconis or Thuban)। এদের মধ্যে পাঁচটি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে মেরুতারা হতে থাকে। এই পাঁচটি নক্ষত্র হলো, শিশুমার নক্ষত্রের ধ্রুবতারা, শিবিরাজ নক্ষত্র, ছায়াগ্নি নক্ষত্র, অভিজিৎ নক্ষত্র ও প্রচেতা নক্ষত্র। ধ্রুবতারা মেরুতারা (Pole Star) হয়েছে 2000 বছর আগে (2000 খ্রিস্টাব্দে)। 3160 বছর পর শিবিরাজ নক্ষত্র মেরুতারা হবে। এখন থেকে 8,320 বছর পরে ছায়াগ্নি নক্ষত্র মেরুতারা হবে। 13,480 বছর পর্যন্ত ছায়াগ্নি মেরুতারা থাকবে। এরপর অভিজিৎ নক্ষত্র মেরুতারা হবে। অভিজিৎও 5,160 বছর সময় ধরে মেরুতারা থাকবে। ফলে অভিজিৎ 13,480 বছর পরে মেরুতারা হয়ে 18,640 বছর অবধি মেরুতারা থাকবে। এরপর আবার প্রচেতা মেরুতারা হয়ে আসবে ঋগ্বেদের যুগে যেমন ছিল। প্রচেতা

5,160 বছর মেরুতারা থাকবে এবং এখন থেকে 23,800 বছর পরে বর্তমানের ধ্রুবতারা আবার পৃথিবীর মেরুতারা হবে। এইভাবে চলবে মেরুতারা পরিবর্তিত হওয়ার চক্র। এই চক্র একবার আবর্তিত হয় 25,800 বৎসরে। ঋগ্বেদের এইসব অত্যাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানা ছিল পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর আগেই।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বা সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা। এই সভ্যতার লোকদের বলা হয় সুমেরীয়। তাই এই সভ্যতার আরেক নাম সুমের সভ্যতা বা সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয়রা যে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী ছিল তা আধুনিক বোগদাদ হতে পারস্য উপসাগর অবধি বিস্তৃত। তারা এক অজ্ঞাত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সাল হতে ভাষাগত ভিত্তিতে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। কতকাল আগে এবং কোথা হতে ব্যাবিলনে তথা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তারা এসেছিল তা এখনও জানা যায়নি। এখন একদল ঐতিহাসিক বলছেন, সুমেরীয়রা ছিল হরপ্পা সভ্যতার লোকজন। এই সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতারই সৃষ্টি। এদের লিপির নাম কীলকাক্ষর বা ক্যুনির্ফম লিপি [Cuneiform Letters]। মোট 42টি অক্ষর দিয়ে তারা তৈরি করেছিল এই বর্ণমালা। সেকালে ইউরোপ যখন নব্য প্রস্তর যুগে পাথরের ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করছে, তখন সুমেরীয়রা চর্চা করছে লিপির। সুমেরীয়রা তখন তাদের দলিল-দস্তাবেজে সীলমোহরের ছাপ লাগাচ্ছে। তাদের সীলমোহরগুলি পৌনে এক ইঞ্চি থেকে সোয়া দু-ইঞ্চি মাত্র লম্বা। খাজনা আদায় হতো রসিদ দিয়ে। সেই রসিদেও থাকতো সীলমোহরের ছাপ। এক অত্যুন্নত নগরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সুমেরীয়রা। তারা হাজার হাজার মাটির ফলকে উৎকীর্ণ করতো শাসন ব্যবস্থার কথা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা। রচনা করতো মহাকাব্য। মাটির ফলকে উৎকীর্ণ করা, ক্যুনির্ফম লিপিতে লেখা দুটি মহাকাব্য আবিস্কৃত হয়েছে। একটি হলো 'গিলগামেশ মহাকাব্য' (খ্রিস্টপূর্ব 2000 অব্দ), অন্যটি 'এতান মহাকাব্য' (খ্রিস্টপূর্ব 626 অব্দ)। সুমেরীয় সভ্যতার উন্নতির মান হরপ্পা কিংবা মিশরীয় সভ্যতার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না।

সুমেরীয়রা জানতো ষাট সেকেন্ডেএক মিনিট, জানতো এক সৌর বৎসর হলো বার মাস। সুমেরীয়রা দ্বাদশ রাশিচক্রের হিসাব জানতো। প্রত্যেক রাশিচক্র আকাশে 30 ডিগ্রি অংশ জুড়ে বিরাজমান তাও তাদের অজানা ছিল না। দিকচক্রবাল হতে একটি রাশির সম্পূর্ণ উদয় হতে মোটামুটি দু'ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের নাম তারা দিয়েছিল 'দান্না' [Danna)। তাদের কাছে একদিন ছিল বারো দান্না বা 24 ঘণ্টা। এই দান্নাকে 30 ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে তারা বলতো এক 'গেস' [Ges]। এক 'গেস' হলো আধুনিক চার মিনিট।

360 গেস নিয়ে একদিন। চন্দ্রের গতিবিধি এবং চান্দ্রমাসের কথাও তাদের অজানা ছিল না। প্রথম প্রথম এরা বারোটি চান্দ্রমাস নিয়ে এক বছর ধরতো। পরবর্তীকালে তাদের ধারণায় সৌর মাস ও সৌর বৎসর যথাযথভাবে চলে আসে। প্রতিটি চান্দ্র মাস ও সৌরমাসের পার্থক্যও তারা অনুধাবন করতে শেখে এবং এও জানে যে, প্রতি তিন বৎসরে একটি করে চান্দ্রমাস বাড়তি হয়। সুমেরীয়রা মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর গণনা করতো এখনকার দিনের মতোই। পদ্ধতির পার্থক্য ছিল। এই উন্নত সভ্যতার সময়-ধারণাও অত্যুন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে স্যার আর্থার কীথ্ বলেছেন, 'সুমেরীয় মুখের আদল প্রাচ্যে আজও দেখা যায়—আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান থেকে শুরু করে সিন্ধু সভ্যতার কুল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পনেরোশ' মাইল তফাতেও সে ছাপ স্পষ্ট।' অনেকের ধারণা সুমেরীয়রা হরপ্পীয়। সুমেরদের রিলীফ ছবিতে দ্রাবিড় প্রভাব নাকি সুস্পষ্ট।

মাটি খুঁড়ে সুমেরীয়দের যে সব ক্যানিফর্মে লেখা মাটির ফলক পাওয়া গেছে তার থেকে 'রাজবংশ অনুযায়ী রাজা এবং তাঁদের রাজত্বকালের তালিকা' আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে যে সময়ের হিসাব আছে তা আধুনিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। এতে বিভিন্ন সুমেরীয় রাজারা কে কত বছর রাজত্ব করেছিল তার যথাযথ বিববণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজত্বকালের যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা অনেকেই অবিশ্বাস্য মনে করেন। এই সুদীর্ঘ তালিকা থেকে এটা জানা গেছে যে, মহাপ্রলয়ের আগে যে দশজন রাজা রাজত্ব করেছিল তাদের মোট রাজত্বকালের সময় প্রায় 4,50,000 বছর। রাজাদের নামও দেওয়া আছে ওই তালিকায়। কাল প্রসরণ [Time Dilation]-এর প্রভাবে এটা সম্ভব হতে পারে। বর্তমান আইনস্টাইনীয় ধারণায় এটা আর এখন অসম্ভব বলে মনে হওয়ার কথা নয়। এই তালিকায় গিলগামেশের নামও আছে যাকে নিয়ে গিলগামেশ মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এঁরা অবশ্য উত্তর-প্লাবন যুগের রাজা ছিলেন বলে তালিকায় বলা হয়েছে। একই রাজার রাজত্বকালের সময় বিভিন্ন মৃৎফলকে ভিন্ন ভিন্ন বলে উল্লিখিত হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেই রাজার রাজত্বকালের সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন। তবে এটাও ঠিক, যে সুমেরীয়রা সময়ের হিসাব অমন নিখুঁতভাবে করতে শিখেছিল তারা রাজবংশ তালিকায় সময়ের হিসাব লিখতে ভুল করবে তা মনে হয় না। তথাকথিত এই ভুলের পিছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে যা আমাদের আজও অজানা।

মধ্য-আমেরিকার মেক্সিকো (দক্ষিণ অঞ্চল), গুয়াতেমালা, বেলাইজ, এল-সালভাদর এবং হন্ডুরাস জুড়ে এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যার নাম 'মায়া-সভ্যতা' [Maya Civilization]। মোটামুটিভাবে এই সভ্যতা 4,500 বছর বা তারও বেশি পুরানো। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়দের আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। এই সভ্যতার প্রাথমিক যুগ হলো খ্রিস্টপূর্ব 2500 বছর থেকে 900 বছর, মধ্যযুগ হলো খ্রিস্টপূর্ব 900 বছর থেকে 300 বছর এবং শেষ যুগ হলো খ্রিস্টপূর্ব 300 অব্দ থেকে 1530 খ্রিস্টাব্দ। এদের চরম উন্নতির সময় ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব 300 বছর হতে 800 খ্রিস্টাব্দ অবধি। মায়াদের সভ্যতা ছিল উন্নত নগরভিত্তিক সভ্যতা। বিশাল বিশাল সৌধ নির্মাণে তারা ছিল যথেষ্ট পটু। কোন কোনও সৌধের উচ্চতা 210 ফুটেরও বেশি। এরা পিরামিড তৈরি করেছে মিশরীয়দের মত, চিত্রলিপিও এদের ছিল। নানা ধাতুপাত্র ও মৃৎপাত্র আশ্চর্য সব নকশা খোদাই করে বানাতে এরা ওস্তাদ ছিল। তাছাড়া বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি বা প্রস্তর ফলকে সুন্দর রিলিফের কাজ এদের উন্নত সভ্যতার পরিচয়ই বহন করে। কিন্তু এই মায়ারা কোথা হতে এসেছিল তাও অজানা। কিভাবে এই অত্যুন্নত সভ্যতার গোড়াপত্তন হলো তাও জানা যায়নি। অনেকে বিশ্বাস করেন, হিন্দু পুরাণের ময়দানবই এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। ময়দানব বহু পুরী নির্মাণ করার কৃতিত্বের অধিকারী। আর 'মায়া' কথাটার সঙ্গে 'ময়' কথাটির বেশ মিল। তবে এই বিশ্বাসের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

যাইহোক, মায়ারা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত জাতি। স্পেনীয়রা য়ুকাটান জয় করার পর মায়াদের প্রাচীন পুঁথিপত্র সব তারা পুড়িয়ে দেয়। পাদ্রী দিয়াগো দ্য লান্দা 1672 সালে লিখছেন,

"লিপি ও অঙ্কন সমন্বিত বহু পুঁথি আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কুসংস্কার, মিথ্যা ও পাপ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। সেইজন্য সেইসব গ্রন্থ আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম। কিন্তু মায়াগণ তাতে নিরতিশয় দুঃখ পেয়েছিল এবং ভীষণ মর্মাহত হয়েছিল।" পাদ্রীসাহেব দয়া করে তিনটি মাত্র পুঁথিকে রেহাই দিয়েছিলেন। সেগুলি ভাঁজ করা ভূর্জপত্রে লেখা। তার বেশিরভাগই এখনো অপঠিত। যেটুকু

জানা গেছে তাতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বিশেষ করে সময় সম্পর্কে মায়াদের ধারণা ছিল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। মায়াদের পঞ্জিকা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। তারা জানতো শুক্র গ্রহের বছর হয় 584 দিনে।। পার্থিব বছর হলো 365.2420 দিনের। পঞ্জিকায় ওরা যা হিসাব রেখে গেছে তা 6.42 কোটি বছর অবধি চলবে। এমন কি 40 কোটি বছর অবধি এই পঞ্জিকা চালু থাকতে পারে বলে অনেকের অভিমত। তাদের মতে ৎস্লকিনের [Tzolkin] বছর 260 দিনে, 365 দিনে পৃথিবীর আর শুক্রের 584 দিনে। মায়ারা বলে 37,960 দিনে দেবতারা আসবেন পরম বিশ্রাম স্থলে। মায়াদের পঞ্জিকার শুরু নাকি 3113 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এটা পুরাণের দাবী। সে পঞ্জিকার আবর্তনকাল নাকি 3,74,000 বছর। মায়াদের অট্টালিকাগুলি তৈরি হয়েছে ওই পঞ্জিকা অনুসারে। একটি সৌধে মাসের প্রতিটি দিনের জন্য গড়া হয়েছে একটি করে সিঁড়ি, প্রতিটি মাসের জন্য একটি বড় ধাপ, আর তার শীর্ষদেশের ধাপটি 365তম দিনের দ্যোতক, যেখানে তৈরি হয়েছে আসল মন্দির। পঞ্জিকার নির্দেশেই যেন এই মন্দির তারা গড়ে তুলেছিল। মেক্সিকোর চিচেন ইৎসার নিবিড় অরণ্যে আছে মায়াদেব তৈরি মানমন্দির। দুটো প্রকাণ্ড চাতালের উপর গোলাকার সেই অট্টালিকা উঠেছে জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে। মায়া জ্যোতির্বিদরা চাঁদের কক্ষপথের হিসাব করেছিল চার দশমিক স্থান পর্যন্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা নকশা ও তথ্য আছে পূর্বোক্ত তিনটি উদ্ধার-প্রাপ্ত পুঁথিতে। সেগুলির অধিকাংশই আজও অপঠিত বা অব্যাখ্যাত।

আরও বড় কথা, যে সব মায়ারা এই অত্যুন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তারা নাকি খ্রিস্টীয় ৪00 অব্দ নাগাদ এই সব শহর ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যায় কেউ জানে না। স্পেনীয়রা যাদের ষোড়শ শতাব্দীতে ওখানে পেয়েছিল তারা সেই উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশিষ্ট মায়ারা নয়। এতো কষ্ট করে, এমন দৃঢ় করে, এতো সুন্দর করে মন্দির, চারুকলামণ্ডিত পিরামিড, এমন সুন্দর সুন্দর মূর্তি দিয়ে ঘেরা নগরোদ্যান, এমন চমৎকার ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ ইত্যাদি দিয়ে এতো সুন্দর শহর যারা বানিয়েছিল তারা সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেল তার হদিস প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আজও দিতে পারেননি। তবে এটা ঠিক মায়ারা তাদের এই সভ্যতা-সংস্কৃতির অত্যুন্নত নিদর্শন, এই নগর ছেড়ে প্রায় 1,200 বছর আগে উধাও হয়ে যায় এবং তাদের একজনও আর ফিরে আসেনি। তারা যেন অনেকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে মায়াপঞ্জিকার শুরু হলো 3113 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এটা মায়াপুরাণের দাবী। এটা সত্যি হলে মায়াসভ্যতা মোটামুটি 5,000 বছরের পুরানো। এই সভ্যতা মিশর, হরপ্পার সমসাময়িক। মায়ারা তখনই জেনেছিল ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ দুটির কথা। মায়া পঞ্জিকা কত নিখুঁত তার একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। মায়াদেব ব্যবহৃত সময় তালিকা এই রকম ঃ

20 কিন = 1 উইনাল বা 20 দিন

18 উইনাল = 360 দিন বা এক টুন

20 টুন = 7200 দিন বা 1 কাটুন

20 কাটুন = 1,44,000 দিন বা 1 বাকটুন

20 বাকটুন = 28, 80,000 দিন বা 1 পিকটুন

20 পিকটুন = 5,76,00,000 দিন বা 1 কালাবটুন

20 কালাবটুন = 115,2000,000 দিন বা 1 কিনচিলটুন

20 কিনচিলটুন = 2,304,00,00,000 দিন বা 1 আটাউটুন

মায়ারা বিশাল সময়ের পরিমাপ যেমন জানতো তেমনি ক্ষুদ্র সময়ের হিসাবও করতো অবিশ্বাস্য নিপুণতায়। সৌর বৎসর এবং শুক্রের বৎসর চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করেছিল প্রাচীন মায়ারা। তারা চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারতো। কোন বছর কটি সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে তা তারা আগেই হিসাব করে বলতে পারতো। মায়া সভ্যতার সময়-ধারণা হয়তো আরও উন্নত ছিল এবং তা অনেকাংশে আধুনিক ধারণার সমকক্ষও হয়তো ছিল; কিন্তু মায়া পুঁথি সব পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে এবং যে তিনটি উদ্ধার পেয়েছে তারও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হওয়ার ফলে, মায়াদের ওই অতুন্যত সময় জ্ঞান সম্পর্কে আর কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

এছাড়া আজটেক, ইঙ্কা, চৈনিক ইত্যাদি সভ্যতার সময় ধারণাও ছিল খুব উন্নত মানের যা আধুনিক সময় ধারণার কোন কোনও অংশের সঙ্গে তুলনীয়। এ ব্যাপারে মায়াদের নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। একদিকে মায়ারা যেমন এক আটাউটুন বা 2,304 কোটি দিনের হিসাব রাখতো, তেমনি দশমিকের পর চার অঙ্ক লাগিয়ে দিনের হিসাবও তারা রেখেছিল। তাদের হিসাবে এক পার্থিব বছর হল 365.2420 দিন।

ইংল্যান্ডে একটি প্রাচীন প্রত্ন-নিদর্শন আছে, তার নাম 'Stonehenge'। এর বাংলা নাম দেওয়া মুশকিল; এটি তৈরি হয়েছিলো এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে। সমগ্র স্থাপত্যটিকে রেডিও কার্বন পরীক্ষায় 2000-1400 খ্রিস্টপূর্বাব্দের বলে নির্ণয় করা হয়েছে। বর্তমানে উইল্টশায়ার সালিসবারি [Wiltshire Salisbury] হতে 13 কিমি উত্তরে এর অবস্থান। সৌধটি তৈরি হয়েছে বৃত্তাকার কতকগুলো স্থাপত্যের সমষ্টি নিয়ে। বাইরে আছে একটি বৃত্তাকার পরিখা, যার উত্তরপূর্বের একটি প্রবেশ পথের ভিতরে আছে একটি বাঁধানো চত্বর। চত্বরের ভিতরে 56টি গর্তের একটি শৃঙ্খল, আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এখন এগুলি 'Aubrey Holes' নামে পরিচিত। এগুলির এবং কেন্দ্রস্থ খণ্ডের মাঝে আছে আরো দুটি অনুরূপ গর্তের মালা। এগুলো 'Z' এবং 'Y'-Holes নামে পরিচিত। পাথরের বেষ্টনীতে আছে দুটো বৃত্ত, য়ার একটি বালিপাথর ও ভিতরেরটি নীল পাথর দিয়ে তৈরি। বাইরের বৃত্ত ও বহির্মুখী অশ্বক্ষুরের ওপর প্রস্তরের আচ্ছাদনী রয়েছে। কেন্দ্রস্থলে আছে 'বেদী-প্রস্তর' [Altar Stone] এবং প্রবেশ পথের ভিতরে আছে 'বধ্য প্রস্তর' [Slaughter Stone]। প্রত্নবিদদের মতে তিনটি স্তরে এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। প্রথম স্তর নির্মিত হয় খ্রিস্টপূর্ব 2000 সাল থেকে 1700 সালের মধ্যে, দ্বিতীয় স্তর খ্রিস্টপূর্ব 1700 সাল থেকে 1500 সালে এবং সর্বশেষ নির্মাণ হয় খ্রিস্টপূর্ব 1500 সাল থেকে 1400 সালের মধ্যে। যে সমস্ত পাথরের স্তম্ভ আজও দাঁড়িয়ে আছে তাদের সবচেয়ে বড়টির উচ্চতা 24 ফুট এবং ওজন 50 টন। আর স্তম্ভগুলি সবই একটি পাথর দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে ছোট স্তম্ভেরই বেধ 3 থেকে 4 ফুট, প্রস্থ 7 ফুট এবং উচ্চতা 13 ফুট। এদের এক-একটির ওজন প্রায় 25 টন। এই সুবিশাল প্রস্তর সৌধ ঠিক কোন্ কাজে ব্যবহৃত হতো তা নির্ধারিত হয়নি। Hawkins বলেছেন, 56টি Aubrey Holes সম্ভবত ব্যবহৃত হতো চন্দ্রসূর্যের গতিবিধি এবং সূর্যের ও চন্দ্রের গ্রহণের পূর্বাভাসের জন্য। আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকদের অধিকাংশই মনে করেন এটি একটি প্রাচীন মানমন্দির। ওই অতো প্রাচীনকালে ইংল্যান্ডে কী ধরনের ধর্ম-বিশ্বাস চালু ছিল তা অজানা। তবে এই মন্দিরে আকাশের উপাসনা হতো তা সবাই মেনে নিয়েছেন। মন্দিরের চারপাশে উৎকীর্ণ চিহ্ন থেকে মনে করা হয় যে, এটি মানমন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উত্তরায়ণের হিসাব অনুযায়ী এর প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রিত হতো। সূর্য-চন্দ্র ও সম্ভবত অন্যান্য গ্রহের উদয়-অস্তকাল লিপিবদ্ধ করা হতো। সৌধটি এমনভাবে তৈরি যে, সূর্যের রশ্মি উত্তরায়ণের শেষ দিনে ওই মন্দিরে সরাসরি প্রবেশ

করতো। 1963 সালে হকিন্‌স সাহেব [Gerald Hawkins] প্রমাণ করেছেন যে, এটা মানমন্দিরই ছিল। চন্দ্রসূর্যের গতিবিধি, বৎসরের হিসাব-নিকাশ, গ্রহণের সময় ইত্যাদি এই মানমন্দিরে নির্ণয় করা হোত। হকিন্‌স সাহেবের যুক্তিপূর্ণ এই প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদরা শুধু এই যুক্তিতে নাকচ করে দেন যে, অতো প্রাচীনকালে এ ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান আসবে কোথা হতে, কারণ ইংল্যান্ড খ্রিস্টজন্মের 500 বছর আগেও তেমন সভ্য হয়ে ওঠেনি। তবে এখন এই মত অনেকেরই গ্রহণযোগ্য যে, Stonehenge সৌধটি একটি অতি প্রাচীন মানমন্দির। এর থেকেই প্রাচীন ইংল্যান্ডের সময়-ধারণার একটা হদিশ পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন দিল্লীর কুতুবমিনারও একটি মানমন্দির এবং তা Stonehenge-এর সমসাময়িক। দিল্লীর 238 ফুট উচ্চতার ওই বিশাল স্তম্ভের চারপাশে 27টি নক্ষত্রের বিভাগ অনুযায়ী 27টি কক্ষ ছিল, যা কুতুবুদ্দীন ভেঙে নিয়ে লৌহস্তম্ভের পাশের 'কুতওল মসজিদ' বানানোর কাজে লাগিয়েছিল। Stonehenge-এর সমসাময়িক কালে ভারতই ছিল একমাত্র দেশ যেখানে চান্দ্রদিনপঞ্জির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতো। ভারতীয় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে চান্দ্র-পঞ্জিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল সে যুগেও। এখনও তো সমানভাবে জড়িত। এঁদের বিশেষ ধর্মীয়-প্রথা পালন, দান করা, গ্রহণকালে শুচিস্নান করা, অমাবস্যার বা পূর্ণিমার নিশিপালন এবং চান্দ্রমাসের একাদশ দিনে অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস প্রভৃতি বারব্রত সুনিয়ন্ত্রিত হতো চান্দ্র-পঞ্জিকার সাহায্যে। এখনও নানা বারব্রত অনুষ্ঠিত হচ্ছে চান্দ্র তিথি-নক্ষত্র ধরে ধরে। পূজা-পার্বণ তো আছেই। গ্রহ ও নক্ষত্র জগতের এই গভীর জ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে। ফলে, অনেকে মনে করেন Stonehenge প্রাচীন হিন্দুদেরই কীর্তি। হিন্দু-সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল ইংলন্ডেও সুদূর অতীতকালে। প্রাচীনকালে হিন্দু সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইউরোপেই। আর Stonehenge-এর নির্মাতারা হলেন প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা। তাদের মতে, পুরাতন দিল্লীর কুতুবমিনার অর্থাৎ প্রাচীন মানমন্দিরের সঙ্গে ইংলন্ডের Stonehenge-এর মানমন্দিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষিত হতো সেই প্রাচীনকালেই, মধ্যরাত্রি থেকে সময় গণনার গ্রীনিচ অভ্যাস পালন করার মধ্য দিয়ে। মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মাঝরাতে উঠে ঘড়ি মেলানোর ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায় না। তা-হলে ইংরেজী দিনপঞ্জিতে এই ব্যবস্থা চালু হলো কেন? কেনই বা রাত 12টার পর থেকে দিন গণনা শুরু করা হয় যদিও ইংলন্ডে তখন মধ্যরাত্রি। আসলে ভারতীয়রা সূর্যোদয়ের সঙ্গে দিন আরম্ভের রীতিতে অভ্যস্ত ছিল। এখানে সূর্যোদয় মোটামুটিভাবে সকাল 5½টা নাগাদ হয়। এখানের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতেই ইংলন্ডে মধ্যরাত্রিতেই দিন শুরু হওয়ার হিসাব চালু হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীন ইংলন্ড এই প্রথাই অনুসরণ করতো। ভারতের সঙ্গে ইংলন্ডের গ্রীনিচের সময়ের তফাৎ ঠিক 5½ ঘণ্টা। প্রাচীনকালে ভারত জ্যোতির্বিজ্ঞানে কতটা উন্নত ছিল এবং সময় গণনায় তার ঋষিদের মননশীলতা কী আশ্চর্যজনক উন্নতি করেছিলো তার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে ইংলন্ডের প্রত্নসৌধ Stonehenge এবং ভারতের কুতুবমিনার।

ভারতবর্ষের সেই অত্যুন্নত জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার প্রায় আধুনিক উত্তরসূরি হল অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত পাঁচটি মানমন্দির। সমসাময়িক কালে সারা পৃথিবীতে এতো উন্নত মানের মানমন্দির কোথাও ছিল না। মহারাজা সোয়াই জয়সিংহ [2য়] [রাজত্বকাল—1699-1743 খ্রিস্টাব্দ] এই মানমন্দিরগুলি বানিয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিত্যদিনের চর্চার জন্য। এগুলি এখন 'যন্তর-মন্তর' নামে বিখ্যাত। পুরানো দিনের 'যন্ত্র-মন্ত্র' নাম এখন 'যন্তর-মন্তর'। কালে কালে এগুলির অন্য নামকরণও করা হয়।

যেমন ঃ বেধশালা, যন্ত্রশালা, যন্ত্রালয় এবং যন্ত্র-মহল। এই পাঁচটি মানমন্দির তৈরি করা হয়েছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত পাঁচটি জায়গায় ঃ

দিল্লী [1724 খ্রিঃ], জয়পুর [1728 খ্রিঃ], উজ্জয়িনী [1734 খ্রিঃ], বারানসী বা কাশী [1737 খ্রিঃ] এবং মথুরা [1738 খ্রিঃ]। জয়পুর এবং উজ্জয়িনীর যন্ত্রগুলি এখনও কর্মক্ষম। মথুরার যন্তর-মন্তর অজ্ঞতায় এবং লোভে, আর ব্রিটিশ শাসকদের চরম ঔদাসীন্যে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উজ্জয়িনীটির আজও 'যন্ত্রমহল' নামে পরিচিত।

গ্রীক সভ্যতার শুরু খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দে। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 3,000 বছর আগে এই বিখ্যাত সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। রোমকদের অধীনস্থ হওয়ার আগে অবধি এর উন্নততর ক্রমবিকাশ সমানভাবে বজায় ছিল নানা দিক নিয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রীক সভ্যতায় মিশরীয়, ভারতীয় ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে ইউরোপে এক অত্যুন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করে। এই সভ্যতার কতকগুলি বিখ্যাত নাম আমাদের অতি পরিচিত। এঁরা হলেন ঃ হোমার [Homer : 800 খ্রিঃ পূঃ], থেলস [Thales 585 খ্রিঃ পূঃ] অ্যানাক্সিম্যান্ডার [Anaximander : 610-546], হেরাক্লিটাস [Heraclitus : 500 খ্রিঃ পূঃ] অ্যানাক্সিমীনেস [Anaximenes : 540 খ্রিঃ পূঃ], পিথাগোরাস [Pythagorus : 510 খ্রিঃ পূঃ], পারমীনিডিস [Parmenides : 450 খ্রিঃ পূঃ], ডেমোক্রিটাস [Democritus : 460-370 খ্রিঃ পূঃ], প্লেটো [Plato : 427-347 খ্রিঃ পূঃ], অ্যারিস্টটল [Aristotle : 384-322 খ্রিঃ পূঃ], হেরোডোটাস [Herodotus : 485-430 খ্রিঃ পূঃ] এবং সক্রেটিস [Socrates ; 469-399 খ্রিঃ পূঃ] ইত্যাদি। এই সমস্ত মনীষীদের নানা মত, নানা আবিষ্কার, নানা সৃষ্টি গ্রীক সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং সমসাময়িক কালে জগৎ-সভায় একে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিল। সময় ধারণায়ও গ্রীক দার্শনিকরা যথেষ্ট উন্নত চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

গ্রীকরা প্রথম প্রথম চান্দ্রপঞ্জিকা ব্যবহার করতো। তাদের মাস ছিল 30 দিনে এবং 29 দিনে। ফলে এই পঞ্জিকায় চান্দ্র-বৎসর নির্ধারিত হতো। ঋতুচক্রের সঙ্গে এই পঞ্জিকার সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করা হয়নি। তখন বৃষ্টি আসার সময়, ফসল বোনার কাল, কৃষিকার্য সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপারগুলোর সময় নির্ধারণ করা হতো কোন নক্ষত্রের উদয়-অস্ত ও আকাশে তার অবস্থান দেখে। এইভাবে কয়েক শতাব্দী চলেছে। অতিপরিচিত কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি দেখে সময় নির্ধারণ করে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম চলেছে। গ্রীকদের দিন আরম্ভ হতো সূর্যাস্তে। দশদিনে এক দশক হতো আবার 29 দিনের মাসে তৃতীয় দশকটি হতো 9 দিনে। পরবর্তীকালে ঋতুচক্রের সঙ্গে মাসের সম্পর্ক রাখতে গিয়ে তাদের পঞ্জিকায় ত্রয়োদশ মাসের সংযোজন ঘটানো হল। এই সময় এদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন রকম পঞ্জিকা মেনে চলত। খ্রিস্টপূর্ব 600 সালে গ্রীসের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন একটা পঞ্জিকা চালু করেন যাতে আট বছরের হিসাব থাকতো। এই আট বছরে মোট তিনটি মাস অতিরিক্ত যোগ করে ঋতুচক্রের সঙ্গে মাসের সামঞ্জস্য বিধান করা হলো। এই পঞ্জিকা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়। এথেন্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেটন [Meton] 433 খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবিষ্কার করলেন উনিশটি সৌরবর্ষে 235টি চান্দ্রমাস হয়। এথেনার মন্দিরে এথেন্সবাসীরা মেটনের এই আবিষ্কারকে সোনার নকশায় খোদাই করে রাখলো। মেটন-চক্রের [Meton Cycle] এক বছরের এক একটি এককের নাম দিল 'স্বর্ণ-সংখ্যা' [Golden Number]। 130 খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিপ্পারকাস [Hipparchus] আবিষ্কার করলেন সৌর বৎসর একেবারে কাঁটায় কাঁটায় 365.25 দিনের নয়। মেটন বা হিপ্পারকাসের এই আবিষ্কারগুলি কিন্তু সাধারণের ব্যবহৃত

পঞ্জিকায় স্থান পায় নি। নাগরিকদের ব্যবহৃত পঞ্জিকা পুরানো আট বছরের নিয়মেই চলে আসছিল।

প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের সময়-ধারণা যথেষ্ট উন্নত মানের ছিল। এঁরা চক্রাকারে সময়ের আবর্তনে বিশ্বাস করতেন। প্লেটো মনে করতেন, বিশ্বের বস্তু নিশ্চয় কোন এক সময় তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাৎ যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিলো সেখানেই প্রত্যাবর্তন করে। মহাকাশের সব জ্যোতিষ্ক কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে যাত্রা শুরু করে যে সময়ে আবার পূর্বাবস্থানে ফিরে আসছে সেই সময়কে তিনি বলতেন 'মহাবর্ষ' [Great Year]। তাঁর ধারণা ছিল সব কিছুই আবার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং সময়ের চক্রাকারে আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল বিশ্ব আবর্তিত হয়ে আবার গতি শুরুর অবস্থানে আসবে। হেরাক্লিটাস অবশ্য পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ধ্বংস ও পুনরায় সৃষ্টি হওয়ার সময় অবধি মোট কাল পরিমাণকে বলতেন 'মহাবর্ষ'। জেনো [Zeno : 335-263 খ্রিঃ পূঃ] মনে করতেন চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি বিশ্বসৃষ্টির শুরুতে যে অবস্থানে ছিল সেই অবস্থানে আবার ফিরে আসবে, বিশ্ব আবার নতুন করে বিকশিত হবে, সময়-চক্র পুনরায় আবর্তিত হবে। এই সময়-চক্রের আবর্তন নিয়ত চলছে। ফিরে ফিরে প্রাথনিক অবস্থা আসছে ও চলে যাচ্ছে। সময় ঘুরছে চাকার মত। অ্যারিস্টটল কিন্তু মনে করতেন সময়ের এই চক্রাকারে আবর্তন অসম্ভব। সময়ের গতি রৈখিক এবং জলস্রোতের মত একমুখী। তিনি গতি ও সময় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা অবশ্য এর বিরোধী মত প্রচার করেন। তবে তাঁরা সময়ের গতির রৈখিক ধারণা মেনে নিয়েছিলেন। সেন্ট অগাস্টাইন ছিলেন এইসব ধর্মযাজকদের মধ্যে একজন, যিনি বলতেন, সময়ের চক্রাকার গতি অসম্ভব, কারণ যিশু একবারই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনও ঘটবে না বা ঘটতে পারে না। সুতরাং সময়ের গতি রৈখিক।

রোমক সভ্যতার শুরু মোটামুটি 400 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। গ্রীক সভ্যতার পরে পরেই এর উন্নতি। গ্রীক সভ্যতা পুরোপুরি রোমকদের কবলে আসে 196 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সমসাময়িক কালে রোমক সভ্যতার চেয়ে উন্নততর সভ্যতা ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যে আর কোথাও ছিল না। রোমকরা সময় ধারণা পেয়েছিল তার পূর্বসূরী গ্রীকদের কাছ থেকে। এদের ব্যবহৃত পঞ্জিকারই নানা পরিবর্তন সাধন করে সম্রাট জুলিয়াস সীজার [Julius Caesar] যে পঞ্জিকা চালু করেন তাই আধুনিক পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের জনক। জুলিয়াস সীজার যে পঞ্জিকা চালু করেছিলেন তার নাম 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার' [Julian Calendar]। এর আগে গোটা রোম সাম্রাজ্য জুড়ে নানা ধরনের পঞ্জিকা চালু ছিল। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হওয়ায় প্রশাসনিক ও সামাজিক কাজকর্মেও এই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা ব্যবহৃত হতে থাকে।

রোমকরা প্রথম দিকে চান্দ্রমাস অনুসরণ করে তাদের পঞ্জিকা বানাতো। এর মাসগুলির একটা 30 দিন পরেরটা 29 দিন এইভাবে 10টি মাস থাকতো। মোট 10টি মাস থাকতো এক বছরে এবং 295 দিনে এই বছর হতো। প্রথম মাস হতো মার্চ। এর দেবতা ছিল মঙ্গল। যেহেতু মঙ্গল [Mars] যুদ্ধের দেবতা এবং মার্চমাসের সময়টা যুদ্ধের উপযোগী, সেই জন্য রোমকরা তাদের বৎসরের শুরু করেছিল যুদ্ধ শুরুর সময়টা ধরে এবং ওই সময়ের প্রথম মাসের নাম দিয়েছিল মার্চ। তাদের 7ম, 8ম, 9ম ও 10ম মাসের নাম ছিল সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর। অনেকে মনে করেন, এই নামকরণ এসেছে ল্যাটিন থেকে। বর্ষপঞ্জিকার যেখানে যেখানে ওইসব মাসের অবস্থান ছিল সেই অনুসারে এই ল্যাটিন নামকরণ। 7ম মাস তাই সেপ্টেম্বর বা September, 8ম হলো অক্টোবর বা October, 9ম মাস November, এবং দশম মাস December। ইদানীং কালের কিছু পুরাতত্ত্ববিদ বলছেন, এই নামকরণের পিছনে এবং এই ধরনের পঞ্জিকা সৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সময় ধারণা এবং

গণনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতীয় পঞ্জিকার বর্ষ আরম্ভও প্রাচীনকালে ওই 25শে মার্চের কাছাকাছি সময়ে হতো। এখন যেমন শকাব্দের হিসাব চালু করা হয়েছে ভারতীয় পঞ্জিকায় 7ই/8ই চৈত্রে বর্ষ আরম্ভ করে, তখনও 25শে মার্চ বা 9ই কিংবা 10ই চৈত্র নাগাদ বর্ষ শুরু বলে ধরা হতো। সূর্যের অয়নগতির ফলে এখন মহাবিষুব সংক্রান্তি হচ্ছে 21শে মার্চ বা মোটামুটিভাবে 6ই বা 7ই চৈত্র। মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিন থেকেই নববর্ষের প্রথমদিন শুরু করা হয়। 2007 সালে দিন-রাত্রি সমান হয়েছে 21শে মার্চ। ভারতীয় শকাব্দের বর্ষ শুরুও হয়েছে পরের দিন অর্থাৎ 22শে মার্চ বা বাংলা পঞ্জিকার 7ই চৈত্র। তবে ভারতীয় সরকারী পঞ্জিকায় ওই দিনটি হলো 1লা চৈত্র, 1929 শকাব্দ। মার্চে বছর গণনা শুরু হলে তবেই 7ম মাস September, 8ম মাস October, নবম মাস November এবং দশম মাস December হয় মাসগুলির আপন-আপন অবস্থান অনুযায়ী। রোমক পঞ্জিকার বছর গণনাও তখন ভারতীয়দের মত মার্চ মাস থেকে শুরু করা হত। রোমক পঞ্জিকা যে ভারতীয় পঞ্জিকার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল এর বহু প্রমাণ আছে।

যাইহোক, রোমকদের 10 মাসের পঞ্জিকায় আরো দু'মাস অর্থাৎ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী যোগ হল 700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। নুমা-পমপিলিয়াস [Numa Pompilius] নাকি এই দুই মাস যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রোমকরা 700 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সময় ধারণায় পরিবর্তন আনার মত যথেষ্ট সভ্য হয়ে ওঠেনি। এদের সভ্যতার বিকাশ ঘটে 400 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। সুতরাং বারো মাসের বছরের ব্যাপারটা রোমকরা ধার করেছিল। ফেব্রুয়ারী মাস হলো 28 দিনে। এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসগুলি হলো 30 দিনের এবং অন্যান্য মাসগুলি 31 দিনের। এইভাবে তাদের 365 দিনে এক সৌরবৎসর হলো। মাসের প্রথম দিনকে বলা হতো 'ক্যালিন্ডজ' [Calends], 5ম বা 7ম দিনকে বলা হতো 'নৌনজ' [Nones]। মার্চ, মে, জুলাই ও অক্টোবর মাসগুলির 7ম দিনকে বলা হত 'নৌনজ' এবং অন্যান্য মাসের 5ম দিন ওই নামে অভিহিত হতো। আবার মাসের 13শ বা 15শ দিনের নাম ছিল 'আইডজ' [Ides]। মার্চ, মে, জুলাই ও অক্টোবর মাসের 13 তারিখ হলো 'আইডজ'। মাসের দিন গণনা রোমকরা অদ্ভুতভাবে করতো। অনেকটা স্কুলের ছাত্রদের মতো। স্কুলের ছাত্ররা যেমন হিসাব করে 'পূজার ছুটির 5 দিন আগে', 'পূজার ছুটির 3 দিন আগে' ইত্যাদি, অনেকটা সেই রকম। উদাহরণ দিয়ে বলা যাক। রোমকরা জানুয়ারী মাসের দিনগুলি এইভাবে হিসাব করতো ঃ

দিন	দিনের নাম
1ম	ক্যালিন্ডজ [Calends],
2য়	নৌনজের আগের চতুর্থ দিন,
3য়	নৌনজের আগের তৃতীয় দিন
4র্থ	নৌনজের আগের দ্বিতীয় দিন,
5ম	নৌনজ [Nones],
6ষ্ঠ	আইডজের আগের অষ্টম দিন,
7ম	আইডজের আগের সপ্তম দিন,
8ম	আইডজের আগের ষষ্ঠ দিন,
13শ	আইডজ [Ides]
14শ	ক্যালিন্ডজ এর আগের 19তম দিন,
15শ	ক্যালিন্ডজ এর আগের 18তম দিন,

16শ	ক্যালিন্ডজ এর আগের 17তম দিন,
17শ	ক্যালিন্ডজ এর আগের 16তম দিন,
31শ	ফেব্রুয়ারীর ক্যালিন্ডজের আগের দিন

দিনের এই নামকরণ ও হিসাব রাখার পদ্ধতি দেখে মনে হয় রোমকদের সময় ধারণা ছিল এরিস্টটলের অনুগামী। অর্থাৎ সময়ের গতি রৈখিক এবং তা সর্বদা সামনের গিকে বয়ে চলেছে, তার চক্রাকার কোনও গতি নেই। এই ধারণা ছিল বলেই সামনের দিকে পিছনের দিনের নামকরণ করা হয়েছে। দিন গণনার এই পদ্ধতি কেবল ভবিষ্যৎমুখী।

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্রীক দার্শনিকরা সময়ের চক্রাকারে আবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। যার থেকে 'মহাবর্ষ' [Great Year]-এর কল্পনা। প্লেটো [Plato]মনে করতেন মহাবর্ষ হলো সেই পরিমাণ কাল বা সময়, যে সময়ের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ ইত্যাদি তাদের পূর্বের কোনও সময়ের আপেক্ষিক অবস্থানে ফিরে আসে। অর্থাৎ কোন একটা সময়ে আকাশে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির পারস্পরিক অবস্থান যেমন ছিল, ঠিক সেই রকম অবস্থানে তাদের ফিরে আসতে যে সময় লাগে প্লেটো তাকে বলতেন মহাবর্ষ। আর হেরাক্লিটাস [Heraclitus] মনে করতেন, মহাবর্ষ হলো পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ধ্বংস এবং পুনরায় সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত মোট সময়। অপর গ্রীক দার্শনিক জেনোর মতাবলম্বীরা, যাদের আমরা 'স্টোইক' [Stoic] বলি, ওই দুই মতবাদকে মিলিয়ে নিয়ে বলতেন যে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে যে অবস্থানে ছিল সেই অবস্থানে আবার ফিরে আসবে, বিশ্ব আবার নতুন করে বিকশিত হবে, সমস্ত সময়-চক্র পুনরাবৃত্ত হবে। এই সব দার্শনিকরা বৈদিক ঋষিদের মত জানতেন না যে, সূর্যও মহাকাশে প্রবলবেগে গতিশীল। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়েই আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড কে [Milky Way Galaxy] পরিক্রমণরত। ফলে, মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির একই রকম অবস্থান কখনই সম্ভব নয়। সূর্য মোটামুটি 25 কোটি বছরে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড একবার পরিভ্রমণ করে। একবার পরিক্রমণ শেষ হবার পরও সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি মহাকাশে সূর্যের ওই পরিভ্রমণ শুরুর আগে যে আপেক্ষিক অবস্থানে ছিল, সেই অবস্থানে আর ফিরে আসে না। তবে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের 'দোলন তত্ত্ব' [Oscillation Theory]-এর প্রতিফলন ঘটেছে স্টোইকদের সময় উপরোক্ত ধারণায়। দোলন তত্ত্ব মতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এখন ক্রমবিকশিত হচ্ছে, তারপর শুরু হবে ক্রম-সঙ্কোচন। সঙ্কোচন শেষ হলে আবার শুরু হবে বিকাশ। পুনরাবৃত্তি ঘটবে সৃষ্টিচক্রের এবং সময়-চক্রেরও। স্টোইকদের সময় চক্রের ধারণা হিন্দু দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুগামী।

গ্রীক দার্শনিকদের সময়-চক্রের ওই ধারণা খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা মানতে পারেননি। সেন্ট অগাস্টাইন (St. Augustine) যুক্তি দিলেন যে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা একবারই মাত্র ঘটেছে, আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সময়ের চক্রাকারে আবর্তন সম্ভব নয়, সময়ের গতি রৈখিক (Linear)। অ্যারিস্টটল গতি এবং সময়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে মনে করতেন। অগাস্টাইন অ্যারিস্টটলের এই মতবাদে সন্তুষ্ট না হয়ে বলতেন যে, আত্মা বা মনের সঙ্গে সময় জড়িত। সময় স্মৃতি (Memory), একাগ্রতা (Attention) এবং উপলব্ধি [Anticipation]-কে সমৃদ্ধ করে। সপ্তদশ শতকে এসে নিউটন (Newton) বললেন, যে, সময় মনের উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। সময় অনন্যগত, অপরিবর্তনীয়, অপ্রতিরোধ্য এক প্রবাহ যা আপনভাবে বয়ে চলেছে অন্তহীন অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যতের পানে। সময়ের অস্তিত্ব মন বা বস্তু কারো উপর নির্ভরশীল নয়। নিউটন মনে করতেন যে, যদি এমন কতকগুলি ঘড়ি বসানো সম্ভব হয় যা নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল সময় নির্দেশ করবে এবং সেই ঘড়ির এক-একটি সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বিশ্বের যেকোনও স্থানে পরস্পরের আপেক্ষিকে চলন্ত যে কোন

মাধ্যমেই (Medium) থাকুন না কেন, এই সব ঘড়ি সব সময়েই সমান গতিতে চলবে এবং যে কোন মুহূর্তে সব ঘড়িতে সমান সময় নির্দেশিত হবে, কোন রকম পার্থক্য থাকবে না।

আগেই বলেছি, নিউটনের সমসাময়িক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ দার্শনিক লাইবনিজ (Leibnitz) বলেছিলেন "Space is the order or relation oF things among themselves. Without things occupying it, it is nothing". অর্থাৎ মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতরে বিন্যাস। মহাকাশে যে সকল বস্তু রয়েছে, সেগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছুই নয়। সময় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, "Time is simply the order of succession of phenomena." বা ঘটনার পরম্পরানুসারী বিন্যাসই সময়। সহজ করে বললে, ঘটনা ঘটছে বলেই সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) সময় সম্পর্কে নিউটন ও লাইবনিজের দুই বিরোধী মতবাদকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কান্ট নিউটনের অন্যান্য আবিষ্কারের উৎসাহী সমর্থক হলেও নিউটনের সময় সম্পর্কিত মতবাদ তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি বললেন, "Time is simply a feature of the way men`s minds visualize the external world and is not a characteristic of external reality itself." অর্থাৎ মানুষের মন বহির্জগতকে যেভাবে দেখে তারই একটি বৈশিষ্ট্য হলো সময় এবং বাইরের বাস্তবতার কোন বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বা গুণ এটা নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে, সময় যদি বিশ্বের একটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য হয়, তবে বিশ্ব যথাকালের বেশ আগেই সৃষ্টি হয়েছে এটা যেমন প্রমাণ করা যায়, তেমনি বিশ্ব যথাসময়ের বেশ আগে সৃষ্টি হয়নি এও প্রমাণ করা সম্ভব। এই বিরোধের মীমাংসায় কান্ট এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্বের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক নেই, কিন্তু বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সময়। এরপর অইনস্টাইন এসে সব বদলে দিলেন। তিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন সময় আপেক্ষিক, বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বিশ্ব না থাকলে সময় নেই, মহাবিস্ফোরণের কাল থেকেই সময়ের চলা শুরু। এ মহাবিশ্ব যদি মুক্ত হয়, তবে বিশ্ব অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হয়ে চলবে। আর এ মহাবিশ্ব বদ্ধ হলে সময় আবার শূন্য হবে অনন্যতায়, যার মধ্যে মহাবিশ্ব লীন হয়ে যাবে। মহাবিশ্ব মুক্ত অথবা বদ্ধ তা আজও অনির্ণীত।

আগেই বলেছি, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সময় ধারণারও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কোনও সভ্যতা কতটা উন্নত তা বোঝা যায় তার সময় ধারণার মান থেকেই। পৃথিবীর সময় ধারণা গড়ে উঠেছে সূর্য, চন্দ্র, সাতাশটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র এবং বারোটি নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশিচক্রকে ঘিরে। আপাতভাবে নক্ষত্রেরা স্থির দেখালেও ওগুলি কিন্তু প্রবলবেগে গতিশীল। মহাবিশ্বের কোনও কিছুই স্থির নয়। সবই গতিশীল। তবু পৃথিবীর সময় ধারণায় নক্ষত্রকে বা নক্ষত্রমণ্ডলীকে স্থির ধরে নিয়েই তাদের প্রেক্ষাপটে সময়ের হিসাব-নিকাশ করা হয়ে থাকে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র, নক্ষত্রমন্ডলী কেউই স্থির নয়। পৃথিবীর সময় গণনা কিন্তু নক্ষত্রদের স্থির কাঠামো ধরেই বহুকাল ধরে করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যে তো এক সময় সূর্যকে স্থির ধরা হতো। আগে অনেকবারই বলেছি, সূর্য তার সৌরমণ্ডলকে নিয়ে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করছে। আর এই পরিক্রমায় এক একবারে সময় লাগছে প্রায় 25 কোটি বছর। আমাদের সূর্যের বয়স 550 কোটি বছর হলে এই সময়ের মধ্যে সপার্ষদ সূর্য প্রায় 22 বার, ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের থেকে 33000 আলোকবর্ষ দূরত্বে থেকে, তার পরিক্রমণ শেষ করেছে।

ভারত, সুমের, মিশর, চীন বহুকাল ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করছে। সময় নিয়ে ভারতবর্ষ অত্যন্ত আধুনিক ধারণার আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল বহুকাল আগে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারত এক সময় এত উন্নতি করেছিল যে বিস্মিত হতে হয়। অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতা ভারতের কাছে ধার করেছিল তার

জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান। এই ঋগের সময়কাল 5000 থেকে 4000 বছর আগের সময়। মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানে তথা সময় ধারণায় এই মহান অবদান অবিস্মরণীয়। তবে মহাকালের প্রেক্ষাপটে মানব সভ্যতার এই সময়-পরিমাণ অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

মানুষের সভ্যতা বিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ সময় মাপতে শিখেছিল মূলতঃ দুটি কারণে। এর একটা হল, শস্য কখন বপন করতে হবে তা জানতে এবং দ্বিতীয়টি হল, উপাস্য দেবতার উপাসনা করার সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করতে। সম্বৎসরের ফসল ঘরে তোলার ব্যাপারটা ঠিকঠাক নির্বাহের জন্য এবং উপাস্য দেবতার পূজাপার্বণের সময় সঠিক রাখার জন্য প্রাচীনকালের মানুষ সময় মাপতে শিখেছিল। স্বাভাবিকভাবে এই সময় মাপা হতো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও নক্ষত্রাদির গতিবিধি দেখে। পূজা-পার্বণের সময় ঠিক করা হতো চন্দ্রের গতিবিধি থেকে। আবার ফসল কাটা, ফসল তোলা বা শস্য বপন ইত্যাদির সময় মাপ করা হতো সূর্যের গতিবিধি দেখে। পরবর্তীকালে সামাজিক কাজকর্মে সময় ঠিক করা হল চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি ও গতিবিধি দেখে। আর শাসন সংক্রান্ত কাজকর্মে সময় পরিমাপ করা হল সৌরচক্র ও সূর্যের গতিবিধির সাহায্যে। তারপর ধীরে ধীরে দিন, মাস ও বছরের হিসাব শুরু এবং এমন একটা সময় এলো যখন শুধু দিনের একক দিয়ে সময়ের পরিমাপটা অনেক বড় বা বেশি বলে মনে হতে থাকলো। একদিন যে পরিমাণ সময় তা দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের সময় নির্দেশ করা অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। ফলে, সময় মাপার আরও ক্ষুদ্র এককের প্রয়োজন দেখা দিল। দিনে দিনে সময় মাপার একক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠল। ভারতবর্ষ প্রায় 4500 বছর ধরে সময় মাপার যে সকল একক ব্যবহার করেছে তা হল ঃ

60 অনুপল = 1 বিপল

60 বিপল = 1 পল

60 পল = 1 দণ্ড

7.5 দণ্ড = 1 প্রহর

8 প্রহর বা 60 দণ্ড = 1 দিন-রাত্রি বা আধুনিক 24 ঘণ্টা

30 দিন = 1 মাস

12 মাস বা 365 দিন = 1 বছর

ত্রিশ দিনে মাস হলে বারো মাস হয় 360 দিনে। কিন্তু সৌরবৎসর হয় 365 দিনে। সব মাস তাই 30 দিনে হয় না। ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধতি অনেক সূক্ষ্ম এবং নিখুঁতভাবে সময় মাপতে পারতো বলেই সে সময় অনুপলের মতো সূক্ষ্ম সময়ের হিসাবও রাখা হত। আগের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে এক দণ্ড হল আধুনিক 24 মিনিট, এক পল হল এখনকার 24 সেকেন্ড, আর এক বিপল হল 0.40 সেকেন্ড এবং এক অনুপল হল 1/150 সেকেন্ড। অর্থাৎ এক অনুপল হল এক সেকেন্ডের একশ পঞ্চাশ ভাগের একভাগ সময়। বৈদিক যুগে এই সূক্ষ্ম সময়ের পরিমাপও করা হত। সূর্য-ঘড়ি (Sun-dial), জল-ঘড়ি (Water-clock) ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। এই ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণ সময় মাপাও হত। ভারতবর্ষে পৌরাণিক যুগে সময়ের হিসাব খুব সূক্ষ্ম থেকে শুরু করে বিশাল পরিমাণে গিয়ে শেষ হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিতে যেসব সময় পরিমাপক একক আছে তার বিবরণী হল ঃ

1 নিমেষ = একটি মাত্র লঘু অক্ষর উচ্চারণের সময় = 0.213 সেকেন্ড

15 নিমেষ = এক কাষ্ঠা = 3.2 সেকেন্ড মোটামুটিভাবে

30 কাষ্ঠা = এক কলা = 1 মিনিট 36 সেকেন্ড (প্রায়)
30 কলা = এক মুহূর্ত = 48 মিনিট (প্রায়)
30 মুহূর্ত = এক দিবস = 24 ঘণ্টা মোটামুটিভাবে = এক পার্থিব দিন-রাত্রি
7 দিন = এক সপ্তাহ
15 দিন = এক পক্ষ (পক্ষ দুরকম ঃ কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ)
দুটি পক্ষ = এক মাস (এক চান্দ্রমাস)
2টি মাস = এক ঋতু (ঋতু 6টি ঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত)
3টি ঋতু = 6টি মাস = এক অয়ন (অয়ন দুটি ঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন)
2টি অয়ন 6টি ঋতু = 12টি মাস = 1 বৎসর
12 বৎসর = এক যুগ

এই হলো পার্থিব সময়ের পরিমাপের পৌরাণিক এককসমূহের তালিকা। দেবতাদের সময়ের সঙ্গে পার্থিব সময়ের যে সম্পর্ক পুরাণগুলি দেখিয়েছে তার তালিকা হলো ঃ

1 উত্তরায়ণ = পার্থিব 6 মাস = দেবতাদের এক দিন।
1 দক্ষিণায়ন = পার্থিব 6 মাস = দেবতাদের এক রাত্রি।
1 পার্থিব বৎসর = এক দিব্য দিবস বা এক দিব্য দিন।
360 পার্থিব বৎসর = এক দিব্য বৎসর।
100 দিব্য বৎসর = দেবতাদের আয়ুষ্কাল = 36,000 পার্থিব বৎসর।
12,000 দিব্য বৎসর = এক চতুর্যুগ অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই 4টি যুগের মোট সময়কাল = 43,20,000 পার্থিব বৎসর।
কলিযুগ = 4,32,000 পার্থিব বৎসর।
দ্বাপর যুগ = 8,64,000 পার্থিব বৎসর।
ত্রেতা যুগ = 12,96,000 পার্থিব বৎসর।
সত্যযুগ = 17,28,000 পার্থিব বৎসর।

$71\frac{3}{7}$ চতুর্যুগ = একটি মনুর রাজত্বকাল = 30,85,71,428.5 পার্থিব বৎসর
14টি মন্বন্তর = 1,000টি চতুর্যুগ = 432 কোটি পার্থিব বৎসর
= এক ব্রাহ্মদিবস বা এক ব্রাহ্ম-যাম = এক কল্প
1,000 চতুর্যুগ = এক ব্রাহ্ম যাম বা এক ব্রাহ্ম-রাত্রি
2,000 চতুর্যুগ = এক ব্রাহ্ম দিন-রাত্রি
= 864 কোটি মানব-বৎসর বা পার্থিব বা মনুষ্য-বৎসর
= নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর্যাবৃত্ত কাল [Periodic Time]
360 ব্রাহ্ম দিন-রাত্রি = এক ব্রাহ্ম বৎসর = 311.04×10^{10}
50 ব্রাহ্ম-বৎসর = 155.51×10^{12} পার্থিব-বৎসর
= ব্রহ্মার বর্তমান বয়স = বিশ্বের বর্তমান বয়স।

প্রকৃত পক্ষে, 15552197, 19,61,678 পার্থিব বৎসর
= 155.522×10^{12} পার্থিব বৎসর [প্রায়] = 2007 খ্রিস্টাব্দে
ব্রহ্মার বয়স = বিশ্বের সঠিক বয়স 2007 খ্রিস্টাব্দে

= 50 ব্রাহ্ম বৎসর + শ্বেত বরাহ কল্পের 6টি মনুর কাল + সপ্তম বৈবস্বত মনুর 27টি চতুর্যুগের কাল + 28তম চতুর্যুগের সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ তিনটির কাল + 28তম চতুর্যুগের কলিযুগের 5117 বৎসর [2007 সালের 15ই এপ্রিল শেষ হয়েছে]

100 ব্রাহ্ম বৎসর = ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল = 31,104 × 10^{10} পার্থিব বৎসর

= সৃষ্টির শুরু হতে এই সময়ের পরেই মহাপ্রলয় হয় বা হবে।

200 ব্রাহ্ম-বৎসর = প্রকৃত লয় বা মহা-প্রলয়ের পর্যাবৃত্ত কাল

= 62,208 ×10^{10} পার্থিব বৎসর

= 622.08 × 10^{12} পার্থিব বৎসর বা মানব-বৎসর।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয়রা কোণ [Angle] পরিমাপেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছে ওই সুদূর অতীতকালেই। সময়ের সঙ্গে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি আকাশের ওই সব জ্যোতিষ্ক, এমনকি পৃথিবীর গতিবিধির সঙ্গে কৌণিক দূরত্ব [Angular Distance] কিংবা কৌণিক বেগ [Angular Motion] বা কৌণিক বেধ ইত্যাদি কোণ সংক্রান্ত মাপজোকেরও প্রত্যক্ষ যোগ আছে। তাই ভারতীয়রা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সময় মাপবার সঙ্গে সঙ্গে নিপুণভাবে সমান তালে কোণ পরিমাপ করতে জেনেছিল। এক দিক-চক্রবাল থেকে আরেক দিক-চক্রবাল অবধি মোট 180 ডিগ্রি ধরে পৃথিবীর চতুর্দিকের খ-গোলক বা মহাকাশ গোলক [Celestial Sphere] মোট 360 ডিগ্রি। প্রাচীন ভারতীয়রা মহাকাশের কাল্পনিক এই গোলককে বারোটি নক্ষত্রমণ্ডলীর সাহায্যে সমান বারোটি অংশে ভাগ করেছিল। প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণ করেছিলো, কাল্পনিক রেখা দিয়ে তার নক্ষত্রগুলিকে যুক্ত করলে যে আকৃতি হয় সেই অনুসারে। এইভাবে মহাকাশ গোলককে সমান বারোটি অংশে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে বলা হলো এক একটি রাশি। রাশিদের নামকরণ করা হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ইত্যাদি। প্রত্যেক রাশিকে সমান ত্রিশ ভাগে ভাগ করে পাওয়া গেল অংশ বা আধুনিক কালের কালের ডিগ্রি [Degree]। সে যুগের ভারতীয়রা কোণ পরিমাপেরও যে বিস্ময়কর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় রেখেছে তা নীচের তালিকা হতে সহজেই অনুমেয়।

60 অনুকলা = 1 বিকলা

60 বিকলা = 1 কলা

60 কলা = 1 অংশ বা আধুনিক ডিগ্রি

30 অংশ = একটি রাশি

12 রাশি = 360 অংশ = খ-গোলক

প্রাচীন ভারতীয় 'অংশ' হলো আধুনিককালের ডিগ্রির সঙ্গে একেবারে এক। বৃত্তের সমান 360 ভাগের এক ভাগ এক ডিগ্রি। প্রাচীন ভারতীয় গণনার 'অংশ' একালের ডিগ্রি। প্রত্যেক রাশিচক্র আকাশে 30 অংশ পরিমিত কৌণিক বিস্তারে অবস্থান করছে। আধুনিক পরিমাপে এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ এক মিনিট এবং এক সেকেন্ড হলো এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। এই মিনিট-সেকেন্ড কিন্তু সময়ের পরিমাপক মিনিট-সেকেন্ডের থেকে একেবারে আলাদা। এই মিনিট-সেকেন্ড কৌণিক মাপের মিনিট-সেকেন্ড। যাইহোক, ভারতীয় এক কলা এখনকার এক মিনিট, এক বিকলা এখনকার এক সেকেন্ড;আর এক অনুকলা হলো 1/60 সেকেন্ড। *এতো সূক্ষ্ম কৌণিক পরিমাপের একক ভারতীয়রা সেই সুদূর অতীতেই* ব্যবহার করতো এটাও আশ্চর্যের। এগুলি জানতো বলেই চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সঠিক সময়

তারা আগেভাগেই কষে বের করতে পারতো। সূর্য-চন্দ্রের গতিবিধি ইত্যাদি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে পারতো। এমনকি গোধূলি কেন হয়, উষা কেন দেখা যায় এবং তারা কতক্ষণ স্থায়ী হয় তাও তারা সঠিকভাবে হিসাব করে দিত। সময় ও কৌণিক পরিমাপের এই গভীর সূক্ষ্মতা সমসাময়িক অন্যান্য সব সভ্যতার তুলনায় অত্যন্ত উন্নতমানের পরিচয় বহন করছে। এই পরিমাপ আধুনিক পরিমাপের সঙ্গে পাল্লা দেয়। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এই বিষয়ে অন্ততঃ ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

সমসাময়িক কালে সুমেরীয়রা দেখলো সূর্য কোনও একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে ফিরে আসতে প্রত্যেকবার মোটামুটি সমান সময় নেয়। সেই সময়টাকে বারোভাগ করলে প্রত্যেক ভাগের সময় হলো এক সৌরমাস। এইভাবে তারা সৌরমাসের কথা জানলো। আকাশে সূর্যের গতিপথকে বারোভাগে ভাগ করে জানলো এক একটি রাশি এবং রাশিচক্রের কথা। তারা এও দেখলো এক একটি রাশির নক্ষত্রমণ্ডলী দিকচক্রবালে উদিত হতে মোটামুটি সারা দিন-রাত্রির বারোভাগের একভাগ সময় অর্থাৎ আদুনিক হিসাবে দু'ঘণ্টা সময় নেয়। সুমেরীয়রা এই সময়টাকে বলতো 'দান্না' [Danna]। এই দু'ঘণ্টা সময়কে তারা 30 ভাগে ভাগ করে এক একটা ভাগের নাম দিল 'গেস' [Ges]। অর্থাৎ এক 'গেস' হলো এখনকার চার মিনিট।

প্রাচীন মিশরীয়রাও সমসাময়িক কালে আবিষ্কার করলো 365¼ দিনে এক সৌরবৎসর। আর একদিনকে 24 ভাগ করলে যে একঘণ্টা হয় তাও তাদের অজানা ছিল না। তারা রাতকে বারো এবং দিনকে বারো ভাগে ভাগ করে সময় মাপতো। সূর্যের চেয়ে তার লুব্ধক নক্ষত্রের গতিবিধির উপরেই বেশি নির্ভর করতো দিন মাস বছরের গণনায়। ঘণ্টা ছিল তাদের সময় পরিমাপের একক। প্রায় তিন হাজার বছরের পুরাতন এক ছায়া-ঘড়ি বা সূর্য-ঘড়ি আবিস্কৃত হয়েছে, যা মিশরীয়রা ব্যবহার করতো। এই ঘড়িতে দশ ঘণ্টার হিসাব দেখানো হয়েছে। উষাকালের একঘণ্টা ও গোধূলির একঘণ্টা এতে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই দু'ঘণ্টা ধরে, দিন হতো বারো ঘণ্টায়। আর রাত তো বারো ঘণ্টারই ছিল। দিনরাত্রিকে তারা ধরতো 24 ঘণ্টার সমাহার।

কিছু পরবর্তীকালে ব্যাবিলনীয়রা অর্ধ-চক্রাকার [Hemi-Cycle] সূর্যঘড়ি ব্যবহার করে সময়ের পরিমাপ শুরু করেছিলো। একটা চৌকোনো কাঠ বা পাথরের উপর অর্ধ-গোলক খোদাই করে তার উপর একটা দণ্ড লাগানো থাকতো। এই দণ্ডই হতো সূর্যঘড়ির কাঁটা। এবার সূর্যের আলোর বিপরীতে দণ্ডের ছায়া পড়তো ওই অর্ধগোলকের উপর। এই ছায়ার অবস্থান দেখে তারা সময় নির্দেশ করতো। তবে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ছায়ার অবস্থান পরিবর্তিত হতো বলে অর্ধগোলকের উপর কতকগুলি বৃত্তচাপ [Arc] দাগ কাটা থাকতো। এইগুলির উপর দণ্ডটির ছায়া কোথায় পড়েছে দেখে দিনের সময় নির্ণয় করা হতো এবং বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তচাপ হতে সময়ের পরিমাপ করা যেতো। প্রত্যেকটি বৃত্তচাপই বারোটি ভাগে ভাগ করা থাকতো। এই বারো ভাগই দিনমানের বারো ঘণ্টার নির্দেশক। ব্যাবিলনীয় সূর্য-ঘড়ি পরবর্তীকালে আরও উন্নততর রূপ নেয়। ওই অর্ধগোলকের সঙ্গে যুক্ত হয় শঙ্কু [Cone] আকৃতির কিছু যন্ত্রাংশ, যার ফলে আরও সঠিকভাবে প্রতিদিন সময়ের পরিমাপ সম্ভব হয়েছিল। সূর্য-ঘড়ির প্রচলন মায়া সভ্যতায় ছিল। গ্রীস, রোম, ইঙ্কা, আজটেক প্রভৃতি সভ্যতাও সূর্যঘড়ির ব্যবহার জানতো। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত মন্দিরে এই ঘড়ির ব্যবহার ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ করে তুলনামূলকভাবে আধুনিক মন্দিরগুলিতেও এই সূর্য-ঘড়ির ব্যবহার দেখা যায়।

প্রসঙ্গত দ্বাদশ শতকে নির্মিত কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে এককালে বহু সূর্যমন্দির ছিল। উড়িষ্যার এই বিখ্যাত মন্দিরের প্রায় একশ' বছর আগে গুজরাটের মধেরায়ও এমনি একটি মন্দির তৈরি হয়েছিল সূর্য-দেবতার উদ্দেশে। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন প্রত্নদর্শন

হিসাবে সযত্নে রক্ষিত আছে। কোনারকের সূর্য-মন্দির তৈরি হয়েছিলো অত্যুন্নত শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য ও প্রযুক্তি ভাবনার সমন্বয়ে। সূর্য অরুণকে সারথি করে সপ্তাশ্বের রথে আকাশে আসছেন। এই রথই বিশাল সূর্য মন্দির। সপ্তাশ্ব সপ্তাহের সাতদিন বা সাদা আলোর সাতটি মূল বর্ণের দ্যোতক। এই মন্দিরের চব্বিশটি চাকা সৌর বৎসরের চব্বিশটি পক্ষ [Fortnight] নির্দেশ করছে। প্রতিটি চাকা এক একটি সূর্য-ঘড়ি। চাকার অক্ষদণ্ড [Axis] কিছুটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে সূর্য-ঘড়ির দণ্ড হিসাবে ব্যবহারের জন্য। ওই বাইরে বের করা অক্ষদণ্ডের ছায়া পড়ে চাকার বেড় [Rim]-এর উপর। যে দিকে ছায়া পড়ছে সে দিকের বেড় বা রিমে নিখুঁতভাবে সমান করে 360টি দাগ কাটা আছে। প্রতিটি দাগ দু মিনিট সময় নির্দেশ করছে। চাকার আটটি অর [Spoke] চাকাটিকে সমান আট ভাগে ভাগ করেছে। প্রত্যেকটি অর এক-একটি প্রহরের দ্যোতক। দিনমানকে চারভাগে এবং রাত্রিকে চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে এক প্রহর বলে ধরা হয়েছে। অক্ষদণ্ডের ওই ছায়া যে দাগের উপর পড়ছে তা দেখে এখনও কোনারকের স্থানীয় সময় নির্ভুলভাবে মাপ করা সম্ভব হচ্ছে। এক প্রহর সময় তিন ঘণ্টা। চাকার যেটুকু জ্যা বা অংশ এক প্রহর সময় নির্দেশ করছে তা সমান নব্বই ভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেকটি দাগ দু-মিনিট করে সময় বলে দিচ্ছে। দুটি দাগের মধ্যবর্তী বৃত্তচাপ চাকার কেন্দ্রে 0.5 ডিগ্রি কোণ তৈরি করেছে। এই 0.5 ডিগ্রি কোণই দু-মিনিটের নির্দেশক হয়েছে কোনারকের সূর্য-মন্দিরের চাকারূপী সূর্য-ঘড়িতে। আধুনিক যুগের ঘড়িতে 6^0 কোণ এক মিনিট সময়ের নির্দেশ দেয়, কারণ এগুলিতে মোট 360^0 কে 60, ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে এক মিনিট ধরা হচ্ছে। যাইহোক, কোনারকের প্রতিটি চাকাই কিন্তু এক-একটি সূর্য-ঘড়ি। চব্বিশটি চাকার এই চব্বিশটি সূর্য-ঘড়ি থেকে বছরের চব্বিশটি পক্ষের বিভিন্ন দিনের সময় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। সারা বছর সূর্যের অবস্থান পরিবর্তিত হয় বলেই সঠিক সময় নির্ণয় করতে সূর্যঘড়ির মাত্রাঙ্কনও [Graduation] ভিন্ন ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্যা দূর করতেই চব্বিশটি চাকা তথা সূর্য-ঘড়ির অবতারণা করা হয়েছে। বছরের বিভিন্ন পক্ষের সময় ভিন্ন ভিন্ন চাকা থেকে নির্ণয় করা হতো কোনারকের এই বিখ্যাত মন্দিরে। অবশ্য এখানকার মত মিনিটের হিসাব ছিল না সে সময়। সময় হিসাব করা হতো প্রহর-দণ্ড-পল-বিপল-অনুপল দিয়ে। কোনারকের সূর্যমন্দির সুমের-ব্যাবিলনীয়দের তুলনায় অনেক আধুনিক। প্রাচীন ভারতে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সময় পরিমাপের নানা তত্ত্ব পাওয়া গেলেও সে সম্পর্কিত প্রাযুক্তিক কোনও নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র মতে কালের সপ্তদশ বা সতেরোটি ভাগ কল্পনা করা হয়। এই সতেরোটি ভাগ হলো—(1) তুট, (2) লব (3) নিমেষ (4) কাষ্ঠা (5) কলা (6) নালিকা (7) মুহূর্ত (৪) (দিনের) পূর্বভাগ (9) (দিনের) পরভাগ (10) দিবস (11) রাত্রি (12) পক্ষ (13) মাস (14) ঋতু (15) অয়ন (16) সংবৎসর ও (17) যুগ।

চোখের পাতা পড়তে যে সময় লাগে তার এক-চতুর্থাংশ সময় হলো 'তুট'। অর্থাৎ চক্ষুর পক্ষ-পাতন সময়ের 1/4 অংশ সময় হল 'তুট' এবং এটা যেন কালের পরমাণুভূত। দুই তুটে এক 'লব' এবং দুই লবে এক 'নিমেষ'। আবার পাঁচ নিমেষে এক 'কাষ্ঠা', ত্রিশ কাষ্ঠায় এক 'কলা' এবং চল্লিশ কলাতে এক 'নাড়িকা' বা 'নালিকা' হয়। নালিকার যা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হলো, চার সুবর্ণমাষা পরিমাণ প্রস্থ ও চার 'অঙ্গুল' দীর্ঘ একটি জলকুম্ভে ছিদ্র দিয়ে সেই কুম্ভস্থিত এক 'আঢ়ক' জল যতটা সময়ে নির্গত হয়, সেই পরিমাণ সময়ের মান হলো এক নালিকা। দুই নালিকায় এক 'মুহূর্ত', পনেরো মুহূর্তে এক রাত্রি ও পনেরো মুহূর্তে এক দিবস। অর্থশাস্ত্র মতে, চৈত্র ও আশ্বিন মাসেই কেবল পনেরো মুহূর্তে এক দিন বা এক রাত্রি হয়। অন্য সময়ে এর তারতম্য ঘটে। কারণ এই দুই মাস দিন ও রাত্রির মান প্রায় সমান থাকে। এর পরে

ছয় মাস পর্যন্ত দিন ও রাত্রির অন্যতরটি যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। অর্থাৎ ছয় মাস দিন বাড়ে এবং রাত্রি কমে। চৈত্র বিষুব বা বাসন্তী বিষুবের পর দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস এবং আশ্বিন বিষুব বা শারদ বিষুবের পর রাত্রির বৃদ্ধি ও দিবসের হ্রাস হতে থাকে।

ছায়া দিয়ে কালমাণ নিরূপণের একটা পদ্ধতি অর্থশাস্ত্র বলেছে। যখন ছায়া আট 'পৌরুষ' অর্থাৎ 96 অঙ্গুল দীর্ঘ প্রতিভাত হবে, তখন সম্পূর্ণ দিনের 1/18 ভাগ গত হয়েছে বলা যায়। আবার 72 অঙ্গুল দীর্ঘ ছায়া পড়লে দিনের 1/14 অংশ গত হযেছে বুঝতে হবে। ছায়া 4 পৌরুষ বা 48 অঙ্গুল দীর্ঘ হলে দিনের 1/8 অংশ, 2 পৌরুষ বা 24 অঙ্গুল দীর্ঘ হলে দিনের 1/6 অংশ এবং 1 পৌরুষ বা 12 অঙ্গুল দীর্ঘ হলে দিনের 1/4 অংশ, 8 অঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হলে দিনের 3/10 অংশ, 4 অঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হলে দিনের 3/8 অংশ গত হয়েছে বুঝতে হবে। যখন কোন ছায়া দৃষ্ট হবে না অর্থাৎ যখন ছায়া শঙ্কুতে প্রবিষ্ট হবে তখন মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত বলে জানতে হবে।

দিবসের মধ্যাহ্ন পার হলে উক্তভাবেই বিপরীতক্রমে অবশিষ্ট দিবস-ভাগ গণনা করতে হবে। আষাঢ় মাসের অন্তে মধ্যাহ্নকালে ছায়া দেখা যায় না। তারপর শ্রাবণাদি ছয় মাসে একেবারে পৌষের শেষ পর্যন্ত ছায়া দু' অঙ্গুল করে বাড়তে থাকে এবং মাঘাদি ছয় মাসে আবার আষাঢ়ের শেষ পর্যন্ত ছায়া দু' অঙ্গুল করে কমতে থাকে।

15 অহোরাত্রিতে একপক্ষ হয়। যে পক্ষে সোম বা চন্দ্র বাড়তে থাকে তা শুক্লপক্ষ এবং যে পক্ষে চন্দ্র কমতে থাকে তা 'বহুল পক্ষ' বা কৃষ্ণপক্ষ। এই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ মিলে এক মাস হয়। এই মাসের নাম 'সাবন' মাস। 30 অহোরাত্র ধরে এক 'প্রকর্মমাস' অর্থাৎ কর্মকরদের ভৃতি-গণনার মাস হয়। অর্ধ অহোরাত্র যোগ করে 30 অহোরাত্রে অর্থাৎ 30.5 দিনে এক সৌর-মাস হয়। সূর্যের গতির অনুরূপে গণনীয় বলেই এই মাস 'সৌরমাস'। আবার অর্ধ অহোরাত্র কম করে 30 অহোরাত্রে অর্থাৎ 29.5 দিনে হয় এক 'চান্দ্র মাস'। 27 অহোরাত্রে হয় এক 'নাক্ষত্রমাস'। 32 অহোরাত্রে হয় এক 'মলমাস'। অশ্ব প্রবাহণ কার্যে নিযুক্ত কর্মচারিদের বেতন-মাস 35 অহোরাত্র করার নিয়ম-নির্দেশের কথা আছে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে। হস্তিপ্রবাহণ-কার্যে নিযুক্তদের বেতনমাস ধরা হতো 40 অহোরাত্র বা 40 দিন। অর্থাৎ তাদের বেতন হতো 480 দিনের এবং মোটামুটি চার মাসের বেতন 'বোনাস' হিসাবে দেওয়া হতো।

আবার 2 মাসে একঋতু। অর্থশাস্ত্র মতে শ্রাবণ ও 'প্রোষ্ঠপদ' (ভাদ্র) এই দুই মাস বর্ষা ঋতু। আশ্বিন ও কার্তিক এই দুই মাস শরৎ ঋতু। মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু। মাঘ ও ফাল্গুন হলো শিশির বা শীত ঋতু। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত ঋতু এবং 'জ্যোষ্ঠা-মূলীয়' বা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুটি মাস গ্রীষ্ম ঋতু। শিশিরাদি তিন ঋতু অর্থাৎ শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর নাম 'উত্তরায়ণ'। বর্ষাদি তিন ঋতুর অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর নাম 'দক্ষিণায়ন'। এই দুই অয়ন মিলে এক সংবৎসর। 5 সংবৎসরে হয় এক যুগ। সম্পূর্ণ কালমানের সংক্ষিপ্তসূত্র বা আর্য্যা ছিল এই রকম ঃ

2 তুট = 1 লব	15 অহোরাত্র = 1 পক্ষ
2 লব = 1 নিমেষ	2 পক্ষ = 1 মাস
5 নিমেষ = 1 কাষ্ঠা	2 মাস = 1 ঋতু
30 কাষ্ঠা = 1 কলা	3 ঋতু = 1 অয়ন
40 কলা = 1 নালিকা	2 অয়ন = 1 সংবৎসর
2 নালিকা = 1 মুহূর্ত	5 সংবৎসর = 1 যুগ
30 মুহূর্ত = 1 অহোরাত্র	

কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র মলমাস বা অধিমাস সম্পর্কে যা বলেছে তা হলো

"সূর্য প্রতিদিনের 1/60 ভাগ ছেদ করে নেয়, এই কারণে সূর্য এক ঋতুতে অর্থাৎ 60 দিনে একদিন অধিক উৎপাদন করে। সুতরাং 2.5 বছরে 15 দিন বাড়িয়ে দেয় সূর্য। এইভাবে চন্দ্রও সূর্যের মত প্রতিদিন দিবসের 1/60 ভাগ কম নেয়, সুতরাং এক ঋতুতে একদিন ছেদ করে দেয় অর্থাৎ 2.5 বছরে 15 দিন কম করে দেয়। এইভাবে 2.5 বছরে মাঘ প্রভৃতি 30 মাসে গ্রীষ্মঋতুতে প্রথম অধিমাস বা মলমাস ও পাঁচবছরে অর্থাৎ পরবর্তী 2.5 বছরে, শ্রাবণ প্রভৃতি 30 মাসে দ্বিতীয় অধিমাস বা মলমাস চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে মিলে উৎপাদন করে।" [কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র 2/21/1-2]

সময়ের এইসব হিসাব কৌটিল্যের যুগে ব্যবহারিক জীবনে এবং রাজকার্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়রা যে সময় পরিমাপে অত্যন্ত দক্ষ ছিল এটা তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ। সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্মে এবং রাজপুরুষের রাজকার্যের প্রতিটি স্তরে এইসব খুঁটিনাটি হিসাবের নিখুঁত প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিল এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। অনেক পণ্ডিত অবশ্য কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র আরও দু'হাজার বছরের পুরানো রচনা বলে মনে করেন। তর্কের মধ্যে না গিয়ে একে যদি নবীনতরও ধরা যায় তাতেও এর বয়স প্রায় 2,300/2,400 বছর দাঁড়ায়। অর্থাৎ আড়াই হাজার বছর আগে সময় গণনায় ভারতীয়রা যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে এই কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় 1909 খ্রিস্টাব্দে। তার আগে বইটির কথা প্রায় অজানাই ছিল। প্রায় হাজার দেড়েক বছরের প্রাচীন 'সূর্য সিদ্ধান্ত' একটি প্রামাণ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সময়ের ক্ষুদ্রতম একক হল 'ত্রুটি'। এই ত্রুটির মান হল 1/33,750 সেকেন্ড। অর্থাৎ এখনকার এক সেকেন্ডের 33,750 ভাগের এক ভাগ সময়ের মত সূক্ষ্মতর সময়ের পরিমাপ বা হিসাব-নিকাশ করেছে এই বিখ্যাত গ্রন্থটি।

মানুষ একসময় দেখলো সূর্য-ঘড়ি দিয়ে যথাযথভাবে সময় মাপার কাজ চলছে না। তাছাড়া রাত্রিবেলায় সূর্য-ঘড়ি কোনও কাজেই আসে না। অথচ সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতেও সময় মাপা জরুরী হয়ে পড়লো। ফলে মানুষ আবিষ্কার করলো জল-ঘড়ি [Water-Clock]। জল-ঘড়ির প্রাথমিক পর্যায়ে একটা বালতি-আকৃতির পাত্রে একটা ছিদ্র করা থাকতো। এই বালতিতে জল ভর্তি করা হতো এবং ছিদ্র দিয়ে জল বেরিয়ে যাওয়ার হার দেখে সময় মাপা হতো। এতে বালতিকে আগে মাত্রাঙ্কিত করা হতো। এই মাত্রাঙ্কন করতে সৌর-সময় ব্যবহৃত হতো। সূর্য-ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে কতটা সময়ে জল বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বালতিটাকে কতদূর খালি করছে, তা দেখে বালতির মাত্রাঙ্কন বা Graduation করা হোত। মাত্রাঙ্কিত বালতির কতটা খালি হয়েছে তা দেখে জলঘড়ি থেকে সময় নির্ণয় করা হতো। পরবর্তীকালে বালতির বদলে সুবিধাজনক নানা আকৃতির পাত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। ছিদ্রের আকৃতিরও নানা হেরফের ঘটে। জলঘড়িতেই প্রথম আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতিবিধির সাহায্য ছাড়াই সময় মাপবার ব্যবস্থা চালু হয়। সময় পরিমাপের আধুনিকতার সেই শুরু। জলপাত্রের জল কমে যাওয়ার হার থেকেই সময় কতটা বয়ে গেল তা হিসাব করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে দুটো করে জলপাত্র ব্যবহৃত হয়। একটার থেকে জল বেরিয়ে অন্যটিতে জমা হতো। দ্বিতীয়টিও মাত্রাঙ্কিত থাকতো। এতে জল জমা হওয়ার হার দেখেও সময় জানা যেত। একটি পাত্রের জল খালি হওয়ার হার ও অন্যটিতে জমা হওয়ার হার দেখে দুটি সময় পাওয়া যেত। তার গড় [Average] করে উদ্দিষ্ট সময় কতটা তার হিসাব করা যেত প্রায় নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে। সময় যে জলস্রোতের মত বয়ে চলে এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে জল-ঘড়িতে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু করে ইউরোপ পেরিয়ে আমেরিকার দেশগুলিতে, যেখানে যেখানে সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল তার প্রায় সর্বত্র, এই জল-ঘড়ির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল সেই সুদূর অতীতকালেই। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীন সূর্য-ঘড়ি এবং জল-ঘড়ি দুটোতেই খুব পারদর্শী হয়ে ওঠে। যে কোনও সময়ের পরিমাপ এই দু-রকমের ঘড়ির সাহায্যেই তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতো। দশম শতাব্দীতে আরব দেশগুলিতেও এই দু-রকম ঘড়ির উন্নত সংস্করণ যথেষ্ট পরিমাণে চালু ছিল। ভারতবর্ষেও এই দু-ধরমের ঘড়ির বহু ব্যবহার ছিল চৈনিকদের সমসাময়িক কালে। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষই এইসব ঘড়ি প্রথম ব্যবহার করতে শেখে এবং অন্যান্য সভ্যতা ভারত থেকেই এগুলি ধার করে। সময় পরিমাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যতাগুলি ভারতের কাছে ঋণী। সূর্য-ঘড়ি এবং জল-ঘড়ি ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও দু-রকমের ঘড়ি চালু ছিল। এক রকম হলো, বালিঘড়ি [Hour-Class or Sand Clock], অন্যটি হলো বাতিঘড়ি [Candle Clock]। বালিঘড়ির প্রচলিত নাম ছিল 'ঘটিকা যন্ত্র'। এতে দুটো পাত্র ব্যবহৃত হতো এবং যন্ত্রটি ছিল জল-ঘড়িরই অনুরূপ। দুটি পাত্রের একটিতে বালি ভরা থাকতো, অন্যটি খালি। দুটিই মাত্রাঙ্কিত। বালি ভর্তি পাত্রটিতে একটি ছিদ্র থাকতো। তার মধ্য দিয়ে বালি ধীরে নীচের দ্বিতীয় পাত্রটিতে পড়তো। বালি ভর্তি পাত্রের খালি হওয়ার হার দেখে ও ওই পাত্রের মাত্রাঙ্কন দেখে কতটা সময় পেরিয়ে গেল তা বলা যেতো। তেমনি যে পাত্রে বালি জমতো তার মাত্রাঙ্কন থেকেও সময় নির্ধারিত হতো। এই উভয় সময়ের গড় করেই সঠিক সময় নির্ণয় করা যেত। বলা বাহুল্য যে, পাত্র দুটি একই মাপের হতো। জল-ঘড়ির ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা ছিল যে, কিছুটা জল বাষ্পীভূত হয়ে উবে যেতো। ফলে যে পাত্রে জমতো তাতে সময়ের পরিমাণ কিছুটা কম হতো। এই অসুবিধা দূর করতেই বালি-ঘড়ির বা ঘটিকা-যন্ত্রের উদ্ভাবন। এতে বাষ্পীভবনজনিত অসুবিধা দূর হলো এবং অত্যন্ত নির্ভুলভাবে সময় মাপতে আর বাধা রইল না।

সময় ধারণার ক্রম বিবর্তনে সময় মাপার পদ্ধতি আরও উন্নততর হতে শুরু করলো। 1088 খ্রিস্টাব্দে চীনের সু-সুঙ্গ [Su-sung] চীনের রাজপ্রাসাদে সর্বপ্রথম ঘড়িঘর [Clock Tower] নির্মাণ করেন। এই ঘড়ির উচ্চতা ছিল প্রায় 10 মিটার এবং ওজন ছিল প্রায় 15 মেট্রিক টন। এই পদ্ধতিতে ঘড়িঘর নির্মাণ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে 1300 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। 1500 সালে জার্মানীর এক তালা নির্মাতা পিটার হেনলিন [Peter Henlein] প্রথম স্প্রীং [Spring] ব্যবহার করে ছোট ছোট টাইমপীস ঘড়ি বানালেন। 1670 সালে ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটার সঙ্গে মিনিটের কাঁটা যোগ হল। এই সব ঘড়ির ব্যাস ছিল 20/25 সেন্টিমিটার এবং এদের বেধ ছিল দুই/তিন ইঞ্চি। দোলকযুক্ত [Pendulum] ঘড়ি সর্বপ্রথম বানান ক্রিশ্চিয়ান হুইগেন্স [Christian Huygens] 1656 খ্রিস্টাব্দে। 1660 সালে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক [Robert Hook] পরিপূরক দোলক [Compensatory Pendulum] বানালেন। এইভাবে দোলকযুক্ত ঘড়ির প্রচলন হয়। 1930 সাল নাগাদ তৈরি করা সবচেয়ে ভালো পেন্ডুলাম ঘড়িতেও মোটামুটি প্রতিদিন 0.001 সেকেন্ড পর্যন্ত সময়ের পার্থক্য হতে দেখা গেল। অর্থাৎ এক হাজার দিনে এই পার্থক্য হচ্ছে এক সেকেন্ড। আরও নির্ভুল করে সময় মাপতে তৈরি হল 'ক্রিস্ট্যাল ঘড়ি' [Crystal Clock]। নানা ধরনের ক্রিস্ট্যাল ঘড়ির মধ্যে সবচেয়ে সঠিক সময় দেয় 'কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল' ঘড়ি। এটি সারাদিনে এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ [Micro Second] অবধি নিখুঁত ও নির্ভুল সময় দেয়।

তবে, 10^{-15} সেকেন্ড থেকে শুরু করে 10^{-24} সেকেন্ড পরিমাণ সময় মাপতে 'কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল' ঘড়ি অচল। ওই অতি সূক্ষ্ম সময় পরিমাপ করতে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর উচ্চ কম্পাঙ্কের পর্যাবৃত্ত গতির সাহায্য নিলেন। 1949 সালে পরমাণু-ঘড়ি [Atomic Clock] তৈরি হল। শুরু হল পরমাণু ঘড়ির

যুগ। 1930 সালের পর থেকে এসেছিল বৈদ্যুতিক ঘড়ি ও কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল ঘড়ির যুগ। এই সব ঘড়ি একলক্ষ Cycles/ সেকেন্ড গণনা করতে পারতো। প্রতি সেকেন্ডে 10, 100, 1000 এবং 10,000 কম্পাঙ্কের গণনা করতে পারে এমন ঘড়ি বহু তৈরি হলো। এইসব ঘড়িতে দু'রকমভাবে ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড দেখার ব্যবস্থা থাকে। কিছু ঘড়িতে মিনিট সেকেন্ডের কাঁটা থাকে এবং বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে। আবার অধিকাংশ এই ধরনের ঘড়িতে সংখ্যা যুক্ত আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল ঘড়ি তৈরি হয় বৈদ্যুতিক ঘড়ির সঙ্গে কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল অসিলেটর [Quartz Crystal Oscillator] যুক্ত করে। কোয়ার্টজ বা অন্যান্য কেলাসের এক বড় গুণ হলো এগুলি একই সঙ্গে স্থিতিস্থাপক [Elastic] এবং 'পিজোইলেকট্রিক' [Piezoelectric] গুণ সম্পন্ন। এই কেলাসগুলির দুই বিপরীত তলে যদি বৈদ্যুতিক বল প্রয়োগ করা হয় তবে কেলাসটির আকৃতির বিকৃতি ঘটে। আবার কেলাসটির আকৃতি বিকৃতি ঘটলে তা হতে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি হয়। একটি কোয়ার্টজ কেলাস কোনও দোলনশীল বৈদ্যুতিক আবর্তনীর [Oscillating Electric Circuit] মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে ওই বৈদ্যুতিক আবর্তনীর কম্পাঙ্ক দরকার মতো বদলানো সম্ভব হয়। সবচেয়ে ভালো কোয়ার্টজ ঘড়িতে 'Drift' হয় প্রতিদিনে 10^{-11} অংশ এবং এর ত্বরণ হলো প্রায় এক মাইক্রো সেকেন্ড বা 10^{-6} সেকেন্ড প্রতিদিন প্রতিদিন বা 10^{-6} সেকেন্ড/(প্রতিদিন)^2।

যাইহোক, পারমাণবিক ঘড়ির মূল তত্ত্বই হলো পরমাণুর ইলেকট্রন যখন উচ্চশক্তি সম্পন্ন কক্ষপথ হতে নিম্নশক্তি সম্পন্ন কক্ষে চলে আসে তখন ওই শক্তির পার্থক্য ওই পরমাণু হতে কিছু নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গ নির্গত করে। এর একটা সূত্রও আছে, সেটা হলো ঃ

$$f = (E_1 - E_2) / h.$$

f = নির্গত শক্তির কম্পাঙ্ক
E_1 = উচ্চতর শক্তি বিশিষ্ট কক্ষের শক্তি স্তর
E_2 = নিম্নতর শক্তি বিশিষ্ট কক্ষপথের শক্তি স্তর
h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Plank's constant]

এই কম্পাঙ্ক মাপ করেই পরমাণু ঘড়িগুলি সময়ের নির্দেশ দেয়।

আগেই বলা হয়েছে, 1949 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ন্যাশানাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যামোনিয়া ঘড়ি বানায়। এতে অ্যামোনিয়া [NH_3] অণু ব্যবহৃত হয়। 1954 সালে এমন একটা অ্যামোনিয়া Oscillator বানানো সম্ভব হলো, যেটাতে অ্যামোনিয়া 'মেসার' ব্যবহার করা গেল। এই 'মেসার' হলো MASER বা Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation। এই পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া অণুদের উচ্চশক্তিসম্পন্ন অবস্থায় একটা গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিম্নতর শক্তি স্তরে নিয়ে আসা হয়। এর ফলে শক্তির বিকিরণ ঘটে। অ্যামোনিয়া মেসার বেশ স্থায়ী এবং তেজষ্ক্রিয় নয়। কিন্তু এর কম্পাঙ্ক বেশ প্রভাবান্বিত হতে পারে যদি উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকে। নাইট্রোজেন-14 ব্যবহার করে এর কম্পাঙ্ক হল প্রায় 23,870,129,300 প্রতি সেকেন্ডে। আর নাইট্রোজেন-15 ব্যবহার করলে এই কম্পাঙ্ক হয় 2278,94,21,700 কম্পন প্রতি সেকেন্ডে।

ইংলন্ডের টেডিংটন (Teddington) ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরী 1955 সালে এক ধরনের অত্যুন্নত স্পন্দক আবিষ্কার করলো সীজিয়াম পরমাণু রশ্মি ব্যবহার করে। সীজিয়াম রশ্মির ঘড়ি তৈরির তত্ত্বটা বেশ জটিল হলেও ইদানীং বেশ কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা এই ঘড়ি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বানাতে পেরেছে এবং এই ঘড়িগুলি যথেষ্ট নিখুঁত সময়ও দিচ্ছে। এই ঘড়ির কম্পাঙ্ক প্রায় $(10)^{12}$ প্রতি সেকেন্ডে। এই

কম্পনের পরিবর্তন ঘটে ± 2 হারে এবং কখনই ± 5 এর বেশি হয় না এই পরিবর্তনশীলতা। 1955-58 সালের মধ্যে ঐ ল্যাবোরেটরী 'Dual Rate Moon Camera' ব্যবহার করে Ephemeris Time-এর সঙ্গে সীজিয়াম রশ্মি স্পন্দকের সম্পর্ক বের করলো। দেখা গেল, এই কম্পাঙ্ক হল 9,192,631,770 Cycle প্রতি সেকেন্ডে। 1967 সালে এটাই প্রমাণ সেকেন্ড বা স্ট্যান্ডার্ড সেকেন্ডের শুদ্ধ মান বলে আন্তর্জাতিকভাবে মেনে নেওয়া হল। এখন আন্তর্জাতিক এক সেকেন্ড হল সেইটুকু সময় যে সময়টুকুতে সীজিয়াম রশ্মি স্পন্দকের স্পন্দন হয় 919 কোটি 26 লক্ষ 31 হাজার 7 শত 70 বার।

1960 সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হাইড্রোজেন মেসার ঘড়ি বের করলো। এই ঘড়ি অ্যামোনিয়া মেসারের থেকে অনেক উন্নত। এর স্থায়িত্বের হিসাব হলো 10^{13}-তে এক অংশ মাত্র। এই কম্পাঙ্ক হলো 1,420,405,751.8 Cycle/ প্রতি সেকেন্ডে। কিন্তু হাইড্রোজেন মেসার বানানো বেশ কষ্টসাধ্য এবং চরম কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য কী ধরনের সংশোধন দরকার তাও সঠিকভাবে জানা যায়নি। ফলে, সীজিয়াম ঘড়ির কম্পাঙ্ককেই স্ট্যান্ডার্ড সেকেন্ডের জন্য ব্যবহার করা হয় 1967 সালে। তাই-ই এখনও স্ট্যান্ডার্ড সেকেন্ডের মান হিসাবে চালু আছে। অর্থাৎ সীজিয়াম রশ্মি স্পন্দকের 919,26,31,770 বার স্পন্দন হতে যে সময় লাগে তাই আজ প্রমাণ সেকেন্ড বা স্ট্যান্ডার্ড সেকেন্ড। এখন আর চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি দিয়ে সময়ের মান নির্ণীত হয় না। এই প্রমাণ সেকেন্ডই সারা পৃথিবীর কাছে মহাসময়ের সর্বজনীন একক।

রুবিডিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে এক ধরনের পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে। এই ঘড়িতে যে নীতি অনুসরণ করা হয় বিজ্ঞানের ভাষায় তা 'Optical Pumping'। এই ঘড়িগুলি হাল্কা এবং তুলনামূলকভাবে সরল। এর কম্পাঙ্ক ঘড়িটি তৈরি করবার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। এই ঘড়ি তাই নির্দিষ্ট কিছু কাজকর্মে ব্যবহার করা হয়। সীজিয়াম ঘড়ির মত ব্যাপক ব্যবহার এর নেই। সীজিয়াম ঘড়ির কম্পাঙ্ক থেকেই আন্তর্জাতিক প্রমাণ সেকেন্ড নির্দিষ্ট। তাই সূক্ষ্ম ও সঠিক সময় মাপের জন্য সীজিয়াম ঘড়ি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়

খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় এখন নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব হচ্ছে এইসব পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে। কোনও স্পন্দকের কম্পাঙ্ক সেকেন্ড প্রতি 10^6 হলে তার সাহায্যে 10^{-6} সেকেন্ড বা এক মাইক্রো সেকেন্ড মাপা যায়। কারণ দুটো কম্পনের মধ্যে যে সময় অন্তর তা 10^{-6} সেকেন্ড। এই সময় আলো জ্বলা সংখ্যার সাহায্যে নির্দেশ করা এখন আর মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় মাপার এতো রকম ব্যবস্থাপনা নেই। মানুষের তৈরি ঘড়ি বিশাল বিশাল সময়ের পরিমাপে কোনই কাজে আসে না। তেজস্ক্রিয়তার হিসাব-নিকাশ করে বড় বড় সময়ের নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বিশাল বিশাল সময়ের নিরূপণে বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘড়ি।

তেজস্ক্রিয়তার (Radioactivity) সাহায্যে পৃথিবীর বয়স, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর বয়স, এমনকি বিশ্বের বয়সও নির্ণয় করা সম্ভব। যে সমস্ত কালের মান অত্যন্ত বেশি সেগুলি নির্ণয়ের জন্য তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে এইসব দীর্ঘ সময়ের মান সুচারুভাবে নির্ণয় করা এখন আর অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘ সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিই প্রাকৃতিক ঘড়ি। প্রথমে তেজস্ক্রিয় কারবনের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু তথা প্রত্নবস্তুর বয়স কীভাবে নির্ণয় করা হয় তা বলা যাক ঃ

সাধারণ কারবন পরমাণুকে আমরা বলি, $_6C^{12}$, অর্থাৎ এর পারমাণবিক ওজন হলো 12 এবং পারমাণবিক সংখ্যা [Atomic Number] হলো 6। এর সঙ্গে যদি দুটো নিউট্রন [Neutron] কণা যুক্ত হয় তখন ওই কারবন পরমাণু তেজস্ক্রিয় কারবনে রূপান্তরিত হয়।

$$_6C^{12} + 2_0N^1 = {_6C^{14}}$$

এই তেজষ্ক্রিয় কারবন পরমাণু সাধারণ কারবন পরমাণুর একটা সমস্থানিক বা আইসোটোপ [Isotope]। কারণ এর পারমাণবিক সংখ্যা সাধারণ কারবন পরমাণুর সঙ্গে এক, কিন্তু পারমাণবিক ওজন বা ভর-সংখ্যা [Mass-Number] বেশি। সাধারণ কারবন পরমাণুর যেখানে 12, এর পারমাণবিক ওজন সেখানে 14। এই কারবন পরমাণু তেজষ্ক্রিয় এবং এর তেজষ্ক্রিয় বিভাজন ঘটে। এই তেজষ্ক্রিয় কারবনের অর্ধ-জীবনকাল [Half Life Time] হলো মোটামুটি 5,730 বছর। অর্থাৎ 10 গ্রাম এই ধরনের তেজষ্ক্রিয় কারবন 5,730 বছর পরে 5 গ্রাম তেজষ্ক্রিয় কারবনে রূপান্তরিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রথমে এই তেজষ্ক্রিয় কারবনের বিভাজনের হার প্রতি মিনিটে প্রতি গ্রাম ভরে 15.3 হলেও, 5,730 বছর পরে এই হার দাঁড়ায় প্রতি মিনিটে 7.65/প্রতি গ্রাম।

মনে করা যাক কোনও বস্তুতে No সংখ্যক তেজষ্ক্রিয় কারবন পরমাণু প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। t সময় পরে যদি সেই পরমাণু সংখ্যা Nt হয়, তবে,

$\frac{Nt}{No} = e^{\lambda t}$, যেখানে λ হলো আনুপাতিক হ্রাসের ধ্রুবক [Constant]। এই ধ্রুবক বিভিন্ন তেজষ্ক্রিয় বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে এর মান হবে ঃ

$$\lambda = \frac{0.69315}{5730} \text{ প্রতি বছরে}$$

$$1.209 \times 10^{-4} \text{ প্রতি বছরে}$$

$$- 2.3 \times 10^{-10} \text{ প্রতি মিনিটে।}$$

যদি কোনও বস্তুর তেজষ্ক্রিয় কারবনের বিভাজনের হার প্রতি মিনিটে গ্রাম-পিছু 'x' হয়, তবে,

$$\frac{x}{15.3} = e^{-\lambda t}$$

এখানে t হলো ওই বস্তুর বয়স যখন ওতে তেজষ্ক্রিয় কারবন প্রথম সঞ্চিত হয়েছিল। পরীক্ষাগারে 'x' বের করা যায়, যার ফলে উপরের সূত্র থেকে পাই,

$$\frac{1}{e^{\lambda t}} = \frac{x}{15.3} \text{ বা } e^{\lambda t} = \frac{15.3}{x}$$

$$\therefore \ln \frac{15.3}{x} = \lambda t$$

$$\text{বা } t = \frac{1}{\lambda} \ln \left[\frac{15.3}{x} \right]$$

এখন x-এর মান আমরা আগেই পেয়েছি। x-এর মান পরীক্ষাগারে পাওয়া যাবে। ফলে t বা প্রত্নবস্তুর বয়স সহজেই বের হয়ে যাবে উপরের ওই সূত্র থেকে।

পৃথিবীতে এখন ইউরেনিয়াম যেখানেই পাওয়া যাক না কেন তাতে যেমন কিছুটা $_{92}U^{238}$ থাকবে তেমনি কিছুটা $_{92}U^{235}$-ও থাকছে। এদের অনুপাত 140 : 1। এই মৌল সমস্থানিক বা আইসোটোপ। খনিজ ইউরেনিয়ামে $_{92}U^{238}$ বেশি পরিমাণে থাকছে। তুলনামূলকভাবে $_{92}U^{235}$ বেশ কমই থাকছে। $_{92}U^{235}$ এর অর্ধজীবনকাল হলো 7.07×10^8 বছর। এখন যদি ধরা হয় পৃথিবীর সূচনায় এই দুটি মৌল

সমপরিমাণে ছিল তাহলে পৃথিবীর বয়স পূর্বোক্ত সূত্র দিয়ে কষে বের করলে 5×10^9 বছর বা 500 কোটি বছর দাঁড়াবে। পৃথিবীর বয়স জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব মত প্রায় 460 কোটি বছর।

কোনও শিলা বা শিলা স্তরের বয়স নির্ণয়ও করা হয় ওই একই সূত্র অনুসরণ করে। তেজষ্ক্রিয় খনিজ পদার্থ যে সব শিলাস্তরে পাওয়া যায় তাদের বয়স এইভাবেই নির্ণয় করা হয়। তেজষ্ক্রিয় খনিজে সাধারণতঃ সীসার [Pb] চারটি আইসোটোপ পাওয়া যায়। এগুলি হলো Pb^{204}, Pb^{206}, Pb^{207} ও Pb^{208}। খনিজে এদের পরিমাণগত অনুপাত হলো 2 ঃ 18·8 ঃ 20·7 ঃ 58·5। Pb^{206} হয় U^{238} থেকে তেজষ্ক্রিয় বিভাজন হয়ে হয়ে। তেমনি pb^{207} আসে Ac^{235} এবং pb^{208} হয় Th^{232} হতে। Ac হলো অ্যাকটিনিয়াম [Actinium], আর Th হলো থোরিয়াম [Thorium]। Pb^{204} হলো সাধারণ সীসা। এর উৎপত্তি তেজষ্ক্রিয় সীসা হতে নয়। Pb^{206}, Pb^{207}, Pb^{208}-এর পরিমাণ দেখে কোনও তেজষ্ক্রিয় খনিজের বয়স যেমন নির্ণয় করা যায়, তেমনি যে শিলায় বা শিলাস্তরে ওই খনিজ পাওয়া যায় তার বয়সও বের করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'সামারস্কাইট' [Samarskite] হলো এক রকম তেজষ্ক্রিয় খনিজ। এতে U^{238}, U^{235} এবং Th^{232} যেমন আছে, তেমনি আছে Pb^{206}, Pb^{207}, Pb^{208}। সীসার এই আইসোটোপগুলি সাধারণত সীসা অর্থাৎ Pb^{204} -এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই আছে সামারস্কাইটে। এখন এই খনিজে ওই সব তেজষ্ক্রিয় সীসার পরিমাণ মেপে খনিজটার তথা যে শিলাস্তরে ওই খনিজ পাওয়া গেল তার বয়স নির্ণয় করা যায়। দেখা গেছে, U^{238} থেকে তেজষ্ক্রিয় বিভাজনে Pb^{206} হতে সময় লাগে 26 কোটি বছর। তেমনি Ac^{235} হতে Pb^{207} হতে সময় লাগে 25 কোটি বছর। আবার Th^{232} থেকে Pb^{208} হতে সময় নেয় 27 কোটি বছর। সুতরাং এই তিনটি সময়ের গড় করলে পাই 26 কোটি বছর। অতএব যে শিলায় বা শিলাস্তরে ওই খনিজটি পাওয়া গেল তার বয়স 26 কোটি বছর। এইভাবে তেজষ্ক্রিয় ঘড়ি [Radioactive Clock] বিশাল বিশাল সময় অনায়াসে মেপে দিতে পারে।

কোনও ঘটনার বর্ণনায় এখন সময়ের উল্লেখ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। সময় এখন তিন রকমের। একটা হলো চক্রাকারে আবর্তন সময় [Rotational Time], দ্বিতীয়টি হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের পঞ্জিকার সময় [Ephemeris Time], তৃতীয়টি হলো পারমাণবিক সময় [Atomic Time]। 'রোটেশনাল টাইম' মাপা হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি দেখে অর্থাৎ পৃথিবী তার নিজের অক্ষে একবার আবর্তন করতে কত সময় নেয় তা দেখে। আবার পঞ্জিকার সময় নির্ধারিত হয় পৃথিবীর একবার সূর্য প্রদক্ষিণের সময় দেখে। আর পারমাণবিক ঘড়ি থেকে পাওয়া যায় 'পারমাণবিক সময়'। পারমাণবিক ঘড়ি, পারমাণবিক সময়, প্রমাণ-সেকেন্ড ইত্যাদি নিয়ে একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকার সময়ের কথায় আসি।

1956 সাল অবধি পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেকে যে সময় পাওয়া যায় তা দিয়ে গড় সৌর সময় [Mean SolarTime] এবং সেকেন্ডের মান নির্ণয় করা হতো। কিন্তু দেখা গেল পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি সব সময় সমান থাকে না। ফলে আহ্নিক গতি থেকে এক সেকেন্ডের মান নির্ণয় করলে সব সময় তা সমান হয় না। এমন কি 'গড় সৌর দিন' [Mean Solar Day] হিসাব করে সেকেন্ডের মান নির্ণয় করলেও ওই মান সব সময় ঠিক থাকে না। 1956 সালে পৃথিবীব্যাপী এক সেকেন্ডের মান ধরা হল সৌরবৎসর থেকে হিসাব-নিকাশ করে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয় তার থেকে বের করা হল এক সেকেন্ডের মান। এই মানও নিখুঁত সময় দিতে পারলো না। ফলে, প্রমাণ-সেকেন্ড [Standard Second] পাওয়া গেল না। তাই 1967 সাল থেকে প্রমাণ সেকেন্ড নেওয়া হয়েছে পারমাণবিক সময় থেকে। এ কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

সৌর সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ 'গড় সৌর সময়' ও 'আপাত সৌর সময়'। আপাত সৌর সময় মাপতে এক সমবেগ সম্পন্ন কাল্পনিক সূর্যকে ধরে নেওয়া হয়, প্রকৃত সূর্য যে সময়ে তার আপাত বাৎসরিক পরিক্রমণ শেষ করে, সেই সময়েই সে অনুরূপ পরিক্রমণ শেষ করে ফেলে। আবার পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্ত পরিক্রমণের সঙ্গে যে সময়ের সম্পর্ক তা হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান পঞ্জিকার সময় বা Ephemeris Time। তাই Ephemeris মতে ঃ

1) বিষুববিন্দুর অয়নগতি ঃ ক) প্রতিসৌরবৎসরে ঃ 50''·29
খ) প্রতি নাক্ষত্র বৎসরে ঃ 50''·26

2) জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে মোট অতিবাহিত দিন ঃ
(1লা জানুয়ারী, 2007-এর গ্রীনউইচের বেলা 12টায়) ঃ 24,54,102 দিন

3) কলিযুগের দিনসংখ্যা ঃ (1-2 জানুয়ারী,2007-এর মধ্যরাত্রি) ঃ 18,65,637 দিন

4) সৌর বৎসর ঃ 365.242191 দিন = 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মি. 45.2 সেকেন্ড
নক্ষত্র বৎসর ঃ 365.256363 দিন = 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট 9.8 সেকেন্ড

5) চান্দ্রমাস ঃ 29.530589 দিন = 29 দিন 12 ঘণ্টা 44 মিনিট 2.9 সেকেন্ড

6) সূর্যের একবার আহ্নিক গতির গড় সৌর সময় ঃ 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4.09053 সেকেন্ড

7) নাক্ষত্র দিনের পরিমাণ গড়সৌর সময়ে ঃ 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4.999 সেকেন্ড

৪) গড় সৌরদিন নাক্ষত্র সময়ের মানে ঃ 24 ঘণ্টা 3 মিনিট 56.555 সেকেন্ড

9) চান্দ্র দিন (এক চন্দ্রোদয় হতে পরের চন্দ্রোদয়) ঃ 24 ঘণ্টা 48 মিনিট 45.838 সেকেন্ড

10) ক) সৌরমণ্ডল নীহারিকার
যেদিকে ধাবমান তার অবস্থান ঃ ধনুরাশির 8° বা 248° (8s 8°)

খ) গতিবেগ ঃ 200 মাইল / সেকেন্ড [মতান্তরে, 160 মাইল/ সেকেন্ড]

গ) নীহারিকার কেন্দ্রের অবস্থান ঃ ধনুরাশির 2° বা 242° (8s 2°)

পৃথিবীর কক্ষপথে পৃথিবীর অবস্থান কোথায় তা বোঝা যায়, নক্ষত্রমণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিতে সূর্য কোথায় অবস্থান করছে তা দেখে। কারণ সূর্যের আপাত সঞ্চরণ পথ বা ক্রান্তিবৃত্তের দুই বিপরীত বিন্দুতে সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান। সায়ন পদ্ধতিতে সৌর জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা (Solar Ephemeris) বানানো হয়েছে। এতে সূর্যের অবস্থান তালিকাবদ্ধ থাকে। আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে এই তালিকা থেকে পঞ্জিকা সময় (Ephemeris Time) নির্ণয় করা যায়। Ephemeris Time-এর এক সেকেন্ডের সঙ্গে গড় সৌর সেকেন্ডের সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। অঙ্ক কষে এই পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই কেবল এই পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। প্রায় তিনশ বছর আগে এই পার্থক্য ছিল না। গড় সৌর সময় কিছুটা পরিবর্তনশীল হওয়ায় এখন ঐ দুই সময়ের মান এক হচ্ছে না।

মহাসময়ের বিশাল প্রেক্ষাপটে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সময় জড়িয়ে গেছে জীবনের সঙ্গে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সময় আরও গভীর প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনে। ফলে নানান সভ্যতার মানুষ সময় হিসাব করতে বানিয়েছে নানা ধরনের বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার Calendar)। ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জী হল একটা পদ্ধতি যার সাহায্যে দিন-মাস-বছরের তথা সময়ের একটা সঠিক হিসাব রাখা যায়। ক্যালেন্ডার নানা নিয়মে নানাভাবে তৈরি। একটা ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জী কিংবা পঞ্জিকার আকৃতি একটা

তালিকা বা একটা বই বা কতকগুলি কাগজ একসঙ্গে জোড়া দেওয়া হতে পারে। আকৃতি যাই হোক না কেন তাতে কোনও একটা বছরের দিন, সপ্তাহ ও মাসের হিসাব দেওয়া থাকে। এছাড়া বর্ষপঞ্জীতে থাকে ছুটির দিনের হিসাব, ঐতিহাসিক কোনও ঘটনার দিনের হিসাব এবং নানা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য, যার থেকে তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি জানা যায়। হিন্দুদের কোনও পঞ্জিকায় থাকে নানা পূজা-পার্বণের বিস্তৃত বিবরণ। অন্যান্যদের পঞ্জিকায় থাকে তাদের নানা উৎসবের দিনের হিসাব। এছাড়াও পঞ্জিকাগুলিতে থাকে, সূর্য-চন্দ্রের দৈনিক উদয়-অস্তের সময়, গ্রহণের দিন ও সময় এবং কোথায় তা দেখা যাবে, জোয়ারভাঁটার দৈনিক বিবর ইত্যাদি। ভারতীয় বর্ষপঞ্জীগুলিতে নানা বিজ্ঞানের সমাবেশ যেমন থাকে, তেমনি থাকে ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কে নানা কথা। কোনও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তার কী নক্ষত্রে জন্ম হল, তার বর্ণ, রাশি, লগ্ন ইত্যাদি কী হল তাও বলে দেয় পঞ্জিকা। এছাড়া আছে অন্নপ্রাশনের দিন, গ্রহশান্তির দিন, গৃহ-প্রবেশের দিন, শস্যছেদনের দিন ইত্যাদি নানা দৈনন্দিন জীবনের শুভদিনের নির্দিষ্টকরণ। এ এগুলি এসেছে ফলিত জ্যোতিষের প্রয়োগ থেকে। এদেশের পঞ্জিকাগুলিতে আরও যেসব আছে তা হল, ভূমিকর্ষণ, হলচালন, বিবাহ, উপনয়ন, সাধভক্ষণ, ও শ্রাদ্ধাদিকর্ম ইত্যাদি নানা দৈনন্দিন ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট শুভদিন ও সময়ের বিস্তারিত বিবরণ। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আজও তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম পঞ্জিকা দেখেই ঠিক করে। শুভকাজ হলে তো কথাই নেই, খুব সাধারণ কাজ যেমন, বৃক্ষ রোপণ, কৃষিকাজ, ভূমিকর্ষণ ইত্যাদিও এদেশের লোক পঞ্জিকার নির্দেশ মেনে করে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনেও পঞ্জিকার ফলিত জ্যোতিষকে কাজে লাগায়। কোন্‌দিন কী খাবে বা খাবে না, কোন্‌দিন উপবাস দিতে হবে, কোন্‌দিন হাল্কা কিছু খেতে হবে এসব নির্দেশও পঞ্জিকায় থাকে। পঞ্জিকা ভারতীয় হিন্দুদের জীবন দর্পণ বললে অত্যুক্তি হয় না। তার উপর শৌচাশৌচ, পূজা-পার্বণ, ব্রত -আচার, শ্রাদ্ধকর্ম ইত্যাদির বিধি-বিধান ও করণীয় সবই বিস্তারিতভাবে পঞ্জিকায় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এদেশের পঞ্জিকা বা বর্ষপঞ্জীগুলি রীতিমত বৈচিত্রময়, বিচিত্র তথ্য-পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট বিস্ময় উদ্রেককারী।

ক্যালেন্ডার শব্দটির উৎপত্তি হলো ল্যাটিন শব্দ 'Kalendae' থেকে। রোমকদের আমলে মাসের প্রথম দিনকে বলা হতো 'Calends'। এই শব্দ থেকেই এসেছে 'ক্যালেন্ডার' বা 'Calendar'। প্রত্যেক সভ্যতা তার জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা বানিয়েছে। প্রাচীন সভ্যতাগুলি বহুদিন ধরেই তাদের এই পুরাতন পঞ্জিকা আঁকড়ে ধরে আছে। এইসব পঞ্জিকার নানা জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত সংস্কার এখনই দরকার, কিন্তু কেউই তাদের পুরাতন পঞ্জিকার সংশোধন বা পরিবর্তনে রাজী নয়, যদিও তারা ভালো করেই জানে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই এই সংস্কার এখনই করা দরকার। আসলে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের বেশ কিছুটাই তাদের পঞ্জিকার সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং পঞ্জিকার সংস্কার করলে সেই ইতিহাসের পরিবর্তন বা অদলবদল হতে পারে, যা কোনও জাতিই মেনে নিতে পারে না। ফলে, আধুনিক আবিষ্কারের আলোয় পঞ্জিকাগুলির সংস্কার একান্ত জরুরী হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব পঞ্জিকা বা নিয়ম ধরে রেখেছে। কেউ কেউ কিছুটা সংস্কার করে নিলেও, আন্তর্জাতিক বর্ষপঞ্জী বা পঞ্জিকা বানানোর ব্যাপারটা আজও বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

মানুষ এ পর্যন্ত যতরকম পঞ্জিকা বানিয়েছে তাদের মোট তিনটি মুখ্য ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(1) চান্দ্র-পঞ্জিকা [Lunar Calendar]

(2) চান্দ্র-সৌর-পঞ্জিকা [Luni Solar Calendar]

(3) সৌর-পঞ্জিকা [Solar Calendar]

চান্দ্র পঞ্জিকা

মানুষের আবিস্কৃত সবচেয়ে পুরাতন পঞ্জিকা হলো চান্দ্র-পঞ্জিকা। স্বাভাবিকভাবেই বহুল ব্যবহৃত। চাঁদ সবচেয়ে কাছের জ্যোতিষ্ক। তাই চাঁদের গতিবিধি দেখে পঞ্জিকা বানানোর ব্যাপারটা মানুষের জ্ঞানের উন্মেষকালের প্রাথমিক পর্যায়েই আবিষ্কৃত হয়েছিলো। পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতাই তাদের পঞ্জিকার গোড়াপত্তন করেছিল এই চান্দ্র-পঞ্জিকা দিয়ে।

এই পঞ্জিকার চান্দ্রমাসগুলি চন্দ্রের একবার পৃথিবী ঘুরে আসতে যতটা সময় লাগে ততটা জুড়েই বিভক্ত। মাসের প্রথম দিন হলো অমাবস্যার পরের দিন অর্থাৎ শুক্লা-প্রতিপদ এবং মাস শেষ হয় অমাবস্যায়। এই পঞ্জিকায় কোনও মাসের দিন, পঞ্জিকা না দেখে কেবল চাঁদের কলা ভালোভাবে দেখেই, মোটামুটি নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়। যারা লেখাপড়া একদম জানে না তারাও চন্দ্রকলা পর্যবেক্ষণ করে মাসের দিনসংখ্যা নির্ভুলভাবে বলতে পারে। হিন্দু পঞ্জিকায় তিথি সংখ্যা চান্দ্রমাসের দিনসংখ্যা। কেবল কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ইত্যাদি তিথিতে মাসের দিনসংখ্যা হবে ষোল, সতেরো ইত্যাদি। ভারতীয় সম্বৎ সাল, ফসলী সন, গুজরাট সম্বৎ ও চান্দ্র শকাব্দ ইত্যাদি বছরগুলির গণনা হয় চান্দ্রমাস দিয়ে। এইসব পঞ্জিকাগুলি মূলতঃ চান্দ্র-পঞ্জিকা হলেও এগুলিতে সৌরবর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মাসগুলির গণনা মূলতঃ চান্দ্রমাস গণনার একেবারে অনুরূপ। একেবারে খাঁটি চান্দ্র-পঞ্জিকা হলো মুসলমানদের পঞ্জিকা। এতে সৌর-বৎসরের সঙ্গে চান্দ্র-বৎসরের সামঞ্জস্য বিধানের কোনও ব্যবস্থাই নেই।

এক চান্দ্রমাসের সঠিক পরিমাণ হলো 29.5306 দিন। মুসলমানদের ইসলামীয় পঞ্জিকায় কিংবা চান্দ্র-পঞ্জিকায় বারোটি মাসের ছয়টি 29 দিনের এবং অন্য ছয়টি 30 দিনের। এক চান্দ্র-বৎসর হয় 354 দিনে। এই হিসাবে গড় চান্দ্রমাস হয় 29.5 দিনে। সুতরাং প্রকৃত চান্দ্রমাসের চেয়ে গড় চান্দ্রমাস প্রায় 0.0306 দিন ছোট। প্রতি তিন বছরে চান্দ্র বৎসর প্রকৃত চান্দ্র বৎসরের চেয়ে প্রায় 0.0306x12x3 দিন বা 1.1016 দিন ছোট হয়ে পড়ে। এই জন্য চান্দ্র পঞ্জিকায় তিন বছর পরে একদিন বা আট বছরে তিন দিন বা 19 বছর পরে 7 দিন কিংবা 30 বছর পরে 11 দিন যোগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার ফলে মাসের আরম্ভ ঠিক শুক্লা প্রতিপদে হয়ে অমাবস্যায় শেষ হয়। তবে যে বছর ওই অতিরিক্ত দিন যোগ করতে হয় সে বছরের শেষ মাসে দিনের সংখ্যা একটা বাড়ে এবং সে বারের চান্দ্র বৎসর হয় 355 দিনে। এই দিন যোগ করার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। প্রাচীনকালে কোনও বিশেষ বিধিও এর জন্য আরোপিত হয়নি। ফলে, কোন জায়গায় তিন বছর পরে একদিন যোগ করে যেমন চান্দ্র-পঞ্জিকার বৎসরের মান ঠিক করা হচ্ছে, তেমনি কোথাও আবার 19 বছ র পরে সাতদিন যোগ করে চান্দ্র-পঞ্জিকাকে চন্দ্রের গতিবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি ঐচ্ছিক। তবে যারা চান্দ্র-পঞ্জিকা অনুসরণ করে পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে তাদের ক্ষেত্রে প্রতি তৃতীয় বৎসরে একদিন অতিরিক্ত যোগ করে চান্দ্র বৎসরকে সেবার 355 দিনের করে তোলাই যুক্তিযুক্ত। এইভাবে ৬ষ্ঠ বৎসরে আবার একটি দিন ও অষ্টম বৎসরে আরেক দিন যোগ করাই বিধেয়। এই দিন যোগ করাটা এমনভাবে করতে হবে যাতে মোট 30টি চান্দ্র বৎসরে সর্বমোট 11টি অতিরিক্ত দিন যোগ হয়। এর ফলে চান্দ্র-মাসের আরম্ভ শুক্লা প্রতিপদে হয় এবং মাসটি শেষ হয় অমাবস্যায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মুসলমান পঞ্জিকায় মাসের শুরু শুক্লা প্রতিপদ থেকে হয় না। শুক্লা দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ায় যে দিন অমাবস্যার পরে প্রথম চাঁদ দেখা যায় সে দিন থেকে শুরু হয়। এই পঞ্জিকায় দিনের শুরু হয় সূর্যাস্তের পর থেকে আর দিন শেষ হয় পরদিন সূর্যাস্তে। সম্বত পঞ্জিকা বা অন্যান্য প্রাচীন চান্দ্র-পঞ্জিকা

সৌর-পঞ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মাসগুলির গণনার পদ্ধতি চান্দ্র পঞ্জিকার নিয়মেই রয়ে গেছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পঞ্জিকা এখনও নির্ভেজাল চান্দ্র-পঞ্জিকাই রয়ে গেছে। এদের ব্যবহৃত পঞ্জিকায় সৌরবর্ষের সঙ্গে চান্দ্রবর্ষের সামঞ্জস্য বিধানের কোনও ব্যবস্থা নেই। মুসলমানদের পঞ্জিকা তাই পুরোপুরি চান্দ্র পঞ্জিকা। তার ঐতিহ্যে কোথাও কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গত দেড় হাজার বছরে নানান নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজিত হয়েছে।

চান্দ্রসৌর পঞ্জিকা

একটি সৌরবর্ষ হয় 365 দিনে। চান্দ্র বৎসরের সঙ্গে মোটামুটি পার্থক্য 11 দিনের। ফলে, তিনটি চান্দ্র বৎসরে সৌরবর্ষের সঙ্গে পার্থক্য দাঁড়াবে মোটামুটিভাবে 33 দিন। সমস্ত চান্দ্র পঞ্জিকা তাই সৌর বৎসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে প্রতি তিনটি সৌর বৎসরে একটি চান্দ্রমাস বা প্রতি আটটি সৌর বৎসরে তিনটি চান্দ্রমাস কিংবা 30টি সৌর বৎসরে এগারটি চান্দ্রমাস অতিরিক্ত যোগ করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি সৌরবর্ষ বা 36টি সৌরমাস 37টি চান্দ্রমাসের সমান। এইভাবে 96টি সৌরমাস 99টি চান্দ্রমাসের, 228টি সৌরমাস 235টি চান্দ্রমাসের ও 360টি সৌরমাস 371টি চান্দ্রমাসের সমান। চান্দ্র-পঞ্জিকাগুলি যুগোপযোগী হওয়ার চেষ্টায় নিজেদের সৌর পঞ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ করে নিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, প্রাচীন ভারতের সম্বত পঞ্জিকা, চান্দ্র শকাব্দ পঞ্জিকা, কিছুটা আধুনিক ফসলী পঞ্জিকা, কিংবা বেশ কিছুটা প্রাচীন গুজরাটি সম্বত পঞ্জিকা ইত্যাদি নিজেরা মূলতঃ চান্দ্র পঞ্জিকা হলেও তারা সৌর পঞ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজেদের নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ধরনের পঞ্জিকা হলো চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা। এইগুলি চান্দ্র ও সৌরপঞ্জিকার পারস্পরিক মিশ্রণে উদ্ভূত। তবে এই সব পঞ্জিকা তাদের চান্দ্র-পঞ্জিকার মূল স্বরূপ হারিয়ে ফেলেনি। কেবল প্রতি তিনটি সৌরবর্ষে একটি অতিরিক্ত চান্দ্রমাস যুক্ত হয়েছে অধিকমাস বা অধিমাস নাম দিয়ে। এই অধিমাসই মলমাস বা ঋগ্বেদের 'মলিম্লুচ'। প্রাচীন গ্রীকরা আটটি চান্দ্রবর্ষের সঙ্গে তিনটি অতিরিক্ত চান্দ্রমাস যোগ করে আটটি সৌরবর্ষের সঙ্গে সমান করতো। এই পদ্ধতি তখন 'Octenniel Cycle' নামে খ্যাত ছিল। আবার 19টি চান্দ্র বর্ষের সঙ্গে সাতটি মাস যোগ দিয়ে 19টি সৌর বর্ষের সঙ্গে সমান করবার পদ্ধতিকে তারা বলতো 'Metonic Cycle'। এই শেষোক্ত পদ্ধতি আজও বহুল প্রচলিত। আমাদের দেশের পঞ্জিকাগুলির অধিকাংশই চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা কিংবা তারই পরিবর্তিত রূপ।

সৌর পঞ্জিকা

আধুনিক কালের অধিকাংশ পঞ্জিকাই সৌর পঞ্জিকা। এতে সৌরবর্ষ হলো সেই সময় যে সময়ে পৃথিবী মোটামুটিভাবে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। এই সময়টাকে বারোটি মাসে ভাগ করে প্রত্যেকটি মাস হয়েছে এক একটা সৌরমাস। আমাদের দেশের সৌর পঞ্জিকাগুলির সৌরমাসগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই বিভাজিত। পৃথিবীর গতির জন্য পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের আপাত-অবস্থান দেখে সৌরমাসগুলির দৈর্ঘ্য ঠিক করা হয়েছে। আকাশের বারোটি রাশিচক্রের প্রত্যেকটি 30 ডিগ্রি করে জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। সূর্য তার আপাত-সঞ্চরণে এই রাশিগুলির এক একটি অতিক্রম করতে যে সময় নেয় তাই এক একটি সৌরমাস। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সৌরমাস এভাবে বিভাজিত নয়। তবে প্রাচীন প্রথা মেনে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে এই মাসগুলির বিভাজন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের এই বিভাজনে কোনও উন্নত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যাইহোক না কেন, প্রাচীন চান্দ্র-বৎসর ও চান্দ্রমাসের চতুলনায়

এই পঞ্জিকা অনেক উন্নত । এই পঞ্জিকায় চন্দ্রকলার উপর মাসের আরম্ভ নির্ভর করে না। শুক্লা প্রতিপদ মাসের যে কোন দিনেই পড়তে পারে। এখানে মূল কথা হলো সূর্য রাশিচক্রের বারোটি রাশির কোন একটিতে প্রবেশ করলে মাস শুরু হয় এবং ওই রাশিটির 30 ডিগ্রি অতিক্রম করলেই মাস শেষ হয়। সূর্যের এই আপাত সঞ্চরণে প্রতিটি রাশিচক্র অতিক্রম করতে সূর্যের মোটামুটি 30/31 দিন লাগে। এই সঞ্চরণ সবসময় সমান নয়। সূর্য অনুসূর হলে পৃথিবীর গতি সবসময় বেড়ে যায়। সূর্য অনুসূর হলে পৃথিবীর গতি যখন বাড়ে তখন সূর্যের আপাত-সঞ্চরণ বেগ বৃদ্ধি পায় আর সূর্য অপসূর হলে পৃথিবীর গতি কমে, তখন সূর্যের আপাত-সঞ্চারণ বেগ হ্রাস পায়। অনুসূর অবস্থার সূর্যের একটি রাশি সংক্রমণে যতটা সময় লাগে অপসূর অবস্থানে তার চেয়ে কিছুটা বেশি সময় লাগে। ফলে সব সৌরমাস 30 দিনের হয় না। পাশ্চাত্য সৌর পঞ্জিকার মাস বিভাজনে সূর্যের এই আপাত সংক্রমণের ব্যাপারটা নেই।

এক সৌরবর্ষ হলো 365.2422 দিন। সাধারণতঃ 365 দিনে এক বছর ধরা হয়। ফলে প্রতি বছর মোটামুটি 0.2422 দিন বা 0.25 দিন বাড়তি থাকে। এই জন্য প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে সৌরবর্ষ হয় 366 দিন, অর্থাৎ 0.25 x 4 দিন বা 1 দিন বাড়তি হিসাবে ওই বছরে যোগ দেওয়া হয়। ইংরেজীতে এ রকম 366 দিনে বছর 'লিপ ইয়ার' [Leap Year] নামে পরিচিত, আর বাংলায় এমন বৎসরের নাম 'অধিবর্ষ'। ইংরেজী পঞ্জিকায় বাড়তি দিন যোগ হয় ফেব্রুয়ারী মাসে, বাংলায় অধিবর্ষের বাড়তি দিনটি যুক্ত হয় অগ্রহায়ণ মাসে। পাশ্চাত্যের দাবী হলো এই অধিবর্ষ ব্যাপারটা চালু করেন জুলিয়াস সীজার তাঁর বিখ্যাত 'জুলিয়ান রিফর্ম'-এর সময়। প্রাচ্যের দাবী হলো পুরো পঞ্জিকা ব্যাপারটাই গ্রীক বা রোমকরা ভারতীয়দের কাছ থেকে ধার করেছিলো এবং তাদের সেই ঋণের সাক্ষ্য পাশ্চাত্য পঞ্জিকাগুলিতে আজও বর্তমান।

যাইহোক, সৌর বছর হলো 365.2422 দিনের এবং 0.2422 দিনকে আমরা 0.25 দিন ধরে চার বছরে একদিন বাড়াচ্ছি। ফলে [0.25 -0.2422] দিন বা 0.0078 দিন বেশি বেড়ে যাচ্ছে প্রতি বছরে বা 400 বছরে প্রায় তিনদিনের মত বেড়ে যাচ্ছে। ইংরেজী কালেন্ডারের গ্রেগরীয় সংস্কারের পর এই বাড়তি দিন আর আসে না বা আসবে না। কারণ গ্রেগরীয় সংস্কারের নিয়মানুসারে 1600 খ্রিস্টাব্দ অধিবর্ষ, কিন্তু 1700 খ্রিস্টাব্দ ও 1800 খ্রিস্টাব্দ এবং 1900 খ্রিস্টাব্দ অধিবর্ষ নয়, কারণ 17, 18 ও 19 সংখ্যাগুলি 'চার' দ্বারা বিভাজ্য নয়। এইভাবে চারশ' বছরে তিনদিন কমিয়ে ফেলা হয়েছে এই সংস্করের ফলে। এতো সংস্কারের পরেও বছর পিছু 0.0003 দিনের একটু ভুল আজও এই পঞ্জিকায় রয়ে গেছে। তবে এই ভুলের পরিমাণ অতি তুচ্ছ, কারণ 10,000 বছরে তিনদিনের বেশি কম নিয়ে মাথাব্যথার খুব একটা কারণ থাকা উচিত নয়।

ভারতবর্ষে অন্ততঃ চৌদ্দটি পঞ্জিকা চালু আছে সময় মাপতে এবং সময়কে জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যবহার করতে। পঞ্জিকাগুলির একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল এবং 2007 খ্রিস্টাব্দে তার কত বছর চলছে ও 2007 সালের কত তারিখে সেই পঞ্জিকার বছর শুরু হল সে দুটি তথ্যও দেওয়া হল। এতে বোঝা যাবে সময় গণনার তথা ওই পঞ্জিকাটির বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য।

পঞ্জিকার নাম	কোন বর্ষের শুরু	2007 খ্রিস্টাব্দের কোন তারিখে তার বর্ষ আরম্ভ
1) ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকা	1929 শকাব্দ	22শে মার্চ
2) বিক্রম সম্বত	2064 অব্দ	19 শে মার্চ
3) বিক্রম সম্বত (গুজরাটি)	2064 অব্দ	10ই নভেম্বর

4) বিক্রম সম্বত (পাঞ্জাবী)	2064 অব্দ	14ই এপ্রিল
5) শকাব্দ (সৌর)	1929 অব্দ	15ইএপ্রিল
6) বাংলা সন	1414 অব্দ	15ই এপ্রিল
7) ফসলী সন (উত্তর ভারত)	1415 অব্দ	27শে সেপ্টেম্বর
8) কোল্লাম বর্ষ (কেরালা)	1183 অব্দ	17ই আগস্ট
9) জুলিয়ান বর্ষ	6720 অব্দ	14ই জানুয়ারী
10) কলিযুগ বর্ষ	5108 অব্দ	16ই এপ্রিল
11) শকাব্দ (চান্দ্র)	1929 অব্দ	19শে মার্চ
12)হিজরী সাল (ইসলামী পঞ্জিকা)	1428 অব্দ	21শে জানুয়ারী
13) বুদ্ধ নির্বাণ	2551 অব্দ	2রা মে
14) মহাবীর নির্বাণ (জৈন)	2534 অব্দ	10ই নভেম্বর

সৌরবর্ষ [Tropical Year]

পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগায় তা হলো এক সৌরবর্ষ। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর 366.25 বার আবর্তিত হয়। কিন্তু গড় বা মধ্য সৌর দিন হলো 365.25। পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের প্রকৃত সময় হলো, 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড। এই পরিমাণ সময় হলো এক নাক্ষত্র দিন। গড় সৌর দিনের মান হলো 24 ঘণ্টা। গড় সৌরদিন বা মধ্য সৌরদিনকে 'দিন' বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এক সৌরবর্ষ সঠিকভাবে 365.242191 সৌরদিন বা 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 45.3 সেকেন্ড। সূর্যের বার্ষিক অয়নগতি হলো প্রতি বছরে 50 সেকেন্ড (ডিগ্রি বা অংশের) বা বিকলা। খুব সঠিকভাবে বললে অয়নগতি [Precession Rate per Tropical Year] হলো 50.2759 সেকেন্ড বা বিকলা। ফলে সৌরবর্ষের আরম্ভ সায়ন মতে কিছুটা করে এগিয়ে আসছে। পৃথিবী সূর্যকে পুরো একপাক ঘুরতে গিয়ে 360 ডিগ্রি না ঘুরে 359 ডিগ্রি 59′10″ ঘুরে ফেলতে যে সময় নিচ্ছে তাই হলো এক সৌরবর্ষ বা 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 45.3 সেকেন্ড। পুরো 360 ডিগ্রি ঘুরতে পৃথিবীর সময় লাগে 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট 9.8 সেকেন্ড, যা হলো এক নাক্ষত্রবর্ষ [Sidereal Year]। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। পৃথিবী কখনও অনুসূর আবার কখনও অপসূর হয়ে অবস্থান করে। অনুসূরে পৃথিবীর গতির কিছুটা দ্রুত এবং অপসূরে তা কিছুটা শ্লথ হয়। ফলে সৌরবর্ষের কাল পরিমাণে পার্থক্য না ঘটলেও মাসগুলির সময় পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। আবার উপরের পরিসংখ্যানগুলিতে প্রতিবছরই সামান্য কিছু অদল বদল ঘটে। যেমন, 2007 সালের সৌরবর্ষের মান হলো 365 দিন 5ঘণ্টা 48 মিনিট 45.2 সেকেন্ড। সূর্যের অয়নগতির বার্ষিক হার ছিল 50.29 সেকেন্ড বা বিকলা। পার্থক্য অবশ্য খুব সামান্যই।

নাক্ষত্রবর্ষ [Sidereal Year]

আকাশের কোনও জ্যোতিষ্ক প্রকৃতপক্ষে স্থির নয়। কিন্তু নক্ষত্রগুলি তাদের বিশালগতি সত্ত্বেও সীমাহীন দূরত্ব নিবন্ধনহেতু স্থির বলে প্রতীয়মান হয়। পৃথিবী বা সূর্যের আপেক্ষিকে নক্ষত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে স্থির বলেই ধরা হয় এবং আপাতভাবে তাই সঠিক। পৃথিবী তার সূর্য পরিক্রমায় কোন একটি নক্ষত্রের আপেক্ষিকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে যাত্রা শুরু করে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে যে সময় নেয় তা

হলো এক নাক্ষত্রবর্ষ। সময়টা হলো 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট 9.8 সেকেন্ড। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের প্রকৃত সময় হলো 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড। কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রের আপেক্ষিকে এই পরিমাপ করা হয় বলে এর নাম 'নাক্ষত্র দিন' [Sidereal Day]। এর সঠিক মান হলো, 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4.091 সেকেন্ড। আর কোনও নক্ষত্রের আপেক্ষিকে পৃথিবীর একবার কক্ষাবর্তনের সময় হলো 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট 9.8 সেকেন্ড। নক্ষত্রের অবস্থান স্থির হওয়ায় পৃথিবী তার কক্ষপথের 360 ডিগ্রি ঘুরে আসতে এই সময়টা নেয়। সময়টা সৌর বর্ষের চেয়ে প্রায় 20 মিনিট 25 সেকেন্ড বা খুব সঠিকভাবে বললে 20 মিনিট 24.5 সেকেন্ড বেশি। সুতরাং সৌরবর্ষ ও নাক্ষত্রবর্ষের পার্থক্য হলো 20 মিনিট 24.5 সেকেন্ড। এই মিনিট ও সেকেন্ডর হিসাব নেওয়া হয়েছে গড় বা মধ্য সৌরদিনকে 24 ঘণ্টা ধরে। সুতরাং সৌরবর্ষ হলো 365.242191 দিন। আবার নাক্ষত্রবর্ষ হলো 365.256363 দিন। পার্থক্য হলো .014172 দিন বা গড় সৌরদিন। আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবী 365.25 দিনে কিংবা বলা যায় 365.242191 দিনে, 366 1/4 বার আপন অক্ষের উপর আবর্তন করে। গড় সৌরদিনের পরিমাণ নাক্ষত্রদিনের চেয়ে বেশি, কারণ মোটামুটি 365.25 সৌরদিনে 366.25 নাক্ষত্র দিন।

এই আলোচনায় অনেকবারই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতীয়রা চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসরের নিখুঁত হিসাব জানতো। ঋগ্বেদই বলছে মলিম্লুচ বা অধিমাস বা মলমাসের কথা। যে মাসে দুটো অমাবস্যা পড়ে তেমন মাস মলমাস। হিন্দুদের পূজাপার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান সবই সে মাসে বন্ধ বা নিষিদ্ধ সেই বৈদিক আমল থেকেই। হিন্দুদের পূজা-পার্বণ নিয়ন্ত্রিত হয় চান্দ্র পঞ্জিকার চান্দ্র মাস ও চান্দ্র তিথি অনুসারে। তবে বৎসরের গণনা হতো এবং এখনও হয় সৌরমাস ও সৌরবৎসরে। ফলে প্রত্যেক বছর সৌরবৎসর ও চান্দ্র-বৎসরের মধ্যে পার্থক্য ঘটতো কিংবা এখনও ঘটে 11দিন করে। তিন বছরে এই পার্থক্য দাঁড়ায় প্রায় 32 দিন। 32 দিন এই জন্য যে প্রতি তিন বছরে একটি চান্দ্র বর্ষ হবে 355 দিনের। কারণ একটি চান্দ্র-বর্ষ 354 দিনের চেয়ে 0.0306 দিন বেশি। তাই প্রতি তিন বৎসরে একটা করে মাসকে মলমাস ধরা হয় পূজাপার্বণগুলিকে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। এ ব্যবস্থা এ দেশে বৈদিক যুগ থেকেই অনুসৃত। প্রত্যেক তিনটি সৌরবৎসরে একটি অধিক চান্দ্রমাস হয়, অর্থাৎ 36টি সৌরমাস হলো 37টি চান্দ্রমাসের সমান। বৈদিক আমলে এই অতিরিক্ত মাসটি অধিকমাস বা মলিম্লুচ এবং তা পরবর্তীকালে 'মলমাস' নামে অভিহিত। তাঁদের জানা ছিল বারো মাসে সূর্যের বারোটি রাশিচক্রে আপাত সংক্রমণের কথা, সূর্যের অয়নগতির কথা, 27টি বিশিষ্ট নক্ষত্রের কথা, এমনকি সপার্ষদ সূর্য যে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে পরিক্রমারত সে কথাও। পৃথিবীর অপসূর ও অনুসূর গতিবিধি, চান্দ্র বৎসরের নিখুঁত হিসাব ইত্যাদিও তাঁদের অজানা ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে কম করে 6,000 বছর আগে প্রাচীন ভারতীয়রা এই অবিশ্বাস্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বছরে কতগুলি গ্রহণ হবে, গ্রহণের পুনরাবৃত্তির সময় পরিমাণ, গ্রহণের স্থায়িত্বকাল, এ সমস্তই তাঁদের মনীষায় ধরা পড়েছিল। অনেকটা সেই নিয়ম মেনেই ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকার বর্ষ শুরু করা হচ্ছে 7ই/8ই চৈত্র। ইংরেজী পঞ্জিকায় এই দিনটি হলো 22শে মার্চ। সায়ন মতে এখন মহাবিষুব সংক্রান্তি হয় 21শে মার্চ। আবার কোন কোনও বছর বর্ষ শুরুর দিন 22শে মার্চ পড়ে আমাদের বাংলা পঞ্জিকার 7ই চৈত্র। অধিবর্ষে ফেব্রুয়ারীর একটা দিন বেড়ে যাওয়ায় এমনটা হয়। নিয়ম হলো মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিনই বর্ষ শুরু গণনা করতে হবে। এ নিয়ম বৈদিক যুগেও যেমন মানা হতো, এই 6,000 বছর পরে এ যুগেও তেমনি মানা হচ্ছে। এটাই ভারতীয় পঞ্জিকার রীতি। এই রীতি যুগযুগ ধরে ভারতবর্ষে অনুসরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছেও। হিন্দুদের সালের

বিবরণ দিতে গিয়ে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'- তে বলেছেন, "বৎসর গণনা দুই হিসাবে হয়, এক চান্দ্র হিসাবে, এক সৌর হিসাবে। চান্দ্র বৎসর সৌরবৎসর অপেক্ষা দশ দিন তিপান্ন দণ্ড উনত্রিশ পল আড়াই বিপল কম। এই পার্থক্য দুই বৎসর আটমাস পনেরো দিনে এক মাস দাঁড়ায়। এই একমাস হ'লে হিন্দুরা মলমাস বলে এবং মলমাস নির্ধারণ করে বৎসরে এক নামে দুটি মাস ধরে এই পার্থক্য সামলানো হয়।" আইন-ই-আকবরীর মতে সম্রাট আকবরও তাঁর সিংহাসন আরোহণের দিন থেকে একটি নতুন সালের প্রবর্তন করেছিলেন। তবে সে সাল এখন অপ্রচলিত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের এই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুমেরীয়, আসিরীয়, গ্রীক ও রোমক ইত্যাদি সভ্যতায় তার নিজস্ব অবদান রেখেছিল। মানব সভ্যতায় ভারতের অনেক দানের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই অত্যুন্নত জ্ঞানের অবদানের কথাও আসে। বিভিন্ন পঞ্জিকায় ভারতীয় জ্ঞানের এই প্রভাব আজও সুস্পষ্ট। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা কিংবা ঐতিহাসিকরা ভারতের এই অবদানের কথা স্বীকার না করলেও তাঁরা মানতে বাধ্য হবেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য প্রাচীন ভারতীয়দের কাছেই ঋণী। অধিকাংশ প্রাচীন বর্ষপঞ্জীই ভারতীয় প্রাচীন পঞ্জিকার পরিবর্তিত রূপ।

মিশরীয়রা প্রায় 10,000 বছর আগে যে পঞ্জিকা ব্যবহার করতো তার মাস ছিল 12টি। প্রত্যেক মাসে 30 টি দিন এবং 360 দিনে ছিল বছর। বৈদিক যুগের প্রাথমিক অবস্থায়ও এমনি 360 দিনের 12টি মাস এবং 12টি মাসের একটি বছর ছিল। মিশরীয়রা 6,000 বছর আগে বছরের সঙ্গে আরও 5 দিন যোগ করে 365 দিনের বছর গণনা করতে শুরু করে। অধিবর্ষ বা লিপ-ইয়ারে একদিন যোগ করার কোনও ব্যবস্থা এই বর্ষপঞ্জীতে ছিল না। ফলে প্রতি চার বছরে নির্দিষ্ট উৎসব বা অনুষ্ঠানের দিন কিংবা নববর্ষের দিন একদিন করে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করে, 4×365.25 বছর বা 1,461 বছর পরে সারা বছর ঘুরে প্রথম দিনটি যে সময় পড়েছিলো আবার ঠিক সেই সময় পড়ে। মিশরীয়রা লুব্ধক নক্ষত্রের ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে উদয় এবং নীলনদের বন্যা একই সময়ে ঘটতে দেখে লুব্ধকের প্রথম ওই ধরনের উদয় ও নীলনদের প্রথম বন্যা মিলিয়ে বর্ষ শুরুর দিন গণনা করতে শুরু করে। অধিবর্ষে 366 দিনের বছর গণনার ব্যবস্থা না থাকায় নববর্ষের দিন এগিয়ে আসতে থাকে প্রতি চার বছরে একদিন করে। নববর্ষের দিন এগিয়ে আসে বটে কিন্তু লুব্ধকের সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে প্রথম উদয় ও নীলনদের প্রথম বন্যা আসার দিন চার বছরে একদিন করে পিছিয়ে পড়তে থাকে ওই নববর্ষের দিন থেকে। এইভাবে এগিয়ে আসতে আসতে 1,461 সৌরবর্ষ পরে আবার নববর্ষের দিন, লুব্ধকের ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্ব দিগন্তে প্রথম উদয়ের দিন ও নীলনদে প্রথম বন্যা আসার দিন এক হয়ে যায়। লুব্ধকের এই উদয়কে আধুনিক পরিভাষায় বলে 'Heliacal Rising', আর লুব্ধকের আধুনিক নাম 'Sirius' হলেও এর মিশরীয় নাম ছিল 'Sothis'। তাই 1,461 বছরের এই কালকে বলা হয় 'Sothic Period', এই সময় পরে পরে লুব্ধকের পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয়ের ঠিক আগের উদয়, নীলনদের প্রথম বন্যার আসা এবং নববর্ষের দিন এক হয়ে যায়। 238 খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা তৃতীয় টলেমি [King Ptolemy III] প্রতি চতুর্থ বর্ষকে 366 দিনের করার প্রথা চালু করেন। এই প্রথা পরবর্তীকালে রোমকরা গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু মিশরীয়রা টলেমির এই প্রথা মানতে অস্বীকার করে এবং পুরাতন প্রথা অনুযায়ী 365 দিনের বছরই চালু রাখে। এমনকি 139 খ্রিস্টাব্দে যখন তৃতীয় 'Sothic Period' শেষ হলো তারপরও তারা পুরাতন নিয়মেই বৎসর গণনা করতে তাকে। টলেমির সংস্কার তাদের কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি।

ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় এবং ক্যালডীয় পঞ্জিকাগুলি মূলতঃ চান্দ্র পঞ্জিকা। এদের বর্ষপঞ্জীতে 12টি মাস থাকতো পর্যায়ক্রমে 30 ও 29 দিনের। বছরের দিনসংখ্যা হতো 354 টি। তাই প্রতি তিন বছরে

একটি করে অতিরিক্ত মাস যোগ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে এই যোগ করাটা কোনও নিয়ম না মেনে রাজার আদেশ মতোই করা হতো। ফলে বর্ষপঞ্জিকাগুলিতে নানা সংস্কার সঠিকভাবে করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু 380 খ্রিস্টপূর্বাব্দ অবধি এ সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করা সম্ভব হয়নি। 380 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিয়ম করা হয় যে, প্রতি 19টি চান্দ্র বৎসরে 7টি অতিরিক্ত মাস যোগ করে নিয়মিত চান্দ্রবর্ষের সঙ্গে সৌরবর্ষের সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। রোমকরা কিন্তু এই নিয়ম এর 50 বছর আগেই চালু করেছিলো। 19 বছরে অতিরিক্ত এই সাতমাস যোগ দেওয়ার ব্যাপারটার তারা নামকরণ করেছিল 'Metonic Cycle'। বলা হয়, রোমকরা এই পদ্ধতি ধার করেছিলো গ্রীকদের কাছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, রোমকরা এই পদ্ধতি নিজেরা আবিষ্কার করেছিলো না তারা সত্যি সত্যিই গ্রীকদের কাছ থেকে তা ধার করেছিলো, কারণ ক্যালডীয় বর্ষপঞ্জীতে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো 380 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। অবশ্য তার আগে এই ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা নিয়ম করে মানা হতো না। এই সমস্ত পদ্ধতিই কিন্তু ভারতীয়রা আগেই আবিষ্কার করেছিলো এবং তাদের পঞ্জিকাতে চালু করেছিলো এই সব সভ্যতার অন্ততঃ হাজার দেড়েক বছর বা তারও বেশি আগেই। হিব্রু বর্ষপঞ্জীও চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা। তারা বর্ষপঞ্জিকার ব্যবহার শুরু করে ব্যাবিলনীয় বর্ষপঞ্জীর অনুকরণে। এখানে বছরের বারোটি চান্দ্রমাস। 6টি 30 দিনের এবং 6টি 29 দিনের। হিব্রুরা অনিয়মিতভাবে অধিমাস যোগ দিয়ে সৌরবর্ষের সঙ্গে চান্দ্রবর্ষের সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করতো। এটা হতো রাজার আদেশ। ফলে ভুলভাল থেকেই যেতো। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে হিব্রুরা তথা ইহুদীরা 'Metonic Cycle' অনুসরণ করতে আরম্ভ করে এবং প্রতি 19টি চান্দ্র বৎসরের সঙ্গে সাতটি চান্দ্রমাস অতিরিক্ত যোগ করে সৌরবৎসরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে শুরু করে। ইহুদীরা তাদের আধুনিক পঞ্জিকায় তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, চতুর্দশ, সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ বৎসরে একটি করে অতিরিক্ত মাস যোগ করে করে উপরোক্ত সামঞ্জস্য বিধান আজও করে চলেছে। সাধারণতঃ এদের বছর হয় 353 বা 354 বা 355 দিনের। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, বিক্রম সম্বত পঞ্জিকায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই। ইহুদীদের 353 বা 354 বা 355 দিনের বছর হওয়ার কারণ এই যে, এদের বর্ষশুরুর দিন রবিবার, বুধবার ও শুক্রবার হবে না কোনওভাবেই। এটা এদের ধর্মীয় নিয়ম। কোনও বছরের 354তম দিনটি শনিবার হলে পরের বছর আরম্ভ হওয়ার কথা রবিবার। কিন্তু রবিবারে বর্ষশুরু নিষিদ্ধ ধর্মীয় আইনে। তাই পূর্বের বছরটিকে করা হয় 355 দিনের। পরের বছর শুরু হয় সোমবার। সে বছর হবে 353 দিনের। এইভাবে এদের বছর হয় 353 বা 354 বা 355 দিনের। এর সঙ্গে 30 দিন অতিরিক্ত যে বছর যোগ হয় সেবার বছর হয় 383 বা 384 বা 385 দিনের। আর দিন হয় সূর্যাস্তের সময় থেকে এবং শেষ হয় পরের দিন সূর্যাস্তে। ইহুদীদের শনিবার হলো শুক্রবারের সূর্যাস্তের পর থেকে শনিবারের সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

চৈনিকদের ব্যবহৃত বর্ষপঞ্জীও চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা। সাধারণভাবে 12টি চান্দ্রমাস নিয়ে হতো একটা চান্দ্র বৎসর বা বৎসর। এর সঙ্গে যথানিয়ম একটি অতিরিক্ত চান্দ্রমাস যোগ দেওয়া হতো প্রতি তৃতীয় বৎসরে। এদের বর্ষশুরু হতো বাসন্তী বিষুবে সূর্যের আপাত সংক্রান্তির পরের দিন থেকে। এদের মতে সূর্যের এই সংক্রান্তি হয় কুম্ভরাশিতে। হয়ত বহু আগে তাই হতো। যাইহোক, এখন কুম্ভ রাশিতে সূর্য থাকে নিরয়ন মতে ফাল্গুন মাসে, সায়ন মতে মাঘের 7 তারিখ থেকে 7ই ফাল্গুন অবধি। প্রাচীন চৈনিক বর্ষ আরম্ভ হতো ফাল্গুন মাসে। এটা প্রাচীন ভারতীয়দের বর্ষ আরম্ভের মাস।

মায়া সভ্যতার দিন মাস বছরের বিস্তৃত তথ্য আগেই দেওয়া হয়েছে। মায়ারা 365 দিনের বছর গণনা করতো বটে, তাদের মাস ছিল 20 দিনের। 20 দিন নিয়ে হতো এক 'উইনাল' 18টি উইনাল নিয়ে হতো

এক 'টুন'। এক 'টুন' হলো মোটামুটি এক বছর বা 360 দিনের একটি বছর। আবার 365 দিনের বৎসর গণনার ব্যবস্থাও মায়াদের ছিল। তৃতীয়তঃ 13টি উইনাল নিয়ে 260 দিনের যে সময় তাও মায়াদের কোনও এক ধরনের বৎসর হিসাবে গণনা করা হতো। মায়ারা এই তিন ধরনের বৎসরের হিসাব জানলেও কোনটা কোন্ কাজে কীভাবে তারা এই তিন ধরনের বৎসরের হিসাবকে কাজে লাগাতো তা আজও অজানা। কোনদিন তা জানা যাবে বলে মনেও হয় না। কারণ বিজয় গর্বে গর্বিত অর্ধসভ্য স্পেনীয়রা ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রাচীন সভ্যতার নবীন উত্তরসূরিদের পরাজিত করার পর মায়াদের যাবতীয় প্রাচীন পুঁথি আগুনে পুড়িয়ে বুহ্যুৎসব করেছে।

প্রাচীন গ্রীকরা প্রথমে চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করতো। 354 দিনেই তাদের বছর হতো সে সময়। নানা প্রয়োজনে এই চান্দ্রবৎসরের সঙ্গে সৌরবৎসরের সামঞ্জস্য বিধান করবার দরকার হয়ে পড়লো। 433 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের অধিবাসী 'মেটন' [Meton] আবিষ্কার করলেন 19টি সৌর বৎসর বা 228টি সৌরমাস 235টি চান্দ্রমাসের সমান। সুতরাং উভয় বর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে প্রত্যেক 19টি চান্দ্র বৎসরের সঙ্গে সাতটি চান্দ্রমাস অতিরিক্ত যোগ করতে হবে। এই পদ্ধতি শুধু গ্রীকরা নয় রোমকরাও ব্যবহার করতে থাকে। এই পদ্ধতির নাম 'Metonic Cycle', যা জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেটনের নামাঙ্কিত। আগেই বলা হয়েছে, 130 খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিপ্পারকাসই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, সৌরবর্ষ সঠিকভাবে 365.25 সৌরদিন নয়, কিছুটা কম।

রোমকদের বর্ষশুরু হতো মার্চ মাসে। বছর ছিল 10 মাসের। মাসগুলির 5টি হলো 30 দিনের আর 5টি 29 দিনের। মোট 295দিনের বৎসর। আর দুমাস কীভাবে গণনা হতো তা জানা যায় না। শুধু তাই নয়, মার্চে বছর শুরু হওয়ায় 7ম, ৪ম, 9ম ও 10ম মাসের নাম হয় September, October, November ও December। এই সব নামকরণের পিছনে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবদান প্রবল। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন বলা হয়, রোমকরা 10 মাসের বছর হিসাব করতো—এই সিদ্ধান্ত যেমন ভুল, তেমনি তাদের এই মাসগুলির নামকরণ তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত এও সম্পূর্ণ ভুল। রোমকদের বর্ষপঞ্জী ছিল পুরোপুরি ভারতীয় পঞ্জিকার অনুকরণে তৈরি।

প্রচলিত ধারণা হলো 700 খিস্টপূর্বাব্দে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী নামের দুটি মাস ডিসেম্বরের পরে যোগ করা হয়। এই যোগ করার কাজটা নাকি করেন রাজা নুমা পম্পিলিয়াস [Numa Pompilius]। পরবর্তীকালে চান্দ্রমাসের বছর সৌরবর্ষে রূপান্তরিত হয়। বছরের 2য়, 4র্থ, 7ম, ও 9ম মাস হয় 30 দিনের এবং বাকী মাসগুলির কেবল ফেব্রুয়ারী বাদ দিয়ে দিন-সংখ্যা হয় 31টি। ফেব্রুয়ারীর দিন-সংখ্যা এমনিতে 28টি, তবে অধিবর্ষে তা হলো 29 দিনের। জুলিয়াস সীজার 46 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই পঞ্জিকার সংস্কার করান। ওই বছর হিসাব করে দেখা হলো যে, 25শে মার্চ মহাবিষুব সংক্রান্তি হচ্ছে। চলতি বছরের সঙ্গে 85 দিন যোগ করে 26শে মার্চ থেকে বর্ষশুরুর দিন ঠিক করা হলো। এই সময় জানা গেল 365.25 দিনে এক সৌরবর্ষ। তাই প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসকে 29 দিনের মাস করা সাব্যস্ত হলো, কারণ ফেব্রুয়ারী তখন বৎসরের শেষ মাস। প্রকৃতপক্ষে, ফেব্রুয়ারী মাসের 24তম দিনটিকে দুবার গণনা করা হতে থাকলো অধিবর্ষগুলিতে। 'জুলিয়ান রিফর্ম' বা 'জুলিয়ান সংস্কার' সংস্কার হিসাবে কিছুটা উন্নতমানের হলেও, 45 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে হঠাৎই 1লা জানুয়ারীকে বর্ষ শুরুর দিন ঘোষণা করায় সমস্ত ব্যাপারটাই তালগোল পাকিয়ে যায়। সীজারের প্রশাসকরা 1লা জানুয়ারী শাসনকার্যের ভারগ্রহণ করতেন বলে নাগরিক বর্ষও শুরু হয়ে যায় বা শুরু করা হয় 1লা জানুয়ারী থেকে। 45 খ্রিস্টপূর্বাব্দের 1লা জানুয়ারী থেকেই বর্ষ শুরু গণনা হতে আরম্ভ করে।

জুলিয়াস সীজারের সংস্কার করা এই বর্ষপঞ্জী 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার' নাম বিখ্যাত। এই পঞ্জিকা সংস্কারের সময় ধরা হয়েছিল সৌরবর্ষ 365.25 দিনের। প্রকৃতপক্ষে সৌরবর্ষ হলো 365.2422দিনের। পার্থক্য হলো 0.0078 দিন প্রতি সৌর-বৎসরে অর্থাৎ এই পার্থক্য 400 বছরে হবে 3 দিন। তাই 325 খ্রিস্টাব্দে Nicaea-তে একটা কাউন্সিল বসলো। তাতে দেখা গেল মহাবিষুব সংক্রান্তি চারদিন এগিয়ে এসেছে অর্থাৎ চারদিন আগেই বা 21শে মার্চেই মহাবিষুব সংক্রান্তি হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 3 দিন এগোনোর কথা উপরোক্ত পার্থক্যের জন্য। সম্ভবত সীজারের মুখ্য জ্যোতির্বিদ Sosigenes-এর গণনায় একদিন বা 24 ঘণ্টার ভুল ছিল। যাইহোক, এই কাউন্সিল চারটি অতিরিক্ত দিন বিয়োগ করে। 325 খ্রিস্টাব্দের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনটিকে 21শে মার্চেই স্থির করা হলো। এরপর 1,250 বছরের বেশি সময় কেটে গেল। যথারীতি প্রতি 400 বছরে তিনদিন করে 21শে মার্চ পিছিয়ে যেতে থাকলো। আর মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন 400 বছরে 3 দিন করে এগিয়ে আসতে থাকলো। ফলে, 1581 খ্রিস্টাব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তি হলো 11ই মার্চ। 1582 খ্রিস্টাব্দের 4ঠা অক্টোবরের পরে 10 দিন বাদ দিয়েছিলেন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী [Pope Gregory XIII]। 4ঠা অক্টোবর ছিল বৃহস্পতিবার। পরের দিন শুক্রবার হলো 15ই অক্টোবর। সেবার অক্টোবর মাসটা হলো 21 দিনের। এই সংস্কারের নাম হলো 'গ্রেগরীয় সংস্কার' [Gregorian Reform]। নতুন বর্ষপঞ্জীর নাম হলো 'গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জী' বা Gregorian Calendar. স্বভাবতই জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য ঘটলো। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে পুরাতন নিয়মই বজায় রইলো কিন্তু গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারে আরও কিছু সংস্কার করা হলো যাতে ভবিষ্যতেও 21শে মার্চেই সায়ন মতে বিষুব-সংক্রান্তি বা বাসন্তী বিষুবে সূর্যের সংক্রান্তি ঘটতে থাকে। গ্রেগরী বললেন যে, প্রতি চারশ' বছরে বর্ষপঞ্জীতে থেকে তিন দিন বাদ দিতে হবে, কারণ সৌরবর্ষ 365.25 দিনের নয় বরং তা 365.2422 দিনের। তিনি এই নির্দেশ দিলেন যে, 1700, 1800 এবং 1900 খ্রিস্টাব্দগুলি অধিবর্ষ ধরা হবে না, যদিও 1600 খ্রিস্টাব্দকে অধিবর্ষ ধরা হবে। অর্থাৎ এইভাবে তিনি ওই তিনটি অতিরিক্ত দিন বাদ দেবার একটা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিলেন। তাঁর এই সংস্কার অনুসারে 1600 খ্রিস্টাব্দে অধিবর্ষ হলেও 1700, 1800, 1900 খ্রিস্টাব্দ ধরা হবে না, কারণ 17, 18, ও 19 এই সংখ্যাগুলি 4 সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নয়। ফলে 1700, 1800 ও 1900 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস 28 দিনের হবে 29 দিনের নয়। এইভাবে প্রতি 400 বছরে তিনটি অতিরিক্ত দিন বাদ পড়বে এবং বর্ষপঞ্জীও নিখুঁত হবে। এমনিভাবে 2000 খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাস 29টি দিনের হলেও 2100, 2200 ও 2300 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস তিনটি হবে 28 দিনের। এই খ্রিস্টাব্দগুলি অধিবর্ষ হবে না। সুতরাং গ্রেগরী জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রতি 400 বছরে তিনদিন বেড়ে যাওয়া সমস্যার সমাধান এইভাবেই করলেন। 1582 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীতে এই নিয়ম যথারীতি মেনে চলা হচ্ছে। এখন ইউরোপের প্রায় সব দেশই গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জী অনুসরণ করছে।

গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারও একেবারে নিখুঁত নয়। কারণ গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় সৌরবর্ষ ধরা হলো 365.24250 দিন। প্রকৃতপক্ষে, সৌরবর্ষ হল 365.24219 দিন, পার্থক্য হল 0.00031 দিন প্রতি বছরে। এর ফলে প্রতি দশ হাজার বছরে 3.1 দিন অতিরিক্ত হয়ে যাবে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীতেও। তবে এই অতিরিক্ত হওয়াটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কেননা 3,300 বছরে একদিন অতিরিক্ত হওয়াটা সাধারণ গণনায় ধর্তব্য নয়। তাছাড়া অজানা কারণে সৌরবর্ষের সময় পরিমাণটা অর্থাৎ 365.24219 দিন পরিমাণটার খুব সামান্য পার্থক্য হতে দেখা যায়। তাই 3,300 বছরে একটা দিন অতিরিক্ত হওয়াটা কোনও সাধারণ খুঁত হিসাবে ধরা হয় না। অর্থাৎ গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জী মোটামুটিভাবে নিখুঁত।

1582 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ড, 1584 খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী রাজ্যগুলি এবং 1586 খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ড এই পঞ্জিকা অনুসরণ করতে শুরু করে। জার্মানীর প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী দেশগুলি এবং সুইজারল্যান্ড 1700 খ্রিস্টাব্দে তাদের দেশে এই পঞ্জিকা চালু করে। ইংল্যান্ড ও তার উপনিবেশগুলি এবং সুইডেন এই পঞ্জিকা গ্রহণ করে 1752 খ্রিস্টাব্দে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে এই পঞ্জিকা তাদের দেশে চালু করে। ফলে, ওই সব দেশের প্রচলিত পঞ্জিকা থেকে 10 দিন বা 11 দিন কিংবা 13 দিন পর্যন্ত বাদ দিতে হয়। প্রথমের দিকে কোনও দিনকে লেখা হতো 10/23 হিসাবে। এর অর্থ হল পুরাতন প্রচলিত মতে দিনটি 10 তারিখ এবং গ্রেগরীয় মতে দিনটি 23 তারিখ। এখন অবশ্য দেশের সর্বত্রই গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারে রপ্ত। তাই এখন আর ওই পদ্ধতিতে তারিখ লেখা হয় না। আমরা যে ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি, বলা বাহুল্য, তা ওই গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার। তাই মহাবিষুব সংক্রান্তি বা বাসন্তী বিষুবে সূর্যের সংক্রান্তি হচ্ছে মার্চমাসের একুশ তারিখে।

ইসলামীয় পঞ্জিকা

মুসলমানদের ব্যবহৃত পঞ্জিকা একেবারে খাঁটি চান্দ্র-পঞ্জিকা। এর বারোটি মাসই চান্দ্র মাস। সাধারণতঃ ছ'টি মাস 30টি এবং অপর ছটি মাস 29 দিনের, মোট 354 দিনে একটি বছর। 30টি বছরের মধ্যে 19টি বছর হয় 354 দিনের। বাকী 11টি বছর 355 দিনের। প্রত্যেক 30 বছরের 2য়, 5ম, 7ম, 10ম, 13শ, 16শ, 18শ, 21শ, 24শ, 26শ ও 29শ তম বছরগুলি 355 দিনের। 30 বছরে এই 11দিন বাড়ার কারণ হল চান্দ্রমাসের পরিমাণ। এক চান্দ্রমাস হলো প্রকৃতপক্ষে 29.530589 দিন। এক চান্দ্রবৎসর হল 29.530589 দিন×12 কিংবা 354.367068 দিন। সুতরাং 354 দিনের বছর ধরলে 0.367068 দিন কম ধরা হয়। এই বাড়তি দিন 30 বছর দাঁড়ায় 11.012040 দিন বা মোটামুটি 11 দিন। তাই 11 দিন যোগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতি 30 বছরে। ফলে উপরোক্ত বছরগুলিতে একদিন করে যোগ দিয়ে মোট 355 দিনের বছর করা হয় ওই 11টি বছরকে। এতেও এই চান্দ্রপঞ্জিকা পুরোপুরি নিখুঁত হল না। কারণ প্রতি 30 বছরে 0.01204 দিন বাড়তি থেকে যাচ্ছে এই হিসাবের পরেও। এই বাড়তি দিনটুকু বাড়তি হয়ে প্রায় 2,500 বছরে আরো একটা দিন অতিরিক্ত হয়ে যায়। তখন একটা বছর হবে 356 দিনের। তবে সে অবস্থা এখনও আসেনি। কারণ এই পঞ্জিকার সবে 1428 সাল চলছে 2007 খ্রিস্টাব্দে। 2500 সাল আসতে অনেক দেরী।

তাছাড়া আড়াই হাজার বছরে একদিনের কমবেশি দৈনন্দিন জীবনের হিসাব-নিকাশের মধ্যে আসে না। সুতরাং চান্দ্র-পঞ্জিকা হিসাবে এই পঞ্জিকা প্রায় নিখুঁত। অসুবিধা হল এই পঞ্জিকানুসারে উৎসব বা অন্যান্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের দিন বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বছর সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিবছরই এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের দিন পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে প্রায় এগারো দিন এগিয়ে আসে। প্রতি বছর 11 দিন করে এগিয়ে এগিয়ে আবার 33 বছর পরে আগের দিনটিতে কোন নির্দিষ্ট উৎসবের দিন পড়ে। 1988 খ্রিস্টাব্দে মহরম পড়েছে 24শে আগস্ট। 1989 খ্রিস্টাব্দে মহরম পড়ল মোটামুটিভাবে 11 দিন আগে অর্থাৎ 13ই আগস্ট। আর 1990 খ্রিস্টাব্দে মহরম পড়লো 2রা আগস্ট। এইভাবে এগিয়ে এগিয়ে 33 বছর পরে অর্থাৎ 2021 খ্রিস্টাব্দে আবার মহরম পড়বে 24শে আগস্ট। ইতোমধ্যে মহরম উৎসবের নির্দিষ্ট দিনটি সারা বছরের সবকটি মাস ঘুরে আসবে। সুতরাং এটা সহজবোধ্য যে, কোন নির্দিষ্ট উৎসব-অনুষ্ঠানের দিন কোন নির্দিষ্ট ঋতু বা কালের মধ্যে প্রতিবছরই সীমাবদ্ধ থাকছে না। যেমন, হিন্দুদের

দুর্গাপূজা মোটামুটিভাবে আশ্বিনমাসে পড়ে, কিংবা খ্রিস্টানদের ইস্টার উৎসব এপ্রিল মাসে পড়ে কিংবা মার্চ মাসে, ইসলামীয় পঞ্জিকায় তেমনটি হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এই পঞ্জিকা খাঁটি চান্দ্র-পঞ্জিকা এবং সৌর পঞ্জিকার সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা এই পঞ্জিকায় নেই।

এই পঞ্জিকার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল মাসের আরম্ভ হয় অমাবস্যার পরে যেদিন প্রথম চাঁদ দেখা যাবে সেদিন থেকে। উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের 13ই সেপ্টেম্বর শফর মাসের শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে 12ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেল। তাই দক্ষিণ ভারতে 12ই সেপ্টেম্বর শফর মাস শুরু হল। আর উত্তর ভারতে 13ই সেপ্টেম্বর চাঁদ দেখা গেল, তাই সেখানে শফর মাস শুরু হল 13ই সেপ্টেম্বর। দিন শুরু হওয়ার নিয়ম অবশ্য সর্বত্রই এক। সূর্যাস্তের পরে দিন শুরু হয়ে দিন শেষ হয় পরের দিনের সূর্যাস্তে। উৎসবের দিন ঠিক করার ব্যাপারেও চাঁদ দেখা যাওয়ার প্রশ্ন জড়িত। মুসলমানদের সবচেয়ে নামী উৎসব ইদের বা ইদ্-উল-ফিতর এর কথাই ধরা যাক। রমজান মাস শেষ হলে শওয়াল মাসের প্রথম দিনে এই উৎসব হওয়ার কথা। কিন্তু ওদিন যদি চাঁদ অর্থাৎ শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখা যায় তবে ওদিন ইদ উৎসব হবে। যেখানে ওই চাঁদ দেখা যাবে না সেখানে ওই দিন ইদ হবে না, হবে পরের দিন। কারণ শুক্লা তৃতীয়ায় চাঁদ দেখা দেবেই তা সে যতই মেঘের আড়ালে থাকুক না কেন। চাঁদ দেখা গেছে কিনা তা ঘোষণা করা হয় সেই অঞ্চলের প্রধান মসজিদ থেকে। এক একটি করে মসজিদ প্রত্যেকটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট আছে। সেই মসজিদের ইমাম চাঁদের দেখা যাওয়া ঘোষণা করেন এবং সেই অনুসারে মুসলমানদের উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন, কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম এই ধরনের ঘোষণা করলে, এই অঞ্চলের মুসলমানেরা তা মেনে অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তেমনি দিল্লীতেও একজন ইমাম আছেন যিনি এই ঘোষণা করেন এবং উত্তর ভারতের তথা পশ্চিম ভারতের মুসলমানেরা তা মেনে নিয়ে তাদের উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করে।

শুক্লা প্রতিপদে সাধারণতঃ চাঁদ আকাশে দৃশ্য হয় না। দ্বিতীয়াতেও কোন কোন জায়গায় চাঁদ অদৃশ্য থাকে কোনও কোনও সময়। ওইসব জায়গায় এই পঞ্জিকার মাস শুরু হবে না। শুরু হবে পরের দিন, কারণ সেদিন অতি অবশ্যই চাঁদ দৃশ্য হবে। যেমন, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ই মার্চ শাবান মাস শুরু হওয়ার কথা। অথচ ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ওইদিন শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখা গেল না, তাই ওই সব অঞ্চলে শাবান মাস শুরু হল ৫ই মার্চ। ফলে ওই মাসের কোনও উৎসবের দিনও ঠিক একদিন পিছিয়ে যাবে ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে, কারণ কোন মাসের কোন দিন কোন্ উৎসব হবে তা পূর্বনির্দিষ্ট। মাসের শুরুর দিন একদিন পিছিয়ে গেলে উৎসবের দিনও একদিন পিছিয়ে যাবে।

এই পঞ্জিকার সালকে বলা হয় 'হিজরী' [Hejira]। চলতি কথায় হিজরী হলেও এটি 'হিজিরা' [Hejira] বা 'হেজিরা' [Hegira] নামে খ্যাত। হজরত মহম্মদ যেদিন মক্কা থেকে মদিনা যান সেদিন থেকেই এই সাল গণনার শুরু। দিনটা ছিল 16ই জুলাই, 622 খ্রিস্টাব্দ। ইসলামীয় পঞ্জিকায় সালকে A H অক্ষর দুটি দিয়ে লেখা হয়। A H হলো Anno Hezirae। আরবীয় শব্দ 'hejira' থেকেই হিজরী বা হিজিরা বা হেজিরা শব্দের উৎপত্তি। আরবীয় 'hejira' শব্দের অর্থ হল বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কারুর বিচ্ছিন্ন হওয়া। হজরত মহম্মদ যখন মক্কা থেকে মদিনায় যান তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু-বক্কর এবং দু-জন পথ-প্রদর্শক। মক্কার সব আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ওইদিন তিনি বিচ্ছিন্ন হন। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য মক্কা থেকে হজরত মহম্মদের বেশ কিছু অনুগামী মদিনায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর এই সব অনুগামীরা 'মুহাজিরান' [Muhajirun] নামে খ্যাত। যাইহোক, হিজরী সালের

চিত্র : 84

ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে তোলা সৌরকলঙ্কের ছবি। এটি তোলা হয় 1951 সালের মে মাসে

চিত্র : 86

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় তৈরি হওয়া 'হীরের আংটি'র ছবিটি 1995 সালের 24শে অক্টোবর তোলা পশ্চিমবঙ্গের তমলুক থেকে
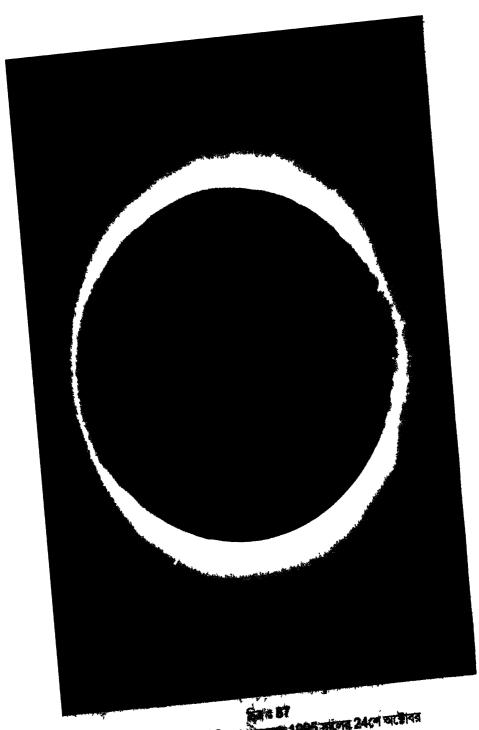
চিত্র ঃ 87

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। ছবিটি তোলা হয়েছে 1995 সালের 24শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের তমলুক থেকে

চিত্র : 91
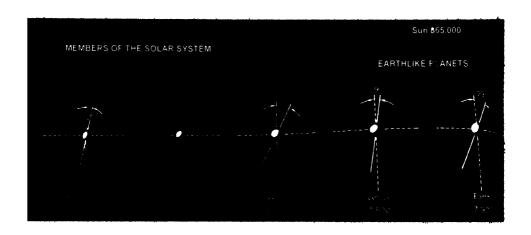
সৌরমণ্ডলের নয়টি গ্রহের আপেক্ষিক আকার। প্রত্যেকের ব্যাস মাইলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রহের ঘূর্ণন-অক্ষ তার কক্ষতলের সঙ্গে কতটা নতিতে [Inclination] অবস্থান করছে তাও দেখানো হয়েছে। ইউরেনাসের ঘূর্ণন অক্ষ প্রায় অনুভূমিক

চিত্র : ৭২

চাঁদের থেকে পৃথিবীর ছবি

চিত্র : 93
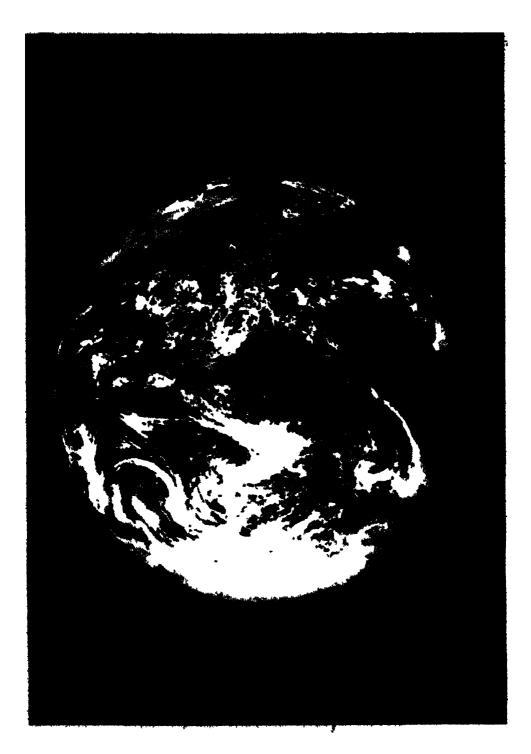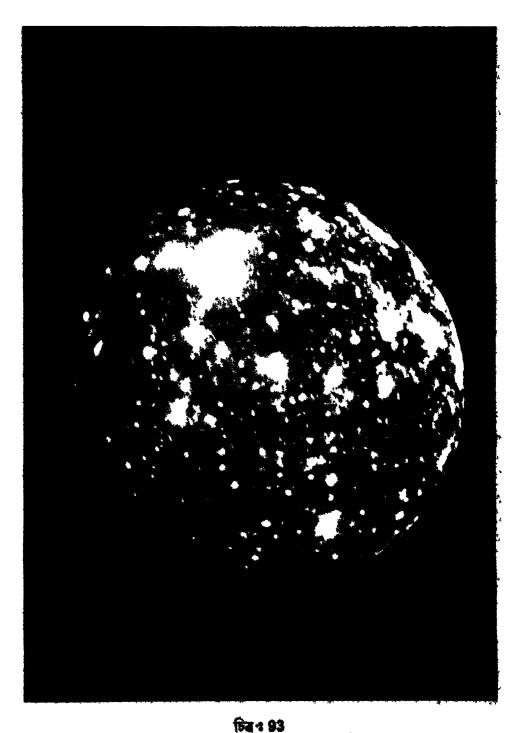
ভয়েজার - 2 বৃহস্পতির উপগ্রহ ক্যালিস্টোর এই ছবিটি তুলেছিল 1979 সালের জুলাই মাসে। ছবিটি তোলা হয় 10,00,000 কিলোমিটার দূর থেকে। সাদা উজ্জ্বল দাগগুলি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, যেখানে জমে আছে জলীয় বরফ।

চিত্র : 95

ভয়েজারের তোলা শনির বলয়ের ছবি। 7,17,000 কিলোমিটার দূরথেকে তোলা ছবি। বলয়টি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয়ের সমাহার। তৈরী হয়েছে ক্ষুদ্র কণা দিয়ে। অনেকগুলিতে আছে ছোট্ট নুড়ির আকৃতির কোটি কোটি বরফ টুকরো। কোনগুলির আকার একটা ছোট্ট ঘরের মত

চিত্র ঃ 96A

বলয় সমন্বিত ইউরেনাস। এর দশটি বলয় রয়েছে

চিত্র : ৯৪
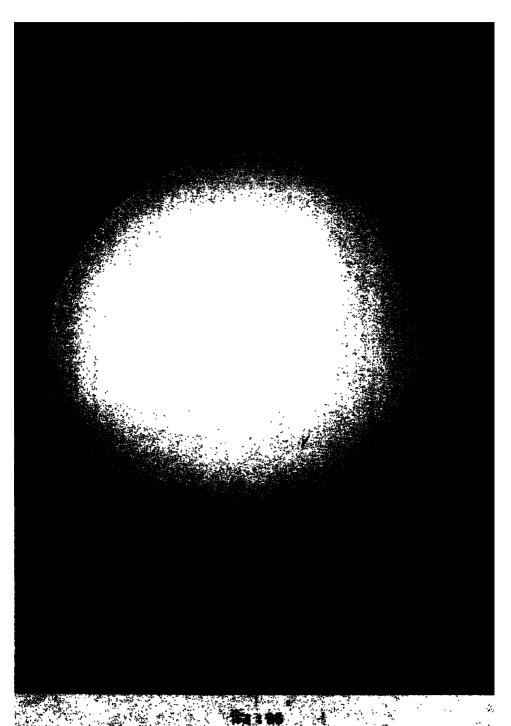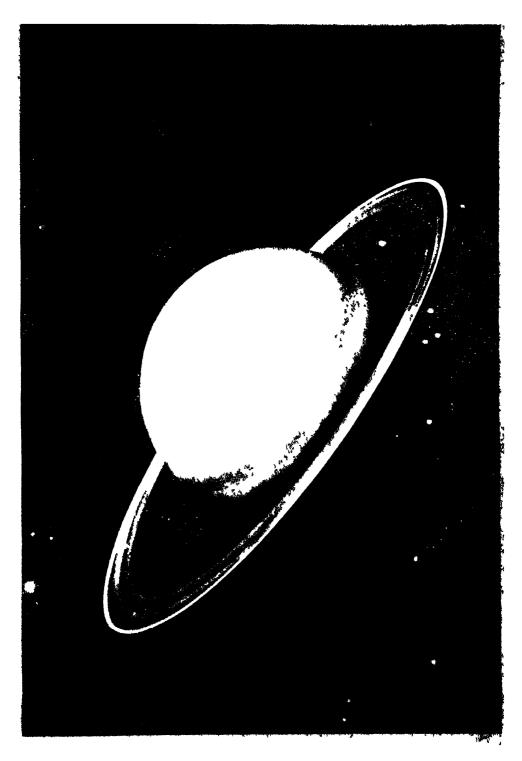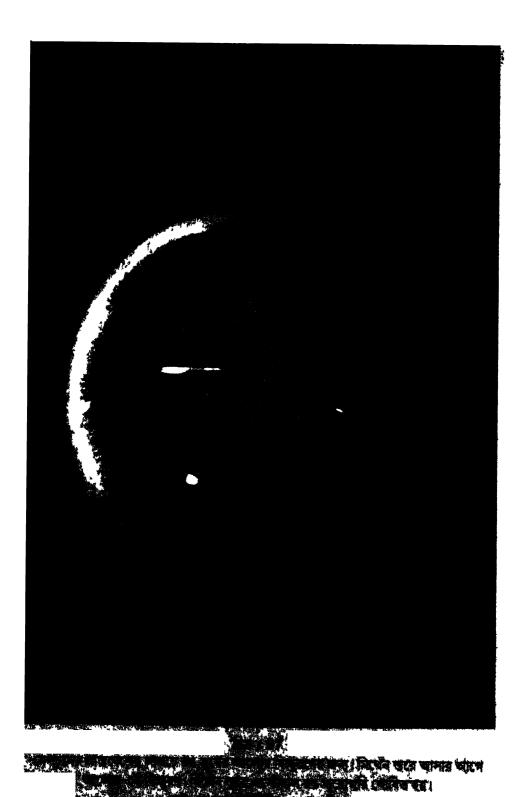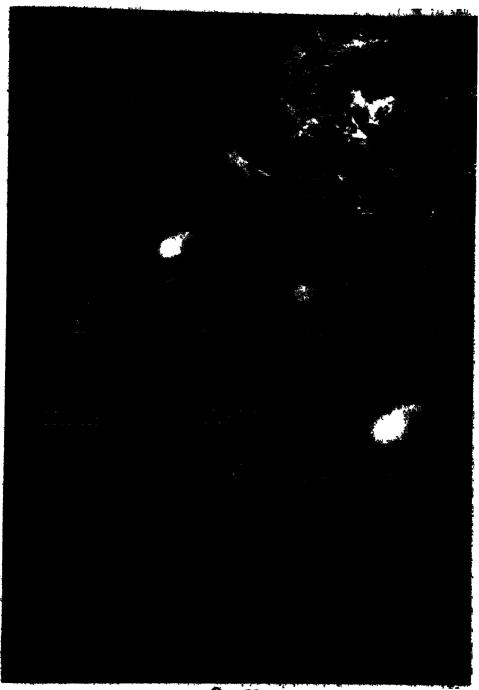
ছবিতে আমাদের পৃথিবী, চন্দ্র, প্লুটো, 2003 সালে আবিষ্কৃত 2003 UB 313 নামক নতুন গ্রহ [New Planet] ইত্যাদির তুলনামূলক আয়তন দেখানো হয়েছে। 2003 UB 313 অবশ্য গ্রহ বলে স্বীকৃত হয়নি

চিত্র 100

বিশাল এক উল্কাপাতের ফলে সৃষ্ট গহ্বর। এটি অ্যারিজোনায় বিখ্যাত উল্কাপাতের ছবি। এই উল্কাপাতে [illegible] গহ্বরের চারদিকে যে দেওয়াল সৃষ্টি [illegible] তার উচ্চতা 100 ফুট থেকে 150 ফুট

চিত্র : 101

ব্রুকসের ধূমকেতু। 1861 সাল থেকে এর ছবি তোলার চেষ্টা চালানোর পর 1880 সালে তা সফল হয়। এই ছবিটি পরবর্তীকালের। দীর্ঘক্ষণের এক্সপোজারে এটি তোলা সম্ভব হয়েছে।
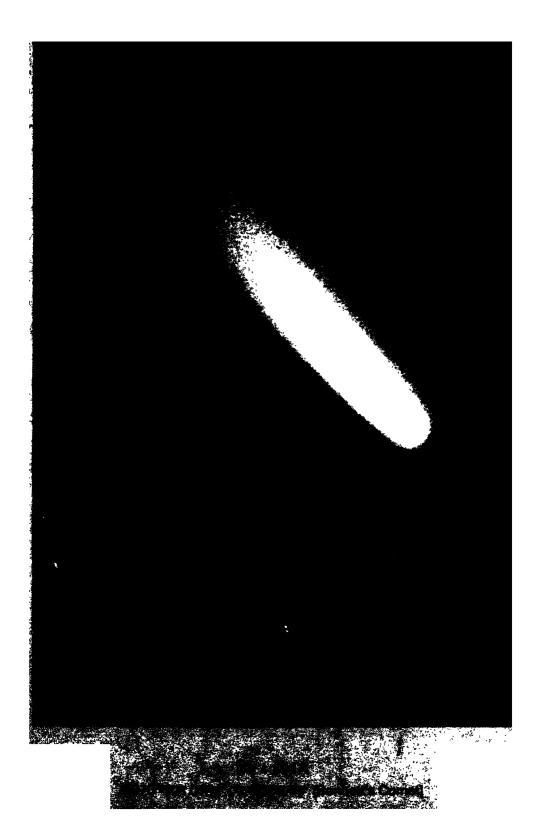
আরম্ভ হলো 16ই জুলাই, 622 খ্রিস্টাব্দ। 1989 খ্রিস্টাব্দের 4ঠা আগস্ট শুরু হল হিজরী সনের 1410 সাল। ওই দিন মহরম মাসের শুরু। প্রকৃতপক্ষে, 3 রা আগস্ট সন্ধ্যা বা সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হল মহরম মাস এবং হিজরীর 1410 সাল। 2007 খ্রিস্টাব্দের 21 শে জানুয়ারী শুরু হয়েছে 1428 হিজরী সাল। 21শে জানুয়ারীর সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়েছে মহরম মাসের প্রথম দিন এবং হিজরীর 1428 সাল। ইসলামীয় এই পঞ্জিকা পুরোপুরি চান্দ্র পঞ্জিকা এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই পঞ্জিকা ধর্মীয় পঞ্জিকাও বটে। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের হিসাব নিকাশ এই পঞ্জিকার সাহায্যে করা এখন আর তেমন সুবিধাজনক নয়।

খ্রিস্টাব্দ [Christian Era]

'Era' বলতে বোঝায় যুগ বা অব্দ। ইতিহাসের কোনও একটা নির্দিষ্ট ঘটনা সেই যুগ বা অব্দের সূচনা করে। সেই ঘটনার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী বর্ষগুলি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ভারতীয় পঞ্জিকায় যেমন বিভিন্ন যুগ বা অব্দ দিয়ে নানা পঞ্জিকা তৈরি হয়েছে তেমনি খ্রিস্টধর্মের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে খ্রিস্টাব্দ। ভারতে কলিযুগ, বা, বিক্রম সম্বৎ, শক ও শকাব্দ ইত্যাদি গণনার বিভিন্ন পঞ্জিকা আছে। তেমনি পাশ্চাত্যেও নানা ধরনের যুগ বা অব্দ গণনা শুরু করা হয় এইসব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক পরে, তবে তা গণনা করা হয় ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। যেমন, খ্রিস্টাব্দ চালু করার প্রস্তাব প্রথম রাখেন এক ধর্মযাজক খ্রিস্টের জন্মের 532 বছর পরে। ধর্মযাজকটির নাম 'ডেনিস লা পেটিট' [Denys Le Petit]। তিনি মারা যান 540 খ্রিস্টাব্দে। খ্রিস্টাব্দ চালু করার প্রস্তাব পাশ্চাত্য দেশগুলি আরও তিন চারশো বছর পরে মেনে নেয়। হিসাবের কেন্দ্রবিন্দু হলো খ্রিস্টের জন্মবর্ষ। ডেনিস অবশ্য হিসাব করে বলেছিলেন যীশু জন্মেছিলেন 25শে ডিসেম্বর, সালটা ছিল 753 রোমক বর্ষ। পরবর্তীকালে হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন 1লা জানুয়ারী। আর সালটা ঠিক করা হলো ইহুদীদের রাজা হেরোদ [Herod] এর মৃত্যুবর্ষ থেকে। ফলে ডেনিসের নির্দিষ্ট সালের সঙ্গে কয়েক বছরের হেরফের হলো। খ্রিস্টাব্দের বর্তমান যা রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে বলা যায় 2007 সালের 1লা জানুয়ারী হলো সেইদিন যে দিন থেকে 2006 বছর আগে যীশুখ্রিস্ট বেথলেহেমে আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের কাছে বর্ষগণনায় '0' বছর বলে কিছু নেই। যীশুর জন্মদিন হলো 001 খ্রিস্টাব্দের 1লা জানুয়ারী আর যীশুর জন্মের আগের 1লা জানুয়ারী হলো 001 খ্রিস্টপূর্বাব্দের 1লা জানুয়ারী। খ্রিস্টাব্দকে লেখা হয় A.D. বা Anno Domini আর খ্রিস্টপূর্বাব্দকে লেখা হয় B.C. বা Before Christ। যেমন, 540 খ্রিস্টাব্দ হলো 540 A.D. আর 530 খ্রিস্টপূর্বাব্দ হলো 530 B.C.। ফলে 1 B.C., 5 B.C., 9 B.C. এই বছরগুলির অধিবর্ষের যদিও সংখ্যাগুলি চার দ্বারা বিভাজ্য নয়। কারণ, মনে রাখতে হবে যে '0' বর্ষ না থাকায় ওগুলির থেকে '1' বাদ যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই অসুবিধা দূর করতে '0' বর্ষ ব্যবহার করেন এবং 5 B.C. কে লেখেন '-4', 9 B.C. কে '-8' ইত্যাদি। তখন অধিবর্ষের নিয়ম নিয়ে আর গোলমাল থাকে না। তাছাড়া হিসাবও সুবিধাজনক হয়ে যায়। যেমন, 200 B.C. জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনায় '-199'। অতএব 2007 সাল থেকে তা কত বছর আগে তা সহজেই বের করা যায় 2007-এর সঙ্গে ওই 199 যোগ করে। উত্তর হবে 2206 বছর। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 25শে ডিসেম্বর কিংবা 1লা জানুয়ারী সত্যি সত্যিই যীশু জন্মেছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনকি যীশু বলে কেউ কখনো ছিলেন কিনা তাও বিতর্কিত বিষয়। এ বিতর্ক আমাদের

নয়, বিতর্ক দানা বাঁধছে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, খোদ খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই। যীশুর ভক্তরা এখন প্রশ্ন তুলছেন যীশু বলে কেউ ছিলেন কিনা এই নিয়ে। 'যীশু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন' এই প্রমাণ দিয়ে ইদানীং বেশ কিছু বইও বেরিয়েছে ওদের দেশে। যীশু প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের উপদেশাবলীর অদ্ভুত কিছু কিছু মিল এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যাইহোক, প্রচলিত বিশ্বাস হলো, যীশুর জন্মদিন হতে খ্রিস্টাব্দের গণনার শুরু। তাঁর জন্মের আগের বছরগুলি খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই গণনা কিন্তু চালু হয় নবম বা দশম শতাব্দী থেকে। এ ধরনের প্রস্তাব এসেছিলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে, যা একটু আগেই বলা হয়েছে।

জুলিয়ান বর্ষ [Julian Year]

জুলিয়াস সীজারের পঞ্জিকা সংস্কার নিয়ে অনেক আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। সে আলোচনায় আসা নিষ্প্রয়োজন। খ্রিস্টের জন্মের বহু আগের ঘটনার সময় নির্দেশ করতে আজও জুলিয়ান বর্ষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটা জুলিয়ান যুগ বা কাল হলো 7,980 জুলিয়ান বর্ষ। এই পর্যাবৃত্তকালের হিসাব দেন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোসেফ স্ক্যালিজার [Joseph Scaliger] 1582 খ্রিস্টাব্দে। এই সংখ্যাটি তিনি বের করেন তিনটি সংখ্যার গুণফল থেকে। সংখ্যা তিনটি হলো 28, 15 ও 19। এই 19 সংখ্যাটি হল গ্রীকদের মেটনিক চক্র বা Metonic Cycle-এর সংখ্যা। 15 সংখ্যাটি এসেছে রোমানদের 'Indiction Cycle' থেকে। 28 সংখ্যাটি হলো রোমানদেরই 'Dominical Cycle' -এর সংখ্যা। এই তিনটি সংখ্যা গুণ করলে পাওয়া যায় 7,980 এবং ওই 7,980 বছরই হলো 'জুলিয়ান যুগ' বা 'Julian Era'।

এই জুলিয়ান কালের শুরু হয়েছে 4713 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। জ্যোতির্বিদরা সালটিকে লেখেন ' -4,712'। এই কালের শেষ হবে 3268 খ্রিস্টাব্দে। 4,713 খ্রিস্টপূর্বাব্দে 1লা জানুয়ারীর দিন 28, 19 ও 15 চল [Variable] রাশির মান ছিল 1 [এক]। তাই জুলিয়ান যুগের ওই 7,980 বছরের শুরু হয়েছিলো 1লা জানুয়ারী, -4,712 বা 1লা জানুয়ারী, 4,713 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। জুলিয়ান যুগের ওই 7,980 বছরের মধ্যে আর একটা বছরই ওই তিনটি 'Cycle'-এর উপরোক্ত তিনটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। জুলিয়ন দিন আরম্ভ হয়েছিলো 1লা জানুয়ারীর মধ্যাহ্ন থেকে। দিনটি ছিল সোমবার। জুলিয়ান যুগ শেষ হবে 3,268 খ্রিস্টাব্দের 1লা জানুয়ারীর মধ্যাহ্নে সোমবারে। সেদিন গ্রেগরীয় পঞ্জিকা মতে হবে 3268 খ্রিস্টাব্দের 23শে জানুয়যারী। সুতরাং জুলিয়ান যুগ বা কালের ব্যাপ্তি হলো 4713 খ্রিস্টপূর্বাব্দের 1লা জানুয়ারীর মধ্যাহ্ন থেকে 3268 খ্রিস্টাব্দের 1লা জানুয়ারীর মধ্যাহ্ন অবধি মোট 7980 বছর। সমস্ত আধুনিক পঞ্জিকা এখনও জুলিয়ান কালের বর্তমান মান বা পরিমাপ নির্দেশ করে চলেছে। Indian Ephimeris-ও এর ব্যতিক্রম নয়। 1967 সালের 21শে নভেম্বর গ্রীউইচ মধ্যাহ্নে জুলিয়ান দিন সংখ্যা ছিল 24,39,816, আর 2007 সালের 1লা জানুয়ারীর গ্রীনউইচ মধ্যাহ্নে ওই দিন সংখ্যা হয়েছে 24,54,102 [Completed]।

বর্ষপঞ্জীর প্রস্তাবিত সংস্কার
[Proposed Reforms of the Calendars]

আধুনিককালের বর্ষপঞ্জীগুলি যথেষ্ট নির্ভুল হলেও এগুলিতে কতকগুলি অসুবিধাজনক পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, মাসের দিনসংখ্যার বিভিন্নতা। একটি মাসের দিন সংখ্যা অন্য মাসের দিনসংখ্যার চেয়ে কিছু

কম বা বেশি। এই পার্থক্য 12 শতাংশ পর্যন্ত হচ্ছে। ব্যবসায়িক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে এক মাসের সঙ্গে অন্য মাসের তুলনা করতে গিয়ে জটিল অঙ্কের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মাসগুলির দিন-সংখ্যার এই পার্থক্যের জন্য। এছাড়া সপ্তাহের কোনও বারে কত তারিখ হবে তাও নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতি বছরে। আবার, কোনও দিনের তারিখ, ধরা যাক মাসের তৃতীয় রবিবারের তারিখ, পরিবর্তিত হচ্ছে মাস ও বছরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং তারিখ, বার, মাস ও বছরই চলমান রাশি হয়ে সময়ের হিসাবে একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ লোকের সঙ্গে কোনও একটা অতীত দিনে কোন মাসের কী বার ছিল কিংবা কোনও মাসের কোনও বারে কত তারিখ ছিল কিংবা কোনও একটি বছরের কোনও একটা মাসের কোনও একটা বারে কত তারিখ ছিল, তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে যদি না হাতের কাছে একটা বর্ষপঞ্জী থেকে থাকে। এই সব অসুবিধা দূর করতে নানা রকমের বর্ষপঞ্জীর প্রস্তাব করা হয়েছে, যেগুলির প্রত্যেকটিই সাধারণের নিকট সহজবোধ্য এবং দিন, বার, তারিখ প্রভৃতির হিসাব করতে হাতের কাছে কোনও পঞ্জিকার দরকার হবে না। খুব চালু একটা প্রবাদ বাক্য আছে, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কবে,' অর্থাৎ হাতের কাছে পাঁজি বা পঞ্জিকা থাকলে কবে বা কত তারিখে কোনও মঙ্গলবার আসবে, তা জানার অসুবিধা থাকে না। এই প্রবচন অবশ্য কোনও প্রসঙ্গের লিখিত বিবরণ হাতের কাছে থাকলে তার নির্ধারণ মৌখিক আলোচনায় না করে ঐ লিখিত বিবরণ থেকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, এই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত বর্ষপঞ্জীগুলির গঠনশৈলী এমনই যে হাতের কাছে কোনও পঞ্জিকা ছাড়াই কোনও বার, দিন বা তারিখ সহজেই বের করা সম্ভব হবে। এমনকি সাধারণ লোকেরাও তা পারবে। এইসব প্রস্তাবিত পঞ্জিকাগুলির মধ্যে দুটি খুবই উচ্চপ্রশংসিত। এই দুটি পঞ্জিকার একটি হলো 'স্থির পঞ্জিকা' (Fixed Calendar), অন্যটি হলো 'বিশ্বজনীন পঞ্জিকা' (Universal Calendar)। দুটোতেই বছর ধরা হয়েছে 364 দিনের। 365তম দিনটিকে রাখা হয়েছে অলিখিত হিসাব বহির্ভূত দিন হিসাবে এবং তা কোনওভাবে গণনায় আসবে না। কেবল সে দিনটা হবে একটা 'আন্তর্জাতিক ছুটির দিন' (International Holiday)। সারা পৃথিবীতে দিনটি ছুটির দিন হিসাবে পালিত হবে। প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ অধিবর্ষে এমনি দুটো অলিখিত দিন থাকবে এবং দুটো দিনই অর্থাৎ 365তম ও 366তম দিন দুটি হবে আন্তর্জাতিক ছুটির দিন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ অবশ্য সারা পৃথিবী জুড়ে এই দুটি প্রস্তাবিত পঞ্জিকার যেকোনও একটি চালু করতে পারেন। এই ধরনের পঞ্জিকা ব্যবহারিক জীবনে চালু করা হলে সাধারণ মানুষের দিন, মাস, বছরের হিসাব অনেক সহজসাধ্য হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও জটিল অঙ্ক কষার হাত থেকেই রেহাই পাওয়া যাবে।

তবে এই দুটি পঞ্জিকারই কিছু কিছু বাস্তব অসুবিধা আছে। স্থির পঞ্জিকায় প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মাস হবে 28 দিন বা চার সপ্তাহের এবং এরকম 13টি মাসে হবে একটি বছর। বছরের মোট দিন সংখ্যা হবে 364টি। 13টি মাস একই রকম হবে, একই দিনে আরম্ভ হয়ে শেষ হবে একই দিনে। এই পঞ্জিকা সরল হলেও এর বিপক্ষে আপত্তি অনেকগুলি। প্রথমতঃ অনেকে মাসকে ছোট করার বিপক্ষে, দ্বিতীয়তঃ 13টি মাস নিয়ে অনেকের আপত্তি। একেই তো 13 সংখ্যাটি অপয়া বলে অনেকের ধারণা, তার উপর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ও নাবিকরা সংখ্যাটিকে নিয়ে তাঁদের অঙ্কে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও নাবিকরা 13টি মাসযুক্ত পঞ্জিকা ব্যবহারে একেবারেই অনিচ্ছুক। তাঁদের অঙ্কের জন্য 12 সংখ্যাটিই যথেষ্ট সুবিধাজনক। কারণ 24 ঘণ্টার দিন, 30 দিনের মাস ইত্যাদির সঙ্গে 12 সংখ্যাটিই বেশ খাপ খেয়ে যায়। ফলে, পৃথিবী জুড়ে এই পঞ্জিকা চালু করার বিপক্ষে অনেকেই। তাছাড়া 365তম

দিনটি হিসাবে মধ্যে না থাকায় ঐতিহাসিক ঘটনার কাল নিরূপণ করা নিয়ে যথেষ্ট গোলমাল হবে ওই পদ্ধতির পঞ্জিকায়।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পঞ্জিকাটি একটু অন্য ধরনের। এতে 12টি মাসের সংস্থান থাকছে এবং বছর হচ্ছে 52 সপ্তাহের বা 364 দিনের। বছরকে চারটি সমান ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগে তিনটি মাস, তিন মাসে 91 দিন বা 13টি সপ্তাহ রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিশ্ব পঞ্জিকার রূপরেখা হবে এই রকম।

	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
জানুয়ারী	1	2	3	4	5	6	7
এপ্রিল	8	9	10	11	12	13	14
জুলাই	15	16	17	18	19	20	21
অক্টোবর	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
ফেব্রুয়ারী				1	2	3	4
মে	5	6	7	8	9	10	11
আগস্ট	12	13	14	15	16	17	18
নভেম্বর	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		
মার্চ						1	2
জুন	3	4	5	6	7	8	9
সেপ্টেম্বর	10	11	12	13	14	15	16
ডিসেম্বর	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30

এই পঞ্জিকায় বছরের শুরু হবে 1লা জানুয়ারী রবিবার। মাসগুলি তিন শ্রেণীর। চারটি শুরু হচ্ছে রবিবার, চারটি বুধবার ও অন্য চারটি শুক্রবার। আর বছর শেষ হচ্ছে সবসময়েই শনিবার 30শে ডিসেম্বর। এই পঞ্জিকায় অনেকগুলি সুবিধা থাকলেও অসুবিধাও আছে বেশ কিছু। এক নম্বর হলো 365তম বা 366তম দিনের হিসাব না থাকায় কোনও ঘটনার দিন মাস বছর সঠিকভাবে বলা মুশকিল হয়ে পড়বে। তাছাড়া বিমানকর্মী ও যাত্রীরা মুশকিলে পড়বেন দিনের হিসাব করতে গিয়ে। তাদের আরও মুশকিল হবে আন্তর্জাতিক দিন রেখা অতিক্রম করার পরে। এসব অসুবিধা কোনওভাবে দূর করা গেলেও খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আপত্তি হবে তাদের ইস্টার উৎসব 22শেষ মার্চ থেকে 25শে এপ্রিল অবধি দিনগুলির মধ্যে যে কোন দিন পড়বে। এই অসুবিধা দূর করা যায় যদি খ্রিস্টানরা ইস্টারের রবিবার হিসাবে এপ্রিলের প্রথম রবিবারটাকে নির্দিষ্ট করে নেন।

গীর্জা পঞ্জিকা [Church Calendar]

খ্রিষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস এবং তার পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদির জন্য সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক ধরনের পঞ্জিকা তৈরি করা হয়েছে যার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের এবং গীর্জাগুলির নিবিড় সংযোগ। এই পঞ্জিকা হ'ল গির্জা-পঞ্জিকা বা Church Calendar। সারা পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রার্থনা-

পূজা-পাঠ, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সময় ও কাল একটা নির্দিষ্ট নিয়মানুগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের সৃষ্টি। হিন্দুরা যেমন বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাদের পূজা-পার্বণ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে পঞ্জিকার নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করে রেখেছে, মুসলমানেরা যেমন তাদের প্রার্থনা উৎসব-অনুষ্ঠান তাদের পঞ্জিকার নির্দিষ্ট দিন ও সময় অনুসারে পালন করে, তেমনিভাবে খ্রিস্টানদের জন্য তৈরি করা হয়েছে গীর্জা পঞ্জিকা। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় জীবন, পূজা-পাঠ-প্রার্থনা ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই পঞ্জিকায়। প্রাচীনকালেই চান্দ্র ও সৌর তিথিকে ভিত্তি করে উৎসবের বা আচার-অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। গীর্জা পঞ্জিকায় খ্রিস্টধর্মের অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানকে ওই সব পৌত্তলিক পূজা পার্বণের দিনে নির্দিষ্ট করা হলো। উদ্দেশ্য হলো খ্রিস্টধর্মের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। সুতরাং গীর্জা পঞ্জিকার অনেকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন খ্রিস্টপূর্ব পৌত্তলিকদের পূজা-পার্বণের দিনের সঙ্গে এক হয়ে গেল। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে যেমন ধর্মগ্রন্থ, তেমনি ইহুদীরাও তাকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মেনে চলে। এই কারণে প্রাথমিক অবস্থায় গীর্জপঞ্জিকা তৈরি হয়েছিলো হিব্রু বা ইহুদীদের ব্যবহৃত ক্যালেন্ডার থেকে। হিব্রুদের সপ্তাহের সপ্তম দিনটি হলো 'স্যাবাথ' [Sabbath] বা বিশ্রামের দিন। ওই দিন ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির পর বিশ্রাম করেছিলেন বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করে। এই দিন হিব্রু তথা ইহুদীদের কর্মবিরতির দিন এবং উৎসবের দিনও বটে। তেমনি হিব্রুদের আরেকটা উৎসবের দিন আছে যেটা খুবই বিখ্যাত। তার নাম হলো 'Passover Festival'। মিশরীয়দের দাসত্ব বন্ধন হতে ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি পাওয়া উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসরই একটা নির্দিষ্ট দিনে এই পর্ব বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দিনটা হলো বাসন্তী বিষুবে সূর্যের সংক্রান্তির পরে পরেই যে পূর্ণিমা হয় সেই দিন। এই দুটো দিনকে ধরেই গীর্জা পঞ্জিকার প্রথম গোড়াপত্তন হয়। ওই 'Passover' পরবের সময়েই যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন এবং তিন দিনের দিন তাঁর পুনরুত্থান ঘটে। ফলে ইস্টার [Easter] উৎসব হিব্রু ক্যালেন্ডারের ওই Passover পরবের সময় অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের কর্মবিরতির দিন নির্দিষ্ট করে রবিবার। ফলে ইহুদীদের কাছে শনিবার পবিত্র হলেও খ্রিস্টানদের কাছে তা হলো রবিবার। রবিবার হলো সপ্তাহের প্রথম দিন এবং ইস্টার রবিবার হলো যীশুর পুনরুত্থানের দিন। দিনটি হলো Lord's Day-খ্রিস্টানদের নতুন নিয়মে।

Passover উৎসবের মতই ইস্টার উৎসবের কোনও নির্দিষ্ট দিন ছিল না। কারণ মহাবিষুব সংক্রান্তির ঠিক পরের পূর্ণিমা 22শে মার্চ থেকে 25শে এপ্রিলের মধ্যে যে কোনও দিন পড়তো। ইস্টার উৎসবের অবস্থাও হলো তাই। এখনও ইস্টার এগোয় পিছোয় তবে তা এপ্রিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাথমিক গীর্জা পঞ্জিকায় এই দুটি উৎসবকে মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট করা হলো। এছাড়া আরও দুটি উৎসব যোগ করা হলো পঞ্জিকায়। উৎসব দুটি হলো Pentecost ও Epiphany। Pentecost হলো Whit-sunday। পেন্টিকস্ট মূলতঃ ইহুদী পর্ববিশেষ। Passover উৎসবের ঠিক 50দিনের দিন এটা অনুষ্ঠিত হতো। খ্রিস্টানরা এর নতুন নামকরণ করলো Whitsunday হিসাবে। দিনটা নির্দিষ্ট হলো ইস্টারের পরবর্তী সপ্তম রবিবার। এই উৎসব চলে এক সপ্তাহ ধরে। আর Epiphany উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 6ই জানুয়ারী। যীশুর জন্মদিন 1লা জানুয়ারী ধরে 6ই জানুয়ারী বেথলেহেমে শিশু যীশুর কাছে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানীদের আগমন ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। সেই ঘটনার স্মরণে আজও Epiphany উৎসব 6ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। যীশু ঠিক কবে জন্মেছিলেন তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। একদলের মতে তাঁর জন্ম হয় 25শে ডিসেম্বর, অন্য দল মনে করেন তিনি জন্মেছিলেন 1লা জানুয়ারী। যাই হোক, Pentecost ও Epiphany উৎসব দুটি গীর্জা ক্যালেন্ডার স্থান পেল।

রোমক পঞ্জিকায় নানা সাধুসন্তের জন্মদিন, রাজা-রাজড়ার জন্মদিন ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা থাকতো। জুলিয়ান সংস্কারের পরেও সেগুলি যথারীতি চালু ছিল। ফলে গীর্জা পঞ্জিকা তখন সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। এমনকি রোমকরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হওয়ার পরও গীর্জা পঞ্জিকার বিশেষ কোনও পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। 325 খ্রিস্টাব্দে Nicaea-তে কাউন্সিল বসে। তারা অবশ্য জুলিয়ান সংস্কারের ভুল সংশোধন করে। গীর্জা পঞ্জিকা সম্পর্কে তারা কেবল এইটুকু সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইস্টার পরবের পুনরুত্থানের দিনটি যেন রবিবারই হয় প্রত্যেক বছর। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ধর্মযাজক 'ডেনিস লা পেটিট' [Danys Le Petit] প্রথম খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তনের দাবী তোলেন এবং তিনি প্রথম বলেন যে, যীশুর জন্মদিন 25শে ডিসেম্বর। এরপর 30শে নভেম্বর থেকে 25শে ডিসেম্বর অবধি Advent Season উৎসব বা অনুষ্ঠান চালু হয় এবং চালু হয় খ্রিস্টমাস উৎসব। এইভাবে গীর্জা পঞ্জিকায় ধীরে ধীরে বিভিন্ন খ্রিস্টধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান স্থান পেতে থাকে। গীর্জা বর্ষপঞ্জীতে এখনকার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনগুলি হলো ঃ

(1) Advent Season : এই সময়টা হলো St. Andrew's Day-র কাছাকাছি রবিবার থেকে খ্রিস্টমাস অবধি সময়। মোটামুটি 30শে নভেম্বর থেকে 25শে ডিসেম্বর অবধি যতটা সময় ততটা।

(2) কুমারী মেরীর গর্ভাধান ঃ [Immaculate Conception of Virgin Mary] ৪ই ডিসেম্বর এবং জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে দিনটি 21শে ডিসেম্বর। তবে ওই দিনটিও গোলমেলে। কারণ ৪ই ডিসেম্বর গর্ভাধান হয়ে 25শে ডিসেম্বর সাধারণতঃ সন্তান প্রসব করার কথা নয়। গর্ভধারণের মোটামুটি 270 দিনের পর সন্তান প্রসব করার কথা। সে অনুসারে যীশুর জন্ম হওয়ার কথা সেপ্টেম্বরে, ডিসেম্বরে কোনও মতে নয়। ৪ই ডিসেম্বর গর্ভধারণ হয়ে যীশুকে মোট একবছর আঠারো দিন মাতৃজঠরে থাকতে হয়েছিলো এটা মানতে হবে, যদি পরের বছর 25শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়েছিলো এটা মেনে নেওয়া হয়। এটা কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ এবং অসম্ভবও বটে। এক বছর আঠারো দিন মাতৃজঠরে থাকাটা অবান্তর মাত্র। অনেক পঞ্জিকায় 25শে মার্চকে 'Lady Day' বলা হয়েছে। ওই দিন নাকি দেবদূত গাব্রিয়েল ঘোষণা করেছিলেন যে, কুমারী মেরী যীশুখ্রিস্টের মা হচ্ছেন। এই 25শে মার্চকেই বরং যুক্তিসঙ্গতভাবে কুমারী মেরীর গর্ভাধান দিবস বলে ধরা যেতে পারে।

(3) খ্রিস্টমাস কাল ঃ [Chiristmas Season] খ্রিস্টমাস [25শে ডিসেম্বর] থেকে 13ই জানুয়ারী।

(4) খ্রিস্টমাস [Christmas] ঃ 25শে ডিসেম্বর [7ই জানুয়ারী জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মতে]

(5) সুন্নৎ করণের ভোজ ঃ [Feast of Circumcision] 1লা জানুয়ারী [জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে 14ই জানুয়ারী]

(6) Epiphany ঃ 6ই জানুয়ারী। [জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে 19ই জানুয়ারী]

(7) Septuagesima Sunday ঃ ইস্টারের নয় সপ্তাহ আগের রবিবার

(8) Lenten Season ঃ Ash Wednesday থেকে ইস্টার পর্যন্ত চল্লিশ দিন। Ash Wednesday হলো ইস্টারের চল্লিশ দিন আগের বুধবার।

(9) গাব্রিয়েলের ঘোষণা দিবস [Annunciation Day] : 25শে মার্চ

(10) পবিত্র সপ্তাহ : [Holy Week] Palm Sunday থেকে ইস্টার অবধি দিনগুলি এই সপ্তাহের অন্তর্গত। Palm Sunday হলো ইস্টারের অব্যবহিত পূর্বের রবিবার।

(11) Good Friday : ইস্টারের পূর্বের শুক্রবার য়িশু ক্রুশবিদ্ধ হন।

(12) Easter Season : ইস্টার থেকে স্বর্গারোহণের দিন অবধি সময়।

(13) Easter Sunday : 21শে মার্চের পরের পূর্ণিমার পরবর্তী বা ওই দিনের রবিবার।

(14) Ascenssion Day : যীশুর স্বর্গারোহণের দিন। ইস্টারের চল্লিশ দিন পরের বৃহস্পতিবার।

(15) Pentecost Day : বা Whitsunday ইস্টারের পঞ্চাশ দিন পরের রবিবার।

(16) Trinity Sunday : পেন্‌টিকসট রবিবারের পরের রবিবার।

(17) Corpus Christi : Trinity রবিবারের ঠিক পরের বৃহস্পতিবার।

(18) যীশুমাতা মেরীকে স্বর্গে গ্রহণ উপলক্ষ্যে পর্ব ও তৎসংক্রান্ত ভোজ [Assumption of the Virgin Mary] 15ই আগস্ট বা জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের 28শে আগস্ট।

(19) All Saints' Day : 1লা নভেম্বর।

(20) All Souls' Day : 2রা নভেম্বর।

গীর্জা পঞ্জিকায় এই সব পরবের অনুষ্ঠানের দিনগুলি ছাড়া আরও অনেক অনুষ্ঠানের দিন সংযোজিত হয়েছে। রোমান ক্যাথলিকদের ক্যালেন্ডার আরও অনেক বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। তাতে আরও অনেক পরব বা উৎসব-অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। লুথেরীয় গীর্জাগুলির ক্যালেন্ডারেও আরো কিছুদিন সাধু সন্তের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে সব গীর্জা পঞ্জিকাতেই উপরোক্ত কুড়িটি উৎসবের দিন বা কাল একই রকমভাবে নির্দিষ্ট। ইস্টার উৎসব এবং তার সঙ্গে জড়িত উৎসব অনুষ্ঠানগুলির বার নির্দিষ্ট থাকলেও তারিখের কিছুটা হেরফের হয় স্বাভাবিক কারণেই।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সংস্কার করলেন পোপ গ্রেগরী [Pope Gregory XIII] 1582 খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু গীর্জাগুলি 1924 সাল অবধি পুরানো জুলিয়ান পঞ্জিকাই আঁকড়ে ধরে থাকলো। ইংল্যান্ড 1752 এবং জার্মানী 1765 খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরীয় পঞ্জিকা অনুসরণ করতে শুরু করলেও গীর্জার পঞ্জিকার কোনও হেরফের হলো না বহুদিন। সেগুলি পুরাতন জুলিয়ান পঞ্জিকাই অনুসরণ করতে থাকে। প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জাগুলি তাদের নিজস্ব পঞ্জিকা চালু রাখে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রেগরীয় পঞ্জিকার অনুসরণে মোটামুটিভাবে সকলের গ্রহণযোগ্য গীর্জা পঞ্জিকা চালু করা হয়। 'Relations Sunday' কিংবা ' World Day of Prayer' ইত্যাদি নাম দিয়ে কিছু দিন নতুন করে নির্দিষ্ট করা হয় গীর্জা পঞ্জিকায়।। এখন পৃথিবীর প্রায় সব খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা মোটামুটিভাবে একই ধরনের গীর্জা পঞ্জিকা অনুসরণ করে।

গ্রেগরীয় পঞ্জিকা প্রায় নিখুঁত ও নির্ভুল হলেও কিছু কিছু অসুবিধা এতেও আছে। বিশ্বজনীন পঞ্জিকার যে প্রস্তাব নিয়ে কিছু আগে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে হয়তো ওই অসুবিধাগুলি দূর হতে পারে। বহু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এখন এই ধরনের পঞ্জিকা চালু করার পক্ষপাতী। এই ধরনের পঞ্জিকার বিপক্ষে খ্রিস্টানদের আপত্তি হলো ইস্টার উৎসব 22শে মার্চ থেকে 25শে এপ্রিলের মধ্যে যে কোনদিন পড়বে। এই অসুবিধাগুলি দূর করা যায় যদি খ্রিস্টানরা এপ্রিলের প্রথম রবিবারকে ইস্টারের রবিবার বলে মেনে নেয়। এর স্বপক্ষে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জনমত আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে।

সম্বত পঞ্জিকা

ভারতবর্ষে প্রচলিত সম্বত পঞ্জিকা মোটামুটি তিন রকমের। এক, বিক্রম সম্বত, দুই, গুজরাটি সম্বত এবং অপরটি হলো পাঞ্জাবী সম্বত। খ্রিস্টের জন্মের 56 বছর আগে এই পঞ্জিকা চালু করা হয়। প্রথমে এই পঞ্জিকা পুরোপুরি চান্দ্র পঞ্জিকাই ছিল। পরবর্তীকালে এর চান্দ্রমাসগুলির সঙ্গে প্রতি তিন বৎসরে একটি অধিক চান্দ্রমাস যোগ করে এই চান্দ্র সম্বত পঞ্জিকার সঙ্গে সৌর পঞ্জিকার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। ফলে এই পঞ্জিকা হয়ে ওঠে চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা [Luni-Solar Calendar]। বলা হয়, 'বিক্রম সম্বত' সাল চালু করেছিলেন বিক্রমাদিত্য নামের এক রাজা। তাঁর চালু করা সম্বত সাল তাই বিক্রম সম্বত নামে পরিচিত। গুজরাটি সম্বত ও পাঞ্জাবী সম্বত বিক্রম সম্বত পঞ্জিকারই সামান্য পরিবর্তিত রূপ। বিক্রম সম্বত এখন চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা হলেও পাঞ্জাবী সম্বত পুরোপুরি সৌর পঞ্জিকা। তবে গুজরাটি সম্বত পঞ্জিকা বিক্রম সম্বতের মতই চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা।

বিক্রম সম্বতের বর্ষ আরম্ভ হয় চৈত্র মাসে, গুজরাটি সম্বতের কার্তিক মাসে দীপাবলীর সময় থেকে, আর পাঞ্জাবী সম্বতের মোটামুটি বৈশাখের প্রথম দিন থেকে বর্ষ শুরু হয়। পাঞ্জাবী সম্বতের বর্ষ শুরুর দিন মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকলেও বিক্রম সম্বত ও গুজরাটি সম্বতে বর্ষ শুরুর দিন এগারো দিন করে এগিয়ে যায় এবং প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি অধিমাস যোগ হওয়ার ফলে বর্ষ আরম্ভের দিন যথাস্থানে ফিরে আসে। ইংরেজী 1985, 1986, 1987, 1988 খ্রিস্টাব্দে সম্বত সালগুলির আরম্ভের দিন কী রকম ছিল তা নীচে দেখানো হল ঃ

সম্বত সনেব নাম	কোন সালের বা অব্দের শুরু	ইংরেজী খ্রিস্টাব্দের কবে তা শুরু হলো
1) বিক্রম সম্বত	2042 অব্দ	22শে মার্চ,1985
	2043 অব্দ	10ই এপ্রিল, 1986
	2044 অব্দ	30শে মার্চ, 1987
	2045 অব্দ	18ই মার্চ, 1988
2) গুজরাটি সম্বত	2042 অব্দ	13ই নভেম্বর ,1985
	2043 অব্দ	3রা নভেম্বর, 1986
	2044 অব্দ	23শে অক্টোবর্র, 1987
	2045 অব্দ	10ই নভেম্বর, 1988
3) পাঞ্জাবী সম্বত	2042 অব্দ	13ই এপ্রিল ,1985
	2043 অব্দ	13ই এপ্রিল, 1986
	2044 অব্দ	14ই এপ্রিল , 1987
	2045 অব্দ	13ই এপ্রিল , 1988

বিক্রম সম্বত বিক্রমাদিত্য নামের রাজা চালু করেছিলেন বলে মনে করা হয়। চালু করা হয়েছিলো বৈদিক যুগের বহু পরে এবং রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগের সময়। ঠিক কোন্ বিক্রমাদিত্যের সময় এটা চালু হয়েছিলো তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। খ্রিস্টের জন্মের পরে গুপ্তযুগে আমরা এক বিক্রমাদিত্যের কথা ঐতিহাসিকভাবে জানি। কিন্তু সেই বিক্রমাদিত্য এই বিক্রম সম্বতের প্রবর্তক কিনা তা বিতর্কিত বিষয়। তবে বিক্রমাদিত্য নামটি সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত পরিচিত। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম, রণকুশলতা, রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁকে আদর্শ রাজা বলে মনে করা হয়। কিন্তু নানা অদ্ভুত কিম্বদন্তী ও উপাখ্যান রাজা বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে বিক্রমাদিত্য একজন না অনেকজন ছিলেন এবং কোন্ সময়ে বা কোন্ কোন্ সময়ে রাজত্ব করতেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। এছাড়া ঠিক কোন্ বিক্রমাদিত্য বিক্রম সম্বত চালু করেছিলেন তা বলা মুশকিল। ঐতিহাসিকভাবে আমরা গুপ্তযুগের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বিক্রমাদিত্য বলে জানি এবং তাঁর রাজত্বকাল ছিল 4র্থ বা 5ম শতাব্দীতে।

বিক্রমাদিত্য নিজে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বলে মনে করা হয়, তেমনি অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তিনি। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বুধমণ্ডলী এঁর সময় রাজসভা আলো করে থাকতেন। রাজদত্ত বৃত্তি ভোগ করে তাঁরা নিরন্তর বিদ্যালোচনায় মত্ত থাকতেন। এই সভা হলো সেই বিখ্যাত 'নবরত্ন' সভা। কালিদাস ইত্যাদি সে যুগের নয়জন পণ্ডিত ছিলেন এই সভার এক একটি রত্ন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে এই নবরত্নের যে সব নাম আমরা জানি সেগুলির অনেকগুলিই ঠিক নয়। এঁদের মতে অমরসিংহের লেখা অমরকোষের ভাষা দেখে মনে হয় এটা নবম বা দশম শতাব্দীর লেখা, আবার কালিদাসের লেখা দেখে মনে হয় তা প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তারও কিছু আগের লেখা। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, বিক্রমাদিত্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, উপাধিমাত্র। ভারতের অনেক রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই এই উপাধি ধারণ করতেন। তবে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য মহান নৃপতি ছিলেন বলেই তাঁর নাম স্মরণীয় করবার জন্য দেশের যা কিছু ভাল ও গৌরবের বিষয় তার প্রায় সবগুলিই এই বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। লোকে মনে করে ওই উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যই এই সব ভাল ও গৌরবজনক কাজ করেছেন।

বিক্রম সম্বত চালু করা হয়েছে বিক্রমাদিত্যের নামে। খ্রিস্টপূর্ব 56 অব্দ হতে এই বিক্রম সম্বত আরম্ভ করা হয়েছে। ওই বছর উনি হূণ বা শক জাতিকে পরাভূত করে নিজের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। তারপর 'শকারি' এই উপাধি গ্রহণ করে নিজের নামে বিক্রম সম্বত চালু করেন। এ নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকে মনে করেন শকজাতির সম্পূর্ণ পরাভব হয়েছিলো উজ্জয়িনীরাজ যশোধর্মদেবের হাতে। সম্ভবতঃ এই বিক্রমাদিত্য ও যশোধর্মদেব একই ব্যক্তি। যশোধর্মদেব বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিক্রমাদিত্য তাঁর সময়ে যে 'মালবাব্দ' নামে একটি অব্দ বা সাল প্রচলিত ছিল তারই নামকরণ করেন বিক্রম সম্বত। অর্থাৎ যশোধর্মদেব শকজাতিকে পরাস্ত করে নিজে শকারি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালে প্রচলিত মালবাব্দের নাম রেখেছিলেন বিক্রম সম্বত। মালবাব্দ শুরু হয়েছিলো খ্রিস্ট জন্মের 56 বছর আগেই। কিন্তু এই মালবাব্দ কীভাবে চালু হয়েছিলো বা কে এর প্রচলন করেছিলো তা জানা যায়নি।

আবার বিক্রমাদিত্য সংক্রান্ত উপাখ্যান ও কাহিনী এই 'বিক্রমাদিত্য' যশোধর্মদেবের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ওই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কথা জড়িয়ে আছে। এঁর রাজ্যের নাম ছিল অবন্তী এবং রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী। যশোধর্মদেব উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন ঠিকই কিন্তু উপরোক্ত কল্পকাহিনী কিংবা অর্ধসত্য কাহিনীগুলি তাঁর জীবনের সঙ্গে মিল খায় না। তাছাড়া

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ব্যাপারটাও যশোধর্মদেবের সমসাময়িক নয়। যাই হোক, কোন এক বিক্রমাদিত্য বিক্রম সম্বত চালু করেছিলেন। বর্তমানেও তা চালু আছে। এটি শুরুতে চান্দ্র পঞ্জিকা ছিল, পরবর্তীকালে চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা হয়েছে। গুজরাট এখন যে পঞ্জিকা ব্যবহার করে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে তা হলো এই চান্দ্র-সৌর সম্বত পঞ্জিকা। আর পাঞ্জাব যে সম্বত পঞ্জিকা অনুসরণ করে তা পুরোপুরি সৌর পঞ্জিকা।

এই বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন হলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের সেরা জ্যোতির্বিদ আচার্য বরাহদেব। কথিত আছে এই বরাহদেবের পুত্র হলেন মিহির এবং মিহিরের স্ত্রী ছিলেন সিংহল রাজকন্যা 'ক্ষণা' বা 'খনা'। ক্ষণা শ্বশুর বরাহদেবের চেয়েও ফলিত জ্যোতিষে অত্যন্ত পারদর্শিনী হয়ে উঠলে তাঁর জিহ্বা ছেদ করা হয়। এই ক্ষণা বা খনাই নাকি 'খনার বচন'-এর স্রষ্টা। তবে এই ঘটনা কিংবদন্তীমাত্র। প্রকৃত পক্ষে, বরাহমিহির একই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম মিহির এবং উপাধি হলো 'বরাহ'। যেহেতু এই বিক্রমাদিত্যের জাতীয় প্রতীক ছিল বন্যবরাহের মুখ এবং বরাহ উপাধিও নাকি তিনি দিতেন তাঁর রাজ্যের সেরা পণ্ডিতদের, তাই মিহির হয়েছিলেন বরাহমিহির। নবরত্নের অতি পরিচিত নামগুলি হলো ধন্বন্তরি, ঘটকর্পর, বররুচি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বেতালভট্ট, শঙ্কু, কালিদাস ও বরাহমিহির। খনার বচন বলে যে সব উদ্ধৃতির কথা আমরা জানি তা কোনও বাঙালীরই রচনা। তিনি পুরুষ ছিলেন বা নারী ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায়। মনে করা হয়, খনার বচনের খনা মোটামুটি 250 বছর আগে এই বাঙলারই অধিবাসী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের বরাহমিহিরের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না, কোনওভাবেই থাকবার কথাও নয়।

'আইন-ই-আকবরী'র মতে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন অধিরোহণের দিন থেকে যে সাল গণনা করা হয় তা হলো বিক্রম সম্বত। আবুল ফজল যে সময় আইন-ই-আকবরী রচনা করেছিলেন সে সময় বিক্রম সম্বতের 1652 সাল চলছিল। আইন-ই-আকবরী বলছে, "শোনা যায় শালিবাহন বিক্রমজিতকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করেন এবং তাঁর কী প্রার্থনা আছে নিবেদন করতে বললে, বিক্রমজিত বলেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাল যেন রহিত করা না হয়। শালিবাহন তাঁর প্রস্তাব মেনে নেন। তবে তিনি নিজেও একটি নতুন সালের প্রবর্তন করেন তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিনটি থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, এই শালিবাহনের বৎসর গণনা 18 হাজার বৎসর পর্যন্ত চালু থাকবে। পরে রাজা বিজয়বর্ধন নতুন গণনার ব্যবস্থা করবেন। পরে নাগার্জুন এসে নতুন গণনার ব্যবস্থা করবেন। নাগার্জুনের গণনা চার লক্ষ বৎসর প্রচলিত থাকবে। পরে কল্কী অবতার আসবেন।" আইন-ই-আকবরীর মতে বিক্রম সম্বতের যখন 1652 সাল ছিল তখন শালিবাহন প্রবর্তিত সালের ছিল 1517 বৎসর। অর্থাৎ পার্থক্য ছিল 135 বৎসর। শালিবাহনের প্রবর্তিত ওই সাল শকাব্দ হলেও হতে পারে। কারণ বিক্রম সম্বতের সঙ্গে শকাব্দের পার্থক্য ঠিক 135 বৎসরের।

শকাব্দ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করতেন শকবংশীয় রাজা কণিষ্ক বা কণীষ্ক। এঁরই প্রস্তরমূর্তির ছবি আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখি। ওই মূর্তির মুণ্ডুটা আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। শক জাতির আদি নিবাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। হিন্দুরা এই প্রদেশকে বলতো 'শাকদ্বীপ'। ওই শাকদ্বীপের অধিবাসীদের বলা হতো 'শক'। শকরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে মাঝে মাঝে হানা দিত এবং

লুঠতরাজ করতো। কণিষ্কই প্রথম উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশাল শকরাজ্য গড়ে তোলেন। এঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমানের পেশোয়ার। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এঁর সময়েই বৌদ্ধগণের চতুর্থ ও শেষ 'সঙ্গীতি' আহূত হয় এবং 'মহাযান' নাম দিয়ে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করা হয়। এর থেকেই পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই কণিষ্কই তাঁর রাজত্বকালে যে সাল বা অব্দ প্রচলিত করেন তাই 'শকাব্দ' নামে পরিচিত। প্রথম শকাব্দ শুরু হয় 78 খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এ নিয়েও অবশ্য মতভেদ আছে। তবে 78 খ্রিস্টাব্দেই শকাব্দ চালু হয়েছিল এটা নিশ্চিত।

অনেকের মতে মহারাষ্ট্রের এক রাজা ছিলেন যাঁর নাম শালিবাহন। এই শালিবাহন নাকি বিক্রমাদিত্যকে পরাস্ত করেন এবং তাঁকে হত্যা করে রাজত্ব লাভ করেন। ইনি শক জাতিকেও পরাজিত ও বিতাড়িত করে 'শকাব্দ' নামে এক নতুন সালের প্রবর্তন করেন। সেই থেকে ভারতবর্ষে শকাব্দ চালু হয়।

ভারতবর্ষে প্রচলিত শকাব্দ এখন তিন রকমের যদিও সবগুলি একই সন বা অব্দ নির্দেশ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় পঞ্জিকা [National Calendar] চালু করা হয়। এই পঞ্জিকার সাল বা অব্দ শকাব্দে গণনা করা হয়। তবে বর্ষশুরুর দিন হলো বাংলা পঞ্জিকার 7ই চৈত্র। মহাবিষুব সংক্রান্তি হয় 21শে মার্চ। তাই এই জাতীয় পঞ্জিকার বর্ষশুরুর দিন হলো 22শে মার্চ অর্থাৎ সায়নমতে সূর্যের মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিন। অধিবর্ষে ফেব্রুয়ারীর একটা দিন বাড়ে বলে সে বছর 21শে মার্চই পঞ্জিকার বর্ষশুরু হয়। সুতরাং আধুনিক জাতীয় পঞ্জিকায় শকাব্দই ব্যবহৃত, কেবল বর্ষশুরুর দিনটা কিছুটা বিজ্ঞানভিত্তিক করে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শকাব্দের দু'ধরনের পঞ্জিকা আছে। একটি হলো চান্দ্র শকাব্দ এবং অন্যটি সৌর শকাব্দ পঞ্জিকা। চান্দ্র শকাব্দে বর্ষ আরম্ভের দিন যথানিয়ম প্রতিবছর 11দিন করে এগিয়ে যায় এবং প্রতি তিন বছরে একটি অতিরিক্ত মাস যোগের ফলে আবার তা স্বস্থানে আসে। চার বছরের শকাব্দ পঞ্জিকায় বর্ষ আরম্ভের দিন নিচে দেওয়া হলো [1985-1988 খ্রিস্টাব্দ]ঃ

পঞ্জিকার নাম*	কোন সাল বা অব্দের শুরু	ইংরেজী তারিখে শুরুর দিন ও খ্রিস্টাব্দ
1) ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকা	1907	22শে মার্চ, 1985
	1908	22শে মার্চ, 1986
	1909	22শে মার্চ, 1987
	1910	21শে মার্চ, 1988
2) শকাব্দ [চান্দ্র]	1907	22শে মার্চ, 1985
	1908	10 এপ্রিল, 1986
	1909	30শে মার্চ, 1987
	1910	18ই মার্চ, 1988
3) শকাব্দ [সৌর]	1907	13-14ই এপ্রিল, 1985
	1908	14-15ই এপ্রিল, 1986
	1909	14-15ই এপ্রিল, 1987
	1910	13-14ই এপ্রিল, 1988

ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকায় বর্ষ আরম্ভের দিন বা 21শে বা 22শে মার্চ। ওই দিন ওই পঞ্জিকার 1লা চৈত্র। বাংলা পঞ্জিকার 7ই বা 8ই চৈত্র। কারণ 22শে মার্চ কোন কোনও বছর বাংলার 8ই চৈত্রও পড়ে।

জাতীয় পঞ্জিকায় মহাবিষুব বা বাসন্তী বিষুব সংক্রান্তির দিন ধরা হয়েছে সায়ন বা পাশ্চাত্য মতে। অয়নগতির ফলে সূর্য এখন মহাবিষুব বা বাসন্তী বিষুব বিন্দুতে উপস্থিত হয় 21শে মার্চ। তারই পরেরদিন শুরু হয় ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকার নববর্ষ। এই পঞ্জিকা এখন সরকারী কাজে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে, বহুল ব্যবহৃত হলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বিভিন্ন ধরনের পঞ্জিকা ব্যবহার করা হয়। যেমন, পাঞ্জাব ও গুজরাট তাদের নিজস্ব ধরনের সম্বত পঞ্জিকার ব্যবহার করে, যার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল বাংলা ও অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসরণ করে। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি অনুসরণ করে ফসলী পঞ্জিকা। দক্ষিণ ভারতে কোল্লাম পঞ্জিকা [Kollam Era] খুবই জনপ্রিয়। কেরালা এবং তামিলনাড়ুর দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে এই পঞ্জিকা কাজে লাগে। সুতরাং সরকারীভাবে শকাব্দ ভারতের জাতীয় পঞ্জিকা হিসাবে গৃহীত হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ তার নিজস্ব পঞ্জিকা আজও চালু রেখেছে। স্থানীয় পঞ্জিকার পাশাপাশি ইংরেজী গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারও ব্যবহৃত হচ্ছে যথারীতি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় পঞ্জিকা। শকাব্দের চেয়ে তাদের কদর অনেক বেশি।

ফসলী পঞ্জিকা

ভারতবর্ষে মোঘল আমলে হিজরী সন চালু করা হল। মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত সমস্ত অঞ্চলে তখন হিজরী পঞ্জিকায় সরকারী তথা দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম করা হতে থাকলো। এতে হিন্দুদের হলো মহা অসুবিধা। কারণ হিজরী পঞ্জিকা পুরোপুরি চান্দ্র পঞ্জিকা এবং এর পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের দিন সবই বছরে 11 দিন করে এগিয়ে যায়। 33 বছর পরে আবার আগেকার সময়ে ফিরে আসে। ফলে হিন্দুদের এই পঞ্জিকায় খুবই অসুবিধা হতে শুরু করল। 1556 খ্রিস্টাব্দের 14ই ফেব্রুয়ারী আকবর দিল্লীর সম্রাট হন। অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা আকবরের কাছে আবেদন জানালে সম্রাট আকবর 1556 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসেই হিজরী পঞ্জিকার পরিবর্তে উত্তর ভারতে যে পঞ্জিকা চালু করেন তা হল চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা। এ নিয়ে মতান্তরও আছে। কারণ সদ্য রাজা হওয়া তরুণ সম্রাটের পক্ষে এক-দেড় মাসের মধ্যেই পঞ্জিকা সংস্কার করে নতুন পঞ্জিকা চালু করা সম্ভব ছিল কি না, তা যথেষ্ট বিতর্কের বিষয়। অনেকে মনে করেন প্রাচীন কোনও হিন্দু নৃপতিই ফসলী সনের প্রবর্তক। এ নিয়ে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

ফসলী পঞ্জিকা মূলতঃ চান্দ্র পঞ্জিকা হলেও ওতে অধিমাসের সাহায্যে সৌরবর্ষের সঙ্গে চান্দ্র বর্ষের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। ফলে এই পঞ্জিকা এখন চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা। উত্তর ভারতে এক পাঞ্জাবকে বাদ দিয়ে সব প্রদেশেই ফসলী পঞ্জিকা চালু আছে। ফসলী পঞ্জিকার শুরু হয় আশ্বিন মাসে। এই পঞ্জিকায় আশ্বিন মাসের নাম আশ্বিন কুঁয়ার। চার বছর ধরে এই পঞ্জিকায় বর্ষ আরম্ভের দিনগুলি এই রকম ঃ

ফসলী পঞ্জিকার অব্দ বা সন	**ইংরেজী পঞ্জিকার যে দিন থেকে শুরু**
1393 সন	29শে সেপ্টেম্বর, 1985
1394 সন	19 শে সেপ্টেম্বর, 1986
1395 সন	8ই সেপ্টেম্বর, 1987
1396 সন	*26শে সেপ্টেম্বর, 1988*

1393 সনের বর্ষশুরুর দিন পড়েছিল 1985 খ্রিস্টাব্দের 29শে সেপ্টেম্বর। তারপর 1394 ও 1395 সনের বর্ষ শুরুর দিন মোটামুটিভাবে 11 দিন করে এগিয়েছে, যেহেতু বছর গণনা হচ্ছে চান্দ্রমাসে। 1395 সনে জ্যৈষ্ঠ অধিক মাস বা মলমাস হিসাবে যুক্ত হয়ে 1396 সনে বর্ষ আরম্ভের দিন 26শে সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে গেছে। অধিবর্ষের জন্য পিছিয়ে যাওয়া একদিন কম হয়েছে। অন্যান্য কিছু কারণেও এই পিছিয়ে যাওয়া 29শে সেপ্টেম্বরে এসে পড়েনি, যদিও চার বছর আগে 1393 সনের বর্ষ আরম্ভের দিন পড়েছিল 29শে সেপ্টেম্বর। বাংলা সনের সঙ্গে ফসলী সনের পার্থক্য কয়েকটা মাসের। ফসলী শুরু হচ্ছে আশ্বিনে। আর সাতমাস পরে বাংলা সন শুরু হচ্ছে। বাংলা সনের বর্ষশুরুর দিন ।লা বৈশাখ। সাল বা অব্দ উভয়েরই এক—1396 সাল। সুতরাং ফসলী সন বাংলা সনের চেয়ে সাতমাস বড় মাত্র। ফসলী পঞ্জিকার বছর শুরু হয় উত্তর ভারতের ফসল তোলার সময়েই। উত্তর ভারতের মূল ফসল আশ্বিনেই কাটা শুরু হয় এবং এই সময় থেকেই কৃষকরা ফসল ঘরে তুলতে শুরু করে। ফসল তোলার সময় ধরেই ফসলী পঞ্জিকার বছর গণনা শুরু হয়। ফসলী পঞ্জিকা মূলতঃ কৃষি পঞ্জিকা। নামটাও 'ফসল' থেকে এসেছে। ফসলী তাই উত্তর ভারতের সাধারণের পঞ্জিকা।

ফসলী পঞ্জিকায় মাসগুলি হলো চান্দ্রমাস। কৃষ্ণা প্রতিপদে গৌণচান্দ্র মাসগুলি শুরু হয়ে শেষ হয় পূর্ণিমায়। ভাদ্রী পূর্ণিমার পরদিন হতে ফসলী পঞ্জিকার নববর্ষ শুরু হয়। আশ্বিন কুঁয়ার হলো ফসলী বর্ষপঞ্জীর প্রথম মাস। এই আশ্বিন কুঁয়ারের প্রথম দিন হলো ভাদ্র পূর্ণিমার ঠিক পরদিন—কৃষ্ণা প্রতিপদে। যদিও আকবর এই পঞ্জিকা চালু করেছিলেন বলে মনে কার হয়, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সম্ভবত কোনও হিন্দুরাজাই অনেক আগে সম্বত পঞ্জিকার অনুকরণে এই ফসলী পঞ্জিকার গোড়াপত্তন করেছিলেন। কারণ সম্বতেও ফসলীর মত কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে মাস গণনা করা হয়। হিজরীতে কিন্তু তা নয়। সুতরাং যাঁরা মনে করেন হিজরী পঞ্জিকার পরিবর্তিত রূপ হলো ফসলী পঞ্জিকা, তাঁরা ভুল করেন। তাছাড়া হিজরী সালের সঙ্গে ফসলী সালের পার্থক্য মাত্র 13 বছরের। 1409 হিজরী সন শুরু হলো 15ই আগস্ট, 1988। আর 1396 ফসলী সালের শুরু হল 26সে সেপ্টেম্বর, 1988। সুতরাং পার্থক্য মোটামুটি 13 বছরের। আকবর সম্রাট হয়েছিলেন 1556 খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং আকবর ফসলী সন চালু করে থাকলে তিনি তাঁর রাজত্ব কাল থেকেই এর বর্ষ শুরু ধরতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সম্ভবত ফসলী পঞ্জিকা আকবরের বহু আগেই উত্তর ভারতে চালু ছিল: আকবর যেটুকু করেছিলেন তা হলো রাজকার্যে এই পঞ্জিকার ব্যবহার। হিজরী সন ধরে খাজনা আদায় ইত্যাদি রাজকর্মে অসুবিধা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সাধারণের সুবিধার্থে, বিশেষ করে হিন্দুদের সুবিধার্থে এই পঞ্জিকা রাজকার্যে ব্যবহৃত হওয়ার আদেশ তিনি দেন। এর মূল কারণ হলো, আকবর যখন এ দেশে রাজত্ব করেন তখন প্রজাদের শতকরা নব্বই ভাগ বা তারও বেশি লোকই ছিল হিন্দু। সুতরাং তাদের দাবী মেনে নেওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। হিজরী পঞ্জিকা তাদের উপর চাপিয়ে দিলে রাজস্ব আদায়ে এবং অন্যান্য রাজকার্যে নানা বিঘ্ন ঘটতো। আকবর সে ভুল করেননি। তাছাড়া খাজনা হিসাবে সে যুগে ফসলও আদায় করা হতো। আকবরের সময় মোটামুটিভাবে উৎপন্ন ফসলের চারভাগের একভাগ খাজনা হিসাবে সম্রাটকে দিতে হতো। খাজনা ফসলে দিতে হলে খাজনা আদায়ের সময়টাও বছরে নির্দিষ্ট রাখতে হবে যাতে ফসল পাকার পরে পরেই আদায়ের সময় আসে। হিজরী পঞ্জিকায় তেমন নির্দিষ্ট রাখা অসম্ভব। একমাত্র চান্দ্র-সৌর-পঞ্জিকা কিংবা সৌর-পঞ্জিকায় তা করা সম্ভব। রাজকার্যে ফসলী বা ওই জাতীয় চান্দ্র-সৌর কিংবা পুরোপুরি সৌর-পঞ্জিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আকবর বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছিলেন। না হলে ফসলে খাজনা আদায় সত্যিই মুশকিল হতো। আর নবাবদের নবাবীতে ঘটতো অর্থনৈতিক অনটন।

বাংলা ও অসমীয়া পঞ্জিকা

বাংলা ও অসমীয়া বর্ষপঞ্জী হুবহু এক, কেবল মাসগুলির নামকরণে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য উভয় প্রদেশের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য। যেমন বাংলার আশ্বিন মাস অসমীয়ায় 'আহিন'। মাসগুলির নামে এই ধরনের কিছু পার্থক্য ছাড়া বাংলা বর্ষপঞ্জী ও অসমীয়া বর্ষপঞ্জী একেবারে এক। এই উভয় পঞ্জিকাই সৌরমাস গণনা করে এবং এরা মূলতঃ সৌর পঞ্জিকা। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের জন্য চান্দ্র পঞ্জিকাও এর সঙ্গে যুক্ত। অধিমাস ব্যবস্থায় সৌরবর্ষ ও চান্দ্রবর্ষকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে পূজা-পার্বণ ইত্যাদি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়েই সীমাবদ্ধ থাকছে এই দুই বর্ষপঞ্জীতে।

প্রচলিত মত অনুসারে আকবর ফসলী পঞ্জিকার মতই বাংলা পঞ্জিকাও চালু করেছিলেন 1556 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কিন্তু বাংলা বা অসমীয়া পঞ্জিকায় এখন চলছে 1415 সাল। তার ইংরেজী সালটা হলো। 2008 খ্রিস্টাব্দ। আকবর বাংলা সন চালু করে থাকলে তা এমনটা হতো না। 1556 খ্রিস্টাব্দেই তার প্রথম অব্দ হতো। আবার অনেকে মনে করেন, তাঁর রাজত্বে হিজরী সনের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে ফসলী, বাংলা ও অসমীয়া সনের প্রবর্তন করা হয়। এই ধারণাও মস্ত বড় ভুল। কারণ বর্তমান বাংলা বা অসমীযা পঞ্জিকা পুরোপুরি সৌর পঞ্জিকা। এগুলি সৌরমাস গণনা করে। সুতরাং হিজরীর সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। আকবরের বহু আগেই এই পঞ্জিকাগুলি এদেশে চালু ছিল। মুসলমানেরা এসে রাজকার্যে হিজরী পঞ্জিকা প্রায় জোর করেই চালু করেছিল। তাতে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আকবর সম্ভবত এই সব পঞ্জিকাও তাঁর রাজকার্যে ব্যবহারের অনুমতি দেন। ফসলী পঞ্জিকার মতই এই দুটি পঞ্জিকা পূর্ব ভারতে বহুল ব্যবহৃত। আকবর নয়, সম্ভবত অন্য কোনও প্রাচীন রাজাই এর প্রবর্তক।

বাংলা এবং অসমীয়া পঞ্জিকা সৌর পঞ্জিকা এবং পঞ্জিকা হিসাবে তাই এ দুটি অনেক আধুনিক। এতে সূর্যের সায়ন গতির কথা ধরা হয়নি। নিরয়ন পদ্ধতিতেই গণনা করা হয়েছে দিন-মাস-বছর। ফলে মহাবিষুব বিন্দুতে নয়, সূর্য যেদিন মেষ রাশির আরম্ভ বিন্দুতে আসছে, সেদিন থেকেই শুরু হচ্ছে ।লা বৈশাখ। মীনরাশির শেষ বিন্দুতে তাই হচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি। তা প্রকৃতপক্ষে মহাবিষুব সংক্রান্তি নয়। কারণ মহাবিষুব সংক্রান্তি এখন 21শে মার্চ বা 7ই চৈত্র হয়ে যাচ্ছে। তাই 8ই চৈত্র দিনটি ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকার ।লা চৈত্র, বর্ষ আরম্ভের দিন। বাংলা ও অসমীয়া পঞ্জিকায় অধিবর্ষ হয় তাদের নিজেদের নিয়মে। যেমন, বর্তমান 1416 সালটা অধিবর্ষ হবে, কারণ এটা চার দ্বারা বিভাজ্য। বাংলা ও অসমীয়া বর্ষপঞ্জীতে অগ্রহায়ণ মাস সাধারণতঃ 29 দিনের হয়। অধিবর্ষ হলে অগ্রহায়ণ মাস হবে 30 দিনের। সৌর পঞ্জিকা বলে এতে অধিমাস হিসাবে অতিরিক্ত একটা মাস যোগ করার প্রশ্ন ওঠে না। একটা সৌর মাসকেই অধিমাস ধরে সে মাসে পূজা-পার্বণ নিষিদ্ধ করে এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয় সবকিছু। এইভাবে সৌরবর্ষ ও চান্দ্রবর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। প্রতি তিন বছরে একটা মাস মলমাস হয়। সাধারণতঃ যে মাসে দুটো অমাবস্যা পড়ে সে মাসটা মলমাস হয়। বাংলা ও অসমীয়া উভয় বর্ষপঞ্জীতেই একই রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

সময় নিয়ে আলোচনার এই পর্বে সময়কে ধরে রাখার কথা কিছুটা বলতেই হয়। আসলে সময়কে ধরে রাখা মুশকিল। নিত্য গতিশীল এই সময়ের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যায় কিন্তু স্তব্ধ করা যায় না এর গতিকে। তবে বর্তমান সময়ের কিছু ঘটনা মানুষ আজ ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে। হয়তো খুব দূর ভবিষ্যতের কাছে নয়, সামান্য কিছুটা ভবিষ্যতে। আর এই ইচ্ছা নিয়েই মানুষ বানিয়েছে 'কালাধার' [Time Capsule]।

কালাধার [Time Capsule]

কোন বদ্ধ আধারে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমসাময়িক সভ্যতার নানা তথ্যকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হলে, ওই আধার বা পাত্রটি 'কালাধার' [Time Capsule] নামে অভিহিত হয়। মানুষের চিরন্তন ইচ্ছা হলো সে তার আবিষ্কার, সৃষ্টি, সভ্যতা, জ্ঞান সুদূর উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দেয়, তাদের জানিয়ে দিতে চায় তার বর্তমান অবস্থার কথা। এই ইচ্ছাই জন্ম দিয়েছে কালাধারের। কালাধারের মাধ্যমেই কেউ তার সমসাময়িক সভ্যতার কথা দূর ভবিষ্যতের উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। তখন তারা থাকবে না ঠিকই, কিন্তু তার সমসাময়িক সৃষ্টি, জ্ঞান, আবিষ্কারের কথা সুদূরের সেই উত্তরসূরিরা জানতে পারবে ওই কালাধারের মাধ্যমে। তাই বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ তাদের এই উন্নত সভ্যতার কথা ভবিষ্যৎ উত্তরসূরিদের জানাতে কালাধার গড়ে তুলেছে। কালাধারের সাহায্যে নিজেদের কথা পাঠাতে চাইছে সেই সুদূর ভবিষ্যতের কাছে। হাজার হাজার বছর পরের কোনও উত্তরসূরি কিংবা অন্য কেউ এই কালাধার থেকে জানতে পারবে বিংশ শতাব্দীর মানুষ কেমন ছিল, কতটা সভ্য ছিল, কতটা উন্নত ছিল। সুদূর ভবিষ্যতের কাছে নিজেদের মেলে ধরার এই চেষ্টা যে শুধু একালের মানুষই করছে তা নয়, এই চেষ্টা দেখা গেছে প্রাচীন মিশরীয় বা ব্যাবিলনীয় মানুষের মধ্যেও। আমাদের এই পূর্বসূরিরা তাঁদের বিভিন্ন মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরে কিংবা মন্দিরের বিভিন্ন গুপ্ত প্রকোষ্ঠে এমন অনেক নকশা, লিপি ও মূর্তি রেখে গেছেন যেগুলিকে তাঁরা তাঁদের সময়ের কালাধার বলেই মনে করতেন। এইসব কালাধার থেকেই আজ আমরা তাঁদের সমসাময়িক সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ পাচ্ছি। এই সব নকশা, লিপি ইত্যাদি তাঁরা এমন যত্ন করে রেখে গিয়েছেন যে, তা দেখে মনে হয়, তাঁরা যেন সুদূর উত্তরসূরিদের জানাতে চেয়েছিলেন তাঁদের সমসাময়িক কালের কথা। এইসব প্রাচীন কালাধার সেইসব প্রাচীন যুগের সভ্যতার কথা জানতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং করছেও। সুদূর ভবিষ্যতের উত্তরসূরিদের নিজেদের কথা জানাতে প্রাচীনেরা যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তারই উন্নত সংস্করণ হলো আধুনিক কালাধার। বিংশ শতাব্দীর মানুষ আধুনিক কালাধারের সাহায্যে এই শতাব্দীর কথা জানাতে চাইছে কয়েক হাজার বছর পরের উত্তরসূরিদের। মিশর ব্যাবিলনের সেই প্রাচীন নীতিই অনুসৃত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ব্যবস্থাপনায় বিংশ শতাব্দীর প্রাযুক্তিক জ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

'টাইম ক্যাপসুল' নামটার উদ্ভাবক হলো আমেরিকার Westinghouse Electric-Corporation। এই কর্পোরেশনই 1938 সালে প্রথম আধুনিক কালাধার বানায়। প্রথম কালাধার ছিল লম্বা ও ছুঁচালো আকারের, দেখতে অনেকটা টর্পেডোর [Torpedo] মত। এই কালাধারের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে সাত ফুট (2.3 মিটার)। 1939 সালে 'Flushing Meadows' নামের একটা জায়গায় এই কালাধারটি মাটির 50 ফুট (15.2 মিটার) গভীরে প্রোথিত করা হয়। 1939 খ্রিস্টাব্দে ওইখানেই সেবার New York World's Fair হচ্ছিল। 1964-65 খ্রিস্টাব্দে আবার একবার New York World's Fair অনুষ্ঠিত হলো। সেবারও ওই Westinghouse Electric Corporation আরেকটা কালাধার বনিয়ে সবাইকে দেখিয়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেললো। এই দুটি কালাধারই 6939 খ্রিস্টাব্দে খোলা যাবে বা যেতে পারে। অবশ্য ততদিনে পৃথিবীতে মানুষ থাকবে কিনা সন্দেহের। 1967 সালে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত Expo-'67-এর সময় আবার একটা কালাধার মাটির নীচে রাখা হলো। এটাকে অবশ্য 2067 খ্রিস্টাব্দে খোলা হবে। জাপানের ওসাকায় Expo-'70 হলো 1970 খ্রিস্টাব্দে। সেবার বার্তুলাকার একটা কালাধার তৈরি করে

মাটির নীচে রাখা হয়েছে। এই কালাধার 6970 খ্রিস্টাব্দ অবধি অক্ষত থাকবে। এখন থেকে 5,000 বছর পরে পৃথিবীতে যদি আমাদের সুদূর উত্তরসূরিদের কেউ বেঁচে-বর্তে থাকে তবে তারা ওই কালাধার পেয়ে জানতে পারবে আমরা কেমন ছিলাম। আর মানুষ যদি তখন না থাকে বহির্জগতের কোন মানুষ এসে ওই কালাধার উদ্ধার করলেও করতে পারে। ওই কালাধার থেকে জানতে পারবে বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী কেমন ছিল। শেষোক্ত বর্তুলাকার কালাধারটির ব্যাস ছিল এক মিটার।

এখন প্রায় সব উন্নত দেশ তাদের নিজেদের দেশের ইতিহাস নথিবদ্ধ করে কালাধার বানিয়ে মাটির নীচে প্রোথিত করে রাখছে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। এমনকি ভারতবর্ষও ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই ধরনের কালাধার বানিয়ে লালকেল্লায় মাটির নিচে রেখে দিয়েছে। আধুনিক কালাধারে থাকছে চিত্র, চিত্রলিপি, ফিল্ম, ফটো, কিছু রেকর্ড করা কথাবার্তা, ইতিহাস সংক্রান্ত মাইক্রো-ফিল্ম ইত্যাদি। বিশেষ ধরনের কাঁচের পাত্রে এইসব জিনিস রেখে ওই পাত্রটিকে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন দিয়ে ভর্তি করা হয়। নাইট্রোজেন রাসায়নিক পদার্থের ক্ষয় নিবারক এবং পচন রোধক, তাই এগুলিকে নাইট্রোজেনের পরিমণ্ডলে রাখা হয়। ওই কাঁচ পাত্রটিকে আবার সঙ্করধাতুর তৈরি পাত্রের মধ্যে রেখে বায়ু নিরুদ্ধ করে বন্ধ করা হয়।

1939 সালের কালাধারের বাইরের পাত্রটি ছিল তামার [Copper] তৈরি। পরবর্তী কালাধার দুটির বাইরের পাত্র তৈরি হয়েছিল স্টেনলেস স্টীল [Stainless Steel] দিয়ে। এই কালাধারে একশোরও বেশি রকমের জিনিষ রাখা হয়েছিল। সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, প্রাযুক্তিক এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিষপত্র তো ছিলই আর ছিল কয়েক মিটার মাইক্রো-ফিল্ম ও নিউজ রীল [Newsreel]। আজকালকার সমস্ত কালাধারেই এই সব জিনিষ রাখা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে দেশের ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিস্তৃত মাইক্রো-ফিল্মও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় ওগ্লেথর্পে [Oglethorpe] মাটির নিচে একটা বেশ বড়সড় ঘর বানিয়ে 1940 খ্রিস্টাব্দেই তাতে ঠাসা হয়েছে সমসাময়িক নানা আবিষ্কার, সৃষ্টি ও জ্ঞান। সভ্যতার ইতিহাসও বিস্তৃতভাবে মাইক্রোফ্লিমে ধরে ভরা হয়েছে ওই ঘরে। পৃথিবীর সমসাময়িক যতকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির নমুনাও রাখা হয়েছে ওই ঘরে, মডেলের আকৃতিতে। ঘরটিকে 'সীল' করে দেওয়া হয়েছে 1940 খ্রিস্টাব্দেই। আশা করা হচ্ছে এই ঘরের সবকিছুই 8113 খ্রিস্টাব্দ অবধি অটুট থাকবে। তাই ওই ঘর খোলার বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে 8113 খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ এখান থেকে 6,000 বছরেরও কিছু পরে পৃথিবীতে যদি কেউ থাকে তারা ওই ঘরে যে সব তথ্য পাবে তার থেকে জানতে পারবে তাদের 6,000 বছরের প্রাচীন পূর্বসূরিরা কেমন ছিল। যেমন আমরা এখন অনুরূপ কালাধার থেকে জানতে পারি আমাদের 6,000 বছরের প্রাচীন পূর্বসূরিরা কেমন ছিল, জানতে পারি আমাদের 6,000 বছরের প্রাচীন পূর্বসূরি মিশরীয়দের কথা।

মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সময় ধারণায় বিবর্তনের কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল। আগেই বলেছি, মহাকালের বিশাল বিস্তৃত আঙিনায় পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিবর্তনের সময়টুকু একেবারেই নগণ্য মাত্র। 1800 কোটি বা 2000 কোটি বর্ষব্যাপী সময়ের বিপুল বিস্তারের প্রাঙ্গণে মানবসভ্যতার 20 লক্ষ কিংবা সাতলক্ষ বছরের ইতিহাস তো এই সেদিনের কথা যেন। মহাকালের বিশাল বিস্ময় তাই মনকে আচ্ছন্ন করে, মন্ত্রমুগ্ধ করে। মানুষের নগণ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

মহাসময়ের বিশাল প্রেক্ষাপটে মানুষের সময় ধারণার মোটামুটি একটা ইতিহাস বলা হল। এ বিষয়ে আরও বিশদ বলা হয়েছে বর্তমান লেখকের 'মহাসময়ের ইতিবৃত্ত' নামের বইটিতে। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা এই বইটি পড়ে দেখতে পারেন। আবারো বলি, মহাবিশ্বে সময়ের চলা শুরুর 2000 কোটি বছরের দীর্ঘ মাত্রার সঙ্গে মানব-সভ্যতার বিবর্তনের 20 লক্ষ কিংবা 7 লক্ষ বছর একেবারে নগণ্য সময় মাত্র। তবু মহাসময়ের বিশাল প্রেক্ষাপটে মানুষের সময় ধারণার বিবর্তনের একটা রূপরেখা এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত করা হল। মানুষ সময়কে দৈনন্দিন জীবনে কতটা কাজে লাগিয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল। মহাসময়ের বিশাল প্রেক্ষাপটে মানুষ এই সেদিন এসেছে। খুব শীঘ্রই সে নিশ্চিহ্ন হবে। মহাবিশ্ব থাকবে, মহাকাল বা মহাসময় থাকবে। বিশ্ব মুক্ত হলে তার প্রসারণ চলবে অনন্তকাল। আর বিশ্ব বদ্ধ হলে আরও 2000 কোটি বছর তার প্রসারণ চলবে এবং তারপর শুরু হবে তার মহাসংকোচন কাল। ●

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রহ-তারক-চন্দ্র-তপন

[ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের খুব সামান্য অংশ জুড়ে রয়েছে আমাদের সৌরজগৎ। এই জগতটিতে রয়েছে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা এবং আরও কত কী। এই পরিচ্ছেদে গ্রহদের কথা একটু বিশদভাবেই বলা হয়েছে। প্লুটো-জেনারা গ্রহ কিনা তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। শুধু গ্রহদের কথা নয়, রয়েছে গ্রহণের কথাও। গ্রহাণুপুঞ্জের বিবরণ কিছুটা বিশদভাবেই বলা হয়েছে। বাদ পড়ে নি উল্কা এবং ধূমকেতুদের বিবরণ। সাতাশটি নক্ষত্র এবং বারোটি রাশির কথাও রয়েছে এই পরিচ্ছেদে। সূর্য, সৌরকলঙ্ক, সূর্যগ্রহণ সবই আছে এখানে। পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদিকে নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনাও করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। গ্রহ-তারক-চন্দ্র-তপনের আলোচনায় রয়েছে আমাদের অতি প্রিয় এই পৃথিবীও।]

এই পরিচ্ছেদ তপন বা সূর্যকে দিয়ে শুরা করা যাক। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের 10,000 কোটি [10^{11}] নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি সাধারণ মাপের নক্ষত্র। সূর্যের একটা নিজস্ব পরিবার আছে, যাকে আমরা সৌরমণ্ডল বলি কিংবা বলি সৌর-পরিবার। এই পরিবারে অন্ততঃ নয়টি গ্রহ, কমপক্ষে 60টি উপগ্রহ, অগুণতি গ্রহাণু ও ধূমকেতু এবং গ্রহগুলির অন্তবর্তী বিশাল মহাকাশ রয়েছে। গ্রহগুলির মধ্যে চারটির বলয় রয়েছে। এদের মধ্যে সাতটির একটি অথবা একাধিক উপগ্রহ রয়েছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ দুটির মাঝখানে কয়েক হাজার গ্রহাণু একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করছে। আবার সূর্যকে পরিক্রমা করে কয়েকশ' কোটি ধূমকেতু। এর অনেকগুলিই সূর্য থেকে পৃথিবীর যা দূরত্ব তার অন্ততঃ 50,000 গুণ দূর থেকে এসে সূর্য পরিক্রমা সেরে যায়। এছাড়া গ্রহগুলির মধ্যবর্তী স্থানে বা মহাকাশে আছে আয়নিত গ্যাসের প্লাজমা [Plasma] এবং অসংখ্য ধূলিকণা, যা মহাবিশ্বের মহাকাশের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। এইসব মিলিয়ে আমাদের সৌরমণ্ডল। এই সৌরমণ্ডল আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অতি সামান্য এক ভগ্নাংশ মাত্র।

সূর্যের গ্রহগুলিকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয় এদের ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে। সূর্যের কাছের গ্রহগুলি যেমন, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, এদের গঠন শিলাময় এবং এদের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 3 গ্রামের বেশি। কিন্তু দূরের গ্রহগুলি, যেমন—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন—এগুলি আয়তনে অনেকটাই বড়, কিন্তু এদের প্রত্যেকের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 2 (দুই) গ্রামের কম এবং এদের গঠনের উপাদান মূলত নানা ধরনের গ্যাস। আবার প্লুটো নামক গ্রহটি গ্রহ কিনা তা নিয়ে বহু বিতর্ক চলছে। প্লুটো 'বামনগ্রহ' —এই সিদ্ধান্ত নিয়েও বহু বিতর্ক রয়েছে। প্লুটো নিয়ে এইসব বিতর্কের সামান্য আভাস পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই পরিচ্ছেদেই করা হবে প্লুটো নিয়ে আলোচনার সময়। আমাদের আলোচনায় প্লুটোকে আমরা গ্রহ

হিসাবেই ধরবো। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহগুলির উপাদান গ্যাস হলেও দূরতর গ্রহ প্লুটোর শরীর কিন্তু বরফ দিয়ে তৈরি, এর ঘনত্ব বেশ কম এবং এর আয়তন আমাদের চাঁদের চেয়েও ছোট। এর ব্যাস মাত্র 2320 কিলোমিটার, যেখানে চন্দ্রের ব্যাস 3880 কিলোমিটার। প্লুটোর মত গুণাগুণ সম্পন্ন আর একটি গ্রহ 2003 সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম 2003UB-313 দেওয়া হয়েছে। এর ব্যাস 3400 কিলোমিটার। এই নিয়ে আলোচনা কিছুটা পরেই করা হয়েছে।

সৌরমণ্ডল নিয়ে আধুনিককালের ধারণার আলোচনায় আসার আগে প্রাচীন ঋগ্বেদীয় ধারণার সামান্য একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণের ঋগ্বেদীয় ধারণা দিয়ে শুরু করা যাক। এই প্রাচীন গ্রন্থটি তার প্রথম মণ্ডলের 62তম সূক্তের সপ্তম ঋকে বলেছে ঃ

"নীল নভে অনায়াস সংস্থিত স্তবকে আধারভূত অর্কের [গ্রহস্তবকের আধারভূত সূর্যের এক নাম অর্ক] বিবর্তন বেগে দ্বি-নাভিসমন্বিত পথ নিত্য সঞ্জাত হয়ে চলেছে। ভগকে [দ্বাদশ আদিত্যের একটির নাম ভগ] নির্দিষ্ট মানে পরিবেষ্টন করে রোদসী আমাদের ধারণ ক'রে ব্যোমচারণ সুসম্পন্ন করছেন।"

সহজ করে বললে, রোদসী অর্থাৎ পৃথিবী নীল আকাশে গ্রহমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে। পৃথিবীর এই পরিক্রমণ পথ দুই নাভি [Focus] যুক্ত। দুটি নাভি আছে মানে হলো পথটি উপবৃত্তাকার। এই উপবৃত্তাকার পথের মান বা পরিমাণ নির্দিষ্ট। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এই জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়দের ছিল এবং আবর্তন পথ যে উপবৃত্তাকার তাও তাঁরা জানতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোনও সভ্যতা এই সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশর সভ্যতাগুলিতে এই আবিষ্কারেরই সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর তৃতীয় পঞ্চিকার চুয়াল্লিশতম অধ্যায় বলছে ঃ

"রাত্রি অবসান হলে ঊষাকালে যখন লোকে মনে করে সূর্য উদিত হলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য আপনাকে বিপর্যস্ত করেন। দিবা অবসানে যখন লোকে মনে করে সূর্য অস্তগত হলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য বিপর্যস্ত হন।"

সকাল এবং সন্ধ্যায় সূর্যোদয়ের কিছুটা আগে এবং কিছুটা পরে যে আধো-আলোকিত কাল, যাদের আমরা ঊষাকাল এবং গোধূলিবেলা বলি, এ দুটির সৃষ্টি হয় সূর্যের আলোর প্রতিসরণের ফলে। সূর্য আপাতভাবে দিক চক্রবাল রেখার উপরে আসার কিছুটা আগেই বায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মির প্রতিসরণের ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে শুরু করে। সূর্য দিকচক্রবাল রেখায় এলে হয় সূর্যোদয়। তার আগে প্রতিসরণের মাধ্যমে যে আলো পৃথিবীতে আসে তাই সৃষ্টি করে ঊষাকাল। এতে যে শুধু প্রতিসরণের আলো আসে তা নয়, বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলনের এবং বিচ্ছুরণের ফলেও কিছুটা অতিরিক্ত আলোক রশ্মি প্রতিসৃত রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় ঊষাকাল বা ভোর বা সকাল। সূর্য উঠলে অর্থাৎ সূর্য দিকচক্রবাল রেখায় আপাতভাবে এলে বলা হয় সূর্যোদয় হল এবং দিন শুরু হয়। তেমনি দিন শেষে সূর্য আপাতভাবে দিকচক্রবাল রেখা পেরিয়ে আরো কিছুটা পশ্চিমে যাওয়া অবধি তার আলো একই রকমভাবে প্রতিসরণের ফলে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর যে অংশে এই ধরনের আলো আসে সেখানে তখন গোধূলি। 'গো' অর্থে আলো, 'ধূলি' মানে অন্ধকার। অতএব গোধূলি মানে হলো আলো-অন্ধকারের সন্ধিকাল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যে সূর্যের 'বিপর্যস্ত' হওয়ার কথা বলছে তা হলো সূর্যরশ্মির এই প্রতিসরণের কথা এবং কিছুটা প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের কথা। সূর্যের বিপর্যস্ত আলোই ঊষাকাল ও গোধূলির সৃষ্টিকর্তা। বায়ুমণ্ডলে আলোর প্রতিসরণ ইত্যাদির কথা

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচয়িতাদের জানা ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল, খুব কম করে ধরলেও, 2,000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

এই উষাকাল, গোধূলিবেলা, দিন এবং রাত্রি পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময়ে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের তো উদয় অস্ত নাই। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সূর্য ঘুরছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষ্ণুপুরাণ বলেছে ঃ

"পৃথিবীর যেখান হতে সূর্য দৃশ্য হল, সেখানের পক্ষে তাঁর উদয় এবং যেখান হতে তিনি দৃশ্য হন না, সেখানের পক্ষে তাঁর অস্তমন মনে হয়। বাস্তবিক, সূর্যের উদয় বা অস্তমন নাই।" আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথাই রয়েছে প্রাচীন পুরাণে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কথারই প্রতিধ্বনি করছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞান। এরই কিছুটা পরবর্তীকালে আর্যভট বললেন ঃ

"পৃথিবী ও গ্রহদের গোলকের যে অর্ধাংশ যখন সূর্যের অভিমুখে থাকে, সেই অর্ধাংশ তখন দীপ্তিশীল হয়। অপরার্ধ নিজের ছায়ায় থাকে বলে নিষ্প্রভ। সূর্যালোকিত অংশ দিন, সূর্য দিননাথ, নিষ্প্রভ অংশ রাত্রি, সোম বা চন্দ্র নিশানাথ।"

সূর্যের অর্ধাংশ উদিত হওয়ার পূর্বে এবং অর্ধাংশ অস্তগত হওয়ার পরে যত সময় নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য বা অস্পষ্ট থাকে তাকে প্রভাতকাল ও সন্ধ্যাকাল বলেছেন প্রাচীন ঋষিরা। এইসময়ের পরিমাণ প্রায় দুই দণ্ড বা 48 মিনিট। গোধূলির পর আসে রাত্রি। 'রজঃ' অর্থ ধূলি বা অন্ধকার, যে কাল রজঃ নিমগ্ন করে সেই কালের নাম 'রজনী'। রাত্রি তাই রজনী। চন্দ্রালোকে রজনীর অন্ধকার দূর হয়, তাই চাঁদের নাম রজনীনাথ। ঋষিরা আরো বলেছেন যে, দর্পণে পতিত সূর্যরশ্মি যেমন দ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে গৃহের অন্ধকার হনন করে, তেমনি চন্দ্রদেহে সূর্যরশ্মি মূর্ছিত হয়ে রজনীর অন্ধকার নাশ করে। চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই একথা ঋষিরা জানতেন এবং সূর্যের আলোই চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়, যেমনটি ঘটে দর্পণে সূর্যালোক প্রতিফলনের ক্ষেত্রে, একথাও তাঁরা ঘোষণা করেছেন সুদূর অতীতে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির কথা সকলের জানা। এই কলা অবশ্য অংশের ষাট ভাগের এক ভাগ। অংশ হলো আধুনিককালের কৌণিক মাপের 'ডিগ্রি' [Degree]। সেদিক থেকে কলা হলো এখনকার 'মিনিট'। প্রাচীনকালে অমাবস্যা হ'তে পূর্ণিমা পর্যন্ত ষোড়শ তিথি ষোড়শ কলা নামে অভিহিত। অমরকোষ বিভিন্ন অমাবস্যা ও পূর্ণিমার বর্ণনা দিয়েছে এই রকম ঃ

"পঞ্চদশ কলাযুক্ত পূর্ণিমার নাম 'অনুমতি পূর্ণিমা' এবং ষোড়শ কলাযুক্ত পূর্ণিমার নাম 'রাকা পূর্ণিমা', চন্দ্রের পূর্ণিমা এই দুই রকম হয়। কিঞ্চিৎ দৃষ্ট চন্দ্রযুক্ত অমাবস্যার নাম 'সিনিবালী', নিঃশেষ চন্দ্র অমাবস্যার নাম 'কুহু' অমাবস্যা। কোকিলের একবার কুহুধ্বনিতে যতটুকু সময় লাগে, তাই কুহু অমাবস্যার স্থায়িত্ব কাল।"

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 84 তম সূক্তের 15তম ঋক বলছে, "এ রূপে আদিত্যরশ্মি এ গমনশীল চন্দ্র মণ্ডলের অন্তর্হিত সূর্যতেজ পেয়েছিল।" নিরুক্ত এক ব্যখ্যায় বলছে, সূর্যকিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে চন্দ্রের আলোক হয়—একথা ঋগ্বেদীয় ঋষিদের জানা ছিল। শুধু তাই নয় চন্দ্রমণ্ডলও যে গতিশীল তা এখানে বলা হয়েছে। আধুনিক মত বলছে, ঋগ্বেদের ঋষিরা জানুন বা না জানুন নিরুক্তকার যাস্কের সময় চন্দ্রালোক সংক্রান্ত ওই তথ্য নিশ্চই জানা ছিল। নিরুক্ত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করেছে মাত্র। তাই ঋগ্বেদীয় ঋষিদের এই তথ্য অজানা ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া ঋকটির অনুবাদেও তো ওই তথ্য বেশ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। 'সিনিবালী' ও 'রাকা' সম্পর্কে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের 32তম সূক্তের বক্তব্য হলো ঃ

"আমি উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা আহ্বানযোগ্য রাকাদেবীকে আহ্বান করি। তিনি সুভগা, আমাদের আহ্বান শুনুন এবং নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে অচ্ছিদ্যমান সূচিদ্বারা আমাদের কর্ম বয়ন করুন এবং বিক্রান্ত, বহুধন বিশিষ্ট ও বীর্যবান পুত্র দান করুন। হে রাকা দেবি! তোমার যে সুন্দর অনুগ্রহ দ্বারা তুমি হব্যদাতাকে ধনদান কর, অদ্য প্রসন্ন মনে সে অনুগ্রহের সঙ্গে এস। হে শোভন ভাগ্যবতি! তুমি সহস্র প্রকারে আমাদের পুষ্টি বর্ধন করে থাক। হে পৃথুজন্মা সিনিবালী! তুমি দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য সেবা কর এবং আমাদের অপত্য উপচিত কর। সিনীবালী সুবাহু সুন্দর অঙ্গুলি বিশিষ্ট, সুপ্রসবিনী এবং বহু প্রসবিত্রী, সে লোকপালিকা সিনীবালীর উদ্দেশে হবি প্রদান কর। যিনি 'গুঙ্গু', যিনি সিনীবালী, যিনি রাকা এবং যিনি 'সরস্বতী', তাঁদের আহ্বান করি।"

আগেই বলা হয়েছে ষোড়শকলাযুক্ত পূর্ণিমার নাম রাকা। এর সম্বন্ধে Muir বলেছেনঃ

"She is however closely connected with parturition, as she is asked to 'sew the work' [apparently the formation of embryo] 'with an unfailing needle' and to bestow a son with abundant wealth" [Muir's Sanskrit Text Vol : V (1884)-P. 346]। সিনীবালী ও কুহু হলো দুটি অমাবস্যা তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু 'গুঙ্গু' শব্দটি এখানে অপরিচিত। সম্ভবত 'গুঙ্গু' শব্দটি রাকা ও সিনীবালীর সহচরী 'কুহু' বোঝাচ্ছে। সায়নাচার্যের অন্ততঃ সেই মত। কুহুর নাম অবশ্য ঋগ্বেদে কোথাও নাই।

ঋগবেদের প্রথম মণ্ডলের 164তম সূক্তের কয়েকটি ঋকে দিন-মাস-বছরের হিসাব যেমন বলা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে ঋতুচক্র, ও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ইত্যাদির কথা ঃ

"সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চারদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করছে ও কদাচিৎ জরাগ্রস্ত হয় না। হে অগ্নি! এ চক্রে পুত্ররূপ সপ্তশত বিংশতি মিথুন বাস করে। পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্ধে থাকেন, কেউ কেউ তাঁকে 'পুরীষী' বলে। অপর কেউ কেউ ছয় অরবিশিষ্ট সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথে দ্যোতমান আদিত্যকে 'অর্পিত' বলে, যখন তিনি দ্যুলোকের অপর অর্ধে অবস্থিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল পঞ্চঅরবিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রয়েছে, এর অক্ষ প্রভূত ভার বহনেও ক্লান্ত হয় না এবং এর নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখনও শীর্ণ হয় না। সমান নেমি-বিশিষ্ট কালচক্র নিরন্তর ঘুরছে। দশজন একযোগে ঊর্ধ্বদেশে মিলিত হয়ে পৃথিবী ধারণ করছে। সূর্যের চক্ষুরূপ মণ্ডল বৃষ্টি জলে আবৃত হল, সমস্ত প্রাণীজগৎ এতে অর্পিত হল। আদিত্যের সহজন্মা ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হতে উৎপন্ন। এ ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হতে উৎপন্ন। এ ঋতুগণ সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত এবং রূপভেদে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট। এরা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য বারবার ঘুরছে। রশ্মিসমূহকে স্ত্রী হলেও পুরুষ বলে, যাদের চক্ষু আছে, তারাই এ দেখতে পায়, যাদের স্থূলদৃষ্টি, তারা এ দেখতে পায় না। যে পুত্র মেধাবী তিনিই এ বুঝতে পারেন।.....দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র, তিন নাভি। এ কথা কে জানে? ওই চক্রে ত্রিশত ষষ্ঠিসংখ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে।"

বর্ষচক্রের দ্বাদশ অর বলতে ঋষিরা বুঝিয়েছেন বারোটি মাস। অনেকে অবশ্য অর বলতে বারোটি রাশিচক্র মনে করেন, যে রাশিগুলি সূর্য সারা দিন ও রাত্রে পরিক্রমা করে। তবে বর্ষচক্রের কথাই যখন বলা হচ্ছে তখন দ্বাদশ অর বলতে বারোটি মাসকেই বোঝায়। এই চক্রের 720টি মিথুন হলো 360টি দিন ও 360টি রাত্রি। মোট 720টি। পঞ্চপাদ বলতে পাঁচটি ঋতুকে বলা হয়েছে।

পরবর্তী ঋকে অবশ্য ছয়টি ঋতুর কথা আছে। তবু এখানে পঞ্চপাদ বলা হলো এই জন্য যে, হেমন্ত ও শিশির বা শীত ঋতু এক ধরে নিয়ে পাঁচটি ঋতু। 'পুরীষ' মানে জল, 'পুরীষী' মানে বৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ সূর্য উত্তরায়ণে বৃষ্টি সৃষ্টি করেন এবং দক্ষিণায়নে বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষারম্ভ হয়। এ সম্পর্কে ঋগ্বেদের 6ষ্ঠ মণ্ডলের 32তম সূক্তের পঞ্চম ঋকেও একই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ভূ-কক্ষের নাভি দুটি নির্দিষ্ট এবং তার পরিবর্তন নেই এবং যে অক্ষের উপর পৃথিবী ঘুরছে সে অক্ষ নিশ্চয়ই 'প্রভূত ভার বহনেও' অক্লান্ত। কালচক্র সমানভাবে ঘুরছে এবং মহাকাশের দশটি দিক পৃথিবীকে এই অবস্থানে ধরে রেখেছে। বারোমাসে বছর হয় আবার অধিমাস বা মলমাসকে নিয়ে তেরো মাসেও বছর হয়। বারোমাসের বৎসরে ছয়টি ঋতু এবং তারা প্রত্যেকেই যুগ্ম। কিন্তু অধিমাস বা মলমাসটি একক। এই মলমাস বা অধিমাস নিয়ে আরো আলোচনা ঋগ্বেদে আছে। ঋতুগুলি বৎসরের স্রষ্টা। এরা ঘুরছে তাই বর্ষচক্র তথা কালচক্র আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে একই ঋতু আসে না, তাই তাদের 'স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত' বলা হয়েছে। আবার ঋতুর রূপও পৃথিবীর সর্বত্র একই রকম নয়। তাই রূপভেদের কথা বলা হয়েছে। সূর্য-রশ্মি চোখে দেখা যায় না এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ঋষিরাও সে কথা বলছেন। কেবল বুদ্ধিমানেরাই তা জানে। বর্ষচক্রের দ্বাদশ পরিধি হলো দ্বাদশ মাস, এক চক্র হলো এক বৎসর। নাভি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক তিন ঋতু। এই চক্রের অর হলো 360টি দিন-রাত্রি বা 360টি দিবস।

চন্দ্র এবং গ্রহদের নিয়েও প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তত্ত্ব রয়েছে। সৌর মণ্ডলের নানা ঘটনার প্রায় আধুনিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পেরেছিলেন কয়েক হাজার বছর আগেই। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিকুল জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেছিলেন এবং কমপক্ষে 4000 বছর আগেই সৌরমণ্ডল সম্পর্কে তাঁরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বহু তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভুলভাবেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি, সময় পরিমাপে তাদের ব্যবহার, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাদের প্রভাব ইত্যাদি যথেষ্ট নির্ভুলতার সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

চন্দ্রকে নিয়ে প্রাচীন ঋষিদের নানা নির্ভুল তথ্য আছে। সেগুলির দু-একটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। পার্থিব পর্যবেক্ষকের চোখে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্রই শীঘ্রগতি। তাঁরা জানতেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আর চন্দ্র ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। এক চান্দ্রমাস হলো সাড়ে ঊনত্রিশ দিন। দ্বাদশ চান্দ্রমাসে একটি চান্দ্র বৎসর। সুতরাং মোট 354 সৌরদিনে এক চান্দ্র বৎসর। প্রকৃতপক্ষে এক চান্দ্রমাস হলো 29·530589 সৌরদিন বা 29 দিন 12 ঘণ্টা 44 মিনিট 2.9 সেকেন্ড এবং প্রায় 354 দিন 8 ঘন্টা 48 মিনিট 35 সেকেন্ডে এক চান্দ্র বৎসর। এক অমাবস্যা হতে অপর অমাবস্যা অবধি ত্রিশটি তিথি বা ত্রিশটি চান্দ্র দিন ধরা হয়। সুতরাং মোটামুটি ত্রিশটি চান্দ্র দিন বা ত্রিশটি তিথিতে সাড়ে ঊনত্রিশটি সৌরদিন হয়। পৃথিবীর সৌর অহোরাত্রি অর্থাৎ নাক্ষত্রদিন সব ঋতুতেই তেইশ ঘন্টা ছাপান্ন মিনিট। সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে ত্রিশ তিথি হয় বলে এক একটি তিথিতে 23 ঘন্টা 56 মিনিট অথবা তার কিছুটা কম সময় হয়। সকল তিথি সমান মানের নয়, কারণ ভূ-প্রদক্ষিণ কক্ষে চন্দ্রের গতি অনুভূ [Perigee] ও অপভূ [Apogee] অনুযায়ী দ্রুত ও ধীর হয়, যেহেতু চন্দ্রের পরিক্রমণ পথও উপবৃত্তকার। তাই একটি তিথির ভোগকাল 23 ঘন্টা 56 মিনিটের বেশি আবার সাড়ে একুশ ঘন্টার কম হয় না কখনও। এজন্য কোনও চান্দ্রতিথি এক সৌর অহোরাত্র জুড়ে হতে

পারে আবার একটি সম্পূর্ণ চান্দ্র তিথি এবং অপর একটি চান্দ্র তিথির কিছুটা অংশ নিয়েও এক সৌর অহোরাত্র হওয়া সম্ভব। কখনো কখনো একটি চান্দ্র তিথির শেষের কিছুটা অংশ, পরের চান্দ্র তিথির মোট ভোগকাল বা সম্পূর্ণ ভোগকাল এবং তার পরের চান্দ্র তিথির প্রথম কিছুটা অংশ নিয়ে এক সৌর আহোরাত্র হয়। এই রকম দিনকে বলা হয় 'ত্র্যহস্পর্শ'। এই ত্র্যহস্পর্শের কথা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে, ফলিত জ্যোতিষে বহুকাল আগেই বলা হয়েছে। চন্দ্রের গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে এটা বলা সম্ভব নয়। তিথি শুরু হওয়ার বা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট কাল নেই। আহোরাত্রের যে কোনও সময় তিথি শুরু বা শেষ হতে পারে। চান্দ্র দিনের নাম তিথি, আর চন্দ্র তাই 'তিথীশ্বর'। ভারতীয় পূজা-পার্বণে চান্দ্রদিন বা তিথির গুরুত্ব অপরিসীম। এ সবই চান্দ্র তিথি ধরে সম্পন্ন হয়। চান্দ্র মাস ও সৌরমাসের মধ্যে পার্থক্যের ফলে প্রতি বছর চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরের মধ্যে 11 দিনের পার্থক্য হয় মোটামুটিভাবে। তিনটি চান্দ্র বৎসর ও তিনটি সৌর বৎসরের পার্থক্য হয় প্রায় এক মাস। এই রকম একটা মাসকে অধিমাস বা মলমাস বা ঋগ্বেদীয় ভাষায় 'মলিম্লুচ' বলে।

চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ না বলে তাকে গ্রহ শ্রেণীভুক্ত করা হলো কেন এ নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। ভাবেন, ঋষি প্রপিতামহেরা বোধহয় জানতেন না চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিক্রমণরত। তাঁদের এই ধারণা একদম ভুল। যে অর্থে ইংরেজীর 'Planet' শব্দ ব্যবহার করা হয় 'গ্রহ' শব্দটি মোটেই সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত 'গ্রহ' শব্দের অর্থ গ্রাস করা। গ্রহ ও গ্রহণ শব্দদ্বয় এক ধাতু হতেই উৎপন্ন এবং গ্রহণ অর্থেও গ্রহ শব্দের প্রয়োগ আছে। সূর্য গ্রহণ অর্থে সূর্যকে গ্রহণ। আর তাকে গ্রহণ করে কে? চন্দ্র, অতএব চন্দ্র গ্রহ। যে গ্রহণ করে সেই গ্রহ। আবার ফলিত জ্যোতিষ মতে মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক ও জীবনের অবসানে প্রাণ গ্রহণ করে যে বা যারা তারাই গ্রহ। এই ব্যাখ্যানুসারে সূর্যও গ্রহ, কারণ ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে সূর্য মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনের অবসানে প্রাণও গ্রহণ করে। এছাড়াও চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দুটি গ্রহণেই সূর্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। তাই সূর্য নক্ষত্র হলেও প্রাচীন ঋষিরা তাকে গ্রহ বলতেন। ঋষিরা রাহু কেতুকেও গ্রহ বলেছেন। অথচ তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানতেন রাহু ও কেতু কোন্ দুটি বিন্দুর নাম। এমনকি নাম দুটি তো তাঁদেরই দেওয়া। নাম দুটি দেওয়া হয়েছিলো ওই বিন্দুদুটির গুণ বা ধর্ম দেখেই। পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ পথ ও সূর্যের সঞ্চার বৃত্ত যেমন পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে, যে দুটি বিন্দু হলো বাসন্তী বিষুব ও শারদ বিষুব, তেমনি পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ কক্ষপথ ও চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণ কক্ষপথও পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। এই ছেদ বিন্দু বা সম্পাতদ্বয়ের একটির নাম দেওয়া হয়েছে রাহু এবং অন্যটির নাম কেতু। রাহু বা কেতুতে উপস্থিতির সময় যদি চন্দ্রের পূর্ণিমা হয় তবে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ ঘটায়। রাহু বা কেতুতে না এলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তাই বৎসরের সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এক বৎসরে কোন চন্দ্রগ্রহণ নাও হতে পারে, আবার তিনটি পর্যন্ত গ্রহণ হতেও পারে, তবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বছরে একবারের বেশি হয় না। পৃথিবীর ছায়া দু'রকমের হয়—প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। উপচ্ছায়াতে চন্দ্র থাকলে কোনও গ্রহণ হয় না। চাঁদকে একটু ম্লান দেখায়। কিন্তু প্রচ্ছায়াতে কোনও আলো না থাকায় চন্দ্রের যতটা অংশ প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করে ততটাই অদৃশ্য হয়। চন্দ্র পুরোপুরি প্রচ্ছায়াতে প্রবেশ করলে তখন তাকে আর দেখা যায় না। সে অবস্থায় চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। আর চন্দ্র আংশিকভাবে প্রচ্ছায়া এবং আংশিকভাবে উপচ্ছায়ায় অবস্থান করলে তার আংশিক গ্রহণ হয়। কারণ উপচ্ছায়ায় চন্দ্রের যেটুকু অংশ থাকে তা দৃশ্যমান হয়, যদিও তাকে খানিকটা ম্লান দেখায়।

223 চান্দ্রমাসে বা সৌর আঠারো বৎসর এগারো দিনে ভূ-কক্ষ ও চন্দ্র-কক্ষের সম্পাতদ্বয় [Nodes] অর্থাৎ রাহু ও কেতু পৃথিবী বেষ্টন করে একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করে। অর্থাৎ রাহু ও কেতু বিন্দু দুটি 18 বছর 11 দিনে বারোটি রাশিচক্রের সবগুলিকে একবার পরিক্রমা করে আসে। একে অর্থাৎ এই 18 বছর 11 দিনকে এক 'চান্দ্রকল্প' বলা হয়। এক চান্দ্রকল্পে যে সময়ে যে ধরনের চন্দ্রগ্রহণ ঘটে পরবর্তী চান্দ্রকল্পেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসারে, পূর্ণিমা তিথিতে একই প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থানে একই রাশি ও নক্ষত্র সমাবেশে এবং একই কাল ব্যবধানে চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস গ্রহণগুলি ঘটতে থাকে। চন্দ্র গ্রহণের এই পুনরাবর্তন প্রতি চান্দ্রকল্পে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় বলেই এই ঘটনাকে 'পুনরাবর্তন নিয়ম' বলা হয়। এই গ্রহণ গণনা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা একেবারে নির্ভুলভাবে করতে পেরেছিলেন। আর এই গ্রহণ গণনা তাঁরা করেছিলেন সেই প্রাচীনকালে যখন অন্য সব প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ সবে শুরু হয়েছে, আমাদের জানা অনেক নবীনতর সভ্যতার শুরুই তখন হয়নি।

রাহু-কেতু ছায়াগ্রহ নামে গ্রহের মর্যাদা পেয়েছে তখন থেকেই। কারণ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে রাহুতে অবস্থিত চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর কোন কোন অংশের উপর দিয়ে যায়। চন্দ্রের ছায়াও দুরকম—প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া। পৃথিবীর যে অংশে প্রচ্ছায়া পড়ে সে অংশের লোকদের কাছে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায় কারণ চাঁদ সেখানে সূর্যকে ঢেকে দেয়। পৃথিবীর সেই অংশের লোকেরা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখে। বিশেষ অবস্থায় ওই প্রচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন পৃথিবীর লোকেরা সূর্যের বলয়গ্রাস গ্রহণ দেখতে পায়। আর পৃথিবীর যে অংশে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে সেই অংশের লোকেরা দেখে সূর্যের আংশিকগ্রাস গ্রহণ। অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয়। কিন্তু প্রতি অমাবস্যায় হয় না। অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে হলে চন্দ্রকে রাহু বা কেতুতে কিংবা তাদের কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে। তা না হলে গ্রহণ হবে না। ঋষিরা একথা জানতেন বলেই যে সম্পাতবিন্দুদ্বয়ে বা যে রাহু-কেতুতে চন্দ্র এলে তবেই গ্রহণ হয়, সেই রাহু-কেতুকে গ্রহ বলে অভিহিত করেছিলেন। রাহু-কেতুই গ্রহণ সংঘটনকারী। অন্তরীক্ষের গ্রহপদবাচ্য অন্য সাতটির সঙ্গে রাহু-কেতুও গ্রহ হিসাবে পরিগণিত হয়। এইভাবে সৌরমণ্ডলে গ্রহের সংখ্যা নয়টি হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে পাঁচটি অর্থাৎ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি হলো Planet, সূর্য একটি ছোটমাপের Star বা নক্ষত্র, চন্দ্র হলো Satellite বা উপগ্রহ আর রাহু-কেতু হলো Nodes বা সম্পাতদ্বয়। কিন্তু ঋষিদের চোখে এরা সবাই গ্রহ। কারণ তাঁদের গ্রহ আর ইংরেজীর Planet শব্দটি একই অর্থবহ নয়। একটু পরবর্তীকালে তাঁরা ইউরেনাসের নাম দিয়েছিলেন প্রজাপতি বা ইন্দ্র, নেপচুনের বরুণ এবং প্লুটোর নাম রুদ্র। ফলিত জ্যোতিষে এখনও প্রাচীনকালের অনুসরণে বারোটি গ্রহের উল্লেখ দেখা যায়। ফলিত জ্যোতিষের গণনাও বারোটি গ্রহের সম্মিলিত ফল দেখে করা হয়ে থাকে। ঋগ্বেদ নয়টি গ্রহের কথা বলেছে এইভাবে ঃ

"অন্তরীক্ষের গ্রহপদবাচ্যদের আচরণের সংবাদ যিনি বিদিত সমুদ্রচারী নবসংখ্যক গ্রহও তিনি বিদিত" [1ম মণ্ডল ঃ 25তম সূক্ত ঃ 7ম ঋক]

"সমুদ্র যেমন মাণিক্য মরকত, মুক্তা, কৌস্তুভ, হীরক, গোমেদ, বৈদুর্য, বিদ্রুম ও আয়স্কান্ত এই নয়টি রত্ন এবং নানাবিধ মুদ্রা অর্থাৎ আকৃতির প্রাণী ধারণ করে সমুদ্র নামে খ্যাত, তেমনি অসংখ্য জ্যোতিষ্ক মুদ্রা ও নবসংখ্যক গ্রহের বিহারস্থল অন্তরীক্ষ বিয়ৎ-সমুদ্র নামে ঋকে উপলক্ষিত, গ্রহেরা সমুদ্রচারীর সঙ্গে উপমিত।" [ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র বেলাবাসিনী ও অহনা গুহ]

এই নয়টি গ্রহের সাতটিকে নিয়েই সপ্তাহের বিভিন্ন বারের সৃষ্টি হয়েছে। ওই প্রাচীন ঋষিদের সেই পুরাতন নামকরণ আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশই অনুসরণ করছে। সপ্তাহের দিনগুলি হলো ঃ রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। গ্রহদের নামেই বারগুলির নামকরণ। রবিগ্রহের দিন হলো রবিবার, চন্দ্রগ্রহের দিন হলো সোমবার, কারণ চন্দ্রের আরেক নাম সোম। এইভাবে সপ্তাহের শেষদিন শনিগ্রহের নামানুসারে শনিবার।

ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদের এইসব আবিষ্কারের ঢেউ লেগেছিল পরবর্তীকালের অন্যান্য সভ্যতায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল গ্রীক সভ্যতায়। তাঁরাও তাই সপ্তাহের সাতটি বারের নাম রেখেছিলেন ঃ

Sunday	Day of Sun,
Monday	Day of Moon,
Tuesday	Day of the Mars or Tiw,
Wednesday	Day of the Woden,
	Day of the Mercury,
Thursday	Day of the Thor,
	Day of the Jupiter
Friday	Day of the Friz,
	Day of Venus
Saturday	Day of the Saturn

গ্রীকরা ভারতীয়দের নামকরণের হুবহু নকল করেছিল। তাই আমাদের রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার হয়ে গেলো Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday এবং Saturday.

হরপ্পা তথা বৈদিক যুগের অত্যুন্নত আবিষ্কারগুলি, যেমন পৃথিবীর আহ্নিক গতি, তার বার্ষিক গতি, সূর্যের অয়ন বিচলন, সূর্যের সপার্ষদ নীহারিকা পরিক্রমা ইত্যাদি, গ্রীকরা সম্ভবত সঠিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই খ্রিস্টের জন্মের চার পাঁচশো বা তারও কিছু আগে গ্রীক পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতে শুরু করেন ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ [Geocentric Theory]। এটা সম্ভবত আমাদের পৌরাণিক ধারণার প্রতিফলন। কারণ আমাদের পুরাণগুলির অধিকাংশই ভূকেন্দ্রিক মতবাদের প্রচারক। এই মতবাদ অনুসারে পৃথিবী স্থির ও বিশ্বের কেন্দ্রে অবাস্থিত এবং পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি। আপাতদৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান হয় তার উপর ভিত্তি করেই এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল। সেই সময়কার কিছু গ্রীক পণ্ডিত অবশ্য সূর্যকেন্দ্রিক [Heliocentric] মতবাদে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা তেমন পাত্তা পাননি। যাইহোক, ভূকেন্দ্রিক মতবাদে পণ্ডিতদের তিথি ও গ্রহণ গণনায় কোনও ভুল হত না। কারণ পৃথিবীকে স্থির মনে করে অন্যান্য সব বস্তুর আপেক্ষিক গতি নিয়ে এই সব জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় ভুল থাকতো না। খ্রিস্টপূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতকে গ্রীক বিজ্ঞানী হিপ্পারকাস [Hipparchus] এবং খ্রিস্টজন্মের পরে দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি [Ptolemy) সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রদের বিচলন [Movement] সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

টলেমি ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদে বিশ্বাস করতেন। এই ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ তাই টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদ ইউরোপের দেশগুলিতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। যদিও আমাদের দেশে সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, বরাহমিহির ইত্যাদিরা অনেক আগেই প্রচার করেছেন। আর এঁদেরও অন্ততঃ হাজার দুয়েক বছর আগে বিশ্ব সূর্যকেন্দ্রিক নয়, সূর্য নিজেও যে তার সৌরজগৎ নিয়ে আমাদের নীহারিকার চারদিকে পাক খাচ্ছে, এই সব তথ্য প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা সুস্পষ্টভাবে প্রচার করেছিলেন।

এথেন্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেরাক্লিডস [খ্রিস্টপূর্ব 388-310] শুক্র ও মঙ্গল এই দুটি গ্রহের সূর্য থেকে কৌণিক দূরত্ব [Angular Distance] নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, এই গ্রহ দুটি পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে না। বরং আবর্তন করে সূর্যের চারিদিকে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে গাগনিক বস্তুগুলির পৃথিবীর চারিদিকে যে দৈনিক আবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার কারণ গাগনিক বস্তুগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে বলে নয়, আসলে পৃথিবী দৈনিক তার কক্ষের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলেই গাগনিক বস্তুদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে বলে মনে হয়। হেরাক্লিডসের এই মতবাদ সে যুগের গ্রীক পণ্ডিতরা মেনে নিতে পারেন নি। এঁর মৃত্যুর পরে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম নিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টারকাস [Aristarchus : 310-230 খ্রিঃ পূঃ]। তিনি বললেন, "স্থির তারকাগুলি ও সূর্য অচল অবস্থায় আছে, কিন্তু পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকারে আবর্তন করছে। সূর্য এই কক্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।" এই মতবাদ সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের সামিল।

এই মতবাদ অ্যারিস্টারকাসকে বিপদে ফেলেছিল। পণ্ডিতেরা তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করলে তার কঠিন শাস্তি হওয়ার উপক্রম হলো। অন্য কোনও বিজ্ঞানী তাই এই মতবাদ অনুসরণ করতে চাইলেন না। বহুদিন পরে কোপারনিকাস [Copernicus : 1473-1543 খ্রিস্টাব্দ] বললেন, পৃথিবী স্থির নয়, বিশ্বের কেন্দ্রেও নয়। সূর্য আছে বিশ্বের কেন্দ্রে এবং সব গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। গ্যালিলিও তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত দূরবীন দিয়ে তা প্রমাণও করলেন। বিজ্ঞানী কেপলার [1571-1630 খ্রিস্টাব্দ], গ্যালিলিও [1564-1642 খ্রিস্টাব্দ] প্রমুখেরা কোপারনিকাসকে অনুসরণ করে গ্রহাদি সম্পর্কে নানা তথ্য আবিষ্কার করলেন। নিউটন [1642-1727 খ্রিস্টাব্দ] তাঁর 'সাধারণ মহাকর্ষ তত্ত্ব' [Universal Law of Gravitation] আবিষ্কার করে তিনি নতুন যুগ আনলেন পদার্থবিজ্ঞান তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানে।

সাম্প্রতিক প্লুটো বিতর্ক বাদ দিয়ে বললে গ্রহদের সংখ্যা মোট নয়টি। যেমন বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। আবার 2003-এ আবিষ্কৃত 2003UB-313-কে গ্রহ ধরলে সৌরমণ্ডলে গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে দশ। তবে ফলিত জ্যোতিষ যে সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র কিংবা রাশির বিচার করে তারা হলো ঃ

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু প্রজাপতি বা ইন্দ্র, বরুণ ও রুদ্র। রাহু কেতু কেন গ্রহ হিসাবে এই তালিকায় স্থান পেয়েছে তার ব্যাখ্যা একটু আগেই করা হয়েছে। আবারো বলি, 'Planet' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ আমাদের 'গ্রহ' শব্দটি নয়। 'গ্রহ' শব্দটির অর্থ গ্রাস করা। 'গ্রহণ' ও 'গ্রহ' শব্দ দুটি একই ধাতু হতে উৎপন্ন। এ দিক থেকে চন্দ্র, সূর্য রাহু, কেতু এই চারটিই গ্রহপদবাচ্য যদিও তারা 'Planet' নয়। আবার রাহু ও কেতু দুটি সম্পাত বিন্দু [Nodes] মাত্র। চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমণের কক্ষপথ এবং পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণের কক্ষপথ পরস্পর যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে সেই দুটি বিন্দুই রাহু ও কেতু। প্রজাপতি বা ইন্দ্র, বরুণ ও রুদ্র এই তিনটি গ্রহ অধুনা আবিষ্কৃত। এরা হলো

যথাক্রমে ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। সব মিলিয়ে ফলিত জ্যোতিষ বারোটি গ্রহের কথা বলে। অথচ বাস্তবে পৃথিবীকে নিয়ে 'Planet' সংখ্যা হলো নয়টি এবং তা সম্ভবত আটটি হবে আগামী কিছুদিনের মধ্যে।

ফলিত জ্যোতিষে 27টি নক্ষত্রকে মানবজীবন বা পার্থিব ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বলে ধরা হয়ে থাকে। সাতাশটি নক্ষত্র হলো ঃ (1) অশ্বিনী, (2) ভরণী, (3) কৃত্তিকা, (4) রোহিণী, (5) মৃগশিরা, (6) আর্দ্রা, (7) পুনর্বসু, (8) পুষ্যা, (9) অশ্লেষা, (10) মঘা, (11) পূর্ব-ফাল্গুনী, (12) উত্তর-ফাল্গুনী, (13) হস্তা, (14) চিত্রা, (15) স্বাতী, (16) বিশাখা, (17) অনুরাধা, (18) জ্যেষ্ঠা, (19) মূলা, (20) পূর্বাষাঢ়া, (21) উত্তরাষাঢ়া (22) শ্রবণা, (23) ধনিষ্ঠা, (24) শতভিষা, (25) পূর্বভাদ্রপদ, (26) উত্তর-ভাদ্রপদ, এবং (27) রেবতী।

এই সাতাশটি নক্ষত্রের প্রত্যেকটি আকাশ গোলকে $13^{0}20'$ স্থান দখল করে আছে। তবে এগুলির প্রত্যেকটিই কতকগুলি তারার সমষ্টি বা তারকামণ্ডলী। কারণ কোনও একটি তারা এতবড় হতে পারে না, যা নাকি পৃথিবীর আকাশে $13^{0}20'$ স্থান দখল করে অবস্থান করবে। সুতরাং ওই $13^{0}20'$ জুড়ে যতগুলি তারা আছে সবগুলি নিয়েই একটি তারকামণ্ডলী বা নক্ষত্র তৈরি হয়েছে ধরা হয়। এই সাতাশটি নক্ষত্রকেই চন্দ্রের 27 জন পত্নী হিসাবে কল্পনা করেছে ভারতীয় পুবাণ। এই নক্ষত্রগুলিতে চন্দ্রের অবস্থান কালে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের নৈসর্গিক ঘটনা ঘটছে বলে মনে করা হয়। বৃষ্টিপাত, অনাবৃষ্টি, জোয়ার-ভাঁটার তারতম্য ইত্যাদি চন্দ্রের বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানের ফল বলে মনে করা হয়। তেমনি বিভিন্ন নক্ষত্রে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থানও মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সংঘটনকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। কোনও মানুষের জীবন-যৌবন-ধন-মান ইত্যাদি গ্রহগুলির বিভিন্ন নক্ষত্রে ও রাশিচক্রে অবস্থানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সুদীর্ঘকাল ধরে সুগভীর বিশ্বাস। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় এই সব বিশ্বাসের সত্যতা আজও নিরূপিত হয়নি। তবে এগুলির সবটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্যে সর্বত্র আজও ফলিত জ্যোতিষের যথেষ্ট রমরমা।

সূর্য আকাশ গোলকে তার আপাত-পরিক্রমণ পথে মোট বারোটি নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশিচক্র অতিক্রম করে একবারের পরিক্রমায়। প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলী বা রাশিচক্র খ-গোলকের 30^{0} স্থান জুড়ে অবস্থিত। এই ত্রিশ ডিগ্রি অতিক্রম করতে সূর্য মোটামুটি 30 দিন সময় নেয়। অর্থাৎ সূর্য এক এক মাসে এক একটি রাশিতে অবস্থান করে। খ-গোলকের 360^{0} মোট বারোটি রাশিতে বিভক্ত। ফলিত-জ্যোতিষ এই বিভাগ মানে। তবে শুধু সূর্যের অবস্থান নয় অন্যান্য গ্রহদের এই সব রাশিতে অবস্থানের ফলে পার্থিব নৈসর্গিক ঘটনা ও মানুষের নিজের জীবনের নানা ঘটনা ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রত্যেক রাশির 30^{0} অংশ জুড়ে 2.25টি নক্ষত্র আছে। কারণ পূর্বোক্ত 27টি নক্ষত্রের প্রতিটি $13^{0}20'$ স্থান জুড়ে থাকে এবং 30^{0} স্থান জুড়ে থাকতে সোয়া দুটি নক্ষত্রের বিস্তৃতি লাগে। আকাশে 12টি রাশিচক্র ও নক্ষত্র 27টির অবস্থান স্থির। 12টি গ্রহই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাশিচক্রে এবং বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান করে। এদের মধ্যে সূর্যের গতি হলো আপাত গতি। পৃথিবী ঘুরছে বলেই পৃথিবীর আপেক্ষিকে সূর্যকে আমরা গতিশীল দেখি। বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর আপেক্ষিকে সূর্য স্থির, অবশ্য নীহারিকার কেন্দ্রের চতুর্দিকে সপার্ষদ সূর্যের নিজস্ব গতি আছে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বারোটি রাশি হলো ঃ

(1) মেষ (Aries), (2) বৃষ (Taurus), (3) মিথুন (Gemini), (4) কর্কট (Cancer), (5) সিংহ (Leo); (6) কন্যা (Virgo), (7) তুলা (Libra), (8) বৃশ্চিক (Scorpio), (9) ধনু (Sagittarius) (10) মকর (Capricorn), (11) কুম্ভ (Aquarius) ও (12) মীন (Pisces)। ইংরেজী নামগুলো সব গ্রীক বা লাটিন। এগুলি প্রাচীন ভারতীয় নামের অনুবাদ মাত্র। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর যেটির তারাগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে মেষের আকৃতি নেয় সেটি বহু প্রাচীনকালে মেষ রাশি নামে চিহ্নিত। এইভাবে রাশিচক্রের বারোটি রাশির নামকরণ করা হয়েছে। উপরোক্ত দ্বাদশ গ্রহ, দ্বাদশ রাশি, সাতাশটি নক্ষত্র সবই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক, কেবল সূর্য, চন্দ্র ও রাহু-কেতুকে ফলিত জ্যোতিষ যে 'গ্রহ' বলছে তাতেই আপত্তি আছে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের। তবে এদের গ্রহ বলার পিছনে ফলিত জ্যোতিষ যে যুক্তি দেখিয়েছে তা আগেই বলেছি এবং তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কিন্তু এরা পার্থিব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে—এ ধারণা মেনে নেওয়া যায় না। সৌরমণ্ডলের গ্রহ ও অন্যান্য কয়েকটি বস্তুর সূর্য থেকে দূরত্ব এবং তাদের মুখ্য উপাদানের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

গাগনিক বস্তুর নাম	সূর্য থেকে দূরত্ব [AU]	ঘনত্ব [গ্রাম/ ঘন সেমি]	মুখ্য উপাদান
বুধ	0.4	5.4	লোহা, নিকেল, সিলিকেট
শুক্র	0.7	5.2	সিলিকেট, লোহা, নিকেল
পৃথিবী	1.0	5.5	সিলিকেট, লোহা, নিকেল
চন্দ্র	1.0	3.3	সিলিকেট
মঙ্গল	1.4	3.9	সিলিকেট, লোহা, গন্ধক
বৃহস্পতি	5.2	1.3	হাইড্রোজেন, হিলিয়াম
আইও [IO]	5.2	3.4	সিলিকেট
ইউরোপা	5.2	3.0	জল, বরফ, সিলিকেট
গ্যানিমিড	5.2	1.9	জল, বরফ, সিলিকেট
ক্যালিস্টো	5.2	1.9	জল, বরফ, সিলিকেট
শনি	9.6	0.7	হাইড্রোজেন, হিলিয়াম
টাইটান	9.6	1.8	জল, বরফ, সিলিকেট
ইউরেনাস	19.2	1.2	বরফ, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম
নেপচুন	30.1	1.7	বরফ, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম
ট্রাইটন	30.1	2.0	জল, বরফ, সিলিকেট, জৈববস্তু
প্লুটো	39.4	1.9	জল, বরফ, সিলিকেট, জৈববস্তু

তালিকা ঃ 10A

● এখানে AU হল 'Astronomical Unit, যা সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বের সমান। সাদামাটাভাবে এই দূরত্ব 9.30 কোটি [9.3×10^7] মাইল। প্রকৃতপক্ষে, এই দূরত্ব হল 14.96 কোটি [14.96×10^7] কিলোমিটার। সুতরাং $1AU = 14.96\times10^7$ কিলোমিটার। এইভাবে সূর্য থেকে প্লুটোর গড় দূরত্ব হল $39.4\ AU = 39.4\times14.96\times10^7$ কিমি $= 589.424\times10^7$ কিমি $= 5894240000$ কিলোমিটার। ●

আবারো বলি, 'Planet' ও 'গ্রহ' শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ফলে, 'Planet'-এর সংজ্ঞা ধরে গ্রহকে বিচার করলে ভুল হবেই। হিন্দুরা যে অর্থে সূর্যকে গ্রহ বলেছে তাতে সূর্য 'Planet' নয়। অর্থাৎ সূর্য হিন্দু ব্যাখ্যায় 'গ্রহ' ঠিকই, কিন্তু আধুনিক 'Planet' নয়, আধুনিক ব্যাখ্যায় সূর্য একটি 'Star' বা নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটির ভর প্রায় 1.8×10^{30} কিলোগ্রাম এবং পৃথিবীর ভরের প্রায় 3,30,000 গুণ। একে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীকে নিয়ে নয়টি Planet ও Planet-দের উপগ্রহগুলি, বেশ কয়েকশ' ধূমকেতু, বেশ কিছু টুকরো হওয়া গ্রহ ও তার কণিকা এবং অন্যান্য বহু সৌরবস্তু। এইসব নিয়েই আমাদের সৌরমণ্ডল বা সূর্যের পরিবার, যার কেন্দ্রে আছে সূর্য। সূর্যকে বাদ দিয়ে আমাদের সৌরমণ্ডলের যা ভর তার প্রায় 1,000 গুণ ভর হলো সূর্যের। সপার্ষদ সূর্য অর্থাৎ পুরো সৌরমণ্ডলসহ সূর্য আমাদের গ্যালাক্সী, যার নাম ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড [Milky Way Galaxy], তার কেন্দ্রের চারিদিকে প্রবলগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় 10,000 কোটি। সূর্য তাদেরই একটি। পুরো সৌর জগতের যা আয়তন তার প্রায় একশো কোটি গুণ আয়তন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের। এখানে দুটি নক্ষত্রের মধ্যে গড় দূরত্ব প্রায় 1.5×10^{14} কিলোমিটার, অর্থাৎ সূর্য থেকে শেষ গ্রহ প্লুটোর যা দূরত্ব, তার প্রায় 25,000 গুণ।

নিউটনের গতিসূত্র এবং মহাকর্ষ তত্ত্ব দিয়ে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং গ্রহাণুসমূহের গতিবিধি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 1687 খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির তথ্য তখনও জানা ছিল না। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট [Immanuel Kant] 1755 সালে প্রথম বললেন, সৌরমণ্ডল শুরু হয়েছিল কণা-সমূহের মেঘ থেকে। ছড়িয়ে থাকা কণাদের মেঘ থেকে, মহাকর্ষ এবং পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এই সৌরমণ্ডল সৃষ্ট হয়েছে তার ঘূর্ণায়মান গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি নিয়ে। কান্ট ছিলেন মূলতঃ দার্শনিক। তিনি অঙ্ক কিংবা পদার্থবিজ্ঞান জানতেন না। তাই তিনি তাঁর এই মতবাদটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তবে তাঁর এই তত্ত্ব কিন্তু এই আধুনিককালে নতুন করে মেনে নেওয়া হয়েছে।

কান্ট তাঁর তত্ত্ব পেশ করার প্রায় 40 বছর পরে ফরাসী গণিতবিদ ল্যাপ্লাস [Pierresimon Laplace] সৌরমণ্ডল সম্পর্কে কান্টের মতবাদ'ক নতুন রূপে পেশ করলেন। কণিকার মেঘ থেকে অঙ্কের নিয়ম মেনে, নিউটনের সূত্রকে অনুসরণ করে কীভাবে সৌরমণ্ডল তৈরি হল তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিলেন ল্যাপ্লাস। কণিকার মেঘ থেকে সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হওয়ার অনুসিদ্ধান্তকে বলা হল 'কান্ট-ল্যাপলাস নেবিউল্যার হাইপোথেসিস' [Kant-Laplace Nebular Hypothesis]। ধূলিকণা ও গ্যাসের নীহারিকা থেকে আমাদের সৌরমণ্ডল তৈরির এই সিদ্ধান্তকে 'নেবিউল্যার হাইপোথেসিস'-ও বলা হয়। এই মডেলের সমস্যা হল এটি গ্রহদের অত্যন্ত খামখেয়ালি কক্ষপথ এবং বক্রীগতি সম্পন্ন উপগ্রহদের কক্ষপথগুলির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এছাড়া, সৌরমণ্ডলের মোট ভরের 99.9% ভর একা সূর্যই দখল করে বসে আছে;আবার বাইরের দিকের গ্রহগুলি সৌরমণ্ডলের মোট কৌণিক ভরবেগের [Angular Momentum] 99% বহন করছে। এই তত্ত্বকে একেবারে সঠিক হতে হলে, এই সমস্যার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে হবে, যা সম্ভব হয়নি। এই তত্ত্বের সঙ্গে সূর্য ও গ্রহদের গতিবেগের সামঞ্জস্য থাকে, যদি সূর্যের ঘূর্ণনবেগ আরও কিছুটা বেশি হয় এবং গ্রহদের সূর্য-পরিক্রমণ বেগ আরও কিছুটা ধীরগতিসম্পন্ন হয়। এই সব সমস্যার জন্য বিজ্ঞানীরা সৌরমণ্ডল সৃষ্টি সম্পর্কিত আরও কিছুটা যৌক্তিক এবং সঠিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে থাকলেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় [1900 খ্রিস্টাব্দ] চেম্বারলিন [Thomas Chrowder Chamberlin]

ও মোউলটন [Forest Ray Moulton] সৌরমণ্ডল সৃষ্টি-সংক্রান্ত এক নতুন তত্ত্ব দেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয় 'চেম্বারলিন-মোউলটন তত্ত্ব' [Chamberlin-Moulton Theory]। অনুরূপ তত্ত্ব দিলেন জীন্স্ [Sir James Jeans] এবং হ্যারল্ড জেফ্রে [Sir Harold Jeffreys]। এঁরা দু'জন ছিলেন বৃটিশ বিজ্ঞানী। এঁদের দেওয়া তত্ত্ব 'Tidal Theory' নামে বিখ্যাত। এই তত্ত্ব অনুসারে আদি সূর্যের কাছ দিয়ে একটি অতি বড় নক্ষত্র, সম্ভবত চিত্রা নক্ষত্র, অতিক্রম করার সময় সূর্যের একটা অংশ স্ফীত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই সৌরমণ্ডলের বাকীদের সৃষ্টি। তবে এই তত্ত্বের প্রধান সমস্যা হল, দুটি নক্ষত্রের মধ্যে এ ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনা খুবই বিরল। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের 2000 কোটি বছর বয়সের মধ্যে সামান্য কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে কি না সন্দেহ।

1940 থেকে 1955 সালের মধ্যে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Carl F. Von Weizsäcker এবং ওলন্দাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুইপার [Gerard P. Kuiper] ও আমেরিকার রসায়নবিদ উরে [Harold C. Urey] একটা নতুন তত্ত্ব দিলেন সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে। এঁদের তত্ত্বের নাম 'ধূলি-মেঘ তত্ত্ব' [Dust Cloud Theory]। এই তত্ত্বানুসারে সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান ধূলিকণা ও গ্যাসের মেঘ থেকে। এই মেঘ ঘন হয়েছে, এর ঘূর্ণন বেড়েছে। ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রের কাছাকাছি ছোট ঘূর্ণি এবং দূরের দিকে বড় ঘূর্ণি উৎপন্ন হয়েছে। কেন্দ্রে জন্ম নিয়েছে সূর্য, দুদিকে গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। প্রায় 500 কোটি বছর আগে সূর্যে শুরু হয়েছে তাপ কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া [Thermo-nuclear Reaction]। পৃথিবী তৈরি হয়েছে 460 কোটি বছর আগে। এই তত্ত্ব সৌরমণ্ডল সৃষ্টি সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল। এই তত্ত্বের সঙ্গে নেবিউল্যার তত্ত্বের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ধূলিকণা-মেঘ তত্ত্বে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ও উল্কাদের তৈরি হওয়ার উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া গেল। তবে এই তত্ত্বও সৌরমণ্ডলের সব কিছুরই একেবারে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এই Dust-Cloud Theory-ই বর্তমানে সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রায় সর্বজন গৃহীত তত্ত্ব।

সৌর মণ্ডলের কৌণিক ভরবেগ সমস্যার সমাধান কান্ট-ল্যাপলাস তত্ত্ব যেমন করতে পারে নি, তেমনি ধূলিকণা-মেঘ তত্ত্বেও এর সমাধান পাওয়া যায় নি। সৌরমণ্ডলের মোট ভরের 99.9% ভর হল একমাত্র সূর্যের; আবার সৌরমণ্ডলের মোট কৌণিক ভরবেগের 99% রয়েছে গ্রহদের কব্জায়—এদের কারণ ব্যাখ্যা ওই সব তত্ত্ব দিয়ে আজও সম্ভব হয় নি। মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে এদের ব্যাখ্যার চেষ্টা চলছে। সূর্যের চেয়ে সামান্য বড় নক্ষত্র থেকে শুরু করে সবচেয়ে ছোট নক্ষত্র অবধি সবাই সামান্য ধীরগতিতে আবর্তন করে—অর্থাৎ এদের প্রত্যেকেরই কৌণিক ভরবেগের ঘাটতি বিদ্যমান। সূর্যেরও কৌণিক ভরবেগের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি ঠিক কেন তা বলা সম্ভব হয় নি। তবে অনুমান করা হয়, 'সৌর-ঝটিকা'ই সূর্যের কৌণিক ভরবেগের মান কমিয়ে দিচ্ছে। সূর্যের ঘূর্ণন বেগ তাই কম হচ্ছে। গ্রহদের কৌণিক ভরবেগের মান কমেনি প্রায় 460 কোটি বছরের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে, কিন্তু সূর্যের কৌণিক ভরবেগ ক্রমশঃ কমছে এই দীর্ঘ সময়ে।

সূর্য

সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র। এটি G2V শ্রেণিভুক্ত। G2 মানে দ্বিতীয় উষ্ণতম নক্ষত্র। এর বহির্মণ্ডলের উষ্ণতা 6000 ডিগ্রি কেলভিন এবং অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা প্রায় 2 কোটি [2×10^7] ডিগ্রি কেলভিন। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের 10,000 কোটি [10^{11}] নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি নক্ষত্র।

ছায়াপথের ব্যাস 1,00,000 আলোকবর্ষ। সূর্য রয়েছে এর কেন্দ্র থেকে 33000 আলোকবর্ষ দূরে। ছায়াপথের প্রান্তদেশ থেকে 17,000 আলোকবর্ষ ভিতরে।

সূর্যের ব্যাসার্ধ $R_{\odot}$ হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধের 109 গুণ। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব $215R_{\odot}$। ফলে, পৃথিবীর আকাশে 1/2 ডিগ্রি কোণ করে সূর্য। চাঁদও সমান কোণ করে আকাশে অবস্থান করছে। পৃথিবীর আকাশে তাই চন্দ্র এবং সূর্যকে একই রকম আকারেই দেখা যায়। পৃথিবীর থেকে সূর্যের যতটা দূরত্ব তার প্রায় 2,50,000 গুণ দূরে রয়েছে পৃথিবীর নিকটতম দ্বিতীয় নক্ষত্রটি। প্রথমটি অবশ্যই সূর্য। দূরতর দ্বিতীয় নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য 6,200 কোটি ভাগ কম হয় পৃথিবীতে। সূর্যের বহির্মণ্ডলের 6000 ডিগ্রি কেলভিনে সমস্ত পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের এই বহির্মণ্ডল 'ফটোস্ফিয়ার' [Photosphere] নামে খ্যাত। এখান থেকেই সূর্যের বেশির ভাগ রশ্মি বিকিরিত হয়ে পৃথিবীতে আসে।

সূর্যের ভর সৌরমণ্ডলের সব গ্রহদের মোট ভরের 743 গুণ এবং পৃথিবীর ভরের 3 30,000 গুণ। সৌরমণ্ডলে সৌর মহাকর্ষই মুখ্য শক্তি, বাকী সব গৌণ। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের ঘনত্ব 100 গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। সূর্যের কেন্দ্রের উষ্ণতা অন্ততঃ 1.5 কোটি ডিগ্রি কেলভিন। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের চাপের প্রায় 10,000 গুণ হল সূর্যের কেন্দ্রস্থলের চাপ এবং এটি হল 3,500 কিলোবার [Kilo-bars]। এই প্রচণ্ড তাপ ও চাপে তাপ-কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া শুরু হয় সূর্যের বুকে। পৃথিবী শক্তিলাভ করে সূর্যের এই তাপ-কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া থেকে। পৃথিবীতে জীবন জারি থাকে এই শক্তির অবদানে।

সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা 1.5 কোটি ডিগ্রি কেলভিন। এটা ক্রমশঃ কমতে কমতে ফটোস্ফিয়ারে এই উষ্ণতা দাঁড়ায় 6000 ডিগ্রি কেলভিন। আবার ফোটোস্ফিয়ারের বাইরের স্তরে, যে স্তরকে আমরা বলি 'ক্রোমোস্ফিয়ার' [Chromoshere], সেখানে বিপরীত ঘটনা ঘটে। উষ্ণতা ওই ক্রোমোস্ফিয়ারে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই স্তরটি 7000 কিলোমিটার বেধসম্পন্ন। এই স্তরটির উষ্ণতা 8,000 ডিগ্রি কেলভিন। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় ক্রোমোস্ফিয়ারকে গোলাপী বলয়ের মত দৃষ্ট হয়। ক্রোমোস্ফিয়ারের বাইরে সূর্যের চারিদিক ঘিরে রয়েছে একটা অনুজ্জ্বল জ্যোতির্বলয়। একে বলা হয় সূর্যের 'করোনা' [Corona] বা 'সৌর-কিরীট'। এর উষ্ণতা প্রায় দশ লক্ষ [10^6] ডিগ্রি সেলসিয়াস বা কেলভিন। এখান থেকেই সূর্যের তাপ বিকিরিত হতে থাকে এবং এই তাপ গ্রহগুলিতে পৌঁছায়। সূর্য থেকে $5R_{\odot}$ বা সূর্যের ব্যাসার্ধের পাঁচ গুণ দূরত্বের পর এই করোনা প্রবাহের গতিবেগ প্রায় প্রতি সেকেন্ডে 400 কিলোমিটার। এই প্রবাহের নাম 'সৌর-ঝটিকা' [Solar Wind]। এই প্রবাহে রয়েছে অসংখ্য তাড়িতাহিত কণিকা। সূর্যের ব্যাস 13,60,000 কিলোমিটার বা 8,46,000 মাইল।

সূর্য একটি স্থির শক্তির উৎস। এর শক্তি বিকিরণের হারকে বলা হয় 'সৌর ধ্রুবক' [Solar Constant]। এর মান হল 137 আর্গ প্রতি বর্গ মিটারে প্রতি সেকেন্ডে [Ergs/m^2/Sec]। একে অন্য একক দিয়ে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় 1.98 ক্যালোরি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে [Cal/Cm^2/Min]। সৌর ধ্রুবকের এই মান দুটি আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সূর্যের বিশাল বিকিরিত শক্তির যেটুকু আমাদের পৃথিবী পাচ্ছে তার মান হল 137 আর্গ / মিটার^2 / সেকেন্ড বা 1.98 ক্যালোরি / সেন্টিমিটার^2 / মিনিট। এই মানের পার্থক্য সাধারণতঃ 0.1%-এর বেশি হয় না। তবে, 11 বছর অন্তর যখন সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, তখন শক্তির বিকিরণের অনেকটাই পার্থক্য ঘটে। পৃথিবী তখন উপরোক্ত পরিমাণের তুলনায় অনেকটাই বেশি বিকিরিত শক্তি পেয়ে থাকে সূর্যের থেকে সৌরকলঙ্কের কারণে।

সূর্য তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় [Thermonuclear Reaction] প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 60 কোটি [6×10^8] টন হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করছে। এই রূপান্তরণ থেকেই প্রবল শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র মেনে। অন্যান্য নক্ষত্রদের মত এই শক্তিই সূর্যের শক্তির মূল উৎস। সূর্যের মোট ভরের 92% হল হাইড্রোজেন পরমাণু, 7.8% হল হিলিয়াম পরমাণু এবং 0.2% হল অন্যান্য ভারী মৌলের পরমাণু। বর্তমান হারে শক্তি উৎপাদন চালু থাকলে সূর্য আরও প্রায় 500 কোটি [5×10^9] বছর ক্রিয়াশীল থাকবে তার এই হাইড্রোজেন ভাণ্ডার নিয়ে। সূর্য তার জীবনের প্রায় 500 কোটি বছর ইতিমধ্যেই কাটিয়ে ফেলেছে। সে এখন মধ্য বয়েসী যুবক।

চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরী হয়। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর হল 4×1.0078 পরমাণবিক ভর একক বা তড়িৎ-চুম্বকীয় একক। একটা হিলিয়াম পরমাণুর ভর হল 4.0026 একক। সুতরাং এই দুই ভরের পার্থক্য হল (4.0312 – 4.0026) বা 0.0286 একক। এর থেকে শক্তি পাওয়া যায় 931×0.0286 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট [Mev] বা 26.63 Mev বা 2 কোটি 66.3 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। সমস্ত হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরণের সময় মোট ভরের মাত্র 0.7% শক্তিতে রূপান্তরিত হয় $E = mc^2$ সূত্র মেনে। 0.7% হাইড্রোজেন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকলে 2×10^{27} টন হাইড্রোজেনের থেকে যতটা শক্তি হবে, প্রতি সেকেন্ডে সেই শক্তি বিকিরণের হার 4×10^{33} আর্গ/সেকেন্ড হলে, সূর্য শক্তি ছড়াতে থাকবে বা সূর্য কিরণ দিতে পারবে মোট 1000 কোটি বছর। তার মধ্যে 500 কোটি বছর অতিক্রান্ত। অতএব সূর্য আরও 500 কোটি বছর কিরণ দিতে পারবে। সূর্য এখন প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে তা হল 4×10^{33} আর্গ/সেকেন্ড, যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সারা বছরে গড়পড়তা যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে তার প্রায় 13,000,000 গুণ বা 1 কোটি 30 লক্ষ গুণ। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে 10 কোটি টন [10^8] হাইড্রোজেন পোড়ায় তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায়। এই পদ্ধতির অন্য নাম 'কেন্দ্রকীয় সংযোজন' [Nuclear Fusion]। বিকিরণের মাধ্যমে সূর্য প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 40 লক্ষ [4×10^6] টন গ্যাস হারাচ্ছে। কেন্দ্রকীয় সংযোজনের সূত্রগুলি হল ঃ

$$e + {}^1H + {}^1H \text{——} {}^2D + \nu + 1.44 \text{ MeV}$$

$${}^2D + {}^1H \text{——} {}^3He + \gamma + 5.49 \text{ MeV}$$

$${}^3He + {}^3He \text{——} {}^4He + {}^1H + {}^1H + 12.85 \text{ MeV}$$

D = ডিউটেরিয়াম [Deuterium]

^2D = ডিউটেরন [Deuteron]

^1H = হাইড্রোজেন পরমাণু

He = হিলিয়াম

ν = উপপারমাণবিক কণা [Subatomic Particle] *বা নিউট্রিনো [Neutrino]*

γ = গামারশ্মি

সূর্য গত 500 কোটি বছর ধরে আলো দিচ্ছে। বলা হয়েছে, প্রতি 100 কোটি বছরে সূর্যের উজ্জ্বল্য 10% বৃদ্ধি পায়। এতাবৎ আদি সূর্যের উজ্জ্বল্য প্রায় 50% বৃদ্ধি পেয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য

বলেন, আদি সূর্যের ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে প্রায় 40%। এটা এই হারে বাড়তেই থাকবে। তারপর একদিন সূর্যের কেন্দ্রের সব হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাবে। এরপর সূর্য হবে 'লাল দানব' [Red Giant]। পৃথিবী অবধি বেড়ে যাবে তার আয়তন। এমন কি মঙ্গলে গ্রহকেও সে গ্রাস করে নিতে পারে। তারপর সে রূপান্তরিত হবে 'সাদা বামন' [White Dwarf] তারায়। আপাততঃ আগামী 500 কোটি বছর সূর্য তার হাইড্রোজেনের তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন করে যাবে।

সূর্যের কেন্দ্রাঞ্চল বাদ দিলে তার আবহমণ্ডলে অছে ফটোস্ফিয়ার [Photophere], ক্রোমোস্ফিয়ার [Chromosphere], সৌর কিরীট [Corona] এবং আছে সৌর-ঝটিকা [Solar Wind]। আগেই বলেছি, ফোটোস্ফিয়ারের বেধ 100 কিলোমিটার এর উষ্ণতা 6000^0K। 82 নম্বর চিত্রে সূর্যের এই ফটোস্ফিয়ার দেখানো হয়েছে। ক্রোমোস্ফিয়ার সূর্যের আবহমণ্ডলের পরবর্তী স্তর। এই স্তরে এক ধরনের গ্যাসীয় উৎক্ষেপণ দেখা যায়। এর নাম 'স্পাইকুলস' [Spicules]। ক্রোমোস্ফিয়ারের উষ্ণতা 10,000 ডিগ্রি কেলভিন থেকে 10 লক্ষ ডিগ্রি কেলভিন হয়। সূর্যের আবহমণ্ডলের সর্বশেষ অংশটিকে বলা হয় করোনা বা সৌর কিরীট। এই অঞ্চলের উষ্ণতা মোটামুটি 16,70,000 ডিগ্রি কেলভিন। এই কোরোনা থেকে তৈরি হয় সৌরঝটিকা, যা পৃথিবীর কাছাকাছি অঞ্চলে 400 কিলোমিটার / সেকেন্ড গতিবেগে দৌড়াচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না, ক্রোমোস্ফিয়ারের ও সৌর-কিরীট অঞ্চলের উষ্ণতা ফোটোস্ফিয়ারের তুলনায় এতো বেশি কেন। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বিকিরণ ক্ষেত্রের কোনও আলোড়নের কারণে তাপের এই অস্বাভাবিক বন্টন। সূর্য কিরীট প্রকৃতির এক নয়ন লোভন দৃশ্য। পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের সময় সৌরকিরীট ভালোভাবে দেখা যায়। অন্য সময় ফোটোস্ফিয়ার থেকে আসা আলো সৌরকিরীটের ঔজ্জ্বল্যকে বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। সৌরকিরীটের মোহিত করা সৌন্দর্য দেখা যায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সামান্য কিছু সময়ের জন্য। পৃথিবীর আকাশে চন্দ্র ও সূর্যকে একই আকারের দেখায়। এরই ফলে পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় বলেই সৌরকিরীটকে ওই সময় ভালো করে দেখা সম্ভব হয়। চন্দ্র যদি আপাতভাবে সূর্যের চাকতির তুলনায় একটু বড় হত তাহলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সৌরকিরীটও ঢাকা পড়ে যেত, তা দেখা যেত না। আবর চন্দ্রের আপাত চাকতি যদি সূর্যের চাকতির চয়ে ছোট হত তা হলে পর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের ফটোস্ফিয়ার ঢাকা পড়তো না। সেক্ষেত্রে সৌরকিরীটকে এমন সুন্দরভাবে দেখা যেত না। এটি একটি প্রাকৃতিক আশ্চর্য যে, সূর্য এবং চন্দ্রকে পৃথিবীর আকশে প্রায় একই আকারের দেখায়।

সৌরকলঙ্ক [Sunspots] সূর্যের একটা অদ্ভুত ঘটনা। এগুলি সৌরপৃষ্ঠের কতকগুলি স্বল্পালোকিত অংশ যাদের ঘিরে রয়েছে কতকগুলি জ্বলন্ত বেষ্টনী। এই স্বল্পালোকিত অংশগুলি কালো দেখায় চারিদিকে এই জ্বলন্ত বেষ্টনী থাকার জন্য। সৌরকলঙ্ক আসলে এক ধরনের ঘূর্ণি যেখান থেকে উত্তপ্ত গ্যাস ঘূর্ণির আকারে অনেক উঁচুতে এবং চারপাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সৌরকলঙ্ক নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই করা হচ্ছে।

সৌরঘটনার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হল 'সৌর লক্ষ্ণীয়তা' [Solar Prominences]। পৃথিবীর আকাশে যেমন মেঘ তার নানা বৈচিত্র্য নিয়ে বিদ্যমান, সূর্যের আকাশে তেমনি আছে এই সৌর লক্ষ্ণীয়তা। এগুলি মূলতঃ উৎপন্ন হয় সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে। এই লক্ষ্ণীয়তা দু'ধরনের ঃ [1] স্থির বা দীর্ঘজীবী [Quiescent] এবং [2] ক্ষণস্থায়ী [Transient]। প্রথমটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে উচ্চমানের চৌম্বকক্ষেত্র। আর ক্ষণস্থায়ী লক্ষ্ণীয়তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রবল উষ্ণতা। এরা ঘন

সৌরকিরীটের অংশ বিশেষ। এর উষ্ণতা 30,000 থেকে 1,00,000 ডিগ্রি কেলভিন অবধি হয়। এগুলির থেকে প্রচুর পরিমাণ অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরিত হয়। সৌরশিখা [Solar Flares] আর একটি সৌর ঘটনা, যার সৃষ্টি হয় সৌরকলঙ্ক থেকে প্রবল পরিমাণে চৌম্বক শক্তি নিঃসরণের ফলে। সৌরশিখা নানা আয়তনের হয়। অনেক সময় একটা বড় সৌরশিখা থেকে প্রতি সেকেন্ডে 10^{33} আর্গ শক্তি নিঃসৃত হয়, যা সূর্যের প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত মোট শক্তির এক চতুর্থাংশ। সৌরশিখার সঙ্গে এক্স-রে স্রোতও যুক্ত থাকে। এই সব এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক থেকে আট অ্যাংস্ট্রম [10^{-8} সেমি] হয়ে থাকে। সৌর লক্ষ্ণীয়তার উচ্চতা যেমন 4,00,000 কিলোমিটারের বেশি হতে পারে, তেমনি সৌরশিখার দৈর্ঘ্য 5,00,000 কিলোমিটারও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সৌর লক্ষ্ণীয়তা তো বটেই সৌরশিখাগুলিও অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয় হয়ে থাকে। 1973 সালের ডিসেম্বর মাসে দেখা বিশালায়তন একটি সৌরশিখার ছবি দেওয়া হল ৪5 নম্বর চিত্রে।

সূর্যের ঘটনাগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হল সৌরকলঙ্ক। এই সৌরকলঙ্ক নিয়ে গবষেণা চলছে। প্রতি এগারো বছর অন্তর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা কেন কমে তা অজানা। হিসাব কবে দেখা গেছে মোটামুটি সবচেয়ে কম সংখ্যক কালো দাগ দেখতে পাওয়ার পর্যাবৃত্ত কাল 11.08 বছর। এর কারণ অনাবিষ্কৃত। বিস্ময়কর এই সৌরকলঙ্কের নাতিদীর্ঘ আলোচনায় আসি।

চাঁদের কলঙ্কের কথা আমাদের সকলের জানা। 'চাঁদের চরকা কাটা বুড়ি' শৈশবেই শিশুমনে ছায়া ফেলে। কিন্তু সূর্যেরও যে কলঙ্ক আছে তা আমরা অনেকেই জানি না। তবে চাঁদের গায়ের কালো কালো দাগ বা কলঙ্কের প্রকৃতি, সূর্যের গায়ের কালো কালো দাগ বা সৌর-কলঙ্কের প্রকৃতির সঙ্গে এক নয়। সূর্য একটা জ্বলন্ত নক্ষত্র। আর চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোয় সে আলোকিত। তাই চাঁদের গায়ের কালো কালো দাগের কারণ এবং সূর্যের গায়ের কালো কালো দাগের কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। একটা কলঙ্কের সঙ্গে অন্য কলঙ্কটা মেলে না। তাই, চন্দ্র-কলঙ্ক এবং সৌরকলঙ্ক উভয়ে কলঙ্ক হলেও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

প্রাচীন চৈনিক পুঁথিতে সৌর কলঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায় 28 খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের এক লেখায়। সূর্যের গায়ের এই সব কালো দাগের ব্যাখ্যায় সেকালের চৈনিক পণ্ডিতরা উড়ন্ত পাখিদের দায়ী করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা এর সঠিক কারণ জানতেন না। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে এখনও সৌর কলঙ্ক সম্পর্কে বহু কথাই অজানা। নানা গবেষণা চলছে বেশ কিছু বছর ধরে। যাই হোক, 1610 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর নবনির্মিত দূরবীন দিয়ে সূর্যের পূর্ব প্রান্তে অনেকগুলি কালো দাগ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, ওই দাগগুলি সূর্যের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে ক্রমশ পশ্চিম দিকে সরে আসতে আসতে এক সময় ওগুলি মিলিয়ে গেল। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, ওই কালো দাগগুলি সূর্যেরই, বাইরের কোনো কিছুর ছায়া নয়।

এখন জানা গেছে, সৌর কলঙ্কের এক একটা কালো দাগের গড় আয়ু প্রায় এক সপ্তাহ। কোনো কলঙ্কের আয়ু কয়েক ঘন্টা, আবার কোনোটিকে প্রায় আঠারো মাস ধরে সূর্যের গায়ে দেখা যায়। কালো এই দাগগুলো আসলে বিশাল গহ্বর। সবচেয়ে ছোটো দাগ বা গহ্বরের ব্যাস প্রায় 8,000 কিমি এবং সবচেয়ে বড়ো দাগের ব্যাস প্রায় 80,000 কিমি। সূর্যের বাইরের দিকের স্তরের চৌম্বক ক্রিয়ার ফলেই নাকি সৌরকলঙ্ক সৃষ্টি হয়। এগুলি কালো দেখায় সম্ভবত এই কারণেই যে, সূর্যের ওই অঞ্চলগুলিতে ওর আশপাশের উজ্জ্বল অংশের তুলনায় উষ্ণতা অনেক কম। তবে সৌরকলঙ্কের সঠিক কারণ আজও সন্দেহাতীতভাবে নির্ণীত হয়নি।

সৌরকলঙ্কের এই দাগ এক বা একাধিক হতে দেখা যায়। অনেক সময় 100টি এমন দাগ দেখা গেছে। এইগুলিকে সাধারণত জোড়া জোড়ায় উৎপন্ন হতে দেখা যায়। জোড়ের একটির চৌম্বকত্ব অন্যটির বিপরীত। আবার এও দেখা গেছে, সূর্যের উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড়ো কালো দাগ বা গহ্বরের চৌম্বকত্ব, এর দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে বড়ো গহ্বরের চৌম্বকত্বের বিপরীতধর্মী, কিন্তু সমান ক্ষেত্রঘনত্ব বিশিষ্ট। সবচেয়ে বড়ো গহ্বরের তথা সৌর কলঙ্কের চৌম্বকক্ষেত্রের পরিমাণ হল প্রায় 3,500 গউস (Gauss)। গ্যালিলিও ও তাঁর পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সৌর কলঙ্কের গহ্বর সংখ্যা প্রতিবছরই কমবেশি হয়। 1843 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির এক শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরিক সোয়েব (Heinrich Schwabe) বললেন যে, সৌরকলঙ্কের একটা 'পর্যাবৃত্ত চক্র' (Periodic Cycle) আছে। এ কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কালো দাগ দেখা যাবার কিংবা সমসংখ্যক দাগ দেখতে পাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট পর্যাবৃত্ত সময় নেই। তবে সবচেয়ে কম সংখ্যক কালো দাগ দেখতে পাওয়ার সবচেয়ে কম পর্যাবৃত্ত সময় মোটামুটিভাবে 11.08 বছর। এটা সৌরকলঙ্কের গড়পড়তা পর্যাবৃত্ত-কাল। তবে এই পর্যাবৃত্ত কাল 8 থেকে 13 বছর হতে পারে। আবার এক এক সময় কালো দাগের সংখ্যা 46 থেকে আরম্ভ করে 154 অবধি হতেও দেখা গেছে।

সৌরকলঙ্কের নতুন চক্র শুরু হওয়ার সময় দেখা যায়, আগের চক্রের কালো গহ্বরগুলির কিছু অবশিষ্ট রয়েছে সৌর-বিষুবেব (Solar Equator) 5^0 থেকে 10^0 উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশগুলিতে। নতুন চক্রে গহ্বরগুলি সৃষ্টি হয় 25^0 থেকে 40^0 উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলিতে। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃষ্ট গহ্বরগুলির অবস্থান সৌর-বিষুবের নিকটবর্তী হতে থাকে। আস্তে আস্তে গহ্বরগুলির চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরুত্ব (Polarity) পরিবর্তিত হয়। আবার এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, পূর্বতন চক্রের সবচেয়ে বড়ো গহ্বরের চৌম্বকক্ষেত্রের যে মেরুত্ব থাকে, পরবর্তী চক্রের অনুরূপ গহ্বরের চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরুত্ব তার বিপরীত হয়। এই রকম বড়ো গহ্বর 'Leader Spot' নামে পরিচিত। কোনো সৌর কলঙ্কের Leader Spot-এর মেরুত্ব কোনো চক্রে 'উত্তর' (North) হলে, পরের চক্রে তা হয় 'দক্ষিণ' (South)। মেরুত্ব পরিবর্তনের এই ঘটনার কিছু কিছু ব্যাখ্যা এখনকার বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সে ব্যাখ্যাও পুরোপুরি সব সংশয় দূর করতে পারেনি।

রিচার্ড ক্যারিংটন (Richard Carrington) এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এই ইংরেজ জ্যোতির্বিদটি প্রথম দেখালেন যে, সৌর কলঙ্কের নতুন চক্র শুরু হয় 20^0-30^0 উত্তর এবং দক্ষিণ সৌর-অক্ষাংশে এবং তা শেষ হয় 5^0-10^0 উত্তর ও দক্ষিণ সৌর-অক্ষাংশে। নতুন চক্র শুরু হয়ে শেষ হতে সময় নেয় দশ বছরের বেশি। ক্যারিংটনই প্রথম দেখালেন যে, সৌর কলঙ্কের কালো দাগগুলি সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু সব দাগগুলির ঘূর্ণনগতি এক নয়। সৌর-বিষুব অঞ্চলের দাগগুলি দ্রুত ঘোরে। বিষুব অঞ্চলে কালো দাগগুলি ঘুরতে 27 দিন সময় লাগায়, কিন্তু সৌর-মেরু (Solar Pole) অঞ্চলের দাগগুলি একবার ঘুরতে সময় নেয় প্রায় 40 দিন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য ঠিক কঠিন ঘন বস্তুর মতো আচরণ করে না। হেনরিক সোয়েবের পর, সুইজারল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রুডল্‌ফ উল্‌ফ (Rudolf Wolf) এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেন যে, সৌর-কলঙ্ক চক্রের পর্যাবৃত্ত কাল গড়পড়তা 11 বছর।

1979-80 সালে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে খুব সুন্দর এবং উপযোগী একটা শীতকাল আসে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ওই বছর সৌর-কলঙ্কের দাগগুলি সংখ্যায় সর্বাধিক হয়েছে। কয়েকবছর আগে সৌর-কলঙ্কের দাগগুলি যখন সংখ্যায় কম ছিল সে সময় কিন্তু এত সুন্দর এবং অত্যন্ত উপযোগী শীতকাল আমেরিকায় আসেনি। বিজ্ঞানীদের ধারণা হল, সৌর-কলঙ্কের সঙ্গে আবহাওয়ার

একটা নিবিড় সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। 1980 সালেই Solar Max নামের একটা মহাকাশযান পাঠানো হল সৌরকলঙ্ক নিয়ে গবেষণার জন্য। তারপর থেকে সৌরকলঙ্ক নিয়ে গবেষণার জন্য প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে বাইশ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে যে খরা হয়ে থাকে তার সঙ্গে সম্ভবত সৌর-কলঙ্ক চক্রের কোনো যোগাযোগ রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সূর্যের গায়ের ওইসব কালো দাগগুলি গভীর গহ্বর। এই গহ্বরের সবচেয়ে ছোটোটায় পৃথিবীটাই সেঁধিয়ে যেতে পারে, কারণ এর ব্যাস প্রায় 8,000 কিলোমিটার। আবার বড়ো গহ্বরগুলিতে সাত-আট হাজার পৃথিবীর জায়গা হতে পারে অনায়াসেই। এই গহ্বরগুলিতে আছে বিশাল বিশাল চৌম্বকক্ষেত্র যার পরিমাণ 3,500 থেকে 4,000 গউস। এগুলিতে উষ্ণতা কিন্তু কিছুটা কম— প্রায় 4,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আধুনিক মত হল, সূর্যের অভ্যন্তরীণ চৌম্বক-ঝড়ই এই সব গহ্বর তথা সৌর-কলঙ্কের স্রষ্টা। সূর্যের কেন্দ্রাঞ্চলের চৌম্বক-ঝড়ই ধীরে ধীরে সূর্যের উপরিতলে এসে ওইসব গহ্বর বা সৌর কলঙ্কের সৃষ্টি করে।

সৌরকলঙ্কের আশেপাশে আগুনের শিখার মতো শিখা দেখা যায়। সূর্যের জ্যোতিকে হার মানিয়ে এগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এই সব শিখাগুলি সৃষ্ট হয় সম্ভবত গহ্বরগুলির চৌম্বকক্ষেত্র বিলয়নজনিত বিস্ফোরণের জন্য। এই বিস্ফোরণ আধঘন্টা ধরে স্থায়ী হতে পারে। কোনো কোনো বিস্ফোরণে যে শক্তি নিঃসৃত হয় তার পরিমাণ, সূর্যের প্রতিদিন নিঃসৃত শক্তির এক হাজার ভাগের এক ভাগ অবধি হতে পারে এবং এই বিশাল শক্তির নিঃসরণ ঘটে সূর্য-গাত্রের খুব সামান্য জায়গা থেকে। ফলে সূর্যের গায়ে এগুলিকে প্রজ্জ্বলিত শিখার মতোই দেখায়। এই শক্তি নিঃসরণের সঙ্গে বেরিয়ে আসে এক্স-রে, প্রোটন কণা, অন্যান্য নানা আয়ন। এই শক্তি ঝড়ের বেগে এসে ধাক্কা দেয় আমাদের বায়ুমণ্ডল বা আবহমণ্ডলের উপরি স্তরে। ফলে, নানা গোলমাল দেখা যায় বেতার তরঙ্গে, উপগ্রহ যোগাযোগে, দূরসঞ্চার যোগাযোগ ব্যবস্থায়, র‍্যাডারের পর্দায় ইত্যাদিতে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমনি এক সৌর-ঝটিকা ইংল্যাণ্ডের সমস্ত মাইক্রোওয়েভ স্টেশনকে প্রভাবিত করেছিল এবং তার সমস্ত র‍্যাডার নেট-ওয়ার্ক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

সৌরকলঙ্কের বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো হল ঃ

(1) সাধারণত এরা জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়।

(2) জোড়ার একটির—বিশেষ করে দর্শকের ডানদিকেরটির—চৌম্বকক্ষেত্র চৌম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর গুণসম্পন্ন এবং বাঁদিকেরটির গুণাবলী চৌম্বক দক্ষিণ মেরুর মতো।

(3) জোড়ের ডান-বামের এই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুত্ব হয় সূর্যের উত্তর গোলার্ধে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত হতে দেখা যায়।

(4) সৌরকলঙ্ক উত্তর ও দক্ষিণ উভয় সৌর-গোলার্ধের মাঝামাঝি অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং প্রায় এগারো বছর ধরে সৌরবিষুবের দিকে এগিয়ে এসে একসময় কলঙ্কগুলি মিলিয়ে যায়।

(5) আবার নতুন সৌরকলঙ্কের উদ্ভব হয় মোটামুটি এগারো বছর অন্তর।

এগারো বছরের এই সৌরকলঙ্ক পর্যাবৃত্তচক্র নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। 280 বছরের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে 1645 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1715 খ্রীষ্টাব্দ অবধি এই 70 বছর কোনো সৌরকলঙ্ক দেখা যায় নি। এর কারণ অজানা। এই সময় সৌর-মেরুজ্যোতিও অদৃশ্য হয়ে যায়। এই মেরুজ্যোতি আবার

দেখতে পান হ্যালির ধুমকেতু-খ্যাত স্যার এডমণ্ড হ্যালি [Edmund Halley] 1716 খ্রিস্টাব্দে। বলা হয়, সৌর কলঙ্ক না থাকার জন্য 1680 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে অবিশ্বাস্য শীত পড়েছিল। টেমস নদীর জল জমে সে বছর এত বরফ হয়ে গিয়েছিল যে, ওই বরফের উপর বিশাল মেলা বসেছিল বেশ ক'দিন ধরে।

গাছের কাণ্ডে যে সব বলয় (Ring) দেখা যায় তাদের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ আছে। 1920 সালে A.E.Douglass সর্বপ্রথম এ ধরনের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। গাছের গুঁড়ির ওই সব বলয় থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সৌর কলঙ্ক যে বছর বেশি দেখা যায় সে বছর গাছের বৃদ্ধি যথেষ্ট ভাল হয়। কারণ সে বছর শীত কম হয় এবং ফলে আবহাওয়া গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয়। তিনি আরো দেখেছিলেন, যে 70 বছর সৌর কলঙ্ক অনুপস্থিত ছিল সেই 70 বছর গাছের বৃদ্ধির হারে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি এবং বলয়গুলির আকার, আকৃতি, প্রকৃতি সবই ওই 70 বছর ধরে প্রায় একই রকম ছিল। এই ঘটনার আধুনিক ব্যাখ্যা হল এই রকম ঃ

বায়ুমণ্ডলে কার্বন আইসোটোপ [Isotope] C_{14}-এর পরিমাণ প্রায় ধ্রুবক [Constant]। C_{14}-এর পরিমাণ প্রায়শই কমতে থাকে মহাজাগতিক রশ্মির [Cosmic Rays] নিরন্তর আঘাত বা সংঘর্ষের ফলে। বায়ুমণ্ডলে C_{14} কমতে থাকলে গাছের গুঁড়ির বলয়গুলিতেও তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু যে বছর সৌর কলঙ্ক বেশি হয় সে বছর সৌর-ঝটিকা প্রবল বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে এবং মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে সৌর-ঝটিকার প্রোটন ও অন্যান্য আয়নিত কণিকার ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ ও প্রতিক্রিয়া বহুলভাবে হ্রাস পায়। ফলে, বায়ুমণ্ডলে C_{14}-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছেদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। তাই প্রতিফলিত হয় গাছের গুঁড়ির বলয়গুলিতে। এই C_{14} তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখা গেছে, গত কয়েক হাজার বছরে যখনই সৌর কলঙ্কের পরিমাণ বেশি হয়েছে তখনই পৃথিবীর উচ্চতর অক্ষাংশগুলিতে [Higher Latitudes] ঠাণ্ডা কমে গেছে, ফসল খুব ভালো হয়েছে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধিও ঘটেছে উচ্চতর হারে। 1982 সালে সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র শৈত-প্রবাহের কারণ হিসাবে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ওই বছর সৌর কলঙ্ক উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। শীতপ্রধান অঞ্চলগুলিতে শৈত্য কমাতে, পৃথিবী জুড়ে ভালো ফসল ফলাতে, বৃক্ষাদির সুষ্ঠু বৃদ্ধি ঘটাতে সৌর কলঙ্কের প্রভাব অনস্বীকার্য। যে বছর সৌর কলঙ্কের কালো দাগগুলি বৃদ্ধি পাবে সে বছর শস্যপূর্ণা হবে বসুন্ধরা। সম্ভবত 2015 খ্রিস্টাব্দ পৃথিবীর পক্ষে খুব দুঃসময় হবে, যখন পৃথিবীর উচ্চতর অক্ষাংশগুলিতে প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ চলবে। পৃথিবীর উৎপাদন কমে যাবে। আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হবে। কারণ 2015 সালে সৌর কলঙ্ক সম্ভবত সবচেয়ে কম হবে এবং ওইগুলি হবে তারই ফলশ্রুতি। সৌর কলঙ্কের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে পৃথিবীর আবহাওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ। সৌর কলঙ্ক নিয়ে গবেষণার পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করার ব্যাপারটা এখন তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

সূর্যের আদি-অন্ত থেকে শুরু করে তার নানা ঘটনা, নানান অবদান ইত্যাদি নিয়ে বলতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যায়। তাই সূর্যের কথা শেষ করি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের কথা দিয়ে। সূর্যগ্রহণ এক অপূর্ব নৈসর্গিক ঘটনা। সূর্যের থেকে চন্দ্র আকার-আয়তনে অনেকটাই ছোট হলেও দূরত্ব নিবন্ধনহেতু চন্দ্র এবং সূর্যকে পৃথিবীর আকাশে প্রায় একই আকারের চাক্তি হিসাবে দেখা যায়। আর ঠিক এই কারণেই সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। সৌরকিরীট খুব ভালোভাবে দেখা সম্ভব হয় ওই সময়। সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের বিবরণে আসি।

সূর্যের গ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, রাহু ও কেতু। সূর্য একটি মাঝারি আকারের মাঝ বয়সী নক্ষত্র। প্রাচীনকালের হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একে বলতেন 'গ্রহ'। গ্রহণ সংঘটনকারী বলেই সূর্য তাঁদের চোখে ছিল 'গ্রহ', যদিও তাঁরা ভালো করেই জানতেন সূর্য একটা ছোট মাপের নক্ষত্র। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যকে 'গ্রহ' বলেছেন, কিন্তু সূর্য 'Planet' নয়। সুতরাং সূর্য প্রাচীন ব্যাখ্যায় 'গ্রহ' হতে পারে, কিন্তু আধুনিক 'Planet' নয়। আধুনিক ব্যাখ্যায় সূর্য একটি 'Star' বা নক্ষত্র। সূর্যের ভর প্রায় 1.8×10^{30} কিলোগ্রাম, যা পৃথিবীর ভরের প্রায় 3,33,420 গুণ। একে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীকে নিয়ে নয়টি 'Planet' এবং এই সব 'Planet'-এর উপগ্রহগুলি [Satellites], বেশ কয়েকশ' ধূমকেতু, বেশ কিছু টুকরো হওয়া হওয়া গ্রহ ও তার কণিকা এবং অন্যান্য নানা সৌরবস্তু। এই সব নিয়েই আমাদের সৌর-পরিবারের যা ভর তার প্রায় 1000 গুণ ভর হল সূর্যের। সপার্ষদ সূর্য অর্থাৎ পুরো সৌরমণ্ডলসহ সূর্য আমাদের গ্যালাক্সী—যার নাম 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড' [Milky Way Galaxy]—তার কেন্দ্রের চারিদিকে প্রবল গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় 25 কোটি বছরে একবার ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রকে পরিক্রমা করছে আমাদের এই সূর্য। এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে 10,000 কোটিরও বেশি নক্ষত্র। সূর্য তাদেরই একটি। পুরো সৌরমণ্ডলের যা আয়তন তার প্রায় 100 কোটি গুণ আয়তন আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের। এখানে দুটি নক্ষত্রের মধ্যে গড় দূরত্ব প্রায় 1.5×10^{14} কিলোমিটার, যা সূর্য থেকে শেষ গ্রহ প্লুটোর যা দূরত্ব তার প্রায় 25,000 গুণ।

সূর্যের বিষুব ব্যাস 8,65,400 মাইল বা 13,92,725 কিলোমিটার। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের 13,06,000 গুণ। পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব 9,29,55,000 মাইল বা 14,95,96,377 কিলোমিটার। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে উপবৃত্তাকার পথে। এ পথে সূর্য পৃথিবীর কখনো খুব কাছে আসে, কখনো বেশ কিছুটা দূরে চলে যায়। সূর্য থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দূরত্ব হয় 9.451 কোটি মাইল বা 15.2099 কোটি কিলোমিটার। আর পৃথিবী থেকে সূর্যের সবচেয়ে কম দূরত্ব হল 9.14 কোটি মাইল বা 14.7094 কোটি কিলোমিটার। সূর্য তার অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় নেয় 25 দিন 3 ঘন্টা 21 মিনিট 36 সেকেন্ড। সূর্য এক মধ্য-বয়সী নক্ষত্র। এর বয়স প্রায় 500 কোটি বছর। আরও 500 কোটি বছর সূর্য টিকে থাকবে। তারপর 'সাদা বামন' [White Dwarf] হয়ে যাবে। সূর্য একটি নক্ষত্র। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা একে 'গ্রহ' বলতেন এই কারণে যে সূর্য গ্রহণ ঘটায়, সূর্য না থাকলে গ্রহণ হত না। গ্রহণ-সংঘটনকারী হিসাবে সূর্যকে তাঁরা বলতেন 'গ্রহ'।

পৃথিবী সূর্যের এক গ্রহ কিংবা Planet। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এক উপবৃত্তাকার পথে। পৃথিবীর নিজের কোনও আলো নেই। সূর্যের আলোয় পৃথিবী আলোকিত। সূর্যের আলো পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সে অংশে পৃথিবীর দিন, বিপরীত দিকের পৃথিবীতে তখন রাত্রি। পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর আবর্তন করে 24 ঘন্টায় একবার। প্রকৃতপক্ষে এই আবর্তন সময়টা হল 23 ঘন্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ক্রান্তিবৃত্ত পরিক্রমা করে প্রতি সেকেন্ডে 29.79 কিলোমিটার বা 18.51 মাইল গতিতে। অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষ পরিক্রমণ গতি ঘন্টায় প্রায় 66,636 মাইল। পৃথিবীর মেরু-ব্যাস 7,900 মাইল বা 12,714 কিলোমিটার এবং বিষুব-ব্যাস 7,927 মাইল বা 12,757 কিলোমিটার। পৃথিবীর ভর হল 5.974×10^{21} মেট্রিক টন। এর আয়তন 1.0822464×10^{12} ঘন কিলোমিটার। পৃথিবী তার ক্রান্তিবৃত্তে যেমন এক সৌর বৎসরে সূর্য প্রদক্ষিণ সারছে, তেমনি সে তার অক্ষে সারাদিনে একবার ঘুরছে। পৃথিবী তার একবার সূর্য পরিক্রমার সময়ে 366.25 বার

অক্ষাবর্তন সেরে ফেলছে। পৃথিবী মোট 365.242191 গড় সৌরদিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ক্রান্তিবৃত্ত পরিক্রমার পথে পৃথিবী অবস্থান করছে কিছুটা কাৎ হয়ে। পৃথিবীর অক্ষ ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে প্রায় $23\frac{1}{2}^{\circ}$ কোণ করে আছে। এই হেলানো অক্ষ যখন সূর্যের দিকে থাকে তখন সে দিকের গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। তখন অনেক বেশি আলো ও তাপ সূর্য থেকে এসে পড়ে পৃথিবীর ওই গোলার্ধ অঞ্চলে।

চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ। চন্দ্র এক উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সে পরিক্রমণ পথ খুবই জটিল। চন্দ্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। তার নিজের কোন আলো নেই। চন্দ্র তার অক্ষে একবার ঘুরতে মোটামুটি 27.3 দিন সময় নেয় এবং পৃথিবীকেও একবার ঘুরে আসতে 27.3 দিন সময় নেয়। ফলে, পৃথিবী থেকে আমরা চন্দ্রেব একটা পিঠই সব সময় দেখি। উল্টো পিঠটা কখনো দেখতে পাই না। আবার চন্দ্রের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে ঘোরানো সেটাও যখন সূর্যের আলো পায় না, তখন আর চাঁদ দেখা যায় না। চন্দ্রের ভর 7.349×10^{19} মেট্রিক টন। আয়তন 5.28×10^{9} ঘন মাইল বা 21.99×10^{9} ঘন কিলোমিটার। চন্দ্রের ব্যাস 2160 মাইল বা 3,476 কিমি। চন্দ্রের কক্ষাবর্তনের গতি প্রতি ঘন্টায় 3,680 কিলোমিটার বা 2,287 মাইল। প্রতিদিন চন্দ্র তার কক্ষপথের প্রায় 13.18 ডিগ্রি পথ অতিক্রম করে। পৃথিবী থেকে চাঁদের সবচেয়ে বেশি দূরত্ব 4,05,508 কিলোমিটার বা 2,51,983 মাইল। আর পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যেকার সবচেয়ে কম দূরত্ব হল 3,63,300 কিলোমিটার বা 2,25,755 মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর মধ্যে গড় দূরত্ব 3,84,400 কিলোমিটার বা 2,38,856 মাইল। চন্দ্রের কক্ষতল পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে $5^{0}9'$ কোণ করে আছে। পৃথিবীর বিষুবতল ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে $23\frac{1}{2}^{\circ}$ কোণ করে আছে। ফলে চন্দ্রের বিষুবলম্ব [Declination] প্রায় $28\frac{1}{2}^{\circ}$ পরিবর্তিত হয় সারা বছরে উত্তর কিংবা দক্ষিণে।

চন্দ্রের কক্ষপথ জটিল হওয়ার ফলে চন্দ্রের কক্ষাবর্তনজনিত মাস চার রকমের। সূর্য থেকে দেখলে অর্থাৎ সূর্যের প্রেক্ষিতে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে চন্দ্রের সময় লাগে 29.530589 দিন বা 29 দিন 12 ঘন্টা 44 মিনিট 2.9 সেকেন্ড। এই সময়টা এক চান্দ্রমাস বা সিনডিক মাস [Synodic Month]। কোন নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে যে সময় নেয় তা হল 27.321662 দিন বা 27 দিন 7 ঘন্টা 43 মিনিট 11.6 সেকেন্ড। এই সময়কাল হল এক নাক্ষত্রমাস [Sidereal Month]। আবার রাহু থেকে যাত্রা করে রাহুতে ফিরে আসতে চন্দ্রের যে সময় লাগে তা হল এক গ্রহণ মাস বা ড্রেকনিক মাস [Draconic Month]। এই সময় হল 27.212221 দিন বা 27 দিন 5 ঘন্টা 5 মিনিট 36 সেকেন্ড। আর অনুভূ [Perigee] একবার পেরিয়ে যাওয়ার সময় থেকে আবার অনুভূ অতিক্রম করতে চন্দ্র যে সময়টি নেয় তা হল 27.554550 দিন বা 27 দিন 13 ঘন্টা 18 মিনিট 33 সেকেন্ড. এই সময়টা এক ব্যতিক্রমী মাস [Anomalistic Month]।

চন্দ্রের কক্ষতল পৃথিবীর বিষুবতলের সঙ্গে যে নতিতে [Inclination] রয়েছে তা সবচেয়ে বেশি হল $28\frac{1}{2}^{\circ}$ ডিগ্রি। ওই উভয় কক্ষতলের মধ্যে সবচেয়ে কম নতি হল $18^{0}20'$। পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তের [Ecliptic] সঙ্গে চন্দ্রের বিষুবতল যে কোণে রয়েছে তার মান হল $1^{0}30'$। আবার চন্দ্রের বিষুবতল চন্দ্রের কক্ষতলের সঙ্গে $6^{0}45'$ কোণ করে আছে। সব মিলিয়ে চন্দ্রের অবস্থান নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে বেশ জটিল অঙ্কের সাহায্য নিতে হয়। আর গ্রহণের জন্য চন্দ্রের অবস্থান জানা খুবই জরুরি। প্রাচীনকালে ভারতীয় বা ব্যাবিলোনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সব অঙ্ক কষতে পারতেন।

একালে অবশ্য কম্পিউটার এই সব জটিল অঙ্কের সমাধান চট জলদি করে ফেলছে। ফলে, চন্দ্রের সঠিক অবস্থান, গ্রহণের সঠিক সময় নির্ণয় করা এখন আর তেমন আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়।

চন্দ্র যে পথে পৃথিবী পরিক্রমা করে তার তল হল চন্দ্রের কক্ষতল। আবার পৃথিবী যে কক্ষে সূর্য প্রদক্ষিণ করে তার তল হল পৃথিবীর কক্ষতল বা ক্রান্তিবৃত্ত [Ecliptic]। ক্রান্তিবৃত্ত ও চন্দ্রের কক্ষতল একই সমতলে অবস্থিত নয়। এই দুইতলের মধ্যে যে কোণ বা নতি [Inclination] তা $4^0 58'$ থেকে $5^0 19'$ অবধি হয়। গ'ড় নতি $5^0 9'$। অর্থাৎ ওই দুই কক্ষতল পরস্পরের সঙ্গে $5^0 9'$ কোণে অবস্থিত। চাঁদের এই কক্ষতল ক্রান্তিবৃত্তকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। এই বিন্দু দুটি সম্পাতদ্বয় [Nodes] নামে খ্যাত। বিন্দু দুটির যেটির মধ্য দিয়ে চন্দ্র দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমন করে তাকে বলা হয় 'আরোহীপাত' [Ascending Node]। আর যে বিন্দুর মধ্য দিয়ে চন্দ্র উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়, তাকে বলা হয় 'অবরোহীপাত' [Descending Node]। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহুকাল আগে এদের নামকরণ করেছেন 'রাহু' ও 'কেতু'। আরোহীপাত হল রাহু এবং অবরোহীপাত হল কেতু। চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়লে সূর্যগ্রহণ হয়। চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়তে হলে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীকে এক সরলরেখায় আসতে হবে এবং চন্দ্র ও পৃথিবীকে একই তলে থাকতে হবে। একটি মাসের মাত্র দুটি দিনে চন্দ্র পৃথিবীর কক্ষতল ভেদ করে চলে যায়। আর মাত্র এই দুটি দিনেই সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী একই সমতলে আসে। এই রকম দিনে যদি অমাবস্যা সংঘটিত হয় অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী একই সরলরেখায় আসে, তখন সূর্যগ্রহণ হয় কিংবা সূর্যগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং, সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীতে একই সরলরেখায় আসতে হবে এবং চন্দ্র ও পৃথিবী একই তলে থাকবে, তবেই চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়বে এবং সূর্যগ্রহণ হবে। চন্দ্র রাহু কিংবা কেতুতে না এলে পৃথিবীর সঙ্গে তা একই সমতলে আসে না, সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে না, ফলে গ্রহণও হয় না। তাই রাহু ও কেতু গ্রহণ ঘটায়, রাহু ও কেতু গ্রহণ সংঘটনকারী। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রাহু ও কেতুকে গ্রহণ সংঘটনকারী বিধায় 'গ্রহ' বলতেন। পুরোপুরি গ্রহ না বলে বলতেন 'ছায়া-গ্রহ'।

যাইহোক, সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হয় যখন রাহু বা কেতুতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হয়। রাহু ও কেতুর অবস্থান স্থির হলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ হত। চন্দ্রের উপর পৃথিবী, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহদের মহাকর্ষ ক্ষেত্র ক্রিয়া করার ফলে চন্দ্রের গতিপথ খুবই জটিল। রাহু এবং কেতুর অবস্থানও স্থির কিংবা নির্দিষ্ট নয়। রাহু কেতুর বক্রী-গতি [Retrograde Motion]। এরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভ্রমণ করে। আকাশে 360^0 পাক খেয়ে আসতে কিংবা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিতে এদের সময় লাগে 18.66 বৎসর। রাশিচক্রের 30^0 পার হতে এরা সময় নেয় দেড় বছরের [1½ বছর] কিছুটা বেশি সময়। রাহু কিংবা কেতুর বার্ষিক গড় গতি $19^0 21' 33''$। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্র, পৃথিবী, সূর্য এবং রাহু-কেতুর গতিবিধি ভালো করেই জানতেন। গ্রহণের হিসাব-নিকাশ তাঁরা তাই নিখুঁতভাবেই করতে পেরেছিলেন।

সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণরত পৃথিবী এবং পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণরত চন্দ্র। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে যখন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে এবং এই তিনটি যখন এক সরলরেখায় আসে, তখন সূর্যগ্রহণ হয়। একই সরলরেখায় আসতে হলে পৃথিবী এবং চন্দ্রকে একই সমতলে আসতে হবে। সে দিন অবশ্যই অমাবস্যা হবে। চন্দ্র থাকবে পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে সমসূত্রে এবং চন্দ্র পৃথিবীর কাছ থেকে

সূর্যকে আংশিকভাবে কিংবা সম্পূর্ণভাবে আড়াল করবে। চন্দ্র অনচ্ছ বিধায় সূর্যের সামনে এলে তার ছায়া উৎপন্ন হয়। চন্দ্রের যে দিকে সূর্য থাকে তার বিপরীতে হয় এই ছায়া। এই ছায়া পৃথিবী অবধি পৌঁছালে তবেই পৃথিবী থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্রের যে দিকটা তখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে সে দিকটা তখন আলোকিত। সে দিকটা এমনিতেই পৃথিবী থেকে কখনো দেখা যায় না। আগেই বলা হয়েছে, চন্দ্রের একটা নির্দিষ্ট অংশই পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। কারণ চন্দ্র 27.3 দিনে যেমন একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তেমনি 27.3 দিনে চন্দ্র নিজের অক্ষের উপরও একবার লাট্টুর মত ঘুরে নেয়। ফলে, পৃথিবী থেকে চন্দ্রের একটা পিঠই আমরা সব সময় দেখি। অমাবস্যার দিন চন্দ্রের যে পিঠটা আমরা সব সময় দেখি সে পিঠে সূর্যের আলো পড়ে না। তাই পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখা যায় না। এই সময় চন্দ্রের যে ছায়া সৃষ্টি হয় তা পৃথিবীর উপর পড়লে তবেই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। পৃথিবীর কাছে তখন চন্দ্রের দ্বারা সূর্য আংশিকভাবে আড়াল হয়। পৃথিবীর সেই অংশের লোকেরা দেখে আংশিক সূর্যগ্রহণ। আবার চন্দ্র যেখানে সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে পৃথিবীর সে অংশের লোকেরা দেখবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব তা পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় 400 গুণ। আবার সূর্যের ব্যাস চান্দ্র-ব্যাসের প্রায় 400.7 গুণ। ফলে, পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে যত বড় দেখায়, সূর্যকেও, প্রায় ততটা বড় লাগে। উভয়েই পৃথিবীতে আধ ডিগ্রি [30'] কোণ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দেখলে চন্দ্র এবং সূর্য উভয়েরই কৌণিক ব্যাস আধ ডিগ্রি বা 30 মিনিট। সূর্য যখন সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে অর্থাৎ প্রতি বছর 4ঠা জানুয়ারী, তখন এই কৌণিক ব্যাস হয় 32'32" এবং সূর্য যখন সবচেয়ে দূরে থাকে তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের কৌণিক ব্যাস হয় 31'28"। পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ায় এমনটা হয়।

পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের কৌণিক ব্যাস যেমন সারা বছর ধরে পরিবর্তিত হয়, তেমনি পৃথিবী থেকে দেখা চন্দ্রের কৌণিক ব্যাসও পরিবর্তিত হয় প্রতি চান্দ্র মাসে। পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের আপাত আকার কম-বেশি পরিবর্তিত হয় শতকরা 1.7 ভাগ। পৃথিবীর আকাশে চন্দ্রের আপাত আকারের পরিবর্তন দেখা যায় শতকরা 7 ভাগ সূর্য গ্রহণের সময় চন্দ্রকে পৃথিবী থেকে তার গড় দূরত্বের চেয়ে অনেকটাই কাছে আসতে হবে। কারণ পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্ব 3,84,400 কিলোমিটার। কিন্তু চন্দ্রের ছায়ার দৈর্ঘ্য 3,74,000 কিলোমিটার। আগেই বলা হয়েছে, চন্দ্র উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এই কক্ষপথের যে বিন্দুতে চন্দ্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে সে বিন্দুর নাম 'অনুভূ' [Perigee] এবং যে বিন্দুতে চন্দ্র পথিবীর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করে সে বিন্দুর নাম 'অপভূ' [Apogee] । অনুভূতে অবস্থান করার সময় পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব হয় 3,63,300 কিলোমিটার। আর অপভূতে থাকাকালীন পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব হয় 4,05,508 কিলোমিটার। সুতরাং চন্দ্র অনুভূ বা তার কাছাকাছি থাকলেই চন্দ্রের ছায়া পৃথিবী ছুঁতে পারে এবং তখন সূর্যগ্রহণ হয় যদি পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে, আর চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে আসে। চন্দ্রের অবস্থান বিশেষে সূর্যের 'বলয়' গ্রহণ দেখা যায়।

চন্দ্রের যে দিকে সূর্য থাকে তার বিপরীত দিকে চন্দ্রের দু'রকম ছায়ার উৎপত্তি হয়। এর একটি হল 'প্রচ্ছায়া'[Umbra], অন্যটি 'উপচ্ছায়া' [Penumbra] । সূর্য এক বিস্তৃত আলোক-উৎস। তার সামনে অপেক্ষাকৃত কম বিস্তার অস্বচ্ছ চন্দ্র থাকায় চন্দ্রের পেছনে যে ছায়া পড়ে তা শঙ্কুর [Cone]

রূপ নেয়। এই ছায়া-শঙ্কুর দুটি অংশ। মাঝখানের অংশটিতে সূর্য থেকে বিন্দুমাত্র আলো পৌঁছায় না। এই অংশটি প্রচ্ছায়া। এটি আলোক-উৎস সূর্যের বিপরীত দিকে একটা অভিসারী শঙ্কুর আকারে বিস্তৃত হয়। দূরত্ব যত বাড়ে এই প্রচ্ছায়া শঙ্কুটি ক্রমশ সরু হয়ে একটি বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়। এই বিন্দু হল ছায়া-শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু [Apex] । এই প্রচ্ছায়ার চারদিকে থাকে স্বল্প আলোকিত ছায়া-ছায়া অঞ্চল। এই অঞ্চলটি চন্দ্রের উপচ্ছায়া অঞ্চল। এটিও একটি শঙ্কুর রূপ নেয় তবে এটি অপসারী শঙ্কু। চন্দ্র থেকে এর দূরত্ব যত বাড়তে থাকে এর ছায়া-ঘনত্ব তত কমতে থাকে। কিন্তু এর আয়তন বাড়তে থাকে। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর যে সব অংশে পড়ে সেই সব অঞ্চল থেকে পৃথিবীর লোকেরা সূর্যকে দেখতে পায় না। চন্দ্র আড়াল করে দেয় সূর্যকে। পৃথিবীর ওই সব অঞ্চল দেখে চন্দ্র সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। পৃথিবীর ওই অঞ্চলগুলি থেকে তখন দেখা যায় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। আর যে সব অঞ্চলে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে সেইসব অঞ্চল দেখে সূর্যের আংশিক গ্রহণ। কিছুটা সূর্য সেখান থেকে দেখা যায়, কিছুটা আড়াল করে অস্বচ্ছ চন্দ্র। আবার বিশেষ অবস্থায় চন্দ্রের প্রচ্ছায়া যখন পৃথিবীর কিছুটা দূরেই শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার শীর্ষবিন্দু পৃথিবীর আকাশে কিছুটা উপরে অবস্থান করে, তখন ওই প্রচ্ছায়ার উল্টো শঙ্কু পৃথিবীতে পড়ে এবং পৃথিবীর যে অংশে তা পড়ে সেই সব অঞ্চলের লোকেরা দেখে সূর্যের বলয়গ্রহণ।

পৃথিবী থেকে সূর্যের তিন রকমের গ্রহণ দেখা যায় ঃ (1) পূর্ণ গ্রহণ [Total Eclipse], (2) আংশিক গ্রহণ [Partial Eclipse] এবং (3) বলয় গ্রহণ [Annular Eclipse]। সূর্যের পূর্ণগ্রহণ 'পূর্ণ সূর্যগ্রহণ' [Total Solar Eclipse] বা 'পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ' নামে খ্যাত। আবার সূর্যের আংশিক গ্রহণকে বলা হয় 'আংশিক সূর্যগ্রহণ' [Partial Solar Eclipse] বা 'খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ', কিংবা সূর্যের 'খণ্ডগ্রাস'। তেমনি সূর্যের বলয় গ্রহণ 'বলয় সূর্যগ্রহণ' [Annular Solar Eclipse] বা 'বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ' নামেও অভিহিত হয়। চন্দ্রের অবস্থান ভেদে তার ছায়া তিন রকমভাবে পৃথিবীতে পড়ে এবং ছায়ার বিভিন্নতাই পৃথিবী থেকে সূর্যের এই তিন ধরনের গ্রহণ দেখায়।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

কোনও অমাবস্যার দিনে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া যখন পৃথিবীর কোনও অংশের উপর পড়ে, তখন পৃথিবীর ওই অঞ্চলের লোকেরা কিছু সময়ের জন্য সূর্যকে দেখতে পায় না। এই ঘটনাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণ-তল বা ক্রান্তিবৃত্ত উপবৃত্তাকার। তাই সে তার পরিক্রমার পথে কখনও সূর্যের কাছে আসে, কখনও কিছুটা দূরে সরে যায়। আবার চন্দ্র যে কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে সে পথও উপবৃত্তাকার। চন্দ্রও তার কক্ষতলে পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে কখনো পৃথিবীর কিছুটা কাছে আসে এবং আবার কখনও কিছুটা দূরে চলে যায়। এই দুই কক্ষতলের মধ্যে রয়েছে $5^{\circ}9'$ এর কোণ। অর্থাৎ এই দুই কক্ষতল একই সমতলে নেই। নেই বলেই প্রত্যেক অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না। এই দুই কক্ষতলের পারস্পরিক ছেদ বিন্দু দুটির নাম রাহু এবং কেতু। সুতরাং রাহু এবং কেতুর কাছাকাছি অঞ্চলে চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের সমতলে আসে। অর্থাৎ তখন সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সমতলে থাকে। কোনও অমাবস্যার দিনে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী যখন এক সরলরেখায় অবস্থান করে, চন্দ্র তার কক্ষপথের অনুভূতে কিংবা তার কাছাকাছি থাকে, তখনই কেবল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীকে এক সরলরেখায় আসতে হলে তাদের একই সমতলে আসতে হবে। তারা একই সমতলে আসবে যখন চন্দ্র থাকে রাহু কিংবা কেতুতে। অমাবস্যায় চন্দ্র থাকে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে। আর চাঁদের

প্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ্য 3,74,000 কিলোমিটার। অনুভূ বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে চন্দ্র অবস্থান করলে তবেই পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব 3,74,000 কিলোমিটার বা তার কম হয়। তবেই চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবী ছুঁতে পারে। পৃথিবীর যে অঞ্চলে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পড়ে সেই সব অঞ্চলে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে, অনুভূ-তে অবস্থান করলে চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব দাঁড়ায় 3,63,300 কিলোমিটার। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল চন্দ্রের প্রচ্ছায়ায় ঢাকা পড়ে, সেই অঞ্চলের লোকেরা দেখে চন্দ্রের চাকতি সূর্যকে কিছু সময়ের জন্য পুরোপুরি ঢেকে দিচ্ছে। এই সব অঞ্চলে তখন দেখা যায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। চন্দ্র কিছু সময়ের জন্য সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে দেয়। পৃথিবীর ওই সব অঞ্চলে ঘটে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

চন্দ্রের চাকতিকে বলা হয় 'চন্দ্রবিম্ব' এবং সূর্যের চাকতি হল 'সূর্যবিম্ব'। সুতরাং চন্দ্রবিম্ব যখন সূর্যবিম্বকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে অর্থাৎ সূর্যের সবটাই ঢাকা পড়ে তখনই সূর্যের পূর্ণগ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। চন্দ্রের প্রচ্ছায়ায় পৃথিবীর যে সব অঞ্চল আচ্ছাদিত সেই সব অঞ্চল থেকে দেখা যায় চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বকে কিছু সময়ের জন্য পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্বের প্রায় 400 গুণ। আবার চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় 400 গুণ হলো সূর্যের ব্যাস। ফলে পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্যবিম্বের কৌণিক ব্যাস প্রায় 32 কলা বা 32 মিনিট। আবার পৃথিবী থেকে দেখা চন্দ্রবিম্বের কৌণিক ব্যাস প্রায় 31 কলা বা 31 মিনিট। পৃথিবীর আকাশে তাই সূর্যবিম্ব ও চন্দ্রবিম্বকে একই আকারের দেখায়, যদিও সূর্যবিম্বের ব্যাস চন্দ্রবিম্বের ব্যাসের 400গুণ। এই দুই বিম্বের আপাত সমান আকার হওয়ায় পৃথিবীর আকাশ থেকে দেখা যায় চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলছে। চন্দ্র যদি মাপে আর একটু ছোট হত কিংবা পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব আরো কিছুটা বেশি হত, তবে চন্দ্রবিম্বের আপাত আকার বেশ ছোট হত এবং তখন চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারত না। ফলে, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কখনই সম্ভব হত না। চন্দ্রের আকার যদি আরো কিছুটা বড় হত কিংবা চন্দ্র যদি পৃথিবীর আরে কাছাকাছি থাকতো তবে পৃথিবী থেকে তার কৌণিক ব্যাস আরও বেশি হত। তখন তার প্রচ্ছায়া পৃথিবীর আরো কিছু অংশ জুড়ে পড়ত এবং আরো কিছুটা বেশি সময় ধরে পৃথিবী থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যেত। সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর আরো বেশি লোক আরো কিছুটা বেশি সময়ে ধরে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখতে পারতো।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিন চন্দ্রের প্রচ্ছায়া একটি সরু শঙ্কুর [Cone] আকৃতিতে পৃথিবীতে পড়ে। চন্দ্রের অবস্থান ভেদে এই শঙ্কুটির দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে। মোটামুটি এর দৈর্ঘ্য 3,74,000 কিলোমিটার। ছায়াশঙ্কুটি যেখানে পৃথিবী স্পর্শ করে সেখান একটি উপবৃত্তাকার প্রচ্ছায়া পড়ে এবং সেই প্রচ্ছায়াগ্রস্ত স্থান থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্র এবং পৃথিবী উভয়েই গতিশীল। ফলে, এই প্রচ্ছায়াটি পৃথিবী পৃষ্ঠে সাধারণত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায়। পৃথিবী গোলাকার এবং তার আহ্নিক গতির কারণে এই প্রচ্ছায়ার গতিপথ ঠিক সরলরেখা নয়, সামান্য বক্র। চন্দ্র উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিক্রমা করে। ফলে প্রচ্ছায়ার গতিপথ উপবৃত্তাকার। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর উপরে যে পথে যায় তা 'পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পথ' [Path of Totality]। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বক্র হওয়ায় এই পথের বিস্তার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং তা সবচেয়ে বেশি বিস্তার পায় পথের মধ্যস্থলে। পূর্ণসূর্যগ্রহণের পথের মধ্যবিন্দু থেকে এর শেষ অবধি আবার বিস্তার ক্রমশঃ কমতে থাকে। বিভিন্ন গ্রহণে পৃথিবীর উপরে এই প্রচ্ছায়াটির বিস্তার বিভিন্ন হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে এই প্রচ্ছায়ার প্রস্থ বা বিস্তার কখনই 262 কিলোমিটারের বেশি হয় না। চন্দ্রের উপচ্ছায়ার বিস্তার পৃথিবীর উপরে সাধারণতঃ 3000 কিলোমিটারেরর বেশি

হয় না। কখনো সখনো উপচ্ছায়ার এই বিস্তার 5000 কিলোমিটার অবধি হতে পারে। কিন্তু কখনই তা 5000 কিলোমিটারের বেশি হয় না। চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার গতি পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতি ঘন্টায় 1800 কিলোমিটার থেকে 8000 কিলোমিটার অবধি হতে পারে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার বিস্তার 262 কিলোমিটারের বেশি কখনই না হওয়ায় পৃথিবী পৃষ্ঠের খুব সামান্য অংশ থেকেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা সম্ভব হয়। পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্রায় প্রতি 360 বছরে মাত্র একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের স্থায়িত্বকাল খুবই কম। পূর্ণগ্রাস সর্বনিম্ন কয়েক সেকেন্ড থেকে সর্বোচ্চ 7.5 মিনিট বা সাড়ে সাত মিনিট অবধি স্থায়ী হতে পারে। কারণ দুটি আলাদা উপবৃত্তাকার পথে চলতে চলতে পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্যের সাপেক্ষে কিংবা পরস্পরের সাপেক্ষে কখনও বেশি দূরে চলে যায়, আবার কখনও বা কাছে আসে। ফলে, পৃথিবী থেকে সূর্য ও চন্দ্রকে সব সময় সমান মাপের দেখায় না। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দেখা সূর্য কিংবা চন্দ্রের বিম্ব দুটির আপাত ব্যাস সব সময় সমান থাকে না। যেমন, 4 জানুয়ারী পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের কৌণিক ব্যাস হয় 32'32" । আবার 4 জুলাই পৃথিবী সূর্যের থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করে। তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের কৌণিক ব্যাস হয় 31'28"। খালি চোখে ততটা বোঝা না গেলেও দূরবীন দিয়ে মাপলে তা বোঝা যায়। তফাৎটা 3% মাত্র। চন্দ্রের বেলাও এমনটা ঘটে। সেখানে তফাৎটা বেশি, প্রায় 14%। সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ তখনই হবে, যখন পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব হবে সবচেয়ে কম, অর্থাৎ চন্দ্র থাকে তার কক্ষপথের অনুভূতে, যার অর্থ হল পৃথিবী থেকে চাঁদের কৌণিক ব্যাস হবে সবচেয়ে বেশি এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হবে সবচেয়ে বেশি বা পৃথিবী থেকে সূর্যের কৌণিক ব্যাস হবে সবচেয়ে কম, অর্থাৎ সূর্যবিম্ব বা সূর্যের আপাত মাপ হবে সবচেয়ে কম। জুন-জুলাই মাসে সূর্যের আপাত মাপ ক্ষুদ্রতম। এই সময় কোনো অম্যাবস্যায় চন্দ্রের আপাত মাপ যদি বৃহত্তম হয়, আর তখন যদি চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর বিষুবরেখার কাছাকাছি দিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ অতিক্রম করে, তখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থিতিকাল সাত মিনিটেরও বেশি হতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছিল 1955 সালের 20জুন। এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের গতিপথ গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার উপর দিয়ে। স্থিতিকাল ছিল সাত মিনিটেরও বেশি [7.3 মিনিট]। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় ওই সময় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব বানচাল হয়ে যায়। 1991 সালের 11 জুলাই যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয় তার স্থিতিকাল ছিল 6 মিনিট 56 সেকেন্ড [মতান্তরে 7.2 মিনিট] । এই গ্রহণটি দেখা গিয়েছিল মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকার কিছু অংশে এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে।

2009 সালে 22 জুলাই যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছে তার স্থায়িত্বকাল ছিল 6 মিনিটের উপর। এই সময় চন্দ্রের প্রচ্ছায়া গেছে বারাণসীর খুব কাছ দিয়ে। এবার গুজরাট, দমন, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অরুণাচল এবং ভূটানের অনেক জায়গা থেকে দেখা গেছে পূর্ণ এই সূর্যগ্রহণ। কিন্তু বর্ষাকাল থাকায় ওই সূর্যগ্রহণ বেশির ভাগ জায়গায় ভালোভাবে দেখা সম্ভব হয় নি। কেবল বারাণসী থেকে এই পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা গেছে, ওখানে আকাশ পুরোপুরি মেঘমুক্ত থাকার জন্য। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পূর্ণগ্রাস হবে 2168 সালের 5 জুলাই, যখন দিন দুপুরে সূর্য আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে সাড়ে সাত মিনিটের জন্য এবং সে পূর্ণগ্রহণ দেখা যাবে ভারতবর্ষ থেকেই। জানি না, 160 বছর পরেও পৃথিবীতে মানুষ থাকবে কি না

সেই দীর্ঘস্থায়ী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে। 2009 সালের 22 জুলাই যে পূর্ণসূর্যগ্রহণ হল তার স্থায়িত্ব ছিল 6 মিনিট 38.9 সেকেন্ড। ভারতবর্ষে আবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে 2034 খ্রিস্টাব্দের 20 মার্চ। সেবার জম্মু-কাশ্মীরের কিছু অঞ্চল থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ থেকে দেখা যাবে সূর্যের আংশিক গ্রহণ, কিন্তু পূর্ব-ভারত থেকে সূর্যের কোনও রকম গ্রহণই সেদিন দৃশ্য হবে না।

বিংশ শতাব্দীতে মোট তিনটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায় ভারতবর্ষে। প্রথমটি দেখা গিয়েছিল 16 ফেব্রুয়ারী, 1980 সাল। এই দিন চন্দ্রের প্রচ্ছায়া বিকালের দিকে প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে পৌঁছায়। ভারতে সেদিন আগরতলা, ডিব্রুগড়, গৌহাটি, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, দিল্লী, হরিদ্বার, বারাণসী, পুরী, কোণারক, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ওই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু হয়ে এইবারের সূর্যগ্রহণ শেষ হয় সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও এবং ইন্দোনেশিয়ায়। আফ্রিকা এবং চীনেও এই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠ স্পর্শ করে বেলা 12 টা 42 মিনিটে। পৃথিবীপৃষ্ঠ ছেড়ে যায় বিকেল 4টা 04 মিনিটে। কোণারকে সেবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। দেশ বিদেশের বহু বিজ্ঞানী সেবার ভিড় জমান কোণারকে। সেবার চন্দ্রের প্রচ্ছায়া দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়ে কোণাকুণি অতিক্রম করে পুরীর কাছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যায়।

1995 খ্রিস্টাব্দের 24 অক্টোবর আর একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা গিয়েছিল। এই দিন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পথটি তেহরানে শুরু হয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এসে পৌঁছায় সকালের দিকে। তারপর রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে এই পথ চলে যায় বঙ্গোপসাগরে। কলকাতায় সেবার সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখা যায় নি। সেখানে আংশিক গ্রহণ ছিল যদিও সূর্যের প্রায় 89% অদৃশ্য হয়ে যায় চন্দ্রের আড়ালে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলার উপর দিয়ে গিয়েছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পথ। এই পাঁচটি জেলা হল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগণা ও দক্ষিণ 24 পরগণা। কলকাতার কাছে ডায়মন্ডহারবারে এই পূর্ণগ্রাস স্থায়ী হয়েছিল 1 মিনিট 17 সেকেন্ড, সকাল 8টা 48 মিনিট 56 সেকেন্ড থেকে 8 টা 50 মিনিট 13 সেকেন্ড। প্রায় দেড় লক্ষাধিক লোক ডায়মন্ডহারবার থেকে দেখেছিল সেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। একই সঙ্গে তমলুক, গেঁওখালী, হলদিয়া অঞ্চল থেকেও লক্ষাধিক লোক দেখেছিল এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এই অঞ্চলগুলি মেদিনীপুর জেলায়। এই স্থানগুলিতেও পূর্ণগ্রহণের স্থায়িত্ব ছিল এক মিনিটেরও বেশি। আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। ফলে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হয়েছিল এই পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের সময়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কলকাতায় শেষ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল 1688 সালের 30 এপ্রিল। পরের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে কলকাতাকে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত আরো [2008 খ্রিস্টাব্দ থেকে] 40 বছর।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ভারতবর্ষে দেখা গেল 11 আগস্ট,1999 খ্রিস্টব্দে। এই দিন চন্দ্রের প্রচ্ছায়া প্রথম পৃথিবী ছোঁয় উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরে কানাডার দক্ষিণাঞ্চলে। তারপর সেই প্রচ্ছায়া মধ্য-ইউরোপ এবং মধ্য-পূর্ব এশিয়া পার হয়ে চলে আসে ভারতবর্ষে। এই প্রচ্ছায়া প্রথম পৃথিবী ছুঁয়েছিল ভারতীয় সময় 3টা 0 মিনিট 57 সেকেন্ড। তখন সে প্রচ্ছায়ার বিস্তার ছিল মাত্র 49 কিলোমিটার। পূর্ণসূর্যগ্রহণ পথের বিস্তারের মধ্যরেখায় পূর্ণগ্রহণের স্থায়িত্ব ছিল 47 সেকেন্ড। প্রচ্ছায়া পৃথিবী ছোঁয়ার প্রথম 40 মিনিট খুব কম লোকের কাছে তা দৃশ্য হয়, কারণ প্রচ্ছায়া প্রথম পৃথিবী ছোঁয় অতলান্তিক মহাসাগরের উপর। সিসিলি দ্বীপ থেকে পূর্ণসূর্যগ্রহণ দৃশ্য হল ভারতীয়

সময় বিকেল 3টা 40 মিনিটে। বিকেল 4টা 33 মিনিট 04 সেকেন্ডে পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্বকাল হয় 2মিনিট 23 সেকেন্ড। তখন প্রচ্ছায়ার বিস্তার ছিল 112 কিলোমিটার এবং এর গতিবেগ ছিল 0.680 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। পূর্ণসূর্যগ্রহণ পথের দৈর্ঘ্য ছিল 14000 কিলোমিটার, যেটা পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট আয়তনের 0.2% মাত্র। প্রচ্ছায়া এই পথ অতিক্রম করতে সময় নেয় 3 ঘণ্টা 7 মিনিট।

এই দিন চন্দ্রের প্রচ্ছায়া ভারতে প্রবেশ করে ভারতীয় সময় বিকেল 5টা 58 মিনিটে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া ভারতে এসে গুজরাটের কচ্ছের রাণ এলাকায় প্রথম ভারতের মাটি স্পর্শ করে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পথের মধ্যরেখা গিয়েছিল লাখপত, ভারুচ, মাল্য মিয়ানা, ধ্রাংগান্ধ্রা এবং বরোদার কাছাকাছি দিয়ে। এই অঞ্চলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্ব ছিল 1 মিনিট 2 সেকেন্ড। এরপর প্রচ্ছায়া প্রবেশ করে মহারাষ্ট্রের খেতিয়া, ভুসওয়াল, আকোলা, চন্দ্রপুর ইত্যাদি। জায়গায়। এই সব অঞ্চলে পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্ব কমে 1 মিনিট থেকে 52 সেকেন্ড হয়ে যায়। সূর্যের কৌণিক উচ্চতাও 16 ডিগ্রি থেকে 8 ডিগ্রিতে নেমে আসে। শেষে জগদলপুর (মধ্যপ্রদেশ),কোরাপুট (উড়িষ্যা) এবং শ্রীকাকুলাম (অন্ধ্রপ্রদেশ) হয়ে প্রচ্ছায়া চলে যায় বঙ্গোপসাগরে। ভারতীয় সময় বিকেল 6টা 6মিনিটে প্রচ্ছায়া ভারতের মাটি ছেড়ে যায়। আর বিকেল 6টা 6মিনিট 23 সেকেন্ডে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে যায় চন্দ্রের প্রচ্ছায়া। গুজরাটের লাখপতে প্রচ্ছায়া প্রথম ভারত ছোঁয়। তখন বিকেল 5টা 58 মিনিট 5.9 সেকেন্ড। প্রচ্ছায়া লাখপত ছাড়ে বিকেল 5টা 59মিনিট 6.7 সেকেন্ডে। মোট স্থায়িত্ব কাল ছিল 1 মিনিট 1 সেকেন্ড।
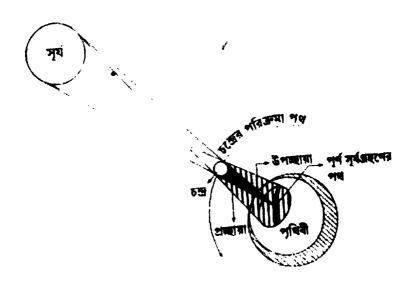
চিত্র ঃ ৪৪

● চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার যতটা পৃথিবীপৃষ্ঠ ছুঁয়ে যায় তার বিস্তার 262 কিলোমিটারের বেশি হয় না। এটাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পথ। এই প্রচ্ছায়া পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে গতিশীল। পৃথিবীর যে অঞ্চল দিয়ে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া যায় সেই অঞ্চলের লোকেরা দেখে সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। উপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন অঞ্চলের লোকেরা দেখে সূর্যের আংশিক গ্রহণ। পৃথিবীর উপরে চন্দ্রের এই উপচ্ছায়ার বিস্তার কখনো 5000 কিলোমিটারের বেশি হয় না। উপরের চিত্রে অবশ্য উপচ্ছায়ার বিস্তার অনেক বেশি করে দেখানো হয়েছে। ●

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিন প্রথমে আংশিক সূর্যগ্রহণ হতে থাকে। তারপর এক সময় চন্দ্র পুরোপুরি সূর্যকে আড়াল করে। ঘটে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। তারপর আবার আংশিক গ্রহণ চলতে থাকে এবং চন্দ্রের উপচ্ছায়াটাও পৃথিবীর মাটি ছেড়ে গেলে আংশিক সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। সূর্য পুরোপুরি গ্রহণ মুক্ত হয়।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের অপূর্ব অতুলনীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা কেবল সে নিজেই। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের চারটি ধাপের নানা বৈচিত্র্য নিসর্গকে নানা অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যে সমৃদ্ধ করে। চন্দ্রবিম্ব বা চন্দ্রের চাকতি যখন প্রথম সূর্যের চাকতি বা সূর্যবিম্ব স্পর্শ করে তখন হয় 'প্রথম স্পর্শ'[First Contact]। প্রথম স্পর্শের পর থেকে ধীরে ধীরে সূর্যবিম্ব আড়াল হতে শুরু করে। যত সময় যায়, তত বেশি অংশ আড়াল হতে থাকে। এই অবস্থাটা সূর্যের আংশিক গ্রহণ। আংশিকগ্রহণ বাড়তে বাড়তে এক সময় আসে 'দ্বিতীয় স্পর্শ' [Second Contact] । চন্দ্রবিম্বের যে বিন্দু প্রথম সূর্যবিম্বকে স্পর্শ করেছিল, চন্দ্রবিম্বের সেই বিন্দুটি যখন সূর্যবিম্বের প্রথম স্পর্শবিন্দুর বিপরীত প্রান্তের বিন্দু স্পর্শ করে তখন হয় 'দ্বিতীয় স্পর্শ'। দ্বিতীয় স্পর্শ থেকেই শুরু হয় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। তখন চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বকে পুরোপুরি ঢেকে দেয়, আড়াল করে। প্রথম স্পর্শ থেকে দ্বিতীয় স্পর্শ অবধি চলে সূর্যের আংশিক গ্রহণ। দ্বিতীয় স্পর্শ থেকে শুরু হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বের তুলনায় বড় হয়। ফলে, দ্বিতীয় স্পর্শের কিছুটা সময় পরে চন্দ্রবিম্বের যে বিন্দুটি প্রথম সূর্যবিম্ব স্পর্শ করেছিল, তার বিপরীত প্রান্তের বিন্দুটি, সূর্যকে চন্দ্রবিম্বের প্রথম স্পর্শ করার বিন্দুটি বা সূর্যবিম্বের প্রথম স্পর্শ বিন্দুটি স্পর্শ করে। এই স্পর্শকে বলা হয় 'তৃতীয় স্পর্শ' [Third Contact] । দ্বিতীয় স্পর্শ থেকে তৃতীয় স্পর্শ অবধি চলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। এই দুই স্পর্শের মাঝখানে যেটুকু সময়, তাই-ই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্বকাল। এই সময় কাল কয়েক সেকেন্ড থেকে সাড়ে সাত মিনিট অবধি হতে পারে। তৃতীয় স্পর্শের পরেই তৃতীয় স্পর্শবিন্দুর পাশ থেকে সূর্য বেরিয়ে আসতে থাকে চন্দ্রবিম্বের আড়াল থেকে। পূর্ণগ্রাস শেষ হয়, আবার শুরু হয় আংশিক গ্রহণ। এবার আংশিক গ্রহণে সূর্যের খণ্ডিত অংশের আয়তন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। চন্দ্রবিম্বের প্রথম স্পর্শ বিন্দুর বিপরীত বিন্দু যখন সূর্যবিম্বের প্রথম স্পর্শবিন্দুর বিপরীত বিন্দুকে স্পর্শ করে, তখন হয় 'চতুর্থ স্পর্শ' [Fourth Contact] । এই অবস্থায় সূর্য চন্দ্রবিম্বের আড়াল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসে। সূর্য গ্রহণ মুক্ত হয়, কেবল চন্দ্রবিম্বের প্রান্ত সূর্যের প্রান্ত স্পর্শে করে থাকে, যেমনটি ছিল প্রথম স্পর্শের সময়। তবে প্রথম স্পর্শে চন্দ্রবিম্বের যে বিন্দুর সঙ্গে সূর্যবিম্বের যে বিন্দুর স্পর্শ হয়েছিল, চতুর্থ স্পর্শের সময় তাদের বিপরীত বিন্দু দুটির স্পর্শ হয়ে থাকে। অর্থাৎ চন্দ্র-বিম্বের প্রথম স্পর্শবিন্দুর বিপরীত বিন্দু এবং সূর্যবিম্বের প্রথম স্পর্শবিন্দুর বিপরীত বিন্দু যখন পরস্পরকে স্পর্শ করে তখন ঘটে চতুর্থ স্পর্শ। এর পরেই গ্রহণ শেষ হয়। প্রথম স্পর্শ থেকে দ্বিতীয় স্পর্শ অবধি চলে সূর্যের আংশিক গ্রাস বা খণ্ড গ্রাস। দ্বিতীয় স্পর্শ থেকে তৃতীয় স্পর্শ অবধি হয় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। তৃতীয় থেকে চতুর্থ স্পর্শ অবধি চলে আবারও আংশিক গ্রহণ। চতুর্থ স্পর্শের পর সূর্যের গ্রহণ মুক্তি ঘটে।

সূর্যগ্রহণের এই সব বিভিন্ন ধাপে অপূর্ব সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। পূর্ণগ্রাসের ও তার কাছাকাছি সময়ে দেখা যায় অন্ধকার সূর্যবিম্বের চারদিকে 'মুক্তামালা'[Bailey's Beads], সূর্যের বর্ণমণ্ডল [Chromosphere] ও তার লালচে কমলা রং, সূর্যের 'ছটামণ্ডল' [Corona], সৌরশিখা [Solar Prominences], হীরের আংটি [Diamond Ring] ইত্যাদি। এগুলি অতুলনীয় সব নৈসর্গিক দৃশ্য। পূর্ণগ্রহণের কয়েক সেকেন্ড আগে শুরু হয় 'ছায়া লহরী' [Shadow Band] । পূর্ণগ্রহণের কিছুটা আগে সূর্য যে দিকে আছে তার বিপরীত দিকে আকাশে তখন দেখা যায় সূর্যাস্তের রক্তিমাভা বা গ্লো [Twilight Glow]। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 2.8 সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা চাকতি বা

মুদ্রা চোখের সামনে 3 মিটার দূরে রাখলে তা সূর্যকে আড়াল করে দিতে পারে। চোখ থেকে 3 মিটার দূরে রাখা 2.8 সেন্টিমিটার ব্যাসের মুদ্রা বা চাকতি চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তা প্রায় $\frac{1}{2}^0$ বা 30 মিনিট। সূর্য কিংবা চন্দ্র পৃথিবীতে প্রায় সমান মানের কোণ উৎপন্ন করে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের কিংবা সূর্যের কৌণিক ব্যাস প্রায় আধ ডিগ্রি বা 30 মিনিট।

সূর্যের আংশিক গ্রহণ

সূর্যের পূর্ণগ্রহণ কিংবা বলয় গ্রহণ কিন্তু শুরু ও শেষ হয় আংশিক গ্রহণ দিয়ে। সূর্যের গ্রহণ শুরু হলে চন্দ্রবিম্ব ধীরে ধীরে সূর্যকে ঢাকতে থাকে। সূর্যের কিছুটা অংশ অদৃশ্য হতে থাকে। চন্দ্রবিম্ব পুরোপুরি সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার আগে অবধি সূর্যের আংশিক গ্রহণ চলতে থাকে। তারপর আসে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের পালা কিংবা বলয় গ্রহণের পালা। পূর্ণগ্রহণ কিংবা বলয় গ্রহণ শেষ হলে আবার চলতে থাকে আংশিক গ্রহণ। এবার তা বিপরীতমুখী। অর্থাৎ গ্রহণের শুরুতে যে আংশিক গ্রহণ চলতে থাকে, তাতে সূর্যের দৃশ্যমান অংশ ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে এবং একসময় তা মিলিয়ে যায় বা বলয়ের রূপ নেয়। আবার পূর্ণগ্রাসের কিংবা বলয়গ্রহণের অবস্থা শেষ হলে চলতে থাকে আংশিক গ্রহণ এবার তা বিপরীতমুখী হয়। অর্থাৎ দৃশ্যমান অংশ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং সূর্যবিম্ব ক্রমশঃ চন্দ্রবিম্বের কবলমুক্ত হয়। শেষ পর্যায়ের আংশিক গ্রহণ শেষ হলে সূর্য পুরোপুরি চন্দ্রবিম্বের আওতা থেকে বেরিয়ে যায় এবং গ্রহণ শেষ হয়।

আগেই বলা হয়েছে, চন্দ্রের দু'রকম ছায়া পৃথিবীতে পড়ে—প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। প্রচ্ছায়া যে সব অঞ্চল দিয়ে যায় সে সব জায়গায় লোকেরা দেখে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। আর উপচ্ছায়া যে সব অঞ্চলের উপর দিয়ে যায় সেখানকার লোকেরা দেখে সূর্যের আংশিক গ্রহণ। বাস্তবে, কোনও জায়গার উপর দিয়ে প্রচ্ছায়া যাওয়ার আগে সে অঞ্চলের উপর দিয়ে উপচ্ছায়া যেতে থাকে বহুক্ষণ ধরে। ফলে, সে অঞ্চল সূর্যের আংশিক গ্রহণ বহুক্ষণ ধরে দেখতে থাকে। আবার পূর্ণ বা বলয় গ্রহণ শেষ হওয়ার পরেও চলে আংশিক সূর্যগ্রহণ। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মোট স্থায়িত্বকাল 7.5 মিনিটের বেশি হতে পারে না। সুতরাং কোনও জায়গায় সূর্যগ্রহণের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে যদি 2 ঘণ্টা সময় থাকে, তার মধ্যে খুব বেশি হলে $7\frac{1}{2}$ মিনিট হবে সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ, আর বাকী সময়টা হবে সূর্যের আংশিক বা খণ্ডগ্রহণ। বলয়গ্রহণের বেলায় একই কথা খাটে। পুরো গ্রহণ পর্যায়ের পূর্ণগ্রাস কিংবা বলয়গ্রাসের সময় বাদ দিয়ে বাকী সময়টা হল আংশিক গ্রহণের সময়। সূর্যের গ্রহণ পৃথিবীতে দেখা গেলে, পূর্ণগ্রাস কিংবা বলয়গ্রাস না দেখা গেলেও, আংশিকগ্রাস বা খণ্ডগ্রাস দেখা যাবে।

চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার পৃথিবীপৃষ্ঠে বিস্তার 262 কিলোমিটারের বেশি হয় না। ফলে খুব বেশি হলে পৃথিবীপৃষ্ঠের 262 কিলোমিটার চওড়া এবং 14/15 হাজার কিলোমিটার লম্বা অঞ্চলের লোকেরা দেখতে পায় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। তাও একসঙ্গে নয়। কারণ এই প্রচ্ছায়া সেকেন্ডে 680 মিটার বেগে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে দৌড়াতে থাকে। উপচ্ছায়া অবশ্য তুলনামূলকভাবে অনেকটা বিস্তৃত জায়গা আচ্ছাদিত করে এবং পৃথিবীর অনেকটা জায়গা থেকেই আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। কোনও সূর্যগ্রহণে পৃথিবীর যেখানে প্রচ্ছায়া পড়ে তার দুদিকে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার করে মোট 5000 কিলোমিটারের বিস্তার নিয়ে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পৃথিবী ঢেকে দেয়। ওই 5000 কিলোমিটার চওড়া এবং 14/15 হাজার কিলোমিটার লম্বা একটা বিশাল অঞ্চল থেকে পৃথিবীর লোকেরা দেখে আংশিক সূর্য গ্রহণ। প্রচ্ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠের 0.2% অবধি আচ্ছন্ন করলেও, চন্দ্রের উপচ্ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠের 20% আচ্ছন্ন করতে পারে। তবে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়ার আয়তন, গতি বিভিন্ন গ্রহণে বিভিন্ন হয়।

অনেক সময় পৃথিবী থেকে সূর্যের কেবলমাত্র আংশিক গ্রহণই দেখা যায়। চন্দ্রের উপচ্ছায়াই কেবল পৃথিবীতে আসে, প্রচ্ছায়া নানা কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে কিংবা পৃথিবীর আকাশে আসতে পারে না। এমন সব দিনে কেবলমাত্র আংশিক সূর্যগ্রহণই দেখা যায়। উপচ্ছায়া অঞ্চলে সূর্যের একটা অংশ থেকে আলো আসে, বাকী অংশটা থেকে আলো আসে না। ফলে, উপচ্ছায়ায় ঢাকা অঞ্চলের লোকেরা সূর্যের কিছুটা অংশ দেখতে পায়, দেখতে পায় না বাকী অংশটুকু। তাই, সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখা যায় উপচ্ছায়ায় ঢাকা পৃথিবীর ওই সব অঞ্চল থেকে। কেবলমাত্র আংশিক গ্রহণ দেখা যায় এমন গ্রহণ সংখ্যা মোট সূর্যগ্রহণ সংখ্যার অর্ধেকেরও কম হয়। এমনিতে পূর্ণগ্রাস কি বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় আংশিক সূর্যগ্রহণ চলতেই থাকে পূর্ণ বা বলয় গ্রাসের সামান্য সময়টুকু বাদ দিয়ে গ্রহণের বাকী সময়টা জুড়ে। কিন্তু কেবলমাত্র আংশিক সূর্যগ্রহণ হয় বা দেখা যায় এমন গ্রহণের সংখ্যাও কম নয়। বিংশ শতাব্দী থেকে পঞ্চবিংশ শতাব্দী অবধি প্রতি 100 বছরে কেবলমাত্র আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে এমন গ্রহণের সংখ্যা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে, এমন সূর্যগ্রহণ সংখ্যা মোট সূর্যগ্রহণ সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। চন্দ্রের উপচ্ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠে তার প্রচ্ছায়াকে ঘিরে কেমনভাবে অবস্থান করে তা বোঝা যেতে পারে ৪৪নম্বর চিত্র থেকে। সেখানে অবশ্য উপচ্ছায়ার আয়তন অনেকটা বড় করে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর অনুপাতে।

শতাব্দী	মোট সূর্যগ্রহণ সংখ্যা	পূর্ণগ্রাস ও বলয়গ্রাস গ্রহণের মোট সংখ্যা	আংশিক গ্রহণের মোট সংখ্যা
1901-2000	228	145	83
2001-2100	224	144	80
2101-2200	235	151	84
2201-2300	248	156	92
2301-2400	248	160	88
2401-2500	237	153	84

এক বছরে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ মিলিয়ে 7টির বেশি গ্রহণ হতে পারে না। এই 7টি গ্রহণের মধ্যে 5টি সূর্যগ্রহণ এবং 2টি চন্দ্রগ্রহণ বা 4টি সূর্যগ্রহণ এবং 3টি চন্দ্রগ্রহণ হবে। বছরে সবচেয়ে কম গ্রহণ হতে পারে 2টি এবং দুটি গ্রহণই হবে সূর্যগ্রহণ। এক শতাব্দীতে গড়ে 66টি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়, কিন্তু কেবলমাত্র আংশিক গ্রহণ হয় 85টি। পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনও নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একবার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গেলে, সেখানে আবার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে অন্ততঃ তার 360 বছরে। কিন্তু আংশিক সূর্যগ্রহণ সে জায়গায় অনেকবারই দেখা যাবে ওই 360 বছরে।

আংশিক সূর্যগ্রহণেরও একটা সৌন্দর্য আছে। ধীরে ধীরে সূর্যের ক্ষয়ে আসা, সূর্যের একফালি চাঁদের আকৃতি নেওয়া, আলোর উজ্জ্বলতা কমে আসা আংশিক সূর্য গ্রহণের বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র আংশিক সূর্যগ্রহণ ততটা আকর্ষণীয় না হলেও, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সঙ্গে বিজড়িত আংশিক গ্রাস অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগে। প্রতি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের শুরু হয় খণ্ডগ্রাস বা আংশিকগ্রাস দিয়ে। আবার শেষেও থাকে খণ্ডগ্রাস। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর যে অংশের উপর দিয়ে চলে যায় সে অংশে দেখা যায় সূর্যের পূর্ণগ্রাস, আর উপচ্ছায়া যে অঞ্চলের উপর দিয়ে যায় সেইসব অঞ্চলে দেখা যায় সূর্যের আংশিকগ্রহণ

বা খণ্ডগ্রহণ। আংশিক সূর্যগ্রহণে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমন হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণকে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগান। কোনও পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণে চন্দ্র ও সূর্যের প্রথম স্পর্শ থেকে দ্বিতীয় স্পর্শ অবধি চলে আংশিক গ্রহণ। তারপর তৃতীয় স্পর্শ থেকে চতুর্থ স্পর্শ অবধিও থাকে আংশিকগ্রহণ। অর্থাৎ কোনও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকে আংশিক সূর্যগ্রহণ এবং তার সামান্য অংশই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

সূর্যের বলয় গ্রহণ

আংশিক গ্রহণেরই একটি রূপ হল বলয় গ্রহণ। একমাত্র সর্যেরই বলয় গ্রহণ হয়। চন্দ্রের কোনও বলয় গ্রহণ হয় না। এই গ্রহণের সময় সূর্যের মাঝখানের অংশটি চন্দ্রের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়ে সূর্যকে একটি বালা বা রিংয়ের মত দেখায়। এই জন্য এই গ্রহণের নাম 'বলয় গ্রহণ' [Annular Eclipse]। এই গ্রহণও খুব অকর্ষণীয়। দৃশ্য হিসাবে অতুলনীয়। চন্দ্রবিম্ব সূর্যের মাঝখানটা আড়াল করে দেয়। ফলে, পৃথিবীর আকাশে সূর্যের মাঝখানটা কালো দেখায়। সেই কালো থালার চারদিকে উজ্জ্বল সূর্যের বৃত্তাকার বেড় [Rim]। সূর্য তখন হয়ে যায় আলোর বলয়। এই গ্রহণ তাই বলয় গ্রহণ।

চিত্র ঃ ৪৭
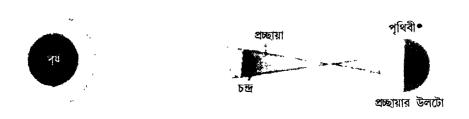
● সূর্যের বলয় গ্রহণ ●

আগেই বলা হয়েছে, চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে একই সরলরেখায় আসে এবং চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে, তখন পৃথিবীর যে সব অঞ্চল দিয়ে ওই প্রচ্ছায়া যায়, সেই সব অঞ্চলের লোকেরা দেখে সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। যে সব অঞ্চলে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে, পৃথিবীর সেই সব অঞ্চল থেকে দেখা যায় সূর্যের আংশিক গ্রহণ। কিন্তু কখনো কখনো চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার শঙ্কুটির শীর্ষবিন্দু পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর আকাশে কিছুটা দূরে অবস্থান করে, তখন পৃথিবীর সীমিত অঞ্চলে বলয় সূর্যগ্রহণ দেখা যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের চারপাশে সূর্যের বহিঃপ্রান্তকে একটি জ্যোতির্ময় বলয়ের মত দেখা যায়। পূর্ণ সূর্যেগ্রহণের সময় চন্দ্র তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর বেশ কিছুটা কাছে থাকে। বলয় গ্রহণের সময় চন্দ্র তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকে। ফলে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবী ছুঁতে পারে না। পৃথিবীর থেকে কিছু দূরে আকাশেই থেকে যায়। মনে রাখতে হবে, চন্দ্র উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমা করে। চন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম হল 3,63,300 কিলোমিটার এবং সবচেয়ে বেশি দূরত্ব হল 4,05,508 কিলোমিটার। গড় দূরত্ব হল 3,84,000 কিলোমিটার। আর চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ্য হল 3,74,000 কিলোমিটার। সুতরাং

কোন কোনও সময়, যখন চন্দ্র পৃথিবীর থেকে 3,74,000 কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থান করে, তখন চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার শঙ্কুটির শীর্ষবিন্দু পৃথিবীর আকাশেই থেকে যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠ অবধি পৌঁছাতে পারে না। এই সময় সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করলে চন্দ্রের ওই প্রচ্ছায়ার একটা উল্টো শঙ্কু পৃথিবীপৃষ্ঠের কিছুটা অংশের উপর দিয়ে যায়। ওই অঞ্চলের আকাশে তখন চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার শঙ্কুটির শীর্ষবিন্দু থাকে। ফলে, চন্দ্রবিম্ব সূর্যের মাঝখানটাকে আড়াল করে দেয়। কালো চন্দ্রবিম্বের চারপাশে সূর্যের প্রান্তদেশ উজ্জ্বল বলয় হয়ে দেখা যায়। তখন পৃথিবীর ওই সব অঞ্চল সূর্যের বলয় গ্রহণ দেখে।
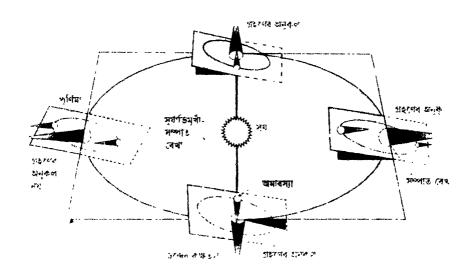
চিত্র : 90

● চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষতল পরস্পরের সঙ্গে 5 ডিগ্রি কোণে থাকায় প্রত্যেক অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না। গ্রহণ হতে হলে চন্দ্রকে সূর্য এবং পৃথিবীর সঙ্গে একই সরলরেখায় আসতে হবে। ●

স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্য ও চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস পৃথিবী থেকে প্রায় সমান। পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথে তার অবস্থান ভেদে সূর্যের আপাত কৌণিক ব্যাস 1.7% কম- বেশি হয়। তেমনি চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস তার কক্ষপথে অবস্থান পরিবর্তনের কারণে 7% কমবেশি হয়। বলয় গ্রহণ হয়, যখন পৃথিবী থেকে সূর্যের কৌণিক ব্যাস তার গড় কৌণিক ব্যাসের তুলনায় কিছুটা বড় হয় এবং চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস তার গড় কৌণিক ব্যাসের তুলনায় কিছুটা ছোট হয়। এই অবস্থায় পৃথিবী থেকে সূর্যের কৌণিক ব্যাস চন্দ্রের কৌণিক ব্যাসের তুলনায় অনেকটা বড় হয়। চন্দ্রবিম্ব তখন সূর্যবিম্বের মাঝখানটা আড়াল করে ফেলে। সূর্যের মাঝখানটায় কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রবিম্ব। তার চারিদিকে উজ্জ্বল আলোর বলয়, যা সূর্যের প্রান্তদেশ। এই গ্রহণে সূর্য বলয়ের রূপ নিচ্ছে, তাই এটি সূর্যের বলয় গ্রহণ। একমাত্র সূর্যেরই বলয় গ্রহণ হয়। তার মূল কারণ হল, পৃথিবী থেকে সূর্যবিম্ব আপাতভাবে বড় দেখাচ্ছে এবং চন্দ্রবিম্ব আপাতভাবে ছোট দেখাচ্ছে বলে। সূর্যগ্রহণের অন্যান্য শর্তের সঙ্গে এই শর্তটিও থাকতে হবে

বলয় গ্রহণের জন্য। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব তার গড় দূরত্বের সমান বা তার চেয়ে বেশি এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সবচেয়ে কম হতে হবে। তবেই পৃথিবী থেকে দেখা চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস ক্ষুদ্রতর হবে এবং সূর্যের কৌণিক ব্যাস বৃহত্তম হবে। বলয় গ্রহণ এক রকমের আংশিক গ্রহণ হলেও, এটিকে পূর্ণগ্রহণের সঙ্গেই গণনা করা হয়। একশো বছরে গড়ে 238টি সূর্যগ্রহণ হয়। তার মধ্যে 79টি গ্রহণই বলয় গ্রহণ। সুতরাং মোট সূর্যগ্রহণের এক তৃতীয়াংশই হল বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ। দক্ষিণ ভারতের কেরালা ও তামিলনাড়ু 2010 খ্রিস্টাব্দে দেখেছে এক দীর্ঘ স্থায়ী বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ। সে গ্রহণ হয়েছে 15ই জানুয়ারী। এই বলয়গ্রাস স্থায়ী ছিল প্রায় 11 মিনিট 7.9 সেকেন্ড। এরপর 2019, 2020 ও 2031 সালগুলিতে ভারতবর্ষে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে যথাক্রমে ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং মে মাসে।

শেষ করা যাক স্যারোস চক্রের বিশদ বিবরণ দিয়ে। একটি স্যারোস চক্রে সাধারণতঃ 42টি সূর্যগ্রহণ এবং 27টি চন্দ্র গ্রহণ হয়। তবে গড়পড়তা 75টি গ্রহণ হতে পারে একটি স্যারোসে। এক চান্দ্রকল্পে বা এক স্যারোসে সবচেয়ে বেশি 88টি গ্রহণ এবং সবচেয়ে কম 68টি গ্রহণ হয়। তিন-চার হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষি-বিজ্ঞানীরা এবং ব্যাবিলোনীয় পণ্ডিতবর্গ জেনেছিলেন প্রতি 6,585.322124 সৌরদিনের পর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণগুলির পুনরাবর্তন ঘটে। এই কালচক্রকেই বল হয় স্যারোসচক্র বা ক্যালডীয় স্যারোস বা ক্যালডীয় কালচক্র। [Chaldean Cycle]। 'স্যারোস' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। এর অর্থ হল 'পুনরাবৃত্তি'। চান্দ্রকল্প কিংবা স্যারোস গ্রহণসমূহের পুনরাবর্তনের কথাই বলে। এই স্যারোস চক্রের অর্থ হল, আজ যদি কোন গ্রহণ সংঘটিত হয়, তবে ঠিক একটি চান্দ্রকল্প বা স্যারোস চক্র পরে অনুরূপ আরেকটি গ্রহণ হবে। তবে অবশ্যই পৃথিবীর উপর একই জায়গায় হবে না এবং সময়েরও সামান্য হেরফের হবে। স্যারোস বা চান্দ্রকল্পের 6,585.322124 সৌরদিন হল 18 বছর 10.322124 দিন, যদি এই সময়ের মধ্যে পাঁচটি অধিবর্ষ [Leap Year] পড়ে এবং চারটি অধিবর্ষ পড়লে এই সময়টা হয়ে 18 বছর 11.322124 দিন।

এ কালের এক 'সিনডিক মাস' [Synodic Month] হল প্রাচীন ভারতীয় এক 'চান্দ্র মাস'। যদি সূর্য থেকে দেখা হয়, তবে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের একবার চক্কর কেটে আসতে সময় লাগে 29.5306 সৌরদিন। আর 'ড্রেকনিক মাস' [Draconic Month] বা গ্রহণ মাস হল 27.21220 সৌরদিন। কক্ষপথের একই সম্পাতে ফিরে আসতে চন্দ্র এক গ্রহণ-মাস সময় নেয়। সম্পাত বিন্দু হল রাহু এবং কেতু। রাহু কিংবা কেতুতে চন্দ্র না এলে গ্রহণ হয় না। চন্দ্রের কেন্দ্র তখন থাকে পৃথিবী ও সূর্যের কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখায়। চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এক সরলরেখায় এলে সূর্যগ্রহণ এবং পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে একই সরলরেখায় এলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। আজ যদি কোনও গ্রহণ হয় তবে তেমনি আরেকটি গ্রহণ হবে যখন সিনডিক এবং ড্রেকনিক মাস পূর্ণসংখ্যায় মিলবে। *রাহু বা কেতুতে না এলে চন্দ্র পৃথিবীর দর্শকদের কাছ থেকে সূর্যকে আড়াল করতে পারে না, তেমনি* রাহু বা কেতুতে না এলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে ঢেকে দিতে পারে না। আবার গ্রহণের পুনরাবৃত্তির সময় জানতে হলে *'সিনডিক' ও 'ড্রেকনিক মাস' দুটিকে পূর্ণসংখ্যায় মেলাতে হবে।* x এবং y দুটি পূর্ণসংখ্যা হলে, সমীকরণ হয় ঃ

$$29.5306\ x = 27.2122\ y$$

$$\text{বা}\quad \frac{x}{y} = \frac{2,72,122}{2,95,306}$$

সৌর পরিবার ও তাদের কিছু পরিচয়

বিষয়	সূর্য	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
ব্যাস [মাইল]	8,65,400	3,030	7,550	7,927	4,200	88,700	75,000	29,000	28,000	3,600 (?)
গ্রহটির মেরু ব্যাস				7,900		82,800	67,000			
ভর [পৃথিবীর ভরের যত গুণ]	3,33,420	0.05	0.82	1.00	0.107	317.45	95.2	14.54	17.6	0.03 (?)
আয়তন [পৃথিবীর আয়তনের যত গুণ]	13,06,000	0.05	0.90	1.00	0.15	1350	800	53	44	0.09 (?)
ঘনত্ব [গ্রাম / সি.সি.]	1.41	5.5	5.1	5.52	4.12	1.35	0.68	1.75	2.2	2.04 (?)
[পৃথিবীর ঘনত্বের কত গুণ]	0.255	0.9	0.89	1.00	0.76	0.25	0.13	0.23	0,29	0.37 (?)
অভিকর্ষজ ত্বরণ [পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণকে একক ধরে]	27.৫	0.4	0.87	1.00	0.38	2.65	1.14	1.04	1.42	?
অভিকর্ষ মুক্তির বেগ [মাইল /সেকেন্ড]	384	2.2	6.3	7.0	3.1	37.3	22.4	13.1	14.3	1.9
সূর্য হতে দূরত্ব [কোটি মাইল]										
গড়	—	3.598	6.724	9.296	14.164	48.372	89.060	177.702	279.944	365.441
সবচেয়ে বেশি	—	4.338	6.769	9.451	15.486	50.717	93.658	185.576	281.998	456.110
সবচেয়ে কম	—	2.858	6.678	9.140	12.841	46.026	84.463	169.828	277.889	274.712
কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা	—	0.2056	0.0068	0.0167	0.0934	0.0485	0.0516	0.0443	0.0073	0.2481
কক্ষ প্রদক্ষিণের গড় গতি [মাইল/সেকেন্ড]	—	29.7	21.7	18.5 [29.76 কিমি.]	15.0	8.1	6.0	4.2	3.4	3.0

৹।র পরিবার ও তাদের কিছু পরিচয়

বিষয়	সূর্য	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
একবার সূর্য পরিক্রমার সময় [পার্থিব বছরে]	—	0.241	0.615	1.00	1.881	11.862	29.458	84.013	164.794	248.430
অক্ষাবর্তনের কাল	25 দিন 3 ঘণ্টা 21 মিনিট 36 সেকেন্ড	± 58.6দিন	±243 দিন	23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4.1 সেকেন্ড	24 ঘণ্টা 37 মিনিট 6 সেকেন্ড	9 ঘণ্টা 50 মিনিট 30 সেকেন্ড	10 ঘণ্টা 14 মিনিট	10 ঘণ্টা 45 মিনিট	15 ঘণ্টা 48 মিনিট	6 দিন 9 ঘণ্টা 22 মিনিট
পৃথিবী থেকে দূরত্ব সবচেয়ে বেশি	9.451	13.8	16.2	—	24.9	60.2	103.1	195.0	291.4	465.6
সবচেয়ে কম[কোটি মাইলে]	9.14	4.8	2.4	—	3.4	36.6	75.0	160.4	268.4	265.3
মাধ্যাকর্ষণ [পৃথিবীর এককে]	28	0.26	0.90	1	0.37	2.64	1.13	0.84	1.14	?
উপগ্রহের সংখ্যা	—	—	—	1	2	16	18	15	8	1

তালিকা ঃ 11

● উপরের তালিকায় দূরত্বের একক হিসাবে মাইল ব্যবহৃত। 1 মাইল = 1.61 কিলোমিটার ধরে কিলোমিটারে দূরত্ব বের করা যাবে। শুক্র এবং ইউরেনাসের বক্রীগতির ফলে এদের অক্ষাবর্তনকাল দীর্ঘ। বিশেষ করে শুক্রের। আর ইউরেনাস তার কক্ষতলের সঙ্গে মাত্র $7^{0}9'$ কোণে অক্ষ রেখে ঘুরছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় পৃথিবীর ভর হল, 5.974×10^{27} গ্রাম বা 5.974×10^{21} মেট্রিক টন এবং এর আয়তন 1.0822464×10^{27} ঘন সেন্টিমিটার বা 1.0822464×10^{12} ঘন কিলোমিটার। ●

এর নিখুঁত সমাধান হল x = 2,72,122 এবং y = 2,95,306। তার ফলে যে সময়টা পাওয়া যায় তা বহু লক্ষ বছরের ব্যাপার। কার্যকারিতার দিক থেকে তা অপ্রয়োজনীয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই এর স্থূলমান বের করে সঠিকভাবে গ্রহণের পুনরাবর্তন সময় নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। এই সময়টা হল 223 চান্দ্রমাস বা 242 গ্রহণমাস বা 223 সিনডিক মাস বা 242 ড্রেকনিক মাস। এটাই চান্দ্রকল্পের কাল বা ব্যাবিলোনীয় স্যারোস চক্রের সময়কাল, যা 6,585.32 সৌরদিন বা সূক্ষ্ম করে বললে, 6,585.322124 সৌরদিনের সমান। মোটামুটি 18 বছর 11.3 দিন বা 18 বছর 10.3 দিন পরে এক চান্দ্রকল্পে যে ধরনের গ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল, সে ধরনের গ্রহণগুলি হতে থাকবে। তবে এই সময় চারটি অধিবর্ষ হলে 18 বছর 11.3 দিন এবং পাঁচটি অধিবর্ষ হলে 18 বছর 10.3 দিন হবে এক স্যারোস বা চান্দ্রকল্প। দিনের সঙ্গে 0.32 দিন বেশি থাকায় কোনও এক স্যারোসে কোনও একটি গ্রহণ যে সময়ে হয়েছিল পরের স্যারোস সেই গ্রহণটি তার প্রায় 8 ঘন্টা পরে হবে। ফলে, গ্রহণ পৃথিবীপৃষ্ঠের যে স্থান থেকে প্রথম স্যারোসে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় স্যারোসে শুরু হবে তার আরো 120^0 পশ্চিম দিক থেকে। তিনটি স্যারোস বা 54 বছর 1 মাসের মত পরে গ্রহণ শুরুর দ্রাঘিমাংশ আবার এক হয়ে যাবে। আধুনিককালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, দূরবীন ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। সেগুলির সাহায্যে কোথায় কী ধরনের গ্রহণ কখন হবে তা নিখুঁতভাবে বলা যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন চান্দ্রকল্প কিংবা ব্যাবিলোনীয়দের স্যারোস একালে তার গুরুত্ব হারিয়েছে, এমন কথা বলা যায় না।

তপন বা সূর্য সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল আগের দুটি পৃষ্ঠায়। বাকী গ্রহদের কথায় আসার আগে সৌর পরিবারের কিছু পরিচয় সমন্বিত একটি তালিকা [তালিকা : 11] দেওয়া হল। এই তালিকার পরিসংখ্যান গ্রহদের কথা বলার সময় কাজে লাগবে। এছাড়াও উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু ও উল্কা সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হবে বর্তমান পরিচ্ছেদে।

● বুধ [Mercury] ●

সূর্যের নিকটতম গ্রহ হলো বুধ। সূর্য হতে এর গড় দূরত্ব প্রায় তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল। এর কক্ষপথ যথারীতি উপবৃত্তাকার, তাই এর সর্বাধিক দূরত্ব প্রায় চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ মাইল এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব হলো দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ মাইল। সূর্যের খুব কাছে থাকে বলে একে সূর্যের থেকে কখনও খুব বেশি দূরে দেখা যায় না। আকাশে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র বৎসরের কোন না কোন সময় মধ্য আকাশে দেখা যায়, কিন্তু বুধ ও শুক্রকে কখনও মধ্য-আকাশে দেখা যায় না, যাবেও না। সূর্যাস্তের পর কিছু সময় বা সূর্যোদয়ের কিছু সময় আগে বুধকে আকাশে দেখা যায় বৎসরের কোনও কোনও সময়, সব সময় নয়। বুধের গতিবেগ খুব বেশি। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এই গ্রহটি সেকেন্ডে প্রায় 29.7 মাইল গতিবেগে ছুটে চলেছে। প্রায় 88 দিনে বুধ একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে। বুধ তার অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে মোটামুটি সময় নেয় 88 দিন। ফলে, বুধের একটা নির্দিষ্ট দিক সব সময়েই সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তাই বুধের যে দিকটা সব সময়েই সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয় থাকে সে দিকে বুধের অনন্ত দিন, অনন্ত গ্রীষ্ম। আর সূর্যের বিপরীতে যে দিকটা থাকছে সেখানে অনন্ত রাত্রি, অনন্ত শীত। বুধের অনন্ত দিনের দিকটায় তাপমাত্রা প্রায় 660^0 ফারেনহাইট আর অনন্ত শীতের দিকটার উষ্ণতা প্রায় -275^0 ফারেনহাইট বা -170^0 সেন্টিগ্রেড। 660^0 ফারেনহাইট মানে প্রায় 350^0 সেন্টিগ্রেড। বুধে বায়ুমণ্ডল নেই। চাঁদের মতই তার অবস্থা। চাঁদের মত বুধেরও একটা

'লিব্রেশন' আছে যার ফলে বুধের প্রায় 23^0 অংশে সূর্য কখনো-সখনো কিছুটা উঁকি মেরে চলে যায়। বুধের একটি গোলার্ধ সারাক্ষণ তার অনেকটা বর্ধিত কক্ষপথের অন্য নাভিটার দিকে চেয়ে থকে। চাঁদের বেলায় যেমনটি ঘটে অনেকটা সেই রকম।

পার্থিব দ্রষ্টা বুধকে কখনো কখনো সূর্যের সম্মুখ দিয়ে চলতে দেখে। তখন মনে হয় একটা কালো বিন্দু সূর্যের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এমন ঘটনা বছরে বছরে অবশ্য ঘটে না, ঘটে 100 বছরে তেরো বার মাত্র। পর পর এই রকম দুটি দৃশ্যের ব্যবধান সাড়ে তিন বছর হতে তেরো বছরের মধ্যে থাকে। বুধ আর চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল নেই। কিন্তু শুক্রে আছে। শুক্রের বায়ুমণ্ডল কারবন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ। ভৌতবিদ্যার নিয়মানুসারে বুধের বায়ুমণ্ডল থাকতে পারে না। প্রাথমিকভাবে যদি কিছু থেকেও থাকে তা ছুটে যাবে অনন্ত শীতযুক্ত অংশে এবং জমে বরফ হয়ে যাবে। সুতরাং কি অনন্ত গ্রীষ্মের দিকে কিংবা অনন্ত শীতের অঞ্চলে, বুধের কোথাও কোনও বায়ুমণ্ডল থাকতেই পারে না। ভৌতবিদ্যার সাধারণ নিয়ম সেই কথাই বলে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান 5000 বছরেরও আগে বুধগ্রহের কথা জানতো। ঋগ্বেদ যে পাঁচটি গ্রহের কথা বলেছে তাতে বুধ আছে। ফলিত জ্যোতিষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই যে নয়টি গ্রহের কথা বলেছে, সেগুলি হল, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র, সূর্য, রাহু ও কেতু। শেষের চারটিকে কেন গ্রহ বলা হল তার ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে। সুমেরীয়রাও প্রায় 5000 বছর আগে বুধগ্রহের কথা জানতো এবং সম্ভবত তারা তা জেনেছিল ভারতীয়দের কাছ থেকে। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতরা অনেককাল পরে ভারতীয়দের কাছ থেকেই বুধ গ্রহের কথা জানে।

সৌরমণ্ডলের প্রথম গ্রহ হলো বুধ। কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হওয়ায় পৃথিবীর উপর এর প্রভাব কম। এর প্রভাবের মাত্রা সূর্য, চন্দ্র এবং মঙ্গলের চেয়ে কম বলেই একে স্থান দেওয়া হয়েছে এই গ্রহগুলির পরে। তাই এর নামাঙ্কিত বারটি চতুর্থ স্থানে রাখা রয়েছে অর্থাৎ রবি, সোম ও মঙ্গলবার তিনটির পরে। বুধবার তাই সপ্তাহের চতুর্থ দিন। ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে এই দিনটি বুধগ্রহ পূজার এবং তার শান্তি বিধানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। বুধ জন্মেছিলেন বৃহস্পতি পত্নী তারার গর্ভে, কিন্তু তাঁর পিতা হলেন চন্দ্র। পুরাণ মতে চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং তারা চন্দ্রের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। ফলে চন্দ্রের পুত্র হয়েই জন্মান বুধ। পরে বুধকে গ্রহমণ্ডলীতে স্থাপন করা হয়। এই কাহিনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বুধ সম্ভবত সূর্য হতে সৃষ্ট হননি। তবে এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পুরাণ ও ফলিত জ্যোতিষ মতে তিনি সোমপুত্র এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণকারী। বুধের অর্থ হলো 'পণ্ডিত' বা 'বিদগ্ধজন'। এখনও 'বুধমণ্ডলী' বলতে আমরা 'পণ্ডিতমণ্ডলী' বা 'বিদ্বানজনমণ্ডলী' বুঝি। এই বুধ গ্রহের বার বা দিনই হলো বুধবার। সাধারণ মানুষ শুভকাজে কোথাও যেতে হলে বুধবারের ভোর বেলাটাই যাত্রা শুরুর প্রশস্ত সময় বলে মনে করে। খনার বচন তো বলেই রেখেছে, 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা।' অর্থাৎ কোথাও গিয়ে কোনও কাজে সাফল্য আসে বুধবারের ভোরে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে। এ বিশ্বাস বহু ভারতীয়ের মজ্জাগত, যদিও কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এই ধরনের বিশ্বাসের।

বুধ সম্পর্কে কিছু তথ্য এই রকম ঃ

1] সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ঃ 58,000,000 কি.মি.
[36,000, 000 মাইল]

2] পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কম দূরত্ব ঃ	45,000,000 কি.মি. [28,000,000 মাইল]
3] সূর্যালোকিত দিকের উষ্ণতা ঃ	350^0C[660^0F]
4] অন্ধকার পৃষ্ঠের দিকের উষ্ণতা ঃ	-170^0 C [-275^0 F]
5] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ	0.206
6] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে কক্ষাবর্তন পথের নতি ঃ	7.004^0
7] সূর্য পরিক্রমণের সময় ঃ	পার্থিব 87.9694 দিন = বুধের একটি বছর।
8] অক্ষাবর্তনকাল ঃ	58.6461 পার্থিব দিন = বুধের একটি দিন।
9] গড় যুতিকাল ঃ [Average Synodic Period]	116 পার্থিব দিন।
10] কক্ষ প্রদক্ষিণের গড় গতি ঃ	48 কি.মি./ সেকেন্ড।
11] ভর ঃ	3.30×10^{20} মেট্রিকটন
12] ব্যাস ঃ	4,878 ± 2 কি.মি.
13] ঘনত্ব ঃ	5.44 গ্রাম/ঘন সেমি।
14] মহাকর্ষীয় ত্বরণ ঃ	370 সেমি/ সেকেন্ড^2।
15] উপগ্রহ ঃ	নেই।

বুধের একদিন পার্থিব 59 দিন হলেও বুধে একটা সূর্যোদয় থেকে আরেকটা সূর্যোদয় হতে সময় লাগে 176 পার্থিব দিন, যা বুধের দু'বছর। এর কারণ হল 59 দিন পরে ক্রান্তিবৃত্তে বুধ এমন অবস্থানে আসে যে, বুধের আকাশে সূর্যের অবস্থান 59 দিন আগের মত থাকে না। আগের মত অবস্থানে সূর্যকে আসতে হলে বুধকে তার সূর্য পরিক্রমা দু'বার সারতে হবে। কক্ষাবর্তনের সময়ের সঙ্গে বুধের অক্ষাবর্তন 3ঃ2 অনুপাতে থাকায় বুধের আকাশে সূর্যের পূর্বাস্থানে ফিরে আসতে বুধের দু'বছর বা 176 পার্থিব দিন সময় লাগে। বুধে অভিকর্ষ মুক্তিবেগ হল 3.54 কি.মি সেকেন্ড বা 2.2 মাইল/সেকেন্ড।

বুধের কোনও আবহমণ্ডল নেই। একেবারে নেই বললে বলা ভুল হবে। মেরিনার -10 মহাকাশ যান জানিয়েছে বুধের প্রায় না-থাকা আবহমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের একলক্ষ কোটি ভাগের দু'ভাগ বা 2×10^{-12} ভাগের এক ভাগ মাত্র। ওই বায়ুমণ্ডলে আছে হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অক্সিজেন ও নিয়ন [Neon]। তবে বুধের জন্ম লগ্ন থেকে এর কোনও বায়ুমণ্ডল ছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। বুধের পৃষ্ঠদেশ তাই অনেকটাই চাঁদের পৃষ্ঠদেশের মত। উল্কাপাতের ফলে বুধের পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। এ ব্যাপারে বুধ এবং চন্দ্র প্রায় একই রকম।

আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম অনুসিদ্ধান্তটি দিয়েছিলেন বুধগ্রহের কক্ষপথের বিচলন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান দিয়ে। আইনস্টাইন বললেন, গুরুভার বস্তুর আশেপাশের মহাকাশ-সময়-সন্তুতি বেশি বক্রতা লাভ করে। সেই মহাকাশে গতিশীল কোনও বস্তু বাঁকা পথে পথ পরিক্রমা করে। সূর্যের কাছাকাছি থাকা গ্রহদের সূর্য পরিক্রমণ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। বুধগ্রহ যে হেতু সূর্যের খুবই কাছে অবস্থিত তাই তার কক্ষপথ অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক [Eccentric]। এর ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্রে ছিল না। পাওয়া গেল আইনস্টাইনের তত্ত্বে। নিউটনের সূত্রানুসারে গ্রহের সূর্যের চারিদিকে ঘোরার অবকল সমীকরণ হল ঃ

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{\alpha}{h^2u^2}$$

আইনস্টাইনের দেওয়া এই সমীকরণক হল ঃ

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{\alpha}{h^2u^2}+3\alpha$$

দুটি সমীকরণেই, u = 1/r = Radius Vector, $\alpha = Mu^2$ যেখানে M = গুরু বস্তুটির ভর। বুধের বেলায় এটা সূর্যের ভর। h= ক্ষেত্রীয় গতি [এখানে বুধের] ।

বহুদিন বুধের অনুসূরের [Perihelion] তথা কক্ষপথের অয়নচলন [Precession] নিউটনের সূত্র দিয়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না। এই অয়নচলনের বাস্তব মান 574 কৌণিক সেকেন্ড। নিউটনের সূত্র থেকে পাওয়া গেল 532 কৌণিক সেকেন্ড। পার্থক্য রইল 42 সেকেন্ডর। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে উপরোক্ত পরিবর্তিত সূত্রটি বের করলেন। তাঁর ওই সূত্রটি থেকে ওই সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। ওই সূত্রের 3α থেকে বুধের কক্ষপথের অয়নচলন গতির ওই পার্থক্য $\varepsilon=\frac{6\pi M^2}{h^2}$, যেখানে, M = সূর্যের ভর, h = বুধের ক্ষেত্রীয় গতি। এখানে থেকে ε-এর মান বের হল 43 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। বাস্তবে এই পার্থক্যের মান ছিল 42 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। বুধের কক্ষপথের অয়ন চলনের মান প্রতি 100 বছরে 574 কৌণিক সেকেন্ডের কিছুটা বেশি। আইনস্টাইনের সূত্র থেকে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগ করে এই মান পাওয়া গেল 575 কৌণিক সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। এর ফলে তাঁর মহাকর্ষ ক্ষেত্র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে এটি ছিল তাঁর প্রথম অনুসিদ্ধান্ত।

1973 সালে মেরিনার -10 বুধ গ্রহের দুটো পিঠেরই বহু ছবি পাঠিয়েছে। আরো নানা সঠিক তথ্য পাঠিয়েছে সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকা এই গ্রহটির সম্পর্কে।

● শুক্র [Venus] ●

পৃথিবীর আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ হল শুক্র। শুক্রকে নিয়ে ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা করেছেন। পৌরাণিক যুগে শুক্রকে নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। আমরা আকাশের এই উজ্জ্বল গ্রহটিকে 'সন্ধ্যাতারা' এবং 'শুকতারা' হিসাবে চিনি। সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে এটি 'সাঁঝতারা' বা 'সন্ধ্যাতারা' হয়ে জ্বলজ্বল করে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে। আবার ভোরবেলায় পূর্ব-আকাশে একে দেখা যায় 'শুকতারা' হয়ে। একে কখনই মাঝরাতের আকাশে দেখা যায় না। এ নিয়ে

রামায়ণে একটা সুন্দর গল্প আছে। শুক্রবার নামকরণ করা হয়েছে শুক্রগ্রহের নাম অনুসারে। শুক্রগ্রহের এক নাম কবি, তাই প্রাচীন ভারতীয়রা শুক্রবারের নাম দিয়েছিলেন 'কাব্যবাসর'। নামটা নিঃসন্দেহে পোষাকী নাম। আবাব ভারতীয় এক নদীকে মনে করা হতো শুক্রের কন্যা, তাই তার নাম রাখা হলো 'কাবেরী'। শুক্রগ্রহকে নিয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনী আছে। শুক্র দানবাচার্য এবং মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের আবিষ্কারক বলে মনে করা হয় তাঁকে। হোরা-জ্যোতিষ মতে শুক্রের সঙ্গে বৃহস্পতি গ্রহের চিরদিনের বৈরিতা। কারণ দেবগুরু হলেন বৃহস্পতি এবং শুক্র হলেন দানবদের গুরু। মানুষের জীবনেও নাকি এই বৈরিতার প্রভাব আছে বলে ফলিত-জ্যোতিষ বা হোরা-জ্যোতিষ মনে করে। শুক্রগ্রহের শান্তির জন্য শুক্রবারে তাঁর অর্চনা ও পূজাপাঠের বিধান দিয়েছে ফলিত জ্যোতিষ। জীবের জন্মের কারক বলে শুক্রের আরেক নাম 'উশনা'। কারণ 'উশনা' শব্দের অর্থ স্রষ্টা অথবা জনক। শুক্র তাই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র-সিদ্ধ। তিনি নিয়ত জীবনদাতা।

শুক্র সৌরমণ্ডলের দ্বিতীয় গ্রহ। তার প্রভাব সম্ভবত বৃহস্পতির চেয়ে কম, অন্তত, এই পার্থিব ঘটনাবলীর উপর। এই ধারণার জন্যই বৃহস্পতিবারের পরের দিনটির নামকরণ করা হয়েছে শুক্রগ্রহের নামে। আবার দেবতারা পার্থিব জীবদের বিশেষ করে মানুষদের কাছে পূজনীয় বলেই সম্ভবত দানবগুরু শুক্রের বাসর বা বারটিকে দেবগুরু বৃহস্পতির নামাঙ্কিত বারের পরে রাখা হয়েছে। শুক্রের অবস্থান কিন্তু পৃথিবীর পাশেই। সৌর মণ্ডলের দ্বিতীয়গ্রহ শুক্র, তৃতীয় গ্রহ পৃথিবী এবং চতুর্থ গ্রহ হলো মঙ্গ ল। সুতরাং পৃথিবীর একপাশে শুক্র এবং তার অন্যপাশে মঙ্গল। দূরত্বের বিচারে শুক্রই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ, যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান মতে চাঁদকে উপগ্রহ ধরা হয়। প্রাচীন মতে চাঁদ গ্রহ এবং 'গ্রহ' ও 'Planet' সমার্থক নয় একথা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

শুক্রগ্রহই সাঁঝ আকাশের 'সন্ধ্যা তারা' এবং ভোর আকাশের 'শুকতারা' এ কথা আগেই বলা হয়েছে। শুক্র কোনও সময় পৃথিবীর আকাশে এতো উজ্জ্বল হয় যে এর আলোতে ছায়া পড়ে। শুক্রকেও বুধের মত সূর্যের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হতে দেখা যায় মাঝে মাঝে। শুক্রের এই অতিক্রমণ সময় পর্যবেক্ষণ করে সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব বের করা হয়ে থাকে। পরপর 113.5 বছর ও 129.5 বছর অন্তর শুক্রগ্রহের এই সূর্যমণ্ডল অতিক্রমণ ঘটে। একবার এ ঘটনা ঘটলে তারপর ষোল বছর পরে পুনরায় ওই ঘটনা ঘটে এবং তারপর 113.5 বছর ও 129.5 বছর পরে আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। সূর্যের নিকটে আছে বলে শুক্রের উত্তাপ বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কারণ শুক্রের বায়ুমণ্ডল আছে। আর সে বাতাসে আছে প্রচুর পরিমাণে কারবন-ডায়-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস। শুক্রে অক্সিজেন নেই। প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। তবে উন্নতশ্রেণীর জীবন ওখানে অনুপস্থিত। শুক্রেরও কলা আছে চন্দ্রের মত। খালি চোখে তা দেখা যায় না। অবশ্য কিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক আছেন যাঁরা খালি চোখেই শুক্রের কলা দেখতে পান। বিখ্যাত গাণিতিক 'গাউস' বলেছেন যে, তিনি একবার তাঁর মাকে দূরবীনে শুক্রগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। মাকে দূরবীনে শুক্রের কলিল অবস্থা দেখিয়ে চমক লাগানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। দূরবীনে শুক্রকে বাঁকা ফালির মত দেখায়। দূরবীনে শুক্রকে দেখে গাউসের মা আশ্চর্য তো হলেনই না বরং উল্টে গাউসকে প্রশ্ন করলেন বাঁকা ফালিটার মুখ অন্যদিকে কেন। অর্থাৎ খালিচোখে তিনি ফালিটাকে যেভাবে দেখেন দূরবীনে তা উল্টে গেছে। গাউস তখন ভাবতেও পারেননি যে, তাঁর মা খালি চোখেই শুক্রের কলাগুলি দেখতে পান। এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুর্লভ। দূরবীন আবিষ্কারের আগে কেউ ভাবতেও পারেনি যে, শুক্রেরও চাঁদের মত কলা আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে শুক্র তার অন্ধকার মুখটি আমাদের দেখায়। ফলে তার

সবচেয়ে বড় কলাটি আমরা পার্থিব মানুষেরা কখনই দেখতে পাই না। 'অমাবস্যার শুক্র' অবস্থা থেকে তার কলা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এই ফালিটি যতই পূর্ণ হতে থাকে, তার ব্যাস তত কমে যায়। শুক্রকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় তার মধ্যবর্তী কলায়। অমাবস্যার শুক্রের 30 দিন পরে গ্রহটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়। তখন সে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকের চেয়ে তেরো গুণ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তার আলোয় পৃথিবীতে কোন বস্তুর ছায়া পড়তেও দেখা যায়।

শুক্রের আকাশে পৃথিবীর জ্যোৎস্নার সঙ্গে চাঁদের আলোও যুক্ত হয়। সেখানে পৃথিবী লুব্ধকের চার গুণ বেশী উজ্জ্বল। শুক্রের আকাশে পৃথিবী ও চাঁদের মিলিত দৃশ্য যেমন চিত্তাকর্ষক হয় তেমনটি এই সৌরমণ্ডলে আর কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বুধ শুক্রের আকাশে 'ভোরের তারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' হয়ে জ্বলজ্বল করে। বুধ সেখানে লুব্ধকেও হারিয়ে দেয় তার উজ্জ্বলতায়। পৃথিবীর আকাশে বুধের যা উজ্জ্বলতা শুক্রের আকাশে বুধ তার তিনগুণ উজ্জ্বল। বৃহস্পতি সেখানে নিষ্প্রভ এবং মঙ্গল বেশ স্তিমিত। সূর্য সেখানে আমাদের তুলনায় কিছুটা বড় দেখায় এবং তা আমাদের সূর্যের আপাত আকারের প্রায় দ্বিগুণ। যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বলেই পশ্চিমদেশগুলি আজও শুক্রবার দিনটাকে 'অপয়া দিন' বলে মনে করে। তাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেশগুলির অধিকাংশ মানুষের ধারণা দিনটি অশুভ। বিবাহ, নতুন কাজে যোগ দেওয়া, নৌকার প্রথম যাত্রা শুরু করা, জাহাজ জলে নামানো, সমুদ্রযাত্রা করা ইত্যাদি কাজ আজও তারা শুক্রবার করে না। আবার মুসলমানেরা দিনটাকে অতি পবিত্র দিন বলে মনে করে। করে বলেই তারা শুক্রবারে মসজিদে অতি অবশ্যই জড়ো হয়ে একসঙ্গে 'জুম্মার নামাজ' পড়ে। অন্যান্য শুভকাজ এরা শুক্রবারেই করতে পছন্দ করে।

গ্রীক পুরাণে প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী হলেন অ্যাফ্রোদিতি [Aphrodite]। রোমানরা তাঁকে বলতো 'ভেনাস'[Venus]। পরবর্তীকালে দুজনে এক হয়ে হন 'ভেনাস'। প্রাচীনতর কাহিনীতে অ্যাফ্রোদিতি ছিলেন দেবরাজ জিউস ও ডিওনের কন্যা। পরবর্তীকালে তাঁর জন্মকে রোমান্টিক কাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়। ইউরেনাসের রক্তে লাল সমুদ্র-জল, সে জল রঙ নেয় গোলাপের। সেই লাল জল ঘেরা সাইপ্রাস দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রে একদিন তিনি হঠাৎই আবির্ভূত হলেন। এক বিশাল শুক্তির উপর তাঁর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের চিরযৌবনা উর্বশী মতো আপনাতে আপনি তাঁর বিকাশ। পবনদেব 'জেফিরাস' সেই দেবীকে শুক্তিসহ ভাসিয়ে নিয়ে এলো সাইপ্রাসের কূলে। শুক্তি থেকে মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই শুষ্ক বালুকায় জেগে উঠল সবুজ মখমল ঘাস। সুন্দরী কুমারীর দল তাঁকে নানাভাবে, নানা আবরণে-আভরণে সাজিয়ে হাজির করল অলিম্পাস পর্বত শিখরে যেখানে দেবতাদের বাসভূমি। দেবতাদের মনে কামনার ঢেউ তুললেন ভেনাস। কিন্তু তাঁর কাছে সব দেবতাই প্রত্যাখ্যাত হলো। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ 'জিউস' বা 'জুপিটর' (বৃহস্পতি) ভেনাসকে শাস্তি দেবার জন্য বিয়ে দিলেন অগ্নিদেব 'হীফীস্টাস'-এর সঙ্গে, যিনি দেখতে ছিলেন কদাকার এবং খঞ্জ। তবে তাঁর স্বভাব ছিল মধুর। ভেনাসের স্বামী হীফীস্টাস তাঁর স্ত্রীর জন্য সাইপ্রাস দ্বীপে স্বর্ণ-রৌপ খচিত শ্বেতমর্মর মণ্ডিত এক অসাধারণ বাসভবন নির্মাণ করে দেন। প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী হিসাবে ভেনাস সর্বত্র পূজিত। প্রাচীনকালে তাঁর নামে বহু মন্দির তৈরি হয়েছিলো গ্রীস ও রোমে। সেই ভেনাসের নামে নাম দেওয়া হয়েছে শুক্রগ্রহের। শুক্রগ্রহ তাই Venus আর শুক্রবার হলো 'Day of Venus'। এই গল্পের সঙ্গে আমাদের পুরাণের ব্রহ্মাসৃষ্ট প্রথম নারী 'সন্ধ্যা'র কাহিনীর অদ্ভুত মিল লক্ষণীয়। তবে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে আমাদের পুরাণকাহিনী অনেক বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক।

ভৃগু হতে উৎপন্ন বলে শুক্রগ্রহের আরেক নাম 'ভার্গব'। ভৃগু সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি জ্যোতিষ্ক। ভৃগুর প্রপৌত্র, ঋচীকের পৌত্র, জমদগ্নির পুত্র পরশুরামই শুক্রগ্রহের রূপক। নাক্ষত্রীয় ব্যাখায় পুরাণ কাহিনীর রূপ যায় বদলে। এই সব কাহিনী ও বাস্তবের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা আজও সম্ভব। কেমন করে সম্ভব তা দেখা যাক। কবি ও মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র বিশারদ শুক্রগ্রহ ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে পরিভ্রমণ করছে। সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব আকাশের উজ্জ্বল 'শুকতারা' হলো সেই শুক্রগ্রহ। আবার সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশের জ্বলজ্বল করা 'সন্ধ্যাতারা'ও সেই শুক্রগ্রহ। কিন্তু মাঝরাতে বা মাঝ আকাশে কখনও তাকে দেখা যায় না। সব জ্যোতিষ্কই বৎসরের কোন না কোনও সময়ে পৃথিবীর মাঝ-আকাশে মাঝরাতে আসে। কিন্তু বুধ আর শুক্র কখনই আসে না। এই দুই জ্যোতিষ্ক হলো ব্যতিক্রম। রাত সাড়ে সাতটার পর পৃথিবীর আকাশে শুক্রকে কখনও দেখা যাবে না। ভার্গব শুক্রগ্রহ অর্থাৎ ভার্গব পরশুরাম কখনও পৃথিবীতে রাত্রিবাস করেন না। শুক্র নামের কারণ এই গ্রহের রশ্মি শুভ্র, 'শুচ্' ধাতুর অর্থ হলো শুক্লতা। শুক্র বা পরশুরাম দুর্নিরীক্ষ শুভ্রবর্ণ এবং ভীমকায়। নক্ষত্রমণ্ডলীতে তিনটি ধনুরাকৃতি তারকাস্তবক দেখা যায়। একটি কালপুরুষের 'পিনাক-ধনু' বা 'হর ধনু', অন্য দুটির একটি বিষ্ণুর 'শার্ঙ্গধনু' এবং অপরটি মহাভারতের অর্জুনের 'গাণ্ডীবধনু'।

সত্যযুগে পরশুরাম জন্মেছিলেন বলে বলা হয়। তিনি অবতার। সে সময় মেরুতারা [Pole-star] ছিলেন শিবিরাজনক্ষত্র এবং কাশ্যপীনক্ষত্রের দীপ্তিতেই শিবিরাজ নক্ষত্রকে চিহ্নিত করা যেত। সেই কশ্যপকে পরশুরাম পৃথিবী দান করলেন বলে পরশুরাম কখনও পৃথিবীতে রাত্রিবাস করেন না। পরশুরাম অর্থাৎ শুক্রগ্রহ দিবালোকে কখনও-সখনো দেখা গেলেও মধ্যরাত্রে কখনই তাকে দেখা যায় না। রামায়ণে এই নাক্ষত্রিক তথ্য যে ভাবে বলা হয়েছে তা হলো ঃ

ভার্গব পরশুরাম রামকে বললেন, 'তুমি জনকের গৃহে হরধনু ভঙ্গ করেছ। এই ধনু বিষ্ণুর শার্ঙ্গধনু, বিষ্ণু এই ধনু ঋচীককে, ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। বিদ্যুৎবর্ণ এই ভীষণ ধনুর্বাণের নিকট হরধনু শিথিল হয়ে যায়। যদি পার তবে এই ধনুর্বাণ নিয়ে তুমি তোমার বীর্য প্রদর্শন কর।'

রাম মৃদু কণ্ঠে বললেন, "ভার্গব, আপনার ক্ষত্রকুলনাশন কীর্তি আমি শুনেছি। আপনি আমার শক্তি অবজ্ঞা করছেন তা আমি সইবো না।" রাম ভার্গব পরশুরামের হাত থেকে শার্ঙ্গধনু নিয়ে তাতে জ্যা-রোপণ করে শরসংযোগ করলেন। এরপর পরশুরামকে বললেন, "আপনি ব্রাহ্মণ এবং পূজনীয় বিশ্বামিত্রের ভগ্নীর পৌত্র, এই হেতু আমোঘ প্রাণহর এই শর মোচন করতে পারছি না। হয় আপনার গতিবেগ, নয় তপোবল অর্জিত স্বর্লোক, এই দুটির একটি নষ্ট করবো। বলুন, কোনটা সংহার করবো?"

এইভাবে ব্রহ্মা ও দেবগণের সমক্ষে পরাভূত পরশুরাম ধীরে ধীরে বললেন, "আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করেছিলাম তখন কশ্যপ বলেছিলেন, 'প্রয়োজনে দিনে তুমি পৃথিবীতে আসতে পার কিন্তু রাত্রিবাস করতে পারবে না। সেই অবধি আমি পৃথিবীতে রাত্রিবাস করি না। এখন তুমি আমার গতি নাশ করো না, আমি যেন দ্রুত গতিতে চলে যেতে পারি। তুমি শর নিক্ষেপ করে আমার তপোবল অর্জিত স্বর্গ সংহার কর।"

তখন রাম শরক্ষেপ করে পরশুরামের স্বর্গ সংহার করলেন। সেই থেকে মধ্যরাত্রির জমজমাট দেবসভায় যেতে পারেন না ভার্গব পরশুরাম অর্থাৎ আমাদের শুক্রগ্রহ। শুক্র ও পৃথিবীর অবস্থান এমনই যে, মাঝ রাতের তারা ভরা আকাশে শুক্র গ্রহকে কখনই দেখা যায় না। প্রাকৃতিক ঘটনাকেই বিবৃত করছে এই কাহিনী। কাহিনীটি তাই প্রতীকী কাহিনী।

দেব-দানবের বিরোধ চিরন্তন ব্যাপার। ঋগ্বেদও একথা বলেছে। এখনও সেই বিরোধ আছে। দেবতাদের গুরু হলেন বৃহস্পতি এবং দানবদের গুরু হলেন শুক্রাচার্য। এই দুজনের বনিবনা নেই। শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃতদের বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। শুক্রচার্য সম্পর্কে আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে আমাদের পুরাণকাহিনীতে। প্রাচীন ভারতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রাজনৈতিক গ্রন্থের নাম 'শুক্রনীতি' এবং ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থের নাম 'ভৃগুসংহিতা'।

শুক্রগ্রহের সূর্য পরিক্রমণ পথ প্রায় বৃত্তাকার। সব গ্রহগুলির মধ্যে শুক্রেরই ক্রান্তিপথ সঠিক বৃত্তের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি। একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে শুক্র 224.7 পার্থিব দিন সময় নেয়। এই সময়টাই হল শুক্রের এক বছর। তবে শুক্রের বক্রীগতি [Retrograde Motion] থাকায় এর এক বছর দাঁড়ায় 584 পার্থিব দিনে। শুক্রের অক্ষাবর্তনের দিক এবং গতি দুটোই বিচিত্র এবং অন্যান্য গ্রহদের থেকে আলাদা। সৌরমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্রহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে তার অক্ষাবর্তনে। কিন্তু শুক্র ঘোরে ঘড়ি কাঁটার দিকে। সহজ করে বললে শুক্রগ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে। ফলে, শুক্রপৃষ্ঠ থেকে দেখলে এখানে সূর্যোদয় হয় পশ্চিমে এবং সূর্য অস্ত যায় পূর্বে। শুক্র তার অক্ষে অত্যন্ত আস্তে ঘোরে। তার একবার অক্ষাবর্তনের সময় 243টি পার্থিব দিন। শুক্রের অক্ষাবর্তন ও কক্ষাবর্তন এমন একটা অদ্ভুতভাবে হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যখন ওই গ্রহটি আসে তখন এর একটা নির্দিষ্ট দিকই পৃথিবীর দিকে থাকে। প্রতিবারেই এই ঘটনা ঘটে। এর কারণ প্রায় অজানা। বলা হয় পৃথিবী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবেই এমনটা হয়। তবে এটা সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত নয়।

পৃথিবীর সঙ্গে শুক্র অনেক দিক থেকে একই রকম। শুক্রের বিষুব ব্যাস 12,102.5 কিলোমিটার, যা পৃথিবীর বিষুব ব্যাসের 94.9%। শুক্রের ভর 4.87×10^{24} কিলোগ্রাম,, যা পৃথিবীর ভরের 81.5%। শুক্রের ঘনত্ব 5.24 গ্রাম/ ঘন সেমি। পৃথিবীর গড় ঘনত্ব 5.52 গ্রাম/ঘন সেমি। শুক্র আকারে একটি নিখুঁত গোলক, যদিও পৃথিবীর মেরুর দিক দুটি কিছুটা চ্যাপ্টা। শুক্র সংক্রান্ত কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য হল ঃ

1] সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ঃ	10,80,00,000 কি.মি.
2] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ	0.007
3] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে কক্ষাবর্তন তলের নতি [Inclination] ঃ	3.4^0
4] ক্রান্তিবৃত্তে একটি আবর্তনের নাক্ষত্রকাল ঃ	224.7 পার্থিব দিন [এক শুক্রীয় বছর]
5] অক্ষাবর্তনের কাল ঃ	243 পার্থিবদিন = শুক্রের একদিন।
6] গড় সূর্য পরিক্রমণ সময় [শুক্রের প্রকৃত এক বছর]	584 পার্থিব দিন [বক্রীগতির জন্য]
7] কক্ষাবর্তনের বেগ ঃ	35 কি.মি/ সেকেন্ড
8] ভর ঃ	4.87×10^{24} কিলোগ্রাম
9] ব্যাস [আবহমণ্ডল বাদ দিয়ে] ঃ	12,102.5 কি.মি.
10] ঘনত্ব ঃ	5.24 গ্রাম/ ঘন সেমি
11] উপগ্রহ ঃ	নেই।

12] অভিকর্ষীয় ত্বরণ ঃ 860 সেমি/ সেকেন্ড^2
13] শুক্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ঃ 90 bar
14] এর পৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা ঃ 735^0 K
15] এর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ঃ $230^0 \pm 10^0$ K

শুক্রের একটা আবহমণ্ডল আছে। তাতে আছে 5% কারবন-ডাই-অক্সাইড, 3.5% নাইট্রোজেন এছাড়া আছে কারবন-মনো-অক্সাইড, হিলিয়াম, সালফার-ডাই-অক্সাইড, সামান্য অক্সিজেন ইত্যাদি বিবিধ গ্যাস। শুক্রের বায়ুমণ্ডল বেশ ভারী। তাই এর চাপও খুব বেশি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় 90 গুণ। শুক্রের আবহমণ্ডলে রয়েছে গ্যাসের ঘন আবরণ। সেই আবরণ ভেদ করে শুক্রের পৃষ্ঠদেশের অবস্থা খুব কমই জানা গেছে, যদিও 1970 এবং 1980 -র দশকে রাশিয়া অনেকগুলি মহকাশযান শুক্র নিরীক্ষণে পাঠিয়েছে। শেষ অবধি ভেনেরা -13 [Venera-13] শুক্রের ভূ-পৃষ্ঠের অনেক ছবি পাঠিয়েছে। কারণ এটি শুক্রে অবতরণ করেছিল। এই সব ছবি থেকে দেখা যায় শুক্রে পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, মাটি সবই আছে। মাটির কণার আকার, পাহাড়ের উপাদান অবশ্য ঠিকঠাক জানা যায় নি। একটি 300 কিলোমিটার ব্যাসের সুপ্ত আগ্নেয় গিরির ছবিও এসেছে ভেনেরা-13 মারফৎ। শুক্রের পাহাড়গুলি বেশ উঁচু উঁচু। দশ কিলোমিটার উঁচু পর্বতও আছে সেখানে, যার আয়তন, হিমালয়ের মত। আবার পামিরের আকারের মালভূমিও আছে শুক্রগ্রহে।

শুক্রে আবহমণ্ডলের পরিচলন অন্যান্য গ্রহদের থেকে আলাদা এবং খুবই অদ্ভুত। গ্রহটি নিজের অক্ষে খুব আস্তে ঘুরলেও, এর আবহমণ্ডলে যে গ্যাসীয় মেঘ রয়েছে উপরের দিকের অঞ্চলে সেই গ্যাসীয় মেঘ শুক্রকে চারদিনে একবার পাক খেয়ে নেয়। আবহমণ্ডলের উপবিতলের এই গ্যাসীয় মেঘ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দৌড়াচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 100 মিটার গতিবেগ নিয়ে। অথাৎ এর গতিবেগ ঘন্টায় 360 কিলোমিটার। আবহমণ্ডলের উপরাংশের এই প্রবল গতি হলেও এই গতিবেগ উচ্চতা কমার সঙ্গে কমতে থাকে। এই গতিবেগ শুক্রের ভূ-পৃষ্ঠে এসে সেকেন্ডে এক মিটার বা ঘন্টায় চার কিলোমিটারের বেশি হয় না। কেন শুক্রের আবহমণ্ডলের উপরের তলের গ্যাসীয় মেঘ এমন প্রবল বেগে দৌড়ায় তার কারণ আজও অজানা।

শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আগ্নেয়গিরির লাভা বহু জায়গায় জমাট বেঁধে রয়েছে। কোন কোনও অঞ্চলে এই জমাট বাঁধা লাভার ব্যাস 40 থেকে 50 কিলোমিটার কিংবা তারও বেশি। অনুমান করা শুক্র গ্রহের অভ্যন্তর অনেকটা পৃথিবীর অভ্যন্তরের মতোই হবে। শুক্রে জল না থাকায় প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে সবাই সন্দিহান। তাছাড়া শুক্রপৃষ্ঠের প্রবল উষ্ণতায় প্রাণ থাকাও দুষ্কর। গ্রহটি সম্পর্কে সব তথ্য আজও অজানা।

রাশিয়া ও অমেরিকা বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই শুক্র অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা তিনটি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল—মেরিনার-2, 1962 সালে, মেরিনার-5, 1967 সালে এবং মেরিনার-10, 1974 সালে। রাশিয়া কিন্তু অনেকগুলি মহাকাশযান পাঠিয়েছে শুক্রে। এদের মধ্যে আছে, 1967 সালে ভেনেরা-4, ভেনেরা-7, 1970 সালে, 1975 সালে ভেনেরা-9 ও ভেনেরা-10, 1983 সালে ভেনেরা-15 এবং ভেনেরা-16। এই ভেনেরা-15 এবং ভেনেরা-16 —এই দুটি মহাকাশযানই সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহ সম্পর্কে বহু নিখুঁত তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়। এরপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের 'Magellan Mission'-এ 'ম্যাগেল্লান' মহাকাশযানটি পাঠায় 1989 সালের মে

মাসে। এটি শুক্রের চারিদিকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করে 1990 সালের আগস্ট মাসে। এই ম্যাগেল্লানই শুক্রের পৃষ্ঠদেশের বহু ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এর র‍্যাডার গ্যাসীয় মেঘের আস্তরণ ভেদ করে শুক্রপৃষ্ঠের নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। এই মহাকাশযানটি শুক্রের যত তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, এতো তথ্য আর কোন গ্রহের জন্য পাঠানো অন্য কোন মহাকাশযান পাঠাতে পারে নি। শুক্রে জীবন নেই, জল নেই, অক্সিজেনও না থাকার মত। কে জানে, এমনও দিন হয়তো আসবে, যখন পৃথিবীর মানুষেরা তাদের নতুন বসতি স্থাপন করবে ওই শুকতারার দেশে।

● পৃথিবী [Earth] ●

সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহ আমাদের সাধের এই পৃথিবী। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জন্য যে প্রতীক ব্যবহার করেন তা হলো ⊕। শুধু পৃথিবীর জন্যই নয় তাঁরা বিভিন্ন গ্রহাদির জন্য যে সব প্রতীক ব্যবহার করেন সেগুলি নীচে দেওয়া হল।

প্রত্যেক গ্রহের জন্য প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদরা একটা করে নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করতেন। প্রতীকগুলি গ্রহের প্রকৃতি কল্পনা করে তার ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল। যেমন ঃ

☽	চাঁদ	♂	মঙ্গল
☿	বুধ	♃	বৃহস্পতি
♀	শুক্র	♄	শনি
♅	ইউরেনাস	☉	সূর্য
♆	নেপচুন	⊕	পৃথিবী
♇	প্লুটো		

পুরাকালের অ্যালকেমিস্টরা গ্রহদের প্রতীক দিয়ে বিভিন্ন ধাতুর চিহ্ন আঁকতেন। সূর্যের চিহ্ন ব্যবহৃত হতো সোনা বোঝাতে, চন্দ্রের চিহ্ন দিয়ে রূপো, বুধের চিহ্ন দিয়ে পারদ, শুক্রের চিহ্ন দিয়ে তামা, মঙ্গলের চিহ্ন দিয়ে লোহা, বৃহস্পতির চিহ্ন দিয়ে টিন, শনির চিহ্ন দিয়ে সীসা ইত্যাদি। এর কারণ হলো প্রতিটি ধাতুকেই প্রাচীনেরা কোন না কোনও দেবতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রহরাও দেবপদবাচ্য ছিলেন ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে।

নানান যন্ত্রপাতি, নানা কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ স্টেশন ইত্যাদির সাহায্যে পৃথিবী গ্রহটির এতো তথ্য এবং তত্ত্ব আমাদের জানা হয়ে গেছে যে, এর খুব কম তথ্যই আমাদের অজানা। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকেও পৃথিবীকে দেখা হয়েছে। নীল আর্মস্ট্রংরা তা দেখেছেন। চাঁদ বা মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে নীলাভ দেখায়। পৃথিবী এক নীলাভ উজ্জ্বল গ্রহ। চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে উজ্জ্বল, নীলাভ এবং বর্ণময় দেখায় [চিত্র ঃ 92]।

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব মোটামুটি 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল বা 1.5×10^8 কিলোমিটার। পৃথিবী একবার সূর্য পরিক্রমা সারতে সময় নেয় প্রায় 365 দিন 6 ঘন্টা। প্রকৃতপক্ষে এর কিছুটা কম। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরও ঘূর্ণমান। পৃথিবীর এই অক্ষাবর্তনের প্রকৃত সময় হল 23ঘন্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড। পৃথিবীর গড় সৌরদিন হল 24 ঘন্টা। পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্ত পরিক্রমা ও অক্ষাবর্তন বেগ থেকেই এই সব পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন দিন ও বছরের পার্থিব পরিমাপগুলি ঃ

1) এক সৌর বৎসর ঃ 365 দিন 5 ঘন্টা 48 মিনিট 45.3 সেকেন্ড,

2) এক নাক্ষত্র বৎসর ঃ 365 দিন 6 ঘন্টা 9 মিনিট 9.8 সেকেন্ড

3) এক চান্দ্রমাস : 29 দিন 12 ঘণ্টা 44 মিনিট 2.9 সেকেন্ড,
4) পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর একবার ঘূর্ণনের 'মধ্য সৌর' সময় : 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4.1 সেঃ,
5) এক নাক্ষত্রদিন (মধ্য সৌর সময়ে) : 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4.091 সেকেন্ড
6) এক চান্দ্র তিথি (গড়) : 23 ঘণ্টা 37 মিনিট 28.096 সেকেন্ড,
7) মধ্য সৌরদিন (নাক্ষত্র সময়ে) : 24 ঘণ্টা 3 মিনিট 56.555 সেকেন্ড।

পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের গতির সঙ্গে নিখুঁত মিল রেখে যা চলে, সমান কোণগুলো একেবারে সমান সময়ে পার হয়, সেই রকম ঘড়িই নিখুঁত ঘড়ি। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি কোন কোন ক্ষেত্রে গতিতত্ত্বের ধারণার সঙ্গে মেলে না, আর এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা বিশ্ব বলবিদ্যার নিয়ম দিয়ে দেওয়া যায় না। দেখা গেছে চাঁদ, বৃহস্পতির এক নম্বর ও দু-নম্বর উপগ্রহ, বুধ, এমনকি সূর্যের বার্ষিক আপাত বা দৃশ্য গতির অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের গতিরও তারতম্য ঘটে, আর আপাতভাবে তার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাইহোক, চাঁদ যে পথে চলে তত্ত্ব অনুযায়ী তা থেকে বেশ কয়েক যুগ পরে তার একটি চাপের এক মিনিটের 1/6 ভাগ অর্থাৎ 10" বিচ্যুতি ঘটে। সূর্যের ঘটে একটি চাপের এক সেকেন্ড। ফলে পৃথিবীর অক্ষাবর্তন বা কক্ষাবর্তনকে সমান গতির আদর্শ হিসাবে ধরে নেওয়া মুশকিল। এই পৃথিবী ঘড়ি বাতিল করে সঠিক ঘড়ি হিসাবে ধরা হলো বৃহস্পতির কোন একটি উপগ্রহ, চাঁদ বা বুধের কক্ষাবর্তনের গতি। কিন্তু এই নতুন ঘড়িতেও পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের মাপটা দেখা গেল অসমান—বেশ কয়েক বছর ধরে তার বেগ যায় কমে। আর তার পরবর্তী কয়েক বছর ধরে তা বেড়ে যায়, তারপর আরেকবার কমে। এইভাবে চলতে থাকে।

দেখা গেল, আগেকার বছরগুলোর তুলনায় 1897 খ্রিস্টাব্দে দিনের পরিমাপ ছিল 0.0035 সেকেন্ড বড়। আবার 1918 সালে দেখা গেল দিন ঠিক ততোটা অর্থাৎ 0.0035 সেকেন্ড করে ছোট হচ্ছে। এখন দিন একশ' বছর আগের তুলনায় প্রায় 0.002 সেকেন্ড বড়। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণ গতি তার অন্যগতির তুলনায় অথবা গ্রহমণ্ডলীর অন্য যে সব গতি সমান গতি বলে গণ্য করা হয় তাদের তুলনায় অসমান। একবারে যথার্থ সমান গতি থেকে পৃথিবীর বিচ্যুতির মান অবশ্য খুবই কম। 1680 সাল থেকে 1780 পর্যন্ত এই বিচ্যুতির পরিমাণ 30 সেকেন্ড। এ সময় দিন ছিল বড়। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দিন ছোট হয়েছে আর বিচ্যুতি হয়েছে প্রায় 10 সেকেন্ড। ওই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দিন আরও 20 সেকেন্ড কমে যায় অর্থাৎ পৃথিবীর গতি বেড়ে যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম 25 বছরে পৃথিবীর গতি আবার কমে আসে, দিন বড় হয়, প্রায় 30 সেকেন্ড বিচ্যুতি ঘটে এবং ওই সময়টা সঞ্চিত হয়। ওই বিচ্যুতির কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, চান্দ্র-জোয়ার, পৃথিবীর ব্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদি। ইদানীং পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে এইসব অসুবিধা দূর করা গেছে এবং প্রায় নিখুঁতভাবে সময় মাপা সম্ভব হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে সপ্তাহের সাতদিনের নামকরণের কৃতিত্ব প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের, যাঁরা সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের নামে সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণ করেছিলেন। এই নাম বিভিন্ন পরবর্তী সভ্যতার হাত ঘুরে গ্রীকদের কাছে এসে Sunday, Monday ইত্যাদি হয়ে ওঠে। চন্দ্র সূর্যকে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা কেন গ্রহ হিসাবে গণ্য করতেন তার ব্যাখ্যা যথাযথভাবে

আগেই করা হয়েছে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য পাঁচটি প্রধান গ্রহকে নিয়ে সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণ করা হয়েছিলো ঃ রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার। রবি হলো সূর্য, যাঁকে বলা হত গ্রহরাজ। তাঁর নামে হলো রবিবার—সপ্তাহের প্রথম দিন। চন্দ্র বা সোমের নামে সোমবার, মঙ্গলের নামে মঙ্গলবার, বুধবারের নাম হলো বুধ গ্রহের নাম অনুকরণে। এমনিভাবে বৃহস্পতি গ্রহের নামে বৃহস্পতিবার, শুক্রগ্রহের নামে শুক্রবার ও শনিগ্রহের নামে শনিবারের সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, হিন্দুরা এখনও মনে করেন সূর্যের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট দিন হলো রবিবার, চন্দ্রের পূজার জন্য সোমবার, মঙ্গলগ্রহের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট দিন হলো মঙ্গলবার। এইভাবে যে গ্রহের নামে যে দিন বা বার, সেই বার বা দিনে সেই গ্রহের পূজা-পাঠ করার জন্য উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করা বহুকাল আগেও হতো, আর এখনও হয়। এখনও শনিপূজা শনিবার দিনই হয়ে থাকে। এর সঙ্গে নানান শুভ তিথি ও নক্ষত্রের যোগাযোগ অবশ্য বিচার করা হয়। তবে শনিপূজা শনিবারেই করবার বিধান বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে চালু।

ফলিত জ্যোতিষে মানুষের জীবনে ও পার্থিব ঘটনায় গ্রহের প্রভাবের কথা মেনেছেন প্রাচীন যুগের ঋষিরা। এই প্রভাব সত্যি সত্যিই কতখানি আছে তা আজও বির্তকের বিষয়। তবে চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটা যেমন হয় তেমনি মানুষের শরীরের কিছু কিছু রোগের বৃদ্ধি যে ঘটে তা আজ প্রমাণিত সত্য। ফলিত জ্যোতিষ গ্রহশান্তির জন্য গ্রহ পূজার যে বিধান দিয়েছে, সেইসব গ্রহপূজা সপ্তাহের সেই নির্দিষ্ট দিন বা বারে করতে বলা হয়েছে, যে দিন বা বার ওই গ্রহের নামাঙ্কিত। শুধু তাই নয়, ফলিত জ্যোতিষ গ্রহশান্তির জন্য রত্ন-ধারণের কথা বলেছে। কুপিত গ্রহ মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে, এটা ফলিত জ্যোতিষের দৃঢ়মূল বিশ্বাস। আর এই জ্যোতিষ বিশ্বাস করে, এই কুপিত গ্রহকে শান্ত করতে হলে কিছু রত্ন ধারণ করতে হয়। রত্ন বলতে তাঁদের মতে প্রবাল, নীলা, হীরা, পান্না, চুনি ইত্যাদি। নয় গ্রহের জন্য যেমন নয়টি রত্ন নির্দিষ্ট আছে, তেমনি আছে নানান উপরত্ন। এগুলির ধারণবিধিতে ফলিত জ্যোতিষের নির্দেশ এই যে, যে রত্ন ধারণ করা হবে সেই রত্নের অধিপতি যে গ্রহ বা যে গ্রহকে সেই রত্ন শান্ত বা বলশালী করে, সেই গ্রহের জন্য সপ্তাহের যে দিনটি নির্দিষ্ট অর্থাৎ যে দিনটি সেই গ্রহের নামাঙ্কিত, সেই দিন বা বারে ওই রত্নটি ধারণ করতে হবে। ফলিত জ্যোতিষে হিন্দুরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুই জড়িয়ে ফেলেছেন গ্রহদের সঙ্গে। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে গ্রহরাই জীব ও জড় সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক এবং মানুষের জীবন-মৃত্যু, শান্তি-অশান্তি ইত্যাদি ও পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ওই গ্রহদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মতের সত্যতা অজানা। কিন্তু এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতীয়রা কী ভীষণভাবে গ্রহগুলিকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের তথা ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক বলে বিশ্বাস করতেন!

পৃথিবী অন্যান্য আটটি গ্রহের তুলনায় আকারে ছোটই। যদিও এটি বুধ, শুক্র ও মঙ্গলের তুলনায় আয়তনে বড়, কিন্তু এটি বাইরের দিকের গ্রহগুলির বিশেষ করে গ্যাসীয় গ্রহগুলির তুলনায় আকরে বেশ ছোটই। পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ। এটি আমাদের অতি পরিচিত চন্দ্র বা 'চাঁদমামা'। চাঁদ কিন্তু বেশ বড়সড় উপগ্রহ, অন্ততঃ পৃথিবীর আকারের তুলনায়। কোন কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে প্লুটো ও তার উপগ্রহ শ্যারন [Charon] যেমন প্লুটো-শ্যারন তন্ত্র [System] তৈরি করেছে, এখানেও তেমনি তৈরি হয়েছে পৃথিবী-চন্দ্র তন্ত্র। পৃথিবী ঠিক গোলাকার বর্তুল নয়। এটি অনেকটা আপেলের মত। এর মেরুর দুটি দিক কিছুটা চ্যাপ্টা। এর অভিকর্ষীয় ত্বরণ সমুদ্রপৃষ্ঠে 980

সেমি/সেকেন্ড^2 , বিষুবরেখায় 978 সেমি/সেকেন্ড^2 এবং মেরুতে 983 সেমি/সেকেন্ড^2। পৃথিবীর অভিকর্ষ চাঁদকে তার চারিদিকে ঘোরাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলকে আটকে রাখতে পেরেছে তার নিজের দেহে। আবার চাঁদ তার আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে সৃষ্টি করেছে জোয়ার-ভাঁটা।

পৃথিবীর কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য এই রকম ঃ

1] সূর্যের থেকে গড় দূরত্ব ঃ 14,96,00,000 কিমি।

2] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ 0.0167

3] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে কক্ষপথের নতি [Inclination] ঃ 0.000^0

4] নাক্ষত্রবর্ষ ঃ 365.256 দিন

5] অক্ষাবর্তনকাল ঃ 23.9345 ঘণ্টা

6] গড় কক্ষাবর্তন বেগ ঃ 29.79 কিমি/সেকেন্ড।

7] কক্ষপথের সঙ্গে অক্ষের নতি ঃ $23^0 27'$

8] ভর ঃ 5.976×10^{24} কিলোগ্রাম।

9] বিষুব ব্যাসার্ধ ঃ 6,378.14 কিমি

10] মেরু ব্যাসার্ধ ঃ 6,356.78 কিমি

11] ঘনত্ব ঃ 5.52 গ্রাম / ঘন সেমি।

12] উপগ্রহের সংখ্যা ঃ এক

13] অভিকর্ষজ ত্বরণ ঃ 980 সেমি/সেকেন্ড^2

14] অভিকর্ষ মুক্তিবেগ ঃ 11.2 কিমি/সেকেন্ড

15] বায়ুমণ্ডলের উপাদান ঃ 77% নাইট্রোজেন, 21% অক্সিজেন, 0.9% আর্গন, 0.03% কারবন-ডাই-অক্সাইড এবং কিছুটা জলীয় বাষ্প।

16] বায়ুমণ্ডলের চাপ ঃ একবার [One Bar]

17] বিষুবরেখায় চৌম্বকক্ষেত্র ঃ 0.3 গউস [Gauss]

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদান হল নাইট্রোজেন [77%], অক্সিজেন [21%], আর্গন [0.9%], কারবন-ডাই-অক্সাইড [0.03%], মিথেন [দশলক্ষ ভাগে দু'ভাগ মাত্র] এবং জলীয় বাষ্প। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপরে বেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার জুড়ে অবস্থান করছে। তবে হাজার কিলোমিটার বা তার উপরের বায়ুমণ্ডলে কিছু হাল্কা গ্যাস ছাড়া আর কিছু নেই। ওই সব অঞ্চলে সৌরঝটিকার প্রভাব রয়েছে। সূর্যের থেকে সৌর ঝটিকা বয়ে আনছে লক্ষ কোটি আয়নিত পারমাণবিক কণা। মোটামুটি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 100 কিলোমিটার উচ্চতা অবধি বায়ুমণ্ডলের উপাদান প্রায় একই রকম। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 15 কিলোমিটার উচ্চতা অবধি অঞ্চলকে বলা হয় 'ট্রপোস্ফিয়ার' [Tropospherc]। এই অঞ্চলে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বাড়ার জন্য উষ্ণতা কমে প্রায় 6^0 সেলসিয়াস। ট্রপোস্ফিয়ার যেখানে শেষ সেখানের উষ্ণতা প্রায় -60^0 সেলসিয়াস। এই অঞ্চলে জলীয় বাষ্পেরা থাকে এবং পৃথিবীর আবহাওয়া এই অঞ্চলই নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর থেকে 50 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত অঞ্চলের নাম 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' [Stratosphere]। অর্থাৎ 15 থেকে 50 কিলোমিটার অবধি 35 কিলোমিটার বেধের অঞ্চলই হল 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার'। এই বাতাসের পরিচলন নীচের থেকে উপরে কিংবা উপর থেকে নীচে হয় না, হয় অনুভূমিকভাবে। এই অঞ্চলের উপরের স্তরে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শোষিত হয়

এবং অক্সিজেন অণুগুলি ভেঙে যায়। অক্সিজেন পরমাণুগুলি জোড়া লেগে এই স্তরে প্রচুর ওজন [O_3] তৈরি হয়। ওই ওজন স্তর সারা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে নিরাপদ আবরণীর মত। সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক প্রায় সমস্ত স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি এই স্তরে শোষিত হয়। এই অঞ্চলের উষ্ণতা তুলনামুলকভাবে কিছুটা বেশি। এর উপরের স্তরের নাম মেসোস্ফিয়ার [Mesosphere]। এই অঞ্চলের উষ্ণতা আবার কমতে থাকে এবং -85^0 সেলসিয়াস হয়ে যায়। এই স্তর বিস্তৃত 100 কিলোমিটার উচ্চতা অবধি। সুতরাং 50 থেকে 100 কিলোমিটার অবধি মোট 50 কিমি বেধের এই স্তরটির নাম 'মেসোস্ফিয়ার'। 100 কিলোমিটার উচ্চতার উপরে বায়ুমণ্ডলীয় স্তরের নাম 'আয়নোস্ফিয়ার' [Ionosphere]। এই স্তরে সূর্যের থেকে আসা অসংখ্য আয়নিত কণা বাধা পায় এবং শোষিত হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায় সেগুলি এইসব আয়নিত কণার সঙ্গে আয়নোস্ফিয়ারের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল।

সূর্য তার আদিকালে অনেক কম উজ্জ্বল ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অবস্থা এখনকার মত একই রকম থেকে থাকলে যে সময় সমুদ্রগুলি জমে বরফ হয়ে ছিল। এই সময় বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইড বেশি থাকায় 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' [Green House Effect] বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বিকিরণজনিত তাপ হ্রাস বাধ্যপ্রাপ্ত হয় কারবন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস বায়ুমণ্ডলে থাকার জন্য। ফলে, পৃথিবী গরম হয়। সমুদ্রের বরফ গলে যায়। এখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যতটা কারবন-ডাই-অক্সাইড আছে, তার অন্ততঃ এক কোটি [10^7] গুণ কারবন-ডাই-অক্সাইড শোষিত হয়ে রয়েছে পৃথিবীর শিলাস্তরে ক্যালসিয়াম কারবোনেট [$CaCo_3$] হিসাবে। শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডলে কারবন-ডাই-অক্সাইড বহুল পরিমাণে রয়েছে, যা পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বিপরীত। ইদানীং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কারবন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে তেল কয়লা ইত্যাদি জৈব-ফসিল জ্বালানী পোড়ানোর ফলে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারবন-ডাই-অক্সাইডের জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গ্রীন হাউস এফেক্ট এতোটাই বাড়ছে যে 2050 সাল নাগাদ পৃথিবীর উষ্ণতা কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে, যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে কৃষিতে এবং সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর সমস্ত উপকূল অঞ্চলকে গ্রাস করে ফেলবে। সভ্যতার টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরের উপরের দিকে যে ওজোন [Ozone] স্তর রয়েছে, যা সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকাচ্ছে, সেই ওজোন স্তরে বিশাল ফুটো [Hole] তৈরি হয়েছে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে, মানুষের তৈরি করা মূলতঃ একটি রাসায়নিক পদার্থের কারণে। এই রাসায়নিকটি হল 'ক্লোরোফ্লুরো কারবন' [Chlorofluoro Carbon]। এটি উৎপন্ন হচ্ছে মূলতঃ শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি থেকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত এই ক্ষতিকারক রাসায়নিক বস্তুটির প্রায় এক তৃতীয়াংশেরও বেশি [34%] একাই উৎপন্ন করে। আগেই বলেছি, সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শরীরের পক্ষে প্রবল ক্ষতিকারক। এই রশ্মি চামড়ার ক্যানসার, চোখের রোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, UV-B শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন-ডি তৈরি করে।

পৃথিবীর জলচক্র [Hydrologic Cycle] পৃথিবীর জীবকুলের টিকে থাকার ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় অবদান রেখেছে। সমুদ্রের জল মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়ে আবার সমুদ্রেই ফিরে যায়। এই জলচক্র বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীর জীবনকে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর 70% ভাগ জুড়েই জল, তবু বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, সামনের 30/40 বছরের মধ্যে পানীয় জলের অভাব নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা প্রবল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রহে পানীয় জলের অভাব ক্রমবর্ধমান। এখন থেকে সাবধান না হলে মানুষের কপালে দুর্ভোগ রয়েছে অদূর ভবিষ্যতেই।

পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে গেলে প্রথমেই আসে ভূ-পৃষ্ঠ। এর বেধ 60 কিলোমিটারের বেশি নয়। এর উপরেই আছে নদী, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি। এই স্তরে আছে মাটি, বালি, পাথর, শিলা প্রভৃতি। এর পরের 400 কিলোমিটার হল গলিত লাভার স্তর। এই স্তরে ধাতু ইত্যাদি গলিত অবস্থায় রয়েছে। এরপর 2890 কিলোমিটার অবধি রয়েছে আরও একটি গলিত স্তর যেখানে আছে গলিত ম্যাগনেসিয়াম ও লোহাযুক্ত গলিত সিলিকেট। এরপর আছে পৃথিবীর কেন্দ্রাঞ্চল। এর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এই স্তরে আছে তরল লোহা ও তার বিভিন্ন সঙ্কর। এই কেন্দ্রাঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রে 5,150 কিলোমিটার নীচে রয়েছে একটা ছোট আকারের কেন্দ্রক। এর ব্যাসার্ধ প্রায় 1200 কিলোমিটার। এই কেন্দ্রকের প্রান্তের উষ্ণতা প্রায় 4000^0 কেলভিন থেকে 5000^0 কেলভিন। আর পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রের উষ্ণতা বা ওই কেন্দ্রকের উষ্ণতা প্রায় $5{,}500^0$ কেলভিন থেকে $7{,}500^0$ কেলভিন, যা সূর্যের বহির্মণ্ডলের উষ্ণতার চেয়ে অনেকটাই বেশি।

পৃথিবীর বয়স প্রায় 460 কোটি বছর। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় 200 কোটি বছর আগে। অস্ট্রালোপিথেকাসকে মানুষের পূর্ব পুরুষ ধরলে মানুষ এসেছে প্রায় 20 লক্ষ বছর আগে। আর সভ্যতা বলে আমরা যা বুঝি তারও বয়স কাল 10/12 হাজার বছরের বেশি নয়। পৃথিবীতে মানবসভ্যতা 10,000 বছর কাটালেও বর্তমান প্রাকৃতিক দূষণে পৃথিবীর যা অবস্থা তাতে এই পৃথিবীর মানব সভ্যতার আর 50 [পঞ্চাশ] বছর টিকে থাকা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই দূষণ তথাকথিত সভ্য মানুষের নিজেরই সৃষ্টি। নিজেদের মৃত্যুর পথ তারা নিজেরাই মজবুত করে বানাচ্ছে।

● মঙ্গল [Mars] ●

মঙ্গল সৌর জগতের চতুর্থ গ্রহ। পৃথিবীর একদিকে শুক্রগ্রহ অন্যদিকে মঙ্গল। মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা ছোট, এর ব্যাস প্রায় চার হাজার দুশো মাইল। মঙ্গলের ঠাণ্ডা-গরমের ব্যাপারটা পৃথিবীর চেয়ে ভিন্ন হলেও মঙ্গল গ্রহের মেরুদণ্ডও তার কক্ষপথের লম্বের সঙ্গে 23.5^0 কোণ সৃষ্টি করে অবস্থিত। মঙ্গল তার নিজের অক্ষের উপর একবার আবর্তিত হতে সময় নেয় 24 ঘন্টা 37 মিনিট। 687 দিনে মঙ্গল একবার সূর্য পরিক্রমা করে। অর্থাৎ মঙ্গলের এক বৎসর হয় আমাদের তেইশ মাসে। মঙ্গল থেকে পৃথিবীকে কখনই পুরোপরি দেখা যায় না। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ দেখা যায় সেখান থেকে। পৃথিবীর চাঁদ মঙ্গল থেকে খালি চোখে দেখা যায়। তবে আমাদের চাঁদ সেখান থেকে লুব্ধকের মতই উজ্জ্বল দেখায়। অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর আকাশে লুব্ধককে যেমন দেখি, মঙ্গলের আকাশে আমাদের চাঁদকে তেমনি দেখায়।

মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ, একটি হলো 'ফোবোস', অন্যটি 'ডেইমোস'। দুটি উপগ্রহ মঙ্গলের খুব কাছেই অবস্থিত। ফোবোস মঙ্গলের থেকে মাত্র চার হাজার মাইল দূরে থেকে মঙ্গলের চারদিকে পাক খায়। ফোবোসের ব্যাস মাত্র দশ মাইল বা 16 কিমি। আমাদের আকাশে শুক্রের যতটা ঔজ্জ্বল্য তার প্রায় 25 গুণ উজ্জ্বল দেখায় ফোবোসকে মঙ্গলের আকাশে। ডেইমোস তার ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়েই মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। আসলে 'ফোবোস' বা 'ডেইমোস' মঙ্গলের খুব কাছে আছে বলেই এটা সম্ভব। মঙ্গল হতে ফোবোসের কলাগুলো খুব স্পষ্টই দেখা যায়। ডেইমোসের কলাগুলোও মঙ্গল হতে খালি চোখে দেখা সম্ভব। ফোবোস হতে মঙ্গলকে অপূর্ব দেখা যাবে। মঙ্গল সেখানে আকাশের প্রায় 41^0 অংশ জুড়ে থাকে। সেখানে মঙ্গল একটা বিরাট আলোর চক্র, তার কলাগুলোও দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকবে। মঙ্গল সেখানে আমাদের চাঁদের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ

উজ্জ্বল এবং আকারেও আমাদের চাঁদের চেয়ে প্রায় 80 গুণ বড় দেখাবে। একমাত্র বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহ থেকে এমন দৃশ্য দেখা সম্ভব। মঙ্গলগ্রহে বা তার উপগ্রহ দুটিতে প্রাণের অস্তিত্ব নাই। উপগ্রহ দুটি বড় বড় পাথরের টুকরোর মত মঙ্গলের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন। মঙ্গলগ্রহের নাম অনুসারে এই বারের নাম মঙ্গলবার। ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে মঙ্গলগ্রহের শান্তির জন্য তার পূজাপার্বণ বা বন্দনা করার পক্ষে এই বার সবচেয়ে প্রশস্ত। পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে লালাভ দেখায়। লাল রঙ যুদ্ধ, কলহ-বিবাদ ইত্যাদির প্রতীক। সম্ভবত সেই কারণেই মঙ্গলকে যুদ্ধ-বিবাদের গ্রহ বলা হয়। 'Mars' বা 'Tiw' যুদ্ধের দেবতা। মঙ্গলবার তাই 'Day of the Mars' বা 'Day of the Tiw'। মঙ্গলবার এইভাবেই 'Tuesday' হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয়রা মঙ্গলকে বলতো 'ভৌম'। ফলিত জ্যোতিষে মঙ্গলের নাম 'কুজ'।

মঙ্গল প্রায় প্রতি পনেরো বছরে পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের কাছে উজ্জ্বলতম হয়ে ধরা দেয়। এর নাম মঙ্গলের 'অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা'। পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘোরে 365.25 দিনে একবার এবং মঙ্গল একবার ঘুরতে লাগায় 687 দিন। দুটো গ্রহ একবার যেন সবচেয়ে কাছাকাছি এলো, পরের বার আবার আসবে পার্থিব ও মঙ্গলীয় বছরের পূর্ণাঙ্ক নিয়ে গঠিত অবকাশের পর। সমীকরণটা হবে,

$$365.25x = 687y$$

বা $$x = 1.88y$$

বা $$\frac{x}{y} = \frac{47}{25} = 1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{3}}}$$

আবার, $$1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{7}} = \frac{15}{8}$$

অর্থাৎ 1/3 বাদ দিলে মঙ্গলের 8 বছর পৃথিবীর 15 বছরের সমান। অবশ্য সমস্যাটিকে সহজ করার জন্য $\frac{687}{365\frac{1}{4}} = 1.88$ ধরা হয়েছে, যদিও প্রকৃত মান হবে 1.8809, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতার সময় হলো পার্থিব 15 বৎসর। বিংশ শতাব্দীতে মঙ্গলের অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা ঘটেছে 1909, 1924, 1939-1941, 1956, 1971-73 এবং 1988 সালে। 2003-04 খ্রিস্টাব্দে আবার অনুকূল প্রতিপক্ষতা ঘটেছে যখন ওই মঙ্গলকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাল পৃথিবীর আকাশে। কারণ মঙ্গল তখন আবার পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল। 2018-2019 সালে আবার ঘটবে এ ধরনের অনুকূল প্রতিপক্ষতা।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে যে চিহ্ন ব্যবহার করতেন তা ঢাল আর বর্শার চিহ্ন। এই চিহ্ন দুটি যোদ্ধার অস্ত্র। মঙ্গল যুদ্ধেরই প্রতীক একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মঙ্গলের অধিদেবতা হলেন যুদ্ধের দেবতা বা 'মার্স'। আধুনিক যুগের প্রাণীবিদরা মঙ্গলের এই প্রতীককে পুরুষ বোঝাতে ব্যবহার করে থাকেন। প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা মঙ্গলের প্রতীক চিহ্নকে লোহার পরিবর্তে ব্যবহার করতেন। লোহা মঙ্গলের ধাতু এই ধরে নিয়েই প্রতীকের এমন উপস্থাপনা। আবার যুদ্ধের জন্য লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্রই বেশি কাজে লাগে। তাই লোহার দেবতা হলো মঙ্গল। লোহার প্রতীক তাঁদের কাছে মঙ্গলের প্রতীক।

সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় 1.52 গুণ। মঙ্গলের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হওয়ার জন্য [0.0934] সূর্য ও মঙ্গলের মধ্যে দূরত্বের পরিমাপ দাঁড়ায় 20.66 কোটি থেকে 24.92 কোটি কিলোমিটার। মঙ্গলের একবার সূর্য পরিক্রমা সারতে পৃথিবীর সময়ের প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। মঙ্গলের ক্রান্তিবৃত্ত বা সূর্য পরিক্রমণ কক্ষপথ সম্পর্কে কিছু তথ্য হল ঃ

[1] সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ঃ 22,79,41,040 কিমি

[2] উৎকেন্দ্রিকতা ঃ 0.093399

[3] পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে কক্ষপথের নতি [Inclination] ঃ 1.85020^0

[4] সূর্য পরিক্রমণ সময় = 686.980 গড় সৌরদিন

[5] যুতি কাল [Synodic Period] ঃ 779.94 গড় সৌরদিন

[6] কক্ষাবর্তনের গতি ঃ 24.1 কিমি/সেকেন্ড

পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তের তলের সঙ্গে মঙ্গলের কক্ষাবর্তনের তল 1.85^0 কোণ করে আছে। মঙ্গলের অক্ষ তার কক্ষতলের সঙ্গে 24.935^0 কোণে অবস্থান করছে। মঙ্গলের একবছর হয় 668.6 বা 669 মঙ্গলের সৌরদিনে। মঙ্গলের থেকে মুক্তিবেগ 5.022 কিমি/সেকেন্ড। কারণ মঙ্গলের অভিকর্ষ খুবই কম, পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মঙ্গল মোটামুটি বর্তুলাকার। মঙ্গলের ভৌত পরিমাপগুলির কয়েকটি নীচে দেওয়া হল ঃ

[1] মেরু ব্যাস ঃ 3,376.1 কিমি,

[2] বিষুব ব্যাস ঃ 3,396.9 কিমি,

[3] পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ঃ 1.44×10^8 বর্গ কিমি,

[4] আয়তন ঃ 1.63×10^{11} ঘন কিলোমিটার,

[5] ভর ঃ 6.418×10^{23} কিলোগ্রাম।

[6] অভিকর্ষজ ত্বরণ ঃ 372 সেমি/সেকেন্ড^2

[7] গড় ঘনত্ব ঃ 3.75 গ্রাম/ঘন সেমি

[8] গড় মুক্তিবেগ ঃ 5.022 কিমি/সেকেন্ড

[9] মঙ্গলের এক নাক্ষত্র দিন ঃ 24 ঘন্টা 37 মিনিট 22.663 সেকেন্ড

[10] মঙ্গলের এক সৌরদিন ঃ 24 ঘন্টা 39 মিনিট 36 সেকেন্ড

[11] কক্ষপথের সঙ্গে মঙ্গলের বিষুবের নতি [Inclination] ঃ 24.936^0

[12] কেন্দ্রীয় চাপ ঃ 350–400 কিলোবার [Kilo Bar]

[13] উপগ্রহের সংখ্যা ঃ দুই।

মঙ্গলের একটা বায়ুমণ্ডল আছে, কিন্তু তাতে অক্সিজেন প্রায় নেই বললেও চলে। মঙ্গলের ভূমিপৃষ্ঠের উষ্ণতা 250^0 কেলভিন। আবহমণ্ডলের নীচের দিকের উষ্ণতা 200^0 কেলভিন। ভূ-পৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের এই উষ্ণতা প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় 1.5^0 কেলভিন করে কমতে থাকে। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি এই রকম ঃ

[1] কারবন-ডাই-অক্সাইড [CO_2] ঃ 95.32%

[2] নাইট্রোজেন [N_2] ঃ 2.7%

[3] আরগন [Ar] ঃ 1.6%

[4] অক্সিজেন [O_2] ঃ 0.13%
[5] কারবন মনোক্সাইড [CO] ঃ 0.07%
[6] জলীয় বাষ্প [H_2O] ঃ 0.03%
[7] নিয়ন [Ne] ঃ 0.00025%
[8] ক্রিপটন [Cr] ঃ 0.00003%
[9] জেনন [Xe] ঃ 0.000008%

মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠে তার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ 5.5–6 মিলিবার [Millibar]। 1947 খ্রিস্টাব্দে যখন মঙ্গল সম্বন্ধে প্রায় কোনও তথ্যই জানা ছিল না, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গেরার্ড পি. কুইপার [Gerard P. Kuiper] আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মুখ্য উপাদান যেমন নাইট্রোজেন, তেমনি মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের মুখ্য উপাদান হল কারবন-ডাই-অক্সাইড। এখন মঙ্গলের বহু তথ্যই আমাদের জানা ভাইকিং-1 ও ভাইকিং-2 [Viking 1 and 2] এবং মঙ্গল পরিক্রমারত আমাদের মহকাশযানের পাঠানো অসংখ্য তথ্য থেকে। মঙ্গলে জল নেই, কিন্তু এর মেরু প্রদেশে বরফ আছে, আর এর বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প আছে। এই গ্রহটির উষ্ণতা ও চাপ এতোই কম যে, জলকণাগুলি এখানে বাষ্প হয়ে কিংবা বরফ হয়ে বায়ুমণ্ডলে থাকে।

ভাইকিং-1 মঙ্গলের যেখানে নেমেছিল সেখানে সূর্যোদয়ের সময় তাপমাত্রা থাকতো 189^0 কেলভিন এবং সূর্যাস্তের আগে তা হতো 240^0 কেলভিন। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে যেমন সাদা মেঘ দেখা যায় জলীয় বাষ্পের, তেমনি হলদে মেঘ দেখতে পাওয়া যায় ধূলিকণার। বায়ুমণ্ডলের 10 কিলোমিটার উচ্চতা অবধি ওই ধূলিকণাদের দেখা যায়। এই গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক এখনও আছে। তবে ভাইকিং দুটি যে দুটি অঞ্চলে নেমেছে ওই দুই অঞ্চলে জীবনের কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মঙ্গলের গ্রহের দুই মেরু প্রদেশে প্রচুর বরফ জমে আছে। দূরবীনে মঙ্গলকে দুটি সাদা টুপি পরা একটি বর্তুল মনে হয়। মেরুদেশের ওই বরফ জলীয় বরফ না কারবন-ডাই-অক্সাইডের বরফ তা নিয়ে এখনও কিছুটা বিতর্ক আছে। মঙ্গলে অবস্থানকারী ভাইকিং-1 ও 2 এবং একে পরিক্রমণরত মেরিনার 9-এর পাঠানো তথ্য এবং ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, মঙ্গলের উত্তর মেরুর বরফ পুরোপুরি জল থেকে তৈরি। কিন্তু এর দক্ষিণ মেরুর বরফ সম্ভবত জলীয় বরফ এবং কারবন-ডাই-অক্সাইড বরফের মিশ্রণ। 'সম্ভবত' বলা হচ্ছে এইজন্য যে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ—ফোবস [Phobos] এবং ডেইমস বা ডাইমস [Deimos]। এগুলি আবিষ্কৃত হয় 1877 সালে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আসাফ হল [Asaph Hall] এদের আবিষ্কর্তা। এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না, এখন জানা গেছে দুই ভাইকিংয়ের কল্যাণে। ভাইকিং-1 ফোবসের মাত্র 100 কিলোমিটার দূর দিয়ে গেছে মঙ্গলে অবতরণের সময়। আর ভাইকিং-2 ডাইমসের মাত্র 30 কিলোমিটার দূর দিয়ে গেছে তার মঙ্গল অভিযানের সময়। এই দুই উপগ্রহ সম্পর্কে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হল ঃ

বিষয়	ডাইমস	ফোবস
[1] কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ঃ	23,459 কিমি	9,378 কিমি
[2] কক্ষাবর্তন কাল ঃ	1.26244 দিন	0.31891 দিন
[3] কক্ষাবর্তনের গড় গতিবেগ ঃ	1.4 কিমি/সেকেন্ড	2.1 কিমি/সেকেন্ড

[4] আকার	15 কিমি×12.2 কিমি ×10.4 কিমি	26.6 কিমি× 22.2কিমি×18.6 কিমি
[5] পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল ঃ	525 বর্গ কিমি	1625 বর্গ কিমি
[6] আয়তন ঃ	1020 ঘন কিমি	5730 ঘন কিমি
[7] ভর ঃ	1.8×10^{15} কিলোগ্রাম	1.08×10^{16}কিলোগ্রাম
[8] গড় ঘনত্ব ঃ	1.8 গ্রাম/ঘনসেমি	1.9 গ্রাম/ঘনসেমি
[9] মুক্তিবেগ ঃ	6 মিটার/সেকেন্ড	10 মিটার/সেকেন্ড

উপগ্রহ দুটি মঙ্গলের খুব কাছেই অবস্থিত। মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসার্ধের মাত্র 2.4 গুণ গড় দূরত্বে রয়েছে এই দুটি উপগ্রহ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মঙ্গলের মহাকর্ষে ফোবসের গতিবেগ কমছে এবং এটি প্রায় 10 কোটি বছর পরে মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে। ফোবস মঙ্গলকে পার্থিব 7 ঘন্টা 39 মিনিট সময়ে একবার পরিক্রমা করে। মঙ্গলের উপর থাকা কোনও দর্শক মঙ্গলের একদিনে ফোবসকে দু'বার উদয় হয়ে দু'বার অস্ত যেতে দেখতে পায়। ফোবস ডাইমসের তুলনায় আয়তনে 5.9 গুণ বড় এবং এর ভরও ডাইমসের 10 গুণ। ফোবসের অবস্থান মঙ্গলের খুব কাছাকাছি বলেই এটি মঙ্গলের উপর প্রায় 10 কোটি বছরের মধ্যেই আছড়ে পড়বে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে এই উপগ্রহ দুটি আসলে গ্রহাণু, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে যে গ্রহাণুপুঞ্জ আছে, সেখান থেকে মঙ্গলের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে চলে এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, ফোবস ও ডাইমস দুটি উল্কা খণ্ড এবং এর তৈরি হয়েছিল সৃষ্টির আদ্যিকালে। ওরা মঙ্গলের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে চলে এসেছে। এই দুই উপগ্রহের অলোক প্রতিফলন ক্ষমতা বেশ কম। ডাইমসের 0.06 এবং ফোবসের 0.05। এই অত্যন্ত কম প্রতিফলন ক্ষমতার জন্যই অনেকে একে উল্কাখণ্ড বলে অনুমান করেন।

1960 থেকে 1980 সাল অবধি রাশিয়া ও আমেরিকা নানা ধরনের মহাকাশযান পাঠিয়েছে মঙ্গলকে জানতে। মেরিনার-4, 6 এবং 7 মঙ্গলের পাশ দিয়ে গেছে এর ছবি তুলতে তুলতে। মেরিনার-9 মঙ্গলের চারিদিকে পরিক্রমণ করেছে। ভাইকিং-1 এবং 2 মঙ্গলে অবতরণ করেছে। রাশিয়ার ভাইকিং মহাকাশ যান ছাড়াও মার্স-2, 3 এবং 5 তিনটি যান মঙ্গল নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে। মার্স-3 তো 1971 সালের 2রা ডিসেম্বর যন্ত্রপাতিসহ একটা ক্যাপসুল মঙ্গলে স্থাপন করেছে। এই তিনটি মহাকাশযানের দুটি মঙ্গলে অবতরণ করে। 1974 সালে মার্স-5 মঙ্গলকে পরিক্রমা করে নানা তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এটি প্রমাণ করেছে মঙ্গলের চৌম্বকক্ষেত্র খুবই দুর্বল।

মেরিনার-9, 1971 সালের নভেম্বর থেকে 1972 সালের অক্টোবর অবধি মঙ্গলের চারিদিকে পাক খেয়েছে। প্রায় এক বছরের এই পরিক্রমণের পর ওটি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মেরিনার-9 মোট 7,330টি ছবি পাঠিয়েছে, যেগুলি 70% ছবিই মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের। 1988 সালে রাশিয়া ফোবস-1 ও ফোবস-2 নামে দুটি মহাকাশযান মঙ্গলে পাঠায়। ফোবস-1 মাঝপথে খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু ফোবস-2 মঙ্গলে পৌঁছায় 1989-এর গোড়ার দিকে এবং মঙ্গল ও ফোবসের বহু ছবি ও নানা তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়। এটি মঙ্গলের কক্ষপথে থাকার সময়ই খারাপ হয়ে যায়।

• বৃহস্পতি [Jupiter] •

বৃহস্পতি সৌরমণ্ডলের পঞ্চম গ্রহ। বিশাল এই গ্রহটি পৃথিবীর আয়তনের 1,350 গুণ। ওজনেও পৃথিবীর 317.5 গুণ। এই বিশাল গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ এতই জোরালো যে, 16টি চাঁদ এর চারদিকে

পাক খাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে চারটি, তাদের গ্যালিলিও প্রায় চার শতাব্দী আগে আবিষ্কার করেন। নীচের তালিকায় আমাদের চাঁদ, বুধ ও মঙ্গলের সঙ্গে বৃহস্পতির প্রথম চারটি উপগ্রহের একটা তুলনা দেওয়া হলো বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির বিশালতা বোঝাতে।

উপগ্রহের নাম	ব্যাস
বৃহস্পতির 1নং উপগ্রহ [Io]	3630 কিমি [প্রায়]
বৃহস্পতির 2নং উপগ্রহ [Europa]	3138 কিমি [প্রায়]
বৃহস্পতির 3নং উপগ্রহ [Ganymede]	5262 কিমি [প্রায়]
বৃহস্পতির 4নং উপগ্রহ [Callisto]	4,800 কিমি [প্রায়]
মঙ্গল	6,600 কিমি [প্রায়]
বুধ	4,700 কিমি [প্রায়]
চন্দ্র	3,480 কিমি [প্রায়]

এই বিশাল গ্রহটি যে ব্যবধানে থেকে তার চাঁদদের পাক খাওয়ায় তা বিস্ময়কর। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় ঃ

ব্যবধান	দূরত্ব কিলোমিটারে	কতগুণ
চাঁদ থেকে পৃথিবী	3,80,000	1
বৃহস্পতি থেকে তার 3 নং উপগ্রহ	10,70,000	3
বৃহস্পতি থেকে তার 4 নং উপগ্রহ	19,00,000	5
বৃহস্পতি থেকে তার 9 নং উপগ্রহ	2,40,00,000	63

এ থেকেই বোঝা যায় বৃহস্পতির পরিবার পৃথিবী-চাঁদ পরিবারের কমপক্ষে 63 গুণ। আর কোন গ্রহের এমন ব্যাপক বিস্তৃত পরিবার নাই। বৃহস্পতি তাই 'ছোট সূর্য' নামেও অভিহিত হয়। তার ভর অন্য সব গ্রহের মোট ভরের তিন গুণ। হঠাৎ সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেলে তার জায়গায় বৃহস্পতিকে দিয়ে অন্য সব গ্রহদের তাকে কেন্দ্র করে পাক খাওয়ানোয় বাধ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বৃহস্পতির আকর্ষণে তার কাছাকাছি প্রায় শ'খানে ধূমকেতু আটকে আছে, যেগুলি ওখান থেকে এসে সূর্য পরিক্রমা সেরে ওই জায়গায় আবার ফিরে যায়।

বৃহস্পতি আর সূর্যের ভৌতিক গঠনেও মিল আছে। বৃহস্পতির আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.35 আর সূর্যের 1.4। বৃহস্পতির আকার কমলালেবুর মত। বরফের পুরু স্তর আর বায়ুমণ্ডলে ঢাকা ঘন বস্তু। এর তাপমাত্রা -140^0 সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ শূন্যের নীচে 140^0 সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে আছে অ্যামেনিয়া আর মিথেন প্রচুর পরিমাণে। দিনের বেলায়ও বৃহস্পতিকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। দূরবীনে বৃহস্পতির কালো মোটা দাগ ও বিন্দুচিহ্নগুলিও দেখা যায়। এগুলির সঠিক ব্যাখা এখনও পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের পঁয়ত্রিশতম

সূক্তের অষ্টম ঋক, যেখানে বলা হলো ঃ

"পৃথিবী হ'তে অন্তরীক্ষ, সূর্য, নক্ষত্র, ত্রিলোকের অষ্টদিক ও বিদিকের নক্ষত্রমণ্ডলী, ধাবমান বিয়ৎ সিন্ধুচারী সপ্তগ্রহ যোজিত দিব্য সবিতার বরণীয় বিগ্রহ রত্নের মধ্যাগত আশু আবেদ্য [আবেদনীয়] হিরণ্যসদৃশ ব্যক্ত হয়।" [ঋগ্বেদ ঃ 1ম/35সূ/8ঋ]

সপ্তাহের পঞ্চম দিন হলো বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতি গ্রহের নামে এই বারের নামকরণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঋষিরা। তাঁরা বৃহস্পতিকে দেবগুরু হিসাবে ধরতেন। এই দেব-গুরুর নাম অনুসারে সবচেয়ে বড় গ্রহটির নাম দিয়েছিলেন বৃহস্পতি। গ্রহের নাম অনুসারে বারের নাম হলো বৃহস্পতিবার। হিন্দুরা বৃহস্পতিবারকে সব রকম দেবপূজার পক্ষে প্রশস্ত দিন মনে করেন। বৃহস্পতিবার যেহেতু দেবগুরু বৃহস্পতির নামাঙ্কিত, অনেকে তাই এই বারকে 'গুরুবার'ও বলেন। আবার বৃহস্পতি সবচেয়ে 'গুরু' বা ভারী গ্রহ বলেও এই নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। তবে সাধারণত দেবগুরুর নাম অনুসারে বারটির নাম হওয়ায় লোকে এই বারকে 'গুরুবার' বলে অভিহিত করেন। দিনটি বৃহস্পতি গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। হিন্দুদের নিত্য পূজাপার্বণের অধিকাংশই এই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার যেমন বৃহস্পতি গ্রহের পূজার পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহ-সংক্রান্ত রত্নধারণের পক্ষেও প্রশস্ত। ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে বৃহস্পতির রত্ন ধারণ বৃহস্পতিবারেই করতে হয়। বৃহস্পতিবারকে 'লক্ষ্মীবার'-ও বলা হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই দিন প্রায় প্রতি বাড়িতেই ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস দুটিতে অর্থাৎ হেমন্তকালে যখন হৈমন্তী ফসল পাকার সময় হয়, তখন প্রতি বৃহস্পতিবারই ধুমধাম করে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। পাকা ফসলের মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীর গৃহে আগমন পূজার মন্ত্রে অভিনন্দিত হয়, বন্দিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দেবতার পূজাপার্বণের অনুষ্ঠানের পক্ষে বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

কোনও শুভকাজ শুরু করার জন্য হিন্দুরা বৃহস্পতিবারকেই প্রশস্ত মনে করে। শিশুদের বিদ্যারম্ভের দিন হলো বৃহস্পতিবার। যেহেতু দেবগুরু বৃহস্পতির নামের সঙ্গে বারের নামের মিল আছে, তাই মনে করা হয় বৃহস্পতিবার বিদ্যারম্ভ করলে দেবগুরুর মত জ্ঞানী হওয়া সম্ভব।

'বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ' এই মত মেনে 'গুরুবার' বা বৃহস্পতিবার বিদ্যারম্ভের প্রাথমিক অনুষ্ঠান 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের বিদ্যারম্ভের দিন হিসাবে বৃহস্পতিই উপযুক্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। এর সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রদের অবস্থান মিলিয়ে ঠিক কোন্ সময় 'হাতেখড়ি' দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়। বৃহস্পতিবারের মধ্যাহ্নের পর থেকে সূর্যাস্ত অবধি সাধারণভাবে 'বারবেলা' ধরা হয় এবং এই সময়ের মধ্যে কোনও শুভকাজ শুরু করা হয় না। তাই পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য শুভকাজ সবই বৃহস্পতিবারের মধ্যাহ্নের আগে শুরু করা হয়ে থাকে। বৃহস্পতিবার উপাসনার দিন হিসাবেও শ্রেষ্ঠ বলে অনেক প্রতিষ্ঠানে বৃহস্পতিবার কর্মবিরতির দিন হিসাবে চিহ্নিত এবং ওই দিনে সপ্তাহিক উপাসনার অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে, হিন্দুদের পূজাপার্বণ, যাবতীয় শুভকাজ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য বৃহস্পতিবারকে প্রশস্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করা হয়।

বৃহস্পতিবারের এই নামকরণ গ্রীস ও রোমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। রোমানরা দিনটি 'জুপিটার' [Jupiter] বা 'জোভ' [Jove]-এর দিন বলে মনে করতো। জুপিটার হলো বজ্রের দেবতা, অনেকটা আমাদের ইন্দ্রের মত অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের মত, যাঁকে বজ্রধারী বা বজ্রের দেবতা বলে কল্পনা করা হয় হিন্দু-পুরাণে। পরবর্তীকালে বৃহস্পতি গ্রহের নামও হয় 'জুপিটার'। জার্মানীর উপজাতীয়রা রোমানদের মত এই দিনটিকে জুপিটারের দিন [Day of Jupiter] বলে মনে করতো। লাটিনে এই দিনের নাম

জোভের দিন বা 'Day of Jove' বা 'Dies Jovis'। ফরাসীতে এর নাম 'জেউদি' [Jeudi]। স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলি এই বারকে বলে 'তোর্সদাগ' [Torsdag]। জার্মানীতে এর নাম হলো 'ডোন্নারস্ট্যাগ' [Donnerstag]। 'Donar' হলো জার্মানীর বজ্রের দেবতা, তাঁরই নামে বৃহস্পতিবারের এই জার্মানী নাম। ইংরেজীতে এই বারে নাম এসেছে 'থর' [Thor] দেবতার নাম থেকে। 'থর' হলেন 'নর্স'দের [Norse] বজ্রের দেবতা। নরওয়ের অধিবাসী ও তাদের ভাষাকে বলা হয় 'নর্স'। ইংরেজীতে 'Thursday' তাই 'Day of Thor', বৃহস্পতিবার তাই 'Thursday'। খ্রিস্টানরা Good Friday-এর আগের বৃহস্পতিবারকে বলে, 'Maundy Thursday' বা পবিত্র বৃহস্পতিবার [Holy Thursday]। কবর থেকে যীশুর উত্থান ও চল্লিশ দিন পরে স্বর্গারোহণ ঘটেছিল এক বৃহস্পতিবার। এই দিনটির নাম 'Ascension Day'। খ্রিস্টানদের কাছে এই বৃহস্পতিবারটি অত্যন্ত পবিত্র দিন। এখনও ইস্টার [Easter]-এর পরের চল্লিশতম দিনটিতে যে বৃহস্পতিবারটি পড়ে সেই বৃহস্পতিবার হলো 'পবিত্র বৃহস্পতিবার' বা 'Holy Thursday' এবং দিনটি সেই হিসাবেই প্রতিপালিত হয়।

আগেই বলেছি, প্রাচীনকালে প্রত্যেকটি গ্রহের এক একটি প্রতীক ছিল। অ্যালকেমিস্টরা প্রাচীনকালে এই চিহ্নগুলি বহুল ব্যবহার করতেন বিভিন্ন ধাতু বোঝাতে। বৃহস্পতির প্রতীক ছিল ♃ এবং সেই চিহ্ন টিন [Tin] ধাতুর প্রতীক। এইসব প্রতীক একালেও ব্যবহৃত হয় অন্য অর্থ নিয়ে। আধুনিক কালের উদ্ভিদবিজ্ঞানীরাও এইসব প্রতীক ব্যবহার করেন। যেমন ঃ পুরুষ বোঝাতে গিয়ে মঙ্গলের প্রতীক, ঢালের পিছনে বর্শার, স্ত্রী বোঝাতে গিয়ে শুক্রের প্রতীক, নারীত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক আয়নার, বার্ষিক উদ্ভিদের চিহ্ন হিসাবে সূর্যের প্রতীক ইত্যাদি তাঁরা আজও ব্যবহার করে চলেছেন। তাঁরা চিরজীবী ঘাসের প্রতীক করেছেন বৃহস্পতির চিহ্নকে এবং শনির প্রতীক ব্যবহার করছেন ঝোপঝাড় ও গাছপালা বোঝাতে। দ্বি-বার্ষিক উদ্ভিদ বোঝাতে তাঁরা সূর্যের প্রতীককে বদলে নিয়েছেন এইভাবে ঃ ◎ অর্থাৎ চক্রের মধ্যে সূর্যের প্রতীক।

বৃহস্পতি গ্রহের বলয় আছে। শনির মত বর্ণময় না হলেও এর বলয়ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় [চিত্র ঃ 118] এটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ভারী গ্যাসীয় গ্রহ। এর নিজস্ব তাপ উৎপন্ন হওয়ার উৎস আছে। এটি সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি তাপ বিকিরণ করে। বৃহস্পতি সম্পর্কে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হল ঃ

1] সূর্যের থেকে গড় দূরত্ব ঃ 7.78×10^8 কিমি

2] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ 0.048

3] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে কক্ষপথের নতি [Inclination] ঃ 1.3^0

4] একবার সূর্য প্রদক্ষিণের সময় ঃ 11.86 পার্থিব বছর

5] বিষুব ব্যাসার্ধ ঃ 71,492 কিমি

6] মেরু ব্যাসার্ধ ঃ 66,770 কিমি

7] ভর ঃ 18.99×10^{23} মেট্রিক টন

8] গড় ঘনত্ব ঃ 1.33 গ্রাম/ঘন সেমি.

9] অভিকর্ষজ ত্বরণ ঃ 2,288 সেমি./সেকেন্ড^2

10] মুক্তিবেগ ঃ 59.5 সেমি./ সেকেন্ড

11] অক্ষাবর্তনের সময় ঃ ক) বিষুব থেকে $\pm 10^0$ অঞ্চল ঃ 9 ঘন্টা 50 মিনিট 30 সেকেন্ড।

খ) উচ্চতর অক্ষাংশ ঃ 9 ঘণ্টা 55 মিনিট 40 সেকেন্ড।

গ) চৌম্বকক্ষেত্রের আবর্তন সময় ঃ 9 ঘণ্টা 55 মিনিট 29 সেকেন্ড।

12] যুতিকাল [Synodic Period] ঃ 398.88 পার্থিব দিন

13] অক্ষের সঙ্গে ক্রান্তিবৃত্তের কোণ ঃ $3^0 07'$

14] চৌম্বক ক্ষেত্র [বিষুবরেখায়] ঃ 4.3 গউস

15] বিখ্যাত লাল দাগের আয়তন ঃ 26,000 কিমি × 14,000 কিমি।

16] উপগ্রহের সংখ্যা ঃ 16টি।

বৃহস্পতি বিশাল গ্রহ হলেও সূর্যের তুলনায় কিছুই নয়। সূর্যের ব্যাস 175 সেমি [69 ইঞ্চি] হলে বৃহস্পতির হবে 18 সেমি [7 ইঞ্চি] এবং পৃথিবীর 1 সেমি [প্রায় আধ ইঞ্চি]। বৃহস্পতির কেন্দ্রে চাপ পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপের প্রায় 12.5 গুণ অর্থাৎ প্রায় 5কোটি 'বার' [Bar]। এক বার হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। পৃথিবীর কেন্দ্রে চাপ 40,00,000 বার (প্রায়)। বৃহস্পতির অভ্যন্তরের কেন্দ্রকীয় অঞ্চলের [Core] ব্যাস প্রায় 12,000 কিলোমিটার। এরপর বাইরের দিকের প্রায় 20,000 কিলোমিটার অবধি একধরনের তরল হাইড্রোজেন রয়েছে যা পৃথিবীর কোনও গবেষণাগারে কখনও তৈরি হয় নি। প্রবল চাপ এবং উচ্চ উষ্ণতার কারণে এই দৈত্যাকার গ্রহটি হাইড্রোজেন অণুদের চাপ দিয়ে চিড়ে চ্যাপ্টা করে। এই চাপ এতোই প্রবল যে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন 'ধাতব হাইড্রোজেন' [Metallic Hydrogen] হয়ে যায়। এই তরল অবস্থার হাইড্রোজেন তড়িৎপরিবাহী। ধাতব হাইড্রোজেন ও আণবিক হাইড্রোজেন স্তর দুটির সংযোগস্থলের উষ্ণতা প্রায় $11,000^0$ সেলসিয়াস। বৃহস্পতির দৃশ্যমান আবহমণ্ডলের একেবারে উপরের স্তরের উষ্ণতা প্রায় -150^0 সেলসিয়াস।

1664 সালে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক এবং গিওভান্নি ক্যাসিনি [Giovanni Cassini] প্রায় একই সময়ে দেখেছিলেন বৃহস্পতির সেই অতি বিখ্যাত লাল দাগ [Great Red Spot]। 1979 সালে এসে আমরা এখন এই লাল দাগের আয়তন বিশাল 26,000 কিমি। × 14,000 কিমি। এর দৈর্ঘ্য 40,000 কিমি পর্যন্ত বাড়তে থাকে। এর রঙ ধূসর গোলাপী এবং উজ্জ্বল লাল। আসলে এই লাল দাগ ঘূর্ণি বাতাস। ওখানে দুটি পৃথিবী অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারে। এই ঘূর্ণি ঘুরছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। এই লাল দাগ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্কের পর 1979 সালের মার্চ এবং জুলাইয়ে বৃহস্পতির কাছে পৌঁছানো দুটি 'ভয়েজার' [Voyager] মহাকাশযান লাল দাগ সম্বন্ধে বহু তথ্য যুগিয়েছে। ফলে, বহু বিতর্কের অবসান ঘটেছে। 1990 সালেও একটি ভয়েজার মহাকাশযান বৃহস্পতি পর্যবেক্ষণ করেছে। এরপর ওই লাল দাগ সম্পর্কে প্রায় সব তথ্যই জানা গেছে। এই লাল দাগের ঘূর্ণনকাল প্রায় পার্থিব 12 দিন। এই ঘূর্ণির মধ্যে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের নীচের দিকের বেশ কিছুটা চলে আসছে। ঘূর্ণি এদের শোষণ করছে। এই ঘূর্ণি কেবল বৃহস্পতির শরীরে নয়, এটি এর বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ মেঘস্তরের আরও আট কিলোমিটার উপর অবধি উঠে যায়। এই লাল দাগ বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ কেবল নিজের দেহে সামিল করে না, এটি বেশ কিছু পদার্থ উদ্গীরণও করে। এই উদ্গীরণ আমাদের পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই অনুরূপ।

বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের প্রাবল্য। বৃহস্পতি ও সূর্যের উপাদানের একটা পার্থক্য হল বৃহস্পতিতে কারবনের আধিক্য রয়েছে, রয়েছে ডিউটেরিয়াম [D], যা সূর্যে নেই। বৃহস্পতি গ্রহটিতে কোনও কঠিন পদার্থ নেই। এর আবহমণ্ডলের উপাদানগুলি হল ঃ

গ্যাসের নাম	মিশ্রণ অনুপাত	মৌল পদার্থের অনুপাত	বৃহস্পতি / সূর্য
হাইড্রোজেন [H_2]	1	×	×
হিলিয়াম [He]	0.13	He/H	0.7
জল [H_2O]	-3×10^{-3}	O/H	−2
মিথেন [CH_4]	2×10^{-3}	C/H	−2
অ্যামোনিয়া [NH_3]	2.5×10^{-4}	N/H	1.5
ফস্‌ফিন [PH_3]	7×10^{-7}	P/H	1
CH_3D	2×10^{-7}	D/H	2.5×10^{-5}
হাইড্রোজেনে সালফাইড [H_2S]	$< 3\times10^{-8}$	S/H	$<10^{-3}$
কারবন মনোক্সাইড [CO]	1×10^{-9}	×	×
হাইড্রোজেন সায়নাইড [HCN]	2×10^{-9}	×	×
জারমেনিয়াম হাইড্রেট [GeH_4]	7×10^{-10}	Ge/H	0.05
আর্সাইন [AsH_3]	2×10^{-10}	As/H	0.5

তালিকা ঃ 12

উপরের তালিকার মিশ্রণ অনুপাত হল, কোনও বিশেষ উপাদান একক আয়তনে যতটা আছে তার সঙ্গে সমান আয়তনে যতটা হাইড্রোজেন অছে তার অনুপাত। একক আয়তনে কোনও উপাদানের যতগুলি অণু আছে তাকে সমান আয়তনে যতগুলি হাইড্রোজেন অণু আছে তা দিয়ে ভাগ করলে যা দাঁড়ায় তাই হল মিশ্রণ অনুপাত। [তালিকা ঃ 12]

বৃহস্পতি উপগ্রহ সংখ্যা 16টি। আগেই বলেছি, এর অন্ততঃ চারটি উপগ্রহ আছে যাদের আয়তন বুধ কিংবা আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক বড়। গ্যানিমিড নামে উপগ্রহটির ব্যাসের পরিমাপ হল 5262 কিমি, যা চাঁদের ব্যাসের দেড়গুণেরও বেশি। চাঁদের ব্যাস 3,480 কিমি। বৃহস্পতির 16টি উপগ্রহ হল ঃ

রোমক ক্রমিক সংখ্যা	উপগ্রহের নাম	আবিষ্কারক	আবিষ্কারের বছর	বৃহস্পতি থেকে গড় দূরত্ব (কিমি)	কক্ষাবর্তন কাল (দিন)	ব্যাসার্ধ (কিমি)	ভর (কিলোগ্রাম)	গড় ঘনত্ব (গ্রাম/ঘনসেমি.)
I	আই ও [IO]	গ্যালিলিও এবং এস. ম্যারিয়াস	1610	4,22,000	1.769	1,815	8.920×10^{22}	3.55
II	ইউরোপা [Europa]	ওই	1610	6,71,000	3.551	1,569	4.870×10^{22}	3.04
III	গ্যানিমিড [Ganymede]	ওই	1610	10,70,000	7.155	2,631	1.480×10^{23}	1.93

রোমক ক্রমিক সংখ্যা	উপগ্রহের নাম	আবিষ্কারক	আবিষ্কারের বছর	বৃহস্পতি থেকে গড় দূরত্ব (কিমি)	কক্ষাবর্তন কাল (দিন)	ব্যাসার্ধ (কিমি)	ভর (কিলোগ্রাম)	গড় ঘনত্ব (গ্রাম/ ঘনসেমি.)
IV	ক্যালিস্টো [Callisto]	ওই	1610	18,83,000	16.689	2,400	1.075×10^{23}	1.83
V	অ্যামালথিয়া [Amalthea]	ই.ই. বার্নার্ড	1892	1,81,000	0.498	840	?	?
VI	হিমালিয়া [Himalia]	সি ডি পেরাঁ্যা [C.D. Perrine]	1904	1,14,80,000	250.57	93	?	?
VII	ইলারা [Elara]	ওই	1905	1,17,37,000	259.65	38	?	?
VIII	প্যাসিফি [Pasiphae]	পি. মেলোট [P. Mellote]	1908	2,35,00,000	735	25	?	?
IX	সাইনোপ [Sinope]	এস-বি-নিকলসন [S-B-Nicholson]	1914	2,37,00,000	758	18	?	?
X	লাইসিথিয়া [Lysithea]	ওই	1938	1,17,20,000	259.22	18	?	?
XI	কারমে [Carme]	ওই	1938	2,26,00,000	692	20	?	?
XII	অ্যানাঙ্কে [Ananke]	ওই	1951	2,12,00,000	631	15	?	?
XIII	লেডা [Leda]	সি কাওয়াল [C. Kowal]	1974	1,10,94,000	238.72	08	?	?
XIV	থিবি* [Thebe]	এস. সাইনট [S. Synnotte]	1979	2,22,000	0.675	2475	?	?
XV	আড্রাস্টি [Adrastea]	ডি. জেউইট ই. ড্যানিয়েলসন	1979	1,29,000	0.298	937.5	?	?
XVI	মেটিস [Metis]	এস সাইনট [S. Synnotte]	1979	1,28,000	0.295	20	?	?

তালিকা ঃ 13

বৃহস্পতির উগগ্রহগুলির মধ্যে বারোটিরই ভর এবং ঘনত্ব অজানা। আমাদের পাঠানো ভয়েজার মহাকাশযানগুলি সমস্ত উপগ্রহদের সব গুণাবলী এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে নি।

বৃহস্পতির বলয় আছে। শনির মত বর্ণময় না হলেও বৃহস্পতির অনুরূপ বলয় রয়েছে। পাইওনিয়ার –11 বৃহস্পতির আকশে গিয়ে এই বলয়ের অবস্থান নির্ণয়ও করেছে। মোটামুটি বৃহস্পতির ব্যাসার্ধের $[R_J]$ 1.7 থেকে 1.8 গুণ দূরত্বে বৃহস্পতির এই বলয়ের অবস্থান। কিছুটা আগে ভয়েজার এই বলয়ের কথা জানিয়েছিল। পাইওনিয়ার এটাকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে ও অবস্থান সঠিকভাবে নির্দেশ করে [চিত্র ঃ 11ঙ]। বৃহস্পতির ভিতরের দিকের আটটি উপগ্রহ তৈরি হয়েছে এই গ্রহটি যেভাবে উৎপন্ন হয়েছে অনেকটা সেই নিয়মেই—ধূলি-মেঘের তত্ত্ব অনুসরণে। কিন্তু এর বাইরের দিকের আটটি উপগ্রহ সম্ভবত বৃহস্পতির আওতায় এসেছে গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে কিংবা অন্য কোনওভাবে। বৃহস্পতির ওই বলয়ও তৈরি হয়েছে খুব সূক্ষ্ম ধূলিকণার সাহায্যে। এইসব ধূলিকণাও এসেছে বৃহস্পতির মহাকর্ষের টানে।

গ্যানিমিড উপগ্রহটি সৌরমণ্ডলের তৃতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। শনির উপগ্রহ টাইটান [Titan] এবং নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন-এর পরেই গ্যানিমিডের স্থান। বৃহস্পতির আড্রাস্টি নামক উপগ্রহটি আমদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দ্রুতগামী উপগ্রহ। এর গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 1,13,000 কিলোমিটারেরও বেশি। এমন গতিবেগ সৌরমণ্ডলের উপগ্রহগুলির মধ্যে বিরল। আবার আইও উপগ্রহটি সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বিস্ফোরক উপগ্রহ। এই উপগ্রহটির আগ্নেয়গিরিগুলি প্রতি 3000 বছরে এতোটাই লাভা উদ্গীরণ করে যে, ওই লাভা আইওর পৃষ্ঠদেশে এক সেন্টিমিটার পুরু স্তর তৈরি করে। আইওর ব্যাসার্ধ 1,815 কিলোমিটার। বৃহস্পতির কোনও ঋতুবৈচিত্র্য নেই। কারণ, এর অক্ষ এর ক্রান্তিপথের সঙ্গে মাত্র 2^0 কোণে অবস্থান করছে। ক্যালিস্টো উপগ্রহটি বৃহস্পতির থেকে প্রায় 18.83 লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। এই উপগ্রহে জল তথা বরফ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। ভয়েজার-2 এই উপগ্রহের যে ছবি তুলেছে তা চিত্র নম্বর ঃ 93-এ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় 370 বছর ধরে। 1610 সালে গ্যালিলিওর হাত ধরে এই আবিষ্কারের শুরু। ভয়েজারের ছবি ও তথ্য দিয়ে তার শেষ।

বৃহস্পতি সম্পর্কে এখনও অনেক তথ্য অজানা। পাইওনিয়ার মহাকাশযানগুলি নতুন নতুন তথ্য প্রেরণ করছে। বৃহস্পতি সম্পর্কে আরও নতুন নতুন খবর জানা যাচ্ছে। বৃহস্পতির 'লাল দাগ' এখনও একটা বড়সড় বিস্ময় হয়ে আছে।

• শনি [Saturn] •

শনিগ্রহ সৌরমণ্ডলের ষষ্ঠগ্রহ। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব 142.61 কোটি কিলোমিটার। সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্বকে একক ধরলে শনির দূরত্ব হলো 9.539 একক। শনিগ্রহ 29.46 পার্থিব বৎসরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে। এক বৎসরে গ্রহটি রাশিচক্রের প্রায় বারো অংশ [Degree] পূর্বদিকে চলে, আবার কখনো বক্রীগতিও হতে দেখা যায় এবং এই গ্রহ প্রায় আড়াই বৎসরে দ্বাদশ রাশির একটি রাশি বা খ-গোলকের 30° বা 30 অংশ অতিক্রম করে। শনির আকার বৃহস্পতির ঠিক নীচে। শনির ব্যাস পৃথিবীর প্রায় 9 গুণের বেশি। পৃথিবীর মধ্যব্যাস 12,757 কিলোমিটার। শনির হলো 1,20,000 কিমি.। আয়তনে শনি প্রায় 745 গুণ। শনির ঘনত্ব হলো 0.71গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। পৃথিবীর ঘনত্বের 0.13 ভাগ মাত্র। অর্থাৎ শনিগ্রহকে জলে ফেলে দিলে তা ভাসবে। তবে তেমন সমুদ্র কোথায় যে সমুদ্রের জলরাশি পৃথিবীর আয়তনের 745 গুণ আয়তন বিশিষ্ট শনিকে ভাসিয়ে রাখবে? গ্রহদের মধ্যে শনিই লঘুতম পদার্থে তৈরি। শনির বহু উপগ্রহ। তবে পাইওনিয়ার-11-এর পাঠানো ছবি অনুযায়ী শনির উপগ্রহ-সংখ্যা এখন অন্ততঃ আঠেরোটি। শনি গ্রহের বৈশিষ্ট্য তার তিনটি বলয় এবং তাদের সীমাহীন সৌন্দর্য, যা অন্য কোনও গ্রহের নেই [চিত্র ঃ 94]। দূরবীক্ষণে শনির ঈষৎ হেমকান্তি এবং এই গ্রহের বিষয়ুরেখা বেষ্টন করা তিনটি আলোক বলয় অপূর্ব শোভা-মণ্ডিত। তিনটি বলয়ই একই সমতলে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বহির্বলয়টি প্রস্থে প্রায় দশহাজার মাইল, মধ্য বলয়টি ষোল হাজার মাইল এবং অন্তর্বলয়ের প্রস্থ প্রায় সাড়ে এগারো হাজার মাইল। সবচেয়ে কাছের বলয়টি শনির দেহ থেকে প্রায় সাত হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্য বলয়টি শনিগ্রহের সমান উজ্জ্বল, কিন্তু অন্য দুটি বলয় শনির চেয়ে কম উজ্জ্বল [চিত্র ঃ 95]।

শনি নিজের অক্ষে 10 ঘণ্টা 14 মিনিটে একবার আবর্তিত হয়। শনির উষ্ণতা -115^0 সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস। শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডল এত বিশাল যে, এর অর্ধেক ভর এর বায়ুমণ্ডলের সৃষ্ট। বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে যেমন অ্যামোনিয়া আধিক্য, শনির বায়ুমণ্ডলে তেমনি মার্শ গ্যাসের আধিক্যই দেখা

যায়। 'অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা' নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 'অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা' হলো সেই সময় যে সময়ে কোনও গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে। যেমন মঙ্গলের অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা হলো 15টি পার্থিব বৎসর। প্রতি পনেরো বছর অন্তর মঙ্গল পৃথিবী সবচেয়ে কাছে আসে, আর সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এই অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতার সময় হলো 83 টি পার্থিব বৎসর । অর্থাৎ 83 বছর পরে পরে বৃহস্পতি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে এবং উজ্জ্বল হয় সবচেয়ে বেশি। বৃহস্পতির শেষবার অনুকূল প্রতিপক্ষতা ঘটেছে 1927 খ্রিস্টাব্দে এবং 2010 সালে আবার সবচেয়ে কাছে আসবে আমাদের পৃথিবীর। তখন বৃহস্পতি দূরত্ব হবে 56.7×10^7 কিলোমিটার। এটাই হলো বৃহস্পতি থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কম দূরত্ব। তেমনি শনির অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতাও বের করা যায়, যে সময় পরপর শনি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখা যাবে শনিকে। হিসাবটা এই রকম।

$$29.46 = 29\frac{46}{100} = 29\frac{23}{50}$$

$$= 29 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{3}}}}}$$

স্থূলভাবে $\frac{1}{3}$ কে বাদ দিয়ে আমরা পাই $\frac{383}{13}$ অর্থাৎ শনির তেরো বছর হলো পার্থিব 383 বছর এবং এই পার্থিব 383 বছর পরপর একবার করে শনির অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা দেখা যায়, যখন শনি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় তাকে এই পৃথিবীর আকাশে। সেই অবস্থায় পৃথিবী থেকে শনির দূরত্ব দাঁড়ায় মোটামুটিভাবে 75 কোটি মাইল।

1921 খ্রিস্টাব্দে একদিন হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে গেল। দেখা গেল শনির বলয়গুলো নেই! গুজব রটলো বলয়ের টুকরোগুলো সূর্যের দিকে ছুটছে এবং তা পৃথিবীকে ধাক্কা দিতে পারে যে কোনও দিন। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের কাছে শনির অবস্থান এই সময় এমন হয়েছিল যে, তার বলয়গুলো আর দেখা যাচ্ছিল না। মনে রাখতে হবে, বলয়গুলো খুবই পাতলা, মাত্র ত্রিশ কিলোমিটারের মত পুরু। প্রস্থ বা চওড়ার তুলনায় তাদের বেধ একটা কাগজের মত। শনির অবস্থান বিশেষে তাদের কোন কোনও সময় না দেখা যেতেও পারে। যখন তারা সূর্যের দিকে আড়ভাবে থাকে তখন তাদের দু-পিঠে আর আলো পড়ে না, আর তাই তারা তখন অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার তাদের কানাতটা যখন পৃথিবীর দর্শকের দিকে মুখ করে থাকে তখনো তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ্যালিলিও শনির বলয়ের এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলেন। বলয়গুলোর দুর্বোধ্য অবলুপ্তিতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। সে আমলে প্রথম আবিষ্কারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার রীতি ছিল এনাগ্রামের মাধ্যমে। 'এনাগ্রাম' হলো বর্ণমালার অদলবদল। কোনও বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের আবিষ্কারটি

এনাগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণা করে রাখতেন এবং সেই এনাগ্রাম থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারতেন না সেই বক্তব্যের অর্থ। তার ফলে কোনও বৈজ্ঞানিক কোন আবিষ্কারকে যাচিয়ে দেখতে পারতেন বেশ কিছুকাল ধরে। অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন থাকতো না। গ্যালিলিও তাঁর ত্রুটিপূর্ণ দূরবীনে শনির পাশের ওই বলয় দেখে তাড়াতাড়ি তাঁর আবিষ্কার ঘোষণার উদ্দেশ্যে যে বর্ণমালার এনাগ্রামটি প্রকাশ করেন তা হলো

'Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras'

এই সংকেতের মানে বোঝা কঠিন। 39 টি অক্ষর সমন্বিত এই এনাগ্রামের অর্থ সমবায় [Combinations] ও বিন্যাস [Permutations] নিয়মে সম্ভাব্য পরিবর্তনের সংখ্যার থেকে বের করা যায়। কিন্তু তাতে অন্তহীন খাটুনি। কারণ পরিবর্তনের মোটসংখ্যা হবে

$$\frac{\lfloor 39}{\lfloor 3 \lfloor 5 \lfloor 4 \lfloor 4 \lfloor 2 \lfloor 2 \lfloor 5 \lfloor 3 \lfloor 3 \lfloor 2 \lfloor 2}$$

এতে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা 35টি অঙ্ক বিশিষ্ট। ইতালীয় বিজ্ঞানী কেপলার অনেক ধৈর্যসহকারে গ্যালিলিও-র এনাগ্রামের পাঠোদ্ধার করেন। তবে সেই পাঠোদ্ধার ছিল ভুল। দুটি অক্ষর বাদ দিয়ে কেপলার ওই এনাগ্রামের যে অর্থ করেন তা হলো

Salve,umbistineum, geminatum Martia proles.

অর্থাৎ 'তোমাদের নমস্কার, মঙ্গলের যমজ সন্তান'।

কেপলার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল গ্যালিলিও মঙ্গলের উপগ্রহ দুটি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছিল আরও প্রায় 250 বছর পরে। কেপলার নিজে বিশ্বাস করতেন মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আছে, তাই গ্যালিলিওর এনাগ্রামের ব্যাখ্যা তিনি ওইভাবেই করেছিলেন। পরে গ্যালিলিও তাঁর এনাগ্রামের যে ব্যাখ্যা দেন তা হলো

'Altissimum planetam tergeminum observavi'

অর্থাৎ একটি অত্যন্ত উঁচু আর ত্রিগুণ [Triple] গ্রহ পর্যবেক্ষণ করেছি।

দূরবীনের শক্তি কম থাকায় গ্যালিলিও শনির এই 'ত্রিগুণ' রূপের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারেননি। কয়েক বছর পর শনির বলয়গুলো অদৃশ্য হয়ে গেলে তাঁর ধারণা হয় তিনি ভুল দেখেছিলেন এবং ধরে নেন শনির কোনও লেজুড় নেই। এর প্রায় 50 বছর পরে 'হুইগেন্‌স্' সৌভাগ্যক্রমে শনির বলয় আবিষ্কার করে তাঁর আবিষ্কারকে এনাগ্রামে প্রকাশ করেন এইভাবে

'Aaaaaaacccccdeeeeeghiiiiiiillllmmnnnnnnnnnoooopppqrrstttttuuuuu'

তিন বছর পর তিনি এই এনাগ্রামের অর্থ প্রকাশ করে বলেন ঃ

"Annulo cingitur. tenui, plano, nusquam cohaerente,
ad eclipticam inclinto."

অর্থাৎ বৃত্তের দ্বারা ঘেরা, পাতলা, চ্যাপ্টা, কোথাও মেলে না আর ক্রান্তিবৃত্তের দিকে ঝোঁকা। এইভাবে শনির আবিষ্কারের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়।

শনিতে গেলে দেখা যাবে তার বলয়গুলো মেরু থেকে 34^0 অক্ষাংশ অবধি মোটেই দেখা যাচ্ছে না। 34^0 থেকে 50^0 অক্ষাংশ অবধি শনি থেকে বলয়গুলি ভালভাবে দেখা যায়। বিশেষ করে 50^0 অক্ষাংশে শনিতে অবস্থিত দর্শক বলয়গুলির পুরো পরিধি চমৎকারভাবে দেখবে। এখানে তাদের সবচেয়ে বড় কোণে অর্থাৎ 12^0কোণে দেখা যায়। বিষুবরেখা বরাবর তারা সংকীর্ণ হয়ে আসে, যদিও

বলয়গুলিকে বেশ উর্ধ্বে দেখা যায়। শনির বিষুবরেখায় তারা সংকীর্ণ রেখার মত দৃষ্ট হয়। শনির বিষুব অঞ্চল এই বলয়গুলির ছায়ায় বেশ কয়েকটি পার্থিব বৎসর ঢাকা পড়ে থাকে। শনির নিকটতম উপগ্রহ থেকে শনির দৃশ্য জ্যোতিষ্ক রাজ্যের সব দৃশ্যকেই ম্লান করে দেয়। ভুবন-ভোলানো এই রূপের অন্য কোনও তুলনা নেই। সেই উপগ্রহের আকাশে দেখা যাবে এক বিরাট বাঁকা ফালি, বলয়ের এক সরু ফিতে তাকে কেটে চলে গেছে, আর তাদের দেখা যাচ্ছে প্রান্ত-চক্রের দিক থেকে এবং তাদের ঘিরে আছে শনির একদল উপগ্রহ। তাদের আকারও ফালির মত, তবে তারা আকারে অনেক ছোট। আমাদের শনি বা শনৈশ্চর নামের গ্রহ সম্পর্কে এই হলো মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই শনির বা শনৈশ্চরেব বাসর বা বার হলো শনিবার তথা 'Day of the Saturn' বা 'Saturday', যেদিন ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য শেষ করে বিশ্রাম নেন বলে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অধিকাংশের বিশ্বাস। সৌরমণ্ডলের ষষ্ঠগ্রহ শনির নামাঙ্কিত বাসর বা বার হলো শনিবার। শনিকে প্রাচীনেরা শেষ গ্রহ বলে জানতেন। তাই শনির বার বা দিন নির্দিষ্ট হলো সপ্তাহের শেষ দিন। ভারতীয়দের কাছে শক্তিপূজার বিশেষ দিন হিসাবে এটি চিহ্নিত এবং এইদিন দেবী মন্দিরে, বিশেষ করে কালীমন্দিরে উপাসনা ও পূজা-অর্চনার ভিড় হয়। দিনটি দেবী পূজার পক্ষে প্রশস্ত দিন বলে গণ্য করা হয়। যদিও ফলিত জ্যোতিষ মতে শনিবারের ষষ্ঠ এবং প্রথম ও অষ্টম যামার্ধ যথাক্রমে বারবেলা ও কালবেলা, তবু পুরো শনিবারটাকেই মোটামুটিভাবে কার্য-আরম্ভ বা যাত্রা শুরুর পক্ষে অপয়া দিন হিসাবেই ধরা হয়ে থাকে। ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে কোনও বিশেষ দিনের কোনও বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও, পৌরাণিক ঋষিদের কাছে সপ্তাহের সাত দিন এবং তাদের অধিপতি সপ্তগ্রহ নানাভাবে তাৎপর্যময় ছিল। শনিগ্রহকে নিয়ে নানা পৌরাণিক গল্প আছে। শনি হলো সূর্য-ছায়ার সন্তান এবং যম-যমী ও অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনীকুমারদের ভাই। শনিগ্রহ শান্তির জন্য শনিবার শনিপূজার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় এই বিজ্ঞানের যুগেও। অধিকাংশ ভাবতীয়ই মনে করে শনি দুষ্টগ্রহ এবং তারই প্রভাবে মানুষের জীবনে যত অঘটন, দুর্বিপাক ইত্যাদি ঘটে। শনির শান্তির জন্য তাই ব্রত-উপবাস, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি বহুল প্রচলিত। ফলিত জ্যেতিষ কিন্তু শনিকে অতটা খারাপ বলে মনে করে না। সব দোষ তার ঘাড়ে চাপাতে চায় না। তাই শনি যে সব সময় অশুভ ফল দেয় বা অনর্থ ঘটায় তা নয়, শনি ভালো কিছুও করতে পারে। যেমন, বৃষলগ্নের জাতকের কাছে শনি রাজযোগকারী গ্রহ। শনির অবস্থান অনুযায়ী মানুষের জীবনে তা নানাভাবে ফল দেয়। স্বাভাবিক দুষ্ট গ্রহ বলে একে চিহ্নিত করা হলেও অনেক সময় আশ্চর্যরকম ভালো ফলও শনি দেয়। সুতরাং ফলিত জ্যোতিষ শনিকে স্বাভাবিক দুষ্ট গ্রহ বললেও মানুষের জীবনে এর প্রভাব ভালোমন্দ দু'রকমই, অন্যান্য গ্রহগুলির অনুরূপ।

সপ্তাহের সপ্তম দিন হলো শনিার। শনিবারটা স্যাবাথ' এর দিন বা 'Day of Sabbath'। বাইবেলের ওলড্ টেস্টামেণ্ট সেই ফবমানই দিয়েছিল। এখনও ইহুদীরা এবং কিছু খ্রিস্টান ধর্মালম্বীও শনিবারকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মবিরতির দিন হিসাবে পালন করে। 'স্যাবাথ' হলো কর্মবিরতির জন্য নির্দিষ্ট বার যা শাস্ত্রনির্দিষ্ট। ঈশ্বর ওই দিনটায় সৃষ্টিকর্ম শেষে বিশ্রাম নেন। ইহুদীদের মতে শনিবার হলো ঈশ্বরের বিশ্রামের দিন। খ্রিস্টানদের কাছে পরবর্তীকালে ওই কর্মবিরতির দিন রবিবার হলেও ইহুদীদের কাছে আজও শনিবারই 'স্যাবাথ'[Sabbath] বা শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম-বিরতির দিন। লাতিনে দিনটার নাম 'Saturnus', যার থেকে ইংরেজী নাম হলো 'Day of Saturn' বা 'Saturday'। 'Sturn' হলো শনিগ্রহ। শনিগ্রহের নামে উৎসর্গীকৃত দিনটি তাই শনিবার বা 'Saturday'।

শনির চিহ্ন হল *h* এবং এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ আকারে এবং ওজনেও। এর আয়তন প্রায় বৃহস্পতির সমান, কিন্তু এর ভর বৃহস্পতির ভরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। সৌর মণ্ডলের সব গ্রহের মধ্যে এটিরই গড় ঘনত্ব সবচেয়ে কম। এর বিষুবতল বরাবর যে অপূর্ব বলয় রয়েছে তা বৃহস্পতি, ইউরেনাস এবং নেপচুনের বলয়ের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং সুন্দর। শনি সূর্য পরিক্রমা সারে প্রায় 142·7 কোটি কিলোমিটার দূর দিয়ে। পৃথিবী থেকে শনির দূরত্ব কখনই 120 কোটি বা 1.2×10^9 কিলোমিটারের কম হয় না। ভয়েজারদের কল্যাণে আমরা এখন শনির সম্পর্কে বহু তথ্য জেনে গেছি, কিন্তু আজও বহু তথ্য অজানা। চেষ্টা চলছে। শনির পৃষ্ঠতলে কোনও শক্ত পদার্থ নেই, আছে গ্যাসীয় এবং তরল পদার্থ। এর বিষুব ব্যাস 1,20,536 কিলোমিটার এবং মেরু ব্যাস 1,08,728 কিলোমিটার। মেরু ব্যাস বিষুব ব্যাসের চেয়ে প্রায় 12,000 কি.মি. কম। শনির মেরু প্রদেশ সামান্য কিছুটা চ্যাপ্টা হলেও এই গ্রহটি প্রায় বর্তুলাকার।

শনি গ্রহটির কিছু ভৌত তথ্য নীচে দেওয়া হল ঃ

1] সূর্য থেকে দূরত্ব	ক) গড় দূরত্ব ঃ 142.7×10^7 কিলোমিটার
	খ) সর্বাধিক দূরত্ব ঃ 150.7×10^7 কি.মি.
	গ) সবচেয়ে কম দূরত্ব ঃ 134.7×10^7 কি.মি.
2] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ	0.056
3] পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে শনির কক্ষপথের নতি ঃ	2.5^0
4] শনি একবার সূর্য পরিক্রমার সময় ঃ	29.46 পার্থিব বছর
5] অক্ষাবর্তন কাল ঃ	10 ঘন্টা 39.4 মিনিট
6] যুতিকাল ঃ	378.09 পার্থিব দিন
7] বিষুব ব্যাস ঃ	1,20,536 কি.মি.
8] মেরু ব্যাস ঃ	1,08,728 কি.মি.
9] ভর ঃ	5.685×10^{23} মেট্রিক টন
10] আয়তন ঃ	766× পৃথিবীর আয়তন
11] গড় ঘনত্ব ঃ	0.69 গ্রাম/ ঘন সেমি
12] বিষুব অভিকর্ষ ঃ	8.96 মিটার/ সেকেন্ড^2
13] মেরু অভিকর্ষ ঃ	12.14 মিটার/ সেকেন্ড^2
14] মুক্তিবেগ ঃ	36 কিমি/ সেকেন্ড
15] উপগ্রহের সংখ্যা ঃ	18টি উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে। আরও আছে।

শনির আবহের মূল উপাদান হাইড্রোজেন (71%) এবং হিলিয়াম (28%)। বাকী 1% -এ আছে মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3)। হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) এবং জল (H_2O) ও কিছু হাইড্রোকারবন, যেমন, অ্যাসিটিলিন (C_2H_2), ইথেন (C_2H_4) এবং সম্ভবত প্রোপেন (C_3H_8) ও মিথাইল অ্যাসিটিলিন (C_3H_4)। শেষের যৌগগুলি শনিতে তৈরি হয়েছে সালোকরাসায়নিক ক্রিয়ায় [Photochemical Effects] সূর্যের বিকিরণের সাহায্যে কিংবা শক্তিকণার আঘাতে।

শনি আয়তনে যেমন পৃথিবীর আয়তনের 766 গুণ, তেমনি এটি পৃথিবীর 95গুণ বেশি ভারী। এর বিষুব অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 1600 কিলোমিটার। বিশাল এই ঝড়। 1857 সালে পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল [James Clerk Maxwell] দেখিয়েছিলেন শনির বলয়গুলি অসংখ্য ছোট ছোট কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি মূলতঃ বরফের টুকরো। শনির কাছাকাছি বলয় দ্রুততর গতিতে শনিকে পরিক্রমা করে। B-বলয়ের ভেতরের দিকটা শনিকে পরিক্রমা করছে 18.9 কিলোমিটার/সেকেন্ড বেগে। বাইরের দিকের কণাগুলি অর্থাৎ A-বলয়ের প্রান্তদেশের কণাগুলি শনি পরিক্রমা করছে 15.8 কিমি/ সেকেন্ড গতিবেগে। এগুলি শনি পরিক্রমা করতে সময় নেয় মাত্র 14.2 ঘণ্টা। C-বলয়ের ভিতরের কণাগুলি শনি পরিক্রমা করতে সময় নেয় 5.6 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা 36 মিনিট মাত্র।

● শনির উপগ্রহগুলি ●

উপগ্রহের নাম	d	p [পার্থিব দিন]	e	ব্যাসার্ধ [কিমি]	ভর [10^{20}কেজি]	ঘনত্ব [গ্রাম/ঘনসেমি.]
S 18 1981S13	2.227	0.583	–	10	–	–
S 17 অ্যাটলাস [Atlas]	2.276	0.602	0.002	20×? ×10	–	–
S 16 1980S27*	2.310	0.613	0.004	70× 50 × 37	–	–
S 15 1980S26	2.349	0.629	0.004	55× 45 × 33	–	–
S 10 জানুস [Janus]	2.51	0.69	–	110×95 × 80	–	–
S 11 এপিমেথেউস [Epimetheus]	2.51	0.69	–	70× 58 × 50	–	–
S1 মিমাস [Mimas]	3.08	0.94	0.020	197±3	0.46± 0.05	1.4 ±0.2
S2 এনসেলাডাস [Enceladus]	3.95	1.37	0.004	251±5	0.8±0.3	1,2±0.5

উপগ্রহের নাম	d	p [পার্থিব দিন]	e	ব্যাসার্ধ [কিমি]	ভর [10^{20}কেজি]	ঘনত্ব [গ্রাম/ঘনসেমি.]
S3 টেথিস[Tethys]	4.88	1.89	0	530±10	7.6±0.9	1,20±0.1
S13 টেলেস্টো [Telesto]	4.88	1.89	–	15×10×8	–	–
S 14 ক্যালিপসো [Calypso]	4.88	1.89	–	12×11×11	–	–
S4 ডিওন [Dione]	6.26	2.74	0.002	560±5	10.5±0.3	1.4±0.1
S12 1980S6	6.25	2.74	0.005	17×16×15	–	–
S5 রিয়া [Rhea]	8.73	4.52	0.001	765±5	24.9±1.5	1.3±0.1
S6 টাইটান [Titan]	20.3	15.95	0.029	2,575± 0.5	1345.7±0.5	1.88
S7 হাইপেরিওন [Hyperion]	24.6	21.28	0.104	205× 130×110	–	–
S8 আইয়াপেটাস [Iapetus]	59	79.3	0.028	730±10	18.8±1.2	1.2±0.1
S9 ফোবি [Phoebe]	215	550	0.163	110±10	–	–

তালিকা ঃ 14

উপরের তালিকায়,

$$d = \frac{\text{উপগ্রহের কক্ষপথের বৃহত্তর অক্ষ}}{\text{শনির বিষুব ব্যাসার্ধ}}$$

P = পার্থিব দিনে শনি-পরিক্রমণ কাল [Sidereal Orbital Period]

e = উপগ্রহের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা।

টাইটান উপগ্রহটি বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিডের চেয়ে আকারে সামান্য ছোট। এটি বুধের চেয়ে আকারে বড়। পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হুইগেন্স [Christian Huygens] এটিকে আবিষ্কার করেন 1655 খ্রিস্টাব্দের 25 শে মার্চ। শনির থেকে টাইটানের গড় দূরত্ব 12,21,800 কিলোমিটার [7,60,000 মাইল]। শনি পরিক্রমায় এর সময় লাগে 15.95 বা 16টি পার্থিব দিন। এর ব্যাস 5000 কিলোমিটারেরও বেশি। ভয়েজায়-1এর প্রায় 6500 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এসে ছবি তুলেছে। টাইটানের আবহমণ্ডল পৃথিবীর আবহমণ্ডলের অনেকটাই অনুরূপ। এর আবহমণ্ডল এর পৃষ্ঠদেশে যে চাপ দেয় তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় দেড়গুণ [1.5 গুণ]। আঠারোটি উপগ্রহের শনির থেকে দূরত্ব এবং তাদের আবিষ্কারকালের একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল পূর্ববর্তী তালিকার সংযোজন হিসাবে।

● শনির উপগ্রহসমূহের আরও বিবরণ ●

উপগ্রহের নাম	শনির থেকে দূরত্ব		মোটামুটি শনিকে একবার প্রদক্ষিণ কাল [পার্থিব দিনে]	আবিষ্কারের সাল
	100 কি:মিতে	100 মাইলে		
অ্যাটলাস [Atlas]	138	86	0.6	1980
প্রমিথিউস [Prometheus]	139	87	0.6	1980
প্যান্ডোরা [Pandora]	142	89	0.6	1980
জানুস [Janus]	151	94	0.7	1980
ইপিমেথেউস [Epimetheus]	151	94	0.7	1980
মিমাস [Mimas]	185	115	0.9	1789
এনসেলাডাস [Enceladus]	238	148	1.4	1789
টেথিস [Tethys]	295	183	1.9	1684
টেলেস্টো [Telesto]	295	183	1.9	1980
ক্যালিপসো [Calypso]	295	183	1.9	1980
প্যান [Pan]	295	183	1.9	1990

উপগ্রহের নাম	শনির থেকে দূরত্ব		মোটামুটি শনিকে একবার প্রদক্ষিণ কাল [পার্থিব দিনে]	আবিষ্কারের সাল
	100 কিমিতে	100 মাইলে		
ডিওন [Dione]	377	234	2.7	1684
হেলেন [Helene]	377	234	2.7	1980
রিয়া [Rhea]	527	327	4.5	1672
টাইটান [Titan]	1,222	760	16	1655
হাইপেরিয়ন [Hyperion]	1,481	920	21	1846
আইয়াপেটাস [Iapetus]	3,561	2,213	79	1671
ফোবি [Phoebe]	12,954	8,049	550	1898

তালিকা ঃ 15

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে মনোহর বস্তু হল শনির বলয়। এর ব্যাস 2.70,000 কিলোমিটার। এর বেধ 100 কিলোমিটারের মধ্যেই আছে। এই বলয়ের মোট ভর 3×10^{16} মেট্রিক টন। বলয়ে যেন একটি লংপ্লেয়িং রেকর্ড যার বেধ 1.5 মিলিমিটার, কিন্তু তার ব্যাস হবে 4 কিলোমিটার। ভয়েজার 2-এর সাহায্যে প্যান [Pan] নামের উপগ্রহটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র 1990 খ্রিস্টাব্দে, যার ব্যাস 20 কিমি মাত্র এবং এটি পুরোপুরি বরফ দিয়ে তৈরি।

● ইউরেনাস [Uranus] ●

সৌরমণ্ডলের সপ্তম গ্রহ হল ইউরেনাস। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর নাম প্রজাপতি বা ইন্দ্র। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব 287 কোটি [287×10^7] কিলোমিটার। আর পৃথিবী থেকে এর সবচেয়ে কাছের দূরত্ব হল 272 কোটি [272×10^7] কিলোমিটার। এর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা -140^0 সেলসিয়াস। এর বিষুব ব্যাস 52,000 কিলোমিটার। এর আবহমণ্ডলের মুখ্য উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। এই গ্রহটির উপগ্রহ সংখ্যা 15টি। এর অক্ষাবর্তন সময় পার্থিব 17 ঘন্টা 15 মিনিট। একবার সূর্য পরিক্রমা সেরে নিতে বা এর এক সৌরবর্ষ হল 84 পার্থিব বৎসর। উইলিয়াম হার্শেল [William Harschel] 1781 খ্রিস্টাব্দের 13ই মার্চ হঠাৎই এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন তাঁর নিজের তৈরি দূরবীন দিয়ে। এই গ্রহটি থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় 2 ঘণ্টা 45 মিনিট। আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে 3,00,000 কিলোমিটার। 1979 সালে ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কৃত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই গ্রহটির কমপক্ষে দশটি বলয় রয়েছে [চিত্র ঃ 96A]।

ইউরেনাসের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, এর অক্ষ এর ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে প্রায় একইতলে অবস্থিত থাকায় এটি গড়িয়ে গড়িয়ে সূর্য পরিক্রমা সারে। এর উত্তর কিংবা দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। যখন উত্তর মেরু সূর্যের আলো পায় তখন এর দক্ষিণ মেরু অঞ্চল থাকে পুরোপুরি অন্ধকারে। ফলে, 42 বছর ধরে এক একটা গোলার্ধে শীতকাল থাকে এবং তার বিপরীত গোলার্ধে থাকে গ্রীষ্মকাল। সৌরমন্ডলের কোনও গ্রহে ইউরেনাসের মত এতো দীর্ঘস্থায়ী ঋতুকাল থাকে না। এই গ্রহটির কিছু ভৌত তথ্য, তার 15টি উপগ্রহের মধ্যে দশটির স্বল্প বিবরণ এবং তার দশটি বলয়ের কিছু তথ্য নীচের তালিকাগুলিতে দেওয়া হল [চিত্র ঃ 96]।

সূর্যের থেকে ইউরেনাসের গড় দূরত্ব 287 কোটি কিলোমিটার [178.3 কোটি মাইল]। পৃথিবীর থেকে দূরত্ব 272 কোটি কিলোমিটার [169 কোটি মাইল]। এর গড় উষ্ণতা -140^0 সেলসিয়াস। এর বিষুব ব্যাস 52,000 কিমি [32,000 মাইল]। এর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে মূলতঃ হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। ইউরেনাসের উপগ্রহ সংখ্যা 15টি। এর দিনের পরিমাণ 17 ঘণ্টা 15 মিনিট। এর এক বছর হল পার্থিব 84 বছর। ইউরেনাসের কিছু ভৌত তথ্যগুলি হল ঃ

1] সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ঃ 287.099×10^7 কিমি।

2] সূর্য পরিক্রমার সময় ঃ 30,685 পার্থিব দিন বা 84.01 বছর।

3] কক্ষাবর্তন গতিবেগ ঃ 6.81 কিমি/সেকেন্ড

4] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ 0.0461

5] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে কক্ষপথের নতি [Inclination] ঃ 0.774^0

6] ভর ঃ 8.684×10^{22} মেট্রিক টন

7] বিষুব ব্যাস ঃ 25,559 কিমি।

8] গড় ঘনত্ব ঃ 1.285 গ্রাম/ঘন সেমি

9] বিষুবে অভিকর্ষজ ত্বরণ ঃ 8.69 মিটার / সেকেন্ড^2

10] বিষুবে মুক্তিবেগ ঃ 21.3 কিমি/সেকেন্ড

11] অক্ষাবর্তনের সময় ঃ 17.24 পার্থিব ঘণ্টা

12] বিষুব ও কক্ষপথের মধ্যে নতি ঃ 97.86^0

13] গড় যুতি কাল ঃ 369.66 পার্থিব দিন

[Mean Synodic Period]

14] তাপমান ঃ 59.1^0 কেলভিন

15] উপগ্রহের সংখ্যা ঃ 15 (পনেরো)

16] বলয় সংখ্যা ঃ 10টি।

ইউরেনাসের আবহমণ্ডলে মিথেন গ্যাস থাকায় গ্রহটিকে নীল রংয়ের দেখায়। কারণ মিথেন বর্ণালির লাল রঙ শুষে নেয়। ভয়েজার-2 ইউরেনাসের সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে। 1977 সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, ইউরেনাসের কতকগুলি বলয় আছে। এই বলয়গুলি, সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে কৃষ্ণবর্ণ কণার সমাহারে তৈরি। ইউরেনাসের অক্ষ তার কক্ষপথের সঙ্গে 98^0 কোণ করে থাকায় এর এক মেরু 42টি পার্থিব বছর এক নাগাড়ে সূর্যের আলো পায়, অন্য মেরু থাকে 42 বছর ধরে অন্ধকারে। পরের 42 বছরে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। তবে গ্রহটির বিষুব অঞ্চল ওই সময়ের মধ্যে দু'বার শীত ও দু'বার গ্রীষ্মকাল উপভোগ করে। ইউরেনাসের এক বছর পার্থিব 84 বছরের সমান।

ইউরেনাসের ঘনত্ব 1.285 গ্রাম/ঘন সেমি। এর ভর পৃথিবীর ভরের 14.6 গুণ। এর কেন্দ্রে আছে শিলা এবং বরফ। এই কেন্দ্রকের আকার প্রায় পৃথিবীর আয়তনের সমান। তার উপরে আছে 8000 কিলোমিটার গভীর গরম জলের সমুদ্র। এই তরলের মধ্যেই উৎপন্ন হচ্ছে প্রবল চৌম্বকক্ষেত্র। পৃথিবীর বেলায় এর চৌম্বক অক্ষের সঙ্গে ঘূর্ণন অক্ষ মাত্র 11.6^0 কোণে অবস্থান করে বলে পৃথিবীতে জাহাজের কম্পাসগুলিতে প্রায় 400 কিলোমিটারের একটা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। চৌম্বক-উত্তর এবং প্রকৃত উত্তরদিকের মধ্যে ওই রকম একটা দূরত্বের ফারাক থাকে। ইউরেনাসের ঘূর্ণন অক্ষ তার চৌম্বক অক্ষের সঙ্গে প্রায় 60^0 কোণে অবস্থান করছে বলে এর চৌম্বক উত্তর ও ঘূর্ণন অক্ষের উত্তরের মধ্যে ফারাক প্রায় 4000 কিলোমিটার হয়। সুতরাং ইউরেনাসে কোনও জাহাজ সঠিক দিকে চালানো খুবই কষ্টসাধ্য!

ভয়েজার-2 এর অভিযানের আগে আমরা ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহের কথা জানতাম। এগুলি হল ঃ (1) টাইটানিয়া [Titania], (2) ওবেরন [Oberon], (3) আমব্রিয়েল [Umbriel], (4) এরিয়েল [Aril], এবং (5) মিরান্ডা [Miranda] । প্রথম দুটি আবিষ্কৃত হয় 1787 সালে এবং এদের আবিষ্কারক হলেন উইলিয়াম হার্শেল। পরের দুটি আবিষ্কার করেন উইলিয়াম লাসেল [William Lassell] 1851খ্রিস্টাব্দে। আর মিরান্ডা আবিষ্কৃত হয় 1948 সালে, আবিষ্কারক গেরার্ড কুইপার [Gerard Kuiper]। মিরান্ডা ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ। ইউরেনাসের থেকে এর দূরত্ব 1,29,400 কিলোমিটার। 1.4 পার্থিব দিনে এটি ইউরেনাসকে একবার পাক খেয়ে আসে। মিরান্ডার ব্যাস 480 কিলোমিটার। এর ঘনত্ব 1.3 গ্রাম/ঘন সেমি। ভয়েজার-2, প্রায় 29,000 কিলোমিটার দূর থেকে মিরান্ডার বহু ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

ইউরেনাসের দ্বিতীয় উপগ্রহ হল এরিয়েল। এর ইউরেনাস থেকে দূরত্ব 1,91,000 কিলোমিটার। এরিয়েলের ব্যাস 1160 কিলোমিটার। এই উপগ্রহটি গ্রহটিকে $2\frac{1}{2}$ টি পার্থিব দিনে একবার পাক খায়। ভয়েজার-2 এরও অনেকগুলি ছবি পাঠিয়েছে। এরপর ইউরেনাসের তৃতীয় গ্রহ আম্ব্রিয়েল। ইউরেনাস থেকে এর দূরত্ব 2,66,000 কিলোমিটার। এর ব্যাস হল 1190 কিমি। এটি ইউরেনাসকে পার্থিব 4.14 দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এটি প্রায় অন্ধকার একটি উপগ্রহ, কারণ এটি মাত্র 10% আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত করে। ভয়েজারের ক্যামেরার হাত থেকে প্রায় অন্ধকার গ্রহটিও রেহাই পায়নি।

ইউরেনাসের চতুর্থ ও পঞ্চম উপগ্রহ হল ঃ টাইটানিয়া ও ওবেরন। টাইটানিয়াকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এর ব্যাস 1590 কিলোমিটার। এর ঘনত্ব 1.6 গ্রাম/ঘন সেমি। ইউরেনাসকে এটি 8·71 পার্থিব দিনে একবার পাক খায়। এটি ইউরেনাস থেকে 4,35,900 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইউরেনাসের 15টি উপগ্রহের মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ। ওবেরন ইউরেনাসের পঞ্চম উপগ্রহ দূরত্ব, 5,83,300 কিলোমিটার। পার্থিব 13½ দিনে এটি ইউরেনাসকে একবার প্রদক্ষিণ করছে । এর নিজের ব্যাস 1,550 কিলোমিটার। এটিটাইটানিয়ার চেয়ে সামান্য ছোট। বাকী দশটি উপগ্রহ এবং ইউরেনাস থেকে তাদের দূরত্ব এইরকম ঃ

ইউরেনাসের উপগ্রহের নাম	ব্যাস কিমি [মাইল]	ইউরেনাস থেকে দূরত্ব কিমি [মাইল]
কর্ডেলিয়া (Cordelia)	15(9 1/3)	49,300 [30,600]
ওফেলিয়া (Ophelia)	20 (12 1/2)	53,300[33,120]
বিয়াঙ্কা (Bianca]	50 (30)	59,100 [36,725]
ক্রেসিডা (Cressida)	70(45)	61,800 [38,400]
ডেস্‌ডিমোনা (Desdemona]	50(30)	62,700 [39,000]
জুলিয়েট (Juliet)	70(45)	64,400 [40,000]
পোর্সিয়া (Portia)	90(55)	66,100 [41,000]
রোজালিন্ড (Rosalind)	50[30]	69,900 [43,435]
বেলিন্ডা (Belinda)	50[30]	75,100 [46,700]
পাক (Puck)	170[105]	85,900 [53,400]

তালিকা ঃ 16

উপরের তালিকায় বন্ধনীর ভিতরে দেওয়া সংখ্যাগুলি হল মাইলে ব্যাস কিংবা দূরত্ব। এই দশটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে ভয়েজার-2। এই দশটি উপগ্রহ খুবই ক্ষুদ্র এবং কর্ডেলিয়া ছাড়া বাকী ন'টিই কৃষ্ণবর্ণ। এগুলির অবস্থান ইউরেনাস থেকে 49,000 হতে 86,000 কিলোমিটার অবধি।

1977 সালে বিজ্ঞানীরা ইউরেনাসের নয়টি বলয় আবিষ্কার করেন। ভয়েজার-2 তার পরিক্রমায় এই নয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আরও একটি নতুন বলয়ের সন্ধান দেয়। এইভাবে ইউরেনাসের দশটি বলয় স্থিরীকৃত হয়। ইউরেনাসের বলয়গুলি খুবই পাতলা। এদের বেধ কয়েক মিটারের বেশি নয়। সবচেয়ে বাইরের বলয়ের নাম দেওয়া হয়েছে এপ্‌সিলন [Epsilon]। এটির প্রস্থ অন্যদের তুলনায় বড়। একদিকে এটি প্রায় 800 কিলোমিটার চওড়া, অন্যদিকে এটি মাত্র 100 কিলোমিটার প্রস্থবিশিষ্ট। এই বলয়টিই ইউরেনাসের সবচেয়ে দূরবর্তী বলয়। ইউরেনাসের বলয়গুলির কিছু বিবরণ নীচের তালিকায় দেওয়া হল ঃ

বলয়ের নাম	ইউরেনাসের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব (কিমি)	সমতুল্য প্রস্থ (কিমি)	পরিলক্ষিত প্রস্থ (কিমি)
6	41,837	0.66	1-2
5	42,235	1.21	2-7
4	42,571	1.06	1-6
আলফা [Alpha]	44,718	3.86	4-11
বিটা [Beta]	45,661	3.16	4-13
ইটা [Eta]	47,176	0.64	1-4
গামা [Gamma]	47,627	3.13	2-8
ডেলটা [Delta]	48,300	2.69	3-8
ল্যাম্‌বডা[Lambda]	50,023	0.1	2-3
এপ্‌সিলন [Epsilon]	51,149	42.8	20-95

তালিকা ঃ 17

এই তালিকায় সমতুল্য প্রস্থ [Equivalent Width] হল প্রস্থ ও আলোর হ্রাস হওয়ার পরিমাণের গুণফল। পরিলক্ষিত প্রস্থ [Observed Width] হল দ্রাঘিমাংশের প্রেক্ষিতে প্রকৃত পরিবর্তনশীলতা এবং পরিমাপের ভ্রান্তি [Error] জনিত ভিন্নতা।

ইউরেনাসের মুখ্য পাঁচটি উপগ্রহ সম্পর্কে কিছু তথ্য ঃ

উপগ্রহের নাম	ইউরেনাসের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব (কিমি)	কক্ষাবর্তনকাল (পার্থিব দিন)	গড় ব্যাসার্ধ (কিমি)	গড় ঘনত্ব (গ্রাম/ঘনসেমি)
মিরান্ডা[Miranda]	1,29,780	1.414	236	1.15
এরিয়েল [Ariel]	1,91,240	2.520	579	1.56
আমব্রিয়েল[Umbriel]	2,65,970	4.144	585	1.52
টাইটানিয়া[Titania]	4,35,840	8.706	789	1.70
ওবেরন [Oberon]	5,82,600	13.463	761	1.64

তালিকা ঃ 18

15টি উপগ্রহ এবং 10টি বলয় নিয়ে ইউরেনাসের পরিবার বেশ বড়সড়। তবে এর বলয়গুলি শনির বলয়ের মত অপূর্ব দর্শনীয় নয় এবং এর বলয়গুলির প্রায় সবগুলিই কৃষ্ণবস্তু দিয়ে তৈরি, ফলে বর্ণহীন।

● নেপচুন [Neptune] ●

সৌরমণ্ডলের অষ্টমগ্রহ। রোমকদের পুরাণ অনুসারে নেপচুন সমুদ্রের দেবতা। ভারতীয় পুরাণ ও ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে নেপচুন হল বরুণ দেবতা। এটি জলের দেবতা—সমুদ্রের অধিপতি। ফলিত জ্যোতিষের দ্বাদশ গ্রহের অন্যতম এই গ্রহটি। নেপচুন গ্রহটি নীল সমুদ্রের মত নীল রংয়ের। আবহমণ্ডলে মিথেন [CH_4] থাকার জন্য নেপচুনের এমন নীল রঙ [চিত্র ঃ 97]।

নেপচুন একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে পার্থিব 164.8 বছরে। নেপচুন আবিষ্কৃত হয়েছিল 1849 খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং তার আবিষ্কারের কাল থেকে সে এখনো একবারও তার সূর্য পরিক্রমণ করে উঠতে পারে নি। এর একবার সূর্য প্রদক্ষিণ শেষ হবে 2014 খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রহটির গতিবেগ সেকেন্ডে 5 কিলোমিটার। ভয়েজার-2 এই গ্রহটি সম্পর্কে অনেক নতুন এবং সঠিক তথ্য জানিয়েছে। নেপচুনের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার। সূর্য থেকে এর দূরত্ব 450.43 কোটি [450.43×10^7] কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় 30 গুণ। নেপচুনের একদিন মাত্র 16.11 পার্থিব ঘণ্টা বা 16 ঘণ্টা 6.6 মিনিট। নেপচুনের এক বছর প্রায় 165 পার্থিব বছর। কোনও মানুষ নেপচুনে থাকলে সে নেপচুনের পুরো এক বছর বাঁচতো না। নেপচুন সম্পর্কে কিছু তথ্য এই রকম ঃ

1] সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ঃ 450,43,00,000 কিমি
2] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ 0.009
3] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে এই কক্ষপথের নতি [Inclination] ঃ 1.77^0
4] একবার সূর্য-প্রদক্ষিণ কাল ঃ 164·8 পার্থিব বৎসর
5] অক্ষাবর্তন কাল ঃ 16·11 পার্থিব ঘণ্টা
6] গড় যুতিকাল [Mean Synodic Period] ঃ 367·49 পার্থিব দিন
7] গড় কক্ষাবর্তনের গতি ঃ 5·43 কিমি/সেকেন্ড
8] কক্ষের সঙ্গে বিষুবের নতি ঃ $29{\cdot}6^0$

9] ভর ঃ 17.15 × পৃথিবীর ভর বা 102.454×10^{21} মেট্রিক টন
10] বিষুব ব্যাস ঃ 24,764 কিমি
11] মেরু ব্যাস ঃ 24,340 কিমি
12] গড় ঘনত্ব ঃ 1.64 গ্রাম/ঘন সেমি
13] উপগ্রহের সংখ্যা ঃ 8টি [আটটি]
14] বলয় সংখ্যা ঃ চারটি [4টি]
15] আয়তন ঃ 57.7 × পৃথিবীর আয়তন বা $62.44561728 \times 10^{12}$ ঘন কিলোমিটার।

নেপচুনের আবহমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। এই দুটি গ্যাসই এর বায়ুমণ্ডলের প্রায় 98% অংশ। বাকী 2% গ্যাসে আছে মিথেন ইত্যাদি। এর কেন্দ্রস্থলে চাপ 50 লক্ষ $[50 \times 10^{5}]$ বার [Bar], উষ্ণতা 7000^{0} কেলভিন। আবার আবহমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে। প্রায় 2000 কিলোমিটার উচ্চতায় উষ্ণতা প্রায় 750^{0} কেলভিন এবং ওই উচ্চতায় চাপ মাত্র 10^{-11} বার। নেপচুনের উপরের উষ্ণতা 59.3^{0} কেলভিন। নেপচুন ইউরেনাসের যমজ ভাই। দুটিরই অনেক গুণাবলী প্রায় একই রকম। নেপচুনের অবস্থান 1795 খ্রিস্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লালান্ডে [Lalande] অঙ্ক কষে বের করেছিলেন। তখনও এটিকে চোখে দেখা যায় নি। পৃথিবী থেকে নেপচুনের দূরত্ব 435 কোটি $[435 \times 10^{7}]$ কিলোমিটার।

ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহের কথা জানা ছিল 1989 সাল অবধি। ভয়েজার-2 1989 সালের আগস্ট মাসের অভিযানে আবিষ্কার করে নতুন আরও ছয়টি উপগ্রহ। ফলে, নেপচুন গ্রহের মোট উপগ্রহের সংখ্যা এখন আটটি। গ্যালিলিও সম্ভবত 1612 সালের ডিসেম্বর মাসে নেপচুন গ্রহটিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাঁর এক নকশায় বৃহস্পতির পাশে একটি গ্রহ এঁকেছিলেন। বৃহস্পতির পাশে দেখানো এই গ্রহটি সম্ভবত নেপচুন গ্রহ-ই ছিল। নেপচুনের উপগ্রহগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য

উপগ্রহের নাম	ব্যাসার্ধ (কিমি)	দূরত্ব (কিমি)	নতি (^{0})	উৎকেন্দ্রিকতা	ঘনত্ব (গ্রাম/ঘন সেমি.)	কক্ষাবর্তনকাল (পার্থিব দিন)
নাইয়াড [Naiad]	29	48,230	4.74	0.0003	—	0.2944
থলাসা [Thalassa]	40	50,070	0.21	0.0002	—	0.3115
ডেসপিনা [Despina]	74	52,530	0.07	0.0001	—	0.3347
গ্যালাটিয়া [Galatea]	79	61,950	0.05	0.0001	—	0.4287
ল্যারিসা [Larissa]	96	73,550	0.20	0.0014	—	0.5547
প্রোটেয়াস [Proteus]	208	1,17,640	0.04	0.0004	—	1.1223
ট্রাইটন [Triton]	1,350	3,54,800	156.8	0.000	2.07	5.8768
নেরেইড [Nereid]	170	55,09,100	27.6	0.753	—	359.632

[এখানে দূরত্ব হল নেপচুনের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব।]

তালিকা ঃ 19

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ঠাণ্ডা উপগ্রহ হল ট্রাইটন। এর উষ্ণতা –236^0 সেলসিয়াস। সৌরমণ্ডলের যে তিনটি উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল আছে ট্রাইটন তাদের অন্যতম। এর আবহমণ্ডলে আছে নাইট্রোজেন এবং মিথেন। এর মেরুপ্রদেশে তাই মিথেন ও নাইট্রোজেনের বরফবৃষ্টি হতে দেখা যায়। 1846 সালে উইলিয়াম লাসেল এটিকে প্রথম আবিষ্কার করেন। নেপচুন থেকে এর দূরত্ব 3.55 লক্ষ কিলোমিটার। নেপচুনকে একবার ঘুরে অসতে সময় নেয় 5.88 পার্থিব দিন। লাসেল [William Lassell] এটিকে আবিষ্কার করেন একটি 24 ইঞ্চির প্রতিফলক দূরবীন দিয়ে। ট্রাইটনে আগ্নেয়গিরি অছে। তা থেকে অগ্ন্যুদগীরণও হয়, পৃথিবী, শুক্র এবং বৃহস্পতির উপগ্রহ আইও-র মত। ট্রাইটনের আকার, ঘনত্ব এবং পৃষ্টদেশের গঠন অনেকটাই প্লুটোগ্রহের মতো। অনেকে মনে করেন, এটি বাইরের থেকে নেপচুনের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে এসে পড়েছে এবং এইভাবে উপগ্রহ হয়েছে নেপচুন গ্রহটির। এই উপগ্রহে জল এবং জলীয় বরফ দুই-ই আছে।

নেপচুন গ্রহটির চারটি বলয় আছে। এই বলয়গুলি সরু এবং ক্ষীণ। এদের কণাগুলি অদ্ভুতভাবে অন্ততঃ পাঁচটি অঞ্চলে বেশি পরিমাণে জমে আছে। এই অঞ্চলগুলির দৈর্ঘ্য 1000 থেকে 10,000 কিলোমিটার। নেপচুনের সবচেয়ে বাইরের বলয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 1989 N 1R। এতেই কণাগুলি এমন জমে জমে আছে। এইভাবে বাকী তিনটি বলয়ের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম হল ঃ 1989 N 3R, 1989 N 2R এবং 1989 N 4R এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরকম ঃ

বলয় পরিচিতি	নাম	নেপচুনের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব (কিমি)	মন্তব্য
1989N3R	গ্যালে [Galle]	41,900	প্রায় 1,700 কিমি. চওড়া, প্রান্তদেশ অস্পষ্ট।
1989N2R	লে ভেরাঁ [Le Verrier]	53,200	কতটা চওড়া নির্দিষ্ট করা যায় নি।
1989N4R	প্ল্যাটো [Plateau]	56,100	প্রায় 5,800 কিমি চওড়া। ভেতরের প্রান্তে রয়েছে 1989 N2R
1989N1R	অ্যাডাম্‌স্ [Adams]	62,900	15 কিমি চওড়া, উজ্জ্বল অংশের পাশেই আছে উপগ্রহ গ্যালাটিয়া।

তালিকা ঃ 20

এ পর্যন্ত কেবলমাত্র ভয়েজার-2 মহাকাশযানই নেপচুন পরিক্রমা করেছে। এর উপগ্রহ, বলয় ইত্যাদি সম্পর্কে বহু নতুন চমপ্রদ তথ্য পাঠিয়েছে এই ভয়েজার-2। আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ তথা মহাকাশযান নেপচুন অভিযানে পাঠানোর চেষ্টা চলছে নাসা-র [NASA]। খুব শীঘ্রই তা পাঠানো হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত 'হাবল স্পেস টেলিস্কোপ' [Hubble Space Telescope] অবশ্য নেপচুনের উপরও গবেষণা করছে।

দৈত্যাকার গ্রহগুলির মধ্যে নেপচুনের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি—1.66 গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার। বৃহস্পতির ভর অনেক বেশি হলে কী হবে, তার ঘনত্ব বেশ কম, মাত্র 1.33 গ্রাম/ঘন সেমি। তাই মনে করা হয়, নেপচুনে ভারী মৌলের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে বেশ বেশি। সৌরকলঙ্ক যখন সবচেয়ে কম

থাকে তখন পৃথিবী থেকে দূরবীনে নেপচুনকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। সৌরকলঙ্ক খুব বেশি হলে নেপচুনের প্রান্তদেশ আবছা দেখায়। (চিত্র ঃ 97 দেখুন)। বৃহস্পতি-শনির চাইতে ইউরেনাস-নেপচুন আকারে ওজনে অনেক ছোট হলেও এই চারটি গ্রহের উপাদান এবং গঠন প্রায় একই ধরনের। বিশেষ করে, নেপচুনকে ইউরেনাসের যমজ বলেই মনে হয়। ওই চারটি গ্রহের আবহমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের আধিক্য। আবার ইউরেনাস ও নেপচুনে আছে মিথেন গ্যাস। এর জন্যই এই গ্রহ দুটিকে পৃথিবী থেকে নীলাভ সবুজ দেখায়। ভয়েজার-2 -এর ছবিতে এদের ফিকে কিংবা গাঢ় নীল রঙের দেখায় [চিত্র ঃ 96 ও 97]।

নীল সমুদ্রের অধিপতি বরুণদেবের নামে নেপচুনের এই নামকরণ সার্থক। ফলিত জ্যোতিষে নেপচুন করুণ নামেই অভিহিত, যেমন প্লুটোর নাম রুদ্র এবং ইউরেনাসের নাম ইন্দ্র বা প্রজাপতি। রোমক দেবতা নেপচুনের নামে এই গ্রহের নামকরণও সার্থক, কারণ নেপচুন সত্যি সত্যিই সমুদ্রের মত নীল গ্রহ।

● প্লুটো [Pluto] ●

প্লুটো সৌরমণ্ডলের নবম তথা শেষ গ্রহ। এর প্রতীক চিহ্ন হল P। প্লুটোকে গ্রহ বলা যাবে কিনা এ নিয়ে প্রবল বিবাদ-বিতর্ক চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। অবশেষে 2006 সালের আগস্ট মাসে 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ইউনিয়ন'-এর [International Astronomical Union] একদল সদস্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউরোপের প্রাগে এক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে, প্লুটো একটি 'বামন গ্রহ' [Dwarf Planet], কুলীন গ্রহ নয়। ওই ইউনিয়নের বেশির ভাগ সদস্য-বিজ্ঞানী অবশ্য প্লুটোকে 'বামন গ্রহ' বলতে নারাজ। তাঁরা প্লুটোর এই বামনত্ব মেনে নেন নি। এ নিয়ে নাতি দীর্ঘ অলোনায় আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার আগে প্লুটোকে গ্রহ ধরে নিয়েই তার বিবরণে আসা যাক।

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে শীতল, সবচেয়ে দূরের গ্রহ হল প্লুটো। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান এর নাম দিয়েছিল 'রুদ্র'। এই 'রুদ্র' মহাদেবের ঋগ্বেদীয় নাম। রোমক পুরাণ কাহিনী অনুসারে প্লুটো হল নরকের দবেতা। এটি সূর্য থেকে এতো দূরে অবস্থিত যে, আলো তার এক সেকেন্ডে 2,99,792 কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে সূর্য থেকে যাত্রা শুরু করে এই গ্রহতে পৌঁছাতে সময় নেয় পাঁচ ঘন্টারও বেশি। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয় 1930 সালের 18ই ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 78 বছর আগে। আবিষ্কারক হলেন ক্লাইড টমবায় [Clyde Tombaugh]। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজ্ঞানীটি তাঁর মাত্র 24 বছর বয়সে প্লুটোকে আবিষ্কার করেন। এর একটি উপগ্রহও আছে। তার নাম শ্যারন [Charon]। শ্যারন আবিষ্কৃত হয়েছে 1978 সালে অর্থাৎ মাত্র 30 বছর অগে। সূর্য থেকে প্লুটোর গড় দূরত্ব 590 কোটি মিলোমিটার। [370 কোটি মাইল]। পৃথিবী থেকে এর সবচেয়ে কাছের দূরত্ব 580 কোটি কিলোমিটার [360 কোটি মাইল]। এর গড় উষ্ণতা -150^{0} সেলসিয়াস। এর বিষুব ব্যাস 2,300 কিলোমিটার [1430 মাইল]। এর কোনও আবহমণ্ডল নেই। প্লুটোর উপগ্রহের সংখ্যা এখনও অবধি একটি বলেই জানা গেছে। প্লুটোর অক্ষাবর্তন কাল, অর্থাৎ প্লুটোর একদিন হল আমাদের পার্থিব 6 দিন 9 ঘন্টা। প্লুটোর একবাব কক্ষাবর্তন বা সূর্য পরিক্রমা কাল হল পার্থিব 248.5 বছর। এর কক্ষপথ এতোই উপবৃত্তাকার যে এই গ্রহটি কক্ষাবর্তনের সময় মাঝে মাঝে নেপচুনের চেয়েও সূর্যের কাছে চলে আসে। তখন নেপচুনই সৌরমণ্ডলের শেষ গ্রহ হয়ে দাঁড়ায়। নেপচুনের ক্রান্তিপথ বৃত্তাকার এবং প্লুটোর কক্ষপথ খুব বেশি উপবৃত্তাকার হওয়ায়

এটা সম্ভব হয়। 1989 সালে প্লুটো সূর্যের সবচেয়ে কাছে এসেছিল। আবার 1979 থেকে 1999 অবধি এই 20 বছর ধরে নেপচুনই ছিল সৌরমণ্ডলের শেষ তথা দূরতম গ্রহ। প্লুটো তখন ইউরেনাসের চেয়েও সূর্যের কাছে এসেছিল। এই সময় কেবল প্লুটোকে নয়, তার উপগ্রহকেও পৃথিবী থেকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। সূর্য থেকে প্লুটোর সবচেয়ে কম দূরত্ব হয় 450 কোটি কিলোমিটার এবং সবচেয়ে বেশি দূরত্ব হয় 750 কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে আলো প্লুটো পৌঁছাতে সময় নেয় 4 থেকে 7 ঘণ্টা।

প্লুটোর ব্যাস আমদের চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এর কেন্দ্রাঞ্চল শিলাময় এবং তার উপরের স্তরে আছে জলীয় বরফ। এই বরফ থেকে যে জলীয় বাষ্প হয় তার থেকে উৎপন্ন প্লুটোর প্রায় অস্তিত্বহীন আবহমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর অনুরূপ চাপের দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ (10^{-6}) মাত্র। এর ঘনত্ব কম হওয়ায় এর ভর চন্দ্রের ভরের প্রায় এক ষষ্ঠমাংশ। প্লুটোর পৃষ্ঠতলে জমাট বাঁধা মিথেন, নাইট্রোজেন, কারবন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বল স্তর বর্তমান। গঠনের ভিন্নতায় প্লুটো তার নিকটবর্তী ইউরেনাস, নেপচুনদের থেকে ভিন্ন। প্লুটো তার খুব বেশি উপবৃত্তাকার কক্ষপথের দূরতম প্রান্তে যখন অবস্থান করে তখন তার প্রবল শৈত্য। প্লুটোর প্রায় না-থাকা আবহমণ্ডলের সবটাই তখন জমে শক্ত বরফ হয়ে যায়। কোনও আবহমণ্ডল থাকে না প্লুটোর ওই শৈত্যের সময়। প্লুটোর কিছু তথ্য এইরকম ঃ

1] সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ঃ 590×10^7 কিমি

2] সূর্য পরিক্রমণ কাল ঃ 247.69 পার্থিব বৎসর।

3] কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ঃ 0.251

4] ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে এর কক্ষপথের নতি ঃ 17.1^0

5] বিষুব ব্যাস ঃ 2302 কিমি

6] ভর ঃ 1.2×10^{19} মেট্রিক টন (পৃথিবীর ভরের 500 ভাগের এক ভাগ মাত্র)

7] অক্ষাবর্তনকাল ঃ 6.3867 পার্থিব দিন

8] যুতিকাল ঃ 366.74 পার্থিব দিন

9] ঘূর্ণন অক্ষের নতি ঃ 122^0

10] উপগ্রহ ঃ একটি [শ্যারন]

11] উপগ্রহের গ্রহাবর্তন কাল ঃ 6.3867 পার্থিব দিন

12] উপগ্রহের ব্যাস ঃ 1186 কিমি

13] উপগ্রহের ভর ঃ 1.8×10^{18} মেট্রিক টন (পৃথিবীর ভরের দশ হাজার ভাগের তিন ভাগ মাত্র)

প্লুটোর আয়তন খুবই কম। এর ব্যাস মাত্র 2300 কিলোমিটার। পৃথিবীর চাঁদ, শনির টাইটান, নেপচুনের ট্রাইটন, বৃহস্পতির চারটি চাঁদ ইউরোপা, আইও, গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টোদের চেয়েও প্লুটো অনেকটাই ছোট। প্লুটো যেহেতু খুবই ছোট এবং পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, তাই পৃথিবী থেকে একে ভালো করে দেখতে পাওয়া খুবই মুশকিল। নাসা [NASA] ভয়েজার জাতীয় কোনো মহাকাশযানও পাঠায়নি প্লুটোর কাছাকাছি। তবে, তারা 2006 সালে 'New Horizons' মিশন নামের প্রকল্পে একটা মহাকাশযান পাঠিয়েছে প্লুটো এবং 'কুইপার বেল্ট' [Quiper Belt] নিয়ে ভালো করে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি প্লুটোর কাছাকাছি পৌঁছাবে 2015 খ্রিস্টাব্দে এবং কুইপারবেল্ট-এর কাছে যাবে 2022 সালে।

প্লুটোর উপগ্রহ শ্যারন আবিষ্কৃত হয় 1978 সসাল। এই গ্রহ ও উপগ্রহ দুটি এতো কাছাকাছি অবস্থিত যে পৃথিবীর কোনও দূরবীন দিয়ে এদের অলোদাভাবে দেখতে পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। শ্যারনের ব্যসার্ধ 593 কিলোমিটার। প্লুটো থেকে এর দূরত্ব 19,640 কিলোমিটার মাত্র। সুতরাং শ্যারনের ব্যাসার্ধ প্লুটোর ব্যাসার্ধের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। সৌরমণ্ডলে আর কোনও উপগ্রহ নাই যেটি গ্রহের আয়তনের তুলনায় এতোটা বড় এবং গ্রহের এতো কাছ দিয়ে ঘুরছে। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন প্লুটো এবং শ্যারন একটি যুগ্ম-গ্রহতন্ত্র [Double Planet System]। এই দুটি গ্রহ-উপগ্রহ এমন একটা অঞ্চলে অবস্থান করে সূর্য পরিক্রমা করছে, যে অঞ্চলটার নাম 'কুইপার বেল্ট', যেখানে ওই রকম অসংখ্য বস্তু ভিড় করে আছে। ওলন্দাজ জ্যোতির্বিজানী জেরাল্ড কুইপারের [Gerald Quiper] নামাঙ্কিত সৌরমণ্ডলের প্রান্তের ওই অঞ্চলটিতে রয়েছে প্লুটো ও শ্যারনদের মতো অসংখ্য বস্তু। এদের বলা হয় 'কুইপার বেল্ট বস্তু' [Quiper Belt Objects বা KBOs]। বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন প্লুটো, শ্যারন, ট্রাইটন, নেরেইড, ফোবিরা KBOs এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে সূর্য, নেপচুন. শনির মহাকর্ষ ক্ষেত্রে এস পড়ে প্লুটো সূর্য পরিক্রমা সারছে ও গ্রহ হয়ে গেছে, অন্যরা হয়েছে গ্রহদের উপগ্রহ। ফোবি যে একটা KBO তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে 'ক্যাসিনি' [Cassini] মহাকাশযানের নিকট পর্যবেক্ষণে। দিনটা ছিল 2004 খ্রিস্টাব্দের 11ই জুন।

এরপর একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী KBO বিধায় প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলতে চাইলেন। তাঁরা সম্মেলন ডাকলেন– IAU-র সদস্যদের। এই সম্মেলন বসল প্রাগে গ্রহের সত্যিকার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য। IAU-র মোট 2500 সদস্যের মধ্যে মাত্র 424 জন উপস্থিত হলেন। তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্লুটোকে 'বামনগ্রহ' বলে ঘোষণা করা হল। তবে বহু বিজ্ঞানী তা মানতে পারেন নি। 2006 সালের 25শে আগস্ট প্রাগের ওই সম্মেলনে আই এ ইউ [IAU] সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌরমণ্ডলের মোট গ্রহ সংখ্যা 11টি [এগারোটি]। এদের মধ্যে 8টি হল কুলীন গ্রহ এবং তিনটি হল 'বামন গ্রহ'। এই বামন গ্রহদের একটি হল প্লুটো, যা এতোদিন গ্রহ বা সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। দ্বিতীয় বামন গ্রহটি হল 'জেনা' [Xena], যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম 2003 UB 313 এবং যার কথায় একটু পরেই আসছি। আর তৃতীয় বামন গ্রহটি হল 'সেরেস' [Ceres]। এটি একটি গ্রহাণু। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে থাকা এই গ্রহাণুটির কথা খানিকটা পরেই বলছি।

এইভাবে বামনগ্রহ ঘোষণা করতে আই এ ইউ গ্রহের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হল, কুলীন গ্রহ বলা হবে তাদের, যারা সূর্য বা অন্য নক্ষত্রের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরবে এবং ওই বস্তুটির ভর এতোটাই বেশি হবে যে, তার অভিকর্ষজ বল তাকে একটা গোলকের আকৃতি দেবে এবং তার সঙ্গে তারা কক্ষপথের আশেপাশের বস্তুদের হঠিয়ে দিতে পারবে। আর বামন গ্রহ তার কক্ষপথের চারিদিকের বস্তুদের হঠাতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 300-রও কম সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ভোটে, যদিও আই এ ইউ-র মোট সদস্য সংখ্যা 2500-এর বেশি। আই এ ইউ-এর ওই সম্মেলনে গ্রহের উপরোক্ত সংজ্ঞার বিরোধিতা করেন বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী। উপস্থিতির সংখ্যা কম হওয়ায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে ওই সংজ্ঞা গৃহীত হয়। কিন্তু আই এ ইউ-র এই সিদ্ধান্ত তার বেশির ভাগ সদস্যই মেনে নিতে পারেন নি। 2500 সদস্যের বেশির ভাগই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন।

প্রাগের ওই সম্মেলনে 'জেনা'-র আবিষ্কর্তা ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির

মাইকেল ব্রাউন সব থেকে বেশি আপত্তি তোলেন প্লুটোর কৌলীন্য নিয়ে। উপস্থিত বিজ্ঞানীদের অনেকেই ব্রাউনকে সমর্থন করেন। ফলে, গ্রহের ওই নতুন সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হয়। আই এ ইউ-র গ্রহের সংজ্ঞা নির্ধারক কমিটিকে বদলাতে হয় তাদের পুরাতন সংজ্ঞা, যেটি সভার কাছে সম্মেলনের আরম্ভে পেশ করা হয়েছিল। নতুন সংজ্ঞায় কুলীন গ্রহের সংখ্যা দাঁড়ায় আটটি এবং বামন গ্রহ হয় তিনটি—প্লুটো, জেনা এবং সেরেস।

সারা পৃথিবী জুড়ে প্লুটোর বামনত্ব এবং গ্রহের নতুন সংজ্ঞার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী মহলে প্রবল বিক্ষোভ চলছে। ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ দেখান 300-র বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গ্রহবিজ্ঞানী 2006 সালের 2রা সেপ্টেম্বর। তাঁরা লিখিত প্রতিবাদ লিপিও পাঠান আই এ ইউ-র কাছে। তাঁরা বললেন, "The IAU can say the sky is green all day long and that does not make it so"। আই এ ইউ সারাদিন ধরে আকাশকে সবুজ বললেও আকাশ সবুজ হয় না। সাধারণ মানুষের অধিকাংশই প্লুটোর ওই বামনত্ব মেনে নিতে পারে নি।

নাসার [NASA] বিজ্ঞানীরা প্লুটোর বামনত্ব একবারেই মানতে পারেন নি। এঁদের মুখপাত্র বিজ্ঞানী অ্যালান স্টার্ন বলেছেন, "কাল যখন ভোট হয়েছে, তখন প্রাগে আই এ ইউ-র হলে আড়াই হাজারের জায়গায় হাজির ছিলেন 424 জন বিজ্ঞানী। ......যে সংজ্ঞাটা আই এ ইউ-তে মঞ্জুর করা হয়েছে সেটা ভয়ঙ্কর। বলা হচ্ছে, বড় গ্রহেরা তাদের কক্ষপথের আশপাশের সব বস্তুকে সরিয়ে দিতে পারে, বামন গ্রহেরা পারে না। ......এটা বাজে কথা। ......পৃথিবী, মঙ্গল, নেপচুন ও বৃহস্পতির মত বড় গ্রহগুলিই তাদের কক্ষপথের আশপাশ থেকে বস্তুদের হঠাতে পারে না, তো প্লুটো। সেক্ষেত্রে তো বৃহস্পতি, নেপচুনদেরও বামন বলতে হয়।" স্টার্নের মতো একদল নামী বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্লুটোকে বামন গ্রহ বলা চলবে না। প্লুটোর কৌলিন্য ফিরিয়ে দিতে এই বিজ্ঞানীর দল পরের বছর [2007 খ্রিস্টাব্দ] সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেন তাবড় তাবড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিয়ে। এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে আছে।

● জেনা [Xena] ●

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালোমার [Palomar] মানমন্দিরে 48 ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে 2003 সালের 21শে অক্টোবর একটা বস্তু নিরীক্ষণ করলেন, যা ওঁদের কাছে নতুন মনে হল। এই তিনজন বিজ্ঞানী হলেন ঃ ক্যালটেকের [Caltech] মিচেল ব্রাউন [Michael Brown], ইয়েলের [Yale] ডেভিড রবিনোউইৎজ [David Rabinowitz] এবং হাওয়াইয়ের জেমিনি অবজারভেটরির চাদ ট্রুজিল্লো [Chad Trujillo]। 2005 সালের 8ই জানুয়ারী এটা স্থিরীকৃত হয় যে, ওই বস্তুটি পূর্বে অদেখা একটি বস্তু, যেটি অনেক দিন থেকে সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহর মত। এর ডাক নাম হল 'জেনা' এবং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম হল 2003 UB 313। 'জেনা' নামটা দেওয়া হল বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকের বিখ্যাত সিরিয়েল Warrior Princess-এর এক চরিত্রের নামে। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে এই সিরিয়েল তখন খুব জনপ্রিয় ছিল এবং মিচেল ব্রাউন, এই সিরিয়েলের একনিষ্ঠ দর্শক ছিলেন। তিনিই 'জেনা' নামটি রাখেন। ব্রাউন এবং তার দল দাবী করলেন, প্লুটোকে যেহেতু গ্রহ বলা হয়েছে, প্রায় একই রকম গুণসম্পন্ন জেনাকেও সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এর আয়তন প্লুটোর থেকেও বড়। [চিত্র ঃ 98 দেখুন।]

জেনার ব্যাস প্রায় 3400 কিলোমিটার [2100 মাইল]। প্লুটোর ব্যাসের [2320 কিমি] প্রায় 1.5 গুণ জেনার ব্যাস। প্লুটোর মত জেনাতেও বরফ ও শিলা রয়েছে। পার্থিব 560 বছরে একবার সূর্যকে

পরিক্রমা করে জেনা। প্লুটোর এক বছর আমাদের পার্থিব 249 বছরের সমান। জেনার ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা –243 ডিগ্রি সেলসিয়াস। জেনা খুবই উজ্জ্বল। সূর্য থেকে জেনার দূরত্ব 1450 কোটি কিলোমিটার। কোন কোন সময় জেনা নেপচুনের কক্ষপথের খুব কাছেই চলে আসে, তখন সূর্য থেকে জেনার দূরত্ব 530 কোটি কিলোমিটার হয়। 2003 UB 313 বস্তুটির উপাদান অনেকটাই প্লুটো গ্রহের মত। জেনা ও প্লুটো কিন্তু অন্য আটটি গ্রহের তুলনায় অন্যরকম। জেনা তার নিজের অক্ষের সঙ্গে 45^0 কোণ করে অবস্থান করছে। জেনা গ্রহ নয়, একটি কুইপার বেল্ট বস্তু [KBO]।

'কুইপার বেল্ট' হল চ্যাপ্টা থালার মতো, মহাকাশে যা অবস্থান করছে 500 থেকে 1500 কোটি কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ সূর্যকে যে কক্ষতলে গ্রহগুলি তাদের সূর্য পরিক্রমা সারছে সেই তলে সূর্য থেকে 500 কোটি কিলোমিটার থেকে 1500 কোটি কিলোমিটার অবধি 'কুইপার বেল্ট' অবস্থিত। এই অঞ্চলের বাইরে রয়েছে মেঘমণ্ডল, যা সৌরমণ্ডলের বাইরে। এই মেঘমণ্ডলের নাম 'ওর্টের মেঘমণ্ডল' [Oort's Clouds]। কুইপার বেল্টের নামকরণ করা হয়েছে এর আবিষ্কারক ওলন্দাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেরার্ড কুইপারের নামে। 1951 সালে তিনি কুইপার বেল্ট আবিষ্কার করেন। আর ওর্ট মেঘমণ্ডলের নামকরণ করা হয়েছে আরেক ওলন্দাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জ্যান ওর্টের [Jan Oort] নামে। দীর্ঘ পর্যায়কালের ধূমকেতুরা, যারা সাধারণত 5×10^{12} থেকে 30×10^{12} কিলোমিটার দূর থেকে আসে, তারা ওর্টের মেঘমণ্ডলের অঞ্চল থেকে আসে। এই মেঘমণ্ডল সূর্য থেকে 5 লক্ষ কোটি কিলোমিটার থেকে 30 লক্ষ কোটি কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত। 200 বছরের চেয়েও কম সময়ে সূর্য পরিক্রমণ করা ধূমকেতু, যাদের আমরা 'স্বল্প পর্যায়কালের ধূমকেতু' বলি তারা আসে এই কুইপার বেল্ট অঞ্চল থেকে।

'কুইপার বেল্ট' অঞ্চলে এক হাজার কোটি [10^{10}] বরফের তৈরি বস্তু আছে যেগুলির ব্যাস 15 কিলোমিটার বা তারও বেশি। অন্ততঃ 35,000 বস্তু আছে যাদের ব্যাস 100 কিলোমিটারের বেশি। এই অঞ্চলে ধূমকেতু আছে অন্ততঃ 10 কোটি কিংবা তারও বেশি, যার হদিশ 'হাবল টেলিস্কোপ' আজও পায়নি। এই অঞ্চলে শ'য়ে শ'য়ে বস্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে যেগুলিকে বলা হয় 'কেবিও' [KBO] বা 'Kuiper Belt Object'। মোটামুটি হিসাবে বলা হয়েছে, নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে অন্ততঃ 75,000 টি বস্তু আছে, যেগুলি বরফ ও শিলা দিয়ে গঠিত।

প্লুটোর কক্ষপথের বাইরে প্রচুর KBO রয়েছে কুইপার বেল্ট এলাকায়, যাদের ব্যাস 100 কিলোমিটারেরও বেশি। 2004 সালে 5ই মার্চ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রাউনের দল আবার একটা বস্তু আবিষ্কার করলেন যারা আকার প্লুটো গ্রহের আয়তনের প্রায় সমান। এর নাম দেওয়া হয়েছে 2003VB12 এবং যাকে 'সেডনা' [Sedna] বলে ডাকা হচ্ছে। 'সেডনা' হল এস্কিমোদের দেবীর নাম। সেই নামই রাখা হয় 2003 VB12 বস্তুটির। সেডনা সূর্য থেকে 1150 কোটি থেকে 14,850 কোটি কিলোমিটার দূরত্ব নিয়ে সূর্য পরিক্রমা সারে। সূর্য থেকে সেডনার গড় দূরত্ব 1590 কোটি কিলোমিটার। এটি 10,500 বছরে একবার সূর্য পরিক্রমা সারে। সেডনার ব্যাস 2000 কিলোমিটার। প্লুটোর থেকে সামান্য ছোট। সেডনাকে কিংবা ওই জাতীয় বস্তুকে কেউ কেউ বলছেন 'Planetoid'। এই রকম আরেকটি বস্তু পাওয়া যায় 2002 সালে। তার নাম দেওয়া হয়েছে, কোয়াহ্-ওহ্-ওয়াহ্র বা 2002 LM 60। এটি সূর্যের চারিদিকে 288 বছরে একবার ঘুরে আসে। 'বরুণ' নাম দেওয়া আরেকটি Planetoid আবিষ্কৃত হয়েছে 2000 সালে, যার ব্যাস 1065 কিলোমিটার। এই ধরনের বহু ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে নানা মাপের। এগুলি গ্রহ কিংবা বামন-গ্রহ হিসাবেও গণ্য হয়নি 2006

সালের প্রাগ সম্মেলনে। সম্ভবত এদের Planetoid নামটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রাগ সম্মেলনে যেটা ঘটেছে সেটা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবা হচ্ছিল। বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্লুটোকে KBO বলে গ্রহমণ্ডলী থেকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী অবশ্য প্লুটোকে গ্রহ বলে মানতেন এবং এখনও মানেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রায়ান মার্সডেন [Brian Marsden] বলেছেন যে, 1930 সালে প্লুটোর আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে এর ভর ও ব্যাস পৃথিবীর মতই। 1960 সালে এসে জানা গেল প্লুটো অনেক ছোট এবং এর গতিবিধি অন্যান্য গ্রহদের মতো নয়। প্লুটোর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় 1/400 ভাগ। ব্যাসও পৃথিবীর ব্যাসের 1/5.5 ভাগের একভাগ। মার্সডেনের মতে ঃ

1] সৌরমণ্ডলে সূর্য নক্ষত্র, তার চারটি শিলাময় গ্রহ (বুধ থেকে মঙ্গল) এবং চারটি গ্যাসীয় গ্রহ (বৃহস্পতি থেকে নেপচুন)। বুধ, শুক্র ছাড়া প্রত্যেকের অন্ততঃ একটি উপগ্রহ আছে।

2] অসংখ্যা গ্রহাণুর [Asteroids] একটা বলয় আছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে যারা সূর্য প্রদক্ষিণ করছে।

3] নেপচুন পেরিয়ে সৌরমণ্ডলে রয়েছে কুইপার বেল্ট—যেখানে রয়েছে প্লুটো, 2003 UB 313 ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু। এরা বেশির ভাগই বরফ মোড়া বস্তু। এখানে আছে বহু স্বল্প পর্যাবৃত্তকালের ধূমকেতু।

মার্সডেন বলেছেন যে, এরপর আমরা যদি এমন কোন বস্তু খুঁজে পাই যাকে নবম গ্রহ বলা যেতে পারে, তবে দেখতে হবে তার ভর যেন নিদেন মঙ্গলের মত হয়। আর প্লুটোকে যেহেতু আমরা গত 79 বছর ধরে গ্রহ বলে মেনে নিয়েছি, তাই প্লুটো গ্রহ-ই থাক, তবে এটিকে KBO-এর তালিকাভুক্তও করা উচিত 2003 UB 313-দের সঙ্গে। বিতর্কিতভাবে IAU এখন [2006 সাল] যে সিদ্ধান্ত চালু করেছে তাতে মোট আটটি গ্রহ কুলীন গ্রহ এবং মাত্র তিনটি গ্রহ বামনগ্রহ প্লুটো, জেনা [2003 UB 313] এবং সেরেস [Ceres]। আমরা কিন্তু বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে প্লুটোকে এই বইয়ের সর্বত্র গ্রহ হিসাবে গণ্য করেছি।

এতাবৎ পৃথিবী এবং চন্দ্র ছাড়া আর কোনও গাগনিক বস্তুর উপর মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। কিন্তু মনুষ্যবিহীন মহাকাযান নানা সময়ে ছবি তুলেছে বিভিন্ন গ্রহের তাদের অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করে। এইভাবে বহু তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে এইসব মহাকাশযানের সাহায্যে। প্লুটোকে বাদ দিয়ে আমাদের সৌরমণ্ডলের বাকী সব গ্রহকেই মহাকাশযান পাঠিয়ে জরিপ করা হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে নানা তথ্য। প্লুটোতে মহাকাশযান পৌঁছাবে 2015 খ্রিস্টাব্দে। অন্যান্য গ্রহগুলির জন্য মহাকাশযান কবে পাঠানো হয়েছিলো এবং কোন্ দেশ পাঠিয়েছিলো তার তালিকা এই রকম ঃ

গ্রহের নাম	মহাকাশযানের নাম এবং কোন্ দেশ পাঠায়	কোন্ সময়
1] শুক্র	মেরিনার-2 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	জুলাই, 1962
	ভেনেরা-4 (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র)	1967 সালে শুক্রে অবতরণ করে।
	মেসেঞ্জার (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	2006 ও 2007 সালে শুক্রের পাশ দিয়ে চলে যায়।
2] মঙ্গল	মেরিনার-4 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1965 সালে মঙ্গলের পাশ দিয়ে চলে যায়।

	মার্স পাথফাইন্ডার (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1997 খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলে অবতরণ করে।
	মার্স রেকোনাইসেন্স অরবিটার [Mars Reconnaissance Orbiter] (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	2006 সাল থেকে মঙ্গল পরিক্রমণ করে চলেছে।
3] বৃহস্পতি	পাইওনীয়ার-10 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1973 সালে বৃহস্পতির পাশ দিয়ে চলে যায়।
	গ্যালিলিও (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)*	2003 সালে বৃহস্পতিতে অবতরণ করে।
	নিউ হরাইজন্স্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	2007 সালে বৃহস্পতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে।
4] বুধ	মেরিনার-10 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1974 সালে বুধের পাশ দিয়ে চলে যায়।
	মেসেঞ্জার (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	2008 ও 2009 সালে বুধের পাশ দিয়ে গেছে এবং 2011 সালে এটি বুধকে পরিক্রমা করতে থাকবে।
5] শনি	পাইওনীয়ায়-11 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1979 সালে শনির কাছ দিয়ে চলে যায়।
	ক্যাসিনি /হুইগেন্স্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	2004-2005 সাল থেকে এটি শনিকে পরিক্রমণ করছে।
6] ইউরেনাস	ভয়েজার-2 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1986 সালে এটি ইউরেনাসের পাশ দিয়ে চলে যায়।
7] নেপচুন	ভয়েজার-2 (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	1989 সালে নেপচুনের পাশ দিয়ে চলে যায়।
8] প্লুটো	নিউ হরাইজন্স্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)**	2015 খ্রিস্টাব্দে এটি প্লুটোর পাশ দিয়ে চলে যাবে।

* মহাকাশযানটিকে বৃহস্পতির আবহমণ্ডলেই ধ্বংস করে ফেলা হয়, কারণ এর মধ্যে পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যে ব্যাকটেরিয়া ছিল তা যাতে বৃহস্পতির চাঁদ 'ইউরোপা' [Europa]-কে দূষিত না করতে পারে।

** 2006 খ্রিস্টাব্দে নিউ হরাইজন্স্কে নাসা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় প্লুটো অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে। এটি 2015 খ্রিস্টাব্দে প্লুটোর পাশ দিয়ে যাবে 9 বছরের মহাকাশ পরিক্রমার শেষে।

তালিকা ঃ 21

● চন্দ্র [Moon] ●

চন্দ্রের অপর নাম সোম। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সূক্তগুলির অধিকাংশেরই দেবতা হলেন সোম। অর্থাৎ সূক্তগুলি সোম বা চন্দ্রের বন্দনা করে রচিত। কয়েকটি সূক্তে অবশ্য সোমলতা ও সোমরসের কথা আছে। সুতরাং চন্দ্র আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে নানাভাবে পাঁচ-ছয় হাজার বছর ধরে পরিচিত।

সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। দিনটি চন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত। চন্দ্র বাস্তবে একটি 'Satellite' বা উপগ্রহ। এটি পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমারত। এ তথ্য প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের অজানা ছিল না। তবু তাঁরা চন্দ্রকে 'গ্রহ' বলতেন। কারণ গ্রহ বলতে তাঁরা বুঝতেন, যে সূর্যতেজ গ্রহণ করে। ফলিত জ্যোতিষ মতে, মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক ও জীবনের অবসানে প্রাণ গ্রহণ করে যে, তারই নাম 'গ্রহ'। সুতরাং ভারতীয় ঋষিদের কাছে চন্দ্র গ্রহ, কিন্তু তা 'Planet' নয়। 'Planet' শব্দের অর্থ হলো 'চলমান তারা'। সুতরাং 'Planet' আর 'গ্রহ' সমার্থক নয়। চন্দ্র ভারতীয় ঋষিদের কাছে 'গ্রহ', 'উপগ্রহ' নয়। চন্দ্রের নামে তাই সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন। সূর্যের পরে অন্যান্য গ্রহদের তুলনায় চন্দ্রের প্রভাব পৃথিবীর উপর সবচেয়ে বেশি। ঠিক সেই কারণেই সপ্তাহের প্রথম দিনটি সূর্যের নামে নামকরণ করবার পর দ্বিতীয় দিনটি উৎসর্গ করা হয়েছিল চন্দ্রকে। ভারতীয় ঋষিরা সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটির নামকরণ করেন সোমবার। সোম চন্দ্রেরই আরেক নাম। এরই পরিবর্তিত রূপ হলো 'Monday' বা 'Day of the Moon' বা চন্দ্রের দিন। হিন্দুরা সোমবারকে চন্দ্র-পূজার শ্রেষ্ঠ দিন মনে করে। ফলিত জ্যোতিষ মতে, সোমবার চন্দ্র-গ্রহের শান্তির জন্য চন্দ্রের পূজা-পার্বণ ইত্যাদি এবং চন্দ্র-সংক্রান্ত রত্ন-ধারণ করার পক্ষে উপযুক্ত দিন।

সোমবার হলো সপ্তাহের কাজ আরম্ভের দিন। কারণ অধিকাংশ দেশই এখন রবিবারকে ছুটির দিন হিসাবে মেনে নিয়েছে। ফলে, সোমবার থেকেই সপ্তাহের কাজ শুরু হয়। এই বারের নাম 'Monday' এসেছে ল্যাটিন 'Lunse Dies' থেকে বা 'Day of the Moon' থেকে। এই বারটি ফরাসীতে 'Lundi', ইতালীয়তে 'Lunedi' এবং 'Lunes' হলো স্পেনীয় ভাষায়। জার্মানীতে এই বারের নাম 'Montag'।

যে চন্দ্রের নামে এই নামকরণ সে আমাদের বহু পরিচিত 'চাঁদমামা'। চন্দ্রের ব্যাস 2,160 মাইল বা 3,476 কিমি। পৃথিবীর ব্যাস 7,910 মাইল বা 12,740 কিলোমিটার। চন্দ্রের ভর পৃথিবীর ভরের $^1/_{81}$ অংশ। এতে তাই কোনও বায়ুমণ্ডল নেই। চাঁদে এখন মানুষের পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ফলে বহু তথ্যই আমরা এখন জানি আমাদের চাঁদমামা সম্পর্কে। কয়েকটি তথ্য নীচে দেওয়া হলোঃ

1]	চাঁদের ভর ঃ	8.10×10^{19} টন বা
		73.49×10^{21} কিলোগ্রাম
2]	আয়তন ঃ	5.28×10^{9} ঘনমাইল
		বা 21.99×10^{18} ঘনমিটার
		বা 21.99×10^{9} ঘন কিলোমিটার
3]	ঘনত্ব ঃ	208.52 পাউণ্ড /ঘনফুট
		বা 3.34 গ্রাম /ঘন সেন্টিমিটার
4]	ব্যাস ঃ	2,160 মাইল বা 3,476 কিলোমিটার

5। অভিকর্ষজয়ী গতিবেগ ঃ — 1,48 মাইল/সেকেন্ড বা 2.38 কিমি/সেকেন্ড

6। অক্ষবেগ ঃ — 2,287 মাইল /প্রতি ঘণ্টা বা 3,860 কিলোমিটার/প্রতি ঘণ্টা

7। 'সাইনোডিক' আবর্তন সময় ঃ [Synodic Revolution Period] — 29 দিন 12 ঘণ্টা 44 মিনিট

8। নাক্ষত্র-আবর্তন সময় ঃ [Sidereal Revolution Period] — 27 দিন 7 ঘণ্টা 43 মিনিট।

9। চান্দ্র-বিষুবে দিনের তাপমাত্রা ঃ — 127^{0} সেন্টিগ্রেড।

10। চান্দ্র বিষুবে রাতের তাপমাত্রা ঃ — -173^{0} সেন্টিগ্রেড

11। মেরু-অঞ্চলের তাপমাত্রা ঃ — -153^{0} সেন্টিগ্রেড

12। পৃথিবী থেকে দূরত্ব

ক) সবচেয়ে বেশি ঃ — 2,51,983 মাইল বা 4,05,508 কিলোমিটার

খ) সবচেয়ে কম ঃ — 2,25,750 মাইল বা 3,63,300 কিলোমিটার

13। সম্পাতদ্বয়ের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন কাল ঃ [Period of Nodal Regression] — 6585.32 সৌরদিন

14। পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল ঃ — 3.7×10^{7} বর্গ কিমি.

চন্দ্র তার নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরতে সময় নেয় 27 দিন 7 ঘণ্টা 43 মিনিট। এটাকে বলা হয় 'নাক্ষত্র আবর্তন সময়' বা Sidereal Revolution Period। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতেও প্রায় একই সময় নেয়। ফলে, চন্দ্রের একটি নির্দিষ্ট অংশই পৃথিবী থেকে সবসময় দেখা যায়। অর্থাৎ আমরা সবসময়েই চাঁদের একটা পিঠই দেখি। উল্টোদিকের পিঠটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। এই সময়টা অর্থাৎ 27 দিন 7 ঘণ্টা 43 মিনিট 11.6 সেকেন্ড হলো চন্দ্রের এক 'নাক্ষত্র মাস' [Sidereal Month]। আবার পৃথিবী চন্দ্রকে নিয়ে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে গিয়ে সূর্যের যে আলো চন্দ্রের উপর পতিত হয় তার প্রায় 1^{0} দিক পরিবর্তন ঘটে প্রতিদিন। ফলে, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিজনিত যে পর্যাবৃত্তকাল তা 29 দিন 12 ঘণ্টা 44 মিনিট। এই সময়টার নাম 'Synodic Month'। ওই দুই মাসের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে জানা যায় যে, 18 বছর 10.3 দিন পরে পরে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে। চন্দ্রে দিনরাত্রি দুটোই প্রায় চৌদ্দ দিন করে লম্বা। চাঁদের কালো আকাশে পৃথিবী নীল-সাদা রঙের চাঁদ হয়ে আপাতভাবে স্থির হয়ে থাকে। চাঁদের পৃথিবী পরিভ্রমণ গতি কখনও বেশি কখনও কম হয়। এইসব নানা গতির সমন্বিত ফল হিসাবে চন্দ্রের মাত্র 59% অংশ আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। বাকীটা পৃথিবীর বিপরীত দিকেই সবসময় অবস্থান করছে। এখন জানা গেছে চাঁদের বয়স প্রায় পৃথিবীর বয়সের সমান অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি বছর। অবশ্য এমন কিছু শিলা চাঁদে পাওয়া গেছে যাদের বয়স 460 কোটি বছর। এর কারণ হলো চাঁদে বহু উল্কাপাত হয়ে থাকে, সেইসব উল্কার বয়স চাঁদের চেয়ে অনেক বেশি। বায়ুমণ্ডল না থাকায় এইসব উল্কা চাঁদকে সরাসরি আঘাত করে তার মাটিকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখেছে।

মানুষের শরীরের অনেক রোগব্যাধি চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বাতরোগের বৃদ্ধির কথা আমাদের সকলেরই জানা। চন্দ্রের প্রভাবে মাথার ব্যারাম 'চন্দ্রাঘাত' নামেই বিখ্যাত। শরীরের উপর চন্দ্রের প্রভাবজনিত এইসব উৎপাত দূর করতে প্রাচীন ভারতীয়রা বিধান দিয়েছিলেন অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় উপবাস-বিধি পালন করতে বা 'নিশিপালন' করতে। শুধু মানুষের শরীর কেন, নদীজলের জোয়ার-ভাঁটা ও পৃথিবীর মহাসাগরগুলির জলের স্ফীত হওয়া না-হওয়া, সবই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। চন্দ্রের আকর্ষণে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সমুদ্রজলের স্ফীতি নদীতে জোয়ার-ভাঁটা ঘটায়। 'মরা কোটাল' ও 'ভরা কোটাল' অর্থাৎ সমুদ্রের জলের স্ফীত হওয়ার কম-বেশি পরিমাণ চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে আসে বলেই জলের স্ফীত হওয়াটা খুব বেশি হয়। তাই অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় 'ভরা কোটাল'। আর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে এই আকর্ষণ মাত্রা কম হওয়ার ফলে ওইসব তিথিতে নদী বা সমুদ্রে 'মরাকোটাল'। চন্দ্র ভাদ্র মাসে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে বলেই তার আকর্ষণের মাত্রাও বছরের অন্য সব মাসের চেয়ে অনেক বেশি হয়। ফলে, ওই সময় জোয়ারের মাত্রা বা কোটালও সর্বোচ্চ মাত্রা পায়। প্রতি ভাদ্রমাসেই এই ঘটনা ঘটে এবং জোয়ারের পরিমাণও বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় সবচেয়ে বেশি হয়। এমনকি শুক্লপক্ষের রাত্রিতে ফোটা নানা রকমের ছোট্ট সাদা ফুলের গন্ধ বিলানোর ঘটনার উপরও চন্দ্রের এই আকর্ষণ-প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। পৃথিবী তথা মানবজীবনের উপর চন্দ্রের এই ব্যাপক প্রভাবের কথা জেনেই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা চন্দ্রকে গ্রহ হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

চন্দ্রের কোনও বায়ুমণ্ডল নেই। ফলে, ওর পৃষ্ঠদেশে উল্কারা এসে আঘাত করে গর্ত সৃষ্টি করে। চাঁদের যে কলঙ্ক আমরা দেখি তা হল মূলত গহ্বর যেখানে সূর্যের আলো পড়ছে না। সুতরাং চন্দ্রের কলঙ্ক তথা আমদের কল্পনার 'চরকাকাটা বুড়ি' আর কিছু নয়, কতকগুলি গহ্বরের সমাহার। চাঁদকে নিয়ে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ চলছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতবর্ষ, ব্যাবিলোন, মেসোপটেমিয়া, চীন প্রভৃতি সভ্যতাগুলি চার-পাঁচ হাজার বছর আগেই চাঁদ সম্পর্কে বহু তথ্য অত্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিল। বিশেষ করে গ্রহণ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ আমাদের পৃথিবীতে যত সুন্দরভাবে দেখা যায়, এমনটা সৌরমণ্ডলের আর কোনও গ্রহে দেখা যায় না। সূর্যগ্রহণের কথা আগেই সবিস্তারে বলা হয়েছে। এখন চন্দ্রগ্রহণের কথা বলি।

চন্দ্র এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করছে। তেমনি পৃথিবী চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে আর একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। চন্দ্রের পৃথিবী-পরিক্রম পথ হল 'চন্দ্রমার্গ'। আর পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণ কক্ষপথ হল 'ক্রান্তিবৃত্তের পথ' এবং যে কক্ষতলে সে পরিক্রমারত তা হল 'ক্রান্তিবৃত্ত'। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী এলে এবং সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করলে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই তিনটিকে একই সরলরেখায় আসতে হলে এদের একই সমতলে আসতে হবে। অর্থাৎ একই সমতলে, এক সরলরেখায় আসা সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, 'চন্দ্রগ্রহণ' সৃষ্টি করে, যখন সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী এসে হাজির হয়। এই সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে দেখা যায় না, কারণ যে সূর্যের

আলোয় চন্দ্র আলোকিত সে আলো পৃথিবী আড়াল করে দেয়। ফলে, চন্দ্র থেকে সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে না এই সময়। পৃথিবীর যে দিকটায় তখন সন্ধ্যা কিংবা রাত্রি সে অঞ্চলের লোকেরা চন্দ্রকে আর স্পষ্ট দেখতে পায় না। পৃথিবীর ওই সব অঞ্চলের লোকেরা দেখে চন্দ্রগ্রহণ।

পৃথিবী এবং চন্দ্র দুটিই অস্বচ্ছ বস্তু। সূর্য নিজের আলোয় আলোকিত। মধ্য-বয়সী নক্ষত্র সে। সূর্যের সামনে পৃথিবী কিংবা চন্দ্র এলে তাদের ছায়া পড়ে মহাকাশে তাদের যেদিকে সূর্য থাকে তার বিপরীত দিকে। এই ছায়া যখন পৃথিবীর উপর কিংবা চন্দ্রের উপর পড়ে তখন গ্রহণ হয়। অর্থা . চন্দ্রের ছায়া যখন পৃথিবীর উপর পড়ে তখন পৃথিবী থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। আবার পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রের উপর পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণের জন্য পূর্ণিমা হতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণিমার দিনই পৃথিবী থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। পৃথিবীর যে দিকটায় তখন সূর্যের আলো পড়ে না সে দিকের লোকেরা তাদের পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ মাঝে মাঝে দেখতে পায়। সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ পূর্ণিমায় হয়, কিন্তু সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কেন হয় না, তা আগে বলেছি। একটু পরে আবার বলবো।

আবারো বলি, সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে একই সমতলে এবং একই সরলরেখায় পৃথিবী চলে এলে তখন 'চন্দ্রগ্রহণ' হয়। তিনটিকে একই সরলরেখায় আসতে হলে জ্যামিতিক সংজ্ঞানুসারে এদের একই সমতলে থাকতে হবে। কারণ ইউক্লীডীয় জ্যামিতি অনুসারে সরলরেখা আঁকা কেবল সমতলেই সম্ভব। সেই কারণেই সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করলেই তারা একই সমতলে আসে। এই অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়লে, চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

পৃথিবী গোলাকার। আলোকবিজ্ঞানের নিয়মে পৃথিবীর ছায়া দু'রকমের হয়। একটি ছায়া অঞ্চল হল প্রচ্ছায়া। যেখানে সূর্যের আলো কোনওভাবেই পৌঁছায় না। প্রচ্ছায়া অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে আলোক শূন্য। এর আকৃতি শঙ্কুর [Cone] মত। সরু হতে হতে একসময় তা একটি বিন্দুতে শেষ হয়। এটি ওই প্রচ্ছায়া-শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু [Apex]। যেহেতু আলোকের উৎস সূর্য, পৃথিবীর তুলনায় অনেকটাই বড়, তাই সূর্যের সামনে আসা পৃথিবীর পিছনে অর্থাৎ পৃথিবীর যে দিকে সূর্য আছে তার বিপরীতে যে প্রচ্ছায়া উৎপন্ন হয় তার আকৃতি শঙ্কুর মত হয়। পৃথিবীর এই প্রচ্ছায়া ওই শঙ্কুর শীর্ষবিন্দুতে শেষ হয়। প্রচ্ছায়া অঞ্চলে সূর্যের কোনও আলো পৌঁছায় না। এই প্রচ্ছায়ার গড় দৈর্ঘ্য 13,70,000 কিলোমিটার। আগেই বলা হয়েছে চন্দ্রও যখন সূর্যের সামনে আসে তখন সূর্য যেদিকে আছে তার বিপরীতে অনুরূপভাবে চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি হয়। সে প্রচ্ছায়াও শঙ্কু আকৃতির। তার গড় দৈর্ঘ্য 3,74,000 কিলোমিটার। যাইহোক, পৃথিবীর যেমন প্রচ্ছায়া তৈরি হয় তেমনি তার উপচ্ছায়াও তৈরি হয় ওই প্রচ্ছায়ার সঙ্গে। প্রচ্ছায়ার দু'দিকে থাকে উপচ্ছায়া। উপচ্ছায়া অঞ্চলে সূর্যের আলোর কিছুটা অংশ পৌঁছায়, বাকীটা পৌঁছায় না। চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে একই সরলরেখায় আসে অর্থাৎ সমসূত্রে এবং একই সমতলে আসে, আর সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী থাকে, তখন পৃথিবীর ওই ছায়ার অঞ্চল দিয়ে চন্দ্র পৃথিবী পরিক্রমা করে। চন্দ্র যখন পুরোপুরি প্রচ্ছায়ার মধ্য দিয়ে চলে, তখন পৃথিবী থেকে চন্দ্রের কোন অংশকেই স্পষ্ট দেখা যায় না। তখন হয় চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ বা পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। কিন্তু চন্দ্র যখন পৃথিবীর উপচ্ছায়া অঞ্চলে পুরোপুরি অবস্থান করে, তখন আকাশে চাঁদকে দেখা যায়, কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই কমে যায়। কারণ, পৃথিবীর ওই উপচ্ছায়া

অঞ্চলে সূর্যের আলোর কিছুটা পৌঁছায়, কিছুটা পৌঁছায় না। তাই উপচ্ছয়ার মধ্য দিয়ে চলার সময় চন্দ্রকে অনুজ্জ্বল দেখায়। তখন চন্দ্রের কোনও গ্রহণ হয় না। আবার চন্দ্র পৃথিবীর ওই ছায়া-অঞ্চল দিয়ে চলার সময় যখন চন্দ্রের খানিকটা প্রচ্ছায়ায় এবং বাকিটা উপচ্ছায়ায় থাকে, তখন প্রচ্ছায়ায় থাকা চন্দ্রের অংশটি থাকে অস্পষ্ট, উপচ্ছায়ায় থাকা তার বাকী অংশটি থাকে অনুজ্জ্বল। এই অবস্থা হল চন্দ্রের আংশিক গ্রহণ বা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। একে খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বা খণ্ড চন্দ্রগ্রহণও বলা হয়। চিত্র নম্বর 99 দেখলে চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।
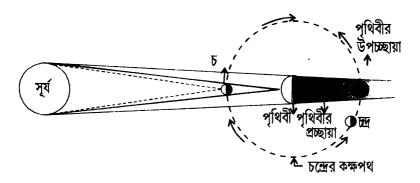
চিত্র ঃ 99

● চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অবস্থান। পৃথিবীর প্রচ্ছায়া চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার তুলনায় অনেকটাই বড়। উপরের ছবি থেকে মনে হয় যে, ক্রান্তিবৃত্তের উপরেই গ্রহণ সংঘটিত হয়। ●

99 নম্বর চিত্রে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের অবস্থান কেমন হয় তা দু'ভাবে দেখানো হয়েছে। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র এসে তার প্রচ্ছায়া ফেলেছে পৃথিবীর উপর। প্রচ্ছায়ার ঢাকা অংশ থেকে পৃথিবীর লোক দেখে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। আবার পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় যখন চন্দ্র অবস্থান করছে তখন চন্দ্রের কোন অংশই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তখন হচ্ছে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রের কিছু অংশ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় এলে তখন হয় খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্র পুরোপুরি উপচ্ছায়ায় থাকলে কোনও গ্রহণ হয় না। কিন্তু চন্দ্র আংশিকভাবে প্রচ্ছায়ায় এবং আংশিকভাবে উপচ্ছায়ায় থাকলে হয় চন্দ্রের আংশিক গ্রহণ বা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ।

পৃথিবীর আয়তন চন্দ্রের তুলনায় অনেক গুণ বড়। তাই পৃথিবীর প্রচ্ছায়া চন্দ্রের কক্ষতলের অনেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে। এই প্রচ্ছায়া অঞ্চলের ব্যাস অনেক বড় হয়। চন্দ্র অনেকটা সময় নেয় এই প্রচ্ছায়া অঞ্চল অতিক্রম করতে। ফলে, চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ অনেকটা বেশি সময় ধরেই দেখা যায়। চন্দ্রগ্রহণের সমস্ত দশা [Phase] প্রায় চার ঘন্টা ধরে চলে। চন্দ্র পৃথিবীর প্রচ্ছায়া যখন প্রথম স্পর্শ করে তখন থেকে চন্দ্রর প্রচ্ছায়া মুক্তির সময় অবধি মোট কাল পরিমাণ প্রায় চার ঘন্টা হয়। এর মধ্যে চন্দ্র পুরোপুরি প্রচ্ছায়ায় অবস্থান করতে পারে সর্বোচ্চ প্রায় 1 ঘন্টা 50 মিনিট। এটা পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের দশা বা অবস্থা। বাকী সময়টা আংশিক চন্দ্রগ্রহণের।

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ যেমন অনেকটা সময় ধরে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি পৃথিবীর অনেকটা জায়গা জুড়ে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ একই পূর্ণিমায় দেখা যায়। কোনো একটি সময়ে পুরো গোলার্ধের যে যে জায়গা থেকে পূর্ণচন্দ্র দেখা যায় তার প্রায় সবখান থেকেই চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্যমান। এই সব কারণে মানুষের কাছে

চন্দ্রগ্রহণ তেমন আকর্ষণীয় নয়, অন্ততঃ পূর্ণ সূর্যগ্রহণের মত আকর্ষণীয় মোটেই নয়। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে যেমন খুব সামান্য সময়ের জন্য সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, অন্ধকার নেমে আসে, পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণে তেমনটা হয় না। একেই তো পূর্ণচন্দ্রগ্রহণের কাল বেশ দীর্ঘ, তার উপর চন্দ্রবিম্ব আকাশ থেকে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায় না। তামাটে রংয়ের চাকতি তার গোল আকার নিয়ে আকাশে অবস্থান করছে দেখা যায়। প্রচ্ছায়া আচ্ছন্ন চন্দ্রে কোনও আলো থাকার কথা নয়, তবু নানা কারণে খুব সামান্য আলো পায় চন্দ্র। চন্দ্রবিম্ব বা চাঁদের চাকতি প্রায় অলোহীন হয়ে তামাটে রঙ নিয়ে আকাশে অবস্থান করতে থাকে। অন্ধকার ঘন হয় ঠিকই, তবে তা অমাবস্যার অন্ধকার হয় না কোনো সময়েই। সব মিলিয়ে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহেণের আকর্ষণ, রোমাঞ্চ, মনোহরণ ক্ষমতা অনেক কম। তাছাড়া পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে একটা স্যারোস চক্রে অনেকবারই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেই জায়গায় একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেলে, সেখান থেকে দ্বিতীয়বার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে অন্ততঃ 360 বছর পরে। সুতরাং কোনও লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তার সারা জীবনে একবারও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নাও দেখতে পারে, কিন্তু সে তার সারা জীবনে কয়েকটি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ অতি অবশ্যই দেখতে পাবে। যেমন, কলকাতায় শেষবার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল 1688 খ্রিস্টাব্দের 30 এপ্রিল। কলকাতা হয়তা আবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবে 2048-49 সাল নাগাদ। তার আগে নয়। ইতিমধ্যে কলকাতা বহুবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখেছে এবং আগামী 50 বছরে দেখবে আরো বহুবার। তাই পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ ততটা আকর্ষণীয় নয়, যতটা আকর্ষণীয় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ।

কোনও এক বছরে সর্বাধিক 7টি গ্রহণ হতে পার। 7টি গ্রহণ হলে তার 5টি সূর্যগ্রহণ এবং 2টি চন্দ্রগ্রহণ কিংবা 4টি সূর্যগ্রহণ এবং 3টি চন্দ্রগ্রহণ হবে। বছরে সবচেয়ে কম সংখ্যক গ্রহণ হতে পার মাত্র দুটি। যে বছর দুটি গ্রহণ হবে, সে বছর সেই গ্রহণ দুটি হবে সূর্যগ্রহণ, কোনও চন্দ্রগ্রহণ হবে না সে বছর। একটা স্যারোস চক্রে সাধারণতঃ 42টি সূর্যগ্রহণ এবং 27টি চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। আবার প্রতি 100 বছরে মোট যতগুলি গ্রহণ হয় তার প্রায় 60%-র বেশি হয় সূর্যগ্রহণ এবং বাকীটা চন্দ্রগ্রহণ, যা প্রায় 40%-এর কম। তবুও মানুষের চন্দ্রগ্রহণের প্রতি আকর্ষণ অনেক কম সূর্যগ্রহণের তুলনায়। পৃথিবীর যে সীমিত অঞ্চলে সূর্য চন্দ্রের দ্বারা ঢাকা পড়ে, কেবল সেখানেই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। এই সংকীর্ণ এলাকার, যা খুব বেশি হলে পৃথিবীর ক্ষেত্রফলের 12% কিংবা 13% এলাকা, সেই সীমানার মধ্যে খুব সামান্য অংশে দেখা যায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এবং বাকীটায় দেখা যায় আংশিক সূর্যগ্রহণ। এই ছায়াঞ্চলের নানা জায়গায় সূর্যগ্রহণের সময়টা নানারকম। তার কারণ সময় মাপের পার্থক্য কিংবা পরিবর্তন নয়। পৃথিবীর উপর দিয়ে গতিশীল চন্দ্রের প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়াও একেক জায়গাকে একেক সময় ঢেকে দেয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার গতি ঘন্টায় 1800 থেকে 8000 কিলোমিটার অবধি হতে পারে। ফলে, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ খুবই অল্পকালের জন্য খুবই কমসংখ্যক লোক দেখতে পায়। চন্দ্রগ্রহণ কিন্তু একেবারেই অন্য ব্যাপার। একটা নির্দিষ্ট সময়ে পুরো গোলার্ধের যে সব অঞ্চল থেকে পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়, সেই সব জায়গা থেকে একই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্রগ্রহেণের নানা ধাপ একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর অর্ধেকটা জুড়ে দেখা যায়। তফাৎ হয় কেবল সময়ের মাপে। সুতরাং পৃথিবীর যে অঞ্চলে পূর্ণিমা থাকে তার পুরোটা থেকেই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় একই সঙ্গে। তবে বিভিন্ন জায়গায় সময়ের মাপ ভিন্ন থাকায় সময়ের তফাৎ হয় বলে মনে হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর কোথায় সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে তা জেনে সেখান যান। কিন্তু তাঁদরে চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য তা করবার দরকার হয় না। একালের জ্যোতির্বিদরা চন্দ্রগ্রহণের প্রতি সূর্যগ্রহণের মত কোন অসাধারণ কৌতূহল অনুভব করেন না। তবে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-বিজ্ঞানীরা কি চন্দ্রগ্রহণ কি সূর্যগ্রহণ, দুই গ্রহণেই তাঁরা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। 'স্বর্ভানু' তথা রাহু-কেতুর কথা যেমন ঋগ্বেদে আছে, তেমনি তাদের কথা ছড়িয়ে আছে আমাদের শাস্ত্রে-পুরাণে। পৃথিবী গোলাকার এই ধারণার সমর্থনও তাঁরা পেয়েছিলেন গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেই। বিখ্যাত পর্যটক ম্যাগেল্লানের পৃথিবী প্রদক্ষিণে চন্দ্রগ্রহণ একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সব নাবিক যখন হতাশ, যখন তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা আর কোনও দিন মাটিতে ফিরতে পারবেন না, তখন ম্যাগেল্লানই বলেছিলেন, "চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তার আকার গোল। এখন ছায়া যদি গোল হয় তবে পৃথিবী গোল হবেই।" চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ কবে পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরের স্তরের গঠন জানা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকাকালীন চন্দ্রবিম্ব একেবারে কালো হয়ে যায় না। সে প্রচ্ছায়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কিছু সূর্যরশ্মি প্রতিসৃত এবং বিচ্ছুরিত হয়ে এসে পড়ে। ফলে, চাঁদের চাকতি বা চন্দ্রবিম্ব পুরোপুরি কালো হয়ে যায় না। পৃথিবীর আকাশে পূর্ণগ্রহণগ্রস্ত চন্দ্রকে দেখা যায় তামাটে রংয়ের চাকতি হিসাবে অস্পষ্টভাবে। এই বিশেষ সময়ে চন্দ্রের আলোর শক্তি এবং চন্দ্রের আলোর ঘনত্বের রঙ জ্যোতির্বিদদের মনে দারুণ কৌতূহল জাগায়। এ সবের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের সংখ্যার যোগ আছে। তাছাড়া সূর্যের তাপ না পেলে চন্দ্র কী হারে শীতল হতে থাকে তা মাপার জন্যও চন্দ্রগ্রহণকে কাজে লাগানো হয়। একবার চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের তাপমাত্রা 70^0 সেলসিয়াস থেকে -117^0 সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছিল। অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে যায় প্রায় 200^0 সেলসিয়াস। কিন্তু পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে মাত্র 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কারণ হিসাবে বলা হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাপ ধরে রাখতে পারে। চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নেই। তাই তার তাপ ধরে রাখার প্রশ্নই নেই। ফলে, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রে তাপমাত্রার এই প্রবল নিম্নগতি। চন্দ্র তাই দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায় চন্দ্রগ্রহণের সময়।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রে দু'ধরনের গ্রহণ দেখা যায় ঃ (1) পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ [Total Lunar Eclipse] এবং [2] আংশিক চন্দ্রগ্রহণ [Partial Lunar Eclipse]। আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর ছায়া দুরকম—প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। পৃথিবীর চারদিকে আপন কক্ষপথে পরিক্রমারত চন্দ্র যখন পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় পুরোপুরি প্রবেশ করে তখন চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ হয়। এটিই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। আবার চন্দ্রের কিছুটা অংশ যখন ওই প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করে এবং অবশিষ্ট অংশ থাকে পৃথিবীর উপচ্ছায়ায়, তখন হয় চন্দ্রের আংশিক গ্রহণ বা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। এ সময় প্রচ্ছায়ায় প্রবিষ্ঠ চন্দ্রের অংশ অস্পষ্ট হয় এবং উপচ্ছায়ায় থাকা চন্দ্রের অংশটি অনুজ্জ্বল দেখায়। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার আগের অবস্থায় আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হতে থাকে এবং এক সময় পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয় যখন চন্দ্র পুরোপুরি পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করে। চন্দ্র যতক্ষণ পুরোপুরি পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকে তখন চলে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। পৃথিবীর প্রচ্ছায়া থেকে চন্দ্র ধীরে ধীরে বের হয়ে অসতে থাকলে আবার শুরু হয় চন্দ্রের আংশিক গ্রহণ। অর্থাৎ চন্দ্রের আংশিক গ্রহণ দিয়ে গ্রহণ শুরু হয় এবং পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের দশা পেরিয়ে আবার তা আংশিক গ্রহণে ফিরে অসে। এক সময় চন্দ্রের কোনও অংশই পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকে না। তখন চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়। সুতরাং পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় চন্দ্র যখন বা যতক্ষণ পুরোপুরি থাকেততক্ষণই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। যতক্ষণ চন্দ্রের কোন

অংশ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকে ততক্ষণ আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। পৃথিবীর উপচ্ছায়ায় থাকলে চন্দ্রের কোন গ্রহণ হয় না, তাকে অনুজ্জ্বল দেখায় মাত্র।

চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ। চন্দ্র এক উপবৃত্তাকার পথে গড়ে প্রতি ঘন্টায় 3,680 কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের সবচেয়ে বেশি দূরত্ব 4,05,508 কিলোমিটার, সবচেয়ে কম দূরত্ব 3,63,300 কিলোমিটার। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে গড় দূরত্ব 3,84,000 কিলোমিটার। চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমণ কক্ষতল পৃথিবীর চন্দ্রমার্গের তল বা চন্দ্রের কক্ষতল ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে 5^0 9′ কোণ করে আছে। এই দুই তলের ছেদ বিন্দু দুটি রাহু এবং কেতু নামে খ্যাত। রাহু হল 'আরোহীপাত' [Ascending Node]। এই রাহু দিয়েই চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে গমন করে। আবার কেতু হল 'অবরোহীপাত' [Descending Node]। কেতু দিয়েই চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে আসে। সূর্য, পৃথিবী এবং চন্দ্রকে একই সরলরেখায় আসতে হলে চন্দ্রকে আসতে হবে রাহু কিংবা কেতুতে। অর্থাৎ রাহু কিংবা কেতুতে চন্দ্র এলে এবং সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী থাকলে, তখনই পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র রাহু কিংবা কেতুতে না এলে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র কেই সবলরেখায় তথা একই সমতলে আসে না, ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয় না। প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী অবস্থান করলেও প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কারণ, প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে একই সমতলে আসে না, তাই আসে না এক সরলরেখায়। ফলে, ওই সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না; সুতরাং যে সব পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের একই সরলরেখায় আসে সেই সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়। আর এই একই সরলরেখায় আসা সম্ভব হয়, যখন চন্দ্র রাহু কিংবা কেতুতে আসে। এ ব্যাপারে 99 নম্বর চিত্র দেখা যেতে পারে।

চন্দ্র পৃথিবীকে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। খুবই জটিল সে পরিক্রমা পথ। চন্দ্র আবার তার নিজের অক্ষের উপরও ঘোরে। নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করতে সময় নেয় 27.32 সৌরদিন। আবার চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় নেয় 27.32 সৌরদিন। ফলে, পৃথিবী থেকে আমরা চন্দ্রে একটা পিঠই সব সময় দেখি। চন্দ্রের উল্টো পিঠটা আমরা পৃথিবী থেকে কখনই দেখতে পাই না। চন্দ্রের যে পিঠটা পৃথিবীর দিকে ঘোরানো সে পিঠটা যখন সূর্যের আলো পায় তখন পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে দেখা যায়। ওই পিঠটা যদি সূর্যের আলো না পায়, তবে পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী আড়াল করায় চন্দ্রের ওই পৃথিবীর দিকে ফেরারো মুখটা সূর্যের আলো পায় না। ফলে, চন্দ্রগ্রহণ হয়।

চন্দ্রের কক্ষাবর্তন বেশ জটিল। গ্রহণের সঙ্গে এই কক্ষাবর্তন নানাভাবে জড়িত। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হয় চন্দ্রের অক্ষাবর্তন ও কক্ষাবর্তন গতির দ্বারা। গ্রহণের পুনরাবর্তন নিয়ম বা স্যারোস-চক্র নির্ণয় করা হয় 'চান্দ্র মাস' ও 'গ্রহণ মাস' দিয়ে। চন্দ্রের কক্ষাবর্তনজনিত মাস চার রকমের। সূর্য থেকে দেখলে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে যে সময় নেয় তা হল এক 'চান্দ্রমাস' [Synodic Month]। এক চান্দ্রমাস হল 29.530589 সৌরদিন বা 29 দিন 12 ঘন্টা 44 মিনিট 2.9 সেকেন্ড। কোনও নির্দিষ্ট নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্র একবার পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে যে সময় নেয় তা হল এক 'নাক্ষত্রমাস' [Sidereal Month]। নাক্ষত্র মাসের সময়কাল হল 27.321662 সৌরদিন বা 27 দিন 7 ঘন্টা 43 মিনিট 11.6 সেকেন্ড। আবার রাহু বা কেতু থেকে যাত্রা করে চন্দ্র আবার রাহু কিংবা কেতুতে ফিরে আসতে যে সময় নেয় তা হল এক 'গ্রহণ মাস' [Draconic Month]। এই গ্রহণ মাসের সময়কাল হল 27.212221 সৌরদিন বা 27 দিন 5

ঘন্টা 5 মিনিট 36 সেকেন্ড। আবার চন্দ্র তার কক্ষপথের অনুভূ [Perigee] বিন্দু অতিক্রম করে পুনরায় অনুভূ বিন্দুতে ফিরে আসতে যে সময় নেয় তা হল এক 'ব্যতিক্রমী মাস' [Anomalistic Month]। এই সময়টা হল 27.554550 সৌরদিন বা 27 দিন 13 ঘন্টা 18 মিনিট 33 সেকেন্ড। এই চান্দ্রমাস ও গ্রহণমাস তুলনা করে স্যারোস চক্রের হিসাবটা বেরিয়ে অসে। গ্রহণের পুনরাবর্তন কাল বা এক স্যারোসচক্র হল 6585.32 দিন বা সৌরদিন। এই সময়টা 18 বছর 11.32 দিন হয় যদি ওই সময়ে চারটি অধিবর্ষ [Leap Year] পড়ে। আবার এই সময়টা 18 বছর 10.32 দিন হয় যদি ওই স্যারোসচক্রে পাঁচটি অধিবর্ষ পড়ে। চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ উভয় গ্রহণেরই পুনরাবর্তন নিয়ম এই স্যারোস চক্র অনুসারী।

অনেক সময় দেখা যায়, পৃথিবীর এক দিগন্তে সূর্য এবং অন্য দিগন্তে গ্রহণগ্রস্ত তামাটে রংয়ের অস্পষ্ট চন্দ্রবিম্ব বা চন্দ্রের চাকতি। এই ঘটনা খুব কম ঘটলেও, বিরল নয়। এই রকম চন্দ্রগ্রহণ মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে, এই রকম চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পৃথিবী সূর্যকে আড়াল করছে না, তবু চন্দ্রের গ্রহণ হয় কেমন করে। বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঘটেও থাকে। আসলে, পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোর প্রতিসরণ ঘটে এবং তার পথচ্যুতি হয়। ফলে, বাস্তবে গ্রহণগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্যকে একই সঙ্গে পৃথিবীর দিকচক্রবালের দু'দিকে আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে, চন্দ্র তখন দিকচক্রবালের নীচে এবং সূর্যও তখন দিকচক্রবালের নীচেই অবস্থান করে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আলোর প্রতিসরণের কারণে তাদের আমরা দিকচক্রবালের উপরেই দেখি। অলোর এই আবহ-প্রতিসরণের ফলে আমরা আকশের সব জ্যোতিষ্ককেই তাদের সত্যিকারের অবস্থানের চেয়ে কিছুটা উপরেই দেখি। বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণের কারণেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে সময় প্রায় চার মিনিট বেড়ে যায়। সূর্যোদয়ের সময় সূর্য প্রায় দু'মিনিট অগেই দিকচক্রবালের উপরে চলে আসে বলে মনে হয়। তেমনি সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রকৃতপক্ষে দিকচক্রবাল অতিক্রম করে নীচে চলে গেলেও প্রায় দু'মিনিট ধরে সূর্যকে দিকচক্রবালের উপরেই দেখা যায়। দিনমান এভাবে মোট প্রায় চার মিনিট বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের অলোর প্রতিসরণের ফলেই এমনটা হয়। এই কারণেই গ্রহণগ্রস্ত চন্দ্র পৃথিবীর দিকচক্রবালের নীচে অবস্থান করলেও তাকে দিকচক্রবালের উপরে দেখা যায়। আবার সূর্য দিকচক্রবালের নীচে থাকলেও তাকেও দিকচক্রবালের উপরেই দেখা যায় ওই প্রতিসরণের কারণে। ফলে, একই সঙ্গে পৃথিবীর দিগন্তে একদিকে সূর্য ও অন্যদিকে গ্রহণগ্রস্ত চন্দ্র দেখা সম্ভব হয়। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল না থাকলে এই ঘটনা ঘটতো না।

পৃথিবীতে যেমন আমরা গ্রহণ দেখে থাকি, চাঁদ থেকেও আমরা তেমনি গ্রহণ দেখতে পারি। চন্দ্রের আকাশে দু'রকমের গ্রহণ হতে পারে এবং তা হয়ও। শুধু সেখানে এখন গ্রহণ দেখার লোক নেই। কিছুকাল পরে চন্দ্রে বসতি স্থাপন করলে তখন আমরা চাঁদের আকাশে গ্রহণ দেখতে পারবো। চন্দ্রের আকাশে দু'রকমের গ্রহণ হয়—সৌর এবং পার্থিব। অর্থাৎ চন্দ্রের আকশে সূর্যগ্রহণ এবং পৃথিবীর গ্রহণ দেখা যায়। পৃথিবী থেকে আমরা যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখি তখন চন্দ্র পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকে। চন্দ্রের আকাশ থেকে তখন সূর্যকে দেখা যায় না, কারণ পৃথিবী সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে দেয়। তখন চন্দ্র থেকে দেখা যায় সূর্যগ্রহণ। চন্দ্রের যতটা অংশ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকে ততটা অংশ থেকেই সূর্যকে দেখা যায় না পুরোপুরিভাবেই। চন্দ্রের ওই পৃথিবীর প্রচ্ছায়াগ্রস্ত অঞ্চল থেকে দেখা যায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। চন্দ্র পুরোপুরি পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় চলে গেলে চন্দ্রের যে পিঠটা পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে, পুরো সেই পিঠটা থেকে দেখা যায় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে তখন দেখায়

লালচে ফিতা দিয়ে ঘেরা একটা কালো চাকতি। এই লালচে ফিতাটা হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের অলো প্রতিফলিত, প্রতিসৃত ও বিচ্ছুরিত হয়ে কিছুটা চন্দ্রে পৌঁছায়। যার জন্য পৃথিবী থেকে পূর্ণগ্রহণগ্রস্ত চন্দ্রকে তামাটে রঙের চাকতির মত দেখায় পৃথিবীর আকাশে। চন্দ্রে তাই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ও কিছুটা অলো থাকে। চন্দ্রে আসা সে আলো তামাটে এবং তার পরিমাণ খুবই সামান্য। যাইহোক, চন্দ্রের যে অংশটা পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় থাকে সেই সব অঞ্চল থেকে চন্দ্রের আকাশে দেখা যায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। চন্দ্র পুরোটাই পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় এলে চন্দ্রের পুরো অঞ্চল থেকেই দেখতে পাওয়া যায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। সুতরাং চন্দ্রের আকাশে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর মত কয়েক মিনিটের ব্যাপার নয়, কয়েক ঘন্টার ব্যাপার হয় সেটা। চন্দ্র পৃথিবীর উপচ্ছায়ায় থাকলে আমরা কোনও গ্রহণ দেখি না। কিন্তু চন্দ্র থেকে সে সময় দেখা যায় আংশিক সূর্যগ্রহণ। কারণ, পৃথিবী তখন চন্দ্রের আকাশে সূর্যকে আংশিক আড়াল করে। ফলে, চন্দ্রের আকশে সে সময় দেখা যায় আংশিক সূর্যগ্রহণ।

চন্দ্রের আকাশে আরেকটা গ্রহণ দেখা যায়। তা হল 'পৃথিবী'র গ্রহণ। এই গ্রহণ এতোটাই সামান্য যে তাকে গ্রহণ বলা যাবে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। এ গ্রহণ চন্দ্রের আকাশে দেখা যায়, পৃথিবীতে যখন দেখা যায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া তখন পৃথিবীতে পড়ে। চন্দ্রের আকাশে তখন দেখা যায় পৃথিবীর বিরাট চাকতিটার গায় চন্দ্রের প্রচ্ছায়া বৃত্তাকার সরু ফিতার মত আকার নিয়ে সঞ্চরমান। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া শঙ্কু পৃথিবীর চাকতির যে অংশটুকুর উপর দিয়ে যায় চন্দ্রের আকাশে পৃথিবীর চাকতির সেই অংশটুকু কালো দেখায়। পৃথিবীর যে সব জায়গা থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়, চন্দ্রের আকাশে পৃথিবীর চাকতির সেই সব অঞ্চল কালো বা ছায়াচ্ছন্ন দেখায়। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া বিস্তারে কখনই 262 কিলোমিটারের বেশি হয় না। এই বিস্তার বিশাল পৃথিবীব তুলনায় খুবই সামান্য। চন্দ্রের আকাশে পৃথিবীর চাকতির উপর এই ছায়া সরু ফিতের মতই লাগে। এই প্রচ্ছায়াও গতিশীল। পৃথিবীর চাকতির উপর ওই বাঁকা কালো দাগও গতিশীল দেখায়। এটা চন্দ্রের আকাশে পৃথিবীর গ্রহণ। তবে এই ঘটনাকে ঠিক গ্রহণ বলা যাবে কিনা তা ভাবনার বিষয়।

সূর্যগ্রহণের মতো গ্রহণ সৌর জগতের অন্য কোন গ্রহ থেকে দেখা যায় না, কেবল পৃথিবীতে ছাড়া। তার কারণ, সূর্য ও আমাদের পৃথিবীর মাঝখানে যে চন্দ্র এসে পড়ে তার ব্যাস সূর্যের চেয়ে যতগুণ ছোট, পৃথিবী থেকে সে চাঁদ সূর্যের তুলনায় ঠিক তত গুণ কাছে আসে। অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের যত গুণ, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্বের তত গুণ। এমন ঘটনা আর কোনও গ্রহের বেলায় ঘটে না। সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র পৃথিবীর ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটে এবং আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যগ্রহণ দেখতে পাই। চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে অবশ্য এ সমস্যা নেই। সৌর-মণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহদের ক্ষেত্রে চন্দ্রগ্রহণের অনুরূপ গ্রহণ ঘটতে পারে। মনে রাখতে হবে, চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় 400.7 গুণ হল সূর্যের ব্যাস। আবার পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় যতটা থাকে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সে সময় তার প্রায় 400 গুণ থাকে। ফলে, ছোট্ট চাঁদ পৃথিবীর কিছু দর্শকের কাছে সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে দিতে পারে এবং পৃথিবীর ওই সব অঞ্চল থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্রগ্রহণের বেলায় এমন ধরনের সমস্যা নেই। কারণ, পৃথিবী চন্দ্রের তুলনায় অনেক বড় হওয়ায় পৃথিবীর প্রচ্ছায়া বিশাল আয়তনের হয় এবং তা চন্দ্রকে বহুক্ষণ ঢেকে রাখতে পারে। ফলে, আমরা বহু সময় ধরে চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাই।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানুষ এখন চাঁদে যাতায়াত করতে পেরেছে। বহু কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে পাড়ি জমাচ্ছে চাঁদে। 1957 সালে স্পুটনিক [Sputnik] মহাকাশযান দিয়ে মহাকাশ যাত্রার

শুরু রাশিয়ার হাত ধরে। আমেরিকা 1969 সালের 20শে জুলাই নীল আর্মস্ট্রং এবং এড্উইন অলড্রিনদের চাঁদে নামাল, সম্পন্ন হল মানুষের চন্দ্রবিজয়। আমেরিকা যেমন অ্যাপোলো নাম দিয়ে এককুড়ি খানেক মহাকাশযান পাঠিয়েছে চাঁদের তথ্য সংগ্রহে, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন 'লুনা' নামের 25-30টি মহাকাশযান পাঠিয়েছে চান্দ্র গবেষণায়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্যাণে চাঁদের প্রায় সব তথ্যই আমদের জানা। চাঁদমামার খুঁটিনাটি এখন আমরা প্রায় সবই জানি।

চাঁদকে নিয়ে গবেষণার শুরু অন্ততঃ হাজার পাঁচেক বছর আগে। হরপ্পা সভ্যতা, মেসোপটোমিয়া ও মায়া সভ্যতার লোকজনেরা চাঁদের অনেক সঠিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতো। আর জানতো বলেই তার গ্রহণের 'স্যারোস' [Saros], চান্দ্রকল্প এসব অঙ্ক কষে বের করেছিল । প্রাচীন ভারতীয়রা সে সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে প্রবল ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল তা আজও তুলনাহীন। চন্দ্র পর্যবেক্ষণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে বহুকালের। হাজার চারেক বছরের পুরাতন ঋগ্বেদে গ্রহণের কথা আছে, রাহু-কেতুর কথা আছে, মলমাস বা অধিমাসের কথা আছে। এগুলির সঠিক হিসাব করতে হলে চন্দ্রের গতিবিধি ইত্যাদির সঠিক হিসাব অতি অবশ্যই জানতে হত। ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের নানা তথ্যের মান অত্যন্ত নিখুঁতভাবে হিসাব করতে পেরেছিল। একালে চন্দ্রাভিযানের বিশাল ইতিহাস তৈরি হয়েছে। ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্রাভিযানে না গিয়েও পৃথিবীতে বসেই যে সব চান্দ্র-তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছিল তা বিস্ময়করভাবে নির্ভুল।

এখনকার চন্দ্রাভিযানের মোটামুটি দুটো উদ্দেশ্য। একটা হল, চাঁদে বসতি স্থাপন করা সম্ভব কিনা যাতে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক হয়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শ জায়গা। তাই এখানে মানমন্দির বসিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা হবে খুবই আদর্শের। বিশেষ করে চাঁদের মেরুতে এ ধরনের একটা মানমন্দির হয়তো অদূর ভবিষ্যতে স্থাপিত হবে।

চন্দ্রকে নিয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। চন্দ্রকে ফলিত জ্যোতিষের গণনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের 27টি নক্ষত্র পৌরাণিক কাহিনীতে হয়েছে চন্দ্রের 27জন পত্নী। আবার বৃহস্পতি পত্নী তারার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে জন্মেছে বুধ। এইসব কাহিনীর রূপকের মোড়ক খুলতে পারলে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য বেরিয়ে আসে। আমরা কয়েক হাজার বছর ধরে জানি চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সূর্যের আলোতে অলোকিত হয়। গ্রহণ হতে হলে চন্দ্রকে রাহু কেতুতে আসতে হয়। এ নিয়েও সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী আছে, যে কাহিনী বলা হয়েছে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে।

আমাদের সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে অনেক কথা বলা হল। এখানের ধূমকেতু, উল্কা ও গ্রহাণুদের কথা বলার অগে এই সৌরমণ্ডলের বাইরে থাকা কিছু গ্রহের কথা বলে নেওয়া যাক। বহুবারই বলেছি, আমদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে দশহাজার কোটি নক্ষত্র আছে। এর ব্যাস এক লক্ষ আলোকবর্ষ। এতে আমাদের সৌরমণ্ডলের অনুরূপ হাজারো সৌরমণ্ডল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'গ্রীনব্যাংক সূত্র' [Green Bank Formula] স্মরণযোগ্য। এই সূত্রের মোদ্দা বক্তব্য হল, মানুষ বিশ্বে মোটেই নিঃসঙ্গ জীব নয়। আমরা মনে করি, মানুষ আজও নিঃসঙ্গ জীব। কিন্তু 1961 সালে তৈরি 'গ্রীনব্যাংক ফরমূলা' অনুসারে, মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে বলে অনুমান করা হয়। মানুষ তাই নিঃসঙ্গ নয়। আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডেই অমাদের মত বা আমদের চেয়েও উন্নত সভ্যতার মানুষ আছে, যাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা এখন আমরা শুরু করেছি। মানুষের

এইসব প্রতিবেশীরা এতো দূরে দূরে আছে যে তাদের নাগাল পেতে মানুষকে আরও বেশ কিছু বছর কাটাতে হবে এবং উন্নততর মহাকাশযান তৈরি করতে হবে। এখনকার বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতেই একমাত্র মানুষ বা জীবন আছে তা নয়, এই রকম আরও বহু গ্রহে জীবন আছে এবং আমাদের চেয়েও উন্নততর সভ্যতার পত্তন হয়েছে তার কোন কোনটাতে। এই রকম গ্রহগুলির কিছু আছে আমাদের গ্যালাক্সীতেই। আবার বেশ কিছু অন্যান্য গ্যালাক্সীর অন্তর্গত। 'গ্রীনব্যাংক ফরমূলা' বলছে ঃ

$$N = R_{+}f_{p}n_{e}f_{i}f_{l}f_{e}L$$

যেখানে

N = পৃথিবীর মত উন্নত কিংবা আরও উন্নততর সভ্যতাযুক্ত গ্রহের সংখ্যা,

R_{+} = আমাদের সূর্যের আকারের সমস্ত নতুন তারার গড় সংখ্যা,

f_p = প্রাণী থাকা সম্ভব, এমন তারার সমষ্টি,

n_e = ইকোস্ফীয়ারে আবর্তনরত গ্রহের গড় সংখ্যা, যেখানে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান,

f_i = যেখান জীবের সত্যিই উন্নতি হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা,

f_l = যে সব গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরা তাদের সূর্যের আয়ুষ্কালের মধ্যে আপন ক্ষমতাবলে বাস করেছে তাদের সংখ্যা,

f_c = যে সব গ্রহে বুদ্ধিমান জীবেরা ইতিমধ্যেই একটা প্রযুক্তি-সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তার সংখ্যা,

L = একটা সভ্যতার আয়ুষ্কাল, কারণ যে সব সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী, কেবল তারাই মহাবিশ্বের দুস্তর দূরত্ব অতিক্রম করে অন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ।

এই সূত্রে প্রত্যেকটি 'function'-এর জন্য ন্যূনতম সংখ্যাটি ধরলে N = 40 হয়। আর স্বীকার্য গরিষ্ঠ সংখ্যা ধরলে N = 50,000,000। সুতরাং কমপক্ষে 40টি এবং খুব বেশি হলে পাঁচ কোটি অজানা সভ্যতা এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে যেখানে মানুষ আছে, অনেকটা আমাদের মত মানুষ।

অর্থাৎ জীবন এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। মানুষ তার নিজের গ্রহের বাইরে জীবনের অস্তিত্ব আজও খুঁজে পায় নি। না পাওয়ার কারণ সে তার নিজের সৌরমণ্ডলের বাইরে আজও যেতে পারে নি। চেষ্টা চলছে। আরও বেশ কিছু বছর লাগবে নিজের নিকটতম প্রতিবেশীকে খুঁজে বের করতে।

আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে এ যাবৎ প্রায় 220টির মতো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের কোনওটি অত্যধিক উষ্ণ, কোনটি আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কেউ কেউ আবার বরফের চাদরে মোড়া। অতি সম্প্রতি [এপ্রিল, 2007] একটা নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, যার ধবণ-ধারণ অনেকটাই পৃথিবী গ্রহের মত। ইউরোপীয়ান সাদার্ন অবজারভেটরির এগারো জন গবেষক দাবী করেছেন এর আগে পৃথিবীর সঙ্গে এতোটা সাদৃশ্যসম্পন্ন গ্রহ আর আবিষ্কৃত হয় নি। এই গ্রহটির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম 581-C। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 20 আলোকবর্ষ, অর্থাৎ $9.46 \times 20 \times 10^{12}$ কিলোমিটার বা 189.2×10^{12} কিলোমিটার বা মোটামুটি 189 লক্ষ কোটি কিলোমিটার। 581-C যে সূর্যকে পরিক্রমা করে সেটি একটি লাল বামন তারা [Red Dwarf Star]। সূর্যের নাম 'গ্লিসে-581'। এটির খুব কাছেই গ্রহটি অবস্থিত। তাই মাত্র 13 দিনে সে তার সূর্যকে একবার পাক খেয়ে নেয়। অর্থাৎ 581-সির বছর হয় পার্থিব তেরো দিনে মাত্র। 581-সি সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে ঃ

[1] 581-সির অভিকর্ষ ঃ 1.6 × পৃথিবীর অভিকর্ষ

[2] এর ভর ঃ 5 × পৃথিবীর ভর

[3] এর ব্যাস ঃ 1.5 × পৃথিবীর ব্যাস

[4] আবহাওয়া ঃ পৃথিবীর সঙ্গে 581-সির আবহাওয়ামণ্ডলের বহু মিল। প্রচুর জল থাকার সম্ভাবনা আছে।

[5] পৃষ্ঠদেশের তাপমান ঃ 0^0 থেকে 40^0 সেলসিয়াস।

সব দেখেশুনে বিজ্ঞানীর এই গ্রহটির নাম দিয়েছেন 'সুপার আর্থ' [Super Earth]। 'গ্লিসে-581' সূর্যটির আকার আমাদের সূর্যের চেয়ে ছোট, তাপমাত্রাও কম। এই সূর্যটি আমাদের সূর্যের থেকে বেশি দিন বাঁচবে কারণ তার নক্ষত্র জীবন সবে শুরু হয়েছে। মোট তিনটি গ্রহ ওই 'গ্লিসে-581' সূর্যটিকে পরিক্রমা করছে। এদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট নিজস্ব কক্ষপথ আছে। লাল সূর্যের তাপমাত্রা কম হওয়ায় 581-সিয়ের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ—অত্যন্ত মনোরম থাকে সারা বছরই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই আবহাওয়ার জন্য ওই গ্রহে প্রচুর জল থাকবে। এমনকি জল আছে বলেই ওখানে প্রাণের অস্তিত্বও অসম্ভব নয়। কারণ জলই জীবন। এই গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ পাহাড়-পর্বত ভরা, সমুদ্র মোড়া—এমনটা অনুমান করছেন স্টেফানি উদরির মত গবেষক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। জল বা প্রাণ যাই থাক না কেন 20 আলোকবর্ষের ওই বিশাল দূরত্ব, যা 189 লক্ষ কোটি মাইল, তা পার হয়ে মানুষ কোনও দিন 581-সিতে পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা অসম্ভব।

• গ্রহাণুপুঞ্জ [Asteroids] •

1801 খ্রিস্টাব্দে ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিউসেপ পিয়াজি [Giuseppe Piazzi] পালের্মো [Palermo] শহরে বসে প্রথম গ্রহাণু আবিষ্কার করেন তাঁর দূরবীনে। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি একটা ধূমকেতু দেখেছেন। এই পর্যবেক্ষণ দিনটি ছিল 1লা জানুয়ারী, 1801 খ্রিস্টাব্দ। তিনি অসুস্থ থাকায় এটিকে আবার পর্যবেক্ষণ করতে পারেন 11ই ফেব্রুয়ারী। দেখা গেল, এটি মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে সূর্য পরিক্রমা করছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। জানা গেল, এটি ধূমকেতু নয়, এটি একটি গ্রহাণু। পিয়াজির দেখা ওই গ্রহাণুটি 1802 সালের 1লা জানুয়ারী আবার দেখলেন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ ভন জ্যাক [Franz von Zach]। এই গ্রহাণুটির নাম দেওয়া হল 'সেরেস' [Ceres]। 'সেরেস' হলেন রোমক শস্য-দেবতা এবং ইতালির সিসিলিতে এই দেবতা ওই সময় খুবই প্রভাবশালী দেবতা হিসাবে গণ্য হতেন। তাঁরই নামে এই গ্রহাণুটির নাম রাখা হল 'সেরেস'।

আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্ততঃ 50,000 জানা গ্রহাণু বা ক্ষুদ্র গ্রহ অবস্থান করছে। এরা মুখ্যতঃ রয়েছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানের অঞ্চলে। এরা প্রত্যেকেই সূর্যকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে। এদের মধ্যে সেরেসই সবচেয়ে বড়। এর ব্যাস প্রায় 786 কিলোমিটার [488 মাইল]। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রহাণুই খুব ছোট আকারের। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। তবে, ভেস্টা [Vesta] নামের একটি গ্রহাণু আছে যেটিকে সেরেসের মত দেখা সম্ভব। গ্রহাণুগুলি প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য পরিক্রমা করে। এদের আকার নির্ণয় করা হয় এদের উজ্জ্বলতা দূরবীনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অবস্থিত এই গ্রহাণুপুঞ্জ সম্ভবত একটা আস্ত গ্রহ ছিল, একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে। কোনও কারণে ওই গ্রহটি চূর্ণ হয়ে যায় এবং সৃষ্টি করে এই গ্রহাণুপুঞ্জ। এই

কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রহাণুর তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও সংখ্যা এবং সাময়িক অভিধা	আবিষ্কারের বছর	আবিষ্কারক	ব্যাস [মাইল]	সূর্য পরিক্রমাকাল [পার্থিব বছর]	ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে নতি [ডিগ্রি]	মন্তব্য
1.	সেরেস [1] [Ceres (1)]	1801	পিয়াজি [Piazzi]	593	4.60	10.6	সবচেয়ে বড় গ্রহাণু, সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত।
2.	প্যালাস [2] [Pallas (2)]	1802	ওলবার্স [Olbers]	348	4.62	34.8	ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে অস্বাভাবিক নতি।
3.	জুনো [3] [Juno (3)]	1804	হার্ডিং [Harding]	118	4.37	13.0	চারটি বড় গ্রহাণুর একটি, চাকতির মত দেখায় দূরবীনে।
4.	ভেস্টা [4] [Vest (4)]	1807	ওলবার্স [Olbers]	248	3.63	7.13	এটিকেই একমাত্র খালি চোখে দেখা যায়।
5.	অ্যাস্ট্রিয়া [Astraea]	1845	হেঙ্কে [Hencke]	—	4.13	5.33	প্রথম গ্রহাণু যার আবিষ্কারক একজন শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
6.	ব্রুসিয়া [323] [Brusia-323 (5)]	1891	উলফ [Wolf]	—	3.68	24.2	প্রথম গ্রহাণু যেটি ছবি থেকে আবিষ্কৃত।
7.	এরোস [433] [Eros (433)]	1898	কার্লোইস ও উইট [Charlois &Witt]	20	1.76	10.8	সূর্যের দূরত্ব মাপতে ব্যবহৃত হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রহাণুর তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও সংখ্যা এবং সাময়িক অভিধা	আবিষ্কারের বছর	আবিষ্কারক	ব্যাস [মাইল]	সূর্য পরিক্রমাকাল [পার্থিব বছর]	ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে নতি [ডিগ্রি]	মন্তব্য
8.	অ্যাকিলিস [588] [Achilles (588)]	1904	উলফ [Wolf]	35	11.98	10.3	ট্রয়-গোষ্ঠীর প্রথম গ্রহাণু।
9.	হিডালগো [944] [Hidalgo (944)]	1924	বাডে [Baade]	15-30	13.9	42.5	সবচেয়ে বেশি পরিক্রমণ সময় নেয়। অপসুর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি।
10.	ফিওডোসিয়া [1048] [Feodosia (1048)]	1924	রেইনমাথ [Reinmuth]	—	4.52	53.8	সবচেয়ে বেশি নতি ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে।
11.	অ্যামর [1221] [Amor (1221)]	1932	ডেলপোর্ট [Delporte]	3(?)	2.67	11.9	পৃথিবীর এক কোটি মাইলের মধ্যে চলে আসে।
12.	অ্যাপোলো [1932HA] [Appollo (1932HA)]	1932	রেইনমাথ [Reinmuth]	2(?)	1.81	6.4	পৃথিবী ও শুক্রের কক্ষপথের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে।
13.	অ্যাডোনিস [1936CA] [Adonis (1936CA)]	1936	ডেলপোর্ট [Delporte]	1(?)	2.76	1.5	এর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা খুব বেশি অন্যদেয় তুলনায়।
14.	হার্মিস [1937UB] [Hermes (1937UB)]	1937	রেইনমাথ [Reinmuth]	1(?)	1.47	6.2	1937 সালে এটি পৃথিবীর মাত্র 4,75,000 মাইল দূরে এসেছিল।
15.	আইক্যারাস [1566] [Icarus (1566)]	1949	বাডে [Baade]	1(?)	1.12	23	এর কক্ষপথের উকেন্দ্রিকতা [0.828] গ্রহাণুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম সময়ে সূর্য পরিক্রমা সারে।

তালিকা ঃ 22

গ্রহাণুপুঞ্জের গড় ঘনত্ব 3.3 গ্রাম/ঘন সেমি। এটি চাঁদের গড় ঘনত্বের প্রায় সমান। গ্রহাণুপুঞ্জের মোট ভর চাঁদের ভরের প্রায় 10%।

বেশির ভাগ গ্রহাণুই প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য পরিক্রমা সারে। তবে এরোস [Eros] এবং আইক্যারাস [Icarus] নামের দুটি গ্রহাণুর কক্ষপথ খুবই উৎকেন্দ্রিক। এরোস পৃথিবীর 2 কোটি 25 লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে যায়। আর আইক্যারাস যায় 64 লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে। এদের পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আন্তর্গ্রহ দূরত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং পূর্বের মানগুলি মিলিয়ে নিয়ে প্রয়োজনে সংশোধন করেন।

1894 এবং 1895 সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী এড্ওয়ার্ড ই. বার্নার্ড [Edward E. Barnard] গ্রহাণুপুঞ্জের গ্রহাণুগুলির আকার মাপতে শুরু করেন। এই সব মাপজোক থেকে প্রমাণ হয়, সেরেসই সব চেয়ে বড় আকারের গ্রহাণু। এই গ্রহাণুপুঞ্জের উৎপন্ন হওয়া নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আজও করা যায় নি। এখন আবার কেউ কেউ বলছেন [Ernest J. Opik], মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে আটকে গিয়েছিল কোনও ধূমকেতু মহাকর্ষের প্রভাবে। তার জলীয় অংশ উবে যাওয়ার পরই সৃষ্টি হয়েছে ওই গ্রহাণুপুঞ্জের।

আবারও বলি, আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবর্তী স্থানে। গ্রহাণুরাও সূর্য পরিক্রমা করে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। এদের সংখ্যা প্রায় 50,000। উপরের তালিকায় মাত্র পনেরোটি গ্রহাণুর বিবরণ দেওয়া হল। এদের আয়তন তুলনামূলকভাবে বেশ কিছুটা বড়। বহু ক্ষুদ্র গ্রহাণু আছে ওই গ্রহাণুপুঞ্জে। কিছু কিছু গ্রহাণু মহাকর্ষের প্রভাবে মঙ্গল গ্রহে এবং আমাদের চাঁদে এসে আঘাত করে। এর ফলে চাঁদের এবং মঙ্গলের গাত্রে বহু গর্ত তৈরি হয়েছে।

● উল্কা [Meteors] ●

আমরা সকলেই কম বেশি উল্কাপাত দেখেছি। উল্কা আমাদের সৌরমণ্ডলেরই সদস্য। এদের গতি-প্রকৃতি অনেকটা ধূমকেতুদের মতো। তবে এরা পৃথিবীর দিকে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে এরা ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সামান্য কিছু বড় আকারের উল্কা সবটা পোড়ার আগেই পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়ে। এদের গতি, ঔজ্জ্বল্য এবং দিক দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এদের অধিকাংশেরই ঘনত্ব কম। এগুলি সম্ভবত বরফ দিয়ে নির্মিত। এরা ধূমকেতুদের মত কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমা করে। উল্কাদের যে অবশিষ্টাংশ পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে তারা সাধারণতঃ দু'ধরনের—পাথরের তৈরি উল্কা এবং বেশিটাই লোহা দিয়ে তৈরি দ্বিতীয় ধরনের উল্কা। যে উল্কার দেহে লোহার পরিমাণ বেশি সেগুলি সম্ভবত গ্রহাণু ছিল। পথভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফাঁদে পড়ে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। অবশিষ্ট কিছু থাকলে পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়ে—সৃষ্টি করে গভীর গর্ত, বিশাল খাদ। এই রকম একটা বিশাল, খাদ বা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে অ্যারিজোনায়। বিশাল এক উল্কা, সম্ভবত সেটি আয়তনে গ্রহাণু সেরেসের মতই ছিল, তার অবশিষ্টাংশ ওখানে এসে আছড়ে পড়ে ওই বিশাল গর্ত তৈরি করেছে। এই গর্তের আকার আয়তনের কথায় একটু পরেই আসছি। [চিত্র 100 দেখুন]।

গত 20 কোটি বছরে সারা পৃথিবী জুড়ে উল্কার অঘাতে যতগুলি গর্ত বা গহ্বর তৈরি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা তাদের 120 টিরও বেশি খুঁজে বের করতে পেরেছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগেরই

বয়স 20 কোটি বছর কিংবা তার কম। তবে এর চেয়ে বেশি বয়সের গহ্বরও আবিষ্কৃত হয়েছে। কানাডার ওন্টারিও [Ontario]-র সাডবারি [Sudbury]-তে একটা গহ্বর তৈরি হয়েছে উল্কাপাতে যার ব্যাস 145 কিলোমিটার [90 Miles]। এই গর্ত প্রায় 180 কোটি বছরের পুরাতন। এই রকম প্রাচীন আরেকটা গহ্বর হল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রেদেফোর্ট [Vredefort] গহ্বর। কিউবেকের ম্যানিকোউয়াগান [Manicouagan] হ্রদটির বয়স প্রায় 21 কোটি বছর। বৃষ্টির জলে ভর্তি হয়ে এর ব্যাস এখন 74 কিলোমিটার। এই হ্রদটি তৈরি হয়েছে একটা উল্কার আঘাতে। হিসাব করলে দাঁড়ায় যে, উল্কার যে অবশিষ্টাংশটি পৃথিবীকে আঘাত করেছিল তার ব্যাস ছিল নিদেন পক্ষে তিন কিলোমিটার।

100 নম্বর চিত্রটি 'অ্যারিজোনা গহ্বর' [Arizona Crater]-এর ছবি। এই খাদের বয়স 30,000 বছর মাত্র। এটি তৈরি করেছে একটি লৌহদেহী উল্কা যার অবশিষ্টাংশের ব্যাস ছিল প্রায় 60 মিটার [200 ফুট]। এই খাদের নাম হল 'ব্যারিংগার গহ্বর' [Barringer Crater]। এর চলতি নাম অবশ্য 'উল্কা গহ্বর' [Meteor Crater]। এই গর্তটি সৃষ্টি হয়েছে অ্যারিজোনার মরুভূমিতে। যে উল্কাটি এখানে পড়েছিল তার গতি ছিল এক সেকেন্ডে 15 কিলোমিটার। বাটির আকারের গর্তটির চারিধারে মাটি উঁচু হয়ে দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে প্রায় 100 থেকে 150 ফুট উঁচু। এই গর্তটির মুখ প্রায় 1,200 মিটার [4,000 ফুট] চওড়া, এর তলদেশের গভীরতা প্রায় 170 মিটার [560 ফুট]।

একটা উল্কা, যার ভর 100 টনেরও বেশি এবং যে সেকেন্ডে 25 কিলোমিটার গতিবেগসম্পন্ন, যখন ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে তখন সংঘর্ষ স্থলে চাপ হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের দশ লক্ষ গুণেরও [10^6 bar] বেশি এবং উষ্ণতা হয় কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে, ওই উল্কা ও ভূ-পৃষ্ঠের ওই অংশ তাপের চোটে বাষ্পীভূত হয়। উল্কার দেহাবশেষের ঢিবি পাওয়া যায় সংঘর্ষের আগে টুকরো হওয়ার জায়গায়। ব্যারিংগার খাতটিতে উল্কার কোনও দেহাবশেষ পাওয়া না গেলেও এই খাতের চারিদিকে 10 কিলোমিটার ব্যাসার্ধে টন টন [Tonne] নিকেল-লোহার ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে। উল্কাটি গলে গিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে যায় সংঘর্ষের ওই প্রবল চাপ ও তাপে। এখন যে সব উল্কার দেহাবশিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে তারা আকারে বেশ ছোট ও তাদের ভরও বেশ কম। কিন্তু প্রাচীনকালের উল্কাদের দেহাবশেষ যারা পৃথিবীতে খাদ বা গহ্বর সৃষ্টি করেছে তাদের আয়তন ও ভর তুলনামূলকভাবে বেশ বড়সড় ছিল। একালে আবিষ্কৃত কিছু বড়সড় উল্কার একটা ছোট্ট তালিকা দেওয়া হল ঃ

উল্কার নাম	পৃথিবীতে অবস্থান	ভর [মেট্রিক টন]
[1] হোবা ওয়েস্ট আয়রণ [Hoba West Iron]	নাম্বিবিয়া	60
[2] আহ্নি ঘিটো [Ahnighito]	গ্রীনল্যান্ড	31
[3] বাকুবিরিটো [Bacubirito]	মেক্সিকো	27
[4] মুসি [Moosi]	তাঞ্জানিয়া	26
[5] আগপালিলিক [Agpalilik]	গ্রীনল্যান্ড	20
[6] আরম্যান্টি [Armanty]	মঙ্গোলিয়া	20
[7] উইলামেটে [Willamete]	ওরিগন	14
[8] চুপাডেরোস [Chupaderos]	মেক্সিকো	14

[9] ক্যাম্পো ডেল সিয়েলো [Campo del Cielo]	আর্জেন্টিনা	13
[10] মুন্দ্রাবিল্লা [Mundrabilla]	পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	12
[11] মোরিটো [Morito]	মেক্সিকো	11

তালিকা ঃ 23

চন্দ্রপৃষ্ঠে অনেক বড় আকারে উল্কাপাত চিহ্নিত করা গেছে। চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নেই বলেই পুরো উল্কাটাই সেখানে এসে আঘাত করেছে। উল্কার সবটাই রয়ে গেছে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিশাল সব গহ্বর সৃষ্টি করে। বলা হয়, ডায়নোসরাসদের পৃথিবী থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণই হল এক উল্কাপাত। 'ক্রেটাসিয়াস' [Cretaceous] যুগের শেষে একটা দশ কিলোমিটার ব্যাসের উল্কা পৃথিবীতে এসে আঘাত করে প্রায় 6.6 কোটি বছর আগে। এর ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের এতো ঘোরতর পরিবর্তন হয় যে প্রায় 6 কোটি বছর ধরে রাজত্ব করা এই বিশাল জীবটির সকল প্রজাতি পৃথিবী থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই উল্কাপাতের একটা প্রমাণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর মাটিতে ইরিডিয়াম ধাতুটি প্রায় ছিল না বললেই চলে, কিন্তু ওই উল্কাপাতের পর পরই পৃথিবীর মাটিতে ইরিডিয়ামের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। এর ফলেই ডায়নোসরাসরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

1908 সালে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার তাঙ্গুশকায় [Tunguska] একটা উল্কা বিস্ফোরণ ঘটেছিল 30 শে জুন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কয়েক মাইল উপরে। উল্কার অগ্নিগোলক কয়েকশ' মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় প্রায় 1000 কিলোমিটার দূর থেকেও এবং প্রায় 60 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা পাইন বনকে একদম ধরাশায়ী করে দিয়েছিল এই বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে কোন গর্ত বা খাদ হয়নি। কারণ বিস্ফোরণটি প্রায় দশ কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুমণ্ডলে হয়েছিল। গলিত উল্কার ছোট ছোট কিছু গোলক পাওয়া গেছে তাঙ্গুশকার আশপাশ অঞ্চলে, যেগুলি মাটিতে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন তাঙ্গুশকায় যে উল্কাপাত হয়েছিল তা 'এনকে' [Encke] নামক এক ধূমকেতুর অংশ বিশেষ। এই ধূমকেতু থেকে 'টাউরিড' [Taurid] উল্কাবৃষ্টি হয় প্রতিবছর অক্টোবর মাসের শেষের দিকে। ধূমকেতুটি পৃথিবীর দিকে ক্রমশঃ সরে আসছে এবং খুব শিগ্‌গির এটি ভেঙে পড়বে। তবে তাঙ্গুশকায় ওই উল্কা বিস্ফোরণ কিন্তু ঘটেছিল 30শে জুন। টাউরিড উল্কাবৃষ্টির প্রায় চারমাস আগে।

সমুদ্রে উল্কাপাতের ফলে 'সুনামি' হতে পারে এবং সে সুনামির ঢেউ 100 মিটার [330 ফুট] অবধি উঠতে পারে। মাটিতে উল্কাপাতে ধূলিঝড় হতে পারে দীর্ঘস্থায়ীভাবে এবং বহু গাছপালার প্রজাতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। ক্রেটাসিয়াস যুগে যে উল্কাটি পড়েছিল, যাতে ডায়নোসরাস নিশ্চিহ্ন হয়, সেটি পৃথিবীর প্রায় 70% জীবনকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। উল্কাপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। বড় আকারের অগ্ন্যুদ্গীরণ পৃথিবীর জীবকুলের কাছে বিপজ্জনক হয়ে যায়। অনেক সময় বড় উল্কা ভূ-পৃষ্ঠে আঘাত করে 40 কিলোমিটার অবধি গভীর খাদ তৈরি করতে পারে এবং ফলে, আগ্নেয়গিরির মত লাভা বেরিয়ে আসে সেই রকম সব গভীর গর্ত থেকে। সুতরাং উল্কা পারে আমাদের পৃথিবীর জীবনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

• ধূমকেতু [Conrets] •

ধূমকেতু শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, 'ধূম হয়েছে কেতু [চিহ্ন] যার'। অর্থাৎ কেতু বা চিহ্ন বা লেজ যার ধূম্রময়। ধূমকেতু তাই ধূম্রময় লেজওয়ালা জ্যোতির্ময় পদার্থ বিশেষ। ঝাঁটার মত আকৃতির এই জ্যোতিষ্কগুলি তাদের লেজের জন্যই এমন নামে অভিহিত। ফলিত জ্যোতিষে ধূমকেতুকে অনিষ্টকারক বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে ইন্দ্র-ধনুর আকৃতি বিশিষ্ট ধূমকেতু কিংবা যে ধূমকেতুর দুটি বা তিনটি চূড়া থাকে তা খুব বেশি অনিষ্টকারক বলে গণ্য করা হয়। যে সব ধূমকেতুর আকার ছোট এবং প্রসন্ন তারা তত অনিষ্টকারক নয় বলে ফলিত জ্যোতিষের ধারণা। প্রাচীনকালে আরও মনে করা হত যে, দক্ষিণ দিকে ধূমকেতুর উদয় ঘোর অনিষ্টকর। অন্য দিকগুলিতে ধূমকেতুর উদয় ততটা ক্ষতিকারক নয়। এই সব ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পুরানো মন্তবাদ ছেড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় দেখা যাক ধূমকেতুর স্বরূপ কী এবং কেমন।

ধূমকেতু এক রকম জ্যোতিষ্ক। তাদের ওজন খুব কম, কিন্তু আয়তন বিশাল। গ্রহদের মত এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এদের পরিক্রমণ পথগুলি দীর্ঘ উপবৃত্তাকার এবং অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। এরা যখন সূর্যের খুব কাছাকাছি আসে তখন দেখা যায়, এদের কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসে আছে গ্যাস যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার আস্তরণ দিয়ে ঢাকা। এই গ্যাস এবং ধূলিকণাই আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ধূমকেতুর লেজ তৈরি করে। এই গ্যাস প্রথমে তরল আকারে থাকে। ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি এলে এটা গ্যাসে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। ধূমকেতুর লেজের উপাদানই এই গ্যাস এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ধূলিকণা। লেজগুলি কিন্তু সব সময়ই সূর্যের বিপরীত দিকে সৃষ্টি হয়।

ধূমকেতুকে ইংরেজীতে বলে 'Comet'। এটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ লম্বা চুলওয়ালা কিছু। লেজের ঝাঁটার মত আকৃতি এবং এর ক্রমবর্ধমান উড়ন্তভাবের জন্যই ধূমকেতুকে বলা হয়েছে 'Comet'। ধূমকেতুর পরিক্রমণ পথ বেশ জটিল এবং তাদের গতিবিধিও যথেষ্ট অনিয়মিত। এজন্য ধূমকেতুদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরেই যথেষ্ট আগ্রহী। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্য এবং গ্রহগুলির দেহ যে পদার্থে তৈরি হয়েছিল কোটি কোটি বছর আগে, ধূমকেতুগুলিও সেই আদি উপাদানে তৈরি। এখনও বিজ্ঞানীরা তাই ধূমকেতুর দেহ যে সব পদার্থে নির্মিত তার ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঁদের ধারণা, ধূমকেতুর উপর গবেষণা করেই এই সৌরমণ্ডল এমন কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণের একটা হদিশ পাওয়া যাবে।

কক্ষপথের আকার ও আকৃতি অনুসারে ধূমকেতুগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এদের এক দল হল 'স্বল্প-পর্যায় ধূমকেতু' [Short Period Comet], অন্য গোষ্ঠির নাম 'দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতু' [Long Period Comet]। স্বল্প-পর্যায়দের একবার তাদের নিজস্ব উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে আসতে সময় লাগে 200 বছরের কম। অর্থাৎ যে সব ধূমকেতু 200 বছরের কম সময়ে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ফেলছে, তাদের বলা হচ্ছে স্বল্প-পর্যায় ধূমকেতু বা 'শর্ট পিরিয়ড কমেট'। আর 200 বছর বা তারও বেশি সময়ে যেসব ধূমকেতু একবার মাত্র সূর্য-প্রদক্ষিণ করতে পারছে, তারা হল দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতু বা 'লঙ পিরিয়ড কমেট'। এদের মধ্যে অনেকে বিশাল এবং অকল্পনীয় দীর্ঘ উপবৃত্তাকার [Elliptical] এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রায় পরাবৃত্তাকার [Hyperbolic] কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এদের একবার সূর্য পরিক্রমায় হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ বছরও লাগতে পারে। হয়ত এমন অনেক ধূমকেতু আছে আমাদেরই এই সৌরমণ্ডলে যার হদিশ এ যাবৎ

আমরা পাই নি এবং আগামী কয়েক হাজার বা লক্ষ বছরেও তাদের সূর্যের কাছাকাছি আসার সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং তারা আমাদের জানার বাইরের থেকে যাবে হাজার হাজার বছর পরেও। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা 100টি স্বল্প-পর্যায় ধূমকেতু এবং 484টি দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতুর তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এতে এই সব ধূমকেতুর আকার, গতি, প্রকৃতি, কক্ষপথ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই 484টি দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতুর অধিকাংশই প্রায় পরাবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

স্বল্প-পর্যায় ধূমকেতুদের অধিকাংশই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে একবার সূর্য-প্রদক্ষিণ সারে। এদের মধ্যে প্রায় 70টি ধূমকেতুর কক্ষপথের অপসূর [Aphelion] বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের কাছাকাছি। এই কারণে, এই 70টি ধূমকেতুকে বলা হয় 'বৃহস্পতি পরিবার' [Jupiter Family]। বিশাল বৃহস্পতির প্রভাবে এই ধূমকেতুদের কক্ষপথ আমাদের সৌরমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বৃহস্পতিকে এরা ছাড়িয়ে যেতে পারে নি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ধূমকেতুগুলির মত। বিজ্ঞানীদের অনুমান শনি কিংবা ইউরেনাস হয়ত কিছু ধূমকেতুকে বৃহস্পতির মতই এই সৌরমণ্ডলে আটকে রেখেছে। তবে বৃহস্পতির মত এতো বড় ধূমকেতু-পরিবার অন্য কোনও গ্রহের নেই। এই সব স্বল্প-পর্যায় ধূমকেতুদের কক্ষতল [Orbit Plane] গ্রহদের কক্ষতলেরই অনুরূপ। এদের গতিবেগ গ্রহদের গতিবেগের অভিমুখী। কেবল, আমরা যে ধূমকেতুটির নাম দিয়েছি 'হ্যালির ধূমকেতু' [Comet Halley], যে নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালীর [Edmund Halley] [1656-1742] নাম অনুসারে, সেই ধূমকেতুটির কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে 18^0 কোণে অবস্থিত এবং তার বেগের অভিমুখ গ্রহদের বেগের অভিমুখের বিপরীত। অর্থাৎ গ্রহদের তুলনায় উল্টো অভিমুখে সে তার সূর্য প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে। এই ধূমকেতুটি তার গোষ্ঠীর 100টি ধূমকেতুর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। কক্ষতল এবং গতির অভিমুখ বিচারে এই ধূমকেতুটি সমগোত্রীয় অন্যান্য ধূমকেতুদের চেয়ে স্বতন্ত্র।

দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতুদের কক্ষপথগুলির মধ্যে কোনও নিয়ম নেই। এই সব কক্ষপথ আমাদের সৌরমণ্ডল পেরিয়ে অতিদূর মহাকাশে পরিব্যাপ্ত। এরা যেমনভাবে পারে হাজার হাজার কিংবা লক্ষ-লক্ষ বছর পরে একবার সূর্যের পাশ দিয়ে চলে যায়। তবে এদের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে এবং সেগুলি প্রায় পরাবৃত্তাকার। এরা সব দিক থেকেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

উভয় শ্রেণীর ধূমকেতুরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেছে। এদের অধিকাংশেরই অনুসূর [Perihelion] বিন্দু পৃথিবীর কক্ষপথের খুব কাছাকাছি। ধূমকেতুর আলোকচ্ছটা হল সূর্য-রশ্মির প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের ফল। সে জন্য সূর্যের যত কাছাকাছি আসবে, ধূমকেতুগুলি তত উজ্জ্বল দেখাবে পৃথিবী থেকে। এইভাবে যেসব ধূমকেতু সূর্যের থেকে খুব দূরে আছে তাদের আমরা খালি চোখে তো নয়ই, খুব শক্তিশালী দূরবীনেও খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তেমনি সূর্যের খুব কাছাকাছি কোনও ধূমকেতু এলে উজ্জ্বল আকাশে তাকে নাও দেখা যেতে পারে। সুতরাং কোটি কোটি মাইল দূরের বেশ কিছু ধূমকেতুর সম্পর্কে আমরা যেমন কিছু জানি না, তেমনি ধূমকেতুর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয় নি।

শক্তিশালী দূরবীনে প্রথমের দিকে ধূমকেতু ক্ষীণ তারার মত দেখায়। এর কেন্দ্রকের আকৃতি যথেষ্ট বড় হলে সূর্য থেকে শনির দূরত্ব যতটা ততটা দূরত্ব থেকেই একে দূরবীনের সাহায্যে ভালভাবেই দেখা যায়। এমন কি খালি চোখেও তা প্রত্যক্ষ হতে পারে। সাধারণভাবে এই দূরত্বের তিন ভাগের একভাগ দূরত্ব থেকে প্রায় সব ধূমকেতুকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছাকাছি আসে, ওর

কুয়াশার আবরণ ততই পরিষ্কার হতে থাকে; ফলে ওকে আরও উজ্জ্বল এবং আরও বড় দেখায়। মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি এলে এর লেজ তৈরি হতে শুরু করে। অর্থাৎ শনির থেকে মঙ্গলের কক্ষপথ অবধি এর কোন লেজ থাকে না। লেজ বা পুচ্ছের শুরু মঙ্গলের কক্ষপথের কাছাকাছি থেকে। এরপর ওটি সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে থাকে, বিকীর্ণ সৌরশক্তির প্রভাবে ওর শরীরের গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বাড়তে থাকে। এই সময় ওর লেজ বা পুচ্ছ নাটকীয়ভাবে বিশালতা পায়। সে সময় কেন্দ্রক বা মাথার আয়তন বৃদ্ধি হয় বেশ নগণ্যই। যে সব ধূমকেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি আসে এবং পৃথিবীর খুব কাছাকাছি দিয়ে যায়, তারাই সবচেয়ে দর্শনীয় রূপ নেয় রাতের আকাশের গায়।

ধূমকেতুর মোট ভরের অধিকাংশটাই তার মাথাতে সীমাবদ্ধ থাকে। এই কেন্দ্রকের ব্যাস অনেক সময় এক মাইলের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র হতে পারে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে তা কয়েক মাইলও হয়। কেন্দ্রক দেখতে অনেকটা বরফ-গোলার মত। এটা তৈরি হয় বরফ, ঘনীভূত হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে। মাঝে মাঝে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ এবং নিকেলের কণারাশিও ছড়িয়ে থাকে।

ধূমকেতুরা সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে থাকে, সূর্যের রশ্মি ওই বরফকে বাষ্প করে দেয়। এই বাষ্প বা গ্যাস প্রসারিত হয়ে কেন্দ্রক থেকে দূরে চলে যেতে চেষ্টা করে এবং সঙ্গে নিয়ে যায় ভারী বস্তুগুলির সূক্ষ্ম কণারাশি। এভাবে তৈরি হয় ধূমকেতুর লেজ বা পুচ্ছ। এই পুচ্ছে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে, তার ভর কেন্দ্রকের ভরের সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। কিন্তু পুচ্ছের আয়তনের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ যাবৎ দেখা গেছে লেজের বা পুচ্ছের ব্যাস 5 লক্ষ মাইল বা 8 লক্ষ কিলোমিটার হতে পারে, যা নাকি বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাসের 5 গুণেরও বেশি। আর সাধারণ ধূমকেতুর লেজের ব্যাস গ'ড়ে 50,000 মাইল বা 80,000 কিলোমিটার।

ধূমকেতুর গ্যাস বা বাষ্প সূর্যালোক শোষণ করে নতুন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। ধূলিকণা বা অন্যান্য ধাতুকণা সূর্যালোকের অনেক বেশি প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ ঘটায়। একটা ধাতুফলক যতটা আলো প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত করে বা করতে পারে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ সম্ভব হয় যদি ওই ধাতুফলকটিকে কণিকায় রূপান্তরিত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই ধূমকেতুর কেন্দ্রকে যেখানে ভর অনেক বেশি এবং যেখানে ধাতু বা ধূলিকণারা এক জায়গায় ঘন হয়ে আছে, সেখানে আলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ পুচ্ছের তুলনায় অনেক কম। পুচ্ছের ঘনত্ব অপরিসীমভাবে কম হওয়ার ফলে ওখানে ধাতু বা ধূলিকণারা ছড়িয়ে থাকে এবং কেন্দ্রকের চেয়ে প্রায় 100 গুণ পর্যন্ত আলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণের ক্ষমতা ধারণ করে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ধূমকেতুর শরীরে যত বেশি ক্রিয়াশীল হতে থাকে, গ্যাসের অণুগুলি তত ভাঙ্গতে শুরু করে। তাদের কিছু কিছু আয়নিতও হয়ে পড়ে ইলেকট্রন হারিয়ে। আবার তড়িচ্চুম্বকীয় চাপ [Electromagnetic Pressure], যা নাকি সূর্যরশ্মি ধূমকেতুর উপর ফেলে, আর অণু ও কণাগুলির মধ্যে পারস্পরিক মহাকর্ষবল—এরা উভয়েই মিলেমিশে ধূমকেতুর পুচ্ছ তৈরিতে সাহায্য করে। আয়নিত কণাগুলির গতিবেগ ও অভিমুখ নিয়ন্ত্রিত হয় ওই দুটি বলের চেয়ে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী বলের দ্বারা। এই অতি শক্তিশালী বল বা ক্ষেত্র তৈরি হয় সৌর-ঝটিকা [Solar Wind] থেকে। সূর্য থেকে সারাক্ষণ অসংখ্য তড়িতাহিত কণিকার যে স্রোত নির্গত হচ্ছে, তাকেই নাম দেওয়া হয়েছে 'সৌর-ঝটিকা'। এই ঝটিকাই ধূমকেতুর আয়নিত অণু বা কণাগুলিকে সূর্যের থেকে দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলে, ধূমকেতুর বিশাল লেজ সূর্যের ঠিক বিপরীতে একেবারে সোজা হয়েই তৈরি হয়।

ধূমকেতুর গতিবেগও প্রচণ্ড। আসাধারণ গতিবেগ সম্পন্ন ধূমকেতুর গতিবেগ ঘন্টায় 50 লক্ষ কিলোমিটার অবধি হতে পারে। সাধারণ গতিবেগসম্পন্ন ধূমকেতুও ঘন্টায় 5-7 লক্ষ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। ফলে দূরন্ত বেগে ছুটন্ত ধূমকেতুর আয়নিত অণু বা কণিকার মেঘ এবং সৌর ঝটিকার আয়নিত কণিকার স্রোত, এই দুইয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় [Interaction] ধূমকেতুর নানান আকৃতি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ধূমকেতুর দুই বা ততোধিক পুচ্ছ হয়। কারণ ওই মিথষ্ক্রিয়া। কারও লেজ বা পুচ্ছ একেবারে সোজা. কারও ইন্দ্রধনুর মত বাঁকা। এর কারণও ব্যাখ্যা করা যায় উপরে বলা ওই মিথষ্ক্রিয়ার [Interaction] সাহায্যে। ধূমকেতুর হাল্কা আয়নিত কণিকারা সৌর ঝটিকার প্রভাবে প্রচণ্ড ত্বরণ পায় এবং দ্রুত সূর্যের বিপরীত দিকে ছুটে পালায়। ফলে যে পুচ্ছ তৈরি হয় তা একেবারে সোজা এবং বহু দূর বিস্তৃত। আবার ধূমকেতুর অনাহিত অণু এবং ধূলিকণিকাগুলি পূর্বোক্ত আহিত অণু বা কণাগুলির মত দ্রুত ত্বরণান্বিত হয় না। ফলে এগুলি অর্থাৎ অনাহিত অণু ও ধূলিকণারা ইন্দ্রধনুর মত বক্রাকার পুচ্ছ তৈরি করে।

সূর্য থেকে দূরত্ব যখন খুবই বেশি, তখন ধূমকেতুর থেকে ক্ষীণ আলো আসে। এই আলোর গুণাগুণ বর্ণালি-বীক্ষণ যন্ত্রে [Spectroscope] পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই আলো সূর্যেরই আলো। যাইহোক, ধূমকেতু যতই সূর্যের কাছাকাছি আসতে থাকে, ততই তার বিভিন্ন ধরনের অণুগুলির সূর্যালোক শোষণ, বিচ্ছুরণ বা বিকিরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। গ্যাসীয় অণুগুলি অনুনাদী কম্পাঙ্কগুলিতে [Resonant Frequencies] সূর্যের আলোক শোষণ করে প্রায় একই কম্পাঙ্কবিশিষ্ট আলোক-রশ্মি নির্গত করে। এই ঘটনাকে 'রেজোন্যান্ট ফ্লোরেসেন্স' [Resonant Fluorescence] নাম দেওয়া হয়েছে।

ধূমকেতুর বর্ণালি পরীক্ষা করলে দেখা যায় তার নীল রঙের অঞ্চলের ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এই অংশের বর্ণালি সৃষ্টি হয় কার্বন-নাইট্রোজেন অণুগুলির উদ্‌গীরণ করা অলোর জন্য। বর্ণালিতে এর পরের পটি [Band] তৈরি করে দুই অনুবিশিষ্ট কার্বন-কণা [C_2]। ঔজ্জ্বল্যেও এই পটির স্থান দ্বিতীয় এবং এর রঙ হয় হলদে। এছাড়াও C_3, CH, NH, OH এবং NH_2 অণুরাও বর্ণালিতে বিভিন্ন রঙের এবং রকমের পটি [Band] তৈরি করে। সূর্যের আরও কাছাকাছি এলে সোডিয়াম অণুর উদ্‌গীরিত অলোর পটি তৈরি হয়। তখন লৌহ, পটাশিয়াম, তামা, সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব কণিকারাও সূর্যের অলো শোষণ করে এবং একই কম্পাঙ্কবিশিষ্ট আলো বিচ্ছুরিত করে। নীল অঞ্চলের আলোর ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশি হয় বলেই প্রায় সব ধূমকেতুকে নীলাভ দেখায়। কাউকে আবার হলদেও দেখায়। এদের ক্ষেত্রে দুই অণুবিশিষ্ট কার্বন-কণা [C_2] বেশি থাকায় হলদে অলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

ধূমকেতুর লেজের ঔজ্জ্বল্য মূলতঃ ধনাত্মক আয়নযুক্ত কার্বন-মনোক্সাইড [Carbon Monoxide], নাইট্রোজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড কণিকাগুলি থেকে নির্গত আলোর উপর নির্ভর করে। এছাড়া, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত আলোও ওই ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সাহায্য করে। তবে বর্ণালি-বীক্ষণ যন্ত্রে শেষোক্ত আলোরশ্মির পটিগুলি খুব দুর্বল প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া বহুরকমের অণু, পরমাণু ও কণাও ধূমকেতু এবং তার লেজের আলোর পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

কিছু কিছু ধূমকেতুর আবিষ্কার পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা করলেও অধিকাংশ ধূমকেতুর আবিষ্কর্তা ছোট ছোট দুরবীনধারী শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পেশাদার জ্যোতির্বিদরা যতগুলি ধূমকেতু আবিষ্কার

করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই ফটো প্লেটে পাওয়া তাদের ছবি থেকে এবং সে ছবিগুলি তোলা হয়েছিল অন্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, যা ধূমকেতুর সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত নয়। অর্থাৎ পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সব ধূমকেতু আবিষ্কার করেছেন তাদের অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়েছে হঠাৎই। দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতুদের বেশ কিছুই পেশাদার বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। অপেশাদারেরা সাধারণতঃ নতুন নতুন ধূমকেতুদের খোঁজে সূর্যাস্তকালীন পশ্চিমাকাশে এবং সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব-আকাশের নীচের দিকে অনুসন্ধান চালান। সুতরাং ধূমকেতুর আবিষ্কারে অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি। এঁরাই বহুকাল ধরে নানা ধূমকেতু আবিষ্কার করে ধূমকেতুর বিজ্ঞান তথা ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সুতরাং ধূমকেতুর আবিষ্কারে অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বই বেশি। পেশাদারেরা আবিষ্কৃত ধূমকেতুগুলির উপর পরবর্তী পর্যায়ে গবেষণা চালান এবং তাদের সম্পর্কে নানা তথ্য আবিষ্কার করতে থাকেন। কোনও ধূমকেতু আকাশে দেখা গেলে তা নতুন দেখা গেল কিংবা পুরানো কালে দেখা যাওয়া কোনও ধূমকেতুকে আবার দেখা গেল তা নির্ণয় করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তেমন পদ্ধতি জানিয়ে রেখেছেন। তৈরি করা আছে ধূমকেতুদের তালিকা এবং জানা কালের মধ্যে দেখা যাওয়া ধূমকেতুদের বিবরণ। আগেই বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এযাবৎ 100টি স্বল্প-পর্যায় এবং 484টি দীর্ঘ-পর্যায় ধূমকেতুর তালিকা বানিয়েছেন।

নতুন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হলে তাকে সাময়িকভাবে একটা নম্বর দিয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়। যে সব ধূমকেতু আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ সে বছরই আবার দেখা গেল, তাদেরও অনুরূপ একটা নম্বর দেওয়া হয়। কয়েকটি নম্বর এইরকম—1910a, 1957d, 1965f ইত্যাদি। 1910a মানে হল সেই ধূমকেতুটি যেটি 1910 সালে সবার আগে দেখা গেল, ওই বছর অন্য ধূমকেতু দেখা গেলে তাদের নম্বর পর পর 1910b, 1910c এভাবে দেওয়া হয়। এগুলি নতুন ধূমকেতু হতে পারে, আবার পুরানোও হতে পারে। কিন্তু পুরানো হলেও ওই বছর আবার ওটা দেখা গেল। এরপর ওদের একটা করে স্থায়ী নম্বর দেওয়া হয়। এই নম্বরে ধূমকেতুটি যে বছরে দেখা গিয়েছিল বা গেল, সেই বছরটির সঙ্গে ওটির অনুসুর বিন্দুর অবস্থান অনুসারে রোমান হরফে একটি সংখ্যা বসানো হয়। যেমন, 1910I, 1957IV, 1965VI ইত্যাদি। কোন ধূমকেতু হয়ত যে বছর দেখা গেল, তারও দু-তিন বছর পরে সে অনুসূর পেরিয়ে যেতে সমর্থ হল, তখন তাকে স্থায়ী নম্বর দিতে তিন-চার বছর অপেক্ষা করা হয়।

প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কৃত ধমূকেতুকে একটা নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এই নামগুলি সাধারণতঃ আবিষ্কারকের নামানুসারে হয়ে থাকে। যেমন, ইকেয়াসেকি ধূমকেতু, এভারহার্ট ধূমকেতু, হ্যালীর ধূমকেতু ইত্যাদি। খ্রিস্টের জন্মের 2200 বছর আগেও ধূমকেতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা ভারতীয়দের মতই ধূমকেতুর অভ্যুদয়কে অশুভ বলে মনে করত এবং এটাকে বিপদ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি অশুভকারক বলে মেনে নিয়েছিল। আবার ইউরোপে বহু শতাব্দী ধরে ধূমকেতুর অভ্যুদয়কে নিছক বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা বলে ধরে নিয়ে ওটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অনুপযুক্ত বলে স্থির করা হয়েছিল।

ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) প্রথম বললেন, 1577 সালের ধূমকেতুটি চাঁদের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থিত। নিউটনের সূত্র আবিষ্কারের ফলে ধূমকেতুর গতি নিয়ে ব্যাখ্যা শুরু হলো নতুন সূত্রগুলির পটভূমিতে। নিউটন নিজেই 1680 সালের উজ্জ্বল ধূমকেতুটির

উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং তার গতিবেগের উপর নিজের আবিষ্কৃত সূত্রগুলির প্রয়োগ করে সূত্রগুলির সত্যতা যাচাই করেন। 1705 সালে এডমন্ড হ্যালী [Edmund Halley] 24টি ধূমকেতুর কক্ষপথ, গতিবেগ ইত্যাদি নিজে বের করেন নিউটনের সূত্রগুলির সাহায্যে। এই 24টির বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকার প্রকাশনাও করেন হ্যালী সাহেব। ধূমকেতুর হঠাৎ হঠাৎ আসা বা হঠাৎ দেখা পাওয়া এখন আর অব্যাখ্যাত নেই। দীর্ঘ উপবৃত্তাকার পথ ও সূর্যের কাচাকাছি আসা ইত্যাদির উপর ওগুলি নির্ভরশীল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালীর নামানুসারে একটি ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয়েছে 'হ্যালীর ধূমকেতু' [Comet Halley]। তাঁর গবেষণার 24টি ধূমকেতুর মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেন যে, 1531, 1607 ও 1682 সালের ধূমকেতু তিনটি একই গতিপ্রকৃতি-সম্পন্ন। যদিও তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন, ওই ধূমকেতুটির পর্যাবৃত্তকাল সমান নয়। এই সমান না হওয়ার জন্য তিনি বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ দুটির মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবকে দায়ী করেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওই ধূমকেতুটি মোটামুটি 75 বৎসর পরে আবার 1758 সালে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত কারণে ধূমকেতুর পর্যাবৃত্ত কালের পরিবর্তন ঘটে তা আবিষ্কৃত হয়। হ্যালীর ভবিষ্যদ্‌বাণী মতই 1758 সালের শেষের দিকে ওই ধূমকেতুটিকে আবার দেখা যায়। ওই ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয় 'হ্যালীর ধূমকেতু'।

এই ধূমকেতুটি 1835, 1910 এবং 1986 সাল আবার দেখা গেছে। 1985 সালের নভেম্বরে সন্ধ্যার ঠিক পরে পরেই বাইনোকুলারের সাহায্যে দেখা সম্ভব হয় এই ধূমকেতুটিকে। 1986 সালের জানুয়ারীর শুরু থেকেই একে খালি চোখে দেখা যেতে থাকে। জানুয়ারীর শেষের দিকে এটি অদৃশ্য হয় সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের আওতায় এসে। একমাস পরে আবার একে দেখা যায় সকালের আকাশে। পূর্বদিকের আকশের গায় একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁষে এর পুনরুদয় হয়। দিক চক্রবালের কাছাকাছি ছিল এর অবস্থান। মার্চের শেষের দিকে এই ধূমকেতুটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে এবং এপ্রিলের প্রথম দিকটায় ওইভাবেই থাকে। তখন এর ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশি হয়। তবে 1910 সালের মত ঔজ্জ্বল্য এবার ছিল না এই বিখ্যাত ধূমকেতুটির। এবার দক্ষিণ-পূর্ব আকশেই এটি অবস্থান করছিল এবং প্রতিদিন উপরের দিকে উঠছিল। এর পুচ্ছ ক্রমশঃ ছোট হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে পৃথিবীর সব অংশ থেকেই এটিকে আর খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় নি।

এই ধূমকেতুর পতিপথ ইত্যাদি নিয়ে নানান হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে একে 1909 সালের 11ই সেপ্টেম্বরই চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়, তখন এটি অত্যন্ত অনুকূলভাবেই পৃথিবী থেকে প্রায় 50 কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করেছিলো। এই ধূমকেতুটি অনুসূর বিন্দু পেরিয়ে যায় 20শে এপ্রিল, 1910 সালে। মে মাসের প্রথম দিকে এটি পৃথিবীর কাছাকাছি দিয়ে যায়। 1910 এর 15ই মে এর লেজের বিস্তার মাপা হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিলো 50°। এর মাথাটা 18ই মে সূর্য গোলককে ঘোরা শেষ করে। তার পরের দুদিন ধরে এর উজ্জ্বল বক্রাকার পুচ্ছ বেশ ভালোভাবেই দেখা যেতে থাকে সকালের আকাশ জুড়ে। এই সময় এটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসে। সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে এর লেজের বিস্তার হয় 140° এবং তা এতো উজ্জ্বল অলো দিতে থাকে যে চাঁদের আলোও ম্লান হয়ে যায়।

1986-তে এর আগমন আকর্ষণীয় হলেও, আলোকোজ্জ্বল শহরগুলি থেকে একে দেখা ততটা আকর্ষণীয় বলে মনে হয় নি। তবু বহু ব্যক্তিই সাগ্রহে এর আগমন প্রতীক্ষায় থেকেছিলেন, বিশেষ করে অপেশাদার এবং পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

ধূমকেতুরা নিয়মিত তাদের ভর হারায় যখন তারা সূর্যের কাছে আসে। কেন্দ্রকে জড়ো হওয়া পদার্থগুলির বেশ কিছুটা পুচ্ছের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফলতঃ ধূমকেতুরা তাদের ভর হারাতে থাকে। প্রত্যেকবারে সূর্যের কাছাকাছি এলেই ওদের ভরের হ্রাস ঘটে এবং ওরা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়ে যাওয়া নিয়ে সব বিজ্ঞানীই একমত, কিন্তু ক্ষয়ের পরিমাণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। ফলে কোন্ ধূমকেতু কতদিন টিকে থাকবে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আজও অসম্ভব। তবে ধূমকেতুদের ভর হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঔজ্জ্বল্য যে কমছে, তা লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পদার্থ হ্রাসের ফলেই ধূমকেতুদের ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই কমে আসছে। এই ক্ষয় একদিন ওদের নিঃশেষ করে দেবে। নক্ষত্রেরা যেমন পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে, ওরা ক্ষয়ে যাবে ভরের হ্রাসের ফলে— অভ্যন্তরীণ পদার্থ হারানো ফলে।

কোন কোন ধূমকেতুকে খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়তে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, স্বল্প পর্যায় ধূমকেতু বিয়েলা (Biela)-র কথা। এই ধূমকেতুটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় 1772 সালে। একে আবার 1815 এবং 1826 সালেও দেখা যায়। এটি আবার 1832 সাল দেখা যাবে তাও বলা হয় এবং আবার একে দেখাও যায় যথারীতি। 1839 সাল এটি সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। ফলে একে দেখা যায়নি। 1846 সালে আবার একে দেখা যায় জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। তখন কিন্তু এটি দুটো ছোট ছোট ধূমকেতুতে রূপান্তরিত। দুটোরই দুটি ছোট ছোট পুচ্ছ আছে। দুটোই একসঙ্গে সূর্য পরিক্রমারত। প্রথমটি একটু উজ্জ্বলতর, দ্বিতীয়টি তার অনুগামী। খুব কাছাকাছি থেকে দুজনেই সূর্য পরিক্রমা সেরে চলে যায়। 1852 সালে আবার ওদের দুটিকে দেখা যায়। এবার দুজনের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশি আগেকার তুলনায়। 1859 সালে এদের দুজনে সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, ফলে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় নি। 1865 সালে যদিও পর্যবেক্ষণ করার কোনও অসুবিধা ছিল না, তবু ওদের আর দেখা গেল না। কিন্তু 1872 সালের 27শে নভেম্বর ইউরোপের বেশ কিছুটা অংশে প্রচণ্ড উল্কাপাত লক্ষ্য করা গেল। এর পরিমাণ ছিল প্রতি মিনিটে 100টি উল্কা। দেখা গেল, এই উল্কাখণ্ডগুলি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর একটা অংশ থেকে আসছে। তারিখ ও বিকিরণের পরিমাণ দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ধূমকেতু বিয়েলাই এই উল্কাখণ্ডগুলিতে রূপান্তরিত। এখন বিয়েলা নামের ধূমকেতুর অস্তিত্ব আর মহাকাশে কোথাও নেই। সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মহাকাশের মহা-আঙিনা থেকে।

1832 সালে এই বিয়েলা নামের ধূমকেতুটি যখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসেছিল তখন পৃথিবীতে উল্কাপাতের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। এরকম আরও কিছু ধূমকেতু আছে যারা পৃথিবীর কাছাকাছি হওয়া সময় বেশ কিছু উল্কাপাত করে যায়। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, কোনও একটি ধূমকেতু একবার যে পরিমাণ উল্কা বৃষ্টি করে পরের বারে তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ উল্কাপাত হয় তার থেকে। এতেই বোঝা যায় যে, ধমকেতুগুলি প্রতিবারই সূর্যের বা পৃথিবীর কাছাকাছি এসে তাদের অভ্যন্তরীণ পদার্থ ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলে। ফলে, ওদের ভর কমতে কমতে একদিন ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এক শতাব্দী ধরে এটা বিশ্বাস করা হত যে ধূমকেতুর মাথা বা কেন্দ্রক অঞ্চলে নিশ্চয়ই ছোট ছোট অসংখ্য শক্ত পদার্থের টুকরো আছে যেগুলো উল্কার মত এবং সে কারণে ধূমকেতু থেকে এতো উল্কাপাত সম্ভব। এখন সে ধারণা বদলেছে। যাইহোক, ধূমকেতুর গঠন ও উৎপত্তি নিয়ে তিন রকম তত্ত্ব এখন প্রচলিত। প্রথমটি 'স্যান্ড ব্যাঙ্ক মডেল' (Sand-Bank Model, দ্বিতীয়টি 'আইসি কনগ্লোমারেট মডেল' (Icy-Conglomerate Model) এবং তৃতীয়টি ওর্ট-এর 'স্টোরেজ ক্লাউড তত্ত্ব' (Oort's Storage Cloud Theory)।

স্যান্ডব্যাংক মডেল [Sank Bank Model]

মহাকাশে ঝাঁক বেঁধে হাঁসের মত উড়ে চলা এবং উল্কার মত শক্ত পদার্থের সমন্বয়ে গড়া ধূমকেতুগুলির ওই সব টুকরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সব ঝাঁকের প্রতিটিরই একটা কেন্দ্রক [Nucleus] আছে। এই সব ঝাঁক 'স্যান্ড ব্যাংক' নামে অভিহিত। এগুলি আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে এসে তড়িচ্চুম্বকীয় [Electromagnetic] ও কণিকাময় বিকিরণ [Corpuscular Radiation]-এর প্রভাবে পড়ে। এর উপর এরা প্রভাবিত হয় মহাকর্ষীয় [Gravitational] এবং চৌম্বক-উদ-গতিকী [Magnetohydrodynamics] বলগুলির দ্বারা। এগুলির ফল-স্বরূপ এই সব ধূমকেতুকে আমরা তাদের বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পাই। ওই ধরনের কেন্দ্রক অর্থাৎ কণিকার ঝাঁকের বা স্যান্ড ব্যাংকের যে কেন্দ্রক তা সাধারণতঃ দেখা যায় হালকা এবং অতি পুরাতন বেশ কিছু ধূমকেতুর বেলায়। আবার এই কেন্দ্রকের দেখা মেলে তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কিছুটা আগের অবস্থায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্তির কিছুটা আগের অবস্থায় কেন্দ্রকসহ হাঁসের বা মৌমাছির মত ঝাঁক বেঁধে চলা কণিকাদের দেখা যায়। বহু পুরাতন অতি বৃদ্ধ ধূমকেতুদের অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায় স্যান্ড ব্যাঙ্ক মডেলের সাহায্যে।

আইসি-কনগ্লোমারেট মডেল
[Icy-Conglomerate Model]

এই মডেলটি ধূমকেতুর গঠন, আকার-আকৃতি এবং গতি-প্রকৃতির অনেক ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। এই মডেলের ভাসা-ভাসা ধারণা বেশ কিছুকাল ধরে চালু থাকলেও এর আধুনিক রূপ দেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হুইপল [F.L. Whipple]। তাঁর এই মডেল অনুসারে বহু ধূমকেতু, যারা বহুকাল ধরে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে, তাদের ওই টিকে থাকার রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়। এই মডেলই বলে দেয়, কেন বহু ধূমকেতুর কেন্দ্রকের জমাট বাঁধা গ্যাস সূর্যের খুব কাছাকাছি এলেও একই রকম শক্ত জমাট বাঁধা অবস্থায় থেকে যায়। বহুকাল ধরে এই সব ধূমকেতু কেমন করে প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই মডেল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হয়।

এফ এল হুইপল [F. L. Whipple] তাঁর এই কনগ্লোমারেট মডেল দেন 1949 সালে। তাঁর এই মডেল অনুসারে যেসব ধূমকেতুর উৎপত্তি, তারা সূর্যের খুব কাছাকাছি দিয়ে বিচরণ করতে পারে এবং তাতে তাদের কোনও ক্ষতি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে "ইকেয়েসেকি" ধূমকেতুটির কথা। দেখা গেছে, এই ধূমকেতুটি সূর্যের খুব কাছাকাছি দিয়ে অনুসূর বিন্দু পরিক্রমণ করলেও নিজের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ জমাট বাঁধা গ্যাস ধরে রাখতে সমর্থ। বার বার পরিক্রমণেও এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু বাইরের স্তরে যৎসামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু অভ্যন্তরের জমাট বাঁধা গ্যাসেরা জমাট বেঁধেই থাকে। এমন কি, সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যাবার সময়ও এ অবস্থার হেরফের হয় না।

ওর্ট-এর স্টোরেজ ক্লাউড তত্ত্ব
[Oort's Storage Cloud Theory]

উপরোক্ত দু'রকমের মডেলই ধূমকেতুদের বর্তমান অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে পার না। সৌরমণ্ডল সৃষ্টির পর থেকে এতদিন ধরে ধূমকেতুরা টিকে থাকতে পারে না, যদি ওই দুই মডেলকে ঠিক বলে ধরে নিই। 1950 সালে জন ওর্ট নামের ওলন্দাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন, এই সৌরমণ্ডলের বাইরে বহু দূরের মহাকাশে অতি হিমশীতল এক ধরনের মেঘের ভাণ্ডার আছে। ধূমকেতুরা বিশেষ করে দীর্ঘ-

পর্যায় ধূমকেতুরা ওই অতি হিমায়িত মেঘপুঞ্জে খুব ধীরে ধীরে গতিশীল থাকে। এই সময় এরা ওই মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া নক্ষত্রদের মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা বার বার নাড়া খায়। ফলে, এমনভাবে ছিটকে বেরিয়ে আসে যে বেশ কিছু ধূমকেতু সৌরমণ্ডলে ঢুকে পড়ে এবং তারপরে তারা যথানিয়মে দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর মতে, এইভাবে নতুন নতুন ধূমকেতু সৌরমণ্ডলে চলে আসে। পুরানো ধূমকেতু যেগুলো আগে সৌরমণ্ডলে পরিক্রমা করে গেছে, তাদের সঙ্গে নতুনদের পার্থক্য হল, নতুন ধূমকেতুর কণিকারা পুরনোদের কণাগুলির চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তাদের ঔজ্জ্বল্যও তুলনামূলকভাবে বেশ কম।

ওর্ট সাহেবের মতে ওই অতিশীতল মেঘপুঞ্জের ভাণ্ডারে অন্ততঃ দশ হাজার কোটি ধূমকেতু জমা আছে। কিন্তু এদের মোট ভর পৃথিবীর ভরের চাইতেও কম। এরাই নানান নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে আন্দোলিত হয়ে মাঝে মাঝে সৌরমণ্ডলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে এদের গতিপথের পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে, বৃহস্পতির প্রভাব এদের উপর খুব বেশি করে পড়ে। ফলে, এদের পরিক্রমণ পথ পরিবর্তিত হতে হতে পরাবৃত্ত থেকে কতক ক্ষেত্রে উপবৃত্তকার হয়ে পড়ে। এইভাবে উপবৃত্তাকার পথে এই সৌরমণ্ডলের মধ্যে থেকে এরা সূর্যকে পরিক্রমা করতে থাকে। এমনি করেই শর্টপিরিয়ড বা স্বল্প পর্যায় ধূমকেতুগুলির সৃষ্টি হয়। তবে, অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এটা এখনও অনুমান করেন যে, ওই অতি হিমশীতল মেঘমণ্ডলে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয় নি। কারণ সূর্য থেকে অতো দূরে কণিকাদের একত্রীভূত হয়ে জমাট বেঁধে ধূমকেতুগুলি তৈরি সম্ভব নয় বলেই তাঁদের মত। তাঁদের অনুমান হল, ধূমকেতুর উৎপত্তি হয়েছিল সূর্যের অনেক কাছাকাছি, খুব সম্ভব যে অঞ্চলে গ্রহাণুপুঞ্জ বা বিরাট আকারের গ্রহগুলি তৈরি হয়েছে, সেই অঞ্চলে ধূমকেতু তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ বৃহস্পতির কাছাকাছি কোন অঞ্চলে ধূমকেতুগুলির সৃষ্টি হয়েছিল একসময়। পরবর্তীকালে কতকগুলি ধূমকেতু সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে দূর মেঘের হিমায়িত জঠরে আশ্রয় নেয়। বাকিরা সৌরমণ্ডলে থেকে যায়।

ধূমকেতু কেবল বিজ্ঞানের আঙিনায় আসন পাতে নি। তার আসন পাতা সাহিত্যের আঙিনায়, সমাজ জীবনের আঙিনায়। ফলিত জ্যোতিষ তাকে এনেছে মানুষের জীবন, সামাজিক অবস্থা, দেশ ও দশের ভালোমন্দের বিচারে। খুবই স্বাভাবিক যে, ফলিত জ্যোতিষ ধূমকেতুর পৃথিবীর আকাশে উদয়কে অশুভ বলেই মনে করে। মনে করা হয়, আকাশে ধূমকেতুর উদয় হলে পৃথিবীতে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-মহামারী যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি হয়। এসব সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গ্রহণ নিয়ে যেমন আমাদের নানা কুসংস্কার আছে, তেমনি ধূমকেতু নিয়েও বহু কুসংস্কার রয়েছে আমাদের মনে। এই কুসংস্কার দূর করে বিরল দৃশ্য ধূমকেতুকে দেখতে হবে আর পাঁচটা স্বাভাবিক নৈসর্গিক ঘটনার মত। বিদ্রোহী কবির মত আমরা বলতে পারি 'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু/এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।' তা বলে ধূমকেতুর উদয় কিংবা তাকে দেখায় আতঙ্কের কিছু নেই। সত্যি সত্যিই কিচ্ছু নেই।

1997 সালের 23শে মার্চ এক উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ পর্যাবৃত্তকালের ধূমকেতু পৃথিবীর খুব কাছেই এসেছিল। এটি প্রতি 3000 বছর অন্তর একবার সূর্যের কাছে আসে। এর নাম 'হেল বোপ'। সাধারণত কোনও ধূমকেতু-কেন্দ্রকের ব্যাস 20 কিলোমিটারের মধ্যে হলেও হেল বোপের ব্যাস ছিল প্রায় 40 কিলোমিটার। সূর্যের কাছাকাছি আসার পর এর ঔজ্জ্বল্য হয় 1.2। এতো উজ্জ্বল ধূমকেতু
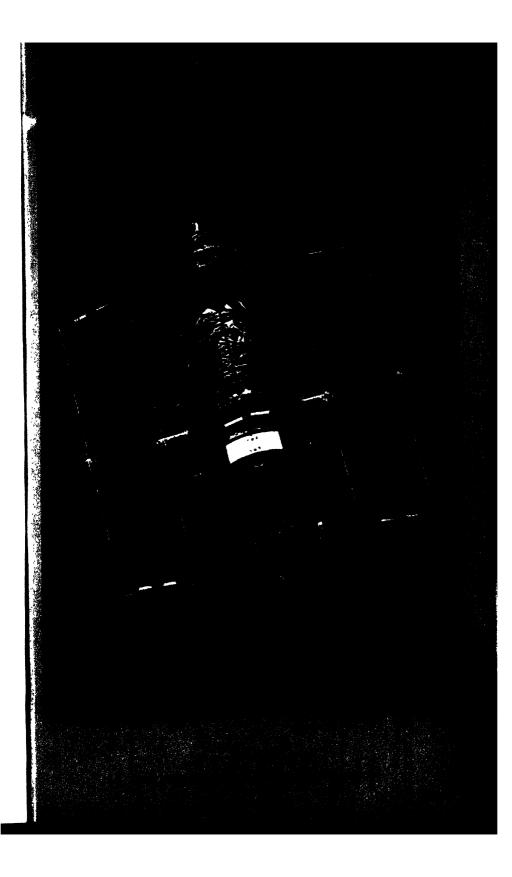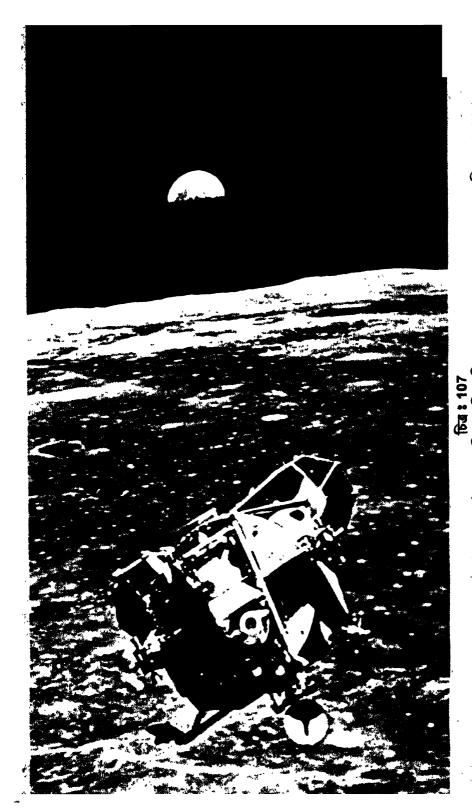
চিত্র : 107

সফল চন্দ্রাবতরণের পর চন্দ্রযান 'ঈগল' আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে ফিরে আসছে অ্যাপোলো-11-এর কলম্বিয়া মহাকাশযানে। দূরে দেখা যাচ্ছে 2,35,000 মাইল দূরের আমাদের প্রিয় পৃথিবী

চিত্র : 108

'ঈগল' চন্দ্রযানে চাঁদে নামার সময় আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনের তোলা কলম্বিয়ার ছবি। এটিতেই থেকে যান মাইকেল কলিনস

চিত্র ঃ 109

চন্দ্রপৃষ্ঠে ভূমিকম্পমাপক-যন্ত্র স্থাপন করছেন এডউইন অলড্রিন [20শে জুলাই, 1969 খ্রিস্টাব্দ]

চিত্র : 110

'ঈগল' থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন অলড্রিন। ছবিটি তুলেছেন আর্মস্ট্রং, যিনি এই সিঁড়ি বেয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমেছেন কয়েক মিনিট আগেই [20শে জুলাই, 1969 খ্রিস্টাব্দ]। আর্মস্ট্রংই প্রথম মানুষ যিনি চাঁদের মাটিতে পা রাখেন
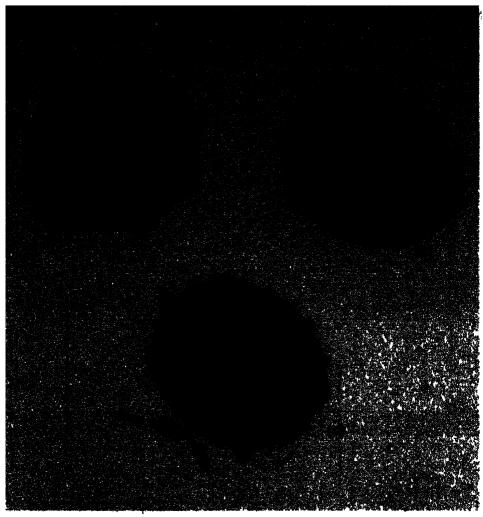
চিত্র ঃ 111

1969 খ্রিস্টাব্দের 20শে জুলাই চন্দ্রাবতরণ ও 21শে জুলাই চাঁদ থেকে প্রত্যাবর্তনের বিভিন্ন ধাপ।

a) চাঁদের চারিদিকে কলম্বিয়া যান, চন্দ্রযানটিকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমারত। কিছুটা পরে দুই সহকারী চন্দ্রাভিযাত্রী চন্দ্রযানে প্রবেশ করলে ওটিকে মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়

b) চন্দ্রযান নামতে থাকে চাঁদের দিকে। প্রয়োজনমত রকেট জ্বালিয়ে চন্দ্রযানটিকে চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করানো হয়। এইভাবে চাঁদে অবতরণ করেন নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন

c) চাঁদে কাজ শেষ করে আবার প্রয়োজনীয় রকেট জ্বালিয়ে চন্দ্রযানটিকে মূলযানের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। তারপর চন্দ্রযানটিকে জুড়ে দেওয়া হয় মূলযানের সঙ্গে। চন্দ্রচারীরা মূলযানে চলে আসেন। চন্দ্রযানটি রয়ে যায় চাঁদের কক্ষপথে। মূলযান আবার রকেট জ্বালিয়ে চন্দ্রের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এসে চলতে থাকে পৃথিবীর দিকে। এরপর মূলযান পৃথিবীর নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে আসে এবং তার থেকে 'Command Module' বেরিয়ে এসে প্যারাস্যুটের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে

চিত্র : 112

চন্দ্রের কক্ষপথে পরিক্রমণ শেষে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় তোলা পৃথিবীর আলোকচিত্র। ছবিতে মেঘের কারুকার্যের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে উত্তর আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপ .

চিত্র : 114

ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের (Milkyway Galaxy) অনন্য রূপ।

সূর্যের অবস্থান দেখানো হয়েছে তীর চিহ্ন দিয়ে। এর ব্যাস 1,00,000 আলোকবর্ষ

চিত্র : 115

আওয়ার গ্লাস নীহারিকা [Hourglass Nebula]। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর নাম My Cn 18। পৃথিবী থেকে দূরত্ব 8,000 আলোকবর্ষ।
1996 সালে হাবল দূরবীনে তোলা ছবি

চিত্র : 116

এটি সম্ভবত একটি সর্পিল ব্রহ্মাণ্ড [Spiral Galaxy]। কালো ফিতার মত অংশটি বিশালকায় ধূলিমেঘ। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম ESO 510-G13। এর দূরত্ব 15 কোটি আলোকবর্ষ। এর ব্যাস 1,05,000 আলোকবর্ষ। সম্প্রতি এতে দুটি ব্রহ্মাণ্ডের সংঘর্ষ ঘটায় এই ধূলিমেঘ উৎপন্ন হয়েছে

চিত্র : 117

মহিমান্বিত শনি। গ্যালিলিওই প্রথম শনির বলয় আবিষ্কার করেন 1609-10 খ্রিস্টাব্দে। হাবল মহাকাশ দূরবীনে এই ছবিটি তোলা

চিত্র - 118

ভয়েজার - 1 - এর তোলা ছবি। বৃহস্পতিরও যে বলয় আছে তা জানা গেল এই ছবি থেকে
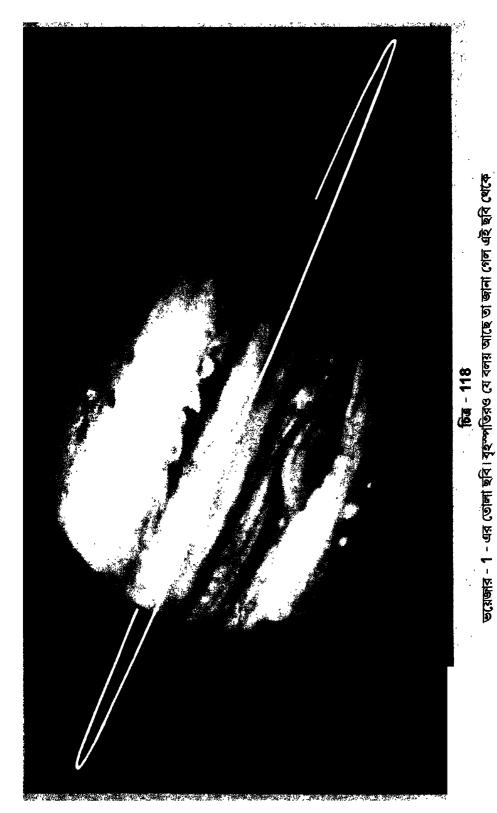
চিত্র : 119

শঙ্খবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড [NGC 4414]। এর চাকতি জুড়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঘন-সন্নিবেশ। এখানের স্থানীয় বস্তুই নক্ষত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে

চিত্র : 120

হাবিস্ফোরণে বিশ্ব প্রসাবিত হয। মহাসংকোচনে তা ফিবে আসে অনন্যতায [Singularity]। বিশ্ব চিব-প্রসারণশীল হলে 10^{100} বছর পরে প ড় থাকবে চরম শীতল অন্ধকাবময বিশ্ব যেখানে থাকবে বাশি বাশি ফোটন এবং দু-তিন বকমেব মৌলিক কণা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাজাগতিক রশ্মি

[বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত হয় মহাজাগতিক রশ্মি। এই রশ্মির ভেদন ক্ষমতা প্রবল। পৃথিবীতে আসা নানা বিকিরণের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চশক্তির বিকিরণ হল এই মহাজাগতিক রশ্মি। বহির্বিশ্ব থেকে আসা এই রশ্মির উপাদান হল নানা আয়নিত কণা। এই বিকিরণের 'জলপ্রপাত তত্ত্ব' বা 'ঝরনা তত্ত্ব' আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রধান হলেন হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। ভারতের এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীটি কেবল মহাজাগতিক রশ্মি নিয়েই গবেষণা করেন নি, বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকেই তিনি ভারতকে পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আজও মহাজাগতির রশ্মি মহাবিশ্বের এক বিস্ময়। গত একশো বছর ধরে নানা গবেষণা করেও এই শক্তিশালী রশ্মির সঠিক উৎস খুঁজে পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, পৃথিবীতে জীবনের বিবর্তনে এই রশ্মির ভূমিকা নিয়ে।]

মহাজাগতিক রশ্মি হল এক রকম অত্যন্ত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ। এই বিকিরণ নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হয় 1911 খ্রিস্টাব্দে। অস্ট্রীয় পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর এফ হেস [Victor F. Hess] বেলুনের সাহায্যে আকাশে আয়নন প্রকোষ্ঠ [Ionization Chamber] পাঠিয়ে এই বিকিরণ নিশ্চিতভাবেই আবিষ্কার করেন। হেস দেখান যে, বহির্বিশ্ব থেকে আসা এক ধরনের আয়নিত বিকিরণ অহরহ পৃথিবীতে আঘাত করছে। কিন্তু তিনি এই বিকিরণের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারেন নি। তবু 1936 সালে হেসকে তাঁর এই নতুন প্রবর্তনার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এর আগেও বিজ্ঞানীরা এই ধরনের বিকিরণ লক্ষ্য করেছেন। তবে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এই বিকিরণ 'গামা' [Gama] বিকিরণ এবং এটি আলো কিংবা এক্স-রের মত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, তবে এর শক্তি এবং 'ভেদনক্ষমতা' [Penetrating Power] অনেক বেশি। এঁরা এই বিকিরণের নাম দিয়েছিলেন 'মহাজাগতিক রশ্মি' [Cosmic Rays]। পরবর্তীকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেল এই রশ্মি কেন্দ্রকীয় কণিকার সমষ্টি। 1940 সালের গোড়ার দিকে জানা গেল, এই রশ্মিতে রয়েছে মূলতঃ প্রোটন অর্থাৎ আয়নিত হাইড্রোজেন নিউক্লীয়াস। এই বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেললেন নতুন ধরনের কণা, যেমন, মেসন [Meson] এবং হাইপেরন [Hyperon]। নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয় উপ-নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

1950 সালের প্রথম দিকে কণা-ত্বরায়ক যন্ত্র বানানো সম্ভব হল। উচ্চ শক্তির বিকিরণ তৈরি করা সম্ভব হল। এই সব ত্বরায়কের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা আরও যথাযথভাবে করা সম্ভব হল। মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে, জানা গেল মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে অনেক

কথা। এই বিকিরণ এখন পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহাবিশ্বকে জানতে হলে জানতে হবে মহাজাগতিক রশ্মিকে।

মহাজাগতিক এই বিকিরণকে দু'ভাগে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক রকম হল ভূমি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং অন্যটি হল বেলুনবাহিত পর্যবেক্ষণ। একালে অবশ্য উপগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ভূমিভিত্তিক পরীক্ষাগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছে শক্তিশালী এই বিকিরণের পৃথিবীতে আসার দিক। এর শক্তি, এর ধারা জানা যায় ভূমিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে। বিশ্লেষণ থেকে আরও জানা গেছে, সূর্যের থেকেও বিক্ষিপ্তভাবে মহাজাগতিক রশ্মি নির্গত হয়।

বেলুন, রকেট ও উপগ্রহের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণায় পাওয়া যায় প্রাথমিক বা মুখ্য মহাজাগতিক বিকিরণের গুণাবলী, প্রকৃতি, বিশেষ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার আগে এই বিকিরণের প্রকৃত অবস্থা। অর্থাৎ প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগে কী কী গুণাবলী সম্পন্ন, তা জানা যায় রকেট বা উপগ্রহদের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে। বেলুনের সাহায্যে গবেষণায় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে বেলুন যতটা উঠছে তার উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডল। আবার রকেট বাহিত উপগ্রহ এমন কি বেলুনও উচ্চতম শক্তিস্তরের বিকিরণ-কণা পর্যবেক্ষণ করতে পারে না, কারণ এর জন্য যে ধরনের বড় বড় যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়, সেগুলি বেলুন বা রকেট কিংবা উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া, এই ধরনের উচ্চতম শক্তিস্তর সম্পন্ন কণা ওই বিকিরণে খুব কমই থাকে। সুতরাং রকেট ও উপগ্রহ দিয়ে যে বিকিরণের পরিমাপ এবং গবেষণা ইত্যাদি করা হয়ে থাকে, সেগুলি নিম্নতর শক্তিস্তরের মহাজাগতিক বিকিরণ। এই বিকিরণই পরিমাণে অনেক বেশি। আবারো বলি, বেলুন দিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ, বেলুন বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে পারে না। বেলুন যতটা উপরে ওঠে তার উপরের বায়ুমণ্ডল প্রাথমিক মহাজাগতিক বিকিরণকে প্রভাবিত করে। ওই বায়ুস্তরের সঙ্গে বিকিরণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক রূপ আর থাকে না। তাই সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপগ্রহই এখন বেশি ব্যবহৃত হয় মহাজাগতিক রশ্মি পর্যবেক্ষণের জন্য।

মহাজাগতিক রশ্মির চিহ্নিতকরণ এবং এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করা—দুইই অত্যন্ত জটিল। এ সংক্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটি পদ্ধতি হল 'ট্র্যাক ভিসুয়ালাইজেশন' [Track Visualization] বা 'পথ দৃষ্টিগোচর করণ' পদ্ধতি। অন্যটি হল 'ইলেকট্রনিক কাউন্টিং টেকনিকস' পদ্ধতি [Electronic Counting Techniques Method] বা 'ইলেকট্রনিক গণন কৌশল' পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে মহাজাগতিক রশ্মির পথকে দৃষ্টিগোচব করা হয় এবং তার ছবি নেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিকিরণ কণার পুরো কিংবা খানিকটা শক্তিকে রূপান্তরিত করা হয় 'বৈদ্যুতিক ঘাত' [Electrical Impulse]-এ। এরপর ওই ঘাত রেকর্ড করা হয়।

'পথ দৃষ্টিগোচর করণ' পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় উইলসন ক্লাউড চেম্বার বা মেঘকক্ষ [Wilson Cloud Chamber], স্পার্ক চেম্বার [Spark Chamber] এবং বিশেষ ধরনের আলোকচিত্রীয় অবদ্রব [Emulsion]। এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিকিরণ কণাগুলির শ্রেণী বা প্রকৃতি জানা যায়। একটি নির্দিষ্ট মহাজাগতিক রশ্মি তৈরি করা নিউক্লীয় কণাগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় আলোকচিত্রে এদের পথগুলির প্রকৃতি দেখে। এদের খুঁজে বের করার জন্য শোষণকারী পদার্থসমূহের এবং কিছু উপরিপন্ন [Superimposed] চৌম্বকক্ষেত্রের স্তরসমূহ ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে মহাজাগতিক রশ্মির পথ এবং তার কণাসমূহের প্রকৃতি এইভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

ইলেকট্রনিক গণন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়, গাইগার কাউন্টার [Geiger Counter], আনুপাতিক গণক [Proportional Counter], আয়নন প্রকোষ্ঠ [Ionization Chamber], প্রস্ফুরণ আলোকবৈদ্যুত পরিবর্ধক পদ্ধতি [Scintillation Photomultiplier System], সেরেনকোভ আলো-আলোকবৈদ্যুত পরিবর্ধক পদ্ধতি [Cerenkov Light-photomultiplier System] এবং কঠিন-অবস্থা অভিজ্ঞাপক [Solid State Detectors]। এইসব যন্ত্রপাতি এবং তাদের সঙ্গে শোষণকারী পদার্থের স্তর এবং উপরিপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের স্তর ব্যবহার করে জানা যায় মহাজাগতিক বিকিরণের কণাগুলিকে, জানা যায় তাদের প্রকৃতি, তাদের শক্তি, তদের আসার দিক এবং পৃথিবীতে আসার হার। মহাজাগতিক রশ্মির গতিপথের প্রকৃতি এবং তার কণাগুলির গুণাবলী নির্ণয় করতে বেশ জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় ওই সব যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েও।

বহু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার পর এখন মহাজাগতিক রশ্মির উপাদান সম্পর্কে বহু তথ্যই জানা সম্ভব হয়েছে। তুলনামূলকভাবে এর প্রকৃতি এখন অনেকটাই সুপরিচিত। মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতি জানতে হলে পৃথিবীতে যে সব বিকিরণ আসছে তাদের কথা জানা দরকার। পৃথিবীতে আসা বিকিরণগুলির মধ্যে আছে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতারতরঙ্গ, মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দৃশ্যমান আলোক, ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্সরে এবং গামারশ্মি। এইসব তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ ছাড়া রয়েছে আয়নিত কণার বিকিরণ, যা মহাজাগতিক বিকিরণ। এই বিকিরণে রয়েছে নানা আয়নিত কণা। এই আয়নিত কণাগুলিতে থাকে মুখ্যতঃ প্রোটন বা হাইড্রোজেনের আয়নিত কেন্দ্রক, আর থাকে লোহা, কোবাল্ট ও নিকেলের আয়নিত কেন্দ্রক। যদিও একেবারে নির্দিষ্ট করে প্রমাণিত হয়নি, তবুও বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, ইউরেনিয়ামের আয়নিত ভারী কেন্দ্রকও থাকে ওই কণা বিকিরক মহাজাগতিক রশ্মিতে। এছাড়া অন্যান্য ভারী আয়নিত কণাও থাকছে ওই বিকিরণে বা রশ্মিতে।

এতে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় থাকছে হাইড্রোজেন কেন্দ্রক, যার পরিমাণ 87% এবং এরপরেই হিলিয়াম কেন্দ্রকের প্রাধান্য—প্রায় 12%। হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের আয়নিত অবস্থা হল প্রোটন-কণা এবং হিলিয়ামের আয়নিত কেন্দ্রক হল 'আলফা-কণা' [Alpha Particles]। এতে খুব স্বল্প পরিমাণে রয়েছে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কারবন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন প্রভৃতির আয়নিত কেন্দ্রক। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে থাকে ভারী মৌলের আয়নিত কেন্দ্রক। এইসব কেন্দ্রকের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, নক্ষত্র ইত্যাদির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বর্ণালিবীক্ষণ থেকে জানা যাচ্ছে, মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে ওইসব পদার্থ বা তাদের আয়নিত কেন্দ্রক। এগুলিই আসছে পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মি হিসাবে।

তবে হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেছে, ভারী মৌলগুলির কেন্দ্রকদের উপস্থিতি কম হলেও মহাজাগতিক রশ্মিতে এদের অধিকাংশেরই উপস্থিতির শতকরা হার অনেকটাই বেশি এবং নক্ষত্রগুলিতে ওই পদার্থগুলির উপস্থিতির পরিমাণের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশ বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহাজাগতিক রশ্মিতে যে পরিমাণ লৌহ-কেন্দ্রক আছে, তা নক্ষত্রগুলিতে কিংবা মহাবিশ্বে থাকা মোট লোহার পরিমাণের তুলনায় প্রায় 50 গুণ বেশি। অর্থাৎ মহাবিশ্বে মোট লোহার থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ পাওয়ার কথা, তার চেয়ে 50 গুণ বেশি বিকিরণ রয়েছে মহাজাগতিক রশ্মিতে। এই পার্থক্যের প্রকৃত কারণ অজানা।

মহাবিশ্বে বিভিন্ন পদার্থের প্রাচুর্য এবং মহাজাগতিক রশ্মিতে তাদের আয়নিত কেন্দ্রকদের উপস্থিতির তুলনামূলক আলোচনা করলে আরো অনেক পার্থক্য চোখে পড়ে। মহাবিশ্বে যতটা লিথিয়াম রয়েছে তার থেকে যে পরিমাণ লিথিয়াম কেন্দ্রকের বিকিরণ হওয়ার কথা, পৃথিবীতে আসা মহাজাগতিক

রশ্মিতে তার প্রায় 100,000 গুণ বেশি আয়নিত লিথিয়াম কেন্দ্রক রয়েছে। আবার ফ্লোরিন, সালফার এবং আরগনের আয়নিত কেন্দ্রক অনেকটা কম পরিমাণেই আছে মহাজাগতিক রশ্মিতে। এইসব পার্থক্যের মূল কারণ, সম্ভবত এর উৎসের উপাদানের উপর এবং ভারী কণাগুলির আন্তর্নক্ষত্র গ্যাসীয় পরমাণু ও ফোটন কণাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ভেঙ্গে যাওয়ার উপর নির্ভর করে। মহাজাগতিক রশ্মির আন্তর্নক্ষত্র পথ-পরিক্রমার কথা প্রমাণ করে এইসব পার্থক্য। মহাজাগতিক রশ্মিতে কিছু ইলেকট্রনও থাকে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল, তা মূলতঃ প্রাথমিক বা মুখ্য মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কে, যে বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে নি। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ভূ-পৃষ্ঠে যে বিকিরণ পৌঁছায় তার প্রকৃতি ওই প্রাথমিক বিকিরণের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য সংঘর্ষের পর, যেগুলিকে বলা হয় কেন্দ্রকীয় মিথষ্ক্রিয়া, মহাজাগতিক রশ্মির অবশেষ 'জলপ্রপাত' [Cascade] হয়ে ভূপৃষ্ঠে পড়তে দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ-কণা হল 'মিউওন' [Muon]। প্রথমে এর নাম দেওয়া হয় 'মিউ-মেসন' [Mu-meson]। এর বর্তমান নাম 'মিউওন'। এছাড়া আরও যেসব বিকিরণ-কণা ভূ-পৃষ্ঠে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে আসছে, সেগুলি হল ঃ প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, পজিট্রন এবং 'নিউট্রিনো' [Neutrino]। এগুলি তৈরি হয় বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির কেন্দ্রকীয় মিথষ্ক্রিয়ায়। এই কণাগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে 'পথ দৃষ্টিগোচর করণ' পদ্ধতিতে।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস কোথায় তা আজও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয় নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তথা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে এটি আজও এক হেঁয়ালি। মহাজাগতিক রশ্মির 'মহাজাগতিক' শব্দটি সম্ভবত ভ্রমাত্মক। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই রশ্মি মহাবিশ্ব থেকে আসছে না, আসছে সম্ভবত আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য থেকেই। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীরই এই ধরনের নিজস্ব বিকিরণ আছে। বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি এবং উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করেই এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন। মহাজাগতিক রশ্মি কোনও ব্রহ্মাণ্ডের নিজস্ব বিকিরণ, মহাবিশ্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে 10,000 কোটি নক্ষত্র। এর ব্যাস মোটামুটি 100,000 আলোকবর্ষ এবং এর বেধ প্রায় 1000 আলোকবর্ষ। মহাজাগতিক রশ্মির উৎস এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই অবস্থিত বলে মনে করছেন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা।

মহাবিশ্বে রয়েছে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সী এবং তাদের অনেকগুলিতেই এই ধরনের বিকিরণ রয়েছে। বেতার-জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। এটা জানা যে, মহাজাগতিক রশ্মির ইলেকট্রন যখন চৌম্বকক্ষেত্রে গতিশীল হয়, তখন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি—বেতার তরঙ্গের মত। এই ধরনের বেতার তরঙ্গ যে শুধু আমাদের গ্যালাক্সী থেকেই নির্গত হচ্ছে তা নয়, আরও বহু গ্যালাক্সী থেকে অনুরূপ বেতার তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে। সুতরাং ওই সব গ্যালাক্সীরও নিজস্ব মহাজাগতিক রশ্মি রয়েছে।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস নিয়ে নানা অনুসিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কোনও অনুসিদ্ধান্তকে আজও তত্ত্ব [Theory] বলা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অসুবিধা হল, এই বিকিরণের প্রবল শক্তির উৎসের সঠিক ব্যাখ্যার অভাব। এই বিকিরণ কোথা থেকে এতো শক্তি পায় তা অজানা। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একটি ঘরের মধ্যে থাকা বাতাসের একটি অণুর তাপীয় গতিশক্তি, মোটামুটি 1/20 ইলেকট্রন-ভোল্ট। এক ইলেকট্রন-ভোল্ট হল সেই পরিমাণ শক্তি, যে শক্তি কোনও ইলেকট্রন লাভ করে এক ভোল্ট বিভব বৃদ্ধির জন্য। মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি হল কয়েকশো কোটি

ইলেকট্রন ভোল্ট [Electron Volt বা EV]। সবচেয়ে বেশি শক্তির মহাজাগতিক রশ্মি এতাবৎ যা পাওয়া গেছে তা হল 10,00,000 কোটি কোটি [10^{20}] ইলেকট্রন-ভোল্ট। প্রকৃতিতে পাওয়া সব আয়নিত কণার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কণা হল মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলি। মনে রাখতে হবে, 10,00,000 কোটি কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট হল 10^{20} ইলেকট্রন-ভোল্ট। মানুষের তৈরি এবং প্রকৃতির সৃষ্টি করা বিভিন্ন কণার শক্তিস্তর এইরকমঃ

1] ঘরের উষ্ণতায় বাতাসের অণু	10^{1}	ইলেকট্রন-ভোল্ট	
2] রোগ নির্ণায়ক এক্সরে	10^{4}	,,	,,
3] পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে পরমাণু	10^{7}	,,	,,
4] মানুষের তৈরি কণা ত্বরায়ক যন্ত্রের প্রোটন	10^{6} - 10^{11}	,,	,,
5] নিম্নশক্তি মহাজাগতিক রশ্মি	10^{9}	,,	,,
6] ক্র্যাব নেবুলার ইলেকট্রন	10^{12}	,,	,,
7] সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি	10^{20}	,,	,,

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস নিয়ে দু'রকম তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। একটা তত্ত্ব বলছে মহাজাগতিক রশ্মি নির্গত হচ্ছে বিন্দুবৎ কোনও উৎস থেকে এবং তা সম্ভবত নক্ষত্রগুলি। অন্য তত্ত্ব হল, কণাগুলি শক্তি লাভ করছে চলমান চৌম্বক ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সাময়িক সংঘর্ষের ফলে এবং এই সংঘর্ষ ঘটে চলেছে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন, এই সব অতি শক্তিশালী কণারা উৎপন্ন হয়েছে সুপারনোভা বিস্ফোরণ ফলে। তাদের মতে সুপারনোভাগুলিই মহাজাগতিক রশ্মির উৎস। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মহাকাশের একটা অঞ্চল যেখানে মহাজাগতিক রশ্মির ইলেকট্রন অত্যন্ত বেশি পরিমাণে রয়েছে, সেই অঞ্চল থেকে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে। আর এই অঞ্চলটা হল 'কর্কট নীহারিকা' [Crab Nebula] যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলটাই। এই নীহারিকাটি তৈরি হয়েছে 1054 খ্রিস্টাব্দে দেখা এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে। তবে ঠিক 1054 সালেই এটি বিস্ফোরিত হয়েছিল তা নয়, এর বিস্ফোরণটা পৃথিবী থেকে প্রথম দেখা গিয়েছিল ওই সালে। তা দেখেছিলেন চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্য পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

জীববিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে দুটি কারণে খুবই আগ্রহী। প্রথমটি হল, সূর্য মাঝে মাঝে কম-শক্তির মহাজাগতিক রশ্মি নির্গত করে এবং এই বিকিরণ মহাকাশযাত্রীদের বেশ কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই বিকিরণ মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক তা নিয়ে গবেষণা চলছে। চেষ্টা চলছে এই বিকিরণ মানুষের কতটা ক্ষতি করছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার। দ্বিতীয়টি হল, যেহেতু বিকিরণ জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিব্যক্তি [Mutation] তৈরি করে, সে কারণে অনুমান করা হয়, মহাজাগতিক রশ্মি হয়ত পৃথিবীর জীবকুলের পরিব্যক্তিতে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতীতে মহাজাগতিক রশ্মি আরও অনেক প্রাকৃতিক ভারসাম্য অনেকটা নষ্ট করেছে। এখন এও মনে করা হয় যে, ডায়নোসরাসরা লুপ্ত হয়েছিল মহাজাগতিক রশ্মির হঠাৎ বেশি মাত্রায় অন্তঃপ্রবাহের [Influx] কারণে। এই অন্তঃপ্রবাহ প্রাকৃতিক ভারসাম্য এতোটাই নষ্ট করে দেয় যে ডায়নোসরাসদের বংশবিস্তার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জিনের পরিব্যক্তিই [Mutation] এই মহা বিনাশের কারণ হতেও পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কোনও এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি এই সময় পৃথিবীতে আসার ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় প্রবলভাবে। বদলে যায় ডায়নোসরাসের জিনের গুণাবলী। প্রায় 6 কোটি

বছর ধরে টিকে থাকা এই বিশাল প্রজাতিটি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে।

মহাজাগতিক রশ্মি জিনের পরিব্যক্তি ঘটায় কিনা, কিংবা ঘটালেও ঠিক কতটা পরিমাণে ঘটায় এবং তা কতটা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। আরও বহু গবেষণার প্রয়োজন। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব যদি সত্যিই ডায়নোসারদের নিশ্চিহ্ন করে থাকে, তা হলে তো এই ভয়ঙ্কর রশ্মি সম্পর্কে আরও অনেক বেশি করে জানার দরকার আছে। বিশেষ করে, এর প্রভাব প্রাণীকুলের তথা জীবজগতের উপর ঠিক কতটা, তা এখনই নির্ণয় করা প্রয়োজন। কেবল 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নয়, মহাজাগতিক রশ্মি নিয়েও চিন্তা করার সময় এসেছে এখন। মানব সভ্যতার তথা পৃথিবীর জীবনে সংকট আনতে পারে এই মহাজাগতিক রশ্মি। তাই সভ্যতাকে বাঁচাতে, জীবনকে বাঁচাতে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। জানতে হবে, এই রশ্মি জীবের জিনের কেমন ধরনের কতটা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সতিাই এই রশ্মি ডায়নোসরাসদের বিলুপ্তির কারণ কিনা তাও জানতে হবে সঠিকভাবেই। সুতরাং মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে পৃথিবীর সভ্যতা, পৃথিবীর জীবকুলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে। এখন ফিরে আসি মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের প্রথম দিকের কথায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে, কোনো স্বর্ণপত্র তড়িৎবীক্ষণকে (Gold Leaf Electroscope) তড়িতাহিত করে খুব ভালোভাবে অন্তরিত করে রাখা হলেও ওই তড়িৎবীক্ষণ থেকে তড়িতাধান ধীরে ধীরে ক্ষয় পেয়ে যায়। এমন কি তড়িৎবীক্ষণকে সীসার আস্তরণে ঢেকে রাখা সত্ত্বেও তড়িতাধানের ক্ষয় হতে দেখে বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করলেন যে, ভূপৃষ্ঠে সব সময় কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশে থাকে এবং ওদের নির্গত রশ্মি তড়িৎবীক্ষণকে তড়িৎমুক্ত করে। অবশ্য তড়িৎবীক্ষণকে সীসার আস্তরণে ঢেকে রাখলে এই তড়িৎ মুক্তির হার অনেকটা মন্থর হয়ে পড়ে। জার্মান বিজ্ঞানী গোকেল্ (Gockel) বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 1909 সালে একটি তড়িতাহিত তড়িৎবীক্ষণকে বেলুনে করে অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে তড়িৎবীক্ষণের তড়িৎ মুক্তির হার ভূ-পৃষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, এই ঘটনা ভূ-পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় বস্তুর কারণে ঘটছে না। এরপর 1911 সাল থেকে 1914 সাল অবধি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুই জার্মান বিজ্ঞানী হেস (Hess) এবং কোলহোর্স্টার (Kolhorster) লক্ষ্য করলেন যে, মাটি থেকে যত ওপরে ওঠা যায়, তড়িৎবীক্ষণের মুক্তির হারও তত বেশি হয়। তাঁরা মন্তব্য করলেন যে, এই রশ্মি বা বিকিরণের উৎস্থল এই বায়ুমণ্ডল নয়, এই মহাবিশ্ব। দেখা গেল প্রায় 9 কিলোমিটার উঁচুতে এই রশ্মি বা বিকিরণের পরিমাণ ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 5 থেকে 10 গুণ। এর তীব্রতা বা বিকিরণ ঘনত্ব যত উঁচুতে যাওয়া হচ্ছে ততই বাড়ছে। এই রশ্মির উৎপত্তিস্থল পৃথিবীর বাইরের মহাশূন্য কিংবা মহাজগৎ হওয়ায় বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী মিলিকান (Millikan) এই রশ্মির নাম দিলেন Cosmic Rays এবং যা বাংলায় 'মহাজাগতিক রশ্মি'।

মহাজাগতিক রশ্মির 'ভেদ-শক্তি' (Penetration Power) অত্যন্ত বেশি। একস্-রে কিংবা গামা-রশ্মির তুলনায় অনেক বেশি। 1923 থেকে 1926 সাল অবধি মিলিকান ও তাঁর সহযোগীরা সমুদ্রের গভীরে এবং খনির ভিতরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখালেন, পৃথিবীর উচ্চ চৌম্বক অক্ষাংশে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা নিম্ন চৌম্বক অক্ষাংশের তুলনায় বেশি। এতে প্রমাণিত হল, এই রশ্মি তড়িৎগ্রস্ত কণার দ্বারা তৈরি এবং পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র বিক্ষিপ্ত করার ফলে বিভিন্ন অক্ষাংশে এই

রশ্মির তীব্রতার বিভিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার এও দেখা গেল যে, পশ্চিম দিক থেকে বেশি সংখ্যায় কণা আসছে, পূর্বদিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম (East-West Effect)।

আগেই বলেছি, এই রশ্মি কোথায় এবং কীভাবে তৈরি হচ্ছে তা এখনও জানা যায় নি। তবে এই রশ্মি অতি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন। এতে যেমন 10^9 বা 10^{10} eV বা ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন কণারা আছে তেমনি আছে 10^{18} eV বা 10^{18} ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন কণারা। এদের ভেদশক্তি অত্যন্ত প্রবল। সূর্য এবং কোনো কোনো নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন, যেমন 10^{12} eV বা ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন কণা বিকিরণ করে থাকে। কিন্তু 10^{18} eV শক্তি সম্পন্ন, কণার উৎপত্তি স্থল কোথায় তা বৈজ্ঞানিকদের আজও অজানা। আর তা 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' অর্থাৎ আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভবত নয়। এখন তো আবার 10^{20} eV শক্তিসম্পন্ন কণারাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে মহাজাগতিক রশ্মি মূলতঃ ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত পারমাণবিক নিউক্লীয়াস বা প্রোটন দিয়ে গঠিত। এই অবস্থার মহাজাগতিক রশ্মির নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রাথমিক রশ্মি' (Primary Radiation)। প্রাথমিক রশ্মির বেশিটাই তড়িৎগ্রস্ত 'প্রোটন'। প্রাথমিক রশ্মি আবহমণ্ডলে প্রবেশ করলে রশ্মির কণাগুলির সঙ্গে আবহমণ্ডলের পরমাণুদের সংঘাত হয়। এর ফলে বিভিন্ন রকমের তড়িৎগ্রস্ত কণা উৎপন্ন হয়। এই কণাগুলির মধ্যে অতি বিখ্যাত হল পজিট্রন (Positron) এবং মেসন বা মেসট্রন (Mesotron)। এরা দ্বিতীয় পর্যায়ের কণা (Secondary Particle) এবং এদের সঙ্গে মিলে মহাজাগতিক প্রাথমিক রশ্মি হয়ে ওঠে Secondary Radiation বা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকিরণ।

পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ ঘটে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে। এর এই বর্ষণের একটা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে—Cosmic Ray Showers বাংলায় বললে দাঁড়ায় মহাজাগতিক রশ্মির 'পশলা বর্ষণ'। 'Showers' হল সেই ধরনের রশ্মি বর্ষণ যেখানে রশ্মিগুলো দলে দলে পৃথিবীতে আসে একটা নির্দিষ্ট সাধারণ কারণ থেকে সৃষ্টি হয়ে এবং এই Shower-এর উৎপত্তিটা কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত, কোনো আপতন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বিজ্ঞানের ভাষায়, Showers is the name given to a very interesting Cosmic ray phenomenon, in which the rays arrive in groups that appear to have been produced simultaneously by some common cause, i, e without becoming associated merely by chance.

1932 সালে Rossi এবং 1933 সালে Blackett ও Occhialini তাদের Counter Controlled Cloud Chamber (বাষ্পীয় প্রকোষ্ঠ)-এর সাহায্যে আবিষ্কার করলেন, মহাজাগতিক রশ্মির এই 'পশলা-বর্ষণ' বা Showers। Shower-এ প্রায় সম সংখ্যক পজিট্রন ও ইলেকট্রন থাকে। ফোটনও থাকে কিছু সংখ্যক। ফোটনের সংখ্যা অন্যান্য আয়নিত কণাদের তুলনায় অনেক বেশিই থাকে। 1936 সালে Anderson ও Neddermeyer তাঁদের Counter Controlled Cloud Chamber-এ 3.5 মিঃ মিঃ পুরু সীসার পাত লাগিয়ে 7,900 Gauss- এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড-এ রেখে দেখলেন যে, Pasadena (সমুদ্রতল)-তে তোলা 2,684 টি মহাজাগতিক রশ্মির অলোকচিত্রের মধ্যে 383টিতে Shower রয়েছে। কিন্তু Pike's Peak(4,300 মিটার)-এর 1775টি আলোকচিত্রের 752টিতে Shower পাওয়া গেল। উভয় স্থানে দুটি কণার Shower-ই বেশি ছিল। Pike's Peak-এর আলোকচিত্রগুলিতে 6টি থেকে 10টি কণাযুক্ত Shower-এর অস্তিত্বও চিত্রায়িত হয়েছিল। বেশি উচ্চতায় বেশি সংখ্যক Shower -এর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আবার দেখ গেল, মাঝে মাঝে মহাজাগতিক রশ্মির আয়নিতকরণের মাত্রাটা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। এই মাঝে মাঝে 'অতি আয়নন' (Excessive Ionization)-এর নাম দেওয়া হয়েছে 'Burst'। তা হলে, মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক কণাগুলি পৃথিবীতে এসে দুটো ঘটনা তৈরি করছে। একটার ফলে তৈরি হচ্ছে Cosmic Ray Showers এবং অন্যটার ফলে হচ্ছে 'Bursts'। প্রথম প্রথম এ দুটোকে আলাদা ঘটনা বলে মনে করা হলেও, পরবর্তীকালে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে 'Showers' এবং 'Bursts' প্রায় একই।

যাইহোক, মহাজাগতিক রশ্মির এইসব Showers এবং Bursts, যার মূলকণাগুলি ইলেকট্রন এবং ফোটন, যে তত্ত্বের সাহায্যে যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হয় তার নাম 'Cascade Theory'। 'Cascade' মানে জলপ্রপাত। সুতরাং Cascade Theory, হল 'জলপ্রপাত-তত্ত্ব' কিংবা 'ঝরনা তত্ত্ব'। 'Shower' এর বাংলা হল 'ধারা', 'বারিপাত', 'বৃষ্টিপাত' ইত্যাদি। মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষেত্রে 'ধারা' কথাটি সম্ভবত 'Shower'-এর ভাবটা খানিকটা আনতে পারে। তবে Shower কথাটা নিঃসন্দেহে অনেকটা বেশি অর্থবহ। আবার মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর উপর অবিরাম জলপ্রপাতের মতো ঝরে পড়ছে বলেই বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির ওই ধারা এবং Bursts-এর ব্যাখ্যাকারী তত্ত্বের নাম দিয়েছেন 'ঝরনা তত্ত্ব' [Cascade Theory]। এই তত্ত্ব 'সমান্তরিত ধারা' [Collimated Showers] সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিলেও, অসমান্তরিত বা অনক্ষীকৃত [Non-Collimated] ধারা সম্পর্কে যথাযথ তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা এখনও দিতে পারে নি।

1937 সালের আগে মহাজাগতিক রশ্মি ধারার গুণ-ধর্ম-প্রকৃতি-চরিত্র-শ্রেণী ইত্যাদির নানান ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও এর পরিমাণ-সংখ্যা-মাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। অর্থাৎ 1937 সালর অগে মহাজাগতিক রশ্মির আঙ্গিক [Qualitative] ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও, এর মাত্রিক [Quantitative] ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। এ নিয়ে গবেষণা চলছিল। 1937 সালে এর তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ওই বছর অধ্যাপক হোমি জাহাঙ্গির ভাবা [Homi Jehangir Bhabha] এবং ওয়েৰ্নার হাইটলার [Werner Heitler] দুজনে মিলে লন্ডন থেকে ঝরনা-তত্ত্বের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মিধারার 'মাত্রিক' ব্যাখ্যা দেন। ওই একই বছরে একই ধরনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন কার্লসন [Carlson] এবং ওপেনহাইমার [Oppenheimer] আমেরিকাতে বসে এবং আলাদাভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে। এ নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই করা হচ্ছে। এইভাবে ভাবা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলেন 1937 সালে এবং স্বীকৃতি পেলেন বিশ্ববিজ্ঞানী হিসাবে। প্রসঙ্গতঃ ভাবা এবং তাঁর গবেষণা সম্পর্কে সামান্য কিছু বলে নেওয়া যাক।

1909 সালের 30শে অক্টোবর বোম্বাইয়ের এক ধনী পার্সি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। তাঁর এক মাসিমার বিয়ে হয়েছিল বোম্বাই-বাসী শিল্পপতি টাটা পরিবারে। সেই সূত্রে টাটা পরিবারে যাতায়াত ছিল তাঁর সেই ছোটোবেলা থেকে। ফলে শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ গড়ে ওঠে। এই দুটি ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। মূলতঃ বিজ্ঞানী হলেও শিল্প ও ব্যবসাটা তিনি অনেকটা সহজাত বোধ থেকেই যেন বেশ ভালোভাবে বুঝতেন। ছোটোবেলা থেকে তাঁর লক্ষ্য ছিল তিনি শিল্পপতি হবেন। বোম্বাইয়ের পার্সি পরিবারের অধিকাংশই নামী দামি ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি শিল্প-বাণিজ্যের যে স্বাভাবিক প্রবণতা লাভ করেন, তারই আরও উন্নতি সাধন ছিল তাঁর ছেলেবেলার লক্ষ্য। পরিবারের সকলেই গতানুগতিকভাবে চাইতেন ভাবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হোন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে শিল্পপতি হয়ে উঠুন। বিশেষ করে টাটা পরিবার তাঁকে শিল্পপতি হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু বান্দা ভাবে এক খোদা করে আর।

এটা ভাবার জীবনে যেমন সত্য হয়েছিল বোধ হয় আর কারো জীবনে তা হয়নি।

1927 সালে আঠারো বছর বয়সে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Gonville and Caius কলেজে ভর্তি হন। ঠিক হয় তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবেন ও টাটাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দেবেন। কার্যত দেখা গেল তাঁর সহজাত প্রতিভা বলে তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে B.A. ডিগ্রি লাভ করেছেন 1930 সালে। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানই তখন তাঁর মূল পাঠ্য বিষয় হয়ে গেছে। কোথায় তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবেন, তা না হয়ে তিনি হলেন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র বা পরবর্তীকালের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। বি. এ. পড়ার সময় পল এ. এম. ডিরাক (Paul A. M. Dirac) ছিলেন তাঁর অধ্যাপকদের অন্যতম। এরপর পদার্থবিজ্ঞানের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে এবং ইঞ্জিনিয়ার হয়ে শিল্পপতি হওয়ার ইচ্ছা মন থেকে পুরোপুরি মুছে যায়। শুরু করেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে নিবিড় গবেষণা। ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবোরেটরিতে তাঁর গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 1935 সালে তিনি Ph D ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'Electron Showers Produced by Cosmic Rays.'

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) নিয়ে ক্যাভেন্ডিশ পরীক্ষাগারে তিনি এরপরও গবেষণা চালিয়ে যান এবং 1939 সাল অবধি এখানে কাজ করেন। এই সময় তিনি ইউরোপের বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং এগুলির সঙ্গে তাঁর লব্ধ জ্ঞানের আদান-প্রদান শুরু হয়। মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays) নিয়ে গবেষণা তখন সবেমাত্র প্রাথমিক স্তর পেরিয়েছে। ভাবার নতুন তত্ত্ব ও আবিষ্কারসমূহ তাতে বিপুল ত্বরণ যোগাল। ইউরোপ ভ্রমণের সময় রোমে এনরিকো ফের্মি (Enricho Fermi), জুরিখে উলফগ্যাংগ পউলি (Wolfgang Pauli) এবং কোপেনহেগেনে নীলস্ বোর (Niels Bohr) ও তাঁদের গবেষক দলবলের সঙ্গে ভাবার বহু আলোচনা হয় তাঁর নতুন আবিষ্কৃত তত্ত্ব নিয়ে। এঁদের পরীক্ষাগারগুলি তিনি অনেকবারই ঘুরে আসেন 1935 সাল থেকে 1939 সালের এই চার বছরে। 1939 সালের মধ্যে তাঁর কুড়িটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। এইগুলি সম্পর্কে তাঁর সহযোগী বৈজ্ঞানিক ওয়ের্নার হাইটলার (Werner Heitler) বলেছিলেন যে, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে ভাবার নাম অমর করে রাখতে এই 20টি গবেষণাপত্রই যথেষ্ট। ভাবা 1940 সালে 'ফেলো অব রয়াল সোসাইটি' (FRS) নির্বাচিত হন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়শুনোর সময় ভাবা জওহরলাল নেহরুর সংস্পর্শে আসেন। নেহরু ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র। তাছাড়া টাটা পরিবারও জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং ওই পরিবারের আনুকূল্যে ভাবা ছেলেবেলা থেকেই বহু জাতীয়তাবাদী নেতার সংস্পর্শে আসেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বহু জাতীয় নেতার সাহচর্য লাভ করেন অল্প বয়সেই এই টাটা পরিবারের কল্যাণে। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শেও তিনি এসেছিলেন এইভাবে এবং ছাত্রাবস্থাতেই। ফলস্বরূপ ভাবার মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে খুব বেশি সময় লাগে নি। এই বোধই নিজের দেশে ফিরে এসে দেশের বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটাতে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁকে। 1939 সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় ভাবা ভারতে ফিরলেন ছুটি কাটাতে। কিন্তু ফেরা হল না তাঁর কেম্ব্রিজে। অন্তরের দেশাত্মবোধের সেই আকুল প্রেরণাই তাঁকে আটকে রাখল ভারতবর্ষে। ব্যাঙ্গালোরের Indian Institute of Science-এর পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে কাজে লেগে পড়লেন সেই 1939 সালেই।

1942 সালে ওই ইনস্টিটিউটের মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ভাবা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। আচার্য জগদীশচন্দ্র

বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখেরা কলকাতাকে করেছিলেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। ভাবা যে সময় ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তখনও কলকাতা তার এই গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত। ভাবা কিন্তু কলকাতায় এলেন না। তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করলেন তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স-এ।

1909 সালে জামশেদজি টাটার দানে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। বোম্বাই নিবাসী এই বিশ্বখ্যাত শিল্পপতি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের আত্মনির্ভরতা আসতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে। বিজ্ঞানচর্চাই ভারতের উন্নতি ও স্বনির্ভরতার চাবিকাঠি এটা তিনি মনে প্রাণে জানতেন। ফলে তাঁরই দানে বিজ্ঞানচর্চার এই কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে দক্ষিণ ভারতে। তবে 1933 সালের আগে অবধি প্রতিষ্ঠানটি গতানুগতিকভাবে চলছিল, কিন্তু জোয়ার এল 1933 সাল থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক (Palit Professor) নোবেল-জয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ওই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন 1933 সাল থেকে। রামনের চেষ্টায় টাটার সাহায্যে ব্যাঙ্গালোরের এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ভাবার সঙ্গে টাটা পরিবারের পরিচয় থাকার সুবাদে টাটাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া অনেক সহজ হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি যে পরাধীন ভারতের কী ভীষণ প্রয়োজন সে সম্পর্কে বারে বারে জোরালো বক্তব্য রাখেন ভাবা বিভিন্ন সময়ে। ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব্ সায়েন্স-এর সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে ভাবার এই সব বক্তব্য টাটা ট্রাস্ট (Tata Trust) মেনে নেন এবং তাঁর প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করতে রাজি হন। টাটা পরিবারের সঙ্গে ভাবার আত্মীয়তা এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

1944 সালে ভাবা প্রস্তাব দিলেন টাটা ট্রাস্টকে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান খুলবার জন্য যেখানে পদার্থবিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্রের উপর উচ্চ গবেষণা সম্ভব হবে। এখানে মহাজাগতিক রশ্মি ও পরমাণু বিজ্ঞানের উপর গবেষণার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। তাঁর পরিকল্পিত এই প্রতিষ্ঠানটি হবে বিশ্বের খ্যাতনামা ল্যাবোরেটরিগুলির অন্যতম। টাটা ট্রাস্ট তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন। 1945 সালে গড়ে উঠল 'Tata Institute of Fundamental Research' (TIFR) ওই ব্যাঙ্গালোরেই। আর ভাবা নিযুক্ত হলেন তার প্রথম পরিচালক। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে ভাবার চেষ্টায় ও টাটার আনুকূল্যে TIFR-এর শাখা প্রতিষ্ঠান খোলা হল বোম্বাইয়ে। সুতরাং ভাবার উদ্যোগে এবং চেষ্টায় ব্যাঙ্গালোর ও বোম্বাইয়ে গড়ে উঠল TIFR সেই 1945 সালে—পরাধীন ভারতবর্ষে। সমস্ত অর্থ যোগালেন টাটা ট্রাস্ট (Tata Trust)। এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য ভাবা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা তুলনাবিহীন। ভারতবর্ষকে বৈজ্ঞানিক যুগধারার সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চালাতে পেরেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের আজকের এই বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক উন্নতির হোতাদের অন্যতম তাই হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। ভারতের ছয় জন পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর নাম করলে তাই ভাবার নাম আনতেই হয়। কারণ তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের সঙ্গে সমান তালে চলতে শিখিয়েছিলেন।

ভাবা পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। 1948 সালে Indian Atomic Energy Commission গঠিত হল এবং ভাবা হলেন তার চেয়ারম্যান। এই কমিশনের কাজকর্ম প্রথম দিকটায় TIFR-এ চলতে থাকে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক যা কিছু কাজ সবই করা হত ওই টাটা ইন্স্টিটিউটেই। 1954 সালে এই কমিশন রূপান্তরিত হল পারমাণবিক শক্তি দপ্তরে (Department of Atomic Energy)। ভাবা তখন নিযুক্ত হলেন এর সচিব (Secretary)। ওই বছরেই বোম্বাইয়ের কাছে ট্রম্বেতে 'পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র' [Atomic Energy Research Centre] তৈরির কাজ শুরু হলে ভাবাকে তার পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। পরিচালক

(Director) ভাবার সুযোগ্য পরিচালনায় AERC দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লী কাজ শুরু করে সেই পঞ্চাশের দশকেই।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক সহযোগিতার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবক্তা। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি উন্নত-দেশসমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত হোক এটা ছিল তাঁর মনোবাসনা। এর জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারত পঞ্চাশের দশকেও বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। ট্রম্বের পারমাণবিক চুল্লী ভারতকে পরমাণু যুগে উন্নীত করল। ইংল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করলেন ভাবা, যাতে ওইসব উন্নত দেশগুলি ভারতকে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে। ভারতের পরমাণু বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তির উন্নতির জন্য ওদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগানোয় ভারতের আজকের উন্নতির মূল হোতা ছিলেন ভাবা। তিনি সারা জীবনই পরমাণু শক্তিকে মানুষের কল্যাণে লাগানোর পক্ষপাতী ছিলেন। সবসময়েই বিরোধিতা করতেন পরমাণু বোমা বানিয়ে মানব সভ্যতার ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করার। পারমাণবিক বোমা বানানোর চরম বিরোধী ভাবার ব্রত ছিল ওই শক্তিকে মানুষের কল্যাণে লাগানো। সারা জীবন জুড়ে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ভারতের দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো যায়।

জেনিভাতে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল 1955 সালে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি কাজে লাগানোর জন্য। এই সম্মেলন 'First International Conference of Peaceful Uses of Atomic Energy' নামে বিখ্যাত। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন ভাবা। জেনিভা সম্মেলনের ফল হিসাবে ভিয়েনাতে প্রতিষ্ঠিত হল International Atomic Energy Agency। আবারো ভাবা নির্বাচিত হলেন এর পরিচালক (Governor)। পরবর্তীকালে তৈরি হল Scientific Advisory Committee। ভাবা হলেন তার সেক্রেটারি জেনারেল (Secretary General)। এই কমিটির মিটিং করতে যাওয়ার পথে Mont Blac-এ তাঁর বিমান ভেঙে পড়ে এবং এই বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় 1966 সালের জানুয়ারি মাসে। শুধু মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, ভারতের পরমাণুবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। আবার ফিরে যাই তাঁর ঝরণা-তত্ত্বের কথায়, মহাজাগতিক রশ্মির অলোচনায়।

ঝরনা-তত্ত্ব থেকে দুটি তত্ত্ব পাওয়া যায় ঃ (1) জোড়া উৎপাদন [Pair Production] (2) বিকিরক সংঘাত [Radiative Collision]। কোন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন যখন কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে যায় তখন তার শক্তির বেশির ভাগই নষ্ট হয় বিকিরক সংঘাতে, যা ঘটে পরমাণুর কেন্দ্রকের সঙ্গে। ফলে, ভরবেগের নিত্যতার সূত্র অনুযায়ী এই সংঘর্ষে সামনের দিকে একটা ফোটন উৎপন্ন হয়। এই ফোটন আলোর বেগে দৌড়াতে শুরু করে এবং কিছুটা গিয়েই পরমাণুর কেন্দ্রকের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় শোষিত হয়। ফলে একজোড়া কণা সৃষ্টি হয় যারা পজিট্রন ও ইলেকট্রন। এই দুই কণার মোট শক্তি শোষিত ফোটনটির শক্তির সঙ্গে সমান। এই দুই কণা ক্রমশঃ এগোতে থাকে এবং এই জোড়া আবার নতুন ফোটন উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি ফোটন আবার নতুন একজোড়া করে পজিট্রন ও ইলেকট্রন তৈরি করে। তবে এই নতুন ফোটনের শক্তি আগের ফোটনের তুলনায় কিছুটা কম হয়। ফলে, নতুন জোড়া কণায় মোট শক্তির পরিমাণও আগে জোড়ার তুলনায় কিছুটা কম হয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রন ও পজিট্রন তৈরি হয় এবং তৈরি হয় এই দুই মৌলিক কণার ধারা বা Shower।

এই ক্রিয়ায় একবার ভর শক্তিতে এবং তারপর শক্তি আবার ভরে রূপান্তরিত হয়। ফলে, মাত্র একটা কণা ঝরনা বা জলপ্রপাত সৃষ্টি করে। Cascade Event শুরু করার মুহূর্তে একটা কণাই থাকে এবং মুহূর্তের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণ সমসংখ্যক পজিট্রন ও ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়। এটা সেই পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না প্রতিটি কণার শক্তি 'সংকট শক্তি'-র [Critical Energy] নীচে নেমে যায়। তখন ফোটন নিঃসরণ তথা জোড়াকণা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। ধারার শক্তি এইভাবে কমে কমে এক সময় শেষ হয়ে যায়। তখন পজিট্রন ও ইলেকট্রন মিলে-মিশে ধ্বংস হয়ে যায়। ধারার শক্তি বিকিরণ ঘটে 'কম্পটন প্রভাব' [Compton Effect] এবং 'আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া'র [Photo-electric Effect] নিয়মানুসারে। এইভাবে কণা ও ফোটন সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক সময় মহাজাগতিক রশ্মির Shower বা ধারা সবচেয়ে বেশি হয় এবং তারপরে তা আবার কমতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রতিটি কণার শক্তি সংকট-শক্তির নীচে নামলেই কণা সৃষ্টির ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং কণাগুলি ধ্বংস হতে থাকে। অধ্যাপক ভাবা এবং তাঁর সহযোগী হাইটলার জটিল গণিতের সাহায্যে এগুলি প্রমাণ করেন।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হল ঃ (1) পৃথিবীর চতুর্দিক থেকেই মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে আসছে; (2) মুখ্য বা প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি মূলতঃ আয়নিত প্রোটন [Proton] এবং আরো কিছু গুরুভার পারমাণবিক নিউক্লীয়াস বা কেন্দ্রক দিয়ে তৈরি; (3) মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল পৃথিবী এবং তার বায়ুমণ্ডলের বাইরে, কিন্তু তা ঠিক কোথায় সেটা আজও অজানা। তবে এ ব্যাপারে দুটি অনুমান মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। এই দুটি অনুমান হল ঃ

(ক) মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল সম্ভবত আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কিংবা মহাকাশে, যার দূরত্ব প্রায় 1000 কোটি [10^{10}] আলোকবর্ষ বা প্রায় 10^{28} সেন্টিমিটার বা 10^{23} কিলোমিটার।

(খ) আবার অনেকে মনে করেন মহাজাগতিক রশ্মি উৎপন্ন হয়েছিল 2×10^{10} বা 2000 কোটি বছর আগে বিশ্ব সৃষ্টির সময়ে। অবশ্য যাঁরা মনে করেন মহাজাগতিক রশ্মির উৎস আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদের কথাও একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ নিয়ে গবেষণা চলছে।

বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে মহাজাগতিক রশ্মির সাতটি গুণাবলীর কথা বলা যাক, যেগুলি বিভিন্ন পরীক্ষায় এবং তত্ত্বীয় ধারণায় প্রমাণিত হয়েছে ঃ

(1) শুরুটা ফোটনের দ্বারাই হোক কিংবা কোনও একটি কণা, মহাজাগতিক রশ্মির ধারা বা Shower একই পদ্ধতিতে এবং একই নিয়মে সৃষ্টি হয়ে থাকে; (2) কোনও একটি ধারায় ফোটনের সংখ্যা তার কণা-সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হবে; (3) কোনও পদার্থে মহাজাগতিক রশ্মির ধারা সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে সংকট শক্তির প্রয়োজন হয় তা ওই পদার্থের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। ঘনত্ব বেশি হলে ওই বস্তুর জন্য 'সংকট শক্তি' কম এবং কম ঘনত্বের বস্তুতে তা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়; (4) মহাজাগতিক রশ্মির ধারা বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন রকম হয় এবং এটা নির্ভর করে স্থান-সংক্রান্ত (Spatial] পরিমাপের উপর; (5) কোনও ধারার কণার সংখ্যা মোটামুটিভাবে পাওয়া যায় ধারা শুরু হওয়ার সময় কণা-শক্তিকে সংকট-শক্তি দিয়ে ভাগ করলে; (6) কোনও Shower- এর পুরো পাল্লা [Full Range] তার পূর্ণ আকৃতির চেয়ে বৃহত্তর এবং তা ধারার সবচেয়ে দীর্ঘ আকৃতির দূরত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তনশীল [The full range of the shower is greater and varies slightly with the distance corresponding to the maximum size of the shower.] (7) কোনো ধারার পার্শ্ব-বিস্তার [Lateral Spread], এর আকৃতি বা দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

মহাজাগতিক রশ্মি ধারার ঝরনা-তত্ত্ব থেকে পাওয়া গেল ওই রশ্মির মাত্রিক ব্যাখ্যা। আগেই বলেছি, 1937 খ্রিস্টাব্দে ভাবা ও হাইটলার ইংলন্ডে এবং কার্লসন ও ওপেনহাইমার আমেরিকায় আবিষ্কার করলেন ওই ঝরণা-তত্ত্ব আলাদাভাবে। উচ্চ শক্তির একটি ইলেকট্রন কোনও পদার্থের মধ্য দিয়ে গতিশীল হলে, এটি একটি পারমাণবিক কেন্দ্রকের সঙ্গে বিকিরক সংঘর্ষ ঘটিয়ে নিজের অধিকাংশ শক্তি হারিয়ে ফেলে। ভরবেগের নিত্যতার নিয়ম অনুসারে এই সংঘর্ষের থেকে নির্গত হয় একটি ফোটন। এই ফোটন গতির দিকে নির্গত হয় এবং এটি আলোর বেগে সামান্য পথ অতিক্রম করার পর একটি পরমাণুর কেন্দ্রকের তড়িৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন করে একজোড়া পজিট্রন-ইলেকট্রন। এই জোড়া হারিয়ে যাওয়া ফোটনের পুরো শক্তিকেই ভাগাভাগি করে নেয়। প্রতি জোড়া কেন্দ্রকীয় সংঘর্ষে একটু কম শক্তির ফোটন নতুন করে উৎপন্ন হয়। এই ফোটন আবার নতুন জোড়া কণা তৈরি করে। এই পজিট্রন-ইলেকট্রনের শক্তি আগের জোড়ার তুলনায় কিছুটা কম হয়। এইভাবে উৎপন্ন হয় ইলেকট্রন এবং ফোটনের ঝরনা ধারা। একবার এই ক্রিয়ায় পদার্থ থেকে শক্তি, আবার পরে পরেই শক্তি থেকে পদার্থ তৈরি হতে থাকে। এইভাবে খুব সামান্য সময়েই পজিট্রন-ইলেকট্রনের এক ঝরনা সৃষ্টি হয়, যেখানে এই দুই কণা সংখ্যা প্রায় সমান।

চিত্র ঃ 103
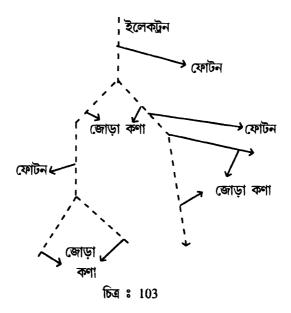
● মহাজাগতিক রশ্মির ধারা [Showers] তৈরি হওয়ার ঝরনা পদ্ধতি ●

এই ঝরনা ধারা তৈরি হতেই থাকে যতক্ষণ না প্রাথমিক শক্তি কমতে কমতে 'সংকট শক্তি'-র নীচে নেমে যায়। তখন ফোটনও তৈরি হয় না, জোড়া-কণা ইলেকট্রন-পজিট্রনও তৈরি হয় না। ধারার শক্তি শেষ অবধি অবক্ষয়িত হয় কম্পটন ক্রিয়া এবং আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়ার ফলে। সুতরাং ফোটন এবং জোড়া কণা রশ্মিধারায় এক সময় সবচেয়ে বেশি হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে।

মহাজাগতিক রশ্মির ধারার মাত্রিক ব্যাখ্যায় ঝরনা তত্ত্ব যে সব সিদ্ধান্তে এসেছে তাদের সাতটির কথা সংক্ষেপে একটু আগেই বলেছি। এগুলির কিছুটা বিশদ আলোচনায় আসা যাক। এইসব সিদ্ধান্ত ঝরনা তত্ত্বেরই ফলশ্রুতি।

(1) মহাজগাতিক রশ্মির ধারার প্রবাহ, কণা কিংবা ফোটন যার দ্বারাই উৎপন্ন হয়ে থাকুক না কেন, একই রকমের হয়। উচ্চ শক্তির মহাজাগতিক রশ্মিতে কণাগুলি এবং ফোটনগুলি সামনের দিকে প্রায় একই অভিমুখে গতিশীল হয়, যাতে পুরো কণিকাগোষ্ঠী সুসজ্জিতভাবে সামনে অগ্রসর হয়।

(2) মহাজাগতিক রশ্মিধারায় ফোটনের সংখ্যা কণাদের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হয়।

(3) ধারা তৈরির সংকট শক্তি যে বস্তুতে ওই ধারা উৎপন্ন হচ্ছে তার ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। সংকট শক্তির মান কম হয় ভারী বা বেশি ঘনত্বসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে। সংকট শক্তির মান বেশি হয় হাল্কা বস্তুর ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জলের ক্ষেত্রে সংকট শক্তি 115 মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট [115 MeV], কিন্তু সীসার ক্ষেত্রে এই সংকট শক্তির মান 7 MeV -র চেয়েও কম হয়।

(4) বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে মহাজাগতিক রশ্মির ধারা সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যেকার পার্থক্য মূলতঃ ঘটনার মহাকাশীয় স্কেলে [Spatial Scale]। কোনও একটি ধারা কতটা মহাকাশ [Space] জুড়ে অবস্থান করবে তা নির্ভর করে দুটি পরিমাণের উপর — প্রথমতঃ একটি দ্রুতগামী ইলেকট্রন সম্ভাব্য কতটা পথ অতিক্রম করে একটি শক্তিশালী ফোটন উৎপন্ন করছে এবং দ্বিতীয়তঃ, ওই ফোটনটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করছে শোষিত হওয়ার আগে অবধি। এই শোষণের পরেই উৎপন্ন হয় পজিট্রন-ইলেকট্রনের জোড়া কণা। দেখা যায়, এই দুটি পরিমাণ প্রায় একই। এই দুটি প্রক্রিয়াই Z^2-এর উপর নির্ভরশীল। এর একটি প্রক্রিয়াতে অতিক্রান্ত দূরত্বকে বলা হয়, 'ঝরনা একক' [Cascade Unit]। বিভিন্ন বস্তুতে এই একক বিভিন্ন হয়। যেমন—সীসায় এটি 0.4 সেমি., লোহার ক্ষেত্রে এটি 1.5 সেমি, অ্যালুমিনিয়ামে এটি 8 সেমি, জলের ক্ষেত্রে এটি 34 সেমি এবং প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের জন্য এই একক 275 মিটার।

(5) কোন একটি ধারার সবচেয়ে বড় আকৃতিতে তার কণাসমূহের সংখ্যা মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়, যে কণাটি ধারার শুরু করেছিল তার শক্তিকে সংকট শক্তি দিয়ে ভাগ করলে, যেহেতু সংকট শক্তিতে উপস্থিত হলে ধারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং ইলেকট্রনের শক্তির মান সংকট শক্তির সমান হয়। প্রাথমিক শক্তি যদি যথেষ্ট বেশি হয় তাহলে কণার সংখ্যা যে কোনও সংখ্যার হতে পারে। কোনও ধারায় লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন থাকতে পারে। দেখা যায়, 10^{10} eV শক্তির ইলেকট্রন একটি সীসার স্তরের মধ্য দিয়ে পাঠালে 3 সেমি গভীরতায় সবচেয়ে বেশি ধারা সৃষ্টি করে। এতে প্রায় 100টি কণা এবং 150টি ফোটন উৎপন্ন হয়। কিন্তু ওই ইলেকট্রনের শক্তি 10^{15}eV হলে এটি যে ধারার সৃষ্টি করবে তাতে প্রায় এক কোটি [10^7] কণা থাকবে এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কণা তৈরি হবে সীসার 8 সেমি গভীরতায়। আবার ওই 10^{15}eV শক্তিসম্পন্ন কণা জলের 800 সেমি গভীরতায় না গেলে সবচেয়ে বেশি কণা উৎপন্ন করতে পারবে না।

(6) কোনও ধারার পূর্ণ পাল্লা বৃহত্তর হয় এবং ধারার সবচেয়ে বড় আকৃতির দূরত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তিতও হয়। কেবলমাত্র খুব শক্তিশালী ধারাই 20 ঝরনা-এককের চেয়ে বেশি দূরত্বে যায়, যার ফলে সমস্ত ঝরনা ধারা (Cascade Showers] 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার পুরু সীসা ব্যবহার করে যথাযথভাবে ফিল্টার করা সম্ভব হয়। একই কারণে, বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে উৎপন্ন মহাজাগতিক রশ্মিধারার অধিকাংশই মাটিতে আসতে পারে না, কারণ পুরো বায়ুমণ্ডলটাই প্রায় 26 ঝরনা-একক।

(7) কোনও ধারার পার্শ্ব-প্রসারণ তার আকারের উপর নির্ভর করে না। কারণ, পার্শ্ব-প্রসারণ শুরু

হয় শেষের একটি বা দুটি স্তরে, যখন কণাসমূহের এবং ফোটনগুলির শক্তি যথেষ্ট কমে আসে। এই সময় এদের শক্তির বিক্ষেপণ [Scattering] ঘটে। কোনও বস্তুতে পার্শ্ব-প্রসারণ হয় প্রায় এক 'ঝরনা-একক'। ফলে, একটা সীসার পাত থেকে নির্গত হওয়া ধারার ক্ষেত্রে ওটি একটা বিন্দু থেকে নির্গত হচ্ছে বলে বোধ হয়, কারণ সীসার ঝরণা-এককের মান খুবই সামান্য, যা প্রায় 4 মিলিমিটার। বাতাসের ক্ষেত্রে এই পার্শ্বপ্রসারণ অনেক বেশি হয় এবং এর ঝরনা-একক প্রমাণ বায়ুমণ্ডলে 275 মিটার হওয়ায়, পার্শ্ব-প্রসারণ কয়েকশো মিটার হয়ে থাকে। এছাড়া, ধারায় কণার বিক্ষেপণ যেহেতু এর শক্তির ব্যস্তানুপাতিক তাই উচ্চশক্তির কণাগুলি ধারার মাঝখানের দিকে থাকবে এবং অপেক্ষাকৃত কমশক্তির কণারা থাকবে বাইরের দিকে। এই কারণে, কোনও ধারার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয় কেন্দ্রে এবং এটি দ্রুত কমতে থাকে ধারের দিকে।

1946 সালে নাসার [Nassar] এবং হ্যাজেন [Hazen] গণিত-নিয়ন্ত্রিত [Counter-Controlled] মেঘ-প্রকোষ্ঠে 0.7 সেমি পুরু চারটি সীসার প্লেটের প্রত্যেকটিকে 5.3 সেমি দূরে দূরে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন উপরের তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তগুলির অনেকগুলিই ঠিক। কণা সংখ্যা, শক্তি বণ্টন, সবচেয়ে বড় আকারের ধারা ইত্যাদি সংক্রান্ত তত্ত্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। এতো কিছু প্রমাণিত হওয়ার পরও আমরা সঠিকভাবে জানি না মহাজাগতিক রশ্মির উৎস কোথায়। কোথা থেকে আসছে এই রশ্মির বিশাল ধারা।

উচ্চভেদী ধারাসমূহের তত্ত্ব [Theory of Penetrating Showers] ঃ

উচ্চভেদী ধারাগুলির সৃষ্টি হয় পারমাণবিক কেন্দ্রকের এক অদ্ভুত ধরনের বিস্ফোরণের ফলে। এই বিস্ফোরণ থেকে কেবল প্রোটন এবং নিউট্রন উৎপন্ন হয় তা নয়, উৎপন্ন হয় আহিত এবং অনাহিত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন 'পাই-মেসন' [π-meson]। এই অনাহিত π^0 মেসন তৈরি করে ফোটন। আর এই ফোটন থেকে তৈরি হয় ঝরনা-ধারা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের। প্রোটন, নিউট্রন এবং আহিত পাই-মেসন পদার্থের ভিতর দিয়ে যায়। এরা পরমাণুর কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। এই সংঘর্ষে আবারও উৎপন্ন হয় নিউক্লীয় টুকরো অংশ। এবার অবশ্য এদের শক্তিস্তর আগের তুলনায় কিছুটা কম হয়। অবশেষে বাতাসে যদি একটি উপভেদী ধারার সৃষ্টি হয়, তখন আহিত পাই-মেসন অত্যন্ত দ্রুত মিউ-মেসনে [μ-meson] পরিবর্তিত হয়। এই মিউ-মেসন কোনও নতুন কেন্দ্রকীয় বিস্ফোরণ ঘটায় না, কিন্তু এই কণা বস্তুর উচ্চ বেধের স্তর, কোনও বিভাজন এবং লক্ষণীয় শক্তিক্ষয় ছাড়াই, অতিক্রম করতে পারে। এই পদ্ধতি, যেহেতু পারমাণবিক কেন্দ্রকের বহু পরিবর্তন ঘটায়, তাই উচ্চভেদী ধারাগুলিকে 'কেন্দ্রকীয় ধারা' [Nuclear Showers] বলা হয়।

উচ্চশক্তির একটি প্রোটন বা নিউট্রন বাতাসের পরমাণু কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষে উৎপন্ন করে, আলফা কণা [α-Particles], প্রোটন [Protons], নিউট্রন [Neutrons] এবং আহিত ও অনাহিত বা নিরপেক্ষ পাই-মেসন [π^+, π^-, π^0]। আহিত পাই-মেসন ক্ষয় পেয়ে তৈরি করে আহিত মিউ-মেসন, যেটি আবার পরিবর্তিত হয় ইলেকট্রন [e^-], পজিট্রন [e^+], নিউট্রনে [ν] । উদাসীন [Neutral] π^0 মেসন ক্ষয়িত হয়ে তৈরি হয় জোড়া ইলেকট্রন সরাসরিভাবে [$\pi^0 \rightarrow e^{\pm} + \gamma$ (গামা রশ্মি)] কিংবা পরোক্ষভাবে [$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$]। প্রতিটি γ-রশ্মি আবার জোড়া ইলেকট্রন তৈরি করে। এই সব ইলেকট্রনের শক্তি এতোটাই উচ্চ হয় যে, এরা ইলেকট্রন-ফোটন ধরনের ঝরনা ধারা সৃষ্টি করতে পারে।

নিউক্লীয় ধারা তৈরির প্রাথমিক কণাগুলির প্রকৃতি জানা গেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে। আলোকচিত্র থেকে জানা গেছে পাহাড়ের উপরে ধারায় রয়েছে আহিত এবং অনাহিত কণাসমূহ কিন্তু আবহাওয়ামণ্ডলে রয়েছে মূলতঃ আহিত কণিকারা। সীসার পুরু স্তরের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, এই সব প্রাথমিক কণাগুলি সীসার স্তরে শোষিত হয়। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা যত বাড়ে নিউক্লীয় ধারার সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায়। এর থেকে বোঝা গেল এই কণাগুলি বায়ুমণ্ডলেও শোষিত হয়। এই শোষণ সাধারণ মিউ-মেসনের চেয়ে অনেকটা তাড়াতাড়িই ঘটে। সুতরাং এইগুলি মিউ-মেসন নয়। আবার এগুলি পাই-মেসনও নয়, কারণ পাই-মেসন বায়ুমণ্ডলে অত্যন্ত দ্রুত অবক্ষয়িত হয়। ওই কণাগুলি এতোটা তাড়াতাড়ি অবক্ষয়িত হয় না। সুতরাং ওরা পাই-মেসন নয়। তাই সিদ্ধান্ত করা হল, প্রাথমিক ওই কণাগুলি প্রোটন এবং নিউট্রন। আবহমণ্ডলের উপরের মহাজাগতিক রশ্মির মূল উপাদান হল প্রোটন — উচ্চ শক্তি সম্পন্ন প্রোটন।

নিউক্লীয় ধারা তৈরির একেবারে শেষের দিকে যেসব ইলেকট্রন এবং ফোটনগুলি উৎপন্ন হয়, তারা বায়ুমণ্ডলীয় মহাজাগতিক রশ্মি ধারা তৈরি করতে সমর্থ হয়, জোড়া কণা উৎপাদন এবং বিকিরক সংঘর্ষের মাধ্যমে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের যে সব ধারা উৎপন্ন হয় তার ব্যাখ্যা এই পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায়; সাধারণ 'ঝরনা তত্ত্ব' সব ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় ধারার ব্যাখ্যা করতে পারে না।

1944 সালে ক্লেইন [Klein] প্রস্তাব দিলেন যে, ব্যাপক ধারার সৃষ্টি হয় একটা ভিন্ন ক্রিয়াবিধি অনুসরণ করে। তাঁর মতে, মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক উপাদান হল আন্তর্নক্ষত্র ধূলিকণা যার মধ্যে রয়েছে বহু 'উল্টো পদার্থ' [Inverted Matter] । উল্টো পদার্থ হল, সেই সব পদার্থ, যেগুলি তৈরি হয় ঋণাত্মক প্রোটন ও ধনাত্মক ইলেকট্রন দিয়ে। এই ধরনের ধূলিকণা, যাতে রয়েছে প্রায় 10^7 বা এক কোটি পরমাণু, যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে চলে আসে, তখন এই ধূলিকণাগুলির বিনাশ হয় এবং তাদের পুরো স্থির ভর [Rest Mass] পরিবর্তিত হয় প্রায় এক কোটি [10^7] ফোটনে। প্রতিটি ফোটনের শক্তি 10^9 eV । এই ফোটনগুলিই মহাজাগতিক রশ্মির বড় বড় ধারার সৃষ্টি করে। যেহেতু ধূলিকণার বিনাশ একই সঙ্গে ঘটে বায়ুমণ্ডলের একেবারে উপরিতম স্তরে, তাই বায়ুমণ্ডলের একেবারে নিম্নস্তরে ব্যাপারটা একই রকম থাকবে, অর্থাৎ মনে হবে একটি উচ্চশক্তির কণাই একটি ধারা সৃষ্টি করছে। ক্লেইন-এর এই অনুসিদ্ধান্ত এটা ধরে নিচ্ছে না যে, প্রতিটি বায়ুমণ্ডলীয় ধারার উদ্ভব হচ্ছে একটি মাত্র প্রাথমিক অতিশক্তিশালী কণার সাহায্যে এবং এই সব কণার শক্তি মাত্রা প্রায় 10^{16} eV । অবশ্য সরাসরি পরীক্ষার সাহায্যে ওই অনুসিদ্ধান্ত আজও প্রমাণিত হয় নি।

মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক বিকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলের উপরিতলে এসে হাজির হয় তখন তাতে মূলতঃ থাকে প্রোটন। তিনটি কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঃ (1) যেহেতু মহাকাশে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন বিদ্যমান সুতরাং মহাজাগতিক কণাগুলির বেশির ভাগই প্রোটন হবে, (2) ভূ-চৌম্বক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক অবস্থায় এতে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক প্রোটনের মত ধনাত্মক কণা। (3) অধুনা মেসন উৎপন্ন হওয়ার উপর গবেষণা চালিয়ে জানা গেছে, বায়ুমণ্ডলের উপরিতলে যে সব মহাজাগতিক কণা মেসন উৎপন্ন করছে সেগুলি অবশ্যই প্রোটন।

মহকাশে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে এবং এর পরেই আসে হিলিয়াম। লিথিয়াম, বেরিলিয়াম এবং বোরনও সামান্য পরিমাণে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে। প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মিতে তাই সবচেয়ে

বেশি রয়েছে প্রোটন এবং বেশ কম পরিমাণে লিথিয়াম ইত্যাদির আহিত কেন্দ্রক। আবার ভারী পদার্থের কেন্দ্রকের সংখ্যা মহাবিশ্বে এদের উপস্থিতির অনুপাতের চেয়ে মহাজাগতিক রশ্মিতে কিছুটা বেশি হতে দেখা যায়, বিশেষ করে যে সব কেন্দ্রকের চার্জ বা আধান 10 -এর চেয়ে বেশি, তাদের ক্ষেত্রে। এর থেকে মহাজাতিক রশ্মির উৎস স্থল সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। নিশ্চিতভাবে না হলেও, অনেক বিজ্ঞানীর মতে, মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল হল সুপারনোভার বিস্ফোরণ। আবার অনেকে মনে করেন এর উৎপত্তি স্থল হল নব আবিষ্কৃত পালসারসমূহ [Pulsar]। এই দুই সিদ্ধান্তের অনেক বিরুদ্ধ যুক্তি রয়েছে। বিশেষ আপত্তি হল, মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলি এমন প্রবল শক্তি পায় কোথা থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এদের উৎস স্থল বিস্ফোরিত সুপারনোভা কিংবা পালসার ধরলে। কারণ, ওই সব সুপারনোভা বা পালসার থেকে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে কণাগুলিকে পৃথিবীতে আসতে হয়, সেই সব দূরত্ব অতিক্রম করার পর তাদের ওই পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকতে পারে না, যা দেখা যায় প্রাথমিক মহাজাগতিক বিকিরণে। এখন বলা হয়, মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলি ত্বরান্বিত হচ্ছে আন্তর্নক্ষত্র চৌম্বকক্ষেত্রে বহুবার প্রতিফলনের কারণে।

বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে যে গৌণ মহজাগতিক বিকিরণ [Secondary Cosmic Radiation] সমুদ্রপৃষ্ঠে আসছে, ইলেকট্রন এবং মেসন কণা ছাড়াও তাতে রয়েছে প্রোটন, নিউট্রন এবং আরও কিছু ভারী কণাও। এই ভারীকণা গৌণ বিকিরণের খুব সামান্য ভগ্নাংশ হলেও, এই কণাগুলির অনেকগুলিই বেশ উচ্চশক্তি সম্পন্ন এবং এরা শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় ক্রিয়াও সৃষ্টি করে।

1941 সালের এক পরীক্ষায় দেখা যায়, প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি ঘন মিটারে, 10,000 ফুট উচ্চতায় 4 টি করে প্রোটন আসছে পৃথিবীতে। 1946 সালে দেখা গেল 10,000 ফুট উচ্চতায় আসা মহাজাগতিক রশ্মির 4% হল প্রোটন কণা। সিদ্ধান্তে আসা গেছে, মহাজাগতিক রশ্মির 0.1% হল প্রোটন কণা সমুদ্রপৃষ্ঠে এবং 10,000 ফুট উচ্চতায় তা 3% সাধারণভাবে। তবে, এই মহাজাগতিক রশ্মি স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক বা মুখ্য মহাজাগতিক রশ্মি নয়, গৌণ মহাজাগতিক রশ্মি, যা উৎপন্ন হয় কেন্দ্রকীয় বিঘটনের [Nuclear Disintegration] কারণে। এই বিঘটন ঘটে বায়ুমণ্ডলে। গৌণ মহাজাগতিক রশ্মিতে প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের পরিমাণ অকেটাই বেশি। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত নিউট্রন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

মেঘ প্রকোষ্ঠের আলোকচিত্র থেকে দেখা গেছে অনেক সময় মহাজাগতিক রশ্মি তারকা বা নক্ষত্রদের আকারে বিকিরিত হয়। এই রকম বহু নক্ষত্র সদৃশ মহাজাগতিক রশ্মির আলোকচিত্র তুলেছেন বেশ কিছু বিজ্ঞানী। 1937, 1941, 1946, 1947 সালগুলিতে এই ধরনের বহু ছবি তোলা সম্ভব হয়।

এই নক্ষত্র সদৃশ মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলির গড় শক্তি প্রায় 10 MeV হয়। এর অধিকাংশ কণাই প্রোটন। কিছুক্ষেত্রে নিউট্রন, মেসন ইত্যাদিও থাকে। আর থাকে ভারী কেন্দ্রকের অংশ বিশেষ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে এই ধরনের নক্ষত্র-সদৃশ মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের ঘটনার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 15000 ফুট উচ্চতায় এই ঘটনার সংখ্যা সমুদ্রপৃষ্ঠের ঘটনার সংখ্যার প্রায় 50 গুণ হয় বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। এ নিয়ে আরও বহু গবেষণা হয়েছে।

104 নম্বর চিত্রে মোট 34 টি দৃশ্যমান পথ রয়েছে। এই পথগুলি তৈরি হয়েছে মূলতঃ প্রোটন এবং আলফা কণা দিয়ে। মোট বিকিরিত শক্তির পরিমাণ 1000MeV -রও বেশি। সবচেয়ে দীর্ঘ পথ রচনা

করেছে 50 MeV -র একটি প্রোটন। এই পথের দৈর্ঘ্য প্রায় 3,500μ। মেঘ প্রকোষ্ঠে মূল ছবিটি ছিল অনেকটাই ছোট। এখানে তার বিবর্ধিত রূপ ছাপা হয়েছে।
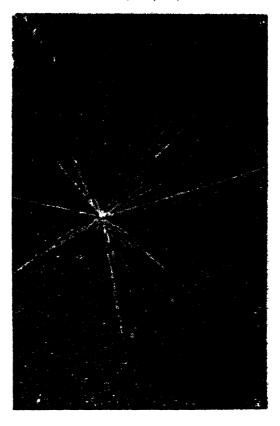
চিত্র ঃ 104

● নক্ষত্র সদৃশ একটি মহাজাগতিক রশ্মির আলোকচিত্র (আলোকচিত্রীয় অবদ্রবতে তোলা)। 1947 সালে এটি তুলেছেন লেপ্রিন্স রিংগুয়েট [Leprince Ringuet] এবং তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীরা। ●

প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির প্রতি 1000 প্রোটনে থাকে প্রায় 85টি হিলিয়াম কেন্দ্রক এবং 6 টি আরও ভারী মৌলের কেন্দ্রক। খুব সামান্য সংখ্যক ইলেকট্রনও থাকে প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে। এই রশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের উপরিতলে আসে তখন এর শক্তির পরিমাণ মোটামুটিভাবে 3×10^9 থেকে 3×10^{10} eV । এদের কতকগুলির শক্তির মান 10^{17} eV অবধি হতে দেখা যায়। এই সব শক্তি সীমার মধ্যে, N_E যদি E শক্তির কণার সংখ্যা হয়, যা প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রম করে, তবে ওই কণা সংখ্যা ওই শক্তির বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ $N_E \approx \frac{K}{E^2}$ যেখানে, K একটি ধ্রুবক। এই সমীকরণকে অন্যভাবে লেখা যায়, যেমন ঃ

$$N_E \approx KE^{-2}$$

এর অর্থ হল বায়ুমণ্ডলে নিম্নশক্তিযুক্ত কণার উপস্থিতিই সবচেয়ে বেশি।

গৌণ মহাজাগতিক রশ্মি দেখা যায় বায়ুমণ্ডলে। এতে আলফা কণা, প্রোটন, নিউট্রন, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেসন, ইলেকট্রন এবং ফোটনরা থাকে বিভিন্ন সংখ্যায়। 10^{10} eV শক্তির প্রোটন বাতাসের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাসীয় পরমাণুর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ ঘটায়। তবে প্রাথমিক প্রোটনগুলির সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে, ওগুলি বায়ুমণ্ডলের যত নীচের দিকে আসতে থাকে। প্রায় 60,000 ফুট উচ্চতায় এদের সংখ্যা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগের সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়ংশ হয়ে থাকে। কিন্তু এই উচ্চতায় অসংখ্য গৌণ কণা উৎপন্ন হয়ে যায়। প্রাথমিক প্রোটনের সংখ্যা 14,000 ফুট উচ্চতায় অনেক কমে যায় এবং এই সংখ্যা আরও কমে সমুদ্রপৃষ্ঠে। এই হল প্রাথমিক প্রোটনের শেষ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। প্রায় একই অবস্থা হয় নিউট্রন এবং হিলিয়াম কেন্দ্রকদের জীবনধারার।

প্রাথমিক রশ্মির ইলেকট্রনগুলি বায়ুমণ্ডলে এসে ঝরনা ধারার সৃষ্টি করে। এগুলি সব গৌণ বিকিরণ। এতে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা হঠাৎই বেড়ে যায়। এগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ অবধি আসে না, যদি না শুরুর কণার শক্তি 10^{14} থেকে 10^{15} eV হয়। বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে যে মেসন কণার উৎপত্তি হয়, তাদের শক্তি কম হওয়ায় তারা তাড়াতাড়ি লয় পায়। ভারী পাই-মেসন রূপান্তরিত হয় অপেক্ষাকৃত হাল্কা মিউ-মেসনে। এই দুই মেসন ধনাত্মক বা ঋণাত্মকভাবে আহিত। এরা তাদের শক্তি হারায় মূলতঃ এদের আয়নিত করণের জন্য। এরা মাঝে মাঝে ইলেকট্রন উৎপন্ন করে। ধনাত্মক তড়িদাহিত মেসন তৈরি করে পজিট্রন। আর ঋণাত্মক মেসনগুলিকে কেন্দ্রকগুলি শোষণ করে নেয় এবং এই শোষণের ফলে উৎপন্ন হয় একটি ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনগুলি থেকে ফোটনও তৈরি হয়। এগুলি শোষিত হয়ে আবার তৈরি করে জোড়া কণা। এইভাবে বিকিরক সংঘর্ষ এবং জোড়া কণার উৎপাদন মিলেই তৈরি হয় মহাজাগতিক রশ্মির ঝরনা ধারা।

দ্রুতগামী প্রোটন এবং মেসন আয়নিতকরণের ফলে সামান্য পরিমাণ শক্তি হারায়, যখন তাদের শক্তি থাকে 1000 MeV-র চেয়ে কম। অপর পক্ষে, দ্রুতগামী ইলেকট্রন অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি হারায় বিকিরক সংঘর্ষে এবং ধারা তৈরিতে, যখন তাদের শক্তি থাকে বায়ুতে 100 MeV এবং সীসায় 10MeV । এইভাবে পুরো মহাজাগতিক রশ্মি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা অংশ হল 'ভেদী বিকিরণ' বা 'অতিভেদী উপাদান' [Hard Component]। এই উপাদানে থাকে মেসন, খুব কম সংখ্যক প্রোটন এবং খুব শক্তিশালী ইলেকট্রন বা ফোটন। অন্য অংশের উপাদান হল, ইলেকট্রন এবং প্রায় একই সংখ্যক ফোটন ও অল্পসংখ্যক ধীরগতির মেসন বা প্রোটন। মহাজাগতিক রশ্মির এই অংশটিকে বলা হয় 'স্বল্পভেদী উপাদান' [Soft Component] । মহাজাগতিক রশ্মির দুটি ভাগ হল — (1) অতিভেদী উপাদান; (2) স্বল্পভেদী উপাদান।

মহাজাগতিক রশ্মিতে নিউট্রন আছে। এই নিউট্রন বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে সংখ্যায় বেশি, ভূ-পৃষ্ঠের দিকে তা খুবই কম। এগুলি উৎপন্ন হয় প্রাথমিক প্রোটন এবং বায়ুর পরমাণুদের মধ্যে কেন্দ্রকীয় মিথিষ্ক্রিয়ায়। গৌণ নিউট্রনরা নির্গত হয় মহাজাগতিক রশ্মির 'নক্ষত্র'গুলি থেকে। তারা বা নক্ষত্রের রূপ নেওয়া মহাজাগতিক রশ্মির জন্ম হয় *কেন্দ্রকীয় বিশরণ বা বিঘটন [Disintegration]* থেকে, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, নিউট্রনের দ্বারা সংঘটিত হয় অথবা ধীরগতি মেসন আত্তীকরণের ফলে সৃষ্টি হয়।

মহাজাগতিক রশ্মির যেসব কণা মাটিতে প্রবেশ করছে সেগুলির মধ্যে আছে ইলেকট্রন এবং মেসন। খনিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া যায় এদের অস্তিত্ব। তবে মাটির নীচে ধারার মাত্রা কমে যায়,

কারণ বায়ুমণ্ডলের চেয়ে মাটি প্রায় 3000 গুণ বেশি ঘনত্বের। খুব বেশি গভীরে ইলেকট্রনরা থাকে না, থাকে কেবল মেসন কণারা। এইসব মেসন কণার শক্তি প্রায় 10^{12}eV হয়ে থাকে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন মেসনরাই মাটি ভেদ করে অনেকটাই যেতে পারে এবং তাই খনি গর্ভে এদেরই দেখা যায়। ইলেকট্রনরা ভূ-পৃষ্ঠের অতোটা গভীরতায় যেতে পারে না মৃত্তিকা ভেদ করে। মেসনরাই কেবল পারে।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আজও সম্ভব হয় নি। মহাজাগতিক রশ্মি কী, তার উপাদান কী, সবই জানা হয়ে গেলেও এর উৎপত্তিস্থল আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। এ ব্যাপারে দুটি প্রশ্নের সঠিক জবাব চাই। এই প্রশ্ন দুটি হল ঃ (1) কোথা থেকে প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি হয়? (2) কীভাবে এই রশ্মি তৈরি হয়? এই দুই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। পরীক্ষায় মহাজাগতিক রশ্মির যে ক'টি বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় তা হল ঃ

(1) সমদৈশিক বন্টন [Isotropic Distribution] ঃ মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর সবদিক থেকে প্রায় সমানভাবেই আসছে নিরন্তরভাবেই।

(2) প্রাথমিক বিকিরণের উপাদানের প্রকৃতি ঃ দেখা গেছে প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির মুখ্য উপাদান হল প্রোটন এবং আরও কিছু ভারী কেন্দ্রক।

(3) শক্তি বর্ণালি [Energy Spectrum] ঃ প্রাথমিক বিকিরণের কণাগুলির শক্তি মোটামুটি 10^9 থেকে 10^{17} eV -এর মধ্যে থাকে। সাধারণভাবে এই মান 10^{10}eV হয়। তবে, 10^{17} eV-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী কণাও পাওয়া গেছে মহাজাগতিক রশ্মিতে।

এখন এটা সিদ্ধান্তকৃত যে, মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোথাও থেকে আসছে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গা থেকে আসছে তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। এ ব্যাপারে যে সব অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে সেগুলি হল ঃ

(1) অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, মহাজাগতিক রশ্মির উৎস আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের কোন জায়গা যার দূরত্ব প্রায় 10^{10} বা 1000 কোটি আলোকবর্ষ। এক আলোকবর্ষ মোটামুটিভাবে 10^{13} কিলোমিটার। সুতরাং এঁদের মতে মহাজাগতিক রশ্মির উৎসস্থলের দূরত্ব প্রায় 10^{23} কিলোমিটার। মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল এঁদের মতে মহাকাশ। এই ধরনের কথা বলেছিলেন কম্পটন, ব্র্যাকেট প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। এই সিদ্ধান্তের কারণ হল এই রশ্মির সমদৈশিক বন্টন। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির উৎসস্থল আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের মহাকাশ হলে পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের গতিশীলতা, এই দুটি গতির ফলে নাক্ষত্রকালের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির পৃথিবীতে আগমনের সামান্য আহ্নিক পরিবর্তন [Diurnal Variation] ঘটবে। পরীক্ষায় দেখা গেল, এই ধরনের কোনও পরিবর্তন নেই মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষেত্রে। তাছাড়া, প্রোটন এবং অন্যান্য ভারী কণার মহাজাগতিক রশ্মিতে অবস্থানের যথাযথ ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়, যদি ধরা হয়, মহাজাগতিক রশ্মি ওই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে পৃথিবীতে আসছে।

(2) সম্প্রসারিত বিশ্বের আদি বিস্ফোরণ ঃ লেমাইৎর বা লেমেতার [Lemaitre], রেগেনার [Regener] এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বললেন যে, মহাজাগতিক রশ্মির প্রোটন ও ভারী কেন্দ্রকীয় কণাগুলি হল বিশ্ব সৃষ্টির সময় যে মহাবিস্ফোরণ হয়েছিল এগুলি তারই অবশেষ বিকিরণ কণা। আগেই বহুবার বলেছি, বিশ্বসৃষ্টির আদি বিস্ফোরণ হল 'মহাবিস্ফোরণ' [Big Bang]। এই মহাবিস্ফোরণ

হয় প্রায় 2×10^{10} বছর বা 2,000 কোটি বছর আগে, তবে লেমাইৎরা বলেছিলেন এই মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল প্রায় 3×10^{9} বছর বা মাত্র 300 কোটি বছর আগে। পরে হিসাব করে দাঁড়ায় এই সময়টা হল 2000 কোটি বছর। সময়টা আরও বাড়তে পারে। এই বিশাল সময়ে ওই বিকিরণ কণাদের শোষণ ইত্যাদির ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা। তাই, এই অনুসিদ্ধান্ত যদিও খুব অসম্ভব প্রস্তাব বলে মনে হয় না, বহু বিজ্ঞানীর কাছে এটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। ওই মহাবিস্ফোরণের ফলে যে মহাজাগতিক রশ্মি উৎপন্ন হয়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

(3) মহাজগতিক রশ্মি আমাদের নিজেদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উৎপন্ন হচ্ছে বলে বহু বিজ্ঞানী মনে করেন। এই রশ্মির প্রোটনগুলি যেহেতু উচ্চশক্তিসম্পন্ন তাই এনরিকো ফের্মি বলেছিলেন, এগুলি আমাদের গ্যালাক্সীতেই উৎপন্ন হচ্ছে। কারণ, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের থেকে আসা প্রোটনকণাদের এতোটা শক্তি থাকবে কি করে! তিনি বললেন যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ছড়িয়ে থাকা পদার্থ নিকটস্থ নক্ষত্রদের দ্বারা আলোক-আয়নিত [Photo-ionised] হয়ে মহাজাগতিক রশ্মির উৎস হয়ে উঠে। আয়নিত এই সব ছড়িয়ে থাকা পাদর্থের মেঘপুঞ্জের গ্যালাক্সীর সঙ্গে ঘূর্ণনের ফলে যে শক্তি সঞ্চিত হয়, সেই শক্তি মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলিকে উচ্চশক্তির যোগান দেয়। এই তত্ত্ব বেশ আকর্ষণীয় হলেও, এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে পারে না প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মিতে প্রোটন ছাড়া অন্যান্য ভারী মৌলকণারা কেমন করে আসে।

(4) মহাজাগতিক রশ্মিতে ভারী মৌলের কেন্দ্রকের উপস্থিতির জন্য অনেক বিজ্ঞানীর মতে, এর উৎপত্তিস্থল আমাদের সৌরমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে। 1948 খ্রিস্টাব্দে টেলার [E. Teller] এবং রিচমাইয়ার [R. D. Richtmyer] ঘোষণা করলেন, মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল আমদের এই সৌরমণ্ডল এবং এই রশ্মি আমাদের সূর্য বা তার আশপাশ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। এঁদের মতে, ভারী কেন্দ্রকগুলি সৌরমণ্ডলের প্রোটন কেন্দ্রকের সঙ্গেই পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্যাখ্যায় আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশে মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল এটা ধরে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সৌরমণ্ডলের বিশেষ করে সূর্যের চারিদিকের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে এই কণাগুলি ত্বরান্বিত হয় এবং উৎপন্ন হয় উচ্চ শক্তির মহাজাগতিক রশ্মি, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আঘাত করে। সুতরাং এঁদের মতে, মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল আমাদের সূর্যের আশপাশের অঞ্চল, মহাকাশ কিংবা আন্তর্নক্ষত্র অঞ্চল নয়। এই অনুসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি হল ঃ

(ক) সূর্য মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলিকে নিম্নশক্তি দিতে পারে, অর্থাৎ নিম্নশক্তি বিশিষ্ট মহাজাগতিক রশ্মি সূর্য সৃষ্টি করতে পারলেও উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি সৃষ্টি সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়; (খ) মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ সৌর সময়ের উপর অতি কমমাত্রায় নির্ভরশীল; (গ) সূর্য থেকে উৎপন্ন হওয়া দুর্বল চৌম্বকক্ষেত্রের দ্রুত কমে আসা মহাজাগতিক রশ্মির সমদৈশিক বন্টন [Isotropic Distribution] ব্যাখ্যা করতে পারে না; (ঘ) যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, সৌরকলঙ্ক মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির একটা উৎস, তবুও মহাজাগতিক রশ্মির প্রবলশক্তির উৎসের হদিশ পাওয়া মুশকিল। সৌর কলঙ্কগুলির শক্তি নিসরণ আরও বহুগুণ বাড়লেও মহাজাগতিক রশ্মির বিশালশক্তির ধারে কাছেও আসে না। হিসাব করে দেখা গেছে পৃথিবীতে যে মহাজাগতিক রশ্মি আসছে তার মোট শক্তির পরিমাণ, কেবল সূর্যের বিকীর্ণ শক্তির নয়, সমগ্র-ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রসমূহের মোট বিকীর্ণ শক্তির

চেয়েও বেশি। এরপরেও কি বলা যায় মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল আমাদের সূর্যের আশপাশ অঞ্চল?

মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলি দুটি পদ্ধতিতে শক্তি সংগ্রহ করে বলে মনে করা হয়। একটি হল, 'সূক্ষ্মসত্ত্ব পদ্ধতি' [Microscopic Process], অন্যটি হল 'স্থূলসত্ত্ব পদ্ধতি' [Macroscopic Process]। এক সময় মিলিকান বলেছিলেন, হাইড্রোজেন থেকে ভারী মৌল উৎপন্ন হওয়ার সময় শক্তির যে ঝলক তৈরি হয় সেটাই মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির উৎস। আবার একদল বিজ্ঞানী পরবর্তীকালে বললেন, পরমাণুর বিলয় হলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাই-ই মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির উৎস। পরমাণুর বিলয় হলে এর অনেক কণা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পদার্থের শক্তিতে এই রূপান্তরণের ফলে যে শক্তি তৈরি হয় তাই-ই মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির উৎস হয় বলে নির্দিষ্ট করলেন এই বিজ্ঞানীরা। একটি প্রোটনের বিলয় ঘটলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তা 10^9eV। আবার, ক্লেইন এবং আরলে [Arley] মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির উৎস হিসাবে বললেন, পদার্থ ও 'উল্টো পদার্থ' [Inverted Matter]-এর সংঘর্ষ ও বিলয়ের কথা। উল্টো পদার্থ হল সেইসব পদার্থ যার পরমাণু ঋণাত্মক প্রোটন এবং ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন দিয়ে তৈরি। এই ঋণাত্মক প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংঘর্ষে দুটি প্রোটনের বিলয় ঘটে এবং প্রবল শক্তি উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্মসত্ত্ব পদ্ধতির মুখ্য বিরুদ্ধ বক্তব্য এই যে, এই ব্যাখায় মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলির যে সর্বোচ্চ শক্তিসীমার কথা বলে তা প্রকৃত ঊর্ধ্বসীমার চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ বাস্তবে যে বিশাল শক্তিসম্পন্ন কণা পাওয়া যাচ্ছে তত্ত্বীয় গণনায় কণাদের তেমন শক্তিসম্পন্ন হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার পরীক্ষাগারে এখনও অবধি কোন কণার বিলয় ঘটিয়ে তাকে পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত করা আজও সম্ভব হয়নি। আমরা যদি ধরেও নিই প্রকৃতিতে তেমন ঘটনা ঘটছে, অর্থাৎ একটা কণা পুরোপুরি বিলয়ের পরে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাহলেও উৎপন্ন শক্তি একটি কণাতে কেমন করে সমাহৃত [Concentrated] হচ্ছে তা অজানা, যদি না এটা ধরে নেওয়া হয় এই পারমাণবিক বিলয়ের ফলে প্রোটন উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু এটা জানা গেছে, ইলেকট্রন বিলয়ের ফলে গামারশ্মি উৎপন্ন হয়, তাই ভারী মৌলকণা বিলয়ের ফলে তেমন ঘটনা ঘটা উচিত। সুতরাং মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির ব্যাখ্যা সূক্ষ্মসত্ত্ব পদ্ধতির সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নয়।

স্থূলসত্ত্ব পদ্ধতিতে মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলির উচ্চশক্তিসম্পন্ন হওয়ার ব্যাখ্যায় তিনটি ক্ষেত্রের প্রভাবের কথা বলা হয়। এই ক্ষেত্র তিনটি হল ঃ মহাকর্ষীয়, বৈদ্যুত এবং চৌম্বক। এরাই মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলিকে ত্বরান্বিত করে। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সব ধরনের কণাকে ত্বরান্বিত করে। বৈদ্যুত এবং চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভাবিত করে কেবলমাত্র আহিত কণাদের। এই তিনটি ক্ষেত্রের প্রভাবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে, মহাজাগতিক রশ্মির কণাদের উচ্চশক্তিসম্পন্ন হওয়ার কারণ। এই ব্যাখ্যা থেকে মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থলের একটা হদিশ পাওয়া যায়।

মিলনে [Milne] বলেছেন, মহাজাগতিক রশ্মির মহাশক্তি আসছে মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র থেকে। এই প্রস্তাব কিন্তু বিজ্ঞানীরা নানা কারণে গ্রহণ করতে পারেন নি। উইলসন [C.T.R. Wilson] প্রস্তাব দিলেন, বজ্রপাতের ফলে মহাজাগতিক রশ্মি প্রবল শক্তি পাচ্ছে। এই প্রস্তাব নানা কারণে বাতিল হয়ে যায়। এই কারণগুলির মধ্যে মুখ্য হল বজ্রপাতে বিভব পার্থক্য মাত্র 10^9 ভোল্ট। অথচ মহাজাগতিক রশ্মির অনেক কণার শক্তি 10^{17}eV অবধি হয়। সুতরাং বৈদ্যুৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে মহাজাগতিক

রশ্মির শক্তির রমরমা এটা মানা যায় না। এর কণাগুলির বিপুল শক্তি কোথা থেকে আসছে তা আজও অজানা।

এনরিকো ফের্মি বলেছেন, আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্র মহাজাগতিক শক্তির মূল উৎস। তাঁর মতে, প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই ঘূর্ণনগতি সম্পন্ন। এর ফলে সৃষ্ট মহাজাগতিক চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে পাওয়া শক্তির যোগ-বিয়োগের পর যা শক্তি পাওয়া যায় তা দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলির মহাশক্তি লাভের মোটামুটিভাবে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়। এই অনুসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোনও পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের চৌম্বকক্ষেত্রের মান +7,800 গস [Gauss] অল্প সময়ের মধ্যে –6,500 গসে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন থেকেই মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলি ওই বিশাল শক্তি লাভ করতে পারে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড থেকেই।

শুধু যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তিত চৌম্বক ক্ষেত্র মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলিকে মহাশক্তি যোগাচ্ছে তাই নয়, আন্তর্ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তিত চৌম্বক ক্ষেত্রও আরো শক্তির যোগান দিচ্ছে কণাগুলিকে। মহাজাগতিক রশ্মি তাই মহাবিশ্বের অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন মহাজাগতিক বিকিরণ, যে বিকিরণ সম্ভবত সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিস্ফোরণের সময়। তবে এই অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে জোরালো সমর্থন পাওয়া গেলেও, মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল নিয়ে সর্বসম্মত সঠিক সিদ্ধান্তে আজও আসা যায় নি।

মহাবিশ্বতত্ত্বের গবেষকদের কাছে মহাজাগতিক রশ্মির উৎসের অনুসন্ধান এবং তার নিশ্চিতকরণ যেমন জরুরি, তেমনি পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছেও। মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তির সঠিক হদিশ থেকে পাওয়া যাবে বিশ্বসৃষ্টির সঠিক ইতিহাস, বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা। এর থেকে পদার্থবিজ্ঞানীরা পেতে পারেন মৌলিক কেন্দ্রকীয় ক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থার অব্যাখ্যাত তথ্যসমূহ। জীববিজ্ঞানীদের কাছে মহাজাগতিক রশ্মির তাৎপর্য হল, এই বিকিরণ পৃথিবীর প্রাণের বিবর্তনে কোনও ভূমিকা রেখেছে কিনা, কিংবা প্রাণের অস্তিত্বের উপর কতটা প্রভাবশীল এই মহাজাগতিক বিকিরণ। এমনও হতে পারে, পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে এই মহাজাগতিক বিকিরণে কিংবা জীবনের বিবর্তনে একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, কিংবা এখনও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এই বিশাল পরিমাণের মহাজাগতিক বিকিরণ তথা অজানা উৎসের এই মহাজাগতিক রশ্মি। ●

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মহাকাশ অভিযান

[প্রাচীনকালের বহু কাহিনীতে মহাকাশ অভিযানের কথা রয়েছে। মাতলি-চালিত ইন্দ্র-রথে অর্জুনের স্বর্গে গমনের কাহিনী যেন মহাকাশ ভ্রমণেরই কথা বলে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই শুরু হয়েছে প্রকৃত অর্থে মহাকাশ অভিযান। 1957 সালে সোভিয়েত রাশিয়ার স্পুটনিক-1 দিয়েই তার শুরু। মানুষ ইতিমধ্যে ছয়বার চাঁদের মাটিতে পদচারণা করেছে। শুক্র ও মঙ্গলে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছাও তার আছে। কিন্তু পার্থিব সভ্যতা আর 50 বছর টিকে থাকবে কি? না থাকলে সব অভিযানই অর্থহীন। 1957 সাল থেকে 1982 সাল অবধি সমস্ত মহাকাশ অভিযানের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। অর্থনৈতিক অবস্থার যে অবনতি সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মহাকাশ অভিযান সত্যি সত্যিই কতদিন আর চালানো যাবে তা এখন ভাবনার বিষয়।]

সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ চাইতো পাখিদের মতো আকাশে উড়তে। শুধু আকাশে উড়তেই নয়, সে চাইতো মহাকাশে পাড়ি জমাতেও। তাই প্রায় সবদেশেরই রূপকথায় কিংবা পৌরাণিক কাহিনীতে বেশ ভালো মাত্রায় ছড়িয়ে আছে আকাশে ঘুরে বেড়াবার কথা, মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার বর্ণনা। এমনি বহু বর্ণনার মধ্যে মহাভারতের কাহিনী থেকে একটি মহাকাশ অভিযানের কথা দিয়ে শুরু করা যাক।

মহাভারতের বনপর্বে ইন্দ্র সারথি মাতলি অর্জুনকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে রথ নিয়ে এসেছেন তার 'বায়ুবেগ গতি' 'দশ সহস্র তুরঙ্গম' সমান। এই তুরঙ্গম সম্ভবত পদার্থবিজ্ঞানের অশ্বশক্তির দ্যোতক। সেই রথের আকাশ পথে গমনের চিত্রটি এই রকম ঃ

"তাহার প্রচণ্ডবেগে জলদমালা ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্মল এবং ঘনঘটার গভীর গর্জনসদৃশ নির্ঘোষে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।" অর্জুনের যাত্রাপথের বর্ণনা অনেকটা এযুগের মহাকাশচারীর বর্ণনার মত। "ধীমান কুরুনন্দন দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে মর্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুতরূপ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সূর্য, চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই। যে সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক বৃহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্টত্বপ্রযুক্ত (দূরত্ব নিবন্ধনহেতু) দীপের ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার সম্পন্ন।" আরও নানান চমকপ্রদ বর্ণনা আছে অর্জুনের এই মহাকাশ যাত্রাপথের। বনপর্বের এই অংশে উজ্জ্বল দৃষ্টিবিমোহন প্রচণ্ড বেগশালী অনেক বিমানের উল্লেখ অনেকবারই আছে এবং আকাশপথে তাদের গমনাগমনের বর্ণনাও আছে বেশ কিছু বার। এ ব্যাপার কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় অনূদিত 'মহাভারত' দেখা যেতে পারে।

মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনের 'পাশুপত' অস্ত্রলাভের কাহিনী আছে। এই অস্ত্র মুহূর্তেই পৃথিবী ধ্বংস করতে পারতো। নিবাত-কবচ অসুরদের ধ্বংসের জন্য প্রয়োজন ছিল এই অস্ত্রের। ওই পাশুপত অস্ত্রলাভের পরপরই অর্জুনকে দেবলোকে যেতে হয়েছিল দেবতাদের কিছু শত্রুকে পাশুপত অস্ত্রে ধ্বংস করার জন্য। দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁর দলবল নিবাত-কবচ ইত্যাদি অসুরদৈত্যদের কিছুতেই বধ করতে পারছিলেন না। পাশুপত অস্ত্র ছাড়া তাদের ধ্বংস করা দেবতাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেবতারা শিবকে সন্তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্রলাভেও অপারগ ছিলেন। তাই অর্জুন যখন তাঁর বীরত্বে পশুপতি শিবকে খুশি করে পাশুপত অস্ত্রলাভ করলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে দেবলোকে আমন্ত্রণ জানালেন নিবাতকবচ ইত্যাদির ধ্বংস করার জন্য।

এরপর অর্জুনের দেবলোক যাত্রার যে বর্ণনা মহাভরেত আছে তা একালের কোন মহাকাশচারীর মহাকাশ যাত্রার বর্ণনার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, বরং অনেক বেশি আধুনিক এবং রোমাঞ্চকর। এর কিছুটা বর্ণনা একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। সহজ করে একটু বিশদ বর্ণনা করলে যা দাঁড়ায় তা এই রকম ঃ

''আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্ণ করে গম্ভীর নাদে মাতলি চালিত ইন্দ্রের রথ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হল। সেই রথের মধ্যে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বিদ্যুৎ, বজ্র, চক্রযুক্ত মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দকারী বায়ু-বিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ত্র, মহাকায় জ্বলিত-মুখ সর্প এবং রাশীকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়ুগতি দশ সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অর্জুন বললেন, সাধু মাতলি, তুমি আগে রথে ওঠ, অশ্বসকল স্থির হোক, তারপরই আমি উঠব। অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে মন্ত্র-জপ ও পিতৃ-তর্পণ করে রথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে মানুষের অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র, সূর্য বা অগ্নির আলো নেই। পৃথিবী থেকে যে দ্যুতিমান তারকাসমূহ দেখা যায় সে সকল অতি বৃহৎ হলেও দূরত্বের জন্য দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অর্জুন সেই সকল তারকাকে স্বস্থলে স্বতেজে দীপ্তিমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্থ ভূতল থেকে যাদের তারকা রূপে দেখেছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন।'' (রাজশেখর বসু অনূদিত 'মহাভারত'-এর বনপর্ব থেকে)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাতলির রথ এক বিশাল মহাকাশযান, যার শক্তি বা ক্ষমতা দশহাজার অশ্বশক্তি। সেই মহাকাশযানে অনেক অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল। ছিল 'চক্রযুক্ত মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দকারী, বায়ু-বিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ত্র'। নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় এই যন্ত্রটি আধুনিক যুগের কামান। রাজশেখর বসু এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর অনুবাদের টীকায়। কিন্তু এটাকে মোটেই প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং এই বর্ণনাকে অনেকটা বেশি বাস্তব বলেই মনে করা হয়। অর্থাৎ মাতলির মহাকাশযানটিতে অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে এযুগের বিমান বিধ্বংসী কামানের মত যুদ্ধ-কামানও সংযুক্ত ছিল। এই যান এসেছিল মহামেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দে সমস্ত দিক প্রকম্পিত করে এবং আকাশমণ্ডলকে অন্ধকার শূন্য করে। সেই বিমানে কিংবা মহাকাশযানে বায়ুর ন্যায় বেগশালী বহু চালক যন্ত্র ছিল। এই যন্ত্রগুলিই ওই বিমানকে বহন করতো। অর্জুন সূর্যের মত সেই দিব্য রথখানিকে অলোকিত করে তাতে আরোহণ করলেন। আবারো বলি, তাঁর মহাকাশে আরোহণ করার বর্ণনা। অর্জুন আকাশে উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করলেন। তিনি পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে হাজার হাজার আশ্চর্য রূপ-সম্পন্ন বিমান দেখলেন। সেখানে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির আলোক নাই। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রস্বরূপ যে সব উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়, সেগুলি অতিবিশাল হলেও দূর বলে দীপের মত

ছোট বলে প্রতীয়মান হয়। অর্জুন মহাকাশে গিয়ে কিরণশালী, মনোহর এবং স্বমহিমায় দীপ্তিমান সেই সব বস্তু দেখতে পেলেন।

এগুলি পড়েই কি মনে হয় না, এগুলি কোনও এক আধুনিক মহাকাশচারীর বর্ণনা? 'মেঘসমূহকে বিদীর্ণ করা' এবং 'আকাশ মণ্ডলকে অন্ধকার শূন্য' করার ব্যাপারটা মহাকাশযানের কথাই বলে। 'মেঘ নিনাদের মত গম্ভীর শব্দের' কথাও এখানে বাদ পড়ে নি। কাহিনীকার উড্ডয়নের প্রকৃত তথ্যাবলীই লিখেছেন। প্রক্ষিপ্ত কিছু নেই। তিনি লিখে রেখেছেন, 'মহামেঘ শব্দের তুল্য গম্ভীর শব্দে সমস্ত দিক পরিপূর্ণ করে, ইন্দ্র-রথ আগমন করল' ধরনের একান্ত বাস্তব বর্ণনা। তাঁর দৃষ্টি যেন বিমানকে অনুসরণ করেছে, যতক্ষণ না সে বিমান মহাকাশের কোলে পৌঁছেছে, যেখানে 'চন্দ্র, সূর্যের আলোক নাই'। বিমান আরও পরে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে, চলে গেছে আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে। তখন মহাকাশচারীর চোখে দেখা হচ্ছে আশপাশের আকাশ। পৌরাণিক কাহিনীগুলি যে কুয়াশার আবরণে ঢাকা আছে তারই ভেতর তাদের বক্তব্য খুঁজতে হয়। তবে অর্জুনের দেবলোক গমনের ঘটনার মত যেসব কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে লেখা রয়েছে, নির্ভুলভাবে তাদের ধরতে অসুবিধা হয় না। কাহিনীকার চেয়েছেন, ভবিষ্যতের মানুষ যেন তাঁর কথা বুঝতে পারে। তাঁর বর্ণনায় তাই তিনি দৃষ্টি ও শ্রুতির বেশ কিছু নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। পৃথিবী থেকে অতো দূরের বস্তু যে কেউ দেখতে পায় না, নক্ষত্র যে একটা বিশাল বস্তু পিণ্ড, সেটা তো এখান থেকে বোঝা যায় না। 'এ ভূতল থেকে নক্ষত্র স্বরূপ যে সকল উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়, সেগুলি অতি বিশাল হলেও দূর বলে দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়।' এই বর্ণনা কোনও ধোঁয়ায় ঢাকা বর্ণনা নয়। সহজ করেই বর্ণনা করা হয়েছে বাস্তব ঘটনার। যেমন লেখা আছে তেমনই বোঝা যায়। সুতরাং অর্জুনের দেবলোক যাত্রা, মহাকাশযানে চড়েই আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে কোথাও হয়ত হয়েছিল। এ নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, একটা কথা পরিষ্কার যে, মানুষের মনে মহাকাশ অভিযানের কল্পনা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। এই ধরনের কাহিনীগুলি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীনকালের মানুষদের সেই সব কল্পনার কথাই বলে। এই সব কাহিনী যতই বাস্তব মনে হোক না কেন, এদের বাস্তবতা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে।

পৌরাণিক আকাশ অভিযানের নানা কাহিনী আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকলেও তার সত্যতা নিয়ে তর্ক-বিতর্কও অশেষ। সুতরাং মহাকাশ অভিযানের একালের কথায় আসাই ভালো। 1905 সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আবিষ্কার করলেন উড়োজাহাজ। বহুকাল ধরে নানা প্রচেষ্টার শেষে সেদিন এসেছিল সফলতা আকাশ-অভিযানে। সেই উড়োজাহাজের নানা বিকাশ ঘটেছে গত একশো বছরে। সুপারসোনিক 'কংকর্ড' ইত্যাদি বিমানেরা এখন পৃথিবীর আকাশ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছে মহাকাশ অভিযান। শুরু হয় পৃথিবীর আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা। শুরু হয় চাঁদের আকাশ, পরিবেশ জানার প্রচেষ্টা। তারপর চলে মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের আকাশে মানবহীন মহাকাশযানের অভিযান। এখনও অবধি মহাকাশ অভিযান সীমাবদ্ধ রয়েছে আমাদের সৌরমণ্ডলের মধ্যেই। তবে, ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো মহাকাশযান পাঠাতে পারবে কাছাকাছি থাকা কোন সৌরমণ্ডলে। আবার কাছের কোনও নক্ষত্রেও পাড়ি জমাতে পারে মানুষের মহাকাশযান অদূর ভবিষ্যতে। বেশ কিছুদিন ধরে একটা পরিকল্পনা চলছে বার্নার্ড নক্ষত্রে [Barnard's Star] মহাকাশযান পাঠানোর। এর দূরত্ব 5.9 আলোকবর্ষ এবং এর একটা গ্রহমণ্ডলী আছে।

পৃথিবীর মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে হলে দুটি প্রাথমিক জিনিসের জটিল নিয়ন্ত্রণের উপর নজর দিতে হবে। এর একটি হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করেই উপগ্রহটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হল, কক্ষপথে স্থাপনের আগে এবং পরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এর জন্য জানতে হয় ওই উপগ্রহটি কোন পরিবেশে কাজ করবে। এই দুটি ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ খুবই জটিল। রকেটের সাহায্যে ঘাত [Thrust] প্রয়োগ করে উপগ্রহটিকে ত্বরণ দেওয়া হয় 32.2 ফুট বা 9.81 মিটার/সেকেন্ড^2 [g]। কক্ষপথে স্থাপনের জন্য উপগ্রহটিকে গতিবেগ দেওয়া হয় 18,000 মাইল বা 28,800 কিমি প্রতি ঘন্টায়। তবেই উপগ্রহটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়।

রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। রকেটগুলি অনেকটা আতসবাজীর হাউইগুলির মত। তবে এগুলি পর্যায়ক্রমে জ্বালানী শেষ করে স্তরে স্তরে মূল রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ফলে, মোট ওজন ক্রমশঃ কমতে থাকায় মহাকাশযানটির গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এইভাবে প্রয়োজনীয় পূর্ণগতি অর্জন করা সম্ভব হয়। রকেটের এই স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে অংশবর্জন মহাকাশযানকে উপযুক্ত গতিবেগ দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি, কারণ রকেটসহ ওই যানের মোট ওজনের প্রায় 1% মাত্র ওই মহাকাশযানের বা কৃত্রিম উপগ্রহের ওজন। বাকী 99% ওই রকেট ও তার জ্বালানীর ওজন। রকেট তার জ্বালানী শেষ করে স্তরে স্তরে খসে গেলে মোট ওজন কমতে থাকে, বাড়তে থাকে গতিবেগ এবং শেষ পর্যায়ে এসে মহাকাশযানটি কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহটি তার ঈপ্সিত গতিবেগ অর্জন করে।

আবার, মহাকাশযানটি যত উপরে উঠতে থকে মাধ্যাকর্ষণও তত কমতে থাকে। 160 কিলোমিটার উচ্চতায় মাধ্যাকর্ষণ কমে 1%। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 2,700 কিলোমিটার উপরে এই মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর উপরিতলের প্রায় 50% কমে যায়। 96,000 কিমি উচ্চতায় পৃথিবীপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণের 1/20 ভাগ হয়ে যায় মাধ্যাকর্ষণ বল। কয়েক লক্ষ মাইল দূরে এই মাধ্যাকর্ষণ প্রায় থাকে না বললেই চলে। মহাকাশচারীকে মহাকাশযানে ভারশূন্য অবস্থায় রাখা হয়। এই অবস্থায় মহাকাশচারীকে প্রথমে অভিকর্ষজ ত্বরণের 5 থেকে 6 গুণ ত্বরণ সম্পন্ন [5g/6g] গতি সইতে হয় প্রাথমিক পর্যায়ে। আবার পৃথিবীতে ফিরে আবার সময় গতিবেগের এই ত্বরণ হয়ে যায় 10g থেকে 13g,অর্থাৎ অভিকর্ষজ ত্বরণের 10 থেকে 13 গুণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব রকেট ছোঁড়া হত সেগুলির সর্বোচ্চ গতিবেগ হত 5,000 থেকে 8,000 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এই গতিবেগ কোনও উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করার উপযুক্ত ছিল না। এখন যে সব রকেট ব্যবহৃত হয় সেই সব রকেট তাদের জ্বালানি পুড়িয়ে শেষ করে ফেলার পর উপগ্রহটির কিংবা মহাকাশযানটির গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 28,000 কিলোমিটার করে দেয়। তখন এটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করতে অসুবিধা হয় না। এই গতিবেগ অর্জিত হয় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার উচ্চতায়। এই উচ্চতা যত বাড়ে মাধ্যাকর্ষণ তত কমে এবং কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথে গতিবেগ আনুপাতিকভাবে ততটাই কম হলেও চলে। প্রথমে রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীপৃষ্ঠের সঙ্গে লম্বভাবে উপরে পাঠানো হয় এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় যাওয়ার পর এটিকে কিছুটা পূর্বদিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর এটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে এসে 90^0 পথ পরিবর্তন করে পৃথিবীপৃষ্ঠের সমান্তরাল কক্ষপথে পরিক্রমণ করতে থাকে।

পৃথিবী থেকে কক্ষপথের দূরত্ব যত বেশি হবে উপগ্রহটির গতিবেগ তত কম হবে। আর এই কম গতিবেগসম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহটি একবার পৃথিবী পরিক্রমায় অনেক বেশি সময় নেয়। 1718 কিলোমিটার উচ্চতায় কক্ষপথে স্থাপিত কোনও কৃত্রিম উপগ্রহ যেখানে তার কক্ষপথে থেকে পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করতে সময় নেয় 2 ঘন্টা, সেখানে 41,600 কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে স্থাপিত উপগ্রহ একবার পৃথিবী পরিক্রমা সারতে সময় নেয় 24 ঘন্টা। পৃথিবী 24 ঘন্টায় নিজের অক্ষের উপর একবার আবর্তন করে। তাই ওই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে, যেগুলি 24 ঘন্টায় একবার পৃথিবী পরিক্রমা সারছে, বলা হয় 'ভূসমলয় উপগ্রহ' [Geostationary Satellite]। এই কক্ষপথে উপগ্রহটি গতিবেগ হয় 11,200 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। চাঁদ উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে 3,84,000 কিলোমিটার দূরের একটি কক্ষপথে অবস্থান করে প্রায় এক মাসে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। ওর কক্ষীয় গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 3,100 কিলোমিটার।

পৃথিবীর উপগ্রহগুলির কক্ষপথ সাধারণতঃ উপবৃত্তাকার। তবে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে বৃত্তাকার কক্ষপথেও স্থাপন করা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা করাও হয়। তবে বৃত্তাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করা বেশ দুরূহ এবং জটিল ব্যাপার। রকেটের জ্বলন যে বিন্দুতে শেষ হচ্ছে, সেই বিন্দুতে গতিবেগ যদি বৃত্তাকার কক্ষপথের জন্য প্রয়োজনীয় গতিবেগের চেয়ে বেশি হয়, তবে ওই বিন্দুটি হবে 'অনুভূ' [Perigee]। অনুভূ হল উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সেই বিন্দু যেখান থেকে পৃথিবী সবচেয়ে কাছে। আবার রকেট জ্বলন যে বিন্দুতে শেষ হল সেই বিন্দুতে গতিবেগ যদি বৃত্তাকার কক্ষপথের জন্য প্রয়োজনীয় গতিবেগের চেয়ে কম হয়, তবে বিন্দুটি হবে 'অপভূ' [Apogee]। এই অপভূ হল মহাকাশযানের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে দূরতম বিন্দু। উভয়ক্ষেত্রেই মহাকাশযানের কক্ষপথ বৃত্তাকার না হয়ে উপবৃত্তাকার হয়।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যেতে হলে মহাকাশযানকে কমপক্ষে ঘন্টায় 40,000 কিলোমিটার গতি দিতে হবে। এটি হলো সর্বনিম্ন গতিবেগ যা কোন মহাকাশযানের প্রয়োজন, যেটি শুক্রগ্রহে কিংবা মঙ্গলগ্রহে যাচ্ছে। বৃহস্পতি যেতে যে গতিবেগ লাগে তা হল প্রতি ঘন্টায় 51,000 কিলোমিটার। আবার প্লুটো অভিযানের জন্য চাই প্রতি ঘন্টায় 59,200 কিলোমিটার গতিবেগ। চাঁদ বা অন্য গ্রহে যাওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট 'প্রক্ষেপ পথ' [Trajectory] ধরে নিয়ে মহাকাশযানটি চালিত করতে হয়। এই প্রক্ষেপ পথ হল কোনও মহাকাশযানের সেই পথ যে পথে চাঁদ কিংবা অন্য গ্রহে যেতে সবচেয়ে কম শক্তি খরচ হয়। এই পথগুলি উপবৃত্তকার। এর অন্য নাম 'Transfer Orbits'। মঙ্গলের অভিযানে 'Transfer Orbit'-এ গতিবেগ কমাতে হয়, কারণ মহাকাশযানটি সূর্য ও পৃথিবীর মহাকর্ষের আওতা থেকে দূরে চলে যায় এবং মঙ্গলের কক্ষীয় গতিবেগও পৃথিবীর চেয়ে কম। কিন্তু শুক্রগ্রহের কক্ষীয় গতিবেগ পৃথিবীর চেয়ে বেশি, তাই Trasfer Orbit-এ মহাকাশযানটির গতিবেগ বাড়াতে হয়। গতিবেগ এইভাবে কমাতে ও বাড়াতে মাঝপথে রকেট জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখতে হয়। মাঝপথে রকেট জ্বালিয়ে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় মহাকাশযানটির। মঙ্গল এবং শুক্রের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক কক্ষীয় অবস্থান মহাকাশযানের অনুকূল হয়, যখন Trasfer Orbit-এ সবচেয়ে কম শক্তি ব্যয় করে মহাকাশযান মঙ্গল বা শুক্রে পৌছাতে পারে।

মহাকাশ যাত্রায় যান চালানোর ব্যাপারটি ত্রি-মাত্রিক, পৃথিবীপৃষ্ঠে কিংবা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যান চালানোর মতো এটি দ্বিমাত্রিক নয়। মহাকাশযান চালানোয় বহু জিনিসের হিসাব-নিকাশ লাগে। যেমন ঃ পৃথিবীর কক্ষীয় গতি, যে গ্রহে পাড়ি জমানো হচ্ছে তার কক্ষীয় গতি, অন্যান্য বস্তুর গতি, পরিবর্তিত

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির আপেক্ষিক অবস্থান, গ্রহদের বিশাল দূরত্ব, পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশযানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাছাড়াও মনে রাখতে হয়, অভিযানের উদ্দেশ্য, কী ধরনের মহকাশযান যাচ্ছে, গতিবেগের পরিবর্তন ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা। সব মিলিয়ে এক জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় মহাকাশ যাত্রায়। সব কিছু ঠিকঠাক করে নিতে হয় যাত্রা শুরুর আগে। প্রথমে ভুল থাকলে মহাকাশ অভিযান বিফল হতেই পারে।

মহাকাশযানের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নততর করা হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন যে নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে তার সঙ্গে মহাকাশযানগুলির মহাকাশ থেকে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা মহাকাশযানগুলির সঙ্গে বেতারতরঙ্গ মারফৎ যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট উন্নতি হলেও, আরও উন্নতি প্রয়োজন রয়েছে। মহাকাশ অভিযানে এই যোগাযোগ রাখার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বহু দেশ কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে এই সংক্রান্ত যোগাযোগ করার জন্য। নাসা [NASA] চালু করেছে 'Tracking and Data Relay Satellite'। এখন আবার মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। সেই স্টেশনের মাধ্যমে মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানগুলি শুধু যে বেতার যোগাযোগ সম্পন্ন করছে তা নয়, এগুলি বহু আলোকচিত্রও পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে।

মানুষ্যবাহী মহাকাশযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন গভীর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তেমনি মহাকাশচারীও যোগযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থায় নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকে। যন্ত্রপাতির দেখভালও অনেকটা ভালোভাবেই করতে পারে মহাকাশযাত্রীরা। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তারা চালাতে পারে মহাকাশে অবস্থিত মহাকাশযানে বসে। এ পর্যন্ত মানুষ কেবল 6 (ছয়) বারই চাঁদে যেতে পেরেছে। মঙ্গলে বা শুক্রে মানবাভিযান এখনও স্বপ্নমাত্র।

মহাকাশচারী মানুষের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাগুলির কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, সেগুলি হল ঃ (1) বিকিরণ প্রভাব থেকে সুরক্ষা;(2) অক্সিজেন সরবরাহ;(3) কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূরীকরণ, (4) মহাকাশযানের কেবিনের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও চাপ সুরক্ষিত ও স্বাভাবিক রাখা, (5) খাদ্য ও জল সরবরাহ বজায় রাখা;(6) যন্ত্রপাতির নিরীক্ষণ ব্যবস্থা;(7) সতর্কতা ঘোষণার ব্যবস্থা;(৪) মহাকাশযানটির চাক্ষুষ দর্শন ব্যবস্থা থাকা; (9) যোগাযোগ ব্যবস্থা সঠিক রাখা, (10) ব্যবস্থাপনায় উচ্চমাত্রার বিশ্বাসযোগ্যতা। মনুষ্যবাহী মহাকাশযানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হবেই। এইসব যানে তাই ফিরে আসার সমস্ত ব্যবস্থা সঠিকভাবে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। মহাকাশচারী তা অতি অবশ্যই করবেন। মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানকে ফিরিয়ে আনার দরকার হয় না সাধারণতঃ। এই ধরনের মহকাশযানের কাজ হল যে গ্রহ বা বস্তুর অভিযানে সেটিকে পাঠানো হচ্ছে সেই সব গ্রহ বা বস্তুর সম্পর্কে নানা তথ্য ও আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠানো।

মহাকাশযানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় মূলতঃ সৌর প্যানেলের সাহায্যে। সৌর-বিদ্যুৎই এতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। মহকাশযান পৃথিবীর ছায়ায় এলে, সৌর প্যানেল দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। তবে সৌর-বিদ্যুতের ভূমিকাই মুখ্য। মহাকাশযানের অভ্যন্তরের বায়ুমণ্ডলকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তা পার্থিব বায়ুমণ্ডলের মতই থাকে। এতে মহাকাশযাত্রীর অসুবিধা হয় না। আবার, শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া যানে ব্যবস্থা রাখা হয় উচ্চ উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা, কারণ শুক্রের বায়ুমণ্ডলের তথা তার পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা অত্যন্ত বেশি। মঙ্গলের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা সমস্যা নেই। তবে এর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে অনেক পাতলা। সুতরাং মহাকাশযানকে বানানো হয়, যে

গ্রহের উদ্দেশ্যে সেটি যাচ্ছে, তার উপযোগী করে। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে বানানো বিভিন্ন মহাকাশযান ভিন্ন ভিন্ন নকশায় তৈরি করা হয়ে থাকে।

মহাকাশ পাড়ি দিতে হলে মহাকাশযানের নকশা বানানোর সময় কতকগুলি জিনিস মনে রাখতে হয়। যেমন ঃ (1) জীবনদায়ী ব্যবস্থা—মহাকাশযানের অভ্যন্তরের কৃত্রিম বায়ুমণ্ডলকে এমনভাবে তৈরি করতে হয় যে, তা মানুষের উপযোগী থাকে। এই কৃত্রিম বায়ুমণ্ডলের চাপও প্রয়োজনীয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়। (2) মহাকাশচারীকে বিভিন্ন ত্বরণসম্পন্ন [5g থেকে 13g] গতিবেগ সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। মহাকাশযানে মহাকাশযাত্রীকে অধোমুখী অবস্থায় [Prone] কিংবা চিৎ [Supine] করে শোয়ানো অবস্থায় রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। এর জন্য বিশেষ ধরনের কোচ [Couch] তৈরি করা হয়। (3) মহাকাশচারীকে সইতে হয় প্রায় 20 হার্ৎজ [Hertz] কম্পাঙ্কের কম্পন। শরীর 4 থেকে 6 হার্ৎজ অবধি কম্পন সাধারণভাবে সহ্য করতে পারে। বেশি কম্পাঙ্কসম্পন্ন কম্পন অনেক সময় শরীর সইতে পারে না, তার টিস্যুগুলি এতে ছিঁড়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করতে হয় মহাকাশযানে। (4) ভারশূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি করতে হয় মহাকাশযাত্রীদের জন্য। মহাকাশযানে এদের যেমন ভারশূন্য অবস্থায় রাখা হয়, তেমনি চাঁদে বা অন্য গ্রহে এদের ওজন প্রয়োজনমত রাখার বন্দোবস্ত করতে হয় বা হবে। মনে রাখতে হবে, চাঁদে কোন মানুষের ওজন তার পৃথিবীতে যা ওজন তার 1/6 অংশ হয়। বৃহস্পতিতে ওজন হবে 2.5 গুণ। আবার মঙ্গলে মানুষটির ওজন তার পৃথিবীর ওজনের $1\frac{1}{3}$ গুণ হবে। মহাকাশচারীকে ঠিক কী ওজনে রাখা হবে তা ঠিক করতে হবে এই সব কথা মনে রেখে। (5) মহাকাশচারীকে বিভিন্ন মহাজাগতিক বিকিরণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়তে হবে। 100 র‍্যাডের [Rad] বেশি বিকিরণ প্রভাবে মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের গোলমাল হয়। রক্তকণিকা তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে। এই অবস্থায় ওই মহাকাশচারীর মৃত্যুও হতে পারে। এই কথা মনে রেখে মহাকাশচারীর জন্য বিকিরণ প্রতিরোধক সবরকম ব্যবস্থা নিতে হয়। (6) মহাকাশযানে মহাকাশচারীকে একা একা কিংবা সমান্য কয়েকজনের সঙ্গে বহু দিন কাটাতে হয়। একাকীত্বের একটা প্রভাব পড়ে মহাকাশচারীর মনে। প্রশিক্ষণ নিতে হয় এই একাকীত্বে দিন কাটানোর অভ্যাস করার জন্য। মনে রাখতে হবে, মঙ্গলে যেতেই কোনও মহাকাশযান প্রায় এক বছর সময় নিতে পারে। তাই দীর্ঘকাল একাকীত্বের মধ্যে সময় কাটানোর অভ্যাস করা একান্ত জরুরি। (7) মহাকাশচারীর মহাকাশ ভ্রমণের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করা দরকার দীর্ঘকালের মহাকাশযাত্রার আগে। মহাকাশে যাত্রাকালীন এবং মহাকাশের বাইরে পদচারণা কিংবা মহাকাশযান মেরামতের সময় অনেক মহাকাশচারীই শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হন। এতে এঁদের শরীরের রক্তচাপ কমে যায়, হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়, ওজন কমে যায়। এমন কি রক্তেও অনেক পরিবর্তন আসে। এগুলি ঠিক হতে প্রায় পাঁচদিন সময় লাগে। শারীর বৃত্তীয় এই পরিবর্তনকে মহাকাশচারীদের ভাষায় বলা হয় 'Deconditioning Phenomenon'। তাই দীর্ঘকালের মহাকাশযাত্রার আগে মহাকাশচারীকে এই সব অভিজ্ঞতার প্রশিক্ষণ নিতে হয় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অনুরূপ পরিবেশে। তবে ভালো হয়, যদি স্বল্পমেয়াদী মহাকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেই মহাকাশচারী দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশচারণে যান। দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ অভিযান মানুষ্যহীন মহাকাশযান দিয়ে বেশ কয়েকবার করা হলেও, মানুষ্যবাহী মহাকাশযান মঙ্গল কিংবা শুক্রে, আজও পাঠানো যায় নি। তবে এই কিছুদিন আগে এই দেশেরই কন্যা সুনীতা উইলিয়াম্‌স মহাকাশ স্টেশনে ছয়মাসেরও

বেশি কাটিয়ে এসেছেন।

মহাকাশে মানুষের অভিযানের বাস্তব রূপ যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনজন বিজ্ঞানী সর্বাগ্রগণ্য। এঁরা হলেন ঃ ৎসিওলকোভ্স্কি [Tsiolkovski], গডার্ড [Goddard] এবং ওবের্থ [Oberth]। এঁরা তিনজনই অধ্যাপক, গণিতবিদ এবং পদার্থবিজ্ঞানী। এঁরাই প্রথম বলেন যে, মানুষের মহাকাশ অভিযান সম্ভব। ৎসিওলকোভ্স্কি [Konstantin Eduardovitch Tsiolkovski] সোভিয়েত রাশিয়ায় বসে কয়েকটি কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী এবং কারিগরি বিদ্যার উপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1898 খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম নিবন্ধে তিনি প্রথম দেখালেন তরল জ্বালানীর রকেট ব্যবহার করে মহাকাশ অভিযান সম্ভব। তিনি জানালেন, তরল অক্সিজেন কিংবা তরল হাইড্রোজেন রকেটের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তিনি বললেন, আন্তর্গ্রহ অভিযানে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে তেল ভরবার স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি মনুষ্যবাহিত মহাকাশযানগুলিতে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি রাখবার কথাও বলেন। তিনি মহাকাশচারীদের উপর যাত্রা শুরুর প্রবল ত্বরান্বিত গতিবেগের প্রভাবের কথাও লিখলেন। ফিরে আসার সময় যে বিপরীতমুখী রকেটের প্রয়োজন তাও তিনি জানালেন। তাঁর এই সব প্রস্তাব সে সময় তেমন আমল পায় নি। 1930 সাল নাগাদ তিনি রাশিয়াতে কিছুটা খ্যাতিলাভ করলেও রাশিয়ার বাইরে তাঁর কথা কেউ তেমন একটা জানতো না।

গডার্ড [Robert H. Goddard] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। তিনি চিন্তা করলেন রকেটে তরল জ্বালানীর পরিবর্তে কঠিন পদার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে। 1916-17 সালে তিনি যখন ক্লার্ক কলেজে [Clark College] অধ্যাপনা করছিলেন, তখন পরীক্ষাগারে দেখান যে, শূন্যে ধাতব আয়ন তৈরি করে তাকে স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্রের সাহয্যে ত্বরান্বিত করা যায়।

গডার্ড সারাজীবন বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে গবেষণা চালানোর উপযোগী রকেট বানানোর এবং আন্তর্গ্রহ মহাকাশ অভিযানের স্বপ্ন দেখেছেন। 1921 সালে তিনি কঠিন পদার্থের বদলে তরল অক্সিজেন এবং গ্যাসোলিন ব্যবহারের কথা বলেছেন রকেটের জ্বালানী হিসাবে। 1926 সালে তিনি বানিয়ে ফেলেন পৃথিবীর প্রথম তরল জ্বালানীর রকেট। এর দৈর্ঘ্য ছিল 184 ফুট [56 মিটার]। 1929 সালে তিনি আরও বড় এবং আরও উন্নতমানের রকেট বানিয়ে ফেলেন। তিনি মাত্র দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সব পরীক্ষানিরীক্ষার সুন্দর নোট রেখে গেছেন। তাঁর এই সব নোটে আছে চন্দ্রাভিযান, মঙ্গল অভিযান এবং শুক্র অভিযানের সার্থক পরিকল্পনা। তিনি মারা যান 1945 খ্রিস্টাব্দে।

ওবের্থ [Hermann Oberth] জন্মেছিলেন ট্রান্সিল ভ্যানিয়ায়। এটি রুমানিয়ায় অবস্থিত। 1923 সালে তিনি লিখলেন, 'The Rocket Into Interplanetary Space'। ওবের্থের এই রকেট ও তার আন্তর্গ্রহ মহাকাশে অভিযানের কথা বাস্তবভাবে ওই বইটিতে বলা হলেও, বিজ্ঞানীরা এটিকে সে সময় গ্রহণ করেন নি। 1929 সালে তিনি আর একটি বই লেখেন 'The Road to Space Travel'। ওবের্থ ছিলেন তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী। তিনি চাঁদ ও আন্তর্গ্রহ মহাকাশে মনুষ্যবাহী তথা মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন তাঁর ওই বই দুটিতে। এই তিনজন বিজ্ঞানীর মধ্যে একমাত্র তিনিই দেখেছিলেন 1957 সালে কৃত্রিম উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ। রকেট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তিন মহান বিজ্ঞানীর কথা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সময়ের আরও দু'জন বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য। এর একজন হলেন রুশ বিপ্লবী 'কিবালটচিচ' [Kibaltchich] এবং অন্য জন হলেন জার্মানীর 'হেরমান গ্যান্স্উইন্ডট্' [Hermann Ganswindt]। এঁদের পরিকল্পনা ছিল উপরের তিনজনের অনুরূপ।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর 1920 সাল নাগাদ মহাকাশ অভিযানের স্বপ্ন সার্থক করার প্রচেষ্টা আবার শুরু হয়। এই সংক্রান্ত নানা সোসাইটি তৈরি হতে থাকে সোভিয়েত রাশিয়ায়, জার্মানীতে, অস্ট্রিয়াতে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, বৃটেনে এবং অন্যত্র। জার্মানীর সেনাবাহিনীতে রকেট মোটর নিয়ে গবেষণা শুরু হয় 1933 সালে। রাশিয়াতে এই সময় টিখোন্‌রাভোভ [M. K. Tikhonravov] এবং ৎস্যান্ডার [Friedrich A. Tsander] সাফল্যের সঙ্গে তরল জ্বালনীর রকেট উৎক্ষেপণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে রকেট ছোঁড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। সব জাতির রকেট সোসাইটি এঁদের কাজকর্ম শিকেয় তুলে রাখে। জার্মানীতে কিন্তু ভার্ণহার ভন ব্রাউন [Wernher Von Braun] প্রচলিত রকেটবিদ্যা নিয়ে কাজ করে যেতে থাকেন। জার্মান সেনাবাহিনী হিটলারের নির্দেশে রকেট নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকে। কাপ্টেন ওয়াল্টার ডোর্নবার্জারের [Capt. Walter Dornberger] নেতৃত্বে রকেক্ষ উৎক্ষেপণ করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়, যাতে রকেটকে যুদ্ধের কাজে লাগানো যায়। এই সময় A-4 জাতীয় রকেট তৈরি হয়। এটি V-2 রকেট নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এটা কিন্তু রকেট কারিগরীর প্রাথমিক স্তর। ভন ব্রাউনের তৈরি এই সময়ের রকেটগুলি কিন্তু ভবিষ্যতের রকেটের পথিকৃৎ।

ব্রাউন এবং তাঁর রকেট তৈরি করার 100 জন কারিগর যুদ্ধের পর চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে গিয়ে তাঁরা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কাজ শুরু করেন নিউ মেক্সিকোতে। V-2 রকেট বানান। এই রকেট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রায় 160 কিমি উচ্চতায় ওঠে। এরপর এক্সপ্লোরার-1 [Explorer-1] উৎক্ষেপণের জন্য রকেট তৈরি করা হল। কিছুটা পরে 'নাসা' [NASA] বানালো 'মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেন্টার' [Marshall Space Flight Centre]। হান্টস্‌ভিলে এই সেন্টারে ভন ব্রাউন ও তার দলবল মিলে তৈরি করে ফেললেন স্যাটার্ন শ্রেণীর রকেটসমূহ। এই রকেট কাজে লাগানো হয়, অ্যাপোলোর চন্দ্রাভিযানে। রাশিয়া জার্মানীর কিছু রকেট বিজ্ঞানীকে তাঁদের দেশে নিয়ে যায়। তাঁরা অত্যন্ত দ্রুত V-2 জাতীয় রকেট তৈরি করে ফেলেন। রাশিয়ার এই রকেট বিজ্ঞানীরা এতো দ্রুত রকেটের উন্নতি সাধন করেন, যে সোভিয়েত রাশিয়া এই সময় এই ব্যাপারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে যায়।

1954 সালে রকেট ও মহাকাশ উড়ান সংক্রান্ত সোসাইটিগুলির পুনর্গঠন করা হয়। "আমেরিকান রকেট সোসাইটি' [ARS] 'স্পেস ফ্লাইট কমিটি' গঠন করে। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে রকেট সোসাইটিগুলির সদস্যরা মহাকাশ অভিযান নিয়ে যতটা উৎসাহিত ছিলেন, বিশ্বযুদ্ধের পর যাঁরা নতুন সদস্য হলেন, সেই সব নবীন বিজ্ঞানী, কারিগব, রকেট ইঞ্জিনীয়াররা ততটা উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যায় এতোটাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, 1954 সালের আগে মহাকাশ অভিযান নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার অভাব দেখা গেল। ভন ব্রাউন এবং তাঁর সঙ্গীরা কিন্তু ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছিলেন। এই ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনা হল ঃ প্রথমে মনুষ্যহীন মহাকাশযান অন্তরীক্ষে পাঠানো, পরে মনুষ্যসহ মহাকাশযান পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা এবং তারপর চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহ অভিযান।

1955 সালের জুলাই মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুপিটার সি রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর কক্ষপথে 9.7 কিলোগ্রাম ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। 1957 সালের 4ঠা অক্টোবর রাশিয়া প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক' পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। প্রকৃত পক্ষে বলা যায়, এটিই ছিল পৃথিবীর মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। মানুষের মহাকাশ অভিযানের সেই শুরু। 1957 সালেরই 3রা নভেম্বর স্পুটনিক-2 মহাকাশে নিয়ে যায় লাইকা [Laika] নামের কুকুরটিকে। স্পুটনিক-1-এর ওজন ছিল 85 কেজি। আয় স্পুটনিক-2-এর ওজন হল 504 কিলোগ্রাম। আমেরিকা তখনও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণে তেমন কুশলী হয়ে উঠতে পারে নি। রাশিয়াই তখন সেরা।

1958 সালের 31শে জানুয়ারী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এক্সপ্লোরার্-1 নামের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে। এতে ব্যবহার করা হয় জুপিটার-সি রকেট। এর যন্ত্রপাতি বানিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির জেট প্রপালসন ল্যাবোরেটরি [Jet Propulsion Laboratory] এবং আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস ভ্যান অ্যালেন [James Van Allen]। 1958 সালের 29 শে জুলাই আমেরিকা প্রণয়ন করে 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস্ অ্যান্ড স্পেস অ্যাক্ট' [National Aeronautics and Space Act] আইন। মহাকাশ অভিযানের জন্য এই আইন অনুসরণ করে গড়া হল এক সংস্থা। তার নাম দেওয়া হল 'ন্যাশনাল আরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' [National Aeronautics and Space Administration], যা আজ 'নাসা' [NASA] নামে বিশ্ববিখ্যাত। এরপর নাসা মহাকাশ অভিযানের নানা পরিকল্পনা নিতে থাকে। সেগুলি বাস্তবায়িত হতে থাকে। কোনওটা সফল হয়, কোনওটা বা বিফল। চলতে থাকে মহাকাশ অভিযানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সোভিয়েত রাশিয়াও আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে এবং তাদের অগ্রগতি একটু বেশি হতে থাকে।

নাসা প্রায় প্রথম থেকেই চেষ্টা চালাতে থাকে চন্দ্রাভিযানের। 1960 সালের প্রথম দিকে রাশিয়া চাঁদে মনুষ্যহীন যান পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়। লুনা-6,7 এবং 8 মহাকাশযানগুলির ব্যর্থতার পর লুনা-9 কে 1966 সালের 3রা ফেব্রুয়ারী চন্দ্রপৃষ্ঠে সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করায় সোভিয়েত রাশিয়া। এই যানটির ক্যামেরা 4,00,000 কিলোমিটার দূরের চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু ছবি পাঠায়, যা পরীক্ষা করে জানা যায়, চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রকৃতি এবং তা বড় বড় মহাকাশযান পাঠানোর উপযোগী। এরপর 2রা জুন, *1966-তে আমেরিকাও সার্ভেয়ার-1 যানটি পাঠায়। এটি প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে চাঁদের মোট 11,000টি* ছবি পাঠায়। 1967 সালের 6ই জানুয়ারী এটি পুরোপুরি বিকল হয়ে যায়।

সোভিয়েত রাশিয়া 1966 সালের 3রা এপ্রিল লুনা-10 কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সর্বপ্রথম চন্দ্রের কক্ষপথে সাফল্যের সঙ্গে স্থাপন করে। আমেরিকা এমনি এক স্যাটেলাইট চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন করে *1966 সালের 14ই আগস্ট। এর নাম ছিল 'Lunar Orbiter-1'। এটিকে 29 আগস্ট নষ্ট করা* হয় 'লুনার অরবিটর-2'কে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করার প্রয়োজনে। এই স্যাটেলাইটগুলির উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা পরের অ্যাপোলো [Apollo] গোষ্ঠীর মহাকাশযানগুলির চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করা। এই সময়ই জানা যায়, চাঁদও পুরোপুরি গোলাকার নয়, কিছুটা নাসপাতির আকৃতির। এর উত্তর মেরুর দিকটা প্রায় 400 মিটার [0.4 কিমি] স্ফীত। ওই বছরই সোভিয়েত রাশিয়ার লুনা-11 চাঁদের কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এটি চাঁদের 160 কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে চাঁদকে পরিক্রমণ করতে থাকে। দিনটা ছিল 24শে আগস্ট 1966 খ্রিস্টাব্দ। ওই বছরই 22শে অক্টোবর

লুনা-12 চাঁদের আরও নিকটতর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এটি চাঁদ থেকে মাত্র 97 কিলোমিটার দূরত্বের কক্ষপথে পরিক্রমণ সারতে থাকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 1966 সালের 6ই নভেম্বর 386 কিলোগ্রাম ওজনের লুনার অরবিটর-2 চাঁদে পাঠায়। এটি চাঁদের 195 কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এরপর 1967 সালের 5ই ফেব্রুয়ারীতে পাঠানো হয় লুনার অরবিটার-3। এর কক্ষপথ ছিল চাঁদের থেকে কেবলমাত্র 55 কিমি দূরত্বে। এরপর 1967 সালেই মে মাসের 11 তারিখে লুনার অরবিটার-4 কে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। 1লা আগস্ট যায় লুনার অরবিটার-5। 1968 সালের এপ্রিলে সোভিয়েত রাশিয়া পাঠায় লুনা-14 এবং এর কক্ষপথ হয় চাঁদের 160 কিমি থেকে 870 কিলোমিটার দূরত্বের। এটি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় চন্দ্র-পরিক্রমণরত অবস্থায়। রাশিয়া অনেকটা পরে লুনা-19 চাঁদের কক্ষপথে [127-135 কিমি] স্থাপন করে।

1966 সালের 13ই ডিসেম্বর লুনা-13-কে চাঁদে যাওয়ার জন্য উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি চাঁদে পৌঁছায় খ্রিস্টমাসের সময়। এতে যে সব যন্ত্রপাতি পাঠানো হয় তাদের সাহায্যে জানা যায়, চাঁদের মাটি পৃথিবীর মত, কিন্তু তার ঘনত্ব পার্থিব মাটির চেয়ে অনেকটা কম। এরপর সার্ভেয়ার এবং অরবিটার উপগ্রহগুলি থেকে জানা গেল ঘনত্ব কম হলেও চাঁদের মাটিতে অ্যাপোলো উপগ্রহের সফল অবতরণ সম্ভব। সিলিকন, ব্যাসল্ট ইত্যাদি উপাদান আবিষ্কৃত হল চাঁদের মাটিতে। এরপর কয়েকটি সার্ভেয়ার অভিযানের পর 1969 সালের 16ই জুলাই অ্যাপোলা-11 স্যাটার্ন-5 রকেটের সাহায্যে পৃথিবী ছাড়ে এবং এটি এর মহাকাশচারীদের নিয়ে চাঁদের আকাশে পৌঁছায়। এর তিনজন মহাকাশচারীদের মধ্যে দু'জন 20শে জুলাই চাঁদে অবতরণ করে 4.17 PM EDT-তে। যে তিন মহাকাশচারী এই চন্দ্রাভিযানে অংশ নিয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন, এডুইন অলড্রিন [Edwin Aldrin], নীল আর্মস্ট্রং [Neil A. Armstrong] ও মাইকেল কলিন্‌স [Michael Collins]। এঁদের মধ্যে নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন চন্দ্রযান ঈগলে করে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন 20শে জুলাই, 1969 খ্রিস্টাব্দ। মাইকেল কলিনস চন্দ্র পরিক্রমারত যানটিতে থাকেন। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন উভয়েই চাঁদের মাটিতে পদচারণা করেন, বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় কয়েক হাজার ছবি তোলেন, চাঁদের মাটির বহু নমুনা সংগ্রহ করেন, আরও নানা কাজ করেন। এ নিয়ে পরে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে তাঁরা চাঁদের মাটিতে পদচারণা করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। চাঁদে প্রায় একদিন কাটিয়ে পরের দিন [21 শে জুলাই, 1969] এই দুই চন্দ্রচারী 'ঈগল'-কে চালিয়ে ফিরে আসেন কলম্বিয়ায়, যেখানে কলম্বিয়াকে চালাচ্ছিলেন মাইকেল কলিন্‌স। পৃথিবীর বাইরের মাটিতে এটাই ছিল মানুষের প্রথম পদচারণা। ঈগল থেকে নেমে চাঁদের মাটিতে প্রথম পদচারণা করে ছিলেন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং। তারপর নেমেছিলেন অলড্রিন।

ওই 1969 খ্রিস্টাব্দেরই 14ই নভেম্বর অ্যাপোলো-12 উপগ্রহ চ'ড়ে আবারো তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী চন্দ্রাভিযানে যান। এঁরা হলেন ঃ অ্যালান এল বিন [Alan L. Bean], চার্লস কনরাড জুনিয়ার [Charles Conrad Jr.] এবং রিচার্ড. এফ. গর্ডন [Richard F. Gordon]। এঁদের মধ্যে কনরাড এবং বিন চাঁদে নামেন। পদচারণা করেন চাঁদের মাটিতে। এঁরা হলেন চাঁদের মাটিতে পা-রাখা তৃতীয় ও চতুর্থ মানুষ। গর্ডন থাকেন চন্দ্র পরিক্রমারত মূল মহাকাশযানে। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের দ্বিতীয় পদচারণা। এরপর 1971 সালের 5ই ফেব্রুয়ারী আরেক চন্দ্রাভিযানে চাঁদে অবতরণ করেছিলেন দুইজন মহাকাশচারী। সেবারের যানটি ছিল অ্যাপোলো-14 এবং এর তিনজন মহাকাশ

অভিযাত্রী হলেন : অ্যালান শেপার্ড [Alan Shepard], এডগার মিচেল [Edgar Mitchell] এবং স্টুয়ার্ট রুজা [Stuart Roosa]। এঁদের মধ্যে শেপার্ড এবং মিচেল চাঁদে নামেন এবং স্টুয়ার্ট থেকে যান চন্দ্র পরিক্রমারত মূল মহাকাশযানে। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের তৃতীয় পদচারণা। কিছুদিন পরে 1971 সালেরই 26শে জুলাই অ্যাপোলো-15-এ চ'ড়ে তিনজন মহাকাশচারী ডেভিড স্কট [David Scott], জেমস আরউইন [James Irwin] এবং আলফ্রেড ওর্ডেন [Alfred Worden] চন্দ্রাভিযানে যান। স্কট ও আরউইন চাঁদে নামেন 30শে জুলাই। ওর্ডেন থাকেন মূল মহাকাশযানে। স্কটেরা তিনবার চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করেন ও নানা পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালান। ওঁরা ফিরে আসেন পৃথিবীতে 7ই আগস্ট। এটি ছিল মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে চতুর্থ দফার পদচারণা। 1972 সালের 16ই এপ্রিল মার্কিন উপগ্রহ অ্যাপোলো-16 আবার চাঁদে পাড়ি জমায়। এবারও তিনজন মহাকাশচারী গেলেন। এঁরা হলেন : জন ইয়ং [John Young], চার্লস ডিউক [Charles Duke] এবং টমাস ম্যাটিংলি [Thomas Mattingly]। ইয়ং ও ডিউক চাঁদে নামেন 20শে এপ্রিল। এঁরা তিনবার চাঁদে ঘুরে বেড়ান। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ম্যাটিংলি থাকেন চন্দ্র পরিক্রমারত মূল মহাকাশযানে। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পঞ্চম পদচারণা। এঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন 27শে এপ্রিল।

1972 সালেরই 7ই ডিসেম্বর অ্যাপোলো-17 আবারো চাঁদে যায় তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে। এঁরা হলেন ইউজিন কারনান [Eugene Cernan], রোনাল্ড ইভানস্ [Ronald Evans] এবং হ্যারিসন স্মিট [Harrison Smitt]। 11ই ডিসেম্বর কারনান এবং স্মিট চাঁদে অবতরণ করেন। এঁরা তিনবার চাঁদে পদচারণা করেন দফায় দফায়। মূল মহাকাশযানে থাকেন ইভান্স। এঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন 19শে ডিসেম্বর। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের ষষ্ঠ দফার পদচারণা।

আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন মোট 21 ঘণ্টা 30 মিনিট কাটান চাঁদের মাটিতে। ঈগল নামের যে যানটিতে করে তাঁরা চাঁদে নামেন সেটিতেই তাঁরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেন এবং চাঁদের মাটিতে নেমে এসে নানা নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করেন। ওই সাড়ে একুশ ঘণ্টা কাজ এবং বিশ্রামের পর ঈগল যান চালিয়েই আবার তাঁরা ফিরে আসেন মূলযান কলম্বিয়াতে, যেখানে অপেক্ষা করছিলেন মাইকেল কলিন্স। এই অভিযানের কিছু কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

1969 সালের 16ই জুলাই অ্যাপোলো-11 পৃথিবীর মাটি থেকে যাত্রা শুরু করে 9.32 AM EDT-তে। এই 'EDT' হল Eastern Daylight Time। কেপ কেনেডি থেকে এটি উৎক্ষেপিত হয় স্যাটার্ন-5 রকেটের সাহায্যে। প্রথমে অ্যাপোলো-11-কে একটা পার্থিব কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, যার উচ্চতা ছিল 185 কিলোমিটার। তারপর রকেট চালিয়ে এটিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতা থেকে বের করে নিয়ে চাঁদের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 39,100 কিলোমিটার গতিতে এটি মহাকাশে ছুটতে থাকে। অ্যাপোলো-11 যখন চাঁদের দিকে যাচ্ছিল তখন সাভিয়েত রাশিয়াও তাদের লুনা-15-কে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন করে। লুনা-15 কেন ওই সময় চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল তা অজানা। তবে, অনেকে মনে করেন, অ্যাপোলোর গতিবিধি জানার জন্যই সোভিয়েত রাশিয়া এমনটি করেছিল। অ্যাপোলো-11 চাঁদের কাছাকাছি আসার পর তার গতিবেগ কমিয়ে করা হয় 10,460 থেকে 5,960 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। এরপর অ্যাপোলো-11 বা মূল যান চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এই কক্ষপথটি উপবৃত্তকার। এ পর্যন্ত আসতে এটি 2,44,930 মাই বা 3,94,337 কিলোমিটার অতিক্রম করে। এই কক্ষপথে এটি স্থাপিত হয় EDT-র 1.22 PM-এ। দিনটা ছিল 1969 সালের 19শে জুলাই।

চাঁদের কক্ষপথে এসে অ্যাপোলো-11 দু'বার চাঁদকে পরিক্রমা করে উপবৃত্তকার কক্ষপথে। তারপর রকেট চালিয়ে ওই কক্ষপথকে বৃত্তাকার [100 এবং 121কিলোমিটার] করা হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠকে ওই কক্ষপথ থেকে দেখার পর আর্মস্ট্রং বলেছিলেন, "It look very much like the pictures but like the difference between watching a real football game and one on TV. There's no substitue for actually being here."

এরপর আর্মস্ট্রং সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে হাউস্টোনকে [Houstone] চাঁদে নামার সম্মতি চাইলেন। সম্মতি পাওয়ার পর চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করা শুরু হল। 'ঈগল' [Eagle] নামক চন্দ্রযানটিকে অ্যাপোলো-11 থেকে আলাদা করা হল। মূলযানের নাম ছিল 'কলম্বিয়া' [Columbia]। কলম্বিয়া ও ঈগল মিলেই হল অ্যাপোলো-11। অতিরিক্ত ছিল কিছু প্রয়োজনমত রকেট। কলম্বিয়া থেকে যায় চাঁদের কক্ষপথে। তাতে থাকেন মাইকেল কলিন্‌স। 'ঈগল'-কে নিয়ে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করতে থাকেন আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন। এরপর ছোট ছোট রকেট দরকার মত জ্বালিয়ে পূর্ব নির্ধারিত স্থানের প্রায় 4 মাইল দূরের একটি স্থানে ঈগলকে সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করানো সম্ভব হয়। ঈগল 1969. সালের 20শে জুলাই বিকাল 4টা 17 মিনিট 41 সেকেন্ডে [4:17:41 P.M. (EDT)] চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখেন নীল আর্মস্ট্রং এবং তারপর এডউইন অলড্রিন।

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল, ঈগল চাঁদের মাটিতে নামার পর মহাকাশচারীদ্বয় ঈগলে আটঘণ্টা কাটাবেন যন্ত্রপাতি পরীক্ষা, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের জন্য। তারপর তাঁরা চাঁদের মাটিতে পা দেবেন। কিন্তু ওঁদের অনুরোধেই সব ঠিকঠাক চলছে দেখে হাউস্টোন $2^1/_2$ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় থেকে কমিয়ে দেয়। তাই নির্ধারিত সময়ের 2ঘণ্টা 30 মিনিট আগেই এঁরা ঈগল থেকে বেরিয়ে চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। ঈগল থেকে নয় ধাপের সিঁড়ি বেয়ে আর্মস্ট্রং সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে নামেন। 10 : 56 : 20 P.M. (EDT) সময়ে আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখেন। আগেই বলেছি, দিনটি ছিল 1969 সালের 20 জুলাই।

চাঁদে নেমে আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটির বর্ণনা দিতে দিতে পদচারণা করতে থাকেন। সারা পৃথিবীর দূরদর্শনে দেখা গেল নীল আর্মস্ট্রংয়ের চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা, শোনা গেল তাঁর চন্দ্র বর্ণনা—"The surface appears to be very very fine grain, like a powder..........I can kick it loosely with my toes. Like powdered charcoal, I can see foot prints of my boots in the small, fine particles...... No trouble to walk around." এর কিছুক্ষণ পরে আর্মস্ট্রং বলার পর অলড্রিনও চাঁদের মাটিতে নেমে আসেন।

এঁরা এরপর চাঁদের অজস্র ছবি তোলেন। এঁরা চাঁদের মাটিতে স্থাপন করেন ফলক, যাতে লেখা ছিল ঃ

"Here Men from the Planet Earth
First Set Foot Upon the Moon
July 1969, A.D.
We came in Peace for All Mankind."

চাঁদে নেমে তাঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। হাউস্টোন থেকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ দুই-ই চলতে থাকে। প্রথমে ওঁরা দেখেন ঈগলের পায়াগুলি কতটা চাঁদের মাটিতে প্রোথিত হয়েছে। দেখলেন, মাত্র এক থেকে দু'ইঞ্চি মাটিতে বসেছে ঈগলের পায়াগুলি। তারপর চলল চাঁদের মাটিতে চলাফেরা ও

দৌড়। পোষাকগুলির কোনও খামতি আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হল। আর্মস্ট্রং সংগ্রহ করলেন প্রায় 20 কিলোগ্রাম চাঁদের ধূলি ও পাথর এবং শিলা। এগুলিকে ব্যগে ভরে সিল করে অ্যালুমিনিয়াম বাক্সে ভরা হল। ওঁরা চাঁদে তিনটি যন্ত্র বসালেন। একটিতে মাপা হবে চন্দ্রপৃষ্ঠে সৌর ঝটিকার মাত্রা। অন্যটি মাপবে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভূমিকম্পের মাত্রা। তৃতীয়টি লেসার রশ্মির সাহায্য চন্দ্রপৃষ্ঠের সে সব জায়গার ছবি পাঠাবে যেগুলির থেকে আরও ভালো অবতরণ স্থল সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। জানা যাবে সেগুলি পৃথিবীর থেকে কতটা দূরে। এই তিনটি যন্ত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে দেয়। প্রথম দিকে এই দুই চন্দ্রচারীর কাছে চাঁদের মাটি একটু পিচ্ছল মনে হলেও পরের দিকে ওঁরা ওর উপর চলতে অভ্যস্ত হয়ে যান।

প্রায় 2 ঘণ্টা 30 মিনিট ধরে চাঁদের মাটিতে নানা কাজ করার পর এঁরা দু'জনে ফিরে আসেন তাঁদের চান্দ্রযান ঈগলে। চাঁদে তাঁরা জঞ্জাল হিসাবে ফেলে আসেন ক্যামেরা, দূরদর্শন ইউনিট, কিছু ছোটখাট যন্ত্রপাতি, পরিবেশ নিয়ন্ত্রক কেনেস্তারা, ব্যবহৃত প্রস্রাব-ব্যাগ, দুটি সুবহ জীবনদায়ী ব্যবস্থা। 20শে জুলাইয়ের বাকী সময়টা বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ঈগল চালিয়ে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন ফিরে আসেন কলম্বিয়ায়। 1969 সালের 21শে জুলাই 1:55 PM [EDT]-তে তাঁরা ঈগলকে চন্দ্রপৃষ্ঠের সংস্পর্শ মুক্ত করে কলম্বিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেন। উড্ডীন যন্ত্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঈগল চাঁদের আকাশে উঠতে থাকে। পিছনে ফেলে আসে কিছু যন্ত্রপাতি, কিছু জঞ্জাল এবং ঈগলের অবতরণ সম্পর্কিত কিছু যন্ত্রাংশ, যা তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

ঈগলের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 6,646 কিলোমিটার করা হয় উড্ডীন যন্ত্রে সাত মিনিটের মত আগুন জ্বালিয়ে। প্রথমে ঈগল সোজা উপরের দিকে উঠে। তারপর এটিকে 52^0 কোণে ঘুরিয়ে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। পরে এটিকে জুড়ে দেওয়া হয় কলম্বিয়ার সঙ্গে। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন হামাগুড়ি দিয়ে চলে যান মূল মহাকাশ যানে। এইভাবে অ্যাপোলো-11 আবার কলম্বিয়া ও ঈগলের সমন্বয়ে আগের অ্যাপোলো-11 মহাকাশযানই হয়ে উঠে।

এরপর অ্যাপোলো-11 ফিরে আসে পৃথিবীতে 24 শে জুলাই, 1969 খ্রিস্টাব্দে। প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাপোলো-11 প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ করে। সময়টা ছিল 12:40 P.M.[EDT], 1969 খ্রিস্টাব্দের 24শে জুলাই। শেষ হয় মানুষের প্রথম চন্দ্রাবতরণের সাফল্যমণ্ডিত চন্দ্রাভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। প্রথম চন্দ্রাভিযানের কয়েকটি ছবি দেখুন, চিত্র ঃ 105 থেকে চিত্র ঃ 110 অবধি।

মহাকাশ অভিযানে সর্ব প্রথম মহাকাশচারী হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন [Yuri A. Gagarin]। 1961সালে 12 ই এপ্রিল তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার ভস্তক-1[Vostok - 1] কৃত্রিম উপগ্রহ চড়ে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমা করেন মহাকাশ। তাঁর কক্ষপথের উচ্চতা ছিল 112 থেকে 203 মাইল। তাঁর উপগ্রহটি একঘণ্টা 48 মিনিটে একবার পৃথিবী পরিক্রমা সারে। গ্যাগারিনই প্রথম মানুষ যিনি মহাকাশে প্রথম পাড়ি জমান। প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী সোভিয়েত রাশিয়ারই ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা [Valentina V. Tereshkova]। তিনি মহাকাশে পাড়ি দেন 1963সালের 16 ই জুন। তিনি মোট 70 ঘণ্টা 50 মিনিট মহাকাশে কাটান। পৃথিবীকে 48বার পাক খান। তারপর সাফল্যের সঙ্গে ফিরে আসেন পৃথিবীতে। তেরেশকোভাই প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী। আর গ্যাগারিন হলেন প্রথম মহাকাশচারী।

পৌরণিককাল থেকেই মানুষ মহাকাশ অভিযানের স্বপ্ন দেখেছে। কে জানে হয়ত কোনও অজানা

অতীতে মানুষ মহাভারতের অর্জুনের মত মহাকাশে অভিযান করেছিল কি না। চার-পাঁচ হাজার বছর আগের মহাভারতের কথা ছেড়ে, জুল ভের্নের কাল থেকে মহাকাশ অভিযানের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আসা যাক। জুল ভের্ন [Jules Verne] ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অতি বিখ্যাত কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী রচয়িতা। ইদানীং কালে তাঁর লেখাতেই প্রথম চন্দ্রাভিযানের কল্পনা অভিযানের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। খুব সংক্ষেপে কালানুক্রমে জুল ভের্ন থেকেই এখন অবধি, পরিক্রমা করা যাক মহাকাশ অভিযানের ঘটনাসমূহের।

সময়	ঘটনা
উনবিংশ শতাব্দী ঃ	জুল ভের্ণ লিখলেন তাঁর কল্প কাহিনী 'From the Earth to the Moon'। এই শতাব্দীতে K.E.Tsiolkovski মহাকাশ উড্ডয়নের মৌলিক নীতি প্রণয়ন করলেন। এডওয়ার্ড ইভারেট হেল [Edward Everett Hale] লিখলেন 'The Brick Moon'.
1901 খ্রিস্টাব্দ ঃ	আরেক কল্পকাহিনী লেখক এইচ. জি. ওয়েলস্ [H.G. Wells] প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 'The First Men in the Moon'.
1903 খ্রিস্টাব্দ ঃ	রাইট ভ্রাতৃদ্বয় [Wright Brothers] প্রথম ওড়ালেন তাঁদের বিমান।
1919 খ্রিস্টাব্দ ঃ	রবার্ট এইচ গডার্ড [Robert H. Godderd] বের করলেন তাঁর বই 'A Method of Reaching Extreme Altitudes'.
1923 খ্রিস্টাব্দ ঃ	হেরমান ওবার্থ [Hermann Oberth] লিখলেন 'The Rocket into Planetary Space'.
1926 খ্রিস্টাব্দ ঃ	রবার্ট এইচ গডার্ড প্রথম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করলেন তরল জ্বালানীর রকেট।
1927 খ্রিস্টাব্দ ঃ	জার্মানীতে মহাকাশ অভিযান সোসাইটি 'Verein für Raumschiffahrt' প্রতিষ্ঠিত হয়।
1929 খ্রিস্টাব্দ ঃ	হেরমান ওবার্থ আবারও প্রকাশ করলেন একটি বই 'Roads to Space Travel' নাম দিয়ে।
1930 খ্রিস্টাব্দ ঃ	'আমেরিকান ইন্টার প্ল্যানেটরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির নাম পরে 'American Rocket Society' রাখা হয়। এর নাম আবারও বদল করে রাখা হয়, 'American Institute of Aeronautics and Astronautics', 'ইনস্টিটিউট অফ অ্যারোস্পেস সায়েন্সেস'-এর সঙ্গে আমেরিকান রকেট সোসাইটির সংযুক্তিকরণের পর।
1931খ্রিস্টাব্দ ঃ	জার্মান রকেট সোসাইটি 100 পাউন্ড ঘাতসম্পন্ন তরল জ্বালানীর রকেট তৈরি করে।
1932 খ্রিস্টাব্দ ঃ	সোভিয়েত রাশিয়ার ৎসান্ডাব এবং তাঁর দল বানান 110 পাউন্ড ঘাতের রকেট।
1934 খ্রিস্টাব্দ ঃ	জার্মানীতে ওয়ের্নার ভন ব্রাউন [Wernher von Braun] 660 পাউন্ড ঘাতের A-3 রকেট পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণ করেন।

1935 খ্রিস্টাব্দ ঃ রবার্ট. এইচ. গডার্ড [Robert H. Goddardl] বানালেন আবর্তন স্থিতিশীল রকেট, যা 7500 ফুট উচ্চতায় পৌঁছে গেল।

1942 খ্রিস্টাব্দ ঃ জার্মানী থেকে প্রথম A-4[V-2] রকেট সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করা হল। এটি 53 মাইল উচ্চতায় উঠল।

1945 খ্রিস্টাব্দ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র WAC কর্পোরেল রকেট উৎক্ষেপণ করল 43.5 মাইল উচ্চতায়।

1946 খ্রিস্টাব্দ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর বায়ুসেনা পৃথিবী পরিক্রমণরত মহাকাশযান নিয়ে গবেষণা শুরু করে।

1947 খ্রিস্টাব্দ ঃ আমেরিকার বায়ুসেনা জার্মানী থেকে দখল করা V-2 রকেটের উৎক্ষেপণ ঘটায় নিউমেক্সিকো শহরের কাছে।

1949 খ্রিস্টাব্দ ঃ আমেরিকার নৌবাহিনীর ছোঁড়া রকেটটি দুইটি স্তরে 244 মাইল উপরে উঠে।

1950 খ্রিস্টাব্দ ঃ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ফেডারেশন [International Astronautical Federation]-এর প্রথম সম্মেলন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়।

1954 খ্রিস্টাব্দ ঃ 'Project Orbiter' সংগঠিত হয়।

1955 খ্রিস্টাব্দ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বর্ষের [International Geo-physical Year] জন্য 'ভ্যানগার্ড স্যাটেলাইট কর্মসূচী' [Vanguard Satellite Progamme] ঘোষণা করে।

মহাকাশ যুগ [Space Age]

1957 খ্রিস্টাব্দ ঃ

অক্টোবর 4 ঃ সোভিয়েত রাশিয়া 'স্পুটনিক -1[Sputnik -1] নামের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে, বাতাসের ঘনত্ব, উষ্ণতা, মহাজাগতিক বিকিরণ, উল্কাপাতের তথ্য জানার জন্য। এর ওজন ছিল 184 পাউন্ড।

নভেম্বর 3 ঃ স্পুটনিক -2 উৎক্ষেপণ করল সোভিয়েত রাশিয়া। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে ছিল কুকুর 'লাইকা' [Laika]। এটি মেপেছিল জৈব - চিকিৎসা, মহাজাগতিক বিকিরণ, সৌর রঞ্জন-রশ্মি, অতিবেগুনি-রশ্মি সংক্রান্ত নানা তথ্য। এর ওজন ছিল 1,121পাউন্ড বা 508 কিলোগ্রাম।

1958 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জানুয়ারী 31ঃ 18 পাউন্ড ওজনের 'এক্সপ্লোরার -1' নামের মার্কিন উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এটি আবিষ্কার করে 'ভ্যান অ্যালেন বলয়' [Van Allen Belt]। পরিমাপ করে মহাজাগতিক বিকিরণ, গ্রহাণুপুঞ্জ সংক্রান্ত তথ্য। এটি পৃথিবীর কক্ষপথে 1970 সাল অবধি থাকে। 1970 সালের 31শে মার্চ এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

মার্চ 17 ঃ মাত্র 8 (আট) পাউন্ড ওজনের একটি মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ 'ভ্যানগার্ড-1' [Vanguard-1] পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এতে ট্রান্সমিটারে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। এর কক্ষপথ ছিল অত্যন্ত উপবৃত্তাকার।

মে 15 : সোভিয়েত রাশিয়ার 2926 পাউন্ড বা 1327 কিলোগ্রাম ওজনের স্পুটনিক-3 উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এটি ছিল একটি ভূ-প্রাকৃতিক গবেষণাগার।

ডিসেম্বর 6 : মার্কিন উপগ্রহ পাইওনীয়ার-3 এর অসফল উৎক্ষেপণ। এটি ভ্যান অ্যালেন বলয়ের বাইরের দিকটা আবিষ্কার করে। এর ওজন ছিল 13 পাউন্ড।

ডিসেম্বর 18 : 'স্কোর' [Score] নামক 8,750 পাউন্ড ওজনের মার্কিন উপগ্রহের সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ। 3969 কিলোগ্রাম বা প্রায় 4(চার) টন ওজনের এই উপগ্রহে বার্তা-সংযোগ তথা কথোপকথনের ব্যবস্থা প্রথম চালু করা সম্ভব হয়।

1959 খ্রিস্টাব্দ :

আগস্ট 7 : মার্কিন উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-6-এর সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ। ওজন 143 পাউন্ড। এটি প্রথম পৃথিবীর মেঘাবরণের দূরদর্শন ছবি পাঠায়। বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্র, গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে নানা তথ্য পাঠায়।

সেপ্টেম্বর 12 : চন্দ্রাভিযানের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার 'লুনা-2' উপগ্রহ উৎক্ষেপণ। এর ওজন 860 পাউন্ড। এটি চান্দ্রপ্রভাব, চৌম্বক ক্ষেত্র, মহাজাগতিক এবং সৌর বিকিরণ, গ্রহাণুপুঞ্জ, গ্যাসীয় উপাদান সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করে।

অক্টোবর 4 : রাশিয়ার 'লুনা-3' চাঁদের উল্টোদিকের পৃষ্ঠদেশের ছবি তুলে পাঠায়। এর ওজন ছিল 960 পাউন্ড।

1960 খ্রিস্টাব্দ :

মার্চ 11 : 95 পাউন্ড ওজনের মার্কিন উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয় সৌরতথ্য সংগ্রহের জন্য। এটি 2 কোটি 25 লক্ষ মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে আন্তর্গ্রহ চৌম্বকক্ষেত্রের নকশা পাঠায়। সৌর ঝটিকা ও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার তথ্য জানান দেয়।

এপ্রিল 1 : 263 পাউন্ড ওজনের মার্কিন উপগ্রহ 'টিরস-1' [TIROS-1] পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এটি 22,952টি ছবি পাঠায় পৃথিবীর মেঘাবরণের। প্রায় 2 মাস 15 দিন ধরে চলে এইসব ছবি পাঠানোর কাজ।

আগস্ট 10 : 1700 পাউন্ডের মার্কিন উপগ্রহ 'ডিসকভারার-13 পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এর সঙ্গে থাকা 300 পাউন্ড ওজনের একটা 'ক্যাপসুল'-কে কক্ষপথ থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়। এটি প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে।

আগস্ট 12 : 166 পাউন্ড ওজনের মার্কিন স্যাটেলাইট 100 ফুট ব্যাসের বেলুনসহ কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এটি যোগাযোগ উপগ্রহের কাজ করে। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত হয় এই উপগ্রহটি।

1961 খ্রিস্টাব্দ :

এপ্রিল 12 : সোভিয়েত রাশিয়ার ভোস্তক-1 উপগ্রহটি প্রথম মহাকাশচারী ইউরি. এ.

গ্যাগারিনকে নিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। 1 ঘন্টা 48 মিনিটে 10,417 পাউন্ড বা 4725 কিলোগ্রাম ওজনের এই উপগ্রহটি একবার পৃথিবী পরিক্রমা করে। এর কক্ষপথ ছিল 112 মাইল থেকে 203 মাইল। এই ইউরি গ্যাগারিনই পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী।

মে 5 ঃ 4040 পাউন্ডের মার্কিন উপগ্রহ 'মার্কারি ফ্রীডম-7', অ্যালান. বি. শোপার্ডকে নিয়ে 15 মিনিটের জন্য মহাকাশে যায়।

জুন 29 ঃ তিনটি মার্কিন উপগ্রহ একসঙ্গে উৎক্ষেপণ করা হয়। এগুলি হল ঃ ট্রানজিট-4A, ইনজুন-1, এবং সোলর্যাড-3। এগুলি পারমাণবিক শক্তি সরবরাহের সাহায্যে চলত।

জুলাই 21 ঃ ভার্জিল গ্রিসোম [Virgil Grissom] 16 মিনিটের জন্য মহাকাশে থাকেন 'মার্কারি লিবার্টি বেল-7' মহাকাশযানে [Mercury Liberty Bell-7 Spaceraft]।

আগস্ট 6 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার ভস্তক-2 উপগ্রহে 'ঘেরম্যান টিটভ' [Gherman Titov] 17 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মোট উড়ান সময় ছিল 25 ঘন্টা 11 মিনিট।

1962 খ্রিস্টাব্দ ঃ

ফেব্রুয়ারী 20 ঃ মার্কিন উপগ্রহ মার্কারি ফ্রেন্ডশিপ-7-এ চড়ে জন. এইচ. গ্লেন [John H. Glenn] তিনবার পৃথিবীকে পাক খায়। মোট উড্ডীন সময় 4 ঘন্টা 56 মিনিট।

মার্চ 7 ঃ 458 পাউন্ডের OSO-1 সৌর উপগ্রহ 13টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় সৌর-শিখার উপর।

মে 24 ঃ মার্কারি অরোরা-7 [Merury Aurora-7] মার্কিন উপগ্রহে চড়ে মাইকেল স্কট কারপেন্টার [Michael Scott Carpenter] তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মোট উড়ান সময় 4 ঘন্টা 56 মিনিট।

জুলাই 10 ঃ মার্কিন উপগ্রহ টেলস্টার-1 [Telstar-1] উৎক্ষেপিত হয়। ওজন 170 পাউন্ড। এটি আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যোগাযোগ উপগ্রহ হিসাবে কাজ শুরু করে।

আগস্ট 11 ঃ সোভিয়েত উপগ্রহ ভস্তক-3-এ আদ্রিয়াঁ নিকোলায়েভ[Andrion Nikolayev] 64 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন 94 ঘন্টা 22 মিনিটে।

আগস্ট 12 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার ভস্তক-4 উপগ্রহে চড়ে পাভেল পোপোভিচ [Pavel Popovich] 48 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন 70 ঘন্টা 57 মিনিট ধরে।

আগস্ট 26 ঃ মার্কিন উপগ্রহ মেরিনার-2 উৎক্ষেপণ করা হয় শুক্রগ্রহ অভিযানে।

সেপ্টেম্বর 28 ঃ 320 পাউন্ড ওজনের কানাডার কৃত্রিম উপগ্রহ 'অ্যালোউট-1' [Alouette-1] মার্কিন রকেটের সাহায্যে কক্ষপথে স্থাপন করা হয় আয়নমণ্ডলীয় পরিমাপ ইত্যাদির জন্য।

অক্টোবর 3 ঃ ওয়াল্টার স্কিরা [Walter Schirra] মার্কিন মার্কারি সিগমা-7 [Mercury Sigma-7] উপগ্রহে চড়ে 6 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন মোট 9 ঘন্টা 13 মিনিট সময়ে।

ডিসেম্বর 14 ঃ মার্কিন উপগ্রহ মেরিনার-2, যেটি 26শে আগস্ট শুক্রগ্রহ অভিযানে পাঠানো হয়েছিল, সেটি শুক্রগ্রহের 22,000 মাইল দূর দিয়ে চলে যায়। 5.4 কোটি মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে পাঠায় শুক্রগ্রহের উপরিতলের উষ্ণতা ইত্যাদির নানা পরিমাপের তথ্য।

1963 খ্রিস্টাব্দ ঃ

মে 15 ঃ মার্কারি ফেইথ-7 [Mercury Faith-7] উপগ্রহটি চড়ে এল. গর্ডন. কুপার [L. Gordon Cooper] 22 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মার্কিন এই উপগ্রহটি এই প্রদক্ষিণে মোট সময়ে নেয় 34 ঘন্টা 20 মিনিট।

জুন 14 ঃ সোভিয়েত উপগ্রহ 'ভস্তক-5' চড়ে ভ্যালেরি বাইকোভস্কি [Valeri Bykovosky] 81 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন মোট 119 ঘন্টা 6 মিনিট সময় ধরে।

জুন 16 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার উপগ্রহ ভস্তক-6-এ চড়ে প্রথম মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা 48 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মোট উড়ান সময় 70 ঘন্টা 50 মিনিট।

জুলাই 26 ঃ 86 পাউন্ড ওজনের মার্কিন যোগাযোগ উপগ্রহ 'সিনকম-2' [Syncom-2] 22,600 মাইল উচ্চতায় স্থাপিত হয়।

অক্টোবর 16 ঃ 297 পাউন্ড ওজনের দুটি মার্কিন উপগ্রহ 'ভেলা-1' ও 'ভেলা-2' [Vela-1, Vela-2] কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, পারমাণবিক বিস্ফোরণ চিহ্নিতকরণের জন্য।

1964 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জানুয়ারী 30 ঃ পৃথিবীর বিকিরণ বলয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া 'ইলেকট্রন-1' এবং 'ইলেকট্রন-2' নামের দুটি উপগ্রহ একসঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে।

জুলাই 28 ঃ 806 পাউন্ড ওজনের 'রেঞ্জার-7' [Ranger-7] চাঁদে পাঠায় আমেরিকা। এটি চাঁদে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ার আগে অবধি চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রচুর ছবি পাঠায়।

সেপ্টেম্বর 4 ঃ 1073 পাউন্ডের মার্কিন উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয় ভূ-প্রাকৃতিক গবেষণার জন্য। এর নাম ছিল OGO-1।

অক্টোবর 12 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার 'ভস্খোদ-1' [Voskhod-1] তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে 16 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এই মহাকাশচারীরা হলেন কনস্ট্যানটিন ফেওকটিস্টভ [Konstantin Feoktistov], ভ্লাদিমির কোমারোভ [Vladimir Komarov] এবং বোরিস ইয়েগোরোভ [Boris Yegorov]। 16 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণে এদের মোট সময় লাগে 24 ঘন্টা 17 মিনিট। উপগ্রহটির ওজন ছিল 11,731 পাউন্ড বা 5,321 কিলোগ্রাম।

1965 খ্রিস্টাব্দ :

ফেব্রুয়ারী 16 : মার্কিন উপগ্রহ 'পেগাসাস-1' [Pegasus-1] উৎক্ষেপিত হয়। এর দুটি প্যানেলের প্রত্যেকটি ছিল 14×48 বর্গফুট। গ্রহাণুপুঞ্জ খোঁজার জন্য এই প্যানেল। এর ওজন ছিল 23,000 পাউন্ড, বা 10,433 কিলোগ্রাম অর্থাৎ 10 টনেরও বেশি।

মার্চ 23 : মার্কিন উপগ্রহে ভার্জিল গ্রিসম [Virgil Grissom] তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই উপগ্রহের নাম জেমিনি-3। এর ওজন ছিল 7,100 পাউন্ড। মোট উড্ডীন সময় 4 ঘন্টা 53 মিনিট।

এপ্রিল 6 : মার্কিন উপগ্রহ 'আর্লি বার্ড' [Early Bird] কক্ষপথে স্থাপিত হয় যোগাযোগের জন্য। ওজন ছিল 85 পাউন্ড।

এপ্রিল 23 : সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ 'মোলনিয়া-1A' [Molniya-1A], কক্ষপথে স্থাপিত হয়।

জুন 3 : মার্কিন উপগ্রহ জেমিনি-4-এ দুই মহাকাশচারীর পৃথিবী পরিক্রমা। এঁরা হলেন ম্যাকডিভিট [James Mcdivitt] এবং এডওয়ার্ড হোয়াইট [Edward White]। হোয়াইট অন্তরীক্ষে প্রথম পদচারণা করেন উপগ্রহ থেকে বেরিয়ে এসে।এই উপগ্রহটি 66 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মোট উড়ান সময় 107 ঘন্টা 59 মিনিট।

জুলাই 14 : মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-4, যাকে 1964সালের 24শে নভেম্বর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, তা এদিন মঙ্গলগ্রহের 6,200 মাইল দূর দিয়ে চলে যেতে থাকে। মঙ্গলের 20টি ছবি এটি পৃথিবীতে পাঠায়। এটির ওজন ছিল 575 পাউন্ড।

আগস্ট 21 : মার্কিন মহাকাশযান জেমিনি-5 চড়ে এল. গর্ডন কুপার [L. Gordon Cooper] এবং চার্লস কনরাড [Charles Conrad] [জুনিয়ার] 128 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন 190 ঘন্টা 56 মিনিট সময়ে।

ডিসেম্বর 4 : আবার মানুষ যায় পৃথিবীর কক্ষপথে মার্কিন উপগ্রহ জেমিনি-7 চড়ে। এবারের যাত্রীরা ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান [Frank Borman] এবং জেমস লোভেল [James Lovell]। এঁরা 220 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। সময় নেন 330 ঘন্টা 35 মিনিট। এটির ওজন ছিল 8,069 পাউন্ড।

ডিসেম্বর 15 : মার্কিন উপগ্রহ জেমিনি-6-এ চড়ে আবারো দু'জন মহাকাশচারী মহাকাশে পাড়ি জমান। এঁরা হলেন ওয়াল্টার স্কিরা [Walter Schirra] এবং টমাস স্ট্যাফোর্ড [Thomas Stafford]। এটিকে জেমিনি-7-এর কক্ষপথেই স্থাপন করা হয়। জেমিনি-7-এর সংগে মাত্র একফুট দূরত্ব বজায় রেখে এটি পৃথিবী পরিক্রমা করতে থাকে। জেমিনি-6 মোট 17 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সময় নেয় মোট 25 ঘন্টা 51 মিনিট।

1966 খ্রিস্টাব্দ :

জানুয়ারী 31 : 220 পাউন্ড ওজনের সোভিয়েত উপগ্রহ লুনা-9 সর্বপ্রথম স্বাভাবিকভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে এবং চাঁদের পৃষ্ঠদেশের ছবি পাঠাতে থাকে।

মার্চ 16 ঃ মার্কিন উপগ্রহ জেমিনি-8-এ চড়ে নীল আর্মস্ট্রং [Neil Armstrong] এবং ডেভিড স্কট [David Scott] মহাকাশে যান। আগে থেকে কক্ষপথে স্থাপন করা একটি উপগ্রহের সঙ্গে জেমিনি-8-কে যুক্ত করেন। 6.5 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণে মোট সময় নেন 10 ঘন্টা 18 মিনিট।

মার্চ 31 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার লুনা-10 সাফল্যের সঙ্গে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এর ওজন ছিল 540 পাউন্ড।

মে 30 ঃ মার্কিন উপগ্রহ সার্ভেয়ার-1 চাঁদে অবতরণ করে। 11,150টি আলোকচিত্র পাঠায় পৃথিবীতে। এর ওজন ছিল 596 পাউন্ড।

জুন 3 ঃ মার্কিন মহাকাশযান জেমিনি-9. অন্তরীক্ষে দু'জন মহাকাশচারীকে বয়ে নিয়ে যায়। এঁরা হলেন টমাস স্ট্যাফোর্ড [Thomas Stafford] এবং ইউজিন কারনান [Eugene Cernan]। এঁরা 47 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। সময় নেন 72 ঘন্টা 21 মিনিট।

জুলাই 18 ঃ মার্কিন উপগ্রহ জেমিনি-10-এর উৎক্ষেপণ। এর দুই মহাকাশচারী হলেন জন ইয়ং [John Young] এবং মাইকেল কলিন্স [Michael Collins]। এঁরা পূর্বে কক্ষপথে স্থাপিত এক উপগ্রহের সঙ্গে জেমিনি-10-কে সংযুক্ত করেন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে। এঁরা 46 বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন পৃথিবী থেকে 100 মাইল থেকে 475 মাইল উচ্চতায়। মোট উড্ডীন সময় হয় 70 ঘন্টা 47 মিনিট।

আগস্ট 10 ঃ 853 পাউন্ড ওজনের মার্কিন উপগ্রহ, যেটি চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এটি চাঁদের সেই সব অঞ্চলের ছবি পাঠায়, যেখানে অ্যাপোলো অভিযানে চন্দ্রযান অবতরণ করানো হয় সামান্য পরবর্তীকালে।

সেপ্টেম্বর 12 ঃ মার্কিন উপগ্রহ জেমিনি-11-এ মহাকাশে গেলেন দু'জন মহাকাশচারী চার্লস কানরাড [Charles Conrad] এবং রিচার্ড গর্ডন [Richard Gordon]। পৃথিবী থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় [100 মাইল থেকে 850 মাইল অবধি] এটি 47 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সময় নেয় 71 ঘন্টা 17 মিনিট। এটির ওজন ছিল 8,374 পাউন্ড।

নভেম্বর 11 ঃ জেমিনি-12 উপগ্রহ নিয়ে যায় দুই মহাকাশচারীকে—জেমস লোভেল [James Lovell] এবং এডুইন অলড্রিন [Edwin Aldrin]-কে। এঁরা 63 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মোট উড্ডীন সময় 94 ঘন্টা 33 মিনিট।

1967 খ্রিস্টাব্দ ঃ

এপ্রিল 23 ঃ রাশিয়ার সয়ুজ-1 [Soyuz-1] উপগ্রহে মহাকাশে যান ভ্লাদিমির কোমারোভ [Vladimir Komarov]। 18 বার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ শেষে এটি পৃথিবীতে ফিরে আসে। মোট উড়ান সময় 26 ঘন্টা 35 মিনিট। এর ওজন ছিল 15,000 পাউন্ড বা 6804 কিলোগ্রাম বা 6.8 টন।

সেপ্টেম্বর 7 ঃ 1120 পাউন্ড ওজনের 'জৈব উপগ্রহ' [Bio-Satellite] উৎক্ষেপণ করে আমেরিকা। এর নাম হয় 'Biosatellite-2'। 30 বার ভূ-প্রদক্ষিণের পর এটিকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়।

অক্টোবর 18 ঃ রাশিয়ার 'ভেনেরা-4' [Venera-4] উপগ্রহটি শুক্রের অভিমুখে পাঠানো হয়েছিল 12 জুন। এটি এই দিন শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে থাকে। এর ওজন ছিল 884 পাউন্ড।

অক্টোবর 19 ঃ শুক্রগ্রহের অভিমুখে পাঠানো মেরিনার-5 এদিন শুক্রের 25000 মাইল দূর দিয়ে অতিক্রম করে। এর ওজন ছিল 540 পাউন্ড।

অক্টোবর 30 ঃ কসমস-186 ও কসমস-188 নামের দুটি রুশীয় উপগ্রহকে একই কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয়। এরা নিজের থেকে সংযুক্ত হয় পূর্ব নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে।

নভেম্বর 7 ঃ সার্ভেয়ার-6 নামক মার্কিন উপগ্রহ চাঁদের পৃষ্ঠদেশে পার্শ্ব-সরণ প্রদর্শন করে। এর ওজন ছিল 617 পাউন্ড।

1968 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জানুয়ারী 7 ঃ 2293 পাউন্ডের মার্কিন উপগ্রহ 'সার্ভেয়ার-7' চাঁদের মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করে, 21000 ছবি পাঠায় পৃথিবীতে।

এপ্রিল 22 ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেনসহ 43টি দেশ 'Space Rescue Treaty' সই করে।

মে 17 ঃ 164 পাউন্ড ওজনের ESRO-28 আন্তর্জাতিক উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এটির জন্য 11টি দেশ ব্যায়ভার বহন করে।

জুলাই 4 ঃ মার্কিন উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার-38' কক্ষপথে পাঠানো হয়। এটি একটি বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত উপগ্রহ। এর ওজন ছিল 610 পাউন্ড।

সেপ্টেম্বর 15 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার 'জোন্দ-5' [Zond-5] উপগ্রহ সরাসরি চাঁদে পাঠানো হয়। মনুষ্যবিহীন এই মহাকাশ যানটিকে উদ্ধার করা হয় 22শে সেপ্টেম্বর।

অক্টোবর 11 ঃ মার্কিন উপগ্রহ অ্যাপোলো-7-এ তিনজন মহাকাশচারী পাঠানো হয় পৃথিবীর কক্ষপথে। এঁরা হলেন ওয়াল্টার স্কিরা, ডন ইজেল [Donn Eisele] এবং ওয়াল্টার কানিংহোম [Walter Cunningham]। এঁরা 141 থেকে 176 মাইল উচ্চতার কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন 163 বার। মোট সময় লাগে 260 ঘন্টা 8 মিনিট। এই উপগ্রহটির ওজন ছিল 45,989 পাউন্ড বা 20.86 মেট্রিক টন। এটি ছিল চাঁদের মানুষ পাঠাবার প্রস্তুতির একটা ধাপ।

অক্টোবর 26 ঃ সোভিয়েত উপগ্রহ 'সয়ুজ-3' পাঠানো হল মহাকাশে। এবারের মহাকাশযাত্রী জার্জ বেরেগোভয় [George Beregovoy]। 64 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণে সময় লাগে 94 ঘন্টা 31 মিনিট।

ডিসেম্বর 21 ঃ তিনজন মহকাশচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো-8-এর চন্দ্রাভিযান। চন্দ্রের কক্ষপথে 10 বার চন্দ্র প্রদক্ষিণ। এই তিন মহাকাশচারী হলেন ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান [Frank Borman], জেমস. এ. লোভেল [James A. Lovell Jr.] এবং উইলিয়াম. এ. অ্যান্ডার্স [William A. Anders]। মোট উড়ান সময় ছিল 147 ঘন্টা।

1969 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জানুয়ারী 14 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার উপগ্রহ 'সয়ুজ-4' উৎক্ষেপিত হয়। ভ্লাদিমির শাতালভ [Vladimir Shatalov] ছিলেন মহাকাশযানে। এটিকে সয়ুজ-5-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় মহাকাশে। 48 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সময় নেয় 71 ঘন্টা 14 মিনিট।

জানুয়ারী 15 ঃ তিন জন মহাকাশচারীকে নিয়ে সোভিয়েত উপগ্রহ সয়ুজ-5 আগে পাঠানো সয়ুজ-4-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এর থেকে দু'জন মহাকাশচারী সয়ুজ-4-এ চলে যায। সয়ুজ-5-এর তিন মহাকাশচারী হলেন—বোরিস ভোলিনোভ [Boris Volynov], অ্যালেকসেই ইয়েলিসেয়েভ [Aleksei Yeliseyev] এবং ইয়েভগেনি খ্রুনভ [Yevgeny Khrunov]। সয়ুজ-5 তার 49 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণে সময় নেয় 72 ঘন্টা 46 মিনিট।

মার্চ 3 ঃ তিনজন মহাকাশচারী নিয়ে মার্কিন উপগ্রহ অ্যাপোলো-9 পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে 151 বার। কক্ষপথের দূরত্ব ছিল 118 থেকে 327 মাইল। উড়ান সময় 241 ঘন্টা 1 মিনিট। এবারের তিন মহাকাশ চারী হলেন ঃ জেমস ম্যাকডিভিট [James Mcdivitt], ডেভিড স্কট [David Scott] এবং রাসেল স্কুইকার্ট [Russell Schweickart]।

মে 16 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার উপগ্রহ ভেনেরা-5, যেটি 5ই জানুয়ারী শুক্রের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, সেটি প্যারাসুটের সাহায্যে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর 53 মিনিট ধরে শুক্রের নানা তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়। এর ওজন ছিল 2,491 পাউন্ড।

মে 17 ঃ জানুয়ারী 10 তারিখে পাঠানো সোভিয়েত রাশিয়ার ভেনেরা-6 শুক্র গ্রহে পৌঁছালেও কোন তথ্য পাঠাতে পারে নি।

মে 18 ঃ অ্যাপোলো-10 কে মহাকাশে পাঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিনজন মহাযাত্রী এবারও পাঠানো হয়। চাঁদে যাওয়ার জন্য এটি আরেকটি মহড়া। মহাকাশচারীরা হলেন ঃ টমাস স্ট্যাফোর্ড [Thomas Stafford], ইউজিন কারনান [Eugene Cernan] এবং জন ইয়ং [John Young]। এটি 31 বার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মোট মহাকাশ উড়ান সময় 192 ঘন্টা 3 মিনিট।

জুলাই 16 ঃ মহাকাশ অভিযানের ঐতিহাসিক দিন। অ্যাপোলো- 11 এদিন উৎক্ষেপণ করা হয়। এটিতে তিন মহাকাশচারী পাড়ি দেন চাঁদের উদ্দেশে। অভিযাত্রীরা ছিলেন নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স। এঁরা চাঁদের কক্ষপথে চলে যান চন্দ্রযান সঙ্গে নিয়ে। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন 20শে জুলাই 'ঈগল'-কে নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামেন। কলিন্স থেকে যান মূলযানে, করতে থাকেন চন্দ্র পরিক্রমা। আর্মস্ট্রং ও এডুইন চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করেন। আর্মস্ট্রং হলেন 'First Man on the Moon'। 21 শে জুলাই চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করেন এঁদের দু'জন। ফিরে যান মূল মহাকাশযানে। তার আগে এঁরা 55 পাউন্ড চন্দ্রশিলা সংগ্রহ করে সঙ্গে নেন। মোট উড্ডীন সময় ছিল 195 ঘন্টা 18 মিনিট।

মহাকাশযানের মোট ওজন ছিল 95,000 পাউন্ড বা 43.1 টন রকেট বাদ দিয়ে।

জুলাই 31 ঃ মার্কিন উপগ্রহ মেরিনার-6, যেটি 24শে ফেব্রুয়ারী উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, মঙ্গলের 2,200 মাইল দূরে পৌছায়। মেরিনার-7 এর সঙ্গে এটি মঙ্গলের 200টি ছবি পাঠায়। এর ওজন ছিল 910 পাউন্ড।

আগস্ট 5 ঃ মেরিনার-7 উপগ্রহ, যেটি 27শে মার্চ উৎক্ষেপণ করা হয়, সেটি মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতে হাজির হয়। এটি মেরিনার-6 এর সঙ্গে প্রায় 200টি ছবি পাঠায় মঙ্গলের। এর ওজনও ছিল 910 পাউন্ড।

অক্টোবর 11 ঃ রাশিয়ার 'সয়ুজ-6' দু'জন মহাকাশচারী নিয়ে আকাশে উড়ে 79 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। 118 ঘন্টা 42 মিনিট মহাকাশে কাটায়। দুই মহাকাশচারী হলেন জর্জ শোনিন [George Shonin] এবং ভ্যালেরি কুবাসোভ [Valery Kubasov]।

অক্টোবর 12 ঃ পরের দিনই উৎক্ষেপিত হয় 'সয়ুজ-7'। রাশিয়ার এই উপগ্রহটিতেও ছিল তিন নভশ্চর আনাতোলি ফিলিপচেঙ্কো [Anatoly Filipchenko], ভ্লাদিস্লভ ভোলকোভ [Vladislov Volkov] এবং ভিক্টর গারবাৎকো [Victor Garbatko]। এটিও 79 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সময় নেয় 118 ঘন্টা 41 মিনিট।

অক্টোবর 13 ঃ পরের দিন 'সয়ুজ-8'-কে মহাকাশে পাঠায় রাশিয়া। এর দু'জন মহাকাশচারী হলেন ভ্লাদিমির শাটালভ [Vladimir Shatalov] এবং আলেক্সেই ইয়েলিসেয়েভ [Aleksei Yeliseyev]। এটিও 79 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সময় নেয় 118 ঘন্টা 41 মিনিট। সয়ুজ 6, 7 ও 8—এই তিনটি উপগ্রহকে সংযুক্ত করা হয় নি। কিন্তু এই তিন উপগ্রহ ঠিকঠাক পৃথিবীতে ফিরে আসে।

নভেম্বর 14 ঃ অ্যাপোলো-12 উপগ্রহ তিনজন নভশ্চর নিয়ে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি জমায়। 19শে নভেম্বর এঁদের দু'জন চাঁদের মাটিতে নামেন। মহাকাশচারীরা হলেন চার্লস কনরাড জুনিয়ার [Charles Conrad Jr.], অ্যালান এল বিন [Alan L. Bean] এবং রিচার্ড এফ. গর্ডন[Richard F. Gordon]। কনরাড ও বিন চাঁদের মাটিতে নামেন। অ্যাপোলো-11-এর মত এবারেও চাঁদের মাটিতে নানা কাজকর্ম করেন এঁরা। এঁরা হলেন চাঁদের মাটিতে পা-রাখা তৃতীয় এবং চতুর্থ মানুষ। এঁরা সার্ভেয়ার-3-এর কাজকর্ম পরীক্ষা করেন। এবারের মোট মহাকাশযাত্রার সময় ছিল 244 ঘন্টা 36 মিনিট। এটি ছিল চাঁদের মাটিতে মানুষের দ্বিতীয় পদচারণা।

1970 খ্রিস্টাব্দ ঃ

ফেব্রুয়ারী 11 ঃ 50 পাউন্ড ওজনের জাপানী উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর নাম ছিল 'Rising Sun-1'। জাপান তার নিজস্ব রকেটেই এটিকে উৎক্ষেপণ করে।

এপ্রিল 11 ঃ অ্যাপোলো-13 উৎক্ষেপণ। তিন মহাকাশচারী জেমস লোভেল [James

Lovell] [জুনিয়ার] ফ্রেড হাইসি [Fred Haise] [জুনিয়ার] এবং জন সুইগার্ট [John Swigert]-কে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় এই উপগ্রহটি। তবে মহাকাশে থাকাকালীন অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেটে বিপত্তি ঘটায় এটিকে ফিরিয়ে আনা হয় 17ই এপ্রিল। নিরাপদেই এটি প্রত্যাবর্তন করে। মোট উড়ান সময় ছিল 142 ঘন্টা 55 মিনিট।

এপ্রিল 24 ঃ চীন তাদের প্রথম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করে। এটি মূলতঃ যোগাযোগ উপগ্রহ। এর ওজন ছিল 381 পাউন্ড।

জুন 1 ঃ সোভিয়েত উপগ্রহ সয়ুজ-9 উৎক্ষেপণ। এবার মহাকাশচারী দু'জন—আঁদ্রিয়ান নিকোলায়েভ [Andrian Nikolayev] এবং ভিটালি সেবাস্তিয়ানভ [Vitali Sevastianov]। এটি 287 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মোট উড়ান সময় 424 ঘন্টা 59 মিনিট।

সেপ্টেম্বর 12 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার লুনা-16 উৎক্ষেপণ। এই উপগ্রহটি 20শে সেপ্টেম্বর চাঁদের 'Sea of Fertility' এলাকায় অবতরণ করে। চন্দ্রপৃষ্ঠের 14 ইঞ্চি গভীরতায় খনন করে এটি চন্দ্রশিলা সংগ্রহ করে ফিরে আসে পৃথিবীতে 24শে সেপ্টেম্বর।

নভেম্বর 10 ঃ রাশিয়ার উপগ্রহ লুনা-17-র যাত্রা শুরু। এটি চাঁদে পৌঁছায় 17ই নভেম্বর। নামে চাঁদের 'Sea of Rains' অঞ্চলে। ওর থেকে রোবট যান লুনোখোদ-1 [Lunokhod-1] বেরিয়ে আসে চন্দ্রপৃষ্ঠে। এটি সৌরশক্তি চালিত যান। চাঁদে চালানো প্রথম রোবটযান।

ডিসেম্বর 15 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার উপগ্রহ 'ভেনেরা-7' যেটিকে 17ই আগস্ট শুক্রগ্রহে পাঠানো হয়েছিল সেটির থেকে একটি নির্দিষ্ট 'ক্যাপসুল' শুক্রের পৃষ্ঠে অবতরণ করে এবং নানা তথ্য পাঠাতে থাকে। সেই প্রথম অন্য কোনও গ্রহ থেকে সিগন্যাল পৃথিবীতে আসতে থাকে। এর ওজন ছিল 2,570 পাউন্ড।

1971 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জানুয়ারী 31 ঃ মার্কিন উপগ্রহ অ্যাপোলো-14 তিনজন মহাকাশচারী নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মহাকাশচারীরা হলেন অ্যালান শেপার্ড [Alan Shepard], এডগার মিচেল [Edgar Mitchell] এবং স্টুয়ার্ট রুজা [Stuart Roosa] আগের মতই শেপার্ড ও মিচেল চাঁদের মাটিতে নামেন 5ই ফেব্রুয়ারী। আবার তাঁরা ফিরেও আসেন একই পদ্ধতিতে। মোট উড়ান সময় ছিল 216 ঘন্টা 2 মিনিট। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের তৃতীয় পদচারণা।

এপ্রিল 19 ঃ সোভিয়েত রাশিয়া 'স্যালিউট-1' [Salyut-1] নামের 36000 পাউন্ড ওজনের একটা পরীক্ষাগার পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে সয়ুজ শ্রেণীর উপগ্রহদের ব্যবহারের জন্য।

এপ্রিল 23 ঃ তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে 'সয়ুজ-10' মহাকাশযানটি উৎক্ষেপিত হয়। এটিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে জোড়া হয় স্যালিউট-1-এর সঙ্গে স্বল্প সময়ের

জন্য। মহাকাশ স্টেশন ব্যবহারের সেই শুরু। সয়ুজ-10 মোট 33 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। উড়ান সময় 47 ঘন্টা 46 মিনিট। তিন মহাকাশচারী যাঁরা এই মিশনে ছিলেন তাঁরা হলেন, ভ্লাদিমির শাটালভ, আলেক্‌সেই ইয়েলিসেয়েভ এবং নিকোলাই রুকাভিশ্‌নিকভ্ [Nokolai Rukavishnikov]।

জুন 4 ঃ সয়ুজ-11-এ তিনজন মহাকাশচারী মহাকাশে যান। এঁরা স্যালিউটে গিয়ে 23 দিন থাকেন। কিন্তু পৃথিবীতে ফেরার পথে এঁরা তিনজনই এঁদের কেবিনে 'Decompression'-জনিত কারণে মারা যান। এঁরা হলেন জর্জ ডোব্রোভোল্‌সকি [Georgi Dobrovolski], ভ্লাদিস্লাভ ভোলকোভ [Vladislav Volkov] এবং ভিক্টর প্যাৎসায়েভ [Victor Patsayev]। এঁরাই সবচেয়ে বেশিদিন মহাকাশে ছিলেন সে সময়। মহাকাশ স্টেশন গ'ড়ে তোলার সেই প্রস্তুতি পর্বে।

জুলাই 26 ঃ অ্যাপোলো-15 তিনজন মহাকাশচারী, ডেভিড স্কট, জেমস আরউইন এবং আলফ্রেড ওর্ডেন [Alfred Worden]-দের নিয়ে চাঁদে পাড়ি দেয়। স্কট ও আরউইন চাঁদে নামে 30শে জুলাই। তিনবার চাঁদে পদচারণা করেন এঁরা। ফিরে আসেন 7ই আগস্ট। যথারীতি এবারও ওর্ডেন থাকেন চন্দ্র পরিক্রমারত মূল মহাকাশযানে। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের চতুর্থ দফার পদচারণা।

নভেম্বর 13 ঃ 30শে মে পাঠানো মার্কিন উপগ্রহ মেরিনার-9 মঙ্গলের কক্ষপথে স্থাপিত হয় এবং এটি মঙ্গলের ছবি পাঠাতে থাকে।

নভেম্বর 27 ঃ রাশিয়ার 'মার্স-2' [Mars-2] উপগ্রহ, যেটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল 19শে মে সেটি মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে স্থাপিত হয় এবং তার থেকে একটি 'ক্যাপসুল' [Capsule] মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করে।

1972 খ্রিস্টাব্দ ঃ

ফেব্রুয়ারী 14 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার লুনা-20 চাঁদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। 21শে ফেব্রুয়ারী এটি চাঁদে অবতরণ করে 'Sea of Fertility' অঞ্চলে। চন্দ্রশিলা সংগ্রহ করে এটি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে 25শে ফেব্রুয়ারী।

মার্চ 2 ঃ পাইওনীয়ার-10 মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটি 1973 সালের 3রা ডিসেম্বর বৃহস্পতি গ্রহের 81,000 মাইল কাছ দিয়ে চলে যায়। *এটি ক্রমশঃ আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে চলে যেতে থাকে। এটিতে একটি চিত্রিত ফলক পাঠনো হয়, যা দিয়ে বহুদূরের অন্য কোনও সভ্যতা বহুকাল* পরেও আমাদের সভ্যতাকে শনাক্ত করতে পারে। এটি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ যেটি নাকি সৌরমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

মার্চ 27 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার 'ভেনেরা-8' উৎক্ষেপণ করা হয়। 22 শে জুলাই এটি ভেনাস বা শুক্রগ্রহে পৌঁছায়। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠে 'ভেনেরা-8' নামিয়ে দেয় নানা যন্ত্রপাতি।

এপ্রিল 16 ঃ মার্কিন অ্যাপোলো-16 আবারো চাঁদে পাড়ি জমালো। এবারও তিন মহাকাশচারী

গেলেন। এঁরা হলেন জন ইয়ং [John Young], চার্লস ডিউক [Charles Duke] এবং টমাস ম্যাটিংলি [Thomas Mattingly]। 20শে এপ্রিল ইয়ং এবং ডিউক চাঁদে নামলো। এঁরা তিনবার চাঁদে ঘুরে বেড়ান এবং ফিরে আসেন পৃথিবীতে 27শে এপ্রিল। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পঞ্চম দফার পদচারণা।

ডিসেম্বর 7 ঃ অ্যাপোলো-17 চাঁদে যাত্রা করল। এবারের তিন মার্কিন মহাকাশচারীরা হলেন ইউজিন কারনান [Eugene Cernan], রোনাল্ড ইভান্‌স [Ronald Evans] এবং হ্যারিসন স্মিট [Harrison Schmitt]। 11ই ডিসেম্বর কারনান এবং স্মিট চাঁদে নামেন। ওখানে তিনবার পদচারণা করেন। সবাই মিলে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসেন 19শে ডিসেম্বর। এবার ইভান্‌স থাকেন চন্দ্র পরিক্রমারত মূল মহাকাশযানে। এটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের ষষ্ঠবারের পদচারণা।

1973 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জানুয়ারী 8 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার উপগ্রহ চাঁদে যাত্রা শুরু করলো। 16ই জানুয়ারী এটি চাঁদে পৌঁছায়। এটি ছিল 'লুনা-21'। এটি চাঁদে পৌঁছে একটা চান্দ্রযান লুনোখোদ-2 [Lunokhod-2] নামিয়ে দেয়। সেই গাড়ী চাঁদের মাটিতে পরের চার মাস ধরে 23 মাইল অবধি ঘুরে বেড়ায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

এপ্রিল 5 ঃ মার্কিন মহাকাশযান পাইওনীয়ার-11 বৃহস্পতি গ্রহের দিকে যাত্রা শুরু করে। এটি বৃহস্পতির 26,600 মাইল দূর দিয়ে চলে যায় 1974 সালের 2 রা ডিসেম্বর।

মে 14 ঃ মার্কিন মহাকাশ স্টেশন 'স্কাইল্যাব-1' [Skylab-1] উৎক্ষেপণ করা হয় পৃথিবীর কক্ষপথে। এই কক্ষপথের উচ্চতা ছিল 271 মাইল। এটি ছিল প্রথম মার্কিন মহাকাশ স্টেশন।

মে 25 ঃ অ্যাপোলো মহাকাশযানে করে তিন মহাকাশচারী চার্লস কনরাড [জুনিয়ার], জোসেফ কারউইন [Joseph Kerwin] এবং পল উইৎজ [Paul Weitz] স্কাইল্যাবে চলে আসে। এঁরা 28 দিন স্কাইল্যাবে কাটিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন 22শে জুন।

জুলাই 28 ঃ আবারও অ্যাপোলো যানে চড়ে তিন মহাকাশচারী স্কাইল্যাবে চলে আসেন। *এবার তাঁরা 59.5 দিন কাটান স্কাইল্যাবে। ফিরে আসেন 25শে সেপ্টেম্বর। মহাকাশচারীরা হলেন ঃ অ্যালান বিন, জ্যাক লাউজমা [Jack Lousma]* এবং আওয়েন হ্যারিয়ট [Owen Harriott]।

নভেম্বর 3 ঃ এবার আমেরিকা মেরিনার-10 পাঠালো শুক্র ও বুধ গ্রহের উদ্দেশে। এটি *শুক্রের কাছাকাছি গেল 1974 সালের 5ই ফেব্রুয়ারী। শুক্রের থেকে তার দূরত্ব দাঁড়ালো মাত্র 3,600 মাইল।* এরপর মেরিনার গেল বুধের কাছে। বুধের মাত্র 460 মাইল দূর থেকে প্রচুর ছবি পাঠালো মার্চের 29 তারিখে। দ্বিতীয়বার এটি বুধের ছবি তোলে 21 শে সেপ্টেম্বর।

নভেম্বর 16 ঃ তিনজন মহাকাশচারী জেরাল্ড কার [Gerald Carr], এডওয়ার্ড গিবসন [Edward Gibson] এবং উইলিয়াম পোগ [William Pogue] অ্যাপোলো চড়ে গেলেন স্কাইল্যাব মহাকাশ স্টেশনে। থাকলেন 84 দিন। এরপর এঁরা ফিরে এলেন 1974 সালের 8ই ফেব্রুয়ারী।

1975 খ্রিস্টাব্দ ঃ

মে 25 ঃ রাশিয়ার সয়ুজ-18 চড়ে পিওত্র ক্লিমাক [Pyotr Klimuk] এবং ভিটালি সেবাস্তিয়ানোভ [Vitaly Sevastianov] স্যালিউট-4 মহাকাশ স্টেশনে উপস্থিত হন এবং ওঁরা 63 দিন ওই স্টেশনে কাটান। ওঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন জুলাইয়ের 26 তারিখে।

জুলাই 15 ঃ রাশিয়া ও আমেরিকার যৌথ অভিযান শুরু হয় মহাকাশে। কেপ ক্যানাভেরাল [Cape Canaveral] থেকে অ্যাপোলো চড়ে টমাস স্ট্যাফোর্ড [Thomas Stafford] এবং ডোনাল্ড স্লেটন [Donald Slayton] মহাকাশে যাত্রা করেন। একই সঙ্গে রাশিয়ার কাজাখস্তান [Kazakhstan] থেকে মহাকাশে যাত্রা করেন আলেকসেই লিওনোভ [Aleksei Leonov] এবং ভ্যালেরি কুবাসোভ [Valery Kubasov] সয়ুজ-19 চড়ে। 17ই জুলাই এই দুই যান সংযুক্ত হয়ে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করতে থাকে। সয়ুজ পৃথিবীতে ফিরে আসে 21শে জুলাই এবং অ্যাপোলো ফেরে 24 শে জুলাই।

অক্টোবর 22 এবং 25 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশযান ভেনেরা-9 এবং 10 শুক্রগ্রহে নানান যন্ত্রপাতি স্থাপন করে, যেগুলি শুক্রের পৃষ্ঠদেশের ছবি পাঠাতে থাকে, জানাতে থাকে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য।

1976 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জুলাই 6 ঃ সয়ুজ-21 মহাকাশযানে চড়ে বোরিস ভোলিনভ [Boris Volynov] এবং ভিটোলি ঝোলোবোভ [Vitoly Zholobov] মহাকাশ স্টেশন সয়ুজ-5-এ পৌঁছায়। ওখানে 50 দিন থাকার পর 24শে আগস্ট এরা ফিরে আসেন।

জুলাই 20 এবং সেপ্টেম্বর 3 ঃ মার্কিন মহাকাশযান ভাইকিং 1 এবং 2 মঙ্গলগ্রহে সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করে এবং মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠের ছবি পাঠাতে থাকে তারা। বৈজ্ঞানিক তথ্যও আসতে থাকে মঙ্গল থেকে।

আগস্ট 22 ঃ *সোভিয়েত রাশিয়ার লুনা-24 চাঁদের মাটি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।*

1977 খ্রিস্টাব্দ ঃ

ফেব্রুয়ারী 18 ঃ মার্কিন স্পেস শাট্‌ল তার পরীক্ষামূলক উড়ান ও অবতরণ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করে।

ডিসেম্বর 10 ঃ রাশিয়ার মহাকাশযান সয়ুজ-26-এ চড়ে উরি রোমানেঙ্কো [Yuri Romanenko] এবং জর্জি গ্রেচকো [Georgi Grechko] স্যালিউট -6

মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে 96 দিন অতিবাহিত করেন। এঁরা ফিরে আসেন 16ই মার্চ, 1978 খ্রিস্টাব্দ।

1978 খ্রিস্টাব্দ ঃ

জুন 15 ঃ মহাকাশচারী ভ্লামিদির কোভালেনোক [Vladimir Kovalenok] এবং আলেকজান্দ্রা ইভানচেনকোভ [Aleksandra Ivanchenkov] রাশিয়ার সুয়েজ -29 এ চড়ে স্যালিউট -6-এ গিয়ে 139 দিন কাটান। এঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন 2রা নভেম্বর।

ডিসেম্বর 4 ও 9 ঃ মার্কিন পাইওনীয়ার ভেনাস-1 ও ভেনাস-2 মহাকাশযান দুটি শুক্রগ্রহের কক্ষপথে স্থাপিত হয় এবং এরা ওই গ্রহ সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে থাকে।

ডিসেম্বর 21 ও 25ঃ রাশিয়ার ভেনেরা-1 ও 2 শুক্রগ্রহে সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করে।

1979 খ্রিস্টাব্দ ঃ

ফেব্রুয়ারী 25 ঃ নভশ্চর ভ্লাদিমির লিয়াখোভ [Vladimir Lyakhov] এবং ভ্যালেরি রিউমিন {Valeri Ryumin] সয়ুজ-32 চড়ে চলে যান স্যালিউট-6 মহাকাশ স্টেশনে। সেখানে 175 দিন কাটিয়ে 19শে আগস্ট ফিরে আসেন পৃথিবীতে।

মার্চ 5 ঃ মার্কিন মহাকাশ যান ভয়েজার-1 বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে পৌঁছে এবং এই গ্রহটির ও তার উপগ্রহগুলির ছবি পৃথিবীতে পাঠাতে থাকে।

জুন 27 ঃ ন্যাশনাল ওসেনিক অ্যান্ড অ্যাটমস্‌ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন [National Oceanic and Atmospheric Administration]-এর উপগ্রহ NOAA -6 কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এটি এবং 1978 সালের 13 ই অক্টোবর কক্ষপথে স্থাপন করা TIROS-N উপগ্রহ মিলে সারাক্ষণ ধরে পৃথিবীর মাটি, সমুদ্র, আবহাওয়ার নানা তথ্য জানান দিতে থাকে এবং বায়ুমণ্ডলের উপরে সৌর-বিকিরণের মাত্রা পরিমাপ করে।

জুলাই 9 ঃ মার্কিন উপগ্রহ ভয়েজার-2 বৃহস্পতির পাশ দিয়ে যায় এবং গ্রহটির বহু ছবি পাঠায়।

জুলাই 11 ঃ মার্কিন মহাকাশ স্টেশন স্কাইল্যাব-1 ভেঙে পড়ে অস্ট্রেলিয়ায়।

সেপ্টেম্বর 1 ঃ মার্কিন পাইওনীয়ার-2 [Pioneer-II] *শনিগ্রহের সবচেয়ে কাছে যায় ও শনির* বহু ছবি পৃথিবীতে পাঠায়।

ডিসেম্বর 24 ঃ European Space Agency-র রকেট 'এরিয়ানে' [Ariane] সাফল্যের *সঙ্গে উৎক্ষেপণ করা হয়। দ্বিতীয়বারের উৎক্ষেপণ ছিল অসফল [মে 23, 1980]।* এটি বিস্ফোরিত হয়। তৃতীয় উৎক্ষেপণে [জুন 19, 1981] এটি দুটি উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপন করে।

1980 খ্রিস্টাব্দ ঃ

আগস্ট 7 ঃ *চার বছর ধরে মঙ্গল গ্রহ প্রদক্ষিণরত ভাইকিং উপগ্রহটির বেতার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়।*

অক্টোবর 11 ঃ নভশ্চর লিওনিদ প্যাপোভ [Leonid Papov] এবং ভ্যালেরি রিউমিন [Valeri Ryumin] স্যালিউট-6 মহাকাশ স্টেশনে 185 দিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

নভেম্বর 12 ঃ মার্কিন উপগ্রহ ভয়েজার-1 শনির সবচেয়ে কাছে পৌঁছে যায়। বহু ছবি পাঠায় শনির। নতুন একটি বলয় এবং অনেকগুলি নতুন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় এই গ্রহটির।

ডিসেম্বর 10 ঃ লিওনিদ কিজিম [Leonid Kizim], ওলেগ ম্যাকারোভ [Oleg Makarov] এবং জেনোডিয়া স্ট্রেকালোভ [Gennodiya Strekalov] সয়ুজ T-3 তে করে স্যালিউট-6 -এ গিয়ে তার মেরামতি করে দু'সপ্তাহ পরে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

1981 খ্রিস্টাব্দ ঃ

14ই এপ্রিল ঃ ক্যালিফোর্নিয়ার এডোয়ার্ডস্ এয়ার ফোর্স বেস-এ জন ইয়ং [John Young] এবং রবার্ট ক্রিপেন [Robert Crippen] স্পেস শাট্‌ল [Space Shuttle] চালিয়ে মহাকাশ থেকে অবতরণ করেন। এঁরা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন যথারীতি কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রকেটের সাহায্যে 12ই এপ্রিল।

জুন 19 ঃ ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সী এরিয়ান রকেটের সাহায্যে ESA আবহাওয়া উপগ্রহ 'মেটিওস্ট্যাট-2' এবং যোগাযোগ উপগ্রহ 'অ্যাপেল' [Apple] — এই দুটি উপগ্রহকে যথাযথ কক্ষপথে সাফল্যের সঙ্গে স্থাপন করে। 'মেটিওস্ট্যাট' -2 [Meteostat -2] আবহাওয়া নির্ণয়ে এবং অ্যাপেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে থাকে।

জুন 25 ঃ মার্কিন উপগ্রহ পাইওনীয়ার -10 প্রায় 25 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট' [AU] [এক AU= 15 কোটি কিলোমিটার] দূর গিয়ে তথ্য দিয়ে জানালো যে, 375 কোটি কিলোমিটার দূরেও সৌর ঝটিকা সমান শক্তিতে বলবৎ এবং আন্তর্গ্রহ চৌম্বকক্ষেত্র বেঁকে গিয়ে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে আছে।

আগস্ট 25 ঃ ভয়েজার -2 শনির খুব সন্নিকটে উপস্থিত হয়। শনির বলয় ও তার উপগ্রহদের প্রচুর খুঁটিনাটি ছবি পাঠিয়ে সে চলে যায় ইউরেনাসের দিকে। ইউরেনাসের কাছাকাছি সে পৌঁছেছে 1986-তে এবং নেপচুন গেছে 1989 সালে।

1982 খ্রিস্টাব্দ ঃ

মার্চ 1এবং 5 ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার উপগ্রহ 'ভেনেরা-13' এবং 'ভেনেরা-14' শুক্রগ্রহে অবতরণ করে। সেখানের ভূ-পৃষ্ঠের ছবি পাঠাতে থাকে। সেখানকার মাটির বিশ্লেষণ তথ্যও পাঠায়।

জুলাই 2 ঃ সোভিয়েত-ফরাসী যৌথ উদ্যোগে তিনজন মহাকাশচারী ভাদিমির দঝানিবেকোভ [Vladimir Dzhanibekov] এবং আলেকজান্দ্রা ইভানচেন্‌কোভ [Aleksandra Ivanchenkov] এবং ফরাসী কর্নেল জাঁ-লুপ ক্রেটিয়েঁ

[Col. Jean-Loup Chretien] এক সপ্তাহ সয়ুজে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। মহকাশ স্টেশন সয়ুজ তখনও ঠিকঠাক চলছিল।

জুলাই 4 ঃ কলম্বিয়া নামের মার্কিন স্পেস শাটল তার চতুর্থ এবং শেষ পরীক্ষামূলক অবতরণ সম্পন্ন করে এড্‌ওয়ার্ড্‌স এয়ারফোর্স বেসে [Edwards Air Force Base]। ক্যালিফোর্নিয়ার এই বিমান বন্দরটি এরপর থেকে মহাকাশ ফেরি 'স্পেস শাট্‌ল' অবতরণ ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত এবং খ্যাত হয়।

আগস্ট 27 ঃ সোভিয়েত নভশ্চরেরা 'স্বেৎলানা স্যাভিৎস্কায়া'[Svetlana Savitskaya] -কে নিয়ে মহাকাশে আটদিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। স্বেৎলানা ছিলেন দ্বিতীয় মহাকাশচারিণী — ভ্যালেন্‌টিনা তেরেসকোভা হলেন প্রথম মহিলা মহাকাশচারী।

মহাকাশ অভিযানের প্রথম 25 বছরের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল। এরপর আরও 25 বছর কেটে গেছে। সব কিছুরই উন্নতি হয়েছে! দু'জন ধনী ব্যক্তি ইতিমধ্যে দু'কোটি ডলার খরচ করে মহাকাশে বেড়িয়ে এসেছেন। মহাকাশ অভিযান প্রসঙ্গ শেষ করবো তিন ভারতীয় মহাকাশচারীর কথা বলে। এঁরা হলেন রাকেশ শর্মা, কল্পনা চাওলা এবং সুনীতা পাণ্ড্য উইলিয়ামস্।

পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় জন্মেছেন রাকেশ শর্মা — ভারতের প্রথম মহাকাশচারী। 1949 -এর 13ই জানুয়ারী তাঁর জন্ম। ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমাণ্ডার ছিলেন তিনি। এখন রিটায়ার করেছেন। 1984 সালে, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ও সোভিয়েত ইন্টারকস্‌মস্ স্পেস প্রোগ্রামে, সুয়ুজ-T-11 মহাকাশযানে চড়ে এই ভারতীয়টি স্যালিউট -7 মহাকাশ স্টেশনে যান। এই স্টেশনে তিনি 7 দিন 21 ঘণ্টা 40 মিনিট কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। মহাকাশে থাকাকালীন অন্যান্যদের মধ্যে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি উত্তর ভারতের Multispectral Photography নিয়ে কাজ করেন। তাঁর এই গবেষণা হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রভূত কাজে লাগে।

2003 সালে মহাকাশযান 'কলম্বিয়া'-র দুর্ঘটনার কথা আজও বহু ভারতীয় মনে রেখেছেন। এটি বিখ্যাত হয়ে আছে কল্পনা চাওলার মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে। কল্পনা চাওলা জন্মেছিলেন হরিয়ানার কার্ণালে 17 ই মার্চ, 1962 খ্রিস্টাব্দে। 1982 সালে বি.এস.সি পাশ করেন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে। এরপর আমেরিকা যান উচ্চ শিক্ষার্থে। সেখানে তিনি এম.এস.সি এবং Ph.D [Aerospace Engineering] ডিগ্রি লাভের প[illegible]যোগ দেন 'নাসা'-তে [National Aeronautics and Space Administration (NASA)] । হয়ে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। 1995 সালে, নাসা-য় যোগ দেওয়ার পর তিনি 'স্পেস শাটল' কলম্বিয়ার 'ক্রু' হন 1997 সালের নাসার এস.টি.এস-87 মিশনে। এরপর S.T.S -107 মিশনে তিনি 2003 সালে মহাকাশচারিণী হয়েই মহাকাশে যান। মহাকাশে তিনি কাটান মোট 31দিন 14 ঘণ্টা 54 মিনিট। ফেরার পথে কলম্বিয়ায় আগুন লেগে পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই অকাল প্রয়াণে সারা ভারত জুড়ে কল্পনা চাওলার জন্য শোকের বন্যা বয়ে যায়।

এরোস্পেস ইঞ্জিনীয়ার কল্পনা চাওয়াল শেষ মহাকাশযাত্রা হয় এস.টি.এস-107 মিশনে। স্পেস শাটল কলম্বিয়া তাঁকে এবং অন্য ছয়জন মহাকাশচারীকে মহাকাশে নিয়ে যায় 2003 সালের 16 ই

জানুয়ারী। কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে তাঁরা কলম্বিয়া নিয়ে পাড়ি দেন মহাকাশে। এটি ছিল কল্পনার 24তম উড়ান। এই মহাকাশ অভিযান ছিল 'A Multi-disciplinary Micro-gravity and Earth Science Research Mission'। 16 দিন মহাকাশে থেকে 282 কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীকে 200 বারেরও বেশি প্রদক্ষিণ করে, কলম্বিয়া কল্পনাদের নিয়ে 2003 খ্রিস্টাব্দের 1লা ফেব্রুয়ারী পুনরায় পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য। সময়টা ছিল সকাল 8টা 50 মিনিট (মার্কিন সময়)। এই সময় হঠাৎই নাসার সঙ্গে কলম্বিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সকাল 9টা নাগাদ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেণ্টারে এটির অবতরণের কথা। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। হঠাৎ এক বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কলম্বিয়া। সাত মহাকাশচারীও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এইভাবে কল্পনা চাওলা অসংখ্য টুকরো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

পরে ভিডিও রেকর্ডিং থেকে দেখা যায়, টেক্সাসের আকাশের মাত্র 63 কিলোমিটার উচ্চতায় কলম্বিয়া ভেঙ্গে পড়ে যখন তার গতিবেগ ছিল প্রতি সেকেন্ডে 5.6 কিলোমিটার বা ঘণ্টায় 20,160 কিলোমিটার। কলম্বিয়ার সঙ্গে বাতাসের ঘর্ষণে উৎপন্ন হওয়া তাপের ফলে আগুন ধরে যায় কলম্বিয়ায়, কারণ এর তাপ প্রতিরোধক আস্তরণে ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। দুর্ঘটনায় সবাই মর্মাহত হল। নাসা তদন্ত কমিশন বসাল। দুর্বিপাক সামলানোর একটা দল টেক্সাস, লুসিয়ানা এবং আরকানসাসে সন্ধান চালিয়ে কলম্বিয়ার অসংখ্য টুকরো খুঁজে পান। মহাকাশচারীরাও অসংখ্য টুকরো হয়ে যান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার 'Columbia Accident Investigation Board' বসিয়ে কলম্বিয়া ভেঙ্গে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করান। যান্ত্রিক ত্রুটি এবং সাংগঠনিক অব্যবস্থা কিছু ছিল কিনা তা ভালো করে খতিয়ে দেখতে বলা হয়। এই তদন্তকারী দল যে রিপোর্ট দেয় তাতে বলা হয়, "That disaster was caused by breaks in the Shuttle's Ceramic heat-shield due to foam insulation peeling of its fuel tank and striking a wing during the launch." এই ভয়ংকর দুর্ঘটনার কারণ হল কলম্বিয়ার সেরামিক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাপ প্রতিরোধক আস্তরণ হিট-শিল্ড হয়ে যায়। ফলে, জ্বালানী ট্যাঙ্কে আগুন ধরে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে নাসা তার সমস্ত মহাকাশ অভিযান দু'বছরের জন্য বন্ধ রাখে। 2005 সালে আবার শুরু হয় নাসার মহাকাশ অভিযান।

ভারতীয় বংশোদ্ভুত সুনীতা পাণ্ড্য উইলিয়ামস্ জন্মেছেন 1965 সালের 19 শে সেপ্টেম্বর। জন্মেছিলেন আমেরিকার ওহিও রাজ্যে, ইউক্লিড শহরে। সুতরাং তিনি আমেরিকার নাগরিক, যদিও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভুত। তাঁর বাবা দীপক পাণ্ড্য এবং মা বনী পাণ্ড্য। তাঁরা এখন থাকেন ম্যাসাচুসেট্সের ফুলমাউথ নামক জায়গায়। সুনীতার ছাত্রজীবন শুরু হয় ম্যাসাচুসেট্সের নীড্হ্যাম শহরে। 1983 সালে তিনি নীড্হ্যাম হাইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে ইউ.এস.নাভাল অ্যাকাডেমি থেকে 1987 সালে ফিজিক্যাল সায়েন্সে বি.এস. সি পাশ করেন। 1995 সালে ফ্লোরিডা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যানেজমেন্টে এম.এস [M.S.] পাশ করেন। বিয়ে করেছেন মাইকেল জে. উইলিয়ামস্কে। এখনও নিঃসন্তান। তাঁর পোষ্য এক কুকুর—তাঁর নাম 'গোরবী'। সুনীতা পাণ্ড্য উইলিয়াম্সের বিবাহিত জীবন অতি সুখের। তাঁর অবসরকালীন আমোদ-প্রমোদ হল — দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, ট্রায়াথেলান্স, উইন্ডসার্ফিং ইত্যাদি।

সুনীতার প্রধান অভিজ্ঞতা তিনি পাইলট। তাঁকে বিচিত্র সরকারী কাজকর্মেও অংশ নিতে হয়েছে দরকার মত। এখন তিনি 'Society of Experimental Test Pilots', 'Society of Flight

Engineers' এবং 'American Helicopter Association' প্রভৃতির সদস্যা এবং এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

1987 সালের মে মাসে তিনি ইউনাইটেড স্টেট্স নেভিতে নিযুক্ত হন আমেরিকার নৌবাহিনীর সর্বনিম্ন অফিসার পদে। 1989 সালে নৌবাহিনীর বিমান পরিচালনায় ট্রেনিং নিয়ে তিনি 'নাভাল এভিয়েটার' [Naval Aviator] হন। এরপর তিনি 'হেলিকপ্টার কমব্যাট সাপোর্ট স্কোয়াড্রন -3 ফর ইনিশিয়াল H-46 সিকনাইট ট্রেনিং নেওয়ার পর, সুনীতাকে ভার্জিনিয়া, নর্ফোক এবং ভূ-মধ্যসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে হয় যুদ্ধের সময় হেলিকপ্টার চালক হিসাবে। 30টি বিভিন্ন বিমানে তাঁর মোট উড়ান হয় 2770 ঘন্টা। সুনীতা সেনাবাহিনীর হয়ে নানা দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। সেইসব কাজের জন্য তিনি পুরস্কৃতও হয়েছেন। দু'বার পেয়েছেন 'নেভি কমেন্ডেশান্ মেডেল', পেয়েছেন 'হিউম্যানিটেরিয়ান্ সার্ভিস মেডেল' ইত্যাদি।

1998 সালের জুন মাসে নাসা সুনীতাকে নির্বাচিত করে মহাকাশচারী হওয়ার জন্য। ওই বছর আগস্ট মাসে তাঁর ট্রেনিং শুরু হয়। প্রশিক্ষণে তাঁকে শিখতে হয় নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিষয়, মহাকাশ ফেরিযান এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের খুঁটিনাটি নির্দেশনামার অনুধাবন, শারীরিক এবং গ্রাউন্ডস্কুল ট্রেনিং, মহাশূন্যের কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তার পদ্ধতি ইত্যাদি। এছাড়াও সুনীতাকে রাশিয়ান স্পেস্ এজেন্সীতে গিয়ে কাজ শিখতে হয়েছে রাশিয়ার নভশ্চরদের সঙ্গে। আবার জলের নীচে গিয়ে জলজ আবাসে নয় দিন থাকতে হয় তাঁকে। এরপর সুনীতা নিযুক্ত হন 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের' এক ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে।

সুনীতাকে নাসার এক্সপিডিশন-14 কর্মসূচির সদস্য নিযুক্ত করা হল। 2006 সালের 9ই ডিসেম্বর STS -117 মিশনের কাজে নিযুক্ত 'ডিস্কভারি' নামের মহাকাশ ফেরিযানের ক্রুদের সঙ্গে আকাশে উড়লেন সুনীতা। ডিসেম্বরের 11তারিখে ডিস্কভারি মহাকাশ স্টেশনে সংযুক্ত হল। নভশ্চররা মহাকাশ স্টেশনে গেলেন। সুনীতাকে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হল। এগুলি পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। মহাকাশ স্টেশনটিতে রয়েছে অনেকগুলি আধুনিক গবেষণাগার। আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের নভশ্চররা এই সব পরীক্ষাগারে এসে কাজ করতে পারেন। সুনীতা 'ডেস্টিনি' পরীক্ষাগারে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান তার কয়েকটি হল ঃ (1) মানবজীবনে বিজ্ঞানের কিছু সমস্যা, (2) ভৌতবিজ্ঞানের কিছু বিষয়, (3) মহাকাশ থেকে পৃথিবীর নিরীক্ষণ, (4) প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রদর্শনী, (5) ভারহীন অবস্থায় মানুষের শরীরে কী ধরনের প্রভাব পড়ে তার পরীক্ষা ইত্যাদি। আবার মহাকাশে পদচারণা, পৃথিবী থেকে নিয়ে আসা যন্ত্রাংশ মহাকাশ স্টেশনে লাগানো ইত্যাদিও করতে হয়। মহাকাশ স্টেশন সারাতেও হয়। মহাকাশ ফেরিযানের 'হিট শীল্ড' [Heat Shield]-ও সারাতে সাহায্য করেন সুনীতা।

সুনীতাদের মিশনের নাম ছিল এস.টি.এস -117[Space Transportation System -117]। এর ফেরিযানের নাম ছিল 'আটলান্টিস'[Atlantis]। এখন যে বিশাল মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত আছে তা কাজ করে চলেছে আমেরিকা ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে। খরচ বহন করছে এই দুটি দেশই। এস.টি.এস মিশনগুলি চলছে এখন যৌথ উদ্যোগেই। এই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের তথ্যগুলি হল ঃ

(1) ভর ঃ 2,13,843.4 কিলোগ্রাম বা 4,71,444 পাউন্ড।

(2) দৈর্ঘ্য ঃ 58.2 মিটার, প্রস্থ ঃ 44.5 মিটার, উচ্চতা ঃ 27.4 মিটার।

(3) বাসযোগ্য স্থানের আয়তন ঃ 424.75 ঘন মিটার।

(4) কক্ষপথের অনুসূর বিন্দুর দূরত্ব (পৃথিবী থেকে) 319.6 কিলোমিটার এবং অপসূর বিন্দুর দূরত্ব (পৃথিবী থেকে) ঃ 346.9 কিলোমিটার।
(5) কক্ষপথের নতি [Orbital Inclination] ঃ 51.63 ডিগ্রি।
(6) গড়গতি ঃ 27,743.8 কিমি/ঘণ্টা।
(7) পর্যায় কাল বা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণের সময় ঃ 91.20 মিনিট।
(8) প্রতিদিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ঃ 15.79 বার
(9) 2007 সালের 20 শে জুন অবধি এই মহাকাশ স্টেশনটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে 47,466 বার।
(10) মোট পরিভ্রমণ সেরেছে 200 কোটি [2×10^9] কিলোমিটার।

সুনীতার মহাকাশ অভিযান শুরু হয় 9 ই ডিসেম্বর 2006 সাল। তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন 22 শে জুন, 2007 খ্রিস্টাব্দে। একনাগাড়ে 195 দিন মহাকাশে থেকে মহিলাদের 'Time-in-Space Endurance'-এর নতুন রেকর্ড গড়েছেন সুনীতা। মেয়েদের মধ্যে সুনীতাই প্রথম 195 দিনের দীর্ঘ সময় মহাকাশে কাটালেন। সুনীতার এক সাথী নভশ্চর মাইকেল লোপেজ মার্কিনদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সময় মহাকাশে বসবাস করার রেকর্ড গড়েছেন 215 দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করে। সবচেয়ে বেশি সময় মহাকাশে কাটানোর রেকর্ড গড়েছেন ভ্যালেরি পলিয়াকোভ। তিনি মহাকাশে কাটিয়েছেন 437 দিন। সুনীতার আগে 'শ্যানন লুসিড' [Shannon Lucid] নামের এক মার্কিন মহাকাশচারিণী তখনকার রুশদেশীয় মহাকাশ স্টেশন 'মীর'-এ একনাগাড়ে 188 দিন 4 ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। সে রেকর্ড সুনীতা ভেঙে দেন মহাকাশে 195 দিন অতিবাহিত করে।

2007 সালের 22 শে জুন ছয় জন নভশ্চরকে সঙ্গে নিয়ে সুনীতা 'আটলান্টিস'-এ চড়ে মোজাভে মরুভূমিতে ক্যালিফোর্নিয়ার 'এডওয়ার্ডস এয়ারফোর্স বেস'-এ অবতরণ করেন। তখনই সাফল্যমণ্ডিত হয় STS -117 মিশন। অভিনন্দিত হন এই সাতজন মহাকাশচারী। আটলান্টিসের নামার কথা ছিল ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেণ্টারে। কিন্তু অবতরণ ক্ষেত্রে তুমুল বৃষ্টির কারণে এই অবতরণ স্থল বদল করা হয় ও এটিকে ওই এয়াসফোর্স বেসে নামানো হয়। আটলান্টিসের নামার কথা ছিল 21শে জুন, কিন্তু কিছু যন্ত্র বিকল হওয়ায় এর অবতরণ পিছিয়ে যায়। মহকাশ স্টেশনেও কিছু মেরামতি করতে হয়। নাসা চাইছিল না ক্যালিফোর্নিয়ার ওই বিমানবন্দরে আটলান্টিসকে নামাতে। কারণ, ওই অবতরণ ক্ষেত্রেই নামার কথা ছিল 2003 সালে ধ্বংস হওয়া 'কলম্বিয়া'র। ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর মাত্র একবারই একটি স্পেস শাট্‌ল নেমেছিল 2005 সালে। এবার অবশ্য STS-117 মিশন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আটলান্টিস সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করে ছিল ক্যালিফোর্ণিয়ার এই অবতরণ ক্ষেত্রে 2007 সালের 22শে জুন।

মিশন STS -117 এর কার্যকাল ঠিক করা হয়েছিল 11দিনের জন্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণের জন্য এর কার্যকাল 15 দিন হয়ে যায়। এই মিশনের তিনটি মূললক্ষ্য ছিল ঃ

(1) আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে 35000 পাউণ্ডের 'পে-লোড' [Pay-load] পৌঁছে দেওয়া।
(2) মহাকাশচারিণী সুনীতার জায়গায় মহাকাশ স্টেশনে মহাকাশচারী ক্লে এনডারসনকে পৌঁছে দেওয়া।
(3) মহাকাশ স্টেশন থেকে সুনীতাসহ সাতজনকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা।

এই তিনটি উদ্দেশ্যে মিশন অবশেষে নানা উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সফল হয়। ফলে, কেবল আমেরিকা

নয় ভারতবর্ষও তার সঙ্গে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। কারণ, ওই সাতজন নভশ্চরের একজন ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভুত সুনীতা পাণ্ড্য উইলিয়াম্‌স।

আটলান্টিসের পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসা নিয়ে নাসার কর্মকর্তাদের উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ হল, আটলান্টিসের ক্ষয়ক্ষতি। STS-117 মিশন শুরু হওয়ার কথা ছিল 2007 সালের মার্চ মাসে। দিনটা ঠিক করা হয়েছিল 15ই মার্চ। আটলান্টিস তৈরি করা হয়েছিল 1985 সালে। এটি 28 বার ফেরিযান হিসাবে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে এর আগে। কিন্তু এবার একটু গোলমাল হয়। 2007 সালের 26শে ফেব্রুয়ারীতে এক ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে আটলান্টিসের বহির্গাত্রে বহু ক্ষয়ক্ষতি হল। বিশেষ করে শিলাবৃষ্টিতে এই ক্ষতি বেশ গুরুতর হল। একে মেরামত করতে বিমানশালায় [Hanger] নিয়ে যাওয়া হয়। একে সারিয়ে তুলতে সময় লাগে। 2007 সালের 8ই জুন কেনেডি স্পেস সেন্টারের প্যাড 39A থেকে আটলান্টিসকে উৎক্ষেপণ করা হয়। 11ই জুন এটি মহাকাশ স্টেশনে সংযুক্ত হয়। মহাকাশচারীরা সাগ্রহে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঘরে ফেরার। কিন্তু হঠাৎই মহাকাশ স্টেশনের নানা কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটারগুলি একসঙ্গে বিকল হয়ে যায়। মহাকাশ স্টেশনের অবস্থান নিয়ন্ত্রক এবং অক্সিজেন তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করা কম্পিউটারগুলি বন্ধ হয়ে যায়। মহাকাশ স্টেশনের যে অংশে রাশিয়ার মহাকাশচারী এবং ইঞ্জিনীয়াররা ছিলেন সে অংশটির কম্পিউটারগুলিই বিকল হয়। এরপর আমেরিকার হিউস্টন থেকে এবং রাশিয়ার মস্কো থেকে নির্দেশ যেতে থাকে কী কী করতে হবে ওই জরুরি অবস্থায়। অবশেষে সারানো গেল বিকল কম্পিউটারগুলি। চালু করা গেল 'অক্সিজেন মেশিন', 'ওয়াটার প্রসেসর', 'কাবন-ডাই-অক্সাইড রিমুভার' ইত্যাদি। উৎক্ষেপণের সময় আটলান্টিসের 'তাপ নিরোধক' ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছিল, সেগুলিও নামার আগে সারিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু নাসা ভীত হয়ে পড়ে। আটলান্টিসের 'হিট শীল্ড' যদি আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে 2003 সালের ভয়ংকর দুর্ঘটনা আবার ঘটতে পারে। আটলান্টিসের অবস্থাও কলম্বিয়ার মত হতে পারে। এই ভয়েই ভীত ছিল নাসার কর্তারা।

মহাকাশ ফেরিযান সারানোর কাজ তাই হাতে নেওয়া হল এবং মহাকাশে থাকা অবস্থাতেই এই সারাইয়ের কাজ করতে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলেন সুনীতা এবং আরও দুই মহাকাশচারী। সুনীতা একজন ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার। তাই এই সারানোর কাজে তিনি অংশ নিলেন। সারানোর কাজ ঠিকঠাক করে ফেলা হল। 11 দিনের মিশনকে বাড়িয়ে 15 দিন করা হল। এই সারানোর ফলেই ফেরিযান আটলান্টিস তার বিগত 22 বছরের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে দুর্ঘটনার হাত এড়িয়ে সাতজন নভশ্চরকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে।

নাসা যে কেবল 2003 সালের কলম্বিয়া বিস্ফোরণ দেখেছে তা নয়, তারও বছর 17 আগে সে দেখেছে মহাকাশ ফেরিযান 'চ্যালেঞ্জার'-এর করুণ পরিণতি। তাই আটলান্টিসকে নিয়ে তার ভয়ের অন্ত ছিল না। 1986 সালের 28শে জুন ওই মহাকাশ ফেরিয়ান উৎক্ষেপণের 73 সেকেন্ডের পরেই এক ভীষণ বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাতজন অভিযাত্রীই এতে প্রাণ হারান। সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয় যানের অসংখ্য টুকরো। তদন্ত কমিশন বলেছিল, এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হল নাসার সাংগঠনিক সংস্কৃতি এবং তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি।

সুনীতা 195 দিন মহাকাশে কাটিয়ে যেমন একটা রেকর্ড গ'ড়েছেন, তেমনি মহাকাশে পদচারণারও একটি রেকর্ড তাঁর দখলে এসেছে। আটলান্টিসকে মেরামত করতে গিয়ে সুনীতা মহাকাশে পদচারণা করেছেন মোট 29 ঘন্টা 24 মিনিট। *নভশ্চারিণীদের ক্ষেত্রে এটি সেরা রেকর্ড। পৃথিবীর কোনও মহিলা এতটা দীর্ঘ সময় ধরে মহাকাশে পদচারণা করেন নি।*

সুনীতা আরেকটা রেকর্ড করেছেন মহাকাশে 'ট্রেড মিল ম্যারাথন' দৌড়ে। দৌড়েছেন অবশ্য মহাকাশ স্টেশনের মধ্যেই। আমেরিকায় প্রতি বছর হয় বোস্টন ম্যারাথন দৌড়। গতবারে হিউস্টনে এই দৌড়ে তিনি অংশ নেন। তাঁর সময় ছিল 3 ঘন্টা 29 মিনিট 57 সেকেন্ড। এ বছরও তাঁর অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মহাকশে চলে আসায় তা সম্ভব হয় নি। সুনীতা কিন্তু ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি নাসাকে জানালেন যে, তিনি মহাকাশ স্টেশনের মধ্যেই দৌড়াবেন। বহু চেষ্টায় নাসার কর্তাদের রাজী করালেন সুনীতা। দৌড়ালেন 'ট্রেড মিল ম্যারাথন' মহাকাশ স্টেশনের অভ্যন্তরেই।

ভারশূন্য অবস্থায় দৌড়াতে গেলে ছিটকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই অনেকগুলি স্ট্র্যাপ দিয়ে মহাকাশ স্টেশনের মধ্যে থাকা 'ট্রেড মিল'-এর সঙ্গে বাঁধা থাকলে পড়ার সে ভয় থাকে না। দৌড়ানোর সময় কাঁধে ও পিঠে চেপে বসে থাকে এই স্ট্র্যাপ এবং এই সব নিয়ে দৌড়াতে খুবই কষ্ট হয়। সুনীতা এই কষ্ট সহ্য করেও মহাকাশ স্টেশনের ভেতরেই দৌড়ান। নাসার অনুমতি পাওয়ার পর এই দৌড়ানোর ব্যবস্থা করে দেন তাঁরই এক সহনভশ্চর। দৌড়ানোর সময় যাতে মহাকাশযানে ঝাঁকুনি না লাগে তার জন্য এক ইঞ্জিনীয়ার সহনভশ্চর বানিয়ে দিলেন 'Special Vibration Isolation System'। এটি লাগানো হল দৌড়ের জায়গায়। এর ফলে সুনীতার দৌড়ানোর সময় মহাকাশ যানটিতে কোনও ঝাঁকুনি লাগে নি। পৃথিবী থেকে 338 কিলোমিটার উচ্চতায় সুনীতা ম্যারাথন দৌড়ালেন নির্বিঘ্নে। এই দৌড় শেষ করতে তিনি সময় নেন 4 ঘন্টা 23 মিনিট 46 সেকেন্ড। এই সময়ে মহাকাশ স্টেশনটি তিন তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ সেরে ফেলেছে। এই ম্যারাথন দৌড় শেষ করার আগে তিনি বহুবার দৌড়ের অনুশীলন করেছেন মহাকাশ স্টেশনের মধ্যেই। সুনীতা মহাকাশ স্টেশনে ম্যারাথন দৌড়ে এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।
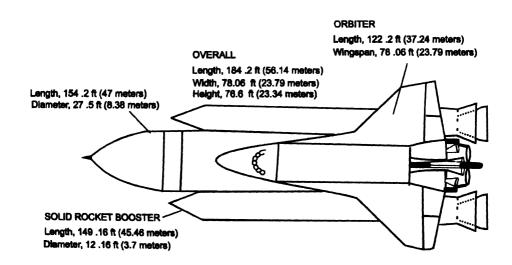
চিত্র : 113

● একটি মহাকাশ ফেরিযানের [Space Shuttle] মোটামুটি মডেল।

সুনীতা মহাকাশে থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করতে এক থেকে দেড় বছর সময় লাগবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এইগুলি কাজে লাগিয়ে ফুয়েল ট্যাঙ্ক, কুলিং সিস্টেম ও ওয়াটার রিসাইক্লিং সিস্টেমের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হবে। 195 দিনের মহাকাশে অবস্থান, সুনীতাকে 'Capillary Flow Experiments [CFE]' -এর উপর বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যান্য নভশ্চরদের তুলনায় এই পরীক্ষায় তাঁর সাফল্য অনেকটাই বেশি। তাঁকে নাসা এখন তাই 'The Queen of CFE' নামে অভিহিত করছেন। মহাকাশযানের মধ্যে ভারশূন্য অবস্থায় করা এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীতে কিছুটা অন্য রকম ফল দেয়।

শুধু এই কাজ নয়, সুনীতা 'Human Life Science'-এর সঙ্গে জড়িত বিষয় নিয়েও মহাকাশে গবেষণা চালান। দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে পুষ্টির উপর কি প্রভাব পড়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করেছেন। নিজেরই রক্ত সংগ্রহ করে রাখতে হয়েছে পৃথিবীতে ফিরে এসে তার বিশ্লেষণের জন্য। আগামী দিনে যাঁরা মহাকাশে যাবেন তাঁদের পুষ্টির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে এই তথ্য খুবই কাজে লাগবে।

মহাকাশ থেকে ফিরে সুনীতাকে 45 দিন হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারে রাখা হয় নাসার ফিজিক্যাল পুনর্বাসনের প্রোগ্রাম অনুসরণে। ভারশূন্য অবস্থায় বহুদিন থাকার ফলে মহাকাশচারীদের হাড় ও মাংসপেশী খুবই দুর্বল হয়ে যায়। এগুলি না সারিয়ে তুললে পৃথিবীর অভিকর্ষে তাদের চলাফেরা খুবই মুশকিল হয়ে যায়। সুনীতা বলেছেন, "Gravity is pretty heavy. My head felt heavy. My Legs felt Heavy". তিনি মহাকাশে গিয়েও ভারতকে ভোলেন নি, যদিও জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয় নাগরিক নন। তিনি মহাকাশে সিঙ্গাড়া নিয়ে যান। ই-মেল পাঠান 'India is all colours from space." বলেন "I would like to have more Indian foods in space." মহাকাশ অভিযানের পর সুস্থ হয়েই তিনি ভারতে এসেছেন এবং ঘুরে গেছেন অভিভূত হয়ে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর রাত জেগে আটলান্টিসের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনার দৃশ্য টিভিতে দেখে তিনি মহাকাশে বসেই অভিভূত হয়েছেন। আটলান্টিসের 'হিট শীল্ড' খারাপ হওয়ার খবর শুনে ভারতবাসীর উদ্বেগ এবং মঙ্গল কামনার্থে মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেওয়া ইত্যাদির খবরে তিনি ভীষণভাবে উদ্বেলিত হয়েছেন। সবাইকে মহাকাশ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানিয়েছেন। ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের ই-মেল পাঠিয়ে বলেছেন, 'মহাকাশই তোমাদের ভবিষ্যৎ।' তাদের আহ্বান জানিয়েছেন মহাকাশ বিষয়ে আগ্রহ নিতে এবং সক্রিয়ভাবে মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে।

সুনীতা তাঁর এই মহাকাশ যাত্রায় কখনো ভয় পান নি। তিনি আর কখনও সারমেয় 'গোরবী'-কে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে সমুদ্রবেলায় ঘুরে বেড়াতে পারবেন না, এমন চিন্তা কখনও তাঁর মনে আসে নি। তাঁর এখন ইচ্ছা, চাঁদে কিংবা মঙ্গলে যাওয়ার। পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা চন্দ্রে যাবেন তাঁর প্রথমে মহাকাশ স্টেশনে যাবেন এবং সেখান থেকে যাবেন চাঁদে কিংবা মঙ্গল গ্রহে। সুনীতা এই কর্মসূচিতেও অংশ নিতে চান। হকিং সাহেব [S.W. Hawking] একবার বলেছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত মানুষ কেবল একটি মাত্র গ্রহেই নিজেকে বদ্ধ রাখবে, ততদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার একটা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তাকে থাকতে হবে। কেননা, আজ না হয় কাল এক গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষে কিংবা পারমাণবিক যুদ্ধে আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি। কিন্তু যদি একবার আমরা এই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারি এবং অনেকগুলি স্বাধীন কলোনি গ'ড়ে তুলতে পারি, তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে।" তাঁর কথা আজ গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। এখন তাঁর বাক্য 'We must

expand into space. That is our destiny'—মহাকাশচারীদের কাছে আপ্তবাক্য হয়ে উঠেছে। সুনীতাও ভারতের কচি-কাঁচাদের সেই কথা বলতে চেয়েছেন তাঁর ই-মেলে, সেলোফোনে।

মহাকাশ অভিযানে মনুষ্যহীন মহাকাশ যান শুক্রগ্রহে কয়েকটি পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে রাশিয়া আমেরিকার থেকে কিছুটা এগিয়ে। অনেক তথ্যও জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে এইসব অভিযানের সুবাদে। শুক্রগ্রহ এখন অনেকটাই আমাদের চেনা। মঙ্গলেও কয়েকটি উপগ্রহ হাজির হয়েছে। এখানে আবার আমেরিকা কিছুটা এগিয়ে। মঙ্গল সম্পর্কে এখন অনেক তথ্যই আমাদের জানা। বৃহস্পতি, শনি ও বুধ সম্পর্কে খুব বিশদ না হলেও বেশ কিছু তথ্য আমরা জেনেছি মনুষ্যবিহীন উপগ্রহ ভয়েজার, পাইওনীয়ার, মেরিনার প্রভৃতির কল্যাণে। মহাকাশ অভিযানে এখনও আমাদের সৌরজগতের অতি ক্ষুদ্র এক অঞ্চলে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। সত্যিকারের মহাকাশে অভিযান আজও কল্পনার।

পাইওনীয়ার-10, ভয়েজার-1 এবং 2 সৌরমণ্ডলের বাইরে চলে গেছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেরার্ড কে. ওনীল [Gerard K. O' Neill] তার বই 'The High Frontier and 2081–A Hopeful view of the Human Future" বইটিতে লিখেছেন যে, খুব শিগগির চাঁদকেই মহাকাশ স্টেশন করা যাবে এবং আগামী 75 বছরের মধ্যে শুক্রগ্রহ থেকে গ্রহাণুপুঞ্জ অবধি সৌরজগতের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে মানুষের কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানগুলি অবারিতভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে। নাসা এখন কাজ করে চলেছে সেই স্বপ্ন নিয়ে। রাশিয়া এখন সঙ্গত দিচ্ছে যৌথ উদ্যোগের প্রয়াসগুলিতে। আবার একদল সাবধানী বিজ্ঞানী মনে করছেন, 75 বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষ টিকে থাকতে পারবে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের। 2050 সাল নাগাদ এই মানব সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। ●

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

[মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীরা কোনও একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। একদল বলছেন, মহাবিশ্ব স্পন্দনশীল। এখন তার প্রসারণ চললেও আরো প্রায় 2000 কোটি বছর পরে তার সংকোচন শুরু হবে। এই প্রসারণ-সংকোচনের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। বিজ্ঞানীদের অন্যদলটি এই 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' মানেন না। তাঁরা বলছেন, বিশ্ব চিরসম্প্রসারণশীল। 100^{100} বছর পরে মহাবিশ্ব রূপান্তরিত হবে রাশি রাশি ফোটন এবং মৌলিক কণাসমূহের অনন্ত মহাসমুদ্রে। দর্শন এক স্রষ্টা বা ঈশ্বর থেকে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করে, বিজ্ঞান সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে একের খোঁজ করে চলে। উভয়েই একক সত্তা স্বীকার করে। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই বলে স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বের কথা। মহাবিশ্বের ইতিহাসে 10^{40} হল যাদুসংখ্যা। এই সংখ্যার অনুষঙ্গী হাবল ব্যাসার্ধ আকস্মিক নয়। মহাবিশ্ব যেন মানুষমুখী। মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় আছে বলেই মানুষ আছে।]

মহাবিশ্বের স্থির অবস্থা তত্ত্বের [Steady State Theory] প্রবক্তা বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা যাক। তিনি তাঁর 'Homage to the Infinite' প্রবন্ধে বলেছেন, "বিজ্ঞান ও ধর্মের সহাবস্থানের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ প্রয়োজন হবে। প্রথমত সব ধর্মকেই বিজ্ঞান আবিষ্কৃত ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক ধারণা ও আবিষ্কারের সঙ্গে ধর্মকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অপর পক্ষে, বিজ্ঞানীদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, তাই তাঁদের নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণের উপযোগী মনোভাব থাকতে হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে মস্তিষ্কের কাজকর্ম জানার যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে, তার গবেষণায় দার্শনিক ধারণার বাস্তবতা, চেতনা ও আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন প্রভৃতি জানার সুযোগ ঘটতে পারে। মোট কথা, বিজ্ঞানীদের সব সময় স্মরণে রাখতে হবে যে, তাঁদের সম্ভবত এমন কিছু ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে যা তাঁদের নিয়মকানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।" ['The Sunday Statesman, November 7, 1993]।

আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ধর্ম না হোক, দর্শনের একটা প্রবল ভূমিকা আছে বিজ্ঞানের গবেষণায় ও আবিষ্কারে। আর ধর্মকে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ না করে তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সহাবস্থান একান্ত জরুরি মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে। বিজ্ঞানে সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঈশ্বরকে না আনলেও চলে, কিন্তু ঈশ্বর অবশ্যই থাকতে পারেন। কারণ বিজ্ঞানের এই সৃষ্টিতত্ত্বে অজানা এমন কিছু আছে, যা জানতে বিজ্ঞানের দীর্ঘকাল লেগে যাবে, কিন্তু সেই ফাঁকটা ঈশ্বর দিয়ে পূরণ করাটা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। কিন্তু ঈশ্বর স্রষ্টা বা ব্যক্তিবিশেষ না হয়ে, যে ঈশ্বর মহাবিশ্ব হয়ে যান,

উপনিষদীয় সেই ঈশ্বরের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ থাকার কথা নয়। সামান্য যে পার্থক্যটুকু আছে, তা কেবল জড়-প্রকৃতির বা মহাবিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ে অন্য কিছু নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় বলেছিলেন, "বিজ্ঞান একের খোঁজ করে। সেই একের খোঁজ পেলে বিজ্ঞানের আর প্রগতির প্রয়োজন থাকবে না, কারণ সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। রসায়ন বিজ্ঞান যখন এমন একটি মূল কণার খোঁজ পাবে যা থেকে সব মৌল গড়া যেতে পারে, তখন তার আর এগোবার প্রয়োজন হবে না। পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন এমন একটি শক্তির খোঁজ পাবেন যা অন্য সব শক্তির প্রকাশ ঘটায় তখন পদার্থবিজ্ঞানের প্রগতিও থেমে যাবে।

এখন ধর্মবিজ্ঞানও যখন মৃত্যুময় বিশ্বে এক এবং অপরিবর্তনীয় এক জীবনের সত্তা খুঁজে পাবে তখন সে পূর্ণতা লাভ করবে। সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তাই সব মানবাত্মায় প্রকাশিত। সেই বহুত্ব ও দ্বৈতের ভেতর দিয়ে শাশ্বত ঐক্যে পৌঁছলে মানুষের ধর্মের আর এগোবার প্রয়োজন হবে না। এই ঐক্যই সব বিজ্ঞানের গন্তব্যস্থল।" [শিকাগো বক্তৃতা ঃ সেপ্টেম্বর 19,1893]।

সত্যিই তো, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য খোঁজাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এরই অনুসরণে আজ আমরা মৌলিক কণা 'কোয়ার্ক' [Quark] অবধি পৌঁছেছি। পদার্থের শেষতম উপাদান যে এই কোয়ার্ক তা এখনই বলা যাচ্ছে না। অতি সম্প্রতি কেয়ার্কের বিভাজ্যতা এবং তারও অন্য উপাদান পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। আবার মৌলিক বল হল তিনটি (1) তড়িচ্চুম্বকীয় বল, (2) মহাকর্ষীয় বল এবং (3) সবল মিথষ্ক্রিয়া বল। এদের একীভূত করার কাজ চলছে। এই ঐক্য খুঁজে পেলে বিজ্ঞানে পূর্ণতা আসবে।

আবার বিজ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মায় বিশ্বাস করে না। ধর্মীয় দর্শন করে। সাংখ্যদর্শন এক ধাপ এগিয়ে পদার্থ ও শক্তি যে একই তা বহুকাল আগেই বলেছে। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ, সাংখ্যের ভাষায় যা 'আকাশ' এবং বিশ্বেয় যাবতীয় শক্তি, সাংখ্যের ভাষায় যা 'প্রাণ'—এই দুটিই উৎপন্ন হয়েছে 'মহত্তত্ত্ব' থেকে। সুতরাং মূলতঃ এরা এক। তেমনি আত্মা ও পরমাত্মা নিয়ে বিজ্ঞানের যে বিভ্রান্তি তাও দূর হতে পারে জ্ঞানেরও ক্রমবিকাশ হচ্ছে তা বাস্তবে প্রমাণিত হতে থাকলে। দর্শন বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানসমষ্টির নাম দিয়েছে 'চিৎ'। দর্শন বলছে, ঈশ্বর হল ঃ

$$\sum_{0}^{\infty} \text{বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান} + \sum_{0}^{\infty} \text{বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ বা শক্তি}$$

$$= \text{চিৎ} + \text{মহাবিশ্ব।}$$

এই 'অসীম' [Inifinity] ব্যাপারটাই আমাদের অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় তাই অতীন্দ্রিয়তা চলে আসে। মহাবিশ্বের ব্যাখ্যায়ও তাই বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বিজ্ঞান বল ও কণা জগতের ঐক্য সাধন করতে পারলেও বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা এই ধর্মীয় দর্শনের অসঙ্গতি থেকেই যাবে। কোন কোন চিন্তাবিদ বলেন, ঈশ্বর ছাড়াই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয়ে সৃষ্টির উপাখ্যান নিশ্চয়ই পূর্ণতা লাভ করবে। ঈশ্বরের উপরোক্ত উপনিষদীয় ব্যাখ্যার পরেও কি ঈশ্বরকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন থাকে? 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা এই সমস্তই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের পার্থক্য খুব সামান্যই। আগেই বলেছি, এই পার্থক্য কেবল জ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ে। 'চিৎ' বা 'চৈতন্য' পদার্থ কিংবা শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকা নিয়ে। ঈশ্বরের আলাদা সত্তা কিংবা আলাদা অস্তিত্ব মানলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মীয় দর্শনের বিরোধ চিরকালই। কিন্তু যে ধর্মীয় দর্শন

সবকিছুর সমষ্টিকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করে তার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ থাকতে পারে না।

পদার্থবিজ্ঞান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ দু'রকম মতবাদ এসেছে। মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে আপেক্ষিকতাবাদ যা বলছে, কোয়ান্টামবাদ তার প্রায় বিপরীত কথা বলছে। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বেরিয়ে আসছে মহাবিশ্বের স্পন্দনশীলতার তত্ত্ব বা 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' [Pulsating Universe Theory]। উপনিষদীয় দর্শনও এই তত্ত্ব মানে। এই দর্শন মতে বিশ্ব একবার প্রসারিত ও একবার সংকুচিত হয় পর্যাবৃত্ত গতিতে। মহাবিশ্ব সসীম কিন্তু তার কোনও সীমানা নেই। একবার তা প্রসারিত হয়ে সসীম মহাবিশ্ব তৈরি করছে। আবার তা সংকুচিত হয়ে মহাজাগতিক অণ্ড বা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদ মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে যা বলছে তার সঙ্গে উপনিষদীয় দর্শনের মূলতঃ কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু হকিং পরিকল্পিত কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটিযুক্ত বিশ্বেও এরকম আবর্তনশীল বিশ্বের সম্ভাবনা থাকে, আবার চির-সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্বও আসতে পারে।

বেদান্তের ঈশ্বর বা পরব্রহ্মের কালাতীত হতে বাধা নেই, কারণ তিনি অমূর্ত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি হেঁয়ালী, কারণ তিনি কী তা কেউ জানে না। যাঁরা পরব্রহ্মে লীন হন তাঁরা তাঁকে জানতে পারেন না, কারণ তাঁরা ব্রহ্মই হয়ে যান। তাই সাধারণের কাছে ব্রহ্ম অবাঙ্‌মানসগোচরই থেকে যান। যেহেতু তিনি অসীম তাই তাঁর উপলব্ধি সম্ভব, তাঁকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, তিনি কী তা বলা অসম্ভব। বলা হয় তিনি এও নন, তাও নন, কোন কিছুই নন। কারণ অসীমের তুলনা তিনি নিজেই। এই নেতি [ন + ইতি] নেতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যোগ ও সমাধিতে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। চিনির পাহাড় থেকে পিঁপড়ের একদানা চিনি সংগ্রহের মতই যেন ব্রহ্মকে জানা হয় ওই যোগ-সমাধিতে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন আত্মদর্শনের এই তত্ত্ব ও পদ্ধতি বিশ্বাস নির্ভর, কিন্তু বিজ্ঞান নির্ভর করে গণিত, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির উপর। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও মনের যোগ বা সমাধি অবস্থার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি। বিজ্ঞানের এই অসাফল্য তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলেও, বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্বে অজ্ঞেয়তার হেঁয়ালী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই অজ্ঞেয়তাই আবার ধর্মে মৌলবাদের জন্ম দিচ্ছে, বাড়ছে অন্ধবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা।

আধুনিক বিজ্ঞানেও রয়েছে এই অজ্ঞেয়তার হেঁয়ালী। কোয়ান্টামবাদই তো অনেক ক্ষেত্রে জন্ম দিচ্ছে হেঁয়ালী, অতীন্দ্রিয়তাবাদ। মহাবিশ্বের আদিরূপ হিসাবে কোয়ান্টামবাদ যে অনন্যতা বা Singularity-র কথা বলে, তা কিন্তু আজও একটা হেঁয়ালী। আদিম বিশ্বে একটি বলের প্রতিসাম্য ভেঙে চারটি বল তৈরি হয়েছে, বিজ্ঞান তার কিছুটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। যে কেউ পরীক্ষা, গণিত এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ইলেকট্রো-উইক তত্ত্ব মিলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তিনটি মৌলিক বল আজও একীভূত হতে বাকী। বিজ্ঞানেও বহু মৌলবাদ আছে। আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টামবাদকে সনাতন পদার্থবিজ্ঞানীরা সহজে মেনে নেন নি। এমন কি আপেক্ষিকতাবাদের জনক মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন জীবনের শেষ দিন অবধি কোয়ান্টামবাদকে মেনে নিতে পারেন নি। আবার বিজ্ঞানের জানা তত্ত্ব থেকে বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের সমাধান হয় নি। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। তাই গ্র্যাভিটি ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয়ে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কোয়ান্টামবাদের প্রয়োগ করে অনেক সাফল্য পাওয়া গেলেও তিনটি মৌলিক বলের একীকরণে এই তত্ত্ব কতটা সফল হবে তা এখন দেখার। তবে বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের এতাবৎ সাফল্য দেখে মনে করছেন, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্ব [Quantum Gravity Theory] সাফল্য তো পাবেই, তার সঙ্গে ওই তিন মৌলিক বলের একীকরণ সমস্যাও দূর করবে এই তত্ত্ব।

আইনস্টাইনের অস্বীকার করা এই কোয়ান্টাম তত্ত্বকে স্বয়ং পেনরোজ [Roger Penrose]-ই বলেছেন অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে, "কোয়ান্টাম তত্ত্বের হেঁয়ালীর সমাধানে নতুন কোন উপযোগী তত্ত্বের আবিষ্কার প্রয়োজন।" [Emperor's New Mind]। তিনি আবারো বলেছেন "কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিতান্তই অসম্পূর্ণ তত্ত্ব। অজানা রহস্য যখন উঁকি দেয় তখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে তার নিখুঁত পরিমাপ চলে না।" 1980 সালে আরেক বিজ্ঞানী মারে গেলম্যান তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "এই [কোয়ান্টাম তত্ত্ব] রহস্যময় বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব, আমরা পুরোপুরি বুঝি না, অথচ আমরা তার ব্যবহার জানি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাফল্যের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করা গেলেও এর অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক দর্শন আজও অসম্পূর্ণ।" অণু জগতে এর এই সাফল্য অবশ্যই সীমিত। কারণ পেনরোজ আবারো লিখেছেন, "ক্রিকেট বলের মত বস্তুর বেলায় সাবেকি পদার্থবিজ্ঞানই প্রয়োজন। আমার মতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও সাবেকি পদার্থ তত্ত্বের মাঝামাঝি এমন এক নতুন তত্ত্ব থাকবে "যাতে কোয়ান্টাম জগৎ সাধারণ জগতে কখন কীভাবে পর্যবসিত হচ্ছে আমরা সেই তত্ত্বের সাহায্যে বুঝতে পারব।"

কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগের সাফল্য বহুক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হলেও তার অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক দর্শন এখন অসম্পূর্ণ রয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে ভরবেগ ও অবস্থান একই সঙ্গে সঠিকভাবে মাপা যায় না। মাপা যায় ওদের সম্ভাব্যতা। কোয়ান্টায় তত্ত্ব মতে বাস্তবতা শাশ্বত নয়, চেতনা নির্ভর। আইনস্টাইন তাঁর এক মানসিক পরীক্ষার ফল থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে, হয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব স্থানীয় হেতুবাদ মানবে, নতুবা তা পুরোপুরি অসম্পূর্ণ। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দার্শনিক ব্যাখ্যার স্ববিরোধিতা বুঝতে আইনস্টাইন-পোডোলস্কি-রোজেনের [সংক্ষেপে EPR] মানসিক পরীক্ষার একটি উদাহরণ কিছুটা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

মনে করা যাক, দুটি কণা 1 এবং 2 কাছাকাছি আছে। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তাদের অবস্থান হল যথাক্রমে q_1 এবং q_2। কণা দুটি গতিশীল। তাদের ভরবেগ p_1 ও p_2। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তার কারণে আমরা p_1 ও q_1 অথবা p_2 ও q_2 একই সঙ্গে নিখুঁতভাবে মাপতে পারি না।

কণা দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব $q = q_1 - q_2$ এবং কণা দুটি ভরবেগের যোগফল $p = p_1 + p_2$ অনিশ্চয়তা ছাড়া মাপা যায়। এখন কণা দুটি বিক্রিয়ার পর কণা-1 চেন্নাইয়ে এবং কণা-2 কলকাতায় পৌঁছালো। এতোদূরে থাকা এই দুটি কণা কোন কারণে প্রভাবিত করবে না—এরই নাম স্থানীয় হেতুবাদ। নিত্যতার নিয়মে দুটি কণার মোট ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে—তাদের দুটি অবস্থানে এই নিয়মই খাটবে। এখন চেন্নাইয়ের কণার ভরবেগ p_1 মেপে যদি পূর্বতন অবস্থানে যুক্ত ভরবেগ p থেকে তা বিয়োগ করা যায় তবে কোলকাতার কণার ভরবেগ $p_2 = p - p_1$ পাওয়ার কথা। একইভাবে চেন্নাইয়ের কণার অবস্থান q_1 মেপে দুটির আগের অবস্থানের ব্যবধান থেকে কোলকাতার কণার অবস্থান $q_2 = q_1 - q$ মাপতে গিয়ে অনিশ্চয়তাবাদের কারণে p_1 মাপে অনিশ্চয়তা থাকতে পরে, কিন্তু স্থানীয় হেতুবাদে আস্থা থাকলে q_1 মাপতে p_2-এর পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। তাহলে অনিশ্চয়তা ছাড়াই আমরা কোলকাতার কণা p_2 ও q_2 অনায়াসে মাপতে পারি। কিন্তু অনিশ্চয়তাবাদ অনুসারে চেন্নাইয়ের কণা মাপতে কোলকাতার কণাও প্রভাবিত হবে। EPR-এর সিদ্ধান্ত হল, হয় কোয়ান্টাম তত্ত্বে স্থানীয় হেতুবাদ স্বীকৃত নয়, যথেষ্ট দূরত্বে থেকেও কণা দুটির প্রভাব পরস্পরের ওপর থাকবে অথবা কোয়ান্টাম তত্ত্ব এমন অসম্পূর্ণ যে একসঙ্গে অবস্থান ও ভরবেগ মাপতে নতুন কোনও নিয়মের প্রয়োজন হবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা স্থানীয় হেতুবাদ ভেঙে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিশাল দূরত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে এটা ভাবতে পারেন না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব তাই অসম্পূর্ণ তত্ত্ব। EPR-এর মতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব সঠিক হলে দূরত্বে তার ক্রিয়া থাকবে। বোরের মতে অবশ্য কোলকাতার 2 নম্বর কণার অবস্থান ও ভরবেগ একসঙ্গে না মেপে তার বস্তুমুখী বাস্তবতা বলা যাবে না। আর তাই সেই

মাপে অনিশ্চয়তাবাদ মানতে হবে। আইনস্টাইন বলেছেন হেতুবাদ নস্যাৎ করা একেবারেই অবাঞ্ছিত, তাই কোয়ান্টাম তত্ত্বই হল এক অসম্পূর্ণ তত্ত্ব।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিশ্ব বস্তুমুখী নয়, তার কোন নিশ্চিত অবস্থা নেই, কিংবা অস্থানীয় কোন দূরবর্তী ক্রিয়ায় বিশ্ব বর্তমান। এই তত্ত্বে দেখা যায় যে, মানুষের বোধগম্যতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার বাইরে কি তাই কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্য রয়েছে, যার খবর বিজ্ঞান পাচ্ছে না? তা হলে কি সেখানে ঈশ্বরীয় সত্তা চলে আসছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে বিজ্ঞানের নতুন কোনও তত্ত্বের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। 1930 সালের 14ই জুলাই কাপুতের আইনস্টাইনের বাড়ীতে সেই বিখ্যাত কথোপকথনের সময় আইনস্টাইন বলেছিলেন, "Even in our everyday life we feel compelled to ascribe a reality independent of man to the objects we use. We do this to connect the experiences of our senses in a reasonable way. For instance, if nobody is in this house, yet the table remains where it is." রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বললেন, "Yes, it remains outside the individual mind but not outside the universal mind. The table which I perceive is perceptible by the same kind of consciousness which I possess"। কবির মতে ব্যক্তিচেতনা এবং বিশ্বচেতনা একাকার। কিন্তু এই বিশ্বচেতনার স্বরূপটাই আমাদের বিজ্ঞানের আজও অজানা। শিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দ যে অদ্বিতীয় সত্তার কথা বলেছিলেন, তার সঙ্গে এই বিশ্বচেতনার সম্পর্ক রয়েছে কি? আগামীদিনের বিজ্ঞান হয়তো এর উত্তর দিতে পারবে। পারবে বাস্তবতা ও চেতনা নিয়ে কোয়ন্টাম তত্ত্বের সমস্যার, এমন কি হয়ত স্রষ্টা ও সৃষ্টির উপরেও আলোকপাত করতে পারবে।

আপাতত ধর্মীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে অন্ততঃ দুটো মিল বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। প্রথম সাদৃশ্য হল ধর্ম বা ধর্মীয় দর্শন এক স্রষ্টা বা ঈশ্বর থেকে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে, বিজ্ঞান সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে একের খোঁজ করে চলে। উভয়েই একক সত্তা স্বীকার করে। দ্বিতীয় সাদৃশ্য হল, বিজ্ঞানে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বের কথা বলে। উপনিষদীয় দর্শনও বলে স্পন্দনশীল বিশ্বের কথা। অর্থাৎ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞান এক্ষেত্রে এক কথাই বলছে। তবে চিরসম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বেরও কথা বলেছে বিজ্ঞান। তার কথায় একটু পরেই আসছি।

মহাবিশ্বের গঠনে বলের প্রভাব অপরিহার্য। মহাবিশ্বের মহাপ্রসারণ কিংবা তার মহাসংকোচন সবই নির্ভর করে বলের উপর। দৈর্ঘ্য এবং সময়ের ক্ষুদ্রতম মান যথাক্রমে প্ল্যাঙ্কদৈর্ঘ্য এবং প্ল্যাঙ্কসময়। আর দীর্ঘতম সময় হল মহাবিশ্বের বয়স ও দৈর্ঘ্য হল হাবল ব্যাসার্ধ। এগুলির উপর মহাকর্ষের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। সব পদার্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বল বা ক্ষেত্র—মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। পদার্থের বাইরের কিছু সাধারণ ধর্ম জানা যায় তার ভর, আয়তন, জীবনকাল ইত্যাদির সাহায্যে। অনুরূপভাবে মহাবিশ্বের স্থিরাংকের মান থেকে আমরা মহাবিশ্বের হালচাল বুঝতে পারি। জানতে পারি বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা থেকে তার ভবিষ্যৎ। মৌলিক স্থিরাঙ্কগুলির তালিকা একটু পরেই দেওয়া হল।

মহাবিশ্ব ও তার উপাদান গড়ে ওঠার পিছনে এই স্থিরাঙ্কগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। এই স্থিরাঙ্কসমূহের ভিত্তিতে মহাবিস্ফোরণের এলোমেলো অবস্থা থেকে একটা সুশৃঙ্খলার, সাজানো মহাবিশ্বের কাঠামো পাওয়া যায়। এর ফলে এই স্থিরাঙ্কগুলির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়, এগুলির

থেকে একটা আভাস পাওয়া যায় যে, শুধু মানুষের জন্যই যেন এই বিশাল মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে। মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশের ধারা থেকে এটা প্রমাণিত যে, কতকগুলি খণ্ড খণ্ড উপাদান জুড়ে মহাবিশ্বের বিকাশ হয় নি, আদিম সুষম মহাবিশ্ব খণ্ড খণ্ড হয়েও নয়। এক শ্রেণীর পদার্থ থেকে অন্য শ্রেণীর পদার্থ যেন ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টির পিছনে জটিলতর শৃঙ্খলার আভাস রয়েছে। গ্রহজগৎ থাকলেই যে তা জীবের বাসের উপযোগী হবে তা নয়। উপরোক্ত স্থিরাংকগুলির মানের স্থিরতা, মহাবিশ্বের মৌলিককণার আনুপাতিক হারের বর্তমান মানের নির্দিষ্টতা ইত্যাদি এমন অনেক শর্ত রয়েছে যেগুলি লঙ্ঘিত হলে মানুষের অস্তিত্ব থাকে না। এই সব শর্ত কেন আছে বা কেমনভাবে পূরণ হচ্ছে তাও মানুষের কাছে, বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়কর হয়ে আছে। বহু প্রশ্নের জবাব আজও পাওয়া যায় নি। মৌলিক ও লব্ধ স্থিরাঙ্কগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

● স্থিরাঙ্কের তালিকা ●

মৌলিক স্থিরাংক

নাম	প্রতীক	আন্তর্জাতিক এককে মান	↓
প্রোটনের আধান	e	1.60×10^{-19}	c
প্ল্যাঙ্ক স্থিরাংক	h	6.63×10^{-34}	js
আলোর গতিবেগ	C	3.00×10^{8}	m/s
মহাকর্ষীয় স্থিরাংক	G	6.67×10^{-11}	Nm^2Kg^{-2}
প্রোটনের স্থিরভর	m_p	1.67×10^{-27}	Kg
ইলেকট্রনের স্থিরভর	m_e	9.1×10^{-31}	Kg
ক্ষীণ বলের স্থিরাংক	g_w	1.43×10^{-62}	$J^3S^4Kg^{-2}m^{-1}$
তীব্র বলের স্থিরাংক	g_s	15	$J^{1/2}M^{1/2}$
হাবল স্থিরাংক	H	2×10^{-18}	s^{-1}
ফোটন বেরিয়ন অনুপাত	S	10^{9}	
বিদ্যুৎশীলতা	ε	$8.85\times10^{\cdot 12}$	$Fm^{\cdot 1}$
বোলৎজমান স্থিরাংক	k	1.38×10^{-23}	JK^{-1}
মহাজাগতিক স্থিরাংক	$\wedge$	$<10^{-53}$	m^{-2}

লব্ধ স্থিরাংক

নাম	প্রতীক	আন্তর্জাতিক এককে মান
প্ল্যাঙ্কদৈর্ঘ্য	$\left(\frac{Gh}{2\pi C^3}\right)^{1/2}$ l_p	1.62×10^{-35} m
প্ল্যাঙ্কসময়	$\left(\frac{Gh}{2\pi C^5}\right)^{1/2}$ t_p	5.39×10^{-44} s

নাম	প্রতীক	আন্তর্জাতিক এককে মান	
প্ল্যাঙ্কভর	$\left(\frac{hC}{2\pi G}\right)^{½} m_p$	$.18\times10^{-8}$	Kg
প্রোটন কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য	$\left(\frac{h}{m_pC}\right) l_p$	1.32×10^{-15}	m
প্রোটন (নিউক্লীয়) কম্পটন সময়	$\left(\frac{h}{m_pC^2}\right) t_N$	4.41×10^{24}	s
হাবল সময়	$(H^{-1})\ t_H$	5.00×10^{17}	s
হাবল ব্যাসার্ধ	$(CH^{1})\ r_H$	1.5×10^{26}	m
বোর ব্যাসার্ধ	$\left(\frac{4\pi \in h^2}{e^2 m_e}\right) \alpha_o$	5.29×10^{-11}	m
বিকিরণ স্থিরাংক	$\left(\frac{\pi^2 k^4}{15C3h^{-3}}\right) \sigma$	7.56×10^{-16}	
তড়িৎ চুম্বকীয় সূক্ষ্মগঠন স্থিরাংক	$\left(\frac{e^2}{4\pi \in \bar{h} C}\right) \alpha$	7.30×10^{-3}	
ক্ষীণ নিউক্লীয় সূক্ষ্মগঠন স্থিরাংক	$\left(\frac{g_W m_e{}^2 C}{h^{-3}}\right) \alpha_w$	3.05×10^{-12}	
মহাকর্ষীয় সূক্ষ্মগঠন স্থিরাংব	$\left(\frac{Gm_p{}^2 C}{h}\right) \alpha_G$	5.90×10^{-39}	

c—কুলম্ব, j—জুল, s—সেকেন্ড, m—মিটার, N—নিউটন Kg—কিলোগ্রাম, F—ফ্যারাড, K—কেলভিন, C—আলোর গতিবেগ।

তালিকা ঃ 24

মহাবিশ্বের স্থিরাঙ্কগুলি নানা পরীক্ষায় অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। G-এর মান কেন বর্তমান স্থিরাঙ্কে বাঁধা তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু মহাবিশ্বের পরিবেশ, আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে—কারণ এই স্থিরাঙ্কগুলি আকস্মিক হলেও একসুরে বাঁধা। তা না হলে মহাবিশ্ব হয়ত সৃষ্ট হত, *কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব থাকতো না। এই বিশ্বের স্থিরাঙ্কগুলি যেন মানুষমুখী।* মহাবিশ্বের অণু-পরমাণু *থেকে ছায়াপথ—বড় ও ছোট সব বস্তুই স্থিরাঙ্কের সঙ্গে যেন একসুরে বাঁধা।* বিজ্ঞানীরা বলছেন, *মহাবিশ্ব যেন এক রঙ্গমঞ্চ, যেখানে প্রাকৃতিক বল, মৌলিক কণা, বস্তুজগৎ যেন বহুকাল ধরে ঐকতান বাজিয়ে চলেছে। মানুষ সেই রঙ্গমঞ্চে এসেছে অনেকটা পরে।* কনসার্ট বাজছিল, কুশীলব হিসাবে *মানুষের সেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব অনেকটাই আধুনিক।* সে এসেছে অনেকটা পরে। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ জানতে মহাবিশ্বের এই স্থিরাঙ্কগুলির একসূত্রে বাঁধা পড়ার কথা জানার প্রয়োজন।

বিশ্বের গঠনে অসম্পর্কিত বৈশিষ্টগুলির একটা মিল আকস্মিক বলে মনে হলেও এই মিলের উৎস যেন আপাত কিছু সমাপতনের সমাহার। বিজ্ঞানীরা বলছেন ঃ

"মহাজগৎ তত্ত্বে মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ, গঠন ও সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায় , কোন একটি নির্ধারিত পরিকল্পনায় যে বিশ্বের অনুশাসন চলছে, তা যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবু প্রচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, বিজ্ঞানের নিয়মকানুন যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে আকস্মিকতা আছে—যেমন 10^{40} সংখ্যা—এটি যেন একটি যাদুসংখ্যা। এই সংখ্যা মহাবিশ্বের অনেক উপকরণের অনুপাত থেকেই পাওয়া যাবে—তার কয়েকটির তালিকা দেখা যাক ঃ

তড়িৎ চুম্বকীয় বল / মহাকর্ষ বল	$\sim 10^{40}$
হাবল ব্যাসার্ধ / নিউক্লিওন দৈর্ঘ্য	$\sim 10^{40}$
নক্ষত্রের প্রোটনসংখ্যা	$\sim 10^{60} = (10^{40})^{3/2}$
বিশ্বের বয়স / নিউক্লীয় সময়	$\sim 10^{40}$
নিউক্লীয় সময় / প্ল্যাঙ্ক সময়	$\sim 10^{20} = (10^{40})^{\frac{1}{2}}$
বিশ্বের বয়স / প্ল্যাঙ্ক সময়	$\sim 10^{60} = (10^{40})^{\frac{3}{2}}$

এসব ছাড়াও এরকম সমাপতন আছে, যেমন,

মহাবিশ্বের ফোটন ও পদার্থের অনুপাত S	$\sim 10^{10} = (10^{40})^{\frac{1}{4}}$
ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা ~ মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা	$\sim 10^{10} = (10^{40})^{\frac{1}{4}}$

10^{40} সংখ্যা ও তার বিভিন্ন ঘাত থেকে পাওয়া সংখ্যার সঙ্গে মহাবিশ্বের উপাদান আয়তন ও গতিবিধির সময় নিয়ে অনেক ঘটনার যোগ আছে।

আবার বলা দরকার যে, সূক্ষ্ম হিসাবে সব সময় 10^{40} সংখ্যা, নয় তার দু-একটি ক্রম কমবেশি মানের সংখ্যা পাওয়া যায়। সংখ্যার বিপুলত্বে এই কমবেশি ভগ্নাংশ হিসেবে নগণ্য ধরা যেতে পারে। আগ্রহী বুদ্ধিমান পাঠক স্থিরাংকের সারণী থেকে নিখুঁত সংখ্যা অবশ্যই হিসেব করে নিতে পারেন, তবে সেই সংখ্যা থেকে বিচ্যুতিটুকু নগণ্য ধরে 10^{40} সংখ্যাকে স্থূলত গুরুত্ব দেওয়া যায়।"

মহাবিশ্বের প্রোটন সংখ্যা 10^{40}। আবার নিউক্লীয় এককে মহাবিশ্বের বয়সও 10^{40}। পল ডিরাক মনে করতেন, এই সমাপতন নেহাৎই আকস্মিক নয়। এই সমাপতনে মহাজাগতিক তত্ত্ব এবং মৌলিক

কণা তত্ত্বের গভীর সম্পর্ক নিহিত আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই সংখ্যা যেন অনেকটাই হেঁয়ালী। সমাধানের খোঁজ চলছে। প্রকৃত ব্যাখ্যা আজও অজানা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, G-এর মান মহাকাশ বা দেশের [Space] প্রসারণের সঙ্গে কমে যায়। আবার হাবল ব্যাসার্ধ প্রসারণের সঙ্গে বাড়ে। ফলে, তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও মহাকর্ষের অনুপাত প্রসারণের সঙ্গে বেড়ে যাবে। নিউক্লীয় আয়তনের এককে বিশ্বের আয়তনও বেড়ে যাবে। G-এর মান পরিবর্তিত হতে পারে, কোনও পরীক্ষায় এরকম আভাস পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্তটি তাই বিতর্কিত। বিজ্ঞানীরা বলছেন ঃ

মহাবিশ্বের কোন কোন মডেলে মহাবিশ্বে প্রসারণরত দেশ ও কাল সসীম, তাই মহাজাগতিক সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যেরও একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে। বদ্ধ বিশ্ব হল ভাল উদাহরণ যেখানে প্রসারণ থেকে সংকোচন ঘটে। সংকোচনের শুরুতে মহাবিশ্বের যে সীমান্ত তা সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট মান হিসাবে ধরে নিউক্লীয় এককে 10^{40} সংখ্যাটি পাওয়া যেতে পারে। হাবল ব্যাসার্ধের হ্রাস-বৃদ্ধিতে 10^{40} সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য অন্য কারণ খুঁজতে হয় না। মহাবিশ্ব মুক্ত অথবা বদ্ধ—এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। তাই মহাবিশ্বের এই মডেল নিয়েও সংশয় থাকছে। আবার বৃহৎ সংখ্যার সমস্যার সমাধান হয় নি।

প্রসারণশীল মহাবিশ্ব যখন স্বীকৃত, মহাকর্ষীয় স্থিরাংক যদি দেশকাল ভেদে স্থির থাকে তবে 10^{40} সংখ্যার অনুষঙ্গ হাবল ব্যাসার্ধ বেড়ে চলার ঘটনা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? 1961 খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ডিকে এই ব্যাখ্যায় মানুষমুখী তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে অতীতে হাবল ব্যাসার্ধ যখন কম ছিল তখন নিউক্লীয় এককে তার মান নিশ্চয়ই কম ছিল, তবে তা প্রত্যক্ষ করার মত জনপ্রাণী তো মহাবিশ্বে ছিল না। ভবিষ্যতে যখন এই মান 10^{40} থেকে বাড়বে তখন মহাবিশ্বে থাকবে শুধু মৃত নক্ষত্রের দল, থাকবে না কোন গ্রহ-জগৎ; তাই সংখ্যাটি কতটুকু বাড়ল তা দেখার কেউ থাকবে না।

মহাবিশ্বের ইতিহাসের তাই 10^{40} সংখ্যা এই ইঙ্গিতই দেয় যে, এই সংখ্যার জন্য হাবল ব্যাসার্ধ যতটা পাওয়া প্রয়োজন সেই ব্যাসার্ধের আয়তনের বিশ্বে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর অবস্থান সম্ভব। 10^{40} সংখ্যার অনুষঙ্গী এই ব্যাসার্ধ আকস্মিক নয়, মানুষের আবির্ভাব কালের সঙ্গে তার সমাপতন ঘটেছে।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষের অস্তিত্ব মহাবিশ্বের গঠন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। দর্শক মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করছে মহাবিশ্বের সীমাবদ্ধ কিছু প্রাচলের [Parameter] যুক্তফলের উপর। আমাদের অস্তিত্বই ঠিক করে দেয় যে, আমরা কী ধরনের বিশ্ব দেখবো। আমরা আছি, তাই মহাবিশ্বের ফোটন ও প্রোটনের অনুপাত এই রকম আছে। মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় আছে বলেই মানুষ আছে। কিংবা বলা যায় মানুষ আছে, তাই মহাবিশ্বও আছে।

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীরা দু'রকম কথা বলছেন। এই দু'মতের কারণ হল, একদল বিজ্ঞানীর মতে মহাবিশ্ব বদ্ধ এবং অপরদল মনে করেন মহাবিশ্ব মুক্ত। যাঁরা বদ্ধ মহাবিশ্বে বিশ্বাস করেন, তাঁরা দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের প্রসারণ হার ক্রমশঃ কমছে। এর কারণ ছায়াপথ ও মহাজাগতিক পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল। এই বল যদি আরও বাড়তে থাকে তবে একদিন ওই প্রসারণ থেমে গিয়ে মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হবে। সেই মহাসংকোচনে মহাবিশ্বের আয়তন ছোট হতে হতে একদিন আবার তা অনন্যতায় [Singularity] পর্যবসিত হবে। এই অনন্যতা 'নগ্ন অনন্যতা'

[Naked Singularity]। আবার একদিন এই অনন্যতা থেকে মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হবে নতুন মহাবিশ্ব। এই অনন্যতা অব্যাখ্যাত, কারণ মহাবিশ্বের ভৌত নিয়মগুলি সেখানে খাটে না। এইভাবে অনন্তকাল ধরে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়ে চলেছে এই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের আয়ু যেন অনন্ত। সে একবার প্রসারিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট সীমায় উপস্থিত হচ্ছে, তারপর শুরু হচ্ছে তার মহাসংকোচন। আবার মহাসংকোচন শেষে তার রূপান্তর হচ্ছে অনন্যতায়, যেখানে দেশকালের নিয়ম খাটে না। আবার ঘটছে মহাবিস্ফোরণ এবং বিশ্ব আবার বিস্ফোরিত হচ্ছে, কিংবা বলা যায় অনন্যতায় বিস্ফোরণ ঘটছে এবং আবার বিশ্ব ক্রম-প্রসারিত হয়ে, ওই নির্দিষ্ট সীমা অবধি প্রসারিত হয়ে, তারপর আবার সংকুচিত হচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে অনন্যতার দিকে। এইভাবে সংকোচন-প্রসারণ চলছে অনন্তকাল ধরে। এই মতে মহাবিশ্ব শাশ্বত, অনন্তকাল ধরে সংকোচন ও প্রসারণশীল। এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 'দোলন তত্ত্ব' (Oscillating Theory) নামে খ্যাত। আধুনিক বিজ্ঞান এই তত্ত্বের নাম দিয়েছেন 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব' [Oscillating Theory]।

এই মতে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর দল বলছেন যে, মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স হল 1800 কোটি [18×10^9] বছর থেকে 2000 কোটি বছর [20×10^9]। অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণ হয়েছিল এখন থেকে প্রায় 2000 কোটি বছর বা 2×10^{10} বছর আগে। তারপর তার প্রসারণ চলছে 2000 কোটি বছর ধরে। এই প্রসারণ চলবে আরও প্রায় 2000 কোটি বছর। তারপর মহাবিশ্ব তার নির্দিষ্ট শেষ সীমায় এলে শুরু হবে মহাসংকোচন। সেই মহাসংকোচনে মহাবিশ্ব রূপান্তরিত হবে অনন্যতায় বা সিঙ্গুলারিটিতে। এইভাবে অতীতে বহুবার মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েছে আবার মহাসংকোচনে তার আদি রূপে ফিরে গেছে। মহাবিশ্বের সংকোচনের শুরু থেকে তার অনন্যতায় ফিরে যাওয়ার সময়কালও 4000 কোটি বছর বলে মনে করা হয়। স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্বে মহাবিশ্বের প্রসারণকাল এবং সংকোচনকাল একই সমান।

এই বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আবার মনে করেন, যেহেতু আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে অনন্যতায় বা সিঙ্গুলারিটি বিন্দুতে কোন নিয়ম-কানুনই খাটে না, তাই অন্যনতা থেকে আবার মহাবিশ্ব গড়ে উঠবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ফ্রিডম্যান-মডেলের এক বিশেষ অবস্থায় এই রকম বিবর্তনশীল মহাবিশ্বের ধারণা পাওয়া যায়। ফ্রিডম্যান-আইনস্টাইনের মূল সমীকরণগুলির সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্বলোকের কয়েক রকম আকৃতি, গঠন ও বিবর্তন ধারা কল্পনা করা সম্ভব। বিশ্ব সসীম হতে পারে, আবার অসীমও হতে পারে। হতে পারে চিরসম্প্রসারণশীল কিংবা চির-স্পন্দনশীল। চির-স্পন্দনশীল হলে তার ভবিষ্যৎ হল প্রসারণ শেষে মহাসংকোচনের মধ্য দিয়ে অনন্যতায় পর্যবসিত হওয়া এবং আবার মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বিকশিত মহাবিশ্বে রূপান্তরণ।

অন্য একদল বিজ্ঞানীর মতে, এই মহাবিশ্ব চির-প্রসারণশীল। তার সম্প্রসারণ 2000 কোটি বছর আগে শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার এই প্রসারণ চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। তার কোনও নির্দিষ্ট শেষ সীমা বলে কিছুই নেই যার পর নাকি মহাসংকোচন শুরু হবে বলে অপর দল মনে করেন। সুতরাং এই সব বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ হলো ক্রমাগত প্রসারণ। মহাবিশ্বের তখনকার অবস্থা হবে কিছুটা অনুমান নির্ভর। নক্ষত্রগুলি একে একে উষ্ণতা বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মৃত নক্ষত্রেরা থাকবে মহাবিশ্বের মহাকাশে। অনেক নক্ষত্র কৃষ্ণবিবর বা কৃষ্ণগহ্বর হয়ে যাবে। তারা গ্যাস ও ধূলিকণা গ্রাস করে আয়তনে স্ফীত হবে। আরও প্রসারণের ফলে তারা ঠাণ্ডা হতে থাকবে। আরও পরে কৃষ্ণবিবরগুলিও ধীরে ধীরে উবে যাবে, রেখে যাবে কেবলই বিকিরণ। চির-সম্প্রসারিত

বিশ্বে শেষ পর্যায়ে থাকবে অজস্র বিকিরণ এবং পদার্থ হিসাবে থাকবে কেবল ফোটন, নিউট্রিনো, গ্রাভিটন এবং সম্ভবত কিছু ইলেকট্রন ও পজিট্রন। অনন্তকাল ধরে বিশ্ব প্রসারিত হতে থাকলে একসময় পাওয়া যাবে বিকিরণ ও কণার মৃত বিশ্ব। এই মৃত বিশ্বই হয়ত অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে।

চিরসম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্বে এক সময় বিশ্ব হবে মৃত—বিকিরণ ও কণার সমষ্টি। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ হবে এক মৃত বিশ্ব যার শবদেহ হবে বিকিরণ ও কণা দিয়ে তৈরি। এই পরিণতি নিয়েই মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। এই তার ভবিতব্য, এই তার ভবিষ্যৎ। একালের অধিকাংশ বিজ্ঞানী মহাবিশ্বের এই পরিণতিতে বিশ্বাসী। অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য স্পন্দনশীল বিশ্বের হদিশ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখনও। কারণ, মহাবিশ্ব স্পন্দনশীল না চিরসম্প্রসারণশীল তা এখনও নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় নি। তর্ক-বিতর্ক চলছেই।

প্রসারণশীল মহাবিশ্বে কোন দর্শক বা পর্যবেক্ষক দেখবে অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডগুলি তার থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরত্ব যত বেশি হবে সরণও তত বেশি হবে। সেই সরণের পরিমাপ করা যাবে ডপলার সরণজনিত আলোর বর্ণালির লাল সরণে। এই সরণ থেকে সরণের গতিবেগও অঙ্ক কষে বের করা যায়। দূরত্ব যত বাড়বে ব্রহ্মাণ্ডের সরণের গতিবেগও তত বাড়বে। এই বেগ বাড়তে বাড়তে এক সময় তা আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদে আলোর গতিবেগ হল গতির শেষ সীমা। দূরের ব্রহ্মাণ্ড বা কোয়াসারগুলি আলোর কাছাকাছি গতিবেগে প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু কখনই আলোর গতিবেগের সমান বা বেশি হতে পারবে না। তাই মহাবিস্ফোরণে উদ্ভূত বিশ্বের অবস্থা হবে সসীম কিন্তু সীমানাহীন। তার কিনারা হবে সেই সব ব্রহ্মাণ্ড বা কোয়াসার যার গতিবেগ আলোর কাছাকাছি, কিন্তু সমান বা বেশি নয়। কারণ তত্ত্ব মতে তার বাইরে আর কিছুই দেখা যায় না। মহাবিশ্বের সেই কিনারা 1500 কোটি [1.5×10^{10}] আলোকবর্ষ দূরত্বের হবে, যেখানে ব্রহ্মাণ্ড কিংবা কোয়াসার আলোর বেগের শতকরা 90 ভাগ বা তার বেশি গতিবেগ নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তার পরের অবস্থা কী, তা অব্যাখ্যাত। আবার বিশ্ব চিরসম্প্রসারণশীল হলে 1500 / 1600 কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের পরে ব্রহ্মাণ্ড বা কোয়াসারদের অবস্থা কী হচ্ছে তা অজানা।

মহাবিশ্বে সবচেয়ে প্রাচীন নক্ষত্রগুলির বয়স নির্ধারিত হয়েছে 1৪00 কোটি বছর। অ্যালান স্যান্ডেজ 1975 সালে বিশ্বের প্রসারণকাল নির্ধারণ করেছেন ওই 1800 কোটি বছর। তবে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা বলছেন মহাবিস্ফোরণের কাল প্রায় 2000 কোটি [2×10^{10}] বছর আগের কোনও সময়।

এখন কোয়াসারের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে 1800 কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আপাতত মহাবিশ্বের শেষসীমা তাই 1800 কোটিআলোকবর্ষ। এই সীমায় কোয়াসারের সরণের গতিবেগও প্রায় আলোর বেগের 90% ভাগ। এই বেগে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যে হাবল ব্যাসার্ধের কথা বলেছি, সেই ব্যাসার্ধ মহাবিশ্বের এই কিনারা ব্যাসার্ধের সমান। তবে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ একটু আলাদা হবে। দেশকালের বক্রতার জন্য মহাজাগতিক ঘনত্বের উপর এই ব্যাসার্ধের মান নির্ভর করে। 2000 কোটি আলোকবর্ষ দূরে গতিবেগ আলোর গতিবেগের প্রায় সমান হয়ে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে বা দাঁড়াচ্ছে তা অজানা। বিজ্ঞানীরা বলেন, তা হবে একেবারে কাল্পনিক। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব নিশ্চিত উত্তর দিতে পারে না, একদিন মহাসংকোচন শুরু হবে কি না। তবে এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছেও, যার সাহায্যে বিশ্ব স্পন্দনশীল কিংবা চিরপ্রসারণশীল তা বলা

যায়। আগেই বলেছি, এ নিয়েও বিতর্ক আছে। একদল মনে করেন বিশ্ব স্পন্দনশীল, মহাবিশ্ব তাই বদ্ধ। অন্য দল মনে করেন মহাবিশ্ব মুক্ত, চির সম্প্রসারণশীল। তার শেষ পরিণতি হবে কিছু কণা ও কিছু বিকিরণ। সঠিক তথ্য জানতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের আশা নিয়ে।

মহাবিশ্ব যদি বদ্ধ হয় তবে তার স্পন্দনশীলতা চলতেই থাকবে অনন্তকাল। এখন সে প্রসারিত হচ্ছে, কিছুকাল পরে তার মহাসংকোচন ঘটবে। আবার মহাসংকোচন শেষ করে আবার ঘটবে তার মহাপ্রসারণ। এইভাবে মহাবিশ্বের সংকোচন ও প্রসারণ চলবে পর্যাবৃত্ত গতিতে অনন্তকাল ধরে বিরামবিহীন লয়ে।

মহাবিশ্ব বদ্ধ হবে যদি তার 'সন্ধি ঘনত্ব' [Critical Density] মহাবিশ্বের পদার্থের ঘনত্বের সমান বা বেশি হয়। সন্ধি ঘনত্ব হল, মহাজাগতিক পদার্থের যে ঘনত্ব হলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ ও তার প্রসারণ এক সময় বন্ধ হবে। এই ঘনত্বই সন্ধি ঘনত্ব। মহাবিশ্বের পদার্থের ঘনত্ব সন্ধি ঘনত্বের সমান বা, বেশি হলে মহাবিশ্বের স্বরূপ হবে 'স্পন্দনশীল'। যদি মহাবিশ্বের পদার্থ ঘনত্ব, সন্ধি ঘনত্বের থেকে কম হয় তবে মহাবিশ্ব হবে চির-সম্প্রসারণশীল।

আইনস্টাইন-দ্য-সিটার মডেল অনুসারে মহাবিশ্বের সন্ধি ঘনত্ব হবে মহাবিশ্বের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় 10^{-29} গ্রাম অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 10টি হাইড্রোজেন পরমাণু। তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্ধি ঘনত্বের একটা সূত্র বের করেছেন।

সূত্রটি হল ঃ

$$\text{সন্ধি-ঘনত্ব} = \frac{3H^2}{8\pi G}$$

যেখানে,

H = হাবল স্থিরাঙ্ক
G = মহাকর্ষীয় স্থিরাঙ্ক

হাবল স্থিরাঙ্কের মান 50 কিলোমিটার / সেকেন্ড / মিলিয়ান পারসেক [Parsec] ধরলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এই মান 4.7×10^{-30} বা 0.47×10^{-29} গ্রাম দাঁড়ায়। তা হলে 0.47×10^{-29} গ্রাম ঘনত্বের চেয়ে মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি কম হয় তবে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। এই মানের সমান কিংবা বেশি যদি মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব হয় তবে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ এবং স্পন্দনশীল। বিজ্ঞানীর হিসাব করে দেখেছেন, মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব সন্ধি-ঘনত্বের প্রায় এক দশমাংশ অর্থাৎ 0.47×10^{-30} গ্রাম। আবার বর্তমান মহাবিশ্বের ভারী হাইড্রোজেন ঘনত্ব থেকে হিসাব করে জানা গেছে বিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব সন্ধি-ঘনত্বের অনেক কম। সুতরাং এর থেকে সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় মহাবিশ্ব চির-সম্প্রসারণশীল। তার ভবিষ্যৎ শেষ হবে অনন্তকালের প্রসারণে।

আবারো বলি, বিশ্বের পরিণতি নির্ভর করবে তার মোট ভরের উপর, অর্থাৎ তাতে কতটা বস্তু আছে তার উপর। বস্তুভর যদি যথেষ্ট হয় তবে শেষ অবধি মহাকর্ষই প্রাধান্য পাবে এবং এক সময় মহাবিশ্ব প্রসারণ থামিয়ে সংকুচিত হতে শুরু করবে। কিন্তু যদি বস্তুভর কম হয় অর্থাৎ সন্ধি-গনত্বের চেয়ে মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব কম হয় তবে অনন্তকাল ধরে বিশ্বের প্রসারণ চলবে। নানান পর্যবেক্ষণ ও হিসাব-নিকাশ করে বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলছেন, মহাবিশ্ব হল চির সম্প্রসারণশীল।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই মুহূর্তে একটা বিশাল ভরের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। মহাবিশ্ব যেন অনেকটাই সমতল [Flat]। তার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোনও বক্রতা যেন নেই। বিজ্ঞানীরা তাই মনে করছেন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চলবে অনন্তকাল। তার ভবিষ্যৎ পরিণতি হবে ফোটন, নিউট্রিনো, গ্র্যাভিটন এবং কিছু ইলেকট্রন ও পজিট্রন এবং রাশি রাশি বিকিরণ। এই রকম মৃত এক মহাবিশ্বই বর্তমান মহাবিশ্বের ভবিতব্য। এই মৃত বিশ্বই অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে। কবির ভাষায় সেদিন 'শক্তির স্পন্দন চলবে আকাশে আকাশে। জ্বলবে না কোথাও আলো।' চির সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের শেষ পরিণতির স্তরগুলির সময়-সীমা বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন। এই সব বিজ্ঞানীদের মতে ঃ

এখন থেকে

10^{12} বছর পরে	মহাবিশ্বের সব গ্যাস শেষ হবে।
10^{25} বছর পরে	মহাবিশ্বের প্রায় সব বস্তু কৃষ্ণ গহ্বরে আবদ্ধ হবে। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে যাবতীয় পদার্থ 'Super Massive Black Hole' হিসাবে জমা হবে।
10^{32} বছর পরে	প্রোটিন ক্ষয় হতে শুরু করবে। পরিণত হবে ফোটন, ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রনে। আর থাকবে অজস্র বিকিরণ।
10^{67} বছর পরে	কৃষ্ণগহ্বরগুলি বাষ্পীভূত হতে থাকবে। উৎপন্ন হবে কণা ও বিকিরণ।
10^{100} বছর পরে	ওই Super Massive Black Hole পুরোপুরি উবে যাবে। পড়ে থাকবে রাশি রাশি ফোটন এবং মৌলিক কণাসমূহের অনন্ত সমুদ্র [Diffuse sea of Photons and Fundamental Particles]

চিরসম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর সমর্থন পেলেও, কিছু বিজ্ঞানী কিন্তু হাল ছাড়েন নি। তাঁর মনে করেন, মহাবিশ্বের ঘনত্ব নির্ণয় সঠিক হচ্ছে না। আর সেই কারণেই ওই ঘনত্ব সন্ধি-ঘনত্বের চেয়ে কম হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের মতে অদৃশ্য নিউট্রিনো এতো বিপুল সংখ্যায় থাকতে পারে যাদের ভর শূন্যে চেয়ে বেশি। এই সব নিউট্রিনো মহাবিশ্বে পদার্থ-ঘনত্বের মান বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা হিসাবে ধরা হয় নি। ছায়াপথগুলির মহাকর্ষীয় আবর্তন বেগ থেকে তার ভর পাওয়া যায়। আবার দৃশ্য, অদৃশ্য বিকিরণ বর্ণালি থেকে সেই ভর হিসাবও করা যায়। বিজ্ঞানীরা এই দুই পদ্ধতিতে ছায়াপথ বা ব্রহ্মাণ্ডগুলির ভর নির্ণয় করে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। তা ছাড়া মহাবিশ্বে বিকিরণহীন বেশ কিছু পদার্থ যেন কোথাও লুকিয়ে আছে। এইসব অদৃশ্য, অজানা পদার্থ, মহাবিশ্বের ঘনত্ব হয়ত সন্ধি-ঘনত্বের সমান করতে পারবে। আর তা যদি হয় তবে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ, চির স্পন্দনশীল— প্রসারণ ও সংকোচন হবে তার নিত্য ধর্ম। আবার ওই সব অদৃশ্য বস্তুর সমন্বয়ে মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি সন্ধি-ঘনত্বের চেয়ে কমই থেকে যায়, তবে মহাবিশ্ব হবে চির সম্প্রসারণশীল। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ তখন হবে অনুমান-নির্ভর। নক্ষত্রগুলি সে ক্ষেত্রে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কেউ কেউ হয়ে যাবে কৃষ্ণগহ্বর। সেগুলি গ্রাস করবে মহাজাগতিক ধূলিকণা এবং গ্যাস। আরও প্রসারণের পর তারা ঠাণ্ডা হতে হতে উবে যাবে বিকিরণ ছড়িয়ে। তখন সেই অতি প্রসারিত মহাবিশ্বে থাকবে অজস্র বিকিরণ, ফোটন, নিউট্রিনো এবং গ্র্যাভিটন, হয়ত কিছু ইলেকট্রন ও প্রোটন।

মহাবিশ্বের অদৃশ্য ভরের তিনটি প্রধান উৎসের কথা বলছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। (1) প্রায় নিভে যাওয়া কিংবা সম্পূর্ণ নিভে যাওয়া শ্বেত বামন এবং নিউট্রন তারা। [2] নিউট্রিনো, যাদের ভর শূন্য ধরা হয়েছে তাদেরও কিছু ভর আছে। [3] কৃষ্ণগহ্বর]Black Hole], তা সে ছোট কিংবা বড় যাই

হোক না কেন। এগুলি দিয়েও সন্ধি-ঘনত্বের কাছাকাছি না পৌঁছাতে পারলে আরও কতকগুলি উৎস আছে যেগুলির থেকে মহাবিশ্বের ঘনত্বের মান বেড়ে সন্ধি-ঘনত্বের সমান হতে পারে। এগুলি হল ঃ

[1] মহাবিশ্বে অসংখ্য তারা আছে যেগুলির সংখ্যাহীন গ্রহ রয়েছে। এই গ্রহগুলিকে ধরতে হবে মহাবিশ্বের ভর সঠিকভাবে নির্ণয় করতে। অনেক লালদানব তারার সঙ্গে সঙ্গী হিসাবে রয়েছে বিশাল ভরের নিভে যাওয়া নিউট্রন তারা বা শ্বেত বামন। এগুলি লাল দানব তারার গ্রহ হিসাবেই পরিণত হয়। কিন্তু এরা অদৃশ্য।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, নক্ষত্র হতে গেলে কোনও বস্তুর বা গ্যাসীয় পিণ্ডের ভর হতে হবে কমপক্ষে সূর্যের ভরের 5%। বৃহস্পতি গ্রহটি আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ। এর ভর সূর্যের ভরের 1/1000 অংশ। তাই বৃহস্পতি নক্ষত্র হতে পারতো যদি তার ভর বর্তমান ভরের 50 গুণ হত। সুতরাং বৃহস্পতি কিংবা তার চেয়ে অনেকগুণ বড় বহু গ্রহ আছে আমাদের মহাবিশ্বে যেগুলির ভর যোগ হবে বিশ্বভরের সঙ্গে। এগুলি নিজস্ব দীপ্তি নেই বলে মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব নির্ণয় করতে এই সব গ্রহদের ভর যোগ করতে পারা যায় নি। এরা বাদ গেছে হিসাব থেকে। মহাবিশ্বে এই রকম দীপ্তিহীন অসংখ্য গ্রহ আছে যেগুলি আমাদের বৃহস্পতির চেয়ে অনেকটাই বেশি ভারী। সারা বিশ্বে এদের অদৃশ্য ভর [Dark Matter] মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্বের বৃদ্ধি ঘটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইসব না হতে পারা নক্ষত্রগুলি, যারা গ্রহ হয়েই আছে, তাদের বলা হতো 'MACHO' বা Massive Compact Halo Objects। এখন এঁদের বলা হয় 'Brown Dwarf' বা 'পিঙ্গল বামন'। এই রকম বেশ কিছু পিঙ্গল বামনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একটি, কেন্দ্রীয় নক্ষত্রটির কাছাকাছি থাকায় প্রতিফলিত আলোর সাহায্যে তার ছবি তোলা গেছে। এইসব পিঙ্গল বামনরা প্রয়োজনীয় অদৃশ্য ভরের কতটা পূরণ করতে পারে তাই-ই এখন দেখার বিষয়।

[2] মহাবিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে গ্যাসীয় পদার্থ। এই গ্যাস আবার কোথাও কোথাও এক লক্ষ ডিগ্রি কেলভিন অবধি উত্তপ্ত। এই গ্যাসীয়পুঞ্জকে কিন্তু ধরা হয়নি মহাবিশ্বের ঘনত্ব নির্ণয় করতে। একেও ধরতে হবে।

[3] অদৃশ্য ভর খুঁজতে গিয়ে একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাবছেন, প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডকে ঘিরে এক বিশাল পরিমাণ দীপ্তিহীন সূক্ষ্ম বস্তুকণামণ্ডল রয়েছে এবং তারই বাড়তি ভর ব্রহ্মাণ্ডের গঠনটিকে টিকিয়ে রেখেছে। তা না হলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রবল ঘূর্ণনবেগের কারণে তাদের গঠন টিকে থাকতে পারতো না। বহুদূর বিস্তৃত ওই কণামণ্ডলে এক বা কয়েক ধরনের দুর্বল মিথষ্ক্রিয়াসম্পন্ন কিন্তু বেশ ভারী কণা অগণ্য সংখ্যায় বিদ্যমান। এই সব কণাদের নাম দেওয়া হয়েছে WIMPS বা Weakly Interacting Massive Particles। এই ধারণা এখনও তত্ত্বীয় পর্যায়ে রয়েছে। তবে কিছুদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডগলাস লিন্ জানাচ্ছেন যে, তিনি আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে দীপ্তিহীন বস্তুকণার মেঘের এক বিপুল ও বিস্তৃত পরিবৃতির সন্ধান পেয়েছেন। তাছাড়া জানা গেছে, আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড এবং নিকটবর্তী ছোট ও বড় 'ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' নামের ব্রহ্মাণ্ড দুটি [Small and Large Magellanic Clould] এক অতি ক্ষীণ হাইড্রোজেন গ্যাসপুঞ্জের মধ্যে ভাসমান। এগুলিকেও হিসাবের মধ্যে আনতে হবে মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্ব সঠিকভাবে জানতে।

মহাবিশ্বের বস্তুঘনত্ব সন্ধি-ঘনত্বের সমান হতে হলে মহাবিশ্বের মোট ভরের 90% ভর খুঁজে বের করতে হবে। এই ভর অদৃশ্য ভর হয়েই আছে। বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন সেই অদৃশ্য ভর *খুঁজে বের করতে। যদি না পাওয়া যায়, অর্থাৎ মহাবিশ্বের পদার্থ ঘনত্ব যদি সত্যিই সন্ধি-ঘনত্বের চেয়ে*

কম হয়, তবে এই মহাবিশ্ব একদিন শেষ হবে বিকিরণ আর কণা সমষ্টিতে। ওইভাবেই অনন্তকাল প্রসারিত হয়ে চলবে এই মহাবিশ্ব।

অতি সম্প্রতি এমন সব প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে, যাতে মনে হচ্ছে বহু ব্রহ্মাণ্ড-সমন্বিত এই মহাবিশ্ব মোটেই সমসত্ত্ব ও সর্বত্রসম [Homogeneous and Isotropic] নয়। মহাশূন্যে ব্রহ্মাণ্ডদের সমাবেশের মধ্যে কোথাও কোথাও অদ্ভুত সব অসমতা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, 100 কোটি ঘন আলোকবর্ষ আয়তনের মধ্যে থাকা কয়েক হাজার গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড, যাদের মধ্যে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডও আছে, তারা সকলে সম্ভবত মহাকাশের কন্যারাশির অঞ্চলের দিকে প্রবল বেগে ধাবমান। আবার, হাইড্রা-সেন্টরাস [Hydra-centaurus] অঞ্চলে এমন একটা কিছু আছে, যা আমাদের মহাবিশ্বের একটা বিশাল অংশকে তার দিকে আকর্ষণ করছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে মহা-আকর্ষক [Great Attractor]। কিন্তু এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বতত্ত্বে আমাদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যেমন ঃ

[1] কোয়ার্ক তত্ত্ব [Quantum Chromodynamics] এবং মহাসূত্র তত্ত্ব [Superstring Theory]। দুটিই যেন মাঝপথে থেকে গেছে। কোয়ার্ক এক ধরনের কণা, আর স্ট্রিং সূতার মতো জিনিস বা কণা। এই দুটি তত্ত্বের একটি কি অপরটির পরিপূরক? নাকি এর একটি সঠিক, অন্যটি ভুল? নাকি এরা আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব এবং কণা তত্ত্বের মত? এর সমাধান আজও পাওয়া যায় নি।

[2] অতি প্রচণ্ড শক্তিশালী কোয়াসারগুলি সবই দূর বিশ্বে অবস্থিত কেন? আমরা এখন তাদের 1300 থেকে 1500 কোটি বছর আগের অবস্থা দেখছি। তাদের এখনকার অবস্থা কখনও জানা যাবে কি? মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দিকে তারা এতো প্রবল ছিল কেন?

[3] বিশ্বের প্রাক্‌কালে তাপ-কেন্দ্রকীয় [Thermonuclear] ক্রিয়া এবং মহাকর্ষ-ঘটিত সংকোচন ক্রিয়া কি অনেক বেশি ছিল? কেনই বা তা অতো বেশি ছিল? মহাবিশ্বের সঠিক আকার কেমন? তার সঠিক আয়তন কত?

[4] বিশ্ব যদি সমসত্ত্ব ও সর্বত্রসম হয়, তা হলে মহা-আকর্ষক, বিপুল-প্রসার মহাশূন্য ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে কেন? বিশ্বের নিকট অঞ্চলগুলির গঠন যেমন, বহু দূরবর্তী অঞ্চলগুলিও সেই রকম এবং একই উপাদান দিয়ে গঠিত কি? বিশ্বের দূরাঞ্চলগুলি কি পরাবস্তু [Anti-matter] দিয়ে গঠিত?

[5] মহাজাগতিক রশ্মির উৎস কী? বিশ্ব কীভাবে উৎপন্ন হয়েছিল? মহাবিশ্ব ভবিষ্যতে সত্যি সত্যিই কীভাবে শেষ হবে? বদ্ধ মহাবিশ্বের স্পন্দনশীলতা, না মুক্ত মহাবিশ্বের বিকিরণ ও কণাসমন্বিত অবস্থা—কোন্‌টি সঠিক?

[6] মহাবিশ্বের চিত্রে একটা অভাবনীয় সুষমা [Symmetry] সর্বত্র রয়েছে—এটা কি আকস্মিক? নাকি এর পিছনে কোনও অসীম শক্তিময় চেতন উৎস কাজ করছে? জীবনের সৃষ্টি কি জড়পদার্থের আকস্মিক পুনঃসমাবেশ, নাকি প্রাণের সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল? সবকিছু দেখে মনে হয়, মহাবিশ্বের পরিবেশ যেন মানবসৃষ্টির অনুকূল করেই তৈরি। তা হলে মহাবিশ্ব মানবমুখী কেন? বিজ্ঞানীরাই বলছেন মহাবিশ্বের ইতিহাসে 10^{40} সংখ্যা এই ইঙ্গিতই দেয় যে, এই সংখ্যার জন্য হাবল ব্যাসার্ধ ততটাই হয়েছে যাতে সেই আয়তনের বিশ্বে মানুষের মত *বুদ্ধিমান প্রাণীর অবস্থান সম্ভব হয়। 10^{40} সংখ্যার অনুষঙ্গী এই ব্যাসার্ধ আকস্মিক নয়, মানুষের*

আবির্ভাব কালের সঙ্গে তার সমাপতন ঘটেছে। কেন এই সমাপতন? ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়?

মানবমুখী মহাবিশ্ব নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যা বলছেন তার সার সংক্ষেপ এই রকম ঃ

"প্রাকৃতিক নিয়মকানুন মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে আকস্মিক কিছু সমাপতন আরোপ করতে পারে কিনা এই প্রশ্ন এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য এই সব সমাপতন যে অপরিহার্য এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার।

সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই, কিন্তু প্রশ্নটির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বস্তুত মানুষমুখী নীতি অধ্যাত্মবাদের জন্য নয়—কারণ সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয়ে অধ্যাত্মবাদীদের বিজ্ঞানের ওই নীতির অবতারণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি। প্রাচীনকালের ধর্মীয় পুরাণে অনেক আগেই মহাজগৎ তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রকরণে স্রষ্টার স্থায়ী অস্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। ক্রমশ বিজ্ঞানের প্রসারে সেই অস্তিত্বের অলীকতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব সমাজের উপর এখন এতো বিস্তৃত যে, সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সমর্থন পাওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই অধ্যাত্মবাদীরা আত্মপক্ষ সমর্থনে মানুষমুখী নীতির আশ্রয় পেতে চাইলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু মানুষমুখী নীতিতে মৌলিক বিজ্ঞানের সমর্থন এতই দুর্বল যে বিজ্ঞানীদের অন্য পথ খুঁজতে হয়।" [মহাবিশ্বের কথা ঃ সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র]।

আধ্যাত্মিকতার কথায় এলে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই ছুৎমার্গী হয়ে উঠেন। তাঁরা মনে করেন আধ্যাত্মিকতা কিংবা কোনও কিছুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যেন চরম বুজরুকি। বিজ্ঞান তার অঙ্ক ও প্রযুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যায় আজও অপারগ, সেখানে দর্শন যদি তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তর্কবিদ্যার·যুক্তিবাদ দিয়ে, সেটির ব্যাখ্যা দিতে পারে, তাকে বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেবার কোনও অধিকার বিজ্ঞানের থাকা উচিৎ নয়। বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা দিতে পারছে না তত্ত্ব কিংবা তথ্য, পরিমাপ কিংবা প্রযুক্তি দিয়ে, তার যুক্তিসম্মত সহজ ব্যাখ্যা যদি দর্শন দিতে পারে, তাকে স্বীকার না করতে পারলেও, বিজ্ঞানীদের একেবারে অস্বীকার করা অনুচিত। আইনস্টাইন, শ্রোয়েডিঙ্গার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা দার্শনিকতা তথা আধ্যাত্মিকতাকে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত উড়িয়ে দেন নি।

মহাবিশ্ব কেন মানবমুখী তার ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান দিতে পারছে না। সে ব্যাখ্যা দিতে নাকি বিজ্ঞানের সময় লাগবে। উপরের উদ্ধৃতি সেই কথাই বলছে। সেক্ষেত্রে উপনিষদীয় দর্শনের একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে তার নিজস্ব ধারায়। সেটা উড়িয়ে দেওয়ার কোনও যুক্তি বিজ্ঞানের আছে বলে মনে হয় না। ধর্মীয় পুরাণের দর্শন ছাড়াও আরেকটা অভ্রান্ত দর্শন আছে, যা উপনিষদীয় দর্শন, যে দর্শন বহু যুগ ধরে বিশ্বসৃষ্টির অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছে, যে দর্শন বহুকাল আগেই বলেছে পদার্থ ও শক্তি এক, যে দর্শন অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগেই বলেছে এক কণা পদার্থ কিংবা এক বিন্দু শক্তি সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, সবই রূপান্তরিত হয় মাত্র। বিজ্ঞানীরা সেই উপনিষদীয় দর্শনের দিকে কবে শ্রোয়েডিঙ্গারদের মত দৃষ্টিপাত করবেন এবং তাঁরা অচ্ছুৎমার্গ থেকে সরে আসবেন, সেই সুবুদ্ধির অপেক্ষায় আছি।

উপনিষদীয় দর্শন বলছে, সৃষ্টি বলতে কিছু নেই। যা ঘটছে সবই রূপান্তর। এক ঈশ্বর বহু হয়েছেন—এই বহু হতে গিয়েই তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন মহাবিশ্বে—প্রাণে ও অপ্রাণে। সাংখ্য

দর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির যত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছে অমন ব্যাখ্যা আমরা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেও পাই নি। মনে রাখতে হবে, সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না নিরীশ্বরবাদী। উপনিষদ ঈশ্বরকে বসিয়েছে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির উপরে এবং গ্রহণ করেছে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত তার চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে। এ নিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আবারও বলি, উপনিষদীয় ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম কোনও মহাশক্তিশালী তৃতীয় ব্যক্তি 'God' কিংবা 'আল্লা' নন—এই পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ব্যাখ্যা হল, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'এ সমস্তই ঈশ্বর'। মহাবিশ্বব্যাপী এই মহান ঈশ্বরের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ থাকার কথা নয়। সামান্য একটা পার্থক্যের কথা অনেকটা আগেই বলেছি এবং তা হল মহাবিশ্বের সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডার, যাকে দর্শন বলছে 'চিৎ'; সেই 'চিৎ'-এরও বিবর্তন হয়, যা বিজ্ঞান মানে না। কিংবা ইংদানী কিছুটা মানে। কারণ একালে হকিং সাহেবই বলেছেন যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকালেই বুদ্ধিমান জীবরাই বিশ্বে থাকবে, তার সংকোচনকালে মহাবিশ্ব বুদ্ধিমান জীবদের উপযোগী থাকবে না। তা হলে তিনি কি এই কথা বললেন না যে, জ্ঞানেরও প্রসারণ এবং সংকোচন তথা বিবর্তন হয় এবং তা আবার মহাবিশ্বের প্রসারণ ও সংকোচনের উপর নির্ভরশীল। উপনিষদীয় এই দর্শন বলছে স্পন্দনশীল বিশ্বের কথা, আর তা বলেছে অন্ততঃ 3000 বছর আগে। সুতরাং উপনিষদীয় দর্শন নিয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানীর উন্নাসিকতা অশোভনীয়।

পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিজেই মহাবিশ্ব হয়েছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ মতে, একা থেকে কেউ সুখ পায় না, আনন্দের জন্য, সুখের জন্য তিনি বহু হলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করলেন। এই মহাবিশ্ব, এই জগৎ-প্রপঞ্চ সবই ঈশ্বর সমুদ্রে নামরূপ তরঙ্গ কিংবা বুদ্বুদমাত্র। সমস্ত জীবজগৎ, সমস্ত চেতন-জগৎ এবং সমস্ত অচেতন বা জড় সব মিলেই তিনি—সেই পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর। তিনি বই কিছু নেই, সবই তিনি, সবই তাঁরই মহান স্বরূপ। মহাবিশ্বের সকল স্থিরাঙ্ক এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, তা যেন মহাবিশ্বকে মানবসৃষ্টির উপযোগী করে তোলার জন্য। এই সমাপতনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। উপনিষদীয় দর্শন তো এর ব্যাখ্যা দিয়েই বলছে, ঈশ্বরই বহু হয়েছেন। তিনিই জড় ও চেতন হয়েছেন, তিনিই জীব ও অচেতন হয়েছেন। তাই তো স্থিরাঙ্কগুলি অমন। ঈশ্বরই মানুষ হয়েছেন। শুধু মানুষ কেন? 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজি ঈশ্বর'? এই ঈশ্বর কোন তৃতীয় ব্যক্তি নন। এই ঈশ্বর মহাবিশ্ব এবং বিশ্বজনীন জ্ঞানের সমষ্টি—'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ'-এর সমাহার—সচ্চিদানন্দ। আগেও বলেছি, আবারও সহজ করে বলি,

$$\text{উপনিষদীয় ঈশ্বর} = \sum_{0}^{\infty} \text{বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান}$$

$$+ \sum_{0}^{\infty} \text{বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কিংবা শক্তি।}$$

ঈশ্বরে নামরূপ তরঙ্গ বা বুদ্বুদ তৈরি হওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে, কারণ, ঈশ্বর বহু হতে চেয়েছেন। মহাবিশ্ব মানবমুখী বলেই কিংবা মানুষ তৈরি করবে বলেই তার স্থিরাংকগুলি অমন মানবসৃষ্টির উপযোগী হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কিংবা মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যই হল সৃষ্টিতে মানুষকে নিয়ে আসা।

বাইবেলের ঈশ্বর খেলার ছলে আদমকে বানিয়ে তার থেকে ইভকে বানালেন, বানালেন বিশ্বকে আদম-ইভের উপযোগী করে। তারপর তিনি গেলেন বিশ্রামে কিংবা ঘুমোতে। কোর-আনও অনেকটা

এমন ধরনের কথা বলে। তাতে 'ইভ' নেই, আছে 'হাবা' বা 'হাওয়া'। এই সব গল্পে আমাদের প্রয়োজন নেই। এই সব পৌরাণিক ধারণা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু যে ঈশ্বর নিজেই বহু হন, যাঁর বিশ্বব্যাপী শরীরেই নামরূপ তরঙ্গের সমারোহ, সে ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেই ঘুমোতে যান না।, এই ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান, অনন্তকাল ধরে স্পন্দনশীল। ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচন তাঁর নিত্যকালীন ধর্ম। সেই ঈশ্বরকে কিছু বৈজ্ঞানিক গায়ের জোরে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু সব বিজ্ঞানী তা পারেন না।

'স্থির অবস্থা তত্ত্ব' [Steady State Theory]-এর জনক হোয়েল-নারলিকারের জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার [J.V. Narlikar] তা পারেন না। পারেন না বলেই উপনিষদীয় দর্শনে তাঁর অগাধ আস্থা। ফ্রেড হোয়েল তো বলেই দিয়েছেন, 'মহাবিশ্ব একটা পরিকল্পিত ব্যাপার' [The Universe is a put-up job]। নারলিকারও লিখেছেন। "..........কারণ মহাবিশ্বের জন্ম নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকরা যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আগে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, সেগুলি আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যদিও তাঁদের চিন্তায় আধ্যাত্মিক মূল্যে গভীরতা বেশি রয়েছে বলে কোথাও কোথাও সমাদর করা হয়। কিন্তু এই চিন্তাভাবনার বৈজ্ঞানিক মূল্যও অনস্বীকার্য। ....। অথচ সম্পূর্ণ নিজস্ব মেধা ও অনুমানশক্তির দৌলতে তাঁরা বিশ্বের উৎপত্তি ও গাঠনিক বিন্যাস নিয়ে যা মতামত প্রকাশ করে গেছেন তা সত্যিই অভাবনীয় এবং বহু জায়গায় আমাদের আজকের ব্যাখ্যাগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।........আমি ব্যক্তিগতভাবে বেদ ও উপনিষদের সুগভীর মতামতগুলিতে চমৎকৃত। যাঁরা এগুলি লিখেছিলেন, তাঁদের তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছিল। তাঁরা মহাবিশ্বের জটিলতা বুঝতে পেরেছিলেন।"

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এক সময় বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই প্রকৃতির চরম রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করার, কারণ আমরা নিজেরাই প্রকৃতির এবং প্রকৃতির রহস্যের অংশ।" আইনস্টাইন তো বলেই রেখেছেন 'স্পিনোজার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর'। আর এই ঈশ্বরই তো 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। তিনি আরো বলেছেন, "বিশ্বসূত্রগুলির মধ্যে এমন একটি চৈতন্যের অভিব্যক্তি রয়েছে যা মানুষের তুলনায় অসীম উন্নত [A spirit is manifest in the laws of the universe—a spirit vastly superior to that of man]।" স্বাভাবিকভাবেই, তিনি তেমন ঈশ্বরে মোটেই বিশ্বাস করতেন না, যে ঈশ্বর একজন বলশালী তৃতীয় ব্যক্তি মাত্র, যিনি মানুষের ভাগ্য কিংবা কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন। বিশ্বব্যবস্থার সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রতিভাত যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরই স্পিনোজার ঈশ্বর—আইনস্টাইনের ঈশ্বর।

1930 সালে বার্লিনে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে অনেকটা পরে নোবেল-জয়ী বিজ্ঞানী ইলিয়া প্রিগোগিন [Ilya Prigogine] বলেছেন ঃ "অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যে রকমভাবেই বাস্তবকে আমরা দেখি না কেন, আজকের বিজ্ঞানের গতি ভারতীয় কবির নির্দেশিত পথেই চলেছে। বাস্তব আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সেতুরচনার মধ্য দিয়েই।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যাখ্যায় উপনিষদীয় দর্শনকেই অনুসরণ করেছিলেন। সে দর্শনে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় বলেই, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 1929 সালে আলোচনার পরে পরেই অনিশ্চয়তা নীতির আবিষ্কর্তা হাইজেনবার্গ বলেছিলেন ঃ "কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্দেশিত বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এখন অনেকটা সহজ বলেই মনে হচ্ছে।"

শ্রোয়েডিংগার বলতেন যে, মন বা চেতনার ব্যাখ্যা ভাবতীয় উপনিষদ যত গভীরভাবে করতে পেরেছে, এমনটি আর কেউ-ই পারে নি। তিনি বলেছেন, "আমি জানি না আমি কোথা থেকে এসেছি বা আমি কে।" আগেই বলেছি ফ্রেড হোয়েলের মতে, 'বিশ্বলোক একটা পরিকল্পিত ব্যাপার'। আবার

বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে নানা নতুন মতের প্রবর্তক পল ডেভিস [Paul Davies] তাঁর 'Superforce' বইটিতে লিখেছেন ঃ "যেসব বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিশ্বের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব ঘটেছে, সেগুলি এক অভাবনীয় কুশলী পরিকল্পনার পরিচয় বহন করে। পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলি যদি পরিকল্পনা-প্রসূত হয় তাহলে বিশ্ব সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে এবং আজকের পদার্থবিদ্যার সাক্ষ্য থেকে আমার খুবই মনে হয় আমরা, ওই সৃষ্টি পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।"

সুতরাং বেশ কিছু নামী-দামী বিজ্ঞানী আজ বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিকতার কথা বলেছেন এবং বলছেনও। এখন বিজ্ঞান মহলে এর বিরুদ্ধ সমালোচনা নেই বললেই চলে। বিরোধিতা রয়েছে কিছু আধা-বিজ্ঞানী তথাকথিত যুক্তিবাদী মহলে, যাঁরা মৌলবাদী শ্রেণীভুক্ত। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কিছু থাকেন বেশ মৌলবাদী। এঁরা চিরকালই থাকেন এবং আছেন। এঁরা ঠিক বিজ্ঞানী নন, এঁরা আধা-বিজ্ঞানী। এঁরা 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী'-র দলভুক্ত।

আজকের এই বিশ্বচিত্র দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকেছেন। কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য এই ব্যাপারে অনাগ্রহী থাকছেন। বলছেন, বিজ্ঞান একদিন এসবের ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে। এই দলের বিজ্ঞানীদের একজন হলেন স্টিফেন ভিনবার্গ [Stephen Wienberg], যিনি আবদুস সালাম ও শেলডন গ্লাসোর সঙ্গে একযোগে 1979 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের 'ইলেকট্রো-উইক তত্ত্ব' [Electro weak Theory] -র জন্য, সেই ভিনবার্গ বলেছেন, "বিশ্ব আমাদের কাছে যতই বোধগম্য হয়ে উঠছে ততই তাকে আরো বেশি অর্থহীন মনে হচ্ছে।" [The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless]

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জন হুইলার [John Wheeler] আশা প্রকাশ করেছেন, "কোন একদিন নিশ্চয়ই একটা দরজা খুলে গিয়ে বিশ্বের জ্যোতির্ময় চালন-কেন্দ্রটির সরল সৌন্দর্য আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে" [Some day a door will open and expose the glittering Central mechanism in its beauty and simplicity] । আর হকিং [S.W. Hawking] বলেছেন, "তবে আমরা সত্যিই যদি কোনদিন (বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারি, তাহলে তার মর্মার্থ কালক্রমে সকলের কাছেই পরিস্ফুট হওয়া উচিত, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর কাছে নয়। আমাদের এবং বিশ্বসংসারের অর্থ সম্পর্কিত আলোচনায় তখন আমরা সকলেই — দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাধারণ মানুষ সবাই, অংশগ্রহণ করতে পারবো। ওই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা পাই তা হলে সেটাই হবে মানব মনীষার চরম সার্থকতা। কারণ তখন আমরা ঈশ্বর মানসের সঙ্গে পরিচিত হব [For then we would know the mind of God] ।" মহাবিশ্ব সম্পর্কে জে.বি.এস হলডেন [J.B.S. Halden] লিখেছেন ঃ "বিশ্ব যে শুধু আমরা তাকে যতটা অদ্ভুত বলে মনে করি তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত তাই নয়, বিশ্ব এতই অদ্ভুত যে আমাদের কল্পনা শক্তিও সেখানে পৌঁছাতে পারে না।" এই পর্যায়ে এসে মহাবিশ্বকে তথা তার রহস্যকে আর গণিত বা তত্ত্ব দিয়ে প্রকাশ করা যায় না —মহাবিশ্ব রহস্য তখন চলে আসে উপলব্ধির দার্শনিকতায়।

এখনকার বিজ্ঞান এই দাশনিকতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনে নতুন পথ খুঁজছে। বিশ্ব রহস্যের সমাধান করতে তার হয়তো আরও কয়েক শতাব্দী লাগতে পারে। ততো দিনে পৃথিবীর মানব সভ্যতা টিকে থাকবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের অধ্যাত্মবাদের- নির্ভরতাকে উড়িয়ে দিয়ে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর নতুন প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এটাই কামনা। যত দিন ওই ব্যাখ্যা না

পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিশ্ব রহস্যের মীমাংসায় উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদকেই আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাই মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে আমরা এইটুকুই বলতে পারি, মহাবিশ্ব যদি স্পন্দনশীল হয়ও তার সংকোচন শুরু হবে অন্ততঃ আরও 2000 কোটি বছর পরে। আর মহাবিশ্ব যদি চির সম্প্রসারণশীলও হয় তবে তা একদিন বিকিরণ ও কণা সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়ে অনন্তকাল ওইভাবেই থেকে যাবে। কবির ভাষায়, 'শক্তির স্পন্দন চলবে আকাশে আকাশে। জ্বলবে না কোথাও আলো।' প্রসঙ্গ শেষ করি রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই, যিনি একাধারে কবি, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী।

"সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই —
'তুমি সুন্দর',
'আমি ভালোবাসি'।"

কে জানে বিধাতা আবার তপস্যায় বসবেন কি না, চির-প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ওই চরম পরিণতি বিকিরণরাশি ও কণাসমূহ থেকে নতুন সৃষ্টির প্রয়াসে। আবারও কি তিনি বলবেন, 'বলো তুমি সুন্দর', বলবেন, 'বলো আমি ভালোবাসি'?। ●●

পরিশিষ্ট-1

● মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে প্রধান ঘটনার কালক্রম ●

কাল	প্রধান ঘটনা
মহাবিস্ফোরণ লগ্ন [0]	মহাবিশ্বের কাল, দেশ ও শক্তির আবির্ভাব। সময়ের শুরু। অনন্যতা থেকে মহাবিশ্বের আরম্ভ।
10^{-43} সেকেন্ড	এই সময়ের মধ্যে কী ঘটেছিল তা আমাদের অজানা। তবে এই সময়ের পরেই গতীয় সাম্য থেকে বিচ্ছিন্ন হল মহাকর্ষ বিকিরণ ও মহাবিশ্বের তাপ। মহাবিস্ফোরণ থেকে এই সময় অবধি কাল হল 'প্ল্যাঙ্কযুগ'।
10^{-34} সেকেন্ড	মহাবিশ্ব তার তৎকালীন অবস্থার প্রায় 10^{50} গুণ হারে স্ফীত হল।
10^{-30} সেকেন্ড	স্ফীতিযুগের অবসান। কণাসৃষ্টির শুরু।
10^{-11} সেকেন্ড	প্রতিসাম্য ভেঙে ইলেকট্রোউইক বল রূপান্তরিত হল তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া বলে [Weak Interaction Force]
10^{-6} — 10^{1} সেকেন্ড	কোয়ার্ক অ্যান্টি-কোয়ার্কের পরস্পর বিনাশ করা বন্ধ হল। অবশিষ্টগুলির তিনটি গোষ্ঠি থেকে উৎপন্ন হল প্রোটন, নিউট্রন ও নিউট্রিনো।
10^{-4} সেকেন্ড	মহাবিশ্বে ইলেকট্রন, পজিট্রন অধিকার করে নিউট্রন, প্রোটন তৈরি হল। প্রোটন তৈরিতে সামান্য কম শক্তির প্রয়োজন হয় বলে মহাবিশ্বে নিউট্রনের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি প্রোটন বেঁচে গেল।
মহাবিস্ফোরণের 10^{-2} সেকেন্ড পরে	তাপগতীয় সাম্যে জড় ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া।
1 সেকেন্ড পরে	নিউট্রিনো অন্য কণার থেকে আলাদা হল।
3 মিনিট 42 সেকেন্ড পরে	নিউট্রন ও প্রোটন মিলিত হয়ে তৈরি হল হল হিলিয়াম নিউক্লীয়াস। মহাবিশ্বে এখন 20% হিলিয়াম এবং 80% হাইড্রোজেন আছে।
7 ঘন্টা পরে	মহাবিশ্বের উষ্ণতা এতোটাই কম হয়ে গেল যে আর কোনও নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটল না।
4 বৎসর পরে	মহাবিশ্বের উষ্ণতা নেমে এলো কোনও নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতায়।

10^6 বৎসর বা 10 লক্ষ বছর পরে	উৎপত্তি হল পটভূমি বিকিরণের। ফোটন বিচ্ছিন্ন হল, ইলেকট্রন ও নিউক্লীয়াস মিলে পরমাণু গঠিত হল। এরপর পদার্থ তৈরি হল। তৈরি হতে থাকলো নক্ষত্র এবং ব্রহ্মাণ্ড।
100 কোটি [10^9] বছর পরে (এখন থেকে প্রায় 1700কোটি থেকে 1900 কোটি বছর আগে)	তৈরি হল নানা ব্রহ্মাণ্ড, নীহারিকাগুচ্ছ এবং কোয়াসারসমূহ। বিশ্বের বর্তমান রূপের আদি অবস্থার সৃষ্টি হল ক্রম প্রসারণে এবং ক্রম বিবর্তনে।
আধুনিক কাল থেকে 500কোটি [5×10^9] বছর আগে	আমাদের সূর্য আবির্ভূত হল আদি তারা বা প্রোটো-স্টার [Proto-Star] হিসাবে।
450 কোটি [4.5×10^9] বছর আগে	আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সর্পিল বাহুর আবির্ভাব। সৌরজগতের গ্রহগুলির সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেন, গ্রহগুলি ও সূর্য নাকি একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রহগুলি গ্রহ হয়েছে কারণ এদের প্রত্যেকের ভর সূর্যের ভরের 5%-এর কম। তবে, সূর্য ও গ্রহগুলির একসঙ্গে উৎপন্ন হওয়াটা তত্ত্বগতভাবে সঠিক নয় বলেই মনে হয়।
এখন থেকে 380কোটি বছর আগে	পৃথিবীর কঠিন শিলাস্তরের উৎপত্তি।
এখন থেকে 350কোটি থেকে 320কোটি বছর আগে [3.5×10^9 থেকে 3.2×10^9 বছর আগে]	ভাইরাস ইত্যাদি আণুবীক্ষণিক জীবের উৎপত্তি আমাদের পৃথিবীতে।
এখন থেকে 200 কোটি বছর আগে	অ্যামিওবার মত জীবের উৎপত্তি।
এখন থেকে 180কোটি [1.8×10^9] থেকে 130 কোটি [1.3×10^9] বছর আগে	পৃথিবীতে গাছপালার আবির্ভাব। আবহমণ্ডলে এলো অক্সিজেনের প্রাচুর্য। জলজ জীবের আবির্ভাব।
90কোটি থেকে 70কোটি বছর আগে	*যৌন মিলনের ফলে জীবনের ক্রমবিকাশ শুরু হল।* জেলিফিস জাতীয় প্রাণী এলো পৃথিবীর সমুদ্রে।
60 কোটি বছর আগে	শামুক জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব পৃথিবীতে।
50 কোটি বছর আগে	মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো পৃথিবীতে।
42.5 কোটি বছর আগে	স্থলে এলো প্রাণী।
40 কোটি বছর আগে	পৃথিবীতে কীটের উৎপত্তি।
32.5 কোটি বছর আগে	*পৃথিবীর স্থলদেশে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব।*
১৮ কোটি বছর আগে	প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের আর্বিভাব হল পৃথিবীতে।

13.5 কোটি বছর আগে	পৃথিবীতে এলো অতিকায় সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ডায়নোসরাস।
7 কোটি বছর আগে	উচ্চতর স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব।
6.5 কোটি বছর আগে	ডায়নোসরাসের বিলুপ্তি ঘটে সম্ভবত বিশাল এক উল্কাপাতের ফলে পৃথিবীতে বহুকাল স্থায়ী প্রবল এক ধূলি ঝড়ের কারণে।
5.5 কোটি বছর আগে	পৃথিবীতে ঘোড়ার আবির্ভাব।
3.5 কোটি বছর আগে	কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর উৎপত্তি
2.4 কোটি বছর আগে	তৃণদের জন্ম
2.1 কোটি বছর আগে	বানর জাতির উৎপত্তি।
2 কোটি বছর আগে	পৃথিবীর বর্তমান আবহাওয়া মণ্ডলের উৎপত্তি।
1.1 কোটি বছর আগে	তৃণভোজী স্থলচর নানা প্রাণীর আবির্ভাব
50 লক্ষ বছর আগে	শিম্পাঞ্জীদের থেকে নর-বানরেরা [Ape-man] আলাদা হয়ে যায়।
37 লক্ষ বছর আগে	নরাকার বানরেরা দু'পায়ে হাঁটতে শিখলো।
20 লক্ষ থেকে 18 লক্ষ বছর আগে	হোমোইরেকটাস [Homoerectus] এলো পৃথিবীতে। এরা দু'পায়ে সোজা হয়ে হাঁটতো। চীনের আদি মানব বা 'পিকিং-মানব' ছিল এরাই।
6 লক্ষ বছর আগে	মানুষ [Homosapiens] এলো পৃথিবীতে।
3.5 লক্ষ বছর আগে	মানুষেরা আগুনের ব্যবহার শিখলো। নিয়ানডারথাল মানুষেরা আগুনের ব্যবহার ভালো করেই জানতো।
40000 বছর আগে	মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখলো।
20000 বছর আগে	মানুষ চাষবাস করতে শিখলো।
18000 থেকে 8000 বছর আগে	নব্যপ্রস্তর যুগের সমাপ্তি। আধুনিক সভ্যতার শুরু।

পরিশিষ্ট-2

● গ্রীক বর্ণমালা ●

Α	α	আলফা (alpha)
Β	β	বীটা (beta)
Γ	γ	গামা (gamma)
Δ	δ	ডেলটা (delta)
Ε	ε	এপসাইলন (epsilon)
Ζ	ζ	জীটা (zeta)
Η	η	ইটা (eta)
Θ	θ	থীটা (theta)
Ι	*i*	আইওটা (iota)
Κ	κ	কাপ্‌পা (kappa)
Λ	λ	ল্যামডা (lambda)
Μ	μ	মিউ (mu)
Ν	ν	নিউ (nu)
Ξ	ξ	জাই (xi)
Ο	ο	ওমিক্রন (omicron)
Π	π	পাই (pi)
Ρ	ρ	রো (rho)
Σ	σ	সিগমা (sigma)
Τ	τ	টাউ (tau)
Τ	υ	আপসাইলন (upsilon)
Φ	φ	ফাই (phi)
Χ	χ	চাই (chi)
Ψ	ψ	সাই (psi)
Ω	ω	ওমেগা (omega)

পরিশিষ্ট-3

● কিছু শব্দার্থ যেগুলি বর্তমান বইটি পড়তে সাহায্য করতে পারে ●

অতিমহান একীকরণ তত্ত্ব [Super Grand Unification Theory] ঃ

বর্তমান মহাবিশ্বের চারটি মৌলিক বলকে একটি বলে একীভূত করার তত্ত্বকে বলা হয় অতি মহান একীকরণ তত্ত্ব। আইনস্টাইন এর নাম দিয়েছিলেন 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' [Unified Field Theory] চারটি মৌলিক বলের মধ্যে 'দুর্বল মিথস্ক্রিয়া বল' [Weak Interaction Force] এবং তড়িচ্চুম্বকীয় বল [Electro-magnetic Force] এখন একীভূত হওয়ায় মৌলিক বল রয়েছে তিনটি—তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল বলের সম্মিলিত রূপ, মহাকর্ষ বল এবং সবল মিথস্ক্রিয়া বল [Strong Interaction Force]।

অনিশ্চয়তাবাদ [Uncertainty or Indeterminancy Principle] ঃ কোয়াণ্টাম তত্ত্বে কণার অবস্থান ও গতিপথ অথবা কণার শক্তির মান ও সময় যুগপৎ নিখুঁতভাবে জানা যায় না। অনিশ্চয়তা তাই কণাজগতের এক মৌলিক ধর্ম। প্ল্যাঙ্কস্থিরাংক h এই অনিশ্চয়তার মাপকাঠি।

অলীক কণা [Virtual Particle] ঃ ভ্যাকুয়াম থেকে ক্ষণস্থায়ী যে সব কণা জন্ম নেয়, তাদের অলীক কণা বলা হয়। অনিশ্চয়তাবাদ এই সব কণার অস্তিত্বের উৎস।

আলোকবর্ষ [Light Year] ঃ এক আলোকবর্ষ হল সেই দূরত্ব, যা মহাশূন্যে আলোকরশ্মি এক বছরে অতিক্রম করে তার প্রতি সেকেন্ডে 3,00,000 কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে। এই দূরত্ব হল 9.46×10^{12} কিলোমিটার।

ইন্টারফেরোমিটার [Interferometer] ঃ একে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রও বলা হয়। আলো বা সমতুল বিকিরণের কিছু কিছু তরঙ্গের বা তার দশার অসম সরণের ফলে যে ব্যতিচার [Interference] বর্ণালী সৃষ্টি হয়, তার পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রই ইন্টারফেরোমিটার।

ইলেকট্রন ভোল্ট [Electron Volt] ঃ শক্তির একক। এক ইলেকট্রন ভোল্ট= 1.6×10^{12} আর্গ। একটি ইলেকট্রন একভোল্ট বিভবের ভেতর দিয়ে ত্বরিত হলে এক ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি লাভ করে। জড় ও শক্তি তুল্যমূল্যতার জন্য কণার ভরও এই এককে প্রকাশ করা হয়।

এক মেরু চুম্বক [Magnetic Monopole] ঃ একটি চুম্বকীয় মেরুযুক্ত খুব ভারী কণা। আদিম বিশ্বের উষ্ণতায় এর অস্তিত্ব ছিল—কোন কোন তত্ত্বে এরকম ধারণা করা হয়।

একীকরণ তত্ত্ব [Unified Theory] ঃ কণা পদার্থবিজ্ঞানে এই তত্ত্ব আপাত পৃথক শ্রেণীর কণাগুলির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বে কণার বিভিন্ন মৌলিক ক্রিয়া একই নিয়মে প্রকাশ করে। যেমন, ম্যাক্সওয়েল আলো ও চুম্বকত্বকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বলে একত্র করেছিলেন।

ওয়েভ ফাংশান [Wave Function] ঃ কোয়াণ্টাম তত্ত্বীয় এই ফাংশানের সাহায্যে একটি কণার বিভিন্ন ধর্ম প্রকাশ করা হয়। ম্যাক্স বর্ণ এই ওয়েভ ফাংশানকে প্রকাশ করেছিলেন গ্রীক বর্ণমালার ψ দিয়ে।

কণাত্বরায়ক [Particle Accelerator] ঃ কণাত্বরণের যন্ত্র। এই যন্ত্রে হয় স্থির লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরিত কণা আঘাত করে অথবা দুটি ত্বরিত কণা বিপরীত মুখে সংঘাত ঘটায়। এই বিপরীত সংঘাত ব্যবস্থায় ত্বরককে কলাইডার বলা হয়। আলোর কাছাকাছি গতিবেগে কণার ভর বেড়ে সংঘাত শক্তি বাড়ে। ফলে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় অন্য কণার সৃষ্টি হয় ও তা কণা সন্ধানী যন্ত্রে ধরা পড়ে।

কণা সন্ধানী [Particle Detector] : গতিশীল কণা সন্ধানের যন্ত্র। আধুনিক এই যন্ত্রে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা কম্প্যুটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে ও কণাত্বরকের সৃষ্ট কণার গতিপথ রেকর্ড করে। মেঘকক্ষ [Cloud Chamber], বুদ্বুদকক্ষ [Bubble Chamber], গাইগার কাউন্টার [Geiger Counter], সিন্টিলেশন কাউন্টার [Scintillation Counter], স্ফুলিঙ্গ কাউন্টার [Spark Counter], ফটোগ্রাফিক এমালসন [Photographic Emulsion] প্রভৃতি এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

কারণবাদ [Causation] : এই নীতিতে প্রত্যেক নতুন ঘটনা পূর্বতন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। সাবেকী পদার্থবিজ্ঞানে এই নীতিতে পরমাণুবাদের যুক্তি দাঁড় করান হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এই নীতি কার্যকর নয় এবং বর্তমান বিজ্ঞানজগতে কারণবাদ অত্যাবশ্যক নীতি নয়।

কুলম্ব বাধা [Couloumb Barrier] : প্রোটনের (বা অন্য আহিত কণার) চারপাশে উদ্ভূত তড়িৎ-চুম্বকীয় বাধাযুক্ত অঞ্চল যা প্রোটনকে (বা অন্য কণাকে) বিকর্ষণ করে।

কৃষ্ণ দেহ বিকিরণ বর্ণালী [Black Body Radiation Spectrum] : কোন বস্তু সব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শোষণ করতে সক্ষম হলে তাকে কৃষ্ণ দেহ বস্তু বলা হয়। তার উষ্ণতা বাড়লে যখন বিকিরণ করে তাতে সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ থাকে। কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কত বিকিরণ হচ্ছে তার বর্ণালীকে কৃষ্ণ দেহ বিকিরণ বর্ণালী বলা হয়। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এই বর্ণালীর লেখচিত্রের একটি সর্বোচ্চ শীর্ষ থাকে। উষ্ণতা বাড়ালে এই শীর্ষবিন্দু হ্রস্বতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যায়। বিগ ব্যাঙজনিত পটভূমি বিকিরণের বর্ণালী—এই শ্রেণীতে পড়ে। তার শীর্ষবিন্দু 3K ডিগ্রি উষ্ণতার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমতুল। এই শ্রেণীর বর্ণালীর উৎস তাপগতীয় সাম্য প্রকাশ করে।

কৌণিক ভরবেগ [Angular Momentum] : সরণশীল বস্তুর রৈখিক ভরবেগের মত আবর্তনশীল বস্তুর ভর ও কৌণিক বেগের গুণফল। কোয়ান্টাম তত্ত্বে $\frac{h}{2\pi}$ এককে কৌণিক ভরবেগ মাপা হয়। এই একক বিভাজ্য নয়।

গিইভো [Gev] : গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট বা 10^9 বা 100 কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট। বিইভো [Bev] [Billion Electron Volt]-এর সমার্থক। বিলিয়নও 100 কোটি [10^9]।

গ্র্যাভিটিনো [Gravitino] : সুপার সিমেট্রি তত্ত্বে কাল্পনিক এই কণা মহাকর্ষ বলের বাহক। এর ভর অজানা হলেও স্পিন ½। অর্থাৎ এই কণা ফের্মিয়ন কণা।

গ্লুওন [Gluon] : সবল নিউক্লীয় বলের বাহক। ফোটন, w, z, গ্র্যাভিটন কণা প্রভৃতি যথাক্রমে যেমন তড়িৎ চুম্বকত্ব, ক্ষীণ নিউক্লীয় বল ও মহাকর্ষের বাহক, গ্লুওনও সেই শ্রেণীতে পড়ে। এটি সকল বলের বাহক। কোয়ার্কের বিনিময় কণা।

ঘটনা [Event] : কাল ও দেশ দ্বারা চিহ্নিত দেশকালের যে কোন বিন্দু।

ঘটনাদিগন্ত [Event Horizon] : কৃষ্ণবিবরের সীমানা।

জুড়ি তারা [Binary Star] : মহাকর্ষবলের আকর্ষণে দুটি তারা দ্বৈত অবস্থায় পরস্পর বাঁধা পড়ে জুড়ি তারা গঠন করে। এরা একে অন্যকে আবর্তন করে।

জ্যামিতি [Geometry] : দেশে অঙ্কিত রেখাগণিত। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে দেশ সমতল অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক দেশে দেশ সমতলের অনুরূপ। নন্‌উক্লিডীয় জ্যামিতিতে দেশ বক্র অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক দেশে একটি গোলক বা পরাবৃত্ত। এই দেশ হল 'স্পেস' [Space]। তবে, Space-কে দেশ না বলে

'মহাকাশ' বলাটাই যুক্তিযুক্ত। তাতে 'স্পেস' শব্দটার ভাবার্থ অনেকটাই প্রকাশ পায়, যা 'দেশ' শব্দে প্রকাশ পায় না। তা ছাড়া Spaceship মানে মহাকাশ যান, Space Exploration মানে মহাকাশ অভিযান ইত্যাদিই ব্যবহৃত, 'দেশযান' বা 'দেশ অভিযান' এখানে অচল।

টিইভো [Tev] ঃ টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট বা 10^{12} ইলেকট্রন ভোল্ট।

ট্রিলিয়ন [Trillion] ঃ 10^{12} বা এক লক্ষ কোটি।

ডপলার সরণ ঃ গতিশীল পদার্থ থেকে বিকিরণের অথবা শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আপাত পরিবর্তন। নক্ষত্র পর্যবেক্ষক থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে ক্রমশ নীচু কম্পাংকের আলো বিকিরণ করে। ফলে নক্ষত্রের বর্ণালী নীচু কম্পাংক লালের দিকে সরে যায়। লাল সরণের পরিমাণ ও নক্ষত্রের দূরত্বের নিবিড় সম্পর্ক থেকে মহাবিশ্ব যে প্রসারণশীল তা প্রমাণ হয়।

ডিগ্রি [Degree] ঃ উষ্ণতার মাপ। ডিগ্রি কেলভিন পরম উষ্ণতার একক। সেলসিয়াস এককে রূপান্তর করতে কেলভিন থেকে 273 বিয়োগ করতে হবে।

তাপগতিবিদ্যা [Thermodynamics] ঃ তাপ কিংবা অন্যান্য শক্তির আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান হল তাপগতিবিদ্যা বা তাপগতিবিজ্ঞান। দুটি বস্তু একই উষ্ণতার থাকলে তাদের মধ্যে তাপ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা হল তাপগতীয় সাম্য। এই বিজ্ঞানের প্রথম নিয়ম হল তাপ একটি শক্তির প্রকারভেদ এবং তাপশক্তি শক্তির নিত্যতার নিয়ম বজায় রেখে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। আর এই বিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম হল তাপীয় অসাম্য অবস্থায় তাপ দিয়ে কাজ করানো যায়, সাম্য থাকলে কাজ পাওয়া যায় না। শক্তির রূপান্তরণের সময় কিছু তাপশক্তি অকার্যকর শক্তি বা এনট্রপিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কম এনট্রপি [Entropy] হল বেশি শৃঙ্খলা, এনট্রপি বাড়লে বিশৃঙ্খলা বাড়ে।

দশান্তর [Phase Transition] ঃ বস্তুজগতের সাম্যাবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্তন হল দশান্তর। মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে শীতল হল, এই ঘটনা হল মহাবিশ্বের দশান্তর।

দেশ-কাল-সন্ততি [space-time continuum] ঃ একে মহাকাশ-সময়-সন্ততিও বলা হয়। কারণ Space বলতে 'দেশ' বললে তা Space-এর যথাযথ অর্থ দ্যোতক হয় না। মহাকাশ-সময়-সন্ততির প্রতিটি বিন্দুই এক একটি ঘটনা নির্দেশ করে। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসার মহাকাশের প্রতিটি বিন্দুই চতুর্মাত্রিক। মহাকাশের বা দেশের তিনটি মাত্রা হল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এবং এর চতুর্থমাত্রা হল কাল বা সময়।

নিত্যতাবাদ [Conservation law] ঃ পদার্থের রূপান্তরে নিত্যতাবাদ কোন পরিমাণকে স্থির মানে রাখে। যেমন—শক্তির রূপান্তরে তার বিনাশ হয় না, পরিমাণ নিত্য থাকে।

নিশ্চয়তাবাদ [Determinism] ঃ কার্যের পিছনে কারণ আছে এই নিশ্চিত নীতি (কারণবাদ দ্রষ্টব্য)।

পারসেক [Parsec] ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের দূরত্বের একক = 3.26 আলোক বৎসর। এই দূরত্ব হল, $3.26 \times 9.46 \times 10^{12}$ কিলোমিটার বা 30.8396×10^{12} কিলোমিটার মোটামুটি 30.8 লক্ষ কোটি কিলোমিটার।

প্রতিসাম্য [Symmetry] ঃ বস্তুর কোনও গঠনতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ায় পরও তার কোন অবস্থার অপরিবর্তনীয়তা। যেমন, মহাবিস্ফোরণের 10^{-11} সেকেন্ড অবধি 100 গিইভো [Gev] বা

10,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের সমতুল উষ্ণতায় তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া বলের প্রতিসাম্য অটুট থাকে। উষ্ণতা এর চেয়ে কমে গেলে প্রতিসাম্য ভেঙ্গে যায়। দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল আলাদা হয়ে যায়। ওই উষ্ণতার নীচে ওই দুটি বলের প্রতিসাম্য ভেঙ্গে [Broken] দুটি আলাদা বল হয়ে প্রকাশ পায়।

প্রোটোগ্যালাক্সী [Protogalaxy] ঃ নির্মীয়মান ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে কোনও নির্মীয়মান গ্যালাক্সী বা ব্রহ্মাণ্ড নেই। তাই মনে করা হয় সব বা অধিকাংশ ব্রহ্মাণ্ডই যেন আগে তৈরি হয়ে গেছে।

ফের্মিয়ন [Fermion] ঃ ½ স্পিন বিশিষ্ট কণা। ফের্মিয়ন পউলির বর্জননীতি মেনে চলে। ফলে একই কোয়াণ্টাম অবস্থার দুটি ফের্মিয়ন পরমাণুতে থাকতে পারে না। তাই পরমাণুর একটি ইলেকট্রন কোষে ইলেকট্রন সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে। প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, কোয়ার্ক প্রভৃতি সব বেরিয়ন ও লেপটন কণাই ফের্মিয়ন শ্রেণীতে পড়ে।

বদ্ধ মহাবিশ্ব [Closed Universe] ঃ মহাজাগতিক এই মডেলে মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে গিয়ে সংকোচন ঘটে ও শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্ব বিগ ব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণের আগের অনুরূপ অগ্নিগোলকে পরিণত হয়।

বিইভো [Bev; Billion Electron Volt] ঃ 10^9ev বা একশ কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট। গিইভোর সমার্থক।

বিলিয়ন [Billion] ঃ 10^9 বা একশত কোটি।

বেরিয়ন [Baryon] ঃ তীব্র নিউক্লীয় বলে প্রভাবিত হয় এরকম ভারী মৌলিক ½ স্পিনবিশিষ্ট কণা। প্রোটন ও নিউট্রন এই শ্রেণীতে পড়ে।

বেরিয়ন সংখ্যা [Baryon number] ঃ মহাবিশ্বের মোট বেরিয়ন ও অ্যান্টিবেরিয়নের বিয়োগফল। তাই এই সংখ্যা মহাজাগতিক কণা—বিপরীত কণার অপ্রতিসাম্যের (Asymmetry) সূচক।

বোসন [Boson] ঃ যে সব মৌলিক কণার স্পিন শূন্য অথবা পূর্ণসংখ্যা এবং বর্জন-নীতি মেনে চলে না। ফোটন, মেসন, w, z কণা এই শ্রেণীতে পড়ে। মহাবিশ্বের যাবতীয় মৌলিক কণা হয় বোসন নয় ফের্মিয়ন। একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, কণারা এই দুটি ভাগেই বা বিভক্ত কেন?

বর্জন নীতি বা অপবর্জন নীতি [Exclusion Principle] ঃ পউলির 'অপবর্জন নীতি'-কে অনেকে 'বর্জন নীতি' বলে অভিহিত করেন। এই নিয়মে দুটি ফের্মিয়ন কোথাও একই কোয়াণ্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। মহাবিশ্বের সর্বত্র এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বর্ণালি [Spectrum] ঃ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী বস্তু বা শক্তির বণ্টন ব্যবস্থার রেকর্ড। নক্ষত্র ও ছায়াপথের রাসায়নিক উপাদান জানতে বর্ণালি বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

মহান একীকরণ তত্ত্ব [Grand Unification Theory-GUT] ঃ সবল মিথষ্ক্রিয়া বল ও ইলেকট্রোউইক বলের সমন্বয়ী বিভিন্ন তত্ত্ব। এখন এই দুটি বলের প্রতিসাম্য ক্ষয় পেয়ে দুটি আলাদা বলে পরিণত হয়েছে। আদিম মহাবিশ্বে একদা এই দুটি বল এক ছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণ ও শীতলীভবনের দশান্তরে তাদের বাহক কণা প্রতিসাম্য হারিয়ে আলাদা ধর্ম পেয়েছে। মহাবিশ্বের আদি অনন্যতায় সব মৌলিক বলই এক ছিল। তড়িচ্চুম্বকীয় বল, মহাকর্ষ বল এবং সবল মিথষ্ক্রিয়া বল [Strong Interaction Force]—সবই একীভূত ছিল। মহাবিশ্বের ক্রমপ্রসারণ এবং উষ্ণতার ক্রম-হ্রাসমানতায় এই বলগুলি আলাদা হয়ে যায়।

মহাবিশ্বের প্রসারণ [Expansion of Universe] ঃ হাবলের সূত্রানুসারে মহাবিশ্ব ক্রম-প্রসারণশীল। ব্রহ্মাণ্ডগুলি একে অপরের থেকে ক্রমশঃ দূরে ছুটে পালাচ্ছে, যেন কেউ তাড়া করেছে। কাছাকাছি অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে এই প্রসারণ তেমন লক্ষণীয় না হলেও দূরের ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে এই প্রসারণ খুবই প্রকট এবং প্রবল। ওই সব অঞ্চলে মহাকর্ষ যেন অনেকটাই শিথিল।

মাত্রা [Dimension] ঃ একটি জ্যামিতিক অক্ষ।

মানুষমুখী নীতি [Anthropic Principle] ঃ যে নীতিতে দেখান যায় যে, প্রাকৃতিক স্থিরাংকগুলি এমন একসুরে বাঁধা যে তাদের মানের একটু অদল-বদল হলে পৃথিবী জীবনের উপযোগী হত না। তাহলে, যারা আছে তারা কেন আছে সে প্রশ্ন কেউ তুলতে পারত না।

মিইভো [Mev] ঃ [মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট Million Electron Volt] = 10^6ev.

মিলিয়ন [Million] ঃ 10^6 বা দশ লক্ষ।

মুক্ত মহাবিশ্ব [Open Universe] মহাজগৎ তত্ত্বের কোন কোন মডেলে মহাবিশ্ব চিরদিন প্রসারিত হবে এবং কখনও তার সংকোচন হবে না। এই মডেলের মহাবিশ্ব মুক্ত। তাতে দেশকাল হবে পরাবৃত্তীয় অর্থাৎ মুক্ত।

মুক্তিবেগ [Escape Velocity] ঃ যে গতিবেগ হলে মহাকর্ষ এড়িয়ে কোন বস্তু অন্য বস্তু থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কোন মহাকাশযানকে পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহে যেতে হলে তার মুক্তিবেগ ঘণ্টায় 25000 মাইল হওয়া আবশ্যক।

মেগা পারসেক [Mega Parsec] ঃ দশ লক্ষ পারসেক। এক পারসেক হল 3.26 আলোকবর্ষ। অতএব এক মেগাপারসেক হল $3.26\times9.46\times10^{12}\times10^6$ কিলোমিটার বা 30.8396×10^{18} বা 308 পরার্ধ কিলোমিটার। এক পরার্ধ = 10^{17}।

ব্রহ্মাণ্ডগুলির সীমাহীন দূরত্ব মাপতে এখন আর আলোকবর্ষ দিয়ে চলে না, এমন কি পারসেকও খুব ক্ষুদ্র একক বলে প্রতীয়মান হওয়ায়, মেগা-পারসেকই একালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভরসার একক।

ম্যাগেল্লানিক ক্লাউড [Megallanic Cloud] ঃ আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড হল — 'বড় ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' এবং 'ছোট ম্যাগেল্লানীয় মেঘ'। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এদের দেখা যায়।

রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা [Relativity] ঃ 1905 সালে আইনস্টাইন আবিষ্কার করেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ [Special Theory of Relativity]। 1916 সালে প্রকাশিত হয় তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। যে সব কণার গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছকাছি তাদের ভর, আচরণ ধর্ম ইত্যাদি জানা যায় এই আপেক্ষিকতাবাদ থেকে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের অনুসিদ্ধান্ত থেকেই পাওয়া যায় $E = mc^2$ এবং 'কাল প্রসরণ' [Time Dilation]। পদার্থবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দেয় বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। কণার কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করে কণার গতিবিধি নিখুঁত জানা যায়।

লাল সরণ [Red shift] ঃ দূরবর্তী ছায়াপথের নক্ষত্রের আলোর বর্ণালি রেখার সরণ প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলির গতিবেগের জন্য ঘটে। এই সরণকে লাল সরণ বলে।

লেপটন [Lepton] ঃ যে সব হাল্কা মৌলিক কণার পরিমাপযোগ্য আয়তন নেই ও তীব্র নিউক্লীয় বলে প্রভাবিত হয় না তারাই লেপটন। ইলেকট্রন, মিউঅন, নিউট্রিনো প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে।

সন্ধি-ঘনত্ব [Critical density] ঃ মহাজাগতিক পদার্থের যে ঘনত্ব হলে মহাবিশ্ব বদ্ধ হবে ও তার প্রসারণ বন্ধ হবে, সেটাই সন্ধি-ঘনত্ব। দেশের দশ ঘনমিটারে প্রায় দশটি হাইড্রোজেন পরমাণু সন্ধি-ঘনত্বের মাপকাঠি।

সময়, কাল [Time] ঃ এই মাত্রা দিয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিহ্নিত করা যায়। আপেক্ষিক তত্ত্বে দেশের মাত্রার অনুরূপ কালও একটি জ্যামিতিক মাত্রা।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ [General Theory of Relativity] ঃ 1916 সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করেন তাঁর অতি বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। প্রকৃতির নিয়ম পর্যবেক্ষকের নড়াচড়া বা গতির উপর নির্ভর করে না এবং এই নিয়ম সব সময় এক থাকে এই ধারণার উপর আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। 'আকর্ষণ বল' নয়, 'মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র' ধারণা দিয়ে তিনি নিউটনীয় ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটান। 'বিশ্বতত্ত্ব' [Cosmology] নতুন মাত্রা পায় তাঁর এই আপেক্ষিকতা বাদ থেকে। বদ্ধ মহাবিশ্বের মডেল এসেছে এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদেরই হাত ধরে।

সার্ন [CERN] ঃ সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরের বাইরে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কণা-ত্বরায়ক যন্ত্র। এটি বিশ্বখ্যাত। সার্ন আসলে 'The Centre for European Nuclear Research'-এর সংক্ষেপিত রূপ।

সিঙ্গুলারিটি [Singularity] ঃ দেশে অসীম বক্রতার একটি বিন্দু যেখানে আপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়ম খাটে না। কৃষ্ণবিবর সিঙ্গুলারিটির প্রতীক। সম্ভবত কৃষ্ণবিবর ছাড়া সৃষ্টির আদিলগ্নে মহাবিশ্বেও সিঙ্গুলারিটির অবস্থা ছিল, তা নগ্ন সিঙ্গুলারিটি নামে পরিচিত।

সুপার নোভা [Super Nova] ঃ নক্ষত্রের আকস্মিক বিস্ফোরণ।

সুপারসিমেট্রি [Supersymmetry] ঃ ফের্মিয়ন ও মেসনের মধ্যে প্রতিসম সম্পর্ক সন্ধানের তত্ত্বাবলী। অর্থাৎ ½ স্পিনের ও পূর্ণসংখ্যক স্পিনের একত্ব যে সব তত্ত্বে প্রতিপাদিত হয়। যদি তা এই সন্ধানে সফল হয়, তবে চারটি স্বাভাবিক বল যে প্রতিসম বা এক তা প্রমাণ করা যাবে। তখন আদিম মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশও বোঝা যাবে।

সুপারস্ট্রিং তত্ত্ব [Superstring Theory] ঃ এই তত্ত্বে আন্তঃপারমাণবিক কণার বস্তুত দেশের একমাত্রায় দড়ির মত বিস্তার আছে এবং এই সব কণার ধর্ম, দড়ির অবস্থান ও কম্পন দিয়ে নির্ধারিত হয়।

সুষমতাবাদ [Uniformetarianism] ঃ এই তত্ত্বে প্রমাণ করা হয় যে, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন আকস্মিকতা (Catastrophes) নয়, বরং বাতাস, আবহওয়া, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি মৃদু প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘটেছে।

সূক্ষ্ম গঠন স্থিরাংক [Fine Structure Constant] ঃ e,c,h এবং ε এই চারটি স্থিরাংক থেকে মাত্রাহীন এই স্থিরাংক পাওয়া যায়। এই স্থিরাংক $\alpha = \frac{1}{137}$ তড়িৎ চুম্বকীয় বিক্রিয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ করে। তীব্র নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সমতুল এই সংখ্যা 1, একই মাপকাঠিতে দুর্বল নিউক্লীয় বলের এই ক্ষমতা 10^{-13} এবং মহাকর্ষ বলের 10^{-38} ।

স্পন্দনশীল মহাবিশ্ব [Oscillating Universe] ঃ এই মতবাদে মহাবিশ্ব বদ্ধ ও তার প্রসারণ একদিন বন্ধ হবে। তার সংকোচন হয়ে আবার বিগ ক্রানচের মধ্য দিয়ে বিগ ব্যাঙের সিঙ্গুলারিটিতে

মহাবিশ্ব ফিরে আসবে। তখন আবার দশান্তরে প্রসারণ আরম্ভ হবে। বার বার প্রসারণ ও সংকোচনে মহাবিশ্ব অনন্তকাল স্পন্দনশীল থাকবে।

স্পিন [Spin] ঃ মৌলিক কণার নিজের অক্ষে অভ্যন্তরীণ কৌণিক ভরবেগ। প্ল্যাঙ্ক স্থিরাংক h এককে প্রকাশ করা হয়। বোসনের পূর্ণসংখ্যক স্পিনের মান কণা ভেদে 0h,1h, 2h ইত্যাদি এবং ফের্মিয়নের অর্ধ-পূর্ণসংখ্যার স্পিনের মান হবে $\frac{1}{2}$h, $\frac{3}{2}$h ইত্যাদি।

স্ফীতি তত্ত্ব [Inflation Theory] ঃ এই মতবাদে ধারণা করা হয় যে, আদিম মহাবিশ্বে প্রসারণের হার বর্তমান হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এই হার সরলরেখায় নয় এক্সপোনেনসীয় হারে বর্ধিত মানে ঘটেছিল।

হাবল নিয়ম [Huble Law] ঃ দূরের ছায়াপথগুলি পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের গতিবেগের সঙ্গে আনুপাতিকভাবে সম্পর্কিত। যে হারে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয় তাকে হাবল স্থিরাংক বলা হয়। প্রতি মেগাপারসেক দূরত্বে 50 কিলোমিটার। ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব ও তার লাল সরণ থেকে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে মহাবিশ্ব যে প্রসারণশীল তা প্রমাণিত হয়।

হিগ্‌স বোসন [Higgs Boson] ঃ হিগ্‌স বোসনের ক্ষেত্র ইলেকট্রোউইক বলের তত্ত্বে প্রতিসাম্য ক্ষয়ে দুটি আলাদা বল সৃষ্টিতে সাহায্য করে মনে করা হয়। এই ক্ষেত্রই মনে হয় w,z কণার উৎস।

হেডরন [Hadron] ঃ এই সব মৌলিক কণা সবল নিউক্লীয় বলে প্রভাবিত হয়। এদের দুটি শ্রেণী—মেসন ও বেরিয়ন।

বর্তমান তালিকার বাইরেও বহু শব্দ সারা বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিটি নতুন শব্দের সঙ্গে তার ইংরেজীটিও দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার শব্দগুলি মূলত বিশ্ব তত্ত্ব [Cosmology] সংক্রান্ত।

পরবর্তী তালিকায় কিছু পরিভাষা দেওয়া হল যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিভাষাগুলি নেওয়া হয়েছে 'প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা' বইটি থেকে। বইটি লিখেছেন 'শ্রী অপূর্ব কুমার চক্রবর্তী'। বর্তমান বইটির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-4

● কিছু পরিভাষা ●

অক্ষাংশ — Latitude
অক্ষবৃত্ত — Circle of latitude
অন্তর্গ্রহ — Inferior Planet
অনস্তগ — Circumpolar
অনুভূ — Perigee
অনুসূর — Perihelion
অপভূ — Apogee
অপরাহ্ন — Evening
অপসূর — Aphelion
অপেরণ — Aberration
বার্ষিক— Annual
আহ্নিক — Diurnal
অমাবস্যা — New moon
অর্ধবৃত্ত পদ্ধতি — Semicircular system
অর্ধেন্দু — Dichotomized moon
অশ্বিনী বিন্দু — Vermal equinox, First point of Aries
আকাশ জ্যোতি — Zodiacal light
আদি বলয় — O-zone
আদিবৃত্ত — Equinoctial Colure
আন্তর্জাতিক সময় রেখা — International date line
আলোক বৎসর — Light year
আহ্নিক বৃত্ত — Diurnal circle
উত্তর বিন্দু — North point
উন্নতি — Altitude
উপাদান, গ্রহকক্ষার — Elements of planetary orbit
উল্কা — Meteor
ঋতুচক্র — Cycle of seasons
এ. ইউ — A.U. (Astronomical Unit)
কটাল, মরা — Neap tide
কটাল, তেজ — Spring tide

কর্কটক্রান্তি — Summer solstice
কর্কটক্রান্তি রেখা — Tropic of Cancer
করোনা — Corona
কলা, গ্রহের — Phases of Planet
কলা, চন্দ্রের — Phases of the moon
কাল বলয় — Times Zone
কালশোধন — Equation of time
কুবিন্দু — Nadir
কেতু — Descending node (of moon)
কেন্দ্রশোধন — Equation of centre
কেপলার — Kepler
কোপারনিকাস — Copernicus
ক্রমোস্ফিয়ার — Cromosphere
ক্রান্তিবিন্দু — Solstice
ক্রান্তিবৃত্ত — Ecliptic
ক্রান্তিলম্ব — Celestial latitude
ক্রান্ত্যংশ — Celestial longitude
খ-অক্ষ — Celestial axis
খ-গোল — Celestial sphere
খ-মেরু — Celestial pole
খৃলদীয় চক্র — Chaldean Saros
গুরুবৃত্ত — Great circle
গ্রহণ, চন্দ্র — Lunar eclipse
বলয়গ্রাস — Annular eclipse
সূর্য — Solar eclipse
চন্দ্রের কলঙ্ক — Lunar maria
গহ্বর — Lunar craters
চান্দ্রদিন — Lunar day
চান্দ্রমাস — Lunar month
ছায়াপথ — Milky way
জলবিষুব — First point of Libra, Autumnal equinox
জাইরোস্কোপ — Gyroscope
জোয়ারভাটা — Tide
টলেমি — Ptolemy

টাইকো ব্রাহে — Tycho Brahe
ট্যানজেন্ট সূত্র — Tangent law
তারকা, অতিদানব — Star, supergiant
গুণিতক— Star, multiple
চল — Variable
দানব — Giant
পুঞ্জ — Stellar cluster
যুগ্ম — Double star
শ্বেত বামন — White dwarf
তারকার গতি — Stellar motion
মান — Stellar magnitude
তুলাবিন্দু — First Point of Libra
দক্ষিণাবর্ত — Clockwise
দিগন্ত, খ — Clelestial horizon
প্রত্যক্ষ — Visible horizon
দিগবিন্দু — Cardinal point
দিগংশ — Azimuth
দ্রাঘণ — Elongation
নক্ষত্র — Constellation
নতাংশ — Zenith distance
নাক্ষত্রকাল — Sidereal time, Sidereal period
নাক্ষত্র দিন — Sidereal day
নিরক্ষরেখা — Terestrial equator
নিরক্ষীকরণ — Reduction to equator
নীহারিকা — Nebula
নীচোচ্চ বৃত্ত — Epicycle
নেপচুন — Neptune
নোভা — Nova
পথকোণ (পৃথিবীর) — Earth's way
পশ্চিম বিন্দু -- West point
পাত বিন্দু — Node
পাত বৃত্ত — Secondary
পাদসংস্থান — Quadrature
পার্সেক — Parsec
পূর্ণিমা — Full moon
পূর্ব বিন্দু — East point
পূর্বাপরবৃত্ত — Prime vertical
পূর্বাহ্ণ — Morning
প্রতিযোগ — Opposition
প্রতিসরণ — Refraction
প্রতিসরাঙ্ক — Coefficient of refraction
প্রতীপ গতি — Retrograde motion
প্রমাণ কাল — Standard time
প্লুটো — Pluto
ফটোস্ফিয়ার — Photosphere
ফুকো — Foucault
বলয়কাল — Zonal time
বহির্গ্রহ — Superior planet
বামাবর্ত — Counter clockwise
বালেন্দু — Crescent moon
বিক্ষেপ — Declination
বিষুবরেখা — Celestial equator
বিষুবাংশ — Right ascension
বুধ — Mercury
বৃহস্পতি — Jupiter
বেসেল — Bessel
বোড — Bode
ব্রাডলি — Bradley
ভূজাংশ — (ক্রান্ত্যংশ দেখুন)
মকরক্রান্তি — Winter solstice
মকরক্রান্তি রেখা — Tropic of Capricorn
মঙ্গল — Mars
মধ্যকাল — Mean time
মধ্যগমন — Transit, Culmination
উচ্চ — Upper transit
নীচ — Lower transit
মধ্যরেখা — Meridian
খ-মধ্যরেখা — Celestial meridian
মূল-মধ্যরেখা — Prime meridian
মন্দ কোণ — Anomaly
মন্দ মাস — Anomalistic month

মিটন বা মেটন চক্র — Metonic cycle
যুতিকাল — Synodic period
য়ুরেনাস বা ইউরেনাস — Uranus
রাশি — Sign of zodiac
রাশিচক্র — The zodiac
রাহু — Ascending node of moon
রিভার্সিং স্তর — Reversing layer
লঘুবৃত্ত — Small circle
লম্বন — Parallax
অনুভূমিক লম্বন — Horizontal parallax
লম্ববৃত্ত — Vertical circle
লাইব্রেশন — Libration
লুপ — Loop
শনি — Saturn
শীর্ষবিন্দু — Apex
শুক্র — Venus
সন্ধ্যালোক — Twilight
সমাক্ষবৃত্ত — Parallels of declination
সম্মুখ গতি — Direct motion
সংযোগ — Conjunction
সুবিন্দু — Zenith
সুপার নোভা — Super Nova
সৌর কলঙ্ক — Sun-spot
স্থানীয় কাল — Local time
হার্জস্প্রুং-রাসেল চিত্র — Hertzsprung-Russel diagram, HR Diagram
হোরাচক্র — Hour circle, Declination circle
হোরাকোণ — Hour angle
Aberation — অপেরণ
annual — বার্ষিক
diurnal — আহ্নিক
Afternoon -- অপরাহ্ণ
Altitude — উন্নতি
meridian — মাধ্যান্নতি
Anomaly — মন্দ কোণ
Anticlockwise — বামাবর্ত
Apex — শীর্ষবিন্দু
Aphelion — অপসূর
Apogee — অপভূ
A. U.—এ. ইউ.
Azimuth — দিগংশ
Bode's law — বোডের সূত্র
Cardinal points — দিগবিন্দু
Celestial axis — খ-অক্ষ
equator — বিষুবরেখা
meridian — খ-মধ্যরেখা
pole — খ-মেরু
sphere — খ-গোল
Circle of latitude— অক্ষবৃত্ত
Circumpolar — অনস্তগ
Chaldean Cycle— খৃলদীয় চক্র
Clockwise— দক্ষিণাবর্ত
Conjunction— সংযোগ
Constellation — নক্ষত্র
Corona—করোনা
Culmination— মধ্যগমন
lower— নীচ
upper —উচ্চ
Declination— বিষুবলম্ব
circle — হোরাচক্র
Direct motion — সম্মুখ গতি
Diurnal circle — আহ্নিক বৃত্ত
East point — পূর্ব বিন্দু
Earth's way — পৃথিবীর পথকোণ
Eclipse — গ্রহণ
annular — বলয়গ্রাস
lunar — চন্দ্রগ্রহণ
solar — সূর্যগ্রহণ
Ecliptic —ক্রান্তিবৃত্ত
Elements of planetary orbit — গ্রহকক্ষের উপাদান

Elongation — দ্রাঘণ
Epicycle — নীচোচ্চ বৃত্ত
Equation of centre — কেন্দ্রশোধন
Equation of time — কালশোধন
Equator (Celestial) — বিষুবরেখা বা বৃত্ত
Equator (Terrestril) — নিরক্ষরেখা বা বৃত্ত
Equatorial system (of co-ords) —বিষুবীয় পদ্ধতির স্থানাঙ্ক
Equinoctial colure — আদিবৃত্ত
Equinox-autumnal — জলবিষুব
vernal — মহাবিষুব
precession of — অয়নচলন
First point of Aries — অশ্বিনী-বিন্দু, মেষাদিবিন্দু
Libra — তুলাবিন্দু
Foucault — ফুকো
Great circle — গুরুবৃত্ত
Gyroscope — জাইরোস্কোপ
Harvest moon — হৈমন্তিক চন্দ্র
Hertzsprung-Russel Diagram — হার্জস্প্রুং-রাসেল চি·
Horizon-celestial — খ-দিগন্ত
true — ক্ষিতিজ, স্পষ্ট দিগন্ত
visible — প্রত্যক্ষ
dip of — দিগন্তের নতি
Hour angle — হোরাকোণ
circle — হোরাচক্র
International date line — আন্তর্জাতিক সময় রেখা
Jupiter — বৃহস্পতি
Latitude-geocentric — ভূকেন্দ্রীয় অক্ষাংশ
celestial —ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ
geographical —ভৌগোলিক অক্ষাংশ
Libration — লাইব্রেশন

Light year — আলোকবর্ষ
Longitude —দেশান্তর, দ্রাঘিমা
celestial — ক্রান্ত্যংশ, ভুজাংশ, দ্রাঘিমা
Lunar day — চান্দ্রদিন
maria — চন্দ্রের কলঙ্ক
month —চান্দ্রমাস
Loop — লুপ
Mars — মঙ্গল
Meridian — মধ্যরেখা
prime—মূলমধ্যরেখা
Meteor — উল্কা
Meton cycle — মিটন বা মেটন চক্র
Milky way — ছায়াপথ
Moon — চন্দ্র
cressent — বালেন্দু
dichotomised— অর্ধেন্দু
gibbous — স্ফীতেন্দু
phases of — চন্দ্রের কলা
new — অমাবস্যা
full — পূর্ণিমা
Morning — পূর্বাহ্ন
Nadir — কুবিন্দু
Nebula — নীহারিকা
Neptune — নেপচুন
Node — পাত বিন্দু
ascending — উচ্চপাত বিন্দু, রাহু (চন্দ্রের)
descending — নীচপাত বিন্দু, কেতু, (চন্দ্রের)
North point — উত্তর বিন্দু
Nova — নোভা
Nutation — অক্ষবিচলন
Opposition — প্রতিযোগ
Parallax — লম্বন
horizontal — অনুভূমিক
geocentric — ভূকেন্দ্রিক
heliocentric (annual) — বার্ষিক

Parallel of declination — সমাক্ষবৃত্ত
Planet — গ্রহ
inferior — অন্তর্গ্রহ
superior — বহির্গ্রহ
Perigee — অনুভূ
Perihelion — অনুসূর
Period, sidereal — পর্যায়কাল
synodic — যুতিকাল
Pluto — প্লুটো
Quadrature — পাদসংস্থান
Reduction to equator — নিরক্ষীকরণ
Refraction-atmospheric — বায়ব প্রতিসরণ
coeff. of — প্রতিসরণাঙ্ক
Retrograde motion — প্রতীপ গতি
Reversing layer — রিভার্সিং স্তর
Right ascension — বিষুবাংশ
Saturn — শনি
Seasons, cycle of — ঋতুচক্র
Secondary — পাত বৃত্ত
Semicircular system—অর্ধবৃত্তীয় পদ্ধতি
Sidereal, day — নাক্ষত্রদিন
month — নাক্ষত্রমাস
period — পর্যায়কাল
time — নাক্ষত্রকাল
year — নাক্ষত্র বৎসর
Small circle — লঘুবৃত্ত
Solstice — অয়নান্ত বিন্দু
summer — কর্কটক্রান্তি
winter — মকরক্রান্তি
Solstitial colure — মকরবৃত্ত
Sun — সূর্য
apparent — স্ফুট সূর্য
mean — মধ্য সূর্য
spot — সৌর কলঙ্ক
Star — তারকা
clustar — তারকাপুঞ্জ
double — যুগ্ম তারকা
giant — দানব
multiple — গুণিতক তারকা
super giant — অতি দানব
variable — চল তারকা
white dwarf — শ্বেত বামন
Stellar magnitude — তারকার মান, মানাঙ্ক
motion — তারকার গতি
Super nova — সুপার নোভা
South point — দক্ষিণ বিন্দু
Tangent law — ট্যানজেন্ট সূত্র
Tide — জোয়ারভাটা
neap — মরা কটাল
spring — তেজ কটাল, ভরা কটাল
Time-local — স্থানীয় কাল বা সময়
mean — মধ্যকাল
standard — প্রমাণ কাল
zonal — বলয়কাল
zone — কালবলয়
Transit — মধ্যগমন
instrument — সংক্রমণ যন্ত্র
Tropic of cancer — কর্কটক্রান্তি রেখা
capricorn — মকরক্রান্তি রেখা
Twilight — সন্ধ্যালোক বা গোধূলি
Uranus — য়ুরেনাস বা ইউরেনাস
Venus — শুক্র
Vertical circle — লম্ববৃত্ত
prime — পূর্বাপরবৃত্ত
West point — পশ্চিম বিন্দু
Zenith — সুবিন্দু
distance — নতাংশ
Zero zone — আদিবলয়
Zodiac — রাশিচক্র
Zodiacal light — আকাশ জ্যোতি
Zodiacal sign — রাশি

চিত্রসূচি

নির্দেশিকা

যে সব বই ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

[1] ঋগ্বেদ সংহিতা (1ম ও 2য় খণ্ড) — হরফ প্রকাশনী
[2] ঋগ্বেদ সংহিতা — রমেশচন্দ্র দত্ত
[3] উপনিষদ (1ম ও 2য় খণ্ড) — হরফ প্রকাশনী
[4] কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত — রাজশেখর বসু
[5] মহাভারত — কালীপ্রসন্ন সিংহ
[6] মহাভারতম্ — হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
[7] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা — উদ্বোধন কার্যালয়
[8] রবীন্দ্র রচনাবলী — বিশ্বভারতী
[9] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — জগদীশচন্দ্র ঘোষ
[10] ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান — প্রশান্ত প্রামাণিক
[11] মহাসময়ের ইতিবৃত্ত — প্রশান্ত প্রামাণিক
[12] বেদ বিজ্ঞান এবং — প্রশান্ত প্রামাণিক
[13] আইনস্টাইনের বিশ্ব — ড. শঙ্কর সেনগুপ্ত
[14] আলবার্ট আইনস্টাইন — দ্বিজেশচন্দ্র রায়
[15] মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন — প্রশান্ত প্রামাণিক
[16] মহাবিশ্বে মহাকাশে — গৌরীপ্রসাদ ঘোষ
[17] মহাবিশ্বের কথা — সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
[18] সৃষ্টির পথ — সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
[19] পদার্থ বিকিরণ বিশ্ব — সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
[20] ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র — বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ
[21] মহাকাশের বুকে পৃথিবী — শঙ্কর চক্রবর্তী
[22] প্রাচীন ও মধ্যযুগে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা — নলিনীকান্ত চক্রবর্তী
[23] মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ — শঙ্কর চক্রবর্তী
[24] জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর — ইয়া পেরেলমান
[25] জ্যোতির্বিজ্ঞানের ডায়েরি — অরূপরতন ভট্টাচার্য
[26] ফোটন ও পরমাণু কেন্দ্র — আ. কিতাইগারোদস্কি
[27] প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা — অপূর্ব কুমার চক্রবর্তী
[28] প্রাচীন ভারতে জ্যামিতি চর্চা — ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদার
[29] পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য — ডঃ তারক মোহন দাস
[30] পরমাণু ও কেন্দ্রীণ — দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
[31] পদার্থবিদ্যার নবযুগ — চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
[32] পদার্থবিদ্যার মজার কথা — ইয়া পেরেলমান
[33] শ্রী সূর্য সিদ্ধান্ত — শ্রী বিজ্ঞানানন্দ
[34] পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ — প্রশান্ত প্রমাণিক

[35] বেদান্ত দর্শন — ডঃ রমা চৌধুরী
[36] বিশ্ব পরিচয় — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[37] গ্রহ নক্ষত্র — জগদানন্দ রায়
[38] প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান — অরূপরতন ভট্টাচার্য
[39] সূর্যের আদি-অন্ত — ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত
[40] হরপ্পার অনার্য গরিমা — প্রশান্ত প্রামাণিক
[41] সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা — ডঃ অতুল সুর
[42] মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা — ডঃ অতুল সুর
[43] মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য — ডঃ অতুল সুর
[44] পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষা — দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
[45] জ্ঞান বিচিত্রা (সেপ্টেম্বর, 1996)
[46] জ্ঞান বিচিত্রা (আগস্ট ও নভেম্বর 2003)
[47] জ্ঞান বিচিত্রা (এপ্রিল-মে, 2004)
[48] আনন্দবাজার পত্রিকা (30শে সেপ্টেম্বর, 2006)
[49] আনন্দবাজার পত্রিকা (26শে এপ্রিল, 2007)
[50] জ্ঞান বিচিত্রা (আগস্ট, 2007)
[51] A. Brief History of Time — Stephen W. Hawking
[52] QED-The Strange Theory of Light and Matter — Richard P. Feynman
[53] Einstein's Universe — Nigel Calder
[54] The Collapsing Universe — Issac Asimov
[55] Atomic physics — Prof. J. B. Rajam
[56] The Evolution of Physics — Albert Einstein & Leopold Infeld
[57] Albert Einstein — Arthur Beckard
[58] A Star Called the Sun — George Gamow
[59] Space To-day — Mohan Sundara Rajan
[60] Astronomy — Edited by John Paton
[61] Quantum Mechanics — V. K. Thankappan
[62] Geometry in Ancient and Mediaval India — Dr. T. A. Saraswati Amma
[63] Indian Ephemeris, 2007 — N. C. Lahiri
[64] The Emperor's New Mind — Roger Penrose
[65] Cosmos — Carl Segan
[66] Bose and His statistics — G. Venkataraman
[67] The First Three Minutes — S. Wienberg

[68]	Chandrasekhar and His limit	G. Venkataraman
[69]	God and The New physics	Paul Davies
[70]	The Realm of the Nebulae	E. P. Hubble
[71]	The Birth and Death of the Sun	George Gamow
[72]	The Big Bang : The Creation and Evolution of the Universe	J. Silk
[73]	The Structure of the Universe	J. V. Narlikar
[74]	Black Holes and Baby Universe	S. W. Hawking
[75]	Shadows of the Mind	Roger Penrose
[76]	An Introduction to Astrophysics	Baidyanath Basu
[77]	The Expanding Universe	Arthur Eddington
[78]	The Amazing Universe	H. Friedman
[79]	Vedic Mathematics	Jagadguru Swami Sri Bharati Kṛṣṇa Tirthaji Mahārāja
[80]	Galaxies and the Universe	Allan Sandage, Mary Sandage and Jerome Kristian.
[81]	Star Clusters	James E. Hesser
[82]	Dynamics of Star and Star Cluster	Jeremy Goodman & Piet Hut
[83]	The Life and Death of a Star	Donald A. Cooke
[84]	Elementary Particles	David H. Frisch & Alan M. Thorndike
[85]	A Planet Called Earth	George Gamow
[86]	The New Solar System	J. Kelly Beatty & Andrew Chaikin
[87]	The Planetary System	David Morrison & Tobias Owen
[88]	Time and its Measure ment : From the stone age to the Nuclear Age	Harrison Cowan
[89]	Sun, Earth, Time and Man	Lucia C. Harrison
[90]	Encyclopedia of Time	Samuel L. Macoy
[91]	Origin of the Universe	Albert Hinkelbein
[92]	Science Reporter [May, 1963 November, 2000 & October, 2005]	

[93]	Mysteries of Mind Space and Time (26 Vols.)	Published by H. S. Stuttman INC.
[94]	Astronomy Encyclopedia	Edited by Sir Patrick Moore
[95]	D. K. Universe	General Editor Martin Rees
[96]	Whitaker's World of Facts	Russell Ash
[97]	Exploring the Planets (8 Vols.)	Duncan Brewer
[98]	Encyclopedia Americana	
[99]	Encyclopedia Britannica.	

লেখকের অন্যান্য বই

1.	মহাসময়ের ইতিবৃত্ত (2য় সংস্করণ) (দে'জ পাবলিশিং)	100 টাকা
2.	রোমন্থন (ইতিহাসের স্মৃতিচারণা) (কাঁথির ইতিহাস)	100 টাকা
3.	সপ্তর্ষি (বিংশ শতাব্দী)	40 টাকা
4.	হঠাৎ ঘণ্টা বাজে (বিংশ শতাব্দী)	25 টাকা
5.	শব্দের কথকতা (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	50 টাকা
6.	বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র (2য় সংস্করণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	70 টাকা
7.	বেদ বিজ্ঞান এবং (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	100 টাকা
8.	ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান (2য় সংস্করণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	150 টাকা
9.	মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন (4র্থ মুদ্রণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	120 টাকা
10.	মৃত্যু—দর্শনে ও বিজ্ঞানে (2য় মুদ্রণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	75 টাকা
11.	পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	75 টাকা
12.	বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (2য় সংস্করণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	60 টাকা
13.	বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ (2য় সংস্করণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	80 টাকা
14.	নোবেলবিজ্ঞানী রামন (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	90 টাকা
15.	বামিয়ানের বর্বরতা (দে'জ পাবলিশিং)	100 টাকা
16.	হরপ্পার অনার্য গরিমা (2য় মুদ্রণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	220 টাকা
17.	নোবেলবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	100 টাকা
18.	বারোজন পদার্থবিজ্ঞানী (2য় সংস্করণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	150 টাকা
19.	নাহিনের জামদানী (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	65 টাকা
20.	মহাবিজ্ঞানী নিউটন (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	130 টাকা
21.	তিনটি বিস্ময়কর প্রভাব (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	80 টাকা
22.	পরমাণু শক্তি ও ভারতবর্ষ (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	100 টাকা
23.	বিপ্লবী বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	110 টাকা